প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে. সি. আই. ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্রোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৮
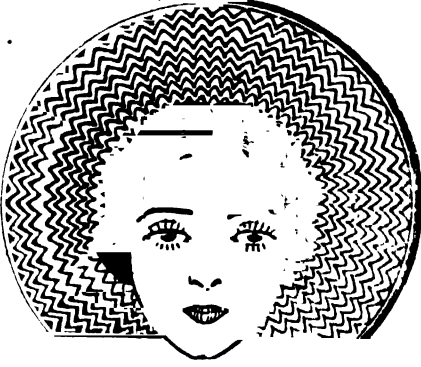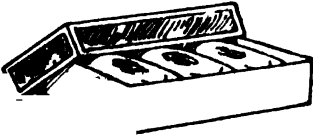
সচিত্র মাসিক পত্রিকা

২৪শ বর্ষ

সন ১৩৩৮, বৈশাখ—চৈত্র

সম্পাদক :

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক :

শ্রীকিরণকুমার রায়

কার্য্যালয় :

৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ল্য

টাকা

প্রতি সংখ্যা

চারি আনা

বর্ষ-সূচী

১৩৩৮, বৈশাখ—চৈত্র

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা— [illegible]

বিনামূল্যে ! বিনামূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনামূল্যে শ্বেতকুষ্ঠের একটা ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।॰ আনা পাঠাইলে নমুনাস্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা, বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।/॰ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীদেরও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

—•—

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ

অতি সুমিষ্ট। অতি শীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বল বৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী

একদিনেই সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥/॰ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।/॰ আনা।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ

১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা। তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা
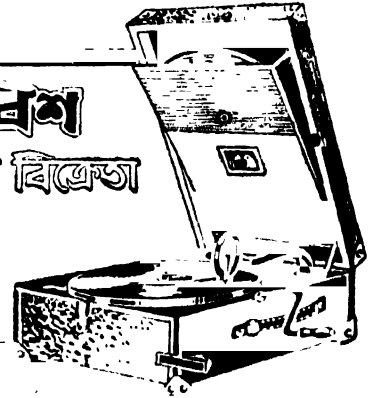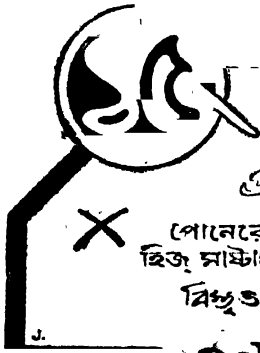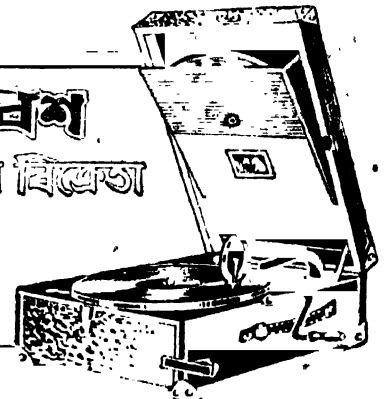
সুবাসিত তিল রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৩৩, ক্যানিং কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

বৈশাখ—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

বৈশাখ—১৩৩৮

কালিপুর-আশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ

পুস্তকের নাম	মূল্য	লেখক
১। জগৎস্বপ্ন	১৲	শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ
২। ক্ষেপীর খেয়াল	৷০	" যোগেশ্বরী সরস্বতী
৩। তত্ত্বকথা	১৷০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রফেসার
৪। ঐ ২য় খণ্ড		
৫। সদ্‌গুরু ও রাজযোগ	১০	শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস বি, এ
৬। সত্যযুগ	৷০	"
৭। ঋষিযোগে স্মৃতি	১৲	" প্রমোদচন্দ্র রায় বি, এ
৮। মুমুক্ষুর বিচার	৷০	শ্রীপ্রতিভা সাংখ্যশাস্ত্রী ও শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী
৯। পূর্ণানন্দের প্রলাপবাক্য	১৲	শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
১০। ঠিক বেঠিক	৷০	"
১১। রামপ্রসাদের 'মা'	৷৶০	"
১২। উপদেশাবলী	৷০	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
১৩। আশ্রম চতুষ্টয় (ব্রহ্মচর্য্য)	৮০	" সুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ
(ছাত্রজীবন) ছাত্রদের জন্য	৷০	
১৪। তত্ত্ব-সঙ্গীত	৵০	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত

আশ্রমাচার্য্য—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, কালিপুর আশ্রম
কামাখ্যা (পোঃ), কামরূপ (আসাম)।

মুকুলিকা

২৪শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | ১ম সংখ্যা

স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে
তখন আর কিছু তো রবে,
তবু দিয়ে মনে বিস্ময়ের
বিরহদীপ জ্বেলো ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ বৈশাখ
১৩৩৮

অনাগত

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

বরষের খেয়া বাহি' বন্ধু মোর চৈত্ররাত্রি-পারে
পার হয়ে গেল অন্ধকারে ;
বিদায়ের কোনো বাণী না কহিয়া কিছু,
নিঃশব্দ প্রশান্ত মুখে গেল চলি' মাথা করি নীচু।
সুখে দুঃখে বাঁধি' ঘর, মোরা—যারা দীর্ঘ দিনেরাতে
এতদিন ছিনু সাথে-সাথে,
স্তব্ধ রহিলাম বসি' তীরপ্রান্তে চাহিয়া সম্মুখে
ব্যথাতুর বুকে।

ধূসর বালুকাতটে নাহি আলো নাহি অন্ধকার,
অস্পষ্ট উষার আলো ইঙ্গিতে জানায় বুঝি পার—
বহুদূরে মোহানার শেষে,
নক্ষত্রের রশ্মি ধরি' বন্ধু মোর গিয়াছে যে দেশে।

—সত্যই সে গেল চলি'—এমনি একান্ত অনায়াসে ?
বিদায়ের রীতি হেরি' অভিমানে চক্ষে জল আসে
জলে-ভরা এই সিন্ধুতীরে !
দুরন্ত আশায় চিত্ত বারবার তবু ফিরে'-ফিরে'
আপনারে বুঝাইতে চায়—
নহে নহে, এ নহে বিদায়।
এ যে তার জয়-যাত্রা, বিদায়-যাত্রার ছদ্মবেশে ;
মোদেরই জয়-শ্রী জিনি' নূতন গৌরবে ফিরিবে সে।
সে কি রূপ, সে কি সজ্জা—সে কি মূর্ত্তি তার
আবার হেরিব চক্ষে, কল্পনায় স্মরি বারম্বার।

* * * *

নিশান্তের হিম বায়ু কাঁটা দিল আকাশের গায়ে
নয়নে নামায়ে তন্দ্রা, অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ জড়ায়ে।
তারি মাঝে, মনে হ'ল, সহসা জাগিল কলতান,
উর্ম্মিক্ষুব্ধ সাগরের গান—
ঐ আসে, ঐ আসে, ঐ বুঝি এল অনাগত,—
নরনারী মাথা কর নত।
দিগন্তে দুলিছে তারই মেঘে-মেঘে বিজয়-পতাকা—
পিঙ্গল শঙ্করজটা প্রলয়ের জলদর্চ্চিমাখা।

সুদূর সিন্ধুর বক্ষে ঐ আসে—ঐ আসে সে কি!
ভয়ে ভয়ে দেখি—
ও কি রূপ ভীম ভয়ঙ্কর!
বিগত বন্ধুর মূর্ত্তি কোথা গেল প্রসন্ন সুন্দর?
ভ্রূকুটি-কুটিল ভালে, অতি দূরে, যায় তবু দেখা
উদ্গলিত সদ্য রক্তরেখা!
প্রচণ্ড ঘৃণার হাস্য স্ফুরিত বিকট আস্য 'পরে,
উচ্ছ্রিত সুদীর্ঘ বাহু উদ্ধত ত্রিশূল ধরি' করে!
মূর্ত্তিমান কাল-সম অকাল-বৈশাখী
বজ্রকণ্ঠে থাকি'-থাকি' উঠে ডাকি'-ডাকি'!
হাহাকারে হুহুঙ্কারে ভরা,
বিদীর্ণ বিরাট ব্যোম, পদতলে স্পন্দমান ধরা!
তীরে নীরে চারিধারে তবু উঠে তারি জয় জয়,
ভয়ঙ্কর ভয়মাঝে কোন্ মন্ত্র ঘোষিল অভয়?

সিন্ধুতীরে সিন্ধুরই উচ্ছ্বাসে
নিরন্ন লাঞ্ছিত ক্লিষ্ট নরনারী ভিড় করি' আসে,—
বরি' লয় আগন্তুকে জয়ধ্বনিমাঝে;
কর্কশের কোলাহলে উন্মত্ত তাণ্ডব-সাম বাজে!
এ কি রূপ, এ কি মূর্ত্তি—এই অনাগত!
এই মানবের বন্ধু—সমুদ্ধত সংহার-উদ্যত?

* * * *

চোখ মেলে' চেয়ে দেখি—বৈশাখের আতপ্ত প্রভাত:
জলে স্থলে ঝলিতেছে তপনের শুভ্র রশ্মিপাত।
দৃঢ়কায় উগ্রগন্ধী ধীবরের দল
সৈকতে বাঁধিয়া ভেলা করিছে উন্মত্ত কোলাহল।
সিন্ধু-শকুনের শ্রেণী আঁকি'-বাঁকি' তারি পাশে-পাশে
মৎস্য-আশে ভিড় করি' আসে।
ছন্দে দ্বন্দ্বে নিরানন্দে কর্ম্মিদল চলিয়াছে কাজে,
দূরে কোথা মন্ত্রকণ্ঠে প্রাহরিক বাজে!

———

কৌলিক শক্তির প্রভাব

[শ্রীকালিদাস রায়]

আমেরিকার কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্তের সন্তানগণ যে কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহার কারণ, তাহারা তাহাদের পিতা-মাতার ক্রোড়ে পালিত হয় বলিয়া—রক্তে বিষ লইয়াই তাহারা জন্মে না। কুলিয়ান দ্বীপে আমেরিকার কুষ্ঠ-রোগীদের একটি উপনিবেশ আছে—সেখানে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক প্রথাও আছে। কিন্তু সন্তান জন্মিবামাত্র সেই সন্তানকে আমেরিকায় আনিয়া প্রতিপালিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের কুষ্ঠরোগ জন্মায় নাই।

আমি বিষয়টির উল্লেখ করিয়া কৌলিক শক্তির প্রভাবকে অস্বীকার করিতে চাহি না। আমার বক্তব্য, জন্মের পর পিতামাতার সংসর্গজাত দোষগুণগুলিকেও অনেক সময় আমরা কৌলিক শক্তির প্রভাবে আরোপ করিয়া বসি। কৌলিক শক্তির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু সেটাকে অতিরিক্ত বড় করিয়া দেখা উচিত নয়। তাহার উপরই অতিরিক্ত নির্ভর করিয়া মানুষ-বিভাগের একটা চিরন্তন রীতি চলিতে পারে কিনা—তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

বীজের মূল্য যত বেশিই থাকুক—মৃত্তিকার গুণ প্রাকৃতিক অবস্থা, জলসেচনাদির মূল্য যে অল্প নহে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পিতা বড় কি মাতা বড় ধরণের প্রশ্ন উঠে। হিন্দু কৌলিক শক্তি যেমন স্বীকার করে—তেমনি শিক্ষাসংসর্গাদির মূল্যও স্বীকার করে—সে সম্বন্ধে তাহার সতর্কতা অল্প নহে—বরং খুবই কঠোর। এত সতর্কতার নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ আছে। তাহা ছাড়া হিন্দুমতে জন্মান্তরীণ সংস্কার আছে। জন্মের তিথি নক্ষত্রাদি আছে—দেশকালগত বৈশিষ্ট্য আছে—ঋতুগত প্রভাব আছে—পিতামাতার স্বাস্থ্য ও বয়ঃক্রমের কথা আছে—জন্মকালীন পিতামাতার মনের ও দেহের অবস্থার কথা আছে—গর্ভ-বাসকালীন মাতার আচরণ, আহারবিহার চিন্তাচেষ্টার কথা আছে—আরো কত কি যে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষের জীবনগঠনের অসংখ্যবিধ উপাদানের কথা ভাবিতে গেলে কৌলিক শক্তির মূল্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাই কৌলিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমাদের যে প্রত্যাশা, তাহা তত্ত্বের সাহায্যে যতটা বল পায় দৃষ্টান্তের সাহায্যে ততটা বল পায় না। বৈজ্ঞানিক যখন কোন মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন—তখন তাহাকে অনন্যসংযুক্ত ভাবেই দেখেন। যে প্রাকৃতিক শক্তির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূত্র নিরূপণ করেন—সে শক্তি ব্যবহারিক জগতে বা মানুষের জীবনে আরো পাঁচটা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া অথবা দ্বন্দ্ব করিয়া বর্তমান থাকে। অন্যান্য শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শক্তিবিশেষের বৈজ্ঞানিক সূত্র অবলম্বনে মানুষের জীবনে একটা ধ্রুব সত্যে পৌঁছান কঠিন।

বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণাশ্রমীরা যে বীজের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা আর আত্মা এক হইতে পারে না। ইহা কোন বিশিষ্ট বীজ; সাধনা ও শিক্ষার দ্বারাই তাহা একদিন মানবদেহে গঠিত হইয়াছে। এ বীজ যেমন অনাদি নহে—তেমনি অমরও নয়। 'যুগে জঘন্যে'ই হউক আর প্রতিকূল অবস্থাতেই হোক, আর আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ক্রিয়াবৈগুণ্যেই হউক একদিন তাহা ধ্বংস পাইতে পারে—তাহার স্থলে নূতন নূতন বীজেরও সৃষ্টি হইতে পারে। সে জন্য স্মরণাতীত, অতীত যুগের আদর্শকল্পিত বীজের উপর নির্ভর করিয়া চিরকাল ধরিয়া কোন বংশধারার জীবন ও চরিত্রবিচার বা সদ্গুণপ্রবণতার সন্ধান চলিতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত। শিক্ষাসাধনার দ্বারা উপচিত বীজ অপেক্ষা মানুষের জীবনে যে প্রবলতর মানবিকতার বীজ আছে, তাহাই সামান্য (general) এবং অনুশীলনসাপেক্ষ বীজ তাহার কাছে বিশেষ (special). মানুষের চিত্তের অধিকাংশ গুণ, সংযমের বলে স্বাভাবিক দোষের পরাভব মাত্র—অধিকাংশ ধর্ম স্বাভাবিক পাপপ্রবণতাকে সংযম বলে পরাজয়। এই সংযমের বল একই জীবনে কখনো,

দৃঢ়, কখনো শিথিল থাকে—পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে প্রজনন-কালে সেই সংযমপ্রবণতা কোথায় যে শিথিল হইয়া পড়ে তাহার কি কেহ খোঁজ রাখে ?

তারপর সংযমকে সাধনাসাপেক্ষ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইলেও যে সকল বৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে, সকল মানবচিত্তেই সেই সকল বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। পাপ-পুণ্য দোষ-গুণ সমস্ত বিরোধী দ্বন্দ্বের প্রবণতার অস্তিত্ব সকল মানবচিত্তেই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায় —সাধনাসাপেক্ষ বিশিষ্ট বীজে যদি নাও থাকে, প্রাকৃতিক মানবিকতার সাধারণ বীজে তাহা থাকিয়াই যায়।

দোষেগুণে পাপেপুণ্যে জড়িত মানবিকতার বীজ মানুষের মধ্যে অমর। বংশানুগত এই মানবিক শক্তি বিশিষ্ট কৌলিক শক্তিকে সহজেই গ্রাস করিয়া ফেলিতেও পারে। অথবা উচ্চতর বিশিষ্ট কৌলিক শক্তিকে এতটা ক্ষীণ করিয়া তুলিতে পারে যে নিকৃষ্ট কৌলিক শক্তির সহিত তাহার প্রভেদ না থাকিতেও পারে। বৃক তপোবনে প্রতিপালিত হইয়া মৃগধর্ম্ম লাভ করিতে পারে—তপোবন হইতে কিছু কাল দূরে চলিয়া গেলেই তাহার বৃকত্ব ফিরিয়া আসিতে পারে। তাহার মৃগত্ব সাময়িক—কিন্তু বৃকত্ব চিরদিনের। যে বিজ্ঞান কৌলিক শক্তির প্রভাব স্বীকার করে, সেই বিজ্ঞানকেই স্বাভাবিক মানবিক ধর্ম্মে কৌলিক শক্তির বিলয়কেও স্বীকার করিতে হইবে। উভয়ই বিজ্ঞানসম্মত। জগতে তাহার উদাহরণের অভাব নাই। পুরাণ ইতিহাসেও তাহার অজস্র উদাহরণ রহিয়াছে। পুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে কৌলিক প্রভাবের সংক্রমণের যেমন স্বাভাবিক শক্তি আছে—তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্যও তেমনি অজস্র প্রাকৃতিক শক্তি বর্ত্তমান। কৌলিক শক্তির প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চশ্রেণীর গুণাবলী লাভ করিব, প্রত্যাশা করিয়া আমরা নিরাশ হই, আবার যেখানে প্রত্যাশা করি না এমন ক্ষেত্রে সেই গুণাবলীর অস্তিত্ব দেখিয়া তেমনি আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু নৈরাশ্য বা বিস্ময়ের কারণ দেখি না। যে সাধনা ও শিক্ষার বলে অতীত কালে উচ্চ বংশে একটি উচ্চশ্রেণীর কৌলিক শক্তি জন্মিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে,—সেই সাধনা ও শিক্ষার নিভৃত অনুশীলনে নিকৃষ্ট বংশে সেই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। এক হাজার বৎসর আগে একজন সাধারণ মানুষে যে শক্তির অঙ্কুর জন্মিতে পারিয়াছে—আজই বা অন্য একজন সাধারণ মানুষে তাহার অঙ্কুর জন্মিবে না কেন ?

কৌলিক শক্তির ফল যদি খুব স্পষ্ট ও অবিসংবাদিত হইত তাহা হইলে সে শক্তিকে মানিয়া লইবার জন্য বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হইত না—সাধারণ লোকেই প্রত্যক্ষ তাহা বুঝিতে পারিত। ফল বেশ স্পষ্ট নয় আর ব্যতিক্রম অত্যন্ত বেশি বলিয়াই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন হইয়াছে।

কৌলিক প্রভাব যেমন সত্য—তাহার ব্যতিক্রমগুলোও তেমনি সত্য। সাধারণ মানবিক শক্তির প্রভাবের **higher synthesis** এ তাহাদের মিলন ঘটিতে পারে। কৌলিক শক্তির প্রভাবকে ক্রিয়াশীল ও ফলবান করিতে হইলে যে পরিমাণ আটঘাট-বাঁধা সতর্কতার প্রয়োজন—তাহা শুধু **experiment** হিসাবেই চলিতে পারে। চিরদিন ধরিয়া প্রত্যেক বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দ্বারে দ্বারে প্রহরীর ব্যবস্থা করা কোন সমাজের পক্ষেই সম্ভব নয়।

আমরা অনেক সময় মনে ভাবি, 'প্রবচনেন, মেধয়া বহুনা শ্রুতেন' বুঝি মানবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়। এগুলি রক্তমাংসের দুর্ব্বলতাকে দমন করিয়া রাখে মাত্র—বল্গা শ্লথ হইলেই যেমন দুর্দ্দম অশ্ব স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে—বংশানুক্রমে এইগুলির অভাব হইলে তেমনি মানবিক দুর্ব্বলতা আবার সবই জাগিয়া উঠে। প্রত্যেক পুরুষের ব্যক্তিগত সাধনার যে শক্তি তাহা পুরুষপরম্পরা লাভ করিতে পারে না। বহু পুরুষ ধরিয়া সাধনার বিচ্ছেদ ঘটিলে দৈহিক বৃত্তিগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে মিলিতে পারে—মানসিক শক্তি কিরূপে সংক্রামিত হইবে? বীজের উপমার বদলে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপমা দেওয়া যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একেবারে নিভিয়া যাইতে পারে—পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে শুধু ভস্মই উড়িয়া আসিতে পারে। বংশে একদিন অগ্নি ছিল এই গৌরবের অভিমানই প্রকৃত কৌলিক শক্তি অপেক্ষা ঢের বেশি কাজ করিতে পারে। আভিজাত্যের অভিমানে উৎসাহিত বংশধর সাধনার শমী

ঘর্ষণ করিয়া নূতন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্ম দান করিতে পারে—পারিপার্শ্বিক জীবন যাত্রা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হইয়াছেও তাই। আমরা মনে করিয়াছি কৌলিক শক্তির বহ্নিকণা ভস্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আভিজাত্যের অভিমান যে নূতন বহ্নির সৃষ্টি করিতে প্রণোদিত করিয়াছে তাহা ভাবিয়াও দেখি না।

ভারত কৌলিক শক্তির বৈজ্ঞানিক আদর্শে মনুষ্য বিচার করিয়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু দার্শনিক আদর্শে মনুষ্য বিচার ভারতবর্ষই জগৎকে শিখাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আদর্শের পরিপোষকগণ যে বীজের কথা বলিয়া থাকেন তাহা দেহাত্মক। কিন্তু দার্শনিক আদর্শে আত্মাকেই বীজ স্বরূপ মনে করা হয়।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে দৈহিকতা ও যতটুকু মানসিকতা দৈহিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি তাহারই প্রচ্ছন্ন প্রবণতা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে সংক্রমিত হইতে পারে। আত্মিক শক্তি পুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইতে পারে না। সন্তানের গর্ভাধানের সময় আত্মার অস্তিত্ব কোথায়? পিতা হইতে দ্বিতীয়বার জ্রূণে শক্তি সঞ্চারিত হইতেও পারে না। হিন্দুবৌদ্ধমতে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই আত্মার পাথেয়,—পিতা হইতে সে তাহার কিছুই পায় না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি সৃষ্টিপরম্পরা বিষয়ে মানুষ ও পশুতে কোন তফাৎ দেখে না।

দার্শনিক আদর্শে দেখি মানবমাত্রেই আত্মবান্ এবং প্রত্যেক মানুষের আত্মা পরমাত্মার মায়াচ্ছন্ন প্রতিরূপ। সর্ষপপ্রমাণ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সমগ্র অশ্বত্থ বৃক্ষটি যেমন আণবিক স্বরূপে বর্ত্তমান আছে—তেমনি প্রত্যেক মানবাত্মায় মানবজীবনের চরমোৎকর্ষ লাভের প্রবণতা আছে। সাধনার বলে—আবাল্য-সংসর্গের ফলে এক জন্মে না হউক জন্মান্তরে সে মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ লাভ করিতে পারে। এই তত্ত্বও ভারতবর্ষের মানবজীবনের ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে বংশপরম্পরাক্রমে খুঁজিতে পারে বিজ্ঞান, কিন্তু দর্শন তাহার ক্রমবিবর্ত্তন খুঁজিবে জন্ম হইতে জন্মান্তরে। এই আদর্শের পক্ষে কৌলিক শক্তির প্রভাব অপেক্ষা ব্যক্তিগত সাধনার মূল্য ঢের বেশী। ব্যাধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও শবরী যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভ করিলেন—একলব্য যে ক্ষাত্রশক্তি লাভ করিলেন তাহা কোন্ প্রভাবে? পুরাণের উদাহরণে প্রয়োজন কি? আমরা নিত্যই শিক্ষায়তনে দেখিতেছি শত শত শূদ্রের পুত্র উচ্চ জাতির সন্তানগণকে শিক্ষাদীক্ষা সুশীলতা সৌজন্যে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।

যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছাড়া অপর জাতির সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না তখন অনায়াসে কৌলিক শক্তির দোহাই দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এখন সার্ব্বজনীন শিক্ষা ও অবাধ মনুষ্যত্ববিকাশের সুযোগ সুবিধা হওয়ার পর, শিক্ষার্থী ও আত্মোন্নতি-সাধনের জন্য উদ্যমশীল বালক ও যুবকদের সংখ্যা, জাতি ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে কোন জাতিই উচ্চবর্ণের তুলনায় শিক্ষোৎকর্ষলাভের পক্ষে অনুপযোগী বা হীন নহে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ বর্ণ হইতে অধিক সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চ বর্ণের জনসংখ্যা অন্যান্য অধিকাংশ বর্ণ হইতে ঢের বেশি এবং তাহারা সর্ব্বাগ্রে শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের বৃত্তি জীবিকা শিক্ষাসাপেক্ষ, বহুদিন হইতে শিক্ষার ঐতিহ্যধারার ফলে সমাজ সংসর্গের একটা সহায়তাও লাভ করিয়াছে—এ কথাগুলি মনে রাখিয়া অবশ্য বিচার করিতে হইবে। ভারতের জাতিবর্ণ (caste) সম্বন্ধে যে কথা জগতের বিভিন্ন জাতি (nation) সম্বন্ধেও সেই কথা। জীবাত্মা যে পরমাত্মারই অংশ—তাহা হইতে জীবের পক্ষে বড় আভিজাত্য কি আছে?

নববর্ষ

[৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]

এই সনাতন সৃষ্টিচাতুর্য্যে নূতন আছে কি ? সবই ত পুরাতন—অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়। কালের অনন্ত ধারা, আপন বৈচিত্র্যে আপনি মজিয়া, অহরহ কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া চলিতেছে। সে বিরাট স্রোতস্বিনীর বক্ষে কত বুদবুদ ফুটিয়া উঠিতেছে, বীচিবল্লরী-বিতান ও ঊর্ম্মিপরম্পরা রবিকরস্পর্শে নানাবর্ণে প্রফুল্ল হইয়া, অনুরাগরক্তিমার শোভা ছড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। সেই একই ভঙ্গী, একই পরম্পরা সর্ব্বকালে সমভাবে পরিস্ফুট। অখণ্ড-দণ্ডায়মান কাল—অবিনশ্বর ও অব্যভিচারী ; ব্যভিচার দেখিতে পাই কেবল গতিতে, কেবল বিকাশে ও বিলাসে কেবল উন্মেষে ও উল্লাসে। আমি দেখি—আমার নয়ন দেখে ; কিন্তু আমি দেখি, তাহাতে সত্যই এমন ব্যভিচার আছে কি না, তাহা ত ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। এই ব্যভিচার-বোধ হইতেই নবীনতার উদ্ভব। গতকল্য যেমন গিয়াছে, আজও তেমনই যাইতেছে, আগামী কল্য তেমনি যাইবে। সেই সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, সেই বিহগকল-কূজন, সেই মন্থরপবনান্দোলিত কিশলয়-কম্পন—অহোরাত্রের পরিবর্ত্তন-প্রবাহ সেই একই রকমে চলিতেছে। কিন্তু এই প্রবাহ-বক্ষের উপর আমিও যে ভাসিয়া যাইতেছি ! আমার আমিত্বের গতি ও পরিণতি আছে কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু এই একটানা প্লাবন-তরঙ্গে পড়িয়া আমি যে একটু ব্যভিচার না পাইলে তৃপ্তি বোধ করি না। তাই ব্যভিচার খুঁজিয়া বাহির করি, অথবা সৃষ্টি করি। যে কুটা ধরিয়া আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, সেই কুটার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, বা কালতরঙ্গে তাহাতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, আমি এই একটানার মধ্যে এক একটা নবীনতার পর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া রাখি। শোকে—দুঃখে—পরাজয়ে এবং উল্লাসে—সুখোন্মাদনায়—বিজয়ে এই নবীনতার ভাব পরিস্ফুট হয়। আমার সুখ দুঃখ, শোক অশোক, জয় পরাজয় আমার আমিত্বের ব্যভিচার মাত্র ; তাই উহারা নবীনতার দ্যোতক। আমার নববর্ষ আমার আমিত্বের প্রশ্বাস-মুহূর্ত্ত ;—একটু জিরাইবার অবসর—নিমেষের তরে পশ্চাদবলোকনের অবকাশ মাত্র। আমার নববর্ষ আমার অনন্ত অতীতের স্মারক, জাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত আমিত্বের বিশ্রাম-ক্ষণমাত্র। আমার নববর্ষ আমার আমিত্বের ব্যভিচারদ্যোতক।

আমি চাই নূতন—নূতন দুঃখ, নূতন সুখ ;—নব সাধ, নবীন মুখ—নূতন সাজ, নব আশা, নবীন সমাজ, নূতন বাসা। তাই মাঝে মাঝে পুরাতনকে নূতন করিয়া লই—সনাতনে নবীনতার অসংখ্য পর্ব্ব গড়িয়া লই। ইহাই নববর্ষ।

এস নববর্ষ ! অতি পুরাতন, অতি সনাতন আমি ;—আমাকে নবীনতার মোহমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তুমি এস। সাধক যেমন একে একে পদ্মবীজমালার এক একটি বীজ ধরিয়া মন্ত্রের আবৃত্তি করে এবং জপে সিদ্ধ হয়, আমরাও তেমনই কালের এই অনন্ত পদ্মবীজমালার এক একটি বীজ বা এক একটি বর্ষ ধরিয়া জীবন-মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেছি, আর অপচয়-উপচয়-ধর্ম্মা জীবদেহের অবসান ঘটাইতেছি—পুরাতনকে নূতন ভাবিয়া নবীনতার আস্বাদে মুগ্ধ হইতেছি। সাধকের ইষ্টমন্ত্র প্রতি বীজের উপর ন্যস্ত থাকে, আমার জীবনের ইষ্টমন্ত্র—আমার আমিত্ব কালের পর্ব্বে পর্ব্বে—বর্ষে বর্ষে ফুটিয়া উঠে ; পরিণামে গণনা শেষ হইলে কাল-চক্রবালের অন্তরালে শুক্রতারার মত ডুবিয়া যায়। এই উদয় অস্তের লীলাই নবীনতার পরিচায়ক। অন্তই পুরাতন বা সনাতনের সহিত সম্মিলন। এস নববর্ষ ! তুমি অভ্যুদয়, তাই তুমি নবীন। আশার অভ্যুদয়, সঞ্চিত সুখের অভ্যুদয়, হয় ত বা নিরাশ নিরাকাঙ্ক্ষের বেদনার অভ্যুদয়, তাই তুমি আমাদের নববর্ষ। এস তুমি ! বর্ষে বর্ষে, সাহিত্যে সমাজে আসিয়া সমুদিত হও। আমরা তোমার কৃপায় যেন অরুণোদয়ের মতন তোমাকে ও আমাদের জীবনকে অনুরাগরক্তিম নবতাপ্রফুল্ল দেখিতে পারি।

আমার দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই,—আমার আছে কাল, কোটীকল্প পরিমাণের কাল। আমি কাল গণিয়া আমার আমিত্বের ধারা কতকটা বজায় রাখিয়াছি, কল্পকল্পান্তরের কথা মনে রাখিয়া আমিত্বের পুষ্টি করিয়াছি। আমার জীবন মরণের পরিচ্ছেদ নাই, তাই আমার দেবতাকে কেবল আমি প্রার্থনার স্বরে বলিয়া থাকি,—

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি..ত্রাহি মাং মধুসূদন।

আমার সাহিত্য এই গতাগতির অভিব্যক্তিমাত্র। আমার সাহিত্য কেবল রূপ নহে, কেবল গুণ নহে—রূপ-গুণের ভাব-অভাবের সমন্বয়; তাই কালের দিকে তাকাইয়া বাঙ্গালী সাহিত্য চর্চ্চা করে। বাঙ্গলার সাহিত্য ধর্ম্মে, অধর্ম্মে, ইহ-পর-কালে সমভাবে বিন্যস্ত। এই নিরবধি কাল-প্রবাহ বর্ষে বর্ষে অগ্রসর হইতেছে, আমাকে জীবন মরণের ভাবনায় ভাবিত করিতেছে,—মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে বটে; কিন্তু চিরকালব্যাপী আমি, আমার মরণ ত হয় না।

জীর্ণ-বস্ত্র-ত্যাগের মতন কত দেহ বদলাইয়াছি, কত সাজ সাজিয়াছি, এখনও কত রূপ ধরিতেছি, কত ভাবে বিভোর হইতেছি।

গত সংবৎসর যে ভাবে দর্প দম্ভ, গর্ব্ব স্পর্দ্ধা, লজ্জা সরম, দুঃখ ক্লেশের ভগ্ন স্তূপ উচ্চ করিয়া শ্মশান দৃশ্যের দীনতা প্রকটিত করিয়াছে, হে নব বর্ষ, তুমিও কি তাহাই করিবে? যদি তাহাই হয়, তবে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি, বলিতে হইবে। দুঃখের পদ্মবীজমালা গণিতে গণিতে মেধার অবসাদ ঘটিয়াছে, করাঙ্গুলি জড়তা লাভ করিয়াছে—আর যে পারি না। যখনই পারি না বলিয়া দুরিয়তা আইসে, তখনই মরণের আকাঙ্ক্ষা হয়। মরিতে চাই—মরণের প্রার্থনা করি, কিন্তু—

কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব?

আমার শত চাঁদ-নিঙড়ান সুধা-মাখান শ্যামসুন্দর, আমার কোটি জন্মের আরাধনার ধন কৃষ্ণ নটবর,—যাঁহার নীল আকাশে, পত্রপল্লবে, নবীন কিশলয়ে, নবদূর্ব্বাদলে, নীলাম্বুতে, নীল নয়নে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—সেই কানুকে কারে দিয়ে যাব? আমার কানু ছাড়া গীত নাই; কানু বিনা রস নাই; আমার শ্যামা জন্মভূমি কখনই তুষার-আস্তরণে শ্বেতাম্বর ধারণ করেন না—জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত আমার সবই কালো—মরিলে তবে আমি শাদা হই—সেই কালোকে আমি কারে দিয়ে যাব? দিবার মতন যোগ্য ব্যক্তি আজও খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়াই এত কাল কেবল ঢেউ গণিয়া কাল কাটাইয়াছি—জানি না, এমনই ভাবে আরও কতকাল কাটিবে।

অতীতের দিকে তাকাইয়া বর্ষ গণনা করিয়া থাকি। তখন একে একে মনে পড়ে কত বর্ষের কথা—মনে পড়ে সুখ-দুঃখ, মনে পড়ে শ্লাঘা-লজ্জা, মনে পড়ে সাজ-সজ্জা। যখন অতীত অরুণোদয়ের নবানুরাগ রক্তিম হইয়া মানসপটে সজীব হইয়া উঠে, তখন আবেগে বলিয়া উঠি,

"ননদী ব'ল গিয়ে নাগরে,
ডুবেছে রাই, রাজনন্দিনী,
কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।"

সত্যই কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়া আছি। সে কলঙ্ক শ্লাঘার—দর্পের—দম্ভের কলঙ্ক; সে কলঙ্ক সুখের-স্নেহের-প্রেমের কলঙ্ক; আমার—তোমার—সকলের কলঙ্ক; সে কলঙ্ক জন্মজন্মান্তরে, পিতৃ পিতামহের, পুরুষ পরম্পরায় কলঙ্ক। তোমরা দশ জন গৌরবে—মনুষ্যত্বের—বীরত্বের—জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিয়া থাক, আমরা ফুকারিয়া কলঙ্কের গৌরব রাখানি। আমার নব বর্ষ এই কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরের একটী তীর্থ, সঙ্কল্প করিয়া এই তীর্থে স্নান কর, কৃষ্ণকলঙ্ক লেপ অনপনেয় লেখায় তোমার সর্ব্বাঙ্গে সংলিপ্ত থাকিবে। সে সুখ কেমন, যে কলঙ্ক-গৌরবে বিভোর সেই জানে! সে যে মূকাস্বাদনবৎ! কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কেমন! বুঝান যায় না বলিয়াই এত কথা কহিতে হয়, বুঝান যায় না বলিয়াই কাঁদিতে হয়; কাঁদিতে কাঁদিতে বুক-ফাটান স্বরে গান গাহিতে হয়,—

"মনে পড়িল রে—
আমার সেই ব্রজভূমি

JOIN

THE

INSURANCE ASSOCIATION

OF INDIA

The only place
where every one connected with Insurance work
in India
can meet irrespective of nationality
or political belief.

For particulars please write to :

THE SECRETARY,
309, Bowbazar Street,
CALCUTTA.

"মরীচিকা" ও "মরুশিখা"র প্রখ্যাতনামা কবি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

নব-প্রকাশিত

—মরুমায়া—

আধুনিক যুগের অনবদ্য কাব্য-গ্রন্থ : জিজ্ঞাসু মনকে পরিতৃপ্ত করিবে।

মূল্য—পাঁচ সিকা।

প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী, ৪৭ মনোহরপুকুর রোড, চাকুরিয়া, কলিকাতা।

কাব্য-পরিমিতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

দৃষ্টান্ত

এইবার কয়েকটী দৃষ্টান্ত-সাহায্যে আমাদের কাব্যের শ্রেণীবিভাগ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং তাহারই অনুসঙ্গে কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের অপরাপর বিশেষত্বের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

খাঁটি ভাবসমুখ কাব্যের উদাহরণ দেওয়া কঠিন ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এই শ্রেণীর কাব্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিবার চেষ্টা করিয়াছি। হেমচন্দ্রের 'রেল গাড়ী' কবিতার আনন্দ নিশ্চয়ই বিলাসচক্রের অন্তর্ভুক্ত; তবে তাহাতে ভাববিলাসের সহিত বাসনা-বিলাসের যোগ আছে। ভাবসমুখ কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক না বলিলেও চলিবে।

ভাবসমুখ কাব্য

বাসনাসমুখ কাব্যের দৃষ্টান্ত সুলভ। বিদ্যাসুন্দরের কতক অংশ রতিবাসনাসঞ্জাত এবং তাহার আনন্দ রতি-বাসনাবিলাস মাত্র, যদিও তাহাতে ছন্দ, অলঙ্কার ও ব্যঞ্জনার অভাব নাই। যে পাকশালে রতিবাসনা পাক হইয়া মধুর রসে পরিণত হয়, সেখানে এ কাব্য পৌঁছে নাই বলিয়া রসোন্মুখী ও কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত ইহাকে অশ্লীল বলিয়া আসিতেছে।

বাসনাসমুখ কাব্য

ঈশ্বরগুপ্ত 'তপ্‌সে মাছে' লিখিয়াছেন—

> প্রাণে নাহি দেরী সয় কাটা আঁস বাচা,
> ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা।
> কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা,
> টপাটপ্ খেয়ে ফেলি ছাঁকা তেলে ভাজা।

ইহা লোভবাসনাসমুখ এবং ইহার আনন্দ লোভবাসনা-বিলাস। লোভ-ভাবের ইহা একটী 'অশ্লীল' কবিতা। শান্ত-রসের কবিতা ইহা নহে।

হেমচন্দ্রের সুপরিচিত কবিতা 'অশোকতরু' বাসনাসমুখ কাব্যেরই উদাহরণ স্থল।

> কে তোমারে তরুবর কোরে এত মনোহর
> রাখিল এ ধরাতলে ধরা ধন্য কোরে।
> এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে?
> দেখ দেখ কি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ থরে থর
> বিরাজে শাখার পর সদা হাস্যভরে
> সিন্দুরের ঝারা যেন বিটপী উপরে।

ইহাতে অশোকতরুর যে শোভা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অশোকতরু-দর্শনের সাধারণ ভাবস্মৃতি মাত্র, কল্পনালোকে তাহা জারিত হয় নাই। তাহার পর কবিচিত্ত স্বকীয় ও মানব সাধারণের দুঃখের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও দুঃখের ভাবস্মৃতি বা বাসনামাত্র। তাহা কল্পনাসমৃদ্ধ নহে। সর্ব্বশেষে যখন বলিতেছেন—

> এ দোষ কাহারও নয়, আমিই কলঙ্কময়,
> আমার অন্তর হায় কলঙ্কেতে ভরা,
> আমি তত বড় পাপী তাই ঠেলে তারা।—

তখন ইহা নিতান্তই মন্তব্যের মত শোনায়। কলঙ্কময়, পাপী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কবিচিত্তের ভাব কোনরূপ বিভাব অনুভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত কবিতায় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি লতা নিজে মেরুদণ্ডহীন হইলেও দণ্ড ও মঞ্চের সাহায্যে উচ্চে উঠিয়া গো-মহিষাদির মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এবং ফল ফলাইতেও সক্ষম হয়। অনেক বাসনাসমুখ কাব্য মধুর ছন্দ, চতুর অলঙ্কার ও সবল রীতির আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন—

> এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে,
> কমল চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
> শীতল হাওয়া মিতল রসে
> বনের পাখী ঘনিয়ে বসে,
> আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন ঝুলাবে
> এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

এস তুমি যূথীর বনে ঝুকুল খুলাবে,
কোল দিয়ে ঐ কেলিকদম মুকুল খুলাবে,
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদার মেঘের মায়া
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙিন গুলাবে।
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন বুলাবে।

তখন কবিচিত্ত কল্পনার অভিনয় করিলেও কবিতা বাসনা-সমুখের উর্দ্ধে উঠে নাই। বর্ষায় দুটি প্রাণীর দোল খাইবার সাধারণ ভাবস্মৃতি হইতে ইহার সম্ভব এবং সেই স্থানেই ইহার শেষ। সেই বাসনাও আবার এলোমেলো কল্পনার ভেজালে একেবারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দেবেন্দ্র সেন যেখানে বাজাইতেছেন—

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ বাজে ওই মল,

কিম্বা গোবিন্দদাস যখন ডাকিতেছেন—

আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা।

তখনও কবিচিত্ত বাসনালোক ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ সব কবিতা কেবল ছন্দ, অলঙ্কার ও রীতির সাহায্যে বাঁচিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ কণিকার মধ্যে বলিতেছেন—

কুড়ালি কহিল, ভিক্ষা মাগি আমি শাল,
হাতল নাহিক, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হ'ল যেই
তারপরে ভিক্ষুকের চাওয়া চিন্তা নেই
একেবারে গোড়া ঘেঁসে লাগাইল কোপ,
শাল বেচারীর হ'ল আদি অন্ত লোপ।

ইহাতে বুদ্ধির পরিচয় অলঙ্কারের কৌশল আছে, কিন্তু কবিচিত্ত বাসনার উর্দ্ধে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; মাত্র চতুরতার সাহায্যে আনন্দ-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাও বিলাসচক্রের অন্তর্গত। তবে এ কবিতা উত্তম কবি-প্রতিভার লীলামাত্র—অক্ষমতা নহে।

উত্তম কবিপ্রতিভার পক্ষে নিম্নস্তরে লীলা করা অসম্ভব নহে। চিত্রে দেখা যায় রসোন্মুখী কবিচিত্তের গতিপথে বাসনাচক্র ও আনন্দচক্র পড়ে। * সুতরাং খেয়াল হইলে সে রসে না উঠিয়া মধ্যে মধ্যে ভাব, বাসনা বা কল্পনা হইতে কাব্যে চলিয়া যাইতে পারে। আবার উচ্চচক্রের অধিকারী পাঠকচিত্তের পক্ষেও বাসনাচক্রে ভ্রমণ করা অসম্ভব নয়। রসোন্মুখী পাঠকচিত্তের পথে বিলাসচক্র পড়ে এবং খেয়ালের বশে সে-কাব্য হইতে সিধা ভাব বা বাসনায় নামিয়া আসিতে পারে। এইজন্যই রসোন্মুখী পাঠকচিত্তও কখন কখন নিম্নস্তরের কাব্যে বিলাস করিতেছে দেখা যায়, যেমন রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তও মধ্যে মধ্যে ভাব ও বাসনান্তর হইতে কাব্য উৎপাদিত করিতেছে দেখা যায়।

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবমুখী বা বাসনামুখী চিত্তের পক্ষে আনন্দচক্র বা রসচক্রে ভ্রমণ সম্ভবপর নহে। বিলাসচক্র ও আনন্দচক্র বৃহত্তর রসচক্রের অন্তঃস্থিত সুতরাং রসচক্রের অধিকারীর ক্ষুদ্রতর চক্রেও অধিকার আছে। আর বৃহত্তর চক্র ক্ষুদ্রতর চক্রের বহিঃস্থিত হওয়ায় ভাবমুখী বা বাসনামুখী পাঠকচিত্তের পক্ষে কল্পনানন্দ বা রস লাভ করা সম্ভব হয় না। রেলপথে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া খেয়াল হইলে যে কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করা চলে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটধারীর পক্ষে অন্য কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। গঙ্গোত্রী-স্নানার্থী যাত্রীর পক্ষে হরিদ্বারের টিকিট কেনা থাকিলে, রাবড়ির লোভে একদিন কাশীবাস করিয়া, ঠুংরি শুনিতে দুই দিন লক্ষ্ণৌএ থাকিয়া, জ্যোৎস্নারাত্রে তাজ দেখিবার মানসে আগরায় নামিয়া, পরে নির্দিষ্ট পুণ্যদিনে হরিদ্বারে পৌছিয়া গঙ্গাস্নানে বাধা নাই। কিন্তু যে লিলুয়ার টিকিট কাটিয়াছে তাহার পক্ষে ঐ সমস্তই নিষিদ্ধ; আর কাশীর টিকিটেও আগরার তাজ দেখা যায় না।

সুতরাং চিত্র ও যুক্তির সাহায্যে বুঝা গেল উত্তম শ্রেণীর কবিচিত্ত কিরূপে সময়ে সময়ে অতি নিম্নস্তরের কবিতা লিখে এবং অতিশয় রসিক পাঠকচিত্তও কি-ভাবে তথা-কথিত অশ্লীল কাব্যের 'রস' গ্রহণে সমর্থ হয়।

কল্পনাসমুখ কাব্যের সাধারণ লক্ষণ পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি। এই শ্রেণীর কাব্যে অল্পাধিক মাত্রায় কাব্যের অধিকাংশ গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা প্রকৃত রস উদ্রেক করিতে পারে না, কারণ কবিচিত্ত এ স্থানে রস উত্তীর্ণ হইয়া কল্পনাসমুখ কাব্যে পৌছে নাই। অথচ কবিচিত্ত রস কাব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকায় রসলোকে উঠিবার পুনঃপুনঃ প্রয়াস করে, যে প্রয়াস অধিকাংশ সময় কাব্যেও প্রকট হইয়া উঠে। সেই রসহীন আয়াসের ফলে ছন্দ,

* ফাল্গুন সংখ্যা 'উপাসনা' দ্রষ্টব্য।

অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতির মাত্রাজ্ঞান কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে।

কবি গোবিন্দদাসের 'আমার ভালবাসা' কবিতাটি লইয়া বিচার করিলে এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হইতে পারে। কবি আরম্ভ করিলেন :—

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,

বুঝিনা আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেমকথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝিনা সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে অঙ্গে কিসে ছুঁয়ে লহ?

কবির চিত্তধারা নারী এই বস্তু হইতে রতিভাব ও রতিবাসনায় উঠিয়া সেই ভাবের যে বিশেষ রূপটিকে মধুর রসে পরিণত করিতে চায় তাহা এই,—রমণীর রূপ ও প্রেম অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য; রূপব্যতিরিক্ত প্রেমের অস্তিত্ব নাই; প্রেম আসলে রূপপ্রধান ব্যাপার। কবিচিত্ত এখানে এমন একটি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়াছে যাহার বাসনা দৃঢ়। তাহার পর উপযোগী শব্দ, বলিষ্ঠ রীতি ও বিবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ—
ও কর্দ্দমে ওই পঙ্কে
ওই ক্লেদে ও কলঙ্কে
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।

কলঙ্ক, ক্লেদ, পঙ্ক এ সমস্ত অলঙ্কার মাত্র। কবির বক্তব্য—নারীদেহের রূপ, লাবণ্য, স্পর্শ, আস্বাদ এই সমস্ত দেহসাহায্যে নিবিড়ভাবে উপভোগ করা। বক্তব্য বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও কল্পনালোকে কবিচিত্তের লীলা ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু কবিচিত্ত এখানে জানে—এই ভাবটিকে যতক্ষণ রসে পরিণত করিতে না পারিতেছে ততক্ষণ তাহার মূল্য কম এবং সে এখনও রসলোকে উঠিতে পারে নাই। তখন নূতন বিভাব অনুভাব উপভাবের সাহায্যে সে রসলোকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের কেলিভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও মত্ত সাগরে বান, 'তোমরা যা কহ।
মর্দ্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উর্দ্ধে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

আরম্ভ হইয়াছিল—লৌকিক পুরুষচিত্ত লৌকিক রমণী-দেহকে যেরূপে সাধারণতঃ ভোগ করে তাহারই কথায়, কবির বক্তব্যও তাহাই। কিন্তু কবিচিত্ত কল্পনালোকে উঠিয়া দেখিল, সাধারণ বিভাব অনুভাব লইয়া সে ইহাকে রসলোকে উঠাইতে পারিল না; তখন ব্যাপারটাকে একেবারে দেহাতীত, রূপাতীত, universal করিবার কৌশল অবলম্বন করিল, যদি তাহাতেই ভাবটি রসে পরিণত হয়। কবিকল্পনা ক্রমে একেবারে বল্গা ছাড়িয়া দিল—

এস সুধা এস বিষ,
এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি এস জল এস গন্ধবহ।

কবিচিত্তের একাগ্র আহ্বানে ও বলিবার বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সমস্তই হয়ত আসিয়াছে, কিন্তু রস আসিতেছে না অর্থাৎ তাহার উদ্দিষ্ট ভাবটী রসে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। তখন আবার নিজের বক্তব্য বিষয়ে সোজা নামিয়া গিয়া অন্য উপায়ে চেষ্টা করিতেছে—

চোখে চোখে চোখ বোজা
হাতায়ে পীরিতি খোজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা চোখে দেখে লহ।
সে আমার আমি তার,
নাহিক বাকল সার :
এক আত্মা তুজনার অনাদি আবহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

কুশলী কবিচিত্ত তাহার এই রসলোকে উঠিবার প্রয়াস কাব্যে যাহাতে প্রকট না হয় সে চেষ্টা যথারীতি করিয়াছে এবং সে বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কিন্তু ফলে কি হইল? আরম্ভ হইয়াছিল

আত্মায় আত্মায় যোগ
বুঝিনা সে উপভোগ—

এই ভাবটিকে রসমূর্ত্তি দিবার পরিকল্পনায়, আর সমাপ্তি হইল

এক আত্মা দুজনার
অনাদি আবহ !

'আত্মায় আত্মায় যোগ' চিরপ্রসিদ্ধ এই ভাবটীকে শ্লেষ করিয়া যাহার আরম্ভ, সেই ভাবটিকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিপন্ন করিয়া কবিতা প্রায় শেষ হইল। তাহার পর যাহা হইতেছে তাহা দেহের রূপাত্মক ভোগকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া "আত্মায় আত্মায় যোগ"এর ভোগকেই অর্ঘ্যদান।

সুন্দর কুৎসিৎ হোক,
উলঙ্গ আবৃত রোক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক নিগ্রহ ;
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখ না, নয় ভয়ে দূরে রহ।
চন্দন আতর সম
তার পুঁজ প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ।

"আত্মায় আত্মায় যোগই প্রেম" এই ভাবটীর অনুভাব পূর্ব্বোদ্ধৃত কাব্যাংশে যেমন চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে এমন খুব কম দেখা যায়। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য ছিল ইহার বিপরীত ভাবটীকে রসে পরিণত করা। কবিপ্রতিভা এক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যথেষ্ট শক্তির অভাবে কবিচিত্তকে রসলোকে উত্তীর্ণ করিতে পারিল না ; পরস্পর-বিরোধী বিভাব অনুভাবের জালে জড়াইয়া কাব্যে আসিয়া পৌঁছিল। কবিচিত্ত নিজে রস ঘুরিয়া কাব্যে আসে নাই বলিয়াই চেষ্টা-চিহ্ন বুদ্ধিগোচর হইতেছে এবং যথেষ্ট নিপুণতা সত্ত্বেও তাহার চিন্তা ও চেষ্টা উদ্দিষ্ট রসের অনুগত হয় নাই। কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হইলে কবিতার প্রথম দুইটি ছত্র এমন পরস্পর-বিরোধী হইতে পারিত না ?

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমূর্ত্ত সকলি তার মিলন বিরহ।

অস্থিমাংসময় দেহের পরস্পর বিচ্ছেদেরই অপর নাম 'বিরহ'। বিরহে অস্থিমাংস কে কোথায় পায় ? বিরহ যখন অমূর্ত্ত হয় তখন আত্মায় আত্মায় যোগের বাকী থাকে কি ?

কল্পনাসমুখ কাব্যের অনেক কথা এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে। এ কবিতা বাসনাসমুখ বলিতে পারি না ; কারণ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে ইহার বিভাব অনুভাব উপভাব ভাবোপযোগী, ইহার প্রত্যেক ছত্রে কবিচিত্তের ছাপ পড়িয়াছে, ইহার প্রতীতি দৃঢ়, রীতি বলিষ্ঠ, গতি সাবলীল, অলঙ্কার সুন্দর, অর্থ সুস্পষ্ট। অর্থসম্পর্কে বলিতে হয় যে সমগ্র কবিতাব কোন অর্থ হয়ই না, ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাই, ইহার মূলভাব রসে রূপান্তরিত হয় নাই বলিয়াই এক অংশের সহিত অপরাংশের অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং বুঝা যায় কবিচিত্ত এ কাব্যে রসোত্তীর্ণ নহে।

উচ্চস্তরের কল্পনাসমুখ কাব্যে কবি-প্রতিভা অনেক সময় সমগ্র কাব্যের মুল ভাবটীকে রসে রূপান্তরিত করিতে না পারিলেও কাব্যাংশে প্রকাশিত সঞ্চারী ভাবকে রসান্বিত করিতে সক্ষম হয়। রসে পৌঁছিবার চেষ্টার মধ্যেও আনন্দ আছে, যদিও সে আনন্দের প্রকৃতি ও গভীরতা রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রের পথে যাতায়াত-জনিত আনন্দের প্রকৃতি ও গভীরতা হইতে বিভিন্ন। কবি-প্রতিভা রসে উঠিবার এই সানন্দ প্রযত্নদ্বারা মধ্যে মধ্যে রসলোক স্পর্শ করিয়া আসে এবং তাহারই ফলে কাব্যাংশ হীরার টুকরার ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করে, যদিও সমগ্র কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দহিন্দোল' কবিতাটী লইয়া বিচার করা যাইতে পারে।

মেঘলা থম্ থম্ সূর্য্য ইন্দু
ডুব্‌ল বাদলায়, দুল্‌ল সিন্ধু।
হেম-কদম্বে তৃণস্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু।

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘসমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন।
দগ্ধদৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির
মুগ্ধনেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

—এ কাব্যে কবি-চিত্ত ঘনায়মান বর্ষার একটী বিশেষ ভাবকে রসমূর্ত্তি দিতে চাহিতেছে। এই ভাবটীকে বর্ষার "হিন্দোল ভাব" বলা যাইতে পারে। বর্ষার সাধারণ ভাবের বাসনা কবিচিত্তে স্পষ্ট ; কিন্তু "হিন্দোল ভাব"এর বাসনা অস্পষ্ট। বাসনা-স্তরে যাহা অস্পষ্ট, কল্পনার মাধ্যমেকে

তাহা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। কোথাও বা কবিচিত্ত প্রথমে বর্ষার এই হিন্দোল ভাবকে ধরিবার প্রয়াস করিতেছে। যখন থম্‌ থম্‌, মেঘাচ্ছন্ন অতিমিত সূর্য্য-চন্দ্রের নীচে সিন্ধু দুলিতেছে, তখন কদম্ব ফুলের ও ঘাসের চোখে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিতেছে। এদিকে অতি ক্ষুদ্র খঞ্জন পাখী নীরবে নৃত্য করিতেছে, ওদিকে মেঘসমুদ্রে মন্থন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যবধানাত্মক বিভাবের দোলা দিয়া তিনি হিন্দোল ভাবটীকে রসে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পরের শ্লোকে এ দোলা প্রায় থামিয়া গেল —

ভাস্‌ছে বিল খাল, ভাস্‌ছে বিলকুল্‌!
ঝাপ্‌সা ঝাপটায় হাস্‌ছে জুঁইফুল,
খাঞ্জশিষ্‌ তার কাছে বিস্তার
তলিকে নন্দার জাগ্‌ছে বুলবুল্‌।

ইহা বর্ষার সাধারণ ভাবের বিভাব; দোলার বিভাব নাই বা একান্ত অস্পষ্ট।

বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্রকম্বু
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
"ওম্‌ বরস্তু" "ওম্‌ স্বস্তু"
ঝর্‌ছে ঝর্‌ঝর্‌ ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্‌
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌ গম্‌
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিনলোক বম্‌ ববম্‌ বম্‌।

বর্ষার সাধারণ ভাবের চমৎকার বিভাব, কিন্তু কবিচিত্ত তাহার হিন্দোল ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে অথবা তাহা লইয়া বিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের শ্লোকটীর সহিত তুলনা করিলে এই দুই শ্লোকের বিভাবে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু এখানেও সেই ব্যবধানাত্মক কৌশল অবলম্বনে হিন্দোল ভাবটীকে রসমূর্ত্তি দেওয়ার প্রয়াস। তবুও যে হিন্দোল ভাব পাঠকচিত্তে মুক্তি পাইতেছে না তাহার কারণ—একবার নিম্নতম মধ্যবিন্দু এবং পরক্ষণে, অথবা কিয়ৎক্ষণ পরে, শীর্ষ বিন্দুদ্বয়ের বর্ণনা করিলেই দোলার সব কথা বলা হয় না। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে ওঠানামার বিচিত্র গতি, ভঙ্গী, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিভাব অনুভাব না থাকিলে ছন্দ নাচিয়া চলিলেও অর্থ দুলিয়া উঠে না। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি, তাহা রবীন্দ্রনাথের ঝুলন বা মরণ-দোলার অংশবিশেষ পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে।

দুলিছ গো দোলা দিতেছ,
পলকে আলোকে তুলিয়া, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।

ছন্দ-হিন্দোলের কবিচিত্ত অবশেষে যখন—

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ-কল্লোল,
ঝিল্লীগুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল!
মূর্চ্ছে বীণ আর মূর্চ্ছে বীণকার,
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দহিন্দোল!—

এই অনুভাবটীর মধ্যে পড়িয়া গেল, তখন বর্ষার হিন্দোল ভাবটী প্রকৃতই মূর্চ্ছাহত হইল। তাহার আর রসে উঠা সম্ভবপর হইল না। কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হইলে এরূপ হইতে পারিত না। কবিচিত্তকে এখানে উচ্চ স্তরের কল্পনা-প্রসূত বলিলেও হয়ত আপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু তাহা রসোত্তীর্ণ নহে। বিভাব-পরম্পরায় যে পরিবেষ্টনী ফুটিয়া উঠিবে তাহা মূল রসের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন; আবার অনুভাবও রসানুগ হওয়া চাই। অনুভাব এবং বিভাব কার্য্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। সান্দ্রবর্ষণ, হর্ষকল্লোল, ঝিল্লীগুঞ্জন, মঞ্জু হিল্লোল, এই বিভাব হইতে 'বীণ, বীণকার ও বর্ষার ছন্দহিন্দোল'এর এক সঙ্গে মূর্চ্ছারূপ অনুভাব অস্বাভাবিক, অপ্রাসঙ্গিক। যদি এ কাব্যে কবিচিত্ত বর্ষার সাধারণ ভাবটীকে রসে পরিণত করিতে চাহিতেছে এমন হইত, তাহা হইলে শেষের কয়েকটী ছত্র আসিত না এবং কবিতাটী হয়ত রসোত্তীর্ণ কাব্যত্বের দাবী করিতে পারিত। কিন্তু কবিচিত্ত বর্ষার হিন্দোল ভাবকেই রসমূর্ত্তি দিতে চাহিয়াছিল, তাহার সাধারণ ভাবকে নহে। উদ্দিষ্ট ভাবের বাসনা কবিচিত্তে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট না থাকায় ভাব রসের স্তরে উঠিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার মধ্যে বর্ষার সাধারণ ভাব—

যাহা এককাব্যের পক্ষে সঞ্চারী ভাব—অনেক স্থলে রসলোক স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে ;

বৃন্তে থম্ থম্ গুরু গম্ভীর।

বর্ষায় মানব-মনের বিস্ময়-জড়তার ভাবটি এই বিভাব দ্বারা চমৎকার রসায়িত হইয়াছে। এখানে কাব্যাংশ আপনার উজ্জ্বলতায় আপনি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

এককাব্যে রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত চমৎকার ছন্দের মধ্য হইতে রসের গন্ধ পাইয়া রসলোকে উঠিতে চাহে, আর পথের অভাবে কল্পনালোকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয় বলিয়া ক্ষুণ্ণ হয়, আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কল্পনামুখী পাঠকচিত্তের সন্তুষ্ট হইবার পক্ষে বাধা হয় না। এ কবিতায় প্রকৃত রসোদ্বোধ যে হইল না তাহার কারণ আমার মনে হয়—যে কবিচিত্তে এ ভাববিশেষের বাসনা ছিলই না বা একান্ত অস্পষ্ট ছিল। সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহার মূলেই কৃত্রিমতা ছিল।

এ কাব্যসম্পর্কে যদি বলা হয় যে ইহা 'ছন্দহিন্দোল' মাত্র, বর্ষার হিন্দোল ভাবকে রসমূর্ত্তি দিবার চেষ্টা বা অনুরূপ কোন প্রয়াস কবিচিত্তে ছিল না, তবে কবি ও কাব্যের মর্য্যাদা হানি করা হয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কাব্যের শেষে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ইহা 'বর্ষার ছন্দহিন্দোল'।

কল্পনাসমুখ কাব্যের আর একটী প্রধান লক্ষণ এই দেখা যায় যে উদ্দিষ্ট ভাবটীর বাসনা কবিচিত্তে দৃঢ়প্রতীত না থাকায় নানা অবান্তর ভাব—যাহাদের বাসনা কবিচিত্তে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়—তাহাই আসিয়া জুটে।

কাব্যরসিকেরা সুন্দরী রাণীর অঙ্গশোভার উপমা মাতঙ্গে ও গৃধিণীতেও পাইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা পবন-নন্দনের পার্থিবরূপ ভুলিয়া যদি তাহার রসরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি উক্তবিধ কল্পনাসমুখ কাব্যের সহিত বিশল্যকরণী আনিতে গন্ধমাদন আনার উপমাটী প্রয়োগ করিতে পারি। এ সব কাব্যগন্ধমাদনে লক্ষ ওষধির গন্ধে চিত্ত বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশল্যকরণীর সন্ধান মিলিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায় এবং সেই বিশল্যকরণীর রস যখন মিলে তখন সংসার-বিষবৃক্ষের বিষশল্যাহত রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত হইতে আপ্রাণের শেষ রক্তবিন্দু নিঃসারিত হইয়া গিয়াছে, ওষধির রস তখন বিফল। কবিচিত্ত শক্তিশালী হইলেও, তাহাতে বিশল্যকরণী সম্পর্কে বাসনার অভাব ও অস্পষ্টতাই এ বিপত্তি ঘটায়। এরূপ কাব্যের দৃষ্টান্তের অভাব নাই এবং দিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে সানন্দ যাতায়াতের ফলে রসোত্তীর্ণ কাব্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এ কাব্যের প্রধান লক্ষণ এই যে কবিচিত্তের কোন আয়াস বা শ্রান্তির পরিচয় ইহাতে থাকে না। ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা সমস্তই রসানুগ হয়, কারণ রসসিক্ত কবিচিত্তের সংস্পর্শে তাহারা জন্মলাভ করিয়াছে। রসোত্তীর্ণ কাব্য কবিচিত্ত এখানে রসসিক্ত হয় বলিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে তাহা নহে, বরঞ্চ উত্তম প্রতিভার লক্ষণই এই যে অন্তর হইতে বচনামৃত আহরণ করিয়া আনন্দলোক বিরচন করিবার সময় সে আত্মসম্বন্ধে বেশ সচেতন থাকে। কবিচিত্ত যদি আপনার সৃজনক্ষেত্রে আপনি ডুবিয়া যায় তবে তাহার সৃষ্টিশক্তি বা প্রতিভার দুর্ব্বলতাই সূচিত হয়। এমন কবিচিত্তের পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে পাই যাহা শক্তিশালী হইলেও আত্মসচেতনতার অভাবে সামর্থ্যোচিত কাব্যসৃষ্টি করিতে পারে নাই। আত্মসচেতন বলিতে ইহা বুঝিব না যে আমরা যেমন কাব্যের বিভাব, অনুভাব, উপভাব বিশ্লেষণ করিয়া কাব্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, কবিচিত্ত সেই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ চেতনা রাখিয়া কাব্য সৃষ্টি করে। রসোত্তীর্ণ কাব্যে এ সমস্ত ব্যাপার স্বতঃই রসানুগ হয়। আত্মসচেতন বলিতে ইহাই বুঝিব—রসলোক ও কাব্যক্ষেত্রে আনন্দময় যাতায়াতের সময় রসোত্তীর্ণ কবিচিত্ত কখনও ভুলিয়া যায় না যে তাহার উদ্দেশ্য রসকে ভোগ করা নহে, রসকে অপরের ভোগ্য করা ; সে ভোক্তা নয়, সে স্রষ্টা ; সে প্রজাপতি নহে, সে মধুমক্ষিকা ; রসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার আনন্দ তাহার নহে, রসসমুদ্র সন্তরণ করিয়া তাহাকে তীরে উঠিতে হইবে। মহাপ্রভুর চিত্ত রসসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল কারণ সে চিত্ত কবিচিত্ত ছিল না, প্রেমিকচিত্ত ছিল।

রসোত্তীর্ণ কাব্যে কবিচিত্তের আয়াসের কোন লক্ষণ থাকে না বলিয়াছি। তাই বলিয়া একথা সত্য নহে যে উৎকৃষ্ট কাব্যরচনায় কবিচিত্তের কোন প্রযত্ন থাকিবার প্রয়োজন হয় না, একবার রসলোক ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহা

নির্ঝরের মত স্বতঃ নিঃসারিত হইয়া চলে। রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে তাহার আয়াস অবশ্যম্ভাবী। কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে বহুদূরে বহিয়া আসিয়াছে, আসিবার পথে বাসনা-বোঝাই কল্পনার তরী টানিয়া আনিয়াছে, তাহার উপর অনিবার ওঠা-নামা, জোয়ারভাঁটার যাওয়া আসা;—শ্রম হইবার কথা বটে। কিন্তু সেই যাতায়াত যদি আনন্দমূলক ও আনন্দের কারণ-স্বরূপ হয়, তবে কবিচিত্তে আয়াস আর আয়াস থাকে না এবং কাব্যেও তাহা আনন্দরূপ গ্রহণ করে। অনায়াসে অন্তর হইতে বচন আহরণ,—কখনও হয়, কখনও হয় না। অন্তরের গহন রসকাননে কোথায় কোন ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধ ধরিয়া তাহার সন্ধান করিতে হইবে; বিবিধ কুসুমের বিচিত্র মধু আনিয়া কাব্যচক্রকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে; ইহা ত অনায়াসসাধ্য হইবার কথা নহে। এ কাজ যাহারা করে তাহারা মধুপ্রিয় প্রজাপতি নহে, মধুচক্রের নির্ম্মাতা মধু-মক্ষিকা। মধুমক্ষিকা কোনদিন অলস বা আয়াসবিমুখ নহে। মধুমক্ষিকার পাখা যে ক্লান্ত হয় না, তাহার কারণ—সে জানে, মধু বহন করিতেছে; তাহার রচিত মধুচক্র যে সৃষ্টিকৌশলে অদ্বিতীয় হইয়াও সহজ-সুন্দর, তাহার কারণ মধুমক্ষিকা নিতান্ত নিপুণ, একান্ত নিরলস।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে অনিবার যাতায়াতের ফলে যখন রসোত্তীর্ণ কাব্যের সৃজন হইতে থাকে, তখন কি কবিচিত্তকে কল্পনালোক, বাসনা-লোক বা ভাবলোকে আর উঠা-নামা করিতে হয় না? যে লোকে বাসনায়িত ভাব কল্পনার সাহায্যে রসরূপ গ্রহণ করে তাহারই নাম রসলোক। কবিচিত্ত কোন ভাবসম্বন্ধে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত ভাবের বাসনা, কল্পনা ও রস তখন অভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ রসলোকে বসিয়াই কবিচিত্ত ঐ ভাবসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বাসনা ও তদুপযোগী কল্পনার যোগান পাইতেছে। নিপুণা গৃহিনী পাকশালে বসিয়াই যেমন রন্ধনোপকরণ প্রাপ্ত হন, হাঁড়ি চড়াইয়া হাটে বা শস্যক্ষেত্রে ছুটাছুটি যেমন হাস্যকর অব্যবস্থা মাত্র, তেমনি রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের পক্ষে রসলোকেই কাব্যের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকে, তাহাকে আর পুনঃপুনঃ বাসনা বা কল্পনালোকে ছুটাছুটি করিতে হয় না। কাব্যবিশেষের উদ্দিষ্ট ভাবসম্বন্ধে রসলোক, কল্পনালোক ও ভাবলোক তখন অভিন্ন ও এক-ক্ষেত্রীভূত হইয়া থাকে।

এইবার রসোত্তীর্ণ কাব্যের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতাটিতে দেখা যায় কবিচিত্ত রস ঘুরিয়া কাব্যে পৌঁছিয়াছে।

> আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
> বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত,
> রুদ্র তপস্যার বনে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
> একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।
>
> বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি উঠিল একবার,
> বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর;
> জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
> দেখিলাম জল স্থল—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল জর্জ্জর।
>
> তবু এনু বাহিরিয়া—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,
> চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিয়া না মরি,
> উগ্র মদ্যসম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মূর্চ্ছমান,—
> বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।
>
> ধীরে এনু বাহিরিয়া, ঊষার আতপ্ত কর ধরি'।
> মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন, মুহুমুহু করি অনুভব!
> সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি',
> দিনদেবে নমস্কার—আমি চম্পা সূর্য্যের সৌরভ।

যে কবিতা রসোত্তীর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহা কেন রসোত্তীর্ণ এ বিচার করা ঠিক সম্ভবপর নহে, সে চেষ্টা করিব না। সে কাব্য কেন ভাবসমুখ নহে, বাসনাসমুখ নহে, কল্পনাসমুখও নহে, তাহার বিচার হয়ত চলিতে পারে; কিন্তু এ কবিতাটী লইয়া সেই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। নব নিদাঘের খর সূর্য্যতাপে শূন্য শুষ্ক বিহ্বল জর্জ্জর অরণ্যানীর মধ্যে বসন্ত যখন মুমূর্ষু, তখন যে কুসুমবালা সাহসিকা অপ্সরার ন্যায় বিশ্বাসের বৃন্তে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে ফুটিয়া উঠিল, সাধারণ কুসুমের মত রৌদ্রের মদ্যপানে বিহ্বল না হইয়া যে অনুভব করিল স্বর্গের অপ্সরার ন্যায়ই তাহার অঙ্গের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই কুসুম ঊষার কর ধরিয়া সূর্য্যের পানে মুখ তুলিয়া যখন বলিয়া উঠে,

"আমি চম্পা সূর্য্যের সৌরভ"—তখন বিশ্লেষণ-বুদ্ধি তাহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া নতজানু হইয়া সেই বিজয়িনীকে প্রণাম করে।

"আমার ভালবাসা" শীর্ষক কবিতায় যে-কবির চিত্ত কল্পনালোকে আপনার খেলায় আপনার খেই হারাইয়া ফেলিল, সেই কবির চিত্ত অপর একটী কাব্যে রসোত্তীর্ণ হওয়ায় কি অপরূপ রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গোবিন্দ দাসের "কস্তুরী"-কাব্যে "অতুল" শীর্ষক কবিতাটার কথা বলিতেছি। বিধবা মায়ের একমাত্র শিশু পুত্র অতুল ছুটি-অন্তে মাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে নাই, তথাপি তাহাকে পাঠাইতে হইল। অতুল আর মায়ের কোলে ফিরিয়া আসে নাই। এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতার প্রতি পংক্তির বিভাব, অনুভাব যে কত দূর মূল রসের অনুগামী হইয়া চলিয়াছে তাহা সমগ্র কবিতাটী পাঠ না করিলে বুঝা যাইবে না। মাতৃহৃদয়ের যে অপরূপ বিয়োগব্যথা এই কবিতায় রসমূর্ত্তি পাইয়াছে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। অতুল বিদেশে যাইতেছে ;—

> একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
> আকুল জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে।
> স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
> দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
> মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায় ;
> গোধূলির কোল হ'তে রবি অস্ত যায়!

তাহার পর বাঙ্গালীর ঘরে আশ্বিন মাস আসিয়াছে ;— অতুল বাড়ী আসে নাই।

> শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
> লইয়া পাথালিকোলে শিশু শশধর,
> ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
> গগন-অঙ্গনে যেন হ'য়েছে বাহির।

কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হওয়ায় মাতৃস্নেহ যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। করুণরসোপেত কবিচিত্তধারা জাহ্নবী-ধারার ন্যায় সুদীর্ঘ বিচিত্র পথে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, আর অগ্রগামী মাতৃস্নেহের শঙ্খনিনাদ তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিপথগামী হইতে দিতেছে না। সমগ্র কবিতাটী উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। রসোত্তীর্ণ হইলে পরিচিত সাধারণ ভাব সাধারণ ছন্দেই কেমন অপরূপ কাব্যশ্রীমণ্ডিত হইতে পারে —এ কবিতা পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে। কবিচিত্ত দশমী রাতের বর্ণনা করিতেছে—

> অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর ;
> আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ-গহ্বর,
> যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
> তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে।

এ বর্ণনা চন্দ্রহীন আকাশের বর্ণনা, না পুত্রহারা জননী-হৃদয়ের বর্ণনা—কে বলিবে ?

ভাবের বিশেষত্ব বা নূতনত্ব না থাকিলে কাব্য রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না, এমন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কাব্যের প্রথম কবিতাটীতে দেখিতে পাই—কবিচিত্ত রসলোক ঘুরিয়া আসিলে সুপরিচিত ভাব হইতেই কেমন রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।

দশমহাবিদ্যা কাব্যের প্রথমেই কবি সতীশূন্য কৈলাসে শিবের শোক বর্ণনা করিতেছেন—

সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিবার পর শিব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মাদের ন্যায় ত্রিজগৎ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শনে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিলেন।

> ছিন্ন হইল সতীদেহ শূন্য হইল শিবগেহ
> বামদেব বিরস-বদন।
> চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
> অন্ধকার বিঘোর ভুবন।
> সতীমুখ-বিভাসিত, যে আলোক শোভা দিত,
> পুলকিত কুসুম-কানন।
> পেয়ে যে কিরণমালা সুবর্ণ মণি উজলা,
> সে আলোক নহে দরশন।
> শুষ্ক কল্পতরুসারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
> শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
> নিস্তব্ধ জগৎ-প্রাণ নিরুদ্ধ সৌরভ ঘ্রাণ,
> কণ্ঠে বদ্ধ বিহগ কূজন.
> নন্দী শুয়ে রেণুপর, কাঁদিছে বৃষভবর,
> প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
> হেরিয়া ত্রিপুরহর দূরে রাখি বাঘাম্বর
> বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন।

দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন,
করে জপমালা চলে মুখে বব বম্ বলে
অন্যশব্দ সকলি মলিন।
জলমগ্ন ফণিমালা মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা
লুকাইল জটার ভিতর,
নিস্পন্দ পবনস্বন নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণুপর।
থামিল গঙ্গার রব নির্ব্বাক প্রমথ সব
কৈলাস জগৎ অচেতন,
কদাচিৎ মা মা নাদে অদম্বিৎ নন্দী কাঁদে,
বম্ শব্দ সহ সম্মিলন।
কৈলাস অম্বরময় তারা সূর্য্য অনুদয়
ক্ষণকালে নিবিল সকল,
তমঃচ্ছন্ন দিগাকাশ কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ কণ্ঠের গরল।
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি' হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার সুকুমার তনু তার,
মমতার অভ্যাস যেমন।
তখন নয়নে ঝরে পূর্ব্ব কথা মনে সরে
ঝরে যথা নদী প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময় নিমীলিত নেত্রদ্বয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন।
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী কাঁদেন কৈলাসপতি
কেবল সতীর কথা মনে,
জগতের জড়জীব কাঁদিছেন হেরি' শিব
কাঁদিতে লাগিল তাঁর সনে।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য গীতিকবিতার আড়ষ্ট ভাব ও ভাষার সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই কবিচিত্ত রস ঘুরিয়া আসিলে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার সমস্তই সহজ অনাড়ম্বর হইয়াও কেমন রসানুগ হয় এবং পূর্ব্বপরিচিত বিভাব অনুভাবই কেমন রসোদ্রেকে সমর্থ হয়। *

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তাজ-কক্ষে

[শ্রীগোপাললাল দে]

মর্ম্মর অলিন্দতল হিমশীত স্ফটিক-সুন্দর,
কবির কল্পনাপূত, শিল্পীর মার্জ্জনা-নিরমল,
রূপ-রসায়নে শুদ্ধ চন্দ্রকর বিনিন্দি' ভাস্বর,
তোরণ মিণারসারি স্বর্ণশীর্ষ গুম্বজ উচল।

পাষাণে পশেছে তরু, মর্ম্মরেতে লতায়েছে লতা,
ফলকে ফুটেছে ফুল, মীণাতে মঞ্জরী অপরূপ,
মণি-কিশলয়দলে বেড়ে আছে প্রাণের বারতা,
গন্ধে বায়ু অন্ধ করে অবন্ধনে বাঁধিয়াছে ধূপ।

মর্ম্মর-জালিকা মাঝে জীবনের দিবা অবসানি'
কুসুম-বাসর শেষে, মরি মরি ইরাণী রূপসী,
এলায়েছ তনুলতা, সুরেন্দর বর বপুখানি,
দীন ভৃত্য দিল্লীশ্বর ধন্য হোল পার্শ্বে তব পশি'।

রহস্য-মন্দির তাজ! সুষমার কোথা তব সীমা,
তোমারে ঘেরিয়া রাজে নিরবধি নিবিড় মহিমা।

* আগামী "অনুশীলনী" অধ্যায়ে গীতিক কবিতার জাতি-বিচার করা হইয়াছে। সঃ সঃ।

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

১৯

ভোর বেলা দুইজনে চিটাগং-মেইলে চাপিয়া বসিল।

গাড়িটা নির্জ্জন ছিল—একই বার্থে দুই জানালায় ষ্টেশনের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কিছু একটা কথা না বলিলে এই স্তব্ধতা অতিমাত্রায় কুৎসিত ও দুঃসহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু কী-ই বা বলিবার ছিল। নমিতা মুখাবয়ব এমন দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে, দুই চোখে তার কঠিন ঔদাসীন্য, বসিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটা দৃপ্ততা যে কোমল করিয়া তাহার নামোচ্চারণটি পর্য্যন্ত প্রদীপের মুখে আর মানাইবে না। অথচ এমন একটি স্নিগ্ধ-করোজ্জ্বল প্রভাতের জন্য তাহার প্রার্থনার আর অন্ত ছিল না। সেই দিনটি এমন মৃত্যু-মলিন রাত্রির মুখোস পরিয়া দেখা দিল কেন?

গাড়ি ছাড়িবার দেরি ছিল। প্রদীপ কহিল,—তোমাকে একটা বই কিম্বা পত্রিকা কিনে এনে দেব?

নমিতা অনুদ্বিগ্ন স্পষ্টতায় উত্তর দিল: ইংরেজি বর্ণমালার পরস্পর সন্নিবেশের কোন মাহাত্ম্যই আমার কাছে নাই। আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

শেষের কথাটুকুর প্রখরতা প্রদীপের কানে বাজিল: কিন্তু সারা পথ তুমি এমনি বোবা হ'য়ে ব'সে থাকবে?

নমিতা চোখ ফিরাইল না, একাগ্র দৃষ্টিতে প্লাটফর্মের উপরকার জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া কহিল,—কথা বলবার লোক থাকলেই চলে না, কথা চাই। কিন্তু আমার জীবনে আবার কথা কী! সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

—কিন্তু আমার অনেক কথা ছিলো।

—কিছু দরকার নেই।

প্রদীপ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল,—কোথায় যাচ্ছ জান্‌তে তোমার একটুও কৌতূহল হচ্ছে না নমিতা?

নমিতা এইবার প্রদীপের মুখের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ধরিল। সেই চক্ষু দুইটি অপ্রত্যাশিতের আশঙ্কায় স্তিমিত নয়, ভাবাবেশে গভীর নয়, উলঙ্গ তরবারির মত প্রখর। তাহার ঠোঁটের প্রান্তে মুমূর্ষু শশিলেখার মত একটি বিবর্ণ হাসি ভাসিয়া উঠিল। কহিল, যাচ্ছি যে সেইটেই বড়ো কথা, কোথায় যাচ্ছি সেইটে নিতান্ত অবান্তর।

গাড়ি এতক্ষণে ছাড়িল। রাশীকৃত কোলাহল ক্রমে ক্রমে টুকরা টুকরা হইয়া এখানে সেখানে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়ি এখন মাঠের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রদীপ কহিল,—কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে ত' ঠাঁই নিতে হবে।

নমিতার স্বরে সেই অনুত্তেজিত ঔদাস্য: পৃথিবীতে কোনো জায়গাই মানুষের পক্ষে শেষ আশ্রয় নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সঙ্গে জায়গাও বদ্‌লে যায়। তাই জায়গা সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও নেই, আশঙ্কাও নেই। আমি সকল আশা আশঙ্কার বাইরে। সেই আমার ভরসা।

প্রদীপ কাছে সরিয়া আসিল: তুমি এ-সব কী বল্‌ছ, নমিতা?

নমিতা একটুও ব্যস্ত হইল না: বল্‌ছি, আপনি যে-জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফের সরে' পড়্‌তে আমার দ্বিধা থাক্‌বে না। আস্‌বার যাবার দু'দিকের পথই আমার জন্য খোলা আছে। বুঝেছেন?

জিজ্ঞাসাটুকুর মধ্যে শ্লেষ আছে। প্রদীপও ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই অবলম্বন করে' আশ্রয় খুঁজ্‌তে বেরুলে, এটার মধ্যেও ত' দ্বিধা থাকা উচিত ছিল।

—উচিত অনেক কিছুই ত' ছিল। উচিত ছিল স্বামী না মরা, উচিত ছিল স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যৌবন উবে যাওয়া। তার জন্যে আমার ভাবনা নেই। মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মেছি বলে' আমার আর অনুশোচনা হয় না। আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেটা আপনিই ভেবে দেখুন না একবার।

প্রদীপ কহিল, আমার ভেবে দেখাতে ত' কিছু এসে যাবে না। কিন্তু পাঁচ জনের মুখের দিকে ঘোম্‌টা তুলে চাইতে পারবে ত' নমিতা?

—আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেইটে আপনি ভাল করে' ভেবে দেখেন নি বলেই পাঁচজনকে টেনে এনে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! আমি ত' আর আপনার জন্যে বেরিয়ে আসিনি।

ম্লান হাসিয়া প্রদীপ বলিল,—সে-কথা মুখ ফুটে না বল্‌লেও আমি ঠিক বুঝেছিলাম, নমিতা। আমার জন্যেই যদি বেরিয়ে আস্‌তে, তা হ'লে তোমার তপস্যার তাপে পাঁচ জনের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব ঘট্‌তো। তখন তুমি আপন সত্যে স্থির, আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌তে। আমার জন্যেও বেরুলে না, অথচ আমারই সঙ্গ নিলে, তোমার বাড়ির অভিভাবকরা এর সূক্ষ্ম রসটা আবিষ্কার করতে পারবে কি?

নমিতা চোখের দৃষ্টিকে কুটিল করিয়া কহিল,—বাড়ির অভিভাবকের রসবোধের অপেক্ষা রেখে ঘর ছাড়িনি একথা ভুলে গিয়ে আমার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করবেন না তাঁরা বুঝুন না বুঝুন, আপনি বুঝলেই যথেষ্ট। রাত এক-টার সময় সদর দরজা খুলে গুঁটি সুটি বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে আপনারই হাত ধরলাম, সংবাদটার মধ্যে যথেষ্ট মাদকতা আছে। সে মাদকতায় আপনিই যাতে আচ্ছন্ন না হ'ন সেই বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে' দেওয়া দরকার। কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই যেন এ ভেবে গর্ব্ব অনুভব না করেন যে আমি আপনার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হ'য়েই আপনার বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমি বেরিয়েছি নিজের প্রেরণায়, নিজের দায়িত্বে—আপনি আমার পক্ষে একটা উপকরণ মাত্র, লক্ষ্য নয়। দয়া করে' এ কথা মনে রেখে চল্‌বেন আশা করি। বলিয়া নমিতা একটা ঢোক গিলিল। তাহার উত্তেজনা এখনো শান্ত হয় নাই। জিভ্‌ দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া আবার সে কহিল,—আমার স্বামীর ফোটোটা আপনি ভেঙ্গে দিয়ে এসে আমার বিপ্লবের সমস্ত মাহাত্ম্য নষ্ট করে' দিয়েছেন। ভেবেছিলাম আমিই একদিন ওটাকে ভেঙে-চুরে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে' ফেল্‌বো। মিথ্যাচারকে আর কত দিন প্রশ্রয় দেওয়া চলে?

প্রদীপের মুখ দিয়া বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বাহির হইবার আগেই নমিতা কহিল,—হাঁ, মিথ্যাচারই ত'। সত্যকে পাব ভেবে যে নিষ্ঠাকে এত মহৎ ক'রেই দেখি না কেন, তার মধ্যে নিত্যের দেখা না পেলেই দারুণ ঘৃণা ধ'রে যায়। সেই ঘৃণা প্রকাশ করবার দিনের নাগাল আজ পেয়েছি আমি।

ঘোমটার তলা হইতে বিপর্যস্ত চুলগুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া নমিতা খোঁপা বাঁধিতে বসিল।

গাঢ়স্বরে প্রদীপ কহিল,—তোমার সান্নিধ্যের মাদকতায় আমি অবিচল থাকবো, আমার ওপর তোমার এ বিশ্বাস এলো কি করে'? তুমি সাবধান করে' দিলেই যে আমার স্নায়ুমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিস্তেজ হ'য়ে থাকবে আমার ভালবাসাকে তুমি এতটা হীন ও দুর্ব্বল করে' দেখবার সাহস কোথা থেকে পেলে নমিতা?

অথচ কথার সুরে মিনতি ঝরিতেছে। নমিতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখে সহসা উষাভাসের লাবণ্য আসিয়াছে, নমিতা চোখ ফিরাইতে পারিল না। প্রদীপ আবার কহিল,—তার চেয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কিম্বা তোমার যদি আর কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকে, ঠিকানা বল, তোমাকে সেখানে রেখে আসি। আমার সঙ্গে তুমি এসো না। আমি বিপ্লবী বলে' বলছি না, আমি লোভী; আমার রক্ত খালি তপ্ত নয়, পিপাসিত। সমাজের কলঙ্কভাজন হ'তে আমার অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তোমার কাছে আমি কালো হ'তে পারবো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস ক'রো না, নমিতা।

নমিতা স্থির শান্ত কণ্ঠে কহিল,—আমি আপনাকে খুব বিশ্বাস করি।

—না, আমার লোভের সীমা নেই, নমিতা। না না সে তুমি বুঝবে না।

—আমি খুব বুঝি।

—বোঝ না। তোমাকে পাবার জন্যেই আমি দস্যু সেজেছিলাম। খালি প্রার্থনার মধ্যে পেতে হবে কেন, বিদ্রোহের মধ্যেও লাভ করা যায়। তোমাকে আমি কেড়ে ছিনিয়ে নেব এই প্রতিজ্ঞায় আমার হাতের মুঠো দু'টো কঠিন হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে কোনোদিন পাব না জান্‌লে এমন পিপাসাকে প্রশ্রয় দিতাম না।

নমিতা ধীরে কহিল,—আপনার এ অস্থিরতা দেখে আমারই ভারি লজ্জা করছে। কোনো মেয়ের কাছে পুরুষের এই নাকি-কান্নার মত বীভৎসতা পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। আপনি যা বলেন বলুন, আমি আপনারই সঙ্গে যাব। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে, অপ্রতিবাদে, যে কোনো সর্ব্বনাশে। নিন্ ধরুন আমার হাত। বলিয়া নমিতা তাহার আঁচলের তলা হইতে একটি শুভ্র শীর্ণ হাত বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ তাহা ছুঁইতেও পারিল না। যেন আগামী জন্মে চলিয়া আসিয়াছে এমনই একটা অভাবনীয়ের চেতনায় সে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই অতটুকু নমিতা এত শীঘ্র এমন করিয়া বদলাইল কিসে? তাহার মেরুদণ্ড কয়েকদিনেই কঠিন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হাত বাড়াইয়া দিবার ভঙ্গিটিতে কী তেজস্বিতা! এত নিভৃতে নিকটে রহিয়াও তাহার স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদাটুকুকে সে সন্দেহে দুর্ব্বল, আশঙ্কায় নিষ্প্রভ করিয়া তুলে নাই। হাসিয়া কহিল,—আপনি ত' আমার বন্ধু, দেখি, আপনার হাত দিন্।

প্রদীপ একটিও কথা কহিতে পারিল না, আস্তে তাহার হাতখানি অসীম ভীরুতায় প্রসারিত করিয়া দিল। নমিতা তাহা স্পর্শ করিয়াই ছাড়িয়া দিল না; কহিল,—এক দিনেই আমার জন্মদিন আবার ঘুরে এল, এবং এ-জন্ম মনে হচ্ছে পৃথিবীতে নয়, আকাশে। আপনার লোভকে আমি ভয় করব ভাব্‌ছেন? কেন, আমি জয় করতে পারি না? একটুখানি হাসিয়া আবার কহিল,—আপনার লোভ আছে, আমার দুর্গম দুর্গ নেই? আপনি আক্রমণ করতে পারেন আর আমি আত্মরক্ষা করতে পারি না?

না, পার না—প্রদীপ ইচ্ছা করিলেই ত' ঐ তপশীর্ণা দেহলতাকে তাহার বুকের উপর দলিত করিয়া ফেলিতে পারে। ঐ ভুরু, নাক, ঠোঁট—আভরণহীন দু'খানি রিক্ত বাহু,—সমস্ত কিছু সে অজস্র অজস্র চুম্বনে সোনা করিয়া দিবে। নমিতার চারিদিকে এমন একটা অব্যাহত কাঠিন্য, এত কাছে বসিয়াও চতুর্দ্দিকে সে একটা দুরতিক্রম্য দূরত্ব বিস্তার করিয়া আছে যে প্রদীপ একটি আঙুলও নাড়িতে পারিল না। নমিতা কহিল,—তা হ'লে আপনি যে ঘটা করে' অত-সব বক্তৃতা দিয়ে এলেন তা শুধু আমাকেই লাভ করতে, আমাকে মুক্ত করতে নয়?

প্রদীপ হাত সরাইয়া নিয়া কহিল,—তার মানে?

—তার মানে, আপনার সঙ্গে আমার যদি আইনানুমোদনে বিধবা-বিবাহ হ'ত, তা হ'লে স্বচ্ছন্দে আবার আমাকে দাসী বানিয়ে ফেল্‌তেন। অর্থাৎ, আমি যদি কোনোদিন কোনো ছুতোয় খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়্‌তে পারি বিশ্রামের জন্য আবার যেন আপনারই শাখায় এসে বসি—এই আপনার কামনা ছিল?

প্রদীপ কহিল,—ছিল, নমিতা। কিন্তু অমন রূঢ় উপমা প্রয়োগ ক'রো না। একদিন এই সব নিষ্ফল পূজোপচার দু'হাতে ছাড়িয়ে দিয়ে তুমি ব্যক্তিত্ব-পূজায় বরণীয় হ'য়ে উঠ্‌বে এই কামনা করে' তোমার জন্য আমি একটি প্রতীক্ষার বাতি জ্বেলে রেখেছিলাম। যে অসীম-শূন্যচারী পাখী চলার বেগে খালি চলে থামে না, তার বেগের মাঝে একটা ক্লান্তির কদর্য্যতা আছে।

নমিতা হাসিয়া কহিল,—এও আপনার রূঢ় উপমা। জানেন ই ত' বড় বড় কথা আমি বুঝি না। দুর্ব্বোধ্য হবার জন্যেই যে-সব কথা বড় বলে' বড়াই করে সেগুলোকে আমার অত্যন্ত বাজে মনে হয়।

দুই জনে আবার চুপ করিয়া গেল। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের শেষে অনন্ত আকাশের অজস্র প্রসারের পানে চাহিতে চাহিতে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার অসঙ্কোচে ভাবগদ্‌গদ স্বরে কহিল,—কী সঙ্কীর্ণ সংসার থেকে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে এসে উত্তীর্ণ হলাম, তার জন্যে আপনাকে আমার বহু ধন্যবাদ।

প্রদীপের বিস্ময়ের অবধি নাই: আমাকে?

—এই উন্মুক্ততার স্বপ্ন আমাকে আরেকজন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার বিদ্রোহ একটা ঝড়ের আকারে আমার ঘরে ঢুকে' আমার আরাম ও আলস্য, স্থিরতা ও স্থবিরতা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে' দিলে। আপনার আচরণে যতই কেন না একটা অপরিচ্ছন্নতা থাক্, সে অসংস্কৃতার মাঝে শক্তি ছিল, তেজ ছিল। তাই আপনাকেই সঙ্গী করলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার কহিল—আমি যে সমাজের প্রতি কী অমানুষিক বিদ্রোহাচরণ করলাম তা আপনিও বুঝবেন না।

প্রদীপ অনিমেষ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নমিতা কহিল,—ঐহিক বা পারত্রিক কোনো লোভের বশবর্ত্তী হ'য়েই এই বিরুদ্ধাচরণ করিনি। লোকে যতই কলঙ্ক দিক্, আমার ভগবান তা শুনবেন না। আর, আমি তারই সঙ্গ নিলাম যার দুর্দ্ধর্ষ আচরণে সমস্ত সংসারের কাছে আমার মুখ অপমানে ও লজ্জায় কালো হ'য়ে উঠ্ল।

—মানুষের মনোরাজ্যের এমন একটা অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা আমার কাছেও ভারি অদ্ভুত ঠেকছে, নমিতা। যার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ও রাগের অন্ত থাকা উচিত নয় এবং এখনও যার প্রতি তুমি মৌখিক শিষ্টাচারের একটা কৃত্রিম আবরণ মাত্র মেনে চলছ, তোমার এই দুর্দ্দিনে তাকেই তুমি সাথী নিলে, এটার রহস্য সত্যিই রোমাঞ্চকর, নমিতা।

নমিতা দৃঢ় হইয়া কহিল,—না, এটার মাঝে অবাস্তব উপন্যাসের কোনো ইন্দ্রজালই নেই কিন্তু। আমার আচরণটা কোষমুক্ত অসির মতই স্পষ্ট। আপনাকে আগেই বলেছি বেরিয়ে আসাটাই আমার কীর্ত্তি, তার নিমিত্তটা অশরীরী। কিন্তু সংসারে আপনাকে নিয়েই আমার দুর্নাম, আপনাকে দিয়েই আমার উৎপীড়ন, ভাবলাম এমন কীর্ত্তিসঞ্চয়ের দিনে আপনিই আমার উপযুক্ত সহচর। শুধু সমাজ নামে ঐ বধির শাসনযন্ত্রটা নিজের দাহে নিজেই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্, সেই আনন্দেই আপনার সাথী হলাম, আপনার কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করবার জন্যে নয়।

মুগ্ধ হইয়া প্রদীপ কহিল,—এত কথা তুমি শিখলে কোথা থেকে?

নমিতা হাসিয়া কহিল,—এ সব ভাবলেশহীন অসার বক্তৃতা নয় যে বই বা খবরের কাগজ থেকে মুখস্থ করে' এসে চেঁচিয়ে লাফিয়ে সবাইকে চমকে দেব। এ আপন আত্মার কাছ থেকে গভীর করে' জানা, আপন অন্তরের খনি খুঁড়ে এ মণি আবিষ্কার করতে হয়। তাই এ শিক্ষা পেতে দিন-ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি লাগে না, একটি মুহূর্ত্তস্থায়ী প্রকাশবিকাশে সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

আপনাকে বাহন করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার সমাজকে শাসন করা। তদতিরিক্ত কোনো মূল্য আপনাকে আমি দিতে পারছি না।

প্রদীপ খালি কহিল,—বেশ। বলিয়াই পকেট হইতে কি একটা ভারি জিনিস তুলিয়া জানলা দিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া দিল।

নমিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল: কী, কী ফেল্লেন ওটা বাইরে?

প্রদীপ তাহাকে বিরত করিয়া কহিল,—ও কিছু না। মুক্তি তুমিই খালি লাভ করনি, নমিতা, আমিও। তুমি তোমার আচরণের মুক্তি, আমি আমার অন্তরের স্বাধীনতা। আপন আত্মার কাছ থেকে আমিও গভীর করে' সত্য শিখে নিলাম, নমিতা, এক মুহূর্ত্তে, চোখের একটি দ্রুত পলক-পতনের আগে। সঙ্কীর্ণ অচলায়তন ছেড়ে আমিও আজ আত্মোপলব্ধির পথ পেলাম।

নমিতা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে কহিল,—আপনার জীবনের এই সব উত্তেজিত মুহূর্ত্তগুলিকে আমি ভয়ানক সন্দেহ করি। এই অন্ধ উত্তেজনাই হচ্ছে সত্যিকারের ম্রিয়মাণতা।

—নয়, নয়, তা নয় নমিতা। আমি সৈনিক, এ উত্তেজনা যেদিন লাভ করেছিলাম সেদিন আমার কবিত্বের, আমার আত্মবিকাশের সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সেটা একটা উগ্র নেশা মাত্র ছিল, হোলি-খেলায় উৎসব জমাতে গিয়ে হিন্দুস্থানিরা যেমন মদ খায়। সেটা উত্তেজনা ছিল না, স্নায়ুকে সে সহিষ্ণু করে না, সেতারের তারের মত সঙ্গীতময় করে' তোলে না। কিন্তু আমিও যে একদিন রাত্রির আকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপন অস্তিত্বের প্রসারতা বোধ করেছিলাম সৃষ্টির প্রেরণায়, সে সত্য আজ আবার তোমাকে কাছে পেয়ে উদ্ঘাটিত হ'ল, নমিতা। বুঝ্লাম, জোর খাটালেই লাভ করা যায় না, তপস্যা চাই। যে-জিনিস সাধ ক'রে হাতে আসে না নমিতা, তার মধ্যে স্বাদ কই? বলিয়া প্রদীপ হঠাৎ নমিতার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিল না। তেমনি উদাসীন নির্লিপ্তের মত কহিল,—আপনার এমন স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের

খবর পেয়ে আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই আর আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল,—কে? অজয়?

নমিতা অস্ফুট স্বরে কহিল,—হাঁ; তিনি আপনাকে বিশ্বাসঘাতক বলবেন।

তাড়াতাড়ি নমিতার হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রদীপ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—কেন, পদে পদে আমি ওর প্রতিবিম্ব হ'য়ে থাকবো আমাকে সৃষ্টি করবার সময় বিধাতা এমন চুক্তি করেছিলেন নাকি? মানুষের বিশ্বাসেরও সীমা থাকা উচিত। তার জন্যে সমস্ত বিশ্বকে সঙ্কীর্ণ করে' রাখতে হবে আত্মার এমন খর্ব্বতা আমি সহ্য করবো না। নতুন সত্যের আলোকে পুরাণোকে পরিষ্কৃত করে' নেব না, আমার এমন অন্ধ অনোদার্য্য নেই। বহু বৈচিত্র্যের আস্বাদে যে বদ্‌লায় না তাকে আমি জীবন্মৃত বলি, নমিতা। অজয়ের ক্ষমা না ক্ষমায় আমার কিছু এসে যায় না। তার সত্য তার, আমার আমার। তার পথ থেকে আমি সরে' এলাম। ধূলো আর ধূনো নিয়েই আমাদের কারবার—

নমিতার ঠোঁটের কিনারে সামান্য একটি ধারালো হাসি ফুটিয়া উঠিতেই প্রদীপ কথা থামাইল। নমিতা কহিল,—বদ্‌লানোতে আপনার বাহাদুরি আছে। কিন্তু সে-কথা থাক্। আমাকে নিয়ে এখন কি করতে চান্?

প্রদীপ খুসি হইয়া উঠিল: আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও বল?

নমিতার মুখ গম্ভীর; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—দেখা যাক্।

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিল। প্রদীপ উঠিয়া পড়িল কহিল,—তখন থেকে খালি বাজে কথা ব'লে চলেছি। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে। দেখি ষ্টেশনে কিছু ফল-টল কিনতে পাই কি না।

নমিতা বাধা দিয়া কহিল,—আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হবেন না। শরীরকে আমি স্বচ্ছন্দে শাসন করতে পারি।

কথায় এমন একটা তেজোদীপ্ত দৃঢ়তা যে প্রদীপের পা দুইটা অচল হইয়া রহিল। গাড়ি আবার চলিয়াছে।

২০

ম্লান মেঘ্‌নার তীরে অখ্যাত একটি পল্লীতে প্রদীপের একখানি নির্জ্জন কুটির ছিল। চারিপাশে অজস্র শ্যামলতার গ্রামবধূর প্রগল্‌ভ নির্লজ্জতা দেখিয়া নমিতা মনে পরম তৃপ্তি পাইল। এমন একটি উন্মুক্ত অবারিত শান্তির জন্যই তাহার তৃষ্ণার অবধি ছিল না। মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলে আকাশের দর্পণে আত্মার ছায়া পড়ে—নিজের বিরাট সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। এমন একটা মহান্ মুক্তির স্বাদ হইতে সে এতদিন বঞ্চিত ছিল। মানুষের ভবিষ্যৎ যে কত সুদূর বিস্তৃত, কত বিচিত্র পরিণামময়—নমিতার চারিদিকে যেন এই সুস্পষ্ট সঙ্কেতটি সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল,—নদীর এ ধারটা একেবারে ফাঁকা; ওপারে কতকগুলো বাগ্‌দিপাড়া আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে স্নান করে' এস, আমি পাহারা দিচ্ছি।

নমিতা হাসিয়া কহিল,—যদি জলে ভেসে যাই, তবে আপনার পাহারায় কি আর সুফল হ'বে? তার চেয়ে চলুন, দু'জনে বাগ্‌দিপাড়াটা ঘুরে আসি।

প্রদীপ কহিল,—যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে; কাল সকালে যাওয়া যাবে'খন। কথার সুরে যেন শাসনের আভাস আছে। নমিতা একটু হাসিল মাত্র।

গ্রামেই মথুর দাস প্রদীপের একসঙ্গে ভাই ও ভৃত্য। সে আসিয়া বিছানা-পত্র হাঁড়ি-কুড়ি লোক-জন সমস্ত নিমেষে জোগাড় করিয়া দিল। রাত্রে নমিতার যদি রাঁধিতে কষ্ট হয় তবে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকেও সে ডাকিয়া আনিতে পারিবে। প্রদীপ মথুরের বাড়িতে পাত ফেলিবে যা হোক্।

প্রদীপ কথাটা পাড়িল। নমিতা রুখিয়া উঠিল,—বিধবারা আবার রাত্রে গেলে নাকি? এটা কোন্ দেশের বিধান?

প্রদীপ কহিল,—কিন্তু আজ সারা দিন তুমি এক ফোঁটা জলও মুখে তোলনি, রাত্রে খেলে তোমার অধর্ম্ম হবে না।

নমিতা স্পষ্ট করিয়া কহিল,—কিসে আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম হবে সে-পাঠ আপনার কাছ থেকে না নিলেও আমার চলবে। মনে রাখবেন আমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী।

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—এই তেজটা এতদূর না এসে শ্বশুরালয়ে দেখালেই ভালো মানাতো। ফের নিয়ে যাব সেখানে ?

শেষের কথাটার মধ্যে এমন একটা কদর্য্য ঝাঁজ ছিল যে নমিতার সহিল না। সে কহিল,—কোথায় যেতে হবে না হবে সে-পরামর্শ আপনার না দিলেও চলবে। পারে এসে নৌকো আমি পায়ে ঠেলে জলে তলিয়ে দিতে পারি যে কোনো মুহূর্ত্তে।

প্রদীপ ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—আর নৌকো যদি ঝড়ের সময় তোমাকে না ডুবিয়ে বরং নিরাপদে পারেই পৌঁছে দেয় তবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ো। দয়া করে' মনে রেখো তুমি আমার অধীনে, এখানে তোমার এত-সব বৈধব্যের আস্ফালন চলবে না।

নমিতার অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল; কহিল,—আপনিও দয়া করে' মনে রাখবেন আপনার অধীনে আসবার জন্যেই আমি এত আড়ম্বর করি নি। আপনার অধীনতায় বিশেষ মাধুর্য্য কোথাও নেই। এখন যান, যেখানে আপনার কাজ আছে। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

প্রদীপ কহিল,—যথেষ্ট ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়েছ, নমিতা। একজন পুরুষকে ধাওয়া করে' এতদূর নিয়ে এলে তারপর তার স্পর্শ থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে থেকে নিজের সতীত্ব ফলাচ্ছো, এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই।

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল,—যান্, যান্, শিগ্‌গির এ-ঘর ছেড়ে চলে' যান। যান্ শিগগির।

ঋজু শীর্ণ দেহ যেন অগ্নিশিখা, বাহুটি বিদ্যুৎবর্ত্তিকার মত প্রসারিত, মুখমণ্ডলে রক্তচ্ছটা। প্রদীপের বলিতে সাহস হইল না যে এ ঘর-বাড়ির মালিক আমি, আমাকে ঠেলিয়া ফেলিলেই দূর করা যায় না। এ ঘরে আমার অপ্রতিহত অধিকার, তুমি আমার বন্দিনী; আমাকে ছাড়িয়া যাইবার তোমার পথ কোথায়? সে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই যে নমিতা দুয়ার দিল—পরদিন ভোর না হইলে সে আর বাহির হইল না। মাঝরাতে প্রদীপ একবার উঠিয়া আসিল সত্য কিন্তু দুয়ারে করাঘাত করিয়াও কোনো সাড়া মিলে নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদারুণ অনুতাপে বিদ্ধ হইয়াছে। নমিতার মাঝে ত' সে বিদ্রোহিণী দাহিকা-শক্তিরই উদ্বোধন দেখিতে চাহিয়াছিল, অথচ সে তাহার বশবর্ত্তিনী হইতেছে না বলিয়া তাহার এই আক্ষেপ কেন? কেন যে এই আক্ষেপ সারা রাত্রি না ঘুমাইয়াও সে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

ভোরবেলা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেই প্রদীপ দেখিল নদীর পারে ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া নমিতা বসিয়া আছে। মাথায় ঘোমটা নাই, খোলা চুলগুলি হাওয়ায় উড়িতেছে। এত তন্ময় যে প্রদীপের পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত সে শুনিতে পারিল না। প্রদীপ কাছে আসিয়া কহিল,—আমাকে কাল্‌কের দুর্ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা কর, নমিতা।

নমিতা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। সে মুখের ও কণ্ঠস্বরের নির্ম্মলতা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে হাসিয়া কহিল,—ও-সব ভণিতা ছেড়ে এখানে একটু বসুন। এমন সুন্দর নদী আমি আর কোথাও দেখিনি।

প্রদীপ একটু দূরে সরিয়া বসিল: তোমার চোখ দিয়ে আমিও এই সৃষ্টিকে নতুন করে' দেখতে শিখেছি, নমিতা। এই নদী, তার এই অনর্গল স্রোত, ওপরে অবারিত আকাশ, পারে ছোট একটি নীড়—আর দু'টি আত্মা ঘিরে অপরিমেয় নিস্তব্ধতা—মনে হয়, নমিতা, সৃষ্টির আদিম যুগে চলে' এসেছি আমরা।

কী-কথায় যে কোন্ কথা মনে পড়িয়া যায় বলা কঠিন। নমিতা জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আপনার বন্ধুর ঠিকানা জানেন?

প্রদীপ কথাটার সোজাসুজি উত্তর দিল না: আমার বন্ধু ত' একটি-দু'টি নয়, কা'র কথা বলছ?

—যা'র কথা বলছি তাকে আপনি খুব ভাল করেই চিন্‌তে পেরেছেন। আমার মুখে নামটা তার শুন্‌তে চান?—অজয়।

ঢোঁক গিলিয়া প্রদীপ কহিল,—তার ঠিকানা জান্‌বার কোনো সুবিধেই সে কাউকে দেয় না কোনোদিন। আজ যদি সে রাণাঘাটে, কাল রেঙ্গুনে।

—কিন্তু আপনি-আমি এখানে এসেছি জান্‌লে নিশ্চয়ই একবার আস্‌তেন। তিনি এ-বাড়িতে কোনোদিন আসেন নি বুঝি?

—বন্ধুবার। এটা আমাদের একটা ওয়েটিং-রুম্ ছিল। ফিরোবার হ'লেও আপনিই একদিন চলে' আস্‌বে। তাকে কি তোমার খুব দরকার ?

ম্লান হাসিয়া নমিতা কহিল,—না, দরকার আবার কী! তিনি ত' এমন মানুষ নন্ যে দরকারে লাগবেন কারুর। নিজের খেয়ালে নিজে ভেসে চলেছেন। কিন্তু এবার উঠি আসুন, বাগ্দি পাড়াটা ঘুরে আসি। তারপর গিয়ে রান্না বান্নার যোগাড় করা যাবে। এখানকার হাওয়ার এই গুণ যে বেশীক্ষণ রাগ করা যায় না - ভীষণ ক্ষিধে পায়। আমি রেঁধে দিলে খাবেন তো' ? দেখুন্।

দুই দিন কাটিল। এত শ্রান্তি প্রদীপ কোথায় রাখিবে ? আবার ঘন ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। প্রতিটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে এই নিষ্ফল সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আর কত শক্তি সে ক্ষয় করিবে ? সে কি এমনি শ্লথস্নায়ু যে এমন একটা অকিঞ্চিতকর বিলাসকে অস্বীকার করিয়া আবার দুর্দ্ধর্ষ জীবনস্বাদে মাতিয়া উঠিতে পারিবে না ? বিলাস বৈ কি !

এত কাছে আসিয়া রহিল, অথচ এমন কঠোর নির্লিপ্ততা—ইহার গভীরতা তলাইয়া বোঝে প্রদীপের সাধ্য কি ? সংসারকে শাসন করিবার জন্য সে এমন একটা নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া রহিল, এই দুর্ব্বলতার কদর্য্যতা প্রদীপকে দিবারাত্রি পীড়া দিতেছে। দুই বেলা রাঁধিয়া দেয়, সান্নিধ্যে সাহচর্য্যে মুহূর্ত্তের পাত্রগুলি মাধুর্য্যের রসে ভরিয়া তোলে, অথচ কী সুদূর একটি ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে কেন যে নমিতা এমন নিঃস্পৃহ নিরাকুল করিয়া রাখিল কে ইহার অর্থ বুঝাইবে ? যদি শুশ্রূষাময়ী কল্যাণী নদীলেখাটির মতই একটি স্নেহসেবাপূর্ণ মমতা লইয়া নমিতা না বহিবে, তবে সে এই ঝড়ের পথিককে নীড়ে লইয়া আসিল কেন ? প্রদীপের এক এক সময় ইচ্ছা হয় গূঢ় অপরিচয়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া নমিতাকে সে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্ধার করিয়া লয়, কিন্তু কী যে রহস্য তাহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার না মিলে সন্ধান, না বা সমাধান। প্রদীপ হাঁপাইয়া উঠিল।

সকালে দুইজনে তাহারা বেড়াইতে বাহির হয়, নদীর পার ধরিয়া অনেকটা ঘুরিয়া আসে। পল্লীগৃহগুলি যেখানে স্তূপীকৃত হইয়া আছে, সেটা দুইদিন নমিতার কাছে তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় সে সেখানে একা গিয়া একটি অর্দ্ধবৃদ্ধা নারীর মুখে তাহার কলঙ্কসূচক তিরস্কার শুনিয়া আর ঐ মুখো পা বাড়াইতে চাহে না। বিধবা হইয়া পুরুষমানুষের এই সান্নিধ্য-সম্ভোগ—ইহার একটা স্থূল ব্যাখ্যা করিয়া সেই মেয়েটা নমিতাকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। নমিতার নাকালের আর অবধি রহিল না, সে না পারিল প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল বুঝাইয়া দিতে যে তাহার গ্রামের মধ্যে দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে, তাহারা সহকর্ম্মী। দেশের লোকের অত-শত বুঝিবার ধৈর্য্য নাই, আগুনের আগে কলঙ্ক চলে। আজ সকালে নমিতাকে দেখিবার জন্য নদীর পারে লোক জড়ো হইয়াছিল।

প্রদীপ এই কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া এমন একটা সঙ্কেত করে যেন তাহাদের পরিচয় ঘনতর হইলেই এই কলঙ্ক চাপা পড়িবে, কিন্তু নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সকল সন্দেহের কুয়াসা উড়াইয়া দিয়া বলে,—মানুষের ভুয়ো কথায়ই যদি কান পাত্‌বে তবে বাইবে বেরবার আর মর্য্যাদা কী ছিল। লোকে যা বলে বলুক্। একদিন আমিই হব এদের লোকলক্ষ্মী। বলিয়াই সে নানারূপ গভীর আলোচনায় মত্ত হইয়া উঠে। কত বড় তপস্যার পুণ্যফলে যে দেশমুক্তি তাহারই গবেষণায় নমিতা অস্থির হইয়া পড়ে,- হাওয়ায় শাড়ি ও আঁচল উড়িতে থাকে, চোখে মহাভবিষ্যতের স্বপ্ন দীপ্ত হইয়া উঠে মনে হয় নমিতাই যেন সেদিনের আকারময়ী সম্ভাবনা।

প্রদীপ বলে, -ঘরে-বাইরে এ অপমান তুমি বেশী দিন সইতে পারবে না।

—খুব পারব। প্রথমত আমার পক্ষে ঘর নেই, সমস্তটাই বাহির। এবং সে বাহির যে কত প্রকাণ্ড তা আমি ধারণাই করতে পারি না। তাই ত' আত্মায় এত বিস্তৃতি অনুভব করি। আর যাকে অপমান বলছেন, সত্যিই তা অপমান নয়, প্রমাণ।

—কিসের ?

—আমি যে প্রস্তুত হ'তে পারছি তার।

—কিন্তু তোমার জন্যে শুধু-শুধু এই অপমান আমি সইতে যাবো কেন?

নমিতা চুপ করিয়া থাকে। পরে মুখ তুলিয়া বলে,—বেশ, স্বচ্ছন্দে আমাকে বর্জ্জন করুন।

—তোমাকে বর্জ্জন করবার জন্যেই এতটা পথ আসা হয় নি।

—তা হ'লে অপমান-সওয়াটা শুধু-শুধু হ'ল কি করে'?

আবার চুপ করিতে হয়। প্রদীপ প্রশ্ন করে: আর কত দিন থাকবে এখানে?

নমিতা গম্ভীর হইয়া বলে: দেখি।

এই ছোট কথাটির মধ্যে যেন বহু দিনরাত্রির প্রতীক্ষার স্বপ্ন রহিয়াছে। প্রদীপের কাছে নমিতার এই কঠোর ধ্যানময়তা সহসা বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। কাহার জন্য তাহার এই অবিচল প্রতীক্ষা এতক্ষণে সে বোধ হয় বুঝিতে পারিল। কিন্তু নামটা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহসে কুলাইল না।

সাহসে কুলাইল না বটে, কিন্তু অধিকারবোধের অহঙ্কারে সে নমিতার পরধ্যানলীন মূর্ত্তির এই নিঃস্পৃহতাও সহ্য করিতে পারিল না। প্রদীপ এমন ধরণের লোক নয়, যে সমস্যার সমাধান এক মাত্র সময়ের বিবর্ত্তনের উপর ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে; সোজাসুজি গোটা কয় তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও তাহাদের স্পষ্ট প্রখর উত্তরের উপরই তার অসীম নির্ভরতা। সেই প্রশ্নোত্তরের পেছনে অনুচ্চারিত কোনো গভীর অর্থ থাকিতে পারে কি না সে-বিষয়ের সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি নাই। তাহার ব্যবহারে যে একটা অপরিচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতা আছে তাহাই তাহাকে বেগময় করিয়া রাখিয়াছে।

তাই রাত্রে শুইবার ঘরের দরজায় খিল্ দিবার আগেই প্রদীপ ঢুকিয়া পড়িল। কম্পমান দীপশিখায় প্রদীপের এই রূঢ় আবির্ভাবে নমিতা চমকিয়া উঠিল। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—এ অসময়ে, হঠাৎ?

মাথার চুলগুলিতে আঙুল চালাইতে চালাইতে প্রদীপ কহিল,—তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

গম্ভীর হইয়া নমিতা কহিল,—বলুন্।

নমিতার কথাগুলি এমন সংযত ও স্থির যে প্রদীপের সমস্ত ভাবোদ্বেগ কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। তবু দৃঢ় করিয়াই কহিল,—আমাদের এমনি করে' আর থাকা চলবে না।

—কোথায় যেতে হবে?

—যেখানেই যাই আমাদের সম্পর্কের একটা মীমাংসা দরকার।

নমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল,—যারা সমাজবিধানকে হেয়জ্ঞান করে' বাইরে চলে' এসেছে তাদের পক্ষে আবার সমাজানুমোদিত সম্পর্কের সার্থকতা কি? অপবাদ যদি সইতে না পারি সেইটে আমাদের প্রকাণ্ড অপরাধ। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া নমিতা জিজ্ঞাসা করিল: তারপর বলুন্।

প্রদীপ কহিল,—সোজা স্পষ্ট করে'ই বলি নমিতা, আমি তোমাকে চাই।

শান্ত স্বরে নমিতা বলিল,—কথাটা আমি আগেই শুনেছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অর্থের রূপান্তর দরকার। বেশ ত, আমাকে আপনার যোগ্য করে' নিন্, কর্ম্মে, সহনশক্তিতে, আত্মোৎসর্গে। এর চেয়ে আমাকে আর বড়ো করে' পাওয়ার কিছু মানে আছে কি? নারীর মুক্তিতেই ত' দেশের মুক্তি। আমি কি সেই দেশমুক্তির মূর্ত্তি নই, প্রদীপবাবু?

বলিয়া নমিতা জানালার কাছে সরিয়া আসিল। জানালার বাহিরে নদীর উপরে অন্ধকার তরঙ্গ তুলিয়া পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে—তাহারই পটভূমিতে নমিতাকে সর্ব্ববন্ধনচ্যুতা একটি শরীরী শিখার মত মনে হইল। প্রদীপ তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল; কহিল,—তোমাকে চাওয়ার একটা কায়িক অর্থ আছে, নমিতা। সে শুধু বিহারে নয়, বিরহে। তোমাকে আমি চাই।

নমিতা হাত সরাইয়া নিয়া কহিল,—দেশের মুক্তিও ত' আপনি চান্। কিন্তু তার জন্য কতটুকু মূল্য দিলেন? হাত পেতে চাওয়ার দীনতা আপনাকে লজ্জা দেয় না? পাওয়ার জন্য যদি মূল্য না দেন তবে সে-পাওয়ায় স্বাদ থাকে কৈ?

প্রদীপ কহিল,—আমি সবই বুঝি, নমিতা। তবু আজকের এই ক্ষণটিতে মনে হচ্ছে দেশের চেয়েও বড়ো হচ্ছে প্রেম,—দশের চেয়ে বড় হচ্ছে এক। কোনো মূল্যই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।

বজ্রিয়া মূঢ় চেতন প্রদীপ নমিতাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ইহার মধ্যে কোথায় একটু অন্যায় ছিল বলিয়াই হোক্ বা প্রদীপের ব্যবহারে বর্ব্বর বন্যতা ছিল না বলিয়াই হোক্, নমিতার আকস্মিক আঘাতে প্রদীপ একেবারে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। নমিতা কহিল,—সমাজদ্রোহীদের এমন সামাজিক ব্যবহার ক্ষমার যোগ্য নয়। আপনি যে এত স্বার্থপর ও নীচ তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন। জানেন না আমি বিধবা?

মাথার সেই ক্ষতস্থানেই বোধ হয় লাগিয়াছিল; তাই প্রদীপ রুখিয়া উঠিল: আর যার মানাক্, তোমাকে এই সতীত্বের আস্ফালন শোভা পায় না। তুমি যা তুমি তাই। সমাজের হাটে তোমার নারীত্ব একটা পণ্য মাত্র। কিন্তু কাল সকালে তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি চলে' যেয়ো, তোমার ওপর আমার দায়িত্ব নেই।

নমিতা খালি একটু হাসিল।

সকালে যাইবার জন্য নমিতা প্রস্তুত হইতেছিল কি না কে জানে, কিন্তু যাওয়া আর হইল না। শেষরাত্রি থাকিতেই পুলিশে আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়াছে। (ক্রমশঃ)

একটি প্রাচীন স্তম্ভচূড়া

[শ্রীঅচ্যুতকুমার মিত্র]

ভুবনেশ্বর রেল ষ্টেশন হইতে নামিয়া সেনেটারিয়ামের দিকে যাইতে বাঙ্গালী পর্য্যটকেরা অবশ্য পথের ডান দিকে রামেশ্বর মন্দিরটি দেখিয়া থাকিবেন। কারুকার্য্য হিসাবে এই মন্দির লিঙ্গরাজ, মুক্তেশ্বর, অনন্তবাসুদেব প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির সহিত তুলনীয় নহে। ইহা উড়িষ্যার মধ্য যুগের শিল্পকলার অবসন্ন অবস্থার অন্যতম নিদর্শন। ইহার পশ্চাতে অনতিদূরে অশোককুণ্ড নামে পরিচিত একটি বিশুষ্ক বাপী আছে।

১৯২৪ সালের অনুমান ফেব্রুয়ারী মাসে যখন অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তি-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাই, তখন এই অশোককুণ্ডের তটে রক্ষিত একটি সুপ্রাচীন স্তম্ভচূড়ার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ব্যাপারটা কতকটা আকস্মিক ভাবে ঘটে। দিনের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। অশোককুণ্ডের চারিদিকে কতকটা বনাকীর্ণ স্থান; সমস্ত জুড়িয়া গাঢ় অন্ধকার নিস্পন্দ হইয়া আছে, ঊর্দ্ধে আকাশে একটি একটি করিয়া তারা দেখা দিতেছে। একখানি না বা ... উপর বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সকালে ... ছিলাম, ঠিক মনে নাই। ভুবনেশ্বরের মত স্থানে, যেদিকেই চক্ষু যায় প্রাচীন যুগের শিল্পসমৃদ্ধির অপর্য্যাপ্ত নিদর্শনের মাঝখানে, নির্জ্জনে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় স্বভাবতঃই মনে আসে—

'Thy tread is on an empire's dust!' কে জানে পদতলে মাটির নীচে কত বিস্মৃত রাজপ্রাসাদ, কত শিল্প কীর্ত্তির নিদর্শন প্রোথিত হইয়া আছে!

সেদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার কাটিয়া গিয়া কখন ধীরে ধীরে চাঁদের আলো দেখা গেল জানিতেও পারি নাই। সহসা দেখিলাম সম্মুখেই একটি সুবৃহৎ স্তম্ভচূড়া! (চিত্র) কলিকাতা এবং সারনাথের মিউজিয়মে রক্ষিত সম্রাট অশোকের পশুলাঞ্ছিত শিলাস্তম্ভসমূহের চূড়ার অনুরূপ। বিস্ময়ে কতকটা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অনতিদূরে কতকগুলি প্রাচীন প্রাসাদপরিখার ধ্বংসাবশেষের কথা মনে হইল। অবশ্য এগুলি অনেক পরবর্ত্তীকালের। কিন্তু কে জানে লোকবিশ্রুত ট্রয়নগরীর মত তাহার ভিত্তিনিয়ে প্রাচীনতর প্রাসাদ বা দেবায়তন সমূহের স্তরবিন্যস্ত ধ্বংসাবশেষ প্রোথিত আছে কি না!

কাছে গিয়া দেখিলাম, মৌর্য্যশিল্পীরা চুণারের যে বেলে পাথরে কাজ করিতেন চূড়াটি তাহাতে খোদিত হয় নাই।

ইহার গাত্রে মৌর্য্যশিল্পনিদর্শনসমূহে সচরাচর দৃষ্ট উজ্জ্বল বার্ণিশও নাই। সেই অস্পষ্ট আলোকে ইহার চেয়ে বেশী দেখা গেল না।

সে রাত্রে ভুবনেশ্বরের ডাক বাংলায় ফিরিয়া চন্দ মহাশয়কে এই প্রাচীন স্তম্ভচূড়ার কথা বলায় তিনি বিস্মিত হইলেন। পরদিন দিনের আলো ভালো করিয়া দেখা দিবার পূর্ব্বেই আমরা অশোককুণ্ডের ধারে উপস্থিত হইলাম। ফিতা ফেলিয়া মাপ লওয়া হইল। চূড়াটির পুষ্পাকার অংশের বৃহত্তম পরিধি প্রায় ১৯ ফিট ৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ২ ফিট ৮ ইঞ্চি। অধস্তন অংশে হস্তি সিংহ, হংস পদ্মাদি শোভিত একটি পুষ্পবল্লী খোদিত হইয়াছে। এই অংশের উচ্চতা ৫ ইঞ্চি। উপরের বলয়াকার গঠনটি ৯ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার ঊর্দ্ধে পীঠিকার (abacus) ভগ্নাবশেষ উচ্চতায় ৬ ইঞ্চি। তদূর্দ্ধে একটি পশুমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

নির্ম্মাণকাল

এই স্তম্ভচূড়ার গাত্রে কোন প্রাচীন শিলালেখ দেখিতে পাই নাই। সুতরাং ঠিক কোন সময়ে কে বা কাহারা কোন স্তম্ভের উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং কোন শিল্পীর দ্বারা ইহা খোদিত হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে প্রত্নতত্ত্বসম্মত অন্যান্য উপায় দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ-কাল অনুমিত হইতে পারে। অশোকের শিলাস্তম্ভগুলির চূড়ার সহিত নবাবিষ্কৃত চূড়াটির সৌসাদৃশ্যের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এ স্থলে কতকগুলি পার্থক্যের বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসঙ্গত হইবে না।

এই চূড়াটির পুষ্পাকৃতি অংশে যে রজ্জুবৎ আলম্বিত শরাগ্রনিম্ন নক্সাগুলি আছে, তাহা কোন মৌর্য্যস্তম্ভেরই চূড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীর নির্ম্মিত কোন কোন চূড়ায় সর্ব্বতোভাবে এক না হইলেও অনুরূপ নক্সার পার্থক্য দেখা যায়। বলয়াকার অংশটির নক্সাও খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে রচিত ভারহুতের প্রসিদ্ধ বেদিকাগাত্রে খোদিত কতিপয় স্তম্ভচূড়ায় দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বে যে বল্লীটির কথা বলা হইয়াছে তাহার খোদনপদ্ধতির সহিত আবার বুদ্ধগয়ার প্রাচীন বেদিকার নক্সার খোদন-রীতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত বেদিকা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয় ভুবনেশ্বরের স্তম্ভচূড়াটি বুদ্ধ-গয়ার বেদিকার সমসাময়িক। কিন্তু জগৎগয়পেটের বেদিকা-গাত্রে খোদিত কতকগুলি স্তম্ভচূড়ার সহিত ইহার অলঙ্কারা-দির তুলনা করিয়া ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী স্থির করিয়াছেন যে ইহার নির্ম্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ হইতে প্রথম শতক।

স্তম্ভের অবস্থান

এই চূড়াটি যে স্তম্ভের শীর্ষদেশে বিরাজ করিত তাহা কোথায় অবস্থিত ছিল নির্ণয় করা সুকঠিন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভুবনেশ্বরের যাত্রীমাত্রেই অবগত আছেন যে ভাস্করেশ্বর মন্দিরের নিম্নতলে একটি হরিদ্রাভ বেলে পাথরের অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভ দেখা যায়। যতদূর স্মরণ হয় ইহার গাত্রে মৌর্য্যস্তম্ভের মত উজ্জ্বল বার্ণিশ দেখা যায় না। ইহা চুণারের প্রস্তরখনি হইতে আনীত অথবা স্থানীয় কোন প্রস্তরে নির্ম্মিত তাহা ভূতাত্ত্বিকেরা বলিতে পারেন। বন্ধুবর নির্ম্মলকুমার বসু অনুমান করেন যে এই চূড়াটি প্রাচীনকালে উক্ত স্তম্ভেরই শোভা বর্দ্ধন করিত। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে চূড়াটি উক্ত স্তম্ভের মত হরিদ্রাভ বেলে পাথরে খোদিত নহে; কোনরূপ একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর কাটিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। একই স্তম্ভের সূচীর জন্য একরূপ এবং চূড়ার জন্য অন্যরূপ প্রস্তরের ব্যবহার বসুজ মহাশয় কোথাও দেখিয়াছেন কিনা উল্লেখ করেন নাই।

এস্থলে তাঁহার অনুমান যুক্তিসঙ্গত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে।

চূড়ার পরিকল্পনা

জেম্‌স্ ফারগুসন, স্যর জন মার্শাল প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের অনতিকাল পূর্ব্বে পারস্যের হকমেনিদীয় (Achæmenid) রাজগণের প্রাসাদ সভাগৃহাদিতে যে শিল্পধারা লক্ষিত হয় মৌর্য্য স্তম্ভচূড়ার পরিকল্পনা তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ও বর্ত্তমান লেখক কয়েকটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে হকমেনিদীয় (Achæmenid) প্রাসাদগুলির স্তম্ভের তলদেশে যে ঘণ্টাকৃতি পীঠিকা আছে প্রাচীন ভারতীয় স্তম্ভচূড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। ঠিক কোন্ সময়ে এই চূড়ার পরিকল্পনা ভারতে আসিয়াছিল, সমসাময়িক লিখিত প্রমাণের অভাবে তাহা স্থির করা সুকঠিন। কাহারও কাহারও মতে হকমেনিদীয় রাজগণ যখন সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রত্যন্ত ভাগ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, সেই সময়েই বা তাঁহাদের রাজত্বকালে কতকগুলি পারসীক নক্সা ভারতে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ সময়ে পঞ্চনদের পূর্ব্বে পারসীক শিল্পের অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। অপর পক্ষে মৌর্য্যাধিকার কালের যে সকল শিল্পনিদর্শন সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ সমূহে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অল্প বিস্তর পারসীক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে, বিশেষতঃ দিগ্বিজয়ী অলীকসুন্দরের (Alexander) সমরাভিযানের ফলে পশ্চিম এসিয়া, পারস্য এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায় এবং সভ্যতামূলক যে সকল আদান-প্রদান ঘটে, তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় হকমেনিদীয় শিল্পের একটি ধারা উত্তরাপথে এবং মগধে আসিয়া পড়ে এবং ইরাণী ও ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যে যে সকল সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা এরূপ আদান-প্রদানেরই ফল। উত্তরকালে সাঁচী, সারনাথ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি মৌর্য্যশিল্পের কেন্দ্রগুলি হইতে ভারতের অপরাপর প্রদেশে ঐ সকল নক্সা বিভিন্ন সময়ে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

বৌলি শিলালেখের উপরিভাগে যে অসমাপ্ত গজমূর্ত্তিটি আছে তাহা মৌর্য্যশিল্পীগণেরই অন্যতম কীর্ত্তি। তদ্দৃষ্টে মনে হইতে পারে যে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই তাঁহার সাম্রাজ্যের শিল্পরীতি উড়িষ্যায় পৌছিয়া যায় এবং এই স্তম্ভচূড়াটি উক্ত শিল্পরীতিরই স্থানকালাত্মক পরিবর্ত্তনের ফল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ভুবনেশ্বরে বা তাহার সমীপে কোন মৌর্য্যযুগেরই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে না। পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে উড়িষ্যার রাজা খারবেল দক্ষিণ কোশল এবং মগধে অভিযান করিয়াছিলেন। উদয়গিরি খণ্ডগিরির গুম্ফাগুলি তাঁহার এবং তদ্বংশীয়গণেরই কীর্ত্তি। এই সকল গুম্ফার বিভিন্ন অংশের শোভাসম্পাদনার্থে যে সকল মূর্ত্তি ও নক্সাদি রচিত হয় তৎসমুদায়ে আর্য্যাবর্ত্তের সমসাময়িক শিল্পরীতির বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে উত্তরাপথের শিল্পের মধ্যে মৌর্য্যরীতি কতকটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল; পাটলিপুত্রে, বিশেষতঃ সারনাথে ইহার বহুল প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে আবিষ্কৃত এবং খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুম্ফাসমূহে খোদিত স্তম্ভচূড়াগুলিতে ভুবনেশ্বরের স্তম্ভচূড়ার মতই অশোকস্তম্ভের চূড়া হইতে অল্পবিস্তর নক্সার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে খারবেলের রাজ্যকালে উড়িষ্যার শিল্পে উত্তরাপথের প্রভাব দ্বিতীয় বার নূতন করিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং নবাবিষ্কৃত চূড়াটি উদয়গিরি খণ্ডগিরির গুম্ফাসমূহে পরিলক্ষিত শিল্পকলারই অন্যতম নিদর্শন।

পরিণাম

[শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

অন্ধকার নিশীথ-আকাশে,
অশনির অগ্নি-কণা হাসে ;
তা'রি মাঝে হেরিলাম রাগিণী সে অভিরাম
মর্ম্মরিছে তারার অক্ষরে—
যে-সুর শুনিয়াছিনু একদিন হেনার অন্তরে।

*

অরণ্যে, সজল তৃণ দলে,—
তুষারের পাখা মেলি' চলে
চরণ-পল্লব তব,— বিকশিয়া নব নব
রক্তিম, নীলিম কত ফুল ;—
শিহরি' খুলিয়া গেল, বেণী তব মেঘাশ্রু-ব্যাকুল।

সে-অরণ্যে অরুণ-তুফান,
ধরেছিল দীপকের তান !
ছায়ায় লুটায়ে কেশ ধরি নির্ঝরিণী-বেশ
চলেছিলে আলোকের পাশে,
আবেশ-মন্থর তনু, নিমীল নয়ন তবু হাসে।

হেনার মুগ্ধ-শিহরণে
আন্দোলন জেগেছিল বনে।
তোমার স্পন্দিত বুকে বেজেছিল মহাসুখে
যৌবনের মদির ঝঙ্কার,
সর্পিল বেণীটি তব কেয়া-গন্ধে হ'ল একাকার।

আদিম সে রূপভার তব,
ধ্যানবলে ফিরে আমি লবো।
হরিণী-চাহনি সেই কোনোখানে নাচিবেই
কোথাও সে আছে আমি জানি,
সেই তব রূপ-নীরে ভরি লবো মোর শঙ্খখানি।

*

আজি দূর আকাশ আঁধারে
হেরিলাম হারানো তোমারে।
চাহনির নীল-মায়া দীঘিজলে ধরে' ছায়া—
কাঁপে ওই বঙ্কিম ভ্রূ-ধনু !
আবিষ্ট অম্বরতলে স্পন্দমান তব রূপতনু।

আজি মোর মিলন-বিরহ,
হরিয়াছে দূর গন্ধবহ।
হংস-শুভ্র ছায়া পথে উন্মাদ রজনী-রথে
সেই সুর শুনি পুরাতন—
রাত্রি হ'য়ে আসে শেষ, কাঁপে দূরে লজ্জাবতী বন।

যৎসামান্য

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়]

জীবনের রহস্যের আর অন্ত নাই।

স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই বাস করিতেছিল, দিব্যি ফুটফুটে চমৎকার একটি ছেলে, একটি মেয়ে,—সংসারে অভাবদৈন্য কিছুই নাই, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে কি যে হইল কে জানে, বাহিরের লোক কেহ কিছুই জানিল না,—স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

অন্য দেশ কিম্বা অন্য জাতি হইলে এই ছাড়াছাড়িটা হয়ত পাকাপাকিই হইয়া যাইত, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে সে ব্যবস্থা নাই বলিয়াই হোক্ কিম্বা কেলেঙ্কারীর ভয়েই হোক্, পাকাপাকি ব্যবস্থা কিছুই হইল না,—স্বামী রহিলেন শ্যামবাজারে আর স্ত্রী রহিলেন ভবানীপুরে।

মাসের প্রথমে স্বামীর বাসা হইতে একটা চাকর আসে স্ত্রীর বাসায়। কিছু টাকা দিয়া রসিদ লিখাইয়া লইয়া যায়। এই তাহাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধ।

যাই হোক, ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতেই বা দোষ কি!

বাসুদেব বলিয়া একটি ছোক্‌রা ভবানীপুরে নলিনীর বাসায় প্রায়ই যাওয়া-আসা করে। ছোক্‌রাটি লম্বা—দোহারা গোছ, চেহারাখানি মন্দ নয়, সাজ-পোষাক, চাল-চলন দেখিলে মনে হয়—ছোক্‌রার পয়সাকড়ি কিছু আছে। আগে সে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই নলিনীর বাসায় পড়িয়া থাকিত, কিন্তু আজকাল তাহার আসা-যাওয়া যেন কমিয়াছে। না আসিলে যেন নয় বলিয়াই আসে।

বাসুদেব সেদিন আসিয়া দেখিল, নলিনী বাড়ী নেই। বড় ছেলেটা তাহার উঠানের মাঝখানে একটা দড়ি ধরিয়া লাফাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রে—তোর মা কোথায়?'

'মা?' বলিয়া ছেলেটা তাহার এই কাকাবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'টুনুকে নিয়ে মা বেড়াতে গেছে কাদের বাড়ী। এক্ষুনি আসবে।'

বারান্দায় ক্যান্‌ভাসের একটা ডেক্-চেয়ার পড়িয়া ছিল, বাসুদেব তাহারই উপর বসিয়া পড়িল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলিল, 'আসুক'।

প্রায় দিন দশ-পনের সে আসে নাই। একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া বাসুদেব তাহার হাতের ইসারায় ছেলেটাকে কাছে ডাকিল,—'আরে এই মণ্টু, শোন্!'

দড়ি হাতে লইয়াই ছুটিয়া মণ্টু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—কালো কোঁক্‌ড়ানো একমাথা চুল, সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, চোখ দুটি বড় চমৎকার!

'ভাল আছিস্ তোরা? তোর মা ভাল আছে?'

'হ্যাঁ! ভাল আছে না ছাই! দিনরাত খিট্‌মিট্ করছে।'

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে কথাগুলা বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল। বাসুদেব তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।—'বাস্‌নে, শোন্।'

একা বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, মণ্টুর কাঁধে হাত দিয়া কি যে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাসুদেব একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল।

শহরের এই প্রকাণ্ড বাড়ীগুলার আড়ালে আকাশের প্রান্তসীমায় তখন বোধকরি সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। তাহারই রাঙা একটুখানি আলো এই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া কোনরকমে কোন্ ফাঁকে যেন কোথা হইতে ছিট্‌কাইয়া ছেলেটার মুখে আসিয়া লাগিয়াছে। মণ্টুকে এত সুন্দর কোনোদিনই তাহার মনে হয় নাই। নলিনীর সেই প্রথম যৌবনের অম্লান প্রফুল্ল সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি তাহার মনে পড়িল। এ মুখে যেন তাহারই আভাস রহিয়াছে।

মুগ্ধনেত্রে কিয়ৎক্ষণ সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকিয়া বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিল, 'পড়াশোনা করছ ত' ভাল করে?'

'হ্যাঁ, স্কুলে যাই। মা'র কাছে গান শিখি। টুনুও শেখে।' বলিয়াই সে তাহার দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি ক্ষুর দিয়ে এইখানটা কামিয়েছেন, না কাকাবাবু?'

'হ্যাঁ।'

হাত বুলাইতে বুলাইতে মণ্টু বলিল, 'তাই মনে হচ্ছে।'

তাহার পর মাথার একগোছা চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'লাগছে আপনার?'

'না।'

'আচ্ছা, এমন কেন হয় বলুন ত' কাকাবাবু? এই—একগোছা চুল ধরে' টানলে লাগে না; আর এই একটি চুল ধরে' টানলে লাগে কেন বলুন ত?'

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মণ্টু তাহার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'আপনার গোঁফ নেই; আচ্ছা গোঁফ আপনি রাখেন না কেন কাকাবাবু?'

কাকাবাবু জবাব না দিয়া শুধু হুঁ হাঁ করিতে লাগিল। মণ্টু কিন্তু প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না।

'আপনার এই ঘড়িটা সোণার না? হাই-ইস্কুলে যখন পড়ব, মা তখন আমায় একটা এমনি কিনে দেবে বলেছে। ...বাবার এমনি একটা ঘড়ি আছে। শুধু—আপনার এই কাঁটাদুটো সোণার তৈরি, না? আর—বাবার ঘড়িটা সোণার, কিন্তু কাঁটাদুটো লোহার। বাবা আগে কিন্তু চেন-ঘড়ি পরতেন,—জামার এই বুক-পকেটে আটকানো থাকতো। তাতে আবার একটা 'লকেট্' ঝুলতো। লকেট্টা কিন্তু ভারি সুন্দর। খুট্ করে' খুলে দেখতাম, তার ভেতরে মা'র একটা ছবি রয়েছে।...আজকাল কিন্তু কই সেটা আর পরেন না, হাতে শুধু এই এম্নি একটা হাত ঘড়ি বাঁধা থাকে।'

কথাটা ধক্ করিয়া গিয়া তাহার কানে বাজিতেই বাসুদেব সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। মণ্টুর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'কেমন করে' জান্লি? দেখা হয় তোর বাবার সঙ্গে?'

'বাবার সঙ্গে?...উম্...ন্ না।'

ঘাড় নাড়িয়া মণ্টু আবার বলিল, 'না।' মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখখানা তাহার আরও লাল হইয়া উঠিল। মিথ্যা বলিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেলে মানুষ যেমন অপ্রতিভ হইয়া ওঠে, ঠিক সেই রকম অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া মাথা হেঁট করিয়া বাসুদেবের জামার একটা বোতাম ধরিয়া মিছামিছি টানাটানি করিতে লাগিল।

বাসুদেবেরও মুখখানা সহসা কেমন যেন অন্য রকম হইয়া গেল। একাগ্রদৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের পানে তাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল।

'বাবার সঙ্গে তোর দেখা হয় নাকি? হ্যাঁরে? সত্যি কথা?'

মণ্টু শুধু ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাসুদেব দেখিল সহজে সে বলিবে না। পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, 'ছি, মিছে কথা বলে না! বল ত' লক্ষ্মী, দেখা হয় তোমার বাবার সঙ্গে। না? লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের দেখে যান। কেমন? হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।' বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বাসুদেব তাহার মুখখানা মণ্টুর মুখের কাছে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কবে দেখা হয়েছিল?'

মণ্টু তখনও ইতস্ততঃ করিতেছে।

বাসুদেব আবার তাহার মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মণ্টু মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'মাকে বলবেন না ত?'

বাসুদেব বলিল, 'পাগল! কিছুতেই বলব না।'

'দিব্যি করুন!'

'হ্যাঁ, দিব্যি গাল্লাম।'

'না, অমন করে' নয়। আমার মাথায় হাত দিয়ে বলুন।'

'এই নাও, তোমার মাথায় হাত দিয়েই বলছি বলব না।'

'বলুন—কালীঘাটের কালীর দিব্যি।'

'হ্যাঁ, কালীঘাটের কালীর দিব্যি।'

মুখের কাছে হাতের একটা আঙুল নাড়িয়া মণ্টু বলিল, 'কা—উকে বলতে পাবেন না।'

'না কারুকে বলব না।'

মণ্টু একবার এদিক-ওদিক তাকাইল, তাহার পর চোখ দুইটা তাহার বড় বড় করিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'বলে' দিলে দেন ত' আমি মার খাব, টুনু মার খাবে, চাকরটা ত' খাবেই।......রোজ নয়, রোজ ত' দেখা হয় না,—শনিবার আর রবিবার—বিকেল বেলা। চাকরটাকে বাবা সেদিন একটা টাকা দিয়েছেন। ......ওই যে মোড়ের মাথায় চুল-কাটার দোকানটা, তারই পাশে একটা চপ্-কাট্‌লেটের দোকান আছে না? ওই ওরই ভেতর ছোট্ট একটা কাঠের ঘর—পর্দাটা ফেলে দিলে আর কেউ দেখতে পায় না। বেড়াতে যাবার নাম করে' চাকরটা আমাদের নিয়ে যায়। আমি হেঁটে হেঁটেই যাই, টুনু হাঁটতে পারে না কিন্তু চাকরটাকে খালি-খালি তাকে কোলে নিতে হয়। সেখানে গিয়ে দেখি, বাবা ঠিক চুপটি করে' চেয়ারের ওপর বসে' আছেন।'

বাসুদেব একটা ঢোঁক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি, কর তোমরা?'

'কিছু না। আমাদের দেখেই বাবা হেসে হেসে হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে নেন। আমি একটা পায়ের ওপর বসি, আর টুনু আর একটা পায়ের ওপর বসে। তারপর দোকানদারটা আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। আমি নিজেই খাই, টুনু ভারি বোকা মেয়ে, বাবাকে খাইয়ে দিতে হয়।'

'কি সব কথা হয় তোমাদের?'

'কথা?—অনেক কথা। বাবা আমাদের একটা ঘোড়া কিনে দেবেন বলেছেন। বড় হ'লে আমি বাবার কাছে গিয়ে থাক্‌ব। টুনীটা কিছুতেই যেতে চায় না। মাকে ছেড়ে ওটা থাক্‌তে পারবে না কিছুতেই।......বাবাকে কিন্তু এইবার চশমা নিতে হবে—সেদিন বলছিলেন। আমি বল্‌লাম, সোনার, বাবা বল্‌লেন, না, সেই কালোরঙের, মোটা-সোটা গোল-গোল।'

'কেন? চশমা কেন? চোখে দেখতে পাচ্ছেন না?'

'ধেৎ! তা কেন হবে? ঘাড় হেঁট্ কর্‌লেই বাবার চোখ দিয়ে আজকাল জল গড়াচ্ছে। আমাদের চুমু খেতে গিয়ে খালি-খালি রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে হয়। আমি ত' সেদিন মনে করেছিলাম বাবা কাঁদছেন।'

বলিয়াই ঈষৎ হাসিয়া মণ্টু আবার আরম্ভ করিল।—'আচ্ছা মা কেন বাবার কাছে যায় না, বলুন ত' কাকাবাবু? বাবা ত' খুব ভাল মানুষ।......বাবা কিন্তু মাকে খুব ভাল-বাসেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

বাসুদেব বলিল, 'হুঁ। কেমন করে' বুঝলে?'

মণ্টু বলিল, 'বা, তা নয় ত' কী? বাবা রোজ জিজ্ঞেস্ করেন, তোমার মা কেমন আছে, কি করছে......তারপর হ্যাঁ, সেইদিন......সেই যেদিন মা'র অসুখ করেছিল? বাবাকে বল্‌লাম। বাবা তখন কি কর্‌লে জানেন? খানিক-ক্ষণ ভেবে নিজের চুলগুলোকে বাবা এমনি করে' করে' টান্‌তে লাগলেন।'

বলিয়া সে তাহার নিজের চুলগুলাকে একবার তেমনি করিয়া টানিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'তারপর আমাদের সঙ্গে ত' সেদিন ভাল করে' কথাই বল্‌লেন না, সেই ছোট্ট ঘরটার ভেতর পায়চারি করে' বেড়াতে লাগলেন।...আচ্ছা দেখুন কাকাবাবু, আমরা সত্যিই হতভাগা, না?'

বাসুদেব মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কের মত বলিল, 'হুঁ। কেন?'

'হ্যাঁ। বাবা ত' তাই বলেন। বাবা বলেন, তোর মার মনে সুখ নেই, আমার মনে সুখ নেই, তোরা বড় হত-ভাগা রে, তোদের কপাল বড় মন্দ।'

বলিয়া সে তাহাদের উঠানের উপর উড়ন্ত ছোট একটি পাখীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাসুদেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সহসা বলিয়া উঠিল।—'হুঁ! চমৎকার! এমনি করে আজকাল তাহ'লে তোমাদের......আচ্ছা, হাঁরে মণ্টু, আমার সম্বন্ধে তোর বাবা কিছু বলেনি?'

মণ্টু আবার ইতস্তত করিতে লাগিল। 'বল্ না আমি কাউকে বলব না।'

মণ্টু বলিল, 'না আপনি রাগ করবেন না বলুন।'

'না, রাগ কেন করব?'

মণ্টু বলিল, 'বাবা সেদিন বলছিলেন, তোর কাকাবাবা আসে? আমি বল্‌লাম, হ্যাঁ আসে, রোজই আসে

আমাদের খুব ভাল বাসেন, খাবার এনে' দেন…। বাবা বল্লেন, না রে বোকা ছেলে, ভাল-বাসে না। ওর সব চালাকি! ও লোকটা ভাল নয়। ওই তোদের সর্ব্বনাশ করেছে। বাস্, আর কিছু বলেন নি।'

'হুঁম্!' বলিয়া মণ্টুকে হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বাসুদেব উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঠিক পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত বারান্দার উপর পায়চারি করিতে করিতে বলিল, 'হুঁ, আমিই তোদের সর্ব্বনাশ করেছি,—না কী বলেছে রে মণ্টু?'

নিতান্ত অসহায়ের মত মণ্টু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বা, এই যে আপনি রাগ করবেন না বল্লেন কাকাবাবু?'

সে-কথার কোনও জবাব না দিয়া বাসুদেব আবার পায়চারি করিতে লাগিল।

খানিক্ পরেই দরজার বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ!

'মা এসেছে।' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া মণ্টু দরজা খুলিয়া দিল।

নলিনী আসিল আগে-আগে—পায়ে জরি-দেওয়া ভেল্‌ভেটের নাগ্‌রা, মাথায় লেশ্-পিন্ দিয়া আট্‌কানো ছাপা সিল্কের শাড়ী, আলুথালু অযত্নবিন্যস্ত মাথার চুল, চোখ দুইটি রহস্যে ভরা! পশ্চাতে টুনুকে কোলে লইয়া চাকর।

ছুটিয়া লাফাইয়া হাসিতে হাসিতে মণ্টু তাহাদের আগে-আগে আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালাইয়া দিল।

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কিগো, কতক্ষণ?'

বাসুদেব জবাব দিল না, গম্ভীরভাবে তেমনি পায়চারি করিতে করিতে উন্মাদের মত দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হুঁ, ঠিক্! আমিই শয়তান! আর কারও দোষ নেই। ঠিকই বলেছে সে।'

'পাগলের মত ও কি বল্‌ছ কি তুমি?'

বলিয়া হাসিয়া নলিনী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কী বল্‌ছি?' আঙুল বাড়াইয়া বাসুদেব বলিল, 'জিজ্ঞেস্ কর তোমার ওই ছেলেকে।—হুঁ! ঠিকই বলেছে। শয়তান পাজি যদি কেউ থাকে ত' সে—আমি। আমিই তোমায় নষ্ট করেছি, তোমার সর্ব্বনাশ আমি করেছি, তোমার ছেলেদের সর্ব্বনাশ আমিই করেছি। তোমাদের মনে সুখ নেই, তোমরা অসুখী,—আর সুখ বল্‌তে যা কিছু, সে শুধু আমার। জগতের মধ্যে সুখী যদি কেউ থাকে ত' সে শুধু—আমি। বুঝলে নলিনী? আঃ কী সুখ! বাপ্‌রে বাপ্! আমার সুখের আর অন্ত নেই।'

নলিনী এতক্ষণ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়াছিল, বলিল, 'কি যে ছাই বল তুমি……কি ব্যাপার কি খুলেই বল না তাই ভাল করে'।'

'ওই ওর কাছে শোনো গিয়ে!' বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া আবার সে মণ্টুকে দেখাইয়া দিল।

মণ্টুর মুখখানি তখন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। নলিনী পিছন ফিরিয়া ছিল, মণ্টু তাহার হাতের একটি আঙুল নিজের ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভয়ে-ভয়ে তাহাকে চুপ করিবার ইসারা করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,

'কাকাবাবু! স্-স্-স্!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে নলিনী একবার বাসুদেবের দিকে একবার মণ্টুর দিকে আবার একবার বাসুদেবের দিকে ঘন-ঘন তাকাইতে লাগিল।

বাসুদেব বলিল, 'ওকে জিজ্ঞেস্ কর। তোমার ওই বোকা বদ্‌মাস্ চাকর—রোজ ওদের কোথায় নিয়ে যায় জিজ্ঞেস্ কর। রাস্তার ধারে ওই যে ওই রেস্তোরাঁটা,—ওইখানে গিয়ে বাপের সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে আসে। করুক, তাতে দোষ নেই, সেকথা বলছিনে। আসল কথা হচ্ছে—তোমার স্বামীর ওপর আমি অত্যাচার করেছি। আমি শয়তান, আমি পাজি,—আমিই তোমাদের দুজনের জীবন নষ্ট ক'রে দিয়েছি, তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি।'

মণ্টু ততক্ষণে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছোট হাতখানি বাড়াইয়া ভয়ে-ভয়ে সে একবার বাসুদেবের হাতখানি নাড়িয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু মা তাহার মুখের পানে তাকাইতেই কিছুই সে বলিতে পারিল না, ঠোঁট দুইটি একবার কাঁপিল মাত্র।

নলিনী বলিল 'হাঁরে মণ্টু, দেখা হয় তোর বাবার সঙ্গে?'

মণ্টু তখন ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেছে। ছেলের মুখের চেহারা দেখিয়া নলিনী আর তাহার জবাবের অপেক্ষা করিল না। বলিল,

'অসম্ভব। আচ্ছা, দাঁড়াও আমি চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে' আসি।'

বলিয়া সে দ্রুত পদে বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মা চলিয়া গেল দেখিয়া মণ্টু আবার তাহার কাকাবাবুর কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল,

'বলব না বলে' আপনি……'

'যা যা—দূর হ' এখান থেকে, যা বেরো!'

বলিয়া বাসুদেব তাহাকে হাত দিয়া একরকম জোর করিয়াই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বারান্দার এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিজের চিন্তায় সে এত বেশি নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, ছেলেটা যে সেখানে বিমর্ষমুখে দাঁড়াইয়া আছে সেকথা তাহার একটিবারের জন্যও মনে হইল না।

নলিনীর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ; ছেলেমেয়ের কথা তাহার কোনোদিনই মনে হয় নাই কেনই বা হইবে?

নিজে বড় হইয়াছে, লম্বা-চওড়া জোয়ান্ সুপুরুষ,—ভদ্রলোক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, ওই অতটুকু ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভাবিবার অবসরই বা তাহার কোথায়!

বেচারা টুনু!

বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সে ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া ইহার উহার মুখের পানে তাকাইতেছিল।

মণ্টু তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বলিল, 'দেখলি, কাকাবাবু কেমন দুষ্টু।' বলিতে বলিতে ঠোঁট দুইটি তাহার কাঁপিয়া উঠিল, আরও কি যেন সে বলিতে গিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্য কথাও যে অনেক সময় গোপন করিতে হয়—ছেলেটা তাহার জীবনে যেন এই প্রথম বুঝিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাহার মনে হইল যে, চপ্, কাট্‌লেট্ পেয়ারা লেবু লজেন্স, সোণার চেন এবং হাতঘড়ি ছাড়াও দুনিয়ায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহার কথা,—সে ছেলেমানুষ, সুতরাং জানিতে তাহার এখনও অনেক দেরি! *

* শেষৰ।

বসন্তের অভিনন্দন

[শ্রীকালিদাস রায়]

একাই আমি এসেছি ভাই পাইনি কারেও সাথে,
তোমার কথা এরা সবাই উড়ায় উপেক্ষাতে।
কবে আসো কবে যে যাও খোঁজও নাহি করে,
এক ঋতুতে লঘূকরণ করেছে বৎসরে।
শীতেও এরা কাঁপে না তাই ভিজে না বর্ষায়,
গ্রীষ্মকালেও গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিতে না চায়।
বনের পানে চায় না এরা রোধে মনের দ্বার,
কেমন ক'রে চিনবে তোমায় হে বন্ধু আমার?

আম-মুকুলে সাজায়নি কেউ তোমার বরণডালা,
অশোকবাসকস্তবকে হায় কেউ রচেনি মালা।
কর্ম্ম হ'তে লয়নি কেড়ে দু'দিন অবকাশ,
কুসমফুলে রাঙায়নি কেউ উত্তরীয় বাস।
অগুরুধূপসৌরভে আজ ভরেনি সমীর,
তোমায় ঘেরি বাজবেনা ভাই লসিত মঞ্জীর।
হিন্দোলাতে আন্দোলিত হবেনা উদ্যান,
নান্দা তোমার গাবেনা ভাই সিন্ধুকাফীর তান।
এরা বলে, "কিসের এত ঘটার অভিনয়?
সময় পেলেই গাই নাচি-তো, কাজ ফেলে কি হয়?"

ভালই হ'লো, কেউ আসে নাই, কিসের তাতে শোক,
তোমায় আমায় এই সুযোগে মনের কথা হোক।
কহ তুমি ফাগে অরুণ কল্প-লোকের কথা,
স্বপ্ন-যুগে কেমন ছিল তোমার বোধন-প্রথা।
বল তুমি কবিরা সব গেয়ে তোমার স্তব,
কেমন ক'রে বাড়াত' ভাই অতিথিগৌরব,
তাদের রঙীন উষ্ণীষে আর কর্ণযুগল 'পরে,
কেমন ক'রে পরিয়ে দিতে মুকুল সমাদরে।
পলাশতোড়া ছুড়ে তোমায় মারত বিলাসবতী,
কেমন ক'রে ঘুঙুর ওপায় পরিয়ে দিত রতি।
কেমন ক'রে দিয়ে অরুণ করতালির তাল,
নাগরীদের নৃত্য-লীলায় ছড়াতে প্রবাল।
কেমন ক'রে ভাঙতে তুমি রুক্ষ যোগীর তপ,
শিখাতে তার অক্ষমালায় অপ্সরানাম জপ।
সে সব কথা বল শুনি কূজনে গুঞ্জনে,
আজ সোনালি স্বপ্নে ভরা কর্ণিকারের বনে।
তোমার লাগি হয়নি মিতা কোনই আয়োজন,
ধর শিথিল ছন্দে-গাঁথা এ অভিনন্দন।

ম্যালেরিয়াতঙ্ক

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়]

১০ই ও ১১ই এপ্রিলের "ষ্টেটস্‌ম্যান্‌" পত্রিকায় লিখিত আছে যে, মালয়-উপদ্বীপে এক প্রকারের সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া হয়; সেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু, ভুক্তভোগী মানুষের দেহে, সুস্থ মানুষের দেহে, "এনোফিলিস্ লাড-লোয়াই" (Anopheles Ludlowi) নামক মশকীর দংশনের দ্বারা বিসর্পিত হয়। জাহাজে চড়িয়া, সেই মশকী কয়েকটি, সুন্দরবনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তথা হইতে, আবার কয়েকটি ঐ মারাত্মক মশকী, বজবজ ও চাঙ্গাইলে উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ, খিদিরপুর গার্ডেন রীচ পর্য্যন্ত, আরো কয়েকটি ঐ মারাত্মক ম্যালেরিয়া-বাহী "এনোফিলিস্ লাডলোয়াই" মশকী আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই বার—সারা কলিকাতা ছাইয়া ফেলিলেই হয়! সংবাদের প্রথমাংশ এইরূপ। বলা বাহুল্য, কয়েকটি মুষ্টিমেয় সাহেব আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই, ষ্টেটস্‌ম্যানের টনক নড়িয়াছে এবং বড় বড় অক্ষরে ভীতিপ্রদ কথা সহস্র প্রকারে বলা হইতেছে। কালা-আদমীর জন্য এতটা দরদ ত' হইবার কথা নয়।

তাহার পর, দ্বিতীয় দফা সংবাদ এইরূপ। বজবজে হঠাৎ কয়েকটি কলের সাহেবের ম্যালেরিয়া হওয়ায়, বেঙ্গল ডিপার্টমেণ্ট অফ্ পাবলিক হেলথের কীটতত্ত্ববিদ মিঃ আয়েঙ্গার তথায় অনুসন্ধানে যান। তিনি ঐ মশকীর সন্ধান পান। সন্ধান পাওয়া ও সাজ-সাজ রব পড়া—ইংরাজদিগের মধ্যে এই নূতন শত্রু মারিবার জন্য রীতিমত সুবন্দোবস্ত হইয়া গেল। সে বন্দোবস্তগুলি এইরূপ:—ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি জাহাজ-কোম্পানীর ডাক্তার (রস্, এম্, ব্রাড্‌লি) ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ম্যালেরিয়া তত্ত্ববিৎ (সিনিয়র হোয়াইট)—এই দুই জনের কর্ত্তৃত্বাধীনে, দুইজন ইন্‌স্পেক্টার ও দুইজন সর্দ্দার বা ওভারসিয়ার নিযুক্ত হইয়াছে; এবং ইহাদের হাতে আট জন কুলী দেওয়া হইয়াছে। প্রধানতঃ, ২৫ ও ২৬ ওয়ার্ডেই কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যের ব্যবস্থা এইরূপ:— (১) কোথায় কোথায় লবণাক্ত জল জমিয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা, কারণ, লবণাক্ত জলেই এনোফিলিস লাড্‌লোয়াই মশকীরা ডিম পাড়ে; এবং সেই জলে কোনও মশকীর বাচ্চা আছে কিনা, তাহা দেখা। এই জলে মাছ আছে বলিয়া, সরাসরি ঐ জলাশয়ে কেরোসিন ঢালা বা পাঁচটা ক্ষুদ্র ডোবা বুজান বা একত্রিত যোগ করিয়া তাহাদের জলনিকাশের ব্যবস্থা তাদৃশ সহজসাধ্য হইয়া উঠিতেছে না,—যেহেতু, ঐ ডোবাগুলি ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব জমীতে অবস্থিত। ইতি মধ্যে প্রায় ৪০০ খাটা পায়খানার ভিতরে বা আশেপাশেও ঐ রকম খানাখোঁদল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাবে প্রাথমিক কার্য্য—অর্থাৎ, শত্রুর শিবিরের সন্ধান লওয়া—চলিতেছে। গঙ্গার পূর্ব্বদিকে প্রায় দেড় ক্রোশ যায়গা লইয়া, আপাততঃ কার্য্য চলিতেছে। (২) সিনিয়ার হোয়াইট সাহেবের আফিষে একখানা বড় কাষ্ঠ-ফলকের উপরে ঐ দুই ওয়ার্ডের বড় নক্‌সা টাঙান হইয়াছে। এই নক্‌সার উপরে, বিভিন্ন রং-এর আলপিনের সাহায্যে, প্রত্যহই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখান হয়, কোথায় কয়টা জলাশয় আবিষ্কৃত হইল, কয়টায় তৈল ঢালা হইল, কয়টা বুজান হইল বা কয়টার জল নর্দ্দামা কাটিয়া সরকারী ড্রেণে আনিয়া ফেলা গেল। এই বোর্ডের আলপিনগুলি প্রত্যহই সর্দ্দারেরা আবশ্যকমত সরাইয়া দেয়; তাহার ফলে, কোথায় কি কাজ হইতেছে, তাহার উপরে দৃষ্টি রাখা সহজ হয়। (৩) এই বোর্ডমত কার্য্য ঠিক হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষার্থে কয়েকজন বেসরকারী ভদ্রলোক, সপ্তাহে একদিন ১০।১২ যায়গায় অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া, সকল রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে বেসরকারী ও সরকারী উভয় দলের কার্য্য মিলাইয়া লওয়া হয়। এই ভাবে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত ধাড়ী ও বাচ্চা—সকল রকমের মশকই ধ্বংস করা চলিতেছে।

এই পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রের কথা। এ কথায় সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত; কারণ, একদিকে নিজ কলিকাতায়

বস্তির ও খোলা ড্রেণের অভাব নাই ; অপর দিকে, গঙ্গার দুপাশে ও হাবড়া সহরে, খানা ডোবার অন্ত নাই। অতএব, একবার যদি একদল "এনোফিলিস্ লাডলোয়াই" মশকী হাবড়ায়, বা গঙ্গার ধারে বা কলিকাতার বস্তিতে কায়েম মোকাম হইয়া বসিতে পারে, তবে সত্যই সহরবাসীর ভয়ের কথা। কলিকাতায় সাধারণতঃ এই তিন জাতীয় মশকী পাওয়া যায় :—

(১) কিউলেকস্ মশকী—যাহা ডেঙ্গু জ্বর ও বাত শিরার জ্বর (filariasis) ছড়ায়—

(২) ষ্টেগোমায়া বা টাইগার মশকী—যাহা পীতজ্বর ছড়ায়—

(৩) এনোফিলিস ম্যাকিউলি পেনিস—যাহা দ্বারা ম্যালেরিয়া বিস্তৃতি লাভ করে।

কাযেই, "গোদের উপরে বিষ-ফোড়া" স্বরূপ, যদি এনোফিলিস্ লাডলোয়াই এখানে বাসা বাঁধেন, ত সোণায় সোহাগা হইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে, আর একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ; সেটি ইংরাজ জাতের কর্ত্তব্যবুদ্ধি। আমরা ব্যারামে উজাড় হইয়া যাই, সংঘবদ্ধ হইয়া কায করি না—আর, ব্যারামের নাম মাত্র, ইংরাজ কিরূপ তৎপরতা ও আপনাদের ভিতরে চাঁদা করিয়া (অর্থাৎ, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, নিজেদের উপরে টেক্স বসাইয়া) সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে। যাহারা আত্মনির্ভরশীল, ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাহাদেরই উপরে বর্ষিত হয়। ইংরাজ ধনী, কাযেই পয়সা নাই বলিয়া বসিয়া থাকিবার কথা নয়। কিন্তু তাহারা দরখাস্ত করিয়া সময় নষ্ট করে নাই বলিয়া, আজ কর্পোরেশন নিজ ব্যয়ে ২৫ ও ২৬ ওয়ার্ডে নিজস্ব মশ-অরি দল পাঠাইতেছেন ও গবর্ণমেণ্টও তৎপর হইবেন, সন্দেহ নাই।

কলিকাতার পূর্ব্ব ভাগে, ধাপার মাঠের পরে যথেষ্ট জলা জমি আছে ; সুন্দরবনেও জলাজমির অভাব নাই। এইজন্য কলিকাতাবাসীর খুবই তৎপরতার সহিত কার্য্য করা চাই। কলিকাতাবাসীর কর্ত্তব্য—

(১) পায়খানার ময়লা জলের ট্যাঙ্কের মাথায় একটা ঢাকা যেন দেওয়া থাকে। যাহাদের সিস্টার্ণ বিগ্‌ড়াইয়া যাইবার জন্য, ট্যাঙ্কের জল খরচ কম হয় বা হয় না, তাঁহারা যেন সেগুলি সারাইয়া লয়েন।

(২) গবর্ণমেণ্টের ও মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ীতে এবং বড় বড় "হৌস"এ আগুন-নিবারণের জন্য যে জল-ভরা বাল্‌তি থাকে, তাহার মুখে ঢাকনী প্রস্তুত করান চাই—অথবা যাহাতে রোজ ঐ জল বদলান হয়, তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করা চাই।

(৩) বস্তির ভিতরে খানা-ডোবা, মজা-নর্দ্দমা, ভাঙ্গা জালা, আবর্জ্জনার স্তূপের অভাব নাই। কলিকাতা ও হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বহুদিন পূর্ব্বেই উচিত ছিল।

(৪) কলিকাতার পূর্ব্বাঞ্চলে যে salt lake ও চিংড়ি হাটার দিকে যে খোলা drain outfall আছে ; এবং পাগলা ডাঙ্গা, বেলেঘাটা, মাণিকতলা, নারিকেল ডাঙ্গা, উল্টাডিঙ্গি, টালা, পাইকপাড়া, কাশীপুর, বরাহনগর, দমদমা প্রভৃতি অঞ্চলে যে ডোবা, পুকুর, খোলা ড্রেণ, ঝোপ-জঙ্গল আছে—সেগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া, জরুরী আইন প্রণয়ন দ্বারা ঐগুলির ত্বরিত সংস্কার করান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। Salt lake এর উপরে, উড়োজাহাজ সাহায্যে রামখড়ি বা সোপ ষ্টোন চূর্ণের সহিত, "প্যারিস্ গ্রীন্" ছড়ান উচিত ; তাহার ফলে মাছ কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু মশকীর বাচ্চারা মরিয়া যাইবে।

কলিকাতায় মশা, মাছি ও ইন্দুরের উৎপাত অত্যন্ত বাড়িয়াছে। যে মহানগরে ঐগুলির উৎপাত বাড়ে, সে নগরে যে কোনও মহামারী প্রবেশ করিলে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে। মশকীই যে ম্যালেরিয়ার বাহন—একথা গায়ের জোরে অনেকেই বিশ্বাস করেন না বলিয়া, স্বল্প কথায় মশকীতত্ত্ব বুঝাইতেছি। "ম্যালেরিয়া" কথাটি দুইটি ইতালীয় বাক্যের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে—"ম্যালা"=মন্দ, "আরিয়া"=বায়ু। অর্থাৎ, কথার মানে ধরিলে, ম্যালেরিয়া= দূষিত বায়ু=miasma. পূর্ব্বে, লোকদের ধারণা ছিল যে, সন্ধ্যাকালে জলাজমির উপরে যে দূষিত বায়ু উঠে, তাহা শুঁকিয়া এবং ঐ সব জল পান করিয়া ম্যালেরিয়া হয়। এখন, অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "প্লাজ্‌মোডিয়াম্" ("হিম্-অ্যামিবার" শ্রেণীভুক্ত) নামক এক-কোষ, অতীব

অতি ক্ষুদ্র জীবাণুই এই জ্বরের কারণ। এই জীবাণুর জীবনেতিহাস অতীব বিচিত্র। ইহার বংশবৃদ্ধি অতীব বিস্ময়কর। নপুংসক বিধায়ে, ইহারা অযৌন ভাবে (a-sexully) বংশ বৃদ্ধি করে; কিন্তু কখনো কখনো নপুংসক কর্তৃক সৃষ্ট হইলেও, ইহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ জীবাণু জন্মে। মানুষের রক্তের লাল কণিকার মধ্যে আশ্রয় লইয়া, তাহারই সার খাইয়া এই নপুংসক জীবাণুরা বাড়ে। এবং, যখন ঐ রক্তকণিকাটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া, একটি জীবাণু "বহুধা স্তাম" (অর্থাৎ, একটি ধাড়ী-জীবাণুর দেহ বিভক্ত হইয়া অযৌনভাবে বহু শাবকে পরিণত হয়) সেই মুহূর্ত্তেই কম্প দিয়া জ্বর আসে। যে নপুংসক শাবকগুলি মনুষ্যরক্তে জন্মে, তাহারা নূতন রক্তকণিকামধ্যে আশ্রয় লইয়া, আবার প্রত্যেকেই বহুধাবিভক্ত হইয়া বহু শাবকের জন্ম দেয়। এই ভাবে, মানুষের দেহের রক্তকণিকামধ্যেই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর অযৌন বংশবৃদ্ধি ঘটে। এই অযৌন বংশবৃদ্ধি "চিরকাল" ঘটে না—বংশ বৃদ্ধি কিছুকাল হইতে হইতে, জীবাণুটি সমূলে আপনিই ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে;—এমন অবস্থায়, বিনা চিকিৎসাতেই ম্যালেরিয়া আপনিই সারিয়া যায়। এই গেল মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর (প্লাজ্‌মোডিয়ামের) জীবনের একার্দ্ধের কথা (অযৌন নপুংসক বংশ-বৃদ্ধির কথা)। কখনো কখনো দেখা যায় যে, মানুষের রক্তে অসংখ্য অযৌন-বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে, দু-চারটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (crescent) জীবাণুও জন্মায়। এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জীবাণুগুলি অপর জীবাণুগুলির মত নপুংসক নহে। বস্তুতঃ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ ও কতকগুলি স্ত্রী। যেগুলি পুরুষ, তাহাদের গায়ে লাঙ্গুলের মত কতকগুলি পুচ্ছ বাহির হয়। ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইবার ৫।৭ দিন পরেই এই যৌন-যূথ দেখা দেয়। মানুষের রক্তে যে সময়ে এই যৌন-যূথ দেখা দেয় সেই সময়ে, যদি এনোফিলিস-জাতীয় কোনও মশকী এই ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত লোকটিকে কামড়ায়, তবে, ঐ মশকীর উদরে বহুসংখ্যক পুং ও স্ত্রী জীবাণু চলিয়া যায়। এখানে তিনটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; প্রথমটি এই যে, মানব-রক্তে, ম্যালেরিয়ার পুং ও স্ত্রী জীবাণুর মৈথুন ঘটে না; দ্বিতীয়টি এই যে, মশকীর দেহেই ঐ মৈথুন ঘটে; এবং তৃতীয়টি এই যে, পুং-মশকরা উদ্ভিদরসভোজী, স্ত্রী-মশকীরা রক্ত-পায়ী। যাহা হউক, মশকের পাকস্থলীতে পীত রক্তটি অনেক ঘণ্টা থাকে, আমাদের মত ৪।৫ ঘণ্টায় তাহাদের হজম হয় না। কাযেই, মশকীর পাকস্থলীতে মৈথুন ঘটে এবং গর্ভবতী স্ত্রী-জীবাণুটি আত্মরক্ষার্থ মশকীর পাকস্থলীর গাত্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে গর্ভ পোষণ করিতে থাকে। গর্ভকাল পূর্ণ হইলে, অসংখ্য নপুংসক জীবাণু পাকস্থলীর গাত্র ভেদ করিয়া মশকীর দেহে পরিব্যাপ্ত হয়। পরে, সে-গুলি মশকীর রক্তপায়ী হুলের নিকট যে লালা-গ্রন্থি আছে, তথায় সমবেত হয়। নিজ লালা-গ্রন্থিতে যখন অসংখ্য নপুংসক ম্যালেরিয়া-জীবাণু একত্রিত থাকে, সেই সময়ে সেই মশকী যদি কোনও সুস্থলোককে কামড়ায়, তবে, তাহার দংশন ও লালা ঢালিবার কালে, ঐ সুস্থলোকটির দেহে অসংখ্য নপুং-সক ম্যালেরিয়া-জীবাণু প্রতিষ্ঠ হইয়া—ঐ লোকটিকে উক্ত ব্যারাম দান করে। মশক, জোঁক, ছারপোকা প্রভৃতি রক্ত-পায়ী জীবরা নির্ব্বিবাদে রক্ত পান করিতে পারিবে বলিয়া, ইহাদের লালাতে এমন একটি পদার্থ থাকে, যাহার সংস্পর্শে আসার দরুণ, রক্ত আর জমাট বাঁধিতে পারে না। পতিত হইবার ২।৩ মিনিটকাল মধ্যে জমাট বাঁধিয়া যাওয়াই, রক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাযেই সহজ বুদ্ধির প্রেরণায়, রক্তপায়ী জীবরা কোনও প্রাণীকে দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে, নিজ লালা একবিন্দু ঢালিয়া দেয়। এই ভাবে মনুষ্যের রক্তের লাল-কণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর অযৌন বংশ-বৃদ্ধি ঘটে এবং মশকীর পাকস্থলীগাত্রে যৌন বংশবৃদ্ধি ঘটে। কাযেই, মানুষ ও মশকী—এই দুইদুইটিকে না পাইলে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর চলে না।

এই কথাগুলির প্রত্যেকটিই বর্ণে বর্ণে, হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়া যায়। কাযেই, কথাগুলি উপেক্ষণীয় নহে। সকল মশকীই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বাহন নহে। বস্তুতঃ তিনটি জিনিষ একত্রিত না হইলে ম্যালেরিয়া ছড়ায় না; সে তিনটি যথাক্রমে—(১) ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এমন রোগী; (২) এনোফিলিস্ নামক বিশিষ্ট জাতীয় মশকী, স্ত্রী-মশক, পুংমশক নহে; এবং (৩) সুস্থদেহ লোক।

পাঠকগণ শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে মেডিকেল কলেজের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যক্ষ, ট্রপিকাল স্কুলের শিক্ষক ও "রক্‌ফেলার ইনষ্টিটিউট অফ্ পাবলিক্ হেল্‌থ"এর ডাইরেকটর, কর্ণেল এ, ডি, ষ্টুয়ার্ট ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট একবাক্যে আশ্বাস দিতেছেন যে কলিকাতাবাসীর তাদৃশ ভয়ের কারণ নাই। কলিকাতা ও হাওড়ার মিউনিসিপ্যালিটিদ্বয়, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী সকলেই অবহিত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন কি গার্ডেনরীচে (খিদিরপুরে) ঐ এনোফিলিস্ লাড্‌লোয়াই মশকী নাই এবং বঙ্গবঙ্গেই যে এই লাড্‌লোয়াই মশকীরা ম্যালেরিয়া ছড়াইয়াছে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কাযেই, ভাবনার কারণ থাকিলেও, কলিকাতাবাসীর ভয়ের কারণ নাই—ষ্টেট্‌স্‌-ম্যানের হিষ্টিরিয়ারও কারণ নাই।

পারুলের আহ্বান

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

সাত ভাই চম্পা—জা—গো—,
জা—গো—, জাগো মোর সাত ভাই!
নিদাঘের ভোরে শোন্
ডাকিছে পারুল বোন্,
অরণ্যমাঝে আর রাত নাই,
চম্পা গো চম্পা গো জাগো ভাই!

এল গেল বসন্তে কত-না আগন্তুক,
জ্বলে' গেল চূতকলি, ঝরে' গেল কিংশুক;
রাঙা পায়ে চলে' গেল,
অশোক কি বলে' গেল?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

খুলে ফেলি' তনুভরা সোণালি ফুলের রাশ—
সোঁদাল ধরিল শিরে নবীন জটার পাশ;
শিমূলের লাল আঁখি
দিগন্তে দিল ফাঁকি;
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

নবনীল অম্বরে বসন্ত নত-মাথে
নবমল্লির ডোরে ফাগুনের দিন গাঁথে,—
সেদিন গিয়াছে চলে'
নিদাঘ উঠিছে জ্বলে',—
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

জাগে জাগে জাগে ঐ নৈদাঘ সূর্য্য!
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য্য!
বসন্ত অবসান,—
কে রাখে ফুলের মান?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

পাতা হ'তে মাথা তুলি' ভাস্করে নমি' কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমিখে ?
কে পিয়ে' অনল-রাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

টগবগ্ ফুটে ধূপ গগনের কটাহে,—
বাসন্তী কেতু তার ছোপাইবে কে তাহে ?
তুলি' নিঃশঙ্ক
কৌসুম শঙ্খ
কে বাজাবে ? চম্পা গো জা—গো—!

শূন্য কাননে কেঁদে' ফিরে অনুকম্পা,
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা!
ভুঁইচাঁপা ভুঁই ফুঁড়ে'
তুইও জাগ্ ভুঁই জুড়ে',
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

দিকে দিকে সাত দ্বীপ কাঁদে সাত্ সাগরে!
গরবিনী পারুলের সাত ভাই জাগো রে!
ভাঙি' সুন্দর তনু
সৌরভী জয়ধনু
টঙ্কারি' চম্পা গো জা—গো—!

চৈতের শেষ হ'তে আষাঢ়ের ওপারে
শহীদের মরু পার,—পায়ে পায়ে কে পারে ?
পারুলের সাত ভাই
পারে সেই চম্পাই ;
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

বসন্ত গেছে, গেছে—হাত নাই, হাত নাই!
অশান্ত গাছে গাছে রাত নাই, রাত নাই।
তোরি আসা আশা করি'
পিক গাহে আশাবরী
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!
জাগো মোর সাত ভাই জা—গো—!

অকারণ

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা]

মানুষ মাত্রেই কবি এবং প্রতি মানুষের জীবনেই এক সময় কবিতা লিখিবার একটা অদম্য ইচ্ছা প্রবল হইয়া দেখা দেয়। ইহা যেন কাহার নিকট শুনিয়াছিলাম। আরও শুনিয়াছিলাম যে-কৃষক চাষ করিতে করিতে নব তৃণোদ্গম লক্ষ্য করে—যে-শ্রমিক কালো চিমনির পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া নব শিল্প-সম্ভারের স্বপ্ন দেখে, যে-জ্যোতির্বিদ সীমাহীন অনন্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের দুর্ভেদ্য রহস্যসীমার পারে নব তারকার জন্ম দেখে—তাহাদের আনন্দ তাহাদের অনুভূতি কবিরই আনন্দ। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে সেই আনন্দ ও সেই অনুভূতি যেদিন যাহার প্রাণে সৃষ্ট হয়, সেইদিন হইতে আর এই ধূলার জগৎকে তাহার কদর্য্য বলিয়া, কঠিন বলিয়া মনে হয় না। সেইদিন হইতে মনের দ্বারে কোথা হইতে কি এক বস্তু আসিয়া সুপ্ত মনকে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, কলা-লক্ষ্মীর পাদস্পর্শে অন্তরের ঘুমন্ত পদ্মটী সুকোমল পাপড়ি মেলিয়া জাগিয়া উঠে—প্রাণ সৌরভে ব্যাকুল হয়। সেইদিন একসাথে প্রাণের সকল রুদ্ধ বাতায়নগুলি মুক্ত হয়। যায়—নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ, চন্দ্রসূর্য্যের আলো—কত জানা-অজানা পাখীর কাকলী সবই ঐ উন্মুক্ত জানালা দিয়া আসিয়া মন প্রাণকে আলোকিত সুরভিত ও স্নিগ্ধ করে। তখন মনে হয় আজ কোন মহারহস্যের কোন অনন্তের ইঙ্গিত আমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছাইল!

অমনি একটা কাল আমার জীবনে দেখা দিয়াছিল। সেদিন নিজের অস্তিত্বকে অসীম আকাশের মত বিস্তৃত মনে হইয়াছিল। সেদিন আমার মন লঘুতনু বলাকার মত দুই লঘু পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতে চাহিয়াছিল! কিন্তু কে ভাবিয়াছিল যে ঐ কয়টী বৎসর জীবন-আকাশে আতসবাজীর মত রংয়ের আর্তনাদ করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে!

কলেজ-জীবনে আমার খ্যাতি ছিল—সাহিত্যিক বলিয়া। কবিতা লিখিতাম, মাঝে মাঝে গল্প এমন কি ভারী ধরণের প্রবন্ধও রচনা করিতাম। কখন কখন রাশ-ভারী প্রবন্ধ, ছন্দহীন কবিতা, প্লটহীন গল্প লইয়া সংবাদপত্র মাসিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে আক্রমণ করিতাম। সুখের বিষয় আমার অস্ত্রগুলি তীক্ষ্ণ ছিল না তাই তাঁহারা অক্ষতদেহে বিরাজ করিতেন। প্রদ্যোৎ আমার বন্ধু, আমার ভক্ত। ভগবান তাকে সু-কপাল দিয়াছিলেন আর তার বাপকে দিয়াছিলেন পয়সা। আমারও সু-অদৃষ্টক্রমে প্রদ্যোৎ আমার পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার নিক্ষিপ্ত রচনাস্ত্রগুলি সম্পাদকমণ্ডলী দ্বারা বিতাড়িত, লাঞ্ছিত হইয়া আসিলে ক্ষুণ্ণমনে প্রদ্যোতকে কহিতাম, দেখো তো ভাই, মনে করছি এগুলো কোথাও পাঠাই, পড়তো—।

প্রদ্যোত সকলগুলি নিঃশব্দে পড়িয়া গদগদ কণ্ঠে কহিত,—অপূর্ব্ব। আমি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া কহিতাম, তোমার চাকরকে বলো একটু চা আনুক!

সেবার শীতকাল যেন একটু সকাল সকাল স্থান ত্যাগ করিল। ফাল্গুনে তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইতে লাগিল—রাস্তার ধারে গাছে গাছে নূতন পাতা লাল হইয়া দেখা দিল। হোষ্টেলের দ্বিতল গৃহে টেবিলের উপর পা ছড়াইয়া, চেয়ারে বসিয়া মুখে জ্বলন্ত সিগারেট টানিতে টানিতে কল্পনায় আমার জন্মভূমির চিত্র দেখিতে লাগিলাম। আমার গ্রামের পথ ঘাট মাঠ সেখানকার অনন্ত নীলাকাশকে সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছে, চৈতালি ফসলের সুগন্ধ, মাঠের ধারে ধারে পলাশের ডালে রাঙা রাঙা ফুল ফুটিয়াছে, ছায়া-মাখা গ্রাম্য পথে আম্র বউলের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে—বিহ্বল দুপুরের স্তব্ধতার মাঝে মাঝে কোকিল ডাকিতেছে—কু কু কু!

ভাবিতে ভাবিতে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ রাস্তার ওধারের বৃহৎ লাল রংয়ের বাড়ীর একটী জানালার নিকট আমার চক্ষু পতিত হইয়া আর অগ্রসর হইল না। একটী সুন্দরী কিশোরী আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে

সরিয়া গেল। মনে হইল আমার মানসী আজ এই ফাল্গুন অপরাহ্নে একটী সুন্দরী কিশোরীর লাবণ্য-মাখা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জুতা পায়ে দিয়া এক বৃহৎ অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষের গবাক্ষপথে দর্শন দিয়া কক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হইলেন। বসিয়া রহিলাম কিন্তু আর দেখা গেল না। না দেখা যাউক তবুও বসিয়া রহিলাম। আকাশে চোখ তুলিতেই দেখি সন্ধ্যাতারা স্নিগ্ধ স্মিত হাস্যে আমার দিকে চাহিয়া আছে! আমার মনে হইল আমার এই অসীম সৌভাগ্য দর্শনে আমাকে স্নিগ্ধ হাস্যে সে অভিনন্দন করিতেছে। আজ আর কলিকাতাকে কুৎসিত মনে হইল না। পূর্ব্বে প্রদ্যোতের সহিত তর্ক করিয়াছি, বলিয়াছি কলিকাতা কুৎসিত—কারণ মাটীর অন্তরের যোগ এখানে ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু আজ মনে হইল কলিকাতার আকাশে বাতাসে আম্র বউলের সুগন্ধ আর চতুর্দ্দিকে পিক পাপিয়ার মূর্চ্ছনা। সত্য সত্যই পাশের বাড়ী হইতে একটী পোষা কোকিল ডাকিয়া উঠিল, কুউ-কু-কুউ। আমি দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম—ধরণী পুলকিত—আকাশ আলোকিত—বাতাস উতলা। আর আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রতি রোমে রোমে রোমে নব বসন্তের রেণুকণা প্রবেশ করিয়া আমার ঘুমন্ত সুপ্ত যৌবনকে তপ্ত করিয়া জাগ্রত করাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল!

সেইদিন হইতে কবিতা লেখা, কলেজ যাওয়া, আড্ডা দিয়া বেড়ান—সব বন্ধ হইয়া গেল! শুধু দুই চক্ষু মেলিয়া জানালাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিতাম। মেয়েটীর নাম জানিনা—জানিবার প্রয়োজনও প্রথমে মনে হয় নাই। পরে ভাবনা সমূহ হইয়া উঠিল—কি উপায়ে আলাপ পরিচয় করি। এই রকম কতদিন কখনও সাড়ীর আঁচল, কণ্ঠের স্বর, চকিত দৃষ্টি দেখিয়া দেখিয়া এই পরের মতন দূরে দূরে রহিব? একান্ত নিকটে বড় আপনার জন হইয়া তাহাকে কবে পাইব? উপায় ঠিক করিতে বন্ধু মিহিরের নিকট গেলাম! পূর্ব্বে সেও আমার ন্যায় শেলীর স্বপ্ন দেখিত কবিতা লিখিত—কিন্তু বর্ত্তমানে ফোর্ডকেই ভালবাসে!

তাহার সহিত যখন দেখা হইল—তখন প্রকাণ্ড এক হিসাবের খাতায় টাকা পয়সার হিসাব করিতে সে ব্যস্ত! মুখ তুলিয়া কহিল, কি ললিত যে—এস, বস! হঠাৎ কী ব্যাপার! কহিলাম, তোমার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম—কি করা যায় তার একটা যুক্তি দাও! মিহির ঘাড় হেঁট করিয়া লিখিতে লিখিতে কহিল—কি, বাপে টাকা পাঠাচ্ছে না? কহিলাম বাজে ব'কোনা, সব মন দিয়ে শোন।

—কি বিপদ, কেন কবিতার বই বিক্রী হচ্ছে না?

কহিলাম—আহা শোনই না সব—জানতো হোষ্টেলের সামনে একটা প্রকাণ্ড লাল রংয়ের বাড়ী আছে—তাকে প্রাসাদ বল্লেই হয়।

মিহির কহিল—থাকা সম্ভব। ক'লকাতা সহরে লাল রংয়ের বাড়ী পর্য্যাপ্ত কিন্তু তাতে তোমার কি—

কহিলাম—সেই বাড়ীর একটী মেয়ে, সুগৌরী, কিশোরী, প্রতিদিন কারণে অকারণে কাজে অকাজে ঐ জানালার ধারে দাঁড়ায়। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—আমার কবিতা, লেখা, কলেজ যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, বেড়ান, ঘুমান, সব বন্ধ হয়ে গেছে! রাত্রে স্বপ্ন দেখি, শুধু তাকে! ভাল করে খেতে পারিনে—কোথাও একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে পারিনে, পাছে সে আমায় না দেখতে পেয়ে ফিরে যায়। ভাই একটা পরামর্শ দাও আমি কি করি!

মিহির কহিল বেড়ে রোমান্স তো! শোন, এক কাজ কর। ঐ তার জানালায় গভীর রাত্রে ফেল রেশমের সিঁড়ি—তারপর রোমিওর বাস্তব মূর্ত্তি দেখিয়ে আমাদের তৃপ্ত কর। সেক্সপিয়ার সত্য হোক্!

কহিলাম—না না ঠাট্টা ছাড়ো, আমি সত্যি যুক্তি চাই।

মিহির উঠিয়া আমার চেয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দুই সবল বাহু আমার ঘাড়ে রাখিয়া চোখে চোখে তাকাইয়া কহিল—ম্যান্, যুক্তি শুনবে—ঐ জানালাটী বন্ধ করে ভাল ছেলের মত পড়াশুনো করো—গল্প কবিতার খাতাগুলোতে অগ্নি সংযোগ কর, তারপর বি-এ পাশ করে আমার কাছে এস। সৎ পরামর্শ দেব—

তাহার অসম্ভব যুক্তি পছন্দ হইল না—অমন অবস্থায় কাহারও যুক্তি পছন্দ হয় না। পছন্দ কেন হইবে? আর মিহির কিই বা জানে—বোঝে। যাহার চোখের দৃষ্টিতে বিশ্বের যাবতীয় প্রখরতা শীতল হইয়া যায়, স্নিগ্ধ হইয়া যায়—যাহার হাসির স্নিগ্ধতায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শ্যাম শস্যাঞ্চল

কাঁপিয়া উঠে—তাহাকে ভুলিতে মিহির বলিতেছে। তাহাকে ভুলিলে জীবনে অবশিষ্ট রহিল কি? মনঃক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

হঠাৎ একদিন কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল কারণ পিতার অর্থাভাব। কলেজ ছাড়িয়া লালদীঘি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু চাকুরী জুটিল না। তাই গত্যন্তর না দেখিয়া দেশে উপস্থিত হইলাম। এতদিনে বুঝিলাম চাকুরীর দিকে পিছন ফিরিয়া সম্মুখের যে সুপ্রশস্ত আলোকিত জায়গাটীর একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম আজ সে সুপ্রশস্ত স্থানটী সঙ্কীর্ণ এবং আলোকিত ভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বুঝিলাম ফোর্ডকে ছাড়িয়া যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—শেলীকে নির্ব্বাসন দিয়া। ক্রোশখানেকের মধ্যে একটী ইংরাজী স্কুল ছিল আজও আছে। হঠাৎ তাহার একটী শিক্ষক মাত্র দুদিনের জ্বরে, ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আমি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া ভাবিলাম, ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অমনি একখানি দরখাস্ত করিয়া বসিলাম। স্কুল কমিটীর সদস্যগণের মধ্যে অনেকে আমার একান্ত আপনার জন ছিলেন। তাঁহাদের সুপারিসে মাসিক চল্লিশ টাকার বেতনে শিক্ষক হইয়া, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলাম। যে মন লইয়া স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভাবিতাম—"O my luve's like a red red rose—" সে স্বপ্ন উড়িয়া গেল! আবার সেই মন লইয়া ব্যাকরণের সূত্র, মৃত আকবরের পিতার নাম, ছাত্রগণকে, ভারতের ভাবী আশাস্থলকে পড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু ছাত্রগণকে নীরস কতকগুলি শাস্ত্র পড়াইতে মোটেই ভাল লাগিত না। বিহ্বল আবেশময় দুপুরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইত—কত কি! মৌমাছির মত ঐ লাইনটী মনের মধ্যে গুণ গুণ করিতাম। এই রকম ভাবে চলিতেছিল—ভাবিয়াছিলাম—সেই কিশোরীর স্মৃতি লইয়া আজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া রহিব। কিন্তু পিতার হুকুম হইল—বিবাহ কর। সবিনয়ে প্রতিবাদ করিলাম—না, উপস্থিত থাক্। কিন্তু আত্মীয়বর্গ সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিলেন—কেন বাপু বিবাহে আপত্তি কি? জ্যেষ্ঠ তুমি—তুমি বিবাহ করিবে না, একি অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। আর বিবাহ কি নূতন সৃষ্টি ছাড়া কিম্ভূতকিমাকার বস্তু আজ তোমার সম্মুখে হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িল যে তাহাতে তাহার আকৃতি দেখিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছ? একটী সামান্য মেয়ের ভার যদি লইতে না পার, তবে পুরুষ নামে ধিক্'। অতএব আমার কৌমার্য্যের গৌরবময় উত্তুঙ্গ পর্ব্বতটা নিমেষে গুঁড়া হইয়া গেল। আর আমার মনের মাঝে যত জানালা একদিন খুলিয়া গিয়াছিল, পুনরায় সকলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল!

সেই সুনীল আকাশ—সূর্য্য চন্দ্র—জ্যোৎস্নার আলো—সব সরিয়া গেল। একদিন শুভক্ষণে শুভ লগ্নে বিবাহ করিয়া শ্রীমতী আশালতাকে লইয়া বাড়ী আসিলাম—তার পর চাকুরী আর নবোঢ়াকে লইয়া রীতিমত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। প্রদ্যোৎ মিহির—সে সুগৌরীর স্মৃতি সব মনের আকাশ হইতে মুছিয়া গেল।

বছর ঘুরিতে ঘুরিতে দুই বৎসর হইয়া গেল। ইহার মধ্যে প্রদ্যোত ও মিহিরের পত্র মধ্যে মধ্যে পাইতাম—কিন্তু শ্রীমতী আশালতাকে লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে, তাহাদের সকল পত্রের যথাযথ উত্তর দিতে পারি নাই। আমার এ ত্রুটি তাহারা ক্ষমা করিত। অকস্মাৎ একদিন যাহা শুনিলাম তাহাতে দস্তুর মত ঘাবড়াইয়া গেলাম! শুনিলাম, আশালতার সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে। অল্প বয়সে পিতৃত্বের সম্ভাবনায় লজ্জিত হইলাম—ততোধিক ভীতও হইলাম। গোপনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে হাসিয়া কহিল—যাও, আমি জানি না। বুঝিতে বাকী রহিল না। আশা না হয় হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া সরিয়া গেল—কিন্তু আয়নায় চাহিয়া দেখিলাম আমার প্রফুল্ল বদন মলিন হইয়াছে। তবুও মনে হইল কিছুদিন অন্তবালে অবস্থানই যুক্তিযুক্ত। নূতন এক প্রাণীর শুভ পদার্পণে আমার মনের ও দেহের মলিনতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাহিরে ঘুরিয়া আসিলে কিছুদিন ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইব। পাঁজী খুলিতেই দেখি বড়-দিনের ছুটি আসন্ন। একদিন বন্ধুবর মিহিরকে পত্র দিয়া কলিকাতার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। আশা বার বার করিয়া বলিয়াছিল, "কল্‌কাতা গিয়েই যেন খবর দিও—দেরী না হয়"—কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি—পত্র দিই নাই।

সেই কলিকাতা—আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলি যেখানে গত হইয়াছে! আজ আর সে দিন নাই—সে চঞ্চল শুভক্ষণ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে মনে হইল—ললিত নামে যে ব্যক্তি কলেজ হোষ্টেলের দ্বিতলে বাস করিত, তাহাকে—যেখানে বন্ধুবর প্রদ্যোতের সাথে কাব্য-চর্চ্চা করিতে করিতে মনে হইত, আজীবন এমনি স্বপ্ন দেখিয়া—এমনি আনন্দে সুখে—চঞ্চল আনন্দ-ক্ষণটীকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়া জীবন-তরণী বাহিয়া চলিব—সে নদীতে উন্মত্ত উত্তাল হইয়া তরঙ্গ আসিবে না—আর আকাশকে অন্ধকার করিয়া ঝড়ও উঠিবে না, শুধু সুনীল আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডাকিবে, নদীর দুটী পারে কাঁশফুল দুলিতে থাকিবে। বাঁশ ঝাড়ের আড়াল হইতে পিক্ পাপিয়া পঞ্চমে তান ধরিবে—আর স্নিগ্ধ শীতল ঝিরঝিরে বাতাসে আম্র বউলের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিবে আর আকাশের চাঁদ দেখিয়া কোন কিশোরীর মুখ স্মরণ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিব—আমাদের চারি পাশে হাসি গান ফুল—আর জ্যোৎস্না রহিবে। কিন্তু সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে!

প্রদ্যোতকে বাহির করিতে দেরী হইল না! বহুদিন পর দুইজনে মিলিত হইয়া বড় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম; মনে হইতে লাগিল যেন সেই ছাত্র-জীবনে আবার আসিয়া পড়িয়াছি। একদিন থিয়েটার ফেরৎ হইয়া আসিতে আসিতে আমিই কহিলাম—চ' একবার হোষ্টেলের ওখান হয়ে যাই। ও আপত্তি করিয়া কহিল—আরে না না, দেরী হ'য়ে যাবে—তা ছাড়া ও রাস্তায় এত রাতে কী বা এমন দরকার।

চুপ করিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিবর্ণ পাণ্ডু জ্যোৎস্নায় রাস্তা ঘাট প্লাবিত—চতুর্দ্দিকে একটা স্তব্ধতা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। শুধু সেই নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দ করিতে করিতে আমরা দুইজনে হাঁটিতেছিলাম। হোষ্টেলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কতদিন পর আবার হোষ্টেলের নিকট আসিয়াছি। দ্বিতলের যে গৃহে বসিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিতাম সেই ঘরখানিকে দেখিয়া লইলাম। তারপর একদৃষ্টে সেই লাল বাড়ীর একটী নির্দ্দিষ্ট জানালার প্রতি নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম। জানি আজ আর জানালা খুলিয়া যাইবেনা—সে কিশোরীর পূর্ণিমাসদৃশ মুখ খানি আর একবারও জানালার ওপারে দেখিতে পাইব না—তবু মনে হইল কেন ও জানালা খুলিল না—কেন সে আজ আর জানালার নিকট দাঁড়াইল না। প্রথম জীবনের সুখময় স্মৃতি একে একে মনের দ্বারে ভীড় করিয়া আসিল। সেই এক জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে কোকিল ডাকিয়াছিল, কুহু-কুহু কু। আর ঐ জানালাটীর ওপারে এক সুগৌরা কিশোরীর পূর্ণিমাচন্দ্রসদৃশ অপরূপ মুখ—কিন্তু আজ সব জীবনের কোন এক অপরিচিত পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—চক্ষু দুটী অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।

প্রদ্যোৎ কহিল—বাঃ চল—। না এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে রহবে। ধরা গলায় কহিলাম—এই যে—।

সেতু

[শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র]

বিরাট্ সেতু সে, এ ধারের সাথে ওধার জুড়েছে ভাই,
সে সেতু হয়েছ পার ?
এ ধারে তাহার আলো জ্বলে নাকো, ওধারে অন্ধকার
সেতু সে বৃহদাকার !

এ পারে যাহার মাটির দম্ভ ওপারে মাটির মায়া
পদতলে যার অশ্রুর মত জল,
সে সেতু নহেক, বিবাহ দেয়নি এপারে ওপারে ভাই,
রাখীবন্ধন নহে শুধু শৃঙ্খল !
এ ধারের সাথে ওধার জুড়েছে কঠিন বাঁধনে ভাই
সেতু সে বিপুল-বল !

ফুল হতে ফলে যে গোপন সেতু
জানি রহস্য তার,
তারা হতে তারা যে সেতু উতরে,
লঙ্ঘি' অন্ধকার—
তারো সন্ধান মেলে কিছু কিছু
নিশীথ রাত্র ভরি'
শুধু এ সেতুর হেতু জানি নাকো
উতরিতে ভয়ে মরি।

সব কিছু সে যে পার হয়ে চলে, তবু কোথা নাহি পার
তীর নাহি মিলে, সেতু সে নিরুদ্দেশ
কঠিন বাঁধনে সব কিছু বাঁধে, তবু লাগে নাকো জোড়া
যোজনার মাঝে বেদনার রহে রেশ।
সূর্য্যের পানে উদ্ধত যার যাত্রার সুরু ভাই
অতল আঁধারে উৎরাই তার শেষ।

বিরাট সাঁকো সে, লঙ্ঘিতে চায় শিশির কণিকাটিরে
সে সাঁকো হয়েছ পার !
এ ধারে তাহার বন্ধ্যা ধরণী অন্ধ আকাশ শিরে
সেতু সে ব্যর্থতার !

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসব

(বসন্ত)

[শ্রীপরিমল গোস্বামী]

কর্ম্মী তাঁর চার ধারে কর্ম্মচক্র রচনা করেন, এবং তার ভিতর দিয়ে আপনার ক্ষমতাকে মূর্ত্ত করেন। আমরা সে মূর্ত্তিকে স্পর্শ করি, তাকে ব্যবহার করি, আমাদের সাংসারিক জীবনে তার মূল্য আছে।

বৈজ্ঞানিক তাঁর ল্যাবরেটরিতে ব'সে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করতে থাকেন, সেখানে তাঁর তপস্যা রূপ পায়। তাঁর সেই রূপায়িত তপস্যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠে, সুতরাং তারও মূল্য আছে।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু কবি রচনা করেন রসচক্র। সেখানে যা রূপ পায় তাকে স্পর্শ করা যায় না, তা অরূপ, আমাদের দেহের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, দেহাতীতের সঙ্গে তার যোগাযোগ। সে অমূল্য।

কবি স্রষ্টা। তিনি 'আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা।' স্বপ্নের আলোয় ডুবে তিনি স্বপ্ন সৃষ্টি করেন। বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সমান আসন। বসন্ত উৎসব অভিনয়ে কবির এই রূপটিই ব্যক্ত হয়েচে।

এই অভিনয় প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখার দরকার। সেই দরকারে 'মুক্তধারা'য় প্রকাশিত কবির একখানা চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম:—

"মেয়েদের বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সঙ্কল্প আমাকে রাস্তায় বের করেচে। যদি কিছুমাত্র সিদ্ধি লাভ করি তা হ'লে দেহের দুঃখ এবং মনের গ্লানি ভুলতে পারব।—অনেকদিন অনেকের দ্বারে ঘুরেচি, অনেক অযোগ্য লোকের কাছে মাথা হেঁট করতে হ'য়েচে, বারে বারেই অকৃতার্থ হয়েচি। আরো একবার যদি সেই দুর্গ্রহ ঘটে তবে এইবার ভিক্ষের ঝুলিতে আগুণ লাগিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে, জীবনের শেষ খেয়ার জন্য চুপচাপ বসে অপেক্ষা করব। দেশে আমার স্থান সঙ্কীর্ণ তার প্রমাণ ভারি হ'য়ে উঠেচে, তবুও নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি। কিছুই যদি সংগ্রহ করতে না পারি তবে ক্লান্ত হাড় কখানা মিলিয়ে দিয়ে যাব সেই নিষ্ঠুর জননীর পায়ের ধুলোর সঙ্গে।"

তিন দিনের অভিনয়ে যা অনুভব ক'রেচি তা বলবার আগে যা দেখেচি তার একটু উল্লেখ করবো।

এবারকার বসন্ত উৎসবের নাম নবীন। "যাদের রস-বেদনা আছে তারা বলচে আমরা নতুন চাইনে আমরা চাই নবীনকে।" বসন্ত-উৎসব ত্রিরিশটি গানে রচিত। প্রত্যেকটি গানের অবসরে বসন্তকালের আগমনী থেকে বিদায়ের ভঙ্গীর বর্ণনা আছে। কবি যে কথা বলতে চেয়েচেন তার বাক্য যেখানে থেমেচে সেখানেই ছন্দ এবং সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠেচে, সেই সুরের রূপ সম্পূর্ণ হয়েচে নৃত্যের ছন্দে। মঞ্চের এক ধারে কবি অন্য ধারে, গায়ক গায়িকা এবং মাঝ খানটা ছিল নৃত্যের জন্য খোলা। এই তিনটি বিভাগে বসন্তের তিনটি রূপ প্রকাশিত হয়েছিল,

বাক্যরূপ, সঙ্গীত-রূপ এবং নৃত্যরূপ। কবির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধারে সে কথার ধ্বনি সুরে জেগে উঠে তার অর্থ স্ফুটতর ক'রে তুলছিল। কথার অর্থ সুরের যোগে যেমন প্রাণে এসে পৌঁছয়, নৃত্যের ছন্দে সেই কথার অর্থ একেবারে দৃশ্য রূপে ফুটে ওঠে। সুতরাং যেকথা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না তা একেবারে সুরের পথে মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে সমস্ত বোধের মধ্যে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। সেই জন্যই বসন্ত উৎসবের সঙ্গীত কেবল শ্রুতি-গোচরও নয়, দৃষ্টিগোচরও বটে। অলিমালা মধুরিমার গান শেষ হ'লে কবির কণ্ঠেও কয়েকবার তা প্রতিধ্বনিত হয়েচে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কবি দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড এবং চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও বসন্ত উৎসব করেচেন!

গানগুলোর ভিতরে ভিতরে আছে লালন ফকিরের দেহতত্ত্বের সুর। কিন্তু বহিরাবরণ ভাষার ঐশ্বর্য্যে সে সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করচে। সুরের ভিতরে তাকে না পেলে ভিতরের বাউলটিকে ধরা সহজ হয় না—

> ও বেলা ডাক পড়েচে কোন্ খানে
> ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে,
> যেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে
> সুরের খেলা ডুব সাঁতারে
> যেখানে চোখ মেলে তার পাইনে দেখা
> তাহারে মন জানে গো মন জানে।

খেলা জমানোর চেয়ে খেলা ভাঙার দিকেই কবি ঝোঁক দিয়েছিলেন বেশি, সেই জন্য খেলা ভাঙার নৃত্যটি সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। ঝরা পাতার গানের সঙ্গে, কিংবা 'বসন্ত দিন চলে যায়' গানের সঙ্গে যে-নৃত্য ছিল তাতে করুণতার তীক্ষ্ণতা ছিল, খেলা ভাঙার তেজ তাতে থাকবার কথা নয়।

শেষ দৃশ্যে যে ছবি ফুটেছিল তার তুলনা হয় না। সে অনির্ব্বচনীয়। প্রলয় তাণ্ডবের ঘূর্ণাবর্ত্ত,—বাঁধন ভাঙার উদ্দাম উন্মাদনা,—কবি নিজে সে ঘূর্ণিতে যোগ দিয়েছেন, বসন্তের সমস্ত পুষ্পপত্র যেন নাচতে সুরু ক'রল, সেই আবর্ত্তে রাঙা আবিরের ধোঁয়ায় সমস্ত দৃশ্যটাকে একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যে রূপান্তরিত ক'রে তুলে ছিল। সে যেন সমস্ত আকাশ রঙিন ক'রে সূর্য্যের বিদায়, তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিল নন্দিনী, সেই প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে ঐ একটুখানি কচি প্রাণ—ঐ ত সেই চির নবীন, সেই কচি কিশলয়, যার মধ্যে ঝরা পাতা, বিদায়বেলার আপনাকে লুকিয়ে রেখে গেল।

আনন্দময় বিশ্বের আনন্দের বেগ যদি অন্তরে বেদনার আবেগ সৃষ্টি করে, তবে নীরবে শুধু উপভোগ করাই চলে না। তখন শুধু গান শোনবার নয় গান শোনাবার জন্য মন ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে। সেই রস-বেদন, সেই ব্যাকুলতা কবিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দেয়।

প্রকৃতির অনন্ত আনন্দের উৎস থেকে যে আনন্দের ঢেউ আমাদের মনে ক্ষণে ক্ষণে এসে লাগে তা আমাদের অন্তরকে অভিভূত করে, কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করবার ভাষা আমাদের জানা নেই। যাঁর মনে সেই আনন্দ ছন্দে সুরে রূপায়িত হয় তিনিই কবি। আনন্দ প্রকাশের ভাষা তাঁর রস-বেদনা থেকে জন্মগ্রহণ করে। শুধু কথার সমষ্টি সে নয়, সেই আনন্দের আবেগ ছন্দে সুরে তাঁর মন থেকে রূপ গ্রহণ ক'রে আমাদের চিত্তের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। বিশ্বস্রষ্টা যে আনন্দ-প্রবাহ তাঁর বস্তু-সুষমার ভিতর দিয়ে আমাদের অন্তরে প্রেরণ করচেন, কবিও সেই আনন্দপ্রবাহ শব্দের সুষমায় আমাদের চিত্তে প্রেরণ করচেন। রূপ-সৃষ্টির সময় কবি যে বাক্যের আশ্রয় নেন, সে বাক্য আমাদের পরিচিত ব'লেই তাঁর ছন্দ সুর আমাদেরো মনে একটা রূপ পায়। সেই ছন্দে সুরে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমরা মনে করি এই ত ভাষা পেলুম, মনে করি কবি যে আমার অন্তরের সকল আনন্দ আমারি ভাষায় প্রকাশ করেচেন, তাঁর কথায় আমার কথায় ত কোনো তফাৎ নেই! তিনি আমার হ'য়ে আমার কথা এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কি ক'রে প্রকাশ করলেন তা ভেবে মুগ্ধ হই। বিশ্বের আনন্দরসের সঙ্গে কবির আনন্দরূপ যুক্ত না হ'লে সুন্দরের উৎসবে আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হ'ত না।

অনন্ত বিশ্বের আত্মার সঙ্গে মানুষের আত্মার যে একটা গভীর যোগ আছে, সেই যোগের ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করতে পারলে অনন্ত আনন্দের ক্ষেত্রে পৌঁছানো যায়। কবি গান-এর ভিতর দিয়ে এই একাত্মার অনুভূতিকে প্রকাশ করেচেন, ঋতু-উৎসবে সেই অনুভূতিটিই মূর্ত্তি ধরে এল, সে

সৃষ্টি কোন আনন্দের সৃষ্টি নয়,—সে আনন্দ-বেদনার সৃষ্টি কবি নিজের কথা নিজে বলেছেন,—

ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান
আপন হারা প্রাণ,
আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রং লাগলো আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্ম্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান ॥

হবে না?—কবি বলচেন—সৌরভের দানসত্রে আমিও বার বার দান করেচি—শূন্য হাতে আসিনি।

কবি বিশ্ব স্রষ্টার সঙ্গে এক হ'য়ে মিলেচেন। কবি তাঁর গুরুর কাছে যে কথা বলেচেন, আমারাও কবিকে সেই কথাই বলি,—

তোমার সুরে ভাবিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাবো যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।

সমস্ত বিশ্বের অন্তরে অন্তরে একটা অখণ্ড আত্মা সর্ব্ব-ব্যাপী হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। সৃষ্টির আদিতে সবই ত একীভূত ছিল, আমরা কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে পৃথক হ'য়ে

"......আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন রাউত রায় কর্তৃক গৃহীত।

পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনী গন্ধায়
রূপ-সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙ্গীন স্বপন মাখা
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান ॥

—"অশোক বনের রং মহলে আজ লাল রঙ্গের তানে তানে পঞ্চম রাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দান সত্র। আমরাও শূন্য হাতে আসিনি।"

অর্থাৎ যে প্রাণ দিকে দিগন্তে আপনাকে প্রকাশিত করেচে—সে প্রাণ মানুষের ভিতর দিয়ে কি প্রকাশিত পড়েচি। এবং পৃথক হ'য়ে পড়েচি বলেই পূর্ব্ব আত্মীয়তার কথা মনেই পড়ে না। তবু ক্ষণে ক্ষণে যখনি বাহিরের কোনো দৃশ্য দেখে অথবা শব্দ শুনে মন আনন্দে নেচে ওঠে তখনি আমাদের 'বহু দিবসের বিস্মৃত বাণী' হঠাৎ মনে জেগে ওঠে। মানুষের মধ্যে কৃত্রিমতা প্রবল বলেই সে নিজের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বকে এক ক'রে দেখতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যে সুরে গান করচে, মানুষ সে সুরের সঙ্গে আপন সুর মিলিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু এই সুরের সঙ্গে যিনি সুর মিলোতে পেরেচেন, তাঁর কাছে জন্ম মৃত্যুর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনিই কেবল বলতে পারেন,

"খেলা সুরুও খেলা, খেলা ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হোলো বাঁধন, খেলার শেষে হোলো বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধ'রে এই খেলার নাচন।"

এই ভাঙা গড়ার মধ্যে মানুষের হৃদয় দুলচে। তার বিরাট কল্পনা ও অনুভূতিকে ছাড়িয়ে উঠেচে তার ছোটো খাটো দুঃখ সুখের মাধুরী। এই পৃথিবীর মহামিলনের ক্ষেত্রে তার বিরহ কিছুতে ঘোচে না। এই বিরহের শূন্য পাত্র সে তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের অমৃতে বারে বারে ভ'রে তোলে। এই লীলাই তার জীবনের মহামূল্য সম্পদ।

এবং এই জন্যই যাঁর মন ধ্যান করচে—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"—তাঁর মন কেঁদে বলচে "ধন নয় মান নয় শুধু ভালবাসা, করেছিনু আশা।" এবং যে মন বলচে,—"আমি ছুটে আসিব গো ওগো নাথ, ওগো মরণ হে মোর মরণ"—সেই মন কেঁদে বলচে, "আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে।"

"দোল লেগেচে এবার। পাওয়া আর না পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ ক'রে ক'রে দুলচে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগচে।

মানুষের প্রাণেও বিরহ মিলনের এই দোলন। তাই বসন্ত-উৎসব একধারে যেমন বসন্ত কালের আনন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আনন্দ করবার উৎসব,—তেমনি এটা তার বিদায়ের শোক-গাথা।

অর্থাৎ কবি সঙ্গীত এবং নৃত্যের ভিতর দিয়ে একটা অরুন্তুদ ট্র্যাজেডি রচনা করেচেন। বসন্ত কালের বিদায় উপলক্ষ্য ক'রে কবি নিজের অস্তোন্মুখ জীবনের গান অতি নিদারুণ করুণ সুরে গেয়েচেন। বসন্তের আসনে নিজেকে বসিয়ে, তিনি আমাদের হ'য়ে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদের কাঁদিয়েছেন।

"হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন ক'রতে এসেছিলো তার ছুটির দিন এলো। তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ ক'রেচো সেই তা'র আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমারি দ্বারে—তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন র'য়ে গেলো তোমার সাথের সাথী। তোমাকে সে তা'র সুরের রাখী পরিয়েচে—তার চির পরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।"

তার পর যে কথা শুধু কথায় বলা গেল না—কবি সুরের ভিতর দিয়ে সে কথা ফুটিয়ে তুল্লেন,—

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক,
যায় যদি সে যাক ॥
রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে;
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না নির্ব্বাক ॥
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তা'রে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক ॥

শেষবারের মতো দেওয়া নেওয়া চুকিয়ে দিতে দিতে বলছেন,—

তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে, মর্ম্মরিত মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হ'তে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন যে বাণী নীরব নয়নে।

এর সঙ্গীতে যে একটা বেদনা ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল তার তীক্ষ্ণতা কম ছিল না।

দ্বিতীয় পর্ব্বের প্রথম ছত্র হ'তেই বেদনার সুর সমস্ত কথাকে ছাপিয়ে উঠেচে। সে বেদনা অন্তর থেকে বাহিরের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্ম্মে মর্ম্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।

কবি বসন্ত বন্ধুকে যে কথা বলেছেন, আমরাও কবির সুরে সুর মিলিয়ে কবিকে সেই কথাই বলেছি—

যখন মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥

এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি ?

গান ক'রতে ক'রতে কবি শ্রোতার আসনে ব'সে সে গান শুনছেন। তিনি নিজের বাঁধন-ছেঁড়া আত্মাকে ছেড়ে দিয়েছেন বসন্তের উৎসবের মধ্যে—তিনি নিজেকে বিস্তার ক'রে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গীতের ছন্দোময়ী মূর্ত্তিতে, এবং সেই রঙ্গে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বসিয়েছেন শ্রোতার আসনে। গায়ক-কবিকে শ্রোতা-কবি বলছেন—

ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে।
ঝরা পাতা গো বসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছো তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।

তারপর——

ক্লান্ত যখন আম্র কলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমি তলে অবসন্ন।
সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে কর ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি' দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
রণসভাতলে সবার ঊর্দ্ধে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

কবি দূরের ডাক শুনতে পেয়েছেন—

"পথিক তোমাকে ফেরাবে কে? তোমার আসা এবং যাওয়াকে আজ এক ক'রে দেখাও।"

কবি তত্ত্বকথায় নিজের বেদনাকে চাপা দিচ্ছেন। সেই তত্ত্বকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায়। সে হচ্চে জন্ম ও মৃত্যুর তত্ত্ব। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই—ওরা একটি পরিপূর্ণ জীবনের দুটি অংশ। ওরা এক সঙ্গে মিললে তবে পূর্ণের দেখা পাওয়া যায়।

"যখন পিছন ফিরে চ'লে যাও সেই চলে যাওয়ার ভঙ্গীটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে আসায়, শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পাইনে তাই হায় হায় করি।"

এই তত্ত্বজ্ঞান থেকে এল অনুভূতি—

"সেথানে শুদ্ধ বীণার তারে তারে
সুরের খেলা ডুব সাঁতারে
সেথানে চোখ মেলে যার পাইনে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে॥'

কিন্তু তত্ত্বকে ছাপিয়ে যে অদম্য ব্যথা হৃদয়কে ব্যথিত ক'রে তোলে তাকে জোর ক'রেই ভুলতে হবে। সুরের এবং নৃত্যের উন্মাদনায় সব বেদনা উড়িয়ে দিতে হবে।

"সুরুর সঙ্গে শেষের সম্পূর্ণ সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি ক'রে চলে যাও।"

"আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়!
মিলন মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কাল বৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন
হাসি কাঁদন পায় ঠেলবি আয়॥"

খেলা ভাঙার নৃত্যে কবি বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর জয় হ'য়েচে।—

'বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া জ্বালা!

তার পর বিজয়ী বীর প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যের আবর্ত্তে সকল বন্ধন, সকল আশা আকাঙ্খা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে মুক্তির পথে জয়যাত্রা করলেন

'ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ঐ তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণী লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝঞ্ঝারিয়া উঠলো আকাশ ঝঙ্কারবে।
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে॥
ভাঙন ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায়রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা ক'বে॥
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে॥

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

এই সময় অক্ষয় দ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "পিসীমা!" টাটকা রণ-প্রত্যাবৃত্তের স্বর এখনও কম্পিত। চারুবালা ধড়মড় করিয়া উঠিলেন, "কি খবর উনি এসেছেন, অন্য কিছু? শীঘ্রই বল।" দাসীকুল অব্যাহতি পাইল, চারুবালাও নিষ্কৃতি পাইলেন—। পীড়ক ও প্রপীড়িতের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার অবসানে, অধিকাংশ স্থলে উভয় পক্ষই সুস্থ অনুভব করে। বলা বাহুল্য অক্ষয়ের আবেদন বেমঞ্জুর হইল না। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ, নির্দ্দেশ, আশ্বাস ও পরামর্শে এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থায় চারুবালা তাহাকে সেইদিনই পৃথক বাটিতে পৃথক সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। অক্ষয় তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্য ও ব্যবস্থা-নৈপুণ্যের পরিচয়-প্রাপ্তিতে ধন্য হইল। কয়েকটি বাছা বাছা বিশেষণে জ্ঞান বাবুর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে অক্ষয়ের আশু অপমানের জ্বালা বিদূরিত ও রূঢ় ব্যবহার-নিবন্ধন গাত্রবেদনা উপশম করিয়া তাহাকে কালবিলম্ব না করিয়া রাত্রির মধ্যে সব বন্দোবস্ত গোছগাছ করিয়া লইতে বলিয়া বিদায় দিয়া চারুবালা ভাবিতে বসিলেন—চুল বাঁধা সে দিন আর সমাপ্ত হইল না, শেষের ঘটনাটি নূতন কিছু নহে।

নব বধূর বেশে এই বাড়ীতে পদার্পণ করিতে আসিবার দিন হইতে চারুবালার মনে সপত্নীপুত্রের উপর একটা নিষ্ক্রিয় আক্রোশ-ভাব জাগরূক ছিল একটির পর একটি দুইটী কন্যা হইয়া যখন তিনি পুনরায় সন্তানসম্ভবনা সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইলেন তখন এই বিদ্বেষ ক্রিয়াশীল হইয়া ক্রোধ ও হিংসায় পরিণত হইল। বিবাহের পর মাতার পক্ষ হইতে শত প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও কন্যাদ্বয় যখন জামাতা বাবাজিদের অতিরিক্ত পোষ মানিয়া গেল—বাবাজীবনেরাও এয়াড়া চাল চালিয়া শাশুড়ীর নিকট ধরা ছোঁয়া লৌকিক কর্টুম্বিতা সূত্রেই যেটুকু শোভন, তাহাই দিয়া এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল; তখন তাহারা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়া 'সারং শ্বশুর মন্দিরং' কথার অসারতা উপলব্ধি করিয়া বাৎসরিক সাক্ষাৎসম্বন্ধ, তত্ত্বতাবাস্, পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। ললিতের অপরাধের সীমা রহিল না, চারুবালা যদি ললিতের সঙ্গে ব্যবহারে সৌজন্য অতিক্রম করিতে পারিতেন তাহা হইলে এ বিদ্বেষভাব অনেকটা লাঘব হইয়া যাইত; কিন্তু শিক্ষা স্বভাব সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বাহ্যিক ব্যবহার নিয়ত মৌখিক সৌজন্য ও ও শিষ্টতার গুরুভারে জর্জ্জরিত হইয়া অগ্নিতে নূতন ইন্ধন যোগাইয়া চলিল। সে বিমাতার আন্তরিক বিদ্বেষ সম্যকরূপে অবগত ছিল, বিমাতারও তাহা গোপন রাখিবার চেষ্টা মোটেই ছিল না; যত্ন ও ভদ্রতা যে তাঁহার অনিচ্ছার দান, ভয়ে নহে, কর্ত্তব্যের অনুরোধেও নহে নিজের মর্য্যাদাজ্ঞান প্রসূত তাহা তিনি সাধ্যমত বুঝাইতে ত্রুটি করিতেন না, অবশ্য মৌখিক কিছুই ব্যক্ত হইত না। কিন্তু এত হইলেও কি হয়, ললিত তাহা ভ্রূক্ষেপ করিত না। আপ্যায়ন সেবা ও ব্যবহারের মধ্যে ঢালা বিষটুকু ভাল করিয়া দেখিয়াও সে যত্নটুকু নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করিয়া বিষটুকু যে দিয়াছে তাহারই জন্য ফেলিয়া রাখিত। ললিত যদি বোকা হইত, বিমাতার আন্তরিক মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইত তাহা হইলে তাহার দোষের ক্ষমা ছিল কিন্তু চারুবালা বিলক্ষণ জানিতেন, ললিত সমস্তই বুঝে, এবং নিজে তাহা লইয়া চিন্তাও করে—অতএব তাহার শাস্তি অনিবার্য্য। আবার ললিত যদি এই অবিরাম বৈরীতার প্রাপ্য পাল্টা জবাবটুকু দিয়া তাঁহার সহিত রেশারেশি করিত তাহা হইলে তাহার অপরাধের লঘু দণ্ডবিধান ছিল; ললিত যে সাধু নহে, বিমাতার প্রচ্ছন্ন বিষ যে সদানন্দের মত অকুণ্ঠ-চিত্তে পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার উচ্চাশা পোষণ করে না তাহাও চারুবালা বেশ জানেন। অতএব তাহার এই মনের বিষ মনে রাখিবার ক্ষমতায়, বিমাতা অপেক্ষা নিজেকে সে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করায় সে চরম শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে।

চারুবালা সংসারে নিজেকে বড় একা মনে করেন—অদৃষ্টের বঞ্চনায় তিনি মর্ম্মাহত কিন্তু অভিভূত নহেন। দারুণ আক্রোশশিখা খরজিহ্বা নিয়ত লেলিহান করিয়া ফিরিতেছে, দাহ্য বস্তুর সন্ধানে; যাহার সেই কাম্যের সহিত সাদৃশ্য আছে যেখানেই গোপন আত্মা 'হইলেও হইতে পারিত' এই প্রত্যয় করে, সেইখানেই যেন দাহিকা জ্বালা ছুটিয়া যায়—কেন্দ্রীভূত বিক্রমে তাহাকে পোড়াইতে; তাই ললিত আজীবন দগ্ধ হইতেছে—তাই শ্যামের মধ্যে সেই ঈপ্সিত দুষ্প্রাপ্যের গন্ধ পাইয়া বহ্নি তাহারও পশ্চাদ্ধাবন করিতে উদ্যত হইয়া পথ খুঁজিতেছে—অক্ষয় অবধ্য, কারণ সে যে কোন স্তরের জীব তাহা চতুর চারুবালার অগোচর নহে।—বৃত্তির পূর্ণ প্রয়োগ না হইলে, সে প্রয়োগের সুযোগ সমূলে বিনষ্ট হইলে, তাহার আশা পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইলে, ব্যবহারে চরিত্রে যে এই 'বিপরীত ভাবের' টান রহিবে তাহা অনেক স্থলেই দেখা যায়;—এই স্থলে মানবের যাবতীয় ব্যবহার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই 'একা' ভাব হইতে; কখন 'বিরহ'রূপে তাহা মিলনের সূচনা করে, তখন মানব দীন বেশে প্রেমভিখারী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; আবার কখন 'মান' রূপে, তখন দুরন্ত কলহের বন্যা লইয়া মানব আত্মমগ্ন, অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে ভাসাইতে, ডুবাইতে, ধ্বংস করিতে।—যেখানে যেমন স্বভাব ও শিক্ষা।—চারুবালার শক্তি প্রচুর, ক্ষুধা প্রচুর, দীনতা কার্পণ্য লেশ শূন্য, তাই সংকীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে, বিষয়ের আধারের অভাবে তিনি ধ্বংস লীলার পুরোহিত—এ যজ্ঞ পূর্ণ হওয়া পণ্ড হওয়ার নিয়ন্তা অবশ্য অন্য একজন।—

চারুবালা স্ত্রীজাতি, অগ্রজের নানা কল্পিত ভয়প্রদর্শনে অনেকটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য একথা বিস্মৃত হইবার নহে। ভবিষ্যতের নিরাশ্রয় অবস্থার চিত্র তাঁহার কল্পনায় জাগ্রত হইতে যতটা তৎপর তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিতেও ততটাই সক্ষম।—অক্ষয় প্রস্থান করিলে চারুবালা ঘোর চিন্তামগ্ন হইলেন—ক্রমশঃ এই চিন্তা আসিয়া শ্যামকে লইয়া পড়িল—স্বামী কলিকাতা গিয়াছেন টাকার যোগাড়ে; সেই টাকা শ্যামকে দিতে হইবে, না দিলেই ভাল হয়। এতটা সহজে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে, ইহা মনঃপুত নহে, অথচ না দিলে পরোক্ষে তাঁহার নিজেরই বিপদের সম্ভবনা—এক কথা হইতে দশ কথার সৃষ্টি, সরিকী বিপদে তাঁহার নিজের নামে কেনা সম্পত্তির এই পরিণাম, মোটেই অভিপ্রেত নহে—এদিকে শ্যামের দাবী ন্যায্য—বিবাদ বাধিলে তাহার পক্ষে শেষ ফল ভালই, অন্ততঃ ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই; এক্ষেত্রে কি করা যায়? এত সোজাসুজি অক্ষতদেহে বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সিদ্ধি শ্যাম করিয়া লইবে, এ সম্বন্ধে কিছু করা প্রয়োজন, অন্ততঃ তাহাকে একটু জব্দ করিতে হইবে। এই জনপ্রিয় মিষ্টস্বভাব প্রিয়দর্শন যুবকের সরল নিশ্চিন্ত ভাব তাঁহাকে আরও উত্তেজিত করিতেছে—বিশেষতঃ সম্প্রতি ললিতের বিরুদ্ধে একটা বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—মেলাপুরের সেই মেয়েটির সহিত তাহার বিবাহ দিতে পারিলে বড় তৃপ্তি হইত; মেলাপুরের বাজারা শূকরের ব্যবসা করিয়া বড়লোক ও রাজ উপাধিভূষিত, জনপ্রবাদ যে সেইজন্য বংশের সকলে কি স্ত্রী কি পুরুষ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উপর শূকরের মত মুখাকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন—যাক্, সে যখন হইল না তখন আপশোষে কি ফল? কিন্তু শ্যামকে সহজে ছাড়া হইবে না—। স্বামী আসুন, একটা পথ পাওয়া যাইবেই। পশ্চিমের গবাক্ষপথে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ম্লান লোহিত মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহার পর ধীরে সূর্য্যাস্ত হইল—চারুবালা অসংবদ্ধ বেণী কোনও মতে জড়াইয়া, আরতির যোগাড় যন্ত্র তত্ত্বাবধান করিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—

ব্রজকিশোর নানা ক্ষত, কতক নূতন কতক পুরাতন, কতক নূতনরূপে পুরাতন, লইয়া ফিরিতেছেন—অবস্থা নৈরাশ্যের ঘন কুয়াসা ঢাকা, প্রাণশক্তির ক্ষীণতাসূচক ঘোর কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। কলিকাতায় পক্ষাধিককাল অবস্থান মন্থর অথচ অমোঘ বিষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে।

ললিত সেই যে কলিকাতা পঁহুছিয়া ছাত্রাবাসে গিয়াছিল পিতার সহিত আর বড় একটা সাক্ষাৎ হয় নাই—বিশেষতঃ পিতার শ্বশুরালয়ে তাহার গতিবিধি ছিলই না। সুধীর বাবু ভগ্নীপতি আসিবা মাত্র তাঁহাকে গ্রাস করিয়া বসিলেন। প্রথমে মদের পাল্লা, থিয়েটার, আখড়াই মজলিশ, নাচের আসর, বাগান বাড়ী ইত্যাদিতে আগমনের উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া রহিল; তার পর একদিন, অবসাদজনিত এক বিরামের অবসরে, সুধীর বাবু মক্কেল-ভুলান গম্ভীর চালে

সমুদায় বক্তব্য পুনরায় শ্রবণ করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন—তিনি চেষ্টা করিবেন। অতঃপর আরম্ভ হইল বিষম ছুটাছুটির মহল্লা; এটর্নির আফিস্; মহাজনের গদী, নানা স্তরের দালাল-দলের আড্ডা—কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, সময়ে অসময়ে, ব্রজকিশোরের আপত্তি জালকে, কাজের দোহাই দিয়া হেলায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সুধীর বাবু তাঁহাকে টানিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে যেদিন ক্লান্ত ব্রজকিশোর নৈরাশ্যের শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া বিরতি প্রার্থনা করিলেন, তখন সুধীর বাবু, জগৎ সংসারের অলীকতা, মানবসাধারণের ক্ষুদ্রতা বিষয়ক এক অনর্গল বক্তৃতার সঙ্গে বিভিন্ন পরিচিত ও উপকৃত বন্ধুবর্গের কলঙ্কগাথা আরম্ভ করিয়া দিলেন; যাহার শেষ কথা টাকা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ বিশেষতঃ যদি তাহার দরকার থাকে, আর যে দিতে পারে তাহার নিকট যাচ্ঞা করিলে। টাকার মহিমা সম্পূর্ণ অবগত হইয়া স্পন্দনহীন দেহ ব্রজকিশোর ভগ্ন-মনোরথ হইয়া বিদায় প্রার্থনা করাতে সুধীর বাবু নিরালা দেখিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন ব্রজ-কিশোর আবার সাহসে ভর করিয়া শ্যালককে শেষ মিনতি জানাইলেন, "আমি ধার পাব না, সরিকী সম্পত্তি, মফস্বলের লোক, কিন্তু সুধীর তুমি পেতে পার আমার মান বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও।" ভ্রাতার সুদীর্ঘ প্রবাস ও দুর্ব্বল চিত্ত আজ তাঁহার জীবনে যে মহা জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার মধ্যে একমাত্র আত্মাভিমান ক্ষীণ বিবেকের প্রতি-নিধি স্বরূপ, ধর্ম্মবুদ্ধিরূপে জাগ্রত।

সুধীর বাবুর বিচক্ষণ বিষয়বুদ্ধিতে ঋজুকুটিল নানা পথ অবলম্বনে সর্ব্বদা আপাত দৃষ্টিকে পাশ কাটাইয়া চলিত, এই বুদ্ধির বীজমন্ত্র ছিল অতি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ, অহেতুকী লোভ। তাঁহার গোপন সাধনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য একটা নিষ্কাম তথ্য পাওয়া যাইত। তাঁহার আসক্তি লোভের বিষয়ে আধারে যতটা না হউক বিশুদ্ধ অনুসরণে ততোধিক; 'মা ফলেষু কদাচন' উপলব্ধি চোর কুঠরীতেও বসিয়া হইতে পারে—অনেক চোর এইরূপ চুরি করে, কেবল চুরির জন্য, অভাব, লোভ, হিংসা, রাগ তাহাদের মধ্যে থাকে না, কেবল চুরির নেশায়, চুরি করিয়া ফেলে। সুধীর বাবুর লোভ অতি সহজেই প্রবুদ্ধ হইত, অনুসরণে তাহার গতি প্রচণ্ড, ফলাফল সম্বন্ধে নির্ব্বি-কারচিত্ত বলিয়া, সে গতির মধ্যে দ্বিধা নাই, ভয় নাই ভ্রূক্ষেপ নাই বাছবিচার নাই, ততটা সুচিন্তিতও নহে; সে লোভ হতাশায় ভগ্নোদ্যম হয় না, পুনঃ পুনঃ বিফলতায় তাহার নিবৃত্তি হইবার নহে; মায়ামমতা ন্যায়পুণ্যবর্জ্জিত, এই লোভ, অহেতুকী, অশরীরী নিষ্কাম, উদ্দাম, অবাধ লোভ, কন্তাকউদাসীন হস্তে জাল রচনা করিয়া তৃপ্ত, বিভোর; —ব্রজবাবু এই জালে পড়িয়াছেন। সুধীর বাবু অনেক ধার করিয়াছেন, তাঁহার লোভ ভবিষ্যতে শোধ দিবার ভয়কে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে। এই লোভ ছাড়িয়া দিলে যে মানুষটি সে কেবল সুরুচি। ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী, সুশিক্ষিত অতএব কৃতকার্য্য, সদ্বংশীয় অতএব মার্জ্জিতরুচি চারুবালা অগ্রজের এই ক্ষেত্রে প্রধান সহায়, কিন্তু তাঁহার বিশাল কৌশলজালবেষ্টনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; ভগ্নীর প্রতাপে অনেক সমস্যাগ্রন্থি বাধাহীন—সুধীর বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। সুধীর বাবুর মক্কেল, সর্ব্বস্বান্ত, এককালে বৃহৎ মহাজনী কারবারের মালিকের, বেনামীতে ব্রজকিশোরের নিকট হইতে ধার করা টাকার অধিকাংশ আবার ব্রজকিশোরকেই উচ্চতর সুদের হারে ধার লইতে হইয়াছে, বাদার জমিদারী ক্রয় করিতে সুধীর বাবুর ভগ্নীর নামে এইটি কেনা হইয়াছে, ব্রজকিশোরের ইপ্সিত না হউক সম্ভাবিত অবর্ত্তমানে সুধীর বাবুই ভগ্নীর অভিভাবক। সুধীর বাবু এই ঋণের জন্য ভগ্নীপতিকে দলিল দিয়াছেন, অন্য সকল সময়ে অসময়ে খুচরা ঋণ কোন পক্ষই ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না তাহার কোন প্রমাণও নাই। এইরূপে ভ্রাতার বিরাট কল্পনা, ভগ্নীর ক্ষিপ্র বিদ্যুৎগতি বুদ্ধিতে সুবিন্যস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। তবে কার্য্যক্ষেত্রে দুইজনে একপথে অগ্রসর হইলেও ভগ্নী ভ্রাতার অন্ধ যন্ত্রমাত্র নহেন। চারুবালার একটা বিশিষ্টতা ও একটা স্বাধীনতা ছিল। ভ্রাতার অন্তরে একটা যন্ত্র সমভাবে চলিয়াছে, সাফল্য পরাজয়, পরিণাম কিছুই সে যন্ত্রের ছায়া মাড়াইতে পারে না; আর ভগ্নীর অন্তরে হুতাশন, প্রচ্ছন্ন অথচ প্রখর, দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ্যের পীড়নে, ভবিষ্যতের ভাবনায়, অহঃরহঃ আত্মরক্ষার উৎকট চাপা চেষ্টায়, প্রাণময়। ভগ্নীর স্বচ্ছ হিংসায়, ভ্রাতার মগ্ন লোভ; ভগ্নী ভ্রাতার নিকট স্বচ্ছ, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট ঘন তমসাবৃত। ভ্রাতা কল্পনা, ভগ্নী চেষ্টা।

সুধীরবাবু ভগ্নীপতির কাতরতা দেখিয়া এতক্ষণে বিচলিত হইলেন। এপর্য্যন্ত মৌখিক সহানুভূতির অবগুণ্ঠনে আন্তরিক উপেক্ষা সত্য সত্যই বিচলিত, তিরোহিত হইল। দয়ার স্রোতে নহে অহেতুকী লোভের একটা নূতন তরঙ্গে। তিনি ভাবিলেন, ভগ্নীপতির অবস্থা এখন চরমে আসিয়াছে-এই সময় এই প্রস্তাব, এই নূতন ঋণের জাল নব নব রক্ত উদ্ধার করিবে, বন্ধন দৃঢ়তর, বিস্তার আরও ব্যাপক হইবে। মধ্যপথে আরও অনেক সুবিধা উপসর্গের মত জুটিতেও পারে। হাতছাড়া করা কাজের কথা নহে, বস্তুতঃ স্বাধীন ভাবে চেষ্টা করিলে এই ঋণ অনা-য়াসলভ্য তাহা মূর্খ ব্রজকিশোরই কেবল জানেন না।

অশ্বাসের উৎসে সিক্তিতকলেবর ব্রজকিশোর দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। সুধীরবাবু পক্ষকাল মধ্যে টাকা লইয়া শ্রীনগরে হাজির হইবেন, সজল নয়নে শপথ করিয়া জানাইলেন—দলিলের অঙ্গপূর্ণ করিয়া সেইখানেই সহি-কার্য্য সমাধা হইবে। দেহ মন একান্ত অবসন্ন ও দেশের বাড়ীর তিয়াসায় অধীর না হইয়া উঠিলে এই সময়টা ব্রজকিশোর ভ্রতুষ্পুত্রের সম্মুখীন হওয়ার অস্বচ্ছন্দতা এড়াইয়া কলিকাতায় থাকিয়া যাইতেন। শ্যালকের প্রতিজ্ঞাবাক্যের ছটায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার দৃঢ় আশ্বাসবাণীতে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ব্রজকিশোর শ্রীনগর যাত্রা করিলেন। অদৃষ্ট তাঁহাকে অব্যর্থ আকর্ষণে টানিয়াছে।

ব্রজকিশোরের স্বগ্রাম প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বাহ্নে সেখানকার একটি সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরেন মণ্ডলের সংসার বহুপূর্ব্বেই ভাঙ্গা উচিত ছিল, কেবল বৃদ্ধের জিদে পুত্রেরা দায়ে পড়িয়া কোন মতে এই শত্রুবেষ্টিত পুরীতে বাস করিয়াছে; দশবার দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া ধীরেন যখন উঠিয়া হাঁটিতে পারিল তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহর হইতে দুঃসংবাদ শুনিয়া গ্রামে আসিয়াছে। পুত্রেরা যুক্তি করিল শ্রীনগর ছাড়িয়া যাইবে; ধীরেন এইবারে আর কোনও আপত্তি করিল না; তবে যাত্রাকালে শত কাকুতি মিনতিকে উপেক্ষা করিয়া সে সাথী হইল না, একা রহিয়া গেল; হাবা ছেলেটা তাহার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, ধীরেনের ইঙ্গিতে ভাইয়েরা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। ধীরেন গম্ভীর ভাবে সকলকে বিদায় দিল। অসুখের সময় ভাবিয়া ভাবিয়া ধীরেনের মনে এক বিষম ওলটপালট হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক মানুষের গঠনপ্রণালীর মধ্যে একটা নৈতিক রজ্জু থাকে, এই নৈতিক রজ্জুই মানুষকে সমাজের উপযোগী ও অন্যের নিকট তাহার স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখে। সংস্কার ও শিক্ষার তারতম্যে ইহার দৃঢ়তা; আবার বিভিন্ন ব্যক্তিতে এই রজ্জুর নির্ম্মাণপ্রণালী এমন বিচিত্র যে একে যে আঘাতে ম্রিয়মাণ সেই এক আঘাতই অন্যের লক্ষ্য গোচরই নহে। ব্যক্তিবিশেষের উপর এই আঘাতেরই হয়তো এমন একটী বেগ ও পরিমাণ আছে যাহা সেই ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক রজ্জুকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। বেগ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন বলিয়া একটা জগৎজোড়া নৈতিক পরিমাপ স্থির করা বাতুলতা। ধর্ম্ম এই দোষেই দীন ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

অসুখের সময় ভাবিতে ভাবিতে এক সময় ধীরেন মণ্ডলের এই নৈতিক রজ্জু একটা কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার অসুখও সেইদিন হইতে একেবারে সারিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে তাহার কেবল মনে আসিতে লাগিল, যে সব খুঁটিনাটি মানুষের নিকট এতদিন ধরিয়া সে সহ্য করিয়া আসিতেছে, আর রক্তবর্ণ কল্পনা পটের পর পটে তাহাকে নূতন দৃশ্য দেখাইতে লাগিল, প্রত্যেক দৃশ্যে সে কড়া ক্রান্তিতে সকলকে পরিশোধ দিতেছে, কাহারও দেনা বাকী নাই।

অক্ষয় দেখিল ধীরেন বাবুর বিরুদ্ধে নানা অভিযান-জল্পনায় সাগ্রহে যোগ দেয়, পাঠক বুঝিলেন ধীরেন এতদিনে একটা কাজের লোক হইয়াছে, কথায় কথায় আর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে না। আগুন তখন তাহার অন্তরের মধ্যে গভীর প্রদেশে গিয়াছে উপরে তাহার উত্তাপও আর অনুভূত নহে।

যেদিন সন্ধ্যায় ব্রজকিশোর গ্রামে ফিরিলেন, সেইদিন গভীর রাত্রে কেহ লক্ষ্য করিল না, ধীরেন মণ্ডল চোরের মত বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাল্কীর সঙ্গে যে সব মশাল আসিয়াছিল তাহারই একটা অদূরে অর্দ্ধ দগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে—ধীরেনের পায়ে হঠাৎ ছাঁকা লাগাতে সেই মশাল সে তুলিয়া লইল—অল্প চেষ্টাতেই অগ্নি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল—সেই নবজাত অগ্নির প্ররোচনা ধীরেনের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাহার চক্ষে দীপ্ত করিল আগুনের সুর; আগুনের কুহকে সে মাতিল।—একজন পথিক ডাকিল, "কে যায়!" হাতের আগুন তখন তাণ্ডবের সুযোগ ভিক্ষা করিতেছে—ধীরেন হন্ হন্ করিয়া পার্শ্বের গলিতে প্রবেশ করিল—একটু দূরে কয়েকটী চালাঘর, কাহাদের তাহা ধীরেন ভাবিলও না—কেবল নির্নিমেষ নয়নে দেখিল কি নিশ্চিত অসহায় আত্মসমর্পণের ভাব তাহাদের চারিদিকে, নীরব হাতের আগুন কাতরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে—শিশু যীশু কি বলিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল, পাদ্রী সাহেব বুড়ো ঘোড়াকে গুলি করিয়া মারার অপরাধে সম্মুখে আসিবার সাহস হারাইয়াছেন। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—

প্রথমে আগুনের তিলক, তাহার পর বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি বিন্দু বিন্দু আগুন; আগুনের ফুল—মুকুট;—আগুন স্তবকে স্তবকে, আগুনের ফোয়ারা; রহিয়া রহিয়া বাতাসের সঙ্গে আগুনের ছলাকলা—তাহার পর আগুনের বন্যা—অগ্নিকাণ্ড।—

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যের উপাদান

ধর্ম্ম ও নীতি অর্থাৎ সংযম ব্যতীত সাহিত্যে সত্যকার সৃষ্টি হয় না—সাহিত্যের বনিয়াদ হিসাবে ধর্ম্ম বা নীতির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে—এই বিচার-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া একদল সাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমালোচক গত কয়েক বৎসর—তরুণ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ করিতেছিলেন। বস্তু-জগতের প্রত্যক্ষ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি করিবার প্রেরণায় 'বস্তী-সাহিত্য' সৃষ্টি করিয়া বসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সাহিত্য-প্রতিভা ছিল বলিয়াই—বিশ্লেষণ বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল—নতুবা যৌন-জীবনের ভোগায়তনে যে সব আপাতমধুর বিলাসের দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত আছে, তাহার কথা অতি অক্ষম লেখকও রঙীন করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছে—আমাদের দেশে অতি সুলভে সে সব 'উপাদেয়' গল্প, উপন্যাস ও কেচ্ছা প্রকাশ করিয়া অনেকে লাভবান হইয়াছেন শুনিয়াছি—কলিকাতার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যৌবন-যজ্ঞের ইন্ধনকাষ্ঠের বহু বিপণি আজও বর্ত্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। "সুমহৎ সাহিত্যিক", "সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু,—'দীন প্রকাসক প্রতীপালক'—'সাহিত্য-রসিক'—মহম্মদ আফজল হোসেন, কেরামত সেখ, সাধনচন্দ্র গাঁয়েন, গদাধর মণ্ডল, রামকানাই সামন্ত বা যাদবচন্দ্র মুন্সী প্রভৃতি উক্ত সাহিত্যের "সমজদার-গণ" সুদূর পল্লী-গৃহে অবস্থান করতঃ দিবা-নিদ্রার চির-সহায়করূপে এই সব গল্প, উপন্যাস বা অপূর্ব্ব কাব্য-সাহিত্যের মর্য্যাদা রাখিতেছেন—কিন্তু সেই সব "চিৎপুরী" সাহিত্যের শোভন সংস্করণ বাহির করিয়া যে সব অর্দ্ধ-শিক্ষিত, অপক্ক, শিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী প্রবীণ নবীনের দল সাহিত্যে নব গঙ্গা আনিবার জন্য একযোগে শঙ্খধ্বনি করিতেছিলেন—তাঁহাদেরি বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে নানাদিক হইতে প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনার বাক্য আমরা শুনিয়া আসিয়াছি।

—এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ বর্ত্তমান সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে আমেরিকায় এই প্রকার একটা সাহিত্য-বিশ্লেষণের চেষ্টার কথা মনে পড়ে। প্রায় ১৮ বৎসর আগে 'নায়ক' পত্রিকার পৃষ্ঠায় অধ্যাপক হটনএর সাহিত্য-বিচার সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছিল—মন্তব্যসহকারে তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে—

১। ধর্ম্ম না থাকিলে সাহিত্য হয় না। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির সাহিত্যের বনিয়াদ ধর্ম্ম। সকল দেশের সকল সাহিত্যের মূলে ধর্ম্ম আছেই।

২। সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটে mysticism ও transcendentalism অর্থাৎ অজ্ঞেয়তাবাদ বা পরাতত্ত্ববাদ-এ—এমন কি প্রেম-সাহিত্যের সঙ্গেও অজ্ঞেয়তাবাদ বা পরাতত্ত্ববাদ মিশিয়া থাকে।

৩। বিলাস ও দেহাত্মবাদ (materialism) প্রবল হইলে সাহিত্যের অবনতি ঘটে। দেহাত্মবাদ প্রবল হইলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি হয় না।

দেহাত্মবাদের প্রভাব অনতিক্রম্য হইলে—খাঁটি কবিও নিম্নস্তরের কাব্য লিখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন—উচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির কাজ তখন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

৪। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণের conservation চেষ্টা হইলেই বুঝিতে হইবে যে সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। যখন নূতন সৃষ্টি হয় তখন ঘর গোছাইবার অবসর থাকে না। মিল্টন বেকনের সময়ে কয়খানা বিশ্বকোষের Encyclopaedia সৃষ্টি হইয়াছিল? এখন সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে একটী করিয়া বিশ্বকোষ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এখন আর নূতন সৃষ্টি হইতেছে না, যাহা পুরাতন আছে, তাহাই সামলাইবার কাল আসিয়াছে।

৫। সাহিত্যে বিভীষিকা বা মৃত্যুভয়—সাহিত্যের অবনতির আর একটী প্রধান কারণ। বাসনা সাহিত্যের জননী। আশা ও আকাঙ্খা হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি।—উৎকর্ষ সাধনের প্রেরণা হইতেই তাহার পুষ্টিসাধন "যতদিন মানুষ ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় যবনিকা ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন কাব্যের সৃষ্টি ও সাহিত্যের পুষ্টি হইবে। কিন্তু যেদিন হইতে মানুষ ইহকাল লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, পরকালের ভাবনা ভাবিতে গেলেই শিহরিয়া উঠিবে, সেইদিন হইতেই তাহার সাহিত্যের অবনতির সূত্রপাত হইবে।"

সাহিত্যে বিভীষিকা

আজ আমাদের সাহিত্যেও কি সেই বিভীষিকার ভাব প্রবেশ করে নাই?—গত কয় বৎসর ধরিয়া সাহিত্যে অনাসৃষ্টির জন্য প্রতিভারও অপচয় ঘটিয়াছে একথা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। জীবনের প্রধান বিভীষিকা মৃত্যু,—ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রবলশক্তি এই মৃত্যুভয়কে ছোট করিয়া দেয়, মরণের পরপারে একটী ভাবজগতের সৃষ্টি করিয়া মরণকে নবজীবনের দ্বারস্বরূপ করিয়া মৃত্যুর বিভীষিকাকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ যখন দৈহিক সুখের প্রত্যাশী হয়—ভোগায়তন দেহের পুষ্টিতে বিব্রত থাকিয়া মানুষ যখন অতীত ও অনাগতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, তখনই এই বিভীষিকা নানা আকারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাহিত্যের এই বিভীষিকা প্রতিভার পরম শত্রু। প্রতিভার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তখন আর নূতন কিছুর স্থায়ী সৃষ্টি চলে না। নূতন সৃষ্টি না থাকিলে সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে অচলায়তনের প্রাকার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। প্রতিভার নবোদ্গত অঙ্কুর আলোবাতাসহীন আবহাওয়ায় সঙ্কুচিত হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সাহিত্যে "আকাল"

অনেকের মতে বাঙ্গলা সাহিত্যে 'আকাল' আসিয়াছে; যাহাকে বলে periodicity—তাহারই প্রভাবে—প্রতিভার স্ফুরণ হইতেছে না।—"মাঝারি" mediocre সাহিত্যিক-এর দল এখন অনুজ্জ্বল সাহিত্য-দীপালীর উৎসবে আত্মহারা—স্তিমিত আলোকপাতে তাহারা যে জীবনের দুর্জ্ঞেয় যবনিকা ভেদ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন—একান্ত আটপৌরে ঘটনাকে জীবনের অনিবার্য্য পরিণতি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা অতি পুরাতন কথাকেই উল্টাইয়া বলিয়া নূতন তথ্যের সন্ধান দিবার গর্ব্ব করিতেছেন। অনেকের মতে তাঁহাদের এই চেষ্টা লজ্জাকর ও অসার্থক।

এ সম্বন্ধে আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ এডিসন বলিয়াছিলেন—ইহা ভাবের যুগ নহে, খেয়াল কল্পনার যুগ নহে, ইহা কর্ম্মযুগ, আবিষ্কারের যুগ, প্রকৃতি দেবীর অবগুণ্ঠন উন্মোচনের যুগ। এখনকার সাহিত্য পদার্থ তত্ত্বে পূর্ণ থাকিবে। এখনকার কবিতা "কল্পনা-লতা" নহে,—যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, শুনিতেছি তাহারই বর্ণনা। এখনকার সাহিত্য জগতের চাতুরী বিকাশে প্রমত্ত থাকিবে। মিল্টন চসারের মাপকাঠিতে এখনকার সাহিত্য মাপিলে চলিবে না।

বস্তুতঃ সাহিত্য জাতির প্রকৃতি ও তৎকালিক মনোভাবের (trend) পরিচায়ক;—জাতির প্রকৃতি অনুযায়ীই সাহিত্য তাহার আকার ধারণ করিয়া থাকে।

—সাহিত্য-বিভীষিকা জাতির অধঃপতনের লক্ষণ বলিয়া এডিসনও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

খ্রীষ্টীয় ইউরোপ খৃষ্টানী সভ্যতা এসিয়া মহাদেশ হইতে পাইয়াছিল;—সারাসেন ও আরব সভ্যতার কাঁছে সভ্যতার বর্ণ পরিচয় করিয়াছিল; অথচ ইউরোপ এই পাঁচ সাত বৎসরে একটা নিজস্ব সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। অবস্থার সঙ্গে নিজেকে উপযোগী করিয়া মানাইয়া লইবার শক্তি পাশ্চাত্যের অপেক্ষা প্রাচ্যের ঢের বেশী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে একটা অভিনব সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। যে পক্ষে যে অন্তরায় সাধন করিবে—সে শুধু সাহিত্য ও ধর্ম্মের শত্রু নহে – সমগ্র মানব জাতির শত্রু।

সাহিত্য-সন্দেশ

১৩৩৮ বৈশাখের প্রবাসী আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে সোভিয়েট নীতি সম্পর্কে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় পয়সা খরচ করিয়া বা না করিয়া যাহারা প্রবাসীর গ্রাহক হইয়াছে তাহারা ভিন্ন অপর কেহ এই সন্দর্ভ পাঠ করিতে পাইবে না। অবাধ সাম্যবাদ সম্বন্ধীয় এই লেখাটার সহিত প্রবাসী কর্তৃপক্ষ হয় একমত নয় ভিন্নমত। যদি একমত হ'ন তাহা হইলে, সাম্যের মর্য্যাদারক্ষার্থ সদ্যসংগৃহীত সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের নাম উদ্ধার করিয়া প্রত্যেককে এক একখানি বৈশাখের প্রবাসী পাঠান উক্ত কর্তৃপক্ষীয়দের উচিত ছিল। নচেৎ কেহ বা কাহারা মনে করিতে পারেন যে প্রবাসী সাম্যবাদ-মতাবলম্বী নহেন। আর যদি প্রবাসীর মত সাম্যবাদ হইতে বিভিন্ন হয় তবে উক্ত সন্দর্ভটীর প্রবাসীতে স্থান পাওয়া উচিত ছিল না। যেহেতু ঐ প্রবন্ধের প্রকাশ হইতে অনেকের মনে করা অসম্ভব নাও হইতে পারে যে প্রবাসী কর্তৃপক্ষ সাম্যবাদ মতাবলম্বী।

ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিতেছেন—"প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কালে ও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হ'লে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধা মার খেতে খেতেও মরতে চায় না।" রবীন্দ্রনাথের মতে এর কারণ হচ্চে "বিদেশীয় শাসনকার্য্যে অন্য য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কৃপণ ও নিষ্ঠুর" অর্থাৎ ইংরেজ জাতি অপর জাতির তুলনায় আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধার পাত্র এবং এ কথা আমরা অন্তরে অন্তরে জানি ও মানি বলিয়াই তাহাকে নিগূঢ়ভাবে শ্রদ্ধা করি। ভূতের হাতের বোনা সর্ষপ রোজার হাতে পড়িয়াও যদি ভূতের প্রতি নিগূঢ় শ্রদ্ধা রাখিতে পারে তবে ভূত যে প্রকৃতই শ্রদ্ধেয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী তাঁহার প্রবন্ধে প্রায় প্রমাণ করিয়াছেন যে রাজপুত্র বিজুলী খাঁ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। এক খৃষ্টীয় অব্দে এক মুসলমান হিন্দু হইল, অথচ খৃষ্টাব্দ খৃষ্টাব্দই রহিল, মুসলমানকে মুসলমান থাকিয়া গেল এবং চৈতন্যদেবের একজন শিষ্য বাড়িয়া গেল—আজিকার দিনে ভারতের পক্ষে এ যে কত বড় আশার কথা তাহা সামান্য পত্রিকায় লিখিয়া কি জানাইব? চৌধুরী মহাশয় তাঁহার এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পথে বলিতেছেন, "মুসলমান ধর্ম্ম যে প্রধানতঃ ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম্ম এ কথা কে না জানে?" এ কথা আমরা মোটেই জানিতাম না, সুতরাং লজ্জায় অধোবদন হইতেছি।

প্রবাসীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—বিবিধ প্রসঙ্গ। আমরা প্রবীণ সম্পাদকের মন্তব্যপরম্পরার সহিত প্রায় একমত। কেবল যে দুই এক স্থানে আমাদের কিছু বলিবার আছে তাহাই বলিতেছি।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"(কংগ্রেস) বক্তৃতামঞ্চের চিত্রের একটি ফটোগ্রাফ ছাপিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। পরে যদি পাই এবং তাহা যদি ব্লক করিয়া ছাপিলে ছবি পরিষ্কার বুঝা যায়, তাহা হইলে মুদ্রিত করিব।"

বহুবিধ ইচ্ছার মধ্যে একটি ফটোগ্রাফ ছাপিবার ইচ্ছার প্রতি সম্পাদকের এই পক্ষপাতিত্ব আমাদিগকে পীড়া দিয়াছে। সত্য বটে ইহা শুভইচ্ছা, কিন্তু সম্পাদকের মনে এতাদৃশী বা ইহা হইতেও উচ্চ স্তরের এক বা ততোধিক শুভ ইচ্ছা যে উদয় হয় নাই তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। বরঞ্চ ইহাই বেশী সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, যে তাঁহার ন্যায় উচ্চহৃদয় ব্যক্তির চিত্তে সতত নানা শুভ ইচ্ছার উদয় হইতেছে অথচ নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। স্বীকার করি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের সময়ও সম্পাদক উক্ত ইচ্ছাটিকে বঞ্চিত করিতে ভুলেন নাই—যদি ফটোগ্রাফ পান, যদি তাহা ব্লক করা হয়, যদি ব্লক করিয়া ছাপানো ছবি পরিষ্কার বুঝা যায় তবেই তিনি ঐ ফটোগ্রাফটি মুদ্রিত করিবেন, নচেৎ নহে। কিন্তু প্রবাসীর ন্যায় বৃহতী পত্রিকায় আরও অনেক ফটোগ্রাফ আসা সম্ভব, যাহা ব্লক করিয়া ছাপিলেও ছবি পরিষ্কার রূপে বুঝা না যাইতে পারিত। সেই সমস্ত ফটোগ্রাফ ছাপিবার ইচ্ছার অনুরোধ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

অবশ্য ইহা অসম্ভব নহে যে প্রবাসীতে ইতঃপূর্ব্বে এরূপ ফটোগ্রাফ কখনও আসে নাই যাহা ব্লক করিলে বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা সত্য নহে দেখাইবার জন্য আমরা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি যে ১৪৮ পৃষ্ঠায় 'করাচীতে হিন্দু মহা-সভার অধিবেশন' ছবিখানি কোন্ শ্রেণীর? প্রথমতঃ পট-ভূমিকায় মাত্র দুইটি গরাদেসংযুক্ত জানালা ছাড়া কি আর কিছু ছিল না করাচীতে? দ্বিতীয়তঃ কিষ্কিন্ধ্যা ভিন্ন কি অন্য প্রদেশ হইতে 'হিন্দু' ইহাতে যোগদান করে নাই? তৃতীয়তঃ আন্দাজ নয় জন সভ্য লইয়া যে চিত্র তাহা কি 'মহাসভা'র? চতুর্থতঃ এই কজনের মধ্যে অন্ততঃ একজন দাঁড়াইয়া আছেন—ইহার নাম কি "অধিবেশন"?

এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ বা কাহারা সন্দেহ করেন যে সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাসভায় সভাপতি ছিলেন বলিয়াই এরূপ বিসদৃশ ফটোচিত্র প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছে—ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, তবে তাহা অসত্য হইলেও অসম্ভব না হইতে পারে।

অন্যত্র সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কংগ্রেসের ১৯৩০ সালের যে রিপোর্ট প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। (উক্ত রিপোর্টে) লেখা হইয়াছিল যে সংবাদপত্রসমূহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আদেশ অনুসারে প্রকাশ বন্ধ করে নাই। তাহারা ত কংগ্রেসের চাকর নহে। খবরের কাগজসমূহে সত্যাগ্রহের সংবাদ ঘন ঘন প্রকাশিত না হইলে আন্দোলন কখনই বিস্তৃতিলাভ করিত না। সংবাদপত্র সমূহের সম্বন্ধে কমিটি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিমকহারামী ভিন্ন কিছুই নহে।"

যে রিপোর্ট প্রত্যাহৃত হইয়াছিল তাহার প্রত্যাহরণের অবশ্যই এক বা ততোধিক কারণ ছিল, তন্মধ্যে উক্ত কারণ হয়ত একটি। প্রত্যাহৃত রিপোর্টকে মৃত বলাই সঙ্গত। তাহার উপর ক্রোধবশে খড়্গাঘাত পুরুষত্বের হানিকর। ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত রিপোর্ট সম্ভবতঃ ইংরাজীতে লিখিত ছিল, হিন্দীতে লিখিত হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহা যে বাংলায় লেখা ছিল না ইহা ঠিক। সুতরাং 'আদেশ' কথাটী কোন্ কথার তর্জ্জমা তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু তাহা না জানিলেও আলোচনা বন্ধ করা চলে না। আদেশ শব্দটি যে শব্দেরই তর্জ্জমা হউক, তাহার প্রকৃত অর্থ যে অনুরোধ ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, যেহেতু সংবাদপত্র সমূহ যে কংগ্রেসের চাকর নহে তাহা সকলেই জানে ও মানিত। দেশের মধ্যে কংগ্রেসের চাকর তাহারাই যাহারা কংগ্রেসের কথা মানিয়া চলিয়াছে ও চলিতেছে। সংবাদপত্রসমূহকে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। সংবাদপত্রসমূহ যে কংগ্রেসের চাকর নহে তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ কংগ্রেসই সংবাদপত্র-সমূহের চাকর; কারণ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক বলিয়াছেন যে কংগ্রেস সংবাদপত্রসমূহের নিকট "নিমকহারামী" করিয়াছে। কংগ্রেস যে নিমক ছাড়া অন্য নিমক ব্যবহার করিবে না বলিয়াছিল, তাহা উৎপন্ন করিতেছিল গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের চাকরেরা। সেই নিমকোৎপত্তির সংবাদ বহন করিতেছিল বলিয়া কমলাকান্তি মতে সম্পাদকেরাই তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস যে নিমক খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছিল তাহা সংবাদপত্রীয় নিমক, ইহাতে সন্দেহ কি? কংগ্রেস যখন সে কথা ভুলিয়া স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় সম্পাদকের স্বার্থের হানিকর অনুরোধ করিয়াছিল তখন অবশ্যই 'নিমকহারামী' করিয়াছে। ক্রোধের অনেক দোষ আছে কিন্তু তাহার একটি গুণ এই যে তাহা মানব-মনের অনেক নির্জ্ঞান সত্যকে সজ্ঞান স্তরে ভাসাইয়া তোলে।

চৈত্রের 'পঞ্চপুষ্প'এ সম্পাদক মহাশয় যে 'গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন' পত্রস্থ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ইহার পরও যদি কোন গ্রাহক চতুর্থ বর্ষে পদার্পিত পঞ্চপুষ্পের জন্য মণি অর্ডার না করেন অথচ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেন তবে তাহা একান্ত নিষ্ঠুর হইবে।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে 'স্পন্দিতা' কবিতাটী আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিতে পারিত যদি আমরা তাহার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিতাম। তবে

ঘনমীরদের হৃদয় ভেদিয়া
অবিরল ধারা ঝরে,

এটি আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম। এ লাইনটি হয়ত সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া ছাপিয়াছেন।

চৈত্র মাসের বিচিত্রা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র এম-এ, ডি-লিটএর 'খেয়া'র সমালোচনায় উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলি রস-সাহিত্যে উচ্চ স্থান পাইবার উপযোগী।

তরুণী মাতা

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

নরের রচিত তুমি মা তরুণী মাতা,
তরুণী-মন্ত্রে মানব তোমার রচে বন্দনা-গাথা।
ভক্ত সাজিয়া তোমারে দিল সে মোহিনী মূর্ত্তিখানি,
তরুণীর বেশ রচিয়া তোমার জুড়িয়া যুগ্ম পাণি—
বন্দনা তব গাহিয়া উঠিল; তুমি হেসে মৃদু হাসি,
মন্ত্রে তাহার ধরিলে জননী অপরূপ রূপ-রাশি।
সে রূপে তোমার নাচিয়া উঠিল কাজল-নয়ন দু'টি,
নধর অধরে কমলের ভ্রমে ভৃঙ্গ পড়িল লু'টি।
কম্বু-গ্রীবার অম্বু-উজল-মোহন-মুক্তাহারে,
চুম্বিল তব বক্ষ-বসন মণ্ডিত কুচ-ভারে।
নিবিড়-নীরদ-নিন্দিত-নীল-কুঞ্চিত-কেশ-ভার,
উড়িল পৃষ্ঠে—মধুর দৃষ্টি—দিলে বীণা-ঝঙ্কার।
মানব অমনি রচিল স্তোত্র-গান,
মন্ত্রে তাহার তরুণী-মূর্ত্তি হইলে মূর্ত্তিমান।

নিখিলের আদি সৃষ্টি তুমি মায়া গো,
চিৎপদ্মের রস-চন্দনে রঞ্জিত তব কায়া গো।
চিন্ময়ী মাগো, যে জন যে ভাবে করে তব আবাহন,
তাহারি ভাবের মূর্ত্তি ধরিয়া দেহ তারে দরশন।
বন্দিল নর তরুণী-মন্ত্রে তাই যে তরুণী তুমি,
মায়েরে পূজিতে তরুণীর পূজা করিল মর্ত্ত্যভূমি।
তোমার ধেয়ান রচিতে গিয়া গো দেহের সুষমা-তরে,
রূপসীর স্তবে অঞ্জলি তব সাজাইল থরে থরে।
নয়নের পূজা করিল কাজলে স্তনে দোলাইল হার,
স্তনেরে পূজিতে কুচযুগের পূজা দিল বারে বার।
মনের বিলাসে মুরতি গড়িল ভগবতী নাম দিয়া,
তনু-সুষমায় বন্দিল হায় চরণ পূজিতে গিয়া।
জননী গো, তোর চরণপূজার ছলে,
চরণ না পূজি' তরুণ বদনে পূজা দিল দলে দলে।

শত ধ্যানে নর করিছে রূপেরি পূজা গো,
হ'লি ধ্যানে ধ্যানে বাণী কল্যাণী হ'লি শ্যামা দশভুজা গো।
'দেবী ব'লি যারে বন্দিনু ওরে ডাকি যারে মাতা বলি',
তারি আঁখিযুগ বদনের শ্লোকে আপনার মন ছলি!
কাজল-আঁখিতে হাজার যুগের তৃষ্ণা আছে যে ঢালা,
পীন-উন্নত-পয়োধরে যে রে দেহের তৃষ্ণা জ্বালা!
ছদ্ম-মনের তরুণ-পিপাসা তবু নাহি মানা মানে,
গড়িতে জননী গড়ে রমণীরে তরুণীর সন্ধানে।
তরুণী ভুবনে আদিম জননী মানি সে বারংবার,
আত্ম-ভোলা যে শিশুসন্তান বক্ষ চুমিছে তার।
শিশু যদি হয় সন্তান মার, তখনি তরুণী মাতা,
তরুণী মায়ের বক্ষে শুধুরে শিশুরি শয্যা পাতা।
রূপের পূজার মাতৃ-মন্ত্র-ছলে;
রূপসী মায়ের তনুর স্তোত্রে মার মন নাহি টলে।

তরুণী মায়ের পূজা দিবি যদি আজি,
ওরে ও ভক্ত জননীর পায় শিশু হয়ে আয় সাজি'।
ওই ছাখ্ মার আঁখির কাজল স্নেহজলে ভেসে যায়,
স্তন-ধারে আজি জীবনের সুধা নিবি যদি আয় আয়।
স্তন যুগে মার শিশুর তৃষ্ণা মালা হ'য়ে ওই দোলে,
তরুণী মায়ের বুকে আয় ওরে শিশু হয়ে যাই কোলে।
নিখিল ব্যাপিয়া মহাশক্তির দোলেরে সৃষ্টি-দোল্,
তরুণী মায়ের তরুণ দেহের দুলিছে রে স্নেহ কোল।
যুবা-বৃদ্ধের নাচেরে সেথায় শিশু-বিহ্বল-মন,
তরুণী মায়ের স্নেহ-দোলনায় দুলিতেছে ত্রিভুবন!
তরুণী মায়েরে পূজা দিতে যাই বহি আধ্খানা মনে,
আধেক তরুণ আধা শিশু-ভাবে মিলেনা সে শ্রীচরণে।
শিশুর ছন্দে না বাঁধিলে এই প্রাণ,
তরুণীর দেহে জননীর ছবি হয় না মূর্ত্তিমান।

পুস্তক-পরিচয়

মায়া-কাজল—কাব্যগ্রন্থ। প্রণেতা শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়। প্রকাশক আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮, দাম দেড় টাকা।

হেমেন্দ্র বাবু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি। এই গ্রন্থে তাঁহার নানা বিষয়িণী অনেকগুলি কবিতা আছে। প্রত্যেকটি কবিতাকে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিবার মত স্থান আমাদের নাই। প্রথম কবিতায় কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কবি বলিয়েছেন,—

বুলিয়েছে রে মায়া-কাজল—চোখে তুলি বুলিয়েছে,
মরীচিকার মায়ার রাতে নিখিল ভুবন ভুলিয়েছে,
কুলহারা অচিন পথে হঠাৎ দিয়ে হাতছানি—
যাদুকরের যাদুর মালা গলায় গেছে দুলিয়ে যে।

এই মায়াকাজল চোখে পরিয়া কবি জগৎকে দেখিয়াছেন, জগতের যে রূপ কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা আশা এবং আনন্দের রূপ। কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনোরম ভঙ্গীতে এই রূপ আঁকিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র ছন্দের অনুসরণে লেখা হইলেও 'উর্ব্বশীর অভিশাপ' কবিতাটী আমাদের সকলের চেয়ে ভাল লাগিয়াছে।

এই কাব্য সংগ্রহ হইতে গুটী কয়েক কবিতা বাদ দিলেই আমাদের মনে হয় ভাল হইত। যথা জ্যোৎস্না রাতে, রাতের ইতিহাস, সাকাই প্রভৃতি। তিনটি কবিতাতে দেহতাত্ত্বিকতা নির্লজ্জভাবে দেখা দিয়াছে কাজেই গ্রন্থের ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। দুই একটি কবিতাতে ছন্দের ত্রুটি আছে।

বহিখানির ছাপা ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব খুব ভাল।

ব্যথা ও বেদনা—কাব্যগ্রন্থ। ৮৩ পৃষ্ঠা। প্রণেতা শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক বুক কোম্পানী লিঃ, ৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার।

গ্রন্থ পরিচয়ে শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন,—

"একটী তরুণ বয়স্ক বাঙ্গালীর ছেলে তিন বছর আগে আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে, নব পরিণীতা বধূকে ফেলে, সকলকে কাঁদিয়ে কর্ত্তব্য পালনের জন্য সুদূর ইংলণ্ডে অপরিচিত লোকদের মধ্যে সুদীর্ঘ প্রবাস বরণ করেছিলেন। * * *

যাঁকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে অল্পক্ষণের জন্য লাভ করেই স্থানান্তরিত হয়ে অপরিচিত সুদূর দেশে একাকী প্রবাসের দুঃখ স্বীকার করতে হ'য়েছিল তাঁকে লক্ষ্য ক'রেই—এই কবিতাগুলি রচিত হ'য়েছে।"

অতএব বলা বাহুল্য কবিতাগুলি প্রেম ও বিরহ সম্বন্ধীয়। কতক গুলি কবিতাতে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকগুলি কবিতা হুবহু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ কিন্তু কবি মিল সম্বন্ধে একটু অসতর্ক।

বহির কাগজ ও ছাপা ভাল, তাহা সত্ত্বেও একটী শুদ্ধিপত্র আছে।

যাত্রী—কাব্যগ্রন্থ। ৪২ পৃষ্ঠা। প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীতারকচন্দ্র মজুমদার।

কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও ভাবে অনুপ্রাণিত এবং বীররসাত্মক। কয়েকটি কবিতা ভাল। ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য আট আনা। —র-ম

ষ—শ্রীবিভূতি চৌধুরী। গল্পের বই। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক রবীন্দ্র সাহিত্য-সংসদ।

বিভূতি বাবুর গল্প উপন্যাস লেখায় খ্যাতি আছে। 'স্বপ্ন-শেষ', 'পথের বাঁকে' 'রাখালী' ও 'তরুণী-তীর্থ্যা' এই চারিটি গল্পে বইখানি পরিসমাপ্ত। প্রথম গল্পের নামেই পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে—কিন্তু অপর তিনটি গল্পেরও মূল গায়েন (theme-song) ঐ—। এই বিস্তৃত পৃথিবীর কত দিক দিয়া কত বিবিধ স্বপ্নের বিচিত্র সমাপ্তি হইতেছে, তাহার খবর রাখা কঠিন।—বিভূতি বাবুর শিল্পী-প্রাণকে মানুষের এই নিত্য দুঃখকে নাড়া দিয়াছে—। "পথের বাঁক"এর পটলী—করুণ সৃষ্টি। অতি হীন মেয়েমানুষটির মধ্যেও যে মা লুকাইয়া আছে, তাহার স্বপ্ন-ব্যর্থতা সত্যই অনুভব। সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী জানিয়াও গভীর রাত্রে পটলী যখন প্রাণপণ বলে বুকের মধ্যে ভেলুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—তখন সে কান্নার কথা মনে করিয়া আমাদিগকেও মাথার উপরকার লক্ষ কোটি নক্ষত্রের মত একবার পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে হয় বৈকি। কয়টি গল্পই সুলিখিত।

স্বাধীনতার দাবী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরিয়া একটি জাতি অন্যজাতির করতলগত—ইহার চাইতে অধিকতর ট্রাজেডি বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেই জাতি যখন স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করে, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ, এমন কথার পিছনে যুক্তি নাই।—কিন্তু আমার স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।—দুঃখের বিষয়, এই ধারণা স্পষ্ট করিয়া মনে ছাপ ফেলিয়াছে, এমন শিক্ষিত লোকেরও সংখ্যা মুষ্টিমেয়—। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে, শিক্ষায়, কুহেলী-পর্ব্ব চলিয়াছে,—অনেকগুলি কথা জানি, একটিরও অর্থ জানি না, যাহার অর্থ জানি, তাহার মূল্য জানিনা—বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য ঠিক এই স্থানটিতে।—এমন না হইয়া যদি আমরা অল্প জিনিষ জানিতাম, কিন্তু যাহা জানিতাম তাহা এমন করিয়াই জানিতাম, যাহার মধ্যে ফাঁকী নাই—তবে আশার কথা ছিল। আনন্দবাজার সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বর্ত্তমান পুস্তকটি ঠিক এই আশার কথা বহন করিয়া আনিয়াছে। সাতটি অধ্যায়ে ইহা সমাপ্ত—"পূর্ণ স্বরাজ্য সঙ্কল্প" 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নীতি" "আমেরিকায় ব্রিটিশ অধিকারের পরিণাম" "ইউরোপে নবযুগের সূচনা" "কানাডা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি" "আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্রিটিশ প্রভুত্ব" এবং "ভারত ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র।"—অধ্যায়গুলির নাম দেখিলে মনে হইবে এ সম্বন্ধে অজানা এমন কথা কি আছে—আমেরিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্রিটিশ প্রভুত্বের ইতিবৃত্ত—তাহার মধ্যে অজানা কিছুই নাই—কিন্তু এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক পরম্পরাগত একটা ধারণা আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই আছে।—বিশেষ করিয়া এইগুলির সহিত আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতার দাবী কতখানি জড়িত—সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা খুব কম লোকেরই আছে।—বর্ত্তমান পুস্তকে এই বিষয়টী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের পুস্তক একেবারেই নাই।—সুতরাং এ পুস্তকের যে বহুল প্রচার হইবে,—ইহা জানা কথা। —ক-র

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, কলিকাতায় জনকয়েক বীমা-উৎসাহী ভদ্রলোকের উদ্যোগে **'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্যুরেন্স ইন্‌ষ্টিট্যুট'** নামে একটি অনুষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে সংবাদপত্রের মারফতে আমরা ইহার বৃত্তান্ত পাঠ করি। কিছুদিনের মধ্যেই ইঁহারা 'অ্যালবার্ট ইন্‌ষ্টিট্যুট'এ একটি কি দুটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া জন সাধারণকে ভারতীয় বীমা-সংঘগুলিতে বীমা করার সদ্‌বুদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন। অতঃপর ইঁহাদের ছাপা দু'একটি হ্যাণ্ডবিল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সমস্ত মিলিয়া ব্যাপারটি আমাদের দিব্য লাগিতেছিল এবং আমরা সত্যই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, যাহা হৌক, এতদিন পরে ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় Insurance Habit—এমন একটা কিছু আমাদের এই অল্প-শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিবার জন্য কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি বুঝি সত্যই বদ্ধপরিকর হইলেন।

এমন আশা করা আমাদের অন্যায় হয় নাই কেননা এই 'ইন্‌ষ্টিট্যুট'এর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আমরা বীমা-প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, বীমাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের এবং বীমাবিদ্‌ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখিয়াছিলাম। আর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও বড়ো কম কেহ ছিলেন না।

অদ্যাবধি অপাংক্তেয় বীমা-বিষয়কে উপাসনার পৃষ্ঠায় আমরা আজ তিন বৎসর হইল নিয়মিত মাসিক আলোচনার বস্তু করিয়া আসিয়াছি এজন্য অকারণে আমাদিগকে ব্যঙ্গোক্তি একাধিকবার শুনিতে হইয়াছে—আমরা নাকি সাহিত্যের জাতি মারিলাম, এমন কথা সাহিত্যিক মহলে আমরা শুনিয়াছি এবং বীমা-মহলে যাহা শুনিয়াছি তাহাও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহজনক নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য আমাদের বহু আছে; কিন্তু আজ সে আলোচনা করিব না। শুধু বলিয়া রাখি যে দু'একটি 'অভিজাত' পত্রিকায় আমাদের ছোঁয়াচ ইহারই মধ্যে লাগিয়াছে দেখিলাম।—কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম--কিছুদিন পূর্ব্বে এই ইন্‌ষ্টিট্যুট হইতে আমাদের শ্রদ্ধার্হ বন্ধু **'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্যুরেন্স জার্ণ্যাল'**এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের নিকট একখানি চিঠি আসে—বৈদ্যনাথ বাবু সেটি আমাদিগকে পড়িয়া শোনাইয়াছিলেন। পত্রে লেখা ছিল এই যে প্রত্যেক ভারতীয়েরই বিশেষ করিয়া ভারতীয় বীমা-সাংবাদিকের ভারতীয় বীমা সংঘগুলিরই সমর্থন করা উচিত।—কিন্তু কিছুদিন হইতে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্যুরেন্স জার্ণালের পৃষ্ঠায় বিদেশী বীমা কোম্পানীর জন্য একটু বেশী মাত্রায় দরদ দেখা যাইতেছে—সুতরাং ইন্‌ষ্টিট্যুট এ বিষয়ে কর্ত্তব্য হিসাবে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।—কারণ একটি ছিল। সেটি এই। উপাসনার পাঠক পাঠিকার মনে থাকিতে পারে গত বৎসর ব্যবসায় সম্পর্কীয় কোনও একটি মাসিকে সান্‌ লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানী অব ক্যানাডার বিষয়ে সুবৃহৎ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে লিখিত বিষয় সত্য কি মিথ্যা, সে বিচার করিবার বর্ত্তমানে দরকার নাই। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের দুই একটি যুক্তি যে অতি মাত্রায় হাস্যোদ্দীপক ছিল—একথা আমরা উপাসনার পৃষ্ঠায় তখনই দেখাই। অতঃপর এই প্রবন্ধ নিয়া দেশময় একটি রটনা হয় যে সান্‌লাইফ ভারতবর্ষ হইতে জাল গুটাইতেছেন। ইহার প্রতিবাদে অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে শুরু করিয়া নানা প্রাচীন-অপ্রাচীন, জাতীয়-অজাতীয়, খ্যাতনামা-অখ্যাতনামা, ইংরাজী-বাংলা সংবাদ

পত্রের পৃষ্ঠায় আমরা বিবৃতি দেখিয়াছি। ইণ্ডিয়ান ইন্সুরেন্স জার্ণাল-এও এমনই একটি প্রতিবাদ বাহির হয়। বিশেষ করিয়া বোধ করি এই কারণেই ইন্‌ষ্টিট্যুট এই চিঠি জার্ণাল-সম্পাদককে লেখেন। পত্রোত্তরে জার্ণাল-সম্পাদক নিজের মত প্রকাশ করিয়া জানান যে ভারতীয় জনসাধারণকে বীমা বিষয়ে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহার পত্রিকা, বীমা সম্পর্কে যাহা সত্য তাহা নিয়া তিনি অকুতোভয়ে লড়িবেন—এ জন্য যদি কোনও দল বিশেষ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হয় তবে তিনি নাচার। বলা বাহুল্য এ উত্তরে ইন্‌ষ্টিট্যুট খুশী হন্ নাই—সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই ইন্‌ষ্টিট্যুটের পক্ষ হইতে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর প্রত্যেকের কাছে একটি ইস্তাহার এই বলিয়া জারী করা হয় যে জার্ণালকে বয়কট করা হউক কেননা জার্ণ্যাল বিদেশী বীমা পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার ফল বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। অতএব কিছুদিন পরেই এই সার্কুলার নাকচ প্রস্তাবও ইন্‌ষ্টিট্যুট হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।—ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই।

এখন আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে—ইণ্ডিয়ান ইন্সুরেন্স ইন্‌ষ্টিট্যুট যে উদ্দেশ্য নিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা এই প্রকার প্রস্তাবে বহু পরিমাণে ক্ষুন্ন হইয়াছে।—কেননা কোনও একটি বিশেষ পত্রিকার বিরুদ্ধে তাঁহাদের ক্ষোভ লজ্জাকর ভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে—কেন করিয়াছে এ নিয়া অবশ্য নানা দুষ্ট লোক নানা কথা রটাইতেছে—আমরা সে সব কথায় কর্ণপাত করি না।—কিন্তু 'ইন্‌ষ্টিট্যুট'এর কাছে আমাদের বিনীত জিজ্ঞাস্য এই যে—কলিকাতা সহরে সারা বৎসরের মধ্যে একটি কি দুইটি সভা আহ্বান করিয়া ও খানকয়েক হ্যাণ্ডবিল বিলাইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি এমনই নিঃশেষ ভাবে উজাড় হইয়া গেল যে—তৎপরে এমন একটি ইস্তাহার জারী করিতে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যাহার আদি অন্ত ভারতীয় জীবনবীমা প্রীতির নামাবলীতে ঢাকা থাকিলেও—সভ্যাকার বীমা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তাহা নিতান্তই হাস্যকর!—গ্রামে গ্রামে যেখানে প্রভেন্সিয়াল আর সানলাইফ কঠিন ছাউনি গাড়িয়া বসিয়া আছে—সেখানে কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছিল?—কিন্তু এমন অনেক কথাই বলা যাইতে পারে।

—বলিলে মর্য্যাদার কারণ বাড়িবে।—'ইন্‌ষ্টিট্যুট'এর জন্য আমাদের সত্যকার শুভেচ্ছা আছে বলিয়াই সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন দেখি না।—শুধু 'ইন্‌ষ্টিট্যুট'এর কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা বারম্বার অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিয়া যেন তাঁহারা কাজ করিতে না যান। তাহা হইলে তাঁহারাও ঠকিবেন, আমরাও হতাশ হইব।—

সে ক্ষতি তাঁহাদের পক্ষে যেমন মারাত্মক হইবে, আমাদের পক্ষে তেমনই শোচনীয় হইবে।

আমরা 'ওরিয়েণ্ট্যাল' জীবন-বীমা সমিতির ১৯৩০ সনের একখানি উদ্বৃত্ত-পত্র আলোচনার্থ হইয়াছি। 'ওরিয়েণ্টাল ব্যবসায়-জগতে ভারতবর্ষের অতুল কীর্ত্তি—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ইহার শাখা সমিতি—। 'ওরিয়েণ্টাল'এর সাফল্য আমাদের পক্ষে প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব স্মারক, ভবিষ্যৎ ভারতের পথ-নির্দ্দেশক। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে 'ওরিয়েণ্টাল' বীমা-ব্যবসায়ে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা যেমন দৃঢ়-ভিত্তি তেমনই বিস্তৃত।

এই বৎসরে উদ্বৃত্ত-পত্রে দেখিতেছি চাঁদা আদায় হইতে সম্বৎসরে আয় হইয়াছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ১৮ লক্ষ টাকা বেশী। অথচ সমগ্র বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রিক অশান্তি ও আর্থিক বিপর্য্যয় ভারতবর্ষকে মথিত করিয়াছে—তৎসত্বেও কোম্পানীর যে এই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই শ্লাঘ্য। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার জন্য ২৬ হাজার ৪৮৩ খানি বীমা-পত্র দাখিল করিয়াছেন। সুদ হইতে আয় হইয়াছে ৫২ লক্ষ টাকা। জীবন বীমা ফণ্ডে ৭৭ লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে—বর্ত্তমানে এই ফাণ্ডে মজুদ টাকার পরিমাণ দশ কোটিরও বেশী।

বাৎসরিক সভায় এই বৎসরের জন্য প্রত্যেক অংশীদারকে অংশ পিছু ৫০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে!

'ওরিয়েণ্টাল'এর বর্ত্তমান বাৎসরিক পত্রে ১৯৩০ সনের মৃত্যুজনিত দাবীর তালিকায় কোন্ রোগের দরুণ দাবী তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা হইতে কিছু শিক্ষার বিষয় আছে—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রণালীর রোগে (Respiratory organs) তৎপরেই জ্বর রোগে। সর্ব্বাপেক্ষা কম মৃত্যু বেরিবেরি রোগে।

বর্ষারম্ভে

কাল-বৈশাখীর প্রথম প্রভাতে আজ সেই রুদ্রদেবতাকে প্রণাম করি,—যাঁহার ভ্রুকুটিতে ঈশানের মেঘপুঞ্জ ঘনাইয়া উঠে—বজ্রনির্ঘোষে ধরিত্রী কম্পিত হয়—যাঁহার মুখের হাসি ও চোখের অশ্রু দিবসরাত্রির অন্তরালে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা জমাইয়া তোলে—কণ্ঠে যাঁহার অমৃত ও হলাহলের সঞ্চয়, বাহুতে যাঁহার ধ্বংস ও সৃষ্টির শক্তি,—চঞ্চলা ধরণীর লীলা-সহচর, সুখ দুঃখের আদি দেবতা, সেই পরম পুরুষকে আজ আভূমি প্রণতি জানাই।

যিনি দুঃখ দিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন, বিপদ দিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, কলঙ্কে ডুবাইয়া যিনি আমার গৌরবকে প্রদীপ্ত ও মর্য্যাদাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন—যিনি আমার অভাব দিয়াছেন প্রাচুর্য্যের মধ্যে, বেদনা দিয়াছেন আনন্দের মধ্যে,—আজ বর্ষ-সূচনায় নতজানু হইয়া তাঁহাকেই সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

এই বৈশাখে উপাসনা চব্বিশ বৎসরে পদার্পণ করিল—বহু বাধা, বহু বিঘ্ন, বহুতর সমস্যার মধ্য দিয়া—তাহাকে কালের খেয়া পার হইতে হইয়াছে—কি যে অপ্রত্যাশিত দুঃখ ও বেদনা, নৈরাশ্য ও অস্বস্তির মধ্যে উপাসনাকে পথ চলিতে হইয়াছে কেবল তাহার পথের বন্ধুরা ছাড়া আর কেহই তাহা জানে না।

বর্ত্তমান সম্পাদক আজ দীর্ঘ পনের বৎসর কাল ঘনিষ্ঠ ভাবে উপাসনার সুখদুঃখের সহিত বিজড়িত—উপাসনা তাহার প্রাণের বস্তু, হৃদয়ের সামগ্রী; ক্ষোভ এই যে লালন পালনের ভার যাহার উপর একান্তই সে দরিদ্র, নিতান্তই সে অক্ষম—কিন্তু আমার যে সব বন্ধু ও সাহিত্যাগ্রজেরা অকৃত্রিম প্রীতি ও সাহিত্য-সেবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় উপাসনাকে বহন করিবার ভার লইয়াছেন—তাহারই জন্য আমি ভবিষ্যতের দিকে আশা-ভরা উৎসাহে চাহিয়া আছি। নিজের অক্ষমতার ত্রুটি যে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিজ-গুণে ঢাকিয়া লইবেন এ বিশ্বাস আমার আছে

বিশেষ করিয়া আজ একটা জরুরি কথা জানাইতে চাই —আমাদের কার্য্যালয়—উপাসনা প্রেস সমেত, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঠিক পূর্ব্বদিকে—২নং ওয়েলিংটন লেনএ আগামী ১৫ই মে (১৯৩৬) হইতে স্থানান্তরিত হইবে।—সুপরিসর স্থান ও কলিকাতার কেন্দ্রস্থল হিসাবে সেখানে কাজের অনেক সুবিধা হইবে বিবেচনাতেই এই পরিবর্ত্তন করা হইল। ১৫ই মে হইতে চিঠিপত্র, টাকাকড়ি বিনিময় পত্র ইত্যাদি নূতন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বৈশাখ সংখ্যা উপাসনা আমাদের বর্ত্তমান অফিস ৩০৯ বহুবাজার হইতেই বিলি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নূতন জায়গায় গুছাইয়া বসিতে একটু বিলম্ব হইবে—তজ্জন্য এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত লাইন কয়টির জন্য সুগায়ক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আগামী সংখ্যা উপাসনায়—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের 'কাব্য-পরিমিতি' সমাপ্ত হইবে—কিছু দিনের মধ্যেই রসচক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। 'কাব্য-পরিমিতি' সম্বন্ধে 'সম্মিলনী' বলিতেছেন, "কেবলমাত্র এই প্রবন্ধটির জন্য উপাসনার গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এমন উচ্চ শ্রেণীর চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ সচরাচর মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় না।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম্-এ বি-এল এর 'কাকজ্যোৎস্না'—আগামী আষাঢ় সংখ্যায় শেষ হইবে। শ্রাবণ হইতে নবপর্য্যায়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজ-কুমার রায় চৌধুরীর একখানি সুলিখিত উপন্যাস প্রকাশিত হইবে।

আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সুলিখিত প্রবন্ধ 'ঘুঁস ও ঘুঁসী', শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অভিনব কবিতা "বোঝা", স্বামী বাসুদেবানন্দের "ধর্ম্ম ও সমাজ" ও মহারাজা শ্রীশচন্দ্রনন্দী এম্-এ মহোদয়ের "মিশরের লুপ্ত গৌরব" প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহক অনুগ্রাহক ও লেখকগণের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া বর্ষারম্ভ করিলাম।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

PHONE: CAL. 3419

OUR SERVICE WILL MERIT A CONTINUANCE OF OUR CORDIAL RELATION

UPASANA PRESS

FINE ART, COMMERCIAL & VARIETY PRINTERS,
PUBLISHERS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

14 A, SARAT GHOSE STREET, CALCUTTA

১লা শ্রাবণ ১৩৩৫

ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী থেকে আমাদের উপাসনার ও মাসিক পত্রিকার সব ব্লকের কাজই আমরা করাই। ফোটোগ্রাফের আলো ছায়া ও অন্ধকার সূক্ষ্ম তারতম্য সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান যত বেশী— ব্লকের কাজ তাঁদের হাতে তত বেশী ভাল হবে। এঁদের সে জ্ঞান আছে ব'লে এক রঙা বহু বর্ণের লাইন বা হাফটোন ব্লক নিশ্চিন্ত ভাবে এঁদের কাছে তৈরী করতে দিতে পারা যায়। এক রঙের আঁকা ছবি থেকে উপাসনার প্রচ্ছদপট যে এমন রঙীন করে ছাপবার সুযোগ এঁরা দিতে পারবেন এ আশা করিনি।

এই শিল্পকলায় এঁরা বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন এ ভরসা আমার আছে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক, উপাসনা

THE INDIAN PHOTO ENGRAVING CO.,

Process Engravers & Colour Printers

217, Cornwallis St., Calcutta.

Telephone—B. B. 2905. Telegram—"Ductype"—Calcutta.

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

বিষয়-সূচী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

কালিপুর-আশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ ঃ—

পুস্তকের নাম	মূল্য	লেখক
১। জগৎস্বপ্ন	১৲	শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ
২। ক্ষেপীর খেয়াল	॥০	„ যোগেশ্বরী সরস্বতী
৩। তত্ত্বকথা	১॥০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রফেসার
৪। ঐ ২য় খণ্ড		
৫। সদ্‌গুরু ও রাজযোগ	১।০	শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস বি, এ
৬। সত্যযুগ	॥০	
৭। ঋষিযোগে স্মৃতি	১৲	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় বি, এ
৮। মুমুক্ষুর বিচার	॥০	শ্রীপ্রতিভা সাংখ্যশাস্ত্রী ও শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী
৯। পূর্ণানন্দের প্রলাপবাক্য	১৲	শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
১০। ঠিক বেঠিক	॥০	
১১। রামপ্রসাদের 'মা'	॥৵০	
১২। উপদেশাবলী	॥০	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
১৩। আশ্রম চতুষ্টয় (ব্রহ্মচর্য্য)	৬০	„ সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী
(ছাত্রজীবন) ছাত্রদের জন্য	॥০	কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য তর্কতীর্থ
১৪। তত্ত্ব-সঙ্গীত	৵০	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত

আশ্রমাচার্য্য—**শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়,** কালিপুর আশ্রম

কামাখ্যা (পোঃ), কামরূপ (আসাম)।

জননী

Shonar Bangla soap
DEFENDS
your
beauty
মডেল সোপ কোং

গুণে ও বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

তাই সর্ব্বত্র ইহার এত আদর।

—ইহার—

ব্যবহারাধিক্যে
নানা প্রকার নারিকেল তৈল
তৈল নামীয় ভেজাল কেশতৈল
দিন দিন বাজার হইতে লোপ পাইতেছে।

নিয়মিত ব্যবহারে
মস্তিষ্ক শীতল থাকে,
চুলের সৌন্দর্য্য বাড়ে,
চিত্তবিনোদন করে।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বিহার মিসেলেনী—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফোন নং—বি, বি, ৩৭৭০

দি

ওরিয়েণ্টাল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন

লিমিটেড্

৯৮।৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তিনটী

১। **বিনা** ডাক্তারী পরীক্ষায় ১৮ হইতে ৫৫ বৎসরের **যে কোন** পুরুষ বা মহিলা বীমা করিবার অধিকারী। মাসিক নিয়মিত চাঁদা নাই, হইলেও ১৲ টাকার অধিক নহে।

২। **স্বামী স্ত্রী** একত্র একই খরচায় বীমা করাইবার **প্রচলনই** আমাদের বিশেষত্ব। এককালীন সামান্য ৫৲ টাকা দিয়া ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি ?

৩। **পাঁচ শত** টাকা পর্য্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত মেম্বরগণ **কর্জ্জ** পাইবার অধিকারী।

(১২ বৎসর পর বীমাকারীকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না)।

সম্ভ্রান্ত **পুরুষ ও মহিলা** কর্ম্মীর প্রয়োজন। যোগ্যতা অনুসারে বেতন, কমিশন, বাৎসরিক ও বিশেষ বোনাস্ দেওয়া হইবে। কর্ম্মীগণের বিনা খরচায় বীমা করিবার সুবিধা আছে।

২৪শ বর্ষ　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮　　২য় সংখ্যা।

বোঝা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
　　আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া ?
যৌবনযোগে দেখা দিলে ফিরে,
　　কার কৈশোর কাহারে দিয়া ?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ;
　　আজি তাও পুনঃ কে লয় টানি' ?
যা নহে
　　কেন চিরদিন প্রয়াস বাণি !
আজি নিশিশেষে বসে মুখোমুখী
　　নব পরিচয় [illegible] ।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি'
　　মিলাব নূতন নয়নে তব ।

আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে' ?
যুগ-সঞ্চিত চুম্বনভারে
শ্রান্ত আনত অধর তব,
ভেবেছিলে সখি, তোমার সে ভার
আমার অধর পাতিয়া ল'ব ?
হায় সখি হায়, আমার অধরে
উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা !
অসহ তাহার বহনের ভার
নামাতে যে চাহি অহর্নিশা।
কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে ?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতি ঝরণ
ও কপোল-তলে শুকায়ে উঠে ?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজ-কলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ শেফালীর একটি রাতের
দীপালী নিবিছে ওষ্ঠাধরে ?
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে ?
এবারের মত শিহর ভুলিছে
কোন্ কদম্ব ও রোমকূপে ?
এবারের মত ফুলন ফুরায়
কোন্ চম্পক তোমার রূপে ?
কোন্ কুহকীর কুহু কুহু কুহু
ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে !
কোন্ সে চাঁদের মধু-পূর্ণিমা
ভোর হ'য়ে যায় তন্ত্র পারে !

অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সখি কার গন্ধ শোভা।
তাই বার বার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।

অমন করিয়া চেয়োনাক' সখি,
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা;
ছুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখোনা মাথা।
তনু হ'তে তনু, দীপ হ'তে দীপ,
যে অতনু শিখা জ্বলিছে চির।
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি,
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির!
আমার বুকের জতুগৃহখানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে।
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি' দিব বল কাহার দেহে?
আমরা দু'জনে চ'লেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা;
অসীম-পুরের রাজপথে-পথে
ফেরি হেঁকে' হেঁকে' গাহক খোঁজা।
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে রসে গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি;
আমার পশরা র'য়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদি কালই।

হেঁকে চল; তুমি—চাই সুধা চাই,—
ঘরে ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি';
আমি হেঁকে চলি—চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় কোরে আসে সুধার ফাঁকি।

অমৃতবাহিনী হায় মায়াবিনী
ছলে বাঁধি, মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস্ মোরে ?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে' যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে ?
অধরে অধরে ধরাধরি কোরে
মিলনের বোঝা নামাস্ পথে।
অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি' ;
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে' দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি !
পথপাসে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি',—
চাই সুধা চাই,—চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরাণো ফেরি !
হায় মায়াবিনী, পথ-পশারিণী,
বেঁচে যায় প্রাণ—তোর বুকে যদি
শেষ বোঝা মোর নামাতে পারি।

ঘুষ ও ঘুষী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

নাম শুনিয়া কেহ তরুণ-তরুণী বা হরিণ-হরিণীর মতো একজোড়া স্ত্রীপুরুষ বলিয়া ভুল করিবেন না। ইহারা ঠিক স্ত্রীপুরুষ নহে। তবে সৃষ্টির জন্য যেমন নারী ও পুরুষ—উভয়েরই প্রয়োজন, সৃষ্টি রক্ষা করিতেও তেমনি এই বস্তু-যুগলের শুভসম্মিলন একান্ত প্রয়োজন; নতুবা একদণ্ড সংসার চলিত না।

তাই, দম্পতী হিসাবে কেহ যদি ইহাদের কল্পনা করিতে চাহেন, তিনি নিতান্ত ভুলও করিবেন না। তবে, পুরুষ অপেক্ষা এক্ষেত্রে স্ত্রীটিই সমধিক শক্তিশালিনী—কতকটা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের মতো। ঘুষ অপেক্ষা ঘুষীর দেহশক্তিও এম্‌নি প্রবল যে এ স্থলে স্ত্রীকে পুরুষ এবং পুরুষকে স্ত্রী ভাবিলেও নিতান্ত অন্যায় হইবেনা।

এক কথায়, ঘুষ মনোরঞ্জনী বৃত্তির ব্যাকরণসঙ্গত পুরুষ সংস্করণ এবং ঘুষী ঠিক ইহার বিপরীতধর্ম্মী অর্থাৎ পশুবলের আদ্যা শক্তি।

জগতে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করুন, কুত্রাপি এই যুগ্ম শক্তির অভাবে সংসার চলিতেছে, এমনটি দেখিতে পাইবেন না। গৃহ, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য বা তদন্তর্গত যে কোনো অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান—কোথাও বৈলক্ষণ্য নাই।

দেহ ও মন, পশুবল ও প্রীতি-আকর্ষণ—এই দুই লইয়াই যখন সংসার, তখন ব্যতিক্রম ঘটিবে কোথা হইতে? দেহ ঘুষী, মন ঘুষ,—শক্তি ঘুষী, প্রীতি ঘুষ,—রুষ্টি ঘুষী, তুষ্টি ঘুষ—অনায়াসে এ কথা বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিম বাবু যে অত মাথা ঘামাইয়া কুকুর ও বৃষ জাতীয় পলিটিক্সের ধারাবিভাগ করিয়াছিলেন, তাহার গোড়াকার কথা এই ঘুষ ও ঘুষী অর্থাৎ গদা ও বাঁশী—অর্থাৎ কিনা জোর ও খুসী; দেহবল ও মনের সুড়সুড়ির আদানপ্রদান ছাড়া আর কিছুই নহে।

হয় ঘুষে নয় ঘুষীতে কিম্বা উভয়ের যথাযোগ্য প্রয়োগে জগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। যে কোনো উদাহরণ লইলেই ইহা স্পষ্ট হইবে।

প্রথমে একটা বড় ব্যাপারই লওয়া যাক্—রাজ্যজয়। দেহশক্তি বা পশুবল ইহার প্রধান উপায়। হয়ত এই এক উপায়েই কার্য্যসিদ্ধি হয়, ইহাই ঘুষী। কখনো বা হয় না; সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাজার বা শক্তির তুষ্টি বা প্রীতি বা সাহায্য আবশ্যক। তাহাকে খুসী করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। ইহা ঘুষ। কখনো একটি, কখনো দুইটিই প্রয়োজন।

একটা ছোট উদাহরণ দিই। চুরি ডাকাতী বা অম্‌নি একটা কিছু করিতে হইবে। এ কার্য্যসিদ্ধির উপায় মারধর বা দেহশক্তির প্রয়োগ। কখনো এই উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষের তুষ্টির জন্য ঘুষেরও ব্যবস্থা প্রয়োজন। ধরা পড়িলে, হয় মারধর করিয়া পলায়ন কর, নয় ঘুষ দিয়া অব্যাহতি লাভ কর। ঐ ঘুষ বা ঘুষী অথবা উভয়েরই আবশ্যক হইতে পারে। মারধর বা ঘুষ অবস্থাবিশেষে বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রয়োগই বিধি।

শক্তি ও তুষ্টি—ঘুষী ও ঘুষ সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকালে সর্ব্ব-কার্য্যোদ্ধারের যুগ্মমন্ত্র।

ঘুষ শ্যাম—প্রীতির দেবতা, ঘুষী শ্যামা—শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। এই শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয়ে সংসার সচল। নতুবা প্রলয় হইত।

স্বর্গে যাইতে হইবে—হয়, অসুরের মতো জোর করিয়া স্বর্গের অধিকারী দেবগণকে তাড়াইয়া স্বর্গ অধিকার কর, শক্তির দ্বারা জয় কর; নয়, দেবতার পূজা করিয়া, যজ্ঞ করিয়া, সেবা করিয়া অর্থাৎ যে কোনো প্রকারেই হৌক্, তাঁহাদের তুষ্টিসাধনের ঘুষ চালাইয়া চালাইয়া স্বর্গের সোপান অতিক্রম কর।

তাহার পর ইহাও ভাবিতে হইবে, ভাবান্তরের অন্তর্গত মুখোচ্চারণ-সূত্রের ফলেই ঘুষ-ও-ঘুষী ক্রমে ঘুষোঘুষীতে পরিণত হইয়াছে কিনা! ঘুষোঘুষী বা Struggle for Existence যে এই জগদ্ব্যাপারের মূলে চিরদিন সক্রিয় রহিয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। অধুনা মহাত্মা গান্ধী

তাঁহার বিপরীত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া প্রায় সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, ঘুষোঘুষীবাদ মহাত্মার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অহিংসাবাদ অপেক্ষাও বৃহত্তর সত্য। কারণ, মহাত্মাকেও শেষে ঘুষ দিয়া ঘুষীর সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছে। এখন যাহা চলিতেছে, তাহা ঘুষোঘুষী মাত্র। পূর্ণ অহিংসাবাদের সহিত এই ঘুষোঘুষীতত্ত্বের সমন্বয় দেখিবার জন্য বিশ্বজগৎ উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

আর একটা বড় প্রশ্ন জগতে মাথা তুলিতেছে। মানব-সভ্যতার আদিতে ঘুষ ছিল, না ঘুষী ছিল? ঘুষই ক্রমে ঘুষী হইল, না ঘুষীর পুচ্ছ খসিয়া গিয়া ঘুষে দাঁড়াইল? সমস্যা জটিল—প্রেম হইতে শক্তি, না শক্তি হইতে প্রেম? চুম্বন হইতে দংশন, না দংশন হইতে চুম্বন? আদি নর নারী-হৃদয় জয় করিয়াছিল ঘুষী দ্বারা না ঘুষের দ্বারা? বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের দাম্পত্যবন্ধনে অবশ্য ঘুষের মাত্রা অধিক, কিন্তু ঘুষীর কাল ও অধিকারও যে একেবারে বিগত হয় নাই তাহার প্রমাণও নিতান্ত দুর্লভ নহে। দাম্পত্য-বন্ধনে ঘুষীর উপকারিতা সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক, এই দুই ভিন্ন অন্য পথ নাই—'নান্যপন্থা'—গৃহধর্ম্মে স্বামী স্ত্রীর উপর, পুত্রের উপর, ভৃত্যের উপর শক্তি চালনা করিতেছে। ওদিকে গৃহিণী বা অন্যান্য পোষ্যেরা কর্ত্তাকে অহরহ খুসী করিবার পন্থা খুঁজিয়া ঘুষ চালাইয়া যাইতেছে! দুই দিক হইতে দুই পথে কলের মত কাজ চলিতেছে।

সমাজের সাক্ষ্য লউন। তাহাই দেখিবেন। গুরু, পুরোহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতির শক্তির বা ঘুষীর প্রয়োগ করিতেছেন। ইতর জনে তাঁহাদের খুসী করিয়া টিকিয়া থাকিতেছে। অন্যথা বিপ্লব।

জগতের পথে, হাঁটিয়াই যাও বা রেল ষ্টীমার যে যান বাহনেই যাও, সর্ব্বত্র ঘুষ ও ঘুষীর যে নিত্য প্রয়োজন, তাহা যাত্রীমাত্রকেই বোধ করি, বিশদ করিয়া আর বুঝিতে হইবে না।

জীবিকার জন্য চাকুরী করিতে যাও, হয় ঘুষ না হয় ঘুষী, হয় শক্তি নয় প্রীতি। গুরুতরের জোর বা খোসামুদী উমেদার-জীবনের পরম পাথেয়।

সওদাগরী আফিসই বল আর করপোরেসানই বল,—ইহার প্রসার জাজ্জ্বল্যমান। পুলিস বিভাগে ত' ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। অমন যে বিশ্ববিদ্যালয়, শুনিয়াছি সেখানেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। আর ধর্ম্মাধিকরণের ত' কথাই নাই।

হাঁ, ভালো কথা—ঘুষের একটা ডাকনাম আছে, উপরী। এই উপরি বলিয়া যে 'প্রাপ্য'টির কথা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি, তাহার বিশদ ব্যাখ্যাটি কি? তাহা অনন্ত, অশেষ! এমন কোনো কর্ম্ম বা এমন কোনো কর্ম্মচারী আছে কি, যাহার উক্ত প্রাপ্যটি নাই? যদি থাকে তবে Exception proves the rule. ব্যতিক্রম মাত্র। সামান্য বাগানের ফুলফল হইতে আরম্ভ করিয়া বড় দিনের ভেট পর্য্যন্ত cash ও kind এর বহু স্তর ও পর্য্যায়।

অতএব প্রমাণ হইয়া গেল জগৎ ঘুষ ও ঘুষীর উপরই দাঁড়াইয়া আছে। আমার মনে হয়, গত মহাপ্রলয়ের পর বসুন্ধরার উদ্ধার ঘুষ ও ঘুষীর দ্বারা হইয়াছিল বলিয়াই আজও তাহারই জের চলিতেছে। বিষ্ণু তখন একটি বটপত্রে ভাসমান। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে নিয়ত স্তব-স্তুতি করিতেছেন—হে দেবাদিদেব, হে আদিকারণ নারায়ণ, আপনি তুষ্ট হউন, বসুন্ধরা উদ্ধার করুন। বিষ্ণু ঘুষ পাইয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং পরক্ষণেই বিরাট বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটি প্রচণ্ড ঘুষীতে বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করিলেন। ঘুষ ও ঘুষী তত্ত্বের মধ্যে ওই মহান্ আদি কারণটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কাব্য-পরিমিতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনুশীলন

রসোত্তীর্ণ কাব্যের আর একটি লক্ষণ এই যে কবিচিত্তে ভাবের বাসনা দৃঢ় ও স্পষ্ট হওয়ায় কাব্যে সত্যকার অস্পষ্টতাদোষ আসে না। অনেক সময় বাসনা গভীর বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে কাব্য অস্বচ্ছ দেখাইতে পারে, কিন্তু পর্যাবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এ কাব্য কোনদিন পল্বল-সলিলের ন্যায় মলিন নহে।

রসচক্রের অধিকারী কবিচিত্তও অনেক সময় রসে উঠিতে সক্ষম না হইয়া আনন্দচক্রে ভ্রমণ করে। তাহার কারণ একাধিক :—

১। প্রতিভার জোয়ার ভাঁটা আছে। ভাঁটার সময় তাহা কবিচিত্তকে ভাসাইয়া রসলোক পর্যান্ত তুলিতে সক্ষম হয় না।

২। প্রতিভা হয়ত স্থায়ীরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কবিচিত্ত তাহার পূর্ব্বপরিচিত রসলোকের স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া নকল রসচক্রের সৃষ্টি করিতেছে, যাহা আসলে আনন্দচক্রমাত্র।

৩। প্রতিভা সবল হইলেও হয়ত অলস অর্থাৎ অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। আলস্যবশতঃ কিম্বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতায় সে তাহার সমগ্র শক্তিকে সক্রিয় করিতে পারিতেছে না। ফলে আনন্দচক্রের বেশী কিছুই সৃষ্ট হইতেছে না।

৪। দুর্ভাগ্য বা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কবিচিত্ত এমন ভাবকে রসে তুলিতে চাহিতেছে যাহা তাহার প্রতিভার শক্তিতে কুলায় না। হরিদ্বারের গঙ্গাস্রোত শিলাখণ্ড ভাসাইয়া লইতে সক্ষম, কিন্তু সুন্দরবনের ভাগীরথী বালুকণাটিকেও চড়ায় ফেলিয়া যায়। প্রতিভাও শক্তিমাত্র; ভাববিশেষের ভার যদি তাহার পক্ষে বেশী ভারী হয়, তবে তাহাকে রসলোক পর্যান্ত ভাসাইয়া লইতে সে সমর্থ হয় না এবং অল্পবীর্য্য উৎসের মত কল্পলোকে উঠিয়াই কাব্যে ঝরিয়া পড়ে।

ভাববিশেষের গুরুত্ব-সম্পর্কে আর একটী কথা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে। রতিভাব, শোকভাব বা শমভাবকে রসে পরিণত করিতে হইলে প্রতিভার প্রকৃতি ও শক্তি যে যে পর্য্যায়ের হওয়া প্রয়োজন, হাস্যভাব, ক্রোধভাব, বিস্ময়ভাব প্রভৃতিকে রসায়িত করিতে হইলে প্রতিভার প্রকৃতি ও শক্তি ঠিক সেই সেই পর্য্যায়ের হওয়ার প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ভিন্ন, সুতরাং তাহাদের রসে ভাসাইয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও শক্তি-বিশিষ্ট প্রতিভার প্রয়োজন হয় এবং তদুৎপন্ন রসও আস্বাদে ও গাঢ়ত্বে সকলে সমান নহে। স্বপ্রতিভার প্রকৃতি ও শক্তির সহিত ভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের হিসাব না করিয়া যদি কবিচিত্ত বিষয় নির্ব্বাচন করে তবে সে উদ্দিষ্ট রসে উঠিতে পারে না, অথবা পুনঃ পুনঃ রসাভাস ঘটায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিচিত্ত তাহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে—বাসনালোক হইতে। উৎকৃষ্ট কবিচিত্তের বাসনা বিচিত্র ও গভীর। এরূপ কবিচিত্তের আশৈশব ভাবস্মৃতি বাসনালোকের গভীর স্তরে অতি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই বিচিত্র-গভীর বাসনা-সাগর হইতে প্রতিভা স্বীয় শক্তি অনুসারে যেরূপ উপাদান সংগ্রহ

বাসনা-লোক

করিয়া আনে, কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষের সম্ভাব্যতা প্রধানতঃ তাহার উপর নির্ভর করে। যে বিশ্বপ্রকৃতি কাব্যের প্রধান ভাণ্ডার বলিয়া কথিত হয়, তাহা উপলক্ষ্য মাত্র; বাসনালোকই কাব্যের ভাণ্ডার। প্রাকৃতিক ব্যাপারের সংঘাতে কবিচিত্তে যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা কবিপ্রতিভাকে বাসনা-সাগরে ডুব দিবার প্রেরণা যোগায় মাত্র। তৎকালিক ভাবের প্রেরণায় প্রতিভা বাসনা-সাগরের তলদেশ হইতে কি রত্ন উদ্ধার করিবে, তাহা অপর মানবচিত্তের অগোচর। সাধারণ দৃষ্টি হইতে দৃষ্টি পৃথক। কিন্তু এই কবিদৃষ্টি আর কিছুই নহে,—বিশেষ

কবিপ্রতিভার বাসনা-সাগরে ডুব দিবার বিশেষ শক্তি। ১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড় হইল। ঝড়ের আঘাত কবি-চিত্তে ভয়বিমিশ্র বিস্ময়ভাবের উৎপাদন করিল, সকলের মনেই তাহা অল্প-বিস্তর করে। কবিচিত্ত সাধারণ ঝড়ের বর্ণনা করিয়া ভাবসমুখ কাব্য রচনা করিতে পারিত, অথবা পূর্ব্বদৃষ্ট ঝড়ের বাসনার সহিত মিলাইয়া বাসনা-সমুথ কাব্য রচনা করিতে পারিত। বাসনা-সাগরে ডুব দিয়া কল্পনা-সাহায্যে সাধারণ কল্পনাসমুথ কাব্যরচনা করিতেও কোন বাধা ছিল না। রবিচিত্তের প্রতিভা তাহাতেও ক্ষান্ত হইতে পারে নাই; সেই ঝড়ের দিনে সে বাসনাসমুদ্রের গভীর দেশে ডুব দিয়া নিশ্চিত, নিষ্ঠুর, সহজ-দুর্দ্দম নূতনের যে মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া আনিল, ঝড়ের সহিত তাহার কোন একান্ত-নিকট সম্বন্ধই ছিল না। ইহাকেই আমরা সচরাচর কবিদৃষ্টি বলিয়া থাকি; কিন্তু ইহা দৃষ্টির কাজ নহে, বিশেষ কবিপ্রতিভার বিশেষ বাসনাসাগরে ডুব দিবার বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপার; প্রাকৃতিক ঝড় নিমিত্ত হইয়া প্রতিভাকে বাসনা-সাগরে ডুব দিবার প্রেরণা দিয়াছিল। বাসনার গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের উপর কাব্যের স্তরভেদ নির্ভর করে। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তবিশেষের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত বলিয়াই অনুভূত হউক, কাব্যের, বিশেষতঃ উচ্চ কাব্যের ভাণ্ডার বাসনার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে; প্রকৃতি চিরদিনই উপলক্ষ্য।

উৎকৃষ্ট কবিচিত্ত কখনও কখনও বাসনার এমন গভীর স্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করে যাহার ভাব এ জীবনের অর্জ্জিত বলিয়াই মনে হয় না। তাহা যেন পূর্ব্বজন্মের, জন্ম-জন্মান্তরের আস্বাদিত ভাবের বাসনা। কবি তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় এইরূপ জীবনান্তরে আস্বাদিত ভাবের বাসনাকে কল্পনা-সাহায্যে অপরূপ রসমূর্ত্তি দিতে সক্ষম হন। কালিদাস বলিয়াছেন, 'মেঘ দেখিলে সুখী ব্যক্তিদের চিত্তও এক প্রকার ব্যথায় ভরিয়া উঠে, তাহার কারণ জন্মান্তরের স্মৃতি।' আর এক কবিচিত্ত যেখানে বলিতেছে—

> গভীর চিত্তে গোপনশালা, সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
> জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া।

অথবা

> আজ জেগেছে যে সব ব্যথা,
> এই জীবনে নেইকো তাহার হেতু।

সেখানেও সেই গভীর বাসনা-স্তরের কথাই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে। জন্মান্তর যাঁহারা না মানেন, তাঁহাদেরও heredity, উত্তরাধিকার, মানিতে হয়। মানব মনের সমস্ত বাসনা একটী খণ্ডিত জীবনে অর্জ্জিত ভাবস্মৃতি মাত্র না হইতে পারে। জন্মান্তরে বা যুগযুগান্ত-প্রবাহী মানব-বংশের অতীত ধারায় যে যে ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারে বাসনায় পরিণত হইয়া আছে। সাধারণতঃ তাহারা নিষ্ক্রিয় বা তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

> তব সঙ্কার শুনিছি আমার
> মর্ম্মের মাঝখানে।
> কত দিবসের কত সঞ্চয়
> রেখে যাও মোর প্রাণে।
> তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
> অদৃশ্য লিপি দিয়া
> পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
> মজ্জায় মিশাইয়া।

ইহা বাসনালোকের সেই স্তরের কথা যেখানে 'বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত' হইয়া আছে।

সুতরাং বাসনাকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—অর্জ্জিত ও লব্ধ। কবিচিত্ত বিশিষ্ট প্রতিভার বলে এই গভীর লব্ধবাসনার স্তর হইতেও কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া কল্পনালোকে রসের পাক চড়ায়। যে-সব ভাবের সহিত পরিচয় জীবনে হইয়াছে, যে-সব বাসনা অর্জ্জিত, তাহাদের রসে উঠান কঠিন; আবার যাহাদের সহিত এ জীবনে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, সেই সব লব্ধবাসনাকে রসমূর্ত্তি দেওয়া নিশ্চয়ই কঠিনতর। কিন্তু কবিচিত্তে এই লব্ধ-বাসনা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি থাকে বলিয়াই তাহাকে রসায়িত করা সম্ভব হয়। উত্তুঙ্গ প্রতিভা-মণ্ডিত কবিচিত্তের অতল-স্পর্শ বাসনা-সাগর হইতে যে রসমূর্ত্তি উঠিয়া আসে, তাহা রসিক চিত্তেরও বিস্ময়ের কারণ হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা এমনি একটি রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে—তাহার

নাম জীবনদেবতা। কবিপ্রতিভা তাহার গভীর লব্ধ-বাসনার স্তর হইতে শুক্তি তুলিয়া সেই জীবন-দেবতাকে মুক্তামালায় সাজাইতে আজিও একেবারে ক্লান্ত হইতে পারে নাই।

বলা বাহুল্য এই কবিচিত্তের পূর্ণ পরিচয় সেই পাঠক-চিত্তেই সম্ভব যাহা বাসনালোকের গভীর স্তরসম্বন্ধে সজাগ, এবং যেখানে অনুরূপ লব্ধবাসনা সঞ্চিত আছে।

কিন্তু কবিচিত্ত কখনও কখনও লব্ধবাসনার এমন স্তর হইতে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে যাহা কখনও ভাবরূপে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই মনে হয় না, সুতরাং যাহার সম্বন্ধে কোন বাসনার অস্তিত্বেই সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। কবি যখন বলেন—

> আমি চঞ্চল হে,
> আমি সুদূরের পিয়াসী,
> দিন চলে যায়, আমি আনমনে
> তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
> ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
> পরশ পাবার প্রয়াসী,
> আমি সুদূরের পিয়াসী।

তখন সীমাবদ্ধ মানব-মনের এই যে অসীমের জন্য ব্যাকুল পিপাসা, ইহার বাসনা কোথায়? ইহার ভাব এ জীবনে অর্জ্জিত হয় নাই নিশ্চয়। জন্মান্তরে বা মানবেতিহাসের অতীত ধারায় চিত্ত যে-যে ভাবের সহিত সম্ভবতঃ পরিচয় স্থাপন করিয়া আসিয়াছে এ তৃষ্ণার মূলে ত তাহাদের কোনটীর বাসনা বর্ত্তমান দেখা যায় না। ইহার মূল ত অতীতে যাহা পাইয়াছি তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মনে হয় না, বর্ত্তমানে যাহা পাই নাই, ভবিষ্যতে যাহা পাইতে চাই তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক। এই যে

> অসীম চাহিছে সীমার নিবিড় সঙ্গ
> সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।

ইহার ভাবস্মৃতি কোথায়?

লব্ধবাসনার অতলস্পর্শতার মধ্যে ডুবিয়া চলিলে আমরা অনুভব করিতে পারিব যে এ আকাঙ্ক্ষা যাহাকে কখনো পাই নাই ঠিক তাহার জন্য নহে; জীবচৈতন্যোদয়ের অতি প্রভাবে যে অসীম চৈতন্যসাগর হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম, তাহাকেই পুনরায় পাইবার জন্য এই আকাঙ্ক্ষা। অসীমের সাগরে যেদিন প্রথম ঘট ভরা হইল, সেইদিন উত্তাল জলে ঘটের যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ভাব বাসনা আকারে ঘটের জলে সঞ্চিত আছে, হয়ত-বা সাগরের জলেও ঘুমাইয়া আছে। সে ঘটের জল যেখানে রাখ, যেখানে ফেল, যেখানে উঠাও, তাহা অনিবার নিম্নাভিমুখে সাগরেই মিশিতে চাহিতেছে। বাষ্প করিয়া আকাশে উড়াও—মেঘ হইয়া নিম্নে বর্ষিত হইবে; তুষার করিয়া পর্ব্বতে উঠাও—নির্ঝর হইয়া নামিয়া আসিবে; মাটী খুঁড়িয়া পুকুরে ভর—তলে তলে নদীর সন্ধান করিয়া সাগরের উদ্দেশে ছুটিবে। উত্তুঙ্গ হিমাদ্রির চিরহিমরেখার ঊর্দ্ধে জমাইয়া রাখিলেও সে সাগরের ধ্যানে মগ্ন থাকিবে, যুগযুগান্তে সুযোগ পাইলেই তুষারনদীরূপে সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাগরের পানে প্রবাহিত হইবে। অসীম সাগরকে পাইবার জন্য ঘটের জলের যে তৃষ্ণা, তাহা অপ্রাপ্তকে পাইবার তৃষ্ণা নহে, অতিদূর অতীতে যাহা হারাইয়াছি, ইহা তাহারই বেদনা। আমরা অসীমের কথা কহিতেছি, যেখানে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অন্তরাল লুপ্ত হয়; সুতরাং হারানোর বেদনা ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এখানে হয়ত একই জিনিষের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র, একই বৃত্তাভাসের দুই কেন্দ্র। তথাপি একথা অনুভব করা কঠিন নহে, যে সীমাবদ্ধের চিত্তে অসীমের জন্য এই যে ব্যাকুলতা ইহা লৌকিক বিরহ না হইলেও অসীম অতীতের মধ্যে আদি-মিলনের ভাবস্মৃতি হইতে উদ্ভূত বিরহ। বর্ত্তমানে তাহা আমাদের অনধিগম্য হইলেও অতীতে তাহার সহিত পরিচয়ের অভাব ছিল না। কোন পরিচয়ই যদি না থাকিবে তবে কবিচিত্ত কেন পরক্ষণেই বলে—

> আমি উৎসুক হে,
> হে সুদূর আমি প্রবাসী।
> তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
> কি কথা আমায় শুনাও সতত,
> তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
> জেনেছে তাহার স্বভাষী,
> হে সুদূর আমি প্রবাসী।

ঘটের জলকে ভাঁড়ার-ঘরের জলচৌকির প্রবাসে রাখা হইয়াছে, কলকলোর্থ স্বভাষা সে ভুলিয়াছে, কিন্তু এখনও

একেবারে ভুলিতে পারে নাই—অতি-প্রত্যুষে নদীজলধারায় সে বহিয়া চলিয়াছিল, সহসা কে যেন ঘটের আঘাতে ঢেউ তুলিয়া তাহাকে সেই নদীধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া আনিল। নির্জ্জন পল্লীপথে গমনান্দোলিত সুন্দরীর কক্ষে ভুজলতাবেষ্টনলব্ধ আনন্দে সে মুখরিত হইয়াছে; গৃহস্থের গৃহে আসিয়া নির্ম্মলা-কর্পূর সহযোগে সে স্বাদগন্ধ অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু ঘটের ঘায়ে যে ঢেউ উঠিয়াছিল সেই ঢেউ-এর কথা ত সে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। পল্লীর গৃহস্থ-বধূরা আজিও জানে—ঢেউ দিয়া জল ভরিলে মৃৎকলসের নিস্তরঙ্গ নিথর বদ্ধ জলও ভাঁড়ার-ঘরে বসিয়াই হঠাৎ কখন কলস ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া চলিবে। নদীতীরপল্লীর প্রতি গৃহস্থবধূ জল ভরিবার সময় বিশেষ সাবধান হয় যেন জলের সহিত ঢেউ না আসে, কারণ সে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ করিয়াছে কুম্ভের জলে ঢেউ-এর স্মৃতি থাকিয়াই যায়; বদ্ধ ঘরের নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিবার আকাঙ্ক্ষা যদি কুম্ভের জলে জাগিয়া উঠে, বুঝিতে হইবে প্রত্যুষে ঢেউ দিয়া জল ভরা হইয়াছিল। ঢেউ-এর মধ্য দিয়া নদীধারার সহিত যে বিচ্ছেদ কুম্ভজলের ঘটিয়াছে, তাহারই ভাবস্মৃতি বা বাসনা লব্ধবাসনার যে অতি-গভীর স্তরে ঘুমাইয়া থাকে তাহাকে 'অতিলব্ধবাসনা' বলা যাইতে পারে। যে কবিপ্রতিভা এই অতিলব্ধবাসনার অতলতা হইতে ঢেউ-এর গান তুলিতে সক্ষম হয় তাহাকে আমরা mystic কবিপ্রতিভা বলি। সে প্রতিভা ঘটের জলকে জানায়—

> নাহি জানে কেউ
> রক্তে তোর নাচে আজি
> সমুদ্রের ঢেউ।

অপূর্ব্ব অনুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে সে ঘটের জলকে লোভ দেখায়—

> ওরে দেখ, সেই স্রোত হ'য়েছে মুখর,
> তরণী কাঁপিছে থরথর।
> তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে' থাক্ তীরে,
> তাকাস্‌নে ফিরে,
> সম্মুখের বাণী
> নিক তোরে টানি'
> মহাস্রোতে,
> পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
> অতল আঁধারে, অকূল আলোতে

এই mysticism যদি ভাবমূলক না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অভাবাত্মক হইত, হঠাৎ যাহাকে কখনো পাই নাই তাহাকে পাইবার ব্যাকুলতাই যদি ইহার একমাত্র উত্তেজক কারণ হইত, তবে mystic কাব্যে অসীমের সহিত লীলার প্রকাশ দেখিতে পাইতাম না। এ লীলায় মিলনের ভাবস্মৃতি আছে বলিয়া বিরহ গভীর ও মধুর হইয়াছে। 'বাসকশয়ন 'পরে' সীমা যখন অসীমের বাহুতে বাঁধা ছিল তখন 'ঘুম-ঘোরে অচেতন' থাকিলেও তাহার বাসনা আজ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কারণ সে অন্য মুহূর্ত্তে বলিতেছে,—

> তোমায় জানিনা চিনিনা একথা বলত
> কেমনে বলি ?
> খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও
> খনে খনে যাও চলি।
> অসীম যখন সীমার দুয়ারে আসিয়া,
> শুধালো কাতরে সে কোথায় সে কোথায়
> ব্যগ্র চরণে আমারি দুয়ারে নামি'
> সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
> নবীন পথিক সে যে আমি
> সেই আমি।

এই সরমের কল্পনা মিলনভাবের অতিলব্ধবাসনা-সঞ্জাত, ইহা অভাবাত্মক বিরহ মাত্র নহে।

কাহার ঘট মহাসাগরের কোন্ সমুদ্রে ভরা হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? প্রশান্ত সমুদ্রে না অতলান্তিকে, লোহিত সাগরে না পীত সমুদ্রে? কাহার ঘট কবে ভরা হইয়াছিল তাহাই বা কে জানে; বিক্ষুব্ধ বাত্যায় না প্রশান্ত চন্দ্রকিরণে? সুতরাং চিত্তে চিত্তে অতিলব্ধবাসনা বিভিন্ন হইবার পক্ষে বাধা দেখা যায় না এবং mysticismও ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

Mystic কবিতার চক্র সম্পূর্ণ করিতে mystic পাঠক-চিত্তের প্রয়োজন; অর্থাৎ যে পাঠকচিত্তে সেই ঢেউ-এর ভাবস্মৃতি একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে নাই এবং অনুরূপ ঢেউ-এর দোলা যে চিত্তকে আজিও মধ্যে মধ্যে নাড়া দেয়, সেই

পাঠকচিত্ত সহধর্মী mystic কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

খাঁটি mystic ও নকল mystic কবিচিত্তের প্রধান প্রভেদ এই যে নকল mystic কবিচিত্তে অতিলক্ষ্যবাসনা সম্বন্ধে প্রতীতি বা প্রকৃত অনুভূতি নাই, তাহা তাহার শোনা কথা মাত্র।

বাসনালোকে দাঁড়াইয়া আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে—কাব্যে তত্ত্বের স্থান আছে কিনা? কিন্তু এ প্রশ্নই সঙ্গত মনে হয় না। কাব্যে সকল বস্তু ও বিষয়েরই স্থান আছে, এবং তত্ত্বেরও আছে, প্রতিভা যদি তাহাকে বাসনা হইতে কল্পনার মধ্য দিয়া রসে পৌঁছাইতে পারে। এক এক শ্রেণীর সাধারণ ভাবই চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে বাসনান্তরে উঠিয়া দানা বাঁধিয়া যে বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাহাই সে চিত্তে উক্ত ভাবের তত্ত্ব। তত্ত্বীভূত বাসনা বিশিষ্ট কল্পনা দ্বারা জারিত হইলে রসলোকে উঠিতে পারে; আবার সুচিন্তিত যুক্তি দ্বারা চালিত হইলে

তত্ত্ব

দর্শনক্ষেত্রে স্থান পায়;—সে দোষ বা গুণ তত্ত্বের নহে, তাহা চিত্তের। বরং ইহাই সম্ভব যে ভাব-বিশেষের বাসনা চিন্তাশীল কবিচিত্তে দৃঢ় হইলে দানা বাঁধিয়া প্রথমে এক একটী তত্ত্বরূপই গ্রহণ করে এবং সেই তত্ত্ব উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার নিকট রসে উঠিবার যোগ্যতর ও উচ্চতর উপাদান হইয়া উঠে। কর্দ্দমসাহায্যে ঘরের দেওয়াল দেওয়ায় বাধা নাই, কিন্তু কর্দ্দম হইতে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৎসাহায্যে দেওয়াল দেওয়া অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রথাই মনে হয়। ইষ্টক ত আর কিছু নহে সে এক-প্রকারের মৃৎতত্ত্ব মাত্র। রবীন্দ্র-কাব্যে অনেক ভাবই প্রায় তত্ত্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরে রসে উঠিয়াছে। তাঁহার রসোত্তীর্ণ কবিতাসমষ্টি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে জীবন সম্বন্ধে তাঁহার একটী তত্ত্ব আছে, মরণ সম্বন্ধে তাঁহার একটী তত্ত্ব আছে, এমন কি বর্ষা সম্বন্ধে, গ্রীষ্ম সম্বন্ধে, সন্ধ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার এক একটী তত্ত্ব আছে। আর সেই-জন্যই তাঁহার অসংখ্য ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যেও ঐ ঐ বিষয় এক একটী বিভিন্ন অথচ সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সৃষ্টির মধ্যেও অনেক চরিত্র আছে যাহারা এক একটী তত্ত্ব মাত্র। রসে উঠিবার পথে তত্ত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয় না হইলেও তাহা ঐ পথের অন্তরায় নহে। কেবল অল্পশক্তি কবিপ্রতিভা তত্ত্বের ভার সম্যক্ বহন করিতে পারে না বলিয়া কাব্য রসবিমুখী ও দর্শনমুখী হইয়া পড়ে।

রসোত্তীর্ণ কাব্য বাহিয়া রসলোকে কবিচিত্তের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারিলেই রসোন্মুখী অর্থাৎ সুরসিক পাঠকচিত্তের কাজ শেষ হইল। কিন্তু এই সুরসিক পাঠক-চিত্তের মধ্যে যাহারা রসাস্বাদের পর রসলোকে বিশ্রাম না করিয়া কবিচিত্তধারার প্রতিকূলে তাহার প্রতিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পায়, এবং কবিচিত্তের

ক্রিটিকচিত্ত

কল্পনালোক, বাসনালোক ও ভাবলোকের সম্যক পরিচয় পাইবার জন্য রসচক্র সম্পূর্ণ পরিবেষ্টন করিয়া একেবারে স্বক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে, তাহাকে ক্রিটিক্‌চিত্ত বলা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট কবিচিত্ত যেমন রসে পৌঁছিয়াও স্থির থাকে না, কাব্যে নামিয়া তবে শান্তিলাভ করে, ক্রিটিকচিত্ত তেমনি রসলোকে পৌঁছিয়াই পূর্ণ তৃপ্তি পায় না, কবিচিত্তধারার প্রতিবর্ত্তন করিয়া নূতন আনন্দলাভের চেষ্টা করে। কবিচিত্তধারার সম্যক্ পরিচয় লাভ করাই ক্রিটিক্‌চিত্তের ধর্ম্ম।

কবিও পাঠক, সুতরাং কবির মধ্যে কবিচিত্তধারার পাশে পাশে পাঠকচিত্তধারাও বর্ত্তমান। কোন কবির কবিচিত্ত ভাবসমুখ, বাসনাসমুখ কিম্বা কল্পনাসমুখ হইলেও তাহার অভ্যন্তরস্থ পাঠকচিত্তের রসোন্মুখী হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। বরং ইহাই দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিরা প্রায় সকলেই রসোন্মুখী। তাঁহাদের অভ্যন্তরস্থ পাঠকচিত্তের এই রসোন্মুখীনতাই অনেক সময় তাঁহাদের কবিচিত্তের প্রেরণা যোগায়। প্রতিভার অল্পতায় কবিচিত্ত বিলাসচক্রে বা আনন্দচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের পাঠকচিত্ত চিরদিনই রসচক্রের অধিকারী। উচ্চ কবিপ্রতিভা একান্ত দুর্লভ। কিন্তু রসোন্মুখীচিত্ততাও জগতে নিতান্ত সুলভ নহে। যে পথে হউক রসলোকে উঠিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহা-রাই ধন্য।

আয়াস সহকারে অথবা অনায়াসে যে সমস্ত কাব্যের অর্থবোধ হয়, তৎসম্পর্কিত কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের

অনুসরণ এতক্ষণ করিলাম। কিন্তু এমন কাব্যও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাহার কবিচিত্তকে উন্মাদ কবিচিত্ত বলা যাইতে পারে। সে পূর্ণ-নিরঙ্কুশ কবিচিত্তের গতিপথ কোন নিয়মের ধার ধারে না বলিয়া সুস্থচিত্তে তাহার অনুসরণ অসাধ্য। সে কাব্যের সম্যক্ অর্থ করা সম্ভব হয় না কারণ তাহা প্রলাপ-প্রধান। অথচ এই প্রলাপচক্র সম্পূর্ণ করিতে পারে এমন পাঠকচিত্তও এই বিচিত্র জগতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সে 'মদসমুখ' কাব্যের বিষয় আমাদের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

কাব্য-পরিমিতি লিখিয়া যে অপরাধের ভাগী হইলাম তাহার উল্লেখ করিয়া ইহার উপসংহার করি। প্রথম অপরাধ—রসচক্রের রেখারূপঅঙ্কনের প্রয়াস। সমস্ত অপরাধের মূলে মানবচিত্তের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান। অনুভব-যোগ্য রসকে 'বুঝিবার' চেষ্টার ফলেই এই রসচক্রের উদ্ভব। কিন্তু অবোধ্যকে বুঝিবার চেষ্টা মানবমনের চিরন্তন দুর্ব্বলতা। তথাপি রসজ্ঞদের নিকট আমি আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

দ্বিতীয় অপরাধ আমার অন্তরঙ্গ কয়েকটী বন্ধুকবিদের সম্পর্কে। পাঠকচিত্তধারার অনুসরণ সম্বন্ধে যাহাই বলি, কবিচিত্তধারার অনুসরণ আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইত না, যদি কয়েকটী সহৃদয় কবিচিত্তের সহিত আমার অন্তরঙ্গতা না থাকিত। রসের আলোচনাসম্পর্কে তাঁহারা নিজ নিজ চিত্তের দ্বার আমার নিকট পুনঃপুনঃ অকপটে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি বিচিত্র-সুন্দর কবি-চিত্তধারার যা-কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আমার বক্তব্য বিষয়ে প্রতীতি সেই বন্ধুকবিদের সংস্পর্শেই আসিয়াছে। আমার অনেক কথাই রসতত্ত্বালোচনা-কালে তাঁহাদের রসমুগ্ধ অন্তরের কথা। বলিয়া ও না-বলিয়া সংগৃহীত তাঁহাদের সেই সব অন্তরের কথা কম্পাসে চিত্রিত করিয়া সাধারণের গোচর করিবার অপরাধ আমার হইয়াছে—সেজন্য আমি আমার সেই বঙ্গ বন্ধু-কবিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

[শেষ]

তাজ-বক্ষে

শ্রীগোপাললাল দে

চতুরুদধিকা মহাভারতের রাজ-রাজরাণী মমতাজ!
এ তাঁর সমাধি; মণি-কিশলয়, কল্প-শিলায় রতন-বেদী;
তাঁর পাশে এই পূজারী প্রেমিক সম্রাট শাজাহান রাজ,
রূপসী-প্রিয়ার অসহ-বিরহে শ্বসিল যে বঁধু মর্ম্মভেদী।

এবার মিলেছে, কুসুম-বাসর রচা আছে তাই নিশিদিন,
পরিরম্ভণ এবার শিথিল হবে না কালের বন্ধনে;
এই ফুল লও, প্রার্থনা কও, সুর বাঁধো, যদি আছে বীণ্,
আজানের গান শোন পেতে কাণ ডাকদি খোদার বন্দনে।

'চির বাসরের ওগো ও প্রেমিক, ওগো ও রূপসী বাদশা-পিয়া,
জাগো একবার এসেছে প্রভুর প্রার্থনাবেলা সন্নিকটে;'
খিলানে, খিলানে, মিণারে, মিণারে যমুনা কিনারে মূরছি গিয়া,
সুর-সুরধূনী রচিল আজান শত-ধারাময়ী গোমুখীতটে।

মূর্চ্ছনা তার ফিরে ফিরে আসে, আরও শুনি, আরও শোনা যায়,
তবু শুনি কাণে মিলালো যখন অসীম নভের কিনারায়।

সুখী যুবরাজ

শ্রীভীমাপদ ঘোষ

সুখী যুবরাজের সুবর্ণ মূর্ত্তি সহরের মধ্যে উচ্চ এক বেদীর উপর স্থাপিত আছে। তাঁর উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির চোখ দুটি ও তরবারির হাতলের উপর বড় পদ্মরাগ মণিটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

যেই দেখত সেই মূর্ত্তিটির প্রশংসা না করে থাকতে পারত না।

ছোট্ট একটি ছেলে একদিন চাঁদ ধরবার জন্য মায়ের কাছে আব্দার করে কান্না জুড়ে দিলে। মা তাকে ভুলাবার জন্য মূর্ত্তিটি দেখিয়ে বললেন, "বা কি সুন্দর! সুখী যুবরাজ কখনও কাঁদে না। দুষ্ট ছেলে, তুমিও কি ওর মত হতে পার না?"

এক দিন হতাশ হৃদয়ে একব্যক্তি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে মূর্ত্তিটি দেখে বললেন, "যাক্ পোড়া পৃথিবীতে তা হলে একজনও ত সুখী আছে।"

গরীব ছেলেরা গির্জ্জা থেকে ফিরবার সময় মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে বলাবলি করত, "দেখ ভাই, এটি দেখতে ঠিক দেবদূতের মত!"

একদিন তাদের অঙ্কের মাষ্টার এই কথা শুনে ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন করে জানলে তোমরা যে এটি দেখতে দেবদূতের মত? তোমরা কি কখনও দেবদূত দেখেছ?"

"আজ্ঞে, চোখে দেখি নাই, তবে স্বপ্নে দেখেছি।"

উত্তর শুনে তিনি রোষপূর্ণলোচনে ছেলেদের দিকে চাইলেন। ছেলে মানুষ দেবদূতের স্বপ্ন দেখেছে—এও কি কখনও হয়?

ছোট এক চাতকপাখী একরাত্রে এইসহরে এসে উপনীত হ'ল ও চারিদিকে উড়ে বেড়াতে লাগল। তার আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবেরা বহুদিন পূর্ব্বে মিসর দেশে চলে গিয়েছে। নদীর কিনারার এক শর গাছের সঙ্গে প্রেমে পড়ে সে-ই কেবল পিছিয়ে পড়ে আছে। বসন্তের এক সুন্দর প্রভাতে উভয়ের দেখা হয়। চাতক তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে—স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে বললে, "ভাই, তুমি বড় সুন্দর। তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছা করছে।" এই বলে গাছটির চারিধারে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কখনও কখনও বা নদীর জলের উপর তার পাখার দ্বারা আঘাত করে সুন্দর ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে তার প্রেম নিবেদন করতে লাগল। এমনি করে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত কেটে গেল। তা সে টেরও পেলে না।

তার গতিকসতিক দেখে তার জ্ঞাত-ভাইরা সব হেসে খুন। "শরের সঙ্গে ভালবাসা! এও কি কখনও হয়! শরের রূপও নাই অর্থও নাই, নদীর ধারে গেলেই ত লাখে লাখে শর গুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায়।"

তার সাথীরা সকলে সে দেশ ছেড়ে চলে গেলে তার মন কেমন কেমন করতে লাগল। সেও তার প্রেয়সীকে কত প্রকারে তার নিবেদন জানাতে লাগল। "কই, আমার সঙ্গে ত একটি কথাও বলে না, কিন্তু বাতাসের সঙ্গে এর কত ভাব! হেলে দুলে কত কথাই বলে। আমার অভ্যাস দেশে দেশে ঘুরে ফিরে বেড়ান, আর এ দেখছি স্থান ত্যাগ করে নড়বে না, যাক্ শেষ চেষ্টা করেই একবার দেখা যাক্। "এই মনে করে সে শরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাই, তুমি কি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?" কথা শুনে শর মাথা দুলিয়ে জানালে যে ঘর ছেড়ে সে এক পাও নড়বে না।

"ওঃ, তবে তুমি আমায় শুধু শুধু এত দিন কষ্ট দিলে? আচ্ছা তবে আসি, আমি পিরামিডের দেশে চললাম।"

এই বলে সে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত দিন উড়ে সে এই সহরে এসে রাত কাটাবার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগল।

উচ্চ বেদীর উপর দণ্ডায়মান সুবর্ণ মূর্ত্তিটা দেখে সে মনে করলে, "যাক্ খালি জায়গা পাওয়া গিয়েছে। খোলা হাওয়ার মধ্যে কোনও রকমে এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।" এই ভেবে সে সুখী যুবরাজের দু'পায়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বসল।

মনে ভাব্‌লে, "আজকে দেখছি ভগবান কপালে সোনার ঘরে শয়ন লিখেছেন।" এই মনে করে পাথার উপর মাথাটি রেখে ঘুমাতে যাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় বড় এক ফোঁটা জল তার গায়ে পড়ল। "কি আশ্চর্য্য! বিনা মেঘে বৃষ্টি! চাঁদনী রাত, কোথাও একটুকুও মেঘ নাই। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে। এদেশের আবহাওয়া দেখ্‌ছি অদ্ভুত!"

তার পর আর এক ফোঁটা জল পড়ল। "দূর কর ছাই, যদি বৃষ্টিতেই ভিজব, তবে এই মূর্ত্তির নীচে থেকে লাভ? বিধির বিড়ম্বনা! এই রাত্রেই দেখ্‌ছি আবার কোথাও আস্তানা খুঁজে নিতে হবে।" এই মনে করে সে সেখান থেকে উড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প কর্‌লে।

পাখা দুটি মেলবার পূর্ব্বেই আর এক ফোঁটা জল পড়ল। তখন সে উপরের দিকে তাকিয়ে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌লে।

সুখী-যুবরাজের চোখ দু'টি অশ্রুপূর্ণ আর তাঁর গণ্ডে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে। চাঁদনি রাতে তাঁর মুখ খানি এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে চাতক বেচারার মনে বড় কষ্ট হল।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কে?" "আমি সুখী-যুবরাজ!"

"তবে আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার অশ্রুধারায় আমি যে ভিজে গেলাম।"

"আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখন আমারও সাধারণ মানুষের মত হৃদয় ছিল। আমি রাজ-প্রাসাদে থাকতাম, দুঃখ যে কি তা তখন টের পাই নাই। দিনের বেলায়—সঙ্গীদের সঙ্গে বাগানে খেলা করতাম, রাত্রে ঘরের মধ্যে নাচ গান হত। সুন্দর বাগান, চারধারে উচু প্রাচীরে ঘেরা। অভাব কিছুরই ছিল না, কাজেই প্রচীরের বাইরে কি হচ্ছে ও কি আছে তা জানবার ইচ্ছা কোনও দিনই হ'ত না। সকলেই আমাকে সুখী-যুবরাজ বলত। আমোদ আহ্লাদে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই যদি সুখের হয় তবে বাস্তবিকই আমি সুখী ছিলাম। তার পর যখন আমি মারা যাই, সহরের লোকে আমার স্মৃতি রাখবার জন্য এই উচু স্থানটিতে আমার মূর্ত্তি স্থাপিত করেছে। এখন এখান থেকে সহরের দুঃখকষ্ট সব আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আর আমার সীসানির্ম্মিত হৃদয় গলে যাচ্ছে।"

কথা শুনে চাতক মনে মনে ভাবলে, "তা হলে মূর্ত্তিটি দেখ্‌ছি আগাগোড়া সোনার ঢালা নয়!" যাক্, মুখ ফুটে সে আর কিছুই বলল না।

মূর্ত্তিটি—করুণস্বরে বলে যেতে লাগল, "এখান হতে দূরে এক গলি রাস্তার পাশে গরিবের এক কুটির দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঘরের জানালা খোলা আছে। তাই দিয়ে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি যে একটি স্ত্রীলোক টেবিলের পাশে বসে আছে। শীর্ণ তার দেহ, মুখখানি শুষ্ক, হাতের আঙ্গুলগুলি ছুঁচ বিঁধে বিঁধে লাল হয়ে গেছে। মেয়েটি দরজীনী। রাণীর প্রিয় সখী আগামী বলনাচের দিনে যে পোষাকটি পর্‌বেন তারই উপর বসে বসে সে ফুল কাট্‌ছে। এক কোণে তার রুগ্ন বালক পুত্রটা শুয়ে আছে। জ্বরে ছেলেটা ছটফট করছে, আর কমলা লেবুর জন্য ঝোঁক ধরেছে। এদিকে ঘরে নদীর জল ছাড়া আর কিছুই নাই। মা কি দিয়ে তাকে সান্ত্বনা করবে? ছেলেটির কান্না কিছুতেই থামেনা। ভাই চাতক, তুমি আমার তরওয়ালের হাতল থেকে পদ্মরাগমণিটী তুলে নিয়ে মেয়েটীকে দিয়ে এস না? আমার পা দুটো এই স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে নতুবা আমিই নিজে ছুটে সেখানে যেতাম।"

"আমি যে ভাই আজ ভোরেই মিশরে চলে যাব। আমার সঙ্গীরা এখন নীল নদীর ধারে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ফুটন্ত পদ্মের সঙ্গে কত আলাপই না তারা এতক্ষণ জমিয়ে তুলেছে। শীঘ্রই তারা সে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের কবরের উপরে গিয়ে ঘুমাবে। বিচিত্র শবাধারের মধ্যে সম্রাট সেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁর দেহে সুগন্ধি ঔষধাদি অনুলিপ্ত হয়েছে, নানা প্রকার রাজ-ঐশ্বর্য্য ও বিভবের মধ্যেই তিনি নিদ্রা যাচ্ছেন।"

"ভাই চাতক, তুমি কি একটি দিনও আমার কাছে থেকে যাবে না? ছেলেটা তৃষ্ণায় ছটফট করছে, আর তার মায়ের বুক যে ফেটে যাচ্ছে।"

চাতক বল্‌লে, "ছোট ছেলেদের প্রতি আমার বড় দয়া মায়া নাই। গেল বছর গরমের সময় আমরা নদীর ধারে চরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটি দুষ্ট ছেলে আমাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে লাগল। আমরা খুব উঁচুতে উড়ি। তাঁছাড়া

চট্‌পটেও খুব, কাজেই আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু কাজটা বড় অন্যায়। ছেলেরা আমাদিগকে বড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।"

কথা শুনে যুবরাজ এত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যে তাঁর মুখ খানি দেখে চাতকের ভারি কষ্ট হল। "এখানে বড় শীত। আপনি যখন এত করে বল্‌ছেন তখন একদিনের জন্য থেকে আপনার কাজ করব।"

"তোমাকে বহু ধন্যবাদ, ভাই চাতক।"

তারপর তরবারি থেকে পদ্মরাগ-মণিটি তুলে নিয়ে চাতক সহরের উপর দিয়ে উড়ে চল্‌ল।

গির্জ্জার উপর মার্ব্বেল পাথরের সুন্দর দু'টি দেবদূতের মূর্ত্তি শোভা পাচ্ছে, চাতক তার পাশ দিয়ে উড়ে গেল। রাজ-প্রাসাদের কাছ দিয়ে উড়ে যাবার সময় সে নৃত্য-গীতের শব্দ শুনতে পেল। এক সুন্দরী তার প্রিয়তমের সহিত খোলা ছাদে বেড়াচ্ছিলেন। বল্‌ছিলেন, "দেখ, রাজকীয় নাচের পূর্ব্বে আমার পোষাকটী পেলে হয়। দরজী-নীকে পোষাকের উপর ফুল কাট্‌তে দিয়েছি, কিন্তু তারা যে আসলে কাজ করতেই চায় না।"

নদীর ওপর জাহাজের মাস্তুলে তখনও লণ্ঠন ঝুল্‌ছে। ইহুদীরা বন্দরে দরদস্তুর করছে ও টাকা ওজন করছে। এই রকমের নানা প্রকার জিনিস দেখ্‌তে দেখ্‌তে চাতক সেই গরিবের গৃহে উপস্থিত হ'ল। ছেলেটী তখনও জ্বরে ছটফট করছে। তার মা ক্লান্ত হয়ে তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাতক আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করে টেবিলের ওপর যেখানে দরজীনীর আঙ্গটটা পড়ে ছিল, সেইখানে বড় পদ্ম-রাগ মণিটী রেখে দিলে। তারপর বিছানায় তার পাশে আস্তে আস্তে ঘুরে তার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। ছেলেটী ভাবলে, "আঃ যা হোক, শরীরটা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হ'ল। এইবার জ্বর ছাড়বে।" এই মনে করে সে সুখে ঘুমিয়ে পড়ল।

এর পর চাতক ফিরে এসে যুবরাজকে সমস্ত সংবাদ দিলে। সমস্ত ব্যাপার শুনে যুবরাজ বল্‌লেন, "দেখ, আজ কি কন্‌কনে শীত, কিন্তু আমার শরীরটা গরম বোধ হচ্ছে।"

প্রভাতে চাতক নদীর ধারে গিয়ে স্নান করলে। পক্ষী-তত্ত্ববিদ্ এক পণ্ডিত সাঁকো দিয়ে নদী পার হবার সময় অসময়ে এই চাতককে দেখে মনে করলেন, "কি আশ্চর্য্য, শীতকালেও এদেশে চাতক আছে!" তিনি এই সম্বন্ধে দুরূহ শব্দ দিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। দেশ বিদেশের সংবাদ পত্রে তা প্রকাশিত হ'ল, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা খুব কম লোকেই বুঝতে পার্‌লে।

"যাক্, আজ শেষ রাত্রে মিশরে রওনা হব" এই মনে করে চাতক সহরের গির্জ্জা, স্মৃতি-স্তম্ভ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান-গুলি দেখে বেড়াতে লাগল। চড়ুই পাখীরা তাকে দেখে বলাবলি করতে লাগল। "অসময়ে এই নূতন অতিথি কোথা হতে এল?" তাদের কথাবার্ত্তা শুনে চাতকের কি আনন্দ!

চাঁদ উঠলে চাতক সুখী যুবরাজের কাছে গিয়ে বল্‌লে, "এইবার আমি মিশরে রওনা হচ্ছি, সেখানে আপনার কিছু দরকার আছে কি?"

"ভাই, তুমি আর একদিনের জন্য থেকে যাও।"

"আমার সঙ্গীরা সব আমার পথপানে চেয়ে আছে। কাল তারা বড় জলপ্রপাতের দিকে উড়ে যাবে। তার কিছু দূরে অশ্বের মত বেগবতী নদীর স্রোত শরের বনে আবদ্ধ হয়ে আছে। দুপুর বেলা জ্বলন্ত ও ভীষণ চক্ষুবিশিষ্ট বড় বড় সিংহ হুঙ্কার দিয়ে জলপ্রপাতের ধারে তৃষ্ণা নিবারণ করতে আসে। জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জনের চাইতেও তা ভয়াবহ।"

"—ভাই চাতক, দূরে সহরের মধ্যে ছোট একটী ঘরে এক যুবককে দেখতে পাচ্ছি। বই ও কাগজে পরিপূর্ণ এক টেবিলের সামনে সে হেলান দিয়ে বসে আছে। টেবিলের ওপর কতকগুলি শুকনো নীল রঙের ফুল পড়ে আছে। চুল গুলি তার কোঁকড়া কোঁকড়া, ঠোঁট দুটী বেদানার মত লাল ও বড় বড় চোখ দু'টী—স্বপ্নাবেশে মুদিত-প্রায়। অপেরা কোম্পানীর জন্য একখানি নাটক শেষ করবার জন্য সে চেষ্টা করছে, কিন্তু বেচারা শীতে এত জড়সড় হয়ে পড়েছে যে তার ভাব আর জুগিয়ে উঠছে না। ঘরে আগুনের লেশ মাত্র নাই। আহা, যুবকটী ক্ষুধার জ্বালায় মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।"

চাতকের মেজাজ তখন ভালই ছিল। সে বল্ল, "যাক্ আপনি যখন অত করে বলছেন, তখন এ রাতটাও এখানেই থেকে যাব। তাকে কি আর একটী পদ্মরাগ মণি দেবো?"

"না ভাই, আর পদ্মরাগ মণি কোথায় পাব? আমার নীলকান্তমণির চোখ দুটীই এখন আমার একমাত্র সম্বল। এ দুটীর মূল্য অনেক। জানি না কতদিন পূর্ব্বে এ অমূল্য রত্ন দুটী ভারতবর্ষ থেকে আনা হয়েছিল। যাক্, এর একটি তুলে নিয়ে তাকে দিয়ে এস। গরিব বেচারা কোনও জহুরীর কাছে এটী বেচে আহার, জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি কিনবে ও পরে হয়ত নাটকটা শেষ করে ফেলবে।"

কথা শুনে চাতকের মনে বড় কষ্ট হ'ল। সে বললে "যুবরাজ, একাজ আমার দ্বারা হবে না।"

"ভাই চাতক, আমি যা বল্‌ছি শোন, দেরী করো না।"

চাতক যায় কি করে? শেষে বাধ্য হয়ে যুবরাজের একটী চোখ তুলে নিয়ে গরীব ছাত্রটীর ঘরের দিকে রওনা হল। ঘরখানি জীর্ণ, ছাদে একটা বড় রকমের ফাট ছিল। কাজেই ঘরে প্রবেশ করতে চাতকের বিশেষ কষ্ট হ'ল না। যুবকটী টেবিলের ওপর হাত দিয়ে, তার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল, চাতকের পাখার শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গল না, সে কিছুই টের পেলে না। জেগে উঠে অবাক্ হয়ে দেখলে লাল ফুলগুলির মধ্যে এক পরম সুন্দর নীলকান্ত-মণি শোভা পাচ্ছে।

মণিটী দেখে তার আনন্দ হ'ল। সে বলে উঠল—"এইবার লোকে আমার লেখার কদর বুঝেছে। নিশ্চয়ই কোনও গুণগ্রাহী অর্থশালী ভদ্র লোক আমাকে এই মণিটী উপহার দিয়ে গেছেন। যাক্, আমার দুঃখ এইবার ঘুচবে, আর নাটকটাও শেষ হবে" এই মনে করে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

পরদিন বন্দরে গিয়ে চাতক এক জাহাজের উচ্চ মাস্তুলের উপর বসল। মাঝিমাল্লায় মাল নামাচ্ছে ও উঠাচ্ছে। কুলীরা মাল নামান উঠানর সময় চীৎকার করছে। চাতক চীৎকার করে বললে, "ওহে তোমরা শুনছ আমি মিশরে যাচ্ছি?" কিন্তু সেখানে কে কার কথা শুনে?

চাঁদ উঠলে সে সুখী যুবরাজের কাছে এসে বস্‌ল ও বল্‌ল—"যুবরাজ, এইবার তা হ'লে বিদায় দিন।"

"ভাই চাতক, আর একটি দিন কি এখানে থেকে যেতে পার্‌বে না?"

"দেখুন, এ দেশে কি ভীষণ শীত পড়েছে। হয় ত দুই এক দিনের মধ্যেই বরফ পড়বে। মিশরে তাল-বীথিকার মধ্যে এখনও বেশ গরম আছে। নদীর ধারে মস্ত মস্ত কুমীর সেখানে কাদার উপর পড়ে রোদ পোহায়। আমার সঙ্গীরা সব এতক্ষণ উচু মন্দিরের উপর নীড় বেঁধেছে, ঘুঘু পাখীরা আনন্দে কূজন করছে। যুবরাজ, এবারের মত আমাকে বিদায় দিন্। আপনার স্নেহের কথা চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে। বসন্তে যখন আবার এদেশে ফিরে আস্‌ব তখন আপনার জন্য গোলাপের মত রাঙা পদ্মরাগ মণি একটী ও সমুদ্রের জলের মত নীল নীলকান্ত মণি একটী এনে আপনাকে উপহার দেব।"

"চাতক, ঐ পার্কের মধ্যে ছোট একটী মেয়ে দেয়াশলাই বেচে বেড়াচ্ছে। ওই যা, দেয়াশলাইগুলি হঠাৎ তার হাত থেকে নর্দ্দমায় পড়ে নোংড়া হয়ে গেল। কি হবে ভাই? দেয়াশলাই বিক্রী করে কিছু অর্থ না নিয়ে গেলে মেয়েটার বাবা তাকে বক্‌বে ও মার্‌বে। কাজেই মেয়েটী ভয়ে কাঁদ্‌ছে। তার পায়ে জুতা মোজা কিছুই নাই, মাথায়ও টুপী নাই। ভাই চাতক, আমার আর একটী চোখ তুলে নিয়ে মেয়েটীকে দিয়ে এস। তা' হ'লে আর তার বাপ তাকে মার্‌বে না।"

"আচ্ছা, আপনি যখন বল্‌ছেন তখন আর এক রাত্রি না হয় থেকেই যাব, কিন্তু আপনার আর একটী চোখ আমি তুলে নিতে কিছুতেই পার্‌ব না। আপনি যে তা' হ'লে একেবারে অন্ধ হ'য়ে যাবেন!"

"ভাই চাতক, আমি যা বল্‌ছি কর, আর কোনও উপায় নাই।"

কাজেই চাতক যুবরাজের চোখটী তুলে নিয়ে বালিকার অনুসন্ধানে গেল। বালিকাটীকে খুঁজে বা'র করে—তার মাথার উপর উড়ে ঝুপ করে তার হাতে মণিটী ফেলে দিল!

মণিটী পেয়ে বালিকা মনে করলে, "ভারি সুন্দর কাচ ত! যাই, বাবাকে এটা দেখিয়ে আনি" এই মনে করে সে দৌড়ে বাড়ী ফিরে গেল।

তারপর চাতক যুবরাজের কাছে ফিরে এসে বললে, "আপনি এখন অন্ধ, আমি এখন থেকে আপনার কাছেই থাকব। আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।"

"না ভাই চাতক, এইবারে তুমি মিশরে চলে যাও।"

"তা কি হয়, আমি আপনার কাছেই পড়ে থাকব।" এই বলে চাতক ঘুমিয়ে পড়ল।

তার পর দিন থেকে সে যুবরাজের কাঁধের উপর বসে তাঁকে দেশ বিদেশের গল্প শুনাতে লাগল। মিশরে ঝাঁকে ঝাঁকে বক নদীর ধারে স্বর্ণ মৎস্য ধরে খায়, বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত 'স্ফিংক্স' মূর্ত্তি সেখানে অনন্ত কাল ধরে পাহারা দিচ্ছে, মাথা হাতে করে বাণিজ্যসাদারগণ উটে করে দেশ-বিদেশে মাল আমদানী রপ্তানী করছে, ভীষণ সবুজ বর্ণ এক সাপ তাল গাছের উপর নিদ্রা যাচ্ছে, আর কত পুরোহিত নিত্য সুখাদ্য দিয়ে তার অর্চ্চনা করছে,—ইত্যাদি কত প্রকার গল্পই সে করত!

তার গল্প শুনে যুবরাজ বল্‌তেন, "চাতক, তুমি পৃথিবীর অনেক আশ্চর্য্য জিনিষের কথা আমাকে শুনাচ্ছ। কিন্তু মানুষের দুঃখকষ্টের চাইতে সংসারে আর আশ্চর্য্য জিনিষ কি আছে? আমি ত' এখন চক্ষুহীন। যাও একবার সহরের উপর উড়ে দেখে এস সেখানে কি হচ্ছে, আর সেই কাহিনী আমাকে শুনাও।"

সুতরাং চাতক সহরের উপর উড়ে বেড়াতে লাগল। ধনী লোকেরা বাটীর ভিতর আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে আছেন আর বাইরে কত নিরন্ন ভিক্ষুক এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য বসে আছে! সহরের অন্ধকার ও অপ্রশস্ত গলির পাশে অন্নাভাবে শীর্ণ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মলিন বেশে নোংরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু'টী ক্ষুধার্ত্ত বালক শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক সাঁকোর তলায় পরস্পর জড়াজড়ি করে বসে আছে। এমন সময় পাহারাওয়ালা এসে বল্‌লে, "এই, সাঁকোর তলায় কে বসে আছ? পালাও।"—কাজেই তারা দু'টিতে প্রচণ্ড শীতের দিনে বাইরে বসে ভিজতে লাগল।

এই সকল করুণ কাহিনী শুনে যুবরাজের মনে বড় কষ্ট হল। তিনি বললেন, "দেখ, আমার দেহ সোনার পাতে মোড়া, এক এক করে সোনার পাত আমার দেহ থেকে খুলে গরিব লোকদের বিলিয়ে দাও। মানুষ কি ভ্রান্ত! যতদিন বেঁচে থাকে কতক গুলো। সোনা পেলেই বড় সুখী হয়। আদেশ পেয়ে যুবরাজের দেহ থেকে সোনার পাতগুলি খুলে চাতক এক এক করে বিলিয়ে দিলে। সুখী যুবরাজের ধাতুময় ধূসর বর্ণ মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সোনা পেয়ে গরিবের মুখে হাসি ফিরে এল। তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল খেতে পরতে পাবে মনে করে তারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল!

ক্রমে সে দেশে তুষার পাত হতে লাগল। রাস্তা, ঘাট, ঘরবাড়ী সব সাদা হয়ে গেল। চারিদিকে বরফের স্তূপ রূপার মত উজ্জ্বল ও সুন্দর! বড় লোকেরা ভাল ভাল শীতের পোষাক লোম ও পুচ্ছনির্ম্মিত গলাবন্ধ প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা লাল টুপি পরে বরফের উপর ছুটাছুটি করতে লাগল।

চাতক শীতে বড় কাতর হয়ে পড়ল, কিন্তু সে যুবরাজকে এত ভাল বাসত যে তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে তার ইচ্ছা হল না। রুটিওয়ালার দোকান থেকে দুই এক টুকরা খাদ্য সংগ্রহ করে কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে লাগল। যখন শীতে তার শরীর আড়ষ্ট হবার মত হত, ডানা নেড়ে শরীর গরম করে নিত।

তারপর একদিন সে বুঝতে পারলে যে তার মরণের আর দেরী নাই। তখন সে যুবরাজের কাঁধের উপর এসে বলল, "যুবরাজ, বিদায়, চির বিদায়। একবার আপনার হস্ত চুম্বন করবার অনুমতি পাব কি?"

"ভাই চাতক, শুনে বড় সুখী হলাম যে তুমি এত দিনে মিশরে যাচ্ছ। কতদিন হ'ল তুমি এসেছ! তুমি আমার অধরে চুম্বন কর।"

"না যুবরাজ, মিশরে যাওয়া আর হল কই? মরণ আমাকে টানছে। যাক্ তাতেই বা ভয় কি? ওটাত এক প্রকারের ঘুম ছাড়া আর কিছুই নয়।"

এই বলে সে সুখী যুবরাজের অধরে চুম্বন করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণহীন দেহ যুবরাজের পদতলে পড়ে গেল।

কি আশ্চর্য্য! ধাতুময় প্রস্তরমূর্ত্তি থেকে সেই সময় ফট করে এক শব্দ হ'ল। যুবরাজের সীসানির্ম্মিত হৃদয় বক্ষ

বিয়োগ সহ্য না করতে পেরে ফেটে গেল। লোকে ভাবলে, যে শীত পড়েছে—মূর্ত্তিটি ফাটে, আর না ফাটে।

তারপর একদিন সহরের মেয়র কতকগুলি সদস্য ও অমাত্যের সহিত বেড়াতে বেড়াতে যুবরাজের মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "যুবরাজের মূর্ত্তিটা কি বিশ্রীই হয়েছে।"

আমাত্যবর্গের কাজ তাঁর কথায় সায় দেওয়া, কাজেই তাঁরাও সকলে এক সঙ্গে বলে উঠলেন "হাঁ, হাঁ, সত্যিই ত, মূর্ত্তিটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।" এই বলে এগিয়ে গিয়ে মূর্ত্তিটা ভাল করে দেখতে লাগলেন।

মেয়র বল্লেন, "যুবরাজের চোখের নীলকান্ত মণি দুটী, তরবারির হাতলের উপর—পদ্মরাগমণিটী ও সর্ব্বাঙ্গে জড়িত সোনার পাত কিছুই ত নাই। এযে দেখছি যুবরাজের ভিক্ষুক-বেশ হয়েছে।

আমাত্যেরা বল্লেন, "তাইত, তাইত, আজব ব্যাপার, কেন এমন হ'ল?"

মেয়র বললেন, "এ আবার কি? যুবরাজের পায়ের গোড়ায় একটি পাখী মরে পড়ে আছে দেখছি। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা কিছুই লক্ষ্য রাখে না।" তাঁর সঙ্গে যে সব কর্ম্মচারীরা ছিলেন তাঁরা তাঁর কথা নোটবুকে লিখে নিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুশিল্পের অধ্যাপক মহাশয় বললেন যে মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্যই যখন নষ্ট হয়েছে তখন ওটা রেখে লাভ? ওটা ভেঙ্গে ফেলাই ভাল।

তার পর ঐ ধাতুমূর্ত্তিটী অগ্নির উত্তাপে গলিয়ে ফেলা হ'ল

এই ধাতু দিয়ে কি করা হবে এই স্থির করবার জন্য মিউনিসিপালিটীর এক সভা বসল। মেয়র বললেন যে ওটা দিয়ে সহরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ মেয়রের এক মূর্ত্তি তৈয়ার হবে।

কথা শুনে সদস্যেরা সকলেই নিজের নিজের দাবী উপস্থিত করলেন। বিষম ঝগড়া বেধে গেল। আমি যখন সেখান থেকে আসি তখনও তারা এই নিয়ে ঝগড়া করছিল।

এদিকে কারখানার ওভারসীয়ার কুলীদিগকে বললেন, "দেখ এত চেষ্টা করা গেল, কিন্তু যুবরাজের সীসানির্ম্মিত হৃদয় কিছুতেই গলান গেল না। যাক্, ওটা ফেলে দাও।" আদেশ পেয়ে তারা যেখানে মৃত চাতক পাখীটী পড়েছিল তারই ঠিক পাশেই যুবরাজের ধাতুনির্ম্মিত হৃদয়টী ফেলে দিলে।

এমন সময় ভগবান তাঁর আজ্ঞাবহ দেবদূতদিগকে আদেশ দিলেন, "ঐ সহর থেকে বেছে বেছে উৎকৃষ্ট দুটি জিনিষ নিয়ে এস।" তাঁর আদেশ পেয়ে তাঁরা যুবরাজের সীসা নির্ম্মিত হৃদয় ও মৃত পাখীটী এনে তাঁকে উপহার দিলেন।

আনন্দিত হয়ে ভগবান বললেন, "তোমরা ঠিক জিনিষই এনেছ। এই যুবরাজ চিরকাল স্বর্গের সুবর্ণ-পুরীতে থেকে আমার সেবা করবেন, আর এই পাখীটি অনন্তকাল এইখানে মনের আনন্দে গান গাইবে।" •

ধর্ম্ম ও সমাজ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

অন্তরায়—(১) সাম্প্রদায়িকতা

ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ-শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার দুটো অন্তরায় প্রত্যেক নবোন্নতিবাদীই স্বীকার করে থাকেন। প্রথম হলো সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং দ্বিতীয় জন্মগত বর্ণ-বিভাগ। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রথমটি এবং বারান্তরে দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনার ইচ্ছা রইল।

এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের হেতু কি? শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আপাতঃ পরস্পর একটা বিরোধ থাকলেও, তাদের অন্তরদেশে প্রবেশ করলে কিন্তু এ বিরোধ দেখতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আদর্শ মানব যাঁরা, তাঁদের চরিত্র, ব্যবহার ও বাণী যদি পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা যায়, তা হলে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, তাঁরা একধর্ম্মী। ধর্ম্মভাব খুব উচ্চ প্রগতিতে পৌছুলেই হিন্দু আর হিন্দু থাকে না, বা মুসলমান মুসলমান থাকে না—কেবল এক উদার ও সার্ব্বজনীন মানবতাই তাদের চরিত্রে পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। হনুমান বলেছিলেন, "হে রাম কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস, কখনও দেখি তুমি ভগবান আমি ভক্ত, আর কখনও দেখি তুমি ও আমি এক।" কৃশ্চান ও মুসলমান সাধকদের ভেতরও এরূপ দুই একজনের ইতিহাস আমরা পাই। প্রকৃত জ্ঞানীরা ধর্ম্মাকাশের এত উঁচুতে ওঠেন যে সেখান থেকে মসজিদ, গির্জ্জে, মন্দির এক হয়ে মিশে যায়। যে সব বিভিন্ন ভাব নিয়ে এত গোলমাল লাঠালাঠি, সে সব ধারার মূল উৎসের সন্ধান পেয়ে সংঘর্ষের হেতু মহাপুরুষেরা বুঝতে পারেন না, পরন্তু আরও অনন্ত বিচিত্র ভাবের আকাঙ্খা করে থাকেন, এবং সেই জন্য তাঁদের ভাষাও হয় এক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"সেখানকার সব শেয়ালের এক রা।" গ্রীক্ প্লেটো বলচেন, "ভগবান সম্বন্ধে যত কিছুই ব্যাখ্যা করনা কেন, সব রূপকথার মত হবে, কোনটাই তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ দিতে পারবে না।" আর ভারতের মহাপুরুষ বলচেন, "কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে সমুদ্রের ধারে একটা গর্ত খুঁড়ে সমুদ্দুরটা তার মধ্যে পোরবার চেষ্টা করছিল। এটা যেমন বাতুলতা, ভগবানকে মন বুদ্ধির ভেতর ধরবার চেষ্টা করাও ঠিক তেমনি।"

কিন্তু একটা জিনিষ বোঝা ও একটা জিনিষ করা সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা বুঝি অনেক জিনিষ ঠিক, কিন্তু করবার সময় করি একটা বন্য বর্ব্বরের মত ব্যবহার। এর কারণ হচ্চে ব্যবহারের সঙ্গে আমরা সত্যের খাপ খাওয়াতে পারি না—আরামপ্রিয়তার জন্য, প্রাচীন অভ্যাসের জন্য, আগন্তুক সত্যের অমর্য্যাদা আমরা করে থাকি। কেন যে ঋষিরা চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তার তত্ত্ব না বুঝে, সেটাকে জন্মগত করে নিম্নবর্ণের ওপর উচ্চবর্ণের স্বাধিকার বলপূর্ব্বক দাবী করে বসি। খুব অসভ্যদের সুসভ্য করবার জন্যই চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি। যেমন যেমন উন্নতি হবে, তেমনি তাদের উচ্চ উচ্চতর বর্ণে উঠিয়ে নিতে হবে। এ বিষয়ে বহু উদাহরণ আছে—বহু ঋষি নীচ বর্ণ থেকে উচ্চ বর্ণে স্থান পেয়েচেন এবং বহু ঋষির পুত্রও গুণকর্ম্মানুযায়ী নিম্নবর্ণে অধোগামী হয়েচেন। সমগ্র ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণ—এই একত্বের দিকে সমগ্র সমাজকে পরিচালিত করবার জন্যই ঋষিরা চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাধিকারে আসক্তি বশতঃ অভিজাতেরা তা ভুলে গেলেও দেখা যায়—কবীর, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যখনই একবর্ণের সৃষ্টি করতে চেয়েচেন, তখনই দলে দলে লোক তাঁদের অনুসরণ করচে এবং অভিজাতেরা তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি না মানলেও মহাপুরুষ বলে তাঁদের গ্রহণ করতে বিরত হন নি। সত্যটা তাঁরা প্রাণে প্রাণে বুঝেও কথা দিয়ে সেটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেচেন, বলেচেন, "ওঁরা মহাপুরুষ লোক ওঁদের কথা আলাদা।" কিন্তু খড়ের গতি দেখেই বাতাসের গতি নির্ণয় করতে হয়।

হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটা ব্যাপক দয়ার ওপর তার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। তার সার কথা হচ্চে যে যে স্তরের উপাসকই হোক না কেন তার অগ্রগমনের সাহায্যের জন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। একেবারে বিশ্ব-জনীন ধর্ম্ম সকলে গ্রহণ করতে পারবে না

বলেই সম্প্রদায়। সেই জন্যই স্বামিজী বলেছিলেন, "মন্দিরের গণ্ডীতে জন্মান ভাল, কিন্তু মরা ভাল নয়।" একটা সুরক্ষিত জায়গায় শিশু না জন্মালে তার বাঁচাই দায় হয়, কিন্তু চির-কাল তার মধ্যে থাকলে তার বাড় নষ্ট হয়ে পঙ্গুত্বই আসে। সকল সংঘ, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও জাতির শিশুপালন সম্বন্ধে এ সত্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সকলেরই আশা করার অধিকার আছে যে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নত, শিশু আমাদের চাইতেও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

হিন্দুর বৃদ্ধি এই উদারতার ওপর। আমরা যেমন খেলনার মধ্য দিয়ে শিশুকে নানা বিষয় শিক্ষা দেই, ঋষিরাও তেমনি অসংখ্য অনার্য্য দেবদেবী আর্য্যধর্ম্মাঙ্গীভূত করে তাদের ওঠবার সাহায্য করেচেন। সেমেটিক (Semitic) ধর্ম্মের মত পরমত-অসহিষ্ণুতা হিন্দু ধর্ম্মে একেবারেই নেই। যেখানেই হিন্দু ধর্ম্মে অত্যাচার সেখানেই অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ, হিংসা, অসংযম প্রভৃতি তার কারণ। কিন্তু সেমেটিক ধর্ম্ম বলচে, 'এ না মানলে নরক হবে, বিধর্ম্মীকে হত্যা করলে স্বর্গ হবে।' আধুনিক ভারতীয় ধর্ম্মে যে এই সব পাগলামী মাঝে মাঝে শাস্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তার হেতু সেমেটিক সভ্যতার প্রভাব। হিন্দু মসজিদ বা গির্জ্জা ভাঙতে চায় না, কারণ সেখানেও যে ভগবানেরই উপাসনা হয়। কিন্তু যখন তার মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করলে, তখন সে হয়ত একটা মসজিদ ভাঙলে—কিন্তু সেটাও তার ধর্ম্মসঙ্গত নয়। হিন্দুর কোনও শাস্ত্রই বিশ্বাস করে না যে অপর ভাবাবলম্বীর নরক হবে। তার মূর্ত্তি-প্রতীকের অর্দ্ধেক শিব, অর্দ্ধেক বিষ্ণু। অস্পষ্ট মস্তিষ্কের বিবাদ মেটাবার জন্য ঘণ্টাকর্ণোপাখ্যান সকল হিন্দুই জানে।

হিন্দু ধর্ম্ম প্রথম ও চিরকাল প্রচারশীল। তবে সে প্রচার কখনও তরবারির দ্বারা হয়নি বা জাতিগত বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেনি। সে চায় প্রতি জাতির চরিত্র বদলে তাকে মহৎ করতে, তা সে যে কোনও দর্শনই মানুক বা যে কোনও প্রতীক—ক্রুশ বা কাবার উপাসনা করুক। হিন্দুর ভগবান বলচেন, "স্ত্রী, শূদ্র এবং পাপযোনিও যদি তাঁর উপদেশ পালন করে, তাহলে মুক্তি হবে।" স্বধর্ম্ম পালন না করলে তাকে মেরে ফেলার কথা কোন শাস্ত্রে নেই। সেমেটিক বলচে, 'চরিত্র তোমার যাই হোক না, আমার পথটা স্বীকার করলেই তুমি ধার্ম্মিক।' হিন্দু বলচে, 'পথ তোমার যাই হোক না, চরিত্র না থাকলে তুমি অধার্ম্মিক।' এই ভিত্তির ওপর হিন্দু প্রচারশীল এবং বহু গোষ্টিকে স্বাধিকারভুক্ত করেচে। বেদের তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞের বিবরণে দেখা যায়, কেবল দুই একটি নয়—গোষ্টিকে গোষ্টি হিন্দুধর্ম্মভুক্ত করা হয়েচে। দেবল স্মৃতি বলচেন, "বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত, কলুষিত বা অবরুদ্ধ স্ত্রীলোক, ঐশ্বর্য্যলোভে ধর্ম্মত্যাগীদেরও সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা যেতে পারে।" কিন্তু ধ্বংসমুখী অজ্ঞাত এই স্মৃতির অনুসরণকারীদের দেবল ব্রাহ্মণ বলে ঘৃণা করে এসেছেন, কিন্তু অবস্থান্তরে পড়ে এই দেবল স্মৃতির অনুসরণ করা ছাড়া আজ আর উপায় নেই। সকলেই একবার পাবনা, ময়মনসিং ও সিন্ধুদেশের ব্যাপারটা স্মরণ করবেন।

প্রাচীন কালের অনুশীলন করলেই দেখা যায়, জাতির পর জাতিকে আর্য্যসমাজে তুলে নেওয়া হচ্চে এবং তাদের দেবতাদের ইন্দ্র-সভার সভ্য করে' নেওয়া হচ্চে। রামচন্দ্রের গুহক চণ্ডাল ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা এবং শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমন, অনার্য্য বানর ও নাগজাতিকে তুলে নেওয়ার ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এমনি ক'রে পিতৃ, সাধু, গ্রহ, ভূত এবং গোষ্টিদেব উপাসনা এক ব্রহ্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, বিরাট হিন্দু-মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল। সকলেরই উদ্দেশ্য এই সকল দেবদেবীর মধ্য দিয়ে এক ব্রহ্মবস্তুতে লীন হওয়া। এমন কোনও শাস্ত্র নেই যা বলচেন না, 'তোমারই ইষ্ট সকলের ইষ্ট।' অথচ ধর্ম্ম প্রচার ও ব্যবহারে এত বৈষম্য কেন? বৈষম্যের হেতু বহিরাঙ্গ ভক্তি। গোল বাধে তিলক, কৌটা, তুলসী, রুদ্রাক্ষ, পূর্ব্বমুখ পশ্চিম মুখ নিয়ে। 'এগিয়ে গেলে' এসব বিরোধ মিটে যায়। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ এই 'উপায়'গুলোকে 'উদ্দেশ্য' ক'রে বসে থাকে। ধর্ম্মাঙ্গকে ভগবানের আসনে বসালেই এ বিভ্রাট বাধবে। ধর্ম্ম যখন আমরা ত্যাগ করতে পারছি না, তখন ধর্ম্মের মূলদেশ অনু-সন্ধান ব্যাপক ভাবে আমাদের করতে হবেই। নইলে সাম্প্রদায়িকতা কিছুতেই এই বিশাল ভারতের শক্তি কেন্দ্রী-ভূত হ'তে দেবে না, পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার নাশে ভারতের বৈচিত্র্যও নষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মনাশ হবে, ধর্ম্মের নাশে জাতিরও

নাশ। যেমন বিভিন্ন অংশ নিয়ে একখানা ইঞ্জিন, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে এই বিরাট জাতীয় অর্ণবযান চলছে। বিভিন্ন অংশের নাশে অর্ণবযানের নাশ নিশ্চিত।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান মহাভারতের শক্তি কেন্দ্রীভূত করা যখন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়েছে এবং সাম্প্রদায়িকতা যখন তার একটা মস্ত অন্তরায়, তখন তার ধ্বংস হ'য়ে নতুন জাতি গড়ে উঠুক না কেন? হ'লে হয় ভাল, কিন্তু সম্প্রদায় ভাঙ্গা মানে ধর্ম্ম ভাঙ্গা। সহস্র সহস্র বর্ষ আচরিত, সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি ধর্ম্মপ্রাণ জাতির ধর্ম্ম ভাঙ্গা কি রাম শ্যাম প্যালা পঞ্চার কর্ম্ম? না, জগতে এমন কোনও শক্তি আছে যে তা পারবে? ইউরোপের খৃষ্টান তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে, তুর্কীর মুসলমান তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু ভারতের খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না। বিশ্ব-মন্দির ভারতের আকাশ চিরকালই সকল ধর্ম্ম-প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় লাঞ্ছিত থাকবেই। লক্ষের মধ্যে স্ব স্ব যথার্থ ধর্ম্ম যাতে আচরিত হয়, তার ব্যবস্থা করাই সোজা পথ। ধর্ম্মের দোষ নেই—দোষ আচরণকারীর - দোষ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাকারীর কলহপ্রিয়তা, প্রবঞ্চকতা, প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, শাসনেচ্ছা—দোষ, ধর্ম্ম-সংঘের ব্যক্তিগত স্বার্থ, সম্পত্তি, কর্ত্তৃত্ব ও দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অশিক্ষা ও আরাম-প্রিয়তা—দোষ জাতির পরাধীনতা, ব্যাপক মৃত্যু-তুষ্টি, অলৌকিক জ্ঞান, বুদ্ধির অভাব, সমষ্টি-ধারণায় অসামার্থ্য।

হিন্দুর সভ্যতা সেমেটিক প্রভৃতি জাতির সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুর সভ্যতা বিসূচিকার মত ছড়িয়ে পড়ে না, হিন্দুর ভেতর ফেরাও বা তৈমুর কখনও জন্মায় নি, হিন্দু কখনও জাতকে জাত উজাড় করে দিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা করে নি। হিন্দু কখনও কারও সমাজ, বিশ্বাস বা প্রতিমা ভাঙ্গেনি, তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা থেকেই উচ্চ উচ্চ চিন্তার দ্বারা তাদের আয়ত্ত করে নিয়েচে। অপরের দেবতাকে ঘৃণা করা মানে তাদেরই ঘৃণা করা। হিন্দু কিন্তু অপরের দেবতাকে নিজেদের দেবতার আসনের পাশেই স্থান দিয়েচে। কোন জাতির নিম্ন-সত্য নাশ করা মানে সে জাতির আমূল ধ্বংস করা, এ সত্য হিন্দু জাতি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে নি। তার পর হিন্দুর একটা জাতিগত সংস্কার যে ঈশ্বর সকল ধর্ম্মের ঈশ্বর, তাঁরই ইচ্ছায় অসংখ্য জাতি, গোষ্টি, সম্প্রদায় উঠচে, গড়চে, পড়চে এবং এমন কোনও ব্যক্তি নেই যেখানে তাঁর আলোক না পড়েচে। বিপথগামীর ভেতরও যে ঈশ্বর-সত্তা রয়েচে! (১) সেমেটিক ধর্ম্ম তার কতটুকু উপলব্ধি করেচেন তা বলতে পারি না এবং বর্ত্তমান হিন্দুর অবস্থাও ঠিক তাই। ধর্ম্মনেতারা মুখে বেদান্তের ব্রহ্মপদ বলেন, কিন্তু বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য না বুঝে অযথা শূদ্রের পীড়ন করে থাকেন। তাঁরা সহরে স্বর্ণমুদ্রার প্রাচুর্য্য দেখলেই উদার হয়ে পড়েন কিন্তু গ্রামে দরিদ্রকে সামান্য কারণে নিপীড়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কোনও দলের অনুন্নত কুসংস্কার দূর করতে হলে, তার ব্যক্তির মনের একদেশীতা বা পক্ষপাতিত্ব দোষটি আগে নষ্ট করে দিতে হবে। মানবের চরিত্র বুঝে তবে তাকে তদুপযোগী উপদেশ দিতে হয়, নচেৎ উপদেশ কেবল বিদ্বেষে পরিণত হয়। বলপূর্ব্বক কোনও ধর্ম্ম সভ্যতা বা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই অশান্তি। পাশ্চাত্য বিদ্যাধারায় স্নান করে পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য মানব এখন আত্ম-সম্মানে উজ্জ্বল। প্রেমপর না হ'লে পশুবল বা কূট নীতির মধ্য দিয়ে কোনও ধর্ম্ম, সভ্যতা বা শাসন কেউ গ্রহণ করতে চায় না। "নিরীহ হিন্দুর" এই প্রেমপর নীতি প্রাচীনকালে খুব প্রবল ছিল। সেই আদর্শ আবার ফুটে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রতীকের মধ্য দিয়ে। তাঁর জীবন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধীরে ধীরে বুঝচে। প্রাচ্য এর মধ্যেই তা বাস্তবতায় আনবার

(১) এ বিষয়ে ধর্ম্মনেতাদের স্বামিজীর একটা কথায় বিশেষ মনযোগ দেওয়া দরকার হয়ে পড়েচে—"সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে। এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ, জাতি বিশেষ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতকগুলি জাতি রহিয়াছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ সহস্র করিয়া ব্যক্তি। উহারা যদি মিলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে না। আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে, আর যখনই তাহাদের সকলের একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে?"—ভারতে বিবেকানন্দ পৃঃ ৩৩২—৩৩, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

চেষ্টা করচে, কিন্তু বলদর্পিত পাশ্চাত্য বুঝেও তা কার্য্যে এখন এতটুকুও পরিণত করতে পারে নি।

এখন ধর্ম্ম ও সমাজগুলোর প্রতি বিদ্রূপ বা গালি বর্ষণ না করে, ভুলগুলো খুব শীগ্‌গির সংশোধন করতে হবে। উচ্চ সত্য যত ব্যাপক হবে, সমাজ ও বিশ্বাস তত বদলে যাবে। ধর্ম্মের নামে কুসংস্কারগুলো নির্ম্মূল না হলে, কাজ করবার ক্ষমতা কিছুতেই বাড়বে না। প্রচারকের এখন প্রধান কর্ত্তব্য লক্ষের মাথায় মতের বোঝা চাপান নয়, তাদের ভেতর বড় হবার আকাঙ্খা জাগিয়ে দেওয়া। সরল মনে চোখ খুললেই দোষ কোথায় তা আমরা বুঝতে পারব। তারপর কাজ আরম্ভ – জোর করে বা ভয় দেখিয়ে নয়, পরামর্শ দিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে, ভুল জিনিষটা একটা জঘন্যতা নয়, ওটা মনের একটা অপরিপক্ক অবস্থা। ধৈর্য্য ধরে থাকলেই সময়ে ওসব সেরে যাবে। হিন্দুর একটা বিশেষত্ব দেখা যায়, তারা সবলের প্রতি অতি মাত্রায় কঠোর, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি একেবারে শ্লথ।

অধ্যাপক ক্লেমেণ্ট ওয়েব এক জায়গায় বলচেন, (২) যে হিন্দুর এত উচ্চ-নীচ ভাব যে সাধারণের পক্ষে ভাল মন্দ বেছে নেওয়া অসম্ভব এবং অনেক সময় তারা খারাপ জিনিষটাকেও উপেক্ষা করে। কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত যে তিনি যেটাকে উপেক্ষা মনে করচেন, সেটা উপেক্ষা নয়, পরমত-সহিষ্ণুতা। অদ্বৈত বেদান্তী খৃষ্টানের মতকে উপেক্ষা করে না, শ্রদ্ধা ও সহ্য করে—অনুন্নত মত বলে তার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করে না। আসল কথা হচ্চে, কলেজ ভাল মন্দ বিচার করে ছাত্র যদি কলেজের পর কলেজ বদলায় তাতে তার কিছুই হবে না, যতক্ষণ না সে নিজে বদলায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই।

আমাদের দেশের দু একটা দলে দেখা যাচ্চে যে, যেই তাঁদের চিন্তাটা একটু পরিমার্জ্জিত হয়ে এসেছে, আর অমনি বলতে আরম্ভ করলেন, পৌত্তলিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর কিছু হবে না। কিন্তু বিদ্রূপের হাসি হেসে যখন তাঁরা ঐ দীনেদের দিকে তাকান তখন তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে তথাকথিত শিক্ষা যতই চমকপ্রদ হোক, তা অন্নের সৃষ্টি করতে পারে না। যারা অন্নের সৃষ্টি করতে পারে তারা বড় বড় দার্শনিক-দের চাইতে এক হিসাবে অনেক উঁচু। এক বড় দার্শনিক ও তাঁর চাকর গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। সহসা বরফপাতে দার্শনিক অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, চাকর সেই বরফের ঝড় ভেদ করে মূর্চ্ছিত প্রভুকে বাঁচালে—বড় কে, দার্শনিক?—না চাকর? তবে চাকরেরও উচ্চ উচ্চ চিন্তা দরকার। তোমার প্রচারের মধ্যে যেন তার উপযোগী খাদ্য থাকে। তোমার পা আছে বলে তুমি খোঁড়ার লাঠিটা পা নয় বলে কেড়ে নিতে পার না, যদি নিতে চাও তা হলে তুমি নির্ব্বোধ। তোমার অন্নটা ভাল, তা বলে অপরের কুৎসিত অন্ন ফেলে দিতে পার না, যতক্ষণ না তুমি তাকে তোমার অনুযায়ী খাদ্য না দিতে পারচ। বিদ্যুতের আলোয় বসে গ্রামের প্রদীপকে ঘৃণা করলে চলবে না। সেখানে গিয়ে তাদের শিক্ষিত কর, তাদের ভাষায় কথা বল, তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হও, নইলে চিরান্ধকে রূপের কথা বলার মত তোমার ধর্ম্ম, সভ্যতা, শাসন সব বৃথা। (৩) যা কিছু প্রচারিত হবে (অবশ্য যদি তাতে সদুদ্দেশ্য থাকে)

(২) With its traditions of periodically repeated incarnations of the deity in the most diverse forms, its ready acceptance of any and every local divinity or founder of a sect or ascetic devotee as a manifestation of God, its tolerance of symbols and legends of all kinds, however repulsive or obscene by the side of the most exalted flights of world-renouncing mysticism, it could perhaps more easily than any other faith develop, without loss of continuity with its past into a universal religion which would see in every creed a form suited to some particular group or individual, of the universal aspiration after one eternal Reality, to whose true being the infinitely various shapes in which it reveals itself to, or conceals itself from me are all alike indifferent.
—Needham, Science, Religion and Reality P. 334-5.

(৩) স্বামিজীর এ কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"তোমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরীব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ, তোমরা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার, আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক, অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাস্তিক অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাক—এত দুর্ব্বল লোকে চির-কালই করিয়া থাকে—যে আমাকে পরাস্ত করিবে সেই নাস্তিক! যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে আগাগোড়া যুক্তিবাদী হও, আর যদি না পার, তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও, অপরকেও তাহা দাও না কেন?—ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৫৬৫, ৬ সং।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলি বিবেচনা করে তা করা দরকার—ব্যক্তির প্রকৃতি, নৈতিক ও মানসিক সামর্থ্য, শিক্ষা এবং পারিবেষ্টনী।—এ কাজটা বলপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ নয়, এ কাজটার বাস্তব রূপ সাহায্য ও সহানুভূতি—এটা উপেক্ষা ও ত্যাগ নয়, গ্রহণ ও সমতা। বিচারের ভুলটা ত আর নৈতিক দুর্ব্বলতা নয়, অন্ধতা ত' আর হৃদয়ের অভাবের পরিচয় নয়—এই ভেবে সকলকে গ্রহণ করতে হবে। তবে অবস্থাভেদে ব্যবস্থারও প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "সব জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সব জল খাওয়া চলে না।"

ধর্ম্মটা যে একটা শুষ্ক বিশ্বাস নয়, একটা শুদ্ধ জীবন, এটা পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা বেশ বুঝেছিলেন। (৪) মন ও ব্যবহার শুদ্ধ হলেই হল—খাওয়া পরার মধ্যে ধর্ম্ম নেই। এই খাওয়া পরার জন্যই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। কঠোরতা ও ধর্ম্ম যে আলাদা জিনিষ, এইটি বোঝাতে গিয়েই খৃষ্ট পড়লেন বিপদে। জন দি ব্যাপটিষ্ট এ কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে উত্তর দেন, তা জনকে খুবই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল (৫) এবং ফারিসিদেরও একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল (৬)। বুদ্ধদেবের এই মধ্য-পন্থার প্রচারকথায় দেবদত্তের কাছে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "ভিক্ষুরা গৃহস্থকে পীড়া দান করবে না। গৃহস্থ যা ভিক্ষা দেবে ভিক্ষু তাতেই তৃপ্ত হবে।" এখানেও গোলমাল বেধেছিল ভিক্ষান্নেতে আমিষ থাকার জন্য। আর ইদানীং রামকৃষ্ণ অতি কঠোর ভাষায় বলেছেন, "আমিষ খেয়ে যদি ঈশ্বরভক্তি হয়, সে আমিষ হবিষ্যান্নের তুল্য, আর নিরামিষ খেয়েও যদি ভগবানে ভক্তি না হয়, তা আমিষেরই তুল্য।"

ধর্ম্মের খোসা নিয়ে আমাদের বিবাদবিসংবাদের প্রয়োজন একেবারে নেই। মোট কথা হচ্ছে, একেশ্বরবাদ। সে একেশ্বরবাদ সকল হিন্দু মানে। এটা আমাদের কথা নয়, বিদেশীর কথা। (৭) এখন বিবাদের হেতু কোথায়? বিবাদের হেতু হচ্ছে, আমার মতে ঈশ্বরের উপাসনা কেউ করে না কেন? এ জিনিষটা ইদানীং হিন্দুদের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে পড়েছে। কিন্তু হিন্দুর পরমত-সহিষ্ণুতা একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম—সব শাস্ত্র, বিশেষতঃ উপ-পুরাণ ও তন্ত্রগুলি এই সমন্বয়ের ওপর খুব জোর দিচ্ছে। এমন কি অতি প্রাচীনকালে বৈদিক সত্যের তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীবুদ্ধও

(৪) Religion is universal to the human race, wherever justice and charity have the force of law and ordinance, there is God's Kingdom. (—Spinoza.)

(৫) Go and tell your master what you have seen and heard. The sick are healed, the blind receive their sight and the poor have the Gospel preached to them......It is true that I do not fast, nor forego the every-day pleasures of life. John did his work and it was fine; but I cannot work in his way. I must be myself......and these results which you have seen ..... these are my evidence."

(৬) "You shall walk only so far on the Sabbath," said the Code. He walked as far as he liked.
"These things you may eat and these you shall not" said the Code.
"You're not defiled by what goes into your mouth," he answered, "but by what comes out."
"All prayers must be submitted according to the forms provided," said the Code. "None others are acceptable."

It was blasphemy to him. This God was no Bureau, no Rule-maker, no Accountant. "God is a spirit," he cried. "Between the great spirit and the spirits of men—which are a tiny part of His—no one has the right to intervene with formulae and rules."—The Man Nobody knows (p. 72-3) by Bruce Barton.

(৭) In the Census Report for 1911 M. Burns observes: "The general results of my inquiries is that the great majority of Hindus have a firm belief in one supreme God, Bhagavan Parameshvara, Ishvara or Narayana."

Sir Herbert Risely observes; These ideas are not the monopoly of the learned, they are shared in great measure by the man in the street. If you talk to a fairly intelligent Hindu peasant about the Paramatma, Karma, Maya, Mukti, and so forth. you will find as soon as he has got over his surprise at your interest in such matters that the terms are familiar to him, and that he has formed a rough working thory of their bearing on his own future. (—The People of India.)

সর্ব্ব ধর্ম্মের ওপর সমান শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। (৮) তারপর অশোক তাঁর এক প্রস্তর-লিপিতে অনুশাসন দিচ্ছেন, "দেব-প্রিয় অশোক ধর্ম্মের সকল রূপকেই সম্মান করেন, তিনি যে কোন দান ও সম্মান অপেক্ষা ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। এই হচ্ছে মূল কথা, নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অপরের ধর্ম্মকে নিন্দা না করা। যে এই শাসন ভঙ্গ করে সে নিজ ধর্ম্মেরই ক্ষতি এবং অপরের অনিষ্ট করে। আমার শাসনের মধ্যে সকল ধর্ম্মমতই আচরিত হোক।" (৯) হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা এই উদার নীতির অনুসরণ করাতেই পৃথিবীর যাবতীয় নির্য্যাতিত, অত্যাচারিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভারতে স্থান হয়েছিল। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন প্রয়াগে সর্ব্বস্ব দান-যজ্ঞে প্রথম দিন বুদ্ধের, দ্বিতীয় দিন সূর্য্যের এবং তৃতীয় দিন শিবের উপাসনা করতেন। নবম শতাব্দীর স্থাণু রবির কোওয়াম লিপি এবং বিজয়রাগ দেবের কোচীন লিপির দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে সেখানকার হিন্দু রাজারা কেবল যে হিন্দুদেরই সাহায্য করেছিলেন তা নয়, অন্যান্য ধর্ম্মের অধ্যাপকদেরও তিনি বৃত্তি দিতেন। (১০) হিন্দুরা এই ভাবে স্বস্ব আস্থা থেকে নিম্ন স্তরের ধর্ম্মগুলিকে ধীরে ধীরে উচ্চ আসনে বসিয়ে দিতেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে গত কয়েক শতাব্দীর অন্তর্ব্বিবাদে হিন্দু তার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে বন্য ও পার্ব্বত্য জাতিদের তোলবার কোনও চেষ্টাই করেন নি। এখন তার সময় উপস্থিত হয়েছে।

অপর দিকে বিজ্ঞানের যাদুকাঠির স্পর্শে সমস্ত পৃথিবীটা একটা ছোট জীবাবাসে পরিণত হয়েচে। পাশাপাশি সব জাতকেই থাকতে হচ্চে বলে পরস্পরের চিন্তার আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী। সমষ্টি-মানবতার জ্ঞান ধীরে ধীরে সকল ব্যক্তির মধ্যে উন্মেষ হওয়ায় এমন একটা উদার সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শ আমাদের নয়নপথে এসে পড়েছে, যাতে সকল জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্টি ও ব্যক্তি শান্তিতে ও স্বাধীন-ভাবে অপরের অনিষ্ট না করে থাকতে পারে। যেমন কোন ধর্ম্মবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলেই অপর ধর্ম্ম ক্ষেপে ওঠে, তেমনি কোন জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলেই অপর জাতিও ক্ষেপে উঠবে। সেইজন্য পৃথিবীতে শান্তিতে বাঁস করতে গেলে যেমন সকল ধর্ম্মের স্বাধীনতা দরকার সেইরূপ সকল জাতির স্বাধীনতাও অবশ্যম্ভাবী। এই হোল বিশ্বের একত্বের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে প্রত্যেক স্বাধীন জাতি পরস্পরের ভাব, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের আলোচনা করে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবে এবং তৃতীয় স্তরে মানুষ বুঝবে যে পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তি এক বিশ্বাত্মার প্রকাশ। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরেরই সসীম প্রকাশ। "সীমার মাঝে অসীমের বাঁণী" চিরকাল ধরে যে বাজচে, তা তখনই শোনা যাবে, তার পূর্ব্বে নয়।

শেষ কথা হচ্চে, ধর্ম্ম জিনিষটা খারাপ একেবারেই নয়। জীবন-সমুদ্রে এই অর্ণবপোতেই মানুষকে পশুরাজ্য থেকে স্বর্গরাজ্যের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্চে। মানুষের নৈতিক দেহে ব্রণের মত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, যখন ছড়িয়ে পড়ে, ধর্ম্মই চিরকাল সে সব নানা উপায়ে সারাবার চেষ্টা করে তাকে নীরোগ করেচে। ধর্ম্ম জিনিষটা একটা হুকুম নয়, আপ্ত পুরুষের অভিজ্ঞতা। এবং এই অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্মের বাহিরাঙ্গ খোসাগুলো ধীরে ধীরে লোপ পায়। (১১) দেহের একটা অঙ্গের হঠাৎ বৃদ্ধি যেমন অসুস্থতার লক্ষণ, তেমনি শিল্প, সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞানের কোন একটার হঠাৎ বৃদ্ধিও সুস্থতার লক্ষণ নয়। ধর্ম্মও মানব-মনের একটা অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ। সকলের সহিত এরও সমভাবে উন্নতিই হচ্চে সমন্বয় এবং সমাজ সংঘের স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তি।

(৮) Vide Sutta Nipata, 7832; see also Auguttara Nikaya iii. 57-1.

(৯) The twelfth Rock Edict.

(১০) Yuan Chwang Rerport.

(১১) Dean Inge: "The centre of gravity in religion has shifted from authority to experience.......The fundamental principles of mystical religion are now very widely accepted, and are, especially with educated people, avowedly the main ground of belief."—The Platonic Tradition in English Religious thought.

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৬

অবনীবাবু সহজে পরাস্ত হইবার লোক নহেন। বুঝিতে তাঁহার আর বাকি ছিল না যে নমিতার এই উদ্ধত আচরণের আড়ালে কাহার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ছিল। সেই দিন দুপুর বেলায়ই প্রদীপ চলিয়া গেলে অবনীবাবু যখন বকিয়া বকিয়া নমিতাকে একেবারে নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, তখন এমন পর্য্যন্ত বলিতে দ্বিধা করেন নাই: ঘরের বার হ'য়ে যেতে পার না ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে, এখানে বসে' ঢলাঢলি করে' আমাদের মুখে আর চূণ-কালি মাখাও কেন? তখন নমিতা নিজেকে আর দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিয়াছিল: যাব ত' বেরিয়ে। কার সাধ্য আমাকে আটকায়! তাই, ভোর হইলে অবনীবাবুর মনে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে ঐ প্রদীপের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করিয়া চরিত্রহীন মেয়েটা কুল ডিঙাইয়াছে। স্বয়ং হাকিম হইয়া এত সহজে প্রদীপকে ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নন্। ফল যাহাই হোক, ঐ গুণ্ডাটাকে একবার দেখিয়া লইতে হইবে। তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

গাড়ি আবার কলিকাতার দিকে গড়াইল। রাত্রিকাল। একই গাড়িতে সকলে উঠিয়াছে—দু' পাশের বেঞ্চি দুইটাতে নমিতা আর প্রদীপ; মাঝেরটাতে পুলিশের কয়েকজন লোক। অপরিমেয় স্তব্ধতা—কাহারো চোখে ঘুম নাই। অনেক পরে প্রদীপ ইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিল,—জবানবন্দি ত' টোকা হয়েছে, ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?

ইন্‌স্পেক্টার নমিতার অনুমতি চাহিলেন—সে কিন্তু অতি সহজেই রাজি হইয়া গেল। হাসিয়া কহিল,—আসুন।

প্রদীপ ধীরে উঠিয়া আসিল। দূরে বেঞ্চির এ পাশে সরিয়া বসিয়া বলিল,—জবানবন্দিতে কি বল্লে?

পুলিশকে শুনাইয়া স্পষ্ট করিয়া নমিতা কহিল,—সত্য কথাই বলেছি। আপনি আমাকে ছল করে' ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর নিতান্ত নির্লজ্জের মতো দৈহিক বলপ্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বলেছি বৈ কি!

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—জানতাম তুমি তা বলবে। এর চেয়ে সত্য করে' কোনো নারী কোনো পুরুষকে দেখতে শেখেনি। কিন্তু কথাটাকে আরো একটু মার্জ্জিত করে' বল্লে না কেন?

প্রদীপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া থাকিয়া নমিতা বলিল,—অমন একটা নিদারুণ কথার আরেকটা মার্জ্জিত সংস্করণ আছে নাকি?

—আছে বৈ কি। কণ্ঠস্বর হঠাৎ গাঢ় ও আর্দ্র করিয়া প্রদীপ বলিল,—বল্লেই পারতে আমার ভালবাসার আকর্ষণে তোমাকে সমস্ত প্রাচীন প্রথা ও শাসনের প্রাচীর থেকে মুক্ত করে' উদার আকাশের নীচে নিয়ে এসেছি—যেখানে বিস্তৃত জীবন, বিচিত্র তার উৎসব। বল্লেই পারতে, সহজ অধিকারের দাবিতে তোমাকে কামনা করেছিলাম, নমিতা।

অন্ধকারের মধ্যে নমিতা হাসিয়া উঠিল। কহিল,—অত কথা পুলিশ বুঝত না যে—

প্রদীপের মুখে আর কথা আসিল না। চুপ করিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত তরল সুরে বলিয়া উঠিল: কেমন মজা। শেষকালে কিনা ফুসলিয়ে ঘরের বউকে বা'র করার জন্যে জেল খাটবেন। অদৃষ্টে দুর্গতি থাকলে অমনিই হয়—হাতিও শেষে কাঁটা ফুটে মারা পড়ে। হঠাৎ কথার মাঝখানে প্রদীপের অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ক্ষীণ অনুচ্চকণ্ঠে নমিতা কহিল,—আরো এমনি মজা যে আপনার হাতে এমন কোন সম্বলও আর নেই যে আত্মহত্যা করে' এ কলঙ্ক থেকে ত্রাণ পেতে পারেন। আপনার বন্ধু এ কথা শুনলে কী ভাববেন বলুন দিকি?

কথা কয়টা কর্ণকুহরে নিক্ষেপ করিয়াই নমিতা আবার দূরে সরিয়া বসিল। প্রদীপ বলিল,—বন্ধু কী ভাববেন তা তিনিই ভাবুন। জেলে যদি আমি যাই-ও, তবু মনে এমন কোনো গ্লানি থাকবে না যে আত্মহত্যার উপকরণ হাতে নেই বলে' অনুতাপ করতে হবে। ব্যাথা একটা মনের মধ্যে কখন থেকেই গ'ড়ে উঠেছে—তোমার জন্যেই জেলে গেলাম।

—আমার জন্যেই বৈ কি! নমিতা ইনস্পেক্টারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—একজন অসহায়া বিধবা মেয়েকে কৌশল করে' ঘরের বাইরে এনে তার ওপর পশুর মত উৎপীড়ন করতে চান আপনাকে লোকে জেলে না পাঠিয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো করবে, আপনার ফোটো সামনে রেখে নিশান উড়িয়ে মিছিল করবে, না?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রদীপ কহিল,—যা খুসি বল। কিন্তু তুমি মনে মনে ত' জান আমি পশুও নই, দেবতাও হ'তে চাই না। তোমাকে আমি কামনা করেছিলাম বৈ কি, সে কামনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-কামনার মতই সুন্দর। তোমাকে পাইনি, জেল যদি আমার খাটতে হয় সে জন্তেই খাটবো। পাওয়ার পেছনে যে প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন হয় সে-শিক্ষাই না-হয় লাভ করা যাবে।

—যান্ যান্ আর বক্তৃতা করতে হবে না; এখন ঘুমুন তো। বলিয়া নমিতা বেঞ্চির কিনারে কাঠের দেয়ালে হেলান্ দিয়া পা দুইটা সামনে একটু প্রসারিত করিয়া শুইবার ভঙ্গি করিল এবং তাহার ইঙ্গিতে ইনস্পেক্টার আসামীর হাত ধরিয়া অন্য বেঞ্চিটাতে সরাইয়া আনিলেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়া পুলিশ প্রদীপকে থানায় লইয়া গেল এবং নমিতাকে অবনীবাবুর জিম্মায় রাখিয়া বলিয়া দিল যেন ঠিক এগারোটার সময় তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হয়।

ভোর বেলা—উমা ছাড়া সবারই ঘুম ভাঙিয়াছে। আত্মীয়-পরিজনের শাসন-প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে নমিতার মুখ একটুও ম্লান হইল না, তার দৃষ্টিতে না একটু কুণ্ঠা, পদক্ষেপে না একটু জড়তা। চাদরটা গায়ের উপর ভালো করিয়া টানিয়া সে সিঁড়ি দিয়া সোজা তাহার দোতলার পূজার ঘরে উঠিয়া আসিল। নির্ভীক বীরাঙ্গনা, অটল ঋজু মেরুদণ্ড, আকাশের অরুণরশ্মির মত তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে যেন একটা দুঃসহ তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। আত্মীয়-পরিজনরা মূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, কেহ একটা কথা বলিতে পারিল না, না বা পারিল উহাকে বাধা দিয়া উহার মুখ হইতে এই জঘন্য আচরণের একটা অর্থ বাহির করিতে। অবনীবাবু উৎফুল্ল হইয়া ফোনে শচীপ্রসাদকে প্রদীপের গ্রেপ্তারের সংবাদ দিতে ব্যস্ত হইলেন, আর অরুণা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া উমাকে জাগাইয়া কহিলেন,—ওঠ্ শিগগির, দেখবি আয়,—পোড়ারমুখী ফিরে এসেছে—

একলা বিছানার পশ্চিমের বিদ্যুৎ দিগ্‌রেখাটির মত উমা ঘুমাইয়া ছিল। সুরের মাঝে অনুচ্চারিত বাণীর যে সুষমা, ঘুমন্ত উমার দেহে তেমনি একটি অনির্বচনীয় কান্তি। মায়ের হাতের ঠেলা খাইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল: কে ফিরে এসেছে মা? বৌদি? আর দীপ দা?

অরুণা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—আর দীপ-দা! সে পাজিটা পুলিশের হাতে—হাতে তার হাতকড়া। এবার ঘানি ঘোরাবে আর কি।

উমার ঠোঁট দুইটি সহসা পাণ্ডুর হইয়া উঠিল: ঘানি ঘোরাবেন মানে? উনি কী করলেন? যদি কেউ পথ ভুলে বাইরে বেরিয়ে আসে তবে তাকে আশ্রয় দেওয়া পাপ না মহত্ত্ব? ওঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে' আমাদেরই বরং উচিত মা, ওঁকে একদিন নেমন্তন্ন করে' খাইয়ে দেওয়া!

কোথায় উমা জাগিয়া উঠিয়া মার সঙ্গে নিভৃতে একটু-খানি নমিতার চরিত্রালোচনা করিবে, না, একেবারে মোড় ফিরিয়া প্রদীপের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল! অরুণা ধমক দিয়া কহিলেন,—এক ফোঁটা মেয়ে, তুই তার কী বুঝবি? যা, ওঠ্ এখন। খালি পড়ে' পড়ে' ঘুমুনো। মুখ ধুয়ে পড়্‌তে বোস্ এসে।

উঠিতে হইল। ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত তলাইয়া বুঝিতে তাহার আর বাকি নাই। নমিতা নিতান্ত নমিতা বলিয়াই তাহার জীবনে এমন একটা আচরণের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহসঙ্কুল প্রশ্ন উঠে, উমার জীবনে এমন একটা সমস্যার আবির্ভাব হইতে পারে এমন কথা সে নিজে ভাবি-তেই পারে না। ঘর সে ছাড়িবে কিনা, এবং ছাড়িলে

কোথায় বা কাহার সঙ্গে সে আবার ঘর বাঁধিবে—এই সব প্রশ্ন তাহার ব্যক্তিগত নির্দ্ধারণের বিষয়। ইহার জন্য পাড়ার পাঁচ জনের মুখ চাহিতে হইবে নাকি? উমা হইলে কখনই ফিরিয়া আসিত না, এমন ভাবে হয়ত নিজেকে বন্দিনী করিয়া ফেলিত যে দীপ-দাকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া নেয় কাহার সাধ্য!

নমিতার ঘরের গোড়ায় আসিয়া দেখিল সেখানে ছোট খাটো একটি ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। শচীপ্রসাদ পর্য্যন্ত হাজির। সবারই মুখ প্রসন্ন, নমিতার প্রতি কাহারো স্বাভাবিক রূঢ়তা নাই। ব্যাপারটা উমা চট্ করিয়া ধরিতে পারিল না। শচীপ্রসাদ হাসিয়া কহিতেছে,—যাক্, ও ছোট লোক গুণ্ডাটা যে ধরা পড়েছে, তাই ঢের। একেবারে সেসান্‌স্ কেস,—দু'টি বছর শ্রীঘরে। খবর শুনে স্বস্তিতে আমার চা-ও খাওয়া হ'ল না। এই যে উমা, চা ক'রে দাও দিদিন একটু।

অবনীবাবু ঘরের মধ্যে নমিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—পুলিশের কাছে যে সত্য কথা বলেছ বৌমা, তাতেই তোমার বুদ্ধির তারিফ্ করছি। ঐ পাজির পা-ঝাড়া স্কাউণ্ড্রেলটাকে এবার আমি দেখাবো—

—নিশ্চয়। শচীপ্রসাদ সায় দিল: মেয়েছেলে যতই কেননা বেয়াড়া হোক্, বাড়ির বাইরে যেতে হ'লে পুরুষমানুষের হেল্প্ তাদের চাই-ই। তার ওপর উনি হিন্দু বিধবা, পুরস্ত্রী। তা' ছাড়া কল্‌কাতায় নয়—একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। ও স্কাউণ্ড্রেল্‌টা যদি বলেও যে বৌদি ইচ্ছে করে' বেরিয়ে এসেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ তা কখ্‌খনো বিশ্বাস কর্‌বেন না।

অবনীবাবু বলিলেন,—ও বল্‌লেই হ'ল? বৌমা ত' জবানবন্দীতে স্পষ্ট ব'লেই দিয়েছেন যে প্রদীপই ওকে ছলে বলে ফুস্‌লিয়ে বাড়ির বা'র করেছে। কোর্টেও তোমাকে সেই কথাই বল্‌তে হবে, বৌমা।

নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

—বাস্, তা হ'লে আর আন্‌ডিউ ইন্‌ফ্লুয়েন্সের কথাও উঠ্‌তে পারে না। পুলিশের কাছে এটুকু না বলে' এলেই মুস্কিল হ'ত।

শচীপ্রসাদ কহিল,—বৌদি আমাদের অত বোকা নন্। মেয়েমানুষদের অমন এক-আধটু ভুল হ'য়েই থাকে, কিন্তু যারা সেই সব ভুল খুঁচিয়ে তাদের বিপথে চালিয়ে নেয় তাদেরকে ছেড়ে দিতে নেই। ফাঁদ পেতে ডাকাতকে ধর্‌তে পেরেছেন তাতে আপনাকে বাহবা দিচ্ছি, বৌদি।

নমিতা আবার একটু হাসিল; চোখ তুলিল না, কথা কহিল না।

কথা কহিল উমা: ফাঁদে যদি ডাকাত ধরা না পড়ত, তবে ব ড়কর্ত্রীকে আপনারা আর আস্ত রাখতেন না। ইঁদুর আজ সিংহকে ধরে' দিতে পেরেছে বলেই ছুটি পেলো—নইলে সে একা ফিরে এলে তাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' ফেলতেন।

অবনীবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন: যা যা, তোকে আর সর্‌ফর্ কর্‌তে হবে না। বৌমাকে শিগ্‌গির দু'টো রেঁধে দে দিকিন, এগারোটায় কোর্টে হাজিরা দিতে হবে।

শচীপ্রসাদ কহিল,—আর আমার চা।

ঘর খালি হইয়া গেলে উমা রুক্ষ হইয়া প্রশ্ন করিল,—বৌদি, এ তোমার কী নির্লজ্জতা?

নমিতা চম্‌কাইয়া উঠিল। উমার মুখের উপর দুইটি জিজ্ঞাসু চক্ষু তুলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

—ফিরে এসেছ তার জন্যে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু নিজের ঠুন্‌কো খ্যাতি বাঁচাবার জন্যে এ তুমি কী করে' বস্‌লে?

—কী করে' বস্‌লাম? নমিতা দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

—ঢের ন্যাকামো করেছ। কেই বা তোমাকে ঘটা করে' বাড়ির বা'র হ'তে বলেছিলো, আর কেনই বা তুমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ কর্‌লে? ও-মুখ লুকোবার জন্য এ-বাড়ির বাইরে কি আর তোমার জায়গা ছিলো না?

নমিতা ধীরে কহিল,—লুকোবার কথা বোলোনা ঠাকুর-ঝি। এ-মুখ দেখাবো ব'লেই ত' এ-বাড়িতে ফের ফিরে এসেছি।

উমা তবুও শান্ত হইল না: কেন ফিরে এলে? যখন বেরুলে ত' হার স্বীকার কর্‌লে কেন? আবার এসে তুমি

তুমিও আর মোটা-পুরা সুরু করবে? তবে এই অভিনয় করবার কী দরকার ছিলো?

নমিতা হাসিয়া কহিল,—পুলিশে ধরলে কি আর করা যায় বল।

—কি করা যায়? স্পষ্ট কণ্ঠে বলা যায়, আমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি, যাকে তোমরা নারীহর্তা বলে' ধরতে এসেছ, সে আমার নব-জীবনের প্রভু, তাকে আমি ভালোবাসি। বললে না কেন, বৌদি?

মুখ গম্ভীর করিয়া নমিতা কহিল,—মিথ্যা কথা বল্‌বো কি করে'?

—জানি তুমি সত্যবাদী মেয়ে এসেছো। তাই কিনা তুমি দীপ-দার সর্ব্বাঙ্গে কালি ছিটোতে দ্বিধা করলে না। যে ভদ্রলোক স্নেহ করে' নিরাশ্রয় মেয়েকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে এলেন, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে সত্যের গৌরব করতে তোমার লজ্জা করলো না বৌদি? এই জঘন্য আত্মরক্ষার চেয়ে আত্মহত্যাও ভালো ছিল।

নমিতা ক্ষীণ একটু হাসিল; কহিল,—কা'র সত্য কোন্ পথে এসে দেখা দেয় তুমি সহসা তা বুঝবে না, উমা। বরং শচীপ্রসাদের জন্যে চা করগে। সুসংবাদ পেয়ে উত্তেজনায় বেচারার দারুণ তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়।

উমা রুখিয়া উঠিল: কার জন্য চা করতে হবে সে পরামর্শ তোমার কাছ থেকে না নিলেও চল্‌বে। নিজের খেলো মান বাঁচাতে গিয়ে ভীরু অপদার্থের মত তুমি যে আরেক জনকে সমাজের চোখে লাঞ্ছিত করবে—এ অত্যাচার আমরা সইবো না। মনে রেখো।

নমিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—কী আর করবে বল। আইনের কাছে আবদার খাটে কৈ?

—খাটেই না ত'। সত্য বলে' যা নিয়ে তুমি আস্ফালন করছ সেই তোমার অসতীত্ব। স্থান তোমার সংসারের বাইরে বাইরেই। তবু তুমি এত স্বার্থপর হবে যে—ছিঃ!

হঠাৎ ভয়ে উমার চোখমুখ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না; উমা যখন চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল, নমিতা তাহাকে বাধা দিল: শোন। সংসারের গণ্ডীর বাইরে চলে' এসে আমায় এ দু'টি দিনে কম শিক্ষা হয়নি, উমা। আমি বুঝেছি তোমাদের ঐ সতীত্ব-বোধটা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বাধা। সে-বাধা আমি খণ্ডন করবো—আপন শক্তিতে, আপন স্বাতন্ত্র্যে।

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইল: তাই যদি হয় তবে নিজের সতীত্বের ওপর মুখোস্ টান্‌বার জন্য আরেক জনের মুখে কালি ছিটোতে তোমার বিবেক সায় দেয়?

উমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া নমিতা কহিল,—আরেকজনের জন্য যে তোমার ভারি দরদ!

উমা গাঢ়কণ্ঠে কহিল,—সে দরদের এক কণা তোমার থাক্‌লে এমন নির্লজ্জের মত নির্দ্দোষ সেজে আইনের সুখ মেটাতে চাইতে না। কে তোমাকে দীপ-দার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বলেছিলো?

—ভাগ্য উমা,—যে ভাগ্য মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে হিজিবিজি ছবি আঁকে। আমার সঙ্গে আর বেশি তর্ক করো না লক্ষ্মী,—আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি। কাল সারা রাত ঘুমুতে পারিনি।

হঠাৎ উমা নমিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—কিন্তু দীপ-দাকে তুমি জেল থেকে বাঁচাবে, আমাকে কথা দাও, বৌদি। তিনি ত' তোমাকে জোর করে' বাবা-মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন্ নি, তুমিই বরং পথে বেরিয়ে তাঁকে কুড়িয়ে পেলে। তুমিই বরং তাকে জখম করলে, তিনি তোমার কোনো ক্ষতিই করেননি। কপালের সেই ঘা-টা তাঁর কেমন আছে, বৌদি?

নমিতা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কখন্ তাহার পায়ের উপর উমার হাত দুইটি নামিয়া আসিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। ধীরে কহিল,—তিনি আমার কোনো ক্ষতিই করেননি, এ তুমি কী করে' বুঝলে, উমা?

—ক্ষতি করেছেন! কী তিনি করতে পারেন শুনি?

—যদি বলি উমা, তিনি প্রমত্ত পুরুষত্বের লালসায় আমাকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে শাসন করা দরকার—

উমা দাঁড়াইয়া পড়িল: মিথ্যা কথা।

নমিতা বলি[illegible] -মিথ্যা কথা নয়, উমা

—কবু নারীর কাছে তাঁর জন্ম আছে;—যে-নারী তাঁকে সঙ্গী হ'তে আহ্বান করে, যে-আহ্বান তিনি যদি নিমন্ত্রণ ব'লে' মনে করেন তার মধ্যে কপটতা কৈ, বৌদি? শেষ, তাঁকে তুমি বর্জ্জন কর, কিন্তু মুক্তির যে-দায়িত্ব তুমি অর্জ্জন করলে সে তোমারই থাক্।

কথা শুনিয়া নমিতা হাসিয়া ফেলিল। ঠাট্টা করিয়া কহিল,—তাঁকে ত্যাগ করলেই যে তুমি তাঁর নাগাল পাবে, এমন কথা বিশ্বাস হয় না, উমা।

উমার চক্ষু ভিজিয়া উঠিয়াছিল, প্রাণপণে সে চোখের দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া রাখিল, কহিল,—আমি কেন, কোনো মেয়েই তাঁর নাগাল পাবে না, বৌদি। এই বিশ্বাসই যদি তোমার হ'য়ে থাকে, তবে কেনই বা তাঁকে ত্যাগ করতে যাবে?

উমা আর দাঁড়াইতে পারিল না; মা'র কথা শুনিয়া মুখ ধুইতে নীচে নামিয়া গেল।

যথাসময়ে মামলা উঠিল।

উমা অবনী বাবুকে বলিল,—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো, বাবা?

অবনী বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন: তুই আবার কোথায় যাবি?

—কেন, কোর্টে। যেখানে সবাই তোমরা যাচ্ছ।

শচীপ্রসাদ আগাইয়া আসিল: তুমি যাবে মানে? তোমার একটা প্রেস্‌টিজ্‌ নেই?

—নিশ্চয় আছে। বৌদিও ত' তাঁর প্রেস্‌টিজ্‌ বাঁচাতেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চলেছেন। আমি যাবো বাবা, দীপ-দাকে তাঁর জেলে যাবার আগে একটিবার দেখবো।

নির্ভীক, দুরন্ত মেয়ে। মুখে কিছুই বাধে না।

শচীপ্রসাদের সহিল না: দীপদাকে দেখবে? ঐ র‍্যাগামাফিন্ স্কাউণ্ড্রেলটাকে? ওকে দেখলেও ত' অশুচি হ'তে হয়।

—তা হয় অশুচি একটু হ'ব। তারপর আপনাদের মুখের দিকে চেয়েই ত' সে পাপ আমার কেটে যাবে। তা হ'লে আর ভয় কি? দাঁড়াও ভাই বৌদি একটু, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আসছি। দু' মিনিটও লাগবে না—এই হ'ল বলে'।

উমা ক্রতপদে অন্তর্দ্ধান করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিল নীচে তাদের জন্য কেহই আর বসিয়া নাই। হয়ত' কাপড় বদলাইয়া আসিতে তাহার দু'মিনিটের বেশি লাগিয়াছে—ইহার মধ্যে ঘটা করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সেফ্‌টিপিন্ আঁটিয়া জুতা পরিয়া তাহার বাবু না সাজিলে গোটা মহাভারতটা অশুদ্ধ হইয়া যাইত না।

কিন্তু এই বেশে বিছানায় লুটাইয়া অভিমানে ও দুঃখে সে গোঙাইবে—উমা ততটা নির্লজ্জ নয়। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত আছেন—তাঁহাকে এড়াইতে হইবে। একটিও শব্দ না করিয়া উমা অতি সন্তর্পণে খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা ট্যাক্সি লইয়া চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইতে কতক্ষণ।

আদালত লোকে লোকারণ্য; কোনো প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া উমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন এজলাসে আসেন নাই, সমস্ত ঘরময় একটা চাপা গুঞ্জন চলিয়াছে। আসামীর ডক্‌টাও শূন্য; ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেই হয়ত প্রদীপকে হাজির করানো হইবে।

অবনী বাবুদের লক্ষ্যের বাহিরে উমা একটা বেঞ্চিতে একটু জায়গা করিয়া বসিল।

পাশের ছোকরা উকিলটি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না: ঐ মহিলাটি বুঝি আপনার কেউ হন?

উমা তাঁহার মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাহিল না; খালি কহিল,—না।

—কিম্বা আসামী?

—তাও না।

উকিলটি বিস্মিত হইলেন: তবু এসেছেন?

—আপনি এসেছেন কেন?

—আইন শিখ্‌তে।

—আইন শিখ্‌তে না কৌতুহল নিবৃত্ত করতে? আমাদেরো কৌতুহল হয়, মশাই। মেয়ে মানুষ নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শত্রুতা করে' এক নির্দ্দোষ ভদ্রলোককে

যদি জেলে পাঠায়, সে একটা উপন্যাসের মতই থ্রিলিঙ্‌। তাই দেখতে এসেছি।

উকিলটি কহিলেন,—আপনার কথায় কৌতূহল যে আরো বেড়ে গেল। কী ব্যাপার খুলে বলুন। যদি পারি উপকার করবো, বিশ্বাস করুন।

উমা কহিল,—কত দিন প্র্যাক্‌টিস্‌ করছেন?

—কেন বলুন ত'?

—বলুন, দরকার আছে।

—প্রায় দু' বছর।

—মোটে? উমার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন,—কেন, আপনার কোনো কাজ আছে? বেশ ত', বত্রিশ বছরের প্র্যাক্‌টিস্‌ করা এক বুড়ো হাবড়া ধ'রে নিয়ে আসছি না হয়।

—না, না, ফি দেব কোত্থেকে? আপনি ঠিক উপকার করবেন?

উমার ভাবাকুল দুইটি চোখের দিকে তাকাইয়া ভদ্র লোকটি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—যদি পারি, নিশ্চয় করবো। কেন করবো না?

—কেন করবেন না, তার কারণ অনেক থাকতে পারে। ফি পাবেন না যে। কিন্তু সত্যি যদি দীপ-দাকে খালাস করে' দিতে পারেন, একদিন নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করে' পেট ভরে' খাওয়াবো আপনাকে। বলিয়া উমা নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

ভদ্রলোক ব্যবসার খাতিরে গম্ভীর হইয়া উঠিলেন: কে দীপ-দা?

—এই মোকদ্দমার আসামী।

—আসামী? কেন, তাঁর পক্ষে উকিল নেই?

—বোধ হয় না। দীপ-দা আমার এমন লোক নন যে কুৎসিত মিথ্যার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করে' তুলবেন। আমি তাঁকে চিনি না? বরং তিনি হাসিমুখে মিথ্যার অত্যাচার সইবেন, তবু একটিও সামান্য প্রতিবাদ করবেন না।

ভদ্রলোকটি ভীষণ অস্থির হইয়া উঠিলেন: কী হয়েছে সব আমাকে খুলে বলুন দিকি শিগগির—দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি। একটা জামিন পর্য্যন্ত চাওয়া হয়নি? বলুন, আমিই দাঁড়াবো।

উমা কহিল,—শত্রুতা করে' আমার বাবা আর শচী প্রসাদ বলে' একটা ছোঁড়া—

—আপনার বাবা? ঐ মহিলাটি আপনার কে হয়?

—বলছি। মহিলাটি আমার বৌদি। সংসারের অত্যাচারেই হোক বা যার জন্যেই হোক, পথে বেরোন আর পথের মোড় থেকে আমার দীপ-দাকে হাত-ছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ি করে' ইত্যাদি ইত্যাদি। সব বুঝে নিন শিগ্‌গির। তারপর পুলিশ গিয়ে ধরে—পুলিশের কাছে মোমের পুতুল আপনার ঐ মহিলাটিই এখন বলছেন যে দীপদা তাঁকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

—কিন্তু সে সবের প্রমাণ?

উমা কহিল—যদি ভগবানে বিশ্বাস করেন ত তিনি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার বৌদির বয়স কত?

উমা বোধ করি চটিয়া উঠিল: ঐ চেয়ে দেখুন না? বয়েস দিয়ে আপনার কী হবে?

কোনো কথা বলিবার আগেই ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া কোর্টে প্রবেশ করিলেন। সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল—উদ্বেল জন-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল।

এই দীপ-দার চেহারা হইয়াছে! পরনের কাপড়টা ময়লা, চুলগুলি শুকনো জটপাকানো, পায়ে জুতা নাই—কোমরে দড়ি বাঁধা। কত দিন যেন ঘুমাইতে পারেন নাই, দাড়ি কামান নাই, গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গেছে। এদিকে একবারো তাকাইতেছেন না কেন? তাঁহার কিসের লজ্জা যে গভীর অনুশোচনায় তাঁহাকে হেঁট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে?

উমা সহসা নিতান্ত অবোধের মত উকিলটির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল,—যে করে' পারেন, আমার দীপ-দাকে এই কলঙ্ক থেকে বাঁচান। ফি আপনাকে আমি পরে যেখান থেকে পারি জোগাড় করে' দেব। যেখান থেকে পারি—আমার গয়না আছে। বৌদিকে দুটো জেরা করলেই সত্য কথা বেরিয়ে পড়বে। আপনি যদি না পারেন, অন্য কাউকে ডাকুন। বৌদি সতী সেজে কাঠের ফ্রেমে আঁটা ছবি পূজো করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু দীপ-দাকে এমন করে' মরতে দেবেন না কক্‌খনো।

—আপনার কিছু ভয় নেই। বলিয়া ভদ্রলোক সস্মিতমুখে বেঞ্চি ছাড়িয়া এক পাশে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের ঐ বন্ধুতাপূর্ণ হাসি ও দাঁড়াইবার এই দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গিটি উমাকে যে কী আশ্বাস দিল বলা যায় না।

কালো গাউন-পরা সরকারের পক্ষে উকিল খাড়া হইলেন। নমিতা ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া উমার দুই চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল—নির্লজ্জ, স্বেচ্ছাচারী! নমিতা দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্দ্দমনীয় কাঠিন্য, মুখে নিষ্ঠুর সাহস—ঘোমটার ফাঁক দিয়া বিস্রস্ত বেণীটা নামিয়া আসিয়াছে—যেন সর্ব্ববন্ধনহীনতার সঙ্কেত। উমা প্রদীপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহারো মুগ্ধ দৃষ্টি সেই নিরাভরণা দেহাগ্নি-শিখাকে বন্দনা করিতেছে।

সমস্ত ঘর মৃত হৃৎপিণ্ডের মত স্তব্ধ।

সরকারের পক্ষে উকিল কথা পাড়িলেন—নমিতার নাম ধাম বংশ পরিচয় সম্বন্ধে অবান্তর প্রশ্ন। তারপর :

তুমি ঐ আসামীকে চেন?

চিনি।

বেশ। ঐ লোক ১৭ই কার্ত্তিক রাত্রি একটার সময় তোমার ঘরে এসেছিলো?

না।

না? তোমাকে এসে বলেনি যে তোমার মা'র মরণাপন্ন অসুখ, তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে?

না। মিথ্যা কথা।

এই বলে' তোমাকে ভুলিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে ট্রেণে করে ফুলহাটি গ্রামে নিয়ে যায় নি?

কক্‌খনো না।

অবনীবাবুর মুখে কে কালি মাখাইয়া দিল; শচীপ্রসাদ সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারিয়া বলিয়া বসিল : ষ্টুপিড। সরকারের পক্ষে উকিল কহিলেন,—তবে কী হয়েছিল খুলে বল।

নমিতার গলার স্বর একটু কাঁপিল না পর্য্যন্ত। ধীরে সংযত গভীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল : বিশেষ কিছুই হয়নি। আমি স্বেচ্ছায় আপনার দায়িত্বে ঘর ছেড়েছি—মুক্তি আমার নিজের সৃষ্টি। প্রদীপবাবু আমার বন্ধু, বিপদের সহায়। তাঁকে সঙ্গে করে' আমি নিজের প্ররোচনায় ফুলহাটি বেড়াতে যাই। এর মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না, এতটুকু কলুষ নেই। আমি সাবালিকা, আমার বয়েস গত আশ্বিনে কুড়ি পূর্ণ হয়েছে। জীবনে কোথায় আমার গন্তব্য, কে আমার সঙ্গী, কেন আমার যাত্রা,—এ-সবের বিচার করবার আমার বুদ্ধি হয়েছে। যদি ভুল হ'য়ে থাকে তার পরিণামও আমিই বিচার করবো। প্রদীপবাবু নির্দ্দোষ নিষ্কলুষ—আমার মুক্তি আমার নিজের রচনা।

সবাই একসঙ্গে একেবারে থ হইয়া গেল। ঘরের ছাদটা ভাঙিয়া পড়িলেও বোধকরি শচীপ্রসাদের কাছে এত অস্বস্তিকর লাগিত না। সরকারী উকিল কর্কশ হইয়া কহিলেন,—তবে পুলিশের কাছে এত সব উল্টো কথা বলেছ কেন?

—পুলিশের কাছে কি বলেছি আমার কিছু মনে নেই। উল্টো কথা যদি কিছু বলে' থাকি, তবে এই জন্যই হয়ত বলেছিলাম যে, এমনি একটা উন্মুক্ত সভায় ধর্ম্মসাক্ষী করে' সর্ব্বসাধারণের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের মুক্তি ঘোষণা করতে পাবো। যা আমি নিজে সৃষ্টি করলাম, তা পরের সাহায্যে যে মোটেই লাভ করিনি, সেইটে উঁচু গলায় বলবার জন্যে আমি একটা সুযোগ চেয়েছিলাম মাত্র। এর চেয়ে সোণার সুযোগ আর কী হ'তে পারত? নেপথ্যে বা স্বপ্নে বা পুলিশের কাছে আমি যা বলেছি তার মূল্য নেই, স্পষ্ট দিবালোকে সজ্ঞানে ধর্ম্মাধিকরণের সাম্‌নে যা বলছি তাই আমার সত্য। উল্টো কিছু বলা বা প্রলাপ বকার জন্যে যদি শাস্তির বিধান থাকে তা আমি নেব; কিন্তু লুব্ধ যদি কেউ কাউকে করে' থাকে, তবে আমিই প্রদীপ বাবুকে করেছি, তিনি আমাকে নয়। তিনি আমার বন্ধু, আশ্রয়দাতা। যদি এও শুন্‌তে চান্, আমি বল্‌বো, ঐ আসামীকে আমি ভালোবাসি।...

স্তব্ধ ঘর নিশ্বাস ফেলিল; দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে, অবনীবাবু কহিলেন,—চলে এস শচীপ্রসাদ। এর পর ঘাড়ের ওপর মাথা নিয়ে আর লোক-সমাজে ফিরতে পাবে না; ছি ছি ছি!

উমা ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। উকিল বাবুটি কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—আমাকে কিছু বলতেও হ'ল না। মেয়েদের বয়েসই হচ্ছে বাঁচোয়া, বুঝলেন? কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন?

বিবর্ণ মুখের উপর হাসি টানিয়া উমা কহিল,—আপনাকে আমি ভুলবো না। আপনি আমাকে খুব সাহস দিয়েছিলেন কিন্তু।

কিন্তু উমার চেহারায় সাহসের এক কণাও ভদ্রলোকের চোখে পড়িল না। মুখ ছাইয়ের মত শাদা, দুই চোখে কেমন একটা নিরীহ অসহায় ভাব। কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। ভদ্রলোকটির কেন জানি মনে হইল, সর্ব্বান্তঃকরণে মেয়েটি হয়ত ইহা চাহে নাই। কোথায় যেন একটু আশাভঙ্গের মনস্তাপ রহিয়াছে।

প্রদীপ ও নমিতাকে ঘিরিয়া তখনো ভিড় লাগিয়া আছে। দুই জনেই নির্ব্বাক, সবারই প্রতি সমান উপেক্ষা। শচীপ্রসাদেরই আপশোষ ঘুচিতেছে না; সে সক্রোধে দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া নমিতার সামনে আসিয়া কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কেন এই কেলেঙ্কারি ক'রে বসলেন বলুন ত? আমাদের মুখ রাখবার আর জায়গা রইল না য!

অবনীবাবু দূর হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন—ঐ হতভাগীর সঙ্গে কথা বলো না শচীপ্রসাদ। যাক্ ও জাহান্নমে,—তুমি চলে' এস।

যাইতে যাইতে শচীপ্রসাদ কহিল, এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরলেও যে ভাল ছিল। দুই জনে ধীরে ধীরে জনস্রোত সরাইয়া রাস্তার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ কহিল,—এখন কোথায় যাবে নমিতা!

নমিতার মুখে অটল গাম্ভীর্য্য—যেন পরপার হইতে কথা কহিতেছে: আমি কি জানি?

—সম্প্রতি একটা গাড়ি নেওয়া যাক্, নইলে এ ভিড় এড়ানো সহজ হবে না। দু'দিন কিছু খেতে দেয়নি নমিতা, পেট চোঁ চোঁ কচ্ছে। কিছু না খেলে চল্‌বে না যে।

উদাসীনের মত নমিতা কহিল,—বেশ, তবে গাড়ি ডাকো।

—গাড়ি ত' করবো, কিন্তু কে এখন আমার জন্য আর ভাত বেড়ে রেখেছে বল?

—কেন, হোটেল? কল্‌কাতা শহরে হোটেল নেই?

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে হোটেলে?

—আপনার সঙ্গে যেতে আর আমার বাধা কোথায়?

ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পাশে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছে—প্রায় ছুটিতে ছুটিতে উমা আসিয়া হাজির: আমাকে চিন্‌তে পারো দীপ-দা?

—তুমি এখানে উমা? প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না: উঠে এস, উঠে এস শিগ্‌গির—

নমিতা এক পাশে সরিয়া গিয়া উমাকে তাহাদের মধ্যখানে বসিতে দিল।

তবুও গাড়িটা তখনই ছাড়িতে পারিল না। কে একজন ডান হাতে ছাতা তুলিয়া গাড়িটাকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। নমিতা তাহার গভীর হৃদয়ের মধ্যে যেন কাহারও ডাক শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইহাকেই সে যেন বিনিদ্র ব্যাকুল চোখে এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। কিসের বা তাহার মুক্তি, কী বা তাহার সত্য।

কোর্টে আসিতে গিরিশ বাবুর দেরি হইয়া গিয়াছিল। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটা ট্যাক্সিতে করিয়া নমিতা কাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে। সামনে আসিয়া চোখে তাঁহার ধাঁধা লাগিল। চোখ কচ্‌লাইয়া নমিতাও চাহিয়া দেখিল—তাহার কাকা ছাড়া পিছনে আর কেহ নাই। গিরিশবাবু ট্যাক্সির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—কী হ'ল?

কথা কহিল উমা: কী আবার হবে? বৌদি জিতেছেন।

—জিতেছে? গিরিশ বাবু লাফাইয়া উঠিলেন: কয় বছর জেল হ'ল গুণ্ডাটার?

উমা তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল,—গুণ্ডা আবার আপনি কাকে দেখলেন?

—গুণ্ডা নয়, একেবারে গুণ্ডা! ছোঁড়াটার মাথায় যেমন একরাশ চুল, চোখ দুটো ভাঁটার মত, হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবা—ওটাকে আমি বরাবরই রাখিতে চাইনি বাড়িতে। নেহাৎ ওর দিদির আব্‌দারেই ছিলো, ত', দিদিকে কি আর কম জালিয়েছেন সোনার চাঁদ! "ক" বছর হ'ল?

—কা'র কথা বলছেন?

—কেন, অজয়ের। সে ইতিমধ্যে এসেছিলো একদিন আমার বাড়িতে; এসে বল্লে,—নমিতা কোথায় গেছে জানেন? শ্বশুরবাড়িতে তাকে খুঁজে পেলাম না।—কী ভীষণ চটে' উঠলাম, যে কী বল্‌বো। বল্লাম—শিগ্‌গির আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি, নইলে পুলিশ ডাকবো, নমিতা তোমার কে শুনি হে বাবু?

মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—আমাকেও এমনি পুলিশ ডাকবার ভয় দেখিয়ে একজন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো। দয়া করে' একটু সরুন, গাড়িটা যেতে পারছে না।

নমিতা ধীরে প্রশ্ন করিল; কত দিন আগে এসেছিলেন?

—এই ত, দিন তিন-চার হবে। ও হরি! তখন কে জান্‌তো ছোঁড়াটা এত বড় হতচ্ছাড়া, জানোয়ার! নমিতাকে নিজে সরিয়ে দিব্যি ন্যাকা সেজে কি না বলে' গেল: নমিতার ঠিকানা কি বলতে পারেন? ব্যাটা পাজি—ক' বচ্ছর হ'ল ওর জেল হ'ল শুনি?

উমা বিরক্ত হইয়া কহিল,—ওঁর জেল হ'তে যাবে কেন? কী বল্‌ছেন আপনি?

গিরিশবাবু হতভম্ব হইয়া কহিলেন,—বা, এই যে বল্লে নমিতা মামলা জিতেছে।

—জিতেছেনই ত'। সমস্ত পৃথিবীর সামনে সোজা সত্য কথা স্পষ্ট করে' বলে' আসতে পেরেছেন। মানুষের এর চেয়ে বড় জয় কিছু আর আছে নাকি? কেউ বৌদিকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তিনি নিজের আত্মার শক্তিতে নিজের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন। যান্, জেল-ফেল কারুর হয়নি কোনোদিন।

গিরিশবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন আর কি: বল কি উমা? নমিতা নিজের ইচ্ছায় বাড়ির বা'র হয়েছে? তবে কার বিরুদ্ধে এই মামলা? এঁ্যা! কোথায় যাচ্ছ তবে তোমরা?

নিতান্ত অজ্ঞানীর মত মুখ করিয়া উমা কহিল,—তা কে কবে বলতে পারে বলুন, কোথায় কে যে যাচ্ছে?

গাড়িটা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, গিরিশবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন: শোন্, নমি, কেন তবে ঘর ছেড়েছিলি শুনি? কার জন্যে?

উমা বলিয়া উঠিল: কার জন্যে আবার লোকে ঘর ছাড়ে? নিজের জন্য। চালাও জল্‌দি!

গিরিশবাবুকে আর একটি কথাও বলিতে না দিয়া ট্যাক্সিটা বাহির হইয়া গেল। ছাতা হাতে করিয়া গিরিশবাবু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নমিতা মুগ্ধ চোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিক পরে তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল,—এত কথা তুমি কোত্থেকে শিখলে, উমা?

উমা হাসিয়া কহিল,—তোমারই কাছ থেকে বৌদি।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ট্যাক্সিটা যে কোথায় চলিয়াছে, যেন কাহারো কোন দিশা নাই। প্রদীপ সহসা সচেতন হইয়া কহিল,—তুমি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবে, উমা?

মানুষের মন না পদ্মপাতায় শিশিরকণা! নিমেষে উমার সমস্ত উৎসাহ উবিয়া গেল; মুখখানি ম্লান করিয়া সে কহিল,—না, কোথায় আবার যাব! আমার আর কাজ কি আছে? এই, রোখো।

গাড়ির গতিটা একটু কমিতেই দরজা খুলিয়া উমা নামিবার জন্য পা-দানিতে পা রাখিল।

ব্যস্ত হইয়া কহিল,—এখানে নামবে কি? এখান থেকে তোমাদের বাড়ি যে ঢের দূর।

—হোক্। আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আমার আর কী হবে? বলিয়া উমা সোজা ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

প্রদীপ গাড়িটাকে ছাড়িতে বলিতে পারিল না। বরং হাত তুলিয়া অভিমানিনী উমাকে ডাকিতে সুরু করিল।

নমিতা বাধা দিল: ওকে ডেকে কোথায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে'? ও বাড়ি যাক্।...চলো।

গাড়িটা গড়াইয়াছে, অমনি ছুটিয়া উমা ফের হাজির হইল। কহিল, তোমাকে প্রণাম করা হয়নি, বৌদি। মনে মনে যদি কোনোদিন দুঃখ দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। আর কোনোদিন দেখা হয় কিনা, কে জানে। বলিয়া দরজা খুলিয়া সে নমিতার পদধূলি নিল।

নমিতার দুই চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমা পাশের কোন্ গলি দিয়া সহসা কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সুখ

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

সুখের বসতি কোথা কেহ নাহি জানে,
বিশ্ব তবু সমস্বরে কহে—চাহি সুখ,
চির রাত্রি চির দিন জগৎ উন্মুখ
ছুটিয়াছে আত্মহারা তাহার সন্ধানে।
রূপ-রস-শব্দ স্পর্শ-বর্ণ-গন্ধ-গানে
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে তন্ন তন্ন করি',
হেম-মায়া মৃগ-নাভি-গন্ধ অনুসরি'
এক হ'তে অবিশ্রান্ত ধায় অন্য পানে।
সম্মুখে সতত নাচে রূপ চিত্তহরা
সুখ-স্বর্ণ-মায়ামৃগ নাহি দেয় ধরা॥

অস্তমান তপনের শেষ রক্তরাগে
দিগঙ্গনা বাষ্পাকুল নীলিম-নয়নে
যখন উছলে হাসি, প্রাচী দিগঙ্গনে
সপ্ত বর্ণসমারোহে ইন্দ্রধনু জাগে।
ব্যর্থ আশা যদি কেহ সুখ-সঙ্গ মাগে
তরল উচ্ছল লঘু আনন্দলীলায়,
সুখ ইন্দ্র মুগ্ধচ্ছবি পলকে মিলায়,
উল্লাস হিল্লোল যদি তা'র অঙ্গে লাগে।
অশ্রু বাষ্প ছল ছল নয়ন-পল্লবে
আনন্দ আলোকপাতে সুখ মূর্ত্তি লভে॥

দুঃখের নিদাঘ দিনে কেমনে কি জানি,
আশার অঙ্কুরকণা দীর্ঘশ্বাস মুখে
ভেসে এসে স্থান লয় তাপদগ্ধ বুকে,
ঊষর উরস ক্ষেত্র সার তীর্থ মাগি'।
বরষার নব মেঘ ভরসার বাণী
বহি' আনে, জলধারা সাজায় তাহারে
ফল, ফুল, পত্র-পুষ্প-পল্লব-সম্ভারে;
শীত তারে রিক্ত করে হিম বাত্যা হানি'।
বসন্তের বৃন্তচ্যুত আশার মন্দার
সুখের সমাধিবক্ষে করে হাহাকার॥

বিজ্ঞানের গল্প

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

বিশ্ব-সৃষ্টি

জীব ও জড় এই নিয়ে জগৎ। দেশ অবলম্বন করে নানা আকারে ও আয়তনে জড়ের অস্তিত্ব ও বিস্তৃতি। দেশ ও কাল অবলম্বন করে প্রাণের প্রবাহ। এই প্রাণের বিকাশ ও লীলা জড়ের বিবিধ মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে চলে আসছে। জীব ও জড় এই দুই পদার্থের অতীত হল জ্ঞান-চৈতন্য। চৈতন্য-প্রবাহ বিশুদ্ধ কালকে অবলম্বন করেই আছে। চৈতন্য চলেন জড় ও প্রাণের সাক্ষ্য। এই জন্যেই ব্রহ্মবিদ্যা বলেন 'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ'।

এই তিন তত্ত্বের আদি কোথায় ও কি তাই জানা হল বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু ··আদি তত্ত্ব নির্ণয় করা বিজ্ঞানের অসাধ্য। সব আগে কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর মানব-জ্ঞানে সম্ভব নয়; যেটাকেই বলবে যে 'এই ছিল আগে' তখনি প্রশ্ন হবে 'এই বা এল কোথা হতে?' তখন বিজ্ঞানকে বলতে হবে—হয় 'এর আগে কিছু ছিল না'; না হয় 'কি ছিল জানি না'। 'এর আগে কিছু ছিল না এই ই সর্ব্বাদিম' এ খুব দুঃসাহসের কথা! আর কি ছিল জানি না এ বললে তো হার স্বীকার করাই হলো।

যাই হোক বিজ্ঞানবিদ্যা—'অনাদি আদি তত্ত্ব কি' না বলতে পারলেও 'পদার্থ বিশেষের আদি রূপ কি' তার কিছু উত্তর দেবার চেষ্টা করতে পারে; এবং এই উত্তর মানববুদ্ধির ক্রমিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এবং যুক্তি প্রমাণের সমর্থনের ফলে ক্রমশঃই সন্তোষকর হতে পারে। বিজ্ঞানের সার্থকতাই এইখানে। মানব বুদ্ধি যুক্তি ও বিচারযোগে···কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ সত্যের শিখরে উঠতে চলেছে এইটেই বিজ্ঞানের মস্ত সার্থকতা।

মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন কেবলি জানতে চায় এটা কোথা হতে এল? ওটা কি করে হল? সব চেয়ে যে বড় প্রশ্ন সভ্য মানুষকে বিচলিত করে এসেছে সেটা হচ্ছে—'জগৎ স্বরূপে কি?' 'জগৎ এল কোথা হতে?' 'জীব কি?' 'প্রাণের উৎপত্তি কোথা হতে?'—যুগে যুগে সভ্য মানুষের দর্শন বিজ্ঞান এসব প্রশ্নের কত রকম উত্তর দিয়ে এসেছে।··আর যতই মানুষের বিচার-বিবেচনা-শক্তি প্রখর হচ্ছে ততই পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তরের খুঁৎ ধরছে, দোষ বার করছে এবং নূতন নূতন মীমাংসার চেষ্টা করছে। এক পুরুষের জ্ঞান বিদ্যা উত্তর পুরুষের কাছে ভ্রান্ত জ্ঞান বলে না-মঞ্জুর হচ্ছে। সোজা কথায় বিজ্ঞান ক্রমশঃই বৃহত্তর সত্যের দিকে পৌছুচ্ছে।

মানুষের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে স্থাবরজঙ্গমময়ী বসুন্ধরা, ওই যে জীবন্ত জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল সূর্য্য, শিরোপরে আরো দূরে ওই যে অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিন্দু, এই সব নিয়ে এই যে বিরাট বিশ্ব—এ এল কোথা হতে? আদিম ধর্ম্মশাস্ত্রের উত্তর হচ্ছে—মানবধর্ম্মী এক সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ বিশেষ, ঈশ্বর যাঁর নাম, তিনিই এই সব সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞান শাস্ত্র এ উত্তরে সন্তুষ্ট নয়; এবং সহজ বুদ্ধি বলে দেয় কেন এ উত্তর সন্তোষজনক নয়।

সাধারণ অভাবুক লোক ভাবে পৃথিবী তো একই ধরণে ও রূপে চিরকালই বিদ্যমান; এখন যেমন দেখা যাচ্ছে, আদিতেও এমনি ছিল; এবং এই বিচিত্র রূপ ও আকার নিয়ে এক সময় হঠাৎ দেশে ও কালে সৃষ্ট হয়।

কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। একটু লক্ষ্য করে যারা দেখে তারাই ধরতে পারে পৃথিবী অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরের ভিতর দিয়ে চলেছে; জলে স্থলে বাতাসে জীব-জগতে সর্ব্বত্র নিরন্তর রূপান্তর হচ্ছে—। ভূতত্ত্ব শাস্ত্র হতে জানা যায় অতীতে পৃথিবীর দেহে জল স্থলের সমাবেশ এমন ছিল না—যুগে যুগে তার মূর্ত্তি এবং তার বক্ষে জীববংশের জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি নব নব রূপের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে।

তারও আগে এমন এক সময় ছিল পৃথিবীর শিশুজীবনে, যখন তার দেহে জল স্থল বাতাস, ধাতু, পাথর, পাষাণ ও মৃত্তিকার কোনো ভেদই ছিল না, ভূদেহ ছিল একাকার উত্তপ্ত এক বর্ত্তুলাকার বাষ্প পিণ্ড মাত্র। তারও আগে পৃথি

কোথায় ও কি ভাবে কিরূপে ছিল—তার উত্তর আর ভূতত্ত্ব শাস্ত্র দিতে পারে না—তার উত্তরের জন্য শরণ নিতে হবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের। দেখা যাক্ জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বলে এর উত্তরে।

সৃষ্টিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে এখনকার সূর্য্য আদিতে একটা বিশাল সৌর নীহারিকা রূপে…জগতের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে ছিল। এই নীহারিকারই দুই বিপরীত পৃষ্ঠভাগ হতে দুটা দীর্ঘ বাষ্প-বাহু বাহির হয়ে..আবর্ত্তন-গতিফলে বেঁকে গিয়ে নীহারিকাটাকে একটা spiral বা ঘূর্ণী নীহারিকার রূপ দেয়। এই উৎক্ষিপ্ত দুই বাহুর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান করা হয় যে কোনো এক সুদূর অতীতে এক আগন্তুক অতিকায় সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের গা ঘেঁসে চলে যায়; এবং এই আগন্তুক সূর্য্যরাজের প্রচণ্ড আকর্ষণে আমাদের সূর্য্যদেহের উভয় ভাগের চন্দ্রাকর্ষণে. সিন্ধুবারির উৎক্ষেপের মতই খুব খানিকটা বাষ্পরাশি উপর দিকে ঠেলে ওঠে; এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্যের দেহে ফিরে আসবার পূর্ব্বেই শীতল শূন্য সংস্পর্শে জমে গিয়ে তরল বা কঠিন…ছোট বড় সূক্ষ্ম অসংখ্য জড়কণায় পরিণত হয়।—প্রত্যেক বাহুর মধ্যে যে গুলা বড় জড়পিণ্ড সেগুলা ছোট ও সূক্ষ্ম জড়কণাগুলাকে আত্মসাৎ করে এক এক গ্রহে পরিণত করে। সর্ব্ব শুদ্ধ এরূপ নয়টা প্রধান গ্রহ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে চারটী কনিষ্ঠ (minor) গ্রহ, এরা সূর্য্যের নিকটতম। প্রথমে বুধ, তারপর শুক্র, তারপর পৃথিবী, তারপর মঙ্গল। এরপর এক ঝাঁক ক্ষুদ্র গ্রহ দল বেঁধে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের সংখ্যা কম পক্ষে এক হাজার হবে। এই ক্ষুদ্র গ্রহ দলের পর জ্যেষ্ঠ গ্রহ পাঁচটী। সব আগে বৃহস্পতি; তার পর শনি; তারপর বরুণ (Neptune) তারপর Uranus অরুণ; সব শেষে নবাবিষ্কৃত Pluto।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ-সৃষ্টি

সূর্য্য হতেই যে গ্রহগুলির উৎপত্তি এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতভেদ নাই। তবে সেই আদিম সূর্য্য আকারে ও আয়তনে একটা বর্ত্তুলাকার নীহারিকার মতই ছিল, এখন কি প্রক্রিয়াতে এই সব গ্রহ উৎপন্ন হয় এ নিয়ে বহু theory এতাবৎ প্রচারিত হয়েছে। প্রত্যেক মতেই অল্প বেশী দোষ ত্রুটী আছে; তবে উপরে যে মতটী বর্ণিত হলো সেটীতে দোষ ত্রুটীর ভাগ খুবই কম; এইজন্য পণ্ডিতরা এই মতটীকে এখন সুনজরে দেখছেন। এই theoryটী দুই ভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। Dr. Jeans এর মত মত হচ্ছে যে আগন্তুক সূর্য্যের আকর্ষণে আমাদের সূর্য্য-দেহের উপর হতে খানিকটা বাষ্প-পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়; এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ হতেই গ্রহদেহ গঠিত। এটি হচ্ছে Tidal theory. Chamberlain ও Moulton নামক দুই মার্কীণ জ্যোতির্ব্বিদ্ যে মত প্রচার করেন তার নাম Planetesimal Theory; এই মতে আদিম সৌর নীহারিকা ছিল অসংখ্য শীতল জড়কণার বিপুল বিস্তৃতি মাত্র। এই সব কঠিন জড়কণা বা দানা একটা মধ্যবিন্দুর চতুর্দ্দিকে নিয়মিত পথে ঘুরছিল। কালক্রমে এই সব জড় দানা কণা পরস্পরে আকৃষ্ট হওয়াতে নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লাগে, এবং সেই সংঘর্ষজনিত উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হয়; এই উত্তাপে সমস্ত জড়কণা প্রথমে গলে তরল হয়, পরে জমাট বেঁধে বড় বড় জড় পিণ্ডে বা গ্রহে পরিণত হয়।

উপরে যে গ্রহ-সৃষ্টি প্রণালী ব্যাখ্যাত হয়েছে সেটি এই Tidal ও Planetesimal দুই theoryর মিশ্রণে গঠিত।

সৌর নীহারিকা হতে না হয় গ্রহমণ্ডল হলো; স্বয়ং সূর্য্য কোথা হতে কি রূপে হলো? সূর্য্যতো একটা নয়; অসংখ্য ঐ যে উজ্জ্বল তারকারাশি নৈশাকাশে হীরার হারের মত শোভা পায়, ওদের প্রত্যেকটাই এক একটী সূর্য্য, আমাদের সূর্য্যও একটা তারা; যেমন বৃক্ষসমষ্টি নিয়ে অরণ্য তেমনি তারকাসমষ্টি নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। সিন্ধুতীরে যেমন বহু বালুকণার মধ্যে একটী কণা, বিশ্ববেলাভূমে অসংখ্য তারকার মধ্যে আমাদের এই ছোট সূর্য্যও একটী। সবই এক এক বিরাটকায় অত্যুগ্র দীপ্তিশালী বাষ্পময় জড়পিণ্ড।

সূর্য্য সৃষ্টি

যে বস্তুর রূপান্তর আছে তার আদি মধ্য ও অন্ত থাকবেই। এই ব্রহ্মাণ্ড যখন রূপান্তরের ফল, তখন তারও আদি ছিল অর্থাৎ সূর্য্যগুলির এক সময়ে জন্ম হয়েছিল। কি করে হল? এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হতে ছাড়েনি।

আধুনিক মত এ সম্বন্ধে এই:—পূর্ব্বশতাব্দীতে আবিষ্কৃত ঘূর্ণী-নীহারিকাগুলিকে তৎকালীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা Laplace ব্যাখ্যাত নীহারিকা-বাদের জলন্ত প্রমাণরূপে গণ্য করেন। কিন্তু এ শতাব্দীতে অতিকায় দূরবীণযোগে ভালভাবে পর্য্যবেক্ষিত হয়ে স্থির হয়েছে যে ঐ সব নীহারিকা এত প্রকাণ্ড, তাতে এত পদার্থ পরিমাণ আছে, যে তা হতে ছোট একটা সৌরজগৎসৃষ্টি তুচ্ছ কল্পনা;—পক্ষান্তরে তা হ'তে যা সৃষ্ট হচ্ছে সে সব হল কোটী সংখ্যক সূর্য্য বা সৌর-নীহারিকা বা তারা।

এই সব বিশালকায় নীহারিকা-দেহের দুই প্রান্ত হতে দুটা দীর্ঘ বাহু বাহির হয়েছে (সম্ভবতঃ অন্য এক নিকটগামী নীহারিকার আকর্ষণপ্রভাবে)—এই বাষ্পবাহুদুটীর বহু স্থানে ছোট বড় অসংখ্য জড়পিণ্ড তাল বেঁধে আছে; সেইগুলিই কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে...একক (single) বা গুচ্ছীকৃত তারকা উৎপন্ন হয়।

কি সূর্য্য কি গ্রহ দুইই নীহারিকা-বাষ্প হতে উৎপন্ন হয়; এবং উভয় নীহারিকাই ঘূর্ণী আকারের; তফাৎ শুধু নীহারিকার বিস্তৃতি ও বস্তুপরিমাণে আর উভয়ের উৎপত্তি-প্রক্রিয়াতে।

নানাদিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে আমাদের নক্ষত্র-জগৎটী আকারে একটা চাপটা চাক্‌তির (flat disc) মত, যার কেন্দ্র হতে যত উর্দ্ধ ও নিম্ন বা পরিধির দুই প্রান্ত ভাগের দিকে যাওয়া যাবে তারকাসংখ্যা ততই কম ও লঘুভাবে বিন্যস্ত দেখা যাবে। একটা বড় সহরে যেমন মধ্যভাগে দীপমালা খুব ঘনবিন্যস্ত থাকে, আর যতই উপকণ্ঠের দিকে ও সহর ছেড়ে পল্লীর দিকে যাওয়া যায় ততই আলোগুলি খুব কম ও দূর দূর অবস্থিত হয়, বিশ্বের মধ্যে সূর্য্যবিন্যাসও তেমনি। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে তারকাসংখ্যা ন্যূনপক্ষে ৩০০০ হতে ৪৭০০ কোটী। এই সব তারা হয় দূর দূর তফাৎ একা নিঃসঙ্গ ভাবে, না হয় যুগলে, না হয় দ্বিযুগ্ম (quadruple) ভাবে; না হয় গুচ্ছাকারে (in cluster) ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বতন্ত্র গতি আছে এবং সকলের এক সঙ্গে একটা স্রোতাকারে প্রবাহগতি আছে। যেমন গ্রহদের নিজেদেরই দুটা গতি আছে নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে আর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে—তেমনি আবার সূর্য্যের সঙ্গে এক হয়ে সকলের একটা সাধারণ গতি আছে মহাশূন্য-পথে।

আমাদের জগতের সীমানাস্বরূপ সুদূরবর্ত্তী ছায়াপথের বাইরে অথচ উপকণ্ঠ ভাগে (outskirts) বহু তারকাগুচ্ছ আছে। এরা এক একটী ছোট ছোট বিশ্ব। আরো দূরে মহাকাশের অন্ধকারগর্ভে বিরাজমান আছে অসংখ্য বড় বড় নক্ষত্র-জগৎ। দূরবীণে এদের ঘূর্ণী নীহারিকা আকারে (কুণ্ডলীকৃত ধূমকেতুর মত) দেখা যায়।

তারকাদের জীবনে একটা জন্ম-বৃদ্ধি-স্থিতি ও লয়ের ক্রমিক ধারা বা অবস্থান্তরলাভ আছে। তারাগুলি জন্ম-কালে শৈশবে খুব বিশালায়তন ও তীব্র দীপ্তিশীল থাকে;—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার তেজ কমে আসে, আয়তন ছোট হয়, দীপ্তি হ্রাস পায়; পরিণামে শীতল শক্ত জমাট পাথরপিণ্ডে পরিণত হয়, এবং দেহ একেবারে দীপ্তিহীন হ'য়ে যায়। বয়সের সঙ্গে বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। শিশু তারা শুভ্র বা ঈষৎ নীলাভ উজ্জ্বল শুভ্র; মাঝ বয়সের তারা হল্‌দে ও কমলা রং-এর হয়; বুড়া বয়সে লাল রং-এর হয়। মরণান্তে একেবারে বিবর্ণ। আমাদের সূর্য্যের বার্দ্ধক্য এসেছে। অরণ্যে যেমন অঙ্কুর হ'তে জরা-জীর্ণ নানা পর্য্যায়ের বৃক্ষই দৃষ্টিগোচর হয়, আকাশেও সেইরূপ সকল বয়সের তারকাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নীহারিকা-গর্ভে ভ্রূণ সূর্য্য, নবজাত শিশু-সূর্য্য, অমিত তেজোময় যুবা-সূর্য্য, জ্যোতিহীন ম্লান সঙ্কুচিতকায় বৃদ্ধ-সূর্য্য এবং প্রাণহীন সূর্য্য-শব—সব রকম অবস্থার সূর্য্যই যন্ত্রচক্ষে ধরা পড়ে।

(জীবনধারা)

নবজাত অতিকায় শিশু-সূর্য্য ক্রমে জীবনলীলা শেষ করে জ্যোতিহীন সঙ্কুচিতকায় বামনত্ব লাভ করে; পরিণামে গগনপটে প্রেতদেহ নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের চোখে পড়ে না। তার পর তার কি হয়? ওইখানেই কি শেষ? বিজ্ঞান কিছু তার উত্তর দিতে পারে না। এখানে অনুমান ছাড়া কিছু চলে না। হয়তো এই শীতল জড়-পিণ্ডত্ব লাভ করবার আগে তারকাগুলা ফেটে চুরমার হ'য়ে উল্কা যাকে (meteorites) বা জড়চূর্ণে planetsmal বা জলন্ত বাষ্পে পুনরাবর্ত্তন করে, নীহারিকায় পরিণত হয়; আদিতে যা ছিল অন্তে তাই হয়, 'Dust it was to dust

returneth !'—ধূলা হ'তে জন্ম লাভ ধূলাতেই লয়। Browning এর কথায় 'after the last returns the first.'

জগতের পরম-আদি ও চরম-অন্ত দুই-ই বিজ্ঞানের জ্ঞানের অগোচরে। বিজ্ঞান কেবল বর্ত্তমানকে দেখে বর্ত্তমানের উপর দাঁড়িয়ে অতীত বা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারে; এবং যতটা সম্ভব তারি সাহায্যে আদি অন্তের রূপ কল্পনা করতে পারে। বিজ্ঞান আকাশ পটে অনন্ত ঘূর্ণামান নীহারিকাকে ক্রমিক অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে সূর্য্যত্বে পরিণত হ'তে দেখছে;—দেখেই বিশ্বের আদি অন্ত আরম্ভ ও লয় কল্পনা করতে পারছে।

কাজেই নীহারিকাই যে বিশ্বের প্রসূতিস্থানীয়া এ সিদ্ধান্ত সেরেফ্ আজগুবি কল্পনা নয়, এটা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য অনুমান।

উত্তম কথা। নীহারিকাই বিশ্বের আদি-কারণ মেনে নেওয়া গেল। নীহারিকার উৎপত্তি কোথা হ'তে হ'ল? বিশ্বতত্ত্ববিদ্ অবশ্য বলবেন 'জানি না'। নীহারিকা হ'তে সূক্ষ্মতর পদার্থ গগন-পটে দৃষ্ট হয় না। কাজেই বলা বড় দুষ্কর কোথা হ'তে নীহারিকা এল। তবে চেপে ধরলে বিশ্বতত্ত্ববিদ্ একটা অনুমান করবেন—সেটা হচ্ছে এই যে—নীহারিকা-দেহ পরমাণুপুঞ্জেরই একটা ঘনীভূত অবস্থা মাত্র। এই সব সংখ্যাহীন আদিম ও পরম পরমাণু 'নীহারিকাত্ব' লাভ করবার আগে মহাশূন্যগর্ভে খুব তফাৎ-তফাৎ হ'য়ে ছড়ানো ছিল; এরাই কালক্রমে পরস্পরাকৃষ্ট হ'য়ে ঘনসন্নিবিষ্ট হ'ল এবং নীহারিকাত্ব লাভ করলে।

এত স্থান মহাশূন্যে ছিল? ছিল বৈকি। Sir Oliver Lodge গণনাযোগে আবিষ্কার কোরেছেন যে এক ঘন ইঞ্চি বাতাসে অণু আছে ১০ হাজার কোটী-কোটী (million million million molecules)! লক্ষ কোটী সূর্য্যসম্বলিত বিশ্বে কত অণু আছে তা হ'তে বুঝে দেখুন। Einstien-এর গণনা অনুসারে মহাকাশ সসীম। কিন্তু সেই সসীম মহাকাশও এতই বিশাল যে এই সমস্ত অণুকে সমান দূরে দূরে রেখে সাজালে প্রত্যেক অণু দু'টীর মধ্যে ১০ হাত স্থান ব্যবধান থাকবে!

সৃষ্টির আদিতে হয়তো দেশগর্ভে জড়ের এই রূপ সমাবেশই ছিল। তারপর এই সাম্যাবস্থায় এক অজ্ঞেয় কারণে চাঞ্চল্য ঘটে যার ফলে এই কারণ-সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে ও পরমাণুপুঞ্জ স্থানে স্থানে জটলা বাঁধতে থাকে। পরমাণুদের এই প্রথম গা-ঘাঁসা অবস্থার নাম হ'ল নীহারিকা। খুব সম্ভব এই রূপেই অসংখ্য নীহারিকা দেখা দেয়। যেমন বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্য জলবাষ্প ঘনীভূত হ'লে জলবিন্দু হয়; জলবিন্দুর অণুগুলা আরো সংহত হ'লে তুষারকণা হয়—তেমনি ধরণেই অদৃশ্য পরমাণু-সমুদ্র স্থানে স্থানে সংহত ও ঘনীভূত হয়ে দৃশ্যমান নীহারিকা হ'ল; নীহারিকার লঘুপদার্থ ঘনীভূত হ'তে হ'তে তারকা-সূর্য্যে পরিণত হয়; আবার তারকা-সূর্য্য হ'তে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পকণা জমাট বেঁধে জড়কণাও দানায় পরিণত হয়। সেইগুলাই আবার কালক্রমে পিণ্ডীকৃত হইয়া গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হচ্ছে।

এর পরও যদি নাছোড়বান্দা পাঠক বলেন পরমাণু এল কোথা হ'তে? বিজ্ঞান বলবে 'জানি না—আমার দৌড় ওখানেই শেষ—'।

এর উত্তর দর্শনশাস্ত্রের যে রাজা, সেই বেদান্তশাস্ত্র দিতে পারে। উত্তর কি? পরমাণু এল মন বা আত্মা হ'তে! আত্মা হ'তে পরমাণু? একি গাঁজাখুরী প্রলাপ! প্রলাপ বাস্তবিকই নয়। খুব ভয়ানক সত্য কথা মন বা আত্মা মানেই আত্মার জ্ঞান। এত ও বিচিত্র বিশ্বকে যে এক একাকার পরমাণু রূপ আদি তত্ত্বে টেনে নিয়ে গেল, অর্থাৎ এতৎসম্পর্কে একটা hypothesis খাড়া করলে—সে কে? মানুষের মনের জ্ঞান—জ্ঞান বা আত্মা একার্থ। A hypothesis is born of a mind—। এরই প্রাচীন দার্শনিক ভাষান্তর হচ্ছে—'আত্মা বা ইদম অগ্র আসীৎ'—আত্মা সবার আগেই থাকেন, আত্মা হ'তেই সব হয়, আত্মাতেই সব থাকে; আত্মাতেই সব লয় পায়

অমাবস্যার পরে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অমা-র সীমান্তে তুমি শান্তিমতী স্নিগ্ধ জ্যোতির্লেখা,
নিঃশঙ্ক সঙ্কেত শোভে সীমন্তের সোনার সিন্দুরে;
তুমি তারি প্রতিবিম্ব যাহা কিছু অমর্ত্ত্য অ-দেখা,
এনেছো সন্ধ্যার তারা সন্ধ্যাদীপে গৃহ-অন্তঃপুরে।

গাহন নহেক ইহা মুক্তা-লোভে, এ যে মুক্তি স্নান,
তোমার সর্ব্বাঙ্গ যেন দেবতার মন্দির-চত্বর
নিষ্ফল সংগ্রাম শেষে দিবা পেলো সন্ধ্যার সন্ধান,
রমণীয় রোমাঞ্চন নহে নহে—শীতল শিহর!

ললিত লাবণ্যপুঞ্জে লুকাইয়া রেখেছো হৃদয়,
বাহুর বন্ধনমাঝে করিতেছ বিরহ-বন্দনা;
দেহের কুলায়ে তব সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয়;
ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের সেই আকাশ-শ্রী—তোমার তুলনা।

ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার নাই, তারকার বাজে একতারা
সংসারের উপকূলে বহমানা কল্যাণী তটিনী,
গ্রীষ্মের তপস্যা শেষে তুমি দাগ আষাঢ়ের ধারা,
কবিতা-কাননে তুমি লক্ষ্যভ্রষ্টা হারানো হরিণী।

সূর্য্যের সে আত্মহত্যা দেখিয়াছে দরিদ্র সে দিন,
বিস্মৃতির বৃষ্টি আনো ক্ষমাময়ী তুমি বিভাবরী
ব্যর্থ ক্ষণখণ্ডগুলি স্পর্শরসে করেছো রঙিন,
স্পর্শ তব বর্ম্ম যেন—মাতৃস্নেহে রেখেছে আবরি'।

আকাশ ফেণিল ছিলো বিষবাষ্পে, আজি শুধু নীল—
গাত্র তব পূজাপাত্র, লাবণ্য ত' নির্ম্মাল্য নির্ম্মল,
মরুভূতে মেঘছায়া, গুপ্ত ভালে নয়ন-সলিল,
অধরেতে সুরা নয়, অধরা সে—আময তরল!

এসো বসি জানালায়, দীর্ঘ রাত্রি আসুক ঘনায়ে,
কী আলস্য লাস্যে তব! ঘুমো চোখ—শ্লথ থাক্ বেণী
কী সম্পূর্ণ সমর্পণ অবিচল মনোবাক্যকায়ে—
কপটপটুতা তব চাহনি কি কভুও শেখেনি?

ছিলাম উন্মুক্ত পাখী, ঝোড়ো রাত্রে উদ্দাম পথিক,
তুমি রাত্রি দিগ্ব্যাপিনী স্বপ্ন-বিন্দু-নক্ষত্র-স্পন্দিতা;
প্রত্যহের প্রয়োজনে তুমি তবু কল্পনা-প্রতীক,
অন্ধকার উদ্ভাসিনী সুহাসিনী চকিতা কবিতা॥

আশ্রয়

শ্রীহাসিরাশি দেবী

১

পিতামহ ফটিক দাসের উইল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তি সমান আধা-আধি ভাগ হইয়া যেদিন বড় ভাই বৃন্দাবন এবং ছোট ভাই চরণের দিকে পড়িল, সেদিন সকলেই জানিল যে বৃন্দাবন আপনার অংশ সযত্নে রক্ষা করিলেও চরণ তাহা করিবে না, বরং উড়াইয়া দিতেই সে চেষ্টা করিবে বেশী।

হইলও প্রায় তাহাই।

বৃন্দাবনের স্ত্রী ক্ষ্যান্তকালীর গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা উঠিল, এবং তাহার বিধবা বোন্ নৃত্যকালীও দিদির এই সুখ-সৌভাগ্য দর্শন করিতে অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃন্দাবনের সন্তান-সন্ততির বালাই ছিল না। ক্ষ্যান্তর ঠাকুর-দুয়ারে মানত করা এবং তামার এবং রূপার মাদুলী সোনার হইয়া কণ্ঠ বাহু ও কোমরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিলেও তাহার ইপ্সিত ধন মিলাইতে পারে নাই, তবু এ বিষয়ে সন্ন্যাসী-ফকিরের উপদেশমত কবচ ধারণ, যাগযজ্ঞের জন্য খরচ করিতে 'পেছপা' না হইলেও সে অনাথ দুঃখীকে ভুলিয়াও এক পয়সা দিত না।

বৃন্দাবনও ছিল ঠিক ঐ প্রকৃতির, কিন্তু চরণের প্রকৃতি ছিল ঠিক তাহার বিপরীত।

ইচ্ছা করিয়াই সে বিবাহ করে নাই, কিন্তু লোকে তাহার এই ইচ্ছার জন্য অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিত। যাহা হোক,—বলিতে গেলে মোটের উপরে সে ছিল 'খরচে' এবং 'আমুদে' লোক, তাই সম্পত্তি ভাগ বখরা হইল এবং বাসস্থানও এক বাড়ীর মধ্যেই প্রাচীর তুলিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল।

বৃন্দাবনের এই সৌভাগ্যের জন্য তাহার বাড়ীতে আরম্ভ হইল স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, ও হরিনাম-কীর্ত্তন এবং চরণের গৃহে বসিল—বাঁয়া-তবলার চাঁটি ও বেহালার সুরের সহিত পুরা-দমে গানের মজলিস্।

অবশ্য সে মজলিস্ শুধু একা চরণই করিতে পারিত না যদি তাহার অন্য বন্ধুরা না আসিয়া জুটিত। তাহাদেরই কাহারও হাতে ছিল বেহালা, কেহ লইয়াছিল বাঁশের বাঁশী, কেহ বা বাঁয়া-তবলা।

বৃন্দাবনের বাড়ীর মঙ্গলাচরণের গম্ভীর মন্ত্রপাঠের শব্দ ছাড়াইয়া সে গানের সুর ও বাজনার শব্দ উঠিতে লাগিল; কার্য্যে ব্যস্ত নৃত্যকালীর কানে সে শব্দ পৌঁছাইতেই সে সভয়ে ক্ষ্যান্তর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

কর্ম্ম-নিরতা ক্ষ্যান্ত মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল —'কি লা?'

নৃত্য কহিল।

"মাতালের হল্লা শুনতে পাচ্ছ না?—"

ক্ষ্যান্ত উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; হাসি থামিলে বলিল।

"মাতাল কেন হ'তে যাবে? ওযে ও বাড়ীতে ছোট ঠাকুরের গানের মজলিস ব'সেছে, তাই অত শব্দ আসছে; পাশের ঘরে ব'সলে এত শোনা যেত না।"

নৃত্য বিস্ময়ে গালে হাত দিল,—

"ওমা, তাই নাকি?—"

ক্ষ্যান্ত আপনার মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া নৃত্য ডাকিল,—

"দিদি"—

ক্ষ্যান্ত উত্তর দিল।

"কেন?—"

নৃত্য বলিল।

"তোমার মুখেই তো শুনি যে তোমার দেওরের স্বভাব 'চরিত্তি'র ভাল নয়,—যেমন নাকি গুণ্ডার মত চেহারা, তেমনি কথায় কথায় ভাল মানুষকেও ঘা কতক দিয়ে জখম ক'রতে এমন কি খুন ক'রতেও 'পেছপা' হয় না। তবে বড় ঘরের মধ্যে যে জানালাটা মাঝখানের দেয়ালে রয়েছে সেটা ভেঙ্গে যদি কোনও দিন ও তোমাদের কেটে দিয়ে যায়!—"

ক্ষ্যান্ত হাসিতে গেল, কিন্তু পারিল না। মনে হইল নৃত্যর কথাটা তো অবহেলার জিনিষ নয়। ওই তো জানালা, উঁই ধরিয়া কর্ত্তার আমল হইতে নড়িতেছে,

হাতের ঘা একটু জোরে পড়িলেই যেন ভাঙ্গিয়া চুর হইয়া যাইবে ;—উহাকে দেওয়ালের সহিত আট্‌কাইয়া রাখা আর কতদিন চলিতে পারে !—

আর 'গুণ্ডা' প্রকৃতির ছোট ঠাকুরের ভয়ে সদর দরজায় খিল আটকাইলেও ঐ যে বড় ঘরের জানালাটা রহিয়াছে, উহারই একপার্শ্বে শয়ন করে সেই গুণ্ডাটা !

যদি সে জানালাটাকে ধরিয়া একবার নাড়া দেয়,—তাহা হইলেই তো জানালার দফা শেষ সঙ্গে সঙ্গে—

চিন্তাস্রোত দ্রুত গতিতে বহিয়া আসিয়া যে স্থানে থামিয়া গেল,—সেইদিকে মনশ্চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াই ক্ষান্ত অসম্ভব রকম চমকিয়া উঠিল।

নৃত্য কহিল—"চমকালে যে ?"—

অন্তরের সত্যটাকে গোপন করিয়া ক্ষান্ত বলিল—"কই না !—তবে তোর কথাটাই ভাবছিলাম নেত্য, যা ব'লেছিস্ তা সত্যিই ; আমার মনেও কয়দিন ধ'রে ঐ কথাটাই জাগছিল, কিন্তু মুখে ফোটেনি।"

একটু কি ভাবিয়া পুনরায় বলিল—"সত্যিই,—ও যা খুশী ক'রতে পারে নেত্য, বুঝলি ? ওর অসাধ্য কোনও কাজ নেই, এই গ্রামের যত বকাটে, বোম্বেটেরা ওর কথায় ওঠে বসে, ওর বাড়ীতে তো সমস্ত ক্ষণই তারা আড্ডা দেয়, সাধে দিনে 'রাত্তিরে' ঘরে কান পাতা দায় হ'য়ে ওঠে !"

দিদির কথাটাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অসীম শ্রদ্ধার সহিত নৃত্য অন্তরে গ্রহণ করিল। বলিল—"দাস মশায়কে তুমি কিন্তু জানালাটা ভাল করে সারিয়ে দিতে বলো দিদি, আমিও বলবো।"

ক্ষান্ত মাথা নাড়িয়া জানাইল আজই সে ও বিষয়ে বৃন্দাবনের সহিত যাহা হোক একটা হেস্ত নেস্ত করিয়া ফেলিবে। কারণ, শুভস্য শীঘ্রং।

২

চণ্ডীমণ্ডপে—প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত রামদাস গোঁসাই বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন—

'আমার নয়নভূষণ হরিদরশন
মুখের ভূষণ নাম।'

ভক্তিগদগদ চিত্তে ক্ষান্তকালী ভগিনী সহ আসিয়া গোঁসাইজীর পদ-ধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পরিধানে লাল চওড়াপাড় তসর, গলায় তিন ছড়া সোণার ভারী ভারী হার ; উপর হাতে চৌদ্দ ভরির তাগা, নীচের হাতের গোছ-ভরা চুড়ী।

সঙ্গে নিরাভরণা নৃত্যকালী।

তাহার অঙ্গ আভরণ এবং সজ্জাহীন হইলেও যৌবন জোয়ার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছিল, মুখে শান্ত হাসি, দৃষ্টিতে কিশোরীসুলভ চপলতা।

চণ্ডীমণ্ডপে গোঁসাইজীর কয়েকজন শিষ্য ছাড়া আর কেহ ছিল না, বৃন্দাবনও কোন কাজে বাহিরে গিয়াছিল।

কক্ষ ধূপ ও ফুলের সুগন্ধে ভরপুর। কক্ষের মধ্যস্থানে রাধাগোবিন্দের পট ফুলের স্তূপের উপরে রাখিয়া গোঁসাইজী কৃষ্ণ-প্রেমরসে উন্মত্ত চিত্তে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুদিত নেত্রে গাহিতেছিলেন—

নয়নভূষণ হরিদরশন
মুখের ভূষণ নাম,
তুমি কেন শাপ দিলে হে !—

ভগিনীদ্বয়ের প্রণামে গোঁসাই একবার নয়ন মেলিয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিল, দুই হাতে ক্ষান্তকালীর পার্শ্বস্থা নৃত্যর হাত দুইখানা ধরিয়া ফেলিয়া গদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

এতদিন পরে ফিরে এলি রাধারাণী !
যার নয়নভূষণ হরি দরশন
মুখের ভূষণ নাম—,
তুমি যারে শাপ দিলে হে—

ক্ষান্তকালী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,

"মুখপোড়া মিন্সে, হাত ছাড় বল্‌ছি হাত ছাড় ; তোর মুখে আগুন দেই, তোর ভক্তিতে আগুন ধরাই—"

শিষ্যেরা গুরুর কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কেহই উঠিল না, কিন্তু তখনই একটা বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল—

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বজ্র-মুষ্টিতে গোঁসাইজীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবা মাত্র তাঁহার পরমার্থিক জ্ঞান ছুটিয়া গেল,—আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আঁ—আঁ—আঁ—"

নৃত্যকালীর হাত ছাড়িয়া দিতেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে উদ্ধারকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল ;—দেখিল ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। কণ্ঠ ছাড়িয়া সে দুই হস্তে রামদাসের

বিপুল দেহখানাকে শূন্যে তুলিয়াছে, যেন এখনই পুতুলের মত ছুড়িয়া ফেলিবে।

শিষ্যমণ্ডলী "হাঁ হাঁ" করিয়া ছুটিয়া আসিল, কান্তকালীও রাগ ভুলিয়া ছুটিয়া গেল, "এবারকার মত ওকে রেহাই দাও ছোট ঠাকুর, তোমার হাতে ধরছি, লক্ষ্মীটি—"

সে ধীরে ধীরে রামদাসকে নামাইয়া দিয়া ভগিনীদ্বয়ের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টিতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল অবহেলা ও ঘৃণা। একটু নীরবে থাকিয়া বলিল—"তোমারও জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে বড় বৌ, নইলে এমন সময়ে কখনও আসতে না; যাক,—যা হবার তা হয়েছে, এবার ভেতরে যাও, এদের দূর করে তবে আমি যাব।"

আর দাঁড়াইল না, অচেতনবৎ নৃত্যর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বেলাশেষে যখন বাড়ী ফিরিয়া বৃন্দাবন স্ত্রীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, পাছে এই কথা গ্রামের আর কেহ শুনিতে পায় ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সেই কক্ষেরই পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া চরণ ভাবিতেছিল যাহাকে লইয়া এক মুহূর্ত্তে আজ এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, সে কে? তাহাকে তো সে আর কোনও দিন দেখে নাই।

সেদিন সমস্ত ক্ষণ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতে লাগিল নৃত্যর নয়নের সেই ভীত অসহায় দৃষ্টি ও সেই রক্তশূন্য মুখখানা।

পরদিন প্রভাতে সে দেখিল কান্তকালী আসিয়া তাহার রুদ্ধদুয়ারে করাঘাত করিতেছে। দুয়ার খুলিয়া চরণ প্রশ্ন করিল—"কি বড় বৌ?"

কান্ত বহুদিন পরে চরণের সহিত কথা কহিল। বলিল—"আজ থেকে এবাড়ীতে রান্না হ'বে না, ওখানেই খাবে, বুঝলে?"

চরণের তরফ হইতে তখনই কোন উত্তর আসিল না; ইচ্ছা হইল প্রশ্ন করে, "এতদিন পরে আজ আবার এ খেয়াল কেন হঠাৎ হ'ল বড় বৌ?" কিন্তু মনে হইলেও মুখে সে একথা বলিল না,—হাসিয়া জানাইল—"আচ্ছা"—

কান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আঁচলের চাবীর গোছা বাজাইয়া চলিয়া গেল।

ঈশ্বর যাহা করেন, হয়তো তাহা ভালর জন্যই, তাই রামদাস গোঁসাই কীর্ত্তন গাহিতে আসিয়া এবাড়ীর অনেকটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া গেল। খরচের দিক দিয়া এবিষয় মনঃপূত না হইলেও গৃহিণীর ইচ্ছায় বৃন্দাবনকেও ইহাই মানিয়া লইতে হইল। গৃহিণীর ইচ্ছা এই হিসাবে বলবতী হইল যে ছোট ঠাকুর তখন ছিল বলিয়াই তো রক্ষা, তাহা না হইলে—!

বাকী কথাটা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ছোট ঠাকুরের উপরে এই হিসাবে আত্মীয়তার টান অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল কিন্তু কান্তর ঐ টানেরই অন্তরালে যে আর একখানি হৃদয় সেই ছোট ঠাকুরের প্রতিই অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল তাহার খবর শুধু কান্তকালীই নহে, সেই ছোট ঠাকুরও পাইল না

চরণ এবাড়ীতে আসে, খাওয়া দাওয়া শেষে আবার চলিয়া যায়।

এমনি, প্রতিদিনকার আসা যাওয়ার মধ্য দিয়া নৃত্য তাহার যে পরিচয় টুকু পাইল, তাহার সহিত দিদির বর্ণিত সেই 'গুণ্ডা'র কোনও সাদৃশ্যই সে দেখিতে পাইল না। সাধারণ মানুষ যে প্রকৃতির হয়, চরণের প্রকৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধিও সেই গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ অসীম নহে। তবে, তাহার সহিত বৃন্দাবনের প্রভেদ শুধু এইটুকুই যে মায়া, দয়া, বা লজ্জা বলিয়া যে জিনিস তাহার নাই, তাহা চরণের আছে এবং সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই।

এ সংসারের সব কাজ করিয়া দেওরের ঘরবাড়ী গুছাইতে বা ঝাঁটা দিতে সব দিন কান্ত'র সময় হইয়া উঠে না,—তাই যখন চরণ বাড়ী থাকে না তখন সে সমস্ত কাজগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত করিয়া দিয়া আসে নৃত্য।

সেইটুকু অবসরে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যায় চরণের বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা।

শয্যা মলিন,—দুর্গন্ধে ভরপুর। মেঝের উপর প্রতিদিন হাটু পর্য্যন্ত ধূলা সহ অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি, দেয়াশলাইয়ের কাঠি এবং ছেঁড়া কাগজের টুকরা পড়িয়া থাকে—কাপড়ের

আল্না হইতে আর দেরাজ আলমারী পর্য্যন্ত প্রতিদিন আপনাদের যত্নের হীনতা প্রতিপন্ন করিতেই যেন অসহায় দৃষ্টিতে নৃত্যর আশায় চাহিয়া তাহারা ছড়াইয়া থাকে। সে ছাড়া তাহাদের যত্ন করিবার মানুষ যেন কেহ নাই।

সেদিন যখন আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও চরণ ভাত খাইতে আসিল না, অথচ সে যে আজ সকাল সকাল পাড়ায় তাস দাবার আড্ডা ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়াছে সে কথাও এবাড়ীর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না, তখন ক্ষান্ত একটু বিস্মিত হইল। বৃন্দাবন কুড়ি টাকা মাহিনায় গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করে, সে সকালেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া চলিয়া গিয়াছে; ক্ষান্তও সেই থালায় বসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহার উদরও পূর্ণ; শুধু বাড়ীর মধ্যে একজন উপবাসী ছিল, সে নৃত্য।

তাহার নাকি ক্ষুধা মান্দ্য হইয়াছে।

ক্ষান্ত বলিল — "বেলা গেল বরং এক মুঠো ভাত মুখে দিয়ে অখন, নইলে আবার পিত্তি প'ড়বে।"

নৃত্য জানাইল—"আচ্ছা।"

কিন্তু সেই বেলাও প্রায় যায় যায়; রান্নাঘরের এক-পাশে চরণের ভাত ঢাকা রহিয়াছে, নৃত্যও খায় নাই।

একটা 'টানা ঘুম' দিয়া উঠিয়া ক্ষান্ত নৃত্য'র শুষ্ক মুখের দিকে চাহিল। প্রশ্ন করিল—"কিছু খেয়েছিস!"

নৃত্য জানাইল—"না"।

বিস্ময়ে ক্ষান্ত গালে হাত দিল, "ওমা, বলিস কি লা বেলা গেছে, এখনও খাস নি! না, অসুখ না ক'রে আর তুই ছাড়বিনে নেত্য, তোকে নিয়ে আমি মলুম।"

নৃত্য সে কথার জবাব দিল না, শুধু একবার করুণ দৃষ্টিতে রান্নাঘরে অপর পার্শ্বস্থ ঢাকা-দেওয়া ভাতের দিকে চাহিল। হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ক্ষান্তর মনে পড়িয়া গেল চরণ এখনও ভাত খায় নাই; মুখ তুলিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, "ছোটকর্ত্তা আজ আর খেতে আসবে না নেত্য, বুঝলি? সাপের বাচ্চার চোখ ফুটলেই ছোবল দেয় জানিস তো? ও তেমনি। ভাত বেড়ে যে অবধি দোরপানে চেয়ে ব'সে আছি, 'সে খেয়াল তো ছোট কর্ত্তার নেই! সে নিশ্চয় এতক্ষণ কোথাও থেকে খেয়ে এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমার একথা বিশ্বাস না করিস্, বড় ঘরের জানালা খুলে দেখ্‌গে যা, যে দিদি যা বলেছে তা সত্যি কিনা।"

নৃত্যর ইচ্ছা হইল, সে বলে—"সত্যি হলেও হ'তে পারে, কারণ দুনিয়ায় না হবার মত কিছুই নাই; কিন্তু তুমিও তো মানুষ, একবার গিয়ে তাকে খাবার জন্যে ডাকলেই বা কি ক্ষতি হ'তো?"

কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে একটা কথাও বলিল না, নীরবে উঠিয়া গেল!

বড় ঘরের জানালা ক্ষান্তর দিক হইতে বরাবর বন্ধ থাকে; আজ সেই জানালার খিল নিঃশব্দে খুলিয়া নৃত্য দেখিল দুই হাতে কপালের দুই পাশ টিপিয়া ধরিয়া চরণ খাটের উপরে বসিয়া আছে; তাহার মুখ চোখ লাল, গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়ান।

জানালা খুলিবার শব্দে হঠাৎ সে এই দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই নৃত্য তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

কোনও দিন এমন করিয়া সে চরণের সম্মুখে অনাবৃত মুখে দাঁড়ায় নাই, আজ 'সামনা-সামনি' দেখা হইয়া যাইবার কথা মনে পড়িতেই সে একবার শিহরিয়া উঠিল, তাহার পরে ধীরে ধীরে দেওয়ালগাত্রবিলম্বিত আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই তাহার মূর্ত্তি! উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মধ্য দিয়া এ কোন কমনীয়তা সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়াছে!

চোখের কোলে ও কিসের ছায়া! গোলাপী ঠোঁটের উপরে কি জন্য হাসি ভাসিয়া উঠিয়াছে? কই, একদিনও তো সে আপনার এ মূর্ত্তি দেখে নাই, দেখিবার ইচ্ছাও জাগে নাই, তবে? —

পশ্চাৎ হইতে ক্ষান্ত বলিল—"ওখানে অমন কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন লা নেত্য? কি আছে ওখানে?"

চমকিয়া নৃত্য ফিরিল, কম্পিতস্বরে উত্তর দিল—"কিছু নয়।"

ক্ষান্ত বলিল—"কিছু নয় তো 'বেরম্বো কাঠের' মত দাঁড়িয়ে কি ক'রছিস? যা বল'লাম, তা দেখেছিলি?"

অস্পষ্টস্বরে নেত্য কি উত্তর দিল ভাল বোঝা গেল না।

ক্ষান্ত কহিল—"কি বল্লি?"—

মুখ ঘুরাইয়া ভারী স্বরে নৃত্য জবাব দিল—"আমার দেখবার কি দায় প'ড়েছে, শুনি! তোমার দেওর কুটুম,

তুমি দেখবে কে খেলে কে না খেলে। আমার দেখবার কি এত দায় প'ড়ে গেল,—তুমি দেখগে।"

একটা দমকা হাওয়ার মত সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষান্ত তাহার হঠাৎ এই ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

ক্ষান্ত বলিল—"আর এমন ক'রে দিন কাটালে তো চ'লবে না ছোট ঠাকুর! ঘর সংসার হাতে তুলে নিতে হবে যে!"

চরণ কহিল—"সে তো অনেক দিন আগে থেকেই নিয়েছি বড় বৌ, আজ ব'লেতো নয়।"

ক্ষান্তকালীর মুখখানা কাল হইয়া উঠিল,—কিন্তু সে ভাব সে মুখের উপরে স্থায়ী হইতে দিল না, ঠোঁটের উপরে হাসির রেখা ভাসাইয়া বলিল—"সে নেওয়ার কথা তো হচ্ছে না,—বিয়ে করতে হবে বুঝলে?—"

"বিয়ে?"—চরণ চমকিয়া উঠিল।

ক্ষান্ত বলিল—"চমকালে যে?—"

চরণ উত্তর দিল—"বিয়ের কথায় চমকাইনি বড় বৌ, সে ধারণা তোমার ভুল! আমি"—কি একটা কথা বলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল।

বুঝিতে বাকী রহিল না যে ক্ষান্তর আজিকার এই কথা উত্থাপনের মূলে রহিয়াছে আর একজন, কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে, নহিলে আজ এক ্ক্ষান্তর মুখ দিয়া বাহির হইত না। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে—"ব'লতে পার বড় বৌ—আজ তোমায় এ অনুরোধ ক'রতে কে পাঠালে? কিন্তু যেই পাঠাক,—হাজার বার চেষ্টা করলেও তোমার মনের ধারা বদলাতে সে পারবে না। তাই ব'লছি শুধু শুধু এই আত্মীয়তার বন্ধনে পুনরায় বাঁধবার কি দরকার ছিল?—তার চেয়ে সেই পুরাতন ব্যবস্থাই সকলের চেয়ে ভাল ছিল। যার উপমা কেউ দিতে পারতো না।"—

ক্ষান্ত প্রশ্ন করিল—"চুপ ক'রে রইলে যে?"

একটু হাসিয়া—শান্ত স্বরে চরণ বলিল—"বেশতো,—বিয়ের চেষ্টা ক'র না বড় বৌ, সে তো খুব চমৎকার কথা। বিয়ে ক'রতে আমার অমত নেই, তবে মনের মত পাত্রী হ'লে যে তবে বিয়ে ক'রবো, তাও তোমায় এই ব'লে রাখছি,—নইলে নয়।"

ক্ষান্ত হাসিয়া কহিল—"কেমন মেয়ে চাই, তাই একবার ব'লে ফেলনা শুনি, তবে তো চেষ্টা দেখব!"

তেমনি হাসি মুখেই চরণ জবাব দিল—"কুঁচবরণ কন্যের মেঘবরণ চুল! বুঝলে তো?"

"নাঃ,—তোমার সঙ্গে কথায় আমি আর পেরে উঠিনে বাপু, আর কুঁচবরণ কন্যের মেঘবরণ চুল খুঁজতে পৃথিবী বেড়াতেও আমার শক্তি নেই; সুতরাং তুমি কখনও তোমার সেই কুঁচবরণ কন্যের মেঘবরণ চুলের স্বপ্নে ঘুমিয়ে থাক।"

ক্ষান্ত নীরব হইতেই দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী নৃত্য ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। দূরের জানালায় ভাসিয়া উঠিল একখানা মুখ।

সে দৃষ্টিতে চপলতা ছিল না, মুখেও হাসি নাই।

চরণের দৃষ্টি হঠাৎ সেইদিকে পড়িতেই চরণ মুখ ফিরাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিল বিরক্তির একটা অস্পষ্ট ছায়া।

সে আর কোনও কথা বলিল না,—উঠিয়া গেল।

কথায় কথায় একদিন নৃত্য ক্ষান্তকে বলিল—"আর যে এক জায়গায় থাকতে ভাল লাগছে না দি'দি, তার চেয়ে দু'দিন বরং চল,—একটা কোনও তীর্থ ঘুরে আসি। বেড়ানও হবে, তীর্থদর্শনও হবে।"

ক্ষান্ত বলিল—"তীর্থ করতে? সে যেতে তো খরচ বড় কম নয় নেত্য, সে এক 'পেল্লয়' খরচ। কে ঘাড়ে নেবে বলতো, তোর দাস মশায়? তা হ'লেই হ'য়েছে।"

নৈরাশ্যপূর্ণস্বরে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া ক্ষান্ত চুপ করিয়া গেল। নৃত্য ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিল, তাহার পরে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, খরচের জন্যে না হয় আমার ঐ তাবিজ জোড়াই নাও দিদি, তবুও চল। সত্যিই, আর এক জায়গায় থাকতে ভাল লাগছে না।

ক্ষান্ত বলিল—"সেও কি হয়!—"

নৃত্য উত্তর দিল না, নীরবে বসিয়া যেন কি ভাবিতে লাগিল।

সাত বৎসর বয়সে নৃত্যের বিবাহ হইয়াছিল তাহার পিত্রালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে। বেশ অবস্থাপূর্ণ ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল,—কিন্তু পাত্রকে দেখিয়া নহে। তাই, ষাট বৎসরের বৃদ্ধ স্বামী, যেদিন নৃত্যকে ফেলিয়া পরপারের পথে যাত্রা করিল সেদিন—নৃত্যের এই অদৃষ্টের জন্য দোষী করিবার মত কাহাকেও সে খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু যাহার অদৃষ্ট খারাপ, তাহার অদৃষ্ট কেহ হাজার চেষ্টা করিয়াও ভাল করিতে পারে না,—হয়তো সেই জন্যই তাহার সপত্নী-পুত্রেরাও পিতার বিষয়ের এক পয়সাও বিমাতাকে দেয় নাই ;—কয়েকখানা সোণা রূপোর গহনা ও তোরঙ্গভরা দেশী-বিলাতী রং-বেরংয়ের শাড়ী লইয়া নৃত্য সেদিন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তাহার পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, পিতা মাতাও বিধবা কন্যার ভার নামাইয়া রাখিয়া চির বিদায় লইয়াছেন ;—কিন্তু নৃত্যের সপত্নী পুত্রেরা আর তাহার খোঁজখবর লয় নাই।

বৎসর কয়েক পিতার ভিটায় বাস করিয়া নৃত্য যখন তাই ক্ষান্তর নিকটে চলিয়া আসিল তখন ক্ষান্তর ভগিনী-স্নেহ বহুদিন পরে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।—কহিল—

"আর তোকে আমি ছাড়ব না নেত্য, ম্যালেরিয়ার দেশে বাস ক'রে সেই চেহারাখানা আজ তোর কেমন হ'য়েছে তাই একবার আয়না ধ'রে দেখ্‌তো! ওদেশে কি আর মানুষ বাস করে? আমি আর জীবন থাক্‌তে তোকে ওখানে পাঠাব না নেত্য।"

নৃত্য বলিল—"কিন্তু, বাড়ী ঘর—"

পিতা সমস্ত বিষয় নৃত্য'র নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

ক্ষান্ত অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল—"সে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা তোর দাস মশায় ক'রে দেবেন, ওঁকে আজ সে কথা বলব এখন।"

তাহার পরের পর দিন বৃন্দাবন শ্বশুরের ভিটা শ'খানেক টাকায় বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু সে টাকা নৃত্য'র তোরঙ্গে উঠিল না, উঠিল বৃন্দাবনের লোহার সিন্দুকে।

৫

তীর্থে যাওয়া হইল না।

ক্ষান্ত বলিল—"এখন থাক্ নেত্য, এখনও তো তোর 'তীর্থ-ধর্ম্ম' কর্‌বার সময় ফুরিয়ে যায়নি! তোর দাস মশায় বল্‌ছিলেন যে আস্‌ছে মাঘ মাসে তোকে ওই যে ওঁর নামে ......ওই তীর্থ করিয়ে আন্‌বেন। তার পরে কাশী 'পেরাগ'—"

কিন্তু সেই মাঘেই একটা বিপদ ঘটিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রাও বন্ধ হইয়া গেল।

বিপদকে আসিবার জন্য আহ্বান করিতে হয় না, তবুও বিপদ আসে। এক্ষেত্রেও হইল তাহাই।

বৃন্দাবন বলিল—"তাইতো—"

নথ ঘুরাইয়া ক্ষান্ত কহিল—"উড়ো আপদ! বলে,—'থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে', কাল হ'ল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে', বেশ ছিলাম, সম্পর্কের বালাই ছিল না ; এদিকে ভাইয়ের টান উথ্‌লে পড়লো। এখন সাম্‌লাবে কে? ঐ অসুখে কে সেবা করবে শুনি? আমি পারব না। আমিও তো মানুষ, সংসারের এই ভূতের খাটুনী খেটে—তার পরে আবার......আমি পারব না, কখ্‌খনো পারব না।"

বৃন্দাবন বলিল—"টান উথলে উঠেছিল আমার না তোমার বড়বৌ? মিথ্যা ব'লো না, সত্যিই বলতো, ফের ওকে কে এ বাড়ীতে আনালে?"

ক্ষান্ত বিরস মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বারান্দায় দণ্ডায়মানা নৃত্য'র ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কথাগুলি কানে যাইতেই সে একবার শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল একখানি যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখ।

সে মুখখানা পীড়িত চরণের।

কয়েকদিন হইতে সে যে জ্বরে পড়িয়াছিল, সে জ্বরে তাহার জ্ঞান প্রায় ছিল না। আজ তাহাকে একবাটি দুধ বার্লী দিয়া আসিয়াই ক্ষান্ত সভয়ে যে কথাটা প্রকাশ করিল, তাহাতে কেহই নিশ্চিন্ত রহিতে পারিল না, সকলের মনের মধ্যেই একটা না একটা চিন্তার স্রোত বহিয়া চলিল।

ক্ষান্ত বলিল—"শুধু জ্বর নয় গো, শুধু জ্বর নয় ; সমস্ত গায়ে 'মায়ের দয়া' হ'য়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনও আৎকাইয়া উঠিল!

তাহার পরে বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, পীড়িত চরণের দিক দিয়াও কেহ ঘেঁসে নাই।......

বড় ঘরের জানালার ওপাশ হইতে কাতরতাপূর্ণ একটা অস্ফুট স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, ক্ষান্ত'র গায়ে একটা ঠেলা দিয়া নৃত্য বলিল—"শুনচো দিদি? ঐ যে—"

বাকী কথাটা তাহার মুখেই আটকাইয়া গেল, বারুদের স্তূপের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষান্ত উত্তর দিল, "শুনে কি ক'রবো, আমার কি কোনও হাত আছে? আমি কিছু ক'রতে পারব'না বাপু, ওর কাছেও আমি ঘেঁসব' না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, যে ম'রবে সে ম'রবে আমি তার ভোগ ঘাড়ে নিতে যাব' কেন?—"

নৃত্য'র মুখখানা মলিন হইয়া গেল; একটা দীর্ঘশ্বাস কষ্টে চাপিয়া নিয়া বলিল—"কিন্তু, দেখবার তো একটি লোকও নেই দিদি! না দেখা শোনায় একটা মানুষ ঘরে থেকে ম'রে যাবে?"

সঙ্গে সঙ্গে সে একটা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পূর্ব্ববৎ বিরক্ত স্বরে ক্ষান্ত বলিল, "তা ব'লে আমিই বা কি করবো বল? বাঁচা আর না বাঁচা বিধাতার ইচ্ছা আর ওর বরাত। আমি তা ব'লে যেতে পারব না, আর উঁর যে কাজ, সে তো সব্বাই জানে, এক তিল সময় নেই যে ভাইকে দেখতে যান।"

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল -"ঐ রুগীর শুশ্রূষা কে ক'রবে শুনি--আর এত যে ওর বন্ধুবান্ধব—'হৃদের কুসুম' ছিল, তারা এখন সেবা করতে আসছে না কেন?—যারা, চব্বিশ ঘণ্টা গান বাজনার জ্বালায় বাড়ীর ত্রিসীমানায় কাউকে কান পাততে দিত না, তারা এখন কোথায় গেল?"

যাহাকে সাক্ষ্য রাখিয়া ক্ষান্ত এতগুলা কথা বলিয়া গেল, সে কিন্তু, একবার কোনও জবাব দিল না, নীরবে নত বদনে বসিয়া রহিল, কিন্তু বিধাতার বিধান বিপরীত, তাই চরণের ভাই ও ভাই-বৌ থাকিতে তাহার সেবার ভার লইতে হইল নৃত্যকে।

অনুরোধের স্বরে বৃন্দাবন বলিল, "আমার তো সময় নেই, আর তোমার দিদির শরীরও তো দেখছো নেত্য,—এবার আমার এ যাত্রা রক্ষা কর ভাই, নইলে—"

বাকী কথাটা সে শেষ না করিয়া কাতর দৃষ্টিতে অদূরোপবিষ্টা নৃত্য'র নত মুখের প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিল।

কিন্তু নৃত্য মুখ তুলিল না কোন জবাবও দিল না।

তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষান্ত কাতর স্বরে বলিল।—

"কথা রাখ্, নেত্য, এবার আমাদের দয়া ক'রে উদ্ধার কর্ ভাই, লক্ষ্মী দিদি আমার! দেখ্ নেত্য, আমি তোর বড় বোন, একটা কথা আমার রাখবিনে!" ক্ষান্ত নৃত্য'র হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চাহিল।

মুখ তুলিয়া কম্পিত স্বরে নৃত্য জবাব দিল— "আচ্ছা।"

সেইদিন বেলাশেষে জ্বরে প্রায় অচেতন চরণের শিয়রে বসিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে নৃত্য যখন আপনার অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিতেছিল, তখন সহসা রক্ত চক্ষু মেলিয়া চরণ ডাকিল, "বড় বৌ—"

পাখা সমানে নড়িতে লাগিল, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

চরণ উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, প্রশ্ন করিল, "কে তুমি?"

নৃত্য উত্তর দিতে পারিল না, ললাটের উপরে ঘোমটা আরও একটু টানিয়া দিল।

উত্তর না পাইয়া চরণ কি বুঝিল কে জানে; ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "মুখে একটু জল ঢেলে দিতে পারবে?—"

পাখা রাখিয়া নৃত্য নীরবে উঠিয়া গেল, এবং ক্ষণ পরে একটা পরিষ্কার গ্লাসে জল আনিয়া যখন ধীরে ধীরে চরণের মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল, তখন যে তাহার হাতখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত শক্তি বা সামর্থ্য চরণের ছিল না; সে জলপান শেষ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল, নৃত্যও তাহার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিল।

৬

চরণ সারিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিদিনকার এমনি সেবা শুশ্রূষার মধ্য দিয়া তাহার মনের অন্ধকার কোণে জাগিয়া উঠিল একটা ক্ষীণ হর্ষালোক ;—

দাবী? দাবী করিবার মত তাহার যে কিছু নাই তাহা সে জানে, কিন্তু যে ভিক্ষা করিয়া জীবননির্ব্বাহ করে সেও একদিন তাহার সেই ভিক্ষার গৌরবকেই সকল গৌরবের উপরে স্থান দিয়া হাসে ; এ আনন্দও তেমনি, কিন্তু তবু…তবু…

আজ সে ভাল হইয়া উঠিলেই কাল হইতে নৃত্য হয়তো…হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আসিবে না—তাহা সে জানে ; তবু এই ক্ষণিকের আনন্দেই যেন সে ডুবিয়া থাকিতে চাহে।

মনে পড়ে এ আনন্দের পরে আবার সেই আলস্যময় জীবনযাত্রা, সমস্ত মন তিক্ততায় ভরিয়া উঠে।

কিন্তু আহারের সময় দুধ সাগুর বাটি হস্তে অবগুণ্ঠনাবৃত নৃত্যকে দেখিয়াই সে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—"ও দুধ সাগু দিনরাত আমি আর গিলতে পারছিনে, নিয়ে যাও।"

নৃত্যের তরফ হইতে কোনও উত্তর আসিল না, সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চরণ কহিল—"দাঁড়িয়ে রইলে যে? যা বল্লুম তাই করবে কিনা?"

মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে জবাব আসিল—"না।"

"না?"—বিস্মিত চরণ নৃত্যর কথাটই পুনরাবৃত্তি করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু নৃত্যর অবগুণ্ঠন ঠেলিয়া চরণের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পর্যন্ত পৌঁছাইল না। ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া চরণ সহসা অপ্রস্তুতের মত প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"তোমারই নাম বুঝি নৃত্য?"

হাসির একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল ; মাথা নাড়িয়া নৃত্য জানাইল—"হাঁ"।

চরণ মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিল।

আবার কিছুক্ষণ নীরব।

নৃত্য নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার এক হাতে দুধ সাগুপূর্ণ বাটি, অপর হাতের একখানা ছোট রেকাবীতে খানকয়েক ফলের টুক্‌রা।

বেলা বোধ হয় দশটা কি সাড়ে দশটা ; ওবাড়ী হইতে বৃন্দাবনের ডাক শোনা গেল—"ভাত দাও গো, আজ ইস্কুলের বেলা হ'য়ে গেল যে—"

ক্ষান্ত কি উত্তর দিল ভাল বোঝা গেল না, শুধু অস্পষ্ট একটা শব্দ বড় ঘরের ওপাশ হইতে শোনা গেল।

নৃত্য চমকিয়া জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মনে হইল কে যেন এই মাত্র জানালার ওপাশ হইতে সরিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া তিক্তস্বরে চরণ বলিল—"কতক্ষণ আর কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? রেখে যাও,—পরে খাচ্ছি।"

নৃত্য বাটি নামাইল না, কোন উত্তরও দিল না, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

চরণ কহিল—"শুনতে পাচ্ছ না?"

আবার হাসির একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল ; মাথা নাড়িয়া নৃত্য জানাইল সে সমস্তই শুনিতে পাইতেছে, বধির নহে।

দুই হাতের কনুইয়ের উপরে ভর দিয়া চরণ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। বিরক্তমুখে হাত পাতিয়া কহিল—"তবে দাও।"

নৃত্য দুধ-সাগুর বাটি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া ও ফলের ডিস্ তাহার শয্যাপরে নামাইয়া রাখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল, এবং চরণের খাওয়ার শেষে তাহার উচ্ছিষ্ট পাত্র তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

…একটা বড় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চরণও পুনরায় শুইয়া পড়িল।

এবাড়ীর বাসি 'পাট ঝাঁট' সারিয়া ও চরণকে খাওয়াইয়া নৃত্য যখন দিদির বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল তখন সূর্য্য প্রায় মাথার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া নৃত্য বিস্মিত হইল ; দেখিল, অন্যদিনের মত বৃন্দাবন আজ আর স্কুলে যায় নাই ; খাটের উপরে বিষণ্ণ মুখে বৃন্দাবন এবং কক্ষতলে ক্ষান্ত নীরবে বসিয়া আছে, কক্ষ শব্দহীন। দুই জনের মুখই আষাঢ়ের মেঘের মত ভার।

নৃত্য ডাকিল "দিদি"—

বারুদের স্তূপের মত এক মূহুর্তে ক্ষান্ত যেন ফাটিয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর ও মুখ দেখাসনে নেত্য, আর আমি তোর ও মুখ দেখতে চাইনে। যেমন ভাল ভেবে এনেছিলাম, তেমনি আমার তুই খুব সাজা দিয়েছিস, এখন ভালয় ভালয় আমার বাড়ী ছেড়ে দূর হ'য়ে যা, তোর ও কালা মুখ আমি আর দেখতে চাইনে;—যে মেয়ে নিজের স্বভাবচরিত্রও ঠিক রাখতে পারে না…"

নৃত্য'র সম্মুখের আলোয়-ভরা সমস্ত জিনিয়া এক মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল,—আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি ব'ল্লে দিদি… ?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, রুদ্র মূর্ত্তিতে ক্ষান্ত যে কি বলিয়া গেল তাহা নৃত্য শুনিতে পাইল না, সে নিষ্পলক নেত্রে ক্ষান্তর আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া আড়ষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

পরদিন সকালে নৃত্যকে আর দেখা গেল না। পীড়া শয্যায় শুইয়া উৎসুক চরণ কেবলই সারা সকাল ধরিয়া মিথ্যা কাহার পদধ্বনি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

অপমানিতা বিতাড়িতা হতভাগিনী তখন হয়তো পথে পথে আশ্রয় খুঁজিয়া ক্লান্ত হইতেছিল।

বৈশাখী ঝড়ের রাতি

সুফী মোতাহার হোসেন

বৈশাখী ঝড়ের রাতি, গুরু গুরু গভীর গর্জ্জনে
মেঘ-দৈত্য দলে দলে অন্ধকারে উঠিছে উল্লাসি'।
আর্ত্ত বায়ু হু হু রবে বাজাইছে ভাঙ্গনের বাঁশী।
বিসর্পি বিজুলী-রেখা মহাকাশ ফাঁড়িছে সঘনে।

তুমি আজ আস যদি, অন্ধকারে চকিতে গোপনে
ঝড়ের কপোতী সম সহসা দাঁড়াও হেথা আসি',—
অশ্বে মোর তুলি' নিয়া পায়ে পায়ে বিদ্যুৎ বিকাশি,
বৈশাখী ঝড়ের বেগে ছুটে যাব উপেক্ষি' মরণে।

মনে হবে, আমি কোন্ মরুচারী দস্যু বেদুঈন্—
অশ্ব-'জিনে' ঝন ঝন্, অশ্ব-খুরে ধূলির প্রলয়—
বাদ্‌শাজাদীরে লুটি' উল্কাসম চলেছি ছুটিয়া।
অবাক বিস্ময় মানি' এ জগত রহিবে চাহিয়া—
মনে হবে, আমি রুদ্র মহাকাল নিঠুর নির্দ্দয়,
রূপকুমারীরে হরি' ছুটিতেছি চিররাত্রিদিন।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মাথায় দারুণ ব্যথা ও অল্প জ্বর লইয়া ব্রজকিশোর গৃহ-প্রবেশ করিলেন; সদর মহলের শয়নকক্ষেই তাঁহাকে হাত পা এলাইয়া পড়িতে হইল, অন্দর মহল পর্য্যন্ত যাইবার ক্ষমতা ও বাসনা দুইয়েরই টানাটানি পড়িয়াছিল। যুধিষ্ঠির সবে মাত্র ভিজা গামছা দিয়া প্রভুর মুখ হাত পা মুছাইয়া বাতাস করিতে বড় পাখাটা তুলিয়াছে এমন সময়ে চারুবালা ও তৎপশ্চাৎ শ্যাম সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; চারুবালা একবার মাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মনের সন্দেহ দূরীভূত করিলেন। স্বামীর শুষ্ক কাতর মুখে, চোখের কোলে কালিমার মধ্যে, চাতুরী বা ভাণ থাকিতে পারে না; মমতা ও দুঃখ আসিয়া সন্দেহের স্থান অধিকার করিল। এই সময় শ্যাম তাঁহার চোখে পড়াতে তিনি মনের কথা মনে চাপিয়া বিরক্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দ্র সরকার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এইবার তিনিও ভিতরে আসিলেন। ব্রজকিশোর নয়ন মুদিত করিয়া শুইয়া থাকিলেও এই সব আগমন প্রস্থান লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং ব্যক্তিগুলির সঠিক পরিচয়ও অনুমান করিয়াছিলেন। চারুবালা অক্ষয়কে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "যখন আমি না থাকব তখন তুমি সর্ব্বদা ওঁর কাছে কাছে থাকবে; চোখের আড়াল কর্ব্বে না; কার মনে কি আছে বলা যায় না।" অক্ষয় আসিয়া ঘরের মধ্যে একপাশে চুপ করিয়া বসিল, কিন্তু এমন ভাবে যেন তাহার চোখ কান এড়াইয়া কেহই কর্ত্তার সহিত কোন আলাপ করিতে না পারে। ঘরের মধ্যে নানা নীরব শক্তিসংঘাতে একটা অতীন্দ্রিয় সাড়া জাগ্রত। ব্রজকিশোরকে নয়ন উন্মীলিত করিতে হইল,—ও কে? শ্যাম; নিশ্চয়ই শ্যাম; একেবারে নন্দের চেহারা। তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; অন্ধকারে ছবির মত ফুটিয়া উঠিল, কৈশোরের একটি প্রায় নিত্য ঘটনা; বাড়ীতে তাঁহার কোন দৌরাত্ম্য ধরা পড়িলেই, পিতা প্রশ্ন করিতেন, "হ্যাঁরে ব্রজ, এ নন্দার কর্ম্ম বুঝি?" অপরাধী প্রতিবাদ করিত না আর নিরপরাধ নির্ব্বাক নন্দ মার খাইয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিত। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ আর নন্দ ছিল শ্যামবর্ণ, তিনি পিতৃস্নেহের পূর্ণধারায় সিঞ্চিত ও পরিপুষ্ট আর মাতার ছুঁচিবাইয়ের উচ্চ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া যেটুকু স্নেহ তির্য্যক গতিতে আসিতে পারে তাহাই ছিল নন্দের অবলম্বন। নন্দের উপর সেই পুরাতন অন্যায় আজ তাঁহার মনের নিবিড় অনুতাপকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে শ্যামকে দেখাইয়া দিতেছে—প্রায়শ্চিত্ত কর, কৃতাপরাধের ঐ অবলম্বন। মনটা গলিয়া গিয়াছে; সম্প্রতি নিজের পক্ষ হইতে যে উপেক্ষা, অবিচার তাহা যে কত হৃদয়হীন, সেই পুরাতন মুখের স্মৃতি তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, প্রাণের ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিতেছে।

নন্দের কণ্ঠস্বর কানে গেল; কিন্তু এত দরদ নন্দের মধ্যেও কখনও ছিল না। ব্রজকিশোর শুনিলেন শ্যাম জিজ্ঞাসা করিতেছে, "জেঠামশাই, আপনার কষ্ট খুব বেশী হচ্ছে কি?" তাহার পর ললাটে স্নিগ্ধ পরশ, আবার "গা বেশ গরম হয়েছে যে! ইন্দ্রকাকা আপনাদের কবিরাজ মশাইকে ডেকে পাঠান।"—মায়ের জ্বালা-জুড়ান হাত, পরশের মধ্যে সেই আশ্বাস-বাণী। হাত বুলান মন্দ লাগিতেছে না; বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার রোগশয্যায় নিদ্রিত ব্রজকিশোর অকস্মাৎ নিদ্রা-ভঙ্গে এই রকমই এক জোড়া হাতের সন্তর্পণ-পরশ অনুভব করিয়াছিলেন,—এই হাত দুইটীর চেয়ে ছোট কিন্তু এমনই সেবা-উদ্যত প্রাণ। ললিত তখন অজাতশ্মশ্রু বালক, চক্ষু মেলিতেই ধড়্‌মড়্‌ করিয়া কক্ষত্যাগ করিয়াছিল। আজ সেই কথা মনে পড়াতে অন্তরচক্ষুর মধ্যে একটা বেদনা-সংযোগের সৃষ্টি হইল, উদ্গত অশ্রু কষ্টে সংবরণ করিয়া বলিলেন, "রোগের কষ্ট ততটা নয় যতটা তোমাদের জন্য। নন্দ চলে গেল—কি ভাবলে আমাকে? যদি তাই হতুম তাহ'লে কষ্ট হত না। কেবল সে ভুল বুঝে গেছে নিশ্চয়, আর আমারই দোষে।

এ কষ্ট রাখবার আমার এখন আর জায়গা নেই। তারপর সেই তুচ্ছ টাকার কথা, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে কিন্তু যাই হোক আর না, আমি কাল পরশুর মধ্যে টাকাটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব—সে বেঁচে থাকতে তোমরা কেউ একবার যদি আসতে—আমার এ আপশোষের দরকার আজ থাকত না—স্বপ্নেও ভাবিনি আমার ভাই এমন বিপদে পড়তে পারে—মনে কথাটা মোটেই লাগেনি—নন্দ মনের দুঃখ নিয়ে চলে গেছে—নিশ্চয় ভেবেছে দাদা কি পাষণ্ড।—তুমি মনে দুঃখ কর না বাবা, এখন যেটুকু করা হাতে আছে তাতে আর দেরী হবে না।" ব্রজকিশোর অসুখের উত্তেজনায় এতখানি কথার সত্য মিথ্যার মধ্যে নিজের অন্তরটিকে বাহিরে চালিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের পাখা আরও চলিতে লাগিল। ইন্দ্র সরকার একবার অক্ষয়কে, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন, অক্ষয়কে কিন্তু সে চাপা গলার কথা শুনিতে পায় নাই এইরূপ ভাণ করিয়া ধ্যানমগ্নভাবে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকেই উঠিতে হইল, কিন্তু তিনি অবিলম্বেই আসিয়া স্বস্থানে আবার বসিলেন। অক্ষয়ের উপর রাগটা বন্ধ থাকিয়া অধিক জ্বালাময় হইয়াছে। শ্যাম ব্রজকিশোরকে বলিল, "এখন ওসব কথা নিয়ে ভাববেন না, যা করতে হয় আমাদের বলবেন, আপনার আদেশ পেলে আমরা করে নিতে পারি কিন্তু আগে সুস্থ হ'ন—তারপর হবে।" ব্রজকিশোর সহানুভূতির আঘাতে বিচলিত হইলেন—এতটা উত্তেজিত শ্যাম তাঁহাকে তিরস্কার করিলেও হইতেন কি না সন্দেহ; প্রায় উঠিয়া বসিয়াই তিনি বলিলেন, "নাঃ আর তা কচ্ছি না; হবে এখন করেই এই জ্বালা সৃষ্টি করেছি—তার যথেষ্ট হয়েছে, এখন অসুখ কি? যদি মরতে মরতেও এই টাকাটার ব্যবস্থা করি, তবে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।" কথাটার মধ্যে একটা দমকা রাগ, দূর আকাশের বিদ্যুতের মত এক ঝলক কান্না। কাহার উপর রাগ? শ্যামের উপর না নিজের দুর্ব্বলতার উপর? বিলাপ কাহার জন্য, মৃত ভ্রাতার জন্য না নিজের জড়াপটি খাওয়া গ্লানিময় অতীতের জন্য? ব্রজকিশোর অবশ্য তাহার উত্তরদানে অক্ষম।—কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর তিনি দৃঢ় স্পষ্টভাবে এই সময় দিতে পারিতেন; তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির অন্তরালে কি প্রতারণা চাতুরী ছিল? ইহার উত্তরে ব্রজকিশোরের কণ্ঠ দেহ মন সমস্বরে বলিতে পারিত, "না"। তবে—এইখানেই মানবজীবনের একটা রহস্য, নানা অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চনায় আমাদের ব্যক্তিগত জীবন জটিল সমস্যার আকর; প্রহেলিকাময়; কিন্তু তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ নিশ্চয় আছে—মানুষকে যে তারে বাজাইবে সেই তারে বাজিবে।—তবে প্রত্যেকে বাজিবে নিজের মত; দুইটী যন্ত্রের আওয়াজ কখন আর এক, সম্পূর্ণ এক হইয়াছে? তারপর আবার চড়া নরম বাঁধা তারের পার্থক্য ত' আছেই।—

কর্ম্মবিমুখ, চিরজীবন কর্মে অনভ্যস্ত ব্যক্তি ওজন না করিয়া ঝটিতি মুক্তহস্ত হইয়া পড়ে। ব্রজকিশোরের এই অকস্মাৎ প্রতিশ্রুতি সেই ধরণের।—জটিলতার দৈন্য নাই—আবার নূতন জটিলতাকে জীবনে এক কথায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তিনি নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন; নিজের কথা কি উপায়ে বজায় রাখা যায় তাহার উদ্ভাবনে তৎকালীন ক্ষীণ বুদ্ধি শক্তিকে নিয়োজিত করিবার হতাশ চেষ্টায় তিনি নির্ব্বাক। মনোভাব সমবেত এতগুলির নিকট ধরা পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে তিনি চক্ষু বুঁজিয়া শুইয়া আছেন. এমন সময় ওস্তাদজী ব্যস্তভাবে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। —কবিরাজ মন্তব্য দিলেন. সামান্য জ্বর, শরীরের উপর নানা পুরাতন ও নূতন অত্যাচারপ্রসূত; পথশ্রমে অনিয়মে প্রকোপ এখন একটু বাড়িয়াছে; ব্যবস্থা চিরপুরাতন চিরাবখ্যাত বটিকা, তৈল ও অনুপানাদি; অনন্তর সশব্দে নস্য গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় শাস্ত্রীয় চিকিৎসা-সমাদর সম্বন্ধে কৌতূহলনিবৃত্তির চেষ্টা করিয়া অবশেষে কবিরাজ বিদায় নিলেন। ব্রজকিশোর ওস্তাদজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিশ্রজী ভাল আছেন ত'? আপনার কথাই ঠিক, কলকাতার জল আমার মোটে সহ্য হয় না—এ যাত্রা ভোগান্তি আছে—তারপর সামনে ঝঞ্ঝাট কত! তাও সামলাতে হবে কত! কাছারী হাকিম, টাকার শ্রাদ্ধ,—সবার বেশী নন্দর দেনাটা ফেলে রাখা অসহ্য!—আগে আমারই যাওয়া উচিত ছিল—তা নয় ছোট সেই আগে গেল, এমনই সংসার।" ব্রজকিশোর এইরূপ কথার ছাঁদে যেন কতকটা তৃপ্তি পাইতেছেন। আর একটা কথা; ইন্দ্র সরকার যে অতিকষ্টে তাঁহার বক্তব্য দমন করিয়া আছেন, বক্তব্যটিও

যে কি তাহা অনুভব করিয়া অনেকটা চাপা দিবার একটা দুর্বল চেষ্টা এই সব বক্তৃতার মূলে আছে। ওস্তাদজীরও যে একটা বক্তব্য আছে এবং তাহার সম্বন্ধেও একটা মনে মনে ধারণা ব্রজকিশোর করিয়াছেন। ওস্তাদজীর সহিত কথা-প্রসঙ্গে সকল স্বার্থই সিদ্ধ হইতেছে—এমন কি প্রতিশ্রুতি-রক্ষার দুশ্চিন্তাও একেবারে গ্রাস করিতে পারিতেছে না:—ওস্তাদজী গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন, তাঁহার আশ্বাসদানের চেষ্টা যেন কতকটা অন্যমনা, "বাবুজী, সংসারকা গতি এই আপ-শোষ মিথ্যা আছে। আর শরীর রাধানাধবজীর কৃপায় দু' দিনে সুস্থ হয়ে যাবে। ঝঞ্ঝাট কাজ শ্যামবাবু আছে—আপকা খোকা যে উনিও সেই—আর সরকার বুঢ়া কেবল নামে আর বয়সে বুঢ়া, কাজে পুরা জোয়ান আছে, আপনার মুখ থেকে হুকুম, বাকী সব ওদের ভার—আপনি খুসী থাকুন, ওই ওদের ঢের।"

এই সকল কথা আলোচনা লইয়া ব্রজকিশোর তখন একটা লঘু বাদানুবাদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট। শ্যামের মনেও এখন একটা ক্ষীণ বিপরীত স্রোত আসিয়াছে; কোথায় যেন একটা অন্যায়, একটা মিথ্যা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহার মন ধরি ধরি করিয়াও তাহা ধরিতে পারিতেছে না—প্রথম দর্শনে অসুখের গুরুত্ব যতটা মনে হইয়াছিল এখন ততটা মনেও হইতেছে না; সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ইন্দ্র সরকার অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। অধৈর্য্য হইবার অন্য কারণ ছিল; অক্ষয়ের উপস্থিতিজনিত বিরক্তি যেন সকলের উপরই ছড়াইয়া পড়িতে চায়। শ্যামের প্রতি আন্তরিক পক্ষপাতিত্ব অক্ষয়রূপ উপদ্রবসৃষ্টির জন্য অভিমান ও শ্যামের সহায়তার জন্য উদ্‌গ্রীব চিত্ত একটু পরিস্ফুট হইয়া তাঁহার এই সকল অনর্থক প্রসঙ্গে বাধা-দেওয়া কথায় ধরা পড়িল, "ছোট কর্ত্তার দরুণ টাকাটা তাহলে কাল ভেতরের তহবিল থেকে বার করে দেবেন; আমি শ্যামবাবুর কাছে থেকে সব বুঝে, লিখে নিইছি; কোথায় কি পাঠাতে হবে; একটু সকাল সকাল বেরোতে পারলে ভাল হয়, অতগুলো টাকা আর একটু গোলমেলে কাজও বটে—আমি নিজেই সহরে গিয়ে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে আসব। এখানে কাজ সামলাবার লোক আছে, আমার এখন গেলে ক্ষতি নেই তেমন।" ব্রজকিশোর জলিয়া উঠিলেন, শ্যাম কক্ষে ছিল না, জ্বালা এখন অপ্রতিভ নহে; বলিলেন, "বন্দোবস্ত যখন তোমাকে কর্ত্তে বলা হবে তখন করবে—আমার দেখি যমের বাড়ী না গেলে আর নিস্তার নেই; তোমাদেরও তর সইছে না; বলি, নিঃশ্বাস ফেলার সময়টা কি তোমাদের কাছে বিক্রী করে রেখেছি আমি? কালই পাঠাতে হবে তার মানে কি? তোমার হুকুম?" ইন্দ্র—"আজ্ঞে আপনি বললেন কাল পরশু পাঠাবেন; কিন্তু পরশু অমাবস্যা তাই আমি কালকের কথা বলছিলাম—তা সকাল সকাল বেরোনো অসুবিধা থাকে, দেরীতেই বেরোবো, পথের অসুবিধা ভেবেই আমি সকাল সকাল বলেছি; আপনার যখন ইচ্ছে, সেই সময় যাত্রা করব এখন, তাতে কি?" ব্রজ, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি কালই যাত্রা কর; তোমাকে রওনা করে তবে আমি জলগ্রহণ ক'র্ব্ব—যদি এ বাড়ীর ওপর রাত্রে বজ্রাঘাত হয় তাহলেও তোমাকে বলব না; ইন্দ্র, আজকের দিনটা থেকে যাও। বাবা খেয়ে ফেলবে সব আমাকে।" ব্রজকিশোর এই বলিয়া পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিলেন। ইন্দ্র সরকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার পাত্র নহেন, আর যখনই ব্রজ-কিশোর কোনও অনর্থ সৃষ্টি করিয়া উপায়ন্তরবিহীন অনুভব করেন তখনই বিশ্বস্ত ইন্দ্র সরকারকে এইরূপ ভাষাতেই চার্জ্জ বুঝাইয়া থাকেন অতএব ইন্দ্র সরকার ইহার মধ্যে অবাস্তব কিছু লক্ষ্য করিলেন না, তিনি দাঁড়াইয়া এইটুকু বলিলেন, "তবে এখন আসি, সকালেই এবিষয়ে অন্য কোন পরামর্শ থাকে, শ্যামবাবু থেকে করা যাবে; সহরে অন্য কোনও ব্যাত থাকে তার আদেশও সেই সময় করবেন। এখন আপনি ক্লান্ত, আমাদের দেখলে আরও বিরক্ত হবেন। যাত্রার অন্য উদ্যোগ আমি রাত্রেই সব ঠিক করে রাখব।" নমস্কারের মাত্রা বেশ দীর্ঘ করিয়া ওস্তাদজীর দিকে একটু উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনন্দসূচক সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। টাকা যে একেবারে নাই, কলিকাতা হইতেও আনা হয় নাই এ সন্দেহ তাঁহার ছিল না। ওস্তাদজী যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ঝমেলা বড়া!"

নীরব ঘরের মাঝে মাঝে কেবল ব্রজকিশোরের অস্বস্তি ও অসুস্থতানিবন্ধন ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গভীর, লঘু দীর্ঘশ্বাস ও

তালপাখা নাড়ার অবিরাম জনান্তিক সুর। আজিকার যুদ্ধাবসানে দুই পক্ষই রাত্রির মত স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত—কেবল একটা ছোট খাট খণ্ড যুদ্ধের যেন শেষ আর হইতে চাহে না। ওস্তাদজী যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল তাহা আসিয়াছে, কেবল অক্ষয় যেন মরিয়া হইয়া বসিয়া আছে; দৃষ্টি, ইঙ্গিত, শিষ্টতা-সীমান্তর্গত দুই একটি তদার্থক কথা, ওস্তাদজী উপর্যুপরি প্রয়োগে দেখিলেন অক্ষয় ভ্রূক্ষেপহীন, ওস্তাদজী পশ্চিম দেশীয়, হঠিবার পাত্র নহেন—তিনি ব্রজকিশোরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাবুজী মেরা কোই আর্জ্জি হ্যায় আপ্ মেহেরবাণী কর্ বিচ্ছু কো হটাইয়ে।" ব্রজকিশোর তখন বিরক্ত ভাবে অক্ষয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "অক্ষয় তুমি আর কাউকে ডেকে দাও গিয়ে, বাতাস কর্ব্বে—যুধিষ্ঠির একটু জিবিয়ে নিক্; আর দেখ; শ্যাম তোমাদের সমবয়সী, খোকা এখানে নেই; ওর সব সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য করা তোমার কাজ, খাওয়াদাওয়ার সময়ও একটু কাছে বসবে টসবে, এখন নূতন এসেছে ওর লজ্জা টজ্জা করতে পারে, যাও. এসবও কাজের সঙ্গে শিখতে হবে, সেরেস্তার মধ্যে কাজের চেয়ে এও কম নয়, যাও।" অগত্যা অক্ষয়কে উঠিতেই হইল, মনে মনে কাহার মুণ্ডপাত করিয়া গেল তাহা সেও জানিল। যুধিষ্ঠির প্রভুরই সাড়া পাইয়া বাহিরে গেল। আবার কে কখন আসিয়া পড়িবে ওস্তাদজী একেবারে সোজা কথা পাড়িলেন, "বাবুজী, আমি বিদায় নিতে এসেছি—অনেক দিন দেশ না দেখি, কাল দেশ রওনা হব।" বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া উঠিল; ওস্তাদজী কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; ব্রজকিশোরও এইখানেই বক্তব্য শেষ হয় নাই বিলক্ষণ জানিয়া চুপ,—আর বলিবার কিছু আবশ্যক থাকিলেও তিনি পারিতেন কি না সন্দেহ, মুখে একটা উদ্যত সাংঘাতিক আঘাতকে অসহায় লোকের নিশ্চেষ্ট অপেক্ষার ভাব; ওস্তাদজী আবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "বাবুজী, আমি আপনার ভাল চাই, মুস্কিল আসানের জন্যে চেষ্টা নহি করি, আর চক্ষুর সামনে আপনার অনিষ্ট হবে, সে আমার বর্দাস্ত হবে না আপনার ভালা জেনে বুঝে নাহি পারলাম, যখন করতে কোন তকলিফ্ নেহি তখন হামার এখানে থাকা মিছে।" ব্রজকিশোর নিরুত্তর; ওস্তাদজী যেন তাহাতে একটু উৎসাহ পাইল।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ওরে পসারিণী ঘরে ফিরে আয়
ফাগুন জেগেছে বনের ঘন পাতায়।
দিনের আলোকপাতে
বাহিরিলি কার সাথে,
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে শাল-বীথিকায়।

একেলা চলিলি পথে লো সাহসিকা
কেমনে লুকাবি রূপ-অনল-শিখা
পতঙ্গ সাধ করে'
আপনি দহিয়া মরে
দাহন দ্বিগুণ জলে দখিনা হাওয়ায়।

পত্র ও উত্তর

শ্রীযুক্ত 'উপাসনা' সম্পাদক সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

গত কয়েকমাস ধরিয়া 'উপাসনা'য় শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য-পরিমিতি' মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছি এবং অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যতীন বাবুর নিজের definition অনুসারে ধরিলেও তাঁহার 'কাব্য-পরিমিতি' একটি পরিপূর্ণ রসোত্তীর্ণ কাব্য। বাংলা ভাষায় এরূপ নিবিড় কাব্য-রসানুভূতি দেখিবার সৌভাগ্য খুব অল্পই হইয়াছে।

বৈশাখের সংখ্যায় কিন্তু একটি স্থানে তাঁহার কবিচিত্তের সহিত আমার পাঠকচিত্তের সংযোগপথ একটু ব্যাহত হইয়াছে, circleটি complete হয় নাই বা short circuit হইয়া গিয়াছে। তাহাও কেবল একটি জায়গায়—যেখানে তিনি ৺সত্যেন দত্তের 'এসো তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে' কবিতাটির আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন,—'কবিচিত্ত কল্পনার অভিনয় করিলেও বাসনাসমুখের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। বর্ষার দু'টি প্রাণীর দোল খাইবার সাধারণ ভাবস্মৃতি হইতে ইহার উদ্ভব এবং সেই স্থানেই ইহার শেষ। সেই বাসনাও আবার এলোমেলো কল্পনার ভেজালে একেবারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।'

—কথাটি কি ঠিক? আমি যতীন বাবুকে আর একবার কবিতাটি সযত্নে পড়িতে অনুরোধ করি। কবিতাটির নাম 'বর্ষা-নিমন্ত্রণ'। আমার মনে হয় উহা কেবল মাত্র দোল খাইবার কবিতা নয়। বর্ষার ঝুলন ঝুলাইয়া প্রেয়সীকে দোল খাইবার নিমন্ত্রণটি উহার বাহ্য প্রকাশ বা ছুতা বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ষাসঞ্জাত নিবিড়তম রতিরস বা মধুর রস উহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। সাহিত্যে এরূপ ভাণ ত বিরল নয়।

গীত-গোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণটি ধরুন। উহা কি কেবলমাত্র বর্ষাকালের একটি ভাবসমুখ বর্ণনা? অন্তর্নিহিত আর কি কিছুই নাই? অন্যের কথা বলিতে পারিনা। কিন্তু আমি যখনই পড়ি—মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্ বনভুবঃশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ—তখনি বর্ষার পরিপূর্ণ রসাপ্লুত মূর্ত্তিটি আমার চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠে—চিত্ত বর্ষানারীর মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়া রস আহরণ করিতে থাকে। 'বর্ষা নিমন্ত্রণ' সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। আমি উহার 'ঝুলন ঝুলানো' 'কেলিকদম' নিতল রসে'র আড়ালে নিগূঢ় অতি সূক্ষ্ম রতিরসেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছি। নানা ভাবে নানা কল্পনার সাহায্যে ঐ রসটিই পরিপুষ্ট হইয়াছে।

যতীন বাবু 'বর্ষা-নিমন্ত্রণ' সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাকি? ইতি—

বিনীত—

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের 'বর্ষা-নিমন্ত্রণ' শীর্ষক কবিতাটির যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সশ্রদ্ধ চিত্তে পাঠ করিলাম। ঐ কবিতাটি পুনরায় একাধিকবার পড়িয়া বুঝিলাম যে উহার কাব্যরস সম্বন্ধে আমার মত যাহাই হউক না, 'বাসনাসমুখ কাব্যের' উদাহরণ হিসাবে ঐটি উদ্ধৃত করা আমার ঠিক হয় নাই। 'কাব্য-পরিমিতি'র সিদ্ধান্ত অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া যখন দৃষ্টান্ত অধ্যায়ে হাত দিই তখনই আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে আমার নিজের পাঠকচিত্তের দুর্ব্বলতা বা একদেশদর্শিতার ফলে আমার ক্রিটিক্‌চিত্তের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্যই আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ও মৃত কবিদের (রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন) কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। দৃষ্টান্ত না দিলেও সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না; অথচ অপরাপর রসিকচিত্তের সহিত মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা এখানেই বেশী। দৃষ্টান্তের দোষে সিদ্ধান্তেও সন্দেহ আসিতে পারে। কারণ সূত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম সে নিজেই যদি অপরিস্ফুট হয় তাহা দোষের হইবে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থে বাসনাসমুখ কাব্যের নিঃসন্দেহ উদাহরণ প্রচুর আছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি মধুর ছন্দ, চতুর অলঙ্কার ও সবল রীতির আশ্রয়ে বাঁচিয়া আছে। সেইগুলির মধ্য

হইতে এমন একটি কবিতা উদ্ধৃত করা আমার উচিত ছিল যাহার সম্বন্ধে 'কল্পনার ভেজালে'র কথা উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

শরদিন্দু বাবুর রসবোধ আমার উক্ত আলোচনাটীতে আঘাত পাইয়াছে ইহা নিশ্চয়। বর্ষা-নিমন্ত্রণ কবিতাটির কোন বিশ্লেষণ না করিয়াই আমি রায় দিয়াছিলাম ইহাও আমার দ্বিতীয় ত্রুটী। ভাবিয়াছিলাম হয়ত মতদ্বৈধ হইবে না। কিন্তু শরদিন্দু বাবু বলিতেছেন, "উহা কেবলমাত্র দোল খাইবার কবিতা নয়। বর্ষার ঝুলন ঝুলাইয়া প্রেয়সীকে দোল খাইবার নিমন্ত্রণটি উহার বাহ্য প্রকাশ বা ছুতা বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ষাসঞ্জাত নিবিড়তম রতি রস বা মধুর রস উহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। সাহিত্যে এরূপ ভাণ ত বিরল নয়।"

কাব্যবিচারের ভাষায় বলিতে গেলে শরদিন্দু বাবুর মতে এই কবিতাটির ব্যঞ্জনা গভীর এবং রসোত্তীর্ণ। এই ব্যঞ্জনাটি ধরিতে না পারিলে কাব্যপাঠ সফল নহে।

কিন্তু কাব্য-পরিমিতির আদর্শবিচারে উহা যে রসোত্তীর্ণ নহে এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হইলে যে মাধুর্য্য ও সামঞ্জস্য কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে এ কবিতায় তাহার অভাব। "উলাবে"-অন্তক মিলের শপথই রসোত্তীর্ণচিত্ততার ধর্ম্ম নহে, পরিকল্পনাতেই কবিচিত্তের এই লুব্ধতা সামঞ্জস্যের অভাব সূচিত করে; অথচ কবিপ্রতিভা একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে তাহার শপথ রক্ষা করিতে পারে নাই। 'অন্তরে আজ রসের ধারা রঙিন গুলাবে' এই পংক্তিতে হুঁচট খাইয়া "এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে" এই ধাপে আসিয়া তাহার পতন হইয়াছে। উঠিবার সময় সে যখন আবার 'উলাবে'র খাতিরে বলিয়া উঠিল "কিসের ছলে নয়ন-জলে নয়ন ভুলাবে" তখন প্রেয়সীর যে মূর্ত্তি আমাদের চোখে এতক্ষণ ভাসিতেছিল তাহাকে তাড়াতাড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতন মূর্ত্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। দ্বিতীয় মূর্ত্তি ফুটিবার পূর্ব্বেই কবিতা শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত রসোত্তীর্ণ কাব্যের লক্ষণ এ সব নহে।

এ কবিতা কল্পনাসমুথ কিনা বিচার করা চলিতে পারে। কল্পনার খেলা যে আছে তাহা আমার চোখ এড়ায় নাই; আমি তাহাকে কল্পনার অভিনয় ও ভেজাল বলিয়াছি। শরদিন্দু বাবুর পাঠকচিত্ত—'ঝুলন-ঝুলানো', 'কেলি কদম', 'নিতল রসে'র আড়ালে নিগূঢ়, অতিসূক্ষ্ম রতিরসেরই আভাস পায়। আমি এবং আমার পরিচিত অনেকগুলি রসিকচিত্ত তাহা পায় নাই। এই জন্যই কাব্য-পরিমিতিতে কাব্যের বিচারে পাঠকচিত্তের স্থান এত বেশী দিতে হইয়াছে। এইখানে 'বাসনা'র কথা আসিয়া পড়ে এবং প্রশ্ন উঠে কাব্য হইতেই আমরা ঐ রস পাইতেছি, না কবিপাঠকচিত্তের মিশ্র বাসনা 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া কাব্যকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া নিজের রস নিজে উপভোগ করিতেছে! এ ক্ষেত্রে কি হইয়াছে বলা কঠিন ও অসমীচিন; কিন্তু এমন যে হয় তাহা সকলেই জানি ধরুন—গীত-গোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণটি—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈঃ।

এই সামান্য শ্লোকাংশ হইতে রসিক পাঠকচিত্ত যতখানি আনন্দ পায়, তাহা যে কবির দান নহে এ কথা গীত-গোবিন্দম্ পড়িলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে এমন একটি শ্লোকও কবি লিখিতে পারেন নাই এবং ইহার যে ব্যঞ্জনা আজ আমরা গ্রহণ করি তাহা কবির কল্পনাতে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। শুনা যায় গীতগোবিন্দে 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্' এই শ্লোকাংশটি প্রক্ষিপ্ত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমার মনে হয় প্রথম শ্লোকটিও হয় প্রক্ষিপ্ত নয় আকস্মিক। মেঘ, মেদুর, শ্যাম, তমাল, এই বিভাব ক'টির একত্র সমাবেশ যদি সচেতন কবিচিত্তের কার্য্য হইত তাহা হইলে 'নন্দনিদেশের সহিত ইহাকে জুড়িয়া না দিয়া ইহার স্থান অন্যত্র করা হইত। কিন্তু সকল রসিক চিত্তের বাসনাতেই মেঘ, মেদুর, শ্যাম ও তমাল, পূর্ব্ব হইতেই যে রসরাজ্যের সৃজন করিয়া রাখিয়াছে তাহারই প্রেরণায় এই শ্লোকাংশ পাঠমাত্র সেই চিত্ত রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। আর ক্রিটিক্ চিত্ত আবার রস হইতে ফিরিয়া আসিয়া অন্যপথে তাহার চক্র সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। বর্ষা নিমন্ত্রণে যে সূক্ষ্ম ও নিবিড়তম মধুর রস শরদিন্দু বাবু পাইয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার কবিজনোচিত বাসনা কি পরিমাণে দায়ী তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ।

শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে :

ইহা বর্ষার নিবিড় স্তব্ধ মিলনাকাঙ্ক্ষার উদ্বোধক বিভাব, সে হিসাবে ইহা প্রকৃতই চমৎকার। কিন্তু ইহার স্থান হইয়াছে 'এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে' ইহার পরেই। বর্ষা-দিনে ঘরের কোণে শায়িত প্রেয়সীকে বাহিরে ঝুলন ঝুলাইবার গতিসুখজাত রতিভাবের আনন্দ দিবার জন্যই এই আহ্বান। কিন্তু 'নিতল রসে বনের পাখী ঘনিয়ে বসে' ইহা স্তব্ধতার বিভাব, সুতরাং বিরুদ্ধ বিভাব। এ নজীরে বরং প্রিয়া বলিতে পারিত, 'আমি বাহিরে যাইব না, তুমিই ঘরে এস'।

প্রথম শ্লোকে প্রেয়সীকে কমল চোখে চাহিয়া কূজন ভুলাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহাতে ইঙ্গিত আসে বন কূজনপূর্ণই ছিল! কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকে পুনরায় বলা হইতেছে "কূজনভোলা কুঞ্জ।" ইহা এক রকমের ক্রমভঙ্গ দোষ, যাহা পাঠকচিত্তকে উন্মার্গগামী করিয়া তুলে।

যাহা হউক আমি শরদিন্দু বাবুর অনুরোধক্রমে এবং তাঁহার সঙ্কেতানুসারে কবিতাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে ওটিকে কোন ক্রমেই রসোত্তীর্ণ কাব্য বলা যায় না। কল্পনার খেলা ও দুই এক স্থানে ভাবের সুন্দর প্রকাশ ইহাতে আছে। ইহাকে মাত্র দোল খাইবার কবিতা বলা ঠিক নহে। দোলে ইহার আরম্ভ ও সমাপ্তি দেখিয়া আমি মধ্যের কল্পনাকে ভেজাল বলিয়াছিলাম। অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় কল্পনার দুই পার্শ্বে দোলটাই ভেজাল, এবং এ দৃষ্টিতে কবিতার মূল্য কিছু বাড়ে কারণ তাহাকে কল্পনাসমুখ বলা চলিতে পারে। কিন্তু ইহা দোল খাইবার বাসনাসম্ভূত তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। যদিও সে বাসনা কবিচিত্ত মাঝে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এ সম্পর্কে কাব্য-পরিমিতির সিদ্ধান্ত অধ্যায় হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না।

"ইহা ছাড়া ভাবলোক বাসনালোক ও কল্পনালোকের সীমান্ত হইতে চক্রের উদ্ভব হইতে পারে এবং সে সব ক্ষেত্রে চক্র 'মিশ্রচক্র'এ পরিণত হয়। এমন কাব্য আছে যাহার চক্র অংশতঃ ভাববিলাস ও অংশতঃ বাসনাবিলাস, অথবা অংশতঃ বাসনাবিলাস ও অংশতঃ কল্পনানন্দও হইতে পারে। এ সমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে কবিপ্রতিভা কত বিচিত্র এবং তাহার পূর্ণ পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ করা কত দুঃসাধ্য তাহা কল্পিত রেখাচিত্র হইতেই বেশ স্পষ্ট হইতেছে। ইহাও বলা সঙ্গত যে অধিকাংশ কাব্যই মিশ্রচক্রের উদ্ভব করে।"

বর্ষা-নিমন্ত্রণে যে চক্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ মিশ্রচক্র—অংশতঃ বাসনাবিলাস ও অংশতঃ কল্পনানন্দ। ইহা বাসনাসমুখের দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করা ঠিক হয় নাই। সত্যেন্দ্রনাথের অন্য কোন কবিতা উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিলে ভাল হইত। আমাকে এই পুনরালোচনার সুযোগ দিয়া শরদিন্দু বাবু আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
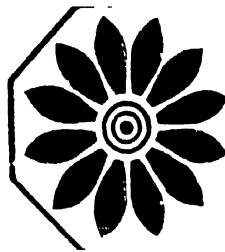
সাহিত্য-প্রসঙ্গ

*সাহিত্য ও জীবন

সাহিত্যকে জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার একটা চেষ্টা আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ও সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে চলিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এ সম্পর্কে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু বিদ্বজ্জন বহুতর গবেষণা করিয়াছেন—তাঁহাদের আলোচনার আদি ও অন্ত লিপিবদ্ধ করিবার মতো পাণ্ডিত্য আমাদের নাই। সাহিত্যের 'মাধুকরী'র মূল্যও আমরা বড়ো বেশী দিই না। নিজেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া পারিপার্শ্বিকের প্রতি তাহার ফল প্রয়োগ করিয়া যে দু' একটি সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তাহাই নীচে বিবৃত করিব।

—

সংস্কৃত সাহিত্যে 'কুম্ভিলক' বলিয়া একটি বাক্য পাওয়া যায়। ইংরাজীতে কুম্ভিলকের প্রতিশব্দ বোধ করি Plagiary হইবে। Plagiary কিম্বা কুম্ভিলক এক প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি। একজন এক কথা লিখিলেন, আমি সেই কথাটিকেই ঘুরাইয়া প্যাঁচাইয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া একটা কিছু খাড়া করিলাম, এ চৌর্য্যের বিষয়ভাগ এই। সাধু বাংলায় গ্রন্থ-তস্কর এবং শাদা বাংলায় ভাব-চোর বলিয়া দুইটি কথা পাওয়া যায়। এ দুটি কথা সম্পূর্ণ সমার্থক না হইলেও, অনেকখানি বটে। এই কুম্ভিলক-বিদ্যা, শ্লোকার্থ-চৌর্য্য-পটুতা সম্পূর্ণ অভিজাত।

—

ইংরাজী সাহিত্যিক অস্কার্ ওয়াইল্ড এই চৌর্য্যতত্ত্ব নিয়া আমাদিগকে একটি অভিনব তথ্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি গল্প আছে। গল্পটি শেক্‌শপীয়ারের সনেটের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা। যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন শেক্‌শপীয়ার যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই সনেটগুলি লিখিয়াছেন, তাহা নিয়া বহু রকম বিতর্ক বিচার আছে।—অস্কার ওয়াইল্ডের উক্ত গল্পের নায়কের স্কন্ধে এই বিতর্ক বিচার এমনই ভূত হইয়া চাপিয়া বসে যে সে নিজেকেই শেক্‌শপীয়ারের উদ্দিষ্ট প্রেমাস্পদ বলিয়া ভাবিয়া নিয়া তাহাই প্রমাণ করিতে নিজে আত্মহত্যা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে জন্মিয়া এক যুবক নিজেকে ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত সনেটাবলীর প্রেমাস্পদ ভাবিয়া নিয়া আত্মহত্যা করিল, ঘটনাটি পুরাপুরি প্রাহসনিক! কিন্তু এই প্রহসনকে কেন্দ্র করিয়াই কোথায় যেন দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়,—একটি কাঁটা কেবলই কোথায় বিঁধিতে থাকে—হয়তো বা ইহা একেবারে প্রহসন নয়, হয়তো বা সাহিত্যের প্রভাব মানুষের জীবনের উপর এমনই করিয়া চাপিয়া বসে। উপরে যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, অস্কার ওয়াইল্ড তাহার নাম দিয়াছেন, "Life as a plagiarist of Art." তাঁহার বক্তব্য তিনি এমন করিয়াই বলিয়াছেন যে, ব্যাপারটির মধ্যকার সত্যকে যাহারা নিতে চাহিবে, তাহারাই নিবে, অপরে ভাবিবে ব্যাপারটি দস্তুরমতো হাস্যকর, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—

এই তত্ত্বের হাসির আবরণ ভেদ করিয়া যে সত্যের আভাষ পাওয়া যায় তাহা হইতেছে এই,—আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে মালমশলা নিয়াই সাহিত্য কি শিল্পকলা গড়িয়া ওঠে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত—কিন্তু পক্ষান্তরে এই সাহিত্য কি শিল্পকলা হইতে আমাদের জীবন যে নিত্য মালমশলা নিয়া বেমালুম নিজের রঙ্‌ বদ্‌লাইয়া ফেলিতেছে, ইহার খবর কে রাখে?—

—

একটি উদাহরণ দিলে, বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইবে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস কেহ পড়িল; পড়িয়া আনন্দ পাইয়া বইখানিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিয়া তাহার সহজ জীবনযাত্রার পথে যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল, এমন ঘটনা হইতে পারে কি? যদি কাহারও হইয়া থাকে, হোক্—আপত্তি করি না। কিন্তু সাধারণতঃ দেখি যে একটি সতেরো আঠারো বছরের বাঙালীর ছেলে 'গোরা' পড়িল, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 'গোরা'র অত্যুগ্র স্বাদেশিকতার সহিত সে নিবিড় প্রেমে পড়িয়া গেল, এবং যদি সে অত্যধিক মাত্রার ভাবপ্রবণ হয়, তবে তখনই মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটিয়া,

মোটা ধুতিচাদর পরিয়া, মাথায় রক্তচন্দনের ফোঁটা এবং পায়ে কটকী জুতা দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল,—ইচ্ছা, সেখানে বৃদ্ধ ভৃত্যের মাথায় প্রভুর জন্য বাজার হইতে আনীত ঝুড়িভরা ফলাদিম কোনও ফিটন গাড়ীর কর্ত্তা ফেলিয়া দিলেই, সে তাহার পশ্চাতে ছুটিবে এবং তাহার পরে, পরে, পরে, 'গোরা' যেমনটি করিয়াছিল তেমনটি করিবেই। কিন্তু এতখানিই যদি সে না করে, অন্ততঃ সে যে কিছুকাল ধরিয়া 'গোরা'র স্বপ্নে অভিভূত থাকিবে,—ইহা নিশ্চয়ই। আর তাও যদি না হইবে, তবে সৎ-সাহিত্য পড়িবার কোনও অর্থ হয় কি?—ধরা-যায়না-ছোঁয়া যায়না এমন আনন্দের জন্য যদি কেহ সাহিত্য পড়েন, তিনি তেমন করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সৎ-সাহিত্য পড়িয়া আনন্দ অর্জ্জন করিয়া নিজের বৈঠকখানা হইতে আফিস এবং আফিস হইতে বৈঠকখানা নিত্য নিত্য আসা যাওয়া করিতে থাকুন—আমরা তাঁহাকে ঈর্ষা করি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের আনন্দ মাত্র অনুভূতি নয়, সেই বোধের প্রকাশও বটে। আর অনুভূতি হইলেই কাজকর্ম্মে তাহা ফুটিয়া উঠিবেই। সুন্দর বলিয়া ছোট ছেলেটিকে ভালো লাগিল, তাহাকে একটা চুমা খাইলাম। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ওখানে গিয়া আজ জানিয়াছি সে-ও আমাকে ভালবাসে—আনন্দে দিশাহারা হইয়া বাসায় ফিরিতেছি, পথে রোজকার রোজ কাণা ভিক্ষুকটি চীৎকার করিতেছে, পকেটে হাত দিয়া টাকা-আনা-পয়সা যাহা ছিল বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া দিলাম। অথচ রোজ ঐ পথেই আসি যাই, কতদিন ঐ ভিক্ষুকের কাতরোক্তি কাণে শুনিয়াছি,—শুনিয়াছি মাত্রই, আবার কোন দিন তাহার চাহিবার ভঙ্গীতে হয়তো বা রাগিয়াছি-ই—আর আজ? এমন করিয়াই আমার আনন্দ আমার দৈনন্দিন কাজে কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে। তাহা না হইলে আনন্দের আর কিছু অর্থ হয় বলিয়া মনে করি না।

'গোরা' পড়িয়া যে ছেলেটি আনন্দ উপভোগ করিল, কথঞ্চিৎ পরিমাণে সে অনুভূতি তাহার জীবনে ফুটিয়া উঠিবেই। ইহার জন্য 'গোরা' পড়িয়া যে 'গোরা' বনিয়া যায়, তাহাকে আমরা বড় জোর 'সেন্টিমেন্ট্যাল' বলিয়া কটাক্ষ করিতে পারি, তাহার সেন্টিমেন্ট্যালিটির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। আর সেন্টিমেন্ট্যালই বা তাহাকে বলিব কেন? St. Francois of Assisiর কিম্বা কবীর সাহেবের জীবনী পড়িয়া যদি কেহ সাধু হয়, Ford এর জীবনী পড়িয়া যদি কেহ ব্যবসায়ী হয়, Einestein এর জীবনী পড়িয়া যদি কেহ বৈজ্ঞানিক হয়, আর তাহাদিগকে বলি সেন্টিমেন্ট্যাল?—একদিকে কল্পনা, অন্যদিকে সত্য, কিন্তু কল্পনা যদি মহৎ হয় আর সত্যও যদি মহৎ হয় তবে এক মাহাত্ম্যে প্রভাবান্বিত হইব, অপর মাহাত্ম্যে হইব না, এমন পণ করি কি করিয়া? তাহা হয় না, হইতেও পারে না। আর শুধু মাহাত্ম্য বলিয়া নয়, যাহা কিছু বলবান, যাহা কিছুর মধ্যে নাড়া দিবার শক্তি আছে, তাহা নাড়া দিবেই—সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক! ঝটিকার ধর্ম্মই হইতেছে নাড়া দেওয়া, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা হাজার চেষ্টা কেন না করি, সে চেষ্টা আমাদের নিষ্ফল!

ঝটিকার এই ধর্ম্ম প্রতিভাবানের রচনায় পাই। সাহিত্য এই সংহত ঝটিকা। সাহিত্য পাঠ করিব এবং কেবল মাত্র তাহা হইতে মধু সংহরণ করিয়া "আনন্দ হইতেছে" বলিয়া কোকেন-খোবের মতো ঝিমাইব, সাহিত্য এমন সুলভ জিনিষ নয়। যাহা কিছুকে আমরা সাহিত্য বলি, তাহার সান্নিধ্যে আসিলেই আমাদের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত প্রবল ঝটিকায় সমুদ্রে জাহাজ যেমন নাড়া খায়, তেমনই একটি নাড়া পায়, ফলে পূর্ব্বে যাহাকে আলো মনে করিতাম, পরে তাহাকে অন্ধকার মনে করি, এবং পূর্ব্বে যেখানে গরল দেখিতাম, পরে সেখানে অমৃত দেখি। বহু বৎসরার্জ্জিত সংস্কার সত্যকার সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া অগাধ জলে ভাসিয়া যায়, তাই কবিকে বলা হয় **"unacknowledged legislator."**

প্রস্পেরোর মতো এই ঝটিকাকে খেলাইবার বাঁশীর সুর যাহার জানা আছে, যে ঝটিকার সৃজন করিয়া পরমুহূর্ত্তে বলিতে পারে—

"We are such stuff as dreams are made of and our little life is rounded with a sleep"—

সাহিত্যিক হইবার দাবী তাহারই—অপর কাহারও নয়।

—সাহিত্য আমাদের জীবনে ছেঁলেখেলার বস্তু হইয়া আসে না। শিল্প ও সাহিত্য হইতে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের পাঠ সংগ্রহ করি, রস ও রঙ্ নিয়া জীবনের প্রতিদিনকে রঙিন ও রসাল করিয়া তুলি, প্রতি মুহূর্ত্তকে আল্পনা দিয়া সাজাই, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে বলি,—

"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"

ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় আমাদের আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, আমাদের শিক্ষিত ও সভ্য জীবনের সহজ ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত কাব্য উপন্যাসের আলোছায়ার এমনই একটি স্বাভাবিক দেনা-পাওনা ক্রমাগত জোয়ারভাটার মত আসিতেছে যাইতেছে। আর সে আজ বলিয়া নয়, যেদিন হইতে সাহিত্য ও কলার সৃষ্টি হইয়াছে সেই আদিম কাল হইতেই এমন চলিয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি, ইটালির রমণীরা অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় শয্যাসম্মুখে প্রসিদ্ধ কোনও শিল্পীর সুন্দর মূর্ত্তিচিত্র ঝুলাইয়া রাখিত, সন্ধ্যা সকাল তাহাকে দেখিতে হইবে, যাহাতে সন্তান অমনই সুন্দর হয়। আমাদের শাস্ত্রেও এমন ব্যবস্থা আছে। অনাগত যে মানবশিশু, তাহাকেও শিল্প দিয়া এই যে গঠন-প্রচেষ্টা, এই বিধিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মানুষের জীবনে সাহিত্য শিল্পকলা এমনই ভাগ্যবিধাতা, অস্কার ওয়াইল্ডের ভাষায় আমাদের জীবন এমনই শিল্প চোর। এ তত্ত্ব জানিয়া শেক্‌শপীয়ার নাটক লিখিয়াছেন একথা কেহই বলিবেন না। কোনও তত্ত্ব জানিয়াই শেক্‌শপীয়ার নাটক লেখেন নাই, তাঁহার লিখিবার তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ তাহা হইতে নানা জনে নানা অর্থ বাহির করিতেছি। কিন্তু এমন অর্থ কেহ বাহির করিয়াছেন বলিয়া জানিনা যে শেক্‌শপীয়ার মানুষের সত্য শিব কিম্বা সুন্দর-বোধকে ক্ষুব্ধ করে। অথচ তাঁহার নাটক সুন্দর কিম্বা অসুন্দর বাছাই করিয়া লেখা নয়—একটি ক্যালিবান নয়, তিনি শতেক ক্যালিবানের সৃষ্টি করিয়াছেন; ম্যাকবেথ, ওথেলো, আয়াগো, হ্যামলেট, সবই তাঁহার বিকৃত চরিত্র কিন্তু এই বিকৃতির যে জন্য আমাদের অনুকম্পা তাহা কথনোই কি সত্য মাহাত্ম্যের জন্য যে মুগ্ধতা, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে? বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র হ্যামলেট—তাহার কোনও দোষ বাহির করা কঠিন, অথচ 'হ্যামলেট' পড়িয়া 'হ্যামলেট'এর আদর্শ আমাদিগকে পাইয়া বসে না—রহিয়া যায় তাহার জন্য বিপুল অনুকম্পা! তাহার ঐ 'To be or not to be' প্রশ্নের দুর্দ্দশাগ্রস্ত মনের বিকার Fortinbrasএর মত সামান্য চরিত্রের পার্শ্বেও বেসুরা লাগে।

আমাদের "আধুনিক" সাহিত্যের ভগীরথ-ভূমি রুশিয়ার কথাই বলি। ধরিলাম তুর্গেনেভ। তাঁহার Virgin Soilএর প্রথম পৃষ্ঠাতেই Nejdanovকে বলা হইয়াছে—"Hamlet of Russia." এই Nejdanovকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমস্ত আশাভরসা সব সমাপ্ত হয় বিপুল অনুকম্পায়, যেমন Marianaর হইয়াছিল। আর Solomin থাকে আদর্শ পৌরুষের প্রতীকস্বরূপ। প্রত্যেক খাঁটি শিল্পীর পরিচয় এইখানে যে তিনি অপূর্ণকে দিয়া পূর্ণের পরিচয় দেন,—ক্ষুদ্রকে দিয়া বৃহতের সাড়া জাগান; কুশ্রীতা দিয়া সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলেন। Tolstoi যেমন Resurrection এ করিয়াছেন। Maslovaর সর্ব্বনাশের যে কারণ, সেই আবার শৃঙ্খলিতা Maslovaর সহিত বিজন সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসন-যাত্রায় সঙ্গী হইয়া চলিতেছে। অপূর্ব্ব! এমনই করিয়া যুগে যুগে যাঁহারা সত্য সাহিত্যিক বোধ নিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন,—দুঃখ আছে, গ্লানি আছে, কুশ্রীতা আছে ঠিক, কিন্তু এ সমস্তকেও অতিক্রম করিয়া আছে শান্তি, পরম পুণ্য ও প্রাপ্তি এবং শ্রী ও সৌন্দর্য্য, স্বর্গ—এবং ইহাই হইতেছে আসল কথা।

আমাদের জাতীয় জীবনের এই মহা দুর্দ্দিনে জাতীয় সাহিত্য-রচনার দায়িত্ব যাঁহারা নিবেন, এই কথাটি তাঁহাদের সতত সজাগ হইয়া বুঝিতে হইবে।

মরুমায়া

শ্রীকিরণকুমার রায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাঙ্গালী স্বপ্ন দেখিয়াছে, তখনও তাহার ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য বিলাস-উৎসব-পূজা-দান সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় নাই। রূপ-কথার রাজকুমারী, হাতী-শালার হাতী, ঘোড়াশালার ঘোড়া তখনও তাহার কল্পনা-প্রজাপতির পাখাকে রঙীন করিতেছে—

—বিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষে বাঙালীর সে স্বপ্ন ভাঙিল। জাগিয়া সে দেখিল বিশ্বপৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, অতি কঠিন বাস্তবের সহিত তাহার একেবারে মুখোমুখী হইয়া গেল। স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়া গেল। সত্য আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবির কাব্য তাই স্বপ্নে টলমল—সে স্বপ্নে আঁখি মুদিয়া আসে, স্নায়ু আবিষ্ট হয়, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে ভুলাইয়া সে স্বপ্ন পাঠককে বিবশ করে।

—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সে-স্বপ্ন দেখিয়া দিনযাপন করিতে পারিলে হয়তো বাঁচিত। সে তা পারিল না।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবিও তাই স্বপ্ন দেখিয়া দিনাতিপাত করিতে পারিল না। করিবার চেষ্টার তার ত্রুটি নাই—। বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছে। দেখা হইতেই তাহার ক্ষেত-ভরা পাকা ধানে কি করিয়া 'কাল রাতে' মই পড়িয়া গেছে সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে মুখে আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বলা হইয়াছে,—সে কাহিনী শুনিয়া বন্ধুর হাই উঠিতেছে। কবি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

> বন্ধু দোহাই, ভুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্‌ভ—
> ক্ষমা করো সখা,—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।
> তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূরে দূরে—
> বাঁকানদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জলীর ডুরে।
> যেথায় আকাশে ভুলে' নেমে আসে মানস-মরাল শ্রেণী
> যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।

কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়—কবিতার শেষ কলিতে কবি সত্য কথা বলিয়া ফেলেন—

> চিরান্নহীন নগ্ন দিনে এসেছ আমার ঘরে,
> শুভখণে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি পরস্পরে,
> চরম প্রণাম করিব যখন,—বন্ধু মাথার কিরে—
> ফণান্বিত করে আশীষ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে।

যতীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি, যে কবি স্বপ্ন-রাজ্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, ধরণীর ধূলিকাদাকে নিয়া যাঁহার কারবার সুরু হইয়াছে—যতীন্দ্রনাথ কাব্য-রাজ্যের সেই স্ব-নির্ব্বাসিত কবি, তাই তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনার কবি!

কবি যতীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালী কবি, যিনি নব জাগ্রত বাঙালী চৈতন্যের একটি নূতন তার সরস্বতীর বীণায় সংযোজনা করিয়া, সেই বীণায় নিজেই সুর তুলিয়াছেন।

কবির প্রথম কাব্য 'মরীচিকা'য় সে সুরের 'সা-রে-গা-ম' শুনিয়াছি, দ্বিতীয় কাব্য 'মরুশিখা'য় সুরের স্বরগ্রাম দেখিয়াছি, বর্ত্তমান কাব্য 'মরুমায়া'য় সেই সুরের আলাপ শুনিলাম।

'মরুমায়া'য় কবির 'বিভীষণ' বলিতেছেন—

> মাটী যদি হতো মাতা,—
> তর্পিতে তায় লাগিত কি লাখো পুত্রের কাঁচা মাথা?
> মৃত-রূপে-রূপে মা রাজে স্বরূপে, শুনে' এই রূপকথা
> দেখিলাম আমি যুগে যুগে নর সহে নব নব ব্যথা।
> রক্তপিপাসা ভক্ত সাজিয়া পূজে মৃন্ময়ী মায়া,
> স্বার্থ-প্রদীপে পুরোহিত করে আরতি আপন ছায়া।
> মিছে ওরে সব মিছে
> মাটীর প্রেমের হেম কুরঙ্গ বনে বনে ছুটাইছে।—

'মরীচিকা' কি 'মরুশিখা'য় কবির চিন্তা এই গভীরতম ব্যাপকতা লাভ করে নাই। উদ্ধৃতাংশ হইতে কবির আরও একটি দিক আমাদের দৃষ্টি এড়াইলে চলিবে না—কবি যতীন্দ্রনাথ কি করিয়া দার্শনিক যতীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত অতিক্রম করিয়াছেন,—'মাটীর প্রেমের হেম কুরঙ্গ' কি করিয়া তাহার 'মার্কা' নিয়া—'মোহিনী' হইয়া আমাদের মনে একটি অতি কঠিন তথ্যের সত্য-বোধকে রসায়িত করিয়া তুলিয়াছে।—

পৌরাণিক চরিত্রকে অতি আধুনিক মতামতের মুখপাত্র হিসাবে এই কাব্যেরই আরও দুইটি কবিতায় পাই—'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' ও 'ভীষ্মের শরশয্যা'। কবিতা হিসাবে এই তিনটি কবিতা ও 'মরুশিখার' 'দ্বাপর হইতে বিদায়' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ভুক্ত—যতীন্দ্রনাথের উচ্চ নাটকীয় বোধও এই কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট।

'মরুমায়া'র যতীন্দ্রনাথ 'মরীচিকা' ও মরুশিখা'র যতীন্দ্রনাথকে নিয়া যে ব্যঙ্গ করিতেছেন, তাহার তীক্ষ্ণতা ভুলিবার নয়—'নষ্টচন্দ্র' দেখিয়াই কবির দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই,—কেহ সজ্জন, কেহ চোর, কেহ ভ্রমর, কেহ ভীমরুল, কেহ কুষ্মাণ্ড খণ্ড, কেহ যুঁই ফুল— যে যাহার মতো সব বলিয়া নিল; কবি-বন্ধু বলিলেন,—

"যা শোন সত্য সবই
ও ত যে সে নহে মদনুগ্রহে ভাবী ও অভাবী কবি"

নিজেকে নিজে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার শক্তি, ব্যঙ্গ করিবার মাহাত্ম্য—নিজেকে নিজেই ছিঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিবার নিষ্করুণতা যতীন্দ্রনাথের অসামান্য।

'দুঃখের কবি'তে স্বকীয় দুঃখবাদের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,

সজল মেঘস্তরে
শুভ্র চৈত্রে রক্তব্যথার পশরাই খুলে ধরে।
মুমূর্ষু চাঁদে বুকে ঢেকে' কাঁদে কৃষ্ণা বাদল-রাতি
উপোসী রূপের অন্তঃপুরে কেঁদে জ্বলে মোমবাতি।
আপন কণ্ঠে অনুখন তার ক্রন্দন উঠে' তাই
যত কান পাতে শোনে দিনরাত অফুরাণ কান্নাই!

'লীলাকীর্ত্তন'এ কবি ঐই দুঃখবাদের স্বরূপ বিচার করিয়া ইহার কারণ দর্শাইতেছেন—

"জীবনে আমার যত না দ্বন্দ্ব কবি অকবির লীলা এ'

বন্ধুর দোষেই এমনটি ঘটিয়াছে, নহিলে ঘটিত না—কিন্তু শুধু কি মার্জ্জনা আছে! প্রবল রাত্র্যার প্রচণ্ডতার অকবি কবিকে নির্দ্দয় আঘাতে মারিয়া জর্জ্জর করিল,—

অরূপ কোঠায় উঠিতে রূপের চোরা সিঁড়ি বাঁধি লাগায়ে
যৌবনমধু লেহিয়া লেহিয়া প্রেমতৃষা রাখি জাগায়ে।

অপাওয়া প্রিয়ার রূপায়ন করি কত রূপকের ছন্দে
রূপের প্রকৃত পঙ্কে ভরাই ফুটাইতে সুখগন্ধে
অগমনীয়ার গমন-স্মরণে বনের মরালী পুষি গো
অথবা বধুর অধরের ভুল তেলাকুচো তুলে চুষি গো।

এই দুঃসহ নির্ম্মমতা মর্ম্মে স্তব্ধ হইয়া বাজে—তাই কবি 'ছুট' চাহিতেছেন,—

হে তপন মোর চিত্তগগনে দোলে যে ইন্দ্রধনু
অশ্রুবিন্দে প্রতিবিম্বিত তোমারই দগ্ধতনু।
সে সকল কথা থাক্—
অসময়ে ছুটি না লইয়ো ত্রুটি; অভাগা ফিরিয়া যাক।—

কবিতাগুলির পারম্পর্য্যে কবি-মানসের ক্রমবিকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছে—নিজের নাগপাশে নিজে বন্দী হইয়া কবি হাসফাস করিতেছেন,—মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে কবি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। 'মুক্তিঘুম'এ কবির এই নিগূঢ় বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

'যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর আঁখি চির আধনিমীলিত
যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহায়িত,

সেই ঘুমের জন্য কবি শয়ন পাতিলেন।—

'মুক্তিঘুম'এর পরে দেখি যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অভিনব রাজ্যে জাগিয়া উঠিয়াছেন। 'কবির ঠিকানা' মিলিয়াছে বলিয়া যাহারা ভাবিয়াছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছে - মরুমায়ার 'হাটে' সেই রাজ্যের প্রথম কবিতা, এবং আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'বোঝা' সেই রাজ্যের দ্বিতীয় কবিতা। নব রাজ্য-সন্ধানী যতীন্দ্রনাথের পরিচয় দিবার সময় আজও আসে নাই—। 'মরুমায়া'য় যতীন্দ্রনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরম পরিচয় দিয়াছেন,—এই নিবন্ধে সেই কথাটি বলিবার চেষ্টা পাইয়াছি—এবং বলিতে গিয়া কবি-মানসের ক্রমবিকাশের স্তরের কিঞ্চিৎ সঙ্কেত দিয়াছি।

এই নিবন্ধে 'মরুমায়ার অধিকাংশ কবিতাই; যেমন 'পাষাণ পথে' 'কেতকী', 'মহারাজ' উল্লিখিত হয় নাই। 'শাওন রাতি' কি 'শরৎ আকাশে' যতীন্দ্রনাথের যে পরিচয় কিম্বা 'ফেমিন রিলিফ' ও 'অকালের পটোল'এ তাঁহার যে দিকের দর্শন মেলে তাহারও নির্দ্দেশ এ নিবন্ধে করা সম্ভব হইল না।

যতীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীর বীণায় নূতন তারের সংযোজনা করিয়াছেন, একথা আমি বলিয়াছি। Wordsworth, Keats কি Shelleyর বহু পরে ইংরাজী কাব্যে এমনই একটি নূতন তারের সংযোজক পাইয়াছিলেন—

"Romance; those first class passengers they like it very well
Printed and bound in little books"; but why don't Poets tell?
I'm sick of all their quirks and turns the loves an' doves they dream
Lord send a man like Robbie Burns to sing the song o' steam."

—Rudyard Kipling

কিন্তু 'Laureate of the Music Hall'এর এই তরল ভাব, John Bullএর এই devil-may-care'এর ভঙ্গী অপেক্ষা অনেক উচ্চ কাব্য-স্তরে যতীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া কাব্যরচনা করিয়াছেন—সত্য-বোধের বেদনা যেখানে প্রধান, নিষ্ফলতার বোধ যেখানে নিবিড়, যতীন্দ্রনাথ সেই স্তরের কবি। আমাদের প্রাচীন দর্শন যেখানে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাণ প্রচার করিয়াছিলেন, যতীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহারই ইঙ্গিত ধ্বনিত হইয়াছে। এ ইঙ্গিতে পাশ্চাত্যের নাস্তিকবাদের আভাস মাত্র নাই একথা না বুঝিলে কিছুতেই যতীন্দ্রনাথকে বুঝিতে পারিব না। *

প্রতীক্ষা

শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ

তুমি ছিলে দীপ-শিখা আমি ছিনু তাহারি আলোক
আকাশের মত ছিনু—তুমি ছিলে সন্ধ্যা-তারা তাই
উদ্বেল রোমাঞ্চ তুমি—আমি তা'র নিবিড় পুলক
সুরের আলাপ তুমি—আমি সাধি, আমি গান গাই।
কঠিন নিষ্ঠুর ছিলে আমি তাই হয়েছি মিনতি—
উজ্জ্বল গৌরব ছিলে—হয়েছিনু তব অভিমান
সুখের প্রতিমা তুমি—আমি তব নেশার আরতি।
ক্ষমার সমুদ্র ছিলে—আমি ছিনু ক্ষমতার বান।

তবুও ভুলিলে সব?—দূরে দূরে হইলে বিলীন
কোথায় তোমার শেষ—অনায়াসে করিলে গোপন
যত চিরন্তন সাধ—ক্ষণকাল করিয়া রঙীন
অতল আঁধারতলে একেবারে দিলে নির্ব্বাসন।
বিস্মৃতি তোমার ধর্ম্ম—আমি আজ স্মৃতিরূপ পাপ,
ঝরিলে ফুলের মতো—কাঁটা হ'য়ে বিঁধি অহরহ
বিশ্বের মঙ্গল হ'লে আমি তার হনু অভিশাপ;
মিলিলে সবার সাথে আমি একা কঠিন বিরহ।

তুমি হ'লে অপরূপ, যার রূপে গড়ি শুধু মায়া—
ছায়া হ'য়ে নেমে এসো অবসন্ন জীবনের পারে
যদি তব ছায়া নাই আমিও চাই না মোর ছায়া
আমারে চাইনা আর ছায়াহীন তোমার আকারে।
উপেক্ষা তোমার রীতি—অপেক্ষায় জাগি নিশি-দিন
যে দিন নিঃসঙ্গ হ'ব সেই দিন হ'ব ছায়াহীন।

* মরুমায়া,—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নব প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ। মূল্য পাঁচ সিকা। সুন্দর ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদপট। প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী, ৪৭ মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট পোঃ।

মহামান্য ভিটলভাই প্যাটেল সম্প্রতি আমেরিকায় Gandhi Testimonial Dinnerএ যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—মিটমাট হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না—পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইবে—এবার বর্জ্জননীতি আরো দৃঢ় ও ব্যাপক ভাবে স্বরাজ আন্দোলনে অনুসৃত হইবে। শুধু মাত্র বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন নহে এবার বিলাতী ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্সও বর্জ্জন করা হইবে। মহামতি প্যাটেল মনে করেন বিলাতী ইনসিওরেন্স ও ব্যাঙ্কের মারফতে আমাদের দেশের অর্থ বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রযুক্ত হওয়াতে আমাদের জাতীয় স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে।

জাতীয়তার দিক দিয়া কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, অর্থনীতির দিক দিয়া কিন্তু একথা আংশিক সত্য। আজ দেশের পরাধীন অবস্থার ক্ষোভ হইতে সঞ্জাত এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া যদি কেহ বিলাতী ব্যাঙ্ক বা ইন্‌সিওরেন্সকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে নগণ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যান তবে তাঁহার বুদ্ধির কেহ তারিফ করিবে না। কারণ আন্তর্জ্জাতিক শান্তির দিনে বিলাতী বা বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্সের প্রয়োজন প্রত্যেক দেশেই উপলব্ধ হইবে। 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 'সান লাইফ অফ ক্যানাডা' নামক লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে একটা বিরুদ্ধ আন্দোলন কিছুদিন পূর্ব্বে চলিয়াছিল।—তাহার ফলে ইন্‌সিওরেন্সের উপর একটা অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাসের ভাব কোনও কোনও স্থানে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

যে-সব বিলাতী বা বিদেশী কোম্পানী ভারতবর্ষের অর্থ লইয়া ভারতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যকে বঞ্চিত করিতেছে—দেশের অর্থ সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও যে সব কোম্পানী বর্ত্তমান কোনও দেশীয় ব্যবসায়কে সাহায্য করে না সমগ্র দেশের উপর সেই সব কোম্পানী বর্জ্জন করিবার দায়িত্ব আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

কিন্তু জাতি হিসাবে যেমন স্বদেশী ইন্‌সিওরেন্স বা ব্যাঙ্কের সহিত আদান প্রদান একান্ত বাঞ্ছনীয়—তেমনি ব্যবসায়ী হিসাবে কোম্পানী ভাল কি মন্দ এ বিচার করাও বুদ্ধিমত্তার কাজ।

শুধু মাত্র ভাবপ্রবণতায় ব্যবসায়-বুদ্ধিকে চাপা দিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের বাহিরে বিদেশী অনেক ব্যাঙ্ক বা ইন্‌সিওরেন্স বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর ষ্টেট্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কথা বলা যাইতে পারে। এক শতাব্দী আগে যেখানে একটি মাত্র লোক ৫০ পাউণ্ড বেতনে সমস্ত কাজ চালাইত আজ সেখানকার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৬০০ এবং সর্ব্ব সাকুল্যে মূলধন হইতেছে ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ব্যাঙ্কিং এনকয়্যারী কমিটির কর্ত্তব্য কি শেষ হইয়া গিয়াছে?—ভারতবর্ষে শুধুমাত্র বিনিময় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া বা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিলেই যে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইবে এমন বোধ হয় না। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিং ব্যাপারে যে কঠিন সমস্যা আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সমাধান কল্পে অনুসন্ধান-সমিতি কি

করিয়াছেন আমরা জানি না এবং পূর্ব্ব হইতে কোনও প্রকার মন্তব্যও আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি বিনিময়-ক্ষেত্রে আমাদের দেশের যে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করিতেছে—সে বিষয় অবহিত হইয়া কার্য্যকরী কোনও প্রস্তাব যদি তাঁহারা করিতে পারেন তবেই ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমস্যার সমাধান হইবে।

জীবন বীমা—মানুষের সামাজিক জীবন হইতে কদাচ বিচ্ছিন্ন নহে। সমাজের মধ্যে ভদ্রভাবে থাকিবার চেষ্টা, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির উদ্বোধন, সামাজিক মানুষ হিসাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি আপন আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদন—এই সবেরই পরিণতি আজ আমরা জীবন বীমাতে দেখিতে পাইতেছি। নিজের বা নিজের ব্যবসায়ের জন্য, পরিবার বা আত্মীয়বর্গের জন্য, জীবন-বীমা করা হইল বটে কিন্তু তাহার শেষ ফল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্শাইতেছে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর।

তাই মনে হয় জীবন-বীমার প্রসার সামাজিক জীবনকেও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিবে। জীবন-বীমার ক্ষেত্রে আমরা যেন আমাদের একান্ত প্রার্থনায় উচ্চ সামাজিক জীবনকে না বিস্মৃত হই।

বীমা-জগতে আমাদের মধ্যে যাহাতে এই ভাবটি (social feelings) জাগ্রত ও মার্জ্জিত হয় সেজন্য কয়েক জন বীমা-ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও ধুরন্ধর সম্প্রতি ইনসিওরেন্স এসোসিয়েসন অফ্ ইণ্ডিয়া (Insurance Association of India) নাম দিয়া একটি সংঘ গঠন করিয়াছেন। ৩০৯ বহুবাজার ষ্ট্রীটে ইঁহাদের কার্য্যালয়। প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে—স্থানীয় বীমা কোম্পানীর অধিকাংশ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বীমা বিষয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে—কর্ম্মীগণের মধ্যে ভদ্রতা ও সহানুভূতির উৎকর্ষসাধন একান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে ইন্‌ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।—এই প্রকার দুইটি সমিতির প্রয়োজন যে কলিকাতা সহরে নাই তাহা আমরা মনে করি না কিন্তু ইন্‌ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট সংক্রান্ত ব্যাপার যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহাদের মনে একটা স্বাভাবিক আশঙ্কা জাগে যে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধের ভাব দেখা দিবে।—

কোনও সমিতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা না একটা 'ক্লিক' (clique)- দল পাকাইয়া বসি।—রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে স্কুলের তর্ক সভায় (debating club) এই বিভিন্ন দলের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমিতির মঙ্গল চাই—এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করি—তাই আশার সঙ্গে আশঙ্কার কথাটাও এইখানে বলিয়া রাখিলাম।

যতদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে মনের ক্ষোভ ও উত্তাপ প্রশমিত না হইবে—ততদিন স্থায়ী মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানীর গত বৎসরের এক সংখ্যা উদ্বৃত-পত্র আমরা আলোচনার্থ পাইয়াছি। গত বৎসর এই কোম্পানী মোট ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ১৮৯৫ খানি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মোট ২১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার ১২৭১ খানি বীমা-পত্র কোম্পানী দাখিল করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে এক লক্ষ টাকার কাজ বেশী হইয়াছে। গত বৎসরের আর্থিক বিপর্য্যয়ের কথা মনে রাখিলে বোঝা যাইবে কোম্পানীর পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এই বৎসরে কোম্পানীর আয়ের অঙ্ক হইতেছে ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ১১৩ টাকা, তন্মধ্যে প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭১১ টাকার। কোম্পানীর জীবন-বীমা-ফাণ্ডের মজুত তহবিল এই বৎসরে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ১৯০ টাকা বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মৃত্যু-জনিত দাবীর পরিমাণ ১৯২৮ ও ১৯২৯ সন হইতে কম। বীমার নির্ব্বাচনে ইহা কোম্পানীর সুবিবেচনার পরিচয় দেয়। পত্রে পড়িলাম, একক্ষেত্রে দাবীর টাকা দিবার অনুসন্ধানফলে মৃত বীমাকারী বারো বৎসর নিজের বয়ঃক্রম কমাইয়া বীমা করিয়াছিলেন—ইহা প্রমাণ হওয়ায় দাবীর টাকা নামঞ্জুর হয়। বীমা-ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়। বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের এজেন্ট ও ডাক্তারনির্ব্বাচনে

আরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। গত মূল্যাবধারণের ফলে কোম্পানী ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ এই পাঁচ বৎসরের জন্য প্রতি ১০০০৲ টাকায় বাৎসরিক ১০৲ টাকা হিসাবে বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোম্পানী মার্টিন কোম্পানীর নিজস্ব প্রাসাদোপম অট্টালিকা ১২নং মিশন রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী বাঙালার গৌরব স্যর রাজেন্দ্রনাথ যে কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং তাঁহার মার্টিন কোম্পানী যাহার ম্যানেজিং এজেণ্টস্, সে কোম্পানীর বিপুল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই।

নিউ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের বৃহত্তম বীমা-সংঘ। অগ্নি-বীমা, নৌ-বীমা, দুর্ব্বিপাক-বীমা ইত্যাদিতে নিজের যশ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া ও আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া কোম্পানী মাত্র গত দুই বৎসর জীবন-বীমার কার্য্য সূচনা করিয়াছে। সূচনা করিয়াই দ্বিতীয় বৎসরে এক কোটি ছয় লক্ষ টাকার কাজ করিয়া 'নিউ ইণ্ডিয়া' নবীন ভারতের ব্যবসায় সম্ভাবনাকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমরা আমাদের চৈত্র-সংখ্যার বিজ্ঞাপনীতে একটি মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য লজ্জিত আছি।—বিজ্ঞাপনীতে ছাপার ভুলে ১ কোটির ১ পড়িয়া যাওয়াতে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ, টাকার কাজ কোম্পানী করিয়াছেন, এমন বিজ্ঞপ্ত হইয়াছিল। এই দুই বৎসর সময়ের মধ্যেই ভারতের প্রথম ছয়টি জীবন-বীমা সমিতির মধ্যে 'নিউইণ্ডিয়া' নিজের নাম তালিকা-ভুক্ত করিয়াছেন। প্রথম মূল্যাবধারণেই 'নিউ ইণ্ডিয়া'র কৃতিত্ব অপরাপর সকল কোম্পানীর কৃতিত্বকে খর্ব্ব করিবে এমন আশা করা অসম্ভব নয়। ইহার কালকাতাস্থ জীবন-বীমা-বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ এস, সি, রায়কে আমরা ব্যক্তি-গত ভাবে জানি। সজ্জন ডাঃ রায় বীমা-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। গত বৎসর এই বাংলা দেশ হইতে তাঁহারই কর্ম্মশক্তিতে কোম্পানী ৩৩ লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন—ব্যবসায়ের সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহারা বুঝিবেন, 'নিউ ইণ্ডিয়া' গত বৎসরের ব্যবসায়ের দুর্যোগ সত্ত্বেও এই কাজ সংগ্রহ করিয়া কি অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
2, Wellington Lane, Dharamtalah, Calcutta.

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বীমা-সমিতি

নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ

—১৯১৯ সনে স্থাপিত—

সমস্ত প্রকার বীমাই (অগ্নি-বীমা, নৌ-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা ও জীবন-বীমা) গৃহীত হয়।

মূলধন (সাবস্ক্রাইবড)	২,৫৬,০৫,২৭৫ টাকা	প্রিমিয়াম আদায় (১৯২৮-২৯)	১৬,৭১,৪৯২৸৩ পাই
মূলধন (পেড-আপ)	৭১,২১,০৫৫ ,,	ফাণ্ড	১,৪০,৩২,৫৯১৷২ ,,

জীবন-বীমা বিভাগ

মাত্র প্রথম দুই বৎসরে কোম্পানীর জীবন-বীমা বিভাগ ১৫০০০০০০৲ কাজ সংগ্রহ করিয়াছে। ভারতের অন্য কোন কোম্পানী প্রথম দুই বৎসরে এত কাজ করিতে পারে নাই। Permanent Disability Benefits, Extended Insurance, Double Endowment, Ideal Option Benefit Scheme ইত্যাদি সমস্ত প্রকার সুবিধাকর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে এই কোম্পানীর শাখা ও এজেন্সী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—	বঙ্গদেশের ব্রাঞ্চ অফিস—	লাইফ সেক্রেটারী—
এস্, জে, এফ, রিভার্স	১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	ডাঃ এস্, সি, রায়।

ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান

লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিঃ

১৯২৯ সালের মূল্যাবধারণের ফল

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

চল্‌তি সমস্ত সলাভ বীমায়

১৯২৫ হইতে ১৯২৯, এই পাঁচ বৎসরের জন্য

প্রতি ১০০০৲ টাকায় বাৎসরিক ১০৲ টাকা হিসাবে

উত্তরকালীন বোনাস-বিতরণ ঘোষিত হইয়াছে।

যে সকল স্থানে কোম্পানীর এজেণ্ট নাই, তথায় কর্ম্মক্ষম এজেণ্ট আবশ্যক।

নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন:—

মার্টিন এণ্ড কোম্পানী

১২নং মিশন রো, কলিকাতা।

অন্য স্থানে যাইবার পূর্ব্বে
কিম্বা পরে
যখন আপনার
আমাদের নিকট
আসিবেন।

আসিলেই
প্রমাণ পাইবেন—আমরা
অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা
কমিশন বেশী দিই ও
লাভ কম করি।

লিমটন্ ওয়াচ্ কোম্পানী

১৪৩, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সমস্ত প্রকার ঘড়ীই সরবরাহ করিয়া থাকি

জেব ঘড়ী -
রিষ্ট ওয়াচ—
ওমেগা :
সিনেমা-লণ্ডন :
ইলেক্সন্ :
ওয়েষ্ট-এণ্ড :
ক্রুরভাইজার :
রেলওয়ে রেগুলেটর
রথারহাম্‌স্ :
ওয়ালথাম্ :

জেনিথ : এল্‌গিন্
এবারহার্ড :
মোয়েরিস্ :

—ক্লক—
ডংজান্‌স্ জে
সেথ থমাস
জাপান জেনুইন্
অ্যান্সোনিয়া
ওয়েষ্ট ক্লক

ঘড়ী কেন কিনিব ? কোন্ ঘড়ী কিনিব ?—দুটি প্রশ্নের উত্তরই আমাদের কাছে হইতে পাইবেন

NATIONAL SOAP
& CHEMICAL WORKS

[২৮শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা]

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—**উপাসনা**—

২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

কে, সি, বসুর বার্লীর নূতন পরিচয়

K. C. BOSE & Co. INDIAN BARLEY CALCUTTA

আর কি দিব ?

(মেসিনে প্রস্তুত ও হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে)

৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

এ যাবৎ

খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা

সাধারণতঃ এই বার্লীর ব্যবস্থা দিয়া

আসিতেছেন।

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য !

জানা জিনিষ ব্যবহার করুন !

কে, সি, বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট ও বার্লী ফ্যাক্টরী, কলিকাতা।

ইহা শিশুদিগের পক্ষে উত্তম ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত করে, হজম-ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বল সঞ্চার করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায় !

প্রোপ্রাইটার— কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং—গিরগাঁও, বোম্বাই।

বিষয়-সূচী

আষাঢ়—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

আষাঢ়—১৩৩৮

কালিপুর-আশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ ঃ—

পুস্তকের নাম	মূল্য	লেখক
১। জগৎস্বপ্ন	১৲	শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ
২। ক্ষেপীর খেয়াল	॥০	„ যোগেশ্বরী সরস্বতী
৩। তত্ত্বকথা	১॥০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রফেসার
৪। ঐ ২য় খণ্ড	১৲	„ „
৫। সদ্‌গুরু ও রাজযোগ	১.০	শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস বি, এ
৬। সত্যযুগ	॥০	„
৭। ঋষিযোগে স্মৃতি	১৲	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় বি, এ
৮। মুমুক্ষুর বিচার	॥০	শ্রীপ্রতিভা সাংখ্যশাস্ত্রী ও শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী
৯। পূর্ণানন্দের প্রলাপবাক্য	১৲	শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
১০। ঠিক বেঠিক	॥০	
১১। রামপ্রসাদের 'মা'	॥৵০	„
১২। উপদেশাবলী	॥০	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
১৩। আশ্রম চতুষ্টয় (ব্রহ্মচর্য্য)	৸০	„ সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ
(ছাত্রজীবন) ছাত্রদের জন্য	॥০	
১৪। ভক্ত-সঙ্গীত	৵০	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত

আশ্রমাচার্য্য—**শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়,** কালিপুর আশ্রম

কামাখ্যা (পোঃ), কামরূপ (আসাম)।

সোল এজেন্ট ঃ—সিক্‌রী এণ্ড কোং ৫৫।৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

STERLINGS
KUNDA
TOOTH
PASTE
ANTISEPTIC
DEODORANT
SWEET
PREVENTS ALL
AND
DISEASES.
STERLING
PHARMACEUTICAL
PRODUCTS CO.
CALCUTTA.

টুথপেষ্ট

ষ্টার্লিং ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস্ কোং
৭২-২, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রফেসর বানার্জির

গুণে ও বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

তাই সর্ব্বত্র ইহার এত আদর।

—ইহার—

ব্যবহারাধিক্যে	নিয়মিত ব্যবহারে
নানা প্রকার নারিকেল তৈল	মস্তিষ্ক শীতল থাকে,
তৈল নামীয় ভেজাল কেশতৈল	চুলের সৌন্দর্য্য বাড়ে,
দিন দিন বাজার হইতে লোপ পাইতেছে।	চিত্তবিনোদন করে।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বিহার মিসেলেনী—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ফোন -বি, বি, ৩২৭০

দি

ওরিয়েণ্টাল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন

লিমিটেড্

৯৮।৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিনটী

১। **বিনা** ডাক্তারী পরীক্ষায় ১৮ হইতে ৫৫ বৎসরের **যে কোন** পুরুষ বা মহিলা বীমা করিবার অধিকারী। মাসিক নিয়মিত চাঁদা নাই, তথাপি ১৲ টাকার অধিক নহে।

২। **স্বামী স্ত্রী** একত্র একই খরচায় বীমা করাইবার **প্রচলনই** আমাদের বিশেষত্ব। এককালীন সামান্য ৫৲ টাকা দিয়া ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি?

৩। **পাঁচ শত** টাকা পর্য্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত মেম্বরগণ **কর্জ্জ** পাইবার অধিকারী। (১২ বৎসর পর বীমাকারীকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না)।

সম্ভ্রান্ত **পুরুষ ও মহিলা** কর্ম্মীর প্রয়োজন। যোগ্যতা অনুসারে বেতন, কমিশন, বাৎসরিক ও বিশেষ বোনাস্ দেওয়া হইবে। কর্ম্মীগণের বিনা খরচায় বীমা করিবার সুবিধা আছে।

বিস্তৃত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

আষাঢ়—১৩৩৮

পরিচালন-পরিষদ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ,

" কালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ,

" যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-ঈ,

" বিশ্বপতি চৌধুরী, এম-এ,

" জগদীশ গুপ্ত

কার্য্যালয় :—

২নং ওয়েলিংটন লেন, পোঃ ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

বাঙ্গলা দেশে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইবার বিড়ম্বনা এই যে তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইতেই হইবে। এ দেশে নিছক সাহিত্য-পত্রিকাও চলা দুষ্কর,—চালাইতে গিয়া অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, আলোচনা ও সমালোচনা প্রভৃতি দিয়া মাসিক সাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধন করিতে হয়। কিন্তু পত্রিকাসম্পাদন করিতেছি বলিয়াই যে সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতা আছে এমন অহঙ্কার আমাদের নাই।—আমরা বহুদিন হইতে আমাদের বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী সাহিত্যাগ্রজ ও বন্ধুকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আজ আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে বর্ত্তমান মাস হইতে তাঁহাদিগকে পরিচালন-পরিষদে পাইয়া আমরা ধন্য হইলাম। শুধু মাত্র নামে নহে—তাঁহারা আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে একান্ত ভাবে উপাসনার কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকিরণকুমার রায়

২৬শ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৩৮ ৩য় সংখ্যা

গান

(বাউল)

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

(১)

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে—
ও আকাশ বল্ আমারে,
তাদের কেও বা রঙীন ওড়্না গায়ে —
কেও সাদা কেও নীল বেশে
কোন্ যমুনা-নীরে তা'রা ভরবে গাগরী,
কা'র বাঁশরী শুন্লে এরা সাগর-নাগরী,
(মরি হায় রে)
তা'রা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর
যায় চলে কা'র উদ্দেশে ?—
—ও আকাশ—বল্ আমারে

কভু বাজিয়ে ডমরু তা'রা উল্লাসে নাচে—
কভু ভানুর সনে খেলে হোলী প্রভাতে সাঁঝে,
তা'রা চাঁদের সনে কি কথা কয়
উজ্জ্বল মধুর হেসে—
—ও আকাশ বল্ আমারে।

বল্‌রে আকাশ বল্
আমার আঁখিজল,
তা'দের মত জীবনখানি করবে কি শ্যামল ?
(আমি তাদের মত) আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা
খেল্‌ব কি দিনের শেষে !
—ও আকাশ বল্ আমারে।

(২)

ওরে বন তোর বিজনে সঙ্গোপনে
কোন্ উদাসী থাকে,
আমার মনের বনের উদাসীরে
ডাকে সে আজ ডাকে।
নিজে সে নীরব হ'য়ে রয়
শোনে সে ফুল যে কথা কয়,
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া—লতার অনুনয়—
শোনে সে লতার অনুনয় !
পাখীদের প্রগল্‌ভতা দেয় কি ব্যথা তাকে ?

কেও তা'রে পায় না ক' ডাকি'
থাকে সে সদাই একাকী—
কোন একাকী করলে তারে এমন একাকী,
তা'রে বৃথায় খোঁজে চন্দ্র তপন পাতার ফাঁকে ফাকে
আজি মন বিবাগী চঞ্চল
বিরহে চক্ষু ছল ছল—
সে সদাই ভণে ওই বিজনে আমায় নিয়ে চল—
ওরে মোর পাগলা পরাণ পাবি কি তুই তা'কে ?

জাত্যভিমানের দণ্ড

শ্রীসুবিমল রায়

দেশে জৈনধর্ম্মের উত্থান হয়েছিল একদিন। জৈনরা বেদ মানলে না—ব্রাহ্মণ মানলে না। ব্রাহ্মণ্য শাসন হ'তে বহু লোককে সরিয়ে নিয়ে নিজেদের দল পুরু করল—বিদেশাগত আর্য্যেতর জাতিকে নিজেদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত করে নিল। জৈনও কোথাও কোথাও রাজত্ব করেছে, হাতে ক্ষমতা পেয়ে ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট শাসন করেছে। তারা ভারতের বাণিজ্য একচেটে ক'রে নিয়েছিল—ধনকুবের হয়েছিল—ধনগর্ব্বে তারা সৌরাষ্ট্র দাক্ষিণাত্যে কলিঙ্গে ব্রাহ্মণের যথেষ্ট অমর্য্যাদা করেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের উত্থান হলো, তারাও বেদ মানলে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠান যজ্ঞ ও পশুবধের বিরুদ্ধে রণঘোষণা করলো, জৈনদের মত তারা ধনে জনে বলে বলীয়ান হলো। তারা ভারতে নূতন নূতন বিদ্যা-চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করল—ব্রাহ্মণ অপরাবিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করে নিলে—পৃথক ভাবে পরাবিদ্যারও চেষ্টা করল—বিশ্ববিদ্যা গঠন করল, সাহিত্য বিজ্ঞান-তন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি বহুবিদ্যাতে নিজেদের ধর্ম্মের ছাপ মেরে দিল। জৈনদের চেয়ে তারা ধনে বড় হয় নাই বটে কিন্তু বিদ্যায় বড় হলো। তা ছাড়া ধর্ম্ম-প্রচারে তারা জৈনদের হারিয়ে দিলে। হিন্দুদের ত' ধর্ম্ম-প্রচার ছিলই না। ত্রিচতুর্থাংশ এসিয়াতে ধর্ম্মবুদ্ধসংঘের জয়ধ্বজা তারা উড়াল। সব চেয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের কৃতিত্ব সে ভারতের সম্রাটের পদ অধিকার করেছিল—বহুশতবর্ষ ধরে তারা 'ভারতে' রাজত্ব করেছে। বলাই বাহুল্য যে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী ধর্ম্মের রাজশক্তির শাসনে ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা এ দেশে ঢের কমে গিয়েছিল।

তারপর এলো মুসলমান। তাদের দ্বন্দ্ব ঠিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নয় সমগ্র হিন্দুজাতির সঙ্গে। ব্রাহ্মণকে হিন্দুজাতির পরিচালক নেতা ও শীর্ষস্থানীয় হিসাবে যথেষ্ট পীড়ন নির্য্যাতন যে সহ্য করতে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজের বদলে মুসলমান রাজা সিংহাসনস্থ হওয়াতে ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রতিপত্তি যে কমে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তারপর মুসলমান ধর্ম্মের আঘাতে ভারতবর্ষ যখন আলোড়িত হলো তখন যে কয়জন মহাপুরুষ নবধর্ম্ম প্রকাশ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন—যে সকল মহাপুরুষ একেশ্বরবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন—তাঁরা কেহই ব্রাহ্মণের পরম মিত্র নহেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেও তাঁদের অনেকে জ্ঞান বিদ্যা কুল জাত্যভিমানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেছিলেন তাতে ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। মহাবীরের সময় হতে এইভাবে ব্রাহ্মণ জাতি ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের উপর শাসন চলে আসছে। কিন্তু ইংরাজ আসার পর তাদের যে শাস্তি হয়েছে—তেমন শাস্তি কোন দিনই হয় নাই।

আমি ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের কথা বলছিনা—হিন্দু-সমাজেরই মনোভাবের পরিবর্ত্তনের কথা বলছি। ইংরাজ আসার পর যে যুগান্তর এলো তাকে মন্বন্তরও বলা যেতে পারে।

ইংরাজী শিক্ষা লোককে ব্রাহ্মণের শাসন অমান্য করতে, জাতিগত শ্রেষ্ঠতাকে অস্বীকার করতে—শাস্ত্রবচনে যুক্তি খুঁজতে শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানকে অবহেলা করতে, সমস্ত আপ্তবাক্য পাঁজিপুঁথি হদিশনিদেশে সত্য খুঁজতে শিখিয়েছে। ইংরাজীশিক্ষিত লোক আর ব্রাহ্মণের অনুশাসন নির্ব্বিচারে মানতে চায় না—সংস্কারমত মামুলি ধাঁচে ব্রাহ্মণকে কতকটা মেনে গেলেও অন্তরের শ্রদ্ধা তাতে যোগ দেয় না।

কিন্তু এতেও কথা হতে পারে যারা ব্রাহ্মণকে মানছেনা তারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হচ্ছে, তাদেরই ক্ষতি হচ্ছে, ব্রাহ্মণের তাতে বেশী ক্ষতি হয় নাই। একেবারে ক্ষতি হয় নাই তা বলা যায় না—আর কোন ক্ষতি না হোক—জীবিকার্জ্জনের কিছু ক্ষতি তাতে নিশ্চয়ই হয়েছে।

কিন্তু ইংরাজের সাম্য-বাদ-মূলক শাসনে যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-হানি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কুল কলেজ স্থাপিত হলো—সেখানে ব্রাহ্মণ সন্তানের পাশে বসে গা ঘেঁষে খ্রীষ্টান মুসলমান চামার চণ্ডালের ছেলে বসতে পেল—

ট্রেনে ট্রামে গাড়ীতে খেয়া নোকাতেও সেই দশা। শুধু তাই নয়—অন্ত্যজ ব্যক্তিও পণ্ডিত হয়ে কালে উপাধ্যায় হয়ে উঠল, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্রাহ্মণের ছেলেকে বিদ্যাভ্যাস করতে হলো—শূদ্রাধম উচ্চপদস্থ হলো। তার অধীনে ব্রাহ্মণকে তাঁবেদারী করতে হলো।—হীনজন্মা বিচারকের সম্মুখে ব্রাহ্মণকে আসামী হয়ে দাঁড়াতে হলো। শূদ্রেরা দেশনেতা, কবি, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সংস্কারক হয়ে জনপূজ্য হলো, ব্রাহ্মণকে তাদের কাছে শিক্ষা পেতে হলো, তাদের অনুসরণ করতে হলো। যে দেশে একই পাপের জন্য শূদ্রের গুরুদণ্ড ব্রাহ্মণের লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল সে দেশের আইনে ব্রাহ্মণ শূদ্র নীচ চণ্ডালটার পর্য্যন্ত দণ্ডবিচারে কোন ভেদ থাক্‌লনা। কোন ক্ষেত্রেই কোন বিভাগেই আজ যোগ্যতাবিচারে ব্রাহ্মণত্বের একটা বিশিষ্ট সুযোগ নাই।

পেটের দায়ে ব্রাহ্মণকে আজ অনেক অপকর্ম্ম করতে হচ্ছে—শূদ্রের বাড়ীতে পাচক ভৃত্যের কাজ করতে হচ্ছে, ম্লেচ্ছের গাড়ী হাঁকাতে হচ্ছে।

কর্ম্মসূত্রে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে অতি নীচ সংসর্গে আস্‌তে হচ্ছে—পতিতার সঙ্গে অভিনয় করতে হচ্ছে, পতিতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে, অধমের কাছে গায়ের বলে নয়, মনের বলে—বিদ্যার বলেও হীনতর প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে, বিধিদত্ত অধিকারের কাছে কৃত্রিম অধিকার বারবার পরাভূত হচ্ছে।

দেশের অপরাধীদের তালিকায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু মাত্র কম নয়।

বাঘের ঘরেও ঘোগের বাসা দেখা যাচ্ছে। অনেক ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ্য শাসন ভাল বাসছে না—আপনার রক্ত-গৌরব জাত্যভিমানকে ভার স্বরূপ মনে করছে, বিসর্জ্জন ক'রে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচছে। বিনা সাধনায় অর্জ্জিত পড়ে-পাওয়া মর্য্যাদাকে স্বাধীন-চেতা ব্রাহ্মণ যুবক নির্ব্বিচারে হজম করতে পারছে না—মনুষ্যত্বের অবমাননা ব'লে মনে করছে। ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে এটা নিদারুণ শাস্তি। কত ব্রাহ্মণের ছেলে নিজ গোত্রের নামটাও ঠিক মত বল্‌তে পারে না—বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণের ছেলেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করতে চায়না—প্রবেশিকায় যতটুকু সংস্কৃত পড়ান হয় তা' একরূপ বাংলা ভাষারই অঙ্গ, তাও ব্রাহ্মণের ছেলেদের অসহ্য দেখে বড় দুঃখ হয়—শুধু দুঃখ নয়, দেবভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র প্রীতি তার রক্তে আছে বলে মনে হয় না। মনে হয় না কোন পুরুষে তাদের মধ্যে সংস্কৃতচর্চ্চা ছিল।

ইংরাজাধিকারে বহু ব্রাহ্মণ গণ্যমান্য পদস্থ হয়েছেন। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব কিছু নেই—ব্রাহ্মণেতর অনেক জাতির লোকে সমান গণ্যমান্যই হয়েছে—তা ছাড়া ব্রাহ্মণ যখন গণ্যমান্য হয়েছে তখন সে বৈদ্য কায়স্থ বা বৈশ্যের পদবীতে নেমে এসেই হয়েছে। পাণ্ডিত্যের ও মহত্বের জন্য অনেক ব্রাহ্মণ নমস্য হয়েছেন—কিন্তু তাও ব্রাহ্মণত্বের জন্য নহে—অন্য জাতির পণ্ডিত ও মহান ব্যক্তিরাও সমান নমস্যই হয়েছেন—কৃতিত্বলাভ তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণের মত সহজ স্বাভাবিক নয় বলে অধিকতর নমস্য হয়েছেন।

সরল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-সংসারে এখনো ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা আছে বলে মনে হয়—কিন্তু সেটাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে খাঁটি মাল বেশী পাওয়া যায় না। শিশ্নোদরপরায়ণ কৌলিকগুরু, জীবিকার্থী পুরোহিত, ভোজনলোলুপ পল্লী-ব্রাহ্মণ, পাণ্ডাপূজারী গোঁসাই দল যে মর্য্যাদাটুকু লাভ করেন—তার মধ্যে কতটুকু খাঁটি শ্রদ্ধা থাকতে পারে—? শুষ্ক সংস্কারের গড্ডলিকা-ধারায় সম্মান-তৃষ্ণা কি তৃপ্ত হয়? যে সমাজের অধিকাংশ লোক জনসাধারণের সঙ্গে সমবৃত্তিক—সে সমাজের ভালো লোক যাঁরা তাঁরা আর জাতির জন্য সম্মান পান না—ব্যক্তিগত মহত্বের জন্যই পান।

এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য, যে ব্রাহ্মণ ভারতীয় সমাজকে শাসন করেছে—তার কি নিদারুণ শাস্তি না হয়েছে এবং হচ্ছে। এ শাস্তি কোন্ পাপে? যে ব্রাহ্মণসমাজ সমস্ত অনুষ্ঠানকে পুণ্য, পুরস্কার—পাপ, প্রায়শ্চিত্তের categoryতে বিচার ক'রে এসেছে—কার্য্য কারণের সম্বন্ধটা যে সমাজ এক জন্ম হতে অন্য জন্ম পর্য্যন্ত টেনেছে—ইহলোক হ'তে পরলোকে পারম্পর্য্য খুঁজছে—সে সমাজকে জিজ্ঞাসা করতে পারি বৈ কি—কোন্ পাপে এ দণ্ড! ব্রাহ্মণ-সমাজ যদি জড়বাদী হতো—তবে একথা তাকে জিজ্ঞাসা করতাম না—জাতিবাদীরা দণ্ডভোগের কারণ হিসাবে পাপকে খোঁজে না—নৈসর্গিক দশাবৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করে।

কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণসমাজ অধ্যাত্মবাদী—বিরোধী ধর্ম্মের অভ্যুত্থান—বিজাতীয় বিধর্ম্মীদের আক্রমণ কোনটাই যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছাড়া—তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি ছাড়া সংঘটিত হয় নাই—এ কথা আর যে অস্বীকার করুক—ব্রাহ্মণ-সমাজ তা' অস্বীকার করবে না। তাই জিজ্ঞাসা করি—কোন পাপে ব্রাহ্মণ-সমাজের এত শাস্তি ভগবান বিধান করেছেন?—যুগে যুগে তাঁর দণ্ডবৈচিত্র্যের শেষ নাই। ব্রাহ্মণ্যশাসনের মূলে বা অন্তস্থলে মনুষ্যত্বের বিরোধী কি এমন কিছু ছিল বা আছে যার জন্য "যুগে যুগে দণ্ডাঘাতেও ঝরছে না তার কর্ম্মফল।" জাতীয় জীবনগঠনের প্রয়াসের দিনে সে খোঁজটা ভাল ক'রে নেওয়ার দরকার। ব্রাহ্মণ্য শাসনের আদর্শে উদার ভাবে জাতীয় জীবনগঠন চল্‌তে পারে কিনা ভাববার কথা। বিজাতীয় আদর্শে এ জীবন গঠিত হোক—ইহা কারো অভিপ্রেত নয় কিন্তু এই ভারতেই ব্রাহ্মণ্য শাসনের বিরোধী বহু ধর্ম্মানুশাসনের অভ্যুদয় হয়েছিল। সেগুলির সম্বন্ধেও ভেবে দেখা উচিত।

উদাহরণ স্বরূপ বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, কবীর, রামানন্দ, পরমহংস ও বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুশাসনের আদর্শগুলি ভেবে দেখতে বলি।

শুধু টিকে থাকার কোন গৌরব নেই—সগৌরবে টিকে থাকাই বাঞ্ছনীয়। দণ্ডভোগ করবার জন্যও টিকে থাকার দরকার। মৃত্যুই খুব বড় দণ্ড নয়। ভগবান যাকে কঠিনতর দণ্ড দিতে চান তাকে দণ্ডভোগের জন্যই টিকিয়ে রাখেন।

দণ্ডভোগের কথায় হিন্দু-সমাজ না বলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কেন বলছি। শাসকের শাস্তিভোগে শাসিতের যে শাস্তিভোগ স্বাভাবিক তা ব্রাহ্মণ্য সমাজের অধীন জনগণের ভাগ্যে ঘটেছে। যারা ব্রাহ্মণ্য সমাজকে আঁকড়ে ধরেছিল তারা ঘরের দণ্ড বাইরের দণ্ড দুই ভোগ করেছে, আজো করছে।

যারা বুদ্ধ মহাবীর চৈতন্য নানক কবীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুশাসনকে আশ্রয় করেছিল তাদের দণ্ড ঢের কম হয়েছে। যারা সম্মান মর্য্যাদাকে জীবনের সব হতে বড় মনে করে, তাদের মর্য্যাদাহানিই সব হ'তে বড় দণ্ড। যাদের কোন মর্য্যাদাই ছিল না—তাদের সে দিক হতে কোন বড় দণ্ডই হয় নাই। যারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের মর্য্যাদা ত্যাগ করেছে—তারা অন্য সমাজের মর্য্যাদা পেয়েছে। যারা ইসলামকে আশ্রয় করেছে তাদের মর্য্যাদা তারা ইসলাম হ'তেই পেয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজে যাদের কোন মর্য্যাদা ছিল না, তারা ইসলামের আশ্রয়ে মর্য্যাদার আস্বাদ পেয়েছে। যারা 'অমানিনে মানদ' ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারাও মর্য্যাদা পেয়েছে।

দারিদ্র্যের দণ্ডের কথা ইদানীং উঠেছে—ভারতবর্ষে দারিদ্র্যকে কোন দিন বড় দণ্ড মনে করে নাই। ধনী কারা? যাদের ধন আছে তারা ধনী; আর যাদের ধনের জন্য পৃথক পরিশ্রম করতে হয় না—প্রচুর না হলেও আপনিই আসে তারাও ধনী। যাদের ধনের জন্য পৃথক পরিশ্রম করতে হতোনা আপনিই জুটত—তাদের যদি আজকে পেটের দায়ে খাটতে হয় তবে দারিদ্র্যের দণ্ড তারাই বেশী ক'রে ভোগ করবে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা ঢের ভাল হয়েছে। ধনার্জ্জন সাধনাসাপেক্ষ, ধনার্জ্জনের সুবিধা সুযোগ তারা যে আজ পাচ্ছে, শুধু ধন কেন, বিদ্যা জ্ঞান যশ মান পদগৌরব সবই অর্জ্জন করবার অধিকার ও সুযোগ যে তারা পাচ্ছে তাতে মনে হয় না তারা দণ্ড ভোগ করছে। কাপুরুষতার দণ্ড, নির্ব্বিচারে প্রভুত্ব মেনে নেওয়ার দণ্ড তারা ভোগ করেছে বৈকি! কিন্তু ব্রাহ্মণের বা ব্রাহ্মণ্য সমাজের পরিপোষকদের তুলনায় তাদের দণ্ড ঢের কম। বৈশ্য শূদ্রগণ তা ছাড়া অন্য দণ্ড ভোগ করে নাই। নিম্ন শ্রেণীর জনগণ যে ব্রাহ্মণ্য শাসন অপেক্ষা বিদেশী শাসনকে স্পৃহনীয় মনে করে, তার একটা কারণ তারা বর্ত্তমান শাসনে দারিদ্র্যের মধ্যেও সুখে আছে—মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাটা ত' কম নয়। তাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্য্যাদা ও মহত্তর সম্মানলাভের সম্ভাবনা ঘটেছে—অধিকার ঘটেছে। তাই বলছিলাম—ব্রাহ্মণ্য সমাজই দণ্ড ভোগ করছে।

পসারিণী

শ্রীহিরণ্ময় মুন্‌সী

কিসের পসরা শিরে,—
বহি পসারিণী ভাস অহরহ আকুল নয়ননীরে।
ফির বাটে বাটে হাটে মাঠে ঘাটে পসরা মাথায় করি,
আজ নয় পথে পথে ফিরিতেছ যুগযুগান্ত ধরি,
আজ নয়, পথে বাহির হ'য়েছ কোন্ আদিকাল হতে,—
ভেসে ভেসে এলে এই ধরণীর ধূলি-বিমলিন স্রোতে।
না জানি সে কোন আদিম প্রভাতে আঁধারের বুক চিরে,
এলে যে বাহির হ'য়ে পসারিণী জ্যোতি-সাগরের তীরে।
মাথায় বহিয়া জ্যোতির পসরা,—উষার অরুণরাগে,—
এলে পসারিণী পা ফেলিযা তালে সৃষ্টির আগে আগে।
এলে যে নাচিয়া চপল নৃত্যে বাজাইয়া কিঙ্কিণী,
পায়ের ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর নূপুরের রিণি-ঝিনি।
তব পথ-চলা-ছন্দে ধরার ছন্দ উঠিল জাগি,—
লো ধনি! জাগিল ধরণীর ধ্বনি তব পদধ্বনি লাগি।

'এই পসরার পসার কে নিবি'—পসারিণী চল হাঁকি,
ফির দেশে দেশে বিমলিন বেশে দ্বারে দ্বারে যাও ডাকি।
ডাক দাও কারও আঁখি ইসারায়, চুপে দাও হাতছানি,
ফিরি ক'রে ফির পথে পথে তাহা হ'য়ে গেছে জানাজানি।
পথের ধূলায় ধূসর হইয়া ঊষর মরুর বুকে,—
চল পসারিণী একাকিনী নিয়ে চোখে জল হাসি মুখে।
তব পসরায় কি পসার রহে কে তাহা বলিতে পারে,—
গূঢ় রহস্যে আবরিত তাহা ভারী বেদনার ভারে।
তবু নিখিলের মানব মানবী চাহে ও পসরা পানে,
ব্যথার পসরা ব'য়ে মর শিরে কেহ কি লো তাহা জানে।
গোপন গহন বেদনা মোহন তব পসরায় ভরা,
আছে আধোহাসি ভালবাসাবাসি আছে আঁখিজল ঝরা।
আছে নিখিলের হৃদয়-বেদনা—ক্রন্দন বুকভাঙ্গা,
পসারিণী! তব হৃদয়রক্তে ধরা বুঝি হ'ল রাঙ্গা।

"প্রাণের মূল্যে কে কিনিবি মোরে"—মিছে ডাকাডাকি কর,
মিছে নিখিলের দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত হানি মর।
কার আছে প্রাণ, কার আছে কড়ি, কে লইবে তোমা কিনে,
পসারিণী তব প্রেমের পসরা কে লইবে বল চিনে!
যে চিনেছে সে কি রহে আবদ্ধ ধরার রুদ্ধ ঘরে,
ঘর ছেড়ে সে যে তোমার পিছনে পথে পথে ঘুরে মরে।

অয়ি পসারিণী! চল একাকিনী সঙ্গেতে কেহ নাহি,
যত বেদরদী মরিছে তোমার কলঙ্কগাথা গাহি।
অবোধ মানব শিশুদের দল তোমারে হেরিয়া কাঁদে,
যত যুবকেরে হে নবযুবতী, ফেল যৌবন-ফাঁদে।
তব অপাঙ্গ দৃষ্টিতে হয় অনঙ্গ জরজর,
বুকের গোপন মদন-কুম্ভ নিতি অমৃতে ভর।
ও তব লাস্যবিলাসে এ ধরা থর থর ওঠে কাঁপি,
অজান প্রেমের উজান বহে গো ' নিখিলের হিয়া ছাপি।
কুমার ভুলিয়া কৌমার-ব্রত কুমারীর তনুতটে
আছাড়িয়া পড়ে, মাথা কুটে মরে—অঘটন যত ঘটে।

পসারিণী তব যৌবনাকাশে হাসে যে পূর্ণশশী,
তুমি তারি সাথে কেঁদে এ ধরাতে এলে কোন্ উর্ব্বশী।
এলে কোন্ নটী নাচিতে নাচিতে সুরসভা পরিহরি,
পদ-মঞ্জীর খসিল তোমার ধূলিতলে গুঞ্জরি।
খসিল বক্ষ-কঞ্চুলিকার অঞ্চল ঝল মল,—
হাসি ভুলে এলে সাথে সাথে নিয়ে আঁখিজল চল চল।
পসারিণী তব পসরা বিকাবে এই নিখিলের হাটে,
ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁদিয়া ফিরিতে দীরঘ বরষ কাটে।
পসরার সাথে বিকাবে নিজেরে রাখিবেনা কোন কিছু,
তোমারে লভিয়া নিখিল বিশ্ব ধাইবেনা কারো পিছু।
তোমারে লভিয়া ধরণীর ধূলা আর ধূলা নাহি রবে,
তব পসরার পরশ মাণিক পরশেতে সোণা হবে।

শোন—শোন—পসারিণী!
দাঁড়াও দাঁড়াও পসরা নামাও—থামাও রিণিকি ঝিনি।
দিনু প্রাণ—দিনু হৃদয়-বেদনা—দিনু প্রেম ভালবাসা,
কলহাসি কল ক্রন্দন দিনু—শত আকাঙ্খা আশা।
নিজেরে সঁপিয়া তব পদে দিনু,—এস এ কুটীরদ্বারে,
বারেক দাঁড়ায়ে লহ এ প্রাণের মূল্য, অশ্রুধারে।

রূপের স্বরূপ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌন্দর্য্য বস্তুটি কখন যে কাহাকে কি ভাবে আঘাত করিবে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে কিছুই বলা যয় না। ব্রাহ্মণের ঘরের এক বর্ষীয়সী বিধবা নাকি তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছিলেন; 'নক্ষিছাড়া মোচনমানগুনো কত শ্বেত পাতরই নষ্ট করেছে। থাকলে কত পাথরবাটি হ'ত!' কথাটা প্রণিধানযোগ্য; বৃদ্ধার রসজ্ঞান, সৌন্দর্য্য-বোধ নাই বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

যাহা সুন্দর তাহাই সার্থক কি না এই প্রশ্ন উঠিয়া পড়িতেছে। ঐহিক জগতে পাথর বাটির একটা স্থূল সার্থকতা আছে। তাজমহলের তাহা নাই। তাজমহলে করিয়া অম্বল খাওয়া চলে না।

তবে কি তাজমহল নিরর্থক? অনেক খানি জমি জুড়িয়া ঐ যে একটা পাষাণ স্তূপ পড়িয়া আছে উহার কি কোন কার্য্যকারিতাই নাই?—যদি বলি নাই, ছোট বড় যত কবি আছেন সবাই তেরিয়া হইয়া উঠিবেন। যদি বলি আছে, তার্কিক অমনি মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন; সেটি কি?

কবি এবং তার্কিক দু'জনকেই এড়াইয়া চলা ভাল। কিন্তু রূপ এবং কার্য্যকারিতার সম্বন্ধটা যে কিরূপ এ সমস্যারও একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। সুন্দর জিনিস যে কার্য্যকরা হয় না এমন নয় এবং কার্য্যকরী বস্তুকে সুন্দর করিবার চেষ্টা জগতে অহরহঃ চলিতেছে। বস্ত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, শিল্পের শাড়ী সুন্দর জিনিস; এখানে দুয়ের মধ্যে কোন বিবাদ নাই—বেশ মিলিয়া মিশিয়া আছে। আবার কুইনাইনে ঠিক ইহার উল্টা, সেখানে দুই পক্ষে ঘোর বিরোধ। ফলে, দেখা যাইতেছে যে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধটা পাকা সম্বন্ধ নয়—আকস্মিক ও অনিয়মিত।

অবশ্য রূপোপাসক দার্শনিক বলিবেন রূপ ও প্রয়োজনের বিরোধটা বস্তুগত নয়—প্রতীয়মান মাত্র। কারণ যাহা নিছক সুন্দর, যেমন রামধনু—তাহা যে একেবারেই অনাবশ্যক তাহা কেমন করিয়া বলিব? ভাত ডাল ছাড়া মানুষের অন্য ক্ষুধাও ত আছে। সেই ক্ষুধাকে যে সুন্দর তৃপ্ত করিতে পারে তাহাকে অনাবশ্যক বলিবার দুঃসাহস আর যাহার থাকুক আমার ত নাই।

যা হোক, এই সব সূক্ষ্ম ক্ষুধার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। এখন প্রশ্ন এই যে, যে সৌন্দর্য্য প্রয়োজন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন তাহার মূল্য কি? পৃথিবীতে কেবলমাত্র সুখ সুবিধা অন্ন বস্ত্রের পরিমাপে সকল বস্তুর মূল্য নিরূপণ হয় না একথা ঠিক। কিন্তু যে পরিমাপে হয় তাহা কি? কোথায় ইহার দাঁড়ি-পাল্লা, সের-বাটখারা?

যদি বলা যায় মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তির বাহিরে সৌন্দর্য্যের কোনও মূল্য নাই, কথাটা হয়ত' অত্যন্ত রূঢ় শুনাইবে। 'A thing of beauty is a joy for ever!' কিন্তু কাহার পক্ষে?

সেইটাই প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Cheese এর নামে ইংরাজ প্রমুখ পাশ্চাত্যদের মুখে লাল পড়ে, আমার গা বমি-বমি করে। এখানে cheese বস্তুটি thing of beauty হইল কি? যে বস্তুকে একজন ভাল বলে এবং অন্য জন মন্দ বলে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবে কে?

আমি নারীর রূপ-যৌবনকে প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া সুন্দর দেখি, চীনাম্যান আম্‌লাকে রুচির ভিতর দিয়া সুন্দর দেখে। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি ও চীনাম্যানের রুচি যদি না থাকিত তবে নারী এবং আম্‌লার কোথায় স্থান হইত? তাহাদের রুচি-প্রবৃত্তি-সংস্কারবিবর্জ্জিত স্বরূপকে আমরা কোথায় রাখিতাম?

অনেক চেষ্টা করিয়াও নিছক নির্লিপ্ত অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য্যকে কোথাও পাইতেছি না। মনের সঙ্গে মিশিয়া বর্ণসংকর হইয়া যাইতেছে।

সুন্দরের স্বরূপ আজও মানুষের চক্ষে ধরা পড়িল না, ধরা পড়িল কল্পিত মানস সরোবরের জলে তাহার বিকৃত প্রতিবিম্ব!

ব্রাহ্মণ ঘরের বর্ষীয়সী বিধবার কথাই ক্রমে সত্য হইয়া উঠিতেছে। সুন্দরের মাপকাঠি নাই। নিজের সুখ সুবিধা তৃপ্তি বাসনা প্রবৃত্তি সংস্কার ক্ষুধা লোলুপতাকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া, যেদিন বস্তুকে নগ্ন করিয়া উলঙ্গ করিয়া দেখিতে পারিব সেইদিন বোধ করি রূপের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িবে।

তাবৎকাল শুধু এইটুকুই জোর করিয়া বলা চলে যে তাজমহল আমার চোখে সুন্দর লাগে—তার বেশী নয়।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের দান

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রত্যেক সাহিত্যের গঠনের মূলেই দুইটী স্বতন্ত্র কার্য্যকরী প্রেরণা থাকে—একটী বাহিরের, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের যে অবস্থার মধ্যে সেই সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে; অপরটী ভিতরের, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ইতিহাসের যে tradition সেই জাতির নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে—এই দুইটী স্বতন্ত্র ধারার পূর্ণ সমন্বয় ব্যতীত কোন সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি সম্ভব নহে—এই দুইটী ধারাও আবার অবস্থাভেদে পরস্পর আপেক্ষিক এবং দেশভেদে, ইতিহাসভেদে, tradition ভেদে বিভিন্ন। কাজেই বাঙ্গালা-সাহিত্য বাঙ্গালা দেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য হইলেও উভয়ের গঠন-পরিবেষ্টন এক নহে, অন্তর্গূঢ় প্রেরণাও এক নহে। তজ্জন্য উভয় জাতির উপজীব্য সাহিত্যের মূলে অনুসন্ধান করিলে দুইটী পৃথক সূত্রের (source) সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রধানতঃ হিন্দু-লেখককেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং যে কয়জন মুষ্টিমেয় মুসলমান বাঙ্গালী লেখক আছেন তাঁহাদিগকে এই ভীড়ের মধ্যে দাবিয়া রাখিয়া থাকেন। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ ভাবে মতামত প্রদান করিতে হইলে অবশ্যই একথা স্বীকার্য্য যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে হিন্দুর দান সমধিক হইলেও মুসলমানেরও একটা বিশিষ্ট দান আছে—সেই দান কতটুকু তাহারই অপক্ষপাত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূলতঃ উদ্দেশ্য। সমস্ত লেখক লইয়া আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, কয়েকজন মাত্র শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা লইয়া বর্ত্তমানে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে কোন মুসলমান লেখক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইতিহাসের দিক দিয়াও বটে, সাহিত্যের দিক দিয়াও বটে, স্থায়ী হিত সাধিত হইতে পারে।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে (বৈষ্ণব যুগে) কয়েক জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সহিত সাক্ষাৎ হয়, দীনেশ বাবুর পুস্তকে ইঁহাদের জীবনী ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—৺রমণীমোহন মল্লিক ও সাহা আকবর, সেখ মর্ত্তুজা প্রভৃতি কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'প্রাচীন মুসলমান বৈষ্ণব-কবি' নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় তিনি এই সকল লেখকের উপর একটী সমালোচনামূলক studyও করিয়াছেন; তাহা আবশ্যক হইলে পঠিত হইতে পারে। এই সকল পদের সম্বন্ধে প্রাচীনদের সহিত আমাদের এক আধটু মতের বিভিন্নতা আছে—স্বর্গীয় রমণীবাবু বলিয়াছেন যে বৈষ্ণব spirit যাঁহারা সত্য সত্যই প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন ইঁহারা (মুসলমান কবিরা) তাঁহাদের অন্তর্গত, ইঁহাদের কবিত্ব সাধনা-লব্ধ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসাপেক্ষ। কিন্তু আমরা মনে করি বৈষ্ণব spiritকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কারণ যেরূপ শিক্ষা, দীক্ষা, অনুশীলন ও পারিপার্শ্বিকতা সে অনুভূতির অনুকূল তাহা তাঁহাদের পক্ষে সুগম ছিল না। এইখানে আসিয়া পড়ে পূর্ব্বকথিত দ্বিতীয়বিধ প্রেরণার কথা। এই জন্য একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই সকল কবিতাতে দেখিতে পাইবেন কবিরা কেবল মাত্র ব্রজলীলার বাহিরের দিকটা লইয়া বড় বেশী নাড়াচাড়া করিতেছেন; ছন্দের লালিত্য, শব্দ-যোজনার কৌশল, অলঙ্কারবিন্যাস সমস্তই আছে, কেবল নাই প্রাণ, যে প্রাণ আছে চণ্ডীদাসে, জ্ঞানদাসে, গোবিন্দ দাসে—দাসত্রয় ছিলেন সাধক, যে সত্য সহজ আনন্দে আপনার স্ফুট চেতনার মধ্যে আপনি ফুটিয়া ওঠে সেই সত্যের তাঁহারা ছিলেন উপাসক। মুসলমান কবিরা সে সত্য যদি ধরিতে না পারিয়া থাকেন ত' দুঃখ করা যাইতে পারে—নিন্দা করা চলে না। বৈষ্ণব রসের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁহাদের ছিল না, কারণ এই অনুভূতির পাথেয় যাহা তাহা তাঁহারা সম্যক রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম বঙ্গীয় পুঁথি-সাহিত্য (folklore) সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। সময় হিসাবে মোটের উপর এগুলি ইংরাজাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বের জিনিস মনে করা যাইতে পারে। 'গোলে হরমুজ' 'লজ্জতেনেছা' জাতীয় পুঁথি সাহিত্যের উপর হিন্দু ত' দূরের কথা মুসলমান লেখ-

কেরাও খুসী নহেন। কুট্‌নীর সাহায্যে গৃহস্থের বধূকে প্রলুব্ধ করা, শিকড়-বাকড় ও মাদুলীর দ্বারা পরপুরুষ বশীকরণ, গোপনে কুমারী-কন্যার গর্ভ-সঞ্চার, নিদ্রিত স্বামীকে প্রবঞ্চিত করিয়া কুলবধূ কর্তৃক প্রতিবেশীর সহিত ব্যভিচার, নানাবিধ টোট্‌কা, ঝাড়ফুক্ ইত্যাদি অসংখ্য অকথ্য কদর্য্য জিনিস এই পুঁথিগুলির প্রত্যেকটী পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। পরবর্ত্তীকালের 'লয়লা-মজনু', 'গাজেব কাওয়ালী' 'বিদ্যা-সুন্দর' প্রভৃতির উপর এই সকলের ছায়া বড় সুস্পষ্ট। দীনেশ বাবুর পুস্তকে এই অংশের আলোচনার যাহা আছে তাহা মোটের উপর সত্য বলিয়াই অনুমান হয়।

কিন্তু মুসলীম বঙ্গীয় গ্রাম্য (গীতি) সাহিত্য যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে একটী ক্রমবর্দ্ধনশীল সাহিত্যের ধারা স্পষ্ট লক্ষিত হয়, যাহার রুচি, technique, expression (অভিব্যক্তি) উচ্চ চিন্তার দ্যোতক। এই পর্য্যায়ে আমরা মাণিক-পীরের গান, ছঁদ, ভাটিয়াল, খেউড়, কবি-গান, জারাগান, দেহতত্ত্ব-মূলক কতক কতক বাউল-গান, এবং মাঝিমাল্লাদের বদর-গান প্রভৃতিকে গণ্য করিতে পারি। বন্ধুবর মন্‌সুর সাহেবের 'হারা মণি' পুস্তকে এই জাতীয় বহু অপ্রকাশিত গীতি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল কবিতার ভিতর দিয়া একটা সামাজিক জীবনের আভাষ পাওয়া যায়, যে জীবনে বিভিন্ন বৈপরীত্যকে একটা সুশৃঙ্খল সমন্বয়ের মধ্যে আনিবার চেষ্টা পরিস্ফুট। হিন্দুর নারায়ণ ও মুসলমানের পীর একত্র করিয়া যেমন ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে মাণিক-পীরের উদ্ভব, সাহিত্যের মধ্যেও তেমনই হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির নীতিগত আদর্শকে এক করিয়া এই সকল কবিতার সৃষ্টি, মন্‌সুর সাহেবের পুস্তকেও এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

ইংরাজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তকার মুসলীম বঙ্গ-সাহিত্যের যাহা লক্ষণ এই সকল রচনায় তাহা যে খুব বেশী আছে এমন বলা যায় না। এই সকল জিনিসের মূল্য প্রধানতঃ ঐতিহাসিক হিসাবে। নিছক সাহিত্যের দিক দিয়াও যে একেবারে কিছুই নাই তাহা নহে—তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তদুদ্দেশ্যে একখানি সুনির্ব্বাচিত সংগ্রহ-গ্রন্থের আবশ্যক, সেরূপ গ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি বিশেষ অভাব।

(২)

বর্ত্তমান শতাব্দী হইতেই প্রকৃত পক্ষে মুসলীম বঙ্গ সাহিত্যের আরম্ভ। এই নব পর্য্যায়ের আরম্ভ গদ্য দিয়া সূচিত হয়। এই পর্য্যায়ে আমরা সর্ব্ব প্রথম মসরফ্ হোসেন ও মোজাম্মেল্ হকের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মসরফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' ও মোজাম্মেল হক্ 'ফেরদৌসী চরিত' লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের রচনা-পদ্ধতির তুলনা করিলে দেখিতে পাই মস্‌রফ্ হোসেনের ভাষা অধিকতর প্রাণস্পর্শী ও কবিত্বময়; যে করুণ পবিত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন ভাষা তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু এই আবেগ-বাহুল্যের খাতিরে আখ্যান-বস্তুর শৃঙ্খলা, রকম বা চরিত্রের ক্রমবিকাশপ্রদর্শন বিষয়ে তিনি স্থানে স্থানে অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছেন দেখিতে পাই। মোজাম্মেল্ হকের ভাষা বেশ আঁটসাঁট্, কাজের লোকের উপযোগী—বর্ণনার ঘনঘটা নাই, ভাবের ঝোঁকে logic (যুক্তি) উল্লঙ্ঘন নাই; তিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক, তাঁহার লেখার রীতিও তদনুযায়ী।

অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে আক্রাম খাঁ ও এক্রামুদ্দীন সাহেবের গদ্য-লেখক বলিয়া বেশ সুনাম আছে। 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে আক্রাম খাঁ যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন সেগুলি সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট না হইলে সৎসাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত। এক্রামুদ্দীন সাহেব আমাদের বিবেচনায় মুসলমান বাঙ্গালী গদ্য লেখকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' পুস্তকে রবীন্দ্র-কাব্যের কতকগুলি অংশের এমন অপূর্ব্ব সমাধান দেখিতে পাই যাহা স্বর্গীয় অজিতকুমার আভাষে মাত্র ছুঁইয়া গিয়াছেন। সু-সমালোচনার লক্ষণ সম্বন্ধে Arnold যাহা বলিয়াছেন "simple, sincere, well informed, ever widening its boundary of knowledge" এক্রামুদ্দীনের লেখায় সেই কয়টী বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ আছে, তদ্ভিন্ন তিনি সাম্প্রদায়িকতার বাতাস হইতেও অনেক খানি মুক্ত। রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুরটী ধরিতে হইলে তিনটী বিষয়ে অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক—হিন্দু উপনিষদ,

ক্লাসিকাল্ সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব কাব্য। এই তিন বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সুলেখক রবীন্দ্র-কাব্যের জীবন-দেবতার স্বরূপ-বিচার বা রবীন্দ্র-দর্শনের আপাতঃ বৈষম্যের অন্তবস্থিত মূলগত ঐক্য (spirit of unity) নিরূপণ করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য 'রবীন্দ্র-প্রতিভা'ও এ বিষয়ে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই—তবু ইহাতে পূর্ণতার দিকে যাইবার কতকটা চেষ্টা আছে।*

'ডালি' কাব্যের রচয়িতা সৈয়দ এমদাদ্ আলির 'তাপসী রাবেয়া' এবং কাজী নজরুলের 'মৃত্যু-ক্ষুধা'ও (উপন্যাস) জন-সমাজে সুপরিচিত। 'মৃত্যু-ক্ষুধা' সম্বন্ধে পরে নজরুল প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতেছে। 'তাপসী রাবেয়া' সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছু নাই, পুস্তকখানি সুলিখিত—বেশ একটা শুচিশুভ্র কমনীয়তা ইহার প্রত্যেকটী বর্ণ হইতে যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তবুও পুস্তকখানির ভাষায় আগাগোড়া কেমন একটা আড়ষ্ট জড়তা এবং পাঠ্য পুস্তকোচিত didacticism (উপদেশ বাহুল্য) লক্ষিত হয়, যাহা স্থায়ী সাহিত্যের পক্ষে একটী মারাত্মক অন্তরায় স্বরূপ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। যতদূর দেখা গেল তাহাতে মুসলীম বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যে কেবল মাত্র ইতিহাস, জীবনী ও সমালোচনা জাতীয় গ্রন্থের অনুশীলন হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যের অপরাপর শাখাগুলির উপর মুসলমান সাহিত্যিকগণের এখনও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই—'সওগাত' বা 'মোহাম্মদী'তে বিবিধ বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয় তাহাদের অধিকাংশই একান্ত দুর্ব্বল, উচ্চ চিন্তা ও গভীর অনুভূতিবিরহিত—ক্ষীণ ও বস্তুগত প্রকৃতির রচনা। উপন্যাস, ছোট গল্প বা নাটক যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা না হইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল মনে হয় না। কোন সাহিত্যের অন্তরের শক্তি প্রকাশ পায় তাহার গদ্যের প্রসারতায়, মুসলীম বঙ্গীয় গদ্যের এখনও নিতান্ত অপরিণত অবস্থা—এই দুরবস্থা নিবারণের কতদূর চেষ্টা মুসলমানেরা করিতেছেন ? †

(৩)

কিন্তু মুসলীম্ বঙ্গীয় পদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস বেশ আশাপ্রদ—অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহারা বিদ্যাবত্তা, প্রতিভা ও রচনা-নৈপুণ্যে আধুনিক কৃতী হিন্দু লেখকগণ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। একটু গোড়ার দিকে (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে) গেলে 'শেষ নবী' রচয়িতা আব্দুল হামিদ্ ও 'স্বর্গ ও নরক' রচয়িতা ফজলুল্ করিমের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। 'স্বর্গ ও নরক'—"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর"—কবিতাটী কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতার মত সর্ব্বজন পরিচিত; অনেকে কবিতাটী সাধারণ কথা বার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কবির নাম না জানিয়াই। মাত্র একটি কবিতা লিখিয়াই কবি সাহিত্য-ক্ষেত্রে Grayর মত একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, যদিও বর্ত্তমান কবিতাটী অবয়বে Grayর Elegyর ষোল ভাগের এক ভাগ মাত্র।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সৈয়দ এমদাদ্ আলি সাহেবের 'ডালি' কাব্যখানির অনেকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই পুস্তকের 'সেকেন্দ্রা', 'খদেজা দেবী' প্রভৃতি কবিতাগুলি অনেক পাঠ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গাঢ়তায়, প্রকাশের দরদে কোন কোন কবিতা অপূর্ব্ব মনে হয়—তবে কবির রচনায় ঢং হেমচন্দ্র বা মাইকেলী যুগের অনুরূপ সে যুগের গীতি-কাব্যে যেমন একটা প্রকৃতিগত কৃত্রিমতা থাকিবেই থাকিবে ইহাতেও সেই লক্ষণ মধ্যে মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ—

'এই স্থানে মোগলের মুকুট রতন
শয়ান শান্তির মাঝে, পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির, উদয় গগনে
ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্য কথা
কত বরষের হায় কত শত ব্যথা!"

—সেকেন্দ্রা।

* কিন্তু তাঁহার উপন্যাস পড়িয়া আমরা মোটেই সুখী হইতে পারি নাই। সে সম্বন্ধে আলোচনা করাও সেই জন্য সঙ্গত মনে করি না।

† স্থানাভাবে আমরা মহম্মদ বরকতুল্লাহের 'পারস্য-প্রতিভা' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিলাম না।

(৪)

ইহার পর একেবারে কাজী নজরুল ইসলামে নামিয়া আসা যাউক। অনেকের মতে নজরুল মুসলীম বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেও কবিতা ও গানরচনার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে, বা 'সাত ভাই চম্পা' নাটকে ভাল জিনিষের অভাব নাই—কিন্তু নাটক বা উপন্যাস লিখিতে যে পরিমাণ লোক-চরিত্রজ্ঞান ও অন্তর্ব্বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতজনিত অবস্থান্তরের বিশ্লেষণ-শক্তি আবশ্যক তাহা কবির নাই। তাঁহার প্রতিভা খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবনকে দেখিতে পারে কিন্তু সমগ্রভাবে জীবনকে লইয়া বিভিন্ন দিক হইতে study করিতে বা তাহাকে একটা বৃহত্তর পরিণতিতে লইয়া যাইতে যে broadness of outlook দরকার নজরুলে তাহার একান্ত অভাব—। এই ত্রুটী শুধু নাটক উপন্যাসকে নয় তাঁহার কবিতাকেও অনেক স্থলে পঙ্গু করিয়াছে। কবি হিসাবে নজরুলের দোষগুণ দুইই খুব বেশী। প্রথমে দোষের কথাটাই বলিয়া ল'ই।—

তাঁহার সকল বিষয়েই অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত কম। 'ঝিঙে ফুল' কাব্যে তিনি শিশু-জীবন চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে সত্যকার শৈশবের ছাপ একটুও নাই; শিশু-মনের নিবিড় গহন গভীর রহস্যের অন্তঃপুরে যে বিরাট খেলোয়াড় অহরহ ভাঙাগড়ার খেলা লইয়া ব্যস্ত, নজরুল তাহার আভাষ পর্য্যন্ত পান্ নাই—'দোলন-চাঁপা' কাব্যে তিনি প্রেমের জয় গাহিয়াছেন, কিন্তু প্রেমের অতীন্দ্রিয়তা, যাহা দেহকে, মনকে এমন কি মনের অতীত সত্তাকে পর্য্যন্ত ধরা ছোঁয়া দেয় না, যে অপরূপ অনবদ্য গূঢ়তা (mysticism) হাফিজে, চণ্ডীদাসে, রবীন্দ্রনাথে আছে—তাহার কণামাত্র নজরুলের প্রেম-কাব্যে নাই; ইহা দেহেই পর্য্যবসিত, দেহের দরবারই কবির আপিলের চরম স্থান।

কমিউনিসম্ বা সোস্তালিসম্ অবলম্বনে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন (যেমন 'সর্ব্বহারা', সাম্যবাদী') তাহাতে আন্তরিকতা, আবেগ, দরদ সমস্তই আছে—কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই seriousness (গাঢ়তা) ও introspection (অন্তদৃষ্টি) এর অভাবে জড় গদ্যে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নজরুলী কাব্যের কতকগুলি technicality (বাঁধা বুলি) যেমন 'খুন্', 'দিল্', 'চাঙ্গাশির', 'শম্‌শের্' ইত্যাদি স্থানে স্থানে বেশ মনোজ্ঞ শোনাইলেও পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে একঘেঁয়ে না লাগিয়া পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে এগুলি স্বাভাবিক ভাবে আসে না, কবি জোর করিয়া (deliberately) ইহাদিগকে টানিয়া আনেন।

এবার অন্য দিকটা বলি। আজিকার বাঙ্গালা কাব্যে আমরা যে টুকু পৌরুষ বা শৌর্য্য দেখি তাহার অনেকটুকু নজরুলের দান। এই 'তরুণ কোমল কেঁদে-ভাসান' সাহিত্যে তিনিই প্রথম একটা প্রচণ্ড দুঃসাহস-দৃপ্ত বিদ্রোহী-মনের চিত্র আঁকেন, যাহার বাণী হইতেছে—

> "আমি তখনই করি যখনই চাহে এ প্রাণ যা ;—
> শত্রুর সাথে করি গলাগলি, মৃত্যুর সাথে ধরি পাঞ্জা!
> * * *
> আমি মানিনাক' কোন আইন:
> আমি টর্পেডো, আমি কামান, আমি ভীম ভাসমান মাইন
> —বিদ্রোহী (অগ্নিবীণা)

এই কবিতাটি Swinburneএর 'Hertha'র কথা মনে করাইয়া দেয়। 'মুক্ত-পিঞ্জর', 'দুর্গম-গিরি-কান্তার মরু', 'চলরে চলরে' প্রভৃতি গীত ও কবিতা ভাষার তেজে, প্রকাশের ভঙ্গিমায়, আলঙ্কারিকতার গৌরবে, ছন্দের বিচিত্রতায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ - ছন্দ-বৈচিত্র্য ও আলঙ্কারিকতা বিষয়ে নজরুলের স্থান বাঙ্গালা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের সমান না হইলেও অন্ততঃ ঠিক পরেই, কিন্তু প্রকৃত কবিতার বিচার হয় depth (ভাব-সম্পদ) লইয়া যাহা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলে উভয়েই বড় কম।

নজরুলের গজল-গানের খ্যাতি আছে—'বুলবুলে'র ভূমিকায় একজন লেখক ইহা লইয়া কবির উপর যথেষ্ট ফুল-চন্দনও বর্ষণ করিয়াছেন। 'রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু' 'বসিয়া বিজনে' প্রভৃতি গানগুলি আমাদের ভালই লাগে, তবে বেশীর ভাগ গজলেই ভাবের একান্ত অভাব, যে কয়েকটী conventional ভাব তাহাও আবার পুনরাবৃত্তিদোষদুষ্ট—তদুপরি সুর ও ভাষাগত একঘেঁয়েমিও অনেক ক্ষেত্রেই কবি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিহার করিতে পারেন নাই। তবে গজল জিনিসটা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন এবং নূতন দানের গৌরব যাহা তাহা অবশ্যই নজরুল সাহেবের প্রাপ্য।

তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক গানগুলির বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। এগুলি সম্পর্কে আমাদের মনে হয় উত্তেজনায় যাহাদের সৃষ্টি উত্তেজনার অবসানে তাহাদেরও অবসান। নজরুলী কাব্যের যাহা কিছু ভাল বা পাঠ্য তাহা স্বয়ং কবি কর্ত্তৃক 'সঞ্চিতা' নামক চয়নিকা গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। নজরুল সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের নিমিত্ত এই সঙ্কলনখানিই যথেষ্ট, এবং পুস্তকখানিও যে উপাদেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫)

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন 'সওগাত' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক, 'মোহাম্মদী'রও তেমনই কবি গোলাম মোস্তাফা সাহেব একজন খ্যাতনামা নিয়মিত লেখক—কবি হিসাবে উভয়ের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব আছে, এই ভাব মধ্যে মধ্যে বড় লজ্জাজনক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যায় force, vigour, energy, fire এসব বিষয়ে নজরুল অতুলনীয় (এবং অলজ্জানীয়) এবং intensity, depth, sincerity এসব বিষয়ে মোস্তাফা অতুলনীয়,—এতদুভয়ের সমন্বয়েই বড় কবির উদ্ভব, যেমন শেলী, রবীন্দ্রনাথ :—অভাব পক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে উভয় শাখারই মূল্য আছে ;— তবুও গীতি কাব্যের appeal অনেকখানিই নির্ভর করে intensityর উপর। সে দিক দিয়া মোস্তাফা কাজী হইতে বড় কিন্তু কাজীর চিন্তা-ক্ষেত্র মোস্তাফা হইতে অনেক বেশী প্রশস্ত। গোলাম মোস্তাফা একটী ভাব-বিধুর ব্যথা-বেদনা ও সঙ্কোচ-সঙ্কুল, সৌন্দর্য্য-বিহ্বল কবি-চিত্তকে অপরূপ ছন্দের সোনালী ইন্দ্রজালে বাঁধিতে গিয়াছেন— স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিশ্ব-মানবতা, সাম্য মৈত্রী, খিলাফ্‌-পৃপি ; রাষ্ট্র সমাজ, ধর্ম্ম, সব কিছুর (যেখানে যে গলদ আছে সে সকলের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এ সকল তাঁহার চিন্তার অন্তর্গত নহে। পক্ষান্তরে কাজীকে এই সকল জিনিষই অমরত্ব দিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে সৌন্দর্য্যের কবি ও মানুষের কবিতে পার্থক্য আছে ; সৌন্দর্য্যের কবি হইতেছেন artist (শিল্পী) আর মানুষের কবি হইতেছেন prophet (জন-শিক্ষক)। Artist যিনি তাঁহার জগৎ হইতেছে সুরের জগৎ, ছন্দের জগৎ, রসের জগৎ ; বিভিন্ন বৈষম্য, বহুমুখী বিশৃঙ্খলতা সমস্তকে একটী সমাহিত কেন্দ্রে নিবদ্ধ করিয়া একটা শাশ্বত সৌন্দর্য্য-লোকের মহান ঐক্যের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাওয়া, ইহাই হইতেছে artistএর কাজ। Prophetএর জগৎ হইতেছে বিদ্যালয়ের জগৎ, সেখানে সুনীতি, উপদেশ ও শুষ্ক 'মোরালিটি'র মাপকাঠি দিয়া সব কিছুর বিচার— যাহাই কিছু বলা হউক না কেন তাহায় অন্তরাল হইতে গুরু মহাশয়ের বেত্রদণ্ড মাথা তুলিয়া উঁকি দিবেই। মোটের উপর বলিতে পারি মুসলীম্ বাঙ্গালা সাহিত্যে কাজি যদি হন্ prophet ত মোস্তাফা হইতেছেন artist, যদিও কাজীতেও artistic quality প্রচুর আছে এবং মোস্তাফাও সম্পূর্ণ aesthetic artist নহেন।

সৌন্দর্য্যের অন্তর্লীন গূঢ় যে সত্তাকে কেহ পুরুষরূপে, কেহ প্রকৃতিরূপে, কেহ বা পুরুষ প্রকৃতির মিলনে সত্য শিব ও সুন্দররূপে কল্পনা করিয়াছেন—যে অখণ্ড পূর্ণতাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর অগণ্য রূপ-কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে— মোস্তাফার 'হাস্নাহানা'য় তাহার ইঙ্গিত মাত্র নাই। তিনি যে সৌন্দর্য্যের উপাসক তাহা ইন্দ্রিয়ের গোচরসাপেক্ষ প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য। কিন্তু mysticismএর গুণে তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে বেশ একটা অস্ফুটতার অন্তরাল আছে। উদাহরণ স্বরূপ 'সন্ধ্যাবাণী' কবিতাটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে—

> 'সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী...
> এই যে মোদের গোপন মিলন কেউ জানে না আমরা জানি!
> *   •   *   *   •
> তোমায় আমায় নদীর তীরে নিত্য সাঁঝে এমনই দেখা—
> লক্ষ আঁখির তলায় তলায় আমরা দুজন একা একা।"

(৬)

কবি হিসাবে জসীমউদ্দীনের স্থানটী একটু বিচিত্র রকমের। একদলের মতে জসীমের মত কবি নাকি 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। আর একদল তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত। এই দুইটী পরস্পরবিরোধী মতের যে কোন একটীকে অবলম্বন করিয়া একতরফা বিচার করা সঙ্গত নয়। প্রকৃত পক্ষে জসীমের কবিতাকে সমগ্রভাবে লইলে দেখিতে পাই দুইটী বিভিন্ন স্তরে তাহা

ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে পল্লীগ্রামের ভাষায় লিখিত সহজ সরল পল্লী-জীবনের কবিতাগুলি; দ্বিতীয় স্তরে standard অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক আদর্শে লিখিত আধুনিক ঢঙের কবিতা গুলি। যাঁহারা জসীমের অনুরাগী তাঁহারা প্রথম স্তর লক্ষ্য করেন, আর যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা দ্বিতীয় স্তর লক্ষ্য করেন। প্রশ্ন আসিতে পারে আমরা কোন্ দলে—উত্তরে বলিয়া রাখি আমরা উভয় দলেই—অর্থাৎ 'নক্সী কাঁথার মাঠে'র বা 'রাখালী'র কতকাংশের আমরা প্রশংসাও করি, 'বালুচরে'র আমরা নিন্দাও করি। নিন্দার কথাটা পরে বলিব, আগে প্রশংসার কথাটাই বলি

হিন্দু কবিদের মধ্যে যতীন্দ্র বাগ্‌চী, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় ও সাবিত্রীপ্রসন্ন পল্লী-জীবনকে কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্নের পল্লী জীবনের অভিজ্ঞতা বিশেষ ব্যাপক ও উদার, তাঁহার কবি-দৃষ্টি পল্লীর অন্তরের দিকে—তাই তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা, বেদনা ও নৈরাশ্যের কথা চোখের জলে লিখিয়াছেন। মমতা-করুণ কল্পনার আশার বাণী তাই তাঁহার পল্লীকাব্যে এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। কুমুদরঞ্জন নিরাবিল পল্লীজীবনের করুণ ছবি আঁকিয়াছেন এবং যতীন্দ্রমোহন ও কালিদাস রায় পল্লীকাব্যে একটা সুগভীর অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু জসীম এই তিন জনকেই (এক হিসাবে) অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কৃষাণ রূপাই ও তাহার প্রণয়িনী সাজুর জীবন-কাহিনীকে তিনি যে ভাষায়, যে ছন্দে ও যে অকৃত্রিম সহানুভূতি ও স্বাভাবিকতার প্রেরণায় 'নক্সী কাঁথার মাঠে' চিত্রিত করিয়াছেন পল্লী-কাব্যে তাহার অধিক উৎকর্ষ কেহ আশা করিতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত কয় জন কবিই পল্লীকে অল্প বিস্তর সহরের 'মিডিয়ম্' দিয়া দেখিয়াছেন, এই জন্য নাগরিক জীবনের কাল্পনিকতা তাঁহারা একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই; দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাবিত্রীপ্রসন্নের 'পল্লী ব্যথা'র প্রথম কবিতাটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। জসীমের কবিতার মূলগত প্রাণটুকু খাঁটি পল্লীর - বিরহিণী সাজু যখন তাহার অসাময়িক বিচ্ছেদের কারণ স্বরূপ ভাবিতেছে হয়ত বা সে (রূপাই) কোন জেলিয়ার' মাছ 'উধার' করিয়া খাইয়াছে, হয়ত কোন চাষীর 'মাচানের' 'জালি কুমড়া' পাড়িয়া খাইয়াছে. সেই পাপে আজ এই কষ্ট, তখন শিক্ষা দীক্ষা ও রীতিনবস্তু সভ্যতার জগৎ হইতে আমরা অনেক দূরে গিয়া পড়ি, যেখানে স্বাভাবিক উল্লাসে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। এই sincerity ই জসীমের কবিতার প্রাণ।

Standard বাঙ্গালায় জসীম যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন তাহার আমরা মোটেই প্রশংসা করিতে পারি না। তাহার expression (প্রকাশভঙ্গী) এ যথেষ্ট affectation লক্ষিত হয়, নিজের 'লাইন্' যাহা তাহা ছাড়িয়া দিয়া জসীম ভাল কাজ করেন নাই। বন্ধুবর গিরিজা বাবু জসীমকে বাঙ্গালার Burns বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আমরা আপত্তি করিব না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে স্কচ্ dialect পরিহার করিয়া খাঁটী ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া Burns সাহিত্যে বহু আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়া গেছেন।

জসীমের 'বালুচর'কে আমি ঠিক আবর্জ্জনা বলিতে চাহি না কিন্তু

"চলে মুসাফীর গাহি—

এ জীবন হায় ব্যথা আছে শুধু ব্যথার দোসর নাহি" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে উঁচুদরের কবিত্ব কিছু পাই নাই। নাগরিক-জীবনের মোহ জসীমকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, সেই জন্যই তাঁহার লেখায় দুইটী প্রকৃতিগত স্বতন্ত্র ধারা লক্ষিত হয়—একটী স্বতঃউৎসারিত, অপরটী কষ্টকল্পিত। বৃক্ষ আপন স্বাভাবিক পরিবেষ্টনের মধ্যে বাড়িয়া উঠিলে তবেই তাহাতে পুষ্পোদ্গম বা ফলের পরিণতি আশা করা সঙ্গত হয়—টবের গাছ সৌখীন ব্যক্তির বিলাস লালসা চরিতার্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও বৃক্ষের সার্থকতার জন্য বনই আবশ্যক।—ইংরাজ লেখক বলেন—প্রকৃতিতে কোথাও সরল রেখা নাই, তবুও সেই এলোমেলো বিশৃঙ্খলতার মধ্যেই সত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য; সখের কেয়ারী যতই বুদ্ধির বা শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক হউক তাহাতে স্বাভাবিকতা নাই—সৌন্দর্য্য প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিকতারই নামান্তর—সুতরাং সৌন্দর্য্যও নাই।*. জসীমের কাব্যের ক্ষেত্রেও ঠিক এই

* Walter Bagehot : Studies in Literature.

কথাই প্রযোজ্য। প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা বলিয়া রাখি—জসীমের লেখায় বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব, মামুলী-রীতির তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী, বিশেষতঃ এই কবিতাগুলিতে।

(৭)

আমাদের বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং হুমায়ুন কবীর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই উপসংহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

হুমায়ুন কবীরের কৃতী ছাত্র বলিয়া যতটা সুনাম আছে কবি বলিয়া ততটা না থাকিলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার একটি নিজস্ব স্থান আছে, সে স্থানটুকু সঙ্কীর্ণ হইলেও সুরক্ষিত—। সৌন্দর্য্য তত্ত্বের মূল সূত্রটী যতই অনুধাবন করি একটা জিনিস ক্রমাগতই চোখে পড়ে—অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও অপরিমেয় বেদনা এ দুয়ের পূর্ণ সমাবেশেই রসের সৃষ্টি। এই কথাই টেনিসনের 'Dream of Fair Women'এর সারাংশ,

"Beauty and anguish walking hand in hand,
To the downward slope of death."

কীট্‌সের 'Nightingale' ও শেলীর 'Skylark'এর প্রতিপাদ্য বিষয়ও এই—হুমায়ুনের কাব্য-সৃষ্টির অন্তর্গূঢ় বাণীও এই, তাঁহার "বড় ভালবাসি এই সুন্দরী ধরণীরে" কবিতাটীতেই ইহার পরিচয় পাইবেন। একদিকে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় ধরণীর বিচিত্র বন্ধন, অন্যদিকে অজানিত, অপরিজ্ঞেয় লোকাতীত লোকের অপরিহার্য্য আকর্ষণ.. এ দুয়ের মধ্যে ব্যথিত বিক্ষিপ্ত কবি-চিত্ত যে ভাবে সমন্বয় খুঁজিতেছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

কিন্তু একটা কথা এই সূত্রে বলিয়া রাখা দরকার। ইংরাজী কাব্যে অত্যধিক অনুরক্তির ফলেই কী না জানি না হুমায়ুনের অধিকাংশ কাব্যই শেষ পর্য্যন্ত নিজের ভাবগত individuality (মৌলিকত্ব) বজায় রাখিতে পারে না, অল্প বিস্তর সকল কবিতাই কোন না কোন ইংরেজ কবির (বিশেষ করিয়া শেলীর) আওতায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে; কবি হিসাবে এ limitation বড় কম নিন্দার নয়। এই জন্য আমরা হুমায়ুনের মূল রচনা অপেক্ষা অনুবাদ কবিতা (যেমন 'ঝড়') অধিক পছন্দ করি। ছন্দ বিষয়ে হুমায়ুনের হাত এখনও খুব কাঁচা..।

'উপাসনা'র নিয়মিত লেখক সুফী মোতাহার হোসেন, 'ময়নামতীর চর'-রচয়িতা বন্দে আলি মিঞা, 'জয়তী'-সম্পাদক আব্দুল কাদের, 'দীয়ানে হাফিজ'এর অনুবাদক বন্ধুবর কাদের নওয়াজ প্রভৃতির লেখাও আমাদের ভালই লাগে। কিছুদিন হইতে কয়েকজন মুসলমান মহিলাও সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাফিয়া খাতুনের নাম উল্লেখযোগ্য। *

মোটের উপর দেখা যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে মুসলমানের একটা নিজস্ব দান আছে—। বঙ্গ-ভারতীর কলেবরকে হিন্দু সাজাইয়াছে মুক্তা-হারে নীলাম্বরী-বাসে, প্রস্ফুটিত কমলদলে, উশীরানুলেপনে, সিন্দুর-কাজলে—মুসলমান সাজাইয়াছে মখমলের কুর্ত্তিতে, জরীর ওড়নায়, বোস্‌রার গুলে, মেহ্‌দীর লালিমায়, সুর্ম্মার কাজলে; হিন্দু গাহিয়াছে কমলবনের বন্দনা-গীতি, মুসলমান শুনাইয়াছে দ্রাক্ষা কুঞ্জের গজল-গান, হিন্দুর কোকিল ভ্রমর, মুসলমানের বুলবুল; হিন্দুর বীণা-তানপুরা, মুসলমানের এস্রাজ—হিন্দুর ধূপ ধূনা, মুসলমানের গুগ্‌গুল্ লোবান্ দুয়ের পূর্ণ সমন্বয়ে মহা-সরস্বতীর পূজা-আয়তন দিন দিন সমৃদ্ধতর, উন্নততর ও পবিত্রতর হউক ইহাই কামনা! অনেকে চাহেন হিন্দুর সাহিত্য ও মুসলমানের সাহিত্য বিভেদের সীমা রেখা কাটিয়া না চলিয়া এক হইয়া যাক্, এক অখণ্ড সাহিত্য, যাহার নাম হইবে বাঙ্গালা সাহিত্য—। হয় ভালই, কিন্তু আমাদের মতে তাহা হইতে পারে না, কেন পারে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জন্য নিজ নিজ কেন্দ্র হইতেই হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ সাহিত্য-সৃষ্টি করেন সেই ভাল—এক অখণ্ড সাহিত্যের গঠনে তাহাতে কিছুই বাধা পড়িবে না, হয়ত লাল-কালো রঙের একটু খানি ভেদ উভয় শাখার মধ্যে থাকিয়া যাইবে, কিন্তু মিলনের মোহানায় আসিয়া দুই এক হইয়া মিশিবে যেমন ভাবে সুর আসিয়া ছন্দের সহিত মেশে, স্বপ্ন আসিয়া মেশে সুষুপ্তির সহিত।

সর্ব্বশেষে একটা কথা—আবশ্যক বোধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কোন কোন লেখকের রচনার দোষ দেখাইতে বাধ্য হইয়াছি, এ জন্য কেহ যেন মনে না করেন যে আমি তাঁহাদিগের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করি—ব্যক্তিগত ভাবে বর্ত্তমান মুসলমান লেখকদের প্রায় সকলের সহিত আমি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহাদের ভালবাসা ও প্রীতি পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি, তাহাদিগের প্রতিভার প্রতিও আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে কিন্তু সমালোচকের স্থান গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত অনুরক্তির কথা হিসাবের মধ্যে আনা আমি মোটেই সঙ্গত মনে করি নাই; যাহা দোষের বলিয়া বুঝিয়াছি তাহার নিন্দা করিয়াছি—হিন্দু বলিয়া মুসলমানের নিন্দা করিয়াছি এরূপ মনে করিলে আমার উদ্দেশ্যকে ভুল করা হইবে।

* 'সওগাতে'র মহিলা-সংখ্যা দ্রষ্টব্য—

দোষী

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

দেশের কথা, তাই জানি—

স্ত্রীর সঙ্গে দুর্গাপদর বনিবনাও একদিন ছিল, এখন নাই। দুর্গাপদর মেজাজ আগেও ঠাণ্ডা ছিল—এখনও তাই, তার মন নরম চিরকাল। কিন্তু তার স্ত্রী রাজবালার মেজাজ এখন দুঃসহ—কথায় কথায় তার মুখ দিয়া আগুনের ফুল্‌কি ছোটে; কথাগুলি তার মনে কি ভাবে আসে কে জানে; কিন্তু মুখ দিয়া যখন তাহা বাহির হয় তখন যন্ত্রণায় দুর্গাপদর মনে হয় কোথায় যেন ফোস্‌কার পর ফোস্‌কা উঠিতেছে। ভিতরের ধাক্কায় সচল হইয়া আবার ভিতরের টানেই রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ একই কথার উচ্চারণে রাজবালার রসনা প্রতি নিমিষে খরতর হইয়া করাতের মত চলিতে থাকে···

রাজবালার মন কঠিন হইয়া গেছে।

রাজবালার দেহে রূপের সম্পদ ছিল, কিন্তু এখন তা চোখে পড়ে না। তার রং কালো, কিন্তু নিবিড় কালো নয়। পরিপূর্ণ কালোর যে অপরূপ শ্রী লাবণ্য আছে তাহা তাহার নাই; সে কালো কাঞ্চনের আভা লাগিয়া স্বচ্ছ হইয়া আসে নাই; দেখিলেই মনে হয়, ভিতরের কোথাকার একটা শূন্যতার লেহনে যেন তাহা পাণ্ডুর হইয়া আছে। সুন্দর কেবল তার চোখের তারাদু'টি—অগাধ কালো; দুর্গাপদ তার চোখের অপার কালোর দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত··· চোখের পাতা ভার ভার, ভুরু দু'টি স্থূল, পক্ষ্মরাজি সুদীর্ঘ –

আর সুন্দর তার ললাট—চমৎকার মসৃণ; অতি সুন্দর বিন্যাসে সুসমঞ্জস বক্র-রেখায় কেশমূল কর্ণমূল পর্য্যন্ত নামিয়া গেছে। সীঁথির দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া কেশগুচ্ছ কবরীর ভিতর ধরা পড়ে না—দুইটি অর্দ্ধবিকশিত পুষ্প-কোরকের মত ললাট স্পর্শ করিয়া ভাসিতে থাকে

যৌবনের পরিপূর্ণতা তার দেহটির বহু নিম্নে অবতরণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় বহিতেছে, তার উল্লাস নাই। সীঁথির উপরকার চুল কিছু উড়িয়া গেছে; অতিশয় অসতর্কতার সহিত, যেমন তেমন করিয়া, সেখানে সে খানিকটা সিঁদুর লেপিয়া রাখে।

দুর্গাপদ আরও শ্রীহীন।

দুর্গাপদ বি-এ পাশ করিয়াছে; সংস্কৃত কাব্যে তার বিশেষ দখল ছিল; নারীর রূপ বৈকুণ্ঠে সে মনে মনে বহু বিচরণ করিয়াছে, রূপ যে ভোগ্য বস্তু তাহা সে জানে কিন্তু স্ত্রীর রূপের অভাব বা শিথিলতা সে কোনদিনই তীব্রভাবে অনুভব করে নাই। তার সৌন্দর্য্যলোলুপ মন কেবল প্রিয়ার মনের দুয়ারে ভিক্ষার অঞ্জলি পাতিয়া রাখিত...

তার নিজের চেহারায় কোনো শ্রীই নাই; রং ফর্সা না হইলে লোকে ভূত বলিত—এম্‌নি সে ঢ্যাঙা আর কৃশ। প্রসাধনের দিকে আদৌ তার লক্ষ্য নাই···কিন্তু রোগগ্রস্ত সে নয়—তার শরীরের গঠনই ঐ; সরু সরু হাত পা; যেখানে হাড় সমতল নয় সেখানেই তা' বাহির হইতে নজরে পড়ে—চামড়ার নীচে মাংসের পরিমাণ এত কম।

যৌবনের চোখে ওদের পরস্পরকে ভালই লাগিয়াছিল।···দু'টি বৎসর আবেগের সঙ্গে কাটাইয়া রাজবালা একদিন যখন প্রসব হইতে পিত্রালয়ে গেল তখন বিচ্ছেদ-বেদনায় সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল; এবং তখনকার নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ বিরহবেদনা আর পত্রগুলি যে কোনো দম্পতির জীবনের অমূল্য স্মৃতি ও সম্পদ···

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় সেইদিনটি প্রথম যেদিন দুর্গাপদ লুক্কায়িত বার্ত্তা জানিতে পায়···

দুর্গাপদ ইস্কুল হইতে আসিয়া জলযোগের পর কথায় কথায় হঠাৎ বলিয়াছিল,—একটা ছেলে হ'লে বেশ হয় কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে...

শুনিয়া রাজবালা সলজ্জ যে হাসি হাসিয়া তার মুখের শূন্যতার পানে চাহিয়া চক্ষু নত করিয়াছিল সে হাসির পরিপূর্ণ আনন্দ-আঘাতে দুর্গাপদ আসনে বসিয়া থাকিতে পারে নাই—

—সত্যি? বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে স্ত্রীকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ..কতক্ষণ তা' সে জানে না!

—আগে বলোনি' কেন ?

রাজবালা পুনরায় হাসিয়া বলিয়াছিল,—অম্‌নি।

কিন্তু ছেলেটি বাঁচিল না—আঁতুড়েই মারা গেল।

জননীর ব্যথার কথা ফেণাইয়া বলিয়া লাভ নাই; রাজবালা কাঁদিল বিস্তর, এবং তার মা কালীতারা শঙ্কিত হইয়া তার গলায় একটি "অমোঘ শক্তিসম্পন্ন" মাদুলী পরাইয়া দিলেন…

শক্তিশালী মাদুলী ধারণ করিয়া রাজবালা নিজের সংসারে আসিল।

শূন্যক্রোড় স্ত্রীকে দেখিয়া দুর্গাপদ রেলওয়ে ষ্টেশনেই কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল।…পুত্রবতী স্ত্রী শিশুপুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিবে; স্ত্রীর কোল হইতে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে টানিয়া লইয়া সে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিবে, এবং তার হাসির প্রত্যুত্তরে তার স্ত্রীও হাসিবে—কিছু না বুঝিয়া ছেলেও তার কোলে হাসিবে—ননী আর চাঁদ, এই দুইটি জিনিষে তৈরী সে ছেলে।…ইত্যাদি সহস্রাধিক সুখদ কল্পনাকে সে প্রায় একটি বৎসর ধরিয়া নানা রসে উপভোগ করিয়া নানা মূর্ত্তিতে লালন করিয়াছে—অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, প্রাণের উদ্বেলতা সে ধারণ করিতে পারে নাই—নিভৃতে বসিয়া তাহাকে পুলকাশ্রু ত্যাগ করিতে হইয়াছে!

কিন্তু রাজবালা আসিল শূন্য কোল লইয়া।

ষ্টেশন হইতে ঘরে পৌঁছিয়া স্বামী স্ত্রীতে কি আলাপ চলিবে তাহার মহলা সে মনে মনে কতবার দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই…নিজের কথা সে নিজেই বলিত—তাহাতে বাধা পাইবার কথা নয়; স্ত্রীর উত্তরও সে-ই দিত—তাহাতেও বাধা পাইত না।…আলাপ নিশ্চয়ই কেবল ছেলের উপরেই চলিবে ভাবিয়া নিজেদের অবাধ আত্ম-বিসর্জ্জনে সে সুখী হইত…এমন কি, ছেলের স্বাস্থ্যসূত্রে কঠিন উদ্বেগও তাহাকে বহুবার সহ্য করিতে হইয়াছে…

কিন্তু সবই বৃথা হইয়া গেল—

সে এই ষ্টেশনে আসিয়াছে, কিন্তু রাজবালা ছেলে লইয়া আসে নাই…পরম নৈরাশ্য কয়েক বিন্দু অশ্রুর আকারে দুর্গাপদর চোখের কোণে দেখা দিল।

রাজবালা আসিল গোযানে, দুর্গাপদ আসিল হাঁটিয়া—কাজেই পথে কোনো কথা হইল না…কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছিয়াই মৃতপুত্র পিতার দুঃখ অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল; দুর্গাপদ স্পষ্ট কাঁদিয়া ফেলিল…বলিল,—ভেবেছিলাম এক, হ'ল আর এক।

রাজবালা স্বামীর শোকবাক্যে যোগদান করিল না; স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে ঘরে উঠিয়া গেল · এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দশ মিনিট বাদে সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুর্গাপদ তেমনি বিহ্বল অবস্থায় উঠানে দাঁড়াইয়া আছে—

সমুখ দিয়া যাইতে যাইতে রাজবালা বলিল,—কেঁদে কি হবে বলো! মানুষের ত' হাত নেই!

মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের হাত না থাকাটা অকাট্য সান্ত্বনার কথা না হইলেও, বোধ হয় অজ্ঞাত কাহাকেও দায়ী করিতে পাইয়া দুর্গাপদ বিহ্বলতা কিছু ত্যাগ করিল…বলিল,—বাজারে যদি যেতে হয় তবে এখনই যাওয়া দরকার।

রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃশব্দ থাকিয়া ন'টার পর শয়ন করিয়া দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করিল,—দেখতে কেমন হয়েছিল? কার মত?

রাজবালা বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শুইয়া ছিল; বলিল,—দেখতে পাইনি' আমি তাকে; দেখবার সময় পাইনি'।

ছেলের রূপ হইয়াছিল পিতার প্রতিমূর্ত্তির মত, ইহাই জানিতে পারিলে দুর্গাপদ যেন তৃপ্তি লাভ করে…পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—শোন'নি'? তোমার মা বলেন নি'?

—না।

কাহার মত চেহারা হইলে ছেলে দেখিতে পরম সুশ্রী হইত, নিঃশব্দ আর তন্ময় হইয়া দুর্গাপদ তাহাই খানিক চিন্তা করিল…তারপর তার মনে হইল, তাহাদের উভয়েরই আকৃতির প্রতিনিধি হইয়া জন্ম লইলে দাম্পত্য প্রণয়ের যথার্থ সার্থকতা ঘটে—স্বামী স্ত্রীর মিলন পূর্ণাঙ্গপ্রকট সত্য হইয়া ওঠে…সুতরাং জননীর ভুরু আর চক্ষু আর মুখের ছাঁদ, পিতার বর্ণ, আর নিজস্ব অপরূপ কান্তি ও দেহ-সৌষ্ঠব লইয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল নিশ্চয়…

আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—রং খুব ফর্সা হয়েছিল, না ?

রাজবালা বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, উত্তর দিল, না। উত্তর না পাইয়া দুর্গাপদ রাজপুত্রের মত অলৌকিক একটি ছেলের শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর রূপে গুণে রূপান্তর আর প্রয়াণানন্দ ধ্যান করিতে লাগিল।...

দুর্গাপদ শ্যামানন্দপুর রাণী ভগবতী দেবী হাই ইংলিশ স্কুলের থার্ড মাষ্টার। আরো দশজন তার সহকর্ম্মী আছেন, কিন্তু তার মত হাল্‌কা তাঁরা কেউ নন্। ছেলেদের 'নষ্টামি' তার সঙ্গে খুব—

মারিতে গেলে একজন বলে,—মারবেন না, সার, বুকে ঝাঁকি লাগবে···

পাশের ছেলেটা অমনি বলে,—ঝাঁক লাগলেই ভিরমি লেগে' যাবে...

—হ্যাঁ, তখন আন্ জল, আন্ পাখা, দে বাড়ীতে খবর। বলিয়া তৃতীয় ছেলেটা হাসে।

দুর্গাপদ মুখ নামাইয়া আসিয়া বসে, রিপোর্ট করে, ছেলেদের জরিমানা হয়, কিন্তু তাতে তাদের বাড়াবাড়ি আর দুর্গাপদর বুকের জ্বালা কমে না...

ছেলেদের ওই আমোদ—

কিন্তু জিম্‌ন্যাষ্টিক মাষ্টার সুধাকর বাবু দুর্গাপদকে কাঁধে করিয়াই দুইশত গজ দৌড়াইয়া যেদিন প্রথম স্থান অধিকার করিলেন সেদিন আমোদের চূড়ান্ত হইয়া গেল।···

যা-ই হোক্, বেতনটি পাওয়া যায়; তাহাতেই সংসার নিরাপদে অর্থাৎ প্রাইভেট না পড়াইয়াই চলে; কিছু জমেও মাসে মাসে। কিন্তু তাহার সন্তানভাগ্য এমন অপ্রসন্ন কেন হইল তাহা বিচার করিবার কেহ নাই।

মাতৃপ্রদত্ত সে মাদুলী রাজবালা ত্যাগ করে নাই—বহু পরীক্ষিত মাদুলী; অনেক কন্যা এবং বধূর মৃতবৎসা দোষ ঐ মাদুলীধারণে কাটিয়া গেছে বলিয়া কেবল ফাঁকা জনশ্রুতি আছে এমন নয়—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার তিন চারিটি বাল্যসখীই রহিয়াছে। কিন্তু রাজবালার বেলায় অব্যর্থ মাদুলী ব্যর্থ হইয়া গেল।

দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হইয়া রাজবালা মায়ের কাছে গেল, এবং পূর্ব্ববৎ শূন্য ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল; তার মাতা ঠাকুরাণী দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা মাদুলী শোধন করিয়া পুনরায় ধারণ করাইলেন।

প্রথম পুত্রের শোকে দুর্গাপদ সাতদিন কাতর ছিল; দ্বিতীয় পুত্রের শোকে সে একমাস ঝিমাইল—

ঝিমাইতে ঝিমাইতে সহসা একদিন দুর্ম্মতি ঘটিয়া এই হৃদয়বিদারক শিশুমৃত্যুর অপরাধ ইঙ্গিতে স্ত্রীর প্রতি আরোপ করিয়া বলিল,—

দু'টো ছেলে গেল···তোমরা কি করছ তা' জানিনে। বলিয়া কথাটার মত নিঃশ্বাসটাও সে রাজবালাকে শুনাইয়া ত্যাগ করিল···

রাজবালা মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল,—তার মানে ?

দুর্গাপদ কথা কহিল না—

রাজবালা বলিল,—আমরা অযত্ন করে' মেরে' ফেলেছি, এই তোমার সন্দেহ বুঝি ?

দুর্গাপদর সন্দেহ তাই বটে, কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তার আর কথা ফোটে না; তার মনে হয়, ঠিক সেই সময়টিতে সে উপস্থিত থাকিলে আসন্ন সঙ্কটের সময় হাতে কলমে যত্ন করিতে না পারিলেও এমন বুদ্ধি সে দিতে পারিত, যাহাতে এমন দুর্দ্দৈব বোধ হয় নিবারিত হইত।

আগেই কেন এই বুদ্ধিটা মাথায় আসে নাই, এই অনুশোচনা লইয়া দুর্গাপদ উঠিয়া পড়ে; বলিয়া যায়,—বড়ই মনোকষ্টের কথা।

শুনিয়া রাগে রাজবালার অস্থির ঠেকে।

তৃতীয়বার একমাসের ছুটি লইয়া দুর্গাপদ 'ঠিক সময়ে' শ্বশুরালয়ে যাইয়া উঠিল; এবং সে ছুটি ফুরাইয়া গেলে ছুটি আরো বাড়াইয়া লইয়া সে সেখানেই রহিয়া গেল···

শিশু-পালন এবং প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধীয় ইংরেজি বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়া, তার নোট্ রাখিয়া এবং বিশেষ স্মরণীয় নির্দ্দেশগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া তার সময় কাটিতে লাগিল···

কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কাটিল না—ছেলে বাঁচিল না; মাত্র মিনিট পাঁচেকের পরমায়ু লইয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল;

দুর্গাপদর ধাত্রীবিদ্যা, সতর্কতা, আদেশ, উপদেশ প্রভৃতি পুস্তকানুযায়ী এবং নির্ভুল হইলেও কাজে লাগিল না

দুর্গাপদর শ্বাশুড়ী কালীতারা কাঁদিলেন যত, দুর্গাপদ নিজেও কাঁদিল তত —

কালীতারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—বাবা, তোমায় কি আর বল্‌ব' আমি। রাজু আমার পেটের মেয়ে বলে' তোমাকে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করছে।

ঘরের ভিতর হইতে রাজবালা ডাকিল, – মা...

ধ্বনিতে যে ভৎর্সনা ছিল মা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; তিনি জামাতার দুঃখেই পরম দুঃখিত – এমন মেয়ের গর্ভধারিণী বলিয়া তিনি চক্ষুলজ্জায় জামাতার সম্মুখে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন···

দুর্গাপদ বলিল,—এই বাড়ীরই দোষ ঘটেছে, মা!

—আমারও সে-ভয় এতদিনে হয়েছে, বাবা...আগেই কেন সাবধান হইনি'! বলিয়া তিনি মস্তকে করাঘাত করিলেন, কারণ বুদ্ধি বা নিবুর্দ্ধিতার স্থান ঐ মাথা।— তারপর বলিলেন,—কার দৃষ্টি পড়েছে···কি করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন! বলিয়া শিশুভুক্ কোনও জীবের ভয়ে বার কতক শিহরিয়া উঠিলেন,—ভাবনার তাঁর আর অন্ত রহিল

ছুটি ফুরাইলে দুর্গাপদ স্ত্রীকে লইয়া রওনা হইল —

কথা রহিল, এরূপ অবস্থা পুনরায় আসিলে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীই শ্যামানন্দপুরে যাইবেন; অদৃষ্টের নির্ম্মমতা কত, আর বিধাতা-পুরুষ কপালে আরও কি লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহা অকাট্য কি না তাহা সেখানেই পরীক্ষিত হইবে।

পরীক্ষার দিন আসিল —

এবং যে আশঙ্কায় কালীতারার বুক মাসের পর মাস অবিরাম দুরু দুরু করিয়াছে, সংবাদের পর সংবাদ লইয়া দুর্গাপদ ও রাজবালাকে তিনি বিশ্রাম দেন নাই, আর দুর্গাপদর জ্ঞানার্জ্জন শেষ হইতে পায় নাই তাহাই ঘটিয়া গেল—ছেলে বাঁচিল না।

দুর্গাপদ মুস্‌ড়াইয়া পড়িল···

কালীতারা অশ্রুধারায় দিবারাত্র স্নান করিতে লাগিলেন, অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কে আসিতেছে বার বার, আর এমন করিয়া বুকে শেল হানিয়া যাইতেছে! কে সে-ই পরম শত্রু!

রাজবালা কেবল বলিল, তাহাও যেন বক্র সুরে,— তোমাদের বৃথাই ভাবনা আর চেষ্টা, মা।···সে আর কিছু বলিল না, এবং তিনটি মৃত সন্তানের জননী হইলেও তাহাকে কেহ প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলিতে দেখিল না···

কালীতারা বিশ্রাম দিয়া কন্যাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিলেন—

কিন্তু এবার দোষী করিলেন জামাতাকে। তিনি পূর্ব্ব-বর্ত্তী সন্তানটিকে চিহ্নিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন···কিন্তু কলেবরে ইচ্ছাকৃত খুঁৎ লইয়া ছেলে জন্মিবে এবং ছেলে বাঁচাইবার ঐ রীতি প্রাচীন সুতরাং অসভ্য কুসংস্কারমূলক বলিয়া দুর্গাপদ তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই।

কালীতারা বলিয়া গেলেন,—আমার সে কথাটা শুনলে বোধ হয় থাক্‌ত'। বলিয়া তিনি কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিরক্তিই প্রকাশ করিলেন।

মায়ের যাইবার সময় রাজবালা তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইয়া হঠাৎ একটু বিচলিত হইয়া গেল; মা তাহা লক্ষ্য করিয়া আরো কাঁদিলেন...

এবং তিনি চলিয়া যাইবার পরই রাজবালা যে মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল তাহা একেবারে নূতন এবং দুর্গাপদর কল্পনাতীত।

কালীতারা সকাল ন'টার গাড়ীতে প্রস্থান করিয়াছেন—

তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া দুর্গাপদ নিরাশ্রয় ব্যক্তির মত হাঁটু তুলিয়া আর মাথা ঝুলাইয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িয়াছিল—স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথাই হয় নাই।···ঢং ঢং করিয়া থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বেলা বাজিয়া উঠিতেই দুর্গাপদ মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; রান্নাঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমার চানের বেলা হয়েছে, তেল দাও।

রাজবালা চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—চান্ ক'রো না, হাড়ের মরচে ধুয়ে যাবে! হাড়ের গিটে গিটে তেল দাও, গেলবে। হাড়ের ওপর চামড়ায় তেল ঘসে' কি হবে!···

কি যে এ কথার অর্থ তাহা কিছুই দুর্গাপদর ঠাহর হইল না ; এবং কেন যে রাজবালা এমন অনুত্তোজিত কঠিন সুরে দুর্ব্বোধ্য কথাগুলি বলিয়া গেল তাহাও দুর্গাপদর হৃদয়ঙ্গম হইল না…

দুর্গাপদ অবাক্ হইয়া রহিল ; কিন্তু অনুভব করিতে লাগিল রাজবালার কথাগুলি তাহার মস্তিষ্কের পরিধি ত্যাগ করিতে চাহিতেছে না…আর তাহার দুর্ব্বল অস্থির ভিতর একটা সির্ সির্ কম্পন উঠিয়াছে…হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজবালা বলিতে লাগিল,—সাত বছর গোঁয়ালে' আমার নিয়ে তুমি, রোজ এমন চম্‌কালে এতদিন পাঁজরার হাড় কেটে প্রাণ বেরিয়ে যেত' তোমার।…আমার অদেষ্ট দেখে' তোমার চমকানই উচিত। তোমার বিবেচনা নেই এমনত' নয়! আমার স্বামীভাগ্য আর সন্তানভাগ্য দেখে' স্বয়ং শনি চম্‌কে যাবেন। তুমি মানুষ, শনির মত মানুষের মাথা সত্যই চিবিয়ে খাওনা—কিন্তু আমার অদেষ্ট তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ…

বলিতে বলিতে রাজবালা চৌকাঠ ডিঙাইয়া ভিতরে গেল—

তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল,—তোমার হাড় ছেঁকে আমায় যা' দিয়েছ তা' কি ভুলে বসে' আছ! কতকগুলো মরা ছেলে—হাঁসের মত বিইয়েছি, আর তুমি নিয়ে তা' জড়সড় করে এসেছ।…তা' চম্‌কাতে তুমি পারো, কিন্তু পুত্রশোক তোমার সাজে না।…

দুর্গাপদর মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর হাওয়ার ভিতর হইতে বুঝি সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে—তার সংজ্ঞা নিবিয়া আসিতেছে…

স্থির আর নতনেত্র হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাজ-মর্ম্মে

শ্রীগোপাললাল দে

দুঃসহ বিরহ বহি' জীবনের দীপ্ত মধ্যমানে,
সায়াহ্ন যাপন করি অকৃতজ্ঞ পুত্র-কারাগারে ;
প্রেম-পূজা সাঙ্গ হ'লে দিবসের দ্বন্দ্ব অবসানে,
ভেবেছিলে ঘুমাইবে, প্রেয়সীর পার্শ্বে একধারে।

দুই চারি দিন মাত্র, তার পরে সহসা একদা,
বিপুল জনতারবে ভেঙে গেল সুপ্তির জড়িমা ;
এ কি দেখি! নরনারী তীর্থকামী ফিরিতেছে সদা,
সিন্ধুরও ওপার হ'তে, ধরণীর সীমা হ'তে সীমা।

কেহ পুষ্পাঞ্জলি দেয়, চুম্বি তাজে মাথা নত করি,
নারী চলে নৃত্যপরা, কবি গীত করিছে রচনা ;
স্তবগান গায় কেহ, ইতি-কথা কেহ লেখে স্মরি,
সুদুর্লভ ছায়াছবি তুলি লয় শিল্পী শত জনা।

রচিছে প্রেমের তীর্থ কল্পশিলাস্তূপে সমাধির,
জাগর বাসর আজি ধরণীর পূজার মন্দির।

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কিন্তু পরদিন কি ভাবিয়া ভোর বেলাতেই উমা যে একটা টিফিন-কেরিয়ার লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইল তাহা সে-ই জানে। কাল সারা রাত ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত মনে যাহা ডাক দিয়া ফিরিতেছে তাহা কি পূর্ণ না হইয়া পারে? তাই দূরে প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি প্রদীপ ও নমিতাকে ট্রেণের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আর কোনো রোমাঞ্চকর বিস্ময় বোধ করিল না, আজিকার সূর্য্যোদয়ের মতই যেন তাহা অতি সাধারণ। দূর হইতেই প্রদীপ কহিয়া উঠিল: তুমি আবার কোত্থেকে হাজির হ'লে, উমা? বাঃ!

দু'জনে যতক্ষণ না একেবারে কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উমা শব্দ করিল না। কাছে আসিতেই সে বুঝি প্রদীপের হাত ধরিতে গিয়া নমিতার হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—তোমাকে আর একবার ভারি দেখতে ইচ্ছা করছিলো, বৌদি। এই জন্য কাল বারে বারে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। খালি মনে হচ্ছিল তোমার কাছ থেকে ভাল ক'রে বিদায় নেওয়া হয়নি।

নমিতা যেন উমার মনের বেদনা দেখিয়া ফেলিয়াছে। তাই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে কহিল, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, উমা।

দুইটি আনন্দপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া উমা কহিল,—আমারো তাই সাধ হয়, বৌদি। কোথায় যেন চলে' যেতে ইচ্ছা করে।

প্রদীপ কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছিল। হাসিয়া কহিল,—তুমি গেলে এবার আমার জেল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। শচীপ্রসাদ নিশ্চয়ই তাহ'লে দাঁত বত্রিশটা গুঁড়ো করে' দেবে। কাজ নেই উমা, ফুলহাটিতে ফল্‌স্ দাঁত কিন্‌তে পাবো না।

দু'জনে ট্রেণের কাম্‌রায় গিয়া উঠিল। নমিতা কহিল,—ভেতরে একটু বস্‌বে, উমা?

—কাজ নেই বৌদি। গাড়ী এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। শেষে যদি নাম্‌তে না পারি?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা কহিল,—হাতে তোমার ওটা কী?

সচেতন হইয়া উমা কহিল,—তোমার জন্যে কিছু খাবার তৈরী করেছিলাম, বৌদি। নাও, ধর।

—খাবার? কী আছে ওতে?

—কিছু কাট্‌লেট্—

হাসিয়া ফেলিয়া নমিতা কহিল,—কাট্‌লেট্! আমি যে বিধবা সে কথা তুমি রাতারাতি ভুলে গেলে নাকি, উমা?

—তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া উমা কহিল,—না, না, কচুরী আছে, গজা আছে—লুচি তরকারী, চাট্‌নী—কাল সন্ধ্যাবেলা সব তৈরী করেছি বসে' বসে'। মা জিগ্‌গেস্ কর্‌লে বল্লাম: এক বন্ধুর আজকে নেমন্তন্ন আছে, মা। তা, বন্ধু যদি সারারাতেও না আসে, তবে আমার আর কী দোষ বল? তুমি খেয়ো, বৌদি। খুব পরিষ্কার আছে সব—

হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—বৌদির জন্য তোমার এত মায়া, উমা! খাওয়ার জন্য মার কাছে পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বল্লে?

—মিথ্যা কথা বৈকি! নমিতা রুক্ষস্বরে কহিল,—আত্মতৃপ্তির জন্যে কে কবে না মিথ্যা কথা বলেছে?

—আমি বলিনি? কাল কোর্টে সমস্ত লোকের সাম্‌নে?

বিমূঢ় হইয়া প্রদীপ কহিল,—তুমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছো—এ তোমার মিথ্যা কথা?

নমিতা উদাসীনের মত কহিল,—তা কেন হ'তে যাবে? দাও তোমার খাবার, উমা। কাট্‌লেট্‌গুলো প্রদীপ বাবুকে খেতে বল।

উৎফুল্ল হইবার ভাণ করিয়া প্রদীপ কহিল,—তা আর বল্‌তে হবে না। কিন্তু মা যখন জিজ্ঞেস্ কর্‌বেন খাবারগুলো কী হ'লো তখন কি বল্‌বে, উমা?

নমিতা উত্তর দিল: বল্‌বে রাত্রে বন্ধু না আসাতে সকাল বেলায় সেগুলো আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। দাও, উমা, গাড়ী এবার ছাড়বে।

জানলা দিয়া টিফিন-কেরিয়ারটা তুলিয়া দিয়া উমা গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করিল,—আবার কবে দেখা হবে, বৌদি?

দেখা বোধ হয় আর হবে না, উমা। নিরুদ্দেশ-যাত্রার কি আর কোথাও পার আছে?

ফ্ল্যাগ নড়িল, বাঁশী বাজিল, আর একটিও কথা বলিবার আগে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। উমা নড়িল না; চিত্রার্পিতের ন্যায় মূক নিস্পন্দ হইয়া প্লাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নমিতা দেখিল, উমার দৃষ্টি ধাবমান ট্রেণকে অনুসরণ করিতেছে না, মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া আছে।

ক্রমে এই দৃশ্যটুকুও অপসৃত হইয়া গেল। বেঞ্চির এক ধারে উঠিয়া আসিয়া প্রদীপ কহিল,—কী আর মিথ্যা কথা বলে' এসেছ নমিতা?

নমিতা কঠিন হইয়া কহিল,—কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তা আপনি আজো অনুভব কর্‌তে শেখেন নি?

—খুব শিখেছি। তাই তোমার আচরণের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম না। গলার মালার বদলে পায়ের শৃঙ্খল হ'য়ে যদি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চাও, সে-বাধা আমি সইবো না, নমিতা।

—সইতে কে আপনাকে বলছে? আপনি যান্ না যেখানে খুসী,—কপালের নীচে আমারো দু'টো চোখ আছে।

—তবে শুধু শুধু কেন আমাকে জেল থেকে টেনে রাখ্‌লে? আমি না হয় অম্‌নি ক'রেই মর্‌তাম।

হাসিয়া নমিতা কহিল,—মর্‌বার আরো অনেক পথ ছিলো, প্রদীপ বাবু।

কিন্তু সেই ফুলহাটিতেই ফিরিয়া আসিতে হইল।

প্রদীপ কহিল,—আমার সঙ্গে এলে যে বড়?

নমিতার মুখে সেই হাসি: আপনি ছাড়া কে আর আমার সঙ্গী আছে বলুন। আমার জীবনে আপনার মূল্য কি একটুখানি? আপনি আমাকে কলঙ্ক দিলেন, আপনি অধিকারের গর্ব্ব কর্‌তে শেখালেন—আমি অত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে এই বনেজঙ্গলে আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবো।

—কিন্তু বনে-জঙ্গলে তুমি ত আর কোনোদিন ঘর বাঁধবে না।

—ঘর বাঁধবার জন্যই ত' আর পথ নিই নি।

নমিতা ঘর বাঁধিবে না বটে, কিন্তু ফুলহাটির এই শ্রীহীন শূন্য পুরীতে পা দিতে-না-দিতেই সে দু'টি কল্যাণময় ক্ষিপ্র-হাতে তাহার সংস্কারসাধনে তৎপর হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া সেবারতা গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গল-মাধুর্য্য! এইবার আর মথুরকেও ডাকিতে হইল না। যে বিছানা দুইটা দুই কোণে ধূলিলিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল তাহাদের ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রোদে দিয়া সে খট্‌খটে করিয়া তুলিল, ঘর নিকাইল, কাপড় কাচিল এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ যখন হাসিয়া কহিল,—আকাশে দিব্যি মেঘ করেছে, নমিতা, একবার নদীর ধার-টায় বেড়াতে যাবে না? নমিতা কথাটাকে উপেক্ষা করিয়া কহিল,—আমার এখনো কত কাজ বাকী।

হঠাৎ একটা মেঘ ডাকিয়া উঠিতেই নমিতা সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল ঘন নিবিড় মেঘে সমস্ত আকাশ বেদনার্ত্ত মুখমণ্ডলের মত থম্ থম্ করিতেছে। জীবনে সে এত বড় আকাশ দেখে নাই; পুঞ্জিত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গর্জ্জমানা নদীর ডাক যেন তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিল। কিসের তাহার গৃহ, কিসের বা তাহার গৃহকর্ম্ম? নমিতা মাঠের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল—দিগ্‌মণ্ডল ছাপাইয়া অন্ধকারের অজস্র বন্যা নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে মুক্তবেণী ঝটিকা, নীচে নমিতা—যেন শরীরিণী বিদ্রোহ-বহ্নি।

সঙ্গে সঙ্গেই জল আসিয়া গেল বলিয়া সে আর বেশিক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইতে পারিল না। নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের সবগুলি দরজা জানলা খোলা, জোরে জলের ছাঁট আসিতেছে, তবু তাহার খেয়াল নাই। চরাচরপ্লাবী অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল সেই জানে। কেন সে এইখানে আসিয়াছে, কোথায়ই বা আবার এমন মুক্তবন্ধ গগন-বিহঙ্গ মেঘের মত কোন্ অপরি-

চিত দেশের দিকে ভাসিয়া পড়িবে—আজিকার দিনে সে-সব সমস্যা তাহাকে একটুও আলোড়িত করিতেছে না। সে যেন জানিত আজ আকাশে ঝড় আসিবে। সে যেন আরো অনেক কিছু জানিত।

কতক্ষণ তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল খেয়াল নাই, হঠাৎ তাহার আচ্ছন্ন চোখের সাম্‌নে একটা অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। নমিতা চঞ্চল হইল না, লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মার দর্পণে সে বারে বারে যাহার ছায়া দেখিয়াছে, আজিকার এই ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষে এ বুঝি তাহারই প্রতিচ্ছবি! কিন্তু হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা টর্চ জ্বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল। এক ঝলক তীব্র আলোতে ঘরের রাশীকৃত অন্ধকার যেন বিকট হাস্য করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্য, নমিতা একটুও ভীত হইল না।

কাহার স্বর শোনা গেল, ধন্যবাদ।

আবার স্তূপীভূত স্তব্ধতা। এইবার অজয় টর্চটা টিপিয়া তক্ষনি আঙুলটা সরাইয়া নিল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি একলা বসে'? প্রদীপ কোথায়?

ইহাতে অভিভূত হইবার কি আছে? উমা যদি কাল রাত্রে ভাবিয়া থাকে যে ভোর বেলা ষ্টেশনে গেলেই প্রদীপের দেখা পাইবে, তবে নমিতার এত রাত্রের প্রতীক্ষার স্বপ্ন কি জীবনের একটি দিনেও সফল হইতে পারিবে না? সে মাথার উপর ঘোমটা তুলিয়া দিল না, খোঁপাটা বাঁধিল না পর্য্যন্ত, সুতীব্র আলোর ঝাঁঝে চক্ষু দুইটা আবিষ্ট হইতে না দিয়া অপলক চোখে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অজয় হাসিয়া কহিল, খুব অবাক হ'য়ে গেছ দেখছি। আমি ভূত নই, নেহাৎই বর্ত্তমান। জলে ভিজে বড় কষ্টে ষ্টেশন থেকে পথ চিনে এসেছি। প্রদীপ কৈ?

নমিতা কহিল,—বোস। পাশের ঘরে আছেন বোধ হয় ডেকে আনছি।

পাশের ঘরে প্রদীপও তাঁহার নিঃসঙ্গ বিছানায় বসিয়া ঝড় দেখিতেছিল। সে ঝড়ে সে বিপুল সম্ভাবনার সঙ্কেত খুঁজিয়া পায় নাই, এ অন্ধকার যেন তাহার জীবনের রাশি রাশি বিষণ্ণতা নিয়া আসিয়াছে। অচরিতার্থতার এমন রূপ আর সে কবে দেখিয়াছে? এত বড় বিস্তৃতির মধ্যে তাহারই জন্য কোথাও এতটুকু মুক্তি রহিল না?

নমিতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রদীপ টের পায় নাই। কি বলিয়া তাহাকে সে এ সংবাদ দেয় কিছুই ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ তাহার মাথায় এক ঠেলা দিয়া কহিল,—শিগ্‌গির দেখবেন আসুন কে এসেছে।

প্রদীপ ধড়মড় করিয়া উঠিল: কে? পুলিশ নাকি?

—না, না। শিগ্‌গির আসুন।

ঘরের কোন হইতে লণ্ঠনটা লইয়া নমিতার পিছু পিছু প্রদীপ অগ্রসর হইল। ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল ডান-হাতে একটা টর্চ জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর কেহ নয়, অজয়। সহসা প্রদীপ যেন এতটুকু হইয়া গেল।

প্রদীপকে দেখিয়া সৈনিকের ভঙ্গীতে অভিবাদন করিয়া অজয় কহিল,—ধন্যবাদ।

প্রদীপ আর একটু আগাইয়া আসিল বটে, কিন্তু বন্ধুর হাত ধরিতে সাহস পাইল না। খালি কহিল—তুমি? হঠাৎ? কোত্থেকে?

অজয় কহিল,—আসছি অনেক দূর থেকে! হঠাৎ-ই আমি এসে থাকি। খবরের কাগজে তোমাদের কীর্ত্তির কথা আদ্যোপান্ত পড়লাম—বেশ, তোমাদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি। তারপর?

কাহারও মুখে কথা জুয়াইল না। খানিক বাদে স্নিগ্ধ স্বরে নমিতা কহিল,—একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি—

ভিজতে আমাকে আরো অনেক হবে। রাত্রে আজ আর জল থামবে বলে মনে হয় না।

প্রদীপ কহিল: এক্ষুনি আবার চলে যাবে নাকি?

—নিশ্চয়। এক জায়গায় বেশীক্ষণ জিরোবার আমার নিয়ম নয়। কিন্তু ঘরদোরের এ কী হাল-চাল করে রেখেছ? টাকা পয়সার টানাটানি বুঝি? তা আমার কাছে যথেষ্ট আছে। কিছু চাই?

কেহ কোনো কথা কহিল না। জামার পকেট হইতে কতগুলি নোট বাহির করিয়া নমিতার বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া অজয় কহিল,—আমার কাছ থেকে উপহার নিতে তোমাদের কারুরই কোনো সঙ্কোচ করা উচিত নয়। এ দুর্দ্দিনে না চাইতে টাকা পাওয়ার মত পুণ্যফল আর মানুষের কী হতে পারে? এ দিয়ে ভাল দেখে খাট কিনো।

মশারি কিনো, আর নমিতার প্রসাধনের স্নো-টোগুলো, বুঝলে? তারপর এবার আর কি! একটি কেরাণী বনে' যাও, কিম্বা লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট, কিম্বা ধরো পাটের বা মাছের দালাল—কি বল?

প্রদীপ রাগ করিয়া কহিল,—একটা কিছু করতে হবে, সে পরামর্শ তোমার কাছ থেকে না নিলে কিছু এসে যাবে না।

স্বচ্ছ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অজয় কহিল,—ভালো। একটা স্কুল মাষ্টারীও মন্দ হবে না। তারপর নমিতা, ফোটো পূজা করতে করতে সুরাহা একটা কিছু হল তা' হলে? বেশ!

নমিতা একটিও কথা কহিল না, গভীর দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে চুলের দিকে কাপড়ের দিকে পায়ের দিকে চাহিতে লাগিল।

কি, কথা কইছ না কেন? আমি তোমাদের এমন সন্ধ্যাবেলাটা মাটি করে' দিলাম নাকি?

নমিতা কহিল,—বসুন, জামা কাপড়গুলো ছাড়ুন, আপনার প্রত্যেক কথার উত্তর দিচ্ছি।

আমার সময় কৈ? প্রতি নিঃশ্বাসে আমার 'বৎসর' চলে যাচ্ছে। তারপর হাসিয়া কহিল,—কী বা আমার কথা তার আবার উত্তর! কোর্টে দাঁড়িয়ে গ্লাডষ্টোনের ঢঙে কী তোফা বক্তৃতাই যে তুমি দিয়েছ—ক্যাপিট্যাল! কিন্তু কিছু খেতে দিতে পারো, নমিতা? ভারি খিদে পেয়েছে।

নমিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল: নিশ্চয়ই পাবি। বসুন, আমার মাথা খান্, মোটে দশটা মিনিট। যাবেন না, আমার এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।

অজয় বাধা দিয়া কহিল,—তুমি রাঁধতে চল্লে নাকি? পাগল! আমি এখনো এত বাবু হইনি যে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে ভাত খাবো। ঘরে তোমাদের গেল্‌বার কি কিছুই নেই? কী ছাই তবে ঘর করেছ, নমিতা?

পথে যাইতে উমার দেওয়া খাবারগুলির কথা মনে করিয়া নমিতা কহিল,—আছে কিছু, তবে তা বাসি, কাল-কের রাতের তৈরি।

বাসি! নিয়ে এসো চট্ করে'। বলে কিনা বাসি! বলে' বাঁশ চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌তে পারি।

নমিতা টিফিন-কেরিয়ারের বাটিটা লইয়া আসিল। অজয় একেবারে শিশুর মত হাত বাড়াইয়া বাটিটা গ্রহণ করিল। নমিতা কহিল,—দাঁড়ান্ একটা প্লেট নিয়ে আস্‌ছি।

প্লেট-ফ্লেট্ লাগবেনা। এই দাও। বলিয়া অন্ধকারে খাবারগুলি ভাল করিয়া ঠাহর না করিয়াই গোগ্রাসে গিলিতে সুরু করিল। ভাল করিয়া চিবাইবারো সময় হইলনা, একমুখ খাবার লইয়া কহিল,—দুদিন পেটে কিছু যায়নি একদম্। নেহাৎ ভাগ্য প্রসন্ন বলেই প্রসাদ মিল্‌লো। জল? জল লাগবেনা—এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে। দাঁড়াবার আর এক ফোঁটাও সময় নেই। মাঠের মধ্যে দিয়া হাঁ করে' ছুটলেই জল পাওয়া যাবে। তার ওপর এখন যদি নদী সাঁৎ-রাতে হয়, তা হলেত' কথাই নেই—

নমিতা বাধা দিয়া কহিল,—এক্ষুনি যাবেন কি? দাঁড়ান্ জল আন্‌তে কতক্ষণ? সবসময়ই দুরন্তপানা করতে নেই।

কথার সুরটা অজয়ের কানে কেমন একটু অদ্ভুত ঠেকিল, সত্যই যাইতে পারিল না। নমিতা জল লইয়া আসিল। এক ঢোকে সবটা নিঃশেষ করিয়া অজয় কহিল, পিপাসাও আমাদের পায়, স্নেহময়ী নারীর মুখ দেখ্‌তে পেলে আমা-দেরো দুটি দণ্ড দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় নেই। কত কাজ বাকী, কত পথ এখনো উত্তীর্ণ হতে হবে—আমি চল্লাম। তোমাকে বিশেষ কিছু উপহার দিয়ে যেতে পারলাম্ না—কে বা কিনে কেটে আন্‌বে বল! কিছু টাকা রইলো,--তা দিয়ে যা তোমাদের খুসি কিনে নিয়ো। কিনে দিয়ো হে প্রদীপ। শাড়ী ব্লাউজ জুতো গয়না—যা ওর পছন্দ। এখনও সে ভোল্ ফেরায়নি দেখ্‌ছি। বলিয়া অজয় দরজার বাহিরে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে নমিতা হঠাৎ তাহার বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া আকুল কণ্ঠে কহিল,—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

প্রথমটা কথা শুনিয়া অজয়ের সমস্ত চেতনা যেন দুলাইয়া উঠিল, অন্ধকারে নমিতার মুখ স্পষ্ট চোখে পড়িলনা, সে মুখ দেখিতে পাইলে একটু দ্বিধা করিত, হয়ত এমন কঠোর ঘৃণায় সে স্পর্শকে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

অজয় তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—আমার সঙ্গে যাবে মানে?

হ্যাঁ যাব, যেখানে তুমি নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে বলে'ইত এতদিন প্রতীক্ষা করে' বসে আছি।

অজয় আকাশ হইতে পড়িল: এ এ সব কী বল্‌ছে হে প্রদীপ? তুমি কোন কথা বল্‌চ না কেন?

প্রদীপ দূরে জানালার কাছে সরিয়া গেল। নমিতাই বলিয়া উঠিল: কে কী বল্‌বে—কার কী সাধ্য আছে শুনি? তুমি একদিন আস্‌বে সে-আশায় আমি আজো বেঁচে আছি। তোমার সঙ্গে আমি যাব, মরতে যাবো অজয়। কে আমাকে বাধা দেয়? বলিয়া নমিতা অজয়কে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নিঃশ্বাস ফেলিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত কাটিল না। নমিতাকে ডান হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজয় কহিল-সরে' দাঁড়াও, শিগ্‌গির। ছুঁয়োনা আমাকে। তুমি এতদূর নির্লজ্জ হয়েছ জান্‌লে এখানে মরতেও আসতামনা কোনোদিন। ছোঁয়া খাবার খেয়েছি ভেবে সারা শরীর আমার অশুচি হ'য়ে গেছে।

নমিতা বাঁশের একটা খুঁটি ধরিয়া নিজেকে রক্ষা করিল।

কটু কদর্য্য কণ্ঠে অজয় কহিল,—এক জনকে তার ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট করে' পথে বসিয়েছ, তবুও তাতে তোমার তৃপ্তি হ'ল না? এত সহজেই তোমার অরুচি ধরে' গেল? ভেবেছ আমার সঙ্গে চল্‌তে গিয়ে এক সময় জিরোতে চাইবে, পথের থেকে কাঁধে উঠতে চাইবে—অজয় অমানুষ মেয়ে মানুষকে অতটা প্রাধান্য দিতে শেখেনি। লজ্জা করে না?—কে তোমাকে বাধা দেবে? বাধা দেবে তোমার লজ্জা, তোমার চরিত্র।

অজয় পা বাড়াইয়াছিল নমিতা আবার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে কাঁদিতেছে। কহিল,—চরিত্র আমি মানিনা অজয়, মানি আমার মনকে। সেই আমার মণি, সেই আমার সব। তুমি যেয়ো, তোমার সঙ্গেও আমি যেতে চাইনে, কিন্তু আর খানিকক্ষণ তুমি থেকে যাও। আজকের রাতটা।

—তোমার ঘরে? ঐ বিছানায়? সরে দাঁড়াও, নমিতা।

নমিতা প্রখর কণ্ঠে কহিল,—কেন, একটা রাত্রি একাকিনী নারীর ঘরে আত্মদমন করে' থাক্‌তে পারো না?

অজয় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল: তুমি আমাকে লোভ দেখাচ্ছ বুঝি? আত্মদমনের চেয়েও অজয়ের জীবনে মহত্তর আদর্শ আছে। সে হচ্ছে আত্মদান। তুমি তার মহিমা বুঝবে না—পথ ছাড়। যেতে দাও আমাকে। একাকিনী নও, ঐ প্রদীপ দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠা বলে জিনিষটাকে একেবারে অমান্য করোনা। সতী নাই বা হ'লে, কিন্তু তাই বলে' অসৎ হতে হবে?

নমিতা সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটিও কথা নাই।

—পথে বেরুবো বল্লেই কি আর বেরুনো যায়? পথ তোমাকে গ্রহণ করবে কেন? তোমার ছাড়-পত্র কোথায়? ঘরে যাও, দরজা জানালা বন্ধ করে' বিছানাটা উত্তপ্ত করে' রাখ গে—রাত্রে ত' আবার ঘুমুতে হবে। চল্লাম হে প্রদীপ, সুইট ড্রিম্‌স্‌। বলিয়া সেই ঝড় জলের মধ্যেই অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রদীপ কহিল—অজয়ের সঙ্গে গেলে না? নিলো না বুঝি?

নমিতা রুখিয়া উঠিল: কোথায় মরতে যাব ওর সঙ্গে? তার চেয়ে এই আমার ঢের ভাল। বলিয়া খোলা জানলা-গুলি সে বন্ধ করিতে লাগিল: জলে কী হয়েছে দেখুন—ঘরের মধ্যেই নদী বইছে। মেঝেটা লেপ্‌তে হবে।

এখন থাক্‌।

এখন থাক্‌বে কী? ঘুমুনো যাবে নাকি তা হলে? উনুন-টুনন্‌ বোধ হয় ভেসে গেল। একটা হাঁক দিন্‌ না, মথুর কিছু খাবার জোগাড় করে' নিয়ে আসুক। টিফিন-কেরিয়ারে যা ছিল সব উজাড় করে' খেয়ে গেছে—

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে নাকি?

তরলকণ্ঠে নমিতা কহিল,—আহা হা, রাত্রে যেন আমি কত খাই। আপনার জন্যে বল্‌ছি—সারা দিনত' কিছু পেটে পড়েনি। শরীরটা ত গেল। যা হোক্‌, উনুনটা ধরিয়েছিলাম, ঝড় আর আপনার বন্ধু এসে সব মাটি করে দিল। ডাকুন্‌ না মথুরকে।

একটা ন্যাকড়া দিয়া নমিতা ঘর মুছিতেছিল, আভরণ-হীন সেই হাতখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ

কহিল,—মথুরকে ডেকে কাজ নেই। সত্যি আমার একটুও খিদে পায় নি।

—না পুরুষ মানুষের না খিদে পেয়ে পারে? আমার কথা শুনে ত' আর আপনার পেট ভরবে না।

—সত্যি বল্‌ছি, আমার খিদে নেই। কাল খুব ভোরে উঠে না হয় দুটি রেঁধে দিয়ো।

—রেঁধে আমি এখনই দিচ্ছি। একটিবার মথুরকে ডেকে দিন না।

—তুমি রাঁধতে গেলে আমি আর খাব না। এই আমি শুয়ে পড়লাম। বলিয়াই প্রদীপ নমিতার নিজের জন্য পাতা বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল: তোমার বিছানায়ই শুলাম নমিতা।

নমিতা ধীরে কহিল,—বেশ ত'। ঐ যা; জান্‌লাটা খুলে গেল। শিগ্‌গির বন্ধ করে' দিন্। নইলে এক্ষুণি ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একেইত আপনার শরীরটা ভাল নেই।

জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া প্রদীপ আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আব্‌দারের সুরে কহিল,—কাল থেকেই মাথাটা কেমন ধরে' আছে, নমিতা—

নমিতা শুধু কহিল,—যাচ্ছি। আমার এই হ'ল বলে'।

প্রদীপ অসাড় হইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে নমিতা শিয়রের কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল,—বালিসের উপর মাথাটা ভাল করে' রাখুন। কোন খানটায় ধরেছে? বলিয়া সে প্রদীপের শিয়র ঘেঁষিয়া বসিল। প্রদীপ একবার ভালো করিয়া নমিতার মুখ দেখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আগেই লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়াছে। অন্ধকারে সেই মুখের বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না। নমিতা প্রদীপের কপালের উপর স্নিগ্ধ অঙ্গুলিগুলি ধীরে বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—কপালটা টিপে দিই, কেমন? একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। এ কদিন ত' শরীরের উপর আর কম অত্যাচার হয়নি।

প্রদীপ কহিল,—আমি ঘুমিয়ে পড়ব কি! আর তুমি?

পরে আমিও না হয় ঘুমিয়ে পড়বো। এমন বৃষ্টিতে শরীর ভেঙ্গে ঘুম নেমে আস্‌বে।

তুমি এখানে শোও, আমি আমার বিছানায় যাই।

নমিতা প্রদীপের ললাটের উপর করতলটি বিস্তৃত করিয়া স্থাপন করিয়া কহিল,—এখানে একা শুয়ে আমার ভয় করবে যে।

কপালের উপর নমিতার ঠাণ্ডা হাতখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রদীপ কহিল—তবে?

প্রদীপের করতলের মধ্যে নিজের ভীরু হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া নমিতা বলিল,—তবে আর কি, ঘুম পেলে কখন এক সময় আপনারই পাশে শুয়ে পড়বো না হয়।

—আমার পাশে?

—হ্যাঁ আপনাকে আমি ভয় করি নাকি?

নমিতার কথার সুরে একটুও রুক্ষতা নাই,—ভারি কোমল, আদ্র কণ্ঠস্বর।

এই ভাবে বসিবার সুবিধা হইতেছিল না, নমিতা বিছানার উপর পা তুলিয়া ঠিক করিয়া বসিতে না বসিতেই প্রদীপ বালিশটা তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া দিয়া তাহার বিস্তৃত কোলের উপর মাথাটা তুলিয়া দিল। নমিতা কিন্তু মাথাটা নামাইয়া রাখিল না। স্নেহ-আনত দুইটি আয়ত চক্ষু প্রদীপের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অকুণ্ঠিত আবেগে তাহার কপালে ও গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল,—তোমার উপর অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, নমিতা।

জোরে একটু হাসিয়া নমিতা বলিল—তার শাস্তিই ত এখন পাচ্ছেন।

প্রদীপ নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের মধ্যে গুঁজিয়া ফেলিল, কহিল,—বিধাতা সবারই জন্যে সমান পথ তৈরি করে রাখেন নি।

নমিতা কহিল,—কারুর জন্যেই পথ তৈরী করে রাখেন না তিনি, পথ সৃষ্টি করবার গৌরবও যদি আমাদের না থাকে তবে চল্‌বার আমাদের আর আনন্দ কোথায়?

—আমার জন্যে এই ভুবন-ভরা ঋতুর উৎসব।

—আর কারুর জন্যে বা ঘন-গহন অন্ধকার!

—আমার জন্যে তোমার প্রেম, এই যৌবন, এই অগ্নিশিখা। বলিয়া মুহ্যমান প্রদীপ সহসা নমিতাকে বুকের

মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিবুকে, অধরে চোখের পাতায় চোখের নীচে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

প্রতিরোধ করিবার সমস্ত শক্তি নমিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে—সে যেন নিষ্প্রাণ একটা দেহপিণ্ড! ঝড়ের রাত্রে সে যেন অসহায়া পৃথিবী!

বুকের উপর নমিতার আলুলায়িত রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রদীপ কহিল,—যে যা বলে বলুক নমিতা, আমরা ধূলির ধরণীতে স্বর্গ আবিষ্কার করব—আমাদের প্রেমে, সৎকর্ম্মিতায়। আমি কবি, তুমি আমার আকারময়ী কল্পনা, নমিতা!

নমিতা তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া কহিল,—সারারাত ভরেও কথা কয়ে শেষ করতে পারবেন না।

—সত্যি নমিতা, কথার আর শেষ নেই।

—শেষই যেন আর না থাকে। এই কথা আপনার অক্ষরে ফুটে উঠুক।

—আনন্দের কথা সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মত মিলিয়ে যায়, কিন্তু ব্যর্থতার কথা রাত্রির অন্ধকারে তারা হয়ে অক্ষরে অক্ষরে জেগে থাকে!

প্রদীপ নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিস্রস্ত অবগুণ্ঠনের নীচে সে মুখখানিতে অসীম বেদনার মেঘচ্ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

নমিতা বলিল,—মনটাকে খানিকক্ষণ একেবারে ফাঁকা রাখুন, আপনিই ঘুম এসে যাবে। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি না ঘুমোলে আমি কি করে' শুই।

প্রদীপ কহিল,—তুমি কি আমাকে একবারো তুমি বলবে না!

কিছু কাল স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ নমিতা নত হইয়া মুখটা প্রদীপের কানের কাছে নিয়া গিয়া অতি গাঢ় কণ্ঠে ডাকিল—তুমি, তুমি, তুমি!

এবার যদি আমি মরতাম নমিতা, আমার দুঃখ থাকত না।

নমিতা বলিল,—নিশ্চয় তোমার জন্যে এই অলস আবেগময় মৃত্যু, কারুর জন্যে বা কণ্টকক্ষত কদর্য্য জীবন। প্রেমহীন আশ্বাসহীন কঠোর মুহূর্ত্ত। কিন্তু আর নয়, এবার ঘুমোও।

প্রদীপ নিঃশব্দে নমিতার কোলের উপর মাথাটা কাৎ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক সময়ে স্পষ্ট বুঝিল নমিতা আর হাত বুলাইতেছে না—স্তব্ধ হইয়া পাষাণ-প্রতিমার নিশ্চল অটুট ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। তারপর নমিতা যে আর কী করিল বোঝা গেল না। প্রদীপ ততক্ষণে গাঢ় নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে প্রদীপের মাথাটা বালিশের উপর নামাইয়া রাখিয়া নমিতা উঠিয়া পড়িল। দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে—আকাশে মেঘ কাটিয়া বিবর্ণ ঘোলাটে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। ভোর হইয়াছে ভাবিয়া কয়েকটা কাক এখানে-সেখানে চীৎকার করিতেছিল। নদীতে দু একটি নৌকাও দেখা যায়। কোথায় একটি বাতি জ্বলিতেছে—না জানি কত দূরে! ঘাটে যেখানে নৌকারা যাত্রী লইয়া দূর ষ্টীমার-ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা গাঁদি করিয়া থাকে সেই ঘাটের পথ সে চিনিতে পারিবে ত'? এই রাত্রে নিশ্চয়ই কেহ নৌকা ছাড়িবেনা, উত্তর পশ্চিম কোণে এখনো মেঘ আছে। হয়ত উহারাই বিপদের আশঙ্কায় নৌকা ছাড়িবে না। নমিতার জীবনে আবার বিপদ কিসের? তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেনোচ্ছ্বাসিত নদী যে তাহার বন্ধু, সহযাত্রিণী। বিধাতা, আজিকার এই অভিসারে যেন অজয়ের সঙ্গে তাহার দেখা না হয়। সে যেন একাই চলিতে পারে, একাই মরিতে পারে যেন। এই গর্ব্বটুকু তাহার নষ্ট করিয়োনা।

বিছানার উপর একধারে অজয়ের সেই নোটের তাড়াটা এখনো পড়িয়া আছে। মরিয়া গেলেও প্রদীপ তাহা ছুঁইবে না নিশ্চয়। কিন্তু ঐ টাকার উপর তাহারই ত সর্ব্বোত্তম অধিকার—তাহাকেই ত দিয়া গিয়াছে। দিয়া না গেলেও সে নিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিত না হয়ত'। এই বিষয়ে সামান্য বিষয়ী হইলে কি এমন অন্যায় হইবে? কত দূরে তাহাকে যাইতে হইবে কে বলিতে পারে? এই টাকা ফুরাইয়া গেলে কেমন করিয়াই বা তাহাকে মরিতে হইবে তাহারো কোনো সন্ধান নাই। নমিতা আঁচলের খুঁটে

নোটের তোড়াটা বাঁধিয়া লইল। কে জানে, পথে লুট হইতেই বা কতক্ষণ! তবু সঙ্গে থাক্।

এখান হইতে তারপাশা - তার পরে ষ্টীমারে গোয়ালন্দ। সেখানে ট্রেণ দাঁড়াইয়া আছে। তার পর কলিকাতা। তার পর? এখানে বসিয়া থাকিলেও, তার পর?

একেবারে একা—সঙ্গীহীন! সম্মুখে পথ মুহূর্ত্ত হইতে মহাকাল!

নমিতা একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় ঐ ঘুমন্ত অসহায় প্রদীপের চেহারা দেখিয়া তাহার মমতার অন্তর ছিল না। একবার সাধ হইল নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রদীপের কপালে অস্ফুট একটি বিদায়-চুম্বন উপহার দিয়া আসে, গভীর শব্দহীনতায় গোপনে বলিয়া আসে—এই চুম্বনে তোমার ললাট দগ্ধ করে' যাই, বন্ধু! আমাদেরই মত তুমি ব্যর্থ হও, ধন্য হও। কিন্তু না, যদি জাগিয়া উঠে। যদি দুই ব্যাকুল বাহু-বন্ধনে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়! যদি এই অবসন্ন জ্যোৎস্নাটুকুর মতই তাহার সকল সঙ্কল্প স্তিমিত হইয়া আসে!

নমিতা বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত পাড়া নিঝুম। মাঠে জল জমিয়াছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া নমিতা অগ্রসর হইল। পথ সে ভাল করিয়া চেনে না, কিন্তু পথ তাহাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। এক পথ হইতে অন্য পথে একদিনের পর অন্য রাত্রে। থামিবার সময় কোথায়?

কিছুদূর অগ্রসর হইতে দূরে যেন কাহাকে দেখা গেল। কে যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। নমিতা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লোকটা তবু তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে। তাহারই সম্মুখীন না হইয়া নমিতা আর যায় কোথায়?

আরো খানিকটা কাছে আসিতেই লোকটাকে চিনিতে পারিয়া নমিতার সর্ব্বদেহ ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল। এ যে তাহার স্বামী— সুধী! বাণীগঞ্জের শালবনে সেইদিন যে পোষাকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, পরণে সেই পোষাক! মুখে সেই অম্লান হাসিটি, তেমন করিয়া বাঁ হাতে কোঁচাটা তুলিয়া ধরিয়াছেন!

যেন সে মূর্ত্তি তাহাকে বলিল,—এস আমার সঙ্গে।

আর একটু আগাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেই যেন নমিতা সে মূর্ত্তিকে ধরিয়া ফেলিবে।

নমিতা ত্বরিতপদে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু তবুও তাহার নাগাল পাইল না।

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল: কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছ?

সে মূর্ত্তির কণ্ঠ হইতে স্পষ্ট উত্তর আসিল: এস আমার সঙ্গে। তোমার কিছু ভয় নেই। (সমাপ্ত)

মেঘদূত

[পূর্ব্ব মেঘ]

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

প্রিয়ারে হারায়ে বরষের তরে, স্বকর্ম্মে অবহেলার পাপে,
প্রভুশাপে এক ভ্রষ্ট-মহিমা যক্ষ অসহ বিরহ যাপে—
সেই রামগিরি-আশ্রমে সেই ছায়া-সুশীতল তরু-বিতানে,
যেথাকার জল পূত-নিরমল জনকদুহিতা সীতার স্নানে।

২

কামানলে দহি' সে প্রিয়াবিরহী কতিপয় মাস যাপিলে পর,
কর হ'তে তা'র কনক বলয় খসিয়া যখন রিক্ত কর,
ত্যাখে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে গিরি-সানুদেশে হয়েছে নত
নব জলধর,—যেন গজবর বপ্রক্রীড়া-বিলাসে রত।

৩

কামনা হৃদয়ে জাগে মেঘোদয়ে,—তাই সে-মেঘের সমুখে আসি'
কুবেরানুচর ধ্যানে তন্ময় কোনমতে রুধি' অশ্রুরাশি।
নবমেঘ হেরি', সুখী যে, তাহারো অকারণে করে মন কেমন,
বিরহী কি বাঁচে, নিয়ত যে যাচে প্রিয়ার কণ্ঠ-আলিঙ্গন ?

৪

আসিছে শ্রাবণ,—প্রিয়ার জীবন কী লয়ে কাটিবে সে বরষাতে ?
ভাবে তাই,—স্বীয় কুশল-বারতা পাঠাবে প্রিয়ারে মেঘের হাতে !
সদ্যঃস্ফুট কুটজ-কুসুমে অর্ঘ্য রচিয়া তা'বে তখন,
প্রীতি-সুমধুর বচনে যক্ষ করিলো স্বাগত-সম্ভাষণ।

৫

কোথা ধূম, জ্যোতি, বারি ও বায়ুর পুঞ্জিত মেঘ,—কোথা বা হায়
বার্ত্তা, যা' শুধু ইন্দ্রিয়বানই প্রাণী সনে প্রিয়জনে পাঠায় !
আকুলতাবশে এ কথা ভুলিয়া প্রার্থনা তা'রে নিবেদিলো'সে :—
জড়ে ও চেতনে জ্ঞানের অভাব কামীদের চির-স্বভাবদোষে !

৬

"পুষ্কর আর আবর্ত্তকের প্রখ্যাত কুলে জন্ম তব,
ইন্দ্রের তুমি প্রধান পুরুষ, ওহে কামরূপী নীরদ নব !
প্রিয়া দূরে, তাই মিনতি জানাই !—মহতের কাছে চেয়ে না-পেয়ে
ক্ষতি কিছু নাই, শ্রেয় মানি তাই অধমের কাছে পাওয়ার চেয়ে।

৭

সন্তপ্তের শরণ, হে মেঘ,—কুবেরের ক্রোধে প্রিয়াবিরহী
আমিও তাপিত, বারতা আমার তা'র কাছে লয়ে যাও হে বহি' !
যেতে হবে তোমা' যক্ষরাজের অলকাপুরীতে, সৌধ যেথা
ধৌত শিবের শির-শশিকরে, ঘেরা চারিধারে উদ্যানে তা।

৮

আরোহিলে তুমি আকাশের পথে, পথিক-বনিতা অলক তুলি'
হেরিবে তোমায়, অতি বিশ্বাসে র'বে আশ্বাসে আশায় ভুলি' ;
মোর মতো দীন যা'রা পরাধীন তা'রা বিনা বলো কে আর কবে,
বিরহবিধুরা বধূরে করে গো উপেক্ষা, তুমি উদিলে নভে ?

৯

ঐ যে পবন অনুকূল হয়ে মৃদু মৃদু তোমা' চালনা করে,
ঐ ত চাতক তুলিয়াছে বামে সুস্বর তার গরবভরে !
গর্ভাধানের শুভকাল জানি' সবে মিলি' নব মালিকা গাঁথি'
নভোমণ্ডলে তুষিবে তোমায় নয়নানন্দ বলাকা-পাঁতি,

১০

অবারিতগতি গৃহে পশি মোর দেখিবে এ তব ভ্রাতার প্রিয়া,
সেই সতী, শুধু দিন গুণি' গুণি' আছে কোনমতে দেহ ধরিয়া ;
বিরহের দাহে প্রেমিকা-জীবন-কুসুম নিমেষে ঝরিতে পারে,
আশাবন্ধই বৃন্তের মতো কোনমতে রাখে বাঁধিয়া তা'রে।

১১

ফুটায়ে তুলিয়া কন্দলী-ফুল শস্যশালিনী করো ধরণী,
হে মেঘ, তোমার গভীর মন্ত্রে ;—শুনি' সেই শ্রুতিমধুর ধ্বনি
মানসযাত্রী মরালের দল মৃণাল পাথেয় লইয়া সবে
কৈলাসগিরি অবধি তোমার গগন-পথের সঙ্গী হবে।

১২

রাঘবের জন-বন্দিত-পদ-চিহ্ন যাহার মেখলা-দেশে,
এই সে তুঙ্গ শৈল, তোমার প্রিয়সখা, তা'র বক্ষে এসে
প্রেমালিঙ্গনে শুধাও কুশল ; বরষে বরষে মিলনে, হায়,
সে-যে বিরহের তপ্ত-বাষ্প-মোচনে তোমায় স্নেহ জানায়।

১৩

যে-পথে তোমায় যেতে হবে, তাই আগে বলি শোনো হে মেঘ প্রিয়,
তার পরে মোর গোপন বারতা শ্রবণে তোমার ভরিয়া নিয়ো।
ক্লান্তি হরিতে শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া চলিয়ো ধীরে;
ক্ষীণ হ'লে তনু, পিয়াসা মিটায়ে বারি পিয়ো লঘু স্রোতের নীরে।

১৪

'অচলের চূড়া উড়ালো নাকি লো পবনে ?'—ভাবিয়া সকৌতুকে
মুগ্ধ চকিত সিদ্ধাঙ্গনা হেরিবে তোমায় উর্দ্ধমুখে।
বেতসে মেদুর এই গিরি হ'তে উত্তর নভে যাবে যখন,
যেয়ো পরিহরি' দিঙ্‌নাগেদের স্থূল শুণ্ডের আস্ফালন।

১৫

নানা রত্নের বর্ণদ্যুতি মিলায়ে বুঝি-বা ইন্দ্রধনু
ঐ বল্মীক-চূড়া হ'তে উঠি' জাগে পুরোভাগে !—তোমার তনু
একেই ত শ্যাম, তাহে সে শোভায় অপরূপ সাজে সাজিবে হেন,—
শিখিপুচ্ছের প্রভা-উজ্জ্বল গোপালের বেশে বিষ্ণু যেন !

১৬

'কৃষিফল তব করতলগত'—ইহা জানি' যত পল্লী-বধূ,
আঁখি শরহানা শেখেনি, কেবলি চেয়ে র'বে, চোখে প্রীতির মধু !
যেয়ো, যেথা আছে হল-কর্ষণে সদ্য সুরভি সে মালভূমি;
বষণে লঘু হয়ে পুনরায় উত্তরে পরে যেয়ো হে তুমি।

১৭

ঢালি' বারিধারা গিরি-দাবানল নিবারিলে তুমি একদা কবে,
আজি তাই তব শ্রান্ত ও-দেহ আম্রকূট যে শীর্ষে ল'বে;—
কৃত উপকার করিয়া স্মরণ গৃহাগত প্রিয়সখার সেবা
ক্ষুদ্রেও করে,—কেন না করিবে উন্নত তারি, তুল্য যেবা ?

১৮

পরিণত-চূত ফল-নিকুঞ্জে ঢাকা যে শৈলোপান্তভূমি,
স্নিগ্ধ বেণীর বর্ণে গিরির শীর্ষে আরূঢ় হইলে তুমি
ধরিবে সে গিরি দেব-দম্পতী-দর্শনীয় অপূর্ব্ব শোভা !—
মধ্যে শ্যামল, প্রান্ত অবধি পাণ্ডু,—ধরার স্তন যেন বা !

১৯

বিহরে কুঞ্জে বনচর-বধূ, ক্ষণকাল সেথা রহি' আবার
বর্ষণে লঘু দ্রুতগতি হয়ে পরের পথটি হইয়া পার
উপলবিষম বিন্ধ্যের মূলে হেরিবে শীর্ণা রেবার ধারা,—
গজের গাত্রে আঁকা যতনে আঁকা-বাঁকা চারু রচনা পারা।

২০

সেই জলধরা জম্বুকুঞ্জে প্রতিহত, বনগজের মদে
বাসিত মধুর; বর্ষণান্তে তাই পিয়ে পুন চলিয়ো পথে।
অন্তরে সার থাকিলে, পবন আঁটিবে তোমায় শকতি নাই ;—
রিক্ত যাহারা লঘু তা'রা সবে, গৌরব শুধু পূর্ণতায়।

২১

হেরি' কদম্বে হরিত-কপিশ অর্দ্ধোদ্গত কেশর-জালে,
অনূপ-ভূমির ভূমিকদলীর প্রথম-মুকুল ভোজনকালে,
আর বনে বনে আঘ্রাণ করি' মাটির গন্ধ সুরভি নব,
ওগো পয়োধর, পথের সূচনা কুরঙ্গেরাই করিবে তব।

২২

মনে লয়, সখে, মোর প্রিয় কাজে দ্রুত যেতে সাধ যদিও র'বে,
কুটজ-সুরভি শৈলে শৈলে তবু দেরী তব হবেই হবে;
কেকারবে সেথা স্বাগত শুধায়ে সজল-নেত্রে ময়ূরগণ
বরিবে তোমায়; কোনমতে, তবু, ত্বরা যেতে তুমি কোরো যতন।

২৩

বিকচ-কেতকী-মুকুলে পাণ্ডু হবে যেথা উপবন-প্রাচীর,
গ্রাম-পথ-তরু করি' সমাকুল গৃহ-বিহগেরা গড়িবে নীড়;
পক্কজম্বুকাননে শ্যামল সুন্দর সে দশার্ণ ভূমি
শোভিবে, সেথায় র'বে হংসেরা কিছুদিন, কাছে আসিলে তুমি।

২৪

বিদিশা নাম্নী রাজধানী তা'র, বিখ্যাত যে গো দিকে দিকে সে,
প্রেমিক প্রাণের কামনার ফল পাবে অচিরেই গিয়া সে দেশে ;—
বেত্রবতীর তীরে হুঙ্কারি' মধু বারি পান করিবে সুখে,—
চল-তরঙ্গ চারু-ভ্রূভঙ্গ সম শোভা পাবে সে চারু মুখে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের গল্প

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !

ছেলেবেলায় চারুপাঠে ঐ নামে একটা প্রবন্ধ পড়া গিয়েছিল। ভাল রকম মনে নাই ব্রহ্মাণ্ড বলতে গ্রন্থকার কি বুঝিয়েছিলেন। এই সৌরজগৎ না সমগ্র নক্ষত্র জগৎ? খুব সম্ভব সৌরজগৎ; কেননা সে আজ ৪০।৫০ বৎসরের কথা, তখন ব্রহ্মাণ্ড বলতে জ্যোতির্বিদ্‌রা সৌরজগৎই বুঝতেন। সমগ্র বিশ্বের বিরাট রূপের পরিচয় তাঁরা তখন তেমন লাভ করেন নি, এখন এই শতাব্দীতে তা যতটা পাওয়া গিয়েছে।

৪০।৫০ বৎসর আগে পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল বা সূর্য্যের দূরত্ব ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল বা খুব বেশী তো নেপচুন গ্রহের দূরত্ব প্রায় ২৮০ কোটী মাইল এই শুনলে চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতো। কিন্তু এখন এসব দূরত্ব আধুনিক বিশ্ব-তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে হিমালয়ের তুলনায় বল্মীক-স্তূপের মতই তুচ্ছ।

আধুনিক অতিকায় দূরবীণ যন্ত্র বিশ্বের সীমা-রেখাকে কত দূরে ঠেলে নিয়ে গেছে শুন্‌লে বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। দূরতম আকাশ-পদার্থ যা এ পর্য্যন্ত ঐ সব দূরবীণে ধরা পড়েছে সে হচ্ছে একটী বিশ্ব নীহারিকা, যার দূরত্ব হচ্ছে ১৪ কোটী আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষ বলতে বুঝতে হবে সেই পরিমাণ দূরত্ব যা নাকি আলোকরশ্মিকে (যা সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে) ২ বছরে অতিক্রম করতে পারে। এই রকম ১৪ কোটী বৎসর লাগে সেই নীহারিকা হতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছুতে। কালমাপক বছর দিয়ে দেশমাপক মাইল বা যোজনের ধারণা করা, এ বড় মন্দ রহস্য নয়!

কিন্তু উপায় নাই—আধুনিক যন্ত্র ও গণনাশক্তিবলে মহাকাশে তারকা ও নীহারিকাদের দূরত্বের এমন উপলব্ধি হয়েছে যে তার মাত্রা সাধারণ মাইল বা 'যোজনে প্রকাশ করতে বড় অসুবিধা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধ্রুবতারার দূরত্ব জানা গেল ৫০ আলোকবর্ষ; এইটী সাধারণ অঙ্কে প্রকাশ করলে হবে ৫০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬০০০ মাইল! জালের ভিতর দিয়ে যেমন সরষে অসাড়ে গলে যায় আমাদের ক্ষুদ্র অথচ মোটা অনুভূতিতে এই দুর্দ্দান্ত অঙ্ক তেমনি কোনো সাড়াই জাগাবে না। কাজেই একটু বোধগম্য হয় এবং সংক্ষেপে ও সহজে প্রকাশ হয় Light year বা Parsec কথা ব্যবহার করলে। তিন আলোকবর্ষ পরিমাণ দূরত্ব হল এক পারসেক দূরত্বের সমান।

Parsec কথাটা দুটো কথার আদ্যাংশ নিয়ে হয়েছে—Parallax ও Second; একটা তারকার এক Second মাত্রা (1/360th. of a Degree) Parallax হয়, যে পরিমাণ দূরত্ব বশত: তাকে এক Parsec দূরত্ব বলে। ১ পারসেক—১৯ মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল বা ২ কোটী—কোটী মাইল!

অনেক তারকার নিখুঁৎ দূরত্ব-পরিমাপ সম্ভব হয়েছে আধুনিক পরীক্ষণ যন্ত্রাদির সূক্ষ্মত্বের ফলে। সব চেয়ে নিকটতম যে তারা Alpha Proxima, তার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৪ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটী মাইল। বেগা নামক তারকা পৃথিবী হতে ২৭ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা ৫০ আলোকবর্ষ দূরে! এরা সব তো নিতান্ত এপাড়া ওপাড়ার প্রতিবেশী তারকা। এমন সব দূরবর্ত্তী তারা আছে যাদের আলো শত ও সহস্র আলোকবর্ষে পরিমাপিত হয়। ছায়াপথ বা স্বর্গঙ্গার উপকণ্ঠ ভাগে এমন সব তারকাগুচ্ছ (cluster) আছে যাদের হতে আলোক খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হবারও আগে হতে যাত্রা করে এতদিনে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। এমনি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের তারকাপুঞ্জও আছে।

ছায়াপথবেষ্টিত আমাদের এই নক্ষত্র-জগতে তার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছুতেই লাগে ৩ লক্ষ বৎসর।

আমাদের ঘরের জগৎটার বিশালতাই এই। এর বাইরে এরূপ ধারণাতীত মাত্রার দূরে এমন সব নীহারিকা

ও নক্ষত্র-জগৎ আছে যা হতে আলো এ জগতে পৌঁছুতে দু দশ কোটী বৎসর লাগে। Coma Berenica নামক এক তারকা আছে যার কাছাকাছি আকাশভাগে কতক-গুলা ঘূর্ণী নীহারিকা দেখা যায়, যাদের দূরত্ব ৫ কোটী আলোকবর্ষ পরিমাণ। ইতিপূর্ব্বে বলা গেছে যে সব চেয়ে যে দূরতম নীহারিকা দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা হতে আলো আসে ১৪ কোটী বৎসরে।

এই সব তত্ত্ব হতে একটা ভারি নিগূঢ় রহস্য বুঝা গিয়াছে। রহস্যটী এই যে আমরা যে বিশ্ব দেখছি বলছি, সেটা আসল সত্যকার বিশ্ব নয়, সেটা appearance মাত্র। যে সব তারা বা নীহারিকা আমরা দেখছি, সে গুলাকে আসলে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর আগের অবস্থাতেই দেখছি। এই মূহুর্ত্তে তারা কি অবস্থাপন্ন তা জানবে আমাদের সেই বংশধররা যারা হাজার বা লক্ষ বৎসর পরে আসবে।

এ সম্বন্ধে ইদানীং জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের মধ্যে Einstein এর প্রভাবে একটা নূতন রকমের কথার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে খুব। Einstein নাকি গণিত বিশ্লেষণে সিদ্ধান্ত করেছেন যে space বা মহাকাশ কখনো সীমাহীন হতে পারে না। Space অসীম কিন্তু গণ্ডীমুক্ত – finite but unbounded. এ কথার অর্থ কি ভাবে বুঝতে হবে ঠিক ধরা যায় না; সম্ভবতঃ এই space আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের space idea নয়। যাই হোক space সসীম হলে তদন্তর্গত বিশ্বের নিশ্চয়ই সীমা কোথাও আছে। এই সীমার শেষ কোথা? পণ্ডিতরা গণিতের সাহায্যে এরই মধ্যে তারও একটা 'ইতি' করেছেন। বৃহত্তম দূরবীণে এ পর্য্যন্ত যে দূরতম জ্যোতি পদার্থ ধরা পড়েছে সে হচ্ছে একটী নীহারিকা, যা হতে আলোক আসে এ জগতে ১৪ কোটী বৎসরে। অর্থাৎ এতাবৎ আবিষ্কৃত আকাশভাগের ব্যাসার্দ্ধ হচ্ছে ১৪ কোটী আলোকবর্ষ। বিশ্বের শেষ সীমা-প্রান্ত আরো ১০ হাজার গুণ বেশী দূরে! এই সমগ্র বিশ্বের পরিধি ঘুরে আসতে আলোকরশ্মির সময় লাগে ১০ হাজার কোটী আলোকবর্ষ।

আমরা ক্ষুদ্র মানুষ; বিস্তীর্ণ বেলাভূমে বালুকণার মতই ক্ষুদ্রতম একটা শীতল জড় গ্রহের মধ্যে বাস করি; তুচ্ছ একটা শতাব্দীরও পুরামাত্রা আমাদের জীবলীলার কাল পরিমাণ নয়; হাজার করা ৯৯৯ জনের জীবনযাত্রা ২।১০ ক্রোশ স্থানের মধ্যেই নিবদ্ধ। কাজেই হঠাৎ এই অসীমের সঙ্গে মুখ চাওয়াচায়ি হ'লে আমাদের অবিশ্বাসের হাসি হাসবারই কথা, না অর্জ্জুনের মত বিরাটের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ে ভয়ে বিস্ময়ে 'প্রব্যথিত মন' হ'তে হবে? জড় পদার্থে আমাদের পৃথিবীও গঠিত; এবং তাতে বাকী সমগ্র বিশ্বও গঠিত; অথচ আমাদের পরিচিত এই পার্থিব জড়ের স্বভাব প্রকৃতি ওই সব নীহারিকা সূর্য্য ও তারাদের জড় পদার্থের স্বভাব প্রকৃতি হতে পুরামাত্রায় বিভিন্ন। সৌর-জগতের বাইরে বিশ্বব্যাপী যে জড়রাশি নানাকারে বিদ্যমান তার অধিকাংশের তাপমাত্রাই ১০ লক্ষ contigrade। এ ভয়াবহ মাত্রার প্রচণ্ড উত্তাপে অণু পরমাণু কি একটাও আস্ত গোটা আছে? না থাকতে পারে? পরমাণু গুলাই চুরমার হয়ে আছে—কক্ষভ্রষ্ট ইলেকট্রনরাশির, অদৃশ্য তেজোরাশির ও ইথর তরঙ্গের প্রবল ঝড়ঝাপটায় এই বিশাল পরমাণুসমুদ্র সর্ব্বদাই [illegible]।

মহাকাশের বুকে মহাকালের এই যে লীলাবিস্তৃতি এর যা কিছু যেদিক দিয়ে দেখা যাক, সব সম্বন্ধেই এই কথা খাটে —'অপরিমিত'! 'অসীম'!

সূর্য্য বা তারাদের এক একটার আয়তনই বা কি ভীষণ! Betelgeux বা আর্দ্রা তারার গর্ভে আমাদের সূর্য্য ও পৃথিবী নিজ নিজ আয়তন ও দূরত্ব বজায় রেখে থাকতে পারে!

এই যে আমাদের নক্ষত্র-জগৎ, যাকে galaxy বলা হয়, এর সীমার বাইরে বহু বহু লক্ষ কোটী যোজন দূরে দূরে ক্ষুদ্র ধূমখণ্ডের মত দেখা যায় যে সব নীহারিকা, সেগুলি এখন বোঝা গেছে স্বতন্ত্র একটা নক্ষত্র-জগৎ! মহাসমুদ্রে দীপমালার মত মহাকাশে এই সব 'বিশ্ব-দীপ' বিরাজমান। এদের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আলোকবর্ষে পরিমিত হয়। এদের আয়তন বিস্তৃতিই কি কম! এই সব বিশ্ব নীহারিকার ব্যাসরেখা সহস্র সহস্র আলোক বর্ষে মাপা হয়। Andromeda রাশির অন্তর্গত যে বিশালকায় ঘূর্ণী নীহারিকাটা দেখা যায় তার ব্যাস-রেখা ৫০০০০ আলোক বর্ষ ও দূরত্ব ১০ লক্ষ আলোক বর্ষ!

তাই কি এই সব বিশ্বজগৎ শুধু এক স্থানে নিবদ্ধ আছে? তাও না। সমস্ত বিশ্বই সচল গতিশীল। যে যার পথ ধরে মহাকাশবক্ষে প্রচণ্ড গতিতে কোথায় ছুটেছে কে জানে!

কারো গতিবেগ সেকেণ্ডে দুশো মাইল; কারো বা ৫০০ মাইল; কারো বা হাজার মাইল! আমাদের নিজের যে এই বিশ্বটী এটী নিজেই Cassiopeia রাশির দিকে সেকেণ্ডে ২৮০ মাইল বেগে চলেছে!

অথচ অগণিত এই গতিশীল বিশ্বগুলির কারোর সঙ্গে কারোর ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম। পৃথিবীর সাতটা সমুদ্রে ভাসমান সচল সাতখানা জাহাজের পরস্পর ধাক্কাধাক্কির যতটা সম্ভাবনা আছে তার চেয়েও কম সম্ভাবনা—দুইটী সূর্য্য বা ব্রহ্মাণ্ডের সংঘর্ষ লাগার।

প্রথম প্রবন্ধে আমরা পরিচয় দিয়েছি—বিজ্ঞান শাস্ত্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে কি কি থিওরি এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করে এসেছে এবং আধুনিক পণ্ডিতরা কোন মতটীকে সমধিক আদর করেন। এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করলাম ব্রহ্মাণ্ডগুলির ও ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টি মহাবিশ্বের সীমা কোথায় বা অসীমতা কি পরিমাণে। বিশ্বের অসীমতা বললেই বুঝতে হবে মহাকাশের বিস্তৃতি, জড়ের পরিমাণ ও সূর্য্যগুলির সংখ্যা ও আয়তন, তাদের পরস্পর দূরত্ব, কালের স্থিতি, পরিমাণ এই সবেরই অসীমতা। সমগ্র বিশ্বটীর shape বা আকার কিরূপ তার সম্বন্ধে আধুনিক আলোচনা ফল বলে প্রবন্ধের উপসংহার করা যাবে।

আমাদের galaxy বা নক্ষত্র-জগৎটীর আকার একটা চ্যাপটা অল্প পুরু চাক্‌তির মত এইরূপ অনুমান করা হয়। এই চাক্‌তিটার গুটী বা দানাগুলা হল এই সব কোটী কোটী সূর্য্য। চাক্‌তি গুলার কেন্দ্র হতে পার্শ্বের দিকেই বেশী বিস্তৃতি; কিন্তু কেন্দ্র হতে উপর নীচু দিকে বিস্তৃতি নাম মাত্র।

এ জগৎ ছাড়া অন্য যে অসংখ্য নীহারিকারূপী বিশ্ব আছে তারাও এক একটা বিশাল তারকা-চাকতি; মহাশূন্যে এই সব বিশ্বের স্থিতি ও বিন্যাস অনেকটা সমুদ্রগর্ভে—সন্তরণশীল ও ভাসমান অসংখ্য মাছের ঝাঁকের মত। "অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডানি মহাজলৌঘমৎস্য বুদবুদানন্ত সংঘবৎ ভ্রমন্তি" (বিভূতিপাদ উপনিষদ)।

মহা শূন্যের অতল অসীম বিস্তৃতিটা যেন একটা সীমাহীন সরোবর; তাতে দূরে দূরে ভাসমান এক একটী পদ্ম! পদ্মে অসংখ্য পাপড়ি। কোনো পদ্মটী মুকুল মাত্র; কোনোটী অর্দ্ধবিকশিত; কোনোটা পূর্ণ প্রস্ফুটিত। কোনোটা বা শুকিয়ে ঝরে যাবার মত হয়েছে: কোনোটায় বা পাপড়ি কি কেশর কিছুই নাই, শুধু শুষ্ক চাকতিটাই পড়ে আছে।

মহাকাশ-সরোবরের কোন ফুলটী বাষ্পময় নীহারিকা মাত্র; কোনোটী বা সদ্যোজাত শিশু সূর্য্যে ভরে উঠেছে। কোনোটীতে একাকার বাষ্পরাশি সবেমাত্র অর্দ্ধগঠিত বাষ্প-পিণ্ডে পরিণত হব হব হয়েছে। কোনোটী বা পুনর্গঠিত জ্বলন্ত যুবা-সূর্য্যের সংখ্যা গৌরবে পরিপূর্ণ ও পুষ্টাঙ্গ হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য গুলি লীলা শেষ করে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছে; এবং তেজদীপ্তিহীন হয়ে—শবাকার শীতল জড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওস্তাদজী বলিলেন, "আপনি মঞ্জুর করুন, আমি শ্যামবাবুকে সব কথা সাফ্ বলে তাকে সমঝিয়ে আপনার পায়ের কাছে এনে দিব; টাকা চাই এখন, তা কি হয়েছে? পোড়া কষ্ট আপনার, শ্যামবাবুর? তা কষ্ট জলদি মিটে যাবে; যদি মনে কোন রাগ হয় সে ভি কষ্টের সঙ্গে চলে যাবে। তার-পর উমিদ রাখি, সত্য কথা বলে আমি তাকে নরম করে দেব, আপনার কুছু তক্‌লিফ্ আসবে না। বাবুজী সত্য যে সে ভগবান, তাতে মঙ্গল আছে। আপনি কেবল ভয়ে ঝুটা সৃষ্টি করছেন; এতে কেবল আখির দিন পর্য্যন্ত ঝগড়া ও ঝঞ্ঝাট; আপনি হুকুম করুন আমি শ্যামবাবুকে সাফ্ কথা বলি; রাধামাধবজীর কৃপা, সাফ্ দিল, আর সাফ্ কথা, এইতে সব মঙ্গল। আর যদি বাবু আপনার দিল্ আমার সল্লা না চাহে, তবে মাফ্ করবেন আমার ছুটি; কালই চলে যাব। এই আমার আর্জ্জি—এখন আপনার মর্জ্জি।" ব্রজকিশোর নিরুত্তর; ওস্তাদজীর মুখের বিষণ্ণ ভাব একটু পাতলা হইয়াছিল। আবার মেঘ ঘনাইয়া ক্রমশঃ ধীর কঠোর ভাবের সঞ্চার হইল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তা হলে, আমার ছুটি?" ব্রজকিশোর যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "টাকার যোগাড় আমি করেছি। সুধীর পাকা কথা দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত টাকা না জোটে তখন অগত্যা তাই কর্ত্তে হবে; আগে থাকতে ছোট হয়ে কি লাভ? বিশেষ করে যখন কথা ঢাকা রাখবার বার আনা আশা—একথা ওকথায় পাঁচ সাত দিন কাটিয়ে দিতেই হবে কোন রকমে।" "বৃথা বাবুজী, বৃথা; তখন বলতে গেলে কোন লাভ নেই। যে ধরম আছে সে আপসে, খুসীসে করনা; নাচারিসে কর না ও ধরম নেহি। সবকা আশ্রয় করিয়ে বাবু ঝুটকা ফন্দমে ফসিয়ে মত।" ব্রজকিশোর বুঝিলেন, বুঝিতে তাঁহার দেরী লাগে না। কিন্তু সরলভাবে এই পথে তৎক্ষণাৎ পদার্পণ অসম্ভব মনে হইতে লাগিল; চিত্তের হাটে বিরোধী যুক্তিদলের মেলা বসিয়া গিয়াছে। যে নিজের চোখে খেলো হইবার ভয়ে মিথ্যা সৃষ্টি করিতে পারে, সে অন্যের চোখে খেলো হইবার বিপদসম্মুখীন হইলে, আকুলি বিকুলি করিয়া মিথ্যার আবরণে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, সে আর বিচিত্র কি? ব্রজকিশোর শেষটায় বলিলেন, "ওস্তাদজী, আপনি আর পাঁচটা দিন অপেক্ষা করুন। ওস্তাদজী—"যোগ্য নহি বাবু, কোই ফায়দা নহি। ভুলচুক হামারা সব মাফ কর না;—রাম-রাম।" কথার প্রতিধ্বনি মিলাইল না; ওস্তাদজী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রজ-কিশোর একবার বিহ্বল ভাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় উঠিলেন, যেন ইহাই বুঝিয়া যে নিজের মধ্যে যাহা কিছু সম্মানীয়, নির্দ্দোষ তাহা চির বিদায় লইতেছে—

কক্ষমধ্যে সশরীরে, পত্নী পায়ের নিকট ঢিপ্ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। চারুবালার পশ্চাতে একজন দাসী, তাহার হাতে একটি থালার উপর গরম দুধের বাটি; আরও পিছনে যুধিষ্ঠির কক্ষদ্বার হইতে উঁকি মারিতেছে। ব্রজকিশোর আবার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। উদ্দীপনা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া নিমেষে নিবিয়া গিয়াছে। ব্রজকিশোর ভাবিতেছেন, ওস্তাদজীকে পরে ডাকাইয়া পাঠাইবেন, এবার বলিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবেন। টাকা নিশ্চয় যোগাড় হইবে, পাঁচদিন পরে যখন টাকা দেওয়া হইয়া যাইবে তখন শ্যামকে সব কথা সত্য বলিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তখন সব বলিয়া, সত্যের মর্য্যাদা সুরক্ষিত করা যাইবে—ইহাতে ওস্তাদজীর আর কিছু আপত্তি করিবার থাকিবে না। কেবল টাকা দেওয়া পর্য্যন্ত কথাটা চাপা থাক্! কাপুরুষ যুদ্ধ-বিমুখ দুর্গস্বামী বোধ হয় এমনি করিয়া শয়নকক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল—ভাবিয়াছিল এইখানেই যুদ্ধ করিয়া মরিব। চারুবালা হাতের পানবাটা শয্যার উপর রাখিয়া, দাসীর হস্ত হইতে থালা লইলেন, একটু চাপা গলায় দাসী ও যুধিষ্ঠিরকে আদেশ

করিলেন, "তোরা যা, এদিকে যেন কেউ না আসে—আমিই বাতাস দেব, এখন।" ব্রজকিশোর দুধের বাটি হাতে অল্প অল্প চুমুক দিতেছেন, অলস পাখা হস্তে চারুবালা কিয়ৎকাল স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শরীর খারাপ, না মন খারাপ? ঠিক করে বল দিকি?" দুইটী চুমুকের অবসরে সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল, "দুইই।" চারুবালা—"ও খোট্টা ভালুকটার সঙ্গে এত কি প্রাণের কথা হচ্ছিল? দাসীকে আজকাল আর মনে ধবে না বোধ হয়, তা না হলে অসুখ কি অন্দর মহলে গেলে বেড়ে যেত? আমাকে শেষে এইখানে আসতে হ'ল; তাও কি সহজে, যে নবরত্ন ঘিরে আছে সর্ব্বদা; ঠেলে আসা যায় না, বিশেষ করে ওই খোট্টা বেটা যেন দরজা আগলে পাহারা দিচ্ছে। তুমি আমাকে গণ্য কর না, কিন্তু আমার প্রাণটা যে ছট্‌ফট্ করে আর কলকাতা থেকে এলে, দুটো কথা খবর শোনবার ইচ্ছেও ত আমার হতে পারে।" ব্রজকিশোর খালি বাটি নামাইয়া আবার শয্যা অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার কি আরাম আছে না বিশ্রাম আছে—এই শরীর অসুখ, এতটা পথের কষ্ট—কিন্তু ছাড়ে কে? সব ঝঞ্ঝাট আর কাজ নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে; বাধ্য হয়ে এইখানে আটকে গেলাম। আর তাও কৈ কিছু কুল কিনারা দেখছি না; সব দিক অন্ধকার, সামলান দায়। তারপর এমন একজনও দরদের বিশ্বাসী নেই যে তার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।" চারু—"কেন তোমার অমন সোহাগের খোট্টাজী রয়েছে, বুড়ো ঝানু সরকার আছে, গুণের ভাইপো এসেছে। উপযুক্ত ছেলে ডেকে পাঠালেই আসে, তোমার আবার ভাবনা কি? সে জানি, কাজের সময় এরা কেউ নয়, তখন ধর আমাদের দাদাকে। এরা খালি আছেন সভা উজ্জল করতে।" ব্রজকিশোর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না, একটা দারুণ শারীরিক অস্বচ্ছন্দতায় তিনি তখন কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছেন, হঠাৎ বাহিরে গিয়া সদ্যপীত দুগ্ধ বমি করিয়া ফেলিলেন; মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটা আলোড়িত হইয়া ভিতরটা ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল। চারুবালার আহ্বানে, লোকজন আসিয়া তাঁহাকে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল। চারুবালা মাথায় কপালে শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন; পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রজকিশোর অনেকক্ষণ পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্নীর মুখে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি আর বেশী দিন নয়।" চারু—"ছিঃ ওসব কথা মুখে আনতে নেই; কলকাতায় যা তা কত উদরস্থ করেছ, সে বিষ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কি আর ভাল জিনিষ পেটে থাকতে পায়। নেঃ, তোরা বেরো ঘর থেকে, ওঁকে একটু নিরিবিলি থাকতে দে।" সকলে চলিয়া গেলে আবার চারুবালা বলিতে লাগিলেন, "তোমার যেমন ঢঙ্গ, সব সময় ভাল লাগে না; এখন দু তিন দিন কারুর সঙ্গে কোনও কথা কইতে পারে না, তা সে ওস্তাদই হোক আর ভাইপোই হোক্, কেবল বিশ্রাম।" ব্রজকিশোর মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার কাতর দৃষ্টি চারুবালার অন্তরের চারিদিকে হাতড়াইয়া শেষে সেইখানে বাজিল। চারুবালা কাছে সরিয়া খাটের উপর বসিলেন, সহানুভূতির বহিরাবণ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, "আর তোমার যদি সত্যি কোনও অশান্তি থাকে মনে, আর দাদা ব্যবস্থা না করে থাকে কিছু, আমাকে সেটা খুলে বলা দরকার; তোমার বিপদ কি আমার নয়? তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? বলে দেখ আমায়, কোনও যুক্তি দিতে পারি কি না।" পত্নীর এক হস্ত তাঁহার দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় বক্ষস্থলে ন্যস্ত, অপর হস্ত কপালে মাথায় লঘু ক্ষিপ্রগতিতে সঞ্চালিত হইতেছে। স্বামীর চক্ষু দুটি স্ত্রীর মুখে বিভোর হইয়া সংলগ্ন, চারুবালার অতি নিভৃত অন্তরের বিশুদ্ধ স্ত্রীকে জাগাইয়া তোলা-ব্রজকিশোরের জীবনের প্রধান গৌরব, বিশেষতঃ তিনি নিজে চিরদিন দুর্ব্বলচিত্ত আর এই সময় সম্পূর্ণ অসহায়; দুর্ব্বল সহজেই সবলকে আকর্ষণ করে।

দাম্পত্যপ্রলাপ, যুক্তি, পরামর্শে এক ঘণ্টার অধিক সময় পূর্ণ হইয়া গেল; ব্রজকিশোর আত্মসমর্পণের এমন সুযোগ পাইয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া চারুবালা বলিতেছেন, "তাহলে সরকারকে সোজা কলকাতা রওনা করে দাও কাল—সেইখানে টাকা দাদার কাছ থেকে পাবে বলে দাও; দাদা যেন ব্যাঙ্ক থেকে বার করে ওকে দেবে—তার পর দাদাকে আমি চিঠিতে ইসারা করে দিচ্ছি—যতদিন না টাকায় যোগাড় হয় ওকে

কিছু জানতে দেবে না অথচ এ কথা সেকথায় আটকে রেখে দেবে; খোট্টাটা যেতে চাচ্ছে, যাক্ ও বিদায় হ'য়ে; এখানে একটু হাল্কা হয়ে যাবে। দাদা সব ঠিক করে নেবে, তুমি ভেব না মোটে; সরকার যত ধড়ীবাজ সে এখানে, কলকাতায় দাদার হাতে পড়লে কাবু।—এদিকে টাকা যোগাড় হলে দাদা এখানে সোজা চলে আসবে, তোমার ভাইপোকে তখন একটা কিছু বুঝিয়ে দিলেই হবে। আর ইতিমধ্যে বাছা যদি বেশী জেদাজেদি করে, তাহলে দিনকতক অজ্ঞাতবাসে সে মারা যাবে না, পরে কখনও টের না পায় সে ব্যবস্থাও হবে; এইটুকুর ভার তুমি পার ভাল, না হয় আমি মেয়েমানুষ হলেও তার ব্যবস্থা করে নিতে পার্ব্ব—এই জন্যই অক্ষয়কে হাতে রেখেছি। জমিদারী চালাতে গেলে সব কর্ত্তে হয়। ব্রজকিশোর তখন হাল পাল-বিহীন ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ মাত্র—চারুবালা নির্ম্মম স্রোত জড়ধর্ম্মীর উপর কর্ম্মীর সম্মোহন, সুবিধা পাইলেই প্রচণ্ড হইয়া উঠে ভাসে, মহাসাগর অভিমুখে, আবর্ত্তের চক্রে বা চড়ার কাদায়, যেখানেই টানিয়া লইয়া যাউক।

...র আসিয়া কর্ত্তার কানের কাছে কি সংবাদ দিল—চারুবালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"আবার কি সব গোপন মন্ত্রণা হচ্ছে—আমার কাছে লুকোতে হবে।—আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না এসব; কি বলছিলি বল্ শীঘ্র বেয়াদপ্ চাকর—বল্।" যুধিষ্ঠির ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল; চারুবালার রাগ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তখন ব্রজকিশোর বলিলেন,—"এও এক নূতন হাঙ্গামা, কত দিকে যে সামলাই; অথচ না করলেই নয়, লোকটা যেমন বিশ্বাসী তেমনি অনুগত; আর বিপদেও পড়েছে তেমনি, এক আমার ওপরই ওর ভরসা, অথচ আমি পড়ে আছি—আর পারি না।"

চারু - লোকটা কে বল না শুনি?

ব্রজ—আগে বল তুমি তার বিষয়ের ভারও নেবে; আমার এই অবস্থায় তুমিই আমার এক ভরসা; আমায় এই ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত করবে, বল?

চারু—আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি তার ভার নেব-লোকটা কে?

ব্রজকিশোর তখন একটু ঢোক্ গিলিয়া বলিলেন,—"এই রাজু গয়লা। অমনটি আর হয় না - যা করতে বলবে তাতে 'না' নেই আর 'হয়নি' 'হোলো না'ও নেই। আর ওর ক্ষমতার কথা তুমি জান; আমার কথায় প্রাণ দিতে পারে হাসিমুখে—তার বিপদ সব জানা আছে তোমার—নূতন করে বলতে হবে না - ও এসেছে এখানে।"

চারু "ওঃ—বুঝেছি" - এইটুকু বলিয়া গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। স্বামীর উদ্গ্রীব, ব্যাকুল দৃষ্টি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে—যুধিষ্ঠির পালাই-পালাই ডাক ছাড়িতেছে। একটা মৃদু উজ্জ্বল হাস্যে কক্ষের সমস্ত অ-স্বচ্ছন্দতাকে বিদূরিত করিয়া চারুবালা বলিলেন,—"ঠিক হ'য়েছে রাধামাধব ওর কথাটা তোমার মুখ দিয়ে এই সময় বা'র করেছেন বুঝলে, সেই কাজটা ওকে দিয়েই হবে; যুধিষ্ঠির, তুই যা, ওকে তোর ঘরে বসিয়ে রাখ, বলিস্ যেন যতক্ষণ আমি কিংবা বাবু না ডাকি ততক্ষণ যেন না নড়ে।" যুধিষ্ঠির চলিয়া গেলে রাজুর বর্ত্তমান বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানিয়া লইয়া চারুবালা স্বামীকে বুঝাইলেন যে ইহা সুবর্ণ সুযোগ; ভক্ত হনুমানটির পরীক্ষা ও নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধি যুগপৎ হইবে। সে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার চারুবালা অনায়াসেই করিতে পারেন—যেহেতু অভিযোগী ধীরেন মণ্ডল ও তাহার পৃষ্ঠপোষক চন্দ্র পাঠক উভয়েই অনুগত অক্ষয়ের হাতের লোক। আর বনের মধ্যে শ্যামকে আটক রাখিলে ভবিষ্যতে কোনও ভয় নাই। রাজুকে কলিকাতা বা সহরে কোথাও থিতু করিলেই হইবে।

ব্রজকিশোরের ক্ষীণ প্রতিবাদকে খণ্ডিত করিয়া চারু-বালা শেষটায় বলিলেন,—"আমার সাম্‌নে সবাই মিলে তোমার প্রাণটা চট্‌কে বা'র ক'রে দেবে তা আমি সহ্য কর্ত্তে পারব না, তাতে যাই হোক্; আমি যা ধরেছি তা করব—তুমি মানা করলেও করব—বাধা দিলে অনর্থ হবে বলছি—আমার আগে তোমাকে দেখা দরকার। তুমি চুপ ক'রে থাক, দেখ, যা বলি তাই ক'রে যাও কেবল—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এখন ডাক তোমার রাজুকে, দেখি সে কেমন তোমার কথা রাখে—খালি মুখে বললে হয় না—কাজে

আগে দেখি, ওর টান তোমার ওপর কতটা,—তখন ওকে বাঁচিয়ে দেবই—আমি ভার নিচ্ছি।"

কক্ষে প্রবেশোদ্যত শ্যামকে দ্বারদেশে একটু থমকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, চারুবালা ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া সহজ কণ্ঠে তাহাকে কক্ষমধ্যে আহ্বান করিলেন। তাহার পর অবলীলায় অনর্গল প্রশ্নমালায় তাহাকে ব্যস্ত করিয়া দিলেন। সমস্তই তাহাদের অতীত জীবনের বিবরণ সম্বন্ধে, তাহাতে সহানুভূতি অপেক্ষা লৌকিক কৌতূহলই প্রকাশ পাইতেছে। প্রশ্ন ছাড়া মাঝে মাঝে, শ্যামকে আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করিবার সামাজিক প্রতিবন্ধক উল্লেখ করিয়া ও জীবদ্দশায় দেবরের জ্ঞাতিস্বজনের প্রতি অবহেলা উপেক্ষা ইঙ্গিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণপ্রয়োগে তিনি কেমন সিদ্ধহস্ত তাহার নিদর্শন দিলেন। ব্রজকিশোর কেবল পাশমোড়া দিতেছেন ও যন্ত্রণাসূচক এক একটা উচ্চারণ মাঝে মাঝে করিয়া তাঁহার পক্ষপাতশূন্যতার একটা ক্ষীণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রজকিশোরের শরীর বাস্তবিকই অসুস্থ কিন্তু রোগ এখন নিজ মূর্ত্তি ধরে নাই, প্রচ্ছন্ন আশ্রয়ে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে।

শ্যাম ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, কৃত্রিম ভাব, কপট কথা, উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই, অদূরে একটা ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বও সে অনুভব করিতেছে। কি একটা গুপ্ত চেষ্টা, উদ্দেশ্যপূর্ণ অভিনয়, ফাঁকা আওয়াজ যেন অলক্ষ্য ভাবে ভরাট; সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; অনেকটা সেইটাকে পরিস্ফুট করিবার মানসে আর কতকটা জ্যাঠাইমার বক্তৃতাস্রোত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সে জ্যাঠা মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ইন্দ্র কাকার সঙ্গে এক্ষুনি কথা হচ্ছিল, উনি কাল টাকা নিয়ে সদরে যাবেন শুনলাম, আমি ওঁকে পাঠাবার ঠিকানা টিকানা সব বুঝিয়ে, লিখে দিয়েছি—কলকাতায় বড়বাজারে বদরিনারায়ণ বাবুদের গদি আছে সেইখানে দিতে হবে; তবে রেজিষ্ট্রি করে পাঠানর চেয়ে, কেউ গিয়ে টাকা দিয়ে রসিদ নিলে ভাল হয়—না হয় আমি যাব, অবশ্য আপনি অনুমতি দিলে।" ব্রজকিশোর ও চারুবালার মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল, তাৎপর্য্য—'নাও এখন'—'নিশ্চিন্ত থাক'।

চারুবালা বলিলেন—"আচ্ছা এই টাকা না দিলে কি কর্ত্তে পারে তারা?"

শ্যাম কঠিন কণ্ঠে বলিল—"সে কথায় কি লাভ, আমাদের বংশে এখনও কোন জোচ্চোর জন্মগ্রহণ করে নি।"

চারুবালা একটু অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আমি কি তাই করতে বলছি, কেবল জিজ্ঞেস কচ্ছি। আর কিছুদিন দেরী কল্লে চলে না?—ওঁর শরীর খারাপ।"

শ্যাম—"দিতেই যখন হবে, আর দেবার যখন কোনও অসুবিধা নেই, ইন্দ্র কাকা যেরকম বল্লেন, উনি কাল যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন—তখন দেরী করে একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করা বই তো নয়? দেরী দেখলে তারা পাওনাদার, শাস্তি মূর্ত্তি ছাড়তে কতক্ষণ; এখনও তাগাদা করেনি বটে, কিন্তু এখানেও আসতে পারে তেমন গোলমাল বুঝলে—ওদের টাকাই হচ্ছে সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম, আমোদ, কাজ, খেলা সব টাকা নিয়ে আর টাকার মাপকাঠিতে। আর তাছাড়া দেরী করার কোনও দরকার আছে কি?"

কথার শেষ ভাগটা অতর্কিত ভাবে দুইটী বক্ষে গিয়া বিদ্ধ হইল। চারুবালার আতঙ্ক হইল বুঝি সব কথা এই প্রশ্ন টানিয়া বাহির করিয়া লইবে, বাদার এলাকাও আর রক্ষা হইল না। ব্রজকিশোর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ নাঃ কিছু না, কি দরকার অনর্থক দেরী করার। কাল ইন্দ্র যাবেই, কিন্তু এখান থেকে টাকা সব হয়ে উঠবে না কিনা—তাই বরং সোজা কলকাতা চলে যাক্, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে ওদের দিয়ে আসবে। কলকাতায় সুধীরের কাছে যাবে, সেই সব করে দেবে ঠিক্, একে এটনি তায় কলকাতার লোক কোনও ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না ইন্দ্রকে, আর তুমি বাবা যেওনা, আমার শরীর খারাপ। তুমি বাড়ী আছ এই ভরসা। এতটা জানলে আমিই আসবার সময় কলকাতা থেকে নিয়ে আসতাম টাকা।

শ্যাম—"একথা কিন্তু সব চেয়ে ভাল। তাহ'লে আমিও বদরি নারায়ণ বাবুকে সেইভাবে ইন্দ্র কাকার হাতে চিঠি দিয়ে দেব, এদিকে তারা বড় ভদ্র আর ইন্দ্র কাকাকে বলে দিতে হবে, সহর থেকে একজন ভাল ডাক্তার যেন পাঠিয়ে দিয়ে যায়, ও কব্‌রেজের চিকিৎসায় আমার মন উঠছে না।"

একজন ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, গ্রামে আগুন লাগিয়াছে, পাশের ঘরের খোলা জানালার নিকট

শ্যাম আসিয়া দেখিল—অগ্নিরাক্ষসের লেলিহান ঊর্দ্ধমুখী সহস্র জিহ্বা আকাশকে সাজাইতেছে, রক্তবর্ণ ধূম্র উদ্গীরণে আকাশগাত্র আকুল; শ্যাম আর থাকিতে পারিল না। সকলে আগুণ দেখিতেছে—রাজু সন্তর্পণে আসিয়া ব্রজকিশোরকে বলিল, "কর্ত্তা বাবা, আগুণ লেগেছে, আমি যাই।" চারুবালা অগ্নিকাণ্ড দেখিতে দ্বিতলে চলিয়া গিয়াছেন। রাজুর যাওয়া হইল না—নির্জ্জন কক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই জনে কথা হইল, অবশ্য রাজুর পক্ষ হইতে কথা অতি সামান্য। যখন রাজু ক্ষিপ্র নীরব পদ-সঞ্চারে সকলের অলক্ষ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল, তখন তাহার মুখে দৃঢ় সংকল্পের সমাবেশ—যেমন বিচিত্র তেমনই ফুটন্ত। ব্রজকিশোর বাবুও অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন—এই কক্ষ নানা কারণে বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। রাজুকে শ্যামের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া দুই পক্ষের জন্যই অশান্তির কবল হইতে রক্ষার এক উপায় হইল। ভাবিলেন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা যদি পর্ব্বে পর্ব্বে, সরল সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয়।

অগ্নি নির্ব্বাপণের প্রথম সংবাদ লইয়া আসিল অক্ষয়—চারুবালা তখন সেখানে উপস্থিত। চন্দ্রপাঠকের গোলা পুড়িয়া গিয়াছে, বিস্তর ছোলা নষ্ট হইয়াছে—শ্যাম সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অগ্নিনির্ব্বাপণ চেষ্টার জন্য বলিয়া বৃথাই পরিশ্রম করিয়াছে। চন্দ্রপাঠক ক্ষিপ্তপ্রায়, তিনি স্বচক্ষে রাজুকে আগুন লাগাইয়া পালাইতে দেখিয়াছেন—সকালেই থানায় সেই মর্ম্মে ডায়েরী করাইবেন। অক্ষয়ের কথা শেষ হইবা-মাত্র চারুবালা বলিলেন, "অক্ষয়, তোমার উপর আজ একটা ভার দিলাম, আজ থেকে যেন রাজুর মাথার একগাছি চুলও কেউ ছুঁতে না পারে, তোমাকে তার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। এখন এইভাবে চলতে হবে—তুমি পাঠককে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে এসো; এখুনি যাও, দেরী করো না—যাও বাবা, এইটে আমার বড় জরুরী।" অক্ষয় ভাবিল, জাহাজের যতটা অংশ জলের উপর, নীচে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী। সে ধীরপদে আদেশপালনে চলিয়া গেল। চারুবালা স্বামীর দিকে চাহিলেন—তাহার মধ্যে আশ্বাস ছিল, বিজয়-গৌরব ছিল। ব্রজকিশোরও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলেন; যাহা হউক রাজুর ভবিষ্যৎ যোগ্য করে ন্যস্ত; তাহার এই নূতন বিপদবরণ অনর্থক হইবে না। বিনিময়ে সে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু শ্যাম; যাক্—এখন সে কথা ভাবিয়া কি হইবে; উপায়ান্তরই বা কোথায়, মাথারও যে যন্ত্রণা অসহ্য, দেহের মধ্যে যেন একটা নাগরদোলা চলিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডের সময় শ্যামের উৎসাহ দর্শকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বটে কিন্তু অভ্যাস ও উপাদানের অভাবে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। অক্ষয়ের উক্তি এ সম্বন্ধে আংশিক সত্য। শ্যাম যখন বাড়ী ফিরিল তখন জ্যাঠা মহাশয় নিদ্রিত; সুতরাং সে রাত্রে সেইখানেই যবনিকা পড়িল। দগ্ধ শস্য ও অর্দ্ধদগ্ধ গৃহোপকরণের একটা অপ্রীতিকর গন্ধে গ্রামের বাতাস পরিপূর্ণ ও বিষাদময় হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

মানুষের ইতিহাস

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

কোন পর্ব্বতের কঠিন বক্ষ হইতে একটী নদী জন্মগ্রহণ করে। তারপর আঁকিয়া বাঁকিয়া কত অজানা অরণ্য অজ্ঞাত গ্রাম প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া, দুটী তীরে গেরুয়া অঞ্চল বিস্তীর্ণ করিয়া তার প্রাণধারাটী বালুচরের উপর দিয়া বয়। পার্শ্বে হয়তো কোন অজ্ঞাত অরণ্য থাকে। তার প্রতি গাছে গাছে হয়তো ফল ফুল দেখা দেয়। অজানা পাখীর মিষ্ট কাকলীতে অরণ্য পূর্ণ হয়। দিনান্তের রবি সেই দৃশ্য দেখিয়া বিবাগী অরণ্যের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সাজ দেখিয়া হাসিয়া উঠেন। তাঁর হাসির স্বর্ণ ছটা অরণ্যের প্রতি বৃক্ষের পল্লবে পল্লবে মাখিয়া যায়। নদীটী বিরাগী বন্ধুর আনন্দে কুলু কুলু করিয়া গান করিয়া উঠে। একদিন তাপসী নদীর শীর্ণ প্রাণধারাটী উচ্ছ্বসিয়া উঠে! মাঠ, ঘাট, অরণ্য সব ভাসিয়া যায়! সমস্ত কুল বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া, নদীটি উন্মাদ হইয়া অজানা পথঘাট ভাসাইয়া ছুটিতে থাকে; তারপর আর একদিন ঐ উচ্ছ্বসিত প্রাণ-ধারাটী শুষ্ক হইয়া শীর্ণতর হইয়া উঠে। শেষে কোন অজানা পথে নদীটির প্রাণ-ধারা শুকাইয়া পৃথিবীর সহিত একাকার হইয়া যায়। তাহার কোন চিহ্ন কোন সন্ধান থাকে না। প্রতিদিনের সূর্য্য ঠিক তেমনি অস্ত যায়। পাখীরা তেমনি কাকলী করে। কিন্তু একজনের প্রাণ-ধারাটী যে শুকাইয়া গেল সে কথা কাহারও স্মরণ থাকে না। নদী আর মানুষ—মানুষ অমনি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের তীব্র ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ঐ নদীটার মত প্রাণ-ধারায় উচ্ছ্বসিয়া উদ্বেলিয়া শেষে সকলের অলক্ষ্যে হারাইয়া যায়। তাহার কোন চিহ্ন কোন সন্ধান থাকে না।

সেই হারানো ইতিহাসের কিছু ছায়া কিছু ছবি ধরিলাম।

নামের সহিত অন্তরের কোন যোগ-সূত্র থাকে কি না, না থাকিলেও সেই নামানুযায়ী মানুষের চরিত্র ঠিক সেইরূপ হয় কিনা, তাহা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ হয় না। কিন্তু ভোলানাথের জীবনে সে সূত্রটী বোধ হয় ঠিকই ছিল।

স্কুল পলাইয়া সাক্ষাতে অসাক্ষাতে গাঁজা টিপিয়া টিপিয়া যখন সে কাল কাটাইতে লাগিল, বয়স তখন তার নেহাৎ অল্প নয়—দেহে যৌবনোদ্গমের সু-প্রচুর আয়োজন চলিতেছে। গঙ্গাতীরের বালুচরের উপর সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে যাতায়াতও আরম্ভ করিল। এই গুজব কানে পৌঁছাইতে ভোলানাথের মা ক্ষেমঙ্করীর বিন্দুমাত্র দেরী হইল না। তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া হৃদয়দাসকে গৃহে টিকিতে দিলেন না। পুত্রসন্ধানে হৃদয়দাস বিফল হইয়া বাড়ী আসিয়া উনানের নিকট বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে কহিয়া উঠিলেন—হারামজাদা, সয়তানের বাচ্চা, বাড়ীতে ঢুকতে দেবনা, দূর করে দেব—লক্ষ্মীছাড়া।

ক্ষেমঙ্করী ঊর্দ্ধে জলভরা দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলেন—পুত্র যেন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। সোণার অঙ্গে ভস্ম, আর গেরুয়ার আলখাল্লা। হস্তে কমণ্ডলু আর সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ কালবরণ চিমটা! ক্ষেমঙ্করী কাঁদিয়া উঠিলেন। হুঁকা হস্তে হৃদয়দাস ছুটিয়া আসিয়া ক্রন্দনরতা ক্ষেমঙ্করীর প্রতি একটী রোষযুক্ত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিয়া উঠিলেন—ঢং—সবকে দূর করবো! সবকে তাড়াবো!

কিছুদিন পর ভোলানাথ বাড়ী ফেরে। চীৎকার করিয়া কহে, খেতে দাও। ক্ষেমঙ্করী আসন পাতিয়া, জল গড়াইয়া কহেন—কোথায় ছিলি এতদিন? বিটকেল এক মুখভঙ্গী করিয়া ভোলানাথ কহে—চুলোয়। ভাত দাও নইলে এই উঠলাম। শঙ্কিতা ক্ষেমঙ্করী সশঙ্ক চিত্তে পুত্রের সম্মুখে ভাত ধরিয়া দেন। কোথা হইতে হৃদয়দাস গাঁক গাঁক করিয়া চীৎকার করিতে করিতে উপস্থিত হন! বলেন—অকর্ম্মার ঢেঁকি ভাত গিলতে লজ্জা হয় না, বেরো বেরো। এই বলিয়া ভাতের থালা কাড়িয়া লইয়া, ভোলানাথের পিঠে ক্যাৎ ক্যাৎ করিয়া লাথি মারেন। তীরের মত ভোলানাথ ছিটকাইয়া উঠে, কি ভাবিয়া হক্কের পলকে

বাহির হইয়া যায়। ক্ষেমঙ্করী সজল চক্ষে অভুক্ত থালাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। একদিন দুইদিন করিয়া বহুদিন চলিয়া যায়, ভোলানাথ নিরুদ্দেশ। ক্ষেমঙ্করী কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। হৃদয়দাস কহেন—ওর নাম আমরা সামনে করো না। হাড় কখানা জুড়িয়েছে। বেটা শয়তানের ধাড়ী!

কিন্তু ভোলানাথ একদিন ফেরে—হৃদয়দাস তখন মৃত্যুশয্যায়। শান্ত হইয়া ভোলানাথ তখন মৃত্যু-পথ-যাত্রী পিতার সেবা করে। হৃদয়দাসের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠে। ক্ষেমঙ্করীর বক্ষের ধূমায়িত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। শান্তির প্রলেপে সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যায়। পুত্রের মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে হৃদয়দাস চক্ষু বোঁজেন। নিঃশব্দে মৃত পিতার পদতলে বসিয়া ভোলানাথ সম্মুখে চাহিয়া থাকে। চতুর্দ্দিক যেন শূন্য, আর অন্ধকার। পিতৃ কর-ধৃত সংসারচক্রটী এতদিন সুচারুরূপে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যেন নিস্তেজ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারই চক্ষের সম্মুখে নিঃশব্দে নিশ্চল হইয়া গেল। অবলম্বন করিবার মত একগাছি তৃণও কোথাও নাই। তার কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এক অনাগত ভয়ের প্রাবল্যে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

সঙ্গীরা আসে কিন্তু বিফল হইয়া ফিরিয়া যায়। ভোলানাথ বসিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন সন্ধান করে। ক্ষেমঙ্করী ভাবেন পুত্র শেষে পাগল হইয়া যাইবে নাকি! তিনি পুত্রকে কহেন—অমনি মুখ বুঁজে বসে রইলে চলবে কি করে বাবা? বুক বাঁধতে হবে—সাহস করতে হবে! সত্যই তো—সাহস না করিলে কি করিয়া সম্মুখের সীমাহীন সমুদ্রের পাড়ি জমাইবে? স্মৃতি সুখময় বটে কিন্তু অবলম্বন হইতে পারে না। অবলম্বন করিবার মত একগাছি তৃণও যে ত্রিভুবনের কোন স্থান হইতে খুঁজিয়া লইয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোলানাথ জমিদারবাড়ী উপস্থিত হইল। জমিদার বাবু কহিলেন—কি ভোলানাথ, এস এস খবর কি? ভোলানাথ দুই কর জুড়িয়া নিবেদন করিল—আজ্ঞে সবই তো জানেন—সংসার চালাবার মত কিছু একটা চাই, তাই ঐ আমবাগানটী হুজুর নিয়ে যদি কিছু টাকা—। জমিদার বাবু বহুদিন হইতে হৃদয়দাসের আমবাগানটীর উপর লুব্ধ হইয়া ছিলেন। সে সুযোগ যাচিয়া উপস্থিত! অনেক বিঘা জমি—সব ফলন্ত গাছ, বাড়ীর নিকট ভাল সম্পত্তি। আনন্দে শুষ্ক কঠোর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া নৃত্য সুরু করিল! তিনি যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া কহিলেন—সবই তাঁর ইচ্ছা, এ সংসার মায়াময়, তিনিই সত্য, তিনিই মঙ্গলময়। শেষে নানা উপদেশ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভোলানাথের দুটী কর্ণ পূর্ণ করিয়া দিয়া অল্প মূল্যে কার্য্যোদ্ধার করিলেন।

ভোলানাথ হাটের মাঝে দোকান খুলিল—নুন, ঝাল, মসলা ময়দা এই সব! নির্ব্বিঘ্নে সংসার চলিতে থাকিল।

প্রতিবেশিনীগণের নিকট ক্ষেমঙ্করী গল্প করেন—কি ভাবনাই হয়েছিল বোন, ভোলা যে মানুষ হ'বে এ আশা ছিল না! নারায়ণ মুখ তুলেছেন। প্রতিবেশিনী কহে—এবার বিয়ে দে—বউ আন—ঘর আলো হোক্। ক্ষেমঙ্করী কহেন—তাই ভাবছি বোন—মেয়ে একটা আছে—রূপে গুণে মা আমার লক্ষ্মী। ভাবছি এই সামনের মাসেই—।

প্রতিবেশিনী আনন্দে নিকটে সরিয়া আসে। ক্ষেমঙ্করী সুখ-স্বপ্নের জাল বুনিতে থাকেন।

ভোলানাথের বিবাহ হইল ন-গাঁয়ের মেয়ে হরিদাসী তাহারই সহিত। হরিদাসীর সর্ব্বাঙ্গে দিব্য শ্রী! বৌ দেখিয়া পাড়ার সকলে সন্তুষ্ট হইল। ক্ষেমঙ্করী পুত্রবধুকে লইয়া মনের সকল সাধ আহ্লাদ মিটাইতে লাগিলেন! অতীত কালের ব্যথামাখা দিনগুলি চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। অশান্ত ভোলানাথ এখন শান্ত হইয়াছে—ধীর স্থির, কর্ম্মে সু-বিবেচক! মৃত স্বামীর কথা মনে হইতেই ব্যথায় দুটী চোখ আবিল হইয়া উঠে। তিনি কিছুই দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুটী হাত যোড় করিয়া নিঃশব্দে প্রার্থনা করেন। ঊর্দ্ধে তাকইয়া কহেন, নারায়ণ এদের মঙ্গল কর।

ভোলানাথ স্ত্রীকে স্নেহ যত্ন আদর করে। দুই হস্তে সব উজাড় করিয়া বধুটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়—কিছুতেই কার্পণ্য করে না। রাত্রে দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি অধিক হইয়া যায়। ক্ষেমঙ্করী বধুকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া পুত্রের খাবার তাহার ঘরে ঢাকিয়া রাখেন। ভোলানাথ নিজেই এই ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছে। সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিতে ভোলানাথের অনেক দেরী হইল। ক্ষেমঙ্করী তখন ঘুমাইতেছেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল বধূও ঘুমাইতেছে। নিদ্রিতা বধূর রক্ত-ওষ্ঠ ধরিয়া নাড়িয়া দিতেই বধূ জাগিয়া উঠিল। সম্মুখে ভোলানাথকে দেখিয়া লজ্জায় এক অপরূপ ভঙ্গীতে মৃদু হাসিয়া উঠিল। দোকানী ভোলানাথের শুষ্ক হিসাবী মনের জীর্ণ দেওয়াল এই হাসিতে ফাটিয়া তথায় অজস্র সুগন্ধি পুষ্প-মঞ্জরী থরে থরে ফুটিয়া উঠিল। ভোলানাথ একবার বাহিরে তাকাইল। জানালার ওপারে আলোর মেলা! চন্দ্রালোকের প্রাচুর্য্যে পথঘাট প্লাবিত। নীলাকাশখানির মাঝে অজস্র নক্ষত্র। সব হীরকের মত দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। বাড়ীর নিকটেই হেনা ফুটিয়াছিল। একটা সুমিষ্ট সুগন্ধ শীতল ঝির ঝিরে বাতাস ঘরের ভিতর ভাসিয়া আসিতেছে। ভোলানাথ বধূর মুখের দিকে তাকাইল। আরক্ত মুখে হরিদাসী ভোলানাথের বক্ষে মুখ লুকাইল। কাল কাল গোছা চুলে মৃদু অস্পষ্ট একটা সুগন্ধ। সে সুগন্ধ ভোলানাথের মস্তিষ্কে উঠিয়া সারা দেহকে এক মধুর মাদকতায় আচ্ছন্ন করিয়া দিল। নির্ম্মল নীলাকাশের নিম্নে একটী প্রজাপতি জন্মলাভের জন্য থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ভঙ্গুর চুম্বনের আঘাতে সে জন্মলীলা সার্থক হইয়া গেল। প্রজাপতি তার বর্ণ বিকশিত করিয়া নির্ম্মল নীলাকাশের বক্ষে বিচিত্র পাখনা মেলিয়া উড়িয়া গেল!

ভোলানাথ অবাক হইয়া স্ত্রীকে বহুমূল্য রত্নের মতই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে থাকে। এমনভাবে কোনদিন স্ত্রীকে দেখে নাই। ভোলানাথের দিন কাটিতে লাগিল সুখে ও শান্তিতে। রূপে রসে অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ—প্রণয়ীর অন্তর তাই! সংসারসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ নাই—সমুদ্র ধীর স্থির শান্ত! আকাশে মেঘ নাই—নির্ম্মল পরিষ্কার। অতএব নৌকার বিন্দুমাত্র ভয় নাই—ভাবনা নাই। নিরুদ্বেগে তর্ তর্ করিয়া নৌকা পাল তুলিয়া ছুটিতে থাকে। দিন কাটিতে থাকে—কাটিতে কাটিতে বৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসর পড়ে।

ইহার পর ছয় মাস কাটিয়া যায়। সেদিন মঙ্গলবার হাটের দিন। বেলা আটটা হইতেই লোক জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। হাট বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ভোলানাথের একবিন্দু ফুরসুৎ নাই। খরিদ্দারদের একা জিনিষ বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এমন সময় শব্দ হইল 'শঙ্কর'। চাহিয়া দেখিল সন্ন্যাসী। চোখ দুটী আশ্চর্য্য—যেন জ্বলিতেছে—যেন সকল বস্তুকে টানিয়া আনিয়া নিজের চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া সবকে নিমেষের মধ্যে এক পলকে ভস্ম করিতে পারে। সেই দুটী চক্ষুর দিকে তাকাইয়া ভোলানাথ কথা কহিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পর শশব্যস্তে একটী টুল ঝাড়িয়া দিয়া কহিল, বসুন। সন্ন্যাসী বসিয়া মৃদু হাসিলেন। হাসিতে কি ছিল বলা যায় না—কিন্তু ভোলানাথ এতটুকু হইয়া গেল। হাট ভাঙ্গিলে ভোলানাথ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে লইয়া বাড়ী উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা তখন হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যাস্তের রঙ্গিন আলো আসিয়া পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে রং মাখাইয়া দিয়াছে। ভোলানাথ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বাড়ীতে ক্ষেমঙ্করীকে খবর দিল। ক্ষেমঙ্করী পুত্র ও পুত্রবধূসহ বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চরণধূলি বক্ষে মস্তকে ধারণ করিলেন। সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন—কি যে তাহা পরিষ্কার বোঝা গেল না। হরিদাসী ঘোমটার ভিতর দিয়া সম্মুখে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইল। আবার সেই অদ্ভুত হাসি সন্ন্যাসীর মুখে খেলিয়া গেল। সেটী ব্যঙ্গের না কৃপার না ক্ষমার না লোভের তাহা পরিষ্কার পরিস্ফুট হইল না।

রাত্রে নিরালায় হরিদাসী ভোলানাথকে কহিল—আমার' কিন্তু ভাল লাগছেনা। বিস্মিত হইয়া ভোলানাথ কহিল—কি ভাল লাগছেনা? শেষে রসিকতা করিয়া কহে—আমাকে কি?—চোখ মুখ ঘুরাইয়া হরিদাসী কহে, যাও—ভাল লাগছে না ঐ সন্ন্যোসী ঠাকুরকে। পরমাশ্চর্য্যের কথা! বিস্মিত দৃষ্টিতে ভোলানাথ তাকাইয়া থাকে। রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। বাহিরের ঘর হইতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুরু গম্ভীর স্তোত্রপাঠ ভাসিয়া আসে—"ভূতাধিপং ভুজগভূষণ ভূষিতাঙ্গং ব্যাঘ্রাজিনাম্বর-ধরং জটিলং ত্রিনেত্রং। পাশাঙ্কুশাভয়-বর-প্রদ-শূলপাণিং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথং॥ শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং, ভালেক্ষণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণং। নাগাধিপারচিত-ভাসুর কর্ণ-

পুরং বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথং—।" গৃহ গম্ গম্ করিতে থাকে। ভোলানাথ স্ত্রীকে দুইহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

ক্ষেমঙ্করীর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। প্রতিবেশিনীরা আসিয়া কহে—বউকে কেমন দেখছি না—যেন পাংশে—। ক্ষেমঙ্করী কহে, ওমা এই পাঁচমাস যে। হরিদাসী আস্তে আস্তে উঠিয়া যায়। ভোলানাথ স্ত্রীর মন ভাল রাখিবার জন্ত নানা ছোটখাট ভালমন্দ উপহারসামগ্রী তাহার হস্তে পৌঁছাইয়া দেয়। ক্ষেমঙ্করীরও যত্নের ক্রটী নাই—বৌয়ের অরুচির মুখ···। ক্ষেমঙ্করী পৌত্রের আগমন প্রতীক্ষা করে। একটী ছোট্ট খোকা হামাগুড়ি দিয়া ঘরময় দাপাইয়া বেড়াইবে—গোল গোল মোটা মোটা হাত দিয়া আবশ্যক বস্তু টানিয়া ছিঁড়িবে ভাঙ্গিবে, কখনও কচিহাত উঁচু করিয়া আকাশের চাঁদের দিকে তাকাইয়া আধ আধ স্বরে কহিবে আয় আয় আয়। মনশ্চক্ষে ক্ষেমঙ্করী সব দেখিতে থাকেন। কিন্তু বিধাতার চক্ষুর নিকট কাহার একতিল অপরাধও এড়াইয়া যাইতে পারে না। প্রত্যেক বৃহৎ দোষগুণ অপরাধ তুলাদণ্ডে ওজন হইতেছে। সময় আসিলে অলক্ষ্যে বজ্রের মত নামিয়া আসে। কেহ পরিত্রাণ পায় না। সময় বোধ হয় হইয়াছিল—তাই বজ্র নামিয়া আসিল। দুপুরে গৃহে কেহই নাই। একখানি বই লইয়া হরিদাসী একমনে পড়িতেছিল: কোনদিকে কোন শব্দ নাই—সব স্তব্ধ নিস্তব্ধ! নিঃশব্দে বাহিরের সদর দরজা খুলিয়া গেল—সন্ন্যাসীঠাকুর ধীরে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া একেবারে হরিদাসীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিদাসী একমনে বই পড়িতেছিল—এবং মুখখানি সম্পূর্ণভাবে পুস্তকের আড়ালে ছিল, হরিদাসী কিছুই জানিতে পারিল না! এমনি ভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর ওধারের খিড়কীর দরজায় শব্দ হইতেই, সন্ন্যাসীঠাকুর বাহির হইয়া পড়িলেন। ক্ষেমঙ্করী তখন উঠানের মধ্যে—হরিদাসী উঠিয়া কহিল, ও কে মা—ও চলে গেল ও কে মা—? ক্ষেমঙ্করী কথা কহিলেন না—নিস্তব্ধ হইয়া পুত্রবধূর মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সর্প অন্ধকারই ভালবাসে। সন্দেহ ঐ একই বস্তু। মনের আঁধার দিনে দিনে বাড়িতে থাকে—বিষাক্ত সর্পের মত ও ভয়ঙ্কর। একদিন উহারই সুতীব্র বিষ সর্ববস্তুকে জ্বলাইয়া ধ্বংস করিয়া দেয়।

দু একদিন যাইবার পর যে গুজব উঠিল তা ভয়ঙ্কর। শুধু স্ত্রী নয়—স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকের পক্ষে ও বস্তু ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়।

—হরিদাসী নাকি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত রহস্যালাপ করে—

--প্রতিদিন নাকি একঘরে সারদুপুর উহারা কাটায়—

আঁচল টানিয়া দিতে, পান খাওয়াইয়া দিতে অনেকেই নাকি দেখিয়াছে—ইহাই গুজব রটিল। কিন্তু কেহই সঠিক নাম করিতে পারিলনা যে কে ঐ সব কার্য্যাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। ক্ষেমঙ্করী নীরব—কিছুই তিনি দেখেন নাই সত্য তবুও সন্দেহ যাইতে চাহে না। মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করেন না। বিষাক্ত সন্দেহের বিষ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত সত্তাকে যেন নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছে। ভোলানাথ মাকে প্রশ্ন করে কিন্তু ক্ষেমঙ্করী নীরব। ভোলানাথ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া থাকে। অন্তরে যে অগাধ আনন্দ সাগর সীমাহীন থৈ থৈ করিতেছিল, দেখিল সব যেন শুকাইয়া গিয়াছে। স্ত্রীর প্রতি যে বিশ্বাস যে ভালবাসা এতদিন অচল হইয়া অন্তরে বসিয়াছিল আজ তাহা যেন সন্দেহের একটী মৃদু আঘাতেই সে অচল বিশ্বাস কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। ভালবাসার এই ভঙ্গুরতায় ভোলানাথ নিজেও কম আশ্চর্য্য হইল না। কিন্তু পূর্ব্ব-বিশ্বাস যেন কোন মতেই ফিরিয়া আসিতে চাহে না।

ভোলানাথ রাত্রে স্ত্রীকে কহে—একি সত্য? সব কথা পরিষ্কার করে বলো! হরিদাসী ভোলানাথের পায়ে মাথা রাখিয়া কহিল—তুমি স্বামী—পরম গুরু—এর একবর্ণও সত্য নয়—যা শুনেছ সব মিথ্যা—সব ভুল—আমি নিরপরাধী।

স্বল্পালোকে ভোলানাথ যা দেখিল তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরিদাসীর সর্ব্বাঙ্গে এক অপরূপ লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে। শিশুর মতন সরল দুটী চক্ষু। পরিধানে চওড়া লালপাড় সাড়ি, হাতে লাল শাঁখা আর সিঁথিতে রক্তের মত লাল সিঁদুর! সমস্ত যেন দপ্ দপ্ করিতেছে, সব যেন জীবন্ত জলন্ত! হরিদাসী যেন জলন্ত শিখা—সমস্ত মিথ্যা—সমস্ত পাপ সব যেন ঐ জলন্ত শিখার স্পর্শে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। ভোলানাথ হঠাৎ সরিয়া আসিয়া হরিদাসীর একহাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আমি বিশ্বাস করছি এ গুজব মিথ্যা।

হরিদাসী টকটকে লাল ফুলো ফুলো দুটী চোখ তুলিয়া কহিল, সত্যি বলছো? ভোলানাথ কহিল, হ্যাঁ! হেঁট হইয়া গলায় কাপড় দিয়া ভোলানাথের পায়ের তলায় মাথা ঠেকাইয়া হরিদাসী উঠিয়া পড়িল। কহিল—আমার আবার ভয় কিসের, কিন্তু ছিঃ, লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে—তারা তো বিশ্বাস করবে না—তারা আড়ালে আড়ালে হাসাহাসি করবে। কোন মঙ্গল কাজে আমায় ডাকবে না। এর চেয়ে মরণ ভাল! ভোলানাথ তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কানে কানে কহিল—না ডাকুক কোন ক্ষতি নেই। আমি জানি যারা এ কথা বলছে—তারা তোমার পায়ের একটা আঙ্গুলের সমান নয়। হরিদাসী কোন কথা কহিল না, ভোলানাথের বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকিল।

ভোরের বেলা ভোলানাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানায় হরিদাসী নাই! সম্মুখে তাকাইয়া যা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া পাথর হইয়া গেল! শুধু গলার ভিতর দিয়া আওয়াজ বাহির হইল—মা—। উহা আর্ত্তনাদের মতই শোনাইল! ক্ষেমঙ্করী বাহির হইতে কহিলেন, কি হোলরে—

কোন কথা না কহিয়া সম্মুখে শুধু অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেখাইল—হরিদাসী শূন্যে ঝুলিতেছে! ক্ষেমঙ্করী চীৎকার করিয়া কহিল—একি হোলরে—

ভোলানাথ ছিট্‌কাইয়া উঠিল—একটা দা লইয়া কাপড়টা কাটিয়া দেহ নামাইল—কিন্তু প্রাণ নাই! ক্ষেমঙ্করী মাথা কুটিতে কুটিতে কহিলেন—ওরে ভোলা মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে গেল যে রে—ওরে এ যে সব মিথ্যে! ভোলানাথ কোন কথা কহিল না—শুধু নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে হরিদাসীর প্রাণহীন দেহটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেইদিন হইতে ভোলানাথের মুখে হাসি অন্তর্হিত হইল। কাহারও সহিত কোন কথা কহে না—শুধু বসিয়া বসিয়া কি সব ভাবে। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাইয়া কান পাতিয়া কি যেন শোনে! আকাশে যেন হরিদাসীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে, নিশীথে গভীর রাত্রে তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া যেন হরিদাসীকে দেখিতে থাকে। অনেকক্ষণ পর বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়ে, তখন তার দুটী শীর্ণ চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে—শেষে টপ টপ করিয়া মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে। হরিদাসীর অপমৃত্যুর কথা ভুলিবার নয়। একটী পুষ্পকলিকা শত সহস্র দল মেলিয়া শতদলের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু অকালে তাহা ঝরিয়া গেল! হরিদাসী নিজ হস্তে পুষ্পের বৃন্ত কাটিয়া জগতকে নিজ পবিত্রতা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও অপমৃত্যুর কথা ভুলিবার নয়।

একদিন ভোলানাথ কহিল—মা চল সহরে। এখানে আর নয়। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—এ গ্রাম ছেড়ে—তোর বাপ ঠাকুরদার ভিটে মাটী ছেড়ে?—অসহিষ্ণু হইয়া ভোলানাথ কহে—হ্যাঁ এই ভিটে, এই মাটি সব ছেড়ে—ভোলানাথ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া চটকলে কাজ লইল! ভোলানাথকে এখন আর চেনা যায় না। পরিধানের কাপড় যদিও গেরুয়া নয়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা যদিও নাই, মস্তকে জটিল জটাজাল তাও নাই। তবুও মনে হয় এ যেন সন্ন্যাসী। একটা অস্বাভাবিক প্রখরতা সর্ব্বাঙ্গে যেন মাখিয়া আছে। বেশী কথা কহে না, সর্ব্বদা গম্ভীর। ক্ষেমঙ্করীর মনে নীড় বাঁধিবার সাধ এখনও আছে। কহেন, বাবা বিয়েটাই কর। ভোলানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহে—না! হরিদাসীর অপমৃত্যুর স্মৃতি তাহার অন্তঃকরণে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। অত্যাচারী সমাজ এক হইয়া, এক সরলা নির্দ্দোষী বালিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এ কথা ভুলিবার নয়—ভোলা যায় না। ভোলানাথ ভুলিবে কি করিয়া! তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দ্রুতবেগে সব স্মৃতি একে একে উদ্ঘাটিত হইতে থাকে! হঠাৎ বজ্রাগ্নিশিখায় দপ্‌ করিয়া সর্ব্ব শরীর যেন জ্বলিয়া উঠে। শূন্যে হাত তুলিয়া আরক্ত চক্ষু দুটী আকাশে তুলিয়া কহে, ভগবান বিচার করো! অন্তর্যামীর সূক্ষ্ম বিচার তখনও শেষ হয় নাই বোধ হয়। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ একমনে রাস্তায় চলিতেছিল। ক্ষেমঙ্করীর কয়দিন হইতে অসুখ হইয়াছিল, তাই একহাতে কিছু ফল এবং ঔষধ। ভাবিতেছিল—সহরে আর থাকিবে না। থাকিতে ভাল লাগে না। চারিদিকের অশান্ত কোলাহল তাহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছে। উর্দ্ধে তাকাইলে আকাশ দেখিতে পাওয়া

যায় না। সবুজের বিন্দুমাত্র রেখাও কোথাও যেন নাই। কিন্তু তাহার জন্মভূমি সেখানকার সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রখচিত আকাশ—মাঠ, ঘাট, পথ, নির্ম্মল গঙ্গা সব যেন মধুর, সব যেন সুন্দর। কোনদিকে কোন কোলাহল নাই, অশান্তি নাই। দুর্নিবার শক্তিতে তার গ্রামখানি যেন তাহাকে দুই হাত দিয়া টানিতে থাকে। হোক্ সে দেশের লোক খারাপ, হোক সে সমাজ নিকৃষ্ট—তবুও তার জন্মভূমির প্রতি বস্তুটীর সহিত কিছুরই যেন তুলনা হয় না। এ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সবই ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের ধ্বংস একদিন হইবেই। একদিন সমস্ত ছাড়িয়া বুকভরা আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া—অসমাপ্ত না-বলা বহু কথা, বহু কর্ম্ম লইয়া চলিয়া যাইতেই হইবে—কিন্তু যেদিন তার মৃত্যু হইবে, সেইদিন যেন তার জন্মভূমিতে সকল পরিচিত ব্যগ্র মুখের সম্মুখে দুটী চক্ষু বুঁজিতে পারে। সেই চির-পরিচিত পথ-ঘাট-প্রান্তর। ছায়ামাখা গন্ধভরা পথের মধ্য দিয়া তাহাদের স্নেহময়ী গঙ্গার শীতল কোলে যেন পৌঁছাইতে পারে। সেই সুখ সেই অসীম আনন্দের তুলনা নাই।

ইহা মনে হইতেই এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সীমাহীন সাগরের অগাধ আনন্দের ফেনা সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। কিন্তু বিধাতার দণ্ড কে রোধ করিবে! তাহা সত্য, তাহা অমোঘ—

—পিছন হইতে একটা ভারী মোটরলরী আসিয়া পড়িল। একটী মুহূর্ত্ত মাত্র। চতুর্দ্দিকের পথিকরা চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু ভোলানাথ চকিতে সরিয়া যাইতে না যাইতে হুড়মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়া মোটর লরী তাহাকে দলিত পিষ্ট করিয়া থামিয়া পড়িল।

ভোলানাথ রাস্তার উপর লম্বা হইয়া পড়িল। শুষ্ক রাস্তা রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। হাতের ঔষধ ও ফল এক ধারে গড়াগড়ি যাইতেছে। একবার চোখ তুলিয়া তাকাইয়া কি বলিতে গেল কিন্তু বাক্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। ডান পায়ের একটী শিরা তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তারপর এক সময় তাহাও কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল। ক্ষেমঙ্করী হয়তো রোগশয্যায় শুইয়া তখন পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছে।

যে প্রাণধারাটী এই কিছু পূর্ব্বে সমস্ত দেহে বহিতেছিল, এখন কোথায় গেল, কে তাহার সন্ধান বলিবে? ভঙ্গুর এই জীবন—এমনি অসমাপ্ত বাক্য, এমনি অসমাপ্ত কর্ম্ম রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। হয়তো কোন স্নেহ মুখ, হয়তো কোন মিষ্টি কথা যাইবার পূর্ব্বে শুনিতেও পাওয়া যাইবে না, দেখিতেও পাওয়া যাইবে না!

মানুষের এই ইতিহাস।

বিদ্রূপ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

হাজার হাজার যোজনের পথ ঊর্দ্ধে থাকিয়া রবি,
হয়তো ভুলেও ভাবেনা পদ্মবালার ও মুখ ছবি;
যুগ যুগান্ত হয়ে যায়, কভু
হয়নি মিলন, হবেও না; তবু
লিখে তাহাদের প্রণয়-কাব্য কেমন খেয়ালী কবি!

জীবনে যে কারো পায়নি সোহাগ দুখের কালিমামাখা
মুখখানি যার, নামটী তাহার 'আদুরী' 'সোহাগী' রাখা,
ধরে দিয়ে নানা কার্য্যের ত্রুটী
কুটিল হাস্যে করিয়া ভ্রূকুটি
এ যেন বেচারা বাসার চাকরে 'আপনি' 'মশাই' ডাকা।

ঘরে চাল নাই দেখে গৃহিণীর নথখানি দিয়ে নাড়া
"চাল বাড়ন্ত" বলা বিদ্রূপ রসের সরস ধারা।
কাব্যেই থাক্ কাব্যের ধন
বাস্তবে তার কোন্ প্রয়োজন
ভারী নিষ্ঠুর প্রথা এ যেমন মরার উপরে খাঁড়া।

নারী-সংগতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

ইংরাজশাসনের নাগপাশ হইতে ভারতবাসী আজ মুক্তি চাহিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি চাহিতেছে—সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা তাহাদের হিন্দুভাই-এর সংখ্যাগরিমার বাস্তব ও কল্পিত অত্যাচার হইতে; মুক্তি চাহিতেছে—অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের হাত হইতে, কিষাণ জমিদারের কবল হইতে, শ্রমিক ধনিকের মুষ্টি হইতে, স্ত্রী পুরুষের সোহাগ হইতে, পুত্র পিতার পালন হইতে, কন্যা মাতার লালন হইতে! চারিদিকে মুক্তির হাওয়া, নবজাগরণের রোল। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়—এবার যাহোক্ একটা কিছু ঘটিবেই; যদিও কি ঘটিবে তাহা ভগবানের হাতে।

আমরা বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি—স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার; অর্থাৎ স্বাধীনতা মানুষের সহজাত; বাহিরের কেহ বা কাহারা আমাদের সেই স্বাধীনতা হরণ করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; আত্মবলে তাহাকে পুনরুদ্ধার করা, আমাদের জন্মগত অধিকারকে পুনরর্জ্জন করা, মানুষের কাজ।

স্বাধীনতার জন্ম জন্মগত কিনা দেখিতে হইলে দেখিতে হইবে, জন্ম কি? মুক্তি না বন্ধন? মুক্তি নহে, বন্ধনই। আমরা জন্মিয়াই কাঁদি। বিজ্ঞান বলে—ফুসফুসের কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য কাঁদা একান্ত প্রয়োজন, না কাঁদিলে শাস্ত্রীয় উপায়ে কাঁদান হয়। কিন্তু হাসিয়াও ত ফুসফুসকে সক্রিয় করা যাইত। গর্ভবাস হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশু মুক্তি পাইয়াছে মনে করে না ইহা ধ্রুব। মানুষকে জন্মিয়াই কাঁদিতে হয়, হাসি শিখিতে হয়। সৃষ্টির মূল স্বাধীনতা নহে—বন্ধন।

অবোধ হইয়াও শিশু মুক্তিকামী, কিন্তু সে কি নিরুপায়! মাতৃস্নেহের বন্ধন না হইলে তাহার জীবনযাত্রা আরম্ভ হইতে পারে না।

বালক মুক্তিকামী; কিন্তু পিতৃপ্রমুখ আত্মীয়-স্বজনের পরিপালনে সে নিয়ত বন্ধনই অর্জ্জন করিয়া চলে।

তাহার পর মানুষ ক্রমে গৃহ, পরিবার, সমাজ ও সংসারের অসংখ্য জটিল বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে। তথাপি সে হাঁকে—"অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"

মানুষের বন্ধন যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, বন্ধনের সহিত তাহার চিরবিদ্রোহও তেমনি আন্তরিক সত্য আর এই বিদ্রোহের ইতিহাসই মানবের ইতিহাস।

এই বন্ধন যে মূল হইতে শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে তাহা আমাদের অজ্ঞেয়,—তাহাকে মহাশক্তি বল, মহামায়া বল, স্রষ্টা বল, ব্রহ্ম বল, কেবল কথাই বাড়িয়া যায়; মীমাংসা হয় না।

আবার মানুষের স্বীয় মুক্তিকামনা কোন্ উৎস হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শক্তিসংগ্রহ করিয়া আসিতেছে, ইহার উত্তরও সহজ নহে। কিন্তু সে উৎস তাহার নিজের মধ্যে ইহা নিশ্চয়। এই উৎসই তাহার আমিত্ব, তাহার আত্মা। যাহা বাহির হইতে আসিতেছে তাহা বন্ধন, আর ভিতর হইতে যুঝিতেছে—মুক্তিকামনা। সুতরাং স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার নহে, আজন্মের আকাঙ্খা।

বাহিরের সহিত অন্তরের, প্রকৃতির সহিত মানুষের এই চিরবিরোধ দেখিয়া মনে হয় মানুষ ক্রমবিবর্ত্তনদের কোন ধাপে পড়ে না, সে একটা আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত সৃষ্টি। সেই জন্যই সে এত অস্বাভাবিক, সেই জন্যই তাহার সভ্যতা, তাহার তপস্যা, তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ক্রমেই দূরে লইয়া চলিয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিলে মানবাত্মার বিশেষত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

মানুষের কি জয় হইয়াছে? না; বন্ধনের মূল শক্তি মহাশক্তি; তাহাকে অতিক্রম করা বুঝি কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

মানুষ কি পরাজিত হইয়াছে? না; ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত মানবাত্মা সেই মহাশক্তির সহিত শক্তিপরীক্ষায় বিরত হইবে না; পরাজয় স্বীকার করিলে তাহার আত্মাবমাননা হয়। মানবের অহংকারের সীমা নাই।

এই চিরবিরোধের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বেচারী প্রেম! সে একবার একে বলে—ওগো; একটু ঠাণ্ডা হও; আরবার ওকে বলে– ওগো তুমিই না হয় একটু সাম্‌লে চলো; পরস্পরকে লইয়াই যখন সংসার, তখন একটা রফা করিয়া লইলেও হয়

প্রেমের ইতিহাস এই চিরন্তন ও চিরনূতন রফার ইতিহাস।

মানুষ বলিল—হে ইন্দ্র, হে পর্জ্জন্য, হে আদিত্য, হে রুদ্র, হে সোম, বহুচেষ্টায়ও তোমাদের বাগাইতে পারিলাম না; কিন্তু তোমরাত পর নও; আমরা যজ্ঞ করি, তোমরা প্রসন্ন হও। তোমাদের প্রসাদে ও আমাদের প্রেমে চতুর্দ্দিক মধুময় হউক। রফা নং ১।

শঙ্কর কহিলেন –হে ধনঞ্জয়, হে সব্যসাচী, চাহিয়া দেখ আমি কিরাত নহি; তোমার তপস্যায় তোমার বীর্য্যে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর, তোমায় আজ আমার অদেয় কিছুই নাই। রফা নং ২।

এমনি দফায় দফায় একই রফা বহুধা হইয়া মানবের ইতিহাসকে বিচিত্র করিয়াছে।

শিশুপুত্র অসহায়, দুর্ব্বল। পিতা পূর্ণকায়, সবল। এই অনুপায় বৈষম্যের পর্দ্দা-উন্মোচন উভয় মানবাত্মার লজ্জাজনক। রফা হইল,—পিতা হাতে পায়ে ঘোড়া হাঁটিবে, আর পুত্র পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বলিবে--হ্যাট্‌ হ্যাট্‌! পিতারও আনন্দ, পুত্রেরও আনন্দ। কিন্তু পিতার আত্মা নূতন বন্ধনের মধ্যে আপনাকে বারিত করিতেছে, আর পুত্রের আত্মা নিজের অধিকারগৌরবে নিজেকে প্রতারিত করিতেছে। শিশুর মধ্যে যদি কোন যুগে 'প্রগতি' জাগে তবে সে বুঝিবে ও বলিবে—ইহা মিথ্যা প্রবঞ্চনা, সুতরাং আত্মার অবমাননাকর। এই লজ্জাজনক ঘোড়সোয়ারি বন্ধন হইতে শিশুআত্মার মুক্তি চাই। পিতা তখন কি বলিবে কল্পনা করা একটু কঠিন। যদি কেবল হাসে, শিশুপুত্র আরও অপমানিত জ্ঞান করিবে, বিরোধ বাড়িবে; আর যদি তর্ক করে, তর্কে নিশ্চয় হারিয়া যাইবে। যদি সার দায়—রফার ইতিহাসে আর এক নম্বর রফা যুক্ত হইবে।

নারী আগুন, নর পতঙ্গ; নারী দাসী, নর প্রভু; নারী দেবী, নর পূজারী—এসব তত্ত্ব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনবশে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। নরনারীর আদি ও অকৃত্রিম পার্থক্য সেইদিনই প্রথম ধরা পড়িয়াছিল, যেদিন স্বেচ্ছাচারণ ও সমাচরণের মধ্যে নারী প্রথম গর্ভধারিনী জননী হইল। নারীহৃদয় যাহাই বলুক্ নারীদেহের অন্তরালে যে বন্ধনবিরাগী মুক্তিপিপাসু চিরবৈদান্তিক মানবাত্মা আছে সেদিন তাহার বড় দুর্দ্দিন। অন্তরের অন্তরে সে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়াছিল। সেই লজ্জাই নারীকে আজও লজ্জাবতী করিয়া রাখিয়াছে, সেই লজ্জারই উদয়রশ্মি নারী-অঙ্গের শিখরে শিখরে আজও রূপ দিতেছে।

অপরপক্ষে নরহৃদয় সেদিন যাহাই অনুভব করুক, নরের অন্তরে যে মানবাত্মা আছে, সে সহচারী মানবাত্মার এই অপ্রত্যাশিত ও অপরিহার্য্য বৈষম্যবিধানে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল নিশ্চয়। সেইদিনকার নরের ক্ষোভ ভিতরে ভিতরে নারীকে সে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছিল আজিও তাহার বিরাম হয় নাই; নরের মুরুব্বিয়ান স্নেহ সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।

তাহার পর হইতে নরনারীর মধ্যে যে রফা ও আত্মপ্রবঞ্চনার বন্ধন আরম্ভ হইল তাহাই দাম্পত্য প্রেম।

মানুষ নরনারীনির্ব্বিশেষে জানে কোন্ মহাশক্তির সহিত তাহার কত বড় বিরোধ! আত্মকলহে শক্তির অপচয় করিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু সৃষ্টির মূলে যে বৈষম্য বিদ্যমান, তৎকর্ত্তৃক এই কলহ যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তখন সে স্বজনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ রফা করিয়া সমগ্র মানবশক্তিকে অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা পায়। বিরুদ্ধ মহাশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানব মানবকে প্রত্যক্ষ অপমান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে। তখন সে হয় ত্যাগের মধ্য দিয়া আত্মকে বঞ্চিত করে, নয় ভোগের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রবঞ্চিত করে। জরাগ্রস্ত রাজা যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে। ইংরাজ আজও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে সে আপনার জন্যই ভারতকে দোহন করিতেছে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিবার সময়ও শ্লোক আওড়ায়—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। কারণ তাহার অন্তরের কুণ্ঠা কোনদিন ঘুচে নাই। নর পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়াও নর-আত্মা বা নারায়ণের মর্য্যাদা রক্ষা করে। কিন্তু মানবাত্মা যত চেষ্টাই করুক বৈষম্য-জননী বৈচিত্র্যপ্রিয়া মহাশক্তি

একান্ত প্রবল ও ভেদপরায়ণ, তদুপরি সে চির-কৌতুকময়ী ও নিতান্তই নিষ্ঠুর।

নরনারীর মধ্যে নিরুপায় বৈষম্য যেদিন প্রত্যক্ষীভূত হইল তাহার পর হইতে অশক্ত বুঝিয়াই বা নারীকে শক্তিরূপিণী বলা হইল! বিদ্রূপ করিয়া নহে, একান্ত ক্ষোভের সহিত, রফার অর্থাৎ প্রেমের খাতিরে, সান্ত্বনার হিসাবে। মুক্তিকামিনী নারী যখন জননীর মধ্যে সন্তানাতুর, ক্লিষ্ট, নিশ্চেষ্ট, গৃহবন্দিনী; পুরুষ তখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জয়দৃপ্ত পুরুষ গৃহে ফিরিয়া বলিল—দেবি। তোমার শুভেচ্ছা প্রচ্ছন্ন শক্তি না পাইলে আমার জয় সম্ভব হইত না, তোমারই কণ্ঠে এ বিজয়-মালা দিলাম। তখন সেই জয়মাল্যগ্রহণাবনত নারীর গ্রীবা যে আত্ম-বন্দনা ও আত্ম-বঞ্চনা করিল, তাহা হইতে নারীর আজিও মুক্তি হয় নাই। সীতা যেদিন রাবণারির সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে উপবেশন করিয়াছিলেন সেদিন অযৌন মানবাত্মা যে লজ্জায় লজ্জিত হইয়াছিল তাহার নিকট সীতা-নির্ব্বাসনের লজ্জাও বুঝি মলিন হইয়া যায়। যাহা অর্জ্জিত নহে তাহার ভোগও যেমন বিড়ম্বনা ছিল, শেষ পরীক্ষার দিন তাহার ত্যাগও তেমনি অহেতুক হইয়া গেল। কিন্তু মাঝে ছিল প্রেম, অর্থাৎ নিরুপায় রফা।

আবার পুরুষের কোলে গর্ভের সন্তানকে বসাইয়া নারী যেদিন বিজয়গর্ব্বে বলিল—এই নাও আমার প্রত্যুপহার—সেদিনও আর এক রফাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। নর বলিয়াছিল—দেবি, তোমারই জয়। কিন্তু মানবাত্মা বুঝিয়াছিল প্রকৃতপক্ষে ইহা মহাশক্তিরই জয়। মহাশক্তির বিজয়-পতাকারূপী সেই ক্রোড়স্থ শিশুর ছায়াতলে নরনারীতে যে রফাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সমাজ আজিও তাহা মানিয়া চলিতেছে। মানব বুঝে—ক্ষুধিত মার্জ্জারের ন্যায় শাবকভক্ষণ মানবের চলিবে না।

মানবাত্মার অগৌরবেরই কথা, কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস পরম দুর্গম পথে নরের জয়-যাত্রার ইতিহাস, নারী সহধর্ম্মিণী হইয়া সঙ্গে আছে মাত্র। সে সন্তান দিয়াছে, কখনো বা মাথার কেশ কাটিয়া ধনুকের ছিলা বুনিয়াছে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত ও প্রত্যক্ষ দান তাহার বিশেষ কিছু নাই। সুদীর্ঘ মানব-ইতিহাসে গার্গী মৈত্রেয়ীপ্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকটি নারীর কথাই বারবার উল্লেখ করিতে হয়, ইহা নারীরই পরম লজ্জা। মানব সভ্যতার যে নব নব বিকাশ হইয়াছে তাহা প্রায় সর্ব্বতঃ নরের সভ্যতা। এই নারসভ্যতার স্বর্গীয়ত্ব ও নারকীয়ত্বের জন্য নরই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। নারীকে সে প্রয়োজনবশতঃ সঙ্গে রাখিয়াছে; প্রেমিক তাহাকে প্রেম দিয়াছে, কামুক কাম দিয়াছে, ধনী ধন দিয়াছে, ব্রহ্মবিৎ হয়ত ব্রহ্মবিদ্যাও দিয়াছে; কিন্তু স্বীয় পৌরুষার্জ্জিত সভ্যতার পূর্ণভাগ ও সুযোগ (ন্যায্য ভাগের কথাই উঠে না) নর নারীকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই, ইহা সত্য। কিন্তু এই সত্যের মূলে মহাশক্তির মহাসত্যজনিত মহালজ্জা আছে। নর আপন তপস্যার দ্বারা আজিও সে লজ্জার প্রতিবিধান করিতে পারে নাই। আর নর সর্ব্ববিষয়ে উদার হইলেও নরের মহত্ত্ব বাড়িতে পারিত কিন্তু নারীর লজ্জা ঢাকিত না; মানবাত্মা আজিকার মতই ক্ষুণ্ণ থাকিত।

আজ নারী জাগিয়া উঠিয়া নরের কাছে যুগান্তরের হিসাব বুঝিয়া লইতে চায়। জাগিয়াছে ইহা আশার কথা, কিন্তু সেই হিসাবের কথা না তুলিলেই ভাল হয়; তাহা মানবাত্মার শ্লাঘার বিষয় নহে। রফার সর্ত্তানুযায়ী একে ঘুঁষ দিয়াছে অপরে ঘুঁষ লইয়াছে। স্বর্ণের ঘুঁষ, সম্মানের ঘুষ, সুখের ঘুঁষ, দুঃখের ঘুঁষ, স্নেহের ঘুঁষ, সোহাগের ঘুঁষ, ভোগের ঘুঁষ, ত্যাগের ঘুঁষ, দেবীত্বের ঘুঁষ, দাসীত্বের ঘুঁষ—কখনও বা সর্ব্বনাশের ঘুঁষ,—কিন্তু সবই ঘুঁষ; একের অর্জ্জন দু'য়ে বণ্টন করিয়া লওয়া! ইহার পরিবর্ত্তে নারী যাহা দিয়াছে রফার কষ্টিপাথরে অন্তরের দিক হইতে তাহা হয়ত অমূল্যই ছিল। কিন্তু নারীই বলিতেছে বিশ্ব-হাটের পুং-দাড়ীপাল্লায় তাহার ওজন নিতান্ত কম, সীতা সাবিত্রী হইতে আজ পর্য্যন্ত সে প্রবঞ্চিত হইয়া আসিতেছে! সুতরাং ঘুঁষের হিসাবই বাকি থাকিয়া যায়।

নারী আজ আপনার অধিকারের দাবী করিতেছে। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান:—কাহারও তাঁবে না থাকিবার অধিকার। এ অধিকার আপনা হইতে কাহারও নাই, কারণ জন্মটাই আমার তাঁবে নহে। কিন্তু এই তাঁবে না থাকিবার জন্য চিরবিদ্রোহের অধিকার মানুষের আছে,

নারীরও আছে; এই বিদ্রোহই মানবের ইতিহাস। তাঁবে না থাকার অধিকার কখনও পূর্ণভাবে অর্জ্জিত হইতে পারে না। রফায় তাহা অংশতঃ শমিত থাকে এবং বাধায় তাহার মর্য্যাদা বাড়ে। রফা যখন বাতিল হইতে বসিয়াছে এবং লজ্জাজনক বলিয়া অনুভূত হইতেছে, তখন আর এক রফা না হওয়া পর্য্যন্ত বিরোধ চলিবে আশা করা যায়।

পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার অধিকার নারী চাহিয়াছে। কিন্তু নারী অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গতিও স্বভাবতঃ মন্থর। মন্থরতার লব্ধ ও অর্জ্জিত সর্ব্ববিধ হেতু বর্জ্জন না করিলে সে পুরুষের নাগাল পাইবে না। চির-ছয় ফুটে ও চির-পাঁচ ফুটে সমান তালে পা ফেলিতে পারে কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা আবার মহাশক্তির হাতে।

ইহার উপর নাচিবার অধিকার, গাহিবার অধিকার, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিবার অধিকার, বুক খুলিয়া জামা আঁটিবার অধিকার, ঘাড় কামাইয়া চুল ছাটিবার অধিকার, সিগারেট খাইবার, কুস্তি লড়িবার, ছোরা খেলিবার ইত্যাদি নানা অধিকার সে নরের হাত হইতে চাহিয়া বা ছিনাইয়া লইতে চাহে।

কিন্তু এ সমস্তই খেলো কথা এবং অধিকার হিসাবে ইহাদের মূল্য নাই। কিছু দিন পূর্ব্বেও নাচিয়া নাচিয়া কলহ করিবার অধিকার অনেক গৃহস্থ নারীরও ছিল। গামছা পরিবার অধিকার গৃহকর্ত্রীদের বহুদিন যাবৎ প্রায় একচেটিয়া ছিল। জামা ত ছিলই না। আগুল্'ফ চুল লুটাইয়া দিবার অধিকার ঘাড় কামাইয়া চুল ছাটিবার অধিকার অপেক্ষা অনেক বড় অধিকার।

তবে এই সব খেলো কথার মূলে আছে—কলাবিদ্যা-সাধনার, যথেচ্ছ বিলাসিতার ও পেশীশক্তিতে শক্তিমতী হইবার অধিকার আধুনিকা নারী চাহিতেছে। এ সবের পূর্ণ প্রয়োগ সে নাও করিতে পারে, কিন্তু অধিকার হিসাবে তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে এই সে চায়। বিদ্রোহী মানবীর কামনা—তাহার হাতের পাশে সরস্বতীর বীণা ঝুলিবে, পায়ের কাছে লক্ষ্মীর পেঁচা চরিবে ও দুয়ারে শিবের ষাঁড় বাঁধা থাকিবে, আর সে খুসিমাফিক্ তাহাদের ব্যবহার করিবে।

কিন্তু প্রয়োগ করিবার একাগ্র সাধনা ও শক্তি'সহায় ঈপ্সা ভিন্ন মাত্র লিপ্সার দ্বারা অধিকারকে অধিক দিন জিয়াইয়া রাখা যায় না; তাহার অমর্য্যাদাই করা হয়। সূর্য্য-লোকে যাইবার অধিকার কমলিনীর আছে কি না এ তর্ক—বিতণ্ডা মাত্র।

প্রথম কলাবিদ্যার কথা ধরা যাক্। চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্য—এই তিনটি এ অঞ্চলের প্রধান মালিক। চিত্রবিদ্যার সাধনা নারী চিরদিন করিয়াছে শুনা যায়, কিছু কিছু প্রত্যক্ষও করা যায়। কিন্তু মানবেতিহাসে তাহার উল্লেখযোগ্য দান নাই। অধিকার ছিল এবং আছে। চেষ্টা ছিল এবং আছে। কিন্তু দানের পরিমাণ অত্যল্প। পুরুষজ বাধাই ইহার কারণ, না নারীর প্রকৃতিগত সাধনার শিথিলতা ইহার সহিত যোগ দিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। এ চিন্তার প্রয়োজন আছে এই জন্য, যে ব্যাধির নিদাননির্ণয়ে ভুল থাকিলে প্রতিবিধান কার্য্যকর হইবে না।

নারীর নৃত্য ও সঙ্গীত চিরদিন পুরুষকে মোহিত করিয়াছে। এ অধিকার আমাদের সমাজের নিম্নস্তরে অনেকটা জাতিচ্যুত ভাবে পড়িয়া আছে। ইহাকে জাতে উঠাইয়া প্রকৃত অধিকার হিসাবে অর্জ্জন করিতে হইলে চাই সেই কলানুরক্তি ও একাগ্রতা যাহাতে নারী নরের অনুরাগ-বিরাগ তুচ্ছ করিয়া সঙ্গীত ও নৃত্যসাধনার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে পারে। নারী যখন গাহিবে বা নাচিবে তাহা যেন কেবল মাত্র সরস্বতীর সম্মুখেই হয়—পায়ের তলার রাজহংসটীও যেন তখন নারীর দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে। সে সময় নরজাতিকে মুগ্ধ করিবার ইচ্ছা যদি সজ্ঞানে বা নিজ্ঞানে তাহার অন্তরে বর্ত্তমান থাকে, তবে আবার একদফা রফা হইবে। যেমন রফা যুগ-যুগান্তর চলিয়া আসিয়াছে, আর যে রফায় নারীর নারীত্ব বাড়িতে বাড়িতে মানবত্ব প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। নরের সাধনার ইতিহাসে যেমন নারীনিরপেক্ষ সাধনার দৃষ্টান্ত প্রচুর, নারী কি সঙ্গীতে ও নৃত্যে সেই নরনিরপেক্ষ সাধনা করিতে পারিবে? সন্দেহ আছে, কারণ মহাশক্তির মতলব ভিন্নরূপ বলিয়াই মনে হয়। যদি না পারে, তবে হয় অপ্সরীর নয় উর্ব্বরার নারীত্ববর্দ্ধক নৃত্যগীতই আবার ফিরিয়া আসিবে, নারীর দানের কোঠা হয় ত শূন্য থাকিয়া যাইবে।

মানুষ কথা কহিতে পারে, তাহার ভাষা আছে, তাহার সাহিত্য আছে। নরও কথা কয়, নারীও কথা কয়। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য যে অতিমাত্রিক নরের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সৃষ্টি অবশ্যই প্রবলতর পেশীশক্তির ফল নহে। সাহিত্যে নররথীদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারেন এমন নারীসাহিত্যিক খুব কম। ভাষার শব্দ, রূপ ও ভঙ্গী বিচার করিলে দেখিতে পাইব—সাহিত্যমাত্রই নরের মনীষাসঞ্জাত। অঙ্গুলিমেয় নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ছাড়িয়া দিলে শব্দমাত্রেরই আদিরূপ পুংলিঙ্গ, তাহার উপর একটা কিছু চাপাইয়া তাহাকে স্ত্রীরূপ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে—চিন্তা করিতেছে নর এবং আরও পাঁচটা চিন্তনীয়ের মধ্যে নারী একটী চিন্তনীয় মাত্র। এই যে সাহিত্য,—পুরুষ গড়িছে তারে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি' আপন অন্তর হ'তে। স্বয়ং ব্রহ্ম জগতে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হ'ন কি না শপথ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তিনি দেশ বিদেশে যে কয়বার অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায় এবং আগামী বারের জন্ত তাঁহার যে রূপ কল্পিত হইয়া আছে তাহার প্রত্যেকটী যে নরসংস্করণ, ইহার মূলে আছে এই সত্য—মানবের ধর্ম্মচিন্তার ইতিহাস নরেরই চিন্তার ইতিহাস। নারীকে অনুরূপ সম্মান দেওয়া হইয়াছে কল্পনায়, সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ হিসাবে; অর্থাৎ স্বর্গে দেবতাদের বিপদ ঘটিলে ব্রহ্ম যে রূপ ধরেন তাহা মাঝে মাঝে নারীরূপ, কিন্তু প্রত্যক্ষ মর্ত্যে তাঁহার রূপ যুগে যুগে দেশে দেশে নররূপ। আমাদের জাতি—মানবজাতি, মানবীজাতি বা মানব-মানবী-জাতি নহে। আমাদের সভ্যতা মানব-সভ্যতা, আমাদের ইতিহাস মানবেতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম। এই জাতি, সভ্যতা, ইতিহাস ও ধর্ম্মের মধ্যে নারী উপকরণ হইয়া আছে। যুগযুগান্তরব্যাপী নরের এত বড় অর্জ্জনের সমানভাগ নারী চাহিলেই পাইবে না; তাহার জন্ত যে তপস্যা ও নিষ্ঠা প্রয়োজন, নারীর তদুপযোগী শক্তি ও সুযোগ আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। যে বৈষম্য-বিলাসী মহাশক্তি দীর্ঘ দিন ধরিয়া, হয়ত কৌতুকবশেই, এ বিষয়ে নরকে সাহায্য করিয়া নারীকে পিছনে হটাইয়া রাখিয়াছে তাহার বিপক্ষে লড়িবার জন্ত নারীর সমগ্র শক্তিকে একমুখী করিতে হইবে। এই বিস্ময়কর নরসাহিত্যের বিশাল বিস্তার, অতল গভীরতা ও মুখর বৈচিত্র্যের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিয়া নারীকে আত্মস্থ হইতে হইবে; বুঝিতে হইবে নরের এই অধিকার লাভ করিতে হইলে রোষ, ক্ষোভ, অভিমান বা আবদার তাহার কোন কাজেই লাগিবে না। এই তপস্যার পথে পুরুষের সাহায্যের আশা তাহার না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ পুরুষের পিছনে যে মহাশক্তি সদাজাগ্রত, সে সাহায্যকারী নরের দ্বারাই নারীর তপস্যাভঙ্গ করাইবে, রফা করাইবে। নর যখন সত্যের তপস্যা করিয়াছে তখন বিনা দ্বিধায় বলিয়াছে—দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী। আর নারী যখন তপস্বিনী অপর্ণা হইয়াছে তখন তাহা নরকে লাভ করিবার জন্ত;—সে নরকে শিবম্ বলা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। নারীর তপস্যার অন্ত ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। শিবের তপস্যায় ও উমার তপস্যায় প্রভেদ হয়ত বা প্রকৃতিগত! সত্যের আহ্বান আসিলে নারীকে এড়াইয়া চলিবার পথে যুগে যুগে নরের তপস্যা দীর্ঘ ও ঐকান্তিক। কিন্তু নারীর কানে সত্যের কঠোর আহ্বানও পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই আসিতে বাধ্য হয়। এই সত্য বা মিথ্যারূপী প্রকৃতির উজান চলিতে হইলে নারীকে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, শাসনে, পালনে, বিলাসে, ব্যসনে, বিচিত্র মানবেতিহাস—মানবেরই ইতিহাস, ইহার বহিঃপ্রকাশে মানবী নাই বলিলেই চলে। কিন্তু এই সভ্যতার, এই বিকাশের, একটি গভীর অন্তরের দিক ছিল; নারীকে বলা হইয়াছিল, নারীও মানিয়া লইয়াছিল, সেখানে তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ;—ক্ষমায়, ধৈর্য্যে, স্নেহে, সেবায়, প্রেমে, পুণ্যে নারীর মর্য্যাদার আসন পাতা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বঞ্চনা ছিল, কিন্তু প্রবলতর বহিঃশত্রুর সহিত বিদ্রোহে নর ও নারীর মধ্যে এই রকমের একটা রফা হইয়াছিল। নর অর্জ্জন করিবে নারী রক্ষণ করিবে, নর সৃজন করিবে নারী পালন করিবে। শক্তির তারতম্যে দুজনের পথ ভিন্ন। আজ যখন নারী তাহাতে সন্তুষ্ট নহে, রফার ফাঁকি যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন তাহার দোহাই দেওয়া উভয় পক্ষের অপমানজনক। পুরুষের মুখে আজ তাহা কাপুরুষোচিত, নারীর মুখে তাহা দাসমনোভাব-ব্যঞ্জক।

বিলাসের অধিকারের কথা বাদ পড়িলে চলিবে না। নারী হাঁটু তুলিয়া বুক খুলিয়া সজ্জিত হইবার অধিকার চাহে কেন? ইহা সেই দুর্জ্জয় মহাশক্তির নূতন লীলা, নারীকে অধিকারের লোভ দেখাইয়া তাহার ললাটের লজ্জাতিলক আরও উজ্জল করিয়া তুলিবার যুগোপযোগী ফাঁদ! সমগ্র মানবাত্মার দুরদৃষ্টক্রমে নারী কি আজও আবদার করিয়া, ফাঁদ পাতিয়া অথবা ধৃষ্টতার দ্বারা অধিকার লাভ করিতে চাহিবে?—নিষ্ঠার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা নহে? মুক্তি-সাধিকা না হইয়া মুক্তিবিলাসিনী হওয়াই কি তাহার অভিপ্রেত? নারী এমন তপস্যা করুক যাহাতে তাহার বুকের গরিমা ও বুকের লজ্জা, বুকের অমৃত ও বুকের বিষ সমভাবে ধুইয়া মুছিয়া যায়, সে যেন মহাশক্তির সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহারই মত একেবারে বুক খুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। শক্তি যদি কালের বুকে ভর করিয়া কর্ম্মের ঘূর্ণি-ক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে, তবে বিশ্বের দৃষ্টি উরু-উরস্ ছাড়িয়া তাহার চতুর্হস্তেই নিবদ্ধ হইবে, তখন তাহার দিক্-অম্বরের ছাঁট কোন দর্জ্জির কাঁচির অপেক্ষা রাখিবে না।

নারী বুঝিয়াছে,—এবং ঠিকই বুঝিয়াছে—নর স্বীয় দেহশক্তির সাহায্যে বিশ্বে আপনার আধিপত্য স্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাইয়াছিল। সুতরাং কুস্তিলড়া, ছোরা খেলা নারীরও আবশ্যক। ইহাতে পূর্ণ সাহায্য পুরুষ করিবে না; বিমূঢ় নর মহাশক্তির নিষেধ-ইঙ্গিত পাইয়াছে, আপন সৃষ্টি বজায় রাখিবার জন্য মানবাত্মাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সেই মহাশক্তিই এই মন্ত্রণা দিতেছে। নরনারী তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে কিনা বলা যায় না। বহু তপস্যায়ও নর মৃণালভুজের ললিত বিলাসের মোহ ছাড়িতে পারে নাই; আর যে নারী পুরুষের সঙ্গে বিলাসাধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি করে সেও ইহা ত্যাগ করিবে না। মক্ষিরাণী, পুং-মক্ষি ও কর্ম্মী-মক্ষিকার অধিকারের মধ্যে কোন্ অধিকারের গৌরব বেশী একথা হয়ত, না উঠাই শ্রেয়ঃ ছিল কিন্তু বিদ্রোহী মানব মক্ষিকা নহে।

নারী চাহিতেছে—স্বামীর অর্জ্জিত ধনে তাহার এক ভাগ অধিকার বিধিবদ্ধ হউক। যাহাদের অর্জ্জন তাহারা যদি অনিচ্ছুক হয় তবে অর্জ্জনে-অক্ষমদের অধিকার কোথা হইতে আসে? রক্ষার ইতর বিশেষ করিয়াই কি নারীর দিন কাটিবে? পাওয়ার গৌরব কি চাওয়ার লজ্জাকে ঢাকিতে পারে?

নারী যে আজ নরসভ্যতার বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া লোভাতুরা হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। সে দেশে দেশে অকুণ্ঠ কণ্ঠে দাবী করিতেছে—নরের এতদিনকার সর্ব্ববিধ অধিকার। কিন্তু এই সব অধিকারের মধ্যে অধিকাংশই মহাশক্তির সহিত মানবাত্মার শক্তিপরীক্ষার ইতিহাসে নানাকালীন রফা মাত্র। তথাপি বিদ্রোহী নর আজিও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে-মহামায়ার ক্ষেত চষিতেছে, বিদ্রোহী নারী সেই মহামায়ার গোহালেই ছন্দোবন্ধনের মধ্যে বৎসের গাত্রলেহনপূর্ব্বক দুধের যোগান দিতেছে। দুধ দিবার অধিকার জন্মগত এবং উচ্চ অধিকার হইলেও প্রকৃত অধিকার নহে; অথচ গাই-বলদে মিলিয়া চাষ চালাইলেও চাষীর পাঁচনীর দাঁত ঘষিবার সুযোগ আসিতে পারে, কিন্তু গবাত্মার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সমস্যা কঠিন, মুক্তিকামী মানবাত্মার মুক্তির দিন আগাইয়া আসিবার সম্ভাবনা কোথায়?

মুক্তিপিপাসা মানবের সাধারণ ধর্ম্ম কেমন করিয়া ও কবে সে স্ত্রীপুরুষগত দ্বিধায় পড়িয়া গেল তাহা জানা যায় না। তাহার পর হইতে প্রেমের রফা করিয়া সে হয়ত আপনার সেই দ্বিধাই মিটাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফলে বহুধা হইয়া নানা দ্বন্দ্বের উদ্ভব করিয়াছে। আদি মানবাত্মা দ্বন্দ্বাতীত সুতরাং আজিকার যৌনকলহ তাহাকে পীড়িত করে সন্দেহ নাই। যে অন্তরে সেই মানবাত্মা সম্পূর্ণ ঘুমাইয়া পড়ে নাই সেখানে এই দ্বন্দ্বও প্রেম বেদনারই তরঙ্গ তুলে।

নর আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বিচিত্র মানব-সভ্যতার ধারায় তাহার মুক্তির সাধনা বিচিত্রতর। মহাশক্তির নির্ম্মম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার আশায় সে যুগে যুগে রাজ্য, ভোগ, বিলাস ত্যাগ করিবার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে। নারীকে মহাশক্তির বন্ধনের সহায়স্বরূপা মনে করিয়াই সে দারাত্যাগ করিয়াছে। আদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠায়, মুক্তি-সন্ধানের অতিব্যাকুলতায় সে সেবাধর্ম্মী নারীকে কটুকথা বলিয়াছে—অকৃতজ্ঞতার পাপ অর্জ্জন করিয়াছে। পিতৃত্বে বঞ্চিত হইবার আত্মনাশী সুকঠোর সাধনা করিয়া সে মুক্তির

বাণী প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। জ্ঞানের জটিল সুড়ঙ্গপথে নরদেহী বিদ্রোহী মানবাত্মা মহাশক্তির দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সোহং পতাকা উড়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু নারী ত সম্যক্ জাগে নাই। সে সৃষ্টির আদি হইতে নিজেকে বাঁধিয়াছে, নর-কে বাঁধিয়াছে। নারীর অন্তরের বন্ধনপ্রিয়তাই বুঝি বাহিরে আসিয়া চিরদিন হারবন্ধনে তাহার কণ্ঠ বাঁধে, বলয়বন্ধনে মণিবন্ধ বাঁধে, অনন্ত বন্ধনে বাহু বাঁধে, আর যুগে যুগে নব নব কবরী-বন্ধনে তাহার শির বাঁধা পড়ে। তাহার প্রার্থিত মুক্তি আজিও বিলাসের প্রতিধ্বনির মত শুনায়, তাহার জাগরণ হয়ত বা ঘুমের ভিতর ভোগের স্বপ্নান্তর! মানব-সভ্যতার ইতিহাস মহাশক্তির সহিত মানবের শক্তিপরীক্ষার ইতিহাস, অসংখ্য প্রতিরোধ ও বন্ধনের মধ্যে মানবাত্মাকে জয়ী করিবার, মুক্ত করিবার ইতিহাস। নারী স্বয়ং বন্ধন-বিলাসী বলিয়াই কি এই বিদ্রোহের ইতিহাসে তাহার দান নগণ্য!

নারী যদি সত্যই জাগে তবে উভয়ের যোগে মানবাত্মার জয়ের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু জননী না ঘুমাইলে, নারীর সকল অক্ষমতার মূল মাতৃত্ব অস্বীকার না করিলে, নারী ত তাহার ঈপ্সিত মানবত্বের মুক্তিজাগরণে জাগিয়া উঠিতে পারে না। সঙ্কটের কথা এই, নারী যদি এ ক্ষেত্রে মহাশক্তির মহাদাসীত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে, জননী যদি ঘুমাইয়া পড়ে, নরসৃষ্টি লোপ পাইবে। তখন মানবত্বের জয় হইলেও তাহার ফল ভোগ করিবে কে? সেই জয়ের মধ্যেই যে পূর্ণ পরাজয় বিদ্রূপ করিয়া উঠিবে। মানব-শক্তি যদি ছিন্নমস্তা হয়, তবে মহাশক্তির সে দিনের রূপ হইবে—লোলস্তনী ক্ষুধাতুরা বিশ্বগ্রাসোদ্যতা ধূমাবতী! মানব সভ্যতার সে অঙ্কের দৃশ্য বড় ভয়াবহ হইবে সন্দেহ নাই।

তথাপি সাধ হয় নরনারীর বিভেদ ঘুচিয়া মানবাত্মা মুক্ত হউক, জয়যুক্ত হউক। নিমেষের জন্য মানব মানবী পূর্ণ জয় লাভ করিয়া না হয় আপনার মুক্তিপ্রয়াসে আপনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মহামায়ার সৃষ্টিরক্ষার প্রয়োজনে সেই যুগযুগান্তরের অবাঞ্ছিত রফাবন্ধনের হাত হইতে নরনারী মুক্তি পাইবে—মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সর্ব্ব লজ্জা দূর হইবে।

অন্যথা চলিতে থাকুক্—বিদ্রোহ নহে—কলহ, সন্ধি নহে—রফা, প্রেম হইতে প্রেমান্তর, ভক্তিবিলাস হইতে মুক্তিবিলাস, নিদারুণ রোমবিদারক অজাযুদ্ধ। চলিতে থাকুক্ মহামায়ার বিজয় পতাকার ছায়াতলে পড়িয়া নিরুপায়-বিদ্রোহী মানবাত্মার ঘন ঘন ধনুষ্টঙ্কার! চলুক্ স্বর্গের আবডালে মর্ত্ত্যের Dominion status পাকা করিবার শূদ্রোচিত সেবা ও বৈশ্যোচিত অধ্যবসায়!

পুস্তক-পরিচয়

ঝারি—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, ১৩৩৭।

পাঁচটী ছোট কবিতা ও গান একত্র ক'রে এই পুস্তিকাটী গ্রথিত হ'য়েছে। লেখা পড়ে মনে হয় লেখক অত্যন্ত তরুণ, ছন্দ-বিষয়ে হাত তাঁর এখনও বড়ই কাঁচা। 'তলে'র সঙ্গে 'মেলে', 'আলো'র সঙ্গে 'চলো', 'মাথার' সঙ্গে 'দেখা'র মিল স্কুলের ছেলের পক্ষে অসঙ্গত না হ'লেও লেখক-নামাভিলাষীর পক্ষে এ অপরাধ নিতান্তই লজ্জাজনক। শুধু ভাষা নয় ভাবের দিক দিয়েও তিনি জড়তা মোটেই পরিহার ক'তে পারেন নি—এক এক জায়গায় এই ধোঁয়া নিতান্ত আবোল্ তাবোলের মত শোনায়। যেমন—

> ক্ষিপ্রপায় চরণ যায়
> দুলিয়ে যায় মলয় বায়
> ঘাসের ফুল দোদুল্ দুল্!

আরও কিছুদিন নির্জ্জনে সাধনা ক'রে হাত একটু পাকিয়ে নিয়ে তবে লেখা ছাপালেই লেখক ভাল ক'র্‌তেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

মিলন-মঞ্চ—শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ-বি-এল্, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক কতকগুলি গল্পকে নাট্যাকারে গ্রথিত ক'রে এই বই তৈরী হ'য়েছে। সকল গল্পেরই মূল সুরটুকু হ'চ্ছে এই যে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে নিখিল নরনারীর চিত্ত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা ক'র্‌ছে—idea টা ভালই, কিন্তু এর উৎকর্ষ নির্ভর করে লেখকের শক্তির উপর, যার অভাব বইটীতে পদে পদেই অনুভব করা যায়। লেখক কথানাট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করেন এই আমাদের ইচ্ছা। যতদিন তা না ক'র্‌ছেন ততদিন এই সব ছাই-পাঁশ লিখে সাহিত্যে চর্ম্মরোগের সৃষ্টি না করাই যুক্তি-সঙ্গত। গদ্য-পদ্য উভয় দিকেই লেখক হাত চালান। গদ্য তবু চলনসই কিন্তু পদ্যের একটু নমুনা দেওয়া আবশ্যক—

> এক ফাগুনে মাগো আমার দিয়েছিলে বিয়ে
> আর এক ফাগুনে আজ্ কে যে মা এলো ফিরে ধেয়ে।

ভারত-ধারা—(নাটক) প্রথম খণ্ড—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, দাম এক টাকা।

ভূমিকায় গ্রন্থকার ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের একটা মোটা মুটি ইতিহাস দিয়েছেন এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে নাটকের বীজ বিন্দু পতাকা এসবের লক্ষণই বা কী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের প্রকৃতিগত পার্থক্যই বা কোথায় সে সব বিষয়ে আলোচনা ক'রেছেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য-স্বরূপ তিনি ব'লেছেন যে ভারতের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যে বিশিষ্ট ভাবধারা অন্তরে অন্তরে ক্রমোন্নতির প্রেরণা দিয়েছে, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্তকার ভারতীয় চরিত্রে কী ভাবে সেই ধারা প্রতিফলিত হ'য়েছে তাই দেখান' হ'চ্ছে এই নাটকের প্রধান লক্ষ্য। কাজেই প্রথম হ'তেই বোঝা যায় লেখকের উদ্দেশ্য নিছক্ artistic নয়, বরং art এখানে সহকারী মাত্র—এই জন্যই সৃষ্টিপ্রকরণ হ'তে আরম্ভ ক'রে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমস্ত কিছু থেকেই তিনি আখ্যানভাগ গ্রহণ ক'রেছেন এবং কী ভাবে তাদের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আত্মিক-জীবন ক্রম-বিকাশের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে তাই দেখিয়ে গেছেন, তাঁর নিজের কথায় aerial navigation ক'রেছেন। এই জন্যে বইখানি চেহারায় নাটক হ'লেও প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম বাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা Platoর Dialogue ধরণের বই থেকে বড় বেশী বিভিন্ন হয় নি। গ্রন্থকার অভিনয়ের কথা বলেছেন ব'লেই নাট্যকলার দিক দিয়ে এর আলোচনা করা হ'চ্ছে। সেদিক দিয়ে লেখক কৃতকার্য্য হন্‌নি বলাই সঙ্গত, কারণ বইটীতে unity র অত্যন্ত অভাব। ক্লাসিকাল সাহিত্যের ত্রি-বিধ ঐক্যের কথা ছেড়েই দিলাম, বস্তু এবং চরিত্রের ঐক্য ত মানতেই হবে তা না হ'লে নাটক হয় কী ক'রে? কিন্তু এটা যেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক dramatic synopsis……তদ্ভিন্ন রচনাপ্রণালীও বড় বেশী didactic. যেমন—

> 'তপোময় ও জ্ঞেয়ময় এই শরীর—রজোগুণী বিগ্রহ। বিবিধ লোকসৃষ্টির জন্য আমি সন্ অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্যা করি"—১ম অঙ্ক, ১ দৃশ্য।

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এই খণ্ডের আধুনিক ভারত হচ্ছে লেখকের আলোচ্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ ধারা আধুনিক জীবনকেও কী ভাবে অনুরঞ্জিত ক'রেছে তাই লেখক দেখাতে চাইছেন একটা কল্পিত গল্পের মধ্য দিয়ে; প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয়ের এইটুকু সম্বন্ধ এবং পার্থক্যও এইখানে। এই খণ্ডের নাটকোচিত আলোচনা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটকের যা প্রাণ, বহির্ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অন্তর্বৃত্তির ক্রমিক উত্থানপতন, তা এই নাটকে কোথাও নেই—গল্পটা নেহাৎ গল্পই র'য়েছে, কাজেই এতে সত্যকার চরিত্র নেই, কারণ চরিত্রের যা মেরুদণ্ড individual trait তা লেখক বরাবর অস্বীকার ক'রে চ'লেছেন। প্রথম খণ্ডের রচনায় আড়ষ্টতা থাকলেও একটা terseness (বাঁধুনি) ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষাটা অত্যন্ত আল্গা! প্রথম খণ্ড থেকে দ্বিতীয় খণ্ডে এলে হঠাৎ যেন ভাবগত anti-climaxএ এসে পড়তে হয়। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত, যেমন Goetheএর Faust এ হয়েছে!

এই প্রসঙ্গে বই দু'খানির গান সম্বন্ধেও একটী কথা বলা উচিত। দু' একটী পরিচিত গান ছাড়া অধিকাংশই একান্ত অসার ও অপাঠ্য মনে হয়। যেমন—

"রূপের আভায় পাষাণ জাগায় মিলিয়ে ছুয়ে জড়িয়ে রাখায়
ঠাণ্ডা বায় জমাট্ বাঁধায় চাঁদের আলোয় ভেতর কাঁপায়!"

ভাগবত-ধর্ম্ম—(দ্বিতীয় ভাগ) শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ; ভাগবত রত্ন -মূল্য এক টাকা।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু যখন কৃষ্ণ চরিত্রের মানুষী দিক নিয়ে ব্যাখ্যা করেন, তখন দেশে দুটো দলের মধ্যে একটা মস্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—একদল 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' এর অন্যথা না হয় তাই নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগলেন, আর একদল ব'লতে লাগলেন কৃষ্ণ ideal man, তার বেশী এক চুলও তিনি নন্—বস্তুত বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য এই দলই ভুল করলেন। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণের ভগবানত্ব উড়িয়েও দেন নি, প্রতিপাদনও করেন নি, কেবল সাধারণ মনুষ্যের বিশ্বাসপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর কৃত-কর্ম্মে ideality কতটুকু তারই প্রতিপাদন করে গেছেন...তারপর অনেক দিন গেছে এখন গোঁড়ামি বোম্বেটেমি দুইই দেশে অনেকটা কমে এসেছে, কাজেই আজ ঠাণ্ডা মাথায় কুলদা বাবুর ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে কোন বাধা নেই...ভাগবত ব্যাখ্যা ব'লতে তাঁর খ্যাতি আছে, কাজেই একাজ তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগীই হ'য়েছে। রস যখন স্বরূপে রূপান্তরিত হয় তখনই তা হয় ভাব-এই ভাবই হচ্ছে বৈষ্ণবীয় সাধন-তত্ত্বের আসল জিনিস; ভাগবৎ আবার এই ভাবসাধনের প্রধানতম দ্যোতক—কাজেই বৈষ্ণবীয় প্রেম ধর্ম্মের সত্যকার spiritটী বুঝতে হ'লে ভাগবত বোঝা দরকার! এই বিষয়ে বর্ত্তমান বইটী বিশেষ সহায়তা ক'রবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস!

রূপ-তৃষ্ণা—(উপন্যাস) শ্রীক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রবীণ ঔপন্যাসিক মুখবন্ধে লিখিতেছেন—"সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যের হানিকর অর্থাৎ দুর্নীতি মূলক যে সকল উপন্যাস আজকাল বাজারে প্রচলিত, তদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া এই উপন্যাসখানি প্রচার (প্রকাশ?) করিলাম। ... ... যদি আমার এই উপন্যাসখানি দ্বারা এ জগতের এক জনেরও চরিত্র সংশোধিত বা গঠিত হয়, আমার সমস্ত পরিশ্রম সুখের ও সার্থক মনে করিব।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ এবং এই মহদুদ্দেশ্যের প্রচারকল্পে লেখনীর যে সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার আছে। উপন্যাসের যে আদর্শ আমরা (দুর্ভাগ্যক্রমে কি সৌভাগ্যক্রমে বলিতে চাহি না) পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি—গ্রন্থকার সেই বঙ্কিমীয় আদর্শে বিশ্বাসসম্পন্ন; সে বিশ্বাসের উপযোগী কল্পনার প্রমাণ তাঁহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। "কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম" কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার (পৃষ্ঠা ৩, ২৮, ৩২ ইত্যাদি) দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থকারের ভাষাসম্পর্কে অধিকতর অবধান হওয়া উচিত ছিল। ইংরাজীতে যাহাকে বলে situation create করা—লেখকের সে বিষয়ে পটুতা আছে।—বর্ত্তমান পুস্তকখানির ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হইবার যোগ্যতা আছে।

ব্যর্থ জাগরণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জগৎ জাগিছে ধীরে, হের ঐ পূর্ব্বতোরে খুলিছে তোরণ
আনন্দ-উচ্ছল বিশ্ব কি নিঃশব্দে করে সুরু কর্ম্ম-আয়োজন
মন্দ মন্দ বহে বায়ু, বিহঙ্গম গাহে গান, গন্ধ দেয় কেয়া—
চলো ঐ নদীতীরে—বসিয়া দেখিব দোঁহে দিবসের খেয়া।

রাখো তব তুচ্ছ তর্ক—নারীরাজ্য জাগরণ—থাক সে বারতা,
সত্য জাগরণ হ'লে মুখে মুখে রটিত না উচ্চ স্বপ্নকথা!
পূর্ণ চৈতন্যের চিহ্ন, জীবের কল্যাণ যাহা, নহে তাহা মোহ,—
সে যে সৃজনের বাণী, সে নয় স্রষ্টার বক্ষে বিলাস-বিদ্রোহ!

চাহে সে কিসের মুক্তি—দেহের না অন্তরের অথবা আত্মার?
লক্ষ বর্ষ হ'ল গত, কোথা পরিচয় তার কোন্ সাধনার!
জীবের কল্যাণ তরে শিবের তপস্যা জানি, সর্ব্বত্যাগী সে যে গো বৈরাগী,
উমার তপস্যা শুধু সেই মুক্ত তপস্বীরই সুখসঙ্গ লাগি'!

বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্যরে জীব-মুক্তি-সাধনায় চিনিয়াছে লোকে,
শঙ্করের ব্রহ্মচর্য্য—অর্থ তার বুঝা যায় রাত্রির আলোকে;
মানবের তপস্যার দানব পেয়েছে ভয়, স্বর্গ কম্পমান,
নহে তাহা মানবীর ক্ষুব্ধ মুক্তিদ্বন্দ্ব শুধু—মিথ্যা অভিমান।

নারীর পঙ্গুত্ব কভু মানবের সৃষ্টি নহে, বিধাতারই দান,
দেহে মনে ধর্ম্মে কর্ম্মে নেপথ্যেরই মূর্ত্তি সে যে, বিজ্ঞান প্রমাণ!
সমুজ্জ্বল চন্দ্রকান্তি যতই সুন্দর হোক্—সূর্য্যেরই সে আলো,
বিস্মিত শ্রদ্ধায় হেরি মানব-সবিতা-মূর্ত্তি, চন্দ্রে বাসি ভালো!

মানি মানবীর সাধ, জানি তবু মনে মনে, সে নহে সাধনা,
মানবে যা সত্যবেদ, মানবীর মাত্র তাহা মনের বেদনা;
মৃত্তিকা সফলা সত্য, পূর্ণ তাহা ফলে ফুলে, স্থান তবু নীচে,
বিরাট আকাশ ঊর্দ্ধে বৃষ্টি বায়ু দীপ্তি বহি' নিঃশব্দে কাঁপিছে!

থাক্ মিথ্যা দ্বন্দ্ব, চলো—না হয় বসিগে ঐ মন্দির-পাষাণে,
পুরুষ প্রকৃতি নিয়ে সৃজন-বাসর-রাত্রি যাপেন যেখানে;
হের স্বচ্ছ সরোবরে অজস্র উন্মুখ ব্যগ্র লীলার কমল,
প্রেমে অবনত সূর্য্য সহস্র কিরণ স্পর্শে মেলে তার দল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

সাহিত্যের উপাদান লইয়া আমাদের আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি সংখ্যায় চলিয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় **সাহিত্যের আদর্শ** লইয়া আলোচনা করা যাক্।

সাহিত্যের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ কথার আলোচনা পূর্ব্বেও হইয়াছে—এখনও চলিতে পারে—কারণ প্রশ্নটা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আরো প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

সাহিত্যের আদর্শ কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি—Art for Art's sake?—না বাস্তব জীবন?—সমস্ত সংসার ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্য আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি বিকশিত হইয়া মানুষের আনন্দবিধান করিবে, না প্রতিদিনকার জীবন-যাপনের মধ্যে মানুষ যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত—আহার বিহার, সুখদুঃখ, হাসিকান্না, নৈমিত্তিক জীবনের প্রতি স্তরে প্রচুরতর ও অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রতিদিন যে নিত্য নূতন আশা-আকাঙ্খা অনুভূত হইতেছে, তাহাকেই আদর্শ করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হইবে?—অর্থাৎ মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি ও শিক্ষাকে আদর্শ করিয়া এবং সেই আদর্শ অনুসারে তাহারই প্রকৃষ্ট পথ দেখাইবার উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি হইবে, না অবিমিশ্র আনন্দ-সৃষ্টিই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিবে?

প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনে যে গভীর সমস্যা, যে অভাব ও বেদনা নানাভাবে প্রকাশ হইতে দেখিতেছি—তাহাকে এড়াইয়া সাহিত্যরচনা চলিতে পারে না বলিয়া যাঁহারা দৃঢ় মত প্রকাশ করেন—তাঁহাদের প্রতিপক্ষ দল বলেন—সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে কোনও উদ্দেশ্য থাকিবে না,—বিধিবদ্ধ নীতি বা বাহিরের গণ্ডী সাহিত্যের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না—অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টিতে কোনও "Four-square scheme" চলিবে না।—সাহিত্য আনন্দ দিবে—এ আনন্দ ফুলের আনন্দ, গন্ধ, মধু বিতরণ করে—আনন্দ পাই, কিন্তু বিকাশের বাসনা থাকিলেও—আনন্দ-বিধানের উদ্দেশ্য ইহাতে নাই।

সাহিত্য লোক-শিক্ষক হইলে সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা ব্যাহত হইবে—। যে সাহিত্য 'স্কুল-মাষ্টারী' করে তাহা প্রকৃত সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ মাষ্টারী করাটা হইতেছে অধিগত বিদ্যার চর্চ্চা—বা অধিকার-চর্চ্চা! যে মাষ্টারী করে সে শিখা বুলি অপরকে শিখায়—প্রকৃত সাহিত্য-সাধনা হইতেছে—আত্মসাধনা। বাহিরের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মনোরাজ্যের খবর লওয়ার মধ্যে—আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে লাভ করিবার যে সাধনা তাহাই হইতেছে সৃষ্টির সাধনা। যাহা সমস্যা তাহা বর্ত্তমানেই আছে—ভবিষ্যতে তাহা কী রূপ লইয়া দেখা দিবে তাহার কতকটা আভাস দ্রষ্টার কাছে ধরা দেয় কিন্তু ভবিষ্যতের জমাখরচের খাতায় তাহার কোনও হিসাব লেখা থাকে না। কাজেই সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যটাই হইতেছে যুগধর্ম্মের; বর্ত্তমানে তাহার রূপ-সৃষ্টির কোনও সন্ধান তাহাতে পাওয়া যায় না। যিনি প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তিনি তাহার নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা নূতন নূতন রূপের সন্ধান দিবেন। স্কুলমাষ্টারীর বাঁধাধরা পথে লেখাপড়ার চর্চ্চা চলিতে পারে, সাহিত্যসৃষ্টি চলে না।

প্রতিপক্ষ উত্তোর গাহিবেন—এ যুগে Art or Art's sake—এ কথা অচল।—কারণ Expression of lifeই হইতেছে Art—জীবনটা যে কি, তাহা লইয়া যখন বর্ত্তমানে বহু মতান্তর রহিয়াছে তখন ও কথা একেবারে অচল। তবুও Artকে জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিলে প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ, গ্লানি, অন্যায় অত্যাচার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিতেছে—বা জীবন-যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ শক্তি মানুষকে যে সাধারণ স্তর হইতে উঁচু

করিয়া দেখাইতেছে তাহার নিখুঁত চিত্র ফুটাইবার জন্যই ইবসেন, বার্ণাড শ' প্রভৃতি তাঁহাদের সমস্ত আর্টিষ্টিক্ শক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

—

আর্টবাদী বলিলেন—জীবন-যুদ্ধ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সভ্যতা সম্পর্কে—পৃথক। রাশিয়ার সমস্যা ভারতবর্ষের নহে—আবার মুসলমানের সমস্যা হিন্দুর নহে—নমশূদ্রের সমস্যা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নহে—কাজেই সাহিত্য কোনও জাতি কোনও দেশ কোনও কাল বা সমাজকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলে তাহা তৎতৎ বিশিষ্ট ছাপ লইয়া প্রকাশ পায়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ট্রেড্-মার্কের মূল্য আছে—তাহার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু সাহিত্যের চাপরাশ বা 'তখমা' অনায়াসে পরিচিত হইয়া উঠিলেও সহজে আত্মীয় হইয়া উঠে না

বস্তুতান্ত্রিক বলেন, রবীন্দ্র সাহিত্যে জন-সাধারণের নৈমিত্তিক জীবনের অর্থাৎ দুঃখদুর্দশার 'ছাপ' নাই অতএব এইরূপ অসম্ভব সাহিত্যের মূল্য নাই—ভাব-বিলাসী সাহিত্যের সঙ্গে প্রকৃত প্রাণের যোগ থাকিতে পারে না।

কিন্তু শুধু কথার প্যাঁচ খেলিয়া লাভ নাই। আসল দিকটা এড়াইয়া যাওয়া চলে না। চাষার গান, ভাটীয়াল ও সারী গানে লোক-সাধারণের প্রাণের ছাপ আছে; অন্নদা মঙ্গল—পাঁচালী গানে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া সাহিত্যের উচ্চ স্তরে তাহার স্থান হইতে পারে না। —ইহাকে সাহিত্য-সৃষ্টিও বলিতে পারি না। দরিদ্রের প্রতি বা জন-সাধারণের প্রতি সহানুভূতি থাকা প্রশংসনীয়, তাহাদের জীবন-সমস্যার গভীর প্রশ্ন সাহিত্যে স্থান পাইলে অস্বস্তি বোধ করিবারও কোনও হেতু নাই। কিন্তু তাহা কখনও সাহিত্যের আদর্শ হইতে পারে না।

মানুষের সুখ-দুঃখের অতীত এক পরম পদার্থের অনুভূতিতে তন্ময় হইয়া কবি যে আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারেন—সে কথা ভুলিয়া আমরা লোক-সাহিত্যকে বড় করিতে চাহিয়াছি।

নিখিল ধরণীর পরিপূর্ণ মূর্ত্তির পরিকল্পনাতেই শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব, রূপের সমগ্রতাতেই শিল্পের প্রাণ, সৃষ্টির সার্থকতা সেই রূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠায়;—সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একথা সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত। ধনীর সুখ-ঐশ্বর্য্য বা দরিদ্রের দৈন্য দুর্দ্দশা ইহার কোনটাই মানুষের পরিপূর্ণ রূপ নহে—সমষ্টিকে পূর্ণতা দানের দিক দিয়া ব্যষ্টির যেটুকু সার্থকতা তাহা ছাড়া ইহার স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোনও মূল্য নাই। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের একদিকের অবস্থাসৃষ্টির সৌন্দর্য্য বিধান করিতে পারে না। কারণ পরিপূর্ণতাই সৃষ্টির রূপ। উদ্দেশ্য হইতে নিরুদ্দেশে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে, অনুভূত হইতে অননুভূতে, বস্তু হইতে রসের দিকে কবি-মনের ব্যাকুল অভিযানই কবির কাব্য-সৃষ্টির সত্যকার প্রেরণা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও অব্যাহত আনন্দসৃষ্টিই সাহিত্যের আদর্শ।

মানুষের ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায় খেয়া অনন্তকাল ধরিয়া পারাপার করিবে—সোণার তরী ইন্দ্র-ধনুর পাল তুলিয়া কল্পলোকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে। কখনও কৌতুকময়ী লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কনিক্কণে কবির আবেশ-বিহ্বল চক্ষে সোণার স্বপ্ন ভাসিয়া উঠিবে। কাব্যের অনবদ্য সৃষ্টি সেখানে সার্থক, রূপ-সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য্য সেখানে নয়নাভিরাম, রসের অফুরন্ত মাধুর্য্যে সৃষ্টির আনন্দ সেখানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সংবাদ

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা

মুখ্যতঃ দেশের নারীজাতির সুশিক্ষাবিধান করাই এ আশ্রমের উদ্দেশ্য। বালকগণ তাহাদের বিদ্যালয়ে গিয়া যে শিক্ষা পায়, বালিকাগণ বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়া প্রায় সেই শিক্ষাই পায়, ফলে পৃথিবীতে অধিকার লইয়া উভয় জাতির দ্বন্দ্ব অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দেশে এই দ্বন্দ্বের ফলে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের দেশে এরূপ সংঘর্ষ এখনও পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া উঠে নাই, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে যে দেখা দিয়াছে একথা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। তাই নারীকে নারীজনোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে মাতাজী এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করেন। মাতাজী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী ১৩০১ সালে বারাকপুরে এই আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় আশ্রম ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ আশ্রমের পুষ্টিসাধন হইলে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রলাভের আশায় ১৩১৮ সালের ১৪ই শ্রাবণ আশ্রম উত্তর কলিকাতার একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল। মাতাজীর নিঃস্বার্থ ঐকান্তিকতার ফলে আশ্রম দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত পরপর কয়েকটী গৃহপরিবর্ত্তন করিয়া অবশেষে ১৩৩১ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে আশ্রম বর্ত্তমান নবনির্ম্মিত ত্রিতল গৃহে স্থায়ীভাবে উঠিয়া আসিল।
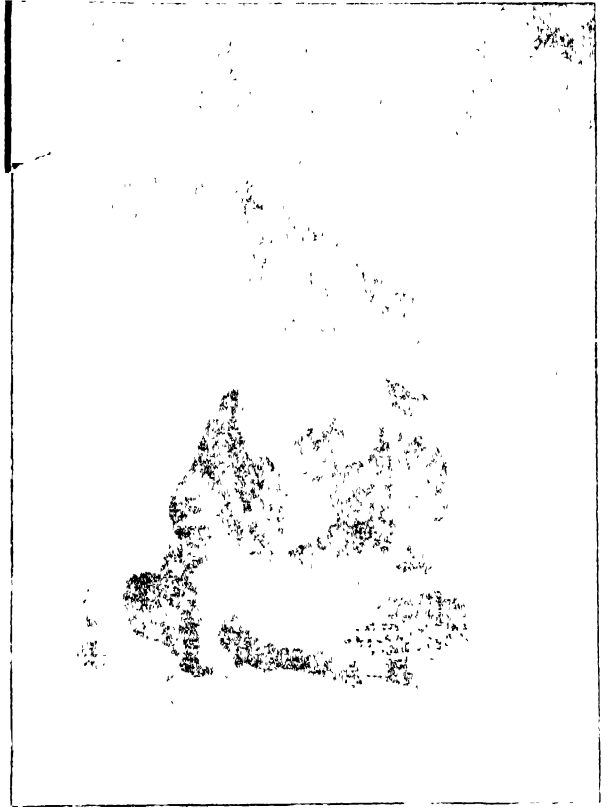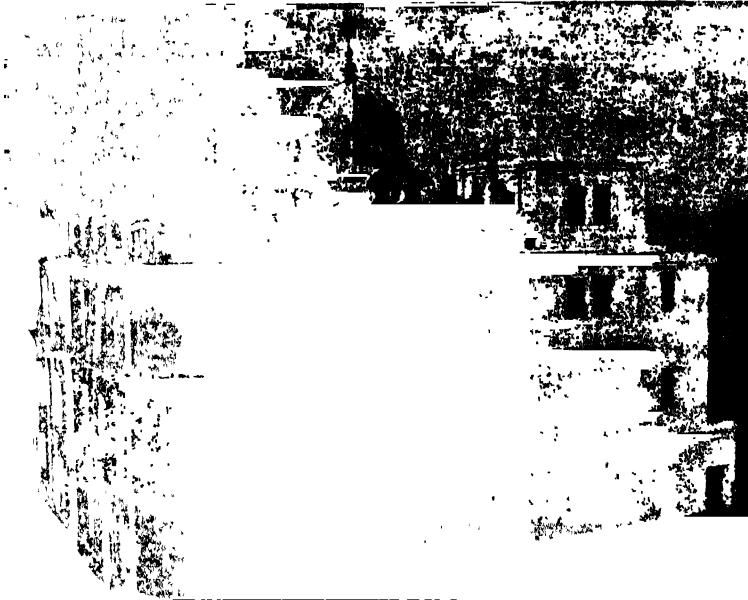
আশ্রম-গৃহ

বর্ত্তমান বর্ষে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ৪৫ জন। তন্মধ্যে ১৯ জন ব্রাহ্মণ, ৫ জন বৈদ্য এবং ২১ জন কায়স্থ। ২৪ জনের ব্যয় অভিভাবক বহন করেন এবং অবশিষ্ট সকলের ব্যয় আশ্রম হইতে অর্থাৎ সাধারণের

শিল্প-বিভাগ

দানে নির্ব্বাহ হয়। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকটী নিতান্ত অল্পবয়স্কা বালিকাও আশ্রমে আছে। আশ্রমসংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ২০০ জন। আশ্রম হইতে একজন মহিলা বি-এ পরীক্ষায় এবং চারিজন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা এই আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

প্রয়োজন হইলে যাহাতে মহিলাগণ শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন তাহার বন্দোবস্তও আশ্রমে আছে এই উদ্দেশ্যে আশ্রমে তাঁত, চরকা এবং সেলাই-এর কল আছে। বালিকারা চরকায় সূতা কাটেন, তাঁতে কাপড়, তোয়ালে, চাদর, গামছা এবং জামার ছিট প্রভৃতি বুনিয়া থাকেন এবং সেলাই ও ছাঁট কাট শিক্ষা করেন। আশ্রমকুমারীগণকে তাঁহাদের জামা সামিজ প্রভৃতি স্বহস্তে তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। ইহা ব্যতীত মখমল, কার্পেট, পাপোষ, চটের আসন, সূক্ষ্ম সূচীশিল্প এবং উল ও পুঁতির কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। বাহিরের অন্য প্রতিষ্ঠানের মহিলাকর্ম্মী এবং গৃহস্থ ঘরের মহিলারাও আশ্রমে আসিয়া শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন।

দানশীলা স্বর্গীয়া হরিমতী দত্ত

উপরে যে দানশীলা মহিলার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, নীচে তাঁহার সংখ্যাহীন দানের কয়েকটির উল্লেখ করা হইল।

বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে·········১০০০০৲
　　"　　"　অট্টালিকানির্ম্মাণ কল্পে···২৫০০০৲
বারাণসীর রামকৃষ্ণ মিশন হোমে—
　মৃত স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থ একটী—
　ওয়ার্ডের জন্য　　　　১০০০০৲

মৃতস্বামীর নামে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে দুইটি Bed এর জন্য টাকা দিয়াছেন এবং matornity বিভাগেও অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে দান, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় সাহায্য, পাঁচ সাত শত টাকা দান বহুবার বহু রকমে করিয়াছেন। তিনি কয়েকজন বিধবা ছাত্রী ও দুঃস্থ লোকের নিয়মিত মাসিক সাহায্য করিতেন। হিন্দু বিধবাদের দুর্দ্দশামোচনকল্পে তিনি বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু বিধবার আদর্শজীবন যাপন করিয়া গত ১৩৩৮ সালের ১৪ই জৈষ্ঠ এই মহীয়সী মহিলা দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ডাঃ বীরেশ্বর মিত্র, এফ্, আর, সি, এস্ মহাশয় তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা। তাঁহার সংসারে স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ—সকলেই বিশেষ কৃতী। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, এটর্ণি—জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণও ইটালি অঞ্চলে সম্ভ্রান্তবংশের গৌরবে সকলের নিকট পরিচিত। ৩৬।বি বেনিয়াপুকুর রোড "দানসমন্দির" এই প্রাতঃস্মরণীয় রমণীর শ্বশুরালয়।

সমর্পণ

শ্রীবাণী রায়

আমার ফুলে আঁচল ভরি,
　লও গো তুমি লও,
হে মোর প্রিয়া, মৌন কেন ?
　একটি কথা কও।
চাহিতে তুমি জাননা কিছু,
চাহিয়া থাক নয়ন নীচু,
তাইতে হিয়া সাধিছে পিছু
　মানিতে পরাজয়।
ভীরু! তোমায় চাই যে দিতে
　লইতে কেন ভয় ?

যে মালা আজ কণ্ঠে তোমার
　পরায়ে দের সখি,
দেখতো চেয়ে এ মালা তুমি
　চিনিতে পার নাকি ?

সেদিন মধুমালতীতলে,—
এ মালা তুমি আমার গলে,
পরালে, বালা কিসের ছলে
　বলিতে পার না কি ?
কেমনে ভুলি পাগল-করা
　কাজল-কালো আঁখি!

রিক্ত আমি ছিলাম বসে আসিলে তুমি হেসে,
ছিন্ন বাসে আবরি তনু লুকায়ে মণি কেশে ;
আজিকে আমি জানি গো জানি
—কি দিয়ে তুমি সাজাবে রাণী,
ফুটিবে মুখে তোমার বাণী
　তোমার দেওয়া দানে।
গরব মোর হৃদয়-চোর তোমারি অভিমানে,
রাজার রাজা। করিলে মোরে বসায়ে প্রেমাসনে

ইণ্ডিয়ান ইন্সুরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট-এর সম্পাদক মিঃ এস, সি, রায় উপাসনার সমালোচনার্থ আয় ব্যয়ের হিসাব সহ একখানি সম্বাৎসরিক বিবরণী পাঠাইয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আলোচ্য বিবরণী পাঠে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি—। গত বৎসর প্রারম্ভিক সভা ছাড়া ৯টি সভা আহুত হইয়াছিল। অ্যাল্‌বার্ট হলে ৩টি সাধারণ সভার আয়োজনও কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় মিঃ জে, এন, বসু, এম, এল, সি, ও আচার্য্য পি, সি, রায় এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

১২০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ যে ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার কতখানি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য দেশে এই প্রকার ভোজের বিশেষ প্রচলন আছে। ইহাতে প্রত্যেকের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় ইহাও ঠিক কিন্তু প্রারম্ভেই এই প্রকার ব্যয়-বহুল আয়োজন না করিলেই ভাল হইত মনে হয়।

স্বদেশী প্রচার (Swadeshi Propaganda) বিভাগে চাঁদা উঠিয়াছে ১০০৫৲—আলোচ্য বর্ষে খরচ হইয়াছে ৮২৭৲১০—এই বিভাগের কার্য্যাবলীসম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে সাধারণকে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইত না।

প্রথম বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রবীণ সহ সভাপতি মিঃ, এ, সি, সেন অনুপস্থিত থাকায় অন্যতম সহ সভাপতি, মিঃ এস, এন ব্যানার্জ্জি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তাপের আধিক্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির উৎকর্ষসাধনের জন্য যে ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্থাপিত হইয়াছে—বাহিরের আক্রমণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি তাহার ভিতরের সংঘশক্তিকে শিথিল করিয়া দেয় তাহা হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইবে। বাহিরের দ্বন্দ্ব ও কলহের কোনও অনিবার্য্য কারণ আছে কিনা এবং—কে বা কাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অবকাশ দিল সে আলোচনারও কোনও প্রয়োজন আপাততঃ দেখি না। কিন্তু আদর্শের মর্য্যাদা রাখিতে গেলে অনেক কিছু ত্যাগ করিতে হয়—তাহাতে মানুষ হিসাবে গৌরব বাড়ে বই কমে না—অথচ সেই সঙ্গে একটি নব-সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দৃঢ় হয়, ভেদ-নীতি ও বিপক্ষতার মূলেও কুঠারাঘাত পড়ে।

সভাপতি যখন বলিয়াছেন—ইন্‌ষ্টিটিউটের "Citadel is built on the foundation of good-will and love for one's indigenous enterprises."—তখন ত্যাগের প্রস্তাব যে একেবারে অবান্তর তাহা আমরা মনে করি না।

কিন্তু ইহাঁদের আদর্শের সঙ্গে সম্প্রতি গঠিত ইন্সিওরেন্স এসোসিয়সনের আদর্শের ত দেখিতেছি মহা গণ্ডগোল বাধিল।—মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিতেছেন, Insurance is a great profession"—ওদিকে মিঃ পি, সি, রায় বলিতেছেন ইহা 'Social service'—মিঃ পি, সি, রায় মহাশয়ের জীবনবীমা সম্বন্ধে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যদি প্রত্যেক বীমা-বিষয়ক পত্রিকায় বিশদভাবে আলোচিত হয় তাহা হইলে অন্ততঃ শিক্ষাভিলাষীগণের যে ইহাতে সবিশেষ উপকার হয় একথা নিশ্চয়।

ইন্‌ষ্টিটিউটের কাউন্সিল নিম্নলিখিত কার্য্যকারকগণকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—সভাপতি—

মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহ-সভাপতি—মেসার্স এ, সি, সেন; এস, এন, বানার্জ্জি; এন্. রঙ্গবামী এবং জি, এম্ সান্যাল। সম্পাদক—মিঃ এস, সি, রায়; সহযোগী সম্পাদক—মেসার্স এইচ্. চক্রবর্ত্তী; বি, এম, সেন;—ধনরক্ষক—মেসার্স, এ, পাল; জে, সি, ঘোষ দস্তীদার।

মিঃ এস্. সি, রায় এই ইনষ্টিটিউটের প্রাণ-স্বরূপ—তিনি উৎসাহী, কর্ম্মপ্রিয়, শিক্ষিত যুবক—বাহিরের যে বৈষম্যে আজ কলিকাতার বীমা-ক্ষেত্র কণ্টকিত, ব্যক্তিগত মান অপমানের কথা মনে না আনিয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত টউটের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য তিনি কি আজ মিলনের চেষ্টা করিতে পারেন না?

এসিয়ান এস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর এক সংখ্যা উদ্বৃত্ত পত্র সমালোচনার্থ আমরা পাইয়াছি। এসিয়ান গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে স্থাপিত হয়। ১৯১১ হইতে ব্যবসায় সূচনা করে। আমরা নীচে কোম্পানীর গত ১৯২৫ ও ১৯৩০ সনের ব্যবসায়সংগ্রহের হিসাব দিতেছি।

	প্রস্তাব	মূল্য	বীমাপত্র	টাকা
১৯২৫	১৩১৪	২৫,১৬,৫০০৲	৮৩২	১৬,০২,০০০
১৯৩০	২৮৩৯	৪৫,৫২,২৫০৲	২১০০	৩২,০৯,০০০

	চাঁদা আদায়	লাইফফণ্ড
১৯২৫	৩.৩৪.৩৩৩৲	৬,০২,৫৫৫৲
১৯৩০	৬,৪৮,৭৯৩৲	১৮,১০,৯৪৮৲

হিসাব হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস 'এসিয়ান'এর ক্রমোন্নতির ইতিহাস। আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ হইতেছে ১,২২,৭৪৯৲ টাকা; বীমাকাল পূরণ হওয়ায় দাবীর পরিমাণ হইতেছে ২৯,৮০১৲ টাকা।

কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত যমুনা দাস মেহতা, ডাঃ চেরেদিয়া, শ্রীযুক্ত ফোজদার প্রত্যেকেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তি। কলিকাতা শাখার পরিচালন শ্রীযুক্ত কামদার ও শ্রীযুক্ত মেহতা করিতেছেন। ইঁহাদের পরিচালনায় উত্তরোত্তর কোম্পানী উন্নতি লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সুরেন্স লিমিটেড বাংলার অন্যতম বীমা-প্রতিষ্ঠান। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

পুণ্যস্মৃতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই কোম্পানীর অন্যতম উদ্যোগী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার নামসংশ্লিষ্ট এই বীমা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের সুপ্রচুর আশা ও কামনা আছে। বৃহত্তর ভারত বলিতে যে সাধনার ভাব ও কল্পনা আমাদের মনে আসে, তাহারই সার্থকতায় এ বীমা-প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ সমুজ্জ্বল হইবে, এ ভরসা আমরা রাখি। পরিচালনমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যেকেই বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহাদের অর্জ্জিত প্রতিষ্ঠা, যশ ও সুনাম গ্রেট ইণ্ডিয়া অক্ষুণ্ণ রাখুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। বাংলার অর্থ বাংলায় রাখিবার জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, বীমা ব্যবসায়ে বাঙালীর সেই সহানুভূতির পরিচয় গ্রেট ইণ্ডিয়া নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মাত্র ১৩ মাস কাজ করিয়া এই কোম্পানী ১৩,০৮,০০০৲ টাকার প্রস্তাবপত্র পাইয়াছিলেন—তন্মধ্যে ১০,৬০,৭৫০৲ টাকা মূল্যের ৫৬৫ খানি বীমাপত্র কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। বাতিল বীমাপত্রের পরিমাণ মাত্র ১৫.৭৪ (শতকরা), ইহা বিশেষ সন্তোষজনক সন্দেহ নাই। এই সময়ের মধ্যে ১০০০৲ টাকার একটি মাত্র দাবী কোম্পানীকে মিটাইতে হইয়াছে। ইহাতেও কোন আশঙ্কার কারণ দেখা যাইতেছে না।

পত্রান্তরে প্রকাশ জীবন বীমার ব্যবসায়ে **হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ** এবার ভারতীয় বীমা কোম্পানী গুলির মধ্যে জীবন বীমা সংগ্রহের কার্য্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। সংবাদটি আনন্দের সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বাঙালী বীমা ব্যবসায়ীগণ সাধুতায় ও কর্ম্মদক্ষতায় জাতীয় জীবনের সুপ্রতিষ্ঠায় উত্তরোত্তর সহায়তা করিতে থাকুন। দেশের জনসাধারণের ন্যাসরক্ষক হিসাবে যাঁহারা জীবন-বীমা বা ব্যাঙ্কের ব্যবসায় করিতেছেন—তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানের উপর ভবিষ্যত আর্থিক ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

নিবেদন

গত কয়েক মাস হইতে 'উপাসনা' সম্পর্কে আমি বহু গুজব শুনিয়া আসিতেছি 'উপাসনা'র সহিত গত দশ বৎসরেরও অধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত থাকিয়া পত্রিকাখানির উপর যে একটা বিশেষ মমতা জন্মিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। সত্ত্বাধিকারী বা সম্পাদক হিসাবে 'উপাসনা'কে লইয়া কোনও দিন অহঙ্কার প্রকাশ করিবার মূঢ়তা আমার আসে নাই—কিন্তু গত বৈশাখ মাস হইতে নূতন ব্যবস্থা করিয়া 'উপাসনা'র আফিস প্রভৃতি নিজের বাড়ীতে আনা সত্ত্বেও যখন বাহিরে প্রকাশ, 'উপাসনা'র সত্ত্বাধিকারী আমি নহি এবং কেহ নাকি আমাকে সম্পাদক রূপে 'বাহাল' করিয়া ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তখন বর্ত্তমানে আমিই যে 'উপাসনা'র একমাত্র সত্ত্বাধিকারী এবং 'উপাসনা'র 'শিখণ্ডী' সম্পাদক হইবার বিড়ম্বনা আমার ভাগ্যে যে এখনও ঘটে নাই তাহা আজ আমাকে সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করিতে হইল।

'উপাসনা' তাহার দীর্ঘকালের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ অনুসারেই পরিচালিত হইবে, ব্যক্তির স্বার্থ ও দলের ঈর্ষাবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়া নিজের মর্য্যাদা সে কখনই ক্ষুণ্ণ করিবে না। সাহিত্য-সেবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার যৎসামান্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দ্বারা জীবনবীমার সাধারণ ভাবে উৎকর্ষ অপকর্ষের অকুণ্ঠিত আলোচনায় ভারতীয় জীবনবীমার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতে পারি তাহা হইলে আমার সাহিত্য-পত্রিকায় বীমা-প্রসঙ্গের প্রবর্ত্তন করা সার্থক হইবে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সত্ত্বাধিকারী, উপাসনা

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
2, Wellington Lane, Dharamtala, Calcutta.

NATIONAL SOAP
& CHEMICAL WORKS

"শতদল দল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়ে যায়।"
কবির এ কল্পনা তখনই মূর্ত্তি
পরিগ্রহ করে যখন প্রত্যেক
নর নারীর প্রধান অবলম্বন
—হয়—
(সেই) চির-পরিচিত বিশ্ব-বিশ্রুত
তরুণ অরুণ সম স্বর্ণাভ রাগ-
রঞ্জিত এবং মন-বিমোহন
মৃদু মন্দ গন্ধবহ
সুষমা
ভারতের শ্রেষ্ঠ কেশতৈল
কেশের পতন ও অকাল পক্কতা এবং মাথার
খুস্কি ও মরামাস নিবারণ করে। মাথা
ধরা, মাথা ঘোরা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস
প্রভৃতি নিরাময় করে।
৵০ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন।
সংসারী লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী।
সকল বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।
পি, সেট এণ্ড কোং
কলিকাতা।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়　　সহ সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]

ABSOLUTELY PURE PERFUMED

TIL OIL

LION BRAND

BRAIN & HAIR FOOD

SOLD BY ALL DEALERS

BENGAL DRUG & PERFUME WORKS.
CALCUTTA

অর্চ্চনা

অগুরু, চন্দন ও কয়েকটী দেশীয় বিশুদ্ধ তৈলসারের সংযোগে অর্চ্চনার সৃষ্টি। কয়েক ফোঁটা রুমালে ব্যবহার করিলে কয়েক দিন ধরিয়া প্রাণে এক আনন্দ-লহরী খেলিতে থাকে। গুণে, গন্ধে, প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থানের যোগ্য।

ফুলরাণী

সুবাসিত কেশতৈল

খাঁটী তিল হইতে প্রস্তুত। কেশ উঠা, অকাল পক্কতা নিবারণ হয়। বায়ু ও মেহঘটিত উপসর্গ দূর হয়। স্নিগ্ধ সুবাসে মন প্রফুল্লিত করে।

১, হলওয়েল লেন, কলিকাতা।

—ঘর সংসারের— সমস্ত [illegible]—

সিঁদুর, আলতা, সাবান, এসেন্স, স্নো, পাউডার, রুজ, রুমাল, লেস, রিবন, গন্ধতৈল, তোয়ালে, চিরুণী, কাঁটা, আয়না—ফাউণ্টেন পেন!

ফন্দের প্রত্যেকটি জিনিস এবং বিবাহের যাবতীয় উপহার আমাদের কাছে পাবেন। মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন ক'রে পাঠিয়ে থাকি।

নিভার্সাল ষ্টোর্স

৬২।১৬, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—
২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

শ্রাবণ—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

শ্রাবণ—১৩৩৮

কালিপুর-আশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ:—

পুস্তকের নাম	মূল্য	লেখক
১। জগৎস্বপ্ন	১৲	শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ
২। ক্ষেপার খেয়াল	॥০	„ যোগেশ্বরী সরস্বতী
৩। তত্ত্বকথা	১॥০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রফেসার
৪। ঐ ২য় খণ্ড	১	„ „
৫। সদ্‌গুরু ও রাজযোগ	১০	শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস বি, এ
৬। সত্যযুগ	॥০	„
৭। ঋষিযোগে স্মৃতি	১৲	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় বি, এ
৮। মুমুক্ষুর বিচার		শ্রীপ্রতিভা সাংখ্যশাস্ত্রী ও শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী
৯। পূর্ণানন্দের প্রলাপবাক্য	১৲	শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
১০। ঠিক বেঠিক	॥০	„
১১। রামপ্রসাদের 'মা'	॥৵০	„
১২। উপদেশাবলী	॥০	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
১৩। আশ্রম চতুষ্টয় (ব্রহ্মচর্য্য) (ছাত্রজীবন) ছাত্রদের জন্য	১০ ॥০	„ সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ
১৪। তত্ত্ব-সঙ্গীত	৵০	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত

আশ্রমাচার্য্য—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, কালিপুর আশ্রম

কামাখ্যা (পোঃ), কামরূপ (আসাম)।

বৎসরের পর বৎসর

প্রত্যেক ফোটো-ব্যবসায়ী ও ফোটো-শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করিতেছি

ফিল্ম
প্লেট
মাউণ্ট

ান দেশের উপযো

ব্যবসায়ী ও অ্যামেচারদিগের প্রয়োজনায় যাবতীয় ফোটোগ্রাফিক সরঞ্জাম

আমাদের নিকট পাইবেন

বটকৃষ্ণ এণ্ড কোং

৮।১, হস্পিট্যাল ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

গরম এক পেয়ালা চা

বলিতে যাহা কিছুর আকাঙ্ক্ষা

আপনার মনে আছে

স্বাদ ঃ বর্ণ ঃ গন্ধ ঃ

সমস্ত কিছুর আদর্শ সংমিশ্রণ

এরিয়ানের চায়ে পাইবেন।

এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সী

৭নং, মিশন রো, ব্লক 'B' কলিকাতা

ফোন : কলি : ২৮০৭

—শান্তি—

শিল্পী :—ম্যাক গ্যাব্রিয়েল]

শ্রাবণ—১৩৩৮

কার্য্যালয় :—

২নং ওয়েলিংটন লেন, পোঃ ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

বাঙ্গলা দেশে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইবার বিড়ম্বনা এই যে তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইতেই হইবে। এ দেশে নিছক সাহিত্য-পত্রিকাও চলা দুষ্কর,—চালাইতে গিয়া অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, আলোচনা ও সমালোচনা প্রভৃতি দিয়া মাসিক সাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধন করিতে হয়। কিন্তু পত্রিকাসম্পাদন করিতেছি বলিয়াই যে সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতা আছে এমন অহঙ্কার আমাদের নাই।—আমরা বহুদিন হইতে আমাদের বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী সাহিত্যাগ্রজ ও বন্ধুকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আজ আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি তাঁহাদিগকে পরিচালন-পরিষদে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। শুধু মাত্র নামে নহে—তাঁহারা আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে একান্ত ভাবে উপাসনার কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকিরণকুমার রায়

২৪শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩৮ | ৪র্থ সংখ্যা

কবি-বিলাপ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

হে অপ্সরী, একদিন ছন্দের টঙ্কারে
স্মর-ধনু ভঙ্গ করি', দেবগণে জিনি'
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বনী
স্বয়ম্বর-মালা ; কি রহস্য—ক'ব কারে ?—
বধূ হ'ল স্বর্গ-নটী !—আকুল ঝঙ্কারে
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে সপ্তপদী—কেন যে, বুঝিনি,—
কার লাগি' পুষ্পাসব ভরিলে ভৃঙ্গারে !

আমার কামনা-ধূমে হয়নি ত' ম্লান
তোমার সীমন্ত-শোভি মন্দার-মঞ্জরী :
তনু তব তোলে নাই আবেশে শিহরি,—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান।
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান,
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী !

এই মোর অপরাধ?—পুষ্পাসব-পানে
ঘূর্ণিত আঁখিরে তব আমার পিপাসা
করেনি মদির-তর? সুপেলব নাসা
স্ফুরিত সঘন শ্বাসে—ক্ষোভে, অভিমানে—
পারে নি জাগাতে মোর উদাসীন প্রাণে
সুচির সন্তাপ?—মঞ্জীরের মঞ্জু ভাষা
উতলা করেছে শুধু; সর্ব্ব সুখ-আশা
অঞ্জলি ভরিয়া আমি ঢেলেছিনু গানে!

ভালো যদি লাগিবে না রূপের আরতি—
অনঙ্গের পরাভব,—হায় গো অপ্সরা!
স্মরধনু-ভঙ্গপণে হ'লে স্বয়ম্বরা
কেন তবে? রূপমুগ্ধ মর্ত্ত্যের সন্ততি.
জানোনাকি, রতিপদে করে না প্রণতি?—
তাই তবু ক্ষণতরে দিয়েছিলে ধরা!

আদিকাল হ'তে সকরুণ সে কাহিনী
ফিরিয়াছে কবিকণ্ঠে—স্বর্গের অপ্সরা
কবে কোন মর্ত্ত্যজনে দিয়েছিল ধরা
অন্ধ অনুরাগে! তার পর সে মোহিনী
যৌবন-নিশার সেই স্বপন-সঙ্গিনী,
সহসা উষার সাথে মিলাইল্ ত্বরা
অন্তরীক্ষে; পুরুরবা সারা বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস-যামিনী।

হায় নর! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন!
উর্ব্বশী চাহে না প্রেম,—প্রেমের অধিক
চায় সে যে দৃপ্ত আয়ুঃ, দুরন্ত যৌবন;
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত-পিক
পলায়েছে; মরু-পথে, হে মৃত্যু-পথিক,
কে রচিবে পুনঃ সেই প্রফুল্ল নন্দন?

ধর্ম্ম ও সমাজ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বর্ণবিভাগ

আমরা বিগত জ্যৈষ্ঠে বলেছিলুম যে ভারতের শক্তি কেন্দ্রীভূত করার দুটো অন্তরায় আছে, প্রথমটী সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং দ্বিতীয়টি বর্ণগত, জন্মগত বর্ণবিভাগ। সেখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমন্বয় কোথায় তা দেখান হয়েছে, এবার ভারত-শক্তি কেন্দ্রীকরণের দ্বিতীয় অন্তরায়টি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

শাস্ত্রপাঠে অনুমিত হয় আদিম কালে বর্ণবিভাগের মর্ম্মকথা ছিল একটা বিরাট ব্যাপক গঠন, বিভিন্ন গোষ্ঠির রাসায়নিক সংযোগ এবং পরস্পরের অনুশীলনের দ্বারা পরস্পর লাভবান হওয়া। বর্ত্তমান যুগের জন্মগত বর্ণ-সংস্কার এবং এক বর্ণের ওপর অপর বর্ণের আধিপত্যের ও ঘৃণার নিষ্ঠুর আদেশ, শ্রীভগবানকথিত গুণকর্ম্মানুযায়ী প্রকৃত বর্ণবিভাগস্মরণে, মস্তিষ্কে একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে বটে কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে হিন্দুর বর্ণবিভাগ অদ্ভুত উদারতা এবং বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই উদারতা এবং বিশ্বাস নষ্ট হওয়াতেই বর্ণবিভাগ এখন গোঁড়ামী, পীড়ন, অসাম্য এবং কমঠ বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়েচে। কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁরা সমাজ-শাসক, যাঁদের এখনও সমাজের ওপর যথেষ্ট আধিপত্য রয়েচে, দেশের ভাবী কল্যাণকে লক্ষ্য করে বর্ণবিভাগের যথার্থ উদ্দেশ্য তাঁরা কার্য্যকরী করতে পারেন।

প্রথমে দেখা যাক্ একটা প্রকাণ্ড দেশের অসংখ্য জনসাধারণের মধ্যে বিভাগসৃষ্টির হেতু কী? সেটা বুঝলে মনের অনেক গোঁড়ামী নষ্ট হবে। প্রথম বিভাগ সৃষ্টি করে—গোত্র, গোষ্ঠি, সম্প্রদায় এবং উপজীবিকা। তারপর হচ্চে উপনিবেশ; একটা মস্ত দেশের এক অংশের একটা দল আর এক অংশে বসবাস করলে বা অপর দেশের একটা দল এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করলে এবং তাদের আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হেতু তারা একটা বিভিন্ন বিভাগে পরিণত হল। যেমন দক্ষিণের সারস্বত ব্রাহ্মণ; এঁরা বঙ্গদেশ থেকে গমন করেন। অথবা যেমন অবেস্তা ও বেদের উপাসকেরা কালে এক জাতি ছিলেন, এক সপ্ত সিন্ধুর তীরে অবস্থান করতেন, কিন্তু সোমরসের নির্ম্মাণ-প্রণালীর বিভিন্নতা এবং ইন্দ্র ও বরুণের আধিপত্য নিয়ে বিবাদ বাধায়, এক আর্য্য সম্প্রদায় ইরাণে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং কিছু কালের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত হয়ে পড়েন। আরও দেখা যায়, শ্বেতকায় আর্য্যেরা সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বে সেথায় অসংখ্য গোষ্ঠি গোত্রে বিভক্ত হয়ে ছিল—পীতকায় মোগল, তাঁবাটে রঙের দ্রাবিড়ী এবং কৃষ্ণকায় সাঁওতাল ভীল কোল। পরে এই বর্ণবিভাগসমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ল যখন আর্য্যেরা প্রথম পারস্যের সঙ্গে, পরে গ্রীক্ ও শকদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে লাগলেন।

এখন এই সামাজিক সংঘর্ষনিরাকরণের উপায় কী? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাতি, একীকরণের নানা উপায় লিখিত আছে—ধ্বংস, দাসত্ব, মিশ্রণ এবং সমন্বয়। প্রথম উপায়টি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই ব্যবহৃত হয়েচে, সেইজন্য মানুষকে সভ্যতার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত উপস্থিত হতে কত সাম্প্রদায়িক সমাধির ওপর দিয়ে যে পথ প্রস্তুত করতে হয়েচে তার স্থিরতা নেই। এখনও দেখতে পাচ্চি আমেরিকার আদিম অধিবাসিগুলো কি করে উঠে যাচ্চে। বৈজ্ঞানিক হয়ত বলবেন, যার বুদ্ধি নেই, যে সভ্যতার ধনভাণ্ডারে কিছু দিতে পারলে না, তার ধ্বংস অনিবার্য্য, তার থাকা না থাকা দুই সমান কিন্তু সংশয় জাগে, ভগবানের ব্যর্থ সৃষ্টির কল্পনা করতে—এই বিশ্বে অনর্থক কিছুর স্থান আছে, এ ধারণা আমাদের বুদ্ধি গ্রহণ করতে চায় না। অনর্থক খনিগুলি যুগ যুগ ধরে পড়ে ছিল, কে জানত যে রত্ন সেখানে আত্ম-গোপন করে রয়েচে?—কে জানত নিগ্রো জাতির মধ্যে বুকার টি ওয়াশিংটন সুপ্ত হয়ে ছিল? সকল ব্যক্তির মধ্যেই সেই ব্রহ্মশক্তি কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে রয়েচেন, অবস্থা, সুযোগ ও সময় হলেই তিনি জাগবেন। তবে প্রাকৃতিক

নিয়মে যে জাত নিঃশেষিত হচ্চে তাকে যেতে দাও, কিন্তু তরবারীর দ্বারা ধ্বংসের সহকারী হয়ো না; স্নুইবেন্সের মত তোমার প্রধান কর্ত্তব্য, শেষ পর্য্যন্ত তাতে প্রাণের উদ্বোধন করা যায় কি না। একটা জাত আর একটা জাতের ওপর আধিপত্য করলেই যে সে জাতটা তার চাইতে বড় তা বলা চলে না। পশুবলে বড় হলেও হ'তে পারে, কৃষ্টি হিসাবে নয়—যেমন রোমানদের ওপর গথদের আধিপত্য; আবার রোমান জুলিয়াস সিজার বলেছিলেন, বৃটনরা একেবারেই উন্নতিশীল নয়। কে জানত, যারা দেবতার কৃপা লাভ করবার জন্য জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারত, সেই চর্ম্ম-পরিধারী বৃটনরা অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর হবে? তেমনি টিউটন ও সারাসিন জাতির ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি অনন্ত ও সুপ্ত, কখন কি ভাবে যে তিনি জেগে উঠবেন, কিছুই বলা চলে না। সেইজন্য সমস্ত নিম্ন স্তরের জাতিদের চারা গাছের মত লালন করা উচিত; তাকে সহানুভূতি ও সাহায্য দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। যেমন একই গোলাপ ফুলের বিভিন্ন বর্ণ আছে, তেমনি একই মনুষ্য জাতির বিভিন্ন ভাবধারা আছে, সেইটি যাতে বৃদ্ধি হয় দেখতে হবে। অনুকূল অবস্থা না পেলে যেমন গাছ বাড়ে না, মানুষেরও তাই। দেখা যায়, উপযোগী অবস্থার উত্তেজনা পেলে, অবস্থানুযায়ী খাপ খাইয়ে একটা জাতি বেশ বৃদ্ধির পথে যেতে পারে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ধ্বংস যেখানে অসম্ভব, সেখানে শক্তিমান জাতিরা দুর্ব্বলকে শৃঙ্খলিত করে রাখেন। কিন্তু ভগবান যেমন ধ্বংস করবার অধিকারও কাউকে দেন নি, তেমনি পদদলিত করবার ক্ষমতাও কাউকে দেন নি। মানব-ধর্ম্মের দিক দিয়ে সকল জাতিই সমান, বরং দুর্ব্বলের প্রতি আরও অধিক যত্ন ও তত্ত্বাবধান নেওয়া উচিত। রোগী, শিশু বা বৃদ্ধের দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাটা কি পাপ? সকলের মধ্যে সেই পরমাত্মা যখন রয়েছেন তখন সকলেই শ্রদ্ধেয়, সকলেই সেবার যোগ্য; সকলের দেহ মনের দাসত্ব নাশ করে' উন্নতি ও মুক্তির উপযুক্ত করে' দেওয়াই মানব-ধর্ম্ম। পরন্তু এ মানব-ধর্ম্ম চিরকালই ভারতবর্ষে, ইজিপ্টে, ব্রাজিলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। লর্ড মিলনার বলেন যে বৃটিশ সম্রাজ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সমরক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু যেখানেই উহার বৈষম্য সেইখানেই অধীনতা। * বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা হতে পারে, বড় বড় কথায় আমরা জগৎ ধ্বনিত করতে পারি, কিন্তু সহজাত চিন্তা যা যুগযুগ ধরে বংশ, গোত্র, আচার, ব্যবহার অশন-ভূষণের মধ্য দিয়ে স্বজাতির সহিত অপর জাতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েচে, তাকে সংযুক্ত করা দুচার দিনের কাজ নয়, পক্ষান্তরে একটা পাহাড় চাপা দিয়ে সব সমভূম করে দেওয়া মানেও একতা নয়। হিন্দুর প্রথা অনুরূপ; তোমার যা আছে তাই নিয়ে অনন্ত উন্নতির পথে চল, কিন্তু দেখো যেন কারও উন্নতির অন্তরায় হয়ো না। আমার সত্য ও তোমার সত্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করুক, কিন্তু একটিকে ধ্বংস করে আর একটির কেবল বৃদ্ধি হতে পারে না। বর্ণাশ্রমের তৎপর্য্যই হচ্ছে অনন্ত-চরিত্র মানবের উন্নতির বিভিন্ন উপায়ের সামাধান। যাঁদেরই অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে তাঁরাই দেখতে পান কী অপূর্ব্ব মানব-রসে এই বিরাট হিন্দু-প্রাসাদ যুক্ত। মিঃ ভেলেন্‌টাইন চিরোল দেখতে পেয়েছিলেন হিন্দুর নীতি কী উদারতার ওপর, কত বিষম জাতি ও গোষ্ঠিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে অনাদিকাল থেকে সমন্বিত করে রেখেছে। এ নীতি যথেষ্ট ভারসহ ও স্থিতিস্থাপক অথচ আর্য্য সভ্যতার প্রাধান্য এতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। †

একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে বর্ণসংকরের দ্বারা সমস্ত জাতটাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়নি কেন? তার হেতু, ঐ রাক্ষস-প্রণালীতে মেশাতে গেলে সারা ভারতে একটা মস্ত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়ে' সারা জাতি ধ্বংস হত। মুসলমান বা ইংরাজ যদি বলপূর্ব্বক বর্ণসংকর ঘটাতে যেতেন তাহলে যে বিপদ উপস্থিত হত, ঠিক আর্য্যদের ভারতবিজয়ের পর বর্ণসংকর চালাতে গেলে

* Lord Milner's Confession of Faith.

† The supple and the subtle forces of Hinduism had already in pre-Historic times wielded together the discordant beliefs and customs of a vast variety of races into a comprehensive fabric sufficiently elastic to shelter most of the indigenous populations of India, and sufficiently rigid to secure the Aryan-Hindu ascendancy—India: Old and New. pp. 42-3.

সেই ভয়াবহ কাণ্ডেরই সৃষ্টি হত। অনার্য্যেরা, বানরেরা, রাক্ষসেরা একেবারে অসভ্য ছিল না—পার্থিব বিদ্যা হিসাবে তারা আর্য্যদের চাইতে অনেক বিষয়ে উন্নত ছিল, তাদের যথেষ্ট আত্ম-সম্মান জ্ঞান ছিল। এখনও অতি নীচ বর্ণের মধ্যেও দেখা যায় অবাধ খাওয়াদাওয়া বা বিবাহ অত্যন্ত নিন্দিত এবং স্বজাতির মধ্যে বিবাহটা একটা খুব গরিমার বিষয়। আর্য্যেরা তাই একটা কৃত্রিম শূদ্র-সমাজ সৃষ্টি করে বিজিতদের ওপর কতকগুলো অযৌক্তিক অসম্মানকর আইন কানুন চড়িয়ে দেন নি, পরন্তু যে সব আইন কানুন তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলোর ওপর স্বাভাবিক উপায়ে শূদ্র সমাজের সৃষ্টি করে, আর্য্য-উচ্চ-সভ্যতার দ্বারা তাদের উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন। বর্ত্তমান কালের আর্য্য-ধারায় শিক্ষিত শূদ্র যাঁরা, তাঁরা ভাবচেন যে তাঁদের ওপর অযথা যা তা আইন কানুন চাপিয়ে অত্যাচার করা হয়েচে। কিন্তু ঘটনা সেরূপ নয়। তাঁদের পূর্ব্ব পুরুষরা আত্মমর্য্যাদা এবং বংশমর্য্যাদারক্ষার জন্য স্ব স্ব জাতির আচরিত আচার ব্যবহার দৃঢ় ভাবেই রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরাই আর্য্য-শিক্ষাকে অতিমাত্রায় বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরাই ধীরে ধীরে আর্য্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই মিলনের আংশিক বিধি আমরা বৃদ্ধ মনুতে দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণ থেকে, ক্ষত্রিয় ত্রিবর্ণ থেকে, বৈশ্য দ্বি-বর্ণ থেকে কন্যা সংগ্রহ করতে পারতেন, এবং শেষ বিধান দিলেন স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হতেও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অপকৃষ্ট অনুশীলনযুক্ত সমাজ বা পরিবারে কন্যাদান তিনি অস্বীকার করে গেলেন। কারণ তার যে বিষময় ফল তা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মতও বটে, আর সাধারণ বুদ্ধিও বলে যে অসৎ সংসর্গে সৎ অসৎ হয় এবং সৎ সংসর্গে অসৎও সৎ হয়। অশিক্ষিতা কন্যা এসে উচ্চ পরিবারে শিক্ষিতা হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিতা কন্যা অশিক্ষিত পরিবারে গেলে তার অধোগতি ও মনঃকষ্টের অবধি থাকে না। সেই জন্য পারিবারিক বা সামাজিক মিলনের প্রাধান্য আর্য্যেরা স্বীকার করেছিলেন। বিভিন্ন আদর্শ ও প্রথার মধ্যে লালিত নরনারীর মিলনের বিষময় ফল বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতি। এবং স্বস্ব জাতি ও বংশমর্য্যাদার উপর মমত্ব যে প্রাচীন অনার্য্যদের খুব পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল, এটা একটা আধুনিক কল্পনা নয়, এখনও তার যথেষ্ট নিদর্শন আছে, নীচ বর্ণীয়েরা এখনও সকলে এক পংক্তিতে খায় না, সকলের মধ্যে বিবাহ চল নেই। এবং যাদের মধ্যে এরূপ কোনও প্রথা নেই এবং বর্ণসংকর অবাধে চলে তারাই "অস্পৃশ্য" বলে প্রসিদ্ধ। বর্ণসংকর জিনিষটা আর্য্যেরা খুব ভয় করতেন এবং বর্ত্তমান নৃ-কৃষ্টি-বিদেরাও খুব ভয় করেন। কারণ বিষম শিক্ষা, আদর্শ ও রীতিনীতির মিলনের ফল চির-কালই ভয়াবহ।

তাই স্ব স্ব আচরিত ও ঈপ্সিত আচার ব্যবহারের মধ্যে থেকে গোটা ভারতবর্ষটাকে একটা আধ্যাত্মিক জাতিতে উৎকর্ষিত করবার জন্যই ঋষিরা বিভিন্ন গণ্ডীর (group) সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এখনও ব্যাপক ভাবে ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্য সভ্যতার অনুপস্থিতি দেখে অনেকে আমাদের মতবাদের বিরোধী যুক্তি তোলেন এবং বলেন যে বলপূর্ব্বক আর্য্যেরা শূদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করায় তা এখনও সর্ব্বত্র অগৃহীত এবং তা ছাড়া শূদ্রাদির মধ্যে উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক উচ্চ গণ্ডীভুক্ত করার উদাহরণ অপ্রচলিত থাকায় আর্য্যদের ঐ উদার কল্পনা আমরা স্বীকার করে নিতে পারি না। এর উত্তর আমাদের আছে। এত বড় বিরাট অথচ অসংখ্য গোষ্ঠি, গোত্র, জাতিসম্পন্ন মহাদেশে একটা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। যাঁরা বর্ত্তমান যুগের প্রচারের মাপকাঠি নিয়ে অতীতের ইতিহাস মাপতে যান, তাঁদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তখন, সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, রেল, মোটর, টেলিগ্রাফ, রেডিয়ো প্রভৃতির অভাবেও তাঁরা যা করেচেন তা অপূর্ব্ব। কেরল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, পুক্কস, আভীর, নিষাদ, বর্ব্বর, বানর, রাক্ষস, কিংপুরুষ, শবর, কিরাত, যবন প্রভৃতি জাতিকে ধ্বংস না করে এখনও আর্য্য-কৃষ্টি স্বমহিমায় বর্ত্তমান এবং ধীর প্রচারশীল। তা ছাড়া ঐলুষ, কষধ, বশিষ্ঠ, পরাশর, ব্যাস, নারদ, বিশ্বা-মিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের নিম্ন গণ্ডী থেকে উচ্চ গণ্ডীলাভেরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তবে পরাধীনতা ও অন্য ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য ধর্ম্মের গতি যে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং ধর্ম্মরক্ষকদের দুর্ব্বলতা হেতু ধর্ম্মের প্রসার ও প্রচার ক্ষীণ হওয়ায়, নিম্ন গণ্ডীর মধ্যে উচ্চ ব্যক্তির এবং যত্নাভাবে উচ্চ গণ্ডীর মধ্যে

নিম্ন বৃত্তির স্থান নির্দ্দেশ নিয়ে সারা জাতকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করে তুলেছে—উচ্চ কুলে জন্ম অথচ নীচ বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মানতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু চক্ষের সমক্ষে রয়েছে চিরাচরিত বংশমর্য্যাদার বিভীষিকা। উপায় কী? উপায়, সহানুভূতি, সেবা, প্রেম ও মৈত্রীর ওপর অসংখ্য গণ্ডীর স্বীকার এবং একাত্ম ব্রহ্মবাদের ওপর তার ভিত্তিস্থাপন, দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যের ওপর (জন্মগত নহে) ধর্ম্মাধিকারীনির্ণয়, সদাচারসম্পন্ন, ত্যাগ-তপস্যাযুক্ত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব ধার্য্য এবং ব্যবসায়ানুযায়ী চারিত্রিক বর্ণের প্রতিষ্ঠা।

হিমাচল ও ভারত সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে আর্য্যদের সমক্ষে যে সমস্যার অভ্যুত্থান হয়েছিল আজ আবার তা বিশ্ব-সমস্যা হয়ে প্রাদুর্ভূত হয়েচে শাস্ত্রকারেরা সত্য কথাই বলতেন যে ভারতবর্ষ জগতের সার। সব দর্শন, বিজ্ঞান, সৃষ্টি, কলা, সমাজ-তত্ত্ব এখানে উঠেচে ও সমাধিগত হয়েচে। মহামায়ার সন্তানেরা কালবিজয়ী হয়ে ইতিহাসের কত লয়াভ্যুত্থান নৃত্য ক্রীড়া দেখল ও দেখবে। অনিত্য জীব মেঘের আড়ালে চঞ্চলার মণিবন্ধ দেখেই তৃপ্ত হল, অখণ্ডরূপ তার দেখা হল না, তাই বিরাট আকাশে কাল-পুরুষের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে এ রঙ্গ-মঞ্চ থেকে জাতির পর জাতিকে অপসৃত হতে হচ্চে। পরন্তু ভারতের একাত্ম-বাদের স্পর্শমণির যাদুস্পর্শে কত মধ্য এসিয়ার বেদিয়া আজ নিজেদের চন্দ্র সূর্য্য বংশজ বলে গর্ব্ব অনুভব করে! *

সমস্যা দাঁড়িয়েচে এইরূপ:—ইউরোপ পৃথিবী বিজয় করেচে। অসংখ্য গোষ্ঠি, জাতি, বর্ণ, কুল গোত্রের তারা অধীশ্বর। তাদের মহিমাদর্শনে অপরাপর গোষ্ঠি ও জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান জীবন্ত হয়ে উঠেচে। অবাধ বিদ্যার প্রচলনে কেউ স্ব স্ব জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করে না। তাই প্রশ্ন উঠেচে পৃথিবীশাসনে তাদের স্থান কোথায়? পীত লোহিত কৃষ্ণ জাতিরা এখন নিজেদের শাসন, আইনকানুন নিজেরা বুঝে নিতে চায়। অপর দিকে শ্বেত জাতি বলচে, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চাই। এ অভিমানে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। পৃথিবীর কোনও অকর্ম্মণ্য জাতি যদি ভূগর্ভনিহিত ধনরত্ন অকেজো করে রেখে দিতে চায়, তা ছিনিয়ে নিতে হবে। হয় তাকে এই জয়যাত্রায় যোগদান করতে হবে, আর নয় তাকে এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চ থেকে উধাও হয়ে যেতে হবে। অকর্ম্মণ্য, বন্য, বর্ব্বরদের রক্ষার জন্য র অগ্রগতি নিরোধ হতে পারে না। বিজ্ঞানের করস্পর্শে সমস্ত জগৎ এখন এক হয়ে পড়েচে। কোন দেশের শস্য, ধনধান্য কোন ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের সম্পত্তি হতে পারে না, জগতের কাজে তাকে লাগাতে হবেই। পক্ষান্তরে সংখ্যায় অত্যধিক পীত কৃষ্ণাদি জাতি সমবেত ভাবে শ্বেত জাতির অভ্যুদয়ে এক ব্যাপক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের পথ সৃষ্টি করে তুলেচে।

এখন এ সমস্যাসমাধানের উপায়? উপায়—ভারতীয় প্রথার অবলম্বন। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠির রাজনৈতিক মুক্তি এবং তাদের বিশেষত্ব রক্ষা করে আনুশীলনিক বৃত্তির ওপর এক বিরাট, ব্যাপক, উদার, পরমতসহিষ্ণু, সর্ব্ব-রক্ষার আত্মবাদে মানবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—যার মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের রক্ষণবল, বৈশ্যের কৃষিশিল্প এবং শূদ্রের সেবা সমভাবে স্থান পাবে। সর্ব্ব-জাতির মুক্তি, চারিত্রিক বর্ণ, পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমভাবে বিভক্তীকরণই এ সমস্যার সমাধান। বিবিক্ত দেশসেবী, অবিলাসী, নিঃস্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা বিদ্যার অর্জ্জন ও প্রচার, ক্ষত্রিয়েরা সমাজরক্ষা, বৈশ্যেরা সমাজকে ঋদ্ধিসম্পন্ন করবেন এবং শূদ্রের সেবার ওপর সমাজভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অর্থপিপাসু ব্রাহ্মণের বিদ্যালাভ হয় না, কিন্তু সমাজ তাঁদের সমস্ত বায়ভার বহন করতে বাধ্য। মানুষের হিংসাবৃত্তি যতদিন না অকেজো (Vestigial) হয়ে যায়, ততদিন ক্ষত্রিয় থাকবেই, যদিও অস্ত্রের দ্বারা যে রাজনীতির প্রতিষ্ঠা সেটা পরিবর্ত্তনশীল হবেই এবং প্রত্যেক মানবেরই বার্ণার্ড শ'র কথায় সায় দেওয়া উচিত যে—"The soldier is an anachronism of which we must get rid." মানবজীবনের সৃষ্টির ইতিহাসে সত্যই সৈনিক বা ধ্বংস-বৃত্তিটা একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ। তারপর বৈশ্যের ধন সমাজের গচ্ছিত, ওর ব্যবহার ও প্রয়োজন মানবহিতার্থে এবং শূদ্রের সেবা ও পরিশ্রমই সমগ্র মানব জাতিকে ধারণ করে রেখেচে।—এইটি বোঝবার এখন সকল জাতির সময় উপস্থিত।

* Mr. Jackson writes; "Those Indians indeed have a poor opinion of their country's greatness who do not realise how it has tamed and civilised the nomads of central Asia, so that wild Turcoman tribes have been transformed into some of the most famous of the Rajput royal races.—Indian Antiquary, Jan. 1911.

বাংলার পরিচিত পাখী

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

শালিক

শালিকের সঙ্গে অপরিচিত বাঙ্গালী বোধ হয় কোথাও নাই। পল্লীতে, জনপদে,—মানুষ যেখানেই আছে, সেইখানেই এই কৃষ্ণশীর্ষ, বাদামী পাখী অবস্থান করে। কাকের মতই দুঃসাহসী ও সর্ব্বত্র বিচরণশীল পাখী এটি—যদিও কাকের মত চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ নয়। এর হাবভাবভঙ্গী এত কৌতূহলপ্রদ যে এই সাধারণ পাখী সম্বন্ধে দুইচারিটা সাধারণ কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

এদের কর্ণমূলে যে পীতবর্ণের একটা পটি আছে তজ্জন্য এর সঙ্গে ময়নার জ্ঞাতিসম্পর্ক আছে বলে লোকের বিশ্বাস। উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষে এই শালিক পাখীকে লোকে "ময়না"ই বলে। ইংরাজ পক্ষিবিদ্ তাঁর পুস্তকাদিতে পাখীর হিন্দুস্থানী নাম সন্নিবেশিত ক'রেছেন ব'লে ইংরাজী বইতে একে the Common Mynah ব'লে উল্লেখ করা হয়।

শালিককে শুধু খেচর না বলে' উভচর বল্‌লে বড় একটা দোষের হবে না। জমীর উপর যখন সে তার হলদে মোজা-পোরা পা দুখানি একটির পর একটি ফেলে দোলায়মান ভঙ্গীতে অগ্রসর হয়, তখন সে গতিভঙ্গীকে লালিত্যের পরাকাষ্ঠা হয়তো না বলা যেতে পারে; কিন্তু তাকে অ-সুন্দর আখ্যা দিয়ে কলাবিভাগের বাইরেও ফেলা যেতে পারে না। তার মস্তকটি প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসে এবং সেই জন্যই শালিকের গতির মধ্যে পৌরুষের অভাব লক্ষিত হয়। তবে তার চ'লবার কায়দা যে দাম্ভিকতায় পূর্ণ এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এতদ্ব্যতীত, জমির উপর সে খুব দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে পারে। আবার বৃক্ষশাখার মধ্যে এর গতি বেশ চঞ্চল ও ক্ষিপ্র, একটুও জড়তা কোথাও দেখা যায় না। উড্ডীয়মান অবস্থায় যদিও খুব বেগে সে উড়তে পারে না, তাহ'লেও আকাশপথে নেহাৎ মন্দ গতিশীল সে নয়। জমির উপর কীটপতঙ্গের পশ্চাদ্ধাবমান হ'য়ে যদি কোনও পতঙ্গ পলায়মান হয়, শালিক তখন যেরূপ ক্ষিপ্র ও নিপুণভাবে ডানায় ভর ক'রে তাকে তাড়া করে ও অবশেষে কবলিত করে সে দৃশ্য দেখবার জিনিষ।

ইংরাজ যখন হাঁটে তখন মনে হয় যেন সমস্ত ধরিত্রী তারই পদানত—তা সে ফ্রান্সে গিয়ে হাঁটুকনা। শালিক ঠিক তেমনি দম্ভভরেই হাঁটে। মনের ভাবটা যেন, "পৃথিবীর যা কিছু ভোগ্য তা আমারই." বাস্তবিকই শালিক অত্যন্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ পাখী। জীবনসংগ্রাম-নীতির মূলে যদি কিছু সত্য থাকে তাহলে বলতে হবে যে সে সংগ্রাম-সিদ্ধ পাখী। একজন ইংরাজ লেখক এ-কে "বার্ড অফ ক্যারেক্টার" বলে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

শরীরটা খুব প্রকাণ্ড হ'লেই যে লোকের তেজ বেশী হয়—এ কথা কেউ স্বীকার করবেন না; এবং ও কথাটা যে নিতান্তই অসিদ্ধ তা শালিককে দেখলেই বোঝা যায়। কাক শালিকের চাইতে আকারে বড়, কিন্তু কাক শালিকের কাছে বেশ জব্দ হ'য়ে থাকে। কাক চতুর, কিন্তু শালিকের কাছে চাতুরী তার খাটে না। আমি শালিককে চিলের সঙ্গেও তাল ঠুকতে দেখেছি। চিল একটু হিংস্র স্বভাবের আর তার মেজাজটাও বড় খারাপ। কিন্তু শালিক চিলের কাছ থেকেও আহার্য্য কেড়ে খায়। একবার আমাদের বাসার প্রাচীরের উপর ব'সে একটি চিল মৎস্যাপেটিকার আস্বাদনে তৎপর ছিল। এমন সময় একজোড়া শালিকের ঐ সামগ্রীর উপর লোভ পড়ল। তাদের একজন গিয়ে চিলের সম্মুখে ও অন্যজন তার পশ্চাতে উপবেশন করল। যে পশ্চাতে ছিল সে একটু সন্তর্পণে, সাবধানে অগ্রসর হ'য়ে চিলের পুচ্ছাগ্রে চঞ্চুদ্বারা এক টান মারলে। এই অঙ্গবিশেষটিকে নিয়ে রসিকতা কোনও বিহঙ্গই পছন্দ করে না। চিলও সবেগে ঘুরে শালিককে দেখে তাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হোল। এই সুযোগে অন্য শালিকটি মৎস্যখণ্ড চঞ্চুগত ক'রে পলায়ন করল। কাককে শালিক এরূপভাবে অহরহ জ্বালাতন করে।

শালিক সর্ব্বদাই দল বেঁধে থাকে। মাঠের উপর অন্ততঃ দশ বিশটি শালিক অল্প দূরে দূরে আহার খুঁজে বেড়ায়। তাদের মধ্যে কোনও কাক এসে পড়লে তাকে বেশ অপমানিত হ'য়েই যেতে হয়। শালিক দলবদ্ধ হ'য়ে বেড়ালেও পরস্পর যে তাদের মধ্যে ঝগড়া বিরোধ হয় না, তা নয়। ঝগড়া মারামারিটা তাদের একটা আমোদের সামিল। বিশেষ, প্রজনন ঋতুতে কোনও শালিক তরুণীর পাণিপ্রার্থী কয়েকটি শালিক যুবকের মধ্যে অনেক সময় বচসা ও অনেক পরে হাতাহাতি একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এরূপ সময়ে যখন দুইটি শালিক চঞ্চু ও নখর সাহায্যে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করে, তখন অপর শালিকগণ তাদের ঘিরে ব'সে কেউ উৎসাহ, কেউ টিটকারি দেয়। এইরূপ গৃহবিবাদে যখন তারা ব্যস্ত থাকে, কাকের তখন ভারি স্ফূর্ত্তি হয়। তারাও তিন চার জন হয় গাছের উপর, নয় অদূরে জমির উপর ব'সে যুদ্ধ ও যোদ্ধা সম্বন্ধে নানারূপ সঙ্গত ও অসঙ্গত অভিমত প্রকাশ করতে থাকে। কারও বা একটু নষ্টামি করবার ইচ্ছা হয়; তখন সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে এক শালিকের লেজ ধ'রে টান মারে। বেশী উত্যক্ত করার ফলে অনেক সময় কাক বেশ উত্তম মধ্যম লাভ করে। কাক চালাক হ'লেও কাপুরুষ, কিল খেয়ে কিল হজম করে। কিল ফিরিয়ে দেওয়ার বলিষ্ঠতা তার নেই। শালিককে একা পেলে কিন্তু সে ছেড়ে কথা কয় না। একদিন বৃষ্টি পড়ছে; আমি এক বন্ধুগৃহে বারান্দায় ব'সে বরষার ঝরঝরাণি গান শুনছিলাম। বাগানের কামিনী ও হেনার ঝোপের নীচে ব'সে বায়সদল বৃষ্টির বিরুদ্ধে তাদের অভিমত বেশ সজোরে জ্ঞাপন করছিল। তাদের কর্কশ চীৎকারে আমার চিন্তার ধারা ছিন্ন হওয়ায় তাদের লক্ষ্য করতে লাগলুম। হঠাৎ দেখি একটি শালিক উড়ে এসে একেবারে কাক-সভার মাঝখানে উপবেশন করল। ইনি এতক্ষণ দীর্ঘ ম্যাগনোলিয়ার শীর্ষে ব'সে আরামে বৃষ্টিতে ভিজছিলেন। শালিকের এরূপ সহসা আবির্ভাবে কাকের কণ্ঠধ্বনি প্রথমে থেমে গেল। তারা যেন একটু অসুবিধায় পড়ল, ভাবটা যেন—"একে বৃষ্টি তার উপর একী আপদ!" প্রথমে তারা ভীতভাবে চেয়ে দেখল আশে পাশে শালিকের দলবল কোথাও আছে কি না। যখন বুঝল যে শালিকটি যূথভ্রষ্ট, একাকী, তখন তারা উল্লাসে তাকে আক্রমণ করল। ইংরাজ যেমন কালা আদমীর দলে গিয়ে খুব খানিকটা হাঁকাহাঁকি ক'রে সকলকে ভীত ত্রস্ত ক'রে দেয়—শালিকও তেমনি প্রথমটা মিলিটারি মেজাজ ঝেড়েছিলেন। কিন্তু দলে ভারী কাক 'হামভি মিলিটারি' ভাব দেখিয়ে শালিককে নাস্তানাবুদ ক'রে দিল। তখন তাকে আর্ত্তনাদ করতে করতে প্রেস্‌টিজ নিয়ে পালাতে হোল। আর এক দিন ওয়াল্টেয়ারের এক কাননমধ্যে শালিকের আর্ত্ত চীৎকার শুনে এগিয়ে দেখি, সেখানেও কাক-সভায় এক শালিক বোধ হয় ১৪৪ ধারার শমন জারি করতে গিয়েছিলেন, কাকমণ্ডলী অহিংসার ধার ধারে না, কাজেই চৌকিদার মহাশয়কে প্রাণ নিয়ে দৌড় দিতে হলো।

পাখীদের মধ্যে পুরুষাংশই সোহাগের খেলা বা flirtation ক'রে স্ত্রী-পাখীর মনোহরণের চেষ্টা করে। শালিক পুরুষ আবার এ বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে থাকে। স্ত্রী-শালিকের পুরোভাগে এসে ঘাড়ের পত্রগুলি ফুলিয়ে বার বার মাথাটি উন্নমিত ও অবনমিত ক'রে, ঘুরপাক খেয়ে নানাপ্রকারে সে প্রেম নিবেদন করে। সব সময়ে কিন্তু এই অভিসার-লীলা শালিক-জায়ার মনঃপূত হয় না। কারণ কখনও কখনও এরূপ বেহায়াপনার জন্য শালিক-তরুণীর নিকট যথেষ্ট তিরস্কার তাকে সহ্য করতে হয়। এই তিরস্কার ঠোনার রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ চঞ্চুর আঘাতে তরুণী শালিক তরুণ প্রেমিককে বেশ সায়েস্তা করে দেয়। আমার মেজাজ অনুকূল থাকলে ঐ সব হাবভাবই তার ভাল লাগে।

আমরা বাঙ্গালী অনেকদিন হ'তেই পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা হারিয়ে ব'সে আছি। সেই জন্যই বোধ করি যে আমাদের আশেপাশে যে বহুপ্রকারের বিভিন্ন বর্ণের বিহঙ্গম সব সময়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের নামকরণ করবার সময় ও ইচ্ছাটাও আমাদের হ'য়ে ওঠে নাই। আমি বাংলার অনেক গ্রামে অনেক সহরে ঘুরেছি। যেখানেই কোনও পাখীর স্থানীয় নাম জানতে চেষ্টা ক'রেছি প্রায়শঃই বিফল মনোরথ হ'য়েছি। ধরুন এই শালিকের কথা। ইংরাজ যার নামকরণ করেছেন The Common Mynah এবং

বৈজ্ঞানিক যার নাম দিয়েছেন *Acridotheres tristis tristis*. আমরা সাধারণতঃ তিন প্রকার শালিকের দর্শন পাই কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে এরা সবাই শালিক। এক পক্ষিতত্ত্ববিদ এদের ভিন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। গাঙ-শালিক ও গো-শালিক বর্ণবিন্যাস ও চালচলনে "শালিকের" চাইতে অনেক বিভিন্ন; কিন্তু এই পার্থক্যগুলি সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালী—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—নিতান্তই নিরেট। আমরা এই প্রবন্ধে The Common Mynahর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছি—কেননা শুধু "শালিক" বললে আমরা একেই বুঝি। তবে "গৃহ-শালিক" আখ্যায় বোধ হয় এর বর্ণনা সমীচীন হয়। বৈজ্ঞানিক একে "ফড়িং-খোর" acridotheres ব'লে বর্ণনা করেছেন। রস-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ধেমো শালিক" বলে যে প্রাণীর বর্ণনা করেছেন সেটি কিন্তু পক্ষিতত্ত্বের বিষয়ীভূত নয়।

শালিক স্বয়ং নীড় নির্ম্মাণ করে না। চতুর লোক প্রায়শঃই পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার পক্ষপাতী। চতুর শালিকের চরিত্রেও এ লক্ষণটা বেশ স্পষ্ট। গর্ত্তের মধ্যে বাসা করা শালিকের অভ্যাস। কিন্তু এই গর্ত্তটি সে নিজে খুঁড়ে খুদে নেয় না। কোনও "বসন্তবৈরী" বা কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত বাসা সে দখল ক'রে তার মধ্যে শুষ্ক তৃণ, ছিন্ন বস্ত্রের টুকরা, কাঠিকুটি, পালক, কাগজের টুকরা প্রভৃতির গদি তৈরী ক'রে তার উপর ডিম্বরক্ষা করে। চড়ুইয়ের বাসায় তাকে ঝুলতে দেখেছি—বাসার ভিতরে চড়ুই-দম্পতি অকথ্য ভাষায় চীৎকার করছে—কিন্তু নাছোড়বান্দা শালিক জবরদস্তি ক'রেই তার বাসা থেকে নীড়নির্ম্মাণের সরঞ্জাম কেড়ে নিয়ে গেল।

শালিকের অপরের প্রস্তুত গর্ত্তে বাসা রচনা করার এই অভ্যাসের মধ্যে পক্ষিতত্ত্বের একটা গূঢ় রহস্যের আভাষ পাওয়া যায়। বিখ্যাত শীকারী ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ সেলুস (Selous) সাহেব আন্দাজ করেন যে পাখীর এই অপরের বাসা দখল করার অভ্যাস হচ্ছে পরভৃত অবস্থার প্রথম স্তর। পাঠক জানেন যে কতকগুলি পাখী অপরের বাসায় ডিম্ব রক্ষা ক'রে সন্তান পালন করায়। কোকিল এইরূপ করে ব'লে তাকে আমরা "পরভৃত" বা "অন্যপুষ্ট" বলি। কিন্তু কোকিল সৃষ্টির আদি থেকেই এই রকম, না বিবর্ত্তনের ফলে এই রকম?

সেলুস বলেন যে প্রথম প্রথম পাখী পরের পরিত্যক্ত বাসায় ডিম পাড়ত। তারা দেখল যে এরূপ করলে নিজের বাসারচনা করার পরিশ্রমটা বেঁচে যায়। এই অভ্যাসের ফলে অনেক সময় পরিত্যক্ত নয় এমন বাসাতেও ডিম পেড়ে ফেলত। পরে গৃহস্বামীর আগমনে সে বাসা তাকে ছেড়ে দিতে হোত, কিন্তু তার ডিম সেইখানেই থেকে যেত এবং গৃহস্বামীর দ্বারাই সে ডিম ফোটান হ'ত ও বাচ্চা প্রতি-পালিত হোত। এই সহজ পন্থা ক্রমশঃ তার স্বভাবগত হ'য়ে পড়ায় নীড়রচনা, সন্তানপালন প্রভৃতি দুরূহ কাজের শ্রম ও উৎকণ্ঠা থেকে সে মুক্ত হোল।

সেলুস সাহেবের অনুমান যদি সত্য হয় তবে শালিককে আমরা পরভৃত অবস্থায় বিবর্ত্তনের প্রথম স্তরে দেখতে পাচ্ছি। সে পরের পরিত্যক্ত বাসায় আজ বাসা নির্ম্মাণ করছে। শুধু তাই নয়,—একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে তার ঘরের শয্যার আসবাব জোগাড় করার ইচ্ছাটাও যেন তার নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। কাঠিকুটি, ঘাস, ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা যেখানে সেখানেই পড়ে থাকে। এতৎসত্ত্বেও শালিককে দেখা যায় সে কোনও চড়াইপাখীর বাসা থেকে শয্যাদ্রব্য চুরি ক'রে কিংবা গায়ের জোরেই সংগ্রহ করছে। এইরূপ পরিশ্রম-বিমুখতার ফলে কালক্রমে শালিক যে পরভৃত হ'য়ে পড়বেনা তা বলা যায় না। তবে এটা অনুমানের কথা—সিদ্ধান্ত ব'লে পাঠককে আমি এ মত গ্রহণ করতে বলছি না।

শালিকের কলরব আমাদের পল্লীজনপদের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। হঠাৎ যদি দেশটা শালিকশূন্য হ'য়ে যায় তাহলে শুধু যে প্রাকৃতিক শোভার অঙ্গহানি হবে, তা নয়। শালিক আমাদের ক্ষেতখামারের ফল ও সবজি বাগানের অনেক উপকার করে। কেননা শস্যাদির অপকারী পোকামাকড়ই তার বেশীর ভাগ আহার্য্য। কৃষক যখন ক্ষেতে প্রথম লাঙ্গল দেয়—তখন লাঙ্গলের ফলায় উত্থিত মাটির সঙ্গে অনেক কীটপতঙ্গ পরিদৃশ্যমান হ'য়ে পড়ে। সেই সময় প্রায়ই দেখা যায় একদল শালিক মহানন্দে লাঙ্গলের পশ্চাৎ অনুসরণ করে উদরের তৃপ্তিসাধন করছে।

এই কারণে অন্য শালিকহীন দেশে শস্যের উপকারার্থ একে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আন্দামানে কারাগারস্থাপন ক'রে বন্দিদের দ্বারা চাষ করবার সময় শস্যের সহায়তাকারী পাখীর যখন দরকার হোল তখন শালিক নিয়ে গিয়ে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হোল। নিউজীল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, মরিসাস্, সুদূর স্যাণ্ডউইচ দ্বীপমালায় ও হনোলুলুতেও শালিককে নিয়ে ছাড়া হ'য়েছিল। একই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের অশিক্ষিত অজ্ঞ লোককে চালান দিয়ে ইংরাজ বিদেশে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর দুর্ব্যবহার ক'রেছেন—তাদের মানুষের অধিকার দেন নাই। কিন্তু শালিকের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠেন না। সে যেখানে গিয়েছে সেখানেই অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি করেছে ও তার আত্মপ্রতিষ্ঠাপরায়ণতার ফলে সে সব দেশের অন্য অনেক পাখীকে অতিষ্ঠ হ'য়ে দেশত্যাগ করতে হ'য়েছে। হনোলুলুতে শালিকের "বার্থকন্ট্রোলের" উপায় ভেবে ভেবে সেখানে সরকারের অনিদ্রারোগ জন্মে গিয়েছে।

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

২৫

বিশ্রামতরে আছে সেথা গিরি নগরীনিকটে নীচৈঃ নামে,
তোমারি পরশে পুলকে শিহরি' উঠিবে সে যে কদম্বদামে !
বারবনিতার রতিবিমর্দ্দগন্ধ উগারি' গুহা উহার
করে নগরের যুবকজনের যৌবনরতিরসপ্রচার।

২৬

বন-নদী-তীরে কাননে কাননে ফুটেছে কত-না যূথিকা-কলি,
বিশ্রামশেষে নব-জলকণা বরষিয়া তায় যেয়ো হে চলি';
ছায়াদানে হোয়ো ক্ষণ-পরিচিত কুসুম-চয়নকারিণীসনে,
কর্ণোৎপল মলিন যাদের কপোলের স্বেদ অপনয়নে।

২৭

উত্তরে যেতে এ-পথে তোমার কিছু ঘুর হবে, তা হোক্, তবু
উজ্জয়িনীর সৌধ-শিখরে নয়ন রাখিতে ভুলো না কভু;
বঞ্চিত হবে, যদি-না সেথায় পৌর-ললনাগণের সনে
চপলা-চমকে চকিত-চপল চাহনীতে লীলা চলে লোচনে।

২৮

বীচিবিক্ষোভে মুখর হংস-পংক্তি-মেখলা-ভূষণে সেজে,
আঘাতি' শিলায় বহিয়া লীলায় আবর্ত্ত-নাভি দেখাইবে যে;
পথে সেই নির্ব্বিন্ধ্যার প্রেমরসে নিয়ো ভরি' হৃদয়খানি,—
প্রিয়ের সমীপে বিলাস,—নারীর সেই ত প্রথম প্রণয়-বাণী !

২৯

আজি তটিনীর স্বল্প সে নীর হয়েছে বেণীর মতন ক্ষীণ,
তট-তরু হ'তে পলিত পর্ণ ঝরিয়া বর্ণ হ'লো মলিন।
এ-হেন বিরহ দশায় সে তব সৌভাগ্যই করে প্রমাণ;—
ওহে চিরাগত, আজি ও তনুর তনিমা ঘুচা'তে করো বিধান।

৩০

পাবে অবন্তী,—গ্রাম-বৃদ্ধেরা কহে যেথা উদয়ন-কাহিনী,
পরে পাবে পুরী পূর্ব্বকথিত অপূর্ব্বশ্রী উজ্জয়িনী;—
পুণ্যের ফল ক্ষীণ হয়ে এলে স্বর্গ-বাসীরা আসি' ভূতলে
সৃজিল উজল স্বর্গখণ্ড যেন অবশেষ-পুণ্যবলে।

৩১

অস্ফুট-মৃদু মদির-মধুর সারস-কূজন দূরে বহিয়া
প্রত্যুষে সেথা বিকচ-কমল-পরিমল-রসে ভরিয়া হিয়া
শিপ্রার বায় শরীর জুড়ায়!—মিনতি জানায়ে দয়িত যেন
প্রিয়ার দেহের সম্ভোগখেদ চাটুবচনেই হরিছে হেন!

৩২

জালোৎগীর্ণ গন্ধধূপের ধূমে হবে তুমি পুষ্টকায়,
বান্ধবস্নেহে গৃহময়ূরেরা নৃত্যোপহার দেবে তোমায়;
রূপসী-রমণী-পাদরাগ-আঁকা কুসুম-সুরভি হর্ম্ম্য-তলে
উজ্জয়িনীর সম্পদ হেরি' ক্লান্তি হরিয়া যেয়ো হে চলে'।

৩৩

প্রভুর কণ্ঠকান্তি তোমাতে হেরিয়া, সাদরে প্রমথগণ
চেয়ে র'বে, তুমি ত্রিভুবনগুরু-মহাদেবধামে যাবে যখন;
সেথা আছে বন জলকেলিরত যুবতীর স্নানে সুরভীকৃত,
গন্ধবতীর উৎপল-রজোগন্ধি পবনে হিল্লোলিত।

৩৪

মহাকালধামে যাও যদি, মেঘ, সন্ধ্যা ভিন্ন অন্য কালে,
রহিয়ো সেথায় যাবৎ সূর্য্য না যায় দৃষ্টি-অন্তরালে;
শিবের সন্ধ্যারতির শ্লাঘ্য ঢক্কা-নিনাদ তুলিয়া তথা
গুরু-গম্ভীর তোমার ধ্বনির লভিবে চরম সার্থকতা।

৩৫

নৃত্যের তালে নর্ত্তকীদের কটিতে কাঞ্চী বাজিবে যবে,
লীলায় ঢুলায়ে রত্ন-চামর ক্রমে দু'টি কর ক্লান্ত হবে,—
প্রণয়ক্ষতে লভি' তোমা হ'তে সুখকর নব-সলিলকণা
মধুকর-শ্রেণী-দীর্ঘ চাহনী হানিবে তোমায় বারাঙ্গনা।

৩৬

তাণ্ডবকালে শোভিয়ো শিবের উন্নত-ভুজ-বনের আগে
মণ্ডলাকারে, মণ্ডিত হয়ে নবজবারুণ সন্ধ্যারাগে;—
রক্তসিক্ত গজাজিনকরে ধারণের সাধ মিটিবে তাঁর,—
স্নিগ্ধ শান্ত নয়নে ভবানী চাহিবে, ভক্তি হেরি' তোমার!

৩৭

রাত্রে নিবিলে আলো রাজপথে, সূচিভেদ্য সে অন্ধকারে
উজ্জয়িনীর রমণীরা চলে প্রিয়গৃহতলে প্রেমাভিসারে;
পথটি তাদের দেখায়ো তড়িতে,—নিকষে কনক-রেখার পারা;—
বরিষণে আর গরজনে বেশী মুখর হোয়ো না,—ভীরু যে ত'রা!

৩৮

সুচির-বিলাসে আলসে এলায়ে পড়িলে তোমার বিজলীপ্রিয়া,
যেথা গৃহচূড়ে ঘুমায় কপোত, সেথা সে-যামিনী সুখে যাপিয়া,
উদিলে তপন বাকী পথটুকু পার হয়ে তুমি যেয়ো হে পরে,—
বন্ধুর কাজ বরণ করিয়া বৃথা বিলম্ব কেহ কি করে?

৩৯

তখন প্রভাতে খণ্ডিতা-নারী-নয়নসলিল মুছায়ে দিতে
যাবে প্রণয়ীরা; তুমি তপনের পথখানি ছেড়ে দিয়ো ত্বরিতে;—
নলিন-বদন হ'তে নলিনীর হরিতে অশ্রুশিশিরনীর
সে-ও যাবে; যদি কর-রোধ করো, নিদারুণ ক্রোধ হবে রবির!

৪০

গম্ভীরানদীনির্ম্মলবারি, প্রসন্ন নারীহৃদয় প্রায়,
তোমার স্বভাব-সুন্দর ছায়া-আত্মা প্রবেশ লভিবে তা'য়;
চটুলশফরীলীলা, সে যে আহা, কুমুদশুভ্র দৃষ্টি তা'র,—
উপেক্ষা করি' ব্যর্থ কোরো না ধীরতায় হয়ে নির্ব্বিকার।

৪১

বেতসের শাখা-বাহুতে ধরিয়া করিয়া ঈষৎ আকর্ষণ,
নদীকটিতট করিয়া প্রকট হরিয়া সলিল-নীলবসন,
আবেশে অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া কেমনে চলিয়া যাবে, হে সখে?
রতিসুখ জানি' বিবৃতজঘনা ললনা তাজিতে পারে বলো কে?

৪২

তব বরিষণে স্ফীত এ মেদিনী, সৌরভে যা'র মধুর ঘ্রাণ,—
শুণ্ড-কুহরে সুন্দর স্বরে সৃজিয়া করীরা করে যা' পান,—
যাহার পরশে উঠিবে পাকিয়া বন্য উডুম্বর সকল,—
দেবগিরি-পথে নিয়ে তোমার বহিবে সে বায়ু মৃদু শীতল।

৪৩

সেথায় স্কন্দ চির-অধিবাসী,—পুষ্পমেঘের রূপে হে তাঁরে
করাইয়ো স্নান মন্দাকিনীর বারিসিঞ্চিত পুষ্পাসারে ;
ইন্দ্রসৈন্য-রক্ষার তরে চন্দ্রশেখর বহ্নি-মুখে
সূর্য্যবিজয়ী তেজোময় ঐ কার্ত্তিকেয়েরে সৃজিলা সুখে।

৪৪

সন্তানস্নেহে, স্বতঃস্খলিত তেজোমণ্ডিত পুচ্ছ যা'র
ভবানী নীলোৎপল পরিহরি' করেন কর্ণে অলঙ্কার,
হরশশিলেখাধৌতাপাঙ্গ কার্ত্তিকেয়ের সেই ময়ূরে
নাচাইয়ো, গিরি মন্দ্রিত করি' গুরু-গর্জ্জনে গভীর স্বরে।

৪৫

শরবনভব ষড়াননে পূজি' যাবে যবে ঐ পথটি ধরে',
বীণাধারী যত সিদ্ধমিথুন বৃষ্টির ভয়ে দাঁড়াবে সরে'।
গোমেধযজ্ঞসম্ভূতা নদী চর্ম্মন্বতী বহে ধরায়
রন্তি-দেবের কীর্ত্তি-লহরী ; তুমি অবতরি' পূজিয়ো তা'য়।

৪৬

কৃষ্ণের শ্যাম-কান্তি হরিয়া নেমে এলে তুমি হরিতে বারি,
নয়ন মেলিয়া রহিবে চাহিয়া গন্ধর্ব্বাদি গগনচারী ;
দূর হ'তে ক্ষীণ মনে হবে সেই বিশাল-প্রবাহ নদী সলিল,—
ধরার মুক্তাহার যেন. মাঝে সুবৃহৎ মণি ইন্দ্রনীল।

৪৭

পার হয়ে নদী যেয়ো দশপুরে ; হে মেঘ, তোমার রূপ নেহারি'
চেয়ে র'বে সেথা সকৌতূহলে ভ্রূলতা-বিলাসে নিপুণা নারী ;
নয়ন-পক্ষ্ম তুলি' কটাক্ষে হানিবে কৃষ্ণ-শুভ্র ভাতি—
যেন চঞ্চল কুন্দ-কুসুমে সঞ্চরমান ভ্রমর-পাঁতি।

৪৮

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে পরে তুমি ছায়ারূপে করি' সঞ্চরণ
ক্ষত্রনিধনচিহ্নিত ভূমি কুরুক্ষেত্রে কোরো গমন ;
গাণ্ডীবী সেথা তীক্ষ্ণ সায়কে লুটাইলো কত নৃপতি-শির,—
ধারা-বরিষণে তুমিও যে-দশা করো কত শত কমলিনীর !

(ক্রমশঃ)

খেলাঘর

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

গ্রামে ঘরে চিত্ত-চাঞ্চল্যকর, চমকপ্রদ ঘটনা বড় বেশী ঘটে না। বছর পনেরো পূর্ব্বে তারক চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কলেরায় মারা যায়। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি নাবালক শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া গ্রামের প্রত্যেক দ্বারে ঘুরিয়াও তারক স্ত্রীর সৎকার করিবার লোক সংগ্রহ করিতে পারে নাই। শেষে ভোরের দিকে নিজেই স্ত্রীর মৃতদেহ বুকে করিয়া গ্রামের মাঠেই কোনোরূপে দাহকার্য্য সম্পন্ন করে। তাঁহার স্ত্রী অন্তিমে গঙ্গা পান নাই।

ঘোঁট পড়িয়াছিল সেই বছর। সমাজপতির দল তারকের এই অহিন্দু আচরণ ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাহারা শ্রাদ্ধের সময় ইহার শোধ তুলিবার জন্ম ভিতরে ভিতরে পরামর্শ করিতে লাগিল। এই দশটি দিন তাহাদের যেন আর কাটিতে চাহিতেছিল না। বৃদ্ধের দল যুবকদের শ্রাদ্ধ-দিবস পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিবার পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা কয়েকবারই তারকের বাড়ীর আনাচে-কানাচে হৈ চৈ করিয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যাহার পত্নীর শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার জন্ম এত আয়োজন, না পাওয়া গেল তাহার দেখা, না পাওয়া গেল কোনো সাড়া। শ্রাদ্ধের দিন সকালে সবিস্ময়ে দেখিল, তারকের বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড বড় একটা তালা ঝুলিতেছে। সমাজপতিদের এত আয়োজন পণ্ড করিয়া তাহারা পিতা পুত্রে যে কোথায় সরিয়া পড়িল আজ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গত পনেরো বৎসর এই কাহিনী রোমন্থন করিয়াই গ্রামের লোকে কোনোরূপে দিন যাপন করিয়া আসিতেছে। এমন সময় আর একটি ঘটনায় গ্রামের বাতাস গরম হইয়া উঠিল,—ছেলেবুড়ার আহারনিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম।

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো ছেলে বলিয়া গ্রামে একটা খ্যাতি ছিল। ইস্কুলের এবং কলেজের পরীক্ষাগুলি ভালো করিয়া পাশ করিয়া সে সম্প্রতি কোনো কলেজে অধ্যাপকের পদ খালি হইয়াছে কি না খবরের কাগজে তাহারই সন্ধান করিতেছিল। এমন সময় অকস্মাৎ দৈব-দুর্ব্বিপাক!

একদিন সকালে দেখা গেল বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী অমলার দ্বার তখনও অর্গল বদ্ধ। এত বেলা পর্য্যন্ত তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে না দেখিয়া বিশ্বেশ্বরের বিধবা জননী আনন্দময়ী অমলার কক্ষদ্বারে গিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। গত কয়দিন হইতেই পুত্রের সঙ্গে বধুর মনোমালিন্য চলিতেছে এ সংবাদ তিনি রাখিতেন। তাই আর বিশেষ জিদ না করিয়া নিজের কাজে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বেলা এগারোটা বাজিয়া গেলেও যখন অমলা দ্বার খুলিল না, বা বাহিরে আসিল না, তখন আনন্দময়ী সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অমলা বড়লোকের একমাত্র কন্যা, অত্যন্ত জেদী। তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। আনন্দময়ী এ দিকে বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু কথাটা সে তেমন গায়ে মাখিল না। অগত্যা সমস্ত কাজ ফেলিয়া তিনিই আবার বধুর কক্ষে ছুটিলেন, কিন্তু বহু ডাকাডাকি করিয়াও কোনো উত্তর মিলিল না। দরজায় কান পাতিয়া শুনিলেন, ঘর একেবারে নিস্তব্ধ; নিশ্বাসপতনের শব্দ পর্য্যন্ত নাই। সেই নিস্তব্ধতায় তাঁহার বুক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—ওরে বিশু, ছুটে আয়!

বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া আসিল। ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে উভয়েরই বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। অমলা বহু পূর্ব্বেই মারা গেছে। তাহার হিম-শীতল দেহ একেবারে কাঠ হইয়া গেছে। আনন্দময়ী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। বিশ্বেশ্বরের যেন কিছুতে বিশ্বাস হইতেছিল না। সে বারবার অমলার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যেই ঘটনাটি সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পাড়ার মহিলাগণ এক এক করিয়া সমবেত হইয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বাড়ীটি মুখর করিয়া তুলিল। কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্যে এই সান্ত্বনা তাহাদের একজন সেই যে শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, তেমনি

নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, আর একজন ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

ওদিকে তারিণী চৌধুরীর বালাখানায় তখন জোর পরামর্শ-সভা বসিয়াছে, এই যে দিনে দুপুরে স্ত্রীহত্যা হইয়া গেল ইহার প্রতিকার কি। নটবর হালদার বলিল, তাহার স্ত্রী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন অমলার গলায় লাল দাগ। অমলাকে যে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে এবিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। কিন্তু তারিণী চৌধুরী চুটাইয়া প্রজা ঠেঙ্গাইয়া এবং সুদের দায়ে খাতককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া চুল পাকাইয়াছেন। নটবর হালদারকে তিনি চেনেন, বিশ্বেশ্বরকেও চেনেন। কথাটা তিনি মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও প্রকাশ্যে বলিলেন, - তা'হলে কি করা যায়?

এদিকে হিতসাধন মণ্ডলীর ছেলের দল কোমরে গামছা বাঁধিয়া বিশ্বেশ্বরের বাড়ীতে হাজির হইল। এই দলটি বিশ্বেশ্বরের নিজের হাতে গড়া। দু'চারিজন কলেজে পড়ে, বাকী সব ইস্কুলের ছাত্র। গুণেন্দ্র আসিয়া বিশ্বেশ্বরকে সান্ত্বনা দিতে বসিল। বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,— ও সব কথা পরে শুনবো ভাই। আপাততঃ সৎকারের আয়োজনটাই আগে করা কর্ত্তব্য!

তাহাদের আর কিছুই বলিতে হইল না। দশ-বারোজন ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে মৃতদেহ উঠানে নামাইল।

এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে তারিণী চৌধুরীর বালাখানায় পৌঁছিল। নটবর হালদারের দল রুখিয়া উঠিল। পুলিশ আসিবার আগে তাহারা কিছুতেই লাস দাহ করিতে দিবে না। তারিণী চৌধুরী চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। নটবরকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,— ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর চেয়ে না করানোই ভালো। লাস দাহ করুক ওরা, বুঝেছ?

কথাটা চট করিয়া নটবরের মনে লাগিল। তাহার দল রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুঁচ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তারিণী চৌধুরী বলিলেন,—লাস চলে গেলেই থানায় খবর পাঠাবে, বুঝেছ নটবর? বিশ্বেশ্বরের শ্বশুর বাড়ীতেও আর একটা খবর পাঠানো দরকার বোধ হয়।

এই কথাটা এতক্ষণ কাহারও মনেই হয় নাই। বিশ্বেশ্বরের শ্বশুর বেশ ধনী লোক। তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। নটবর সেইমত ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া গেল। সেই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট; কিন্তু তারিণী চৌধুরীর হুকুম না লইয়া কোন কাজ করে না।

পরের দিন পুলিশ এবং সৎকারকারী ছেলের দল প্রায় একই সঙ্গে গ্রামে পৌঁছিল।

কাল সমস্ত দিনরাত্রি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে জল্পনা, কল্পনা ও অনুমানের বিরাম ছিল না। কিন্তু পুলিশ আসার ব্যাপারটি এতই সঙ্গোপনে ও সু-কৌশলে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সকলেই ইহাতে বিস্মিত হইয়া উঠিল।

বেলা তখন ন'টার বেশী হইবে না, প্রকাণ্ড একটা লাল ঘোড়ায় চড়িয়া বড় দারোগা এবং তাহার পিছনে-পিছনে একদল কনেষ্টবল আসিয়া বিশ্বেশ্বরের বহির্দ্বারে সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে গোটা কয়েক চৌকিদার এবং স্বয়ং নটবর বাবুও উপস্থিত হইল।

বিশ্বেশ্বর তখন মায়ের ঘরে তাঁহার পা'তলার দিকে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পুলিশের আসার সংবাদ পাইয়া আনন্দময়ী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কোনো কাজেই সহজে ব্যস্ত হইয়া ওঠা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। উদ্বিগ্নমুখে, অথচ শান্ত কণ্ঠেই তিনি শুধু বলিলেন,— পুলিশ আবার কেন?

তাহার গৃহে পুলিশের শুভপদার্পণের হেতু কি তাহা বুঝিতে বিশ্বেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু মায়ের উদ্বেগ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় শুধু বলিল,—দেখি তো।

ঠিক সেই সময় দূরে ধ্বনি উঠিল, বল হরি, হরিবোল। আনন্দময়ী আবার নির্জ্জীবের মতো শুইয়া পড়িলেন।

বিশ্বেশ্বর বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে একজন চৌকিদার দারোগার ঘোড়াটি সামনের একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে তখন ছেলের দলের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বর ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় একখানা চেয়ার বাহির করিয়া দিয়া দারোগাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

দারোগা কিন্তু এই আতিথ্যের জন্য কোনো ধন্যবাদ দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে

চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নাম বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ?

—হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রী অকস্মাৎ মারা গেলেন কিসে ? দারোগার প্রশ্ন করিবার উদ্ধত ভঙ্গিতে বিশ্বেশ্বর উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বলিল,—হার্ট ফেল ক'রে।

—এ তো আপনার অনুমান মাত্র ?

—অনুমান বই কি।

উপস্থিত সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া দারোগা প্রশ্ন করিলেন, - তিনি যে আত্মহত্যা করেন নি, তারই বা প্রমাণ কি ?

—কোনো প্রমাণই নেই। তবে সে রকম সন্দেহ করারও কোনো কারণ উপস্থিত হয় নি।

দারোগা অকস্মাৎ তাঁহাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন,—কারণ উপস্থিত হয়েছে। আমি এমন প্রমাণ পেয়েছি যে, আপনারা তাঁর সঙ্গে বরাবর অসদ্ব্যবহার করতেন।

এক মুহূর্ত্ত তাঁহার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—এ আপনার অনাবশ্যক কৌতূহল। অন্য প্রশ্ন থাকে তো করুন, নইলে আমার অন্য কাজ আছে। বলিয়া বিশ্বেশ্বর তাঁহার দিকে পিছন ফিরিল।

—কাজ আমাদেরও আছে, বুঝেছেন মশাই ? এখানে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতেও আসিনি, রসিকতা করতেও আসি নি।

বলিয়া দারোগা এমনভাবে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পানে চাহিতেই বিশ্বেশ্বরের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন কথাই বলিল না, যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

ওপাড়ার হরিবলা ঘটকের কৌতূহল জিনিষটা অত্যন্ত প্রবল। মেরুপ্রদেশ যেমন ছয়মাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সে-ও তেমনি ছয়মাস ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন থাকে। সেই অবস্থাতেই সে বহু শ্রম করিয়া একগাছি লাঠিতে ভর দিয়া কোনো রূপে ঠুক ঠুক করিতে করিতে দারোগা দেখিতে আসিয়াছিল। এই দারোগার বিশেষত্ব গোঁফজোড়াটি। মোম দিয়া মাজা সূক্ষ্মাগ্র এক জোড়া গোঁফ কম্পাসের কাঁটার মতো ঠোঁটের উপর আলগাভাবে বসানো। স্থান কাল ঘটনা বিস্মৃত হইয়া হরিবলা একদৃষ্টে সেই গোঁফ জোড়াটির পানেই চাহিয়া ছিল। দারোগা অকস্মাৎ তাহারই পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—কি হে, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জানো ?

সে বিশাল প্লীহা এবং জ্বরের কম্প লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এ বিষয়ে কিছুই জানে না। কিন্তু দারোগার ভারি কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতরটা এমন ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল যে, জানি না বলিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিতে পারিল না। হরিবলা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক জন লোক চক্ষের পলকে ভিড়ের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কোনো লোককে অন্য কেহ ভয় করিতেছে জানিতে পারিলে তাহার মূল্য তাহার নিজের কাছেই অসম্ভবরূপে বাড়িয়া ওঠে। দারোগার তাহাই হইল। তিনি দাঁত মুখ খিঁচাইয়া অত্যন্ত অভদ্রভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—বৌটাকে যে আপনিই মেরে ফেলেছেন, তারও প্রমাণ আমি পেয়েছি।

বিশ্বেশ্বরের মুখচোখ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,—আপনি যতক্ষণ না ভদ্রভাবে কথা কইবেন ততক্ষণ কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না।

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। দারোগা একেবারে সমস্ত ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—খবরদার বল্‌ছি, যাবেন না। বলিয়াই একটা চৌকিদারকে মধুর সম্বন্ধে আপ্যায়িত করিয়া বিশ্বেশ্বরকে তাহার জিম্মা করিয়া দিলেন।

নটবর বারান্দার এক কোণে চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। এইবারে চোখ মেলিয়া সকলের মুখের পানে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

এতক্ষণে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। ভিড়ের ওদিকে দেখা গেল, কয়েকটি সৎকারকারী ছেলেকে চুপি চুপি তাহাদের অভিভাবক একরকম জোর করিয়াই ঠেলিতে ঠেলিতে বাহিরে লইয়া গেল। গেল না কেবল গুণেন্দ্র। কেবল তাহারই কোনো অভিভাবক তাহাকে সামলাইবার জন্য আসে নাই। আসিলেও বিশেষ ফল হইত না।

এতক্ষণ নিঃশব্দেই সে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এইবার আগাইয়া আসিয়া দারোগাকে প্রশ্ন করিল,—কিন্তু উনি যে ওঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন আপনিই বা তার কি প্রমাণ পেয়েছেন শুনি?

দারোগা মহাশয় চটিয়াই ছিলেন, একেবারে চড়াসুরে জবাব দিলেন,—তোমার সে খবরে কাজ কি হে, জেঠা ছেলে?

গুণেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—কাজ আছে বই কি, আমি কি অকারণেই জিজ্ঞেস করছি।

বিশ্বেশ্বর তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া রাগে ফুলিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া গুণেন্দ্র আবার হাসিয়া বলিল,—আপনি মিথ্যে রাগ করছেন বিশুদা। চোর ডাকাতের সঙ্গে মিলে মিশে ওঁদের ভদ্রতা-জ্ঞানই কমে গেছে,—নিজেদের ভদ্রতা সম্বন্ধেও জ্ঞান কমেছে, অন্যের ভদ্রতা সম্বন্ধেও কমেছে।

দারোগা মহাশয়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে এত বড় রূঢ় কথা ইতিপূর্ব্বে কেহ বলিতে সাহসী হয় নাই। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন এবং সমাগত কনেষ্টবল ও চৌকীদারগণও কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় নটবর শশব্যস্তে দারোগার কানে কানে বলিয়া গেলেন, ছেলেটি সুশীল বাবু এস, ডি, ওর ছেলে।

বাস্। দারোগার রাগ জল হইয়া গেল। তিনি প্রাণপণে প্রফুল্ল হইবার চেষ্টা করিয়া যথাসাধ্য স্মিত হাস্যে বলিলেন,—তুমি সুশীল বাবুর ছেলে?

সুশীল বাবুর ছেলে কিন্তু ইহাতে গলিয়া গেল না। সে আপনার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—আপনি কি প্রমাণ পেয়েছেন তাই বলুন।

দারোগা পুনরায় মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—গভর্ণমেণ্টের কাজে বাধা দেওয়া আজকালকার ছেলেদের একটা রোগে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তোমার বাবা গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে, তোমার তা সাজে না।

এবারে গুণেন্দ্র একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—কি গভর্ণমেণ্টের কাজ বলুন তো? নিরীহ লোককে অপমান করা? যার দোষ এখনও পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নি তাকে লাঞ্ছিত করা?

গুণেন্দ্র আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু দারোগা বৃথাই পনেরো বৎসর চাকুরী করিতেছেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—চলুন নটবর বাবু, এখন ওঠা যাক্। বিশ্বেশ্বর বাবু, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

দারোগা সদল বলে উঠিয়া গেলেন। ইহার পর সমস্ত দিন ধরিয়া নানা প্রকার আপোষের কথা চলিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর একটি প্রস্তাবেও রাজি হইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অগত্যা দারোগা তাহাকে কোমরে দড়ি দিয়া মহাসমারোহে থানায় লইয়া গেলেন। সেখান হইতে মহকুমা ও পরিশেষে দায়রা আদালতে তাহাকে হাজির করা হইল।

আদালতে বিশ্বেশ্বরের পক্ষ হইতে মামলা চালাইবার কোনো ত্রুটি হইল না। কিন্তু তাহার পক্ষের উকিল তাহার কাছ হইতে কোনোই সাহায্য পাইলেন না। অমলার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সত্যই কোনো কথা সে জানে না। তাহার সহিত অমলার যে প্রায়ই বনিত না ইহাও সে অস্বীকার করিল না। তাহার পক্ষের বলিবার কথা এই যে সে, অমলাকে হত্যা করে নাই, বা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যও করে নাই। হত্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে এবিষয়ে কিছুই জানিত না। সে যতটুকু জানিত ততটুকু মাত্র বলিল; তাহার এতটুকু বেশী বলিতে নিজেও সম্মত হইল না, উকিলকেও বলিতে দিল না। সে যে হত্যা করে নাই, এ বিষয়ে কোনো সাক্ষীও তাহার ছিল না। একজন মাত্র সমস্ত ঘটনা জানেন, তিনি তাহার মা। তাঁহাকে সে প্রাণান্তেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে রাজি হইল না।

পক্ষান্তরে নটবরের দল এমন সব চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিল যাহা একেবারে অকাট্য। বিশ্বেশ্বরের উকিল ছটফট্ করেন। প্রধান সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়া গেল ঘটনার দিন রাত্রি দুইটার সময় অমলার চীৎকার সে শুনিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের বাড়ীর কাছেই তাহার বাড়ী। নিশুতি রাত্রে সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতেছে। এমন ঘটনা উহাদের বাড়ীতে নিতই হয়, সেজন্য সে ব্যাপারটাকে তেমন গ্রাহ্য করিল না।

বিশ্বেশ্বরের উকিল তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, এই সঙ্গীকে কি জেরা করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বরের তখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। সে জড়িত চক্ষু মেলিয়া উকিলকে বলিল,– এখানে বই-টই পড়ার সুবিধা হয় না?

উকিল হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, আসামী কি চায়?

বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—আদালতে বসিয়া থাকিতে তাহার বড় ঘুম পায়। যদি বই পড়ার অনুমতি দেন, বড় ভালো হয়।

জজ সাহেব একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর হইতে সাক্ষীরা একে একে আসিয়া হলপ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে তাহাই বলিয়া যায়, কিছুই গোপন করে না। আসামী কাঠগড়ায় একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া বই পড়ে। কোন সঙ্গীকেই তাহার জেরা করিবার কিছুই নাই। উকিল তবু হাল ছাড়েন না। তিনি প্রাণপণে সঙ্গীদের জেরা করেন। কিন্তু ইহারা সাক্ষ্যপ্রদান বিষয়ে এতই পক্ক যে বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না। আদালত ভাঙ্গিলে বিশ্বেশ্বর বই মুড়িয়া হাজতে চলিয়া যায়।

সওয়ালজবাবের দিন আসামী পক্ষের উকিল শুধু এইটুকু বলিলেন যে, আসামী মার্জ্জিতরুচি, শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়। কিন্তু সে যে স্ত্রীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ইহা আসামীকে দেখিলে মোটেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আসামীর স্ত্রীর মৃত্যু রহস্যজনক সন্দেহ নাই। তথাপি আসামী যে তাঁহাকে হত্যা করে নাই, করিতে পারে না ইহা নিঃসন্দেহ। মৃতা হয় আত্মহত্যা করিয়াছেন, নয় ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। আসামীর নিজের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেন নাই, করিবার কোনো কারণও উপস্থিত হয় নাই এইরূপ অবস্থায় আসামীকে অব্যাহতি দেওয়াই উচিত।

আসামীর দার্শনিক ঔদাসীন্য, তাহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া জজেরও সেইরূপই মনে হইয়াছিল। কিন্তু অতগুলা অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর আসামীকে অব্যাহতি দিতে তিনি পারিলেন না। আসামীর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। বিশ্বেশ্বর যেমন বই পড়িতেছিল, তেমনি পড়িতে লাগিল। দণ্ডাদেশ শুনিয়া তাহার বহু অনুরক্ত বন্ধু ও আত্মীয় হাহাকার করিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া গুণেন্দ্রকে কাছে ডাকিতেই সে ছুটিয়া আসিয়া রেলিং-এর ওদিকে হইতে তাহার দুটি হাত জড়াইয়া ধরিল। বিশ্বেশ্বর বোধ হয় দণ্ডাদেশ শুনিতেই পায় নাই। সে চিরদিনের মতো পরম গম্ভীরভাবে হাতের বইখানি দেখাইয়া গুণেন্দ্রকে বলিল,—পড়েছ? বড় ভাল বই, পড়ে দেখো।

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই দুইজন কনেষ্টবল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

২

সেণ্ট্রাল জেলে যখন বিশ্বেশ্বর আসিয়া পৌঁছিল তখন সূর্য্য অস্ত যাইবার আর বেশী বাকী নাই। জেল-গেটে ওজন লওয়ার ও দেহ খানাতল্লাসীর পর তাহাকে একজন কনেষ্টবল এমনভাবে বীরদর্পে চুয়াল্লিশ নম্বরে লইয়া গেল যে সে যেন এইমাত্র একটা মস্ত বড় যুদ্ধ জিতিয়া আসিল।

তখনও কয়েদীরা ঘরের মধ্যে বন্ধ হয় নাই। সন্ধ্যা হইবার আর বেশী দেরী নাই। এই সামান্য কয়টি মুহূর্ত্তকে তাহারা যেন অসীম আগ্রহে উপভোগ করিতে চায়। বিশ্বেশ্বরকে তাহাদেরই দ্বারপথে আনিতে দেখিয়া চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর কয়েদীরা নবসঙ্গীসম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে সকল কয়েদীই গভীর ঔৎসুক্যে তাহাকে বিবিধ প্রকার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এক বর্ণও না বুঝিতে পারিয়া বিশ্বেশ্বর যেমন নীরবে পথ চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে পৌঁছিবামাত্র সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে ওই এক মিনিটের জন্য। তাহার শান্ত অথচ গম্ভীর মুখশ্রী, কমনীয় দেহ এবং দৃঢ় পদক্ষেপ দেখিয়াই বুঝিল, এই লোকটি তাহাদের কেহ নয়। তাহাদের চোখে-চোখে একটা উপেক্ষার হাসি খেলিয়া গেল। কেবল একটি লোক তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। সে পরম সমাদরে নিজের পাশটিতে তাহার কম্বল বিছাইয়া দিয়া এবং আর একটি কম্বল গায়ে দিবার জন্য ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিল,—চট্ কোরে নীচে থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে শুয়ে পড়ুন। এখুনি দরজা বন্ধ হবে। আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি।

ক্ষুধা বিশ্বেশ্বরের ছিল না। সমস্তদিনের পথশ্রমে ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। সে কোনোমতে নীচ হইতে হাতমুখ মাথা ধুইয়া আসিয়া সটান শুইয়া পড়িল। সকলের খাওয়া অনেক আগেই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাশের লোকটি অনেকদিনের পুরানো অধিবাসী। সে সম্ভবত সামান্য কিছু আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু বিশ্বেশ্বর আর চোখ মেলিল না। ওই একখানা ঘরের জন পঁচিশেক কয়েদীর বিবিধ কলরবের মধ্যেই সে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরবেলা ঘণ্টি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। আর সকলেই তখন উঠিয়া আপন আপন কম্বল গুটাইতেছে। সেও কম্বল গুটাইতে লাগিল। পাশের লোকটি তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—অমন কোরে নয়। দিন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

কাল সন্ধ্যার ম্লান আলোয় বিশ্বেশ্বর তাহার পানে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। তাহার অমন শান্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভাবিতেই পারে নাই লোকটির চেহারা অমন বিশ্রী। গায়ের তামাটে মলিন রঙের উপর মাছের আঁসের মতো দাগ, মুখে মেছেতা, চোখের চারিধারে কালি পড়িয়াছে, হাসিলেই অপরিষ্কার দন্তশ্রেণী বাহির হইয়া পড়ে।

ইহারই পানে সে চাহিয়া ছিল। এমন সময় কালো বেঁটে, বলিষ্ঠগঠন একটি লোক আসিয়া তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া, ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল,—এই তোমার নাম কি?

—বিশ্বেশ্বর বন্—

কিন্তু জেলে বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনোই মর্য্যাদা নাই। লোকটি তাহার উপাধি শুনিবার কোনো আগ্রহ না দেখাইয়া আবার তেমনি ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল,—খুন?

বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

—মেয়েমানুষ?

বিশ্বেশ্বর সায় দিতেই লোকটা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাহার পিঠে দুটা চাপড় দিয়া বলিল,—ঠিক হ্যায়।

বলিয়াই লোকটা নীচে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বোধ হয় বিশ্বেশ্বরের কমনীয় মুখখানি দেখিয়া তাহার ভালো লাগিয়াছিল। সে তখনই ফিরিয়া আসিয়া একটা বিড়ি বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—দেশলাই আছে?

বলিয়া দেশলাই লইবার জন্য তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া তাহার পাশের লোকটির পানে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিল,—কি বাবা, নবী নওয়াজ, আসামাত্রই?

নবী নওয়াজ লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইয়া লইল। বেঁটে লোকটি আর একবার নবী নওয়াজের পানে কুশ্রী ইঙ্গিত সূচক হাসি হাসিয়া বিশ্বেশ্বরের পানে ফিরিয়া চাহিয়া প্রসারিত হাতের দুইটি আঙুল অধৈর্য্যভাবে নাড়িতে-নাড়িতে বলিল,—কই? দেশলাই?

ইহাদের হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া বোকার মতো একবার ইহার পানে, একবার উহার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেছিল। তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছিল না। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—নাই।

ধ্যেৎ! লোকটা বিরক্ত হইয়া গড়্ গড়্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর বিড়ি অন্যমনস্কভাবে ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

নবী নওয়াজ একবার আড় চোখে তাহার পানে চাহিয়া যেন আপন-মনেই বলিল,—এইবার উঠতে হয়েছে।

শীতের রাত্রি। তখনও ভোর হইতে অনেক বাকী। দূরে নেড়া অশ্বত্থ গাছটি বিশীর্ণ, শিরাবহুল বৃদ্ধের মতো অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শীতে থুর্ থুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া চলিতে চলিতে বলিল,—হ্যাঁ। চলুন।

নবী নওয়াজ হাসিয়া বলিল,—আপনার সম্পত্তি রেখে যাচ্ছেন কার জন্যে?

বিশ্বেশ্বর অপ্রস্তুতভাবে জড়ানো কম্বলের পুঁটলিটি বগলে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইল।

নবী নওয়াজ একটুক্ষণ তার পানে চাহিয়া থাকিয়া চোখ ইসারায় পূর্ব্বের বেঁটে লোকটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল,—কোকেন।

ইসারাটুকু বিশ্বেশ্বর ঠিক বুঝিল না। বিস্মিত হইয়া বলিল,—কোকেন কি?

নবী নওয়াজ চারিদিকে সন্তর্পণে চাহিয়া লইল। সবাই তখন নীচে নামিয়া গিয়াছে। সে বিশ্বেশ্বরের আরও কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার কম্বলের জামাটার বোতাম নাড়িতে নাড়িতে চুপি চুপি বলিল,—যে লোকটির সঙ্গে এক্ষুনি কথা কইলেন না?—নাটু ওর নাম,—লোকটা কোকেন-চোর। ভীষণ লোক!

ঠিক সেই সময় নাটু তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে উঠিতে নবী নওয়াজের পানে ফিক্ করিয়া হাসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ঠিক হ্যায়! ঠিক হ্যায়!

নবী নওয়াজ তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুতভাবে বিশ্বেশ্বরকে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

সুমুখের উঠানের উপর একটা বেদীর মতো থানিকটা উঁচু করা। তাহারই উপর অগভীর ছয়টি নালী। কল খুলিয়া দিলেই তিনটি নালী জলে ভর্ত্তি হয়। এই সামান্য জলেই অত লোকের স্নান, আচমন, বাসনমাজা, কাপড় কাচা সম্পন্ন করিতে হয়। এই তিনটি নালীর পাশে পাশে আবার একটি করিয়া নালী,—জল-নিকাশের জন্য।

ইহারই কাছে অনুচ্চ করোগেটেড টিন দিয়া ঘের-করা পায়খানা। একটি হাতখানেক উঁচু করোগেটেড শীটের দুপাশে কয়েকটি করিয়া পায়খানা। একটিতে বসিলে অপরগুলি নজরে পড়ে।

কয়েকমাস হাজতবাসের ফলে এ সমস্তই বিশ্বেশ্বরের কিছু অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেই লাইনবন্দী হইবার সময় হইল। সারবন্দী হইয়া সকলে থালা লইয়া সুমুখের গাছতলায় বসিতেই একজন কয়েদী আসিয়া সকলকে লাপ্সী পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল। মহাকলরবে পরম পরিতোষের সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার পর বাসনমাজার পালা।

বাসন মাজিতে মাজিতে নবী নওয়াজ বলিল,—আপনাকে বোধ হয় আজকে আর কিছু করতে হবে না।

বিশ্বেশ্বর বোধ হয় অন্য কথা ভাবিতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল—না।

—তাহলে সেই আবার দুপুর বেলা দেখা হবে।

বিশ্বেশ্বর অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল,—হুঁ।

আবার ঘণ্টা বাজিল। সবাই সারিবন্দী হইয়া নিজের নিজের কাজের ঘরে চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর তাহার সেই মস্ত বড় হল ঘরে যাইয়া আবার কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। পাহারাওয়ালা আসিয়া দরজা তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলায় আর একবার সবাই হৈ চৈ করিতে করিতে আসিল। কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যে স্নান, আহার ও বাসন মাজা সারিয়া গল্প করিবার সময় বড় থাকে না। তবু উহারই মধ্যে নবী নওয়াজ কয়েকবার বিশ্বেশ্বরের কাছে কাছে ঘুরিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের মন তখন বহু দূরে এলোমেলো ভাবে ঘুরিতেছিল। নবী নওয়াজকে বড় একটা লক্ষ্যই করিল না।

সন্ধ্যার আহারাদির পর নবী নওয়াজ বিশ্বেশ্বরের বিছানাটি যত্ন করিয়া পাতিয়া দিল। নিজেরটিও তাহারই পাশে পাতিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। বিশ্বেশ্বর তথাপি কোনো কথাই কহিল না। একখানি হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া নিস্পন্দ ভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ উস্খুস্ করিয়া নবী নওয়াজ এক সময় ডাকিল,—ঘুমুলেন না কি?

ঘুমাইবার কথা নয়। ঘরের মধ্যে তখন হাসি ও গল্পের তুমুল হর্‌রা চলিতেছে। বিশ্বেশর চোখ মেলিয়া তাহার পানে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আচ্ছা, বাড়ীতে তোমার আর কে আছে?

এই প্রসঙ্গে নবী নওয়াজ সহজে নামিতে চায় না। কিন্তু একবার কথা উঠিলে আর থামিতেও পারে না। তার পরে সমস্ত রাত্রি আর ঘুম হয় না। চোখের সামনে দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মতো তাহার বৃদ্ধা জননী, বিরহিণী স্ত্রী ভাসিতে ভাসিতে মিলাইয়া যায়; ডুরে-শাড়ীপরা মেয়েটি যেন মল বাজাইয়া পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, কচি ছেলেটি দোলায় শুইয়া শুইয়া তাহার পানে মিট্‌মিট্ করিয়া চায় আর হাসে। নবী নওয়াজের বুকের ভিতরটা অসহ্য ব্যথায় মোচড় দিয়া ওঠে। মনে হয়, আজকের রাত্রে একটি মিনিটের জন্যে যদি সে একবার ছুটি পায়। তাহার বিনিময়ে সে সর্ব্বস্ব দিতে পারে। সে তো হইবার নয়! লাথি

মারিয়া এই জানালার গরাদে, ওই উঁচু পাঁচিল যদি সে ভাঙিয়া ধূলায় মিলাইয়া দিতে পারিত !

এই প্রসঙ্গ উঠিলে নবী নওয়াজের মাথা গরম হইয়া ওঠে।

শীতের রাত্রেও জেলঘরের জানালা খোলা থাকে। কে কখন সরিয়া পড়ে তাহার স্থিরতা তো নাই। পাহারা-ওয়ালা জানালা দিয়া গণিয়া গণিয়া দেখে, সব ঠিক আছে কি না।

তবু তাহাদের চোখে ধূলা দিয়াও কয়েদী পালায়।

বিশ্বেশ্বর খোলা জানালা দিয়া নেড়া অশ্বথ গাছটির পানে চাহিয়া ছিল। আবার ডাকিল,—নবী নওয়াজ!

— আজ্ঞে।

-তুমি নেই, তোমার বাড়ীর লোকের খাওয়া পরা চলছে কি ক'রে?

নবী নওয়াজ কথা কহিল না, শুধু খোদার উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর সেদিকে চাহিয়াও দেখিল না। আবার প্রশ্ন করিল,—কি ক'রেছিলে তুমি?

—খুন।

—খুন? তুমি খুন করেছিলে?—বিশ্বেশ্বর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নবীওয়াজের মুখের পানে চাহিয়া সেই স্বল্পালোকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। নবী নওয়াজ কিন্তু যেমন অসাড় ভাবে শুইয়া ছিল, তেমনি শুইয়া রহিল, এতটুকু বিব্রত হইল না।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—তুমি খুন করেছ? খুন করতে পারো তুমি? তোমাকে দেখে—

এবারে নবী নওয়াজ হাসিয়া বলিল,—আপনিও তো খুন ক'রেই এসেছেন। আপনাকেও তো দেখে মনে হয় না—

বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত ভাবে বিছানায় একটা চাপড় দিয়া বলিল,—আমি খুন করিনি। ওরা আমার মিথ্যে জড়িয়েছে।

নবী নওয়াজ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বোধ হয় নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল,—আমায় কিন্তু মিথ্যে জড়ায় নি। আমি সত্যিই খুন করেছিলাম।

নবী নওয়াজ আস্তে আস্তে কপালে হাত রাখিয়া সম্ভবতঃ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল।

বিশ্বেশ্বরের কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না, এই শান্ত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধ লোকটি কোনো কারণেই কাহাকেও হত্যা করিতে পারে। ইহার চোখ দুটি দেখিয়া সে কথা বিশ্বাস হয় না। এই পৃথিবী যাহার আর কোনো প্রয়োজনেই আসিবে না সে যেমন করিয়া চলে এই লোকটির চলিবার ভঙ্গি সেইরূপ। অথচ ইহার মনটি স্নেহ-রসে টলমল। এমন লোক কখনও খুন করিতে পারে? বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে নির্ব্বাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নবী নওয়াজ আরও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়া রহিল। তাহার মুদ্রিত চোখের কোণ বহিয়া দু' ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল, স্বল্পালোকে তাহা ভাল দেখা গেল না। সুদীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এমন করিয়া তাহার মনের কথা কেহ জানিতে চাহে নাই। এই স্নেহ পরায়ণ তরুণের কাছে সমস্ত কথা বলিবার জন্ম তাহার বেদনাতুর মন উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্তরের নিরুদ্ধ জ্বালা সে যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

ওপাশে অন্য কয়েদীদের কল কোলাহল ও কুৎসিত রসিকতা তখনও শেষ হয় নাই। বাহিরে গুটিকয় পারাবত শুইবার স্থান লইয়া নিজেদের মধ্যে ঝটাপটি করিতেছিল। তাহাদের ওয়ার্ডের পাহারাওয়ালা চীৎকার করিয়া উপর-ওয়ালাকে কয়েদীর সংখ্যা যে ঠিক আছে তাহা জানাইয়া দিল।

আরও একটু অপেক্ষা করিয়া নবীনওয়াজ বলিতে লাগিল— (ক্রমশঃ)

ভুলে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আজ মনে হয় জীবনে অনেক করেছি ভুল,
আঁচল ভরিয়া তুলিয়াছি কাঁটা, তুলিতে ফুল !
বকুল ঝরিল সন্ধ্যা বেলায়
অশোক শুকাল আমারি হেলায়,
পদ্মের কুঁড়ি রঙীন না হ'তে
ছিঁড়িল মূল।

মালঞ্চে তব আমি মালাকর গাঁথিব মালা,
ভেবেছিনু তুমি হাসিয়া বহিবে ফুলের ডালা।
হ'ল না,—গোপন গন্ধের টানে
বৃথাই ছুটিনু ফুল-সন্ধানে,
কুঞ্জবিতানে বাহু মেলি' পেনু
কাঁটার জ্বালা।

আজ বুঝিয়াছি আলেয়ার পিছে ঘুরেছি মিছে,
সম্মুখপানে ছুটিতে চেয়েছি—টেনেছে পিছে ;
ভেবেছিনু যারে পথের দিশারী
পথ ভুলাইল সে গোপন-চারী,
গোপনে নিবায়ে দেহলীর দীপ
রাখিল নীচে।

ভুলে মালা গাঁথি ভুল করে' যার পরানু গলে,
হাসিয়া সে মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল ধরণীতলে।
ভরা জ্যোৎস্নায় যে বঁধু আমার
প্রেম-চুম্বন দিল উপহার,
অবগুণ্ঠনে আবরি' বয়ান
সে গেল চলে'।

দাহন নিবাতে অবগাহনের গভীর জলে,
গৃহ ছাড়ি' এসে দাঁড়াইনু তীর তমালতলে ;
সমুখে তটিনী স্রোত-উচ্ছ্বাসে
ডাকে অনিবার কল কল ভাষে,
নিতলের মায়া নিয়ত টানিছে
ব্যাকুল বলে।

লজ্জায় মরি জীবনে কেবল দিয়েছি ফাঁকি
আকাশে দিয়েছি আল্পনা. মনে উপোষী রাখি'—
অন্তর-দাহে ফুল কিশলয়
শুকায়ে ঝরিল,—সে কি মোর জয় ?
পুলকাঞ্চণ গোপন করেছি
ভস্ম মাখি'।

বড়-বৌ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা হইলে কি হয়, সে কালেও বটে—একালেও বটে, বংশের ধারাকে অতিক্রম করিলেই লোকে কহে প্রহ্লাদ।

সেতাব—আর মহাতাপ দুভাইকেও লোকে কহিত জোড়া প্রহ্লাদ।

সরকার-গোষ্ঠি বনিয়াদী বংশ, পুরুষানুক্রমিক জমিদার, মস্ত নামডাক, প্রবল প্রতাপ।

সেতাবের পিতামহ দুর্দ্দান্ত উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান একটা মৌজা খরিদ করায় বন্ধু বান্ধব হিতৈষী পাঁচজনে বলিয়াছিল, বাবু মহালটা কেনা কি ভাল হইল? ও মহাল নিলামে নিলামেই ফিরচে, যে কিনেচে সে ঘর থেকে কিছু দিয়ে তবে ছেড়েচে।

বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, জান—

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম
কংসদমন কৃষ্ণচন্দ্র আশুরীদমন হাম।

—কথাটা বলা তাহার মিথ্যা হয় নাই; সে মহাল খানা তিনি শাসন করিয়াছিলেন; সে মহাল আর সরকারদের নাই, তবে কথাটা আজও আছে।

শুধু প্রবল প্রতাপই নয়—দয়াল দাতা বলিয়াও চাকলাটায় সরকারদের বিপুল খ্যাতি ছিল; গণিয়া দান কখনও সরকারদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, মুঠায় যাহা উঠিয়াছে তাহাই দান করিয়াছে; রাত্রি তৃতীয় প্রহরেও অতিথি আসিলে কখনও বিমুখ হয় নাই; প্রত্যহ খিচুড়ীর আয়োজন পাকশালায় মজুত রাখিয়া ভাণ্ডারী পাচকের ছুটী হইত। গৃহহীনের গৃহের জন্য সরকারদের বিশাল তালপুকুর ছাড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে কড়া হুকুম ছিল অরন্ধনে কাহারও দিন যাইবে না; অভাব হইলে ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইবে; প্রত্যহ একজন পাইক গ্রাম ঘুরিয়া দেখিত কার বাড়ীতে ধোঁয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৈফিয়ৎ তলব হইত, কেন তার বাড়ীতে উনান জলে নাই; সঙ্গত কারণের অভাবে তাহার শাস্তি হইত, সাহায্য মিলিত, আবার শেষে বাবুর নিজ নামে খরচ লিখিয়া জরিমানার টাকা বাদে আদায়ের ঘরে জমা হইত।

উৎসব আড়ম্বর তাও অক্লান্ত অবিরাম ধারায় চলিত, পার্ব্বণেপর্ব্বে সেত রীতি-মত বরাদ্দই ছিল, তাহার উপর এলাকায় যাত্রা, খেমটা, কবি, ঝুমুর যে কোন দল আসিলে সরকার বাড়ীতে গান না শুনাইয়া চলিয়া যাইবার হুকুম কাহারও ছিল না; একবার একজন ভাল খেমটা পঁচিশ দিন বাবুদের বাড়ীতে আটক ছিল; শেষ বাড়ীর গিন্নী যুদ্ধ ঘোষণা করায় তবে তারা ছুটী পায়। এদিকে বাবুদের বাগানবাড়ীর প্রতি ছোট তালগাছের খেড়োর ভিতরে একটী করিয়া গাঁজার কলিকা থাকিত, গিরিমামার খাতা কখনও তিন শূন্য হয় নাই, গিরিমামা হইতেছেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার, বাবুদের দৌলত জমি পুকুর বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু বাকী কম পড়ে নাই।

সেই বংশের পিণ্ডদাতা সেতাব শুধু পূর্ব্বপুরুষগণকেই পিণ্ড দিল না—তাহাদের চালচলন ধারাধরণ সমস্তকেই পিণ্ড দান করিল। গিরিমামার দেনা বাড়াত' দূরের কথা বিনা পয়সাতেই তিনশূন্য হইল; সে স্পষ্ট বলিয়া দিল—

টাকা নাও ত সম্পত্তি ফিরে দাও, সম্পত্তি নাও ত খাতায় উশুল দাও;—চালাকী করত টাকাত দেবই না সম্পত্তিও কেড়ে নেব—।

গিরিমামা হিসাব করিয়া দেখিল সম্পত্তির দিকটাই ওজনে ভারী, সে খাতাটা বন্ধ করিয়া ঘর ফিরিল।

ছোট ভাই মহাতাপের গাঁজা ভিন্ন চলে না বটে কিন্তু সে একপয়সা নগদ বিদায়, গিরিমামা আর সরকার বাবুদের নাম খাতায় ছকিতে পায় না। প্রজার ঘাড়ে সমানে যাত্রা বৃত্তি আদায় চলিল বটে কিন্তু ও খাতায় খরচ বন্ধ হইয়া গেল, যাত্রা খেমটা ত দূরের কথা বাবুদের দুয়ারে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর খঞ্জনীবাদ্যও নিষিদ্ধ হইয়া গেল,—এস, হরি বল, ভিক্ষে মাগ, গীতবাদ্যি কিসের?

দান খয়রাৎ—ও সব তো নিছক বরবাদ,—সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল—মুঠি তো মুঠি, আঙুলের আগাতেও একটা পয়সা উঠিত না;—লোকে খায় না খায় তাহাতে কাহার কি যায় আসে?

একটা বড় কথা বলিতে ভুলিয়াছি,—সরকার বংশের সবচেয়ে মহৎ খ্যাতি ছিল—সত্যবাদিতার। একবার মিথ্যা এজাহার দিবার ভয়ে একটা সম্পত্তিই তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন,—সেতাব কিন্তু সে পথই মাড়াইল না—সে স্বার্থের জন্য দিনকে রাত্রি বলিতেও দ্বিধা বোধ করিত না,—আর সে পারিতও। লোকে বলে সেতাব নাকি ঘুমন্ত লোকের হাতের টিপ লইয়া আসিয়া খৎ তৈয়ারী করে। জালেও তাহার অরুচি নাই।

লোকে কহিত—হাড়ে পাশা হয় বাবা—চামড়ায় ডুগডুগি—গোটা দেশের ভিটেয় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়বে না—। ছোট প্রহ্লাদ মহাতাপ,—সে ছিল পাগল,—পুরাতন বাগানে বাসা, নিয়মিত গাঁজা আর সের দুই দুধ এই হইলেই হইল:—সংসার খুব সুখের স্থান—কোথাও কোন অভাব নাই, দুঃখ নাই।—

তাহার অভাব বড় হইত না, কারণ শীর্ণদেহ সেতাব মহাতাপের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিত;—ওই দেহ আর কাণ্ডজ্ঞানহীনের ক্রোধ,—ও ত সভ্য ভাবে ঝগড়া করিবে না হয় তো তুলিয়া আছাড় মারিয়াই বসিবে।

তবে ভরসার মধ্যে পত্নী—কাদু,—তাহার কথা মহাতাপের বেদবাক্য। কাদু আর মহাতাপ এক বয়সী,—বাল্যসাথী, ন' বছরের কাদু যখন এবাড়ীতে আসে মহাতাপ তখন আট বছরের। কাদু নিশ্চয়ই স্বামীর লাঞ্ছনা দেখিতে পারিবে না—!

বন্ধুর জীবনপথে সংসারটী গোলাকার পৃথিবীর মতই বেশ গড়াইয়া গড়াইয়াই চলিতেছিল,—মাঝে মাঝে ছোট বৌ মানদার ফোঁসফোঁসানি অসন্তোষ উপলখণ্ডের মত পথ রোধ করিলেও গতিরোধ হইত না,—একটু আধটু ঝাঁকানী মাত্র বোধ হইত

ছোট বধুটীর সংসারজ্ঞান খুব টনটনে;—ভাগাভাগীর ঘরের মেয়ে সে ভাগটা খুব বুঝিত—; কিন্তু খোদ ভাগী না বুঝিলে পরের বুঝিয়া লাভ কি?—

রাত্রিতে আরক্ত নেত্রে মহাতাপ যখন শিব নাম করিতে করিতে বিছানায় এলাইয়া পড়িত, তখন মানদার ফোঁস ফোঁসানি বাড়িয়া যাইত—সে বেশ গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করিত—

বলি—কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখ কিছু?

মহাতাপ চমকিয়া লাল চক্ষু যথা সম্ভব মেলিয়া কহিত—কি—বড় বৌ খায় নি বুঝি কিছু?

মানদার আর কথা সরিত না, ক্রোধে লজ্জায় একটা অগ্নি দৃষ্টি হানিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া রহিত; -

মহাতাপ কহিত—কার সঙ্গে ঝগড়া হল,—তোমার সঙ্গে বুঝি—

মানদা নীরব, মহাতাপ অসহিষ্ণু হইয়া উষ্ণ কণ্ঠে কহিত—বলি কথা কওনা যে—

মহাতাপের বিরাশী সিক্কা ওজনের কিলকে মানদার বড় ভয়;—সে এবার উত্তর দেয় কিন্তু ঝাঁজ যায় না—

আমার কি সাধ্যি, রাণীর সঙ্গে কাটকুড়ানীর ঝগড়া করবার সাধ্যি কি?

—তবে দাদার সঙ্গে বুঝি—

অতি তীব্র ঝঙ্কার দিয়া মানদা এবার কহিল—জানিনা আমি—

মহাতাপ অতি রোষে উঠিয়া কহে—আজ চামারের নেতার মেরে দেব একবারে, বৌটাকে মেরে ফেলবে কোন দিন।

মানদা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহাকে ধরিয়া কহে—লোকে যে তোমাকে পাগল বলে তা মিথ্যে নয়।

মহাতাপও বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া কহে—কেন?

মানদা কহে—নইলে তুমি বড় ভা'য়ের নেতার মারতেই বা যাবে কেন, বড় বৌরাণী উপোস করতেই বা যাবে কেন, তাদের ঝগড়াই বা হবে কেন?

বিছানার উপর মহাতাপ বসিয়া কহে—তবে তুমি বলচ কি? হলই বা কি?

মানদার কান্না পায়, সে কহে—বলি তুমিও ত বিষয়ের অর্দ্ধেক মালিক, তা কাগজপত্র তোমার নামে হয় না কেন, তোমার দাদার নামেই বা হয় কেন? আর বিষয়—

মহাতাপ এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আর পোষে না, পরম নিশ্চিন্তের মত বিছানায় শুইয়া কহে—শিব! এতক্ষণ ব্যার ব্যার করে শেষে হল কিনা বিষয়!

মানদাও আর শুনিতে পারে না, সে দড়াম করিয়া দরজাটা খুলিয়া বারান্দায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়—বোধ হয় কাঁদে।

ঘরে মহাতাপ শুইয়া গান ধরে—

মন বলরে শিব শিব
বিষয় বিষ যার গান ক'রোনা।

বোধ হয় মানদাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেই চেষ্টা করে।

৩

সরকার-বাড়ীর সংসারের মধ্যে দুটী বৌ, আর ছোট ভাই-এর একটী ছেলে বছর দেড়েকের। বড় বৌ কাদুর বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। সারা দেহে বন্ধ্যা-নারীর একটা সতেজ স্বাস্থ্য ও লাবণ্য, শুধু তাই নয় গ্রামে বড়-বৌ'র একটা রূপের খ্যাতিও আছে। সে এঘরে আসিয়াছিল ন' বছর বয়সে। ছোট বৌ আসিয়াছিল আরও কম বয়সে, সরকার বাড়ীতে ন' বছরের বেশী বয়সের বৌ আনা নিষেধ। মানদা একটু মোটাসোটা গোলগাল দেহ, তাই মহাতাপ তাহাকে বলিত ধুমসী, আর তাহার পিঠে কিল মারিতে মহাতাপের বড় মজা লাগিত,—কারণে অকারণে, কারণেরও বড় অভাব হইত না। মহাতাপ তাহাকে দেখিতে পারিত না—তাহার ঐ ধুমসী গতরের জন্য। ধুমসীও মহাতাপের হিংসা ছাড়া থাকিত না, ঠিক ছোট বড় ভাই বোনের মত। শুধু মহাতাপের নয়; বড়-বৌর হিংসাতেও সে জর্জ্জর। তার একটা কারণও ছিল। সে কারণ হইতেছে বড়-বৌ আর তার ছোট দেওরটার পরস্পরের নিবিড়তা, বড় বৌর জ্বালাতে খেলাঘরে কখনও মানদা মহাতাপের বৌ সাজিতে পায় নাই; আজও তাই,—মহাতাপের ও বড়-বৌর নিবিড় বন্ধন যেন' আরও নিবিড়, কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত পরামর্শ। মহাতাপের উঠিতে বড় বৌ, বসিতে বড় বৌ, বড়-বৌ যেন সব—তাহার জপের মালা, ইষ্টকবচ; আর মানদা যেন কাঠকুড়ানী, পথের কণ্টক, তাহার কান যেন মহাতাপের কটু কথা শুনিতে, তাহার পিঠ যেন বিরাশী সিক্কা ওজনের কিল খাইতে সৃষ্ট হইয়াছে। সেতাবেরও এটা ভাল লাগে না,—না লাগিবারই কথা, সৌন্দর্য্যের ধনে দেউলিয়া সে। সুস্থ সবল পুরুষত্ব-ভরা মহাতাপের সঙ্গে সুন্দরী বড়-বৌর পরম নিবিড় ভাব তাহার সহ্য হয় না। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে, এ যে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাহিরের পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাহার মনও তাহাতে সায় দেয়, কিন্তু এ যে ঘরের কেলেঙ্কারী, আর তেজস্বিনী বড়-বৌর জবাবগুলিতেও যেন ক্ষুরের ধার, বলিতেও কিছু সাহস হয় না।

তবু সে কখনও কখনও বলে—জান, সব জিনিষেরই মাত্রা আছে, সবই হিসেব করে'—

বড়-বৌ বলে—পাটোয়ারী আলিয়াতি বুদ্ধিতে এ হিসেব কষা যায় না, বুঝলে?—তুমি অতি ইতর, অতি অধম।

একবারে প্রথম ভাগে নামাইয়া তাহাকে অচল করিয়া দেয়, সেতাবের আর বাক্য সরে না—অগত্যা সে খাজা-পাতে সরিয়া পড়ে। সদরে গিয়া সুদ কষে। সে হিসাবও তাহার ভুল হইয়া যায়। অন্দর হইতে বড়-বৌর খিল খিল হাসি, মহাতাপের উচ্চ হাস্য আর মানদার অসন্তোষভরা ঝঙ্কারে তাহার সব গোলমাল হইয়া যায়। সে হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ভাবে, ভিন্ন হওয়াই ভাল। কিন্তু এত বড় বিষয় তাহার বুকের রক্তের চেয়েও প্রিয়, এ বিষয় সে বহু কষ্টে রক্ষা করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহাই দুই ভাগ হইবে; তার চেয়ে ওরা যা করে তাই ভাল। আক্রোশটা পড়ে গিয়া ষোল আনা ওই বড়-বৌর উপর। সে আপন মনেই ভাবে তার চেয়ে দুটা নারী ত্যাগ করাই ভাল। কত সময় মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়াও যায়—বিয়ে করব ফের, দুটা ভার্য্যা—

কিন্তু তাও করা যায় না। ছোট একটুকু দশ দিনের একটা চারাগাছ টানিলে তলার মাটী কাটিয়া যায়, আর দীর্ঘ ষোল বছর ধরিয়া যে বুকের মাঝে আছে তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া ত সোজা নয়; বড়-বৌ আসিয়াছে ন' বছরেরটী, আর আজ তার বয়স পঁচিশ।

সেতার উন্মাদ হইয়া উঠে।

তাহার সময়ে সময়ে ইচ্ছা করে ঘরে আগুণ দিয়া, বড়-বৌ আর মহাতাপকে খুন করিয়া পলাইয়া যায়।

এ ভারতে নারীর অধিকার লইয়া লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র ঘটিয়া গিয়াছে, সরকারগোষ্ঠী ত' তাদের ঘর!

৪

সেদিন মহাতাপের ছাতু খাইতে সাধ হইয়াছিল—

সকালেই বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় বড়-বৌকে হুকুম হইল—বৌ আজ ছাতু খেতে হবে ভাই—নোতুন গুড় দিয়ে ছাতু না হ'লে—

বড়-বৌ হাসিয়া কহিল—না হ'লে মেরে ছাতু করে দেবে?—মারধোরের কথাটা জমিয়া উঠিল—মহাতাপের লাগিল ভাল, সে বসিয়া প্রবল উৎসাহে কহিল—মাইরী বলচি বৌ, মনে হয় এক একবার দিই ওই ছুটকীর ধুমসো গতর ভেঙে ছাতু করে, যে ব্যারর ব্যারর করে—; আর ওই চিমড়ে চামারকেও ছাতু মাখার মত চটকে দিতে ইচ্ছে করে—একটা ছাড়া গাঁজার পয়সা আর মিলবার জো নাই—

ছোট বৌ মানদা - ও ঘরে যাইতে যাইতে কুট কাটিয়া যায়—

এর পর আর তাও জুটবে না,—চোক থাকতে কানার ওই হয়।—

ওই এক কথাতেই আগুন ধরিয়া যায়,—মহাতাপ ডাক ছাড়িয়া লাফ দিয়া ওঠে, কি বল্লি আমি কাণা? ধুমসীর নেতার আজ—

বড় বৌ হাতের কাজ ফেলিয়া চট্ করিয়া মহাতাপকে ধরিয়া কহে, ছিঃ মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলা কি—ব'সো—ব'সো—

ছোট-বৌ কিন্তু থামে না,—বড়-বৌর করুণার তাহার বাঁচিতে সাধ হয় না—সে ঝঙ্কার দিয়া কহে—

না না বসবে কেন, দাও না তোমার পোষা কুকুর ছেড়ে—

দুর্দ্দান্ত মহাতাপ—বড়-বৌর হাত ছাড়াইয়া গিয়া মানদার ঘাড় চাপিয়া ধরে;—বড়-বৌও পিছন পিছন গিয়া মহাতাপকে কহে—

ছাড় বলচি ছাড়—

কণ্ঠে বেশ প্রভুত্বের সুর, সে প্রভুত্ব তাহার খর্ব্ব হয় না- মহাতাপ মানদার ঘাড় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া আসে যেন যাদুকরীর মায়ামুগ্ধ হিংস্র পশু; কিন্তু শাসাইয়া আসে—আচ্ছা থাক্ তুই, তোকে বিদেয় আমি করবই; তোর সঙ্গে ঘর করা আমায় পোষাবে না।

বড়-বৌ মানদাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া আসিয়া কহে—কি বল তুমি তার ঠিক নাই, ছেলের মা বিদেয় করবে কি?

মহাতাপ বলে—দেখো তুমি, সে আমি ঠিক করে রেখেছি—

বড় বৌ কহে, কি করবে শুনি?

মহাতাপ খুব বিজ্ঞ ভাবে একগাল হাসিয়া কহে—

সে বলচি না আমি, সে আমার মনেই আছে।

বড়-বৌ হাসিয়া বলে—আমাকে বলবে না ভাই—

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া হাসে—বলে, না, সে দেখো তুমি, আমি তাক্ লাগিয়ে দোব।

বড়-বৌ বলে—ভাল ভাগ্যি আমার, তুমি যে মনের কথা মনে রাখতে শিখেছ এও আমার ভাগ্যি,—

মহাতাপ বলে—বৌ, আজ ভাই আমাকে আট আনা পয়সা দিতে হবে—

বড়-বৌ বলে—আমি মেয়ে মানুষ পয়সা কোথা পাব ভাই—

মহাতাপ সবিস্ময়ে কহে—তুমি বাড়ীর লক্ষ্মী, তোমার পয়সা নাই বৌ—

বড়-বৌ হাসিয়া কহে—মেয়ে মানুষ পয়সা কোথা পাবে বল, তোমরা দেবে তবে ত; তোমার দাদা—

মহাতাপ পরম বিরক্তিভরে কহে—রাম রাম, সকাল বেলা চামারের কথা ছাড়ান দাও ত।

বড় বৌ কহে—তাই ত বলচি, তাকে ত জান, সে কি!

মহাতাপ বলে—এত খাতির কিসের বলত, চামার বলচ না যে, সে—তাকে, ইঃ যেন গুরু ঠাকুর।

বড়-বৌ হাসিয়া কহে—তাই না হয় বল্লাম, সে ত একটা পয়সাও কখনও দেয় না, আর তোমার ত—

মহাতাপ জাগ্রত হইয়া বলে—দাঁড়াও এবার আমি মহালে যাব, নিশ্চয় যাব—পাল্কী চেপে।

বড়-বৌ বলে—সে সুবুদ্ধি হলে যে আমি বাঁচি—খেয়ে মেখে বাঁচি, গাছের আমড়া দেখে ভাত খেতে হয় না,—

মহাতাপ বড়-বৌর মুখ পানে তাকাইয়া থাকে।

বড় বৌ বলে—জান না বুঝি তোমার দাদা মেয়েদের কি ব্যবস্থা করেছে, মেয়েদের আমড়া দেখে দেখে ভাত খেতে হবে,—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসে।

মহাতাপ বলে—বৌ আজ থেকে আমার খাবার দুজনে ভাগ করে খাব।

—দূর পাগল আমায় না, মানুকে দিতে হয়।

—ওই ধুমসীকে, কভি না; মহাতাপ রাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ধুমসী কিন্তু আড়ালেই ছিল, সে ডাকে, মহাতাপ কহে—কি?

—পয়সা চাইছিলে না-?

—হ্যাঁ, আট আনা।

—পেলে—?

—না, বৌ কোথা পাবে,

—তা বটে, জ্ঞাতির কাছে লক্ষীও গরীব সেজে ছিলেন; এই নাও।

জীতা রহো; জীতা রহো—বলিয়া মহাতাপ আধুলীটি তাহার হাত হইতে লইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে কহে—আচ্ছা পেলে কোথা বল দেখি, হুঁ সেই চামড়া-চোকো দেয় বুঝি, হুঁ বুঝেছি, বৌ আমাকে ভালবাসে কিনা, তাই তোমাকে টাকা এনে দেয়। আচ্ছা আমিও দেখছি। মানদা হাসিবে না কাঁদিবে বুঝিতে পারে না,—শেষে কাঁদেই, আর আপনার বাপকে গালি পাড়ে আর পাড়ে ভগবানকে।

ওদিক হইতে বড়-বৌ হাঁকে,—ছোট-বৌ ও ছোট-বৌ। মানদার অঙ্গ জ্বলিয়া যায়, কেমন করিয়া যে সে শোধ তুলিবে ভাবিয়া পায় না।

বড়-বৌ সাড়া না পাইয়া কহে—

বলি করচিস কি ছোট-বৌ, আমার পিণ্ডি দিচ্ছিস, না কি?

মানদা ঝঙ্কার দিয়া কহে—তোমার দিতে যাব কেন বল, দিচ্ছি যে আমার অদেষ্ট তৈরী করেছে সেই মুখ পোড়া ভগবানকে, মুখপোড়ার দেখা পাই ত দেখি আমি একবার।

বড়-বৌ ওইখান হইতে কহে—মুখপোড়া বড় ভীতু লো, সে কিছুতেই দেখা দেবে না, মিছে ঘরে বসে আছিস, আয় দেখি আমার কাজটা একটু এগিয়ে দিবি।

মানদার ইচ্ছা করে তাহা হইলে মুখপোড়ার পাওনা গণ্ডা টুকু ওই মুখ-পুড়ীর পিঠেই ঝাড়িয়া দেয়, কিন্তু আর এক মুখ-পোড়ার ভয়ে তাও পারে না।

সেদিন মহাতাপ বাড়ী ফিরিল বেশ একটু রং-এর মাথায়, বড় বড় চোখ দুটো লাল, আর ঢল ঢল সারা দেহ খানাই যেন টলে, মুখখানা রাঙা অথচ থম থমে, সে আসিয়াই গম্ভীর গলায় হাঁকিল—বড়-বৌ হামারা ছাতু লে আও—

বড়-বৌ বাহিরে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল, সে মহাতাপকে কোন কথা কহিল না, গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিল—ছোট-বৌ।

সে কণ্ঠস্বরে এবার মহাতাপও চমকিল, তাহার হিন্দী বাত কোথায় উপিয়া গেল। সে কহিল—ছোট-বৌ ত পয়সা দেয় নাই, আট আনা পয়সা সে কোথা পাবে? মাইরী বলচি তোমার গা ছুঁয়ে।

বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়ে।

গায়ে হাত দিয়া মিথ্যা শপথ করিলে অকস্পৃষ্ট প্রিয়জন যে বাঁচে না সে মহাতাপ জানিত। আপন ঘরে ঢুকিয়া মহাতাপ দেখে—পরিপাটী করিয়া আসনটী পাতা, পাশেই এক গ্লাস জল, এদিক ওদিক চাহিতেই দেখে কোনে বাটীতে কি ঢাকা রহিয়াছে, ঢাকা খুলিয়া সে বসিয়া যায়।

ওদিকে বড়-বৌ আরও গম্ভীর কণ্ঠে ডাকে—ছোট-বৌ, বলি কানে সোনা পরেছ ক ভরি? এবার ছোট-বৌ ফোঁস করিয়া উঠে, সে পান সাজা ফেলিয়া সম্মুখে আসিয়া কহে—সোণা কোথায় পাব বল, সরকার-বাড়ীর সুয়োরাণীরই সোণা জোটেনা, তা—কোথাকার ঘুঁটেকুড়োনী।

বড়-বৌ কথার বাঁকা গতির মোড় ফিরাইয়া সোজা কহে—তাই বলি চালে আমার হিসেব মত চলে না কেন, চাল বিক্রী করে করে—

মানদা ঝঙ্কার দিয়া কহে—করেছি বেশ করেছি। সরকার-বাড়ীর চাল-চুলো ত কারও বাপের বাড়ী থেকে আসেনি।

দোতালা হইতে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে একটা কথা আসিয়া পড়ে—

সেই কথাটা মনে রাখতে বল বড়-বৌ, সরকার-বাড়ীর চাল চুলো কারও বাপের বাড়ী থেকে আসে নি—

কণ্ঠস্বর বড় কর্ত্তা সেতাবের—

কথাটার উত্তর মানদার খুব জিহ্বাগ্রে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মরে কিন্তু নেহাৎ লোকলজ্জায় বাহিরে আসিতে পারে না, সে ঘোমটার ভিতর গর্জ্জায়—

উপর হইতে বড় কর্ত্তা আবার বলে—

যত সব ছোট লোকের ঘরের মেয়ে, এবার বড়-বৌ উত্তর দেয়—

বাড়ীর মেয়েদের কথাকাটাকাটির ভেতর পুরুষ মানুষের কথা কইবার দরকার কি শুনি, আর আমাদের বাপ তুলবারই বা তোমার অধিকার কি শুনি—?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ক্রুদ্ধ মত্ত কণ্ঠ শোনা যায়—

খবরদার শুকুনি চামার কিপটে, মেয়েদের কুছ বোলেগা তো ছাতু চটুকে দেগা—ওঃ বিয়ে করেচে তো মানুষ কিন্ লিয়া—

বড়-বৌ উপরে ছুটিয়া আসে—ভয় হয় বা সুন্দ উপসুন্দের দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়।

আসিয়া দেখে সুন্দ তখন ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছে, আর উপসুন্দ তখনও দরদালানে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতেছে—

চামারকে সাথ হাম নেহি রহে গা,

কাল হাম ভিন্ন হোগা—

হাতে মুখে কাল কাল কি মাখা, তাই সে চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে।

বড়-বৌ তার হাতখানা ধরিয়া শুঁকিয়া কহে, এ কি—ছাতু না খইল?

মহাতাপ দিব্য হাত চাটিতে চাটিতে কহে—

কোনে ভিজে ছিল, গুড় দিয়ে দিব্যি লাগচে। হুঁ ছাতুই বটে—বলিয়া আর একবার চাটে—

বড়-বৌ বলে—আমার মাথা আর মুটকীর মুণ্ডু, সে মাথা ঘসবার জন্য খইল ভিজিয়ে রেখেছিল বুঝি, বড়-বৌ তাহার হাত ধরিয়া কহে—এস হাত ধোবে এস—

যাইতে যাইতে সিঁড়ির পথে আবার কহে—বলি নেশা কি এমনি করেই করে যে স্বাদ আস্বাদ—

মহাতাপের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে—সে বড়-বৌর হাত ছাড়িয়া সেই সিঁড়িতে হেঁট হইয়া বসিয়া বড়-বৌর পায়ের বদলে মাটীতে হাত ঘষিতে ঘষিতে কহে—গুরুর দিব্যি, তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কোন্ চণ্ডাল মিছে কথা বলে, মিথ্যে বলিত—

বড়-বৌ শশব্যস্ত হইয়া কহে—আচ্ছা আচ্ছা, ওঠ ওঠ, বলিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দেয়।

—বিশ্বাস হল না, ধরে তুলতে চাচ্ছ, আচ্ছা দেখ—বলিতে বলিতে উঠিতে গিয়া সিঁড়ির মোড়ের মুখে কোণে গড়াইয়া পড়ে, তবু সে বলে—

মিথ্যে বলি ত ধুমসীর মাথা খাই, বলিয়া পড়িয়া পড়িয়াই গান ধরিয়া দেয়—

মূর্খে বলে সুরা সুরা, মায়ের প্রসাদ কারণ বারি—

বড়-বৌ পরম যত্নে তাহাকে দুই হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করে,—মহাতাপও এবার তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া উঠিতে উঠিতে কহে—যার বড়-বৌ নাই—তার কেউ নাই!

বড়-বৌ অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই দেখে উপরে সিঁড়ির মাথায় সেতাব, সাপের মত নিমেষহীন হিংস্র দৃষ্টি তাহার চোখে; চোখোচোখী হইতেই সেতাব কহে—বটে এই জন্যে এত, লোকে দেখি মিথ্যে বলে না।

বড়-বৌ ঘৃণায় মুখ ফেরায়, এ পাশেও ঠিক অমনি দুটী চোখের দৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধরাইতে চায়—নীচে ঠিক সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়া ছোট-বৌ মানদা।

মানদা বলে—যা রটে তাই রটে, আর তা সত্যই বটে, কথাটা দেখি মিথ্যে নয়। লোকে মিথ্যে বলে না। বলিয়াই চলিয়া যায়।

বড়-বৌ গম্ভীর কণ্ঠে কহে—কি বল্লি ছোট-বৌ?

নেপথ্য হইতে উত্তর আসে—বলছিলাম আজ মাসের কদিন হ'ল জানগো বড় গিন্নী?

বড়-বৌ মহাতাপকে ছাড়িয়া দিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, মহাতাপ আবার সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বহু কষ্টে মহাতাপকে তাহার ঘরে শোয়াইয়া দিল। তারপর নীচে আসিয়া দাওয়ার উপর নিস্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই অকল্পিত অসম্ভব আঘাতে তাহার স্নায়ু শোণিত-প্রবাহ, হৃদপিণ্ড সব যেন নিশ্চল মূক হইয়া গেছে

কতক্ষণ কাটিয়া যায়—উপর হইতে শব্দ উঠে. ওয়াক্ ওয়াক্ মহাতাপ বমি করে—

মানদা তাড়াতাড়ি উপরে যায়; ক্ষণপরেই মত্ত কণ্ঠ শোনা যায়—নেচি মাংতা হ্যায়. ভাগো তুম্ ভাগো, ধুমসী, গিধ্বড়-বদনী, ভাগো—

মানদার তীব্র কণ্ঠ শোনা যায়, কে তোমার চাঁদবদনী আছে শুনি, নরক সাফ করে কে দিয়ে যাবে শুনি ?

মহাতাপ হাঁকে, বড়-বৌ—বড়-বৌ—

মানদাকে পিছন হইতে আকর্ষণ করিয়া বড়-বৌ কহে, পাগলের কথায় রেগে কি হবে, সরে আয়, আমি পরিষ্কার করে দিই।

মানদা একটা অগ্নি দৃষ্টি হানিয়া কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলা হইল না।

সেতাব বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—

সে বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল; এক গাছা দড়ি নিয়ে গলায় দিয়ো।

তাহার বুকের পুঞ্জিত ঈর্ষা আজ ফাটিয়া পড়িতে চায়—

৬

এই ছাতুপর্ব্বের ফলেই, সরকার-বাড়ীতে সত্য সত্যই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল—

সেতাবের মনে মহাতাপ ও বড়-বৌর নিবিড় আকর্ষণের ফলে যে স্বাভাবিক সন্দেহ ছিল সে আজ ভীষণাকার ধারণ করিল। সেতাবের আর সহ্য হইল না—ঠিক পরের দিনই সে প্রাতঃকালে সদরে বসিয়া মহাতাপকে ডাকিয়া বলিল—

—তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নাও, 'একজায়গায় থাকা আর পোষাবে না।

মহাতাপ প্রবল উৎসাহে কহিল—বহুৎ আচ্ছা, আমিও তাই চাই,—বড়-বৌ বলছিল গাছের আমড়া দেখে আর সে ভাত খেতে পারছে না—।

পাগলের প্রলাপ সব সময়ে বোঝা যায় না, তবুও সেতাব তাহার মুখে বড়-বৌর দুঃখের কথা শুনিয়া জ্বলিয়া গেল, সে দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া আপন মনেই কহিল—হাঁ, বাপের বাড়ী গিয়ে খুব সুখে ভাতে খাবে—।

মহাতাপ কিন্তু কথাটা শুনিল না,—সে তৎপূর্ব্বেই উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছিল সু-সংবাদটা দিতে; সেতাব আবার তাহাকে ডাকিল, শোন—

—কি ?

আজই সব ভাগ হবে, আমি মাতব্বর মুরুব্বিদের খবর দিয়েছি, আমাদের পাড়ার রামবাবু, তারু জেঠা, ইন্দির দাদা, ওপাড়ার ফকীর মোড়ল, কালাচান্দ বাবু। দেখ, এ ছাড়া আর কাউকে ডাকব—?

মহাতাপ বলে—আবার কে—ওই হবে ?

বেশী কথা বলিতে আর তাহার বিলম্ব সহিতেছিল না, সে সায় দিয়া বাড়ী ফিরিল।

সেতাব হাঁকিল, সরকার মশায়! সরকার আসিয়া সবিনয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলায়। সেতাব বলে পাল্কী বেহারা বলে রাখুন, বড়-বৌ কাল বাপের বাড়ী যাবে। আর একটী কনে,—আচ্ছ সে পরে হবে।

বাড়ীর বাহির হইতেই মহাতাপ হাঁকে, বড়-বৌ, বড়-বৌ। রান্নাশালে বড়-বৌ বসিয়া বাঁটনা বাঁটিতেছিল;—সে তাহার ডাকে আজ আর হাসিয়া সাড়া দিল না—শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল;—করুণ বিষণ্ণ মুখ।

সে সব কিছু আজ মহাতাপের চোখে পড়িল না,—উৎসাহে কহিল—কি দেবে বল ?

বড়-বৌ চুপ করিয়া থাকে, মহাতাপের সে ভাল লাগেনা,—সে প্রবল ধমক দিয়া কহে, বলি কথা কইচ না যে ?

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া কহে,—কি দেব বল ? কথার জবাব পাইয়া মহাতাপ বড় খুসী, সে কহে—

—এখন দুটো জোয়ান মৌরী দাও দেখি, ছাতুর অম্বল আজও মরে নাই,—

বড়-বৌ কহে—জোয়ান মৌরী কি তোমাদের বাড়ীতে কখনও আসে—যে পাবে—

—কেন ওই যে রান্নার বাটায় রয়েচে—ওই যে। বড়-বৌর অতি বিষণ্ণ মুখও কৌতুকে ঈষৎ উজ্জল হইয়া উঠে, সে কহে—আ আমার পোড়াকপাল—ওযে ধনে আর সম্বরা—

মহাতাপ দিব্য কহে—বেশ, ওই তো রোজ নিয়ে খাই আমি, ওতেই ত আমার বেশ অম্বল মরে।

বলিয়া নিজেই দুইটা ধনে তুলিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহে—হ্যাঁ, তার পর শোন, আর আমড়া দেখে ভাত খেতে হবে না—আজ ঠিক হয়েচে আজই ভিন্ন হব—বিষয় ভাগ হ'চ্ছে—।

ওপাশ হইতে মানদা ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া কহিল—তবে ত বড়-বৌর মাছের মুড়োর বরাদ্দ হবে। আনন্দে বিভোর মহাতাপ আজ আর রাগেনা, সেও ব্যঙ্গ করিয়া কহে—না, তুই খাবি। বুঝলে বড়-বৌ! চিমড়ের হাত আর ধুমসীর ব্যাড়র ব্যাড়র আজ থেকে ঘুচবে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।

বড়-বৌ তাহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া ছোট বৌকে কহে—

কি করব বল ছোট-বৌ—ভাসুর তোর আমাকে নেবে না, আমার আমড়া দেখে দেখে ভাত খাওয়া সত্যিই ঘুচেছে।

মহাতাপ মাটীতে একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠে—“নি—শ্চ—য়—নইলে আমার নামই মিছে দেখো তুমি—। আর ধুমসী বুঝলি কিনা, এমন ভাগ করব যে তোর ও ব্যাড়র ব্যাড়র জন্মের মত ঘুচোব—তবে আমার নাম—।

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানদা খুসী হইয়া দেড় বছরের ছেলেটাকে লইয়া বুকে চাপিয়া আদর করে।

৭

পাঁচ পঞ্চায়েৎ মিলিয়া বিষয় ভাগ করিল,—মহাল, জমি পুকুর, বাগানবাড়ী, বাসন, আসবাব সমস্ত।

সেতাব কহিল, আজই তাহ'লে বাড়ী সীমানা নির্দ্দিষ্ট করে পাঁচিল গাঁথতে লাগান হোক—ইঁট, মসলা, রাজ মজুর সবই মজুত—।

একজন পঞ্চায়েৎ বলেন, তাড়াতাড়ি কি—

সেতাব বলে—জানেন না, এর পর সীমানা সরহদ্দ নিয়ে কত গোলমাল হয়—।

তাই হইল,—বাড়ীর মাঝে পাঁচিল উঠিতে সুরু করিল।

‘বড়-বৌ বড়-বৌ’ হাঁকিতে হাঁকিতে মহাতাপ পরম আনন্দে আপন ঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিয়া বিষম চটিয়া গেল। মানদা কাপড় সাঁটিয়া বাসন আসবাব ঘরে তুলিতেছিল।

বিবক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার কার্য্যের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাতেও যখন তাহার ওই দৃষ্টির সূচীকায় মানদার চৈতন্য হইল না, তখন সে কহিল—

বলি—হচ্ছে কি—?

মানদা এক গোছ বাসন তুলিয়া তাহার পানে না তাকাইয়াই চলিতে চলিতে কহে—

চোখের মাথা খেয়েচ না কি—?

মহাতাপ চটিয়া কহে—চোখের মাথা খাই নাই, তোর মাথা খাব—বলিয়া গিয়া তাহার কাঁধে একটা কর্কশ ঝাঁকানি দিয়া কহে—

তুই এখানে কেন?

মানদা এবার আর কিছু বলিতে পারে না, সে পরম বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকে—।

মহাতাপ আবার কহে—যা তুই নিজের ভাগে যা, ওই বড় তরফ—। বড়-বৌ এখানে আসবে।

মানদার হাত হইতে বাসনের গোছাটা ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া যায়, ঘৃণা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তারপর সব ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে দুয়ার বন্ধ করিয়া মেঝেতে লুটাইয়া কাঁদে—।

মহাতাপ অতি রোষে পঞ্চায়েৎদের সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়া কহে—বা এ কি রকম হল,—বড়-বৌ নিজে আমাকে বলেচে দাদা তাকে নেবে না, তাই আমি কিছু বলি নি, এখন ছোট-বৌ কেন আমার ঘরে গিয়ে জ্বালাচ্চে?

পঞ্চায়েতের পঞ্চ বিজ্ঞ মস্তিষ্কও এ কথার মাথামুণ্ডু কিছু ঠাওর পায় না, তাহারা অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকে।

সে আবার কহে—এখন আপনারাই এর ভাগ করে দেন ; ভাগের সময় একটা কথাও আমি বলিনি—আমি বলচি বড়-বৌ আমার ভাগে—

সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ফকির মণ্ডল অবাক হইয়া কহে, বৌ ভাগ !

অসহিষ্ণু মহাতাপ কহে - হ্যাঁ, ছোট-বৌ দাদার ভাগে।

কথাটায় পঞ্চায়েৎ পঞ্চ মুখে রাম নাম স্মরণ করে।

সেতাব কানে আঙুল দেয়, চক্ষু তাহার জ্বলে।

মহাতাপ ছাড়ে না—সে আপন মনেই বলিয়া যায়।

ছোট-বৌ আমাকে দেখতে পারে না, ছোট থেকে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া ; আর দাদা নিজে বড়-বৌকে নেবে না বলেছে।

পঞ্চায়েৎ—সেতাবের মুখ পানে চায়, সম্মতির জন্য নয়, শেষের কথাটার সত্যতানির্দ্ধারণের জন্য।

সেতাব দৃষ্টির প্রশ্ন বুঝিয়া কহে—নিঃসন্তান—বংশ ত চাই ;—জানেন ত পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।

নিশ্চয় নিশ্চয়—পাঁচ পঞ্চায়েৎ একবাক্যে কেরামৎ করিয়া উঠে।

মহাতাপ বলে—তা হলে ?

ওপাড়ার রাম বাবু বলে—এত গাঁজা খেয়ো না, মহাতাপ এত গাঁজা খেয়ো না, একে পাগল আরও পাগল হবে—

—কেন ?

—নইলে বৌ ভাগ করতে বলো, বৌ কি ভাগ হয় ?

প্রবল প্রতিবাদে হাত চাপড়াইয়া মহাতাপ কহে—আলবাৎ হয়,—কেন হবে না শুনি ? ওইত সতীশ বাবুদের বাড়ীর পদ্ম-বৌ আর কাঞ্চন-বৌ।

আঃ—ওদের একজন হ'ল মা একজন হ'ল নিঃসন্তান খুড়ী।

মহাতাপ আর দাঁড়াইয়া শোনে না, সে আপন মনেই বকিতে বকিতে চলিয়া যায়—যত সব কাজীর বিচার, পঞ্চায়েৎ না আমার ইয়ে—।

৮

ঘটনার দিন রাত্রেই সেতাব বড়-বৌকে শাসাইয়া ছিল।

—এ সবে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তোমাতে তার বেশ পরিচয় পাচ্চি।

আনন্দময়ী বড়-বৌ সেদিন সেই অকল্পিত অসম্ভব আঘাতে যেন মূক হইয়া গিয়াছিল আর এ জঘন্য কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তিও হইল না ; সে শুধু তাহার পানে একবার চাহিয়া আবার মুখ ফিরাইল। সেতাবের রাগ তাহাতে বাড়িয়া যায়, মেয়ে মানুষের এত তেজ ; দোষ করিয়া আবার চোখ রাঙায়।

সে কহিল,—মনে হচ্ছে—গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে দি !

বড়-বৌ শান্ত কণ্ঠে কহে—তাই দাও।

তাই দাও ? সেতাব এদিক ওদিক অল্পক্ষণ ঘুরিয়া শেষ বিছানায় শুইয়া কহিল—নাঃ দুষ্টা স্ত্রী আর সাপ দুই সমান ; খুনের দায়েই বা পড়ি কেন ; তুমি মা বাপের ছেলে, মা বাপের কাছে যাও ; আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। খোরপোষ দেব আমি। বলিয়া শুইয়া পড়ে। বড়-বৌ মাটীতে আঁচল বিছাইয়া শোয়।

তাই বড়-বৌ ভাগের দিন ছোট-বৌকে ও কথাটা বলিয়াছিল।

আজ সন্ধ্যায় সেতাব আসিয়া খট্ খট্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, বড়-বৌ বিষয়ে তাহার যদিও কোন দ্বিধা ছিল, তা আর নাই ; মহাতাপের বৌ-ভাগের কথায় সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গেছে।

ছি—ছি—ছি, পঞ্চায়েতে মনে করিল কি ? পাঁচ জনের যে আর সন্দেহ রহিল না ; আর পাঁচ জনেরই বা দোষ কি, অতি আকর্ষণ ভিন্ন কি মহাতাপও ও কথাটা বলিতে পারিত ?

উপরে খাবারের ঠাঁই তৈয়ারী ছিল,—বড়-বৌ ভাতের থালাটা লইয়া গিয়া নামাইয়া দিল। সেতাব অতি রোষে পায়ে করিয়া থালাটা সরাইয়া দিল। বড়-বৌ একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—আমার ছোঁয়া খাবে না ? সেতাব তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কেমন হইয়া গেল। এমন সংযত দৃপ্ত মহিমা সে কখনও দেখে নাই, সে চোখ নামাইল। বড়-বৌ ধীরে ধীরে থালাখানি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সেতাব পিছন হইতে কহিল—কাল তোমায় যেতে হবে—

বড়-বৌ পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেয়—বেশ।

সেতাব আবার বলে—গহনাগাঁটী কিছু পাবে না তুমি।

দৃঢ় পদক্ষেপে অকম্পিত শিখার মত দৃপ্ত মূর্ত্তিটী তখন চলিয়া গেছে।

সেতাব আপন মনেই দাঁতে দাঁত ঘসে;

বড়-বৌ কিন্তু আর আসে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেতাবের উৎকণ্ঠা ও উগ্রতার সীমা থাকে না।

গলায় দড়ি দিল নাকি?

সেই মুখ খানির চোখ বড় হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সেতাবের বুকখানা ফাটিয়া যায়, সে তাড়াতাড়ি ডাকে, বড় বৌ, বড়-বৌ।

উত্তর নাই।

সেতাবের মনে বিদ্যুতের মত আবার আর একটা কথা জাগিয়া উঠে।

হয়ত মহাতাপের কাছে—

সে দেওয়ালে ঝুলানো মরিচা-ধরা তলোয়ারখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে হয় না, সামনের খোলা বারান্দায় বড়-বৌ নিস্পন্দ পড়িয়া।

ডাকিতে তাহার ভরসা হয় না, অপরাধীর মত সে ঘরে আসিয়া শোয়। ভোর বেলা তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

কে যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

সেতাবও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

হ্যাঁ বড়-বৌ-ই বটে; পা টিপিয়া টিপিয়া যাওয়ার ভঙ্গীতে সেতাবের সন্দেহ জাগে। সেও পিছন ধরিয়া চলে।

বড়-বৌ গিয়া মহাতাপের ঘরে গিয়া উঠে।

৯

তখনও পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, মহাতাপ গালে হাত দিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে, পঞ্চায়েতের পঞ্চ প্রবীণ মস্তিষ্কদত্ত জ্ঞানে তাহার আক্কেল জন্মাইয়া গেছে। মানদা ঘরে শুইয়াই আছে, বাসন আসবাব সব এখনও বাহিরে পড়িয়া।

বড়-বৌ চুপি চুপি আসিয়া মহাতাপের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মহাতাপ সানন্দে কহিয়া উঠিল—বড়-বৌ—

ঘরের মধ্যে মানদার বুকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে, সে উঠিয়া বসে, উদ্‌গ্রীব হইয়া শোনে।

বড়-বৌ মৃদুস্বরে কহে,—চুপ কর, আস্তে কথা কও, এইটে নিয়ে রাখ।

বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একটী ছোট পুঁটুলী বাহির করিয়া সম্মুখে ধরে।

মহাতাপ কহে—কি এ?

মৃদুস্বরে বড়-বৌ কহে—টাকা, তোমার দাদা তোমাকে নগদ টাকার ফাঁকি দিয়েচে, যা পেরেচি এনেচি, নাও।

মহাতাপের বুদ্ধি মহাতাপকেই ভাল, সে কহে—না, নিয়ে কি করব আমি?

এ প্রশ্নের উত্তর বড়-বৌও দিতে পারে না, শেষ সে কহে—তোমার না দরকার থাকে, মানু, খোকা—

উদাসভাবে মহাতাপ কহে—দাও গে তবে সেই ধুমসীকে, আমি আর ঘরেই থাকব না।

অতি ম্লান হাসি হাসিয়া বড়-বৌ তাহার মাথায় হাত দিয়া কহে—ছি—পাগলামী কি করে, ঘরে থাকবে না কি?

মহাতাপের কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সে কহে—কার কাছে থাকব বৌদিদি—মা নাই, বুন নাই—

বড়-বৌর চক্ষে জল আসে. প্রাণপণে অশ্রু রোধ করিয়া সে হাসিয়া তরল ভাবে কহিতে চাহিয়া বলে, কেন, বৌর কাছে, মানুর কাছে।

—ধোৎ—বৌ-ই বুঝি সব? মা বুন নইলে কি ঘর বৌদিদ?

বড়-বৌ কথাটাকে তরল করিবার চেষ্টাতেই পরিহাস করিতে চায়—তা আমিও ত মা বুন নই,—

মহাতাপ কহে—না, তুমি যে বড় বৌ, তুমি থাকলে মা বুনের কষ্ট যে বুঝতে পারি না আমি। দাদা তো কথাই কয় না যেন ভিখারী, বলে মুখ্য-ডাং, বৌ আড়ালে বলে—মুখপোড়া,—তুমিই ত শুধু ভাল কথা বল।

বড়-বৌও আর অশ্রু রোধ করিতে পারে না,

পিছন হইতে মানদা গায়ে হাত দিয়া কহে—দিদি ওটা তোমার কাছেই রাখনা, ওকে ত জান আর আমিত বড় উড়ন-চড়ে।

মহাতাপ কহে—শুনচ বড়-বৌ—শুনচ, মার না খেলে—

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া কহে—তুমি একটু থাম ভাই। এটা তুইই রাখ্ মানু, কাল ত বলেচি আমার এ বাড়ীর ভাত উঠেছে। সব বলিনি—শোন্, আজ পাল্কী আসচে, আমার বনবাস। তোর ভাসুর আবার বিয়ে করবে।

মহাতাপ আর চুপ করিয়া থাকে না, সে স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠেই কহে—কি—বিয়ে করবে?

বড়-বৌ জোড় হাত করিয়া কহে—চুপ কর, ভাই চুপ কর, রাজ-মজুর আসতে সুরু করেছে।

মহাতাপ চুপ করিয়া যায়। ওদিকে ঘরের মাঝে খোকাটা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে,—

বড় বৌ বলে—খোকা উঠেচে ছোট-বৌ, ওকে আন্ত, যার ধন তাকেই আমি দিয়ে যাব।

ছোট-বৌ খোকাকে লইয়া আসে, বড়-বৌ তাকে কোলে লইয়া কহে—নাও ত বাবা। বলিয়া টাকার পুটলীটা তার হাতে দেয়।

কথা শুনিতে শুনিতে সেতাবের সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যায়, চোখ দিয়া জল আসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বুকটা হাল্কা হইয়া উঠে।

সে ডাকে, বড়-বৌ—

সকলে সেতাবকে দেখে,—

মহাতাপ বলে—শুকুনি সব শুনছিল বড়-বৌ, আমি বলি দরজার আড়ে ওটা কাপড়!

সেতাব ফট্ ফট্ করিয়া চটীটা টানিতে টানিতে আসিয়া কহে—টাকাটা দাও ত, ছেলেমানুষ কোথা ফেলবে—!

বলিয়া টাকাটা লইয়া বলে, দাও ত একবার খোকা-মণিকে কোলে করি—।

বলিয়া নিজেই বড়-বৌর কোল হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুমু খাইয়া কহে—আমি সব শুনেছি বড়-বৌ। বড়-বৌ চুপ করিয়া থাকে।

সেতাব আবার বলে—এতে খোকার এক গা গয়না হবে, কি বল?—বলিয়া টাকার পুঁটুলীটা নাড়িয়া ওজন দেখিল।

আবার বলে—বংশের মাণিক ও, খালি গায়ে ভাল লাগে না। খোকার হয়েও তোমার ছোট বৌ-মার দুখানা করে হবে, কি বল?

আঃ—কি যে তোরা ঠন্ ঠন্ করিস বাপু, যা—যা এখানে পাঁচীল গাঁথতে হবে না, সদরের পাঁচীল যেটা ভেঙে গেচে গাঁথগে যা। আর বল গে যা পাল্কী চাই নে।

বড়-বৌ স্বামীর মুখপানে তাকায়। সেতাব অতি মিষ্ট হাসিয়া কহে, কত ভুলই মানুষের হয়। বলিয়া খোকাকে আড়াল দিয়া হাতযোড় করে।

রাজ-মজুর চলিয়া যায়, বড়-বৌ কাঁদে, মানদা হাসে, মহাতাপ অবাক—।

খোকামণিকে আদর করিতে করিতে সেতাব কহে, গ্রহের ফের আর কি, কতকগুলো টাকা নষ্ট,—পাঁচীলটা গাঁথা, ক'টাকা গেল আবার ভাঙতে—

মহাতাপ এতক্ষণে লাফাইয়া উঠিয়া কহে—হ্যাঁ, তোমার মত চাম-দাঁড়ির পয়সা লাগে, ও পাঁচীল আমি তিন লাথিতে—

বড়-বৌ মহাতাপের হাত ধরিয়া কহে, থাক্, শেষ আমাকে পদসেবা করিয়ে ছাড়বে। সেঁক করতে আমি পারব না।—

সেতাব হা হা করিয়া হাসে।

এটা তাহার নোতুন।

জল-যাত্রা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

দণ্ড দুই দেরী আছে—যেতে হবে সেই দূরদেশে;
তরণী প্রস্তুত ঘাটে—কে যেন জানায়ে গেল এসে।
প্রস্তুত তো বুঝিলাম, আমারো তো সব ঠিকঠাক;
সুদীর্ঘ প্রবাসযাত্রা—এটা-ওটা-সেটা টুকটাক—
খুঁটিনাটি আয়োজন। সারাদিন পরামর্শ করি'
যা কিছু পারিনু, দিনু গৃহিণীর দুটি হস্ত ভরি'।
কি এমন অসুবিধা? ছেলেটা? আমারি ঘরে যাক্;
গৃহিণী উপরে একা,—মেয়েটা তাহারি পাশে থাক্।
--থাকিস্ মানিয়ে নিয়ে, মিছা কেউ করিস্না গোল;
ঠাকুরের ঘরটাতে—প্রথামত ঠাকুরের দোল—
সেইটে দেখিস্ যেন। বলিবার নাই বড়ো আর—
কি জানিস্—কি জানিস্—মনে আসে তবু বারবার—
থাক্ থাক্—কিছু নয়।

—আরে, আরে, কাঁদিস্না মিছে,—
চোখের জলের ছড়া দিস্নাক' এ যাত্রার পিছে।
সারাটা জীবন মোর ঐ জলে হয়েছে পিছল!
আজিকার যাত্রাপথে ঢালিস্না আর আঁখিজল।

—কই—কোনো চিন্তা নাই—দুর্গা দুর্গা—কিসের বা ভয়?
যাওয়া-আসা, আসা-যাওয়া—তা ছাড়া তো আর কিছু নয়!
চুপ কর্ কাঁদিস্ না—থাম্ থাম্, করিস্ না গোল,
হাঁফটা জিড়িয়ে নিই—হরি বোল, হরি হরি বোল।

—ভয়ের কিছুই নাই—তবে এ যে জলযাত্রা কিনা—
একটু নতুন বটে! পথঘাট কিছু যে চিনি না!
ডাঙার কথা সে এক—অনেক দিনের জানা বটে;
তা ছাড়া ব্যাপারগুলো দেখা যায় চোখের নিকটে।
বাঁধাবাঁধি, জানাশোনা, দায়িত্ব স্থায়িত্ব তার চেনা;
জলের স্বতন্ত্র কথা—ঝাপ্সা যে—ঠিকানা মেলেনা!
—তা'হোক কিসের ভয়—দুর্গা দুর্গা, বল্ হরি হরি;
এ যাত্রা তো দেখা গেল—দেখা যাক্ জলযাত্রা করি'।

কাব্যের মূল

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহানগরীর উপকণ্ঠে চক্রপতির বাসাবাড়ীতে রসচক্র-সভা বসিয়াছে। বর্ষার সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তখনও সভ্যবৃন্দের অনেকেই অনুপস্থিত। সেদিনকার আলোচ্য বিষয় ছিল—কাব্যের মূল শিকড় কোন্ খানে? চক্রপতি মহাশয় দুই এক বার প্রস্তাবটি তুলিলেন। কিন্তু সভায় কবিকেশরী ও কাব্যকুঞ্জর উপস্থিত নাই। সুতরাং গর্জ্জন নাই, শুণ্ডাস্ফালন নাই। সকলেই অধোবদনে নীরবে মূষিক-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কাব্যের মূল শিকড়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত; সভা বুঝি বা জমে না।

তখন "সম্মার্জ্জনী"-সম্পাদক মহাশয় দুর্দ্দিনের দিন-পতি, অগতির গতি, বাক্যপতি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু বুজিলেন অথবা চক্ষু বুজিয়া মুখের দিকে চাহিলেন। সকলেরই প্রাণে আশার সঞ্চার হইল; এই মুদ্রিত নয়নের চাহনি কখনও নিস্ফল হয় নাই, আজও তাহা নিস্ফল হইতে পারে না। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার হস্তস্থিত বিশেষ সংখ্যা 'সম্মার্জ্জনী' বারেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন—বাক্যপতি, তুমি কিছুই বোঝনা, এতক্ষণ যা বলিতেছিলে সমস্তই ভুল। বাক্যপতি অম্লান বদনে বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। সকলেই অবাক! বাক্যপতি মহাশয় ত এপর্য্যন্ত বদনব্যাদানও করেন নাই, অথচ সম্পাদকের এত বড় অপবাদ মানিয়া লইলেন। পুনরায় সকলে নীরব। আজিকার বর্ষায় রসচক্রের চাকা বুঝি বা মেদিনী গ্রাস করিয়াছেন!

বিশ্ব-সঙ্গীত

এমন সময় সুরেশ্বরের আবির্ভাব। সুরেশ্বরের এই অপ্রত্যাশিত শুভাগমনে সভায় সহসা নব-জীবনের সঞ্চার হইল, একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সুরেশ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল—কাব্যের মূল শিকড় কোথায়? ঠিক কথা; শ্রেষ্ঠ কবিদের, মনের বীণায় বিশ্ব-সঙ্গীতের সুর বাঁধা আছে, তাই তাঁহারা সেই সুরে সুর মিশাইয়া কবিতা লেখেন আর কবিতা উৎরাইয়া যায়, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ! আর তোমরা—এই বলিয়া সভাস্থ দু'চার জন কবিত্বাভিমানী লেখকের দিকে চাহিল। আর তোমরা বাহির থেকে সুর খুঁজিয়া আনিতে চেষ্টা কর, ধরিতে পার না। ভিতরের যন্ত্র সুরে না বাঁধা হইলে যা হয়; অর্থাৎ তোমরা যা লেখ তা বেতালা, বে-সুরো কেবল কথার স্তূপ! একজন প্রতিবাদ করিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুরেশ্বরের তখন সুর পাইয়াছে, শুনিবে কে? সে আপন ঝোঁকেই বলিয়া চলিল - এই ধর রবীন্দ্রনাথ, তিনি "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" লিখিলেন, "প্রভাত-সঙ্গীত" লিখিলেন এবং তোমাদের জন্য বাকী রাখিলেন "মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত" "নিশীথ-সঙ্গীত"—কিন্তু তোমরা পারিলে কি? তোমাদের ভিতর বিশ্ব-সঙ্গীত নাই যে, কোথা হইতে পারিবে? এই এখন ত সন্ধ্যা, বিশ্ব-বীণায় এখন যে অবসাদ-শ্রান্তি-শান্তি-সংমিশ্রিত অপূর্ব্ব সঙ্গীত বাজিতেছে তাহা ধরিতে পারিতেছ কি?

তখন সভাই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সামনের রাস্তা দিয়া লরি, মোটর, গরুর গাড়ী কচিৎ এক আধখানা ঘোঁড়ার গাড়ী নিজ নিজ সুর-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, পাশের খানিকটা ফাঁকা যায়গায়, সহরে যাহাকে 'মাঠ' বলে, বৃষ্টির জল জমিয়া থাকায় ভেকেরা বেশ সুবিধা পাইয়াছে, তাহারা নিমকহারামের মত চুপ করিয়া ন'ই, ঝিঁঝিঁপোকারাও হাজার কণ্ঠে জয়গান করিতেছে। সভাস্থ অনেকেই এই সমবেত একতান-বাদনের আভাষ পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই কেহ কেহ বলিল—হাঁ, কতকটা বটে। অর্থাৎ তাঁহারা পুরাপুরি বিশ্ব-সঙ্গীত শুনিতে না পাইলেও বিশ্ব-কন্সার্ট শুনিয়া এইটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে ইহার পিছনে একটী বিশ্ব-সঙ্গীত নিশ্চয়ই আছে। কানটা আর একটু লম্বা হইলেই সেটা শুনিতে পাওয়া অসম্ভব নয়। সুরেশ্বর কতকটা খুসী হইয়া বলিল—দেখ, সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতে গেলে তোমরা হয়ত আরম্ভ করিবে—

ডাকে ব্যাং ডাকে ঝিঁঝিঁ পোকা,
ট্যাক্সি লরী ডাকে একরোখা।

অথবা

প্রতীচির সিঁথীর সিঁদুর
মুছে দিল অম্বর মেদুর—

একজন বাধা দিয়া বলিল—সিঁদুর না লিখিয়া সেঁদুর লেখাই এখানে উচিত। আর একজন বলিল—আহা! সিঁথীর সিঁদুর বজায় থাক্, মেদুরকে মিদুর করাই ভাল। সুরেশ্বর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—সঙ্গীত যখন আসে নাই, তখন মিলের খাতিরে অনেক কিছু করা চলে। মিদুর কেন ইঁদুর হইলেই বা ক্ষতি কি? সকলে বলিল, তথাস্তু। সুরেশ্বর সেই স্যাবেক সুরের জের টানিয়াই বলিতে লাগিল, তোমাদের সন্ধ্যা-সঙ্গীত এইরূপই একটা কিছু হইবে, কিন্তু কোন্ শ্রেষ্ঠ কবি এখানে কি বলিয়া আরম্ভ করিতেন?—সন্ধ্যা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।

একজন হাসিয়া বলিল—আর একজন ছোট কবি কিন্তু লিখিয়াছেন—বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী। সুরেশ্বর বলিল—তবেই তফাৎটা বুঝিয়া লও। সন্ধ্যা প্রতিদিনের, শাশ্বত, সনাতন, আর বর্ষা বৎসরে দুই তিন মাস মাত্র, তাও আবার সব বছর সমান নয়। কবির বিশ্ব-দৃষ্টি থাকিলে কি এরকম অল্প লইয়া খুসী হইতে পারিতেন? বড় কবি ও ছোট কবির তফাৎ কোন্খানে আরও একটু বিশদ করিয়া বলি, নহিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে না, ব্যাপারটা গুরুতর কিনা। এই দেখ কোন ছোট কবি অর্থাৎ যার হৃদয়-যন্ত্র বিশ্ব-সঙ্গীতের সুরে বাঁধা নাই, বলিয়াছেন—

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

আর প্রকৃত কবি যাঁর হৃদয় বিশ্ব-সঙ্গীতে: ভরপুর তিনি কখনই সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপমান করিবেন না, বরং তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়জনকেই আদর করিয়া বলিবেন—ওগো তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও!

বিশ্ব-চিত্র

সুরেশ্বরের কণ্ঠ বিশ্ব-কন্সার্টের সুরে বাঁধা ছিল; সুতরাং সকলেরই কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইতেছিল। এমন সময় সহসা চিত্রেশ গুপ্তের প্রবেশে ব্যাপারটা সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারিল না। চিত্রেশ গুপ্তকে সকলে চিত্র-গুপ্তই বলিত। চিত্রেশ চিত্র-শিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল—ছবি আঁকিয়া নয়, অপরের আঁকা ছবির কঠোর সমালোচনা করিয়া। সে জানিত যে কাব্য বল, সঙ্গীত বল, দর্শন বিজ্ঞানই বল, এমন কি মুক্তিসাধনা পর্য্যন্ত, কিছুই সফল হইবে না যদি না শিল্পী ও সাধক চিত্র-সাধনার পথ ধরিয়া চলে। তার দৃঢ় অভিমত এই যে শ্রেষ্ঠ কবি হইতে গেলে আগে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হইতে হইবে; যে কবির হৃদয়-পটে বিশ্ব-চিত্র আঁকা নাই সে কখনই যথার্থ কবি হইতে পারে না।

চিত্রেশ ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই বলিয়া উঠিল—বাঃ! এতক্ষণ চিত্র-শিল্পেরই আলোচনা হইতেছিল দেখিতেছি—সকলেই সমস্বরে একটু দ্বিধা না করিয়া বলিয়া উঠিল, হাঁ। চিত্রেশ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, বলিল—তোমরা ছবির কি জানহে যে ছবি লইয়া তর্ক করিতে বসিয়া গেছ? একি সঙ্গীত যে—এই বলিয়া সুরেশ্বরের দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টি হানিল। সুরেশও দমিবার লোক নহে, বলিল, দেখ চিতু, বিশ্ব-থিয়েটারে শুধু গোটাকতক 'সিন' থাকিলেই চলিবে না, সঙ্গীত চাই-ই, 'সিন' একেবারে বাদ দিলেও ক্ষতি হয় না, এই যেমন যাত্রা শুধু গানেই মাৎ। চিত্রগুপ্ত অবজ্ঞায় হাসিয়া উঠিল, বলিল—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবিয়া কথা কও সুরেশ; তিনি ত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিশ্ব-সঙ্গীত সাধনা করিলেন, নামও নিলেন কিন্তু ফলে দাঁড়াইল কি? সেই শেষ বয়সে চিত্র-সাধনা করিতে হইতেছে। লোকটার উপর বিশ্ব-চিত্রকরের অসীম কৃপা হে, তাই এত দিন পরেও তিনি তাঁর একনিষ্ঠ সাধককে ঠিক পথটা বাৎলাইয়া দিলেন। এইবার দেখে নিও, আর দু'এক বছর পরেই কবিবরের লেখায় বিশ্ব-চিত্র ফুটিয়া উঠিবে, এখনই রং ধরিয়াছে। তোমরা একটা কথা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, শ্রেষ্ঠ চিত্র ও শ্রেষ্ঠ কাব্য একই জিনিষ—ভার্জ্জিলের ইলিয়াড্ আর র‍্যাফেলের লোণা মিসা একই হে, একই ব্রহ্ম-পদার্থের এপিঠ ওপিঠ।

প্রথমে সকলেই স্তম্ভিত! ক্রমশঃ চাপা হাসি, পরে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত। বাক্যপতি বলিল, না, আর সহ্য হয় না। চক্রপতি ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিবারণ

করিলেন। সুরেশ্বরও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু এমন সময় সহসা, হঠাৎ,—আচম্বিতে সভাগৃহে ভাস্করের উদয়, ভাস্কর ভাস্করেরই মত। সকলেই সমস্বরে আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, এস এস ভাস্কর বে—

বিশ্ব-ভাস্কর্য্য

ভাস্কর এই আদর-আপ্যায়ণ গ্রাহ্যও করিল না, বলিল, —কবি-কেশরী কোথায়? মুখফোঁড় বাক্য-পতি বলিল, কেন সিংহ-ব্যাঘ্র না হইলে কি চলিবে না? মেষ মহিষ লইয়াই একদিন চালাও না। ভাস্কর হাসিয়া বলিল, তোমরা বুঝিবে না। বাক্যপতি বলিল, নাই বুঝি তবুও বল। ভাস্কর বলিল, দেখ বড় কবি হইবার একটা trade secret আছে সেটা আমি কবি-কেশরীকেই দিতে চাই কারণ তোমাদের সকলের চেয়ে ওবই promise বেশী। সুরেশ্বর বলিল, ভাই আজ উঠি। চিত্রেশ কিছু না বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলে বহু কষ্টে তাহাদের বসাইল। ভাস্কর বলিল, আচ্ছা, তবে শোন—এই ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্ব-ভাস্কর্য্য বলিয়া একটা অতি নিগূঢ় বস্তু আছে, সেটা আয়ত্ত না করিলে কেহ-ই বড় কবি হইতে পারে না। তোমরা লিখিয়া মর কেন? আগে ছেনীবাটালীতে হাতে খড়ি দাও, মর্ম্মর পাথর কুঁদিয়া হাতবাক্স কর, পরে কাগজ কলম ধরিয়ো, একেবারে নিখুঁত কবিতার উদ্ভব হইবে। তোমরা কোন ছার, তোমাদের রবীন্দ্রনাথই বা কি! তাঁর প্রাণের ভিতর তোমরাই বল নাকি বিশ্ব-সঙ্গীত গজ গজ করিতেছে, আবার বিশ্ব-চিত্রও নাকি গজাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু ভাই সব, ঠিক জানিয়ো যতক্ষণ না তাঁর মধ্যে বিশ্ব-ভাস্কর্য্য প্রবল হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি খাঁটি কবিতা লিখিতে পারিবেন না। এ আমি হলফ্ করিয়াই বলিতে পারি। তিনি কলম ছাড়িয়া তুলি ধরিয়াছেন, কিন্তু যদি অমর কবি হইতে চান, তবে তাঁকে ছেনী-বাটালী ধরিতেই হইবে!

বিশ্ব-স্থাপত্য

পর পর আজ যা সব হইতেছে তা'থেকে সবারই প্রাণে একটা সাহেতুকী আশঙ্কা জাগিয়াছে, সকলেই ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত হইল। সম্মার্জ্জনী-সম্পাদক বলিয়া উঠিলেন,—আর একটু দেরী করিলেই বুঝি বা কোন "বিশ্ব-স্থপতি" আসিয়া তাজমহলকেই আদর্শ কাব্য খাড়া করিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে কর্ণিক দিবার আব্দার করিয়া বসিবেন। না—এই বেলা মানে মানে সরিয়া পড়া যাক। সম্পাদক মহাশয়ের মুখে এমন মৌলিক কথা কদাচ শুনা যায়। সুরেশ্বর, চিত্রেশ ও ভাস্কর বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

বিশ্ব-রস

এমন সময় ছাতাহীন মাথায় ভিজিতে ভিজিতে চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইলেন, আমাদের রসিক দা। সকলেই ভাবিল। আঃ আজ আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না দেখিতেছি। কেহই ডাকিল না, তবুও রসিক দা হাসিমুখে একেবারে ঘরের মাঝে আসিয়াই আরম্ভ করিলেন—

আজি, যা দিস্ কে বল মাদলে,—ফাটা মাদলে
গগনের ফাটা মাদলে,
আহা, রসধারা ঝরে বাদলে—সাঁঝের বাদলে
শ্রাবণ-সাঁঝের বাদলে!
তোরা এসেছিস্ বুঝি না বলে—ঘরে যা চলে
সকলে বাঁধা যে আঁচলে,
তবে আমি ত যাব না এ জলে—তা বলে
বলুক না এরা যা বলে।

এই বলিয়াই রসিক ভিজা কাপড় জামাতেই স্বচ্ছন্দে একটি তাকিয়া টানিয়া লইয়া অম্লান বদনে বলিলেন—চা কই হে? আর দেখ তোমরা কবি বলে মনে মনে অহঙ্কার কর। কাব্যের মূল শিকড় যে কোথায় তা কি কোন দিন কেহ খোঁজ করেছ? বাক্যপতি বলিল—আজ তার সন্ধান পাইয়াছি রসিক দা। রসিক বলিল—কোথায় হে? বাক্যপতি বলিল—সুরেশ্বর বলে বিশ্ব-সঙ্গীতে, চিত্রগুপ্ত বলে বিশ্ব-চিত্রে, ভাস্কর বলে বিশ্ব-ভাস্কর্য্যে, লেস্লী নিশ্চয়ই বলিবে বিশ্ব-স্থাপত্যে, তুমি বলিবে বিশ্ব-রসে। রসিক বলিল, আরে থাম্ থাম্—রসের কথা তোদের কাছে আর যদি কখনই উত্থাপন করি ত আমার দিব্যি। তোরা রসের কি বুঝিস? বাক্যপতি বলিল—তোমার কি মত রসিক দা, কাব্যের মূল শিকড় কোথায়?

রসিক বলিল—আমার সঙ্গে যাস্, দেখিয়ে দেবো কাব্যের মূল শিকড় নূতন বাজারে বেদেনীরা বিক্রি করে। সেই শিকড়-ছেঁচা রসে ভাস্করের ছেনি বাটালির পান্ হয়,

তাই সিদ্ধ কোরে থেয়ে সুরেশ্বরের গলা অমন বিষম মোলায়েম; আর তারি ছিবড়েগুলো চিবিয়ে চিত্রেশ তার তুলি তৈয়ারী করে। সম্পাদক মহাশয়রা তারই বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করেন।

যুগপৎ সুরেশ্বর গুল পাকাইয়া দাঁড়াইল, চিত্রগুপ্ত কোন থেকে লাঠিটা বাগাইয়া ধরিল, ভাস্করের হাতে একটা ইস্পাতের বাঁটওয়ালা শক্ত ও তীক্ষ্ণ ছাতা ছিল, সে তাই ও সম্পাদক মহাশয়ও সম্মার্জ্জনী হস্তে দাঁড়াইলেন। বাহিরে ঝম ঝম বৃষ্টি, মাঝে মাঝে অশনি-গর্জ্জনও হইতেছে। ঘরেও দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের সূচনা, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে কার কণ্ঠে পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিল। চক্রপতি কিন্তু স্থির ধীর। এক হাতে রসিক দাদাকে এবং অপর হাতে সুরেশ্বর-প্রমুখ সম্মিলিত বাহিনীকে অনায়াসে নিবারণপূর্ব্বক তিনি বলিলেন—কাব্যের মূল শিকড় যখন মিলেছে তখন আজিকার মত সভাভঙ্গ হউক। আগামী অধিবেশনে কাব্যের ফলভোগ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

তাজ-পরিক্রমা

শ্রীগোপাললাল দে

তরুবীথিরম্য ঝিল সম্মুখেতে সরিত-মুকুর,
মধ্যে শ্বেত শিলাসন, দূরে দূরে দুইটি তোরণ;
মর্ম্মর-গুম্বজদু'টি দুই পার্শ্বে, অপ্সরার পুর,
উঠিতে মিনারকোণে, চারিধারে শ্যাম-শষ্প বন।

সুনীলসলিলা সখী যমুনা সৈকতশোভা লয়ে
শিয়রে বহিছে সদা, বন-বায়ু শিহরে সলিলে;
লোচন-লোভন ঘন পরিপাটি শিয়রেতে রয়ে,
দিয়াছে নন্দন-শোভা ধরণীর ধ্যানের মঞ্জিলে।

সাধ যায়—এই ক্ষণে, এই খানে, এই যে নিরালা,
প্রেমভারে আমন্থর এ নবীন দেহ গুরুভার
অর্পিয়া অমর হই; মোরও এক স্বপ্নময়ী বালা
আমিও ত হারায়েছি, তবে আর কেন অভিসার!

হে তাজ! তোমার পার্শ্বে রেখে যাই মুগ্ধ হিয়াখানি,
তোমার শ্রীঅঙ্গে-অঙ্গে মিলায়েছে আমারও ইরাণী।

রাশিয়া ও নারী

শ্রীসুনীলকুমার ধর

ও-দেশী লোকের মুখে আজকাল প্রায়ই দুটো ছোট কথা শুনতে পাওয়া যায়—Russian Vodka ও Indian Salt. কথাদুটো অবশ্য দুটো দেশের লোক ও মনোভাবকে ঠাট্টা করার জন্যেই সৃষ্টি করেছে এবং আজ পর্য্যন্ত ওদের খুব কম ডিনার-পার্টি বাদ গেছে যেখানে এই কথা দুটো অন্ততঃ বার দশেক কোরে উচ্চ হাসির সঙ্গে উচ্চারিত হয়নি।

মানুষের কোন দুর্ব্বলতাকে নিজের রচিত ভাষা বা ভঙ্গী দ্বারা উপভোগ করবার যে চেষ্টা তাকে সাদা কথায় ঠাট্টা বলে। নিছক হাসি বা মজার জন্যে যে ঠাট্টার সৃষ্টি তা যখন অপর পক্ষের মনক্ষুণ্ণ করবার উপক্রম করে, তখনই থামিয়ে দেওয়া উচিত—নইলে ঠাট্টার যে একটা সহজ সম্পর্ক আছে সেটাও নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু কাউকে যখন ঠাট্টা করার ছলে আঘাত করাই উদ্দেশ্য হয়, তখন সে ঠাট্টা ন্যায় বা অন্যায় কিংবা অন্য পক্ষের অনুভূতি বা আত্ম-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কোরছে কিনা তা ঠাট্টাকারী দেখতে চায় না। আসলে সেটা দেখার মত মনের যে অবস্থা, তা ঐ ঠাট্টা কোরে অপদস্থ কোরতেই হবে এই মনস্তত্ত্বের আড়ালেই ঢাকা পড়ে যায়। এই জন্যেই হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা, এটা ঠেকে শেখার কথা, কোন দিনই শুনে বা দেখে বুঝা যায় না।

তাই হঠাৎ যেদিন ওরা দেখলে, ঐ ভোদকার মাতালরা তাদের চোখের সামনেই অসাধ্যসাধন করার আশায় বেলেল্লাপণা (?) সুরু কোরেছে, সেদিন চমকে উঠল। কিন্তু প্রতিবিধান করার কোন ক্ষমতাই নেই বলে' মাতব্বরী মুচকি হাসি হেসে বল্লে—মাতালদের কাণ্ডই আলাদা।

আলাদা বলেই তো ওরা আজ মানুষের ভবিষ্যৎ পথ-প্রদর্শক হবার দাবী কোরছে!

এদিকের ঠাট্টা কিন্তু পুরোদমেই চলতে লাগল। ঠাট্টা চলে, কথায় কথায় শোনাও যায়। 'I shall make salt out of you'! কিন্তু ঠাট্টার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণখোলা হাসি আর শোনা যাচ্ছে না, যদিও ওদের ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্য আজও ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু হাসি যে কেন থেমে গেছে, সে কথা ওদের জিজ্ঞাসা কোরলেও জানা যাবে না।

বড় জোর হয়ত মাতব্বরী চালে ব'লবে—প্রথম নেশা কোরতে শিখলে মানুষ নেশার জন্যে এমনিই ব্যাকুল হয়ে ওঠে; শিশু যখন প্রথম 'মা' বলে ডেকে অপ্রত্যাশিতভাবে মায়ের চুমো ও আদর পায় এবং যেমন ঐ চুমোর লোভেই বার বার মা, মা, বলে ডাকে, এদের নুন তৈরী করাও ঠিক তেমনি! এ কথার জবাব দেবার সময় আজও আমাদের আসে নি! কিন্তু এ সব কথা থাক্!

যারা রাশিয়ার মতবাদকে শ্রদ্ধা করে, তাঁদের উপর যাদের বিশ্বাস আছে, তারাও কিন্তু রাশিয়ার বর্ত্তমান একটা মত-প্রবর্ত্তনের সমর্থন কোরতে পারছে না। সেটা হচ্ছে, নারীর বাধ্যতামূলক যুদ্ধশিক্ষা।

নর-নারীর পরস্পরের সহযোগে, অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের গণ্ডির বাহিরে, এমন কোন কোন কাজ আছে যা কেবল নরের জন্যে, কিংবা নারীর জন্যে। নারী যদি এই কাজে নরের সমকক্ষ হ'তে চায়, কিংবা নর যদি নারীকে সাহায্য করবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তা নিছক অনধিকারচর্চ্চা ও আব্দার! এ নিয়ে তর্ক করা চলে কিন্তু সত্যকে রূপান্তরিত করা যায় না!

যে নারী এতদিন পুরুষের শান্তি ও সান্ত্বনার আধার ছিল, সেই নারীর নামে পুরুষকে যদি দুদিন পরে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়, তা হ'লে কর্ম্মক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্যে, সান্ত্বনা ও সেবার জন্যে পুরুষ যাবে কার কাছে? নারীর নিকটে পুরুষ যে শান্তি ও সেবা পায় তার বিনিময়ে পুরুষকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলেও—গাছের ছায়ায়, নদীর জলে পুরুষের এ ক্লান্তি ও তৃষ্ণা মেটে না ব'লেই. প্রথমতম পুরুষের জন্যেও নারীর প্রয়োজন হ'য়েছিল।

রাশিয়ায় সম্প্রতি এই নিয়ম প্রচলিত করা হ'য়েছে যে, কিশোরী মেয়েরা তাদের বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশে ঘরে না থেকে তাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছাউনীতে গিয়ে, যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা গ্রহণ কোরবে দিন পাঁচ ঘণ্টা। সুন্দরী কিশোরী মেয়েদের বিষয়ে কথাটা শুনতে খারাপ। কল্পনায় ভাবতেও মন কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে!

যে দেশে পুরুষের সংখ্যা এত অল্প নয় যে দু'একটা যুদ্ধের পরই ইয়োরোপের কোন কোন দেশের মত একটি পুরুষের একাধিক ব্যবস্থা কোরতে হবে, সে দেশে এখনই এ ব্যবস্থা কেন? এ যে চলতে পারে না বা চলবে না এটা ঠিক। তবুও যাঁরা এই নীতিপ্রচলনের চেষ্টা কোরছেন, তাঁদের লক্ষ্যস্থল হয়ত শুধু রাশিয়া নয়। সমস্ত পৃথিবীও যদি তাঁদের উদ্দেশ্যস্থল হয়, তবুও মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁদের এখনি থেমে যাওয়া দরকার।

নারী কিংবা নারী-প্রভাবকে কেন্দ্র কোরে পুরুষের জীবন-শতদল নানা কাজের মধ্যে দিয়ে একটির পর একটি দল বিকশিত কোরে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে, তারই প্রেরণায় জগতের সকল সাহিত্য ও শিল্প; সেই নারী-অন্তরের অজ্ঞেয় রহস্য, কোমলতা, মমতা ও ভালবাসা যদি না থাকল তা হ'লে সঙ্গীন ঘাড়ে কোরে তারা যখন পুরুষের সামনা সামনি দাঁড়াবে তখন তাদের সাহসী যোদ্ধা বলে তারিফ করা চলবে হয়ত—কিন্তু যুদ্ধের পরেও যদি তাদের বেঁচে থাকতে হয়, তখন তাদের একমাত্র কাম্য মুক্তি হবে মৃত্যু। পৃথিবীতে নর ও নারী এই পরিচয় নিয়ে তারা আর একঘরে বাস করতে পারবে না!

মনে করুন দেখি, একটি ছেলে জ'ন্মে যে মাকে দেখলে না, পথে পথে পরের অনুকম্পা ও অবহেলার ছায়ায় যে পুষ্ট হ'য়ে উঠল—কৈশোরে যে একটি মাতার ভালবাসা পেলে না—দুটো মিষ্টি কথা শুনল না, যৌবনেও কোন নারীর জন্যে মমতা ও আগ্রহ এসে যদি তার এই দুঃখ কষ্টের জীবনকে মধুর কোরে না তোলে—তা হ'লে সে অবশ্য সারা জীবনই দিবারাত্রি একটির পর একটি কোরে যুদ্ধ কোরে যাবে এবং ঐ অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ কোরেই সে মরবে—কিন্তু যুদ্ধেরও যে শেষ আছে, এ খবর ত সে জানল না!

তার পৃথিবীতে আসার সার্থকতা কোথায়?

দুরাত্মাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নারীর যেমন অস্ত্রচালনাশিক্ষা এবং আশু মুক্তির জন্যে কোন কোন কৌশল শিখে রাখা অন্যায় নয়, তেমনি অদূর ভবিষ্যতেই যে নারীর উপর পুরুষ আর সহসা শারীরিক বলপ্রয়োগে অপমান করতে পারবে না, এটাও ঠিক। বন্ধ ঘরের দরজা খুলে তারা বাইরে আসতে পারবে—পথ চলার শক্তি তাদের আপনা থেকেই সংগৃহীত হবে। তার জন্যে জাঁক করবার দরকার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলার দরকার যে, রাশিয়া অদূর অতীতে যে স্বাধীনতা পুনর্জ্জয় কোরেছে, তার জয়যাত্রাকে চারিদিক দিয়ে সফল কোরে তোলার মূলে ছিল রাশিয়ার পুরুষ ও নারীনির্ব্বিশেষের আপ্রাণ চেষ্টা। রাশিয়ার স্বাধীনতার জন্যে রাশিয়ার মেয়েরা শুধু স্বামী হারায় নি, বা কোলের ছেলে দেয় নি, রাশিয়ার এই স্বাধীনতার ভিতর গোড়ায় তাদের নিজেদের রক্তও ঢেলেচে অনেক।

তা হ'লেও কোন দিক দিয়েই রাশিয়ার এ মতকে সমর্থন করা যায় না, কেন না স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে রাশিয়ার নারীদের পূর্ব্বে যদি আড়ম্বরের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন না হ'য়ে থাকে, ভবিষ্যতে কোনদিন পুনরায় যদি তাদের সাহায্যের দরকার হয়, তখন তারা নিজেরাই এসে এবারের পুরুষের পাশে দাঁড়াবে, আহ্বান বা আয়োজনের অপেক্ষা কোরবে না। প্রতিদেশেই দেখা গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে যেদিন নারীর প্রয়োজন হ'য়েছে (যদিও খুব বেশী হয় না, নাম হিসাবে ছাড়া) সে দিন নারী, পুরুষের আহ্বান প্রতীক্ষা কোরে দোর বন্ধ কোরে ব'সে থাকেনি, যুদ্ধে যাবার জন্যে তারা যে সঙ্গীন নিয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত হ'য়েছিল এমন কথাও শোনা যায় না। প্রয়োজনই তাদের সকল বন্ধন মুক্ত কোরে দিয়েছে।

এ প্রতিবাদ রাশিয়ার বিপক্ষে নয়, তার মতবাদের বিরুদ্ধেও নয়, এ শুধু নারীত্বকে যারা অবহেলা কোরতে চায়, মাতৃত্বকে যারা অস্বীকার কোরতে চায় তাদের বিপক্ষে।

যুদ্ধবিদ্যা শিখলেও যে নারীসুলভ কোমলতা পরিপূর্ণ ভাবে থাকা সম্ভব, সে কথাও আমি একেবারে অস্বীকার করছি না কিংবা দিবসে যে নারী যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য পুরুষ হত্যা কোরেছে, রাত্রে সে যে কোন পুরুষকে আনন্দ দিতে পারে না এমনও নয়। কিন্তু ভাবতেই যে ভাল লাগে না, "Here are two hands already to open wounds that formerly had the noble mission of closing them......"

"To habituate the mother of a family to the idea that her most sacred function is no longer to give life, but to deal out death"

নব্য হিন্দুর দায়িত্ব

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

*　　*　　*　　*

একদিন হিন্দুত্বের দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার আমাদিগকে নষ্ট করিতে বসিয়াছিল, ইহার সত্যতাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে আন্দোলন প্রচলিত হয়, আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যুবক সেই আন্দোলনের শেষ ফল। দাম্ভিক হিন্দুত্ববোধ ও তাহার গোঁড়ামী ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে গিয়া সে আজ হিন্দুত্বের সত্যকার মাহাত্ম্যবোধ ও গৌরবানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল যে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাই নহে,—হারাইয়া ফেলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে জানি না।

আত্ম-বিস্মৃতির এই অতলতার মধ্যে ডুব দিয়া হিন্দু যুবক আজ কি রত্ন খুঁজিয়া মরিতেছে? তাহার নিজের খনিতে কি রত্ন নাই? মণিমাণিক্যের সন্ধানে কি তাহাকে আজ ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান যুগের প্রথম ও প্রধান হিন্দু-প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের মুখে হিন্দুধর্ম্মের যে তেজগর্ভ মর্ম্মবাণী বজ্র-নির্ঘোষে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা তাহার কর্ণে কি প্রবেশ করে নাই?

"One of those little handful nations can not keep alive for two centuries together, and our Institutions have stood the test of ages, says the Hindu. Yes, we have buried all the old nations of the earth and stand here to bury all the new races also, because our old ideal is not this world but the Other."

(*Woman of India, pp 23*)

গত কাল নয়, আজ নয়, আগামী কাল নয়, অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল আমি আছি, আমি থাকিব। কেননা আমার আদর্শ ত' এই পৃথিবীর চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া মরে নাই, আমার আদর্শ ইহকাল ছাড়াইয়া পরকালে পরিব্যাপ্ত,—ইহাই হিন্দুর মর্ম্মবাণী। ধর্ম্মকে হিন্দু বলিয়াছে—

যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ

[বৈশেষিক দর্শন, ১।১।২]

—অভ্যুদয় হইতে নিঃশ্রেয়স, আদি হইতে অন্ত, সূচনা হইতে সমাপ্তি, ইহ হইতে পর—হিন্দু ধর্ম্মের প্রগতি ত এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

ঐহিক কর্ত্তব্যকে হিন্দু কোনও দিন তাচ্ছিল্য করে নাই, হিন্দু বলিয়াছে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত তোমার হইল—ততোকিম্?

—অভ্যুদয় ত দেখিলে—নিঃশ্রেয়সের পরিচয় গ্রহণ কর। অন্যান্য সকল চিন্তাধারাকে হিন্দুদর্শন এইখানে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং সে চিন্তা দুই চারিজন মুনি ঋষির গ্রন্থসমষ্টির মধ্যেই নিঃশেষিত হয় নাই। সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত প্রত্যেক হিন্দু তাহার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে এই চিন্তা বহন করিয়া ফিরিয়াছে।

People of Indiaয় মিঃ রিস্‌লি বলিয়াছেন—

মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

"These ideas are not the monopoly of the learned, they are shared in great measure by the man in the street."

(*People of India—Risley*)

১৯১৪ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মিঃ বার্ণস বলিতেছেন :—

"The general result of my enquiries is that the great majority of the Hindus have a firm belief in one supreme God."

(*Census Report, 1924, M. Burns*)

হিন্দু চিন্তাধারার আর একটি বিশেষত্ব—ব্যক্তি ও সমষ্টির একত্বানুভূতি। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে তাই আমরা ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখি না। সমষ্টির মধ্যে পাই—জ্ঞান ও আনন্দের চরম বিকাশ—এই সমষ্টির জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির পরিপূর্ণতায়। ব্যক্তি বলিতে হিন্দু শুধু মানুষকেই বুঝে না—সমুদায় জীবকেই বুঝে। ব্যক্তি-মানুষে নহে—সমষ্টি-জীবে হিন্দু চিন্তার ধারা প্রবাহিত। প্রস্তরে যাহা সুপ্ত, জীবে যাহার স্বপ্নাবস্থা, মানুষে তাহাই জাগ্রত—'a spirit which sleeps in the stone, dreams in the animal and awakes in man.' যখন তুমি জ্ঞাতা তখন "তৎ" অথবা সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুই তুমি—"তত্ত্বমসি" ইহাই হিন্দুর অন্তর্নিহিত শিক্ষা।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

—তত্ত্বমসি- হইতেছে হিন্দুর বিশ্বানুভূতির মূল কথা। বিশ্বদর্শন ত তত্ত্ববিদ্যা। পুরাণ বলিয়াছেন—সর্ব্বজীবের আশ্রয় ও সমষ্টি নারায়ণ, তিনিই ব্যষ্টি-নরে পূর্ণ মহিমায় প্রকটিত।—নারায়ণ এক এবং বহু; সর্ব্বাশ্রয় এবং নিত্য, সর্ব্বাধারে বহু হইয়া সর্ব্ব জীবে বিরাজমান; নারায়ণ সমষ্টি-মানব, এক তিনি বহু হইয়াছেন।—তিনিই বিশ্ব-মানব—মানব-কল্যাণে দেশ, কাল, জাতি ও সমাজে তিনি অভিব্যক্ত; বিশ্বমানবই মানবত্বের মূল—পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিণতি বিশ্বমানবে। তাই বলিতেছি, হিন্দু ধর্ম্মের মত এত বড় উদার ধর্ম্ম আর নাই—নিখিল মানব-জাতির কল্যাণ যে ধর্ম্মের মূল-মন্ত্র সে ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে শুধু হিন্দুর নহে, বিশ্ব-মানবের শাশ্বত কল্যাণের উদ্ভব হইবে।

* * * *

বাস্তবকে হিন্দু দর্শন কোনও দিন তুচ্ছ করে নাই, dignity of labour, work is worship—এই সব সস্তা ইংরাজী বুলি আজ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া আজ আমরা নিজেদের বিচার করিতেছি—এ লজ্জা রাখিবার স্থান আমাদের কোথায়?

মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা বলিতে পারিবেন—কি করিয়া কশাই-এর কর্ত্তব্যকেও হিন্দু পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়াছে।

কোনও সঙ্কীর্ণতা হিন্দুর নাই; আজ যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার রীতি-নীতির শৃঙ্খল আমার পায়ে পায়ে বাজিয়া উঠিতেছে, তাহার একটিও হিন্দু দর্শনের নির্দ্দেশ নয়; পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাহাদের জন্ম, সাময়িক হিসাবে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সমাজপতিরা সেগুলির প্রচলন করিয়াছিলেন মাত্র—শৈবালের মত তাহারা কূলে আসিয়াছিল স্রোতের টানে, আবার অপ্রয়োজনের মধ্যেই তাহারা ভাসিয়া যাইবে; প্রবহমান বিপুল জলস্রোতে তাহাদের স্থান নাই। আজ বদ্ধজলায় তাহারা পাঁক জমাইয়া তুলিয়াছে, সে পাঁকে ডুবিয়া নিজেরা মরণযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি—প্রতিপক্ষ সে সুযোগ উপেক্ষা করিবে কেন? মুমূর্ষুর মত পড়িয়া না থাকিয়া সবল বাহুতে যদি এই শৈবালদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি—তবে নিজেরাও মরি না। বিপুল জলস্রোতের অব্যাহত প্রবাহ আবার ফিরিয়া আসে।

যাহা চাই তাহা এই বিপুল বল, অমিত তেজ, পৌরুষের অনতিক্রম্য প্রভাব। চাই ঋজু মেরুদণ্ড, সাহসবিস্তৃত বক্ষস্থল—সত্যভাষণের অকুণ্ঠ কণ্ঠ।

অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দু ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। শূদ্র নাকি ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য! মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪৮ অধ্যায়) দেখিবেন—রাজসূয় যজ্ঞে কি কাণ্ডটাই না ঘটিয়াছিল,—রাজারা ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করিতেছেন এবং সেই পরিবেশক রাজন্যবর্গের মধ্যে চীন, যবন, পারসীক, শক, হূন, তুষার, রোমক প্রভৃতি কেহ বাদ যায় নাই।

গুণবিভাগ করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কোনও বর্ণ কোনও বর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ বোধ ছিল না। সমাজ-রক্ষার জন্য সকল গুণ, সকল কার্য্য অপরিত্যাজ্য বলিয়া ধরা হইত। চারি বর্ণের উপরই শাস্ত্রের সমান শ্রদ্ধা ছিল। চারি বর্ণ-ই শাস্ত্র কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে—ব্রহ্মণ্য দেব, নৃদেব, অর্য্য বা গুপ্ত দেব, দাস দেব। (ঋক, পুরুষ সূক্ত, দ্বাদশ মন্ত্রের সায়ন ভাষ্য)। শান্তি পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে দেখি কর্দ্দম ব্রাহ্মণের পুত্র বেণ হইলেন রাজা,

তাঁহার দুই পুত্রের একজন নিষাদ হইলেন ব্যাধ, আর একজন পৃথু হইলেন রাজা। এই উদার সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অস্পৃশ্যতার স্থান কোথায়?

অসবর্ণ বিবাহ লইয়া পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার Hindu View of Life-এ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

"The Hindu thinkers perhaps through a lucky intuition or empirical generalisation assumed the fact of heredity add encouraged marriages among those who are of approximately the same type and equality. If a member of a first class family marries another of poorer antecedents, the good inheritance of the one is debased by the bad inheritance of the other, with a result that the child starts life with a heavy handicap. If the parents are of about the same class, the child will be practically the equal of the parents."

(*pp 101—103.*)

অসবর্ণ বিবাহের জন্মেতিহাস পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণের এই উক্তি হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এবং এই উক্তিকে অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়।

বিবাহের মূল সূত্র হইতেছে—দম্পতিযুগলের মধ্যে একপ্রাণতা। প্রেমসঞ্জাত বিবাহে প্রাণের একটা মিল থাকা সম্ভব কিন্তু আচার ব্যবহারে ও সভ্যতায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনের সহিত পুরাপুরি মিল না হইবারই সম্ভাবনা বেশী। নারীর মধ্যে মিশ খাইয়া চলিবার একটী স্বভাবগত শক্তি আছে—কিন্তু সব শক্তিরই ত সীমা আছে।

এই সীমারেখা অতিক্রম করিবার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু সমষ্টিগত কারণ কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের স্ত্রী-পর্ব্বের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দেখি ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথের যবনী-স্ত্রীর কথা।—ইহাতে মারাত্মক অপরাধ বলিয়া জয়দ্রথকে সমাজচ্যুত করিবার কথা কোথাও পড়ি নাই। সমষ্টির মধ্যে এইরূপে ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে হিন্দু চিরকালই মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছে। প্রয়োজন হইলে আজও তাহা না দিবার কোনও হেতু নাই।

*　　*　　*　　*

নারী-প্রগতির কথা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নারী সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র বলিতেছেন—নারী যেখানে থাকেন সেখানে দেবতা বিরাজ করেন। "গৃহ-লক্ষ্মী" আখ্যা দিয়া হিন্দু নারীকে দেবীর সম্মান দিয়াছে। কোনও দেশের কোনও জাতির বা সমাজের মধ্যে এমন গৌরবাত্মক নামে নারীকে কেহ সম্মানিত করে নাই। নারীকে হিন্দু তাহার যোগ্য সম্মান দিতে কখনই কার্পণ্য করে নাই—নারীকে দেবতার আসনে বসাইয়া হিন্দু পূজা দিয়াছে—গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়া হিন্দু তাহাকে মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছে—কল্যাণকর্ম্মে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নারীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া হিন্দু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—নারীর যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে হিন্দুর দান চিরদিনই অকৃপণ। কিন্তু নারী আজ বিদ্রোহিণী। আজ কেবলই শুনিতে পাই—পুরুষ স্বার্থপর, অত্যাচারী, কামুক, হৃদয়হীন পশু ইত্যাদি।—যাহারা তাহাদের জীবনে পুরুষকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে দেখিবার সুযোগ বা অবসর পাইল না—তাহাদের কথা আলোচনার যোগ্য নহে। কিন্তু সমাজে নরনারীর আদর্শ জীবনের উদাহরণের ত অপ্রতুল নাই। অন্ধ সংস্কার ও কদাচারের মোহে নারীকে দুর্গতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে—একথা বলিলে খুব মিথ্যা কথা বলা হইবে না। শ্বশুরালয়ে বধূর প্রতি অত্যাচার-কাহিনীর কথা স্মরণ করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়,—অনেক হৃদয়বিদারক পাশবিক অত্যাচারের মধ্যে "স্বামী-দেবতার" যে যথেষ্ট হাত আছে—এরূপ ঘটনাও অসত্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবে, আজ নারী, যে জন্মদাত্রী ও ধাত্রী, গৃহ-সংসারে প্রয়োজনের দাসী হইয়া পড়িতেছে—ইহাও কদাচ সমর্থনীয় নহে।—কিন্তু দৈহিক গঠন ও মনের স্বাভাবিক গতিকে উপেক্ষা করিয়া আজ আধুনিক নারী যদি পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া চলিতে চায়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের শেষ দিন উপস্থিত হইয়াছে মনে করিব।

যোগ্যতা অনুসারে অধিকারের দাবীর মূল্য আছে—অন্যথায় তাহা করুণ বা হাস্য রসের উদ্রেক করে। দেহ ও মনের অনুপযোগী কোনও অধিকারের দাবী নারীর পক্ষে একান্ত অবান্তর।

—নারীর আসন হিন্দু যথাযোগ্য স্থানেই পাতিয়া রাখিয়াছে—তিনি সেখানে ধৈর্য্যে ও ক্ষমায়, স্নেহে ও সেবায়,

প্রেমে ও পুণ্যে,—নারীর সকল প্রকার স্বভাবগত মহত্ত্বে—আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন, কিন্তু বিদ্রোহ করিবার সাধু ইচ্ছার ভাণ করিয়া নারী-শক্তির অপমান যেন তাঁহারা না করেন।

বিধবা-বিবাহসম্পর্কে এযাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। তবুও দুই একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন মনে করি। স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন —হিন্দুর ঘরে বিধবারা অলঙ্কারস্বরূপ।—কথাটা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি এক একটি পরিবারের সর্ব্ব প্রকার দায়িত্ব লইয়া এক একজন বিধবা আজীবন ত্যাগের মহান ব্রত সাধন করিতেছেন—নিজের ঐহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিবারের স্বার্থে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যে সংযমের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া থাকেন তাহা অন্য কোনও দেশের কোনও সমাজে আছে কিনা জানি না। যখনই আমাদের হিন্দু-গৃহাশ্রমে এইরূপ এক একটি দয়াবতী, ত্যাগব্রতচারিণী মহিয়সী নারীকে দেখি, তখনই মনে হয় ভূদেবচন্দ্রের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু তাই বলিয়া অল্পবয়স্কা বালিকা, যুবতী বিধবা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রভৃতি যে সব নারীর বিবাহের বিধান শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের প্রথা যাহাতে সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য। সমাজের জনবলের দিক হইতে ইহার একটা সার্থকতাও আছে, অধুনাতন মণীষিবর্গ তাহা স্বীকার করিতেছেন। তাই আমার মনে হয়—এ বিষয় সামাজিক অনুশাসনের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা রাখিয়া যতখানি ঔদার্য্য দেখান দরকার তাহার জন্য যেন হিন্দুসমাজ প্রস্তুত থাকেন।

শুদ্ধি ও সংগঠন হইবে কিনা, ধর্ষিতা নারীকে সমাজে স্থান দেওয়া উচিত কিনা সে বিচারের আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

বেদের তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে ব্রাত্যস্টোম যজ্ঞের বিবরণে দেখা যায়—কেবল দু'একটি নয়, গোষ্টিকে গোষ্টি হিন্দুধর্ম্মভুক্ত করা হইয়াছে। 'দেবল স্মৃতি' বলিতেছেন—বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত, কলুষিত বা আবদ্ধ স্ত্রীলোক, এবং ঐশ্বর্য্যলোভে ধর্ম্মত্যাগীকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের কীর্ত্তি-কাহিনী হিন্দু মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়া তিনি যে সর্ব্বজাতিসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যেই আমার মনে হয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে তাঁহার পূর্ণ মহিমা প্রকট করিলেন। উচ্চ-নীচ-ভেদাভেদশূন্য হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে যেমন প্রসাদ পাইবার রীতি আছে—সেইরূপ ঠিক বাহিরের সমাজে ছুঁৎমার্গ দূর করিবার জন্য চাই চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম ও সেবকানুরাগ। হিন্দু প্রধানতঃ উদার-ধর্ম্ম—কাল-ধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুকে উদার হৃদয় ও ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইতে হইবে।

আধুনিকতা-গর্ব্বী বলিবেন—সব বুঝিলাম কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, একথা আমরা এতবার শুনিয়াছি,—যে ইহা শুনিয়া আমাদের আর লাভ নাই। আমি বলি,—ইহা শুনিয়া যদি লাভ নাই, তবে কিসে লাভ আছে?

আমি মহৎ, আমার ধর্ম্ম মহৎ, আমার ইতিহাস গৌরবময়, এ সকল ভাবিয়া বুঝিয়া যদি মাহাত্ম্যের প্রেরণা না পাই, তবে পাইব কিসে?

আমার মনে হয় হিন্দু-সভার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত হিন্দু ধর্ম্মের এই মহান ও উদার মর্ম্মবাণী-প্রচার। গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, আমাদের শাস্ত্রের সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানগুলি সরল ভাষায় লিখিয়া, ছাপিয়া, গান গাহিয়া, কথকতা করিয়া প্রচার করা, ঔদার্য্যের এই নেশা প্রত্যেক হিন্দুর মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া। ইহাতে দুইটি প্রত্যক্ষ ফল ফলিবে। প্রথমতঃ—নিজেরা মহৎ তাহা বুঝিতে শিখিব, দ্বিতীয়তঃ—সেই মহত্ত্বের মধ্য দিয়া অন্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিব। এই প্রচারের মধ্যে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব আসিলে সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। অপর ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিলে—নিজেদের মাহাত্ম্যের পুঁজি উজাড় করিয়া ফেলিলেও কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। সে বিদ্বেষে মাহাত্ম্য বিষাক্ত হইয়া উঠিবে।

* * * *

জাতীয় জীবনের এই দুর্দ্দিনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের গরল যাহারা উদ্গীরণ করিতেছে, তাহারা যে জাতির লজ্জা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক মত্ততা কোনও জাতির

পক্ষেই প্রশংসার্হ নহে। দরিদ্র অসহায় জনসাধারণের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার সুবিধা গ্রহণ করিয়া যাহারা আজ মানুষের প্রাণ লইতে মানুষকে অকারণে উত্তেজিত করিতে পারে—তাহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্করণ করা উচিত—এবং তাহার দায়িত্ব ভারতের মঙ্গলকামী—শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমান রহিয়াছে।

পরমত-অসহিষ্ণুতা হিন্দু-চরিত্রের গৌরব নহে; অপরের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে হিন্দুর কোনও দিন কুণ্ঠা ছিল না আজও নাই—যেমন নিজের ভাল পরকে দিবার কার্পণ্যও তাহার কোনও দিন ছিল না, আজও নাই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। এমনি করিয়া হিন্দুর শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে—ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান থাকিলে আরো হয়ত কাটিত কিন্তু মুসলমান আসিয়া ভারত জয় করিলেন। বিশেষ বিলম্ব হইল না—বিদেশাগত বিজয়ী মুসলমান ভারতবর্ষেই নিবাস গঠন করিলেন। এ নিবাস-গঠনের ইতিহাসে হিন্দুব মন্দির ও প্রতিমাভঙ্গের কাহিনী সুপ্রচুর—কিন্তু শেষাশেষি মিলিয়া মিশিয়া সখ্যতার মধ্যে দুই জাতিই থাকিয়া গেল। ইতিহাসে ইহারও নজির পাওয়া যায়।—একে অন্যের কৃষ্টির প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিল। এই অনুরাগের ইতিবৃত্ত-আলোচনায় লাভ আছে। এই আলোচনা করিতে গিয়া দেখি—হিন্দুর দেবতা মুসলমানের শ্রদ্ধা পাইতেছেন, মুসলমানের দেবতা হিন্দুর পূজা পাইতে-ছেন। এমনি বহুদিন কাটিয়াছে—দুই প্রতিবেশী আনন্দে দিন যাপন করিয়াছে। মন্দির বলিতে মুসলমানেব ক্রোধ নাই, মস্‌জিদ্ বলিতে হিন্দুর ক্ষোভ নাই।

কিন্তু নবজাগ্রত ভারতীয় চৈতন্যে জাতীয়ত্ববোধ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই মিলনে বিরোধের ভাব জন্মিয়াছে দেখিতে পাই। হিন্দুর হিন্দুত্ব জাতীয়তায় নবরূপ গ্রহণ করিল; ভারতীয় মুসলমানের মধ্যকার প্রসুপ্ত ইস্‌লামও—নব্য তুরস্ক, মিশর ও আফগানিস্থানের প্রভাবে আকৃষ্ট হইল কিন্তু মুসলমানের হইল মুস্কিল—তাহার অন্তরের বিশ্বাস, মুসলিম কৃষ্টির বিশেষত্ব জানাইতে হইলে তাহার দেশ, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সর্ব্বতোভাবে মুসলিম হওয়া প্রয়োজন—যেমনটি ঘটিয়াছে তুরস্কে, পারস্যে, মিশরে বা আফগানিস্থানে। বর্ত্তমানের এই হিন্দুমুসলমান-বিদ্বেষের মধ্যে তাই জাতীয়তা-বোধ বনাম ধর্ম্ম-বোধের সমস্যাই লুকাইয়া আছে।

* * * *

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ও নিশ্চিত বলিতে পারি যে পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সভ্যতার আলোকে এই সাম্প্রদায়িকতা ও মধ্যযুগের ভাবানুকরণস্পৃহার অবসান হইবে।

হিন্দুস্থানের হিন্দুর সহিত মুসলমানের মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল, ভারতের হিন্দুর সহিতও মুসলমানের মৈত্রী স্থাপিত হইবে—ইতিহাস-পাঠক প্রত্যেকেরই সে বিশ্বাস আছে। কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু মৈত্রীর দিনও আগত প্রায়—সে ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং হিন্দুমুসলমানের এই বিরোধকে চরম করিয়া ভাবিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে আজ কোনও কথা বলিতে গেলে নির্ব্বাচন-সমস্যা সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিলে চলে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের জাতীয় দল বা Nationalist Party ছাড়া অনেকে শাসন-পরিষদে স্থানসংরক্ষণ ও পৃথক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই দাবীর মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার পরিপন্থী দুইটী বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম—স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মুসলমান-ভারতবর্ষের কল্পনা এবং দ্বিতীয়—কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু পর্য্যন্ত একটী নিখিল মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজ্যসংগঠনের ধারণা। একথার আভাষ পূর্ব্বেও দিয়াছি।

প্রকাশ্যভাবে একথা বলা না হইয়াছে তাহা নহে। শুধু হিন্দুজাতির নহে—রাজনীতিজ্ঞ প্রত্যেক রাজপুরুষেরই ইহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রকার দাবীর সমর্থন শুধু যে জাতিহিসাবে ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় আনিবে তাহা নহে কোনও কালে সম্মিলিত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের যে উদ্ভব হইবে সে আশাও সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষ হিন্দুর নহে, মুসমানেরও নহে—ভারতবর্ষ ভারতবাসীর—এই চিন্তায় যেদিন আমরা হৃদয়ে বল পাইব, সেদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথাও আর থাকিবে না। জাতিহিসাবে ভারতবাসী যদি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলিয়া স্বাধিকারের দাবী করিতে পারে, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে যদি

ভারতবাসী সম্মিলিত শক্তিতে আপনার দাবী উপস্থিত করিতে পারে—তবেই জাতীয়তার স্বপ্ন সফল হইবে। আমার মনে হয় ভারতের শাসনতন্ত্র যদি কোনও দিন দেশের অনুকূলে গঠিত হয় তাহা হইলে তাহার প্রথম সূত্র হওয়া উচিত—অসাম্প্রদায়িকতা। শতধাবিচ্ছিন্ন জাতির কোনও শক্তি নাই,—স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিবার অধিকারও তাহার নাই। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেকেরই একথা আজ মনে রাখিতে হইবে যে একহাতে স্বার্থলাভ হইবে না—ঘরের কলহ ও স্বার্থের কাড়াকাড়িতে আজ আমরা সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া আছি।

—রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য দুই সম্প্রদায়কে একসঙ্গেই চেষ্টা করিতে হইবে—দুই জাতির উত্থান ও পতন ভাগ্যবিধাতা একই অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। যে সম্প্রদায় আজ শুধুমাত্র অসম্ভবের আশায় বিরোধপোষণ করিবে সে শুধু স্ব-সমাজের নহে—স্ব-দেশেরও ভীষণ ক্ষতি করিবে। সমগ্র জাতির অনিষ্ট করিয়া সমাজসেবার আত্মপ্রসাদ লাভ ভ্রমাত্মক মাত্র।

জাতীয়তার বিরোধী ভাব হইতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব—ভারতবর্ষে হিন্দুর দান রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের প্রতিযোগিতা দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম; আজ জাতির একাঙ্গ সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত বলিয়া সর্ব্বান্তকরণে যোগ্যপাত্রে ত্যাগের নিদর্শন দেখাইতে হিন্দু প্রস্তুত—মুসলমান ভ্রাতাগণও আসুন, অতীতের গ্লানি ও বিক্ষোভ ভুলিয়া আজ হিন্দুর সহিত একযোগে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আপন আপন ধর্ম্মের গৌরব, সমাজের রীতিপদ্ধতি, সংস্কারের মর্য্যাদা—যাহার যেমন আছে অব্যাহত থাকুক। যে সম্প্রদায়ের যে লৌকিক আচার অন্য সম্প্রদায়ের ব্যথার কারণ,—একের সংস্কারগত যে প্রথায় অপরে ক্ষুব্ধ হয়—বৃহত্তর কল্যাণ ও মহত্তর স্বার্থের জন্য তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চিরকালের জন্য মিলন-সৌধ গঠিত হউক। তাহারই রত্ন-বেদিকায় হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর বাণী—ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের জন্য আমরাই খোদিত করিয়া যাইব।

শীঘ্রই জাতীয় মহাসভার সহযোগিতায় বিলাতে গোল টেবিলের নূতন অধিবেশন হইবে। অন্যান্য আলোচনার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা সেখানে বিশেষভাবে বিচার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আমরা ইহা চাহি না যে ভারতের হিন্দু সদস্যগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া জাতীয়তার পরিপন্থী কোন ব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবেন। কিন্তু ইহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে বাংলার ও পাঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান সমস্যা ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের অন্য প্রদেশের হিন্দু সদস্যগণ ইহার সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন না। বাংলার এই বিশেষ ও জটীল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য না করিলে জাতির সমূহ অকল্যাণ হইবে। আমরা ইচ্ছা করি আমাদের বাংলার হিন্দু সদস্যগণ অন্ততঃ যেন এ বিষয়ে অবহিত থাকেন।

প্রাদেশিক সীমানির্ণয়-সমস্যা আর একটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়। আমার মনে হয়, যাহারা সম-ভাষাভাষী এবং জাতি হিসাবে ও শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে এক পর্য্যায়ভুক্ত তাহাদিগকে লইয়া এক একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা কর্ত্তব্য। আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমানে যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল সেই কমিশনও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনসাধনের পূর্ব্বে একটি "সীমা-নির্ণয় কমিশন" গঠন করা কর্ত্তব্য। এই কমিশনই যাহারা সমভাষা-ভাষী ও যাহারা শিক্ষাদীক্ষাহিসাবে এক তাহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এ বিষয়ে আমাদের বাঙ্গালা দেশ বহু দিন হইতে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনা ভুলিতে না ভুলিতে মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলাকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দেশের সহিত সংযুক্ত করা হইল। আমাদের আশা ছিল সীমা-নির্দ্দেশ-কমিশন গঠিত হইলে ইহার সুমীমাংসা হইবে, কিন্তু আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইল। গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনরূপ সীমা-নির্দ্দেশ-কমিশন নিযুক্ত করিবেন না; তাঁহারা মাত্র বিহার ও সিন্ধু দেশের জন্য দুইটি পৃথক কমিটী নিযুক্ত করিবেন। এ সমস্যা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা। এরূপ গুরুতর সমস্যাসমাধানের

জন্য এবং এই সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার জন্য কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এক সীমা-নির্দ্দেশ-কমিশন গঠন করা কর্ত্তব্য।

এই বিরোধ ও আত্মকলহের অবসানে উদারতা ও মহানুভবতায়—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য যাহাতে আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে, ভবিষ্যতের সেই দিকে চাহিয়া হিন্দুসভার বর্ত্তমান কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমরা কি করিতে পারি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—আর একবার সংক্ষেপে তাহার পুনরুক্তি করিব।

আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে দেশবাসী জনসাধারণের কাছে পরিচিত করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্যকে তাহাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিয়া আমরা যাহা বুঝি তাহা ঠিক ধর্ম্ম নহে; ভগ্নী নিবেদিতা বলিয়াছেন—

"The word Dharma can in no sense be taken as the name of religion. It is the essential quality, the permanent, the unfluctuating core of substance, the man-ness of man, the life-ness of life as it were......... to the Artist it is Art, to the man of Science it is Sceince, the Monk it is Vow.

(*The Web of Indian Life pp. 138*)

—ধর্ম্মের এই সর্ব্বব্যাপী সার্ব্বজনীন মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্পূর্ণ সচেতন হইতে হইবে। নিজের ধর্ম্ম দিয়া অন্যের ধর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। - বুঝিতে হইবে যে—

"Religion is a great force, the only motive force in the world, but.........that you must get at a man through his own religion and not through yours."

(*Getting married. G. B. S. pp. 250*)

এই বুদ্ধি নিয়া ভবিষ্যৎ হিন্দুকে প্রচারশীল হইতে হইবে। নিজের জন্য নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অনুদার সঙ্কীর্ণতার আবর্জ্জনা দেশবিদেশে জমিয়া উঠিতেছে,—তাহারই উচ্ছেদ-কল্পে ভারতবাসী হিন্দুকে আজ প্রচারে বাহির হইতে হইবে। —হিন্দুত্বের গণ্ডীতে অন্যকে আবদ্ধ করিবার জন্য নহে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বমানবকে পুনর্সঞ্জীবিত করিতে।

ভগবান বোধিসত্ত্বের দেহরক্ষার পর তাঁহার নখ, চুল ও দন্ত বহুযত্নে পেটিকায় রক্ষা করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণক ধর্ম্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন—ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি আজ সেইরূপ ধর্ম্মের গোঁড়ামি, তুচ্ছতা লইয়া নিজেকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব?

পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদ আজ মানবকে ক্লিষ্ট, ক্লান্ত ও অন্ধ করিয়াছে—পাপে-পুণ্যে আস্থাহীন হইয়া, পরলোকে বিশ্বাস হারাইয়া, বিশ্বমানব আজ নিজের আঘাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত—সেই ক্ষত নিরাময় করিবার মহান কর্ত্তব্য নব্য হিন্দুর।—সারল্য, বিশ্বাস ও নির্ভরতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ জ্ঞান, সমস্তই তাহাকে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিতে হইবে;—যে কল্যাণ একদিন হিন্দু দর্শন প্রচার করিয়াছিল, সেই কল্যাণ আজ বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে নব্যহিন্দু প্রচারককে বহন করিয়া ফিরিতে হইবে। একদিন যেমন যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, শক, কাম্বোজ প্রভৃতি সম্পর্কে সে দরদী হইয়া ছিল—আজও তাহাকে সেইরূপ দরদ পোষণ করিতে হইবে।

হিন্দু তুমি ভুলিও না—

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে তাহার জন্ম হিন্দু সভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু! তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। অটল অচল বিশ্বাসের শক্তিতে অনুভব কর, তুমিই বিশ্ব-মানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহ-শৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্ব-মানবের হৃদয় হইতে জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দু-সমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগরসৈকত।"

দেশে দেশে তোমাকে তপোবনের সেই বাণী বহন করিয়া ফিরিতেহইবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। *

* বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণের উদ্ধৃতাংশ।

"অমাবস্যা"র কবি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অনুভূতির নিবিড়তা, ছন্দোবন্ধের সাবলীল গতি, ভাবপ্রকাশের অনায়াস ভঙ্গিমা, শব্দ-সংগ্রহের শিল্প-চাতুর্য্য অমাবস্যাকে এমন সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। আন্তরিকতা আছে বলিয়াই অমাবস্যার কবিতাগুলি এমন নিবিড় ভাবে হৃদয় স্পর্শ করে। একটি বিশিষ্ট ভাবধারা অমাবস্যার কবিতাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবাহিত। কবির ব্যক্তিগত জীবনের মর্ম্মান্তিক বেদনা সেই ভাবধারাকে পরিপুষ্ট ও অব্যাহত রাখিয়াছে।

প্রিয়ার "দ্বিচারিতা" হইতেই কবির ব্যথার সৃষ্টি।

কবি তাহার প্রিয়াকে দেহমন সমর্পণ করিয়া তাহার উপযুক্ত বিনিময় পাইয়াছিলেন—ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সেই প্রিয়া আজ অপরকে দেহ দিয়াছে—বুঝিবা মনও দিয়াছে। এই ভাবস্মৃতি কল্পনার স্তরে উঠিয়া বেদনায়, সংশয়ে ও অভিমানে কেবল দোলা দিতেছে।—

হেথায় ঝরিছে ঘনবর্ষণ ডাকিছে নিদয় দেয়া,
ওপারে তোমার ফুটিল কি তাই কোমল কদম কেয়া ?
হেথায় ক্ষুধিত মন,
তাই ভেবে শিরে ব্রীড়ায় শিথিল দিয়ো অবগুণ্ঠন !
জলহীন চোখে কাজল আঁকিয়ো ললাটে হলুদ টিপ,
হেথা শুধু মেঘ মলিন মধুর, কোথা তুমি মেঘদীপ।
হেথায় জ্বলিছে চিতা,
সেই আলোতেই তোমার রাত্রি হয়েছে দীপান্বিতা ॥

*　　*　　*

গোপন মিলন সুখে
মৃণাল-মৃদুল দুটি বাহু দিয়ে জড়ায়েছো কা'রে বুকে !
পল্লবরাগতাম্র-অধরে কা'র তরে এত মধু,
কা'র করে লীলাকমল তুমি গো, কা'র তুমি লীলাবধূ !

—কবির এই বেদনাই কাব্যের অন্তর্নিহিত বেদনা। কবির এই বেদনা হৃদয়স্পর্শী হইলেও ইহার সহিত বিশ্বজনীন বেদনার মিল নাই—কিন্তু "তিমির তমসাতীরে"র "তীর্থ পথিক" কবি বিশ্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার 'সুশীতল ব্যথা' ও জ্বালাহীন অভিমান-গীতিকা রচনা করিয়াছেন বলিয়া কাব্যের বিশ্বানুগ আবেদন ও দরদটুকু সম্পূর্ণভাবে বজায় আছে। কবির ব্যথা আত্মসর্ব্বস্ব হইলে কাব্যের মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু কবি নিজের ব্যথার সহিত বিশ্বমানবের যোগসূত্র রাখিতে পারিয়াছেন—

তোমরা হেথায় অশ্রুবেলায় বাঁধিয়ো বালির বাসা,
প্রিয়ার নয়নে হেরিয়ো গোপনে সে ভালবাসার আশা।
আমি আসিব না ফিরে',
আমি চলে যাই তীর্থপথিক তিমির তমসাতীরে ॥

সমগ্র মানব, প্রকৃতির মধুপানে মত্ত রহিয়াছে, কবি-হৃদয়ের ব্যথার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সহানুভূতি নাই—এই অভিমানের সূত্রেই কবির আপন ব্যথাকে বিশ্ব-মানব ও প্রকৃতির সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বের দুঃখ 'কবি-মানস'কে ব্যথিত করিতেছে না, আপন দুঃখে সে মুহ্যমান; কিন্তু সেই আত্মমুখী ব্যথা উদাসীর ব্যথা নহে। 'তিমির তমসা তীরে' তীর্থযাত্রার নাম করিয়া সে এই দরদহীন মধুময় পৃথিবীতেই যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। কবি ভালবাসে আপন প্রিয়াকে, বিশ্ব-মানবকে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে। প্রিয়ার নিকট হৃদয়ের বিনিময় পাইয়াও পাওয়া গেল না, বিশ্ব-মানব বা বিশ্ব প্রকৃতি কবির এ গভীর ব্যথার অংশ লইল না; কবি-মানসে এই দুইটি ক্ষোভের সংঘাত কবিতাগুলির বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য সাধন করিয়াছে।

"তোমরা" "তোমাদের" ছাড়িয়া কবি ষষ্ঠ কবিতায় যখন 'তুমি'তে নামিয়া আসিলেন, তখন হইতে তাঁহার ব্যথার গান জমিতে আরম্ভ করিল। ইহার পূর্ব্বের কবিতাগুলিতে আপনার ব্যথাকে universal আবরণে প্রকাশ করিবার যে প্রয়াস তাহা আন্তরিকতার অভাবে সফল হয় নাই। কিন্তু যেখানে কবি আপন ব্যথা প্রত্যক্ষ-ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সকলি যে ভুলিয়াছি,—
কবে তুমি ছিলে মোর মধু-চাকে উন্মন মউ-মাছি !

*　　*　　*

আমি হেথা পরবাসী
ভুলে গেছি সখি, সেই আশাতীত দুয় ভাষা : 'ভালবাসি' ॥

সেখান হইতে কবির সত্যকার প্রেরণার সন্ধান পাই—কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাবস্মৃতি হইতে ;—

মোর আঁখি দিয়া তোমারে ও মোর প্রেমের আবিষ্কার
করিনু প্রথম, তাই ঢেউ দোলে এ হৃদয়-গঙ্গার।
চির মধুশর্করী ;—
তুমি মক্ষিকা, মধু-উৎসবে কর শুধু মাধুকরী ॥

যে প্রিয়াকে কবি এক দিন কায়মনোবাক্যে নিবিড় ভাবে পাইয়াছিলেন—কায়মনোবাক্যে সেই প্রিয়াই অপরের অঙ্কগত হইয়াছে,—ইহার কল্পনা আমাদের দেশে সংস্কার ও সমাজ বিরুদ্ধ। কিন্তু এই কল্পনাই অমাবস্যার প্রাণ। এই সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে—অমাবস্যা শুধুই অন্ধকার। আমরা যখন শুনি—

সখিলো বিদরে হিয়া
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।
অথবা—
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল
মথুরা নগরে ছিলেত ভাল ?

—তখন আমাদের মন সাহিত্য-রসে অভিসিক্ত হইয়া উঠে—হয়ত বা চোখে জলও আসে। কিন্তু যখন পড়ি—

আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি, শুধাই তোমারে ভাই,
হেরিছ তেমনি তার দুই চোখে বসন্ত-বাসনাই ?

*   *   *   *

শয়ন-শিয়রে রজনীগন্ধা ফেলিছে কি নিঃশ্বাস,
নিরালা জাগিয়া দু'জনে তেমনি ভুঞ্জিছো অবকাশ ?

*   *   *

তুমি না চাহিতে অধর আনিয়া অধরে কি আর রাখে,
বারেক আধেক ভালবাসি বলে' তেমনি কি থেমে থাকে ?
রঙীন বসন পরি'
তোমারে তুষিতে খোঁপায় গোঁজে কি ধান্যের মঞ্জরী ?

তবুও জানিত মন
তৃতীয়ের তরে আছে তা'র চোখে দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ।

—তখন আমরা চমকিয়া উঠি—রসে পৌঁছিবার পথে সংস্কারের পাহারা বলে "খবরদার!" লম্পট কথাটির মধ্যেও একটা তিরস্কারবিমিশ্র স্নেহ-মধুর আভাস আছে ; কিন্তু অনুরূপ কোনও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দই আমাদের ভাষাতে নাই। ইহার কারণ আমাদের দেশে এ-ভাবের প্রচলন নাই। তথাপি সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে বলিতে হয়,—এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে অবাস্তব বা অসম্ভব নহে ; সামাজিক অপরাধ বলিয়া আমরা তাহাকে আমোল দিই না। ভাবে যাহা বর্ত্তমান আছে, কল্পনার সাহায্যে তাহার রসবস্তু হইয়া উঠিবার পক্ষে বাধা থাকিতে পারে না ; কারণ রসিক-চিত্ত সাধারণতঃ অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত হইবে ইহাই আশা করা যায়। অমাবস্যায় এই সংস্কারবিরোধী ভাবটি মোটের উপর যে রসবস্তু হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে কবির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে, কাব্যরস অতি উচ্চস্তরে পরিণতি লাভ করিয়াছে—

যদি কোনো দিন বেদনার মত বাদল ঘনায়ে আসে,
কাজল আকাশে আমার আঁখির সজল কাকুতি ভাসে,
বসিয়া তাহার বামে,
একবার শুধু ভুল করে তারে ডাকিয়ো আমার নামে।

*   *   *   *

যখন ফুরাবে কথা,
আমারি লাগিয়া অনুভব ক'রো একটু নির্জ্জনতা।
যদি কোনো রাতে ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ জাগে বাতায়নে,
আমিও জাগিয়া দেখিতেছি চাঁদ, সে-কথা করিয়ো মনে।
দিবা যবে অবসান,
মোরে ভেবে চোখে আঁকিয়ো একটা অতৃপ্ত অভিমান।
মহুয়া-মদির মিলনের মোহে ভুলিয়ো আমার কথা,
উৎসবশেষে বাজে যেন বুকে মধুর অপূর্ণতা।
যখন নিভিবে আলো
ভেবো সেই নীল নিবিড় তিমির লাগিত আমার ভালো।

—ইহার সুনিবিড় আন্তরিকতা মনের সংস্কার ঘুচাইয়া পাঠকচিত্তে আপনার স্থান করিয়া লয়।

আরম্ভেই কবি বলিতেছেন—

আমার পরাণে ভাই,
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।

*   *   *

রহেনি কোথাও ফাঁক
আমার পরাণে জমেছে বিশ্ব-বেদনার মৌচাক।

—কাব্যপাঠে কিন্তু কোটি মানবের অশ্রু-জলের বিশেষ সন্ধান পাইলাম না। তবে সেজন্য নিজেকে বঞ্চিত বোধ করিতেছি না। কারণ একটি মানবের অর্থাৎ কবির নিজের যতখানি অশ্রু-জলের পরিচয় পাইয়াছি, কাব্যরস উপভোগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কবি বলিতেছেন—

সবি হেথা মধুময়
হৃদয়ের দামে যদিও মিলে না হৃদয়ের বিনিময়।

কবির হৃদয় বিশ্বের অফুরান সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সন্ধান পায় বটে কিন্তু সেই বিশ্বের সমস্ত মধু কবির নিকট "তুঁতের মতন তিতা" হইয়া গিয়াছে—হৃদয়েব দামে হৃদয়ের বিনিময় মিলিল না বলিয়া। বিশ্ব প্রকৃতির মধু ব্যর্থ-প্রেম কবি-হৃদয়ের কাংসাপাত্রে পড়িয়া যে সুরার উৎপত্তি করিয়াছে—অমাবস্যার প্রত্যেক কবিতা তাহারই এক একটি ফেণা।—অমাবস্যা তাই কবির নিজস্ব ব্যথার সম্পদে এমন সমৃদ্ধ হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের মরীচিকা-ছন্দে অমাবস্যা রচিত। কিন্তু ছন্দের একটিমাত্র ধারা অনুসৃত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত ভাবটিও এক হিসাবে দুঃখবাদ। মাঝে মাঝে বলিবার ভঙ্গীর মধ্যেও যতীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। সুতরাং মনে হইতে পারে—অচিন্ত্যকুমার বুঝি যতীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বহিরঙ্গের মিল থাকিলেও অন্তরের পার্থক্য যথেষ্ট, সুতবাং কবির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। প্রথমতঃ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ universal দুঃখকে personal ভাবে অনুভব করিবার কল্পনা আর অচিন্ত্যকুমারের দুঃখবাদ personal দুঃখকে universal করিয়া উপভোগ করিবার কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ অচিন্ত্যকুমারের কবিতা বিরহের অর্থাৎ প্রেমের কবিতা; যতীন্দ্রনাথের কবিতায় বিরহের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ—অচিন্ত্যকুমারের মতে—

সুশীতল সবই ব্যথা,
হরিণ-হৃদয়া ভীরু প্রেয়সীর নয়নে নিষ্ঠুরতা।

আর যতীন্দ্রনাথ বলেন—

বাহিরের জ্বালা জ্বালায় ভিতর, ভিতর জ্বালায় বার,
জ্বলে স্তম্ভিত বিদ্যুৎবাতি পথে পথে সারে সার।

গীতি-কাব্যের উপাদান (lyrical elements) অচিন্ত্যকুমারের কবিতায় সুপ্রচুর,—

তোমার হাসির পিছে
প্রতিবেশিনীর নিবানো দীপের বেদনা নিঃশ্বসিছে

কেন যে তখন খুলে রেখেছিনু দখিণের বাতায়ন,
ছোট পাখী, ঘরে এসেছিল উড়ে,—সুকোমল সুশোভন!
কেবা জানে কোথা থেকে,—
কোন্ নীল নীর নিরালা নদীর নিবিড় মমতা মেখে।

* * *

পাখা ভরে' কার সুখ-উত্তাপ আনিয়াছো নিরুপম
বনের বিহগ, তুমি কি আমার মনের বিহঙ্গম?
এনেছো বনের বাণী,
দূর আকাশের টুকরো নীলের একটুকু হাতছানি।

মলিন দিনের মাধুরী হেরিয়া মধুর হয়েছে মন,
রোগশয্যায় একা শুয়ে আছি একান্ত অকারণ।
তবু সবি লাগে ভালো,
বিদায় বেলায় গোধূলির চোখে মৃদু মুমূর্ষু আলো।

* * *

তৃণের ডগার ছোট আলোটুকু, একটি তারকা ফোটে,
শুকনো পাতাটি নীড়ে ফিরে-যাওয়া ভীরু শালিকের ঠোঁটে!

দেহে যৌবনভার
এনেছে অতল গাঢ় রহস্য কালো অমাবস্যার।

ত্রুটির দিকের কথাও আছে।—মাঝে মাঝে অস্পষ্টতা দোষ হইতে কবি মুক্ত হইতে পারেন নাই—অনুভাবের

ধারা অনেক স্থলে স্বাভাবিক গতি হারাইয়াছে। অনু-প্রাসের প্রতি অতি লোভের উদাহরণও প্রচুর ;—

"বন্ধুর দেশে বন্ধু-র মত বন্ধুলি আছে জাগি" "বিছানা বিছালো বিছা" "লোহুজমা লোর লোনা লাগে" "চুমা লাগিছে—চুকা" "ফুলের সৌসব দোসর" "কোলে কপোল" রাখিয়া "কপোলকল্পনায়" "সরাইখানার সরা-র সরাব" "কাফুরের মত ফুবায়ে ফতুর"—খুবই কষ্টকল্পিত—ফলে রসগ্রহণের পক্ষে এগুলি বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু—

"কঠিন উপল হ'ল উৎপল উতল চোখের জল"—চমৎকার।

মাঝে মাঝে বিধাতাকে ডাকিয়া হাঁকিয়া আসরে নামাইবার চেষ্টার মধ্যে কোনও সঙ্গত কারণ পাই না,—বিধাতাসম্পর্কে হয়ত কবির একটা মতবাদ আছে কিন্তু এ কাব্যের মধ্যে তাহা রসসঞ্চার করিতে পারে নাই। নারী-অঙ্গের বর্ণনায় অনেক স্থলে কামলুব্ধতা প্রকাশ পাইয়া কাব্য-সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ছাপ পাঠকমনকে পীড়া দেয়। ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষের অযথা প্রশ্রয় আছে,—গ্রাম্য-ভাষার সুপ্রয়োগ যেমন প্রশংসনীয়—অপ-প্রয়োগ তেমনি দোষাবহ।

"বেবাক বুকেতে কাদা পচিয়াছে"—"শুধু করতলে হাতটি আমার উপুড় করিয়া রাখো"—"সকালের ভাতে তাত নেই আর বিকালে হয়েছে জাউ।" "ডাসা ডালিমেতে বাসা বাঁধিয়াছে" কিম্বা "বিদ্যুল্লতা দ্যুতির দ্রুততা মন্থর মেঘে ঢাকা" —এর পরই—"ব্যঞ্জন আজি আলুনি হয়েছে, কালকূট ঠোঁটে মাখা" কিম্বা "মুকুরে বসিয়া বেণী বাঁধিতেছ" ইত্যাদি রসাভাস ঘটায়। ২৩ সংখ্যক কবিতার শেষ লাইনে ছন্দোপতন, ২৪ সংখ্যকে "গাঢ়" এর সহিত 'পারো'র মিল প্রভৃতি দু'একটি ত্রুটিতে কবির অনবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে।

—বিরহী কবি দুঃখবাদী বটে কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনা ও ব্যর্থতা ভুলিয়া তিনি অপরিসীম ভাবের ক্ষেত্রে "অপরিমিত জীবন" অনুভব করিতে চাহিতেছেন—ইহা আশা ও আনন্দের কথা।

সঙ্কেতময়ী! প্রার্থনা করি, হয়োনা আবিষ্কৃত,
তোমার মাঝারে যেন অনুভবি জীবন অপরিমিত।
বড় করে দাও ঘর,
অরণ্য হতে এনো লাবণ্য—চঞ্চল মর্ম্মর।
অপার সে পারাবার—
গভীর অগাধ স্বাদ নিয়ে এসো অপরিপূর্ণতার।

কবি গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করিয়া—কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহার চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। *

* অমাবস্যা—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী। ৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম—দেড় টাকা।

মুর্শিদাবাদ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভৌগোলিক বিবরণ

মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলা দেশকে যে ত্রয়োদশটী চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ তাহাদেরই অন্যতম। প্রাচীন মুকসুদাবাদ নগর, চূণাখালি পরগণার অন্তর্গত ছিল (বিশ্বকোষ)।

পাঠান সম্রাট সের সাহ, শাসনকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে, প্রথমতঃ ১৯টী জিলায় বিভক্ত করেন। তৎপর ক্রমশঃ অন্যান্য জেলার সৃষ্টি হয়। অধুনা বাঙ্গলা দেশ ঢাকা, চাটিগাঁ, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সী, ও বর্দ্ধমান এই ৫টী ডিভিসন বা কমিশনার বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঢাকা ও চাটিগাঁ পূর্ব্ববঙ্গ, রাজসাহী বিভাগ উত্তর বঙ্গ এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ পশ্চিম বঙ্গ নামে অভিহিত। এই প্রদেশের সকৌন্সিল মহামান্য গভর্ণর সাহেবের অজ্ঞাধীন ৫ বিভাগে ৫ জন কমিশনার, স্ব স্ব বিভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই ৫ বিভাগে মোট ২৮টী জেলা আছে। প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটী জেলা, প্রত্যেক জেলায় কয়েকটী মহকুমা, প্রত্যেক মহকুমায় কয়েকটী পুলিশষ্টেশন বা থানা ও আউটপোষ্ট, প্রত্যেক থানার কয়েকটী ইউনিয়ান বোর্ড এবং প্রত্যেক ইউনিয়ান বোর্ডে কতকগুলি করিয়া গ্রাম আছে। ২৮ জেলায় ২৮ জন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগে—২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও খুলনা এই ছয়টী জেলা আছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরিমাণ ফল ১৭৫০২। লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষের ও অধিক। মুর্শিদাবাদ প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্যতম জেলা, এই জেলার আয়তন ২১২৬ বর্গ-মাইল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের গণনায় —লোকসংখ্যা ১৩৭২২৭৪।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনায়—পুরুষ. ৬২৮৭৪২, স্ত্রীলোক ৬৩৩৭৭২ মোট—১২৬২৫১৪ জন। গৃহসংখ্যা ২৮০০৮৪।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭টী নগর ও ১৯৬৭ খানি গ্রাম আছে।

এই জেলায় কৈবর্ত্ত ১ লক্ষের অধিক। সদ্গোপ ও গোয়ালা ৩৬ হাজার; ব্রাহ্মণ প্রায় ৩০ হাজার; বাগদী, চামার, তাঁতী, ২০।৩০ হাজার; কায়স্থ, বণিক, রাজপুত, কোচ, নাপিত, শুঁড়ি, তেলি, কুমার, কামার, চণ্ডাল ১০।২০ হাজার; কলু, হাড়ী, ডোম, ধোপা, মোদক, যুগী ৫।৬ হাজার। বিভিন্ন জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে, মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। এই জেলায় শতকরা ৫২ জন হিন্দু, ৪৮ জন মুসলমান। খৃষ্টান ও জৈন সংখ্যা ৫।৬ শতের অনধিক।

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে—মালদহ, রাজসাহী জেলা ও পদ্মানদী।

পূর্ব্বে—রাজসাহী ও নদীয়া জেলা ও জলঙ্গী নদী।

দক্ষিণে—বর্দ্ধমান জেলা।

পশ্চিমে—বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা।

অক্ষাংশ—২৫° ২৪° ২৪°
০′, ৩০′, ০′

দ্রাঘিমা—৮৮°।০′, ৮৮°।৩০′, ৮৯°।০′

সীমানা পরিবর্ত্তনের কথা—

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মুর্শিদাবাদের এবং বীরভূমের সীমানা সম্বন্ধে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট যে ইস্তাহার বাহির করেন এবং যাহা ঐ বৎসরের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেই ইস্তাহার দ্বারা সীমানা সরহদ্দ লইয়া বহু পূর্ব্ব হইতে যে গোলযোগ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। গঙ্গা বা পদ্মা এবং জলঙ্গী নদীর প্রবাহিত স্রোত দ্বারা, মুর্শিদাবাদের উত্তর পূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্বের সীমানা স্থিরীকৃত হয়, এবং মালদহ জেলার যে সকল গ্রাম গঙ্গা বা পদ্মার দক্ষিণতীরে অবস্থিত, সেই সকল গ্রাম, মুর্শিদাবাদের অন্তর্ন্নিবিষ্ট হয়। দক্ষিণ দিকের সীমানাও সরলীকৃত হইয়াছিল। পশ্চিম দিকেও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পশ্চিম দিকে ৩৯ খানি গ্রাম, বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদে, এবং সাঁওতাল পরগণা হইতে ৭ খানি গ্রাম, মুর্শিদাবাদের অন্তর্ন্নিবিষ্ট হয়। ঐ

বৎসরের শেষভাগে, ৩০ শে অক্টোবর, যে ইস্তাহার জারী হয় এবং যাহা ১০ই নভেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় তাহাতে পশ্চিমসীমান্তের আরও পরিবর্ত্তন হয়। অনূন ১৭০ খানি গ্রাম মুর্শিদাবাদ হইতে বীরভূমের অন্তর্গত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের সীমানা সম্বন্ধে বহু ও শেষ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। ১০৮ বর্গমাইল পরিমিত বরোওা থানা বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদের হস্তে আইসে, এবং থানা রামপুরহাট, নলহাটী, (বর্ত্তমান মুরারই থানাসহ) যাহা পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ উপরিভাগের মধ্যে ছিল তাহা বীরভূমের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

ভূতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্ব

রাঢ় ও বাগ্ড়ী—ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলাকে প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিমাংশ রাঢ় এবং পূর্ব্বাংশ বাগ্ড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশ্চিম ভাগ উচ্চ ও অসমতল, তজ্জন্য এই অংশের মধ্যে মধ্যে জলা আছে। পূর্ব্বাংশ সমতল ও উর্ব্বরা। ভূতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্বে উভয় অংশের মৃত্তিকা সম্পূর্ণ পৃথক। রাঢ়ের মাটী শক্ত ও আটাল, স্থানে স্থানে কঙ্করময়। এইরূপ মৃত্তিকা ছোটনাগপুর ও বীরভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভূভাগ সাধারণতঃ উচ্চ, সামান্য আঁকা বাঁকা, মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বিল, কোথাও বা মাটীর ঢিপি, ভাগীরথী-তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাঢ়ের মাটী দেখিতে কটা, কোথাও বা লাল বর্ণের চূণ ও লৌহক্ষার (Oxide of Iron) মিশ্রিত বলিয়াই ঐরূপ বং। এখানকার নদীতে সহসা বন্যা আসিয়া দেশকে প্লাবিত করে এবং সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া অধিবাসীগণকে মহা বিব্রত করিয়া ফেলে। সৌভাগ্যের বিষয় যে বন্যার জল বেশী সময়ের জন্য স্থায়ী হয় না। এ অঞ্চলের জমী অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। এখানে হৈমন্তিক বা আমন ধান্যই বেশী জন্মে। আশু ধান্যের চাষ অল্প।

বাগড়ী অঞ্চলের ভূমি কতকটা পূর্ব্ব বঙ্গের ন্যায়। ইহার চতুর্দ্দিক নদীবেষ্টিত। এদেশের জমী সাধারণতঃ নীচু। তজ্জন্য বর্ষার সময় জলমগ্ন হইয়া থাকে। বাগড়ীর জমী উর্ব্বরা। এ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে আমন ও আশু ধান্য এবং কোথাও কেবল আশু ধান্যেরই চাষ দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে তুত-পাতের চাষ অধিকাংশ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলও অধুনা ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম ২৫ মাইল ভিন্ন আর সমস্ত বাম তীর (জলপ্লাবন হইতে রক্ষার জন্য) উচ্চ উচ্চ বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত। মুর্শিদাবাদের জল বায়ু নিম্ন বঙ্গের সদৃশ। গ্রীষ্মকালে মধ্যভারত হইতে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এখানকার বার্ষিক উত্তাপের পরিমাণ গড়ে ৭৮.৬ (ফাঃ হিঃ)—বৈশাখ মাসে কখন কখন ১০০.২ পর্য্যন্ত এবং পৌষ মাসে ৪৬.২ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বার্ষিক গড় পরতা বৃষ্টিপাত ৫৬ ইঞ্চি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ সহর ও তাহার উপকণ্ঠ অনেকটা স্বাস্থ্যকর ছিল। এক্ষণে সমগ্র জেলা বিশেষতঃ ভাগীরথী তীরস্থ জনপদসমূহ ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু স্থান জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। রাঢ় অঞ্চল ও ময়ূরাক্ষী নদীর জলবাতাসে ম্যালেরিয়া জ্বর ও অম্লরোগ সারিয়া যাইত। ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশের অস্থিকঙ্কালসার জনগণ, এই অঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া প্রফুল্ল মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর হইতে বঙ্গের সর্ব্বত্রই যেমন ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, ময়ূরাক্ষীতীরবর্ত্তী ভূভাগেরও কতকটা সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। উত্তর মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের গোদ, গলগণ্ড, কুকুন্দ প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ বহুদিন হইতে দেহের অলঙ্কারস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জেলার রাঢ় অঞ্চলের বহুসংখ্যক পল্লীতে বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সুগভীর পুষ্করিণী, সরোবর বা দীর্ঘিকা রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কারাভাবে সেই সকল প্রসিদ্ধ জলাশয় লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই জেলা হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় অতিশয় চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল। সেই কারণে পল্লীবাসীরা সর্ব্বদাই ভীত থাকিত। তন্নিমিত্ত এই জেলার শান্তিরক্ষার্থ গভর্ণমেণ্ট ৫ হাজার লোক নিয়োজিত রাখিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও আর্টের স্থান লইয়া যে আলোচনা করা হইয়াছে—এ সংখ্যায় তাহারই পূর্ব্বানুবৃত্তি করিব। যৌন-ধর্ম্মের স্বরূপ সাহিত্যে স্থান পাইবে কিনা অর্থাৎ মিথুন-সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রচারের মধ্যে সাহিত্য-জীবনের সার্থকতা বা শিল্পের (art) চরম পরিণতি আছে কি না, এ বিচারের কথা উঠিলে—মূলতঃ সাহিত্যের আদর্শের কথাই আসিয়া পড়ে।

সামাজিক সংস্কার, জাতির ঐতিহ্য ও প্রচলিত রীতি নীতি (convention) অতিক্রম করিয়া প্রকৃত ঘটনা বা তথ্যের বিবৃতি সাহিত্যকে নিকৃষ্ট ও পঙ্কিল করিবে, না—বিগত যুগের সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া সাহিত্যকে নবকলেবর দান করিবে? দাম্পত্য প্রেমও যেমন সত্য নরনারীর প্রেমও তেমনি সত্য হইতে পারে—হয়ত। অতএব পতিভক্তির উন্নত আদর্শকেই চরম ভাবিয়া নরনারীর প্রেম ও মিলনকে তুচ্ছজ্ঞান করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে?—এই প্রশ্নটি লইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও যাদুকর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় বহু সাহিত্যিককে বাদপ্রতিবাদে নিযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

আমরা বলি,—যৌন-বৃত্তিই সভ্য মানুষের একমাত্র বৃত্তি নহে—বিভিন্ন মানবীয় বৃত্তির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতার মধ্যে মানব-সমাজের পূর্ণ বিকাশ ও আত্মতৃপ্তি (self-realisation) দেখিতে পাই। বিভিন্ন বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযমসাধনের মধ্যেই মানব-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধন চলিয়া আসিয়াছে।

সুতরাং যেখানে বৃত্তিসমষ্টিকে লইয়া মানুষের সত্য জীবনটি গড়িয়া উঠে সেখানে বৃত্তিবিশেষকে প্রবৃত্তির নিম্ন মার্গে নামাইয়া দিলে মানব জীবনের দুর্গতিরই সূচনা হইবে। খণ্ডরূপ কখনই সত্য নহে, শোভনও নহে।

একদিকে তথাকথিত শিক্ষিত (cultured) সমাজ বা ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে যুবকযুবতীর অবাধ মিলন, সম্পর্ক ও সম্বন্ধের গণ্ডীকে তুচ্ছ করিয়া দেহ-দানের অত্যুজ্জ্বল চিত্র শোভন-সংস্করণ উপন্যাসে স্থান পাইল। অন্যদিকে খেঁদি, বুঁচি, পটলী, রহমন, আয়না বিবি, নওয়াল কিশোর, জমাদারনী প্রভৃতিকে লইয়া 'তেজাল' (bold) বস্তী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ঘটনা চমকপ্রদ,—মিলন সম্ভব অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়া—দুর্ব্বল মনকে অভিভূত করিয়া দিল—কাঁচা ঘুঁটি পাকিয়া বসিল। গজে কিস্তি মাৎ।—কেহ বলিল সাবাস! কেহ বলিল—ছোঃ! সাহিত্যে নব-ভগীরথ বলিয়া কেহ বা আহ্বান করিলেন—কেহ বা প্রজাপতি-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাকে ডাকিয়া নামের তালিকা দিয়া অনুরোধ করিলেন—এই বৈশাখের প্রথমেই। বুঝিলেন?—আভ্যুদয়িক খরচ পত্র আমার—সে জন্য চিন্তা নাই।—কিন্তু সে কথা থাক্।

প্রকৃত 'আর্ট' সত্যের পরিপূর্ণ রূপ,—নীতির সহিত তাহার বিরোধ হইতে পারে না। সংস্কার মাত্রেই নিন্দার্হ নহে,—বিধি-নিষেধ মাত্রই পরিত্যাজ্য নহে। বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল গড়িল কে?—একদিনেই এই জগৎটা প্রবীণ হইয়া উঠে নাই—সেও একদিন নবীন ছিল—নবীনতার উন্মাদনায় সেও একদিন দিক্‌বিদিক না মানিয়া—উশৃঙ্খল ভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে। সংযম আর কাপুরুষতার প্রভেদ স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভেদ—সংযমকে দুর্ব্বলতা ভাবিয়া স্বস্তি আসিল কৈ?—নিয়মের শৃঙ্খল গড়িয়া যে দিন মানুষ আপনার হাতে আপনি পরিল—বিশ্বসভ্যতার সূচনা হইল সেই দিন।

মানুষ প্রবৃত্তির দাস। সভ্য-যুগের ক্রমঃ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংযম—কি বাক্যে, কি ব্যবহারে, কি ভাবের অভিব্যক্তিতে সর্ব্বত্রই উৎকর্ষের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তবুও অশেষ যত্ন ও অসীম সাধনাসত্ত্বেও নিবৃত্তির মার্গ হইতে মানুষের অবিরাম পতন হইতেছে;—তাহার উপর যদি কবি, চিত্রশিল্পী, কথাশিল্পী প্রভৃতি রসসৃষ্টির অজুহাতে মুখরোচক ও উদ্দীপক সাহিত্য বা চিত্রপ্রকাশের দ্বারা আদিরসের নবগঙ্গা বহাইয়া দেন তাহা হইলে—কূল ভাঙ্গিবে, স্রোতের আবিলতায় মানসিক অস্বাস্থ্যও বাড়িয়া যাইবে—একথা নিশ্চয়।

সাহিত্য বা আর্ট মনুষ্যত্ববিকাশে সহায়তা করিবে। কিন্তু যে আর্ট বা সাহিত্য ইন্দ্রিয়বিক্ষোভের সহায়তা করে, মানুষের মধ্যে আদিম বর্ব্বর যুগের পশুপ্রকৃতির উদ্বোধনে সহায়তা করে—তাহা আর্ট নামের অযোগ্য। তাহা পূর্ণ জীবনের একটা কদর্য্য দিক ফুটাইয়া তুলিলে অপূর্ণতাই প্রকাশ পাইবে।

বোকাক্‌সিওর ডিকামিরন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বাইরণের ডন্ জুয়ান, গোপাল উড়ের টপ্পা,—কোনটাই রুচির জন্য বাহাদুরী পায় নাই। মানুষের সভ্যতার বিচার রুচিতে, সুরুচির মধ্যে একটা অনাবিল স্বস্তিবোধ আছে।

আর্ট—শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, সর্ব্ব দায়িত্ব শূন্য। কিন্তু এই গুণগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কদর্থে অনর্থসৃষ্টি সুনিশ্চিত। অনাবিল রসসৃষ্টি আর্ট বা সাহিত্যের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে সাহিত্যে অনাচার আসে। উচ্ছৃঙ্খলতার গ্লানি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই তখন আমরা বলি—

"Silence for a Generation"—"To keep itself to itself, and never say nothing to nobody."

সমসাময়িক সাহিত্য

প্রবন্ধ

'ভারতবর্ষ'এর শ্রাবণ সংখ্যায় কবিগুরুর দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, একখানির মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিত্বে ও সেই মানুষ অব্যক্তে।"

এই মানুষ অর্থে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন বিশ্ব-মানব, কোন দেশবিশেষের কতকগুলি মানুষ নয়।

পত্রশেষে কবি-গুরু দিলীপ বাবুর কবিতায় পরিপূর্ণাঙ্গ ছন্দ পাইয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য সত্যই দিলীপ বাবুর ছন্দে বেশ অধিকার জন্মিয়াছে। এই সংখ্যার ভারতবর্ষে তাঁহার অভীপ্সা নামক গানটিই তাহার প্রমাণ। দিলীপ বাবু জয়দেবের ছন্দের বেশ সার্থক অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন। তবে ছন্দই ত সব নহে।

অন্য পত্রখানিতে কবিগুরু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সংখ্যা ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সমস্যা না সমাধান।' আজকাল প্রমথ বাবুর ন্যায় অন্য বড় কেহ একটা বিরাট ভাব বা বিশ্বতোমুখী চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া এমন চমৎকার প্রবন্ধ লিখিতে পারেন না। এই ভারতবর্ষের পৃষ্ঠাতেই তাঁহার "বর্ব্বরের ব্রহ্মজ্ঞান" ও "বজ্র" নামক দুইটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। সে দুইটির কথা আজও ভুলিতে পারি নাই।

'সমস্যা না সমাধান'এ লেখক কোন সমাধান দিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কেবল বিশ্বরহস্যের সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের চিন্তার উদ্বোধন করিয়াছেন এবং সমাধানের সন্ধান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রমথ বাবু নবী নহেন, প্রফেট নহেন, সিদ্ধপুরুষ নহেন। তাঁহার নিকট সমাধান চাওয়া বাতুলতা। তবে গড্ডালিকা-প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

সমাধান কি বা কোথায় তাহা বলা শক্ত, কিন্তু কোন একটি আদর্শ, সভ্যতা বা শাস্ত্রকে আঁকড়াইয়া নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চেষ্ট জীবনযাপন অপেক্ষা সমাধানের অভিমুখে যাত্রার মধ্যে অধিকতর সত্য আছে। এই যাত্রা করিতে হইলে অবলম্বিত আদর্শ বা জীবনসূত্র ইত্যাদির মধ্যে সংশয়মূলক সমস্যার সন্ধান পাওয়া চাই। যাঁহারা মনে করেন দর্শন শাস্ত্র সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে, লেখক তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—"দার্শনিকের পক্ক কেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ত স্বচ্ছ নয়, হৃদয়ও অকুতোভয় নয়, বাহুও ধীর অকম্পিত নয়। এ অকূলে পাড়ি দিতে যে রকম সাচ্চা ও শক্ত মাঝির প্রয়োজন, সে রকম সাচ্চা ও শক্ত মাঝির সার্টিফিকেট দার্শনিকের নাই।"

দার্শনিকগণ কেবলই গোলক-ধাঁধাঁর পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

লেখক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানের রচনা সম্ভবতঃ ময়দানবের রচনা। বিজ্ঞান আমাদিগকে কর্ম্ম-দীক্ষা দিয়াছে সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে অনেক মিথ্যা সত্যের সাজে সাজিয়া বেশ কিছু দিন আমাদের ঠকাইয়া গিয়াছে তার সাক্ষ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় পাতায়।"

লেখক বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই—পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সমুদ্র মন্থন করিতেছে তাহাতে কেবল অমৃত উঠিতেছে না বিষও উঠিতেছে। সকল সমুদ্রমন্থনের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। যিনি নিষ্কাম ত্যাগবপু ও বিশুদ্ধজ্ঞানবপু সেই শিবের আমন্ত্রণ হয় নাই। এই বিষ কণ্ঠে ধরিবে কে? জড় আজ চৈতন্যের দীক্ষা না পাইয়া চৈতন্যকেই আপন দীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়াও লেখক সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অমৃতের অভয়ের আনন্দের

খোঁজে চলিয়া আজ ভারত এমন ধারা মৃত্যু, দৈন্য। ভীরুতার নাগপাশে বাঁধা পড়িল কেন?

এই সকল সমস্যার উত্থাপন কেবল চিন্তাশক্তির উদ্বোধন ও সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তিদানের জন্য। প্রবন্ধটিতে লেখক কেবল সংশয়ের সৃষ্টি করেন নাই। সংশয়ের যথেষ্ট কারণও দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্র হইতে কতক কতক অংশ উৎকলিত করিয়া ভারতবর্ষের পৃষ্ঠাপূরণ করিতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে কোন কোন সাপ্তাহিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ব্রজেন বাবু যদি পুরাতন সাময়িক পত্রগুলির সাহায্যে কতকগুলি অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক, অর্দ্ধ-সামাজিক প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত সত্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের তত উপকার হইত না; অবশ্য তিনি ব্যঙ্গের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন।

আমার মতে এই পৃষ্ঠাগুলিতে ব্রজেন্দ্র বাবু আমাদের প্রভূত উপকার করিতেছেন। উদ্ধৃত নিবন্ধগুলি হইতে আমরা সেকালের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের নানা অঙ্গের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পারিতেছি। ব্রজেন বাবু যে সময়ের সাময়িক পত্রের নিদর্শনী আমাদিগকে দিতেছেন, তখন বর্ত্তমান সামাজিক, নাগরিক ও পৌর জীবনগঠনের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। পৌর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি, আমাদের সাহিত্য, ভাষা, সাময়িক পত্র, গ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদন, শিল্পপ্রচেষ্টা ইত্যাদি সমস্তেরই তখন কৌমারাবস্থা। এই নিদর্শনীগুলি পাঠ করিলে আমাদের মনে মনে বহু প্রবন্ধই বিরচিত হইয়া উঠে। ব্রজেন্দ্র বাবুর দুই একটি প্রবন্ধ অপেক্ষা তাহাতে ঢের বেশি লাভ। সেকালে সাহেবদের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্ক, সেকালের ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ উৎসব, সেকালের লোকের নৈতিক আদর্শ, বৃত্তি-প্রবৃত্তি, জীবনযাত্রার গতিবিধির বহু তথ্যই আমরা জানিতে পারিতেছি। এ সকল মনের কোটরে কক্ষে বাসা বাঁধিতেছে। একদিন তাহারা সৃষ্টির উপকরণ উপাদানে পরিণত হইবেই।

এই নিদর্শনীগুলি হইতে সব চেয়ে আমাদের যে লাভ হইতেছে, তাহা ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে। এক শত বর্ষ আগে বাঙ্গলা গদ্যের কী রূপ ছিল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা-গদ্যকে কি অবস্থায় পাইয়া তাহাকে সভ্যভব্য ও মার্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিরূপ উদ্দাম অবল্গিত বাহনকে তিনি বশীভূত ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা এই নিদর্শনীগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরকে অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খুব বড় সাহিত্যিক বলিয়া নহে, একজন মহাশক্তিশালী ভাষা শিল্পী বলিয়া। বিদ্যাসাগর যে কত বড় শিল্পী ছিলেন তাহা তাঁহার শিল্পের উপাদানগুলি দেখিলেই বোঝা যায়।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র "কি লিখি?" প্রবন্ধে যে প্রকার ঘটা করিয়া সূত্রপাত করিয়াছিলেন, প্রবন্ধের প্রগতিতে তাহার সারগর্ভ পরিণতি কিছু দেখিলাম না। তাঁহার প্রবন্ধে অনেক কিছু শিখিব ভাবিয়াছিলাম। মূল্যবান্ কথা যে একেবারে নাই, তাহা নয়, তবে প্রবন্ধটি এমন ভঙ্গিতে লিখিত যে, সেগুলি যেন মজলিসী আলাপনের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।

মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচনা চলে কি না এ সমস্যার সমাধান ত বহু দিনই হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সমাধান হইয়াছে—ইহাতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ সমাধান হইয়াছে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মৌখিক ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বৈষম্য বিদূরিত হওয়ায়। ভাগীরথীর দুই তীরের ভাষাই মৌখিক ভাষার আদর্শ। কলিকাতার ভাষা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র ভাষা কল্পনার প্রয়োজন কি? শিক্ষিত বাঙ্গালী চট্টগ্রামেই থাকুক, আর পেশোয়ারেই থাকুক, মহীশূরেই থাকুক আর দারজিলিং এই থাকুক তাহার মৌখিক ভাষার মধ্যে এখন বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। এ ভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালী পরস্পরের সংসর্গে, স্কুল কলেজে ও মৌখিক ভাষায় রচিত সাহিত্য পাঠে শিখিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক জেলার ইতর লোকদের মৌখিক ভাষার প্রকৃতি ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন। জেলায় জেলায় অশিক্ষিত ভদ্রনারীদের ভাষাতেও তফাৎ আছে। যে সকল ভদ্রলোক গ্রামে বাস করেন, জেলায় জেলায় তাঁহাদের ভাষাতেও তফাৎ আছে; কিন্তু শিক্ষিত নাগরিক বাঙ্গালীর ভাষা সর্ব্বত্রই অভিন্ন। সামান্য দুই একটি শব্দে বা উচ্চারণে কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয় মাত্র।

দুই তীরের ভাষাই শেষ পর্য্যন্ত সকলের আদর্শ।

বাঙ্গালা idiom ব্যবহারে এখনো তাহাদের মধ্যে কিছু গোলযোগ ঘটে। কিছুদিন পরে তাহাতেও গোল থাকিবে না। অতএব জেলায় জেলায় মৌখিক ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াতাহাতে সাহিত্য সৃষ্টির আর অসুবিধা নাই।

যোগেশ বাবুর প্রবন্ধে বানান-সমস্যার একটা ইঙ্গিত আছে। উহা এখনও সমস্যাই থাকিয়া গিয়াছে। এ সমস্যার সমাধান ক্রমেই হইবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রবর্ত্তিত বানান যদি দেশের লোক আজও মানিয়া না লয়, কিছু দিন পরে তাহা যখন শব্দকোষ ও সম্পূর্ণাঙ্গ একখানি ব্যাকরণের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে, তখন অবশ্যই মানিবে। একটি সম্ভ্রান্ত সাহিত্য-সংসদ্ বা পণ্ডিত-পরিষদ্ হইতে যদি একখানি ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচিত হয়, তাহা হইলে দেশের লোক বানানে ঐ ব্যাকরণ ও শব্দকোষের অনুসরণ করিবে।

'ঙ' ব্যবহার সম্বন্ধে যোগেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন। যোগেশ বাবু বলেন, 'ঙ' এর উচ্চারণ বাংলায় অনুস্বারের মতন নহে। আজ আমরা ভাঙ্গা না লিখিয়া ভাঙা লিখি—তাহাতে 'ভাঁওয়া' উচ্চারণ হয়। যোগেশ বাবু প্রাচীন সাহিত্য হইতে অযুক্ত 'ঙ' এর বহু উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন—কোথাও 'ঙ' অনুস্বারের মত উচ্চারিত হয় নাই—'ঙ' এর প্রকৃত উচ্চারণ—'উঅ' বা 'ওঅ'। কাজেই রাঙা না লিখিয়া রাঙ্গা লেখাই উচিত। কিন্তু ভাঙ্গার বা রাঙ্গার বর্ত্তমান উচ্চারণে যে 'গ' একেবারেই নাই তাহার উপায় কি?

যোগেশ বাবুর প্রবন্ধে প্রকাশ—তিনি গত ত্রিশ বৎসরের কথাসাহিত্য পাঠ করেন নাই—তিনি যদি তাহা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আমাদের যথেষ্ট লাভ হইত। ভাষার একটা আদর্শ তাঁহার নিকট হইতে মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত।

ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেনের "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরস" প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সত্য বাবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রাচীন সাহিত্য হইতে হাস্যরসের যে নিদর্শনগুলি তুলিতেছেন—তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে, প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃত হাস্যরস নাই। পূর্ব্বকালের সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের রচনায় একেবারে রসঘন-কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইলেও সত্য। বাঙ্গালা দেশের লোক রসিক বলিয়া খ্যাত—কিন্তু তাহার সে রসিকতা প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও অভিব্যক্ত হয় নাই। লোকসাহিত্যেও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই রং মাখিয়া সং সাজিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া, নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া অভিনেতাদের হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে হইত। আর এক উপায় ছিল—অশ্লীল কুরুচিকর বাক্‌চাতুর্য্য। উহার ধারা দীনবন্ধু মিত্র পর্য্যন্ত আসিয়া লোপ পাইয়াছে। ধনি-মজলিসের যে ভাঁড়ামীর কাহিনী ও ইতিবৃত্ত কিছু কিছু পাওয়া যায়,—তাহাও সাহিত্যের হাস্যরস নয়, ইতর জনেরই উপভোগ্য। কবির গানের হাস্যরসের প্রধান অবলম্বন ছিল গালাগালি।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্রের "সমাজ, দারিদ্র্য সমস্যা ও স্ত্রীসমস্যা" পড়িয়া মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

লেখক বলিয়াছেন—

"আমরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অন্য কোন সভ্যজাতির তুলনায় হীন নহি।" একথা ধ্রুব সত্য,—বা—দেশভক্তের উচ্ছ্বাস?

লেখক বলিয়াছেন—

"ভারতীয় সভ্যতার মতন এত দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতাও পৃথিবীতে কুত্রাপি কখনো দৃষ্ট হয় নাই।"

প্রাচীন সভ্যতা ত' সকল দেশেই লুপ্ত হয় নাই, কোথাও কোথাও রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। সকল সভ্যতারই সেই গতি। আদিম অবস্থায় কোথাও কোন সভ্যতাই বিদ্যমান নাই। ভারতীয় সভ্যতাও সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে। ধর্ম্মের ধারাই একটা সভ্যতার এক মাত্র উপজীব্য নয়, অন্যান্য ধারার কথাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। ধর্ম্মের ধারারও কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। একই সভ্যতা চিরদিন ধরিয়া চলা দেশের শক্তির পরিচয় না জড়তার পরিচয় তাহাও ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ।

লেখক বলিতেছেন—যদি জাতিভেদ প্রথা অনিষ্টকরই হয় তবে বৌদ্ধযুগের পর তাহার আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে কেন?

বৌদ্ধযুগে জাতিভেদ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা কে বলিল ?

অনিষ্টকর হইলেই কি কোন প্রথার পুনঃস্থাপন হয় না ? প্রবলের স্বার্থের জয় কি সর্ব্বত্র নয় ?

লেখক বলিয়াছেন—

"মুসলমান সভ্যতার প্রবল বন্যার মুখে সকল সভ্যতাই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল ভারতবর্ষ তাহার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল।"

এটা কি একটা গৌরবের কথা ? প্রচীন সভ্যতার জন্মভূমি প্রকাণ্ড মহাদেশতুল্য হিন্দু ভারতবর্ষ বাহুবল-সর্ব্বস্ব মুসলমান সভ্যতাকে নিজের অন্তরে প্রবেশ করিতে দিতে বাধ্য হইয়াছে, শুধু প্রবেশ কেন সেই শিশু-সভ্যতার সঙ্গে নিজের সভ্যতার সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে—ইহার তুল্য অগৌরব কি আছে ?

চারু বাবুর প্রবন্ধের প্রত্যেক উক্তির অন্য দিক দেখান যাইতে পারে। প্রকাণ্ড প্রবন্ধের এই ভাবে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে কুলাইবে না।

তিনি জাতিভেদ, একান্নবর্ত্তিতা, ইউরোপের শ্রমিক সমস্যা, আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের শ্রমিক-জীবন, বর্ত্তমান শ্রমিক জীবন, তরুণ ভারতের নবাদর্শ, দরিদ্রের প্রজাবৃদ্ধি, অসাম্যবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন—প্রত্যেকটির স্বপক্ষে বিপক্ষে দুই-ই বলা যায়।

চারু বাবু অর্থনৈতিক দিক হইতে জাতিভেদকে সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে জাতিভেদের সহিত বৃত্তিভেদের সমাঞ্জস্য লোপ পাইতে বসিয়াছে—তবু কি জাতিভেদকে সমর্থন করা যায় ? বৃত্তিকে কি এখন আর পুনরায় জাতিগত করিয়া তোলা যায় ?

অর্থনৈতিক দিক ছাড়া অন্যদিক হইতেও জাতিভেদকে বিচার করা চাই না কি ? জাতিভেদের প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে অনেক লাভ হইয়াছিল—তাহা স্বীকার করি। কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক হইতে কি কোন লোকসানই হয় নাই ? বুদ্ধদেব কি ভুল করিয়াছিলেন ? বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ? জাতিভেদ ভাল হউক আর মন্দ হউক, দেশের শাসকমণ্ডলী ও সমাজপতিগণ তাহার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। যে দিন দেশ পরতন্ত্রে গিয়াছে সেই দিন হইতে তাহার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে সভ্যতা দেশকে রক্ষা করিতে পারে নাই, সে সভ্যতা জাতিভেদকেও বাঁচাইতে অশক্ত। সভ্যতার দীর্ঘকালস্থায়িত্বের কোন গৌরবই নাই—যদি তাহা আপনার শাসনাধিকার রক্ষা করিতে না পারে। নূতন নূতন সমস্যার যত দিন অ'বির্ভাব না হয়, ততদিন সকল প্রথাকেই চমৎকার বলিয়া মনে হয়। নূতন সমস্যার অভ্যুদয় হইলেই প্রচলিত প্রথার আর চমৎকারিতা থাকে না।

মোট কথা, চারু বাবু এই প্রবন্ধে তাঁহার নিজস্ব মতামত গুলিকে যুক্তির পথ দিয়া সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করেন নাই।—আপনার বক্তব্যের পোষকতার জন্যই চিরপোষিত অপরীক্ষিত মতগুলিকে সাজাইয়া গিয়াছেন মাত্র।

শ্রীকালিদাস রায়

কথা

বর্ত্তমানে সাহিত্যে চুরি নিয়া একটি কথা উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন যে: (শারদীয়া বসুমতী —১৩৩০)—"সাহিত্য-জগতে চুরি বলে' কোনও জিনিষ নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই তা' শ্যামের কথা হয়ে ওঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভাসাপেক্ষ। যে পরের জিনিষ নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সেই চোরদায়ে ধরা পড়ে।"

চৌধুরী মহাশয় আরও বলিয়াছেন: "এ-কালের কথাবস্তু সবই লৌকিক আর তার পাত্রপাত্রী সব মানুষ। এক দেশের লৌকিক আচার ব্যবহার আর এক দেশের লৌকিক আচার ব্যবহারের সঙ্গে মেলে না। তা ছাড়া য়ুরোপের স্ত্রী পুরুষ শুধু চর্ম্মে নয়, মর্ম্মেও এ-দেশের স্ত্রী

পুরুষ থেকে অনেক তফাৎ। সুতরাং য়ুরোপের লোকদের বাঙ্গালীতে রূপান্তরিত করা তেমনই কঠিন—বাঙ্গালীকে ইংরাজ করা যেমন কঠিন। ও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করার মত হাতসাফাই সকলের নয়।...পরের জিনিষ আপন করে নেবার ভিতর একটা মস্ত মৌলিকতা আছে। প্রকৃত গুণী ব্যতীত অপর কারো দ্বারা তা সুসাধ্য নয়। একটু আধটু বদ্‌লে জিনিষ যে সম্পূর্ণ নূতন হয়ে যায়, তার প্রমাণ দেখতে চান ত' অতি বড় সুন্দরী রমণীর নাসাংশ এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেখুন, সে নতুন মূর্ত্তি ধারণ করে কি না?"...

"একালের কথাবস্তু সবই লৌকিক, আর তার পাত্র পাত্রী সব মানুষ"—ইহা সত্য; য়ুরোপের স্ত্রীপুরুষ চর্ম্মে বিভিন্ন, ইহা সত্য নহে। পাত্র পাত্রী সব "মানুষ" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একাধিক পক্ষে একাধিক স্রোত একই দিকে প্রবাহিত হইতেছে; এবং মনুষ্যত্ব তাহারই রসে অঙ্কুরিত এবং সঞ্জীবিত হইয়া বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রধানতম মর্ম্মগত অনুভূতিগুলির একত্ব অবিসম্বাদিত বলিয়াই ইংরেজের লেখা আমরা নির্ব্বাসিত করিয়া দেই নাই, তাহা অপাঠ্য হইয়া উঠে নাই; উপরন্তু তাহা আমাদের অমল আনন্দ দেয়। রণভেরীর শব্দে মন কেমন করে তাহা আমরা জানি না; কিন্তু সেখানকার সহজ মানুষ সুখে দুঃখে স্নেহে প্রেমে আশা আশঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত ও বিচলিত হইয়া কিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি; এমন অনেক প্রবৃত্তির কথা বলা যাইতে পারে যাহা কেবল চর্ম্মের উপরিভাগে চৌহদ্দির ছেদ টানিয়া ফেরে না—মনে মনে বন্ধন ঘটায়। ওরা পিতপুত্রে সাম্‌না সাম্‌নি বসিয়া মদ্যপান করে; স্ত্রী স্বামীর বন্ধুর প্রতি অনুরাগ না হোক্ সাহচর্য্যের লালসাটা স্বামীর সম্মুখেই প্রকাশ করে—তাহাতে স্বামী কিছু মনে করিলে স্ত্রী স্বামীকে অভব্য বলে; সহোদরা ব্যতীত অন্য ভগিনীকে একেবারে পর মনে করে—ইত্যাদি।

ওদের কথা-বস্তুর মধ্যে এরূপ আচার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়; ঐ গুলিকে সযত্নে বাদ দিয়া তাহাদের যে দার্শনিক চিন্তাটি আছে, তত্ত্ববোধটি আছে, অনুরাগী হৃদয়টি আছে, তাহার প্রতিচ্ছবি আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপ "উপাদান" নির্ব্বাচন করিতে হইলে লোভসম্বরণ-পূর্ব্বক অনেক উপাদান বর্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে তাহাকে "রূপান্তরিত" করায় তত প্রতিভার প্রয়োজন নাই যতটা প্রয়োজন আছে বলিয়া চৌধুরী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মসাৎ করিয়া বিদেশী কথা-বস্তুকে নূতন রূপ দিতে পারিলেই তাহা সার্থক হইয়া উঠে না, স্বকীয় সাহিত্যে নূতন জিনিষ হইলেই তাহা সার্থক। সুতরাং "রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ" করিতে বসিয়া প্রতিভার অভাবে নহে, সুবুদ্ধির অভাববশতঃই বিভ্রাট ঘটায়।

প্রমথবাবুর সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। সাহিত্যে চুরি বলিয়া জিনিষ নিশ্চয়ই আছে, এবং তদ্রূপ রচনায় ঋণ স্বীকার করা উচিত; ভদ্রতার বা সাধুতার খাতিরে না হোক্, ঐতিহাসিক, সমালোচক এবং পরবর্ত্তী লেখকগণের সুবিধার জন্য লৌকিক বস্তু এবং সংগৃহীত বস্তু স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া রাখা দরকার।

আষাঢ়ের প্রবাসীর প্রথম গল্প "মহেশের মহাযাত্রা"র ছবি নাই, কাজেই কেমন অনুজ্জ্বল আর আড়ষ্ট লাগিয়াছে। স্রোতের জলে চন্দ্রকিরণের মত পরশুরামের গল্পগুলি ছবির সাহায্যে স্ফুটতর এবং মনোরম হইয়া উঠে। গল্পের নিজস্ব রস নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু তাহা পরিবেশন করে ঐ ছবিগুলি। গল্পের ভাষা ও ছবি এতদুভয়ের মধ্যে কে কাহার বেশী মুখাপেক্ষী তাহা লইয়া তর্ক করা চলে। "শিহরণ সেন" নামটির ভিতর কিছু নাই—কিন্তু শিহরণ সেনের চেহারা কেমন তাহা দেখাইয়া দেওয়াতে নামটি বহুলোকের মনে আছে।

কিন্তু "মহেশের মহাযাত্রা"র ছবি নাই। ছবি থাকিলেই ভাল হইত; মানুষের কৌতুকবোধ রসবোধ অপেক্ষা প্রবল হইয়া রসিকতার মাত্রাজ্ঞানের অভাব চাপা পড়িত। ছবির অভাবে ইহার শ্রীহীনতা অনাবৃত হইয়া দেখা দিয়াছে। যে পাত্রগুলিতে comic character আরোপ করিয়া হাসাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেই পাত্রগুলিকেই যেন

স্বস্থানে আনিয়া দাঁড় করান হয় নাই—বিপরীত চরিত্রের লোক হইলেই তাহাদিগকে মানাইত। এক কথায়, এই গল্পটির ভিতর তারা অস্বাভাবিক।

পশুরামের কথাই আর একটু চলুক। পশুরামের কর্ত্তব্য, প্রবাসীর পুরস্কারের সেই দুইশত টাকা, যদি দানে শেষ হইয়া না থাকে তবে, প্রবাসীকে ফেরৎ দেওয়া।

ছোট গল্পের জন্য প্রবাসী তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; বিচারভার অর্পিত ছিল পাঠকের উপর কিন্তু পাঠকগণ মূলে ভুল করিয়া একের জিনিষ অন্যকে দিয়াছেন। পরশুরাম উক্ত পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় ছোট গল্প লেখেন নাই, লিখিয়াছিলেন সচিত্র কয়েকটি চুটকি গল্প—ছোট ছোট হাসির গল্প, যাহা মজলিসে চলে; সাহিত্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দিষ্ট ছোট গল্প তাহা নহে।

প্রবাসী-সম্পাদক এই সম্পর্কে যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহাও হৃদয়গ্রাহী। পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঘোষণা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের গ্রাহক হাজার হাজার—কিন্তু ভোট পাইয়াছি মোটে আশীটি।

ইহার উপরেও আমরা বলিতে চাহি যে, ঐ আশী ভোটের পাঁচাত্তরটি আসিয়াছিল লাইব্রেরী অর্থাৎ ইয়াকির আড্ডা হইতে; বাকি পাঁচটি জন্ম লইয়াছিল, তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে তরুণ স্বামীর বাজি রাখার ফলে।

এই গল্প-লেখা লইয়াই আমাদের কলহের তীব্রতার, আর চুরি ধরাধরির অন্ত নাই।

কলহ এবং সাহিত্যিক চৌর্য্যপরায়ণতার কথায় আর একটা অবান্তর কথা মনে পড়িয়া গেল। পরশুরামের একটি গল্প যখন ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন ঋণ-গ্রহণের উল্লেখ ছিল, কিন্তু গড্ডালিকায় তুলিবার বেলায় কুঠারাঘাতে সেটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। কার আজ্ঞায়?

শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীর, একমাত্র স্তনওসিয়োর মূল ইতালীয় হইতে অনূদিত গল্পটি বাদ দিলে, গল্পাংশ সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন। প্রবাসী বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সহিত প্রবাসীর নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। মাসিক সাহিত্যের যাহা অপরিহার্য্য অঙ্গ, অর্থাৎ সাময়িক প্রসঙ্গ, দেশ বিদেশের খবর ইত্যাদি সঙ্কলন বিষয়ে প্রবাসী আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নানা প্রকার জ্ঞাতব্য আলোচনা ও প্রবন্ধে প্রবাসী ঋদ্ধ। কিন্তু কিছুদিন হইতে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় সৃজনী প্রতিভার পরিচয় বিরল হইয়া আসিতেছে। ইহার মূল কারণ হয়তো এই যে, বাংলা ভাষায় সৃজনী প্রতিভার দারিদ্র্য ঘটিয়াছে। কিন্তু একথা মাসিক সাহিত্য পত্রিকার কিছুতে ভুলিলে চলিবে না যে, নবীন প্রতিভার আবিষ্কার তাহার যেমন অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য তেমনই উৎসাহ ও আশ্রয়দানে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করাও তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন করিবার বিরুদ্ধে অর্থকৃচ্ছ্রতা একটি যুক্তি—অন্ততঃ আমাদের মত ক্ষুদ্র সামর্থ্যের পত্রিকার পক্ষে সেই যুক্তিই একমাত্র যুক্তি। কিন্তু প্রবাসীর পক্ষে সে যুক্তি খাটে না, অন্ততঃ খাটে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। প্রবীণ প্রবাসী সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রতিভা স্বতন্ত্র—বোধ করি তাই তাঁহার পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া গবেষণামূলক প্রবন্ধকারের পরিচয় মাঝে মাঝে মিলে। কিন্তু নূতন কবি ও গল্পলেখককে প্রবাসীর মধ্য দিয়া বহু দিন দেখি নাই। জানিনা প্রবাসীর গল্প-উপন্যাস সম্পাদন দায়িত্ব কাঁহার? যাহারই হউক তাঁহাকে আমরা সুবিবেচক বলিতে পারি না। অবশ্য বিবেচনাযোগ্য গল্প হয়তো দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ইহার উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি। নূতন গল্পলেখককে আবিষ্কার করিবার দায়িত্ব মাসিক সম্পাদকের বড় দায়িত্ব এবং যাহার গল্পে সম্ভাবনা আছে, তাহাকে সন্ধান করিয়া উৎসাহিত করিলে পত্রিকার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না, পক্ষান্তরে বর্দ্ধিতই হয়। একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বিচারের মানদণ্ড এ সমস্ত স্থলে একটু ছোট করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই মানদণ্ডের বিচারে যাহা উত্তীর্ণ হইল তাহা পাঠে পাঠক কেবল দণ্ডই ভোগ না করে। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশ কাল পাত্রানুযায়ী গল্প-সাহিত্যে যে বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিয়া গল্পসম্ভারে সমৃদ্ধি আনয়ন বর্ত্তমান মাসিক পত্রিকার পক্ষে অসম্ভব।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বর্ষা আসিয়াছে। বিশ্বের অন্তরে অনুকূল উৎসাহে প্রকৃতির তপস্যার একটি রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিল কাতারে কাতারে মেঘদল, কেহ চপল, কেহ গম্ভীর, কেহ লঘু, কেহ গুরু, আকাশ জুড়িয়া তাহারা ঘেরিয়া বসিয়াছে—কৌতূহল, ঔৎসুক্য, আগ্রহ, শঙ্কা, উল্লাস বেদনায় তাহাদের প্রাণ চঞ্চল। ওই নীচে ধরণীর বক্ষ, সেখানে রসের ধারায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে – সমাপ্তির, পরিতৃপ্তির দ্বারে তাহারা মন্থর, প্রাণের মন্ত্র অন্তরে লইয়া শান্ত অপেক্ষায় স্থির। বঙ্গদেশের বর্ষা, কত আশা, কত স্মৃতি, কত বার্ত্তা লইয়া সন্তানদের প্রাণে বাজিল, সুখ, দুঃখ, ঔদাসীন্যকে সরস সজাগ করিয়া—চাষারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'আগুড়ি বর্ষা'। বর্ষা শ্যামকে তাহার চিন্তা ও অস্তিত্বের উপর একটা সাময়িক সীমারেখা টানিয়া ধ্যানের মধ্যে ডুবাইয়া নিস্কৃতি দিল।

বর্ষা দেখিয়া দেখিয়া শ্যামের ক্লান্তি নাই, কথা কহিবার সঙ্গীটি চলিয়া গিয়াছে; মনে অহরহ একটা অশান্তি, যেমন কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে অস্বস্তি হয় সেইরূপ। প্রথমদর্শনে জ্যেষ্ঠভ্রাতের প্রতি যে আন্তরিক আকর্ষণ অনুভূত হইয়াছিল তাহা সান্নিধ্যে মন্দীভূত; প্রথম আবেগ অবসন্ন হইয়াছে এখন সব কথার মধ্যে একটা সচেষ্ট স্তোকবাক্য লক্ষ্য করিয়া শ্যাম আরও অশান্ত। ইন্দ্র সরকারের সংবাদ নাই এদিকে ব্রজকিশোরের অসুখও দিন দিন চক্ষের সম্মুখে বাড়িতেছে।

রাজুর উত্তম একটা পথ পাইল। দীর্ঘ নিষ্ক্রিয় জীবন তাহাকে কর্ম্মের, দৃঢ় ক্ষিপ্রকর্ম্মের জন্য পাগল করিয়াছিল। আবার নূতন অতিথি বা বন্দীর অভ্যর্থনা; বনের মধ্যে মাচায় উপর ঘর হইলেই কি গৃহস্বামীর গৌরববোধের অভাব হয়! আগন্তুকের যাহাতে অসুবিধা, কষ্ট না হয় তাহার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও আয়োজন, রাজুর সময় গ্রাস করিতেছে। গৃহসংস্কার ও পরিবর্দ্ধন কার্য্যে বর্ষা কাটিয়া গেল—নূতন সম্ভাবনা ও আশায়, কর্ম্মের পরিতৃপ্তিতে বহুদিন পরে আবার রাজুর কণ্ঠে গান আসিল। হারাধন একবার অবাক হইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল, তারপর যেন কোন অজ্ঞাত শত্রুর আগমনবোধে দৌড়িয়া মাচার উপরে উঠিল। রাজু হাসিয়া উঠিল।

চন্দ্র পাঠকের মধ্যে অগ্নিদেব যেটুকু পদার্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই বর্ষায় একেবারে ধুইয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। নূতন ব্যবসার সূত্রপাত হইতেই ধ্বংস, আর সে ধ্বংসের সঙ্গে নিজেও জড়িত হইয়া টলমল্ অবস্থা প্রাপ্ত। পুত্র ও মারোয়াড়ীর অদ্যাবধি দর্শন নাই; পাঠকের অন্তঃসারশূন্য বাহ্য আবরণটুকু উদ্বেগের বাতাসে কাঁপিতেছে। দারোগার সাহায্যে রাজুকে নির্য্যাতনের পথে অক্ষয়ের গুরুগম্ভীর নিষেধাজ্ঞা,—পাঠককে আর চিনিবার উপায় নাই। অক্ষয় প্রধান মন্ত্রীর এই বুদ্ধিবিকৃতিদর্শনে, এই চতুর্দ্দিক হইতে বিপদজালে জটাপটি খাওয়াতে বিরক্ত হইল, রাগ করিল, সেই মন্ত্রীবর পাঠকেরই উপর। বর্ষায় দুইজনের মধ্যে মনোমালিন্যকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আজ বৃষ্টি ক্ষান্ত হইয়াছে। প্রকৃতি বিপরীত মূর্ত্তিধারণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্যের বিশ্রামলব্ধ তেজোময় কিরণে বিপর্য্যস্ত; আর্দ্র সমীরণ ঘনচ্ছায়া অন্বেষণ করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। দুইজন শ্রীনগরযাত্রী ক্ষুদ্র পুলের ধারে মোট ঘাট নামাইয়া বিশ্রামার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। একজন চন্দ্র পাঠকের পুত্র, অন্যটি মারোয়াড়ী, টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিতেছে মারোয়াড়ীর জিদে গাড়ী

করা হয় নাই। সব টাকার নোট পুঁটুলি করিয়া বাঁধা। কখন একজন কখন অপর জন পথ চলিবার সময় বহন করিয়া আনিতেছে। অনভ্যস্ত পথচলনশ্রমে একান্ত কাতর পাঠকনন্দন জলযোগ কোনও মতে সমাপন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মারোয়াড়ীও তাহার অনুকরণে সচেষ্ট—এমন সময় দেখিল, একজন চাষা মাথায় একটি মোট লইয়া শ্রীনগর হইতে আসিতেছে। সত্ত্ববর্দ্ধিতকলেবর নদীটির পাড়ে, তাহাদের নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে চাষী মোট নামাইয়া হাতে মুখে জল দিতেছে। মারোয়াড়ী গিয়া তাহার অদূরে বসিল; উদ্দেশ্য গল্প করা। দেখিবামাত্র চাষী তাহাকে যে গল্প শুনাইল, তাহাতে মারোয়াড়ীর আধখানা তখনই মরিয়া গেল। ছোলা সব পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বর্ষাতে যেটুকু রক্ষা পাইয়াছিল তাহাও গিয়াছে, পাঠক পাগলের মতন হইয়া গিয়াছে। মারোয়াড়ীর এই সকল চিন্তার কারণ, প্রথমতঃ লোকসান তাহার, পাঠক তাহাকে দেখিবামাত্র এই সব ছোলার দাম চাহিয়া বসিবে। কোনও যুক্তি তর্ক করিতে গেলে, তাহার নিজের গ্রাম আর মারোয়াড়ী বিদেশী—পরিণাম সহজেই অনুমেয়। এ ক্ষতি সহ্য করিবার ক্ষমতা মারোয়াড়ীর নাই; জিনিষ থাকিলে সে কলিকাতার মহাজনকে ধরিয়া কোনমতে দামটা ফেলিয়া দিতে পারিত, কিন্তু এখন তাহার নিজের নগদ টাকা নাই আর থাকিলেই বা এমন দাঁড়াইয়া মার খাইতে শিক্ষা সে করে নাই। চাষী চলিয়া গেলে, মারোয়াড়ী ভাবিতে ভাবিতে নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিল। পাঠকের ক্ষতি হইয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও মারোয়াড়ী সে ক্ষতিপূরণ করিতে অসমর্থ; দুইজনের সাক্ষাতে পাঠকের কোনও উপকার হইবে না, মারোয়াড়ীর অপকার যথেষ্ট হইবে। সহযাত্রী অঘোর ঘুমে অচেতন, রাস্তার দুই পার্শ্বে গভীর বন, তাহার মধ্য দিয়া নদী সেই অরণ্যের ভীতি ও রহস্য কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিতেছে। মারোয়াড়ীর স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী ভর করিয়াছে; টাকার পুঁটুলি মারোয়াড়ীর কাছে এখন রহিয়াছে, থাকুক সেই খানেই, মন্দ কি? জীবনের প্রশস্ত স্পষ্ট পথে চলিতে চলিতে দৈববিপাকে সে পথ বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করা তাহার নূতন অভিজ্ঞতা নহে। কলিকাতাত্যাগের দিন হইতে রাত্রিকালে টাকার পুঁটুলি মারোয়াড়ীর মাথার উপাধানের কার্য্য করিয়াছে—পাঠকপুত্র জানিত তাহার নিজের ঘুম এত গভীর যে টাকা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নহে। মারোয়াড়ী টাকা সঙ্গে লইল মাত্র, আর কিছুর দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। নিদ্রিত সাথীর প্রতি একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মনে মনে তাহার অদৃষ্ট রামজীর যোগ্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া, কালীমাই ও হনুমানজীর অদৃশ্য সঙ্গ প্রার্থনা করিতে করিতে মারোয়াড়ী বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনের মধ্যে ছায়া নিবিড়, কেবল কোথাও খণ্ড খণ্ড রৌদ্র বিশ্রাম করিতেছে। ছায়ার রাজ্যে তাহাদের অস্তিত্ব বড় করুণ। রাজু গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল। তাহার চোখে পড়িল, একটি লোক সন্তর্পণে বনের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে, রাজু আত্মগোপন করিল। আগন্তুক নিকটে আসিতে রাজু মারোয়াড়ীকে চিনিল। আর ইহাও বুঝিল যে একক-পথভ্রান্তের কোনও লক্ষণ তাহার মধ্যে দেখা যায় না। এই অনভিপ্রেত অভ্যাগত রাজুর বিজন বনভূমির একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকার ক্ষুন্ন করিতেছে! রাজুর নিভৃত আশ্রয় হইতে বহুদূরে হইলেও ইহাকে আগে তাড়াইয়া তবে তাহার অন্য কাজ। অকস্মাৎ তাহার সম্মুখীন হইয়া রাজু কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও এখানে?" চমকিত মারোয়াড়ী হতভম্ব হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। সেই ঘোর অরণ্যে রাজুর দীর্ঘ মূর্ত্তি, বিশাল বক্ষ, অভ্যস্ত-মুষ্টিবদ্ধ লাঠি—বাতুলের মস্তিষ্কেও ভাবার্থ প্রবেশ করাইয়া দেয়। মারোয়াড়ী পলায়ন-পন্থা চিন্তামাত্র পরিহার করিল। সদ্যোলব্ধ অর্থ ভাগাভাগি করিয়া নিরাপদ হইবার উপায় সমীচিন নহে অতএব দুর্ব্বলের সনাতন পথ, মৌনব্রত অবলম্বন করাই মারোয়াড়ী শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল।

রাজুর অন্তরে তখন বহুদিনের সুপ্ত বালকটি জাগিয়াছে, সে আবার বলিল, "এখানে কেন এসেছ? প্রাণের ভয় নাই? সন্ধ্যা হলেই বাঘ বেরোবে; কোথায় যাবে?" মারোয়াড়ী পূর্ব্ববৎ। উচ্চারণের অতি আবশ্যক উপাদান কণ্ঠে এক বিন্দুও ছিল না। রাজু আবার বলিল, "হয়, আমার সঙ্গে এস, পৌঁছে দেব, আর না হয় এই বাঁ দিক লক্ষ্য করে সোজা দৌড় মার, নাকের সোজা ঠিক—উত্তর দিচ্ছ না

যে ?" মারোয়াড়ী উত্তর দিল, বৃথা বাক্যব্যয়ে নহে, চরণের উপর আস্থাহীন মৃগবিশেষের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া। পদযুগের উপর শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল, জগতে এক নূতন ভঙ্গীর দৌড়ে। রাজু বুঝিল যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ এ দৌড়ের শেষ নাই। হাসি চাপিতে গিয়া ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের মতন রাজুর কণ্ঠনিঃসৃত একটা বিকট আওয়াজ মারোয়াড়ীর কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। রাজু আবার স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। আজ রাত্রিই শ্যামকে গোপনে বন্দী করিয়া বনাশ্রয়ে আনিবার নির্দ্ধারিত দিন। তাহার গতি ক্ষিপ্র অথচ সাবধান, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ স্থির, মাথায় আক্রমণের কৌশল অথচ হৃদয় রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ শূন্য।

নৈশাহার সমাপনান্তে রাজু কাছারীবাড়ীতে গিয়া বসিয়াছিল। ইন্দ্র সরকারের সংবাদের জন্য তাহার মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রজকিশোরের রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। যাহা কিছু উদরস্থ হইতেছে তাহা অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিতেছে। বালিশ হইতে মাথা তুলিবার শক্তি লোপ পাইতেছে, অথচ কুপথ্য, কুচিকিৎসায় সকলে তুষ্ট হইয়া আছে। ডাক্তার একজন আনান দরকার। অন্যে যখন ভ্রুক্ষেপহীন তখন কর্ত্তব্যের অনুরোধেও শ্যামের নিজের মতে ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। কাছারীবাড়ী আসিয়া অক্ষয়ের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করাতে অক্ষয় এক গল্প ফাঁদিয়া বসিল; কোথায় কোন্ সরিক ডাক্তারের সাহায্যে রুগ্ন ভাগীদারকে জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিল। পাছে কর্ত্তা সেইরূপ কিছু ভাবিয়া বসেন, এই কথায় শ্যামকে সে যথাসাধ্য আপ্যায়িত করিল। শ্যাম কাছারীবাড়ী হইতে বাহির হইল। মাঝখানে মাঠের মতন একটু জায়গা অতিক্রম করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে শ্যাম চলিয়াছে, কয়েকটা বড় গাছ, সেখানে অন্ধকারে, কঠিন জমাট অন্ধকারের টুক্‌রার মতন কি ও? মানুষ! দুইটি সবল হস্ত—একটা প্রচণ্ড আক্রমণে শ্যাম ধরাশায়ী হইল। বিরাট পর্ব্বতের ভার বক্ষের উপর, নাগপাশের মত ক্ষিপ্র; সম্পূর্ণ দৃঢ়বন্ধনে হস্তপদ আবদ্ধ, মুখের উপর আততায়ীর করতল দৃঢ়ন্যস্ত; মাথার উপর তারকাখচিত আকাশ, —দিগন্তের দিকে মিলাইয়া গেল অনন্তর শূন্য ও বিস্মৃতি।

জ্ঞান হইতে শ্যাম অনুভব করিল একজন তাহাকে কাঁধে করিয়া চলিয়াছে। তাহার ঘনঘন নিঃশ্বাসশব্দ ও স্খলিত গতি হইতে সে যে অত্যন্ত ক্লান্ত ইহা বেশ বুঝা যায়। চারিদিকে অন্ধকার কিন্তু তাহাদের পথ যে বনের মধ্য দিয়া তাহা শ্যাম বুঝিতে পারিল। স্থানে স্থানে আকাশগাত্রের ক্ষণদ্যুতি এক একটা তারা, অতি উচ্চে বৃক্ষশীর্ষে পল্লবসমাবেশের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছে মনে হয়; কখন কখন গুরুভার বন্যজন্তুর ত্বরিত গতিশব্দ ঘনঝোপের ভিতর দিয়া তাহাদের গাত্রসঞ্চালিত উদ্ভিদের খস্ খস্ নিকট হইতে দূরে ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। বাহক স্থির প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইতেছে—শ্যাম কল্পনার চক্ষে তাহার মুখের উদ্‌গ্রীব অবহিত ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। আবার বনদেশ স্তব্ধ শান্ত, কেবল পদতলে কচিৎ শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর; শ্যামের হস্তপদ দৃঢ়রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ, মুখের মধ্যে একটুকরা কাপড়, উপরে একটা পট্টি দিয়া পিছনে বাঁধা, কিন্তু এত'র ভিতরেও তাহার স্বচ্ছন্দতার প্রতি বাহকের সাধ্যমত লক্ষ্য আছে তাহা শ্যাম বুঝিল, নিজের অসুবিধার অভাবে। মাথার উপর ঝট্‌পট্ শব্দ, একটা পাখীর চীৎকার। রাজু বুঝিল শ্যামের জ্ঞান হইয়াছে জানিয়া রাজু তাহাকে নামাইয়া মুখের ও পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিল। স্থানটি বেশ শুষ্ক ও কোমল তৃণাচ্ছাদিত। রাজুও বিশ্রাম করিতে বসিল। শ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" রাজু—"আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না।" শ্যাম—"আমাকে এভাবে আনলে কেন, কি দরকার ?" রাজু - "সে কথা এখন বলতে পারব না।" রাজু কথা কহিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া শ্যাম বিরত হইল। ভয় অপেক্ষা তখন উদ্বেগই তাহার প্রকৃত মনোভাব, প্রতি ঘটনা যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণপূর্ব্বক অনুধাবন করিতে অভ্যস্ত তাহার মনে এইটুকু বেশ ধরা দিয়াছে যে এই ব্যক্তি সাধারণ দস্যু বা ঘৃণিত আততায়ী নহে, একটু বিশিষ্টতা আছে। মুখের বাঁধন না খুলিয়া দিলেই পারিত, কথার উত্তরে শিষ্টতার আবশ্যক ছিল না, আরও এমন অনেক খুঁটিনাটি —কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সাধু হইতেই পারে না, তবে কি আটক করিয়া টাকা আদায়ের কৌশল করিয়াছে ? অনেক ডাকাত এমন করে তাহা শ্যামের শোনা ছিল আর এইটাই তাহার

সম্ভব মনে হইল; কিন্তু তাহার জন্য টাকা দিবে কে? এ-প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নিজের মনে শ্যাম পাইল না। পিতৃঋণ পরিশোধের কি হইল, কি হইবে? তাহার এই সহসা অন্তর্দ্ধানে শ্রীনগরের লোক কি ভাবিবে? কেহ কি তাহার জন্য আন্তরিক দুশ্চিন্তার তাড়নে সন্ধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে? জ্যাঠামহাশয়? নিশ্চয়ই! কিন্তু এ 'নিশ্চয়ই'টা নিজের কাছেই বড় ফাঁকা ঠেকিল। শ্রীনগর বেশী দূরে নহে, এই লোকটার সঙ্গীও নিশ্চয় কেহ আছে সেখানে। এই সব চিন্তার প্রান্তে শ্যাম উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাজু উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া দাঁড় করাইল—স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "চল"—শ্যাম ভাবিল, দেখাই যাক্, কতদুর গড়ায়। একটা কাজের মতন নূতন অভিজ্ঞতা হবে। লোকটাকে মন্দ লাগছে না কিন্তু।

গভীর অন্ধকারে দিক্‌নির্ণয় করিয়া শ্যামের সঙ্গী তাহাকে একরকম টানিয়া অগ্রসর হইতেছে। উদ্বেগের মধ্যে কৌতূহলের এঁকাবেঁকা উজ্জ্বল রেখা যেন কালো শাড়ীর জরীপাড়খানি দেহলতা বেষ্টন করিয়াছে। মানুষের ভয় জিনিসটা কল্পনার ঘোরেই বড় দেখায়; প্রকৃত ভয়ের আবর্ত্তে পড়িলে তাহা ঘুচিয়া যায়, কল্পনা নূতন ভয়ের জালরচনার অবসরে, সময়োপযোগী অন্য একটা মনোবৃত্তি তাহার স্থান অধিকার করিয়া থাকে

শ্যাম বাল্যকাল হইতে সাধারণ অপেক্ষা একটু ভিন্ন প্রকৃতির; বালকজীবনে লেখাপড়ায় তাহার উৎসাহ-দর্শনে পিতা ও তদীয় বন্ধুগণ আশ্চর্য্য হইতেন। প্রবেশিকা ও ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সে বাড়ীতেই পড়িতে লাগিল। বড় ভাই বিলাত হইতে ফিরিলে সে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিলাত যাইবে এইরূপ স্থির ছিল। অগ্রজ নবকিশোর সেই বৎসর নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন দূরের কথা, নানা অছিলায় আরও দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিলেন, বিদেশী পত্নীসম্পদে ভূষিত হইয়া। ইতিমধ্যে পিতার তৎকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি অনুরাগ অবলম্বন করিয়া শ্যাম দর্শন শাস্ত্রে তন্ময় হইয়া ভুলিয়া গেল; পিতা পুত্রের মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। দূর অতীতের সতীর্থ জীবন, তাহার মধ্যে যেটুকু একত্রে মহৎ ও চিত্তাকর্ষক সেইটুকু ফিরিয়া পাওয়া লাভ আর জ্ঞান-সাগরে এইরূপ দুর্লভ কাণ্ডারী প্রাপ্তি পুত্রের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। শ্যামের জ্ঞানপিপাসা ছিল অসাধারণ, তাহার হাতে সাংখ্যের একটি বঙ্গানুবাদ এই সময় আসিয়া পড়িল। সন্দেহ দ্বিধা এক নূতন রূপে বর্দ্ধিতায়তনে তাহাকে এক নূতন রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া সে বেদান্ত উপনিষদে সাঁতার কাটিল; বাড়ীর অর্দ্ধ ইংরাজী কায়দার জীবনপ্রণালীকে তুচ্ছ করিয়া সে বিপরীত স্রোতে বাণ ডাকাইল। ছোট ছেঁড়া জামা, ধুতি, চটিজুতা এমন কি মাথায় টিকি সব দিন কতকের জন্য সকলকে চকিত করিয়া দিল; প্রবাসী বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের বিদ্রূপ ক্লান্তিবশতঃ বন্ধ হইয়া গেলে, আবার সে বাহ্যিক সাধারণ মানুষ হইয়াছিল। এই সময়েই ললিতের সহিত পত্রবিনিময় ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ, কিন্তু কবিদের মধ্যে মাত্র দুই একজন ছাড়া অধিকাংশকেই ফিঁকে মনে হইল। তাহার ধারণা, যাহা গদ্যে প্রকাশ করাও দুষ্কর তাহা পদ্যের বাঁধা ধরার মধ্যে রূপ লইতে পারে না। ডিকেন্স তাহার বড় প্রিয় ছিল।

দাদার বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহার বিলাত যাত্রার প্রস্তাব চাপা পড়িয়া গেল; নন্দকিশোর তখন বিপর্য্যস্ত, রোগেরও সূত্রপাত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

কলিকাতা মহানগরী ভেজাল খাদ্য দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত; একথা ভূগোলে প্রকাশ করা টেক্সট-বুক কমিটির অনুমোদন-সাপেক্ষ হইলেও আমরা সকলেই ইহা অবগত আছি। এই ভেজাল নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষীয়গণ ও কংগ্রেসধর্ম্মী কর্পোরেশন মধ্যে মধ্যে প্রাণপাত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে ভেজালই বাড়িয়া গিয়াছে। উপস্থিত সংবাদ, মাননীয় ডাক্তার হরিধন দত্ত কলিকাতাস্থ সর্ষপ তৈলে ভেজাল নিবারণ করিবার জন্য এক বিল উপস্থাপিত করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি একটি নূতন সূত্রও আবিষ্কার করিয়াছেন:—যে কোন তৈলে অপর কোন তৈল মিশ্রিত করিলে তজ্জাত তৈল খাদনীয় বলিয়া গণ্য হইবে না।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এত দ্রব্য থাকিতে ডাক্তার দত্ত তৈলসংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন কেন? আমরা কিন্তু এই বিলের সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন করি, কারণ আমরা জানি যেদিন হইতে সর্ষপ তৈলে ভেজাল ঢুকিয়াছে সেইদিন হইতেই দেশে নানা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। খাঁটি সর্ষপ তৈলের গুণ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালীরা সুস্থ দেহে কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। এ তৈল আবালবৃদ্ধের আপাদমস্তকের বন্ধু। দেশের এই সঙ্কটকালে ডাক্তার দত্ত খাঁটি সর্ষপ তৈলের বহুল প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর হওয়ায় আমরা পরম আশান্বিত হইয়াছি। যে তৈল পায়ে দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, তাহার প্রশংসা শতমুখে করা উচিত।

আধুনিক বাঙ্গালী যুবক খাঁটি সর্ষপ তৈল ছাড়িয়া সাবান ব্যবহার করিতে শিখায় যে যে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে—বিপ্লববাদ তাহারই অন্যতম। ইহারই ফলে অকালে সিমসন্ প্রাণ দিল, দীনেশেরও ফাঁসি হইল। সিমসন্‌কে হত্যা করার পর দীনেশ আত্মহত্যার বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিল। ইংরাজরাজের দক্ষ চিকিৎসা ও সহৃদয় শুশ্রূষার গুণে সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে। তাহার পর ইংরাজের আইনে হত্যাপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। দীনেশের মাতার বহু অনুনয় সত্ত্বেও সে আজীবন কারাবাসরূপ ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। সামনে ও পিছনে চাহিয়া আমরা বলিতেছি বেআইনি মরণে মরিবার চেষ্টা করিয়া দীনেশ ভাল করে নাই। যদি মরিতেই হয় আইন ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা রাখিয়া মরাই সকলের পক্ষে সঙ্গত।

কিন্তু ফাঁসীর পর দীনেশের সম্মানার্থ কলিকাতায় সভা হইয়াছিল, তাহার চিত্রকে 'বন্দেমাতরম' রবে মাল্যবিভূষিত করিয়া পথে শোভাযাত্রা করা হইয়াছিল। নরহত্যাকারী হইলেও সে দেশপ্রাণতা ও সাহসের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই এই সম্মান। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে আমরা সেই যুগে বাস করিতেছি যে যুগে দেশপ্রাণতা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মের কথায় অপর একটী হত্যার কথা মনে আসে। ভোলানাথ সেন প্রমুখ তিন জনের হত্যাপরাধে দুই জন পেশোয়ারী মুসলমান যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া মুসলমান জন-সংঘ 'আল্লা হো আকবর' রবে হত্যাকারীদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। দেশপ্রেমকে যখন ধর্ম্ম বলা হয় তখন তাহার মধ্যে রূপকের আভাস থাকে। কিন্তু মুসলমান যুবকেরা সাক্ষাৎ মুসলমান-ধর্ম্মের জন্যই প্রত্যক্ষ দিবালোকে নরহত্যা করিয়াছিল। তথাপি উভয় সম্বর্দ্ধনায় তফাৎ রহিয়া গেল এই, যে প্রথমটী যুগোপযোগী, আর দ্বিতীয়টি মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বমানব আজ তথাকথিত ধর্ম্মপ্রাণতার ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে। মানবেতিহাসে এমন দিন কি আসিতে পারে না, যখন বিশ্ববন্দিত এই দেশ-প্রাণতাও গোঁড়ামীর অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে? বিশ্বমানব একরূপ ধর্ম্মচ্যুত

হইয়াই ধর্ম্মের উর্দ্ধে উঠিয়াছে ; সে যখন সম্পূর্ণরূপে দেশচ্যুত হইবে, তখনই হয়ত দেশের উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে।

——

কিন্তু কে বলে বিশ্ব-মানব একেবারে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে ? ভারতীয় মুসলমানেরা সকলেই ধর্ম্মচ্যুত নহে, তাহার প্রমাণ ত ভোলানাথের হত্যা এবং হত্যাকারীর সম্বর্দ্ধনা। হিন্দুই কি ধর্ম্মচ্যুত ? হিন্দু নিজে ছাড়িতে চাহিলেও ধর্ম্ম তাহাকে ছাড়েন কই ? সেদিনের ঘটনা আমরা যাহা শুনিয়াছি, আপনারাও শুনুন —

পাবনা জেলার জনৈক ব্যাধিক্লিষ্ট মুসলমান এক সিদ্ধ ফকীরের নিকট গমনপূর্ব্বক যে ঔষধের ফর্দ্দ পায় তাহাতে 'কালীর জিভ্' অন্যতম মশলা ছিল। নিশীথ রাত্রে উক্ত মশলাসংগ্রহের চেষ্টায় মুসলমানটী এক মন্দিরে প্রবেশ করিলে কোন অদৃশ্য হস্তের পীড়নে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। মন্দির হইতে বাহির হইয়া সে ছুটিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিকে কালী-মূর্ত্তি তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে, এবং ক্রমে সে উন্মাদ হইয়া যায়। পরে বিধিমত কালীপূজা করিয়া তবে সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ... ... ব—ন্দে—মা—তরম্ !!

——

উপস্থিত সমস্যা হইতেছে,—হিন্দু দেবদেবীরা যদি এইরূপে নিরুপায় হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার ভার ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে হিন্দু মহাসভার উপায় কি হইবে ? বিশেষতঃ উক্ত মহাসভার যে সব নিরুপাধিক ব্রহ্মোপাসক নেতা ও সভ্য আছেন, তাঁহাদের সে সভায় থাকা আর চলিবে কিনা ? হিন্দু মহাসভার বিগত বর্দ্ধমানাধিবেশনে এ বিষয় আন্দোলিত হইলে ভাল হইত।

কিন্তু হিন্দু মহাসভাও ক্রমে দেশপ্রেমের খর্পরে পড়িতেছেন। সভাপতি কাসিমবাজারাধিপতি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই বুঝা যায়, যে দেশটা যাহাতে মোটের উপর সর্ব্বদিকে উদ্ধার পায়, সেই চেষ্টা উপস্থিত সকলে করুন। কেবল দেখিবেন সেই উদ্ধৃত হিন্দুস্থানে শেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু হিন্দু যেন বজায় থাকে। বাকী সকলে—মুঞ্জী পর্য্যন্ত—বলিয়াছেন ;—গান্ধীজি-পরিচালিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোঁড়ামীগন্ধযুক্ত হইলেও অনেকাংশে জাতীয়তাবর্দ্ধক বলিয়া দেশের পক্ষে তাহা গ্রহণীয়। স্বয়ং মালব্যজীও বলিয়াছেন—বৃদ্ধ বয়সে যদি ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে তথাপি তিনি দেশের জন্য বিলাতে যাইবেন। তবেই দেখা যায় ধর্ম্মের উপর দেশই বড় হইতে চলিল।

ধর্ম্ম এইরূপে কোণঠাসা হইতে হইতে উপস্থিত আশ্রয় করিয়াছেন—সৌকৎ আলিকে। তিনি এতদিনে ধরিতে পারিয়াছেন—'গান্ধীজির মাথা খারাপ'। আমরা এ কথা সেই দিন হইতেই জানি যেদিন তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মিলন সংঘটিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। গান্ধীজি হয়ত বলিবেন—সৌকৎ-আলির তান্ত্রিক সুচিকিৎসাতেই তিনি পুনরায় আরোগ্যের পথে পা দিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং এ রোগ সারিবার নহে।

গান্ধীজির মাথার রোগ যে সারিবার নয়, তাহার প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যায়। ভারতের ভাইসরয় লর্ড উয়িলিংডনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি শিমলা সহরের পাহাড়িয়া পথে ৬ মাইল পদব্রজে যাতায়াত করিয়াছিলেন ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ খালি রিক্স চলিয়াছিল ! প্রথম দিন আবার দারুণ বৃষ্টিপাতের মধ্যেই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন ! সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ হওয়ার পর গান্ধীজি আমাদের জানাইয়াছেন, রোগীর গাত্রোত্তাপ (temperature) এখনও একভাবেই আছে। ইহার অর্থ বোধ হয় এই—গভর্ণমেণ্ট এখন গান্ধীজির চিকিৎসাধীন, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসায় কিছু উপকার হইলেও জ্বরত্যাগ এখনও হয় নাই। আমরা যতদূর জানি উপস্থিত গান্ধীজি হোমিওপ্যাথি মতেই চিকিৎসা চালাইতেছেন। শিশুচিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি বিশেষ উপযোগী বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে কি হইবে বলা কঠিন।

——

তরুণ ডাক্তার জহরলাল এলোপ্যাথি মতের চিকিৎসার পক্ষপাতী হইলেও উপস্থিত মহাত্মার নিকট হোমিওপ্যাথি

শিক্ষা করিতেছেন। তথাপি তিনি এলোপ্যাথি একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়। তিনি একটি ঘোড়ায় চড়িয়া ভাইসরয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিড়ম্বনা হইল এই যে ভাইসরয়ের দ্বাররক্ষক ঘোড়াটীকে প্রবেশ করিতে দিতে চাহিল, কিন্তু তাঁহাকে দ্বার ছাড়িতে আপত্তি জানাইল। লাটসাহেবের ঘোড়াটীতে প্রয়োজন বেশী, না আরোহীকেই তিনি চাহেন এই লইয়া যখন বিচার চলিতেছে তখন ভাগ্যক্রমে সেখানে স্যার ফজ্‌লি হোসেন্ আসিয়া পড়ায় জহরলাল ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন।

—

বাহিরে আসিয়া জহরলাল জানাইয়াছেন অবস্থা পূর্ব্ববৎ। এ অবস্থায় রোগীকে ছাড়িয়া গান্ধীজির সুদূর সমুদ্রযাত্রা সম্ভব হইবে কিনা এখনও সন্দেহজনক। ইতি-মধ্যে জ্বরত্যাগ যদি না হয়, ডাক্তারকে এইখানে বসিয়াই ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু যদি এখানকার রোগীটি আরোগ্যের পথে আসে, তবে গান্ধীজি বিলাতের অন্যান্য রোগীর প্রতি দৃষ্টি দিবার অবকাশ পাইবেন। সাগরপারের রোগীদের অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক। তাহারা বিকারের ঘোরে ভুল বকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আত্মপরভেদ-বোধরহিত হইয়া ভারতের স্বার্থ ও ইংলণ্ডের স্বার্থে কোনই পার্থক্য দেখিতে পাইতেছে না। বলিতেছে—Safeguard in interest of India or Safeguard in interest of England,—একই কথা। অতএব চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এবং গান্ধীজি ছাড়া হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিবার অন্য ডাক্তারও দেখা যায় না।

উক্ত ও অনুক্ত নানা কারণে মহাত্মার বিলাতে যাওয়াই একান্ত আবশ্যক,—এই মর্ম্মে জনৈক আমেরিকা প্রবাসী শিখ মহাত্মাকে একখানি পত্র দিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে—আমেরিকায় তিনি যেন কিছুতেই না যান, কারণ আমেরিকানরা পয়সা ছাড়া কিছুই বুঝে না। তাহারা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির নামেও অপবাদ দেয় যে তিনি আমেরিকানদের দুয়ারে পয়সা কামাইতে আসিয়া আমেরিকানদেরই গালি দিয়া যান, এত বড় স্পর্দ্ধা! সুতরাং তাহারা নিশ্চয় মহাত্মাজীকেও প্রচুর ধন দিয়া রটাইয়া দিবে যে "তাঁহার 'অহিংসা' আমরা কিনিয়া লইয়া patent করিয়াছি, আমাদের permission না লইয়া তিনি যেন উক্ত পণ্যের ব্যবসা অন্যত্র না করেন।" কিন্তু ইংলণ্ড হইতেছে স্বতন্ত্র দেশ, সেখানে মহাত্মাজীর যাওয়াই উচিত; ইংরাজের মত sporting জাতি আর নাই।

—

সে কথা ঠিকই—ইংরাজ প্রকৃতই sporting জাতি। আন্তর্জাতিক টেনিস্ খেলায় অষ্টিন প্রমুখ ইংরাজ খেলোয়াড় সেদিন আমেরিকানদের হারাইয়া দিয়াছে। জলে স্থলে অনলে অনিলে অতিবেগে গমন করিবার সমস্ত রেকর্ডই এখন ইংরাজের। নিউ জীলাণ্ডারের ক্রিকেটদল ১টি মাত্র test ম্যাচ খেলিবার অধিকার পাইয়া কৃতিত্ব দেখান। তাহাতে ইংলণ্ড ঐ দলের সহিত আরও কয়েকটি test ম্যাচ খেলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতীয় রাউণ্ডটেবিল ওয়ালার দল প্রথম ম্যাচে ভাল খেলিয়াছিল বলিয়াই আর একটী ম্যাচের আয়োজন করা হইতেছে। ইংরাজ বুঝিয়াছে ভারতীয়েরাও খেলে ভাল। রন্‌জীৎসিংহের খেলা ইংরেজ আজিও ভুলিতে পারে নাই। তাহার পর দলীপ-সিংজি কথায় কথায় সেঞ্চুরি করিয়া, এবার ইংরাজ খেলোয়াড়-দের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং পাটৌডির কিশোর নবাব অক্সফোর্ডের পক্ষে খেলিয়া এবার সেখানকার রেকর্ড ভাঙিয়া দিয়াছেন। ৬ ইনিংসএ ৫টি সেঞ্চুরী, ১ পক্ষ কালে ৮৯২ রান্ এবং শেষে ২৩৮ রান্ করিলেও যখন তাঁহাকে কেহ আউট করিতে পারিল না তখন তাঁবুতে ফিরিয়া তাঁহার সর্দ্দিগর্ম্মী হইবার উপক্রম! ভারতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নায়ডু (সরোজিনী নহেন, যদিও শুনিতেছি তিনিও বিলাতে যাইতেছেন) আবার বিলাতে উপস্থিত। মহাত্মা বিলাতে গিয়া যদি ইহাদের লইয়া একটী ক্রিকেট দল গঠিত করেন, এবং ভারতের স্বাধীনতা পণ রাখিয়া ক্রিকেট খেলিবার প্রস্তাব করেন তাহা হইলে হয়ত sporting ইংরাজ জাতি তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া যায়।

নজীরের অভাব নাই ;—ভারত সাম্রাজ্য পণ রাখিয়া আর একবার খেলা হইয়াছিল। আমাদের আশা আছে—ম্যাকডোনাল্ড ইহাতে রাজী হইবেন ; কিন্তু মহাত্মাকে ক্রিকেট খেলায় রাজী করা কঠিন। আর যদি বা রাজী হন, হয়ত বলিবেন—'ভারতীয়ের পক্ষে ব্যাট লইয়া খেলা চলিতেই পারে না, ব্যাটের ধর্ম্ম আঘাত সহা নহে, প্রত্যাঘাত করা। তবে এক পক্ষে ক্রিকেট অন্য পক্ষে বল্, এইরূপ খেলা চলিতে পারে।' Sporting ইংরাজ অবশ্যই বলিবে তবে তোমাদের ক্রিকেট আর ইংরাজের বল্। এ খেলার ফল যাহা হইবে তাহা প্যাটেল সাহেব পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছেন—গোলটেবিলটী উল্টাইয়া পড়িবে। ——

গোলটেবিল যাহাতে না উল্টায় তাহার জন্য লর্ড আরউইন, বিলাতে বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় কংগ্রেসও সেই চেষ্টা করিতেছেন। আর উভয়ের মধ্যে ভাবেরও চমৎকার মিল। কংগ্রেস-নিয়োজিত বৈদেশিক-ঋণ-তদন্ত কমিটি বলিয়াছেন ভারতের বৈদেশিক ঋণ সর্ব্বসমেত ১১০০ কোটী টাকা! তাহার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ টাকা প্রকৃতপক্ষে ভারতের দেয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া সঙ্গত নহে ; ইংরাজ সাম্রাজ্যেরই তাহা দেয়। অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ করিলে দেখা যায়—ভারতের যাহা প্রকৃত ঋণ ভারত তাহার প্রায় দ্বিগুণ ইংরাজের নিকট পাইবে। ওদিকে ভারতবন্ধু আরউইন হ্যারোগেটে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—আজ পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ করিলে দেখা যাইবে যে ইংরাজের নিকট ভারতের ঋণ অপরিশোধনীয়। ঠিক কথা, সেইজন্যই কংগ্রেস প্রস্তাব করিতে পারে এই অপরিশোধনীয় ঋণের কথাটা আর তুলিয়া লাভ কি? হাত-চিঠাখানি ছিঁড়িয়া ফেলা হউক।

পুস্তক-পরিচয়

লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার—

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি, এল, ১৩৩৭।

নাম থেকেই বইটীর প্রতিপাদ্য বিষয় বোঝা যায়। সাধারণ লোকের লাইব্রেরী সম্বন্ধে ধারণা এই যে তা একটি আড্ডা, খানকয়েক ভাঙ্গাচোরা টেবিল-চেয়ার ও চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীর ডিটেকটিভ গল্পবোঝাই গোটা দুই আলমারী থাকলেই দস্তুরমত লাইব্রেরী হ'ল—কিন্তু লাইব্রেরীর যে সময়সংহার ছাড়া আরো মস্ত বড় একটা উদ্দেশ্য আছে, লোকশিক্ষা ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজগত মতবাদ প্রচারে, দেশ বিদেশের চিন্তাশীলদের সঙ্গে চিত্ত-বৃত্তির আদান প্রদানে, লাইব্রেরী যে কেন অন্য অন্য দেশে এত বড় জিনিষ ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে এবং এ জন্যে কী আয়োজন জগতের বিভিন্ন স্থানে হ'য়েছে তা বইটীতে সুন্দর ভাবে আলোচিত হ'য়েছে। আমরা বইটীর বহুল প্রচার আমরা করি।

হাসিমুখ—শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর—মূল্য ।/০ আনা।

বাংলা দেশে হাসির বড় অভাব। 'হাসিমুখ' প'ড়ে আমরা সুখী হ'লাম এই জন্যে যে এর হাসির অন্তরাল থেকে কান্না উঁকি দেয় নি। শিশু-সাহিত্যে অক্রূর বাবুর হাত আছে, এই বইয়ের অনেক কবিতা ইতিপূর্ব্বে ছেলেদের মাসিকে প'ড়েছি, সম্প্রতি সেইগুলি এবং কয়েকটী নূতন কবিতা পুস্তকাকারে দেখে সুখী হ'লাম। বইটী ছেলে বুড়ো সমান ভাবে উপভোগ ক'র্‌তে পার্‌বেন।

পথের-বাঁশী—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র, সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ ১৩৩৭।

কবিতার বই। কবি নূতন ;—এঁর রচনায় একটা নিজস্ব ভঙ্গী আমাদের ভাল লেগেছে। 'ফুলের কথা' কবিতাটী বেশ মনোমত হ'য়েছে—সাধনা কর্‌লে কবি সুলেখক হ'তে পারবেন।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়

(জন্ম ১লা কার্ত্তিক ১২৭৩ সন; মৃত্যু ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সন।) ইনি ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৩০৪ সনে তাঁহার সম্পাদিত "পদকল্পতরু" কলিকাতার ভারতীয় গ্রন্থ প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদকতায় পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রমাণিক সংস্করণ বাহির হইবার পূর্ব্বে ইহা পদকল্পতরুর অন্যতম উৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হইত। পরে তিনি মহাকবি কালিদাসের অমর-কাব্য "মেঘদূত", জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও ভানুদত্ত প্রণীত সু-প্রসিদ্ধ "রসমঞ্জরী" কাব্যের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন। তাঁহার "গীতগোবিন্দ" ও "রসমঞ্জরীর" পদ্যানুবাদ অভিজ্ঞ সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রসংসিত হইয়াছে। তাঁহার গীতগোবিন্দের সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি কবি জয়দেব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সমালোচকগণের ভুল অশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নাম দিয়া সুবিস্তৃত ভূমিকা, পাদ-সূচী সহ ৬০০ শতের অধিক নবাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ (authology) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বি, এ শ্রেণীর পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ও "পদকল্পতরুর" সম্পাদক হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল যাবত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরিষদের এক সভায় তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত ও পরিষৎ কর্ত্তৃক ৫ খণ্ডে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। "পদকল্পতরু" বঙ্গসাহিত্যের একটি গৌরবের বস্তু; উহা কেবল তাঁহার নহে, পরিষদেরও একটি স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রকাশ কার্য্যে তাঁহার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে তাহা স্বর্গগত মণীষী রামেন্দ্রসুন্দর, বিশ্ব-বরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সুধীবর্গ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

পদাবলী ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শেষ-জীবনে পদাবলী সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী ও উর্দ্দু সাহিত্যের চর্চ্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। সংস্কৃতে অগাধ ব্যুৎপত্তি থাকায় অতি অল্পদিনের চেষ্টাতেই তিনি হিন্দীতেও সুদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত হিন্দী প্রবন্ধ বহু প্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবন ও

ভারতপুরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ভরতপুরের অধিবেশনে তিনি বিদ্যাপতির উপর একটি সুদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পরে প্রয়োগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন "বিদ্যাপতি ঔ'র উনকী কবিতা" এই নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তাহার মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক কবি ভবানন্দের "হরিবংশ" নামক প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত হন। হরিবংশের ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য রত্নের আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গত ৪০ বৎসর যাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এরূপ একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবা আমাদের দেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ছাড়া জ্যোতিষ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রেও তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল।

রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ

রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ

পার্শ্বে যাঁহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল তিনি দিনাজপুরের অন্তর্গত হরিপুরের বিখ্যাত তিলিবংশের একজন জমিদার। কিছু কাল হইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। নিজের জমিদারীর মধ্যে তিনি সৎকার্য্য দ্বারা যশ লাভ করিয়াছিলেন, প্রজানুরঞ্জন করিয়া লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন, জীবনে তিনি একলক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়াছেন। সামান্য সামান্য কার্য্যেও তাঁহার মহত্ব প্রকাশিত হইত। সুদুর্ল্লভ ন্যায়নিষ্ঠতা দ্বারা তিনি নিজেকে নিজের প্রজাবৃন্দের নিকট পুণ্যস্মৃতি করিয়া গিয়াছেন।

—

স্বর্গীয় কে সি বসু

বিখ্যাত বিস্কুট প্রস্তুত কারক ও বার্লি আবিষ্কারক মেসার্স কে সি বসু এণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কালীকুমার বসু মহাশয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি উপলক্ষে গত ৩রা তারিখে তাঁহার বাটীতে এক সভার আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।
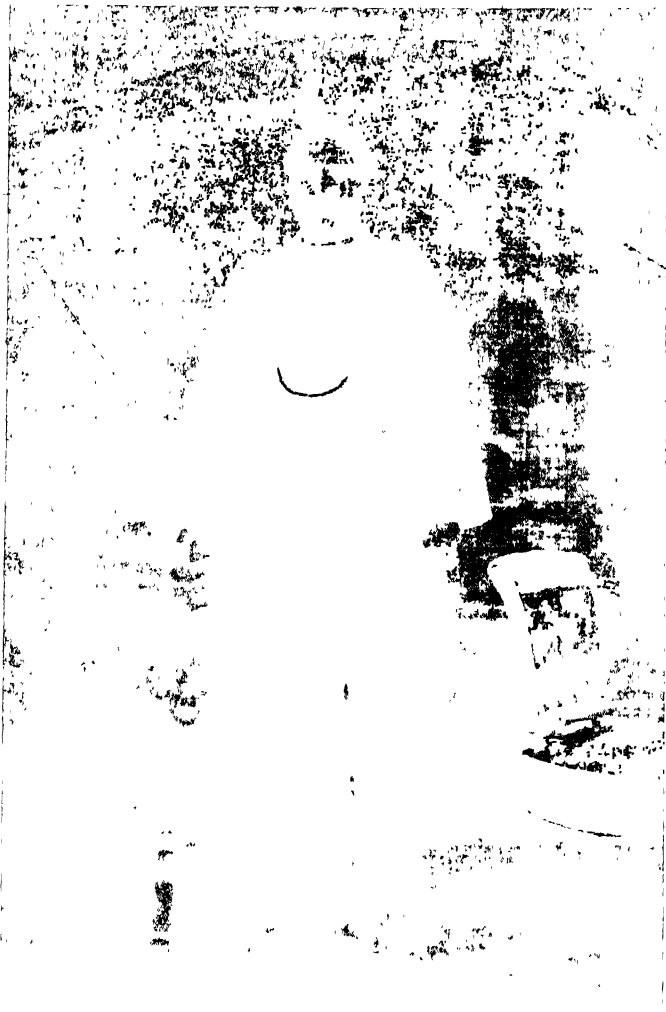
বীমা-প্রসঙ্গ

গত জুন সংখ্যার 'ইন্‌সিয়োরেন্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ' এ Honest Journalism (পত্রিকাসম্পাদনে সততা) শীর্ষে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অনুধাবনযোগ্য। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যে নির্দ্দিষ্ট বিপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন,—তাহা দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পাদকসাধারণের দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনদাতাগণের মুখ চাহিয়া পত্রিকাপরিচালন করিতে হয়—হয়তো তাহার কারণ এই যে, পত্রিকার গ্রাহকমূল্য হইতে পত্রিকার ব্যয়পরিচালন প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমন একখানি পত্রিকাও আমাদের দেশে নাই, যাহার বিক্রয়সংখ্যা দশহাজার! উহাদের দেশে পঞ্চাশ হাজার পত্রিকার বিক্রয়ও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—কিন্তু এ বিলাপ করিয়া লাভ কি?—যে দেশে শিক্ষিত জনসাধারণ অত্যন্ত মুষ্টিমেয়—আবার শিক্ষিতদিগের মধ্যেও পত্রিকাপাঠের ঔৎসুক্য আছে এমন লোক বিরল—তদুপরি এই বিরলতম মুষ্টিমেয় সংখ্যার আবার কয়েকজন মাত্র পত্রিকাক্রয় করিবার ইচ্ছা কিম্বা সামর্থ্য পোষণ করেন—সে দেশের বিজ্ঞাপনদাতাগণ যে সম্পাদকগণের বিদ্যাবুদ্ধিতে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন, কিম্বা তাঁহাদিগকে হুমকী দিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" বলিয়া সান্ত্বনালাভ ছাড়া সম্পাদকগণের গত্যন্তর কি?

ঐ সংখ্যাতেই Rationalised Publicity শীর্ষে যে টিপ্পনী করা হইয়াছে, তাহা পড়িলাম। এ বিষয়ে দেশী ও বিদেশী বীমা-পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলির তুলনামূলক সন্দর্শন উপভোগ্য। ইংরাজী কোনও বীমা-পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে দেখিব যে যত গুলি কোম্পানী বিজ্ঞপ্ত হইতেছে তাহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায়।—আমাদের যে কোনও কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের সহিত অন্য কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বদল করিলে কোনও ক্ষতি নাই। কেবল কোম্পানীর নামটি বদ্‌লাইয়া দিলেই হইল।—দেশীয় কোনও কোম্পানীর 'Publicity'র জন্য বিভিন্ন 'department' আছে বলিয়া জানি না—। লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন, নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণ প্রচুর—অথচ বিজ্ঞাপনব্যাপারে সেই আদিম মান্ধাতীয় আমলের রীতিনীতির এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই—সনাতন আইনকানুনের উপর এরূপ শ্রদ্ধার নিদর্শন আমাদের দেশে অতি সুলভ। বরং দুই একটি বিদেশী কোম্পানী বাংলা পত্রিকার বিজ্ঞাপনে তবু বৈচিত্র্য সাধন করিতেছেন। এ বিষয়ে কি বীমা-সমিতিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি?

জুলাই সংখ্যার 'ইন্‌সিয়োরেন্স অ্যাণ্ড ফিন্যান্স রিভিউ' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধীকে 'ষ্টেট্‌সম্যানী' 'ইন্‌ডিয়ান কন্‌ট্রিবিউটার'এর চিরপ্রসিদ্ধ অমার্জ্জনীয় বিদ্রূপের ভাবে 'Saint of Sabarmati' বলিয়া অভিহিত করাতে প্রত্যেক ভারতবাসীই ক্ষুব্ধ হইবে। বীমাসম্পর্কে মহাত্মাজীর যে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা সম্পাদক করিয়াছেন। এ নিয়া ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয়ের বিবৃতি পড়িয়া মনে হইল তিনি তাহা পাঠ করেন নাই। গত ১৯২৯ সনের মে সংখ্যা 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌সুরেন্স জার্নাল' এর ৩৬ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পাণ্ডাহরিপাণ্ডে লিখিত প্রবন্ধের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ প্রবন্ধ হইতে বোঝা যায় যে মহাত্মাজী ১৯০১ সনে নিজে বীমা করিয়াছিলেন পরে তাহা বাজেয়াপ্ত হইতে দেন—অর্থাভাবে নিশ্চয়ই নয়! তাঁহার মতে বীমা করা ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রমাণ করে। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত পাণ্ডাহরিপাণ্ডে যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে বীমা করা ঈশ্বরে অবিশ্বাসের প্রামাণক তো নয়ই, অধিকন্তু ইহা ঈশ্বরে বিশ্বাসেরই একটি অঙ্গ। ইহারও বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। সুতরাং এ নিয়া আলোচনা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মহাত্মাজী যদি আইরিশ সাহিত্যিক G. B. S. হইতেন অর্থাৎ 'বলিয়া দিলাম একটি কথা। তারপর যাহা হয় হইবে' গোছের মতবাদ যদি তিনি পোষণ করিতেন, তবু বুঝিতাম। কিন্তু মহাত্মাজী কথার আতসবাজীকর নন্। সুতরাং বীমাবিষয়ে তাঁহার মত একমাত্র তাঁহারই মত এই ভাবিয়া নেওয়া

ছাড়া উপায় নাই। এ মতকে জনসাধারণের স্কন্ধে নিক্ষেপ না করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। মহাত্মাজীর সে রসজ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

——

প্রুডেন্সিয়াল এসিয়োরেন্স কোম্পানী কিছু দিন হইল লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হস্পিটালে একটি ওয়ার্ডনির্ম্মাণকল্পে বাৎসরিক ৫ শত পাউণ্ড দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় কোনও হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় কোনও বীমা-সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নিকট এই রকম সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহার কি উত্তর মেলে, তাই দেখিতে ইচ্ছা করে।

বোম্বাইয়ের 'ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানী মধ্য ভারতবর্ষ ও রাজপুতানার জন্য গত ৩রা আগষ্ট ইন্দোরের যশোবন্তগঞ্জ, কৃৎলাম হাউজে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্বামীশরণের হস্তে এই শাখার পরিচালনভার ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত স্বামীশরণ বীমা-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহারা অভিজ্ঞতা তিনি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করি।

——

আগষ্ট সংখ্যায় "ইন্‌সুরেন্স ওয়ার্ল্ড"এর মার্ফত আমরা প্রস্তাবিত জাপানী বীমা এজেণ্টগণের পালনীয় নিয়ম-কানুনের খসড়া পড়িলাম। এ বিষয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার সহিত একমত। ইহা নিশ্চয়ই যে আইন করিয়া মানুষের ভিতরকার সত্য-শিব-সুন্দরের বিকাশ সম্ভব নয়—কিন্তু তবু আইনের প্রয়োজন আছে এবং বর্ত্তমানে বীমা-ক্ষেত্রে খুব বেশী করিয়াই আছে বলিয়া মনে হইতেছে। যে দেশে আর কিছু করিবার নাই বলিয়া লোকে লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স এজেণ্ট হয়—এবং আজ এ কোম্পানীর কাল সে কোম্পানীর হইয়া গ্রামে গ্রামে জীবনবীমা ফিরি করে—সে দেশে অন্তর্নিহিত সত্যশিব সুন্দরের বিকাশক্ষণের অপেক্ষা না করিয়া কড়া আইন জারি করার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ইন্‌সিয়োরেন্স এজেণ্ট বলিতে আমাদের দেশের লোকের সনাতন কাবুলী-ওয়ালা অপেক্ষা কম আশ্রদ্ধা নাই।

সে অশ্রদ্ধার জন্য দেশবাসী যতখানি দায়ী তদপেক্ষা অধিক দায়ী তাঁহারা, যাঁহারা বীমাব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা না থাকা সত্ত্বেও, বীমার দালাল হন্।—আইন করিয়া ইহাদিগকে বীমাক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার অচিরাৎ প্রয়োজন।

——
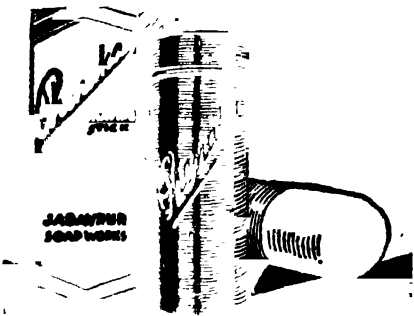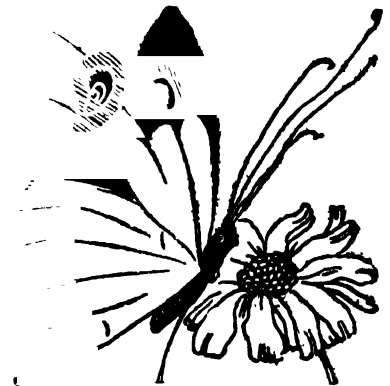
Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,

—তুমি আর আমি—

ইহা এখন আর গোপন করা যায় না, ওটীন এখন সকলেরই সুপরিচিত। অনেক স্ত্রীলোকেই এখন জানেন যে ওটীনের গুণাবলী এমন—যে ইহার ব্যবহারে অধিক বয়সেও নারীযৌবনসুলভ হাবভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়—এ সত্য আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতি রাত্রে ৫ মিনিট কাল ওটীন ক্রীম দ্বারা দেহ মার্জ্জনা করিলে দৈনিক স্বাভাবিক ক্ষয় পূর্ণ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

প্রতিদিন নিয়মিত ওটীন স্নো ব্যবহার করিলে দৈনিক রৌদ্রতাপ, বাতাস, বৃষ্টি, ধূলা, হাসি এবং কান্নাজনিত স্বাভাবিক ক্ষয় পূর্ণ করিয়া আপনার যৌবনোচিত সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বিকশিত করিতে পারিবেন।

ওটীনজাত দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ, এবং প্রসাধনব্যাপারে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে প্রাণিজাত কোনও পদার্থ নাই, এবং প্রস্তুতকালের প্রথম হইতে প্যাকিংকাল পর্য্যন্ত ইহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

ওটীন ক্রীম—

রাত্রিকালীন ব্যবহারের জন্য—ইহা চর্ম্মকে পরিষ্কার, কোমল ও উজ্জ্বল করে।

ওটীন স্নো—

দিবাভাগে ব্যবহারের জন্য—ইহা রৌদ্র, বাতাস, ধূলা ও ঘর্ম্মের প্রতিষেধক ও দৈনিক ব্যবহার্য্য।

বাজারে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

অন্য স্থানে যাইবার পূর্ব্বে

কিম্বা পরে

যখন আপনার

আমাদের নিকট

আসিবেন।

আসিলেই

প্রমাণ পাইবেন—আমরা

অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা

কমিশন বেশী দিই ও

লাভ কম করি।

নং রেগুলেটর 'এল'

আট দিন অন্তর দম দিতে হয়। ঘণ্টায় ও অর্দ্ধ ঘণ্টায় সুন্দর সুমিষ্ট স্বরে বাজে। কঠিন ইস্পাতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ধাতু নির্ম্মিত ডায়াল। দূর হইতে দেখিবার মতো স্পষ্ট গোটা অক্ষরে লেখা। মূল্যবান মজবুদ কাঠে তৈয়ারী সুদৃশ্য ফ্রেম।

মূল্য—

৮" ডায়াল—২০৲ টাকা মাত্র

১০" ডায়াল—২৪৲ টাকা মাত্র

১২" ডায়াল—২৮৲ টাকা মাত্র

ছয় বৎসরের জন্য গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি

সমস্ত প্রকার ঘড়ীই সরবরাহ করিয়া থাকি।

ঘড়ী কেন কিনিব? কোন্ ঘড়ী কিনিব?—দুটি প্রশ্নের উত্তরই আমাদের কাছ হইতে পাইবেন।

লিমটন্ ওয়াচ্ কোম্পানী

১৪৩, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

SOAP
NATIONAL SOAP
& CHEMICAL WORKS

C. 1695

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সহ সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা]

ABSOLUTELY PURE PERFUMED

TIL OIL

LION BRAND

BRAIN & HAIR FOOD

SOLD BY ALL DEALERS

BENGAL DRUG & PERFUME WORKS.
CALCUTTA

অর্চ্চনা

অগুরু, চন্দন ও কয়েকটী দেশীয় বিশুদ্ধ তৈলসারের সংযোগে অর্চ্চনার সৃষ্টি।

কয়েক ফোঁটা রুমালে ব্যবহার করিলে কয়েক দিন ধরিয়া প্রাণে এক আনন্দ-লহরী খেলিতে থাকে। গুণে, গন্ধে, প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থানের যোগ্য।

ফুলরাণী

সুবাসিত কেশতৈল

খাঁটী তিল হইতে প্রস্তুত। কেশ উঠা, অকাল পক্কতা নিবারণ হয়। বায়ু ও মেদঘটিত উপসর্গ দূর হয়। স্নিগ্ধ সুবাসে মন প্রফুল্লিত করে।

২, হুলওয়েল লেন, কলিকাতা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

প্রবাসী-বাঙালীর গৌরব

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক মূল্য—৩৷৷০ টাকা

ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে! ছবি, ছাপা, লেখার গৌরবে 'উত্তরা' প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

রসচক্র

অপূর্ব্ব বারোয়ারী উপন্যাস প্রথম আরম্ভ করিলেন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের নিয়মিত লেখক-লেখিকা :-

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অতুল গুপ্ত
„ নরেশ সেনগুপ্ত
„ রাধারাণী দেবী
„ নলিনী গুপ্ত
„ যতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রীদিলীপ রায়
„ প্রমথ চৌধুরী
„ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
„ ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
„ মোহিতলাল মজুমদার
„ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ইত্যাদি··

আপনাকে আজই গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি] । কার্য্যালয়,

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—

২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

কে, সি, বসুর বার্লীর নূতন পরিচয়

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA

BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY

1lb. net

Prepared only of Genuine & Selected Grains.

K. C. BOSE & CO. SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY CALCUTTA

TO REMOVE COVER CUT ROUND TOP OF LABLE WITH PENKNIFE

আর কি দিব ?

(মেসিনে প্রস্তুত ও হস্তদ্বারা পৃষ্ট নহে)

৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

এ যাবৎ

খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা

সাধারণতঃ এই বার্লীর ব্যবস্থা দিয়া

আসিতেছেন।

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য !

জানা জিনিষ ব্যবহার করুন !

কে, সি, বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট ও বার্লী ফ্যাক্টরী, কলিকাতা

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত করে, হজম-ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিস্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং—গিরগাঁও, বোম্বাই।

বিষয়-সূচী

ভাদ্র—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

ভাদ্র—১৩৩৮

কালিপুর-আশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ ঃ-

পুস্তকের নাম	মূল্য	লেখক
১। জগৎস্বপ্ন	১৲	শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ
২। ক্ষেপীর খেয়াল	॥০	„ যোগেশ্বরী সরস্বতী
৩। তত্ত্বকথা	১॥০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রফেসার
৪। ঐ ২য় খণ্ড	১৲	„ „
৫। সদ্‌গুরু ও রাজযোগ	১।০	শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস বি, এ
৬। সত্যযুগ	॥০	„
৭। ঋষিযোগে স্মৃতি	১৲	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় বি, এ
৮। মুমুক্ষুর বিচার	॥০	শ্রীপ্রতিভা সাংখ্যশাস্ত্রী ও শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী
৯। পূর্ণানন্দের প্রলাপবাক্য	১৲	শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
১০। ঠিক বেঠিক	॥০	„
১১। রামপ্রসাদের 'মা'	॥৴০	„
১২। উপদেশাবলী	॥০	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
১৩। আশ্রম চতুষ্টয় (ব্রহ্মচর্য্য)	৸০	„ সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী
(ছাত্রজীবন) ছাত্রদের জন্য	॥০	কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ
১৪। তত্ত্ব-সঙ্গীত		কুমার দত্ত

আশ্রমাচার্য্য—**শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়**, কালিপুর আশ্রম

কৃষ্ণার্জুন

২৪শ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৩৮ ৫ম সংখ্যা

গান

নজরুল ইসলাম

(১)

(পিলু—কার্ফা)

প্রিয় তুমি কোথায়
আজি কত সে দূর ।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায়
বিরহ-বিধুর ॥

স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিশাইলে কোন্ ঘুমের দেশে ।
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে আঁধারি' হৃদিপুর

আপনা নিয়ে ছিনু একেলা
কেন সে কূলে ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর ॥

ঊষার গাঙে গাহন করি'
দাঁড়ালে নভে রঙের পরী,
প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিশালে নভে হে লীলা-চতুর ॥

কাঁদি মোরা আজ একূল ওকূল
মাঝে বহে স্রোত বিরহ বিপুল,
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথার লুটায় ব্যথাতুর ॥

(২)

(ভীমপলশ্রী—একতালা)

বিদায়-সন্ধ্যা আসিল ঐ
ঘনায় নয়নে অন্ধকার।
হে প্রিয়, আমার যাত্রা-পথ
অশ্রু-পিছল ক'রোনা আর ॥

এসেছিনু ভেসে স্রোতের ফুল
তুমি কেন প্রিয় করিলে ভুল,
তুলিয়া খোঁপায় পরিয়া তায়
ফেলে দিলে হায় স্রোতে আবার ॥

ধরণীর প্রেম কুসুম-প্রায়
ফুটিয়া নিমেষে শুকায়ে যায়,
সে ফুলে যে মালা গাঁথিতে চায়
তার চোখে চির-অশ্রুধার ॥

হেথা কেহ কারো বুঝিনা মন
যারে চাই হেলা হানে সে জন,
যারে পাই সে না হয় আপন
হেথা নাই হৃদি ভালোবাসার ॥

তুমি বুঝিবেনা কি অভিমান
মিলনের মালা করিল ম্লান,
উ'ড়ে যাই মোর দূর বিমান
সেথা গা'ব গান আশে তোমার ॥

মানব ও সমাজ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বিবাহপদ্ধতির ইতিহাস-লেখক পণ্ডিত Westermarck বহুবিবাহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি কারণ এই নির্দ্দেশ করেচেন :—

"One of the chief causes of polygamy is the attraction that female youth and beauty exercise upon the men ;...A further cause of polygamy is man's taste for variety. The sexual instinct is dulled by long familiarity and stimulated by novelty.

অর্থাৎ বহুপত্নীত্বের একটি প্রধান কারণ হচ্চে—নারীর যৌবন এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ। আরেকটি কারণ হচ্চে স্বাদ বদলানোর প্রবৃত্তি। আসঙ্গ-লিপ্সা পুরাণোর সংস্পর্শে তীব্রতা হারিয়ে ফেলে আর নতুনের স্পর্শে তা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে বায়রনীয় ভালবাসা যে এই আসঙ্গলিপ্সারই নামান্তর সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেচি।* আধুনিক কালে একটি সম্প্রদায় যে এই আসঙ্গলিপ্সাকেই 'ভালোবাসা' নামে চালিয়ে তারই নামে বিবাহকে এবং নৈষ্ঠিক প্রেমকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করচেন সে কথাও বলেচি। এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য হচ্চে এই : বিবাহ একটা কামতৃপ্তির সাধন মাত্র : মানুষ নেহাৎ বোকামী ক'রে বিবাহকে জীবনের একটা স্থায়ী বন্ধনে পরিণত করবার চেষ্টা করেচে। বুদ্ধিমান যে সে জানে স্ত্রী হচ্চে একটা দরকারী আপদ। অনেকে তাই বিবাহপ্রথাকেই উঠিয়ে দিতে পারলে খুসী : আর যাঁরা প্রথাটাকে রাখতে চান তাঁরা একে ক্ষণস্থায়ী করবার জন্য সচেষ্ট। কারণ তাঁদের মতে 'ভালোবাসা' উড়োপাখী ; যখন নারী বিশেষ আর আকর্ষণের বস্তুই রইল না, তখন তাকে ত্যাগ ক'রে পুষ্পান্তরের দিকে ধাবিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

এঁরা যাকে 'ভালোবাসা' নাম দিয়েচেন এ যে আমাদের ভাষায় সোজাসুজি 'কাম' তা পূর্ব্বেই বলেচি। এই কামবৃত্তি যে মানুষের একটি অত্যন্ত প্রবল বৃত্তি তাও অস্বীকার করবার কোনো উপায়ই নেই। জীব-জগতে সৃষ্টিধারাকে অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি এই বৃত্তিটিকে দুর্নিবার ক'রে সৃষ্টি করেচে ব'লে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতি কোথাও এই কামসম্ভোগকেই জীবনের লক্ষ্য ব'লে স্বীকার করেনি ; অবাধ ভোগ প্রকৃতির লক্ষ্য নয়, এটা আমরা নিম্ন স্তরের জীব শ্রেণীর দিকে তাকালেই দেখতে পাই। পারিবারিক বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে অবাধ ভোগনীতির অনুসরণকে প্রকৃতি কখনও সমর্থন করেনি। কেউ কেউ বিবাহপদ্ধতিটাকে সভ্য মানবের একটা কৃত্রিম সৃষ্টি ব'লে মনে করেন এবং বন্ধনহীন, দায়িত্ব-হীন অবাধ ভোগকেই মানবের আদিম স্বভাব ব'লে মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত Westermark যা বলেচেন, শোনাই :—

After examining in detail all the cases which are known to me of peoples said to live in promiscuity, I have arrived at the conclusion that not one of these statements can be regarded as authoritative, or even makes the existence of promiscuity probable in any case............Inded, the hypothesis of promiscuity not only lacks all foundation in facts, but is actually opposed to the most probable inference we are able to make as regards the early condition of man. Darwin remarked that from what we know of the jealousy of all male quadrupeds promiscuous intercourse is utterly unlikely to prevail in a state of nature.

পণ্ডিতপ্রবর এই কথাটিই বলচেন যে এই অবাধ পারিবারিক বন্ধনহীন সম্ভোগপদ্ধতিকে মানুষের আদিম অবস্থা মনে করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত হেতুই তিনি পান নি'। বরং তিনি বলতে চেয়েচেন যে—

* বিবাহ-না-ভালবাসা—বিজলী, ১ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা ; ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩১।

"......marriage is not an artificial creation but an institution based on deeprooted sentiments, conjugal and parental, it will last as long as these sentiments last."

অর্থাৎ বিবাহ মানুষের একটা কৃত্রিম সৃষ্টি নয়, মানবের অন্তরের গভীর দাম্পত্যপ্রীতি এবং অপত্যস্নেহের ওপর এর ভিত্তি ; যতদিন এই বৃত্তিগুলো না বিনাশপ্রাপ্ত হবে ততদিন বিবাহও থাকবে।

অগ্নির নিজস্ব ধর্ম্ম হচ্ছে যা-কিছু পাওয়া তাকে দগ্ধ করা ; কিন্তু মানুষ সেই দাহিকা শক্তিকে নব নব সৃষ্টির কার্য্যে লাগিয়েছে, মানুষের অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছে। কামকেও তেমনি যদি অবাধ গতি দেওয়া যায় সে বিষম প্রলয়কাণ্ড ঘটায় ; কিন্তু প্রকৃতি, জীবনধর্ম্ম কামকে কাজে লাগিয়েছে,—বিলাসের কাজে নয়, সৃষ্টির কাজে, সমাজস্থিতির কাজে। এই তত্ত্বটিকে যারা বিস্মৃত হবে তারা জীবনের মূল সত্যকে অস্বীকার করবে এবং সেই অস্বীকৃতি কখনো তাদের কল্যাণকর হবে না।

জীবন তার নিজেরই প্রয়োজনে স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর নিকট শোভনীয় করেছে। কামের সহায়তায় জীবন বর্ত্তমান থেকে ভাবীকালের দিকে চলেছে এবং এই অনিবার্য্য কারণেই পুরুষের নিকট নারীর যৌবন এবং সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই আকর্ষণের বস্তু হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যাবে যে কামপরিতৃপ্তির কোথাও শেষ নেই। অন্যান্য জীবের মধ্যে আমরা সময় বিশেষে কামচাঞ্চল্য দেখতে পাই, কিন্তু মানুষ এই দিক দিয়ে সময়ের বন্ধনকে অতিক্রম করেছে : কামবৃত্তিকে জাগ্রত করবার জন্য তার কোনো বিশেষ কালের নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয় না। অথচ মানুষ কেবলি কামচরিতার্থতার জন্য ছুটে বেড়াক এ জীবনের কাম্য নয়, সমাজসৃষ্টির এবং বিবাহপদ্ধতির গোড়া থেকেই এটা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই মানুষকে এই প্রবৃত্তি সংযত করতে হয়েছে ; জীবনেরই বিকাশের জন্য এটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এই কারণেই বিবাহ মানবসমাজে একটা পবিত্র সংস্কার বলে পরিগণিত হয়েছে।

যারা অসংযত, জীবনে যারা এই কামাসক্তিকেই চরম ব'লে মনে করেছে তারা যত চেষ্টাই করুক মানুষের গভীর সংস্কারে এই বৃত্তিকে সংযত করবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে বলেই মনে হয়।

কামের দিক দিয়েই যদি শুধু বিবাহকে বিচার করতে হয় তা হ'লে একথা কে না স্বীকার করবে যে বিবাহ স্থায়ী হ'তে পারে না। কাম স্বভাবতঃই অতৃপ্ত, চঞ্চল, নিত্যনবীনের জন্য সে কাঙাল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি বিবাহ কামমূলক হ'লেও অন্য ফলের অপেক্ষা রাখে। বিবাহের লক্ষ্য ভাবীকালের দিকে জীবনের আত্মপ্রসার—আর তা শুধু দেহের দিক দিয়ে নয়। যে-সন্তান আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে সে শুধু আমার দেহের উত্তরাধিকারী নয়, সে আমার মনেরও উত্তরাধিকারী। এই কারণেই পিতা এবং সন্তানের সম্বন্ধ শুধু পালন পোষণের নয়। পিতার মধ্যে অতীতকালের মাঝ দিয়ে বিকশিত বংশবিশিষ্টতা এসে সংহত হয় এবং ভাবীকালের দিকে আরো বিকশিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে ; তখন সন্তান পিতার প্রাণের প্রদীপটিকে নিয়ে ভাবীকালের দিকে এগিয়ে চলে : শুধু যে রক্তের মাঝে সঞ্চিত বংশধারার বিচিত্র সম্পদ নিয়েই সে যাত্রা করে তা তো নয় ; পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার মাঝ দিয়ে যে সামাজিক সভ্যতার প্রকাশ সেই সভ্যতার সম্পদ্ নিয়েও তো সে অগ্রসর হয়। তাই তো বলছিলাম পিতামাতার কাজ শুধু তো দেহটিকে সবল করে ছেড়ে দেওয়াই নয়। জীবনের পরিণতির জন্যই মানবশিশুর দীর্ঘকাল পারিবারিক জীবনের মাঝে পরিপুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন। এই কারণেই বোধ করি অপরাপর জীবশিশুদের মত মানবশিশু অত্যল্পকালের মধ্যেই চলতে ফিরতে সক্ষম হয় না : মানবশিশু দীর্ঘকাল অক্ষম অসহায় হয়ে পিতামাতার মুখ চেয়ে থাকে আর তাতে করেই পিতামাতার একত্র বাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সব কারণেই নরনারী স্বভাবতই বিবাহিত জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জীবনের বিকাশের দায়েও কামচঞ্চল প্রজাপতি-জীবন যাপন প্রকৃতি সইতে পারে না। অথচ মানুষের মধ্যে কামবৃত্তির প্রবলতা যে কম তা নয়,

বরং বেশিই। যদি এই বৃত্তি বদ্ধ হয়ে থাকে মানুষের মনে, তা হ'লে তো এই রুদ্ধ বেগ মানুষকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। আসলে কিন্তু তা হয় না। মানুষ তার মনের উদ্ধত কামাবেগকে, Libidoকে রূপান্তর দান করেচে যা থেকে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত আরো কত কি সম্ভব হয়েচে। এই কারণেই যারা মানুষের জীবনে ওই যৌন ভোগটাকেই চরম লক্ষ্য ক'রে জীবনের মাঝে বিপর্য্যয় ঘটাতে চায় তাদের কোনো রকমেই সমর্থন করতে পারা যায় না।

যখন যা-খুসী তাই করতে পারলেই হয়ত মানুষ নিজকে চরিতার্থ মনে করতে পারত; কিন্তু এই যা খুসী-তাই করবার অধিকার যে কারু নেই সেই কথাটি জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। সুতরাং কামের ক্ষেত্রেও মানুষের উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বেশিদিন চলার উপায় নেই। জীবনের কঠোর নির্দ্দেশ এই যে জগতে উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যক্তিগত ইচ্ছার অবাধ তৃপ্তির স্থান নেই।

নেই বলেই সমাজ গড়ে উঠতে পেরেচে, এটাকে কয়েকটা মানুষের সজ্ঘবদ্ধ চক্রান্ত বলে মনে করবার কোনো যুক্তি-সঙ্গত হেতু নেই। উচ্ছৃঙ্খলতার চাইতে শৃঙ্খলা যদি শ্রেয় না হ'তো, অসংযমের চেয়ে সংযম যদি কল্যাণকর না হ'ত, কামের অতৃপ্তির চেয়েও দাম্পত্যপ্রীতির যদি শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশীও না হ'ত, তা হ'লে সমাজে কোনো কালেও গড়ে উঠবার অবকাশ হ'ত না।

বিবাহের এবং বিবাহের স্থায়িত্ব-বিরোধীদের স্বপক্ষে নানা রকমের লোভনীয় তরল যুক্তি আছে, তা যে কতক না শোনা আছে তা নয়। কিন্তু সে-সব যুক্তির অবতারণা ক'রে খণ্ডন করা বৃথা: যারা কোনো বস্তুকেই সমগ্রতার দিক থেকে গভীরভাবে বিচার না ক'রে শুধু সাময়িক মোহের তৃপ্তির জন্য যুক্তিরচনা করচে তাদের বোঝানোর চেষ্টা নিরর্থক। সুতরাং সে চেষ্টা করব না। কামমূলক ভিত্তির ওপরে স্থাপিত হ'লেও বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন যে কামকে অবাধ তৃপ্তির অবসর দিতে পারে না সেই কথাই বললাম। বারান্তরে বাসরনীয় ভালোবাসা থেকে স্বতন্ত্র যে ভালোবাসাকে মানুষ এতকাল পূজা করে এসেচে তার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করবার বাসনা রইল।

গান

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কাল রজনী চল গিয়েছে, সজনি, জল্ আনিতে চল্
ঝম্‌ঝমা ঝম্ ঝুমুর ঝুমুর বাজ্‌বে পায়ে মল।

পদ্মদিঘীর কালো জলে ফুল ফুটেছে সই
পূব লাগে লাল, মেঘলা সকাল কাট্‌ল বুঝি ওই,
তাই, ভরা কলস উজাড়ি মোর, জল আনিবার ছল

গুরুজনের গঞ্জনা নাই নিরালা ঘাটে—
যদি, জল ভরিয়া সাঁতার দিয়া সময় না কাটে
তবে কাঁখের কলস ভাসিয়ে জলে তুল্‌ব কমলদল।

যত্র-তত্র !

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আহারের ব্যবস্থা ; কিন্তু অক্ষুধাতেও যে লোকে ভোজন, অনেক সময়ে গুরুভোজনও করে, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাহার ফল ভাল হয় না, না হওয়াই স্বাভাবিক, তাহাই বলিতেছি।

১

চঞ্চল(কুমার) সেন দার্জ্জিলিঙ জেলার বন-বিভাগের ছোট হাকিম। দুই বৎসর হইল চাকরিতে ঢুকিয়াছে আর এক বৎসর হইল, বর্দ্ধমানের সরকারী উকীল রায় বাহাদুর নরেশচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যা প্রভাত-নলিনীকে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহের মাসখানেক পরে, সেই যে বনে আসিয়া ঢুকিয়াছে আর বাহির হইতে পারে নাই। অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া এক মাসের ছুটি লইয়াছে, ইচ্ছা আছে, অবকাশান্তে পত্নীকে লইয়া আসিবে।

দার্জ্জিলিঙ হইতে শিলিগুড়ি—শৈলশিখর হইতে পর্ব্বত-পাদদেশ বরাবর সে মোটরেই যায় ; এবার রেল-ট্রলিতে নামিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রেল-ট্রলির চারিদিক খোলা, দৃশ্যাদি দেখিতে দেখিতে যাওয়া যায়। ইচ্ছা আছে যদি বেশ আরামদায়ক মনে হয়, তবে মেম সাহেবকে সে এই ট্রলিতেই আনিবে।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, মিক্সড ট্রেণের পিছনে দুইখানি রেল-ট্রলি বাঁধা আছে। একখানির হাতলে তাহার নাম লেখা টিকিট রজ্জুবদ্ধ ; অপরখানিতে কোন্ একটা স্কুলের নাম লেখা আছে। দার্জ্জিলিঙের পুলিস সাহেব হনজিৎ দেওয়ান ও 'রেঞ্জ' রামদাস চঞ্চলকে see off করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই বলিল—মিষ্টার সেনের বরাত ভাল ; রোম্যান্স সঙ্গেই যাইতেছে।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই গুটি দশ বারো মেয়ে কলরব করিতে করিতে সেই দিকেই আসিল এবং প্রথমে চঞ্চলের গাড়ীর টিকিটখানির লেখা পাঠ করিয়া অপর গাড়ীখানির দিকে অগ্রসর হইল। অগ্রসর সকলেই হইল বটে কিন্তু একটি মেয়ে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারেই অগ্রসর হইল। সেই মেয়েটি একদৃষ্টে যেন চঞ্চলকেই দেখিতেছিল। অন্য মেয়েরা মুটের মাথা হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া বেঞ্চের নীচে, আশে পাশে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল ; কেবল সেই মেয়েটি পলকবিহীন নেত্রে চঞ্চলের দিকে চাহিয়া নির্লজ্জের মত দাঁড়াইয়া !

মিষ্টার রামদাস চঞ্চলের বাহুতে ছোট্ট একটি টোকা দিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—মিঃ সেন, দেখুন আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতেছে কি না !

পুলিস সাহেব হনজিৎ দেওয়ান বলিলেন—একটা কথা বলিয়া রাখি সেন। উহারা ত অনেকগুলি লোক দেখিতেছি। যদি মনে হয়, ঐ ট্রলিতে উহাদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, অরসিক না হইয়া, আপনি উহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আপনার ট্রলিতে লইবার আহ্বান দিতে ভুলিবেন না।

রামদাস বলিল—অন্ততঃ ঐ খদ্দরধারিণীকে !

চঞ্চল কোন কথা বলিল না ; ঈষৎ হাসিয়া মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিল। দেখিবার সামগ্রী বটে ! মেয়েটি বাঙ্গালীর মেয়ে, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ের মত নয়। বাঙ্গালীর মেয়েদের চেহারায় থাকে কোমলতা এবং একটু লাবণ্য ; স্বাস্থ্য থাকে না, সুতরাং শ্রীও থাকে না। এই মেয়েটি তাহার ব্যতিক্রম ! বঙ্গ-নারীসমাজে সুদুর্ল্লভ স্বাস্থ্য মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া রহিয়াছে। চঞ্চল নিজ মনে স্বীকার করিল, বঙ্গবালাদের নামের আগে শ্রীমতী লিখিবার ব্যবস্থা তখনই সঙ্গত, যখন এমন শ্রী থাকে।

ঘণ্টা বাজিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাস্য পরিহাস, নমস্কার প্রতিনমস্কারের মধ্যে ট্রেণ-সংলগ্ন ট্রলি দু'খানি ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ট্রেণলগ্ন থাকিয়াই ট্রলি দু'খানি ঘুম ষ্টেশনে আসিয়া থামিল—ষ্টেশনের লোকেরা ট্রলির বাঁধন খুলিয়া দিল। এখন এবং এখান হইতে ট্রলি নিম্নপথে আপনিই বিনাযন্ত্রপ্রভাবে চলিয়া যাইবে।

মেয়েরা যখন শুনিল ট্রলিতে মোটর নাই, এঞ্জিন নাই, কেহ ঠেলিয়াও চালায় না, আপনা আপনিই নামিয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে ভয়, আশঙ্কা ও উদ্বেগ উৎকট হইয়া

উঠিল। চঞ্চল কাছেই পাদচারণা করিতেছিল, বলিল—ভয়ের কোনই কারণ নাই; ট্রেণখানা আগেই থাকিবে, দরকার হইলে আবার আমাদের বাঁধিয়া লইবে।

একজন অপরিচিতের মুখে, ভয়ের কোনই কারণ নাই শুনিয়া মেয়েদের ভয় যে কাটিয়া গেল, তাহা নহে; তাহারা অনেকেই তখন নানা প্রশ্নে তাহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। নিজের অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না, লোকের মুখে শোনা কথাগুলিকে কিছু দৃঢ়তার সহিত চঞ্চল চালাইয়া দিল। মেয়েরা বোধ করি কতকটা আশ্বস্ত হইল।

সেই মেয়েটি কোন কথাই বলে নাই, অনিমেষ নয়নে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া ছিল। সে দৃষ্টি এতই সরল, এতই প্রখর যে চঞ্চল সেদিকে চাহিতে চাহিলেও সাহস পাইতেছিল না। বোধ করি (!) মেয়েটির সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, মেয়েটিকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল—কিরে সন্ধ্যা, গিলে খাচ্ছিস্ যে!

সন্ধ্যা হাসিয়া উত্তর দিল—ইচ্ছে সেইরকমই বটে!

প্রশ্ন ও উত্তর দুইটাই চঞ্চলের কাণে গেল—একটু লজ্জা ও একটু আনন্দ বহন করিয়া সে নিজের ট্রলিতে উঠিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইল।

মনোমধ্যে যেমন, বাহিরেও তেমন, মেঘ আর কোথাও নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে, সূর্য্যকরোজ্জ্বল হিমালয় একটা স্বপ্নরাজ্যের রূপ ধারণ করিয়া ধরণীতলে এক মোহের, এক মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

মেয়েটির নাম জানা গিয়াছে, সন্ধ্যা! নামটি স্নিগ্ধ মিষ্ট; রূপটিও স্নিগ্ধ, মিষ্ট। কিন্তু রূপের সঙ্গে নামটি খাটে না—সন্ধ্যার অন্ধকারের লেশমাত্রও সে রূপে নাই।

সন্ধ্যাদের ট্রলিখান আগে আগে ছুটিতেছে, চঞ্চল পিছনে। মেয়েদের হাস্যকলরব চঞ্চল সবই শুনিতে পাইতেছে। মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া অন্য কিছু দেখার ছলে, কেহ কেহ যে তাহাকে দেখিয়া লইতেছে না, তাহাও নহে।

'সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়!' সুন্দর মুখ একখানি দেখিতে কার না ইচ্ছা হয়? সত্যকারের সুন্দর মুখ বার বার দেখিতে কার না সাধ জাগে? পাঠকের মনের কথা বলিতে পারি না আমি ত সুন্দর মুখ দেখিতে পাইলে জীবন ধন্য মনে করি; নয়ন সার্থক জ্ঞান করি; বার বার—শতবার—জীবনভোর দেখিতে বাসনা করি। সন্ধ্যার সুন্দর মুখখানি চঞ্চলের মনের ভিতরে আলোড়ন তুলিতেছিল, একথা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই।

ট্রলি কার্সিয়ঙে আসিয়া থামিল। চা ও জলযোগাদি সারিবার উদ্দেশ্যে চঞ্চল প্রথম শ্রেণীর রিফ্রেসমেণ্ট-রুমে ঢুকিয়া দেখিল, টেবিলগুলি সবই অধিকৃত; তাহাদের অগ্রগামী মিক্সড ট্রেণের শ্বেতাঙ্গ নরনারী আগে ভাগেই টেবিলগুলি দখল করিয়া বসিয়া গিয়াছে। দু'একখানি টেবিলে দু'একখানি আসন খালি আছে বটে; কিন্তু তাহাতে বসিতে কেমন প্রবৃত্তি হইল না। সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজন কক্ষে ঢুকিয়া একখানি টেবিল অধিকার করিয়া বসিতেছে, সন্ধ্যা, ও সঙ্গিনীরা প্রবেশ করিল। এই ঘরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং একখানি টেবিল ও সাত আটখানি মাত্র চেয়ার। চঞ্চল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; স্মিতহাস্যে কহিল—আপনারা এইগুলিতে বসুন।

সন্ধ্যা বলিল—আর আপনি?

সন্ধ্যার এক সঙ্গিনী কহিল—আমরা ত ছ' জন, চেয়ার আটখানা আছে, আপনিও বসুন না।

চঞ্চল বলিল—ধন্যবাদ!

সকলে উপবিষ্ট হইলেন; 'বয়' আসিয়া চঞ্চলের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, চঞ্চল সন্ধ্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—খাদ্যের ফরমায়েস দিই, আশা করি আপনারা কিছু মনে করিবেন না।

কোন উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই চঞ্চল বয়কে খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিল।

সন্ধ্যা ঠিক চঞ্চলের বিপরীত দিকের চেয়ারেই বসিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সামনা সামনি বসিতেই সে চাপল্য অন্তর্হিত; চঞ্চলও তাহার পানে আর চাহিতে পারিতেছিল না। প্রেম হইলে শুনি এমনই হয়! এ'ও কি তাহাই হইল? আর এত শীঘ্র! তা হইবেও বা!

চা ও নানাবিধ খাদ্য আসিল; মেয়েরা বলিল—এত সব কি হ'বে?

চঞ্চল হাসিয়া বলিল—আপনারা বুঝি ক্ষুধার্ত্ত হন্ নাই? আমি ত দারুণ ক্ষুধা অনুভব করিতেছি। ট্রেণে, মোটরে, ট্রলিতে চড়িলে আমি দ্বিগুণ ক্ষুধা বোধ করি।

এক তরুণী কহিলেন—আমরাও যে অনুরূপ করি তাহা মনে করিবেন না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাও হাসিল। সুন্দর মুখের হাসি—সেও কি সুন্দর!

চঞ্চল জিজ্ঞাসিল—জার্নিটা কেমন উপভোগ করিলেন, বলুন।

কেহ বলিল, চমৎকার; কেহ বলিলেন, Splendid. কেহ দুই কলি ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করিলেন, কেবল সন্ধ্যাই কিছু বলিল না।

চঞ্চল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আপনার কেমন লাগল?

সন্ধ্যা ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল—মন্দ কি!

রবিকরোজ্জ্বল আকাশ যেমন সুন্দর, মেঘাচ্ছন্ন অম্বরও তেমনই সুন্দর! অবশ্য চক্ষু থাকা চাই; চঞ্চল চক্ষুষ্মান।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে পথের দৃশ্যাবলী আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঘুমে কেন সকল সময়ই মেঘের সঞ্চার হয়; ঝরণাগুলা সকল সময়েই জল উদ্গীরণ করে কি করিয়া, পাহাড়ী মেয়েদের চেহারা অমন সুন্দর, কিন্তু তুলনায় পুরুষগুলা দুর্ব্বল ও কুৎসিত কেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সন্ধ্যা কোন আলোচনায় যোগ দেয় নাই, কোন কথাও বলে নাই। চঞ্চল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—আপনি বোধ হয় 'জার্নি'টা ভালরূপ উপভোগ করেন নাই!

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া, কণ্ঠে যতখানি পারিল মাধুর্য্য ঢালিয়া কহিল—কেন বলুন তো?

কৈ, আপনি ত কিছু বলিতেছেন না?

সন্ধ্যা হাস্যরত নয়ন দু'টি চঞ্চলের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মধুর স্বরে কহিল—সব কথাই কি বলা চলে? ভাব, ভাষা কি অব্যক্ত থাকে না?

পাশের মেয়েটি (বোধ করি) সন্ধ্যাকে একটু খোঁচা দিয়াছিল, তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে সন্ধ্যা তাহার পানে চাহিল।

'বয়' বিল লইয়া আসিতে চঞ্চল টাকাটা দিয়া দিল; মেয়েদের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর ভাব দেখা গেল; কিন্তু তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; সময়ই পাইলেন না।

চঞ্চল ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইল; ইঁহাদের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—শিলিগুড়িতে আপনারা 'ডাইন' করিবেন ত? কিছু মনে করিবেন না, জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিয়া, কিন্তু এখান হইতে খবর না দিয়া রাখিলে, অনেক সময় সেখানে অনাহার প্র্যাকটিশ করিতে হয়।

শিলিগুড়িতে খাবারের দোকান নাই?

বলিতে পারি না, থাকিতে পারে; কিন্তু সে খাবার খাওয়া কি উচিত?

ম্যানেজার আসিয়া দাঁড়াইলেন; চঞ্চল বলিল—সাতটা ডিনার শিলিগুড়িতে আমার নামে 'বুক' করিয়া রাখুন।

থ্যাঙ্ক ইউঃ—নেম্ প্লিজ?

—মিঃ চঞ্চল সেন। শিলিগুড়ি হইতে আমি টু-ডাউনে যাইতেছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ম্যানেজার চলিয়া গেল।

মিক্সড্ ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে, ট্রলিগুলি এখনই ছাড়িবে, সকলে প্লাটফর্ম্মে বাহির হইয়া আসিলেন।

চঞ্চল বলিল—আপনারা যদি কিছু না মনে করেন, আমি একটি কথা বলি; একখানি বেঞ্চে আপনাদের খুবই অসুবিধা হইতেছে; আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার ট্রলিতে আসিলে আমি আনন্দ লাভ করিব।

প্রস্তাবটা প্রথমে একটু অশোভন ঠেকিলেও পরমুহূর্ত্তে সেটিকে সঙ্গত মনে করিয়া লইতে কোন পক্ষেরই দ্বিধা রহিল না। এবং আমার পাঠকপাঠিকারা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন যে সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যাই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কহিল—সে ত ভালই হইবে, গল্প করিতে করিতে বেশ যাওয়া যাইবে। আর সংস্কৃত কাব্যের মতে আমরা যখন সাত পা এক সঙ্গে চলিয়াছি, তখন পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধও হইয়া গিয়াছি।

পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণীটি বোধ করি আবার কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহাকে পুনশ্চ বিদ্ধ করিল।

চঞ্চল তাহা লক্ষ্য করিল এবং লক্ষ্য করিয়া আনন্দানুভব করিল।

'ডিনার'-শেষে চঞ্চল গোটা তিনেক 'পেগ্' টানিয়া লইয়া মেয়েদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্মে মিলিত হইল। তখনও ছোট লাইনের ডাউন মেল্ আসিয়া পৌছায় নাই ; সুতরাং বড় লাইনের মেল্ ছাড়িতে দেরী আছে। টেবিলে খানা-শেষে হুইস্কী-সোডার আবির্ভাবেই মেয়েরা চঞ্চলের অনুমতি লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে চঞ্চল-সম্পর্কিত আলোচনাদি হইতেছিল, চঞ্চলকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে একটা চাপা-হাসির স্বচ্ছ তরঙ্গ বহিয়া গেল। চক্ষু 'সাদা' থাকিলে চঞ্চল তাহা দেখিতে পাইত।

অপেক্ষাকৃত বর্ষিয়সী রমণী প্রশ্ন করিলেন—মিঃ সেন, আপনাকে বন্ধুভাবে পাইয়া আমরা আমাদিগকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেছি। কিন্তু আমাদের বন্ধুর উদার আতিথেয়তা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় আমরা পাই নাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে···

চঞ্চল কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল—না, না আপত্তি কিসের ? আপনারা কি জানিতে চাহেন, বলুন না, আমি সানন্দে তাহার উত্তর দিব।

আপনি বুঝি দার্জ্জিলিঙেই থাকেন ?

ঠিক দার্জ্জিলিঙ নয়, দশ্ বারো মাইল দূরে রংবং বলিয়া একটি বন-ভূমি আছে, সেইখানে থাকি। আমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে আছি।

এক তরুণী প্রশ্ন করিলেন—সে কি অজগর বন ? বাঘ টাগ আছে ?

তা আছে বৈ কি !

আপনার ভয় করে না ?

ভয় কিসের ?

আপনার খুব সাহস বুঝি ?

অপরা প্রশ্ন করিলেন—আপনি সেখানে একলা থাকেন ?

চঞ্চল বলিল—আপনারা কি হিসাবে একথা বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গে দারোয়ান, চাপরাসী, চাকর প্রভৃতি অনেক লোক আছে।

এইবার যে প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা, তাহা কোন দেশের কোন কালের কোন মেয়েই 'অনায়াসে' করিতে পারে না। মেয়েদের মুখের ভাবে প্রশ্নটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, রক্তাভ নেত্রেও চঞ্চল তাহা বুঝিয়া লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। তবে এই ভাবিয়া সে সান্ত্বনা পাইল যে মেয়ে-দের মুখ দিয়া প্রশ্নটা কিছুতেই বাহির হইয়া আসিবে না।

কিন্তু হায়! আসিল; আর আসিল, সেই সুন্দর মুখের, সুন্দর অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া! সন্ধ্যা বলিল—আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিবেন, মিসেস্ সেন কি···

চঞ্চল চঞ্চল হইয়া কহিল—না।

প্রশ্নটা কি সম্পূর্ণ না জানিয়াই সে 'না' বলিয়া কথাটাকে চাপা দিয়া দিল।

সন্ধ্যার পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণী অনুচ্চ স্বরে সন্ধ্যাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—মিসেস্ সেন বোধ হয় আজও হন্ নাই।

সন্ধ্যা নৃত্যশীলা নয়ন দু'টি চঞ্চলের মুখের 'পরে রক্ষা করিল ; ভাবটা যেন, সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বল না বাপু, হাঙ্গামা তাহা হইলে মিটিয়াই ত যায় !

চঞ্চলের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, ছোট লাইনের মেল্ এই সময়ে বিকট শব্দ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। চারিদিকে একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। ইঁহারাও ওদিকের প্ল্যাটফর্ম্মে জনতা দেখিতে চলিলেন।

কথায় কথায় ইঁহাদের পরিচয় চঞ্চল যাহা সংগ্রহ করিল, তাহা এইরূপ। এই মেয়েগুলি কলিকাতার কোন এক বিখ্যাত মেয়ে কলেজে পড়েন এবং বোর্ডিঙে অবস্থান করেন। কয়দিন কলেজ বন্ধ ছিল, ইঁহারা রেলের ছাত্রছাত্রী, কন্সেসন লইয়া দার্জ্জিলিঙ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরিচয় এই, সে এইবার বি-এ পরীক্ষা দিবে ; পাস্ করিয়া, তাহার ইচ্ছা, বিলাতে সোসিওলজি পড়িতে যাইবে। তাহার পিতা অর্থবান ব্যক্তি, 'অন্য বিঘ্ন' যদ্যপি না উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আগামী নভেম্বর মাসেই সে 'সেল্' করিবে।

যিনি পরিচয় দিতেছিলেন, 'অন্য বিঘ্ন' (if no untoward event happens) বলিতে তাঁহার মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে ও কণ্ঠটি মধুর রহস্যে ভরিয়া উঠিল। চঞ্চল অসতর্কভাবে বলিয়া ফেলিল—ঘটিলেই বা মন্দ কি !

সন্ধ্যা তাহার দীর্ঘ কমল নয়ন দু'টি তুলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল। চঞ্চলের মনে হইল, তপোবনে শকুন্তলা এক সময়ে এইরূপ তিরস্কারই করিয়াছিলেন।

"আবধেত্যাদি। অপসরতং যুবাং কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েতে ন বাং বচনং শ্রোষ্যামি।"

কিন্তু মুখ রাগ করিয়া 'দূর হও' বলিলেও মন দূর হইতে বলে না; কথা শুনিব না বলিলেও, কাণ ত মানে না। ওগো, সৃষ্টির এই নিয়ম!

পরিচয়-প্রদানকারিণী পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, সন্ধ্যার সব ভার আমার ওপর থাকিলে সোসিও-লজির পরিবর্ত্তে আমি হাউস-লজিংএর ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিয়া ফেলিতাম। দুঃখের বিষয়, অতখানি ভার বহন করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই!

চঞ্চল সাগ্রহে, সতৃষ্ণ নয়নে, আকুলিত অন্তরে সন্ধ্যার মুখের পানে চাহিয়া মুগ্ধ, মোহিত হইয়া গেল। দিবাবসান বেলায় পশ্চিম গগনের রক্তচ্ছটা পড়িয়া সন্ধ্যাকে সুন্দর, সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছে। বিদায়োন্মুখ স্বর্ণ-রবির আভায় সকল আকাশ, সকল জগৎ পুলকিত, আলোকিত হইয়া উঠে, সন্ধ্যার সকল অঙ্গেও যেন পুলকের প্রবাহ বহিতেছিল।

চঞ্চল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। কেন এই দীর্ঘ-শ্বাস, কিসের এই দীর্ঘ শ্বাস, আশায় অথবা হতাশায় এই দীর্ঘশ্বাস, তাহা আমরা বলিতে পারিব না, তবে সে শব্দটুকু সন্ধ্যার অজ্ঞাত রহিল না। সন্ধ্যার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠে একটা হাসির লহর ধীরে বহিয়া গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই হাসিটা চঞ্চলকে বিশ হাত মাটীর নীচে প্রোথিত করিয়া দিল।

৩

এই সময় প্রথম ঘণ্টা পড়িল।

মেয়েদের জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা ছিল। চঞ্চলের প্রথম শ্রেণীর 'কূপের' কাছেই সে গাড়ীখানি। ঘণ্টা পড়িতেই সকলে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। চঞ্চল বলিল—আমি একখানা গাড়ীর পরেই কূপেটায় আছি—কোন কিছুর দরকার টরকার হইলে আমাকে বলিলে আমি খুসী হইব।

সন্ধ্যা তখনও প্ল্যাটফর্মেই ছিল, বলিল—ধন্যবাদ; কিন্তু দরকার কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না।—এই বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। উঠিবার সময় চম্পকাঙ্গুলিধৃত সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র রেশমী রুমালখানি তাহার অজ্ঞাতসারে হস্তচ্যুত হইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া গেল। চঞ্চল নিঃশব্দে সেখানি তুলিয়া লইল। দিবে-কি-দিবে-না ভাবিতে ভাবিতে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, চঞ্চল বাহির হইতে দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, জলপাইগুড়িতে আমি খোঁজ নেব'খন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে, মেয়েদের মধ্যে যে হাস্য তামাসার ঘটা পড়িয়া গেল, তাহা চোখে দেখিলে অথবা কাণে শুনিলে বেচারা চঞ্চল জনকদুহিতা সীতাদেবীর মত বসুমতীর কাছে বর চাহিয়া লইয়া অদৃশ্য হইতে বাধ্য হইত।

নিজের কূপের মধ্যে সে তখন এটাচিকেস খুলিয়া সুগন্ধি নির্ব্বাচনে ব্যস্ত। "Forget me not" "ভুলো না আমায়" শিশিটির ছিপি খুলিয়া বসিয়া আছে, ইচ্ছা, উহারই খানিকটা রুমালে ঢালিয়া দেয়; তারপর দৃষ্টি পড়িল, ফরাসীদেশে প্রস্তুত বহু মূল্যের "Love me dear". চঞ্চল ভাবিতেছিল, সন্ধ্যা কি একবারও ইহা ব্যবহার করিয়াছে? যদি করিয়া থাকে, তবে নামটি ত তাহার তখনই মনে পড়িবে এবং আমার আবেদনটুকুও তাহার প্রাণে জাগিবার সম্ভাবনা আছে। কথাটা চিন্তা করিতেও একটি সুস্নিগ্ধ কাব্যরসের সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু—একটা কিন্তুও আছে। ঐ এসেন্স যদি তাহার ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ত চঞ্চলের সুরভিত নীরব নিবেদন সন্ধ্যার নিকট অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। কাজেই কাগজ কলম বাহির করিতে হইল।

সুন্দর একখানি ফিকা নীল রঙের চিঠির কাগজে মুক্তাক্ষরে লিখিল:—

কেহ যদি অতল তল হইতে মণি মুক্তা কুড়াইয়া পায় তাহা হইলে সেগুলি তাহারই সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়; ইহা আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি, আমারই সম্পত্তি। তবুও যে ফেরত দিতেছি, তাহার একমাত্র কারণ, যদি

তোমার সঙ্গে অতিরিক্ত না থাকে, পথে অসুবিধা হয়, সেই জন্য।

তারপর "Love me dear" খালি করিয়া ঢালিয়া, কোণে একটি সুন্দর ক্লিপে পত্রীটি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। অল্পক্ষণ পরে ট্রেণ থামিলে নামিয়া, ইহাদের গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল, জানালায় মুখ রাখিয়া সন্ধ্যা বসিয়া আছে। কুহকিনী আশা অন্তস্থলে নৃত্য করিয়া উঠিল।

চঞ্চলকে দেখিয়া সন্ধ্যা মুখ তুলিল।

চঞ্চল জিজ্ঞাসিল—ঘুমোন নি যে?

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—ঐ প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায় না কি?

চঞ্চল রসিকতায় মেয়েটির কাছে হার মানিয়া বলিল—এ রুমালখানা আপনার, কোণে S (এস্) লেখা আছে।

হাঁ হাঁ, আমি খুঁজছিলুম—ধন্যবাদ!—হাত বাড়াইয়া সন্ধ্যা রুমালখানি তুলিয়া লইল।

তখনই আবার বলিল—ওঃ চমৎকার গন্ধ ত! আপনি বুঝি গন্ধ ঢেলে দিয়েছেন?

চঞ্চল নীরব।

সন্ধ্যা বলিল—এসেন্সটা বিলিতি বোধ হয়?

ঠিক বিলিতি নয়; তবে স্বদেশীও নয়—প্যারীর তৈরী।

কিন্তু চমৎকার গন্ধটি!

এসেন্সের নামটি এই সূত্রে জানাইবার সুযোগটি চঞ্চল ত্যাগ করিল না; বলিল—সেই জন্যেই এসেন্সটির নাম হইয়াছে, Love me dear! যে মাখিবে, সেই ভালবাসিবে।

সন্ধ্যার মুখে একটা দুষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল; মিটি মিটি চাহিয়া বলিল—কাহাকে?—এসেন্সকে, না যে মাথাইবে, তাহাকে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত, সেই মধ্যাহ্ন হইতে, ইংরাজীতেই কথা বার্ত্তা চলিয়াছিল; এই প্রথম চঞ্চল মাতৃভাষায় উত্তর দিল, কহিল—আপনার কি মনে হয়?

মুখে সেই হাসি, চোখে সেই দুষ্টামী; সন্ধ্যা কহিল—আমার কি মনে হয় জানেন?—না কাজ নাই, থাক্।

চঞ্চল একেবারেই জানালার উপরে মুখ রাখিয়া বলিল—কাজ নাই কেন, কাজ আছে, বলুন।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসিল—একান্তই শুনিবেন?

চঞ্চল সবিনয়ে নিবেদন করিল—যদি বলেন!

সন্ধ্যা এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—যাহারা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহারা যে নাম ইচ্ছা দিতে পারে, নাম সার্থক হইয়াছে এইখানে, পথের মাঝারে রুমালে যে দিয়াছে, তাহার হাতে।

চঞ্চলের চঞ্চল চিত্ত আনন্দে রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু নৃত্য করিয়া উঠিল; কিন্তু নৃত্যরঙ্গ প্রকাশ করিবার আর অবসর মিলিল না; যে হেতু গাড়ী চলিতে লাগিল; ছুটিয়া গিয়া কূপে উঠিতে হইল। জানালা দিয়া দেখিল, ওদিকের জানালায় নারীমূর্ত্তি সুস্পষ্ট।

আকাশে চাঁদ নাই, নক্ষত্র আছে; কুঞ্জবন নয়, ট্রেণ; কুসুম-সুবাস নাই, এসেন্সের গন্ধ আছে—প্রেম চর্চ্চা করিবার পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল নয় সত্য; কিন্তু ছোট্ট খাট্ট সেই ফুলদেবতার দয়া হইলে প্রতিকূল আবহাওয়াও অনুকূল হয়—যেমন এখন হইল। মুখখানি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে না বটে কিন্তু প্রেমিকের চক্ষুর পক্ষে যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই যথেষ্ট। কল্পনার গতি ত দার্জ্জিলিং মেলের গতির অপেক্ষাও দ্রুত। নারী যে বিনিদ্র নেত্রে এই দিকে চাহিয়া আছে, হাতে "Love me dear" বাসিত সেই রুমাল, সে-যে তাহার কথাই চিন্তা করিতেছে, তাহা মনে করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না; এবং বসন্তাগমে পুষ্পলতার সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন মুকুলোদ্গম হয়, মনলতাও তেমনই নবপত্রে, নব বর্ণে, নব-মুকুলে ভরিয়া উঠিল। সোরাবজীর রিফ্রেসমেণ্ট রুমেতে রঙীন বারি-প্রভাব দক্ষিনা-বায়ুর কার্য্য করিল; দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, নক্ষত্রখচিত স্তব্ধ আকাশ—সকলে মিলিয়া চঞ্চলকে দূর হইতে দূরে, অতিদূরে টানিয়া লইয়া চলিল।

ট্রেণ আবার থামিল, চঞ্চল নামিয়া, সন্ধ্যার গাড়ীর সামনে আসিতে চক্ষু দু'টি তাহার জুড়াইয়া গেল। "Love me dear"—সুবাসিত রুমালখানি সন্ধ্যার বুকের জামায় আবদ্ধ।

সন্ধ্যা মুখ বাড়াইয়া বলিল, গাড়ী এখানে কতক্ষণ থামবে?

পার্ব্বতীপুর। আধ ঘণ্টা ত বটেই।

তবে একটু বেড়ান যাক্।—বলিয়া সন্ধ্যা নামিয়া পড়িল।

চঞ্চল আনন্দাতিশয্যে কি যে বলিবে, কি যে করিবে, তাহা ভাবিয়াই পাইল না ; এবং যা-তা কিছু বলিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল—কিছু খাবেন ? চা কিম্বা কফি ?

সন্ধ্যা বলিল—কফি খেতে আমি পারি না। কোকো পাওয়া যায় ?

নিশ্চয়ই যায়—আসুন দেখি।

কোকো পাওয়া গেল ; চঞ্চলের পানীয়েরও অভাব হইল না—মনের আনন্দে চঞ্চল গোটা দুই 'বড়াপেগ্' চড়াইয়া দিল।

গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা বলিল—উঃ, কি ঘুমই ঘুমোচ্ছে ওরা। অন্যবার গাড়ীতে, আমারও খুব ঘুম হয় ; আজ কেন হচ্ছে না—কে জানে ?

চঞ্চল কহিল—আমারও ঠিক তাই। কিন্তু আজকের মত ভাল আমার কোন দিন লাগে নি।

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া (এটাকে শুধু হাসি বলিলে খাটো করা হয় ; কিন্তু কি যে বলিব, তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছি না। হয়ত আমার তরুণী পাঠিকারা লেখকের অক্ষমতা ক্ষমা করিয়া সে হাসির একটা নাম করণ করিতে পাবেন) বলিল—আমারও।

ঘণ্টা পড়িল ; সন্ধ্যা গাড়ীতে উঠিয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিল—সকালে আবার দেখা হ'বে

চঞ্চল ভাবিল, হায়, সে যদি অবিবাহিত হইত ! অন্ততঃ একাধিক বিবাহ যদি সমাজনীতি বিরুদ্ধও না হইত !

সকালে দেখা হইল বটে ; কিন্তু কথা কিছুই হইল না। ভোরের দিকে চঞ্চল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন শিয়ালদহে ট্রেণ থামিয়াছে ; তাহার আর্দ্দালী বিছানাপত্র বাঁধিবার জন্য হুজুরকে ডাকাডাকি করিতেছে। চঞ্চল চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া সন্ধ্যাদের গাড়ীর দিকে ছুটিল ; গাড়ী খালি। পোর্টিকোয় দৃষ্ট হইল, ট্যাক্সির পার্শ্বে অনেকগুলি তরুণী। চঞ্চল সেই দিকে ছুটিল।

জিনিষপত্র উঠিয়াছে, তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, চঞ্চলকে দেখিয়া সকলে সম্মিলিতকণ্ঠে নমস্কার জ্ঞাপন করিলেন। সকলের শেষে সন্ধ্যা হাসিমুখে কহিল—আবার দেখা হ'বে।

কিন্তু কোথায় ও কবে দেখা হ'বে তাহা কিছুই বলিল না ; চঞ্চলও তাহা জানিয়া লইবার অবসর পাইল না। পিছন হইতে পাহারাওলার তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া ট্যাক্সি-চালক গাড়ী চালাইয়া দিল।

যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, চঞ্চল চাহিয়া রহিল। যেন—সেই মুখখানি বার বার দেখা গেল ; যেন মৃণাল হস্তধৃত রুমালখানি ঘন ঘন নড়িতে লাগিল ; যেন সেখানি বার বার বলিতে লাগিল, "Love me dear".

দুই একদিন কলিকাতায় থাকিয়া, মেয়ে কলেজ ও বোর্ডিং পাড়ায় অনর্থক ঘুরিয়া, চঞ্চল বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল।

বিবাহের পর একবার মাত্র সে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছিল—শ্বশুরবাড়ী তাহার পক্ষে পুরাতন হয় নাই। শ্বশুর গৃহে খুব ধুমধাম পড়িয়া গেল।

সেই সব সাময়িক উৎসবের বেগ মন্দীভূত হইলে চঞ্চল অন্তঃপুরে পত্নী প্রভাতনলিনীর কক্ষে নীত হইল। প্রভাত নলিনী ঘরেই ছিল, চঞ্চল কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র দরজার মোটা পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া, ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া, চঞ্চলের হাত ধরিয়া সোফায় বসাইয়া, নিজে পাশে বসিল।

পরস্পরের কুশল প্রশ্নাদির পর, নলিনী (এই নামেই সে সর্ব্বত্র পরিচিত) বলিল—কলকাতায় এতদিন দেরী করলে যে ?

চঞ্চল বলিল—একটু কাজ কর্ম্ম ছিল, সেরে এলাম।

কলকাতায় আবার কি কাজ ?

ছিল একটু।

আমি ভাবলুম, আগে বাড়ীই গেলে বুঝি বা ! কাল মা'র চিঠি পেলুম, তিনি লিখেছেন, সেখানেও তুমি যাওনি।

আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, চঞ্চলের আসল বাড়ী, চন্দননগরে।

চঞ্চল বলিল—না, এখান থেকে বাড়ী যাব। মা'কে আজই টেলিগ্রাম করে এসেছি।

তারপর একথা ওকথা সেকথা, যত বাজে কথা ! যখন বাজে কথাও আর জোগাইল না, তখন নলিনী বলিল—আমার জন্যে কি আনলে বল ?

তুমি কি কিছু আনতে বলেছ ?

নলিনী বলিল—বা রে ! আমি বলবো তবে উনি আনবেন, বেশ লোকটি ত ! আমি কোথায় ভাবছি কত জিনিষ আনছো ?

চঞ্চল হাসিয়া বলিল—কি চাও বল, কালই সকালে গিয়ে আনি আবার !

নলিনী বলিল—হ্যাঁ গা, প্যারীর কি একটা নতুন এসেন্স উঠেছে, বত্রিশ টাকা দাম এক শিশির। কি নামটা ভাল ? "Love me dear" না কি ! তুমি জান ?

হ্যাঁ, নামটা শুনেছি বটে !

ব্যভার কর নি ?

না—তা—ঠিক ব্যবহার করি নি ; তবে না—হাঁ—একবার একটা কিনেছিলুম বটে !

নলিনী উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপরে রক্ষিত চঞ্চলের এটাচি কেস্‌টা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চঞ্চলের চঞ্চলতা সম্পূর্ণ তিরোহিত।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—শিশিটা বোধ হয় ওরই ভেতর আছে।

নলিনী মুখটা নীচু করিয়া (বোধ হয় হাসি গোপন করিতেই) এটাচি কেস্ খুলিয়া এটা ওটা নাড়িতে লাগিল ; তারপর শিশিটা বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল—সুন্দর শিশিটা ! কিনেছিলে, অথচ ব্যভার করনি, খালি তোল কি করে ?

চঞ্চল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নলিনীর মুখখানি দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে মুখ তখনও আনত, দেখা গেল না।

নলিনী আবার জিজ্ঞাসিল—পড়ে গেছে বুঝি ? ভারি অসাবধানী তুমি ! এমন দামী জিনিষটা, যত্ন করে রাখতে হয় না ?

একটা 'হ্যাঁ' বলিয়া দিতে পারিলে তখনকার মত ল্যাঠা চুকিয়া যাইত বটে ; কিন্তু একেবারে নিছক নির্ভাজ নির্জ্জলা মিথ্যাটা উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

নলিনী উদ্গত হাস্য-বেগ রোধ করিতে করিতে বলিল—প্রেম ট্রেম করনি ত ?

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া তখনই বলিল—শুনেছি, দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ী মেয়েরা খুব সুন্দর।

ঘাম দিয়া চঞ্চলের জ্বর ছাড়িয়া গেল ; বলিল—যাচ্ছ ত এবার, দেখবেই'খন কেমন সুন্দর !

এটাচি কেস্‌টা বন্ধ করিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া চঞ্চলের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া নলিনী বলিল—দেখ ত' এতে যে গন্ধ, তা তোমার ঐ প্যারীর "Love me dear" না কি নামটা ভাল, তাই কি না !

সেই যে ভাল ভাল সব কেতাবে দেখে, বিনা মেঘে বজ্রপাত—নলিনীর হাতে সেই রুমাল, সেই কোণে লতা-পাতা মধ্যে 'S' অক্ষর—দেখিয়া চঞ্চলের মাথায় আকাশ ও বাজ একই সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উত্তর দিবে কি, জিহ্বা উদরমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে ; দেখিবে কি, চক্ষু-তারকা কার্য্য কারণ বিস্মৃত হইয়া গেছে !

নলিনী আর পারিল না ; উচ্ছল হাসিতে কক্ষ ভরাইয়া দিয়া বলিল—ভগবান কি পুরুষগুলোকে সত্যিই অন্ধ করে তৈরী করেন ? সন্ধ্যাকে তুমি চিনতে পারলে না ?

চঞ্চলের মনে হইল, সোফাটা দুলিতেছে। অথবা ভূমি-কম্প !

নলিনী কহিল—সন্ধ্যা কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্রই চিনেছিল। তুমি চিনতে পার কি না দেখবার জন্যে কিছু বলে নি ! আচ্ছা লোক ত তুমি ! নিজের শালীকে চিনতে পার না ? কোন্ দিন দেখছি, আমাদেরও চিনতে পারবে না।

চঞ্চলের মনে হইল, সর্ব্বাঙ্গের স্বেদধারা কল্ কল্ রবে প্যাণ্টের পা বাহিয়া নামিতেছে ; জুতা ভিজিয়া যাইতেছে।

নলিনী বলিল—সন্ধ্যা বলেছে, তোমায় আর্শুলো ভেজে মাছ বলে খাওয়াবে। এতো তোমার ভুল ! কি তার অভি-মান ! নাও, আমি ডেকে দিই, শালীর মানভঞ্জন কর।

যাক্—তাহা হইলে সন্ধ্যা অঘটন কিছু ঘটায় নাই ! বাঁচা গেল, বাপ ! বড় ভালো মেয়ে সন্ধ্যা !

ধড়ে প্রাণ পাইয়া, চঞ্চল বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও। শালী বলেছে বুঝি, আমি চিনতে পারি নি ?

বলেছেই ত ! না বল্‌বেই বা কেন ? তার মাথা ধরেছিল, ভদ্রতার খাতিরে তুমি তার রুমালে Love me dear একটু দিয়েছিলে এই মাত্র ! তারপর না একবার খোঁজ নেওয়া, না কিছু ! নিজের শালী জানলে তা কি আর পারতে !

সন্ধ্যার প্রতি কৃতজ্ঞতায় চঞ্চলের মন ভরিয়া উঠিল ; বলিল—ডাক ত শালীকে। সোসিওলজি শেখাই ভাল করে।

নলিনী বলিল—বড়দি'ও আছেন। তাঁকেও ডাকছি।

নলিনী বাহির হইয়া যাইতেই, সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিয়া অধরোষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া কহিল—কিন্তু ও কাজটা আর যন্ত্র-তন্ত্র করবেন না, মিঃ সেন।

কোন কাজটা ?

তাহ'লে বলি···গোড়া থেকেই বলি ?

চঞ্চল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রদোষনলিনী, প্রভাত নলিনী ঘরে ঢুকিলেন ; সন্ধ্যা নলিনী ঘরে ছিল—নলিনীদল মধ্যে চঞ্চল, পুষ্পস্তবক মধ্যে মধুপের মত মহানন্দে গুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

নির্জ্ঞান ও রস-

শ্রীজগৎমোহন সেন

মানুষ এবং পশু এক আদিপুরুষের সন্তান। শুধু এরাই নয়, পৃথিবীর যাবতীয় জীবের উৎপত্তির উৎস একটাই। একথা বিজ্ঞানবিৎ ও পুরাণবিৎ উভয়েই স্বীকার করেন। পশুকে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলে না মানলেও নিকট-কুটুম্ব বলে মনে করতে পারা যায়। আসলে একই পদ্ধতিতে দু'জনের শরীর তৈরী হয়েছে। পশুর দেহমনের ভিত্তি-ভূমির উপর মানুষের শরীর এবং মন গড়ে উঠেছে। ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে পরিবর্ত্তন যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু পশুত্বের চাপ মানুষের দেহমন থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

আদিম মানুষ পশুকে হয়ত নিজের থেকে বেশী তফাৎ করে দেখত না। কিন্তু যতই তার শরীরের এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের সংস্কৃতি হ'তে লাগল, ততই সে নিজের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলে। নিজেকে সে পশুর চেয়ে স্বতন্ত্র, উৎকৃষ্ট করে দেখতে শিখল। তার নিজের মধ্যে যে সমস্ত বৃত্তি পশুবৃত্তির অনুরূপ, সে সকলকে মানুষ ঘৃণা করতে শিখল। অথচ এও সে বুঝতে পারল যে এই সমস্ত পশু-বৃত্তি একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। এগুলো তার জীবনোপায়। তার এবং তার বংশধরের বেঁচে থাকবার জন্য এদের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সুতরাং মানুষকে সংযম শিখতে হ'ল।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ" নীতিটা সব প্রাণীই বোঝে। অনেক দিন থেকেই বোঝে। সেই জন্যেই তারা সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের পক্ষপাতী। মানুষের সমাজ এই নীতিরই উন্নত সংস্করণ। মানুষ দেখল সংযম এই সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করে। স্বাধীন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলা ব্যষ্টিগত জীবনে চলতে পারে, কিন্তু সমষ্টিবদ্ধ জীবন যাপন করতে হ'লে প্রত্যেক ব্যষ্টিরই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করা দরকার। এ না হ'লে একতা থাকে না। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে সমাজ-বন্ধন ছিঁড়ে যায়।

সমাজ-বন্ধনকে অটুট রাখবার জন্যে আত্মরক্ষার খাতিরে মানুষের পক্ষে মনোবৃত্তি-সংযমন খুবই দরকারী বলে বোধ হ'ল। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে তার ভেতরকার মনুষ্য-বুদ্ধিই তাকে এ কথা শিখিয়েছে। সমাজ-বন্ধনের মূল তত্ত্বের জন্য সে তার পশুবুদ্ধির কাছে ঋণী, কিন্তু ঐ তত্ত্বের সংস্কার করেছে তার ভেতরকার "মানুষ", "পশু" নয়। সমাজ-বন্ধনের ফলে সম্পত্তি-বিভাগ হ'ল, বিবাহ-প্রথার প্রচলন হ'ল, মানুষ সভ্য হ'ল।

কিন্তু সংযমের অভ্যাস সহজ নয়। বেশীর ভাগ মানুষই অন্তরের সহিত সংযম অভ্যাস করতে পারলে না। সংযত পশু-বৃত্তির তাড়নায় প্রবল দুর্ব্বলের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করতে আরম্ভ করল। সামাজিক অনুশাসনেও তার স্বেচ্ছাচার ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু দুর্ব্বলের এ সুবিধা ছিল না। তার অসংযত পশুবৃত্তি স্বাধীন ভাবে স্ফূর্ত্তি পেতে পারল না। তখন সে মনের আগুনকে ছাইচাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। এবং সুবিধা পেলে চুরি করতে লাগল। সে সমাজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করল। শুধু সমাজের সঙ্গে নয়, অনেক ক্ষেত্রে নিজের সঙ্গেও তাকে লুকোচুরি খেলতে হ'ল। যে সমস্ত প্রবৃত্তিকে সে হেয় বা অন্যায় মনে করত তাকে গোপন করতে না পারলে ভিন্নভাবে, ছদ্মবেশে প্রকাশ করতে শিখল। সরল মানুষ কপট হ'ল।

ক্রমে এমন দিন এল, যখন মানুষ নিজেকেও ফাঁকী দিতে আরম্ভ করল। সে তখন নিজের মধ্যে পশুত্বের অস্তিত্ব টের পেত না, কিম্বা টের পেলেও স্বীকার করতে চাইত না। এটা সভ্য-জাতির মধ্যেই বেশী। শিশু, বালক কিংবা অসভ্য মানুষের মধ্যে যে সমস্ত মনোভাবের নগ্ন-বিকাশ দেখা যায়, সভ্য মানুষের মধ্যে তাকে আমরা এমন পরিবর্ত্তিত বেশে দেখি যে অনেক সময়ে বুঝতে পারি না, তার স্বরূপ কি। সেই মনোভাবের অধিকারীও মনের আসল কথা জানতে পারে না।

কিন্তু জানুক বা না জানুক, মানুষ তার মধ্যে ঐ পশু-প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাবকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষের মনের এই কথাটা ধরা পড়ে যায়। একজন নিজের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ কিন্তু অন্যের লোলুপতা, চৌর্য্যবৃত্তি বা লাম্পট্যদোষ ইত্যাদিকে ঘৃণা করে। নিজের

ঐ সমস্ত দোষ জানতে পারলেও সে "ভাবের ঘরে চুরি" ক'রে সামলে যেতে চায়, কারণ নিজেকে সে হীন মনে করতে পারে না।

মনো-বিশ্লেষণের সাহায্যে মানুষের নির্জ্ঞানে নিহিত রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। যে সমস্ত ইচ্ছা মানুষের ব্যবহারে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, যে সমস্ত ইচ্ছাকে সে পছন্দ করে না, যে সমস্ত ইচ্ছাকে সে সমাজ-অনুশাসনের ভয়ে চেপে রাখে, সে সমস্ত তার মন থেকে একেবারে দূর হয়ে যায় না। তারা মানুষের মনেরই এক গোপন-অংশ আশ্রয় করে থাকে।

সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মত মানুষের মনের অন্য দু'টো স্তর নির্দ্দেশ করা যেতে পারে,—"মানুষ" এবং "পশু"। কারণ আগেই বলা হয়েছে "পশু"-মনের ভিত্তির ওপর মানুষের মন তৈরী হয়েছে। কিন্তু এও মনে রাখতে হ'বে যে নির্জ্ঞানে নিহিত সমস্ত ইচ্ছাই পশু-বৃদ্ধি-প্রসূত নয়। কারণ সমাজ-নীতির সবটাই মনুষ্যোচিত নয়। সমাজ নীতি বিশ্লেষণ করলে তার অনেক রীতির মূলেই পশু-বৃদ্ধি প্রণোদিত প্রবলের স্বেচ্ছাচারকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। স্বার্থপর প্রবল নিজের সুখ সুবিধার খাতিরে এ সমস্ত সমাজে প্রচলিত করেছে। বংশানুক্রমে একই সমাজ-নীতির শাসনে থাকার ফলে মানুষ সে সকলের দোষগুণ বিচার করতে ভুলে গেছে। পূর্ব্ব সংস্কারের ফলে সে তার সমাজের সমস্ত রীতিকেই নীতিমূলক এবং কল্যাণকর বলে মনে করে। সমাজের সমস্ত রীতিই যদি মনুষ্যোচিত না হয়, যদি তা'তে পশুত্বের ছাপ থাকে, তবে সমাজের নিষ্পেষণের ফলে মানুষের অনেক মনুষ্যোচিত ইচ্ছাও যে নির্জ্ঞানে আশ্রয় নেয়নি, এ কথা কে বলবে?

সুতরাং নির্জ্ঞানে নিহিত রুদ্ধ-ইচ্ছা সমস্তকে অসামাজিক বলা যেতে পারে, কিন্তু তার সবটাই অমানুষিক নয়। মানুষের নির্জ্ঞানে "মানুষ" এবং "পশু" দু'জনারই থাকা স্বাভাবিক—অন্ততঃ সম্ভব।

সমাজ-নীতির মাপকাঠি দিয়ে মনুষ্যত্বের বিচার হওয়া উচিত নয়, কেন না, সমাজ-নীতিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে চললে অকলঙ্ক মনুষ্যত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি জাতির প্রকৃত কল্যাণের পথ-নির্দ্দেশ করা হয় তবে সে সমাজ-নীতির সম্পূর্ণ অনুসরণ না করেও চলতে পারে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বলাভেই জাতির প্রকৃত কল্যাণ এবং সে জন্য সমাজ-নীতির সংস্কার হওয়াও আবশ্যক।

মানুষের মনের নিরুদ্ধ-ইচ্ছাই যদি সাহিত্যে রস-সৃষ্টির উৎস হয় তবে সে রস দু'রকমের হ'তে পারে। প্রথমতঃ যে রস নির্জ্ঞান-আশ্রয়ী অসামাজিক "মানুষের" সৃষ্টি, সে রস উপভোগ করবে পাঠকের মনের অসামাজিক "মানুষ"। দ্বিতীয়তঃ যে রস লেখকের নির্জ্ঞান-আশ্রয়ী অসামাজিক "পশু"র সৃষ্টি,—এ রস উপভোগ করবে পাঠকের মনের অসামাজিক "পশু"। কিন্তু এই "পশু"কে প্রশ্রয় দিয়ে প্রকৃত কল্যাণ হওয়া অসম্ভব।

জাতির জনসাধারণের ভাল মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা কম। তারা হুজুগই ভালবাসে। ছাপার অক্ষরে যা পড়ে, কিম্বা রঙ্গমঞ্চে বা বায়স্কোপে যা দেখে শোনে, তা' যদি একটু পছন্দসই হয় তবে নির্ব্বিচারে তাকেই নকল করতে চায়। সুতরাং নিরুদ্ধ 'পশু'-বৃত্তিকে সাহিত্যে রস-সৃষ্টির খাতিরে মুক্ত করে দিলে মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দেওয়া হবে না, আদিম পশুত্বের দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সাহিত্যিককে মনে রাখতে হবে রস-সৃষ্টিই তাঁর মুখ্য লক্ষ্য নয়। সে রস জাতির শরীরে কি ক্রিয়া করবে সেটা'ও তাঁর দেখা দরকার। অসংযত পশু-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে আজ পর্য্যন্ত কারুকে বড় হ'তে দেখা যায় নি। সংযমই মানুষকে বড় করে। মানুষ তার পশু-প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেই বড় হয়। তাকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়। প্রকৃতির এই নিয়ম। কিন্তু একথা কয়জন বোঝে?

সাহিত্যিক যদি সাহিত্যকে জীবিকা বলে গ্রহণ করেন তবে তাঁর মনে জনরঞ্জনের ইচ্ছাটাই প্রবল হ'বে। যিনি সৌখীন সাহিত্য-চর্চ্চা করেন তাঁরও এ আকাঙ্ক্ষা হ'তে পারে। কিন্তু জন-রঞ্জনের খাতিরে তিনি যদি তাঁর উচ্চাসন থেকে নেমে দাঁড়ান, কিংবা পথ দেখাতে গিয়ে তিনি যদি নিজেই পথ-ভ্রষ্ট হ'ন তবে জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়?

বাংলা সাহিত্যে আগেকার আদর্শবাদের যুগ আর নেই। গল্পের নায়ক আগেকার মত রূপে, গুণে, বলে, বিদ্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিখুঁত কাল্পনিক জীব হয়ে পাঠককে দেখা দেন না। পাঠক বইয়ের পাতার মধ্যে পান তাঁরই মত দোষ গুণে জড়িত এক মানুষকে, যাঁর দুঃখ সুখে তিনি ভাগ বসাতে পারেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এক জাতীয় সাহিত্য মানুষের মনের অসামাজিক "পশু"কেই তৃপ্তি দেয়। এ জাতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা সে জন্যে অনেকের কাছে যথেষ্ট 'বাহবা'ও পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি শুধু ব্যর্থ নয়, অকল্যাণকর। সাহিত্যে এদের সত্যিকারের কোনো দাম নেই। এই ধরণের সাহিত্য মানুষকে কোনো শাশ্বত সত্য শেখায় না।

কিন্তু অন্য জাতীয় সাহিত্যে মানুষের যথার্থ পরিচয় দেবারই চেষ্টা করে। সাহিত্যিক মানুষের দোষ গুণের কাহিনীর বর্ণনার ভেতর দিয়ে আসল "মানুষ"টীকে ফুটিয়ে তুলতে চান। তাঁর সৃষ্টি যেমন একদিকে মানুষের পশু ভাবকে উদ্দীপ্ত করে তোলে না, তেমনিই অন্যদিকে মানুষকে হতাশ করে দেয় না, নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় হতে শেখায়।

তিনি বলেন,—

"শুনহ মানুষ ভাই,—
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

অভিজ্ঞতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুশ্রী ধরায় বিশ্রী করে
স্বার্থ এবং অভিজ্ঞতা,
ভাল নীরস জ্ঞানের চেয়ে
অজ্ঞানেরি আলোক লতা।

স্বার্থ এসে শিখায় সবে,
বৃক্ষ চিরে তক্তা হবে
চক্র ভেঙ্গে মিল্‌বে মধু
জরুরি সব অনেক কথা।

মরাল মেরে মিল্‌বে কলম,
ময়ূরবধে মিলবে পাখা
হরিণীর ওই চক্ষু চেয়ে
চর্ম্মেরি দাম অনেক টাকা।

অমন শিরীষ ফুলের বাসে
এ ধরণীর কি যায় আসে,
প্রকাণ্ড ওর কাণ্ড কেটে
গড়' গরুর গাড়ীর চাকা।

ফুলে ত আর পেট ভরে না
ফুটে থাকুক দিবস নিশি,
শুক লয়ে কি সুখ পাবে রে
তোরা ত আর ন'স্ রে ঋষি।

নয় ত এ যুগ কাদম্বরীর,
জেনো এ যুগ টাকাকড়ির,
শকুন্তলা ফেলে এখন
হাটতলাতে জমাও তিসি।

পিক্ পাপিয়া কাজ কি পুষে
ওরা আবার কি গান গাবে?
হংস পোষো ভোরে উঠে
যা হ'ক তবু ডিম্ব পাবে।

আকাশ পানে চাইছ বৃথা,
রামধনুর নাই সার্থকতা,
ঢেউ গুণো না, মৎস্য ধর—
পরকে দেবে আপনি খাবে।

চিনাও বরং পদ্ম-চাকি
শতদলের কথাই ভোলো,
অর্থ যাতে নাইরে বাপু
কেন তাহার ঢাকনা খোলো?

কাব্যেও চাই অর্থ থাকা,
নইলে বৃথা নইলে ফাঁকা,
ফুলের বাগান উজাড় করে'
খনি হ'তে তাম্র তোলো।

এ সব কথা সত্য দারুণ
যথেষ্ঠ দেয় শিক্ষা এতে,
মানুষ যে চায় মনের খোরাক
কেবল শুধু চায় না খেতে।

হ'লে এ সব কথাই দামী,
থাকতো কেবল মালগুদামই
শোভাময়ী মস্ত ধরা
'পোস্তা' হত একটী রেতে।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকস্মিক বিপদে পড়িয়া আচ্ছন্নভাব কাটাইতে শ্যামের দেরী লাগে নাই—ইহাই তাহার স্বভাবের ও শিক্ষার বিশেষত্ব। রাজু যখন শ্যামকে লইয়া তাহার আশ্রয়স্থানে উপনীত হইল তখন শ্যামের মনের কাঁটা কৌতূহল ছাড়িয়া আমোদের কোঠায় প্রবেশ করিয়াছে, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্' এই রকম ভাব। রাজু একটা বাঁশের মই আনিয়া শ্যামকে সাবধানে উপরের মাচায় উঠিতে বলিল, নিজেও অবিলম্বে তাহার অনুসরণ করিয়া দুইজনে একটি লম্বা ধরণের ঘরে প্রবেশ করিল; মেজেটি সমবিন্যস্ত বাঁশের তৈয়ারী, চারিদিকে অনুরূপ দেওয়াল মাথার উপরও ছাদ বাঁশের, উপরে পাতা দিয়া ছাওয়ান। প্রবেশ-দ্বারের বিপরীত দিকে একটি মোটামুটি রকমের বিছানা, মাদুর সতরঞ্চি আর নীচে পাতা দিয়া কতকটা নরম করা, শ্যাম বুঝিল—সে প্রত্যাশিত তো বটেই পরন্তু ঈপ্সিত অতিথি—রাজু তাহাকে সেইখানে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া তাহারই ধারণার পোষকতা করিল।

শ্যাম শয়ন করিলে রাজু বলিল, "এখনও রাত আছে—ঘুম হবে বোধ হয়—আমি দরজার কাছে শুচ্ছি, কোন ভয় নাই।"

রাজু কোণ হইতে আর কটি মাদুর বাহির করিয়া সেই কথা সেই কাজ—নাসিকাগর্জ্জন এত ঘন আর অল্প সময়ের মধ্যে আরম্ভ হইল যে সন্দেহ হইতে পারে প্রকৃত না কৃত্রিম; কেবল শ্যামের গল্প করিবার ইচ্ছা অনুমান করিয়া তাহা এড়াইবার কৌশল। শ্যাম সেই ঘরের মধ্যে তৃতীয় এক প্রাণীর অস্তিত্বের পরিচয় পাইল, এক কোণ হইতে একটা সহজ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস শব্দ হইতে, কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ক্লান্তি হইয়াছিল—শ্যাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রামগ্ন হইল। কক্ষের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন বক্ষ হইতে তিনটি বিভিন্ন তালে নিঃশ্বাস-ছন্দ চলিয়াছে—বনের মধ্যে নিশা যাত্রার সমাপ্তি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

রাজার পাখীর ডাকে ভোর হইল, প্রভাতের আলো সংবৃত কৌতুক-ছটায় সন্তর্পণে বনরাজ্যে প্রবেশ করিল, প্রভাত সমীরণের চমক ভাঙ্গিতে, স্নিগ্ধ পরশে গাছের পাতার কানে কানে জানাইয়া গেল, অন্ধকার নবাগত দিন রৌদ্র ছায়ার খণ্ড যুদ্ধে বিচিত্র হইবে, আনন্দ কর। হারাধন প্রথম জাগিয়াছে, ঘরের মধ্যে আগন্তুক দেখিয়া সে অবাক; কিছুক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে অবলোকন করিয়া তাহার সাহস সঞ্চার হইলে, একটি ছোট কঞ্চি লইয়া ধীরে শ্যামের নিকটে আগাইয়া তাহাকে এক খোঁচা মারিল ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতাসহকারে স্বস্থানে আসিয়া যেন কত অন্যমনস্ক, এই ভাবে বসিয়া পড়িল। শ্যাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; সুস্থ দেহ ও শুদ্ধ মনের উপর অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গজনিত মোহভাবের প্রভাব অতি অল্প, বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্যাম সহাস্যে বলিল, "তুই আবার কে? বাচ্চা ডাকাত না ডাকাত বাচ্চা?" হারাধন কি বুঝিল আর কি বলিল তাহা সেই জানে, কেবল অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সুপ্ত রাজুকে দেখাইয়া দিল; শ্যাম তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বাবা?"

হারাধন আর থাকিতে পারিল না; রাজুর দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি রাখিয়া সন্তর্পণে শ্যামের অতি নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "বাবা নয়, গয়লা জেঠা—তুমি বাবা।" তাহার পর নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি সহকারে কাঁদিয়া উঠিল, "আমার খিদে পেয়েছে—।"

নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে অন্যদিন আহার্য্য হাজির থাকে, আজ তাহার ব্যতিক্রমে এই বিদ্রোহ। রাজুর নিদ্রাভঙ্গ হইতে বালক আবার চুপ করিল।

শ্যাম বলিল, "ওর খিদে পেয়েছে।"

রাজু—"জ্বালাতন কর্চ্ছিল বুঝি? চল নীচে চল, খেতে দেব।"

রাজু মই দিয়া নীচে নামিয়া গেল, হারাধন এক হাস্য-কর ভঙ্গীতে বিনা সাহায্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিল, শ্যামও অনুসরণ করিল।—

অবতরণকালে শ্যাম লক্ষ্য করিল, তাহাদের শয়ন-কক্ষ যেটি, সেইটি তেতলা, দ্বিতলের ঘরখানি ভাণ্ডার বিশেষ, বিবিধ দ্রব্য ও তৈজসে পূর্ণ; সর্ব্ব নিম্নতলে রান্নাঘর; সমস্তটি এক অতিকায় অশ্বত্থের আশ্রয়ে, তাহার সমান্তরাল দুইটী মোটা ডালের মাঝামাঝি উঠিয়াছে—ঝড়ঝাপটা বৃষ্টি হইতে নিরাপদ; বহিঃসৌষ্ঠবে নির্ম্মাতার প্রতি প্রশংসা আকর্ষণ করে। রাজুর সঙ্গে শ্যাম; কিঞ্চিদগ্রে হারাধন, দুই মিনিটের পথ, তাহারা নদীতীরে উপস্থিত হইল, বর্ষার ছোট নদীটি স্ফীতবক্ষ, কতকগুলি বড় গাছের গুঁড়ি ঘাটের অভাব পূরণ করিয়াছে; সেথানকার দৃশ্য মনের মধ্যে ধীরে ডুবিয়া যায়; ভরানদীর সঙ্গীত যেন বনবালার নিভৃতে স্বগত বিরল কথাটির মতন; প্রাণ অপ্রত্যক্ষ, ভ্রুক্ষেপহীন, অচপল, কিন্তু চাঞ্চল্যের সম্ভাবনায় সদা ওতঃপ্রোতভাবে ভরপুর, অথচ সুন্দর, সৌম্য অথচ কৌতুকদীপ্ত, রহস্যময় অথচ প্রচাররত নিবিড় ঐক্যে কেবল ব্যঞ্জনা।

রাজু বলিল, "একেবারে চান করে নেওয়া যাক্।"

শ্যাম বলিল—"মন্দ নয় কিন্তু ধরে আনবার আগে আমায় খবর দিলে, কাপড় চোপড় সব ঠিক করে আনতাম; এখন?" রাজু হাসিয়া উঠিল, তাহার পর অপ্রস্তুত ভাব দমন করিতে ছুটিয়া একটি নূতন কাপড় আনিয়া দিল—শাড়ী।

শ্যাম "খুব হবে" বলিয়া হাত বাড়াইয়া শাড়াখানি গ্রহণ করিল—চওড়া লাল পাড়, চন্দ্রকোণার, তাহাতে কাঁচা হলুদের গন্ধ; শ্যাম কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু রাজু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইতে বুঝিল এইখানে কোনও গোপন ব্যথা আছে—বক্তব্য মুখের মধ্যেই রহিয়া গেল। তাহার পর এই ভারি হাওয়াকে চাপা দিয়া সাঁতার কাটা আরম্ভ হইল। শ্যাম সাঁতারে অনভিজ্ঞ, সে বিস্মিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, মানুষের ক্ষমতা ও জন্ম-গৌরবের মধ্যে কতটা সবল সৌন্দর্য্য আছে—আপন মনে, দৈহিক স্ফূর্ত্তির জন্য কেবল দর্শক সম্বন্ধে ভ্রুক্ষেপহীন রাজু ছোট নদীর বক্ষ তোলপাড় করিয়া তবে উঠিল; মানুষ বলিতে যে গর্ব্ব তাহা আজ শ্যাম জানিয়াছে।

স্নানাদি শেষ করিয়া তাহারা কুটিরে ফিরিয়াছে, হারাধন পাকা আমের আঁটি চুষিতেছিল। স্নানের পূর্ব্বেই তাহার আহারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এইবারে রাজু তাহাকে রান্নাঘরের দিকে হইতে বাসি ভাত খাইতে দিল; তাহার পর গৃহস্থালীর কর্ম্ম, বাসন-ধোয়া, জল-আনা, আশে পাশের স্থান ঝাঁট দেওয়া, চৌদ্দবার উপর নীচ করা।

শ্যাম একটা নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। কেবল সন্ধান পাওয়া নহে, তাহার মাধুর্য্যে বিভোর; চঞ্চল নিপুণ হস্তের সেবার উদ্যমে একটা নিবিড়তা, মানব-সংসারের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে ভাবের আবেশময় বন্ধনের ব্যক্তিগত না হইলেও নিগূঢ় পরিচয়। শ্যাম অনভিজ্ঞ না হইলে লক্ষ্য করিত রাজুর এই কার্য্যের মধ্যে পুরুষোচিত ভ্রান্তি ও অশোভনতা কিঞ্চিন্মাত্র ছিল না; শ্যাম অজ্ঞ না হইলে বুঝিত রাজুর মধ্যে এই সময় আর একজনের অস্তিত্ব জাগিয়া উঠে—সে পুরুষ নহে।

সূর্য্যের সমান্তরাল কিরণ তখন বড় বড় গাছের গুঁড়িকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছে; উপরে অশ্বত্থের পাতায় পাতায় বাহার, কাঁচা সোণার চোখ-টাটান রং, আবার টাট্‌কা প্রাণের মতন রক্ত ঢালা। পাখী, কত রকমের, কত বর্ণের, অন্তরের আধ জানা কথার মত কেহ, কেহ বেদনার মতন, কেহ আশীর্ব্বাদের মতন আর কোনটা বা ধ্রুব সত্যের ন্যায়। এই নিজেদের লইয়া বিভোর স্বর্গের অর্দ্ধ পথের বাসিন্দা জীবগুলিকে দেখিয়া দেখিয়া, রাজুকে তাহাদের বিষয় প্রশ্ন করিয়া শ্যামের ক্লান্তি নাই, রাজুরও এবিষয়ে উৎসাহ অল্প নহে; এমনি ভাবে কিছুক্ষণ অতি-বাহিত হইলে রাজু বৃক্ষতলে একটি চাটাই পাতিয়া যখন শ্যামকে জলযোগের জন্য আহ্বান করিল—তখন তাহার হাবভাব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার মালিকের অনুকরণীয়। জলযোগের ব্যবস্থা—কয়েকটী আম, একটি বেল, একটি কাঁঠাল ও একটি পাত্রে কতকটা ছোলা ভিজান।

শ্যাম বলিল, "এত কি হবে?"

রাজু—আমরা প্রসাদ পাব এখন; তারপর রান্না আজ আপনাকে কর্ত্তে হবে; অভ্যাস তো নেই কখনও, কত বেলায় যে আবার খাওয়া হবে তার ঠিক কি। আমি সব গোছ করে দেখিয়ে দেব।

এই বলিয়া রাজু হাসিতে লাগিল। পাখীর কথায় তাহার হৃদয় অনেকটা লঘু হইয়াছে, এই নূতন সঙ্গীর সহিত একটা যোগও স্থাপিত হইয়াছে।

শ্যাম হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রাণে মারবে কিন্তু হাতে মারবে না দেখছি, আমায় তুমি চেন ?"

রাজু—না চিনলে আর আনলাম কি করে ?

শ্যাম—তোমার মতলব কিছু বুঝলাম না। তুমি কি চাও ?

রাজু—তা আমি জানি না, বলবই বা কেন ? তবে এখন এইখানেই থাকতে হবে, পালাবার চেষ্টা কল্লে বিপদ, এ বনে পথ নেই, বাঘ আছে, বুনো শুয়োরের ভারী উপদ্রব।

শ্যাম—আর প্রহরী ভদ্র হলেও সতর্ক। তুমি কি রকমের ডাকাত হে ? গোঁফ নেই, গালপাট্টা নেই, হাঁক-ডাক নেই, সর্দ্দারের দল বলই বা কোথায় ?" রাজু মাথা চুলকাইতে ও হাসিতে লাগিল ; তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্যাম আবার বলিতে লাগিল, "তবে কি তুমি তান্ত্রিক সাধক ? না, তারই বা লক্ষণ কোথায় ! তেমন বড জটা কই ? ওইটুকু ঝাঁকড়া চুলে হয় না ; রক্ত চন্দন, চেলী কালী মন্দির ? অন্ততঃ ভাঙ্গা-চোরা ধরণেরও ? কিছু নেই। আর কারণ বারি, অভাবেকল্পে ? কিছু নেই তোমার, তুমি টাকা চাও ?"

রাজু জোরে বলিয়া উঠিল, না, তারপর একটু সামলাইয়া কথা উল্টাইয়া বলিল, হঁ্যা।

শ্যাম—তোমায় দেখে ভয় মোটে হচ্ছে না ; যত দেখছি তত হাসি পাচ্ছে। অত বড় ধড়টা কিন্তু মুখটা যে ছোট ছেলের মতন ; তুমি কে ?

রাজু--আজ্ঞে আমি মূর্খ লোক অত বুঝি না, কেন জিজ্ঞেস কচ্ছেন, আমি বলব না।

শ্যাম—তুমি কে তা বলবে না ; আচ্ছা অন্য কথা বলবে ?

রাজু—হঁ্যা

শ্যাম—এটি কি তোমার ছেলে ?

রাজু—হঁ্যা

শ্যাম—তোমরা কয় ভাই ?

রাজু—দুই ভাই।

শ্যাম—ছোটটির বিয়ে হয়েছে ?

রাজু—না

সংসারের আর কে কে আছে ইত্যাদি প্রশ্নের পর দ্রুত প্রশ্নে রাজু ভাবিয়া চিন্তিয়া ঢোক গিলিয়া উত্তর দিয়া গেল।

শেষ প্রশ্ন হইল, "আচ্ছা তুমি আমার কাছ থেকে টাকা আদায় কবে কেমন করে ? আমার কাছে কি টাকা আছে মনে করে ছিলে ? এত বোকা তুমি নও। আমার হয়ে কে টাকা দেবে ? আর তুমি আদায়ই বা কি উপায়ে করবে ? কত টাকা আঁচ করেছ শুনি !"

রাজু—টাকা বড় কর্ত্তা দেবে—আর কেমন করে কি বৃত্তান্ত সে আমি বুঝব, যখন ছাড়বার তখন ছেড়ে দেব।"

শ্যাম—দেখ, তুমি জাতে গয়লা, তোমার বাড়ী শ্রীনগর, ওছেলে তোমার নয়, কেমন ?

রাজু মনে বুঝিয়াছে যে তাহাকে লইয়া এই ব্যক্তি রঙ্গ করিতেছে আর ইহার নিকট সে সামান্য খেলনার মতন। কথা কহিলে সব ফাঁসিয়া যাইবে সেই জন্য সে শুম হইয়া গেল। কেবল এই রঙ্গ কৌতুকের পশ্চাতে একটা আঘাত করিবার অনিচ্ছা ও সবল সহৃদয়তার আস্বাদ সে পাইছিল বলিয়াই তাহার রাগ হইল না। তবে একটা অকারণ আশঙ্কা তাহাকে সতর্ক ও বিচলিত করিয়া রাখিল।

দিন বসিয়া থাকে না, রন্ধন ভোজন শেষ হইল ; শ্যাম রাজুর প্রত্যেক কার্য্যকলাপ মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া সেই ভিত্তির উপর কল্পনার সাহায্যে তাহার ইতিহাস তাহার উদ্দেশ্য কি জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাবে একটা রচনাও মনঃপূত নহে ; শ্যাম ভাবিতেছে 'যদি ওই টাকাটার ভাবনা না থাকিত তাহা হইলে দীর্ঘকাল এই বনবাস মন্দ হইত না ; আর এই লোক-টার ভিতরও কি একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, ইহার স্বভা-বের ও অবস্থার বিশেষত্বই বোধ হয় তাহার কারণ ; যতটা দেখিতেছি কোনও ঘৃণিত বা নিষ্ঠুর এমন কি আকস্মিক উত্তেজনা-প্রবৃত্ত কোন পাপ কাজের নায়ক বলিয়া তাহাকে মনে ধরিতেছে না, অথচ লোকটা যে অনুচর মাত্র তাহা তাহার ব্যবস্থায়ই মিথ্যা মনে হয়, স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রভাব বড়

স্পষ্ট কিন্তু এ-ব্যক্তি কোন্ চক্রে পড়িয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; সামান্য একটু বাহাদুরীর লোভে ইহাকে সচেতন করিয়া ভুল করিয়াছি—এখন বড় সাবধানে অতি অল্প কথাই কহিবে।

দ্বিপ্রহরে গভীর অরণ্যে একটা থমকান ভাব, এইরূপ চিন্তায় শ্যাম ব্যতিব্যস্ত, অবশেষে সিদ্ধান্তর পশ্চাদ্ধাবন বৃথা বুঝিয়া সে হাল ছাড়িয়া দিল, চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া এক্ষেত্রে কোন ফল নাই।

সন্ধ্যাবেলায়, বৃক্ষ-পল্লবের মধ্যে একবার উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া চাঁদ যখন অদৃশ্য হইল তখন তাহারা পূর্ব্বরাত্রের স্ব স্ব শয্যায় আসীন। বনদেশে আহার নিদ্রার সময় কৃত্রিম আলোকের অপেক্ষা রাখে না, দিনমণিই নিরূপণ করিয়া থাকেন। শ্যাম কোন কথা কহিল না, রাজুও চুপ করিয়া আছে। দ্বিতীয় দিনও পূর্ব্বদিনের মতই কাটিয়া গেল, কেবল শ্যামের পক্ষ হইতে হারাধনের সহিত ঘনিষ্টতা জমাইবার ক্ষীণ চেষ্টার ব্যর্থতা এই দিনের বাহুল্যভাগ।

বনের মধ্যে সূর্য্যপ্রভার নিবিড় শান্তি, চন্দ্রালোকের উৎকট মত্ততা। বড় বড় অতিমানব জীবের সদৃশ গাছগুলি নিজের ছায়ার সঙ্গে কোন্ গুপ্তরহস্য লইয়া তন্ময় চিত্তে মীমাংসা করিতেছে। শীর্ষে পল্লবগুলির কেমন চলচল ভাব। দিন কাটিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিশ্রমে, দীর্ঘ শূন্য আলস্যে, রাত্রিতে কুনিদ্রা, দূরে নিকটে নানাবিধ অর্থপূর্ণ, দুর্ব্বোধ্য শব্দ, চীৎকার, আর দিবা রাত্রি ব্যাপিয়া অশান্ত চিন্তার তাড়না; শ্রীনগর লইয়া উৎকণ্ঠা। শ্যাম দেখে, রাজু বাঁশ কাটিয়া আনে, নানারূপ সম্ভব অসম্ভব বস্তুনির্ম্মাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, মাঝে মাঝে কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ কিছুকালের জন্য একদিকে চলিয়া যায়, সে গমনে গতি ছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্য মনে হয় না, আবার অবিলম্বে এক নূতন দিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ছুটিয়া আসে। অতি অল্প প্রশ্নেরই উত্তর দেয়, তাহাও অতি সংক্ষেপে।

মাছ ধরিতে রাজুর সঙ্গে গিয়া একদিন শ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় ছেড়ে দেবে ?"

রাজু বলিল "না।" রাজু নিরুত্তর।

তাহার পরের দিন সকালে, বিনিদ্র রজনীর স্থির সংকল্প মুখে চোখে, শ্যাম রাজুকে বলিল, "আমি চল্লাম"।

রাজু—"কোথায়—?"

শ্যাম—"শ্রীনগরে—তুমি পথ বলে দাও ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই, কিছু দেরী হবে এই যা, নদী ধরে যাব।"

রাজুর মুখে জিদের রেখা ফুটিয়া উঠিল, শ্যামের মুখে পূর্ব্ব হইতেই সেই গুলি জীবন্ত।

শ্যাম বলিল—"তুমি জোর করে আটকাবে ? আমিও যতটা পারব, জোর কর্ব্ব, না পারি, এক মিনিটের জন্যে চেষ্টা বন্ধ কর্ব্ব না, মরলেও ক্ষতি নাই; রাখতে চাও তা' হ'লে মেরে ফেলে রাখতে হবে, জ্যান্ত নয়।"

রাজু সম্মুখে আসিয়া প্রতিরোধ করিল, শ্যাম তাহাকে পাশ কাটাইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। রাজু তখন দৌড়িয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া লাঠি উদ্যত করিল। শ্যাম একটু হাসিয়া অন্য কোনও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া এক-ভাবে আগাইয়া গেল; রাজুর লাঠি একপাক্ ঘুরিয়া, শ্যামের অঙ্গস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে শিথিল, মুষ্টিচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এইবার রাজু অনুরোধ, অনুনয় আরম্ভ করিয়াছে, পথের ভয় বুঝাইয়া বিরত হইতে জোড়হাতে ভিক্ষা করিতেছে। শ্যামের দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ সহাস্য, সে কেবল দুই কর তলে অবৃত করিয়া রাজুকে বুঝাইল, তাহার সকল চেষ্টা বৃথা—শ্যাম যাইবেই।—রাজু শ্যামের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে—তাহার শক্তি সামর্থ্য যেন কে কাড়িয়া তাহাকে আকুল করিয়াছে; তাহার ভাবিবারও ক্ষমতা কখন অপহৃত। শ্যামের পরণে মালতীর সেই বিবাহের শাড়ীখানি—রাজুর চোখে সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসিল। "তবে চলুন আমি পথ দেখিয়ে দিই।" বলিয়া রাজু শ্যামকে অনুগমন করিল। তাহার ঊর্দ্ধদৃষ্টি কি তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে না কাহাকে অনুযোগ করিতেছে—তাহা বুঝা গেল না।

(ক্রমশঃ)

কেয়াফুল

(বিশ বৎসর পরে)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আবার সেই শ্রাবণরাত, আবার সেই কেয়া!
আবার সেই মাথার পরে গরজি' মরে দেয়া;
কাঁপিয়া উঠে কাননতল,
ছাপিয়া ছুটে নদীর জল,
ছাপিয়া উঠে পরাণমন অকূলে খুঁজি' খেয়া—
আবার সেই কেয়া!

শরৎ আসে শরৎ যায় শেফালিফুলবনে,
কমল-সরে শিশির মরে—জানি না, কোন্ ক্ষণে;
পলাশ চলে মলয়-রথে,
বকুল ঝরে নিদাঘপথে—
না পেয়ে সাড়া কোথায় তারা হারায় অযতনে!

সকল দ্বার বন্ধ করি' রুধিয়া বাতায়ন,
হৃদয় জানে, পাষাণে তারে বেঁধেছি কি কারণ!
উপায়হীন ঝড়ের পাখী
কুলায়তলে মাথাটি রাখি'
যেমন করে' পাখার স্মৃতি ভুলিতে সযতন!

পঞ্চশর মূর্চ্ছাগত পঞ্চাশের পারে,
প্রীতির কথা জাগায় শুধু স্মৃতির বেদনারে;
কুসুম গেছে রাখিয়া বাস,
কারণহারা দীর্ঘ-শ্বাস
আপনা হ'তে উঠিয়া শুধু মিশায় চারিধারে!

শ্রাবণরাতে বাতাস মাতে, অঝোরে ঝরে জল,
বিদ্যুতের দীপ্ত কষা দেখায় রসাতল;
বেসুরা এই মনের মাঝে
বেতাল-তালে মাদল বাজে,
তাহারি ফাঁকে আবার হাঁকে কেতকী-পরিমল!

সকল বাস সহিতে পারি, পারি না কেতকীরে,—
হেলায় সে যে ভুলায়ে দেয় ধুলার ধরণীরে!
নিমেষে কোন্ অজানা টানে
হারাণো মুখ ফিরায়ে আনে—
সাঁঝের মেঘে ভোরের তারা ফুটায়ে তুলে ধীরে!

চন্দ্রমার নাহিক বার, বন্ধ আজি খেয়া,
সময় বুঝে উপরে নীচে দ্বিগুণ ঝরে দেয়া!
শিহরি' উঠে কাননতল,
শিহরি' ছুটে নদীর জল,
পুরাণো সুরে শিয়রে ফিরে' হাঁকিল কে রে কেয়া?

কণ্ঠে আর সে জোর নাই—চিনিনু তবু স্বর,
জীবনভোর বাদলে বুঝি ভেঙেছে কলেবর।
বৃষ্টিভেজা ওষ্ঠপুটে
করুণ হয়ে ধ্বনিটি ফুটে—
পিছল পথে চলিতে কাঁপে চরণ থরথর!

আজি এ রাতে বাদলে বাতে যেয়োনা তুমি আর,
কে চাহে ফুল? সকল ঘরে বন্ধ দেখ দ্বার;
সৌরভেরও সময় আছে,
আদর মিলে সবার কাছে,—
সময় গেলে ফুলের হাসি—সেও যে গুরুভার।

অসময়ের সময় শুধু আমারি আছে জাগি',
হৃদয় যার কাঁপেনা আর ভাবনা ভয় লাগি';
শ্রাবণরাতে কেয়ার বাসে
আজিকে যদি মরণ আসে,
শরণ তবু তাহারি পাশে মাগিবে অনুরাগী!

কবি গোবিন্দদাস

শ্রীকালিদাস রায়

বাংলাদেশের যে কবির শিক্ষাদীক্ষার গৌরব ছিল না,—পদমর্য্যাদা ছিল না,—দেশব্যাপী খ্যাতি ছিল না,—অন্নাভাবে যাহাকে আর্ত্তনাদ করিয়া পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে—মৃত্যুর পর সেই কবিরা 'চিতায় মঠ দেওয়া' দূরে থাকুক, তাহার আবার কেহ জীবনী লিখিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাই শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রচিত গোবিন্দদাসের জীবনীখানি পড়িয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম।

দেশের অন্যান্য কবির তুলনায় কিন্তু এই কবিটিরই জীবনীর অধিকতর সার্থকতা আছে। জীবন দশাবিপর্যায়ে বিচিত্র ঘটনাকীর্ণ ও প্রাণস্পর্শী না হইলে—জীবনী অপূর্ব্ব হইয়া উঠে না। এই হিসাবে গোবিন্দদাসের জীবন জীবনী-রচনার পক্ষে বড়ই উপযোগী। কোন সাহিত্যিক এই দীনহীন কবির জীবনের খুটিনাটির খোঁজ রাখিবেন, ইহা প্রত্যাশা করি নাই—বাংলা দেশে দেখিতেছি এখনও দুই একজন প্রকৃত দরদী লোক মিলে।

গোবিন্দদাসের জীবনচরিত রচনায় বেশ অসুবিধা ও বিঘ্ন বিপত্তি ছিল। কবির জীবন আরো কয়টি জীবনের সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সেই জীবনগুলির সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য কথা না বলিলে কবির জীবনচরিতরচনা সম্পূর্ণতা লাভ করে না।- কেবল অপ্রিয় সত্য কথা মাত্র নহে—সেজন্য রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইবারও সম্ভাবনা ছিল। হেমবাবু এই জীবনচরিতরচনায় যে সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। কবি যে সকল ক্রূর-প্রকৃতি ব্যক্তির শাসনে ও অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছিলেন—তাহাদের সম্বন্ধে রূঢ় সত্য কথা বলিতে লেখক কোথাও কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

চরিত্র

কবির নিজের চরিত্রটি রীতিমত জটিলই ছিল। কবি যে চিরজীবন দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাহার মূল হেতু কবির নিজের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। এজন্য তিনি নিজে যত দায়ী, অন্য কেহই তত দায়ী নহেন।

কবির চরিত্রে অতিরিক্ত তেজস্বিতাই তাঁহার দারিদ্র্যের একটি কারণ। যাঁহাকে চাকরী করিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিতে হইবে, তাঁহার তেজস্বিতা ঐহিক উন্নতির পক্ষে রীতিমত প্রতিকূল। দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়া কবি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বিদ্যা অর্জ্জন করেন নাই,—সহায় সম্বল বা সঙ্গতিপন্ন আত্মীয় বন্ধু ভ্রাতা,—তাঁহার কেহই ছিল না—অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে চাতুর্য্য বা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহাও কবির অধিগত ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে চরিত্রে উদ্ধত তেজস্বিতা থাকিলে দারিদ্র্য যে অবশ্যম্ভাবী। অথচ কবি তেজস্বিতার সহিত দারিদ্র্যকে বরণ বা বহন করিতে পারেন নাই। দারিদ্র্য সহনে তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা কোথা?—দারিদ্র্যের পীড়নে কবি যে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন, তাহার কারণ কবির অতিরিক্ত পারিবারিক প্রীতি ও সন্তানবাৎসল্য। নিজ দরিদ্র্য-জীবনবহন তাঁহার পক্ষে তত কঠিন ছিল না—কিন্তু তিনি পত্নী ও সন্তানগণের বেদনা দেখিতে পারিতেন না—তাহাদের কষ্টই তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিত। আত্মহারা পত্নীপ্রেম তাঁহাকে বড়ই দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল—আর্থিক উন্নতির পথে তাহাও একটা মস্ত বাধা। এই পত্নী-প্রীতিই তাঁহাকে অতিরিক্ত গৃহানুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে পরিমাণ পৌরুষ-সবলতা থাকিলে মানুষ দুঃখ বিপদ অতিক্রম করিয়া আপনার অদৃষ্ট আপনি গড়িতে পারে—সে পৌরুষ-সবলতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তাহার উপর অতিমাত্র ভাবপ্রবণতা বা ভাবাকুলতা। এই ভাবাকুলতা তাঁহার চরিত্রের শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া শিথিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ভাবাকুলতাই তাঁহাকে অব্যবহিতচিত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। জীবনসংগ্রামে কবিকে শূর বলিতে পারি না।

অতিরিক্ত ভাবাকুলতা সময় সময় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য এমনি নষ্ট করিয়া ফেলিত যে তিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনের সময় অন্যমনস্ক হইয়া প[illegible]—দায়িত্বজ্ঞান হারাইতেন।

কবি ভাববিলাসে যতটা আনন্দ পাইতেন, জীবিকার জন্য শ্রমসাধ্য কার্য্যে ততটা আনন্দ পাইতেন না।

ইহা ছাড়া কবির চরিত্রে তিতিক্ষা ও ক্ষমাশীলতারও অভাব ছিল—বরং প্রতিবিধিৎসার প্রবৃত্তিই মর্ম্মকুহর হইতে ফণা তুলিয়া উঠিত। এজন্য কবিকে দোষ দিতে পারি না। কবি দেবতা ছিলেন না, মানুষই ছিলেন। তাঁহার উপর যে নিদারুণ অত্যাচার হইয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে ঐ প্রত্যাঘাতের প্রবৃত্তিকে ক্ষমা করিতেই বাধ্য হই।

কবির উপর যে সকল উৎপীড়ন হইয়াছে তাহা পুঞ্জীভূত হইয়া সহ্যাদ্রিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। কবি আততায়ীর কলঙ্ককে লেখনীর বলে দেশময় করিয়া দিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে নিজেরও কম ক্ষতি হয় নাই। ইহাও তাঁহার দারিদ্র্যের একটি কারণ।

গোবিন্দদাস নিজে বলিয়াছিলেন—"আমি ধনু রাশিতে জন্মিয়াছি। চির জীবন আমাকে ধনুক ধরিয়াই কাটাইতে হইল। জীবনে একদিনের জন্য বিগ্রহের শান্তি হইল না।" সত্যই এই কবি চিরদিন দুঃখভোগ করিতেই জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাকে সুখী করিবার কোন উপায়ই ছিল না। তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ হয়ত দূর করা চলিত, কিন্তু কেবল দারিদ্র্যের জন্যই তিনি কষ্ট পান নাই। ভ্রাতা, পত্নী, ৫।৬টি সন্তানের নিদারুণ বিয়োগব্যথা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। শোক অনেককেই সহিতে হয়, কিন্তু গোবিন্দদাসের চিত্তের গঠন এমনি সুকুমার ছিল যে ঐ সকল শোকে তিনি যতটা মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন অন্যে ততটা মুহ্যমান হয় না। লোকে শোক যেমন পায়—তেমনি তাহাদের সান্ত্বনাও জুটে। নিঃস্ব গোবিন্দদাসের সাংসারিক সান্ত্বনার উপায়ও ছিল না। এই শোক তাঁহার সমস্ত কর্ম্মবল হরণ করিয়া লইয়াছিল।

প্রিয়জনবিরহে গোবিন্দদাস যে বেদনা অনুভব করিতেন তাহাও মাত্রাতীত। মুহুর্ম্মুহুঃ রোগের আক্রমণও তাঁহাকে হতবল করিয়া তুলিত।

কবি অভিমানী কম ছিলেন না। আত্মাভিমানে আঘাত লাগিলেও তিনি দুর্ব্বিষহ বেদনা পাইতেন। কবি একমাত্র জমিদারী কাজকর্ম্ম শিখিয়াছিলেন। জমিদারের কর্ম্মচারীর জীবন কখনো নির্ব্বিঘ্ন ও বিপন্মুক্ত হয় না। এই কাজেও তাঁহাকে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। জমিদারের আমলার কাজ করিতে হইলে যে সকল দোষ বা গুণের প্রয়োজন—কবির চরিত্রে তাহার কোনটিই ছিল না। কাজেই তাঁহার চাকুরী বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছিল।

লাঞ্ছিত জীবন

তারপর প্রবলের নির্য্যাতন—অকথ্য নির্য্যাতন। জীবনী-লেখক বলেন—তিনি যে সকল নির্য্যাতনের উল্লেখ করিলেন, তাহা ছাড়াও এমন নির্য্যাতনও আছে যাহা প্রকাশ পায় নাই বা প্রকাশ করা যায় না। একটি নিঃস্ব কবিকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য প্রবলের কি প্রবল প্রযত্ন, কি বিশাল ষড়যন্ত্র, কি নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম! কবির ঘরবাড়ী জোতজমি বাজেয়াপ্ত। জন্মভূমি হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসন। এই নির্ব্বাসন খুব বড় দণ্ড হইত না,—যদি গোবিন্দদাসের অন্যত্র দাঁড়াইবার ঠাঁই থাকিত, অথবা আত্মীয় বন্ধু সহায় সম্বল থাকিত। কবির জন্মভূমিতে বাস আর কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস একই কথা। তবু জন্মভূমিকে কবি এতই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন যে নির্ব্বাসনদণ্ড তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের মত নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ব্বাসিত হইলেও কবি অব্যাহতি পান নাই। তিনি যাহাতে কোথাও আশ্রয় বা সাহায্য না পান তাহার জন্যও আততায়ীরা চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। একাধিকবার কবি গুপ্তহন্তার আক্রমণ হইতে রক্ষা পান। গুপ্তহন্তার ভয়ে কবির বহুদিন ধরিয়া স্বস্তি শান্তি ছিল না। রাত্রিতে সুনিদ্রা ছিল না—প্রাণ হাতে করিয়া পথে ঘাটে বাহির হইতে হইত। কবির জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই—মানুষের জীবনে যত প্রকার দুঃখের সম্ভাবনা প্রায় সবগুলিই এই দরিদ্র কবির চারি পার্শ্বে ঘিরিয়া ছিল। এমন হতভাগ্য মানুষকে কে সুখী করিতে পারে?

সাহায্য ও সহানুভূতি

আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে কবিপীড়ন নূতন নহে। চণ্ডীদাস লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, প্রতিবেশী ও সমাজনেতাদের দ্বারা। তিনি বাশুলী দেবীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে ভিটে মাটি হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। কিন্তু

আশ্রয় পাইয়াছিলেন—মল্লভূমির রাজসভায়। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানরাজসরকারে লাঞ্ছিত হইয়া কৃষ্ণনগরের রাজসংসারে ঠাঁই পাইয়াছিলেন।

আমাদের গোবিন্দদাসও কোথাও আশ্রয় পান নাই তাহা নহে। তবে তাঁহার দারিদ্র্য কোন দিন ঘুচে না, ঘুচিতে পারেও না। কোন একজন বদান্য ধনী ব্যক্তি যদি চিরদিনের জন্য তাঁহার সমস্ত ভার লইতে পারিতেন অর্থাৎ নিজে জীবিত থাকিয়া কবিকে আমরণ মাসিক বৃত্তি দিতে পারিতেন, তবেই গোবিন্দদাসের দারিদ্র্য ঘুচিতে পারিত। এককালীন দানে, সাময়িক সাহায্যে বা সামান্য মাসিক বৃত্তিতে কবির চিরজীবনের দারিদ্র্য কিরূপে ঘুচিবে? এ যুগে কবিপ্রতিপালনের প্রথা নাই—গোবিন্দদাসের ভাগ্যে সভাকবিত্বও জোটে নাই। দেশে কবিতার পুস্তকের এমন আদর নাই—যে পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থে কবির সংসার চলিয়া যাইবে। দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ও কোনো ভাবে প্রতিপালনের সুযোগ পায় নাই বা চেষ্টা করে নাই।

এ যুগে কোন সাহিত্যিককে সাহায্য করিতে হইলে হিতৈষী ব্যক্তিগণ তাঁহার এমন কোন কাজকর্ম্ম জুটাইয়া দেন, যাহাতে প্রকারান্তরে কবিপ্রতিপালন হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের দুই একজন কবিকে তাঁহাদের হিতৈষী বন্ধুজন উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ঐ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। গোবিন্দদাসের হিতৈষিগণ কয়েকবার তাঁহার চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন। ২।৩ জন সহৃদয় জমিদার আপনাদের জমিদারীতে তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন—কিন্তু চাকরী তাঁহার ধাতে সয় নাই।

কবির বিদ্যা-বুদ্ধি এমন কিছু ছিল না, যাহাতে তাঁহার উচ্চপদলাভ হইতে পারে। স্বল্প বেতনের চাকরীতে তাঁহার বৃহৎ সংসার কিরূপেই বা চলিবে? জমিদারি কাজে যে উপরি পাওনা আছে—তেজস্বী কবির তাহাতে একেবারেই লোভ ছিল না। ভাল চাকরী জুটাইয়া তাঁহার উপকার করার উপায় ছিল না। কবি প্রথম যৌবনে কিছুদিন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যদি ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দারিদ্র্য হয়ত ঘুচিত। দাসত্বে তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে না।

দেশের ভূস্বামিগণ কৃপাবশে তাঁহাকে সাহায্য কম করেন নাই। জীবনীলেখক সাহায্যের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা নিতান্ত হ্রস্ব নয়। বাংলাদেশের কাছে ইহার বেশী প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু গোবিন্দদাসের অভাব ছিল সমুদ্রবৎ, সকল সাহায্যই 'সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য' হইয়া গিয়াছে।

কবির কাব্যপাঠে এবং তাঁহার অপ্রকাশিত পত্রগুলি পাঠে মনে হয়—দেশের সাধারণ লোকের কাছে কবিহিসাবে গোবিন্দদাসের দাবি ছিল অনেক। সে দাবি মিটে নাই বলিয়া তাঁহার অভিমানও নানা রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। হায় অভিমানী কবি! তোমার জন্মভূমি যে বঙ্গদেশ, ইহা কেন ভুলিয়াছিলে? এদেশে কবি জন্মে অনেক, কিন্তু কবিতার রসজ্ঞ দরদী লোক এদেশে অল্পই জন্মে। হায় কবি! তুমি ভাবিতে পার নাই—কতদূর cultured হইলে তবে একটি দেশ কবির যথার্থ আদর করিতে জানে। বঙ্গদেশে সে culture কোথা? আজও সে culture জন্মে নাই। কবে জন্মিবে জানি না। তোমাকে যাহারা সাহায্য করিয়াছে—তাহারা তোমাকে দরিদ্র ভদ্রলোক বলিয়াই ভিক্ষা দিয়াছে, তোমার কাব্যের আদর করে নাই। সেইদিন বুঝিব—কবির কাব্যের যথার্থ আদর হইতেছে, যেদিন কবির আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে—কবিকে বাউল সাজিয়া দুয়ার দুয়ার ভিক্ষা করিতে হইবে না,—ধনী ব্যক্তির স্তবগান করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে না। সেদিন বুঝিব—কবির কাব্যের যথার্থ আদর হইতেছে,—যে দিন কাব্যগ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থেই কবির সসম্মানে সংসারযাত্রা চলিয়া যাইবে।

কাব্যের আদর

বঙ্গদেশ কেবল গোবিন্দদাসের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে নাই, তাহা নয়, কাব্যেরও সম্যক আদর করে নাই। গোবিন্দদাসের কবিতার যে প্রকৃতি তাহাতে বাঙ্গালী পাঠকের মনে হইয়াছে—গোবিন্দদাস বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধির জন্য কাব্য রচনা করেন নাই। নিজের

জীবনের কাহিনী কবিতাতে শুনাইয়াছেন মাত্র, তাহাতে বিশ্বজনীনতার ব্যঞ্জনার অভাব। রবীন্দ্রনাথের যুগে তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া বলার দরকার। রবীন্দ্রনাথের যুগে কাব্যের আদর্শ এমনি বদলাইয়া গিয়াছিল যে কবির আত্মজীবনের নগ্ন অনলঙ্কৃত অমার্জ্জিত উচ্ছ্বাসকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া পাঠকশ্রেণী মনে করিয়া লইতে পারে নাই। গোবিন্দদাসের রচনা অতিরিক্ত subjective, বাচ্যার্থসর্ব্বস্ব ও ক্ষীণধ্বনি। এই শ্রেণীর কাব্যকে উৎকৃষ্ট কাব্য মনে করিবার পক্ষে অনেক বাধাই ছিল। ঠিক এই কারণেই গত শতাব্দীতে বিহারীলালের সম্যক সমাদর হয় নাই। যাঁহারা কাব্যে Realistic sincerityর পক্ষপাতী তাঁহারাই গোবিন্দদাসের কাব্যের আদর করিয়াছিলেন এবং আজিও করেন।

কাব্যের প্রেরণা

গোবিন্দদাস বিদেশী কাব্যসাহিত্য পড়েন নাই। এদেশের কোন কবিরও তিনি অনুকরণ করেন নাই। একমাত্র বিহারীলালের প্রভাব তাঁহার উপর স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারকে বিহারীলালের শিষ্য বলা হয়। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে ইঁহাদের কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব বড় কিছু দেখা যায় না। গোবিন্দদাসকেই প্রকৃতপক্ষে বিহারীলালের শিষ্য বলা যাইতে পারে। বিহারীলালের আত্মসাধনাগত অনুভূতির নিবিড়তা গোবিন্দদাস পাইয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের দারিদ্র্য যদি কোন প্রকারে দূরীভূত হইয়া যাইত—তাহাতে গোবিন্দদাসের পরিবারের লাভ হইত, কিন্তু দেশের বোধ হয় ক্ষতিই হইত। দারিদ্র্য বাদ দিলে সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক সকল প্রকারের বেদনা ক্লেশ দুর্দ্দশাও বাদ যাইত, যমদণ্ডও এত নিদারুণ হইয়া উঠিতে পারিত না। দুঃখ দূর হইলে গোবিন্দদাসের কাব্যস্ফূর্ত্তিই হইত কিনা সন্দেহ। গোবিন্দদাসের কাব্যের মূল প্রেরণাই দুঃখ। বৈদগ্ধ্যমার্জ্জিত কবির পক্ষে দুঃখ বাদ দিলেও কাব্য রচনার প্রেরণার অভাব থাকে না। গোবিন্দদাসের মত প্রকৃতির বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কবির জীবন হইতে দুঃখ দারিদ্র্যকে কাড়িয়া লইলে কাব্য-প্রেরণার কি অবশিষ্ট থাকিত?

কেবল দারিদ্র্য নয় গোবিন্দদাসের জীবনে বেদনার বৈচিত্র্য ছিল অপূর্ব্ব। এই বেদনার বৈচিত্র্য হইতেই তাঁহার কাব্যস্ফুরণ। বেদনাই গোবিন্দদাসের জীবনের স্বয়মাগত সাধনা—কাব্যের অনুপ্রাণনা। ঐ বেদনার সহিত বিজড়িত ক্রোধ, অভিমান, লোভ, প্রতিহিংসা, নৈরাশ্য ইত্যাদি আনুষঙ্গিক মনোবৃত্তিগুলি তাঁহার কাব্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। পুরুষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে যে শক্তির দ্বারা দুর্দ্দশা-দুঃখ-দৈন্যকে বীর্য্যের সহিত জয় করিয়া উঠে, ঠিক সেই শক্তিই গোবিন্দদাসের জীবনে অভিব্যক্ত না হইয়া কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেজন্য গোবিন্দদাসের দুঃখের কাহিনী 'নেহাৎ নাকে কাঁদন' হইয়া উঠে নাই—বেদনার উচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রচুর বলিষ্ঠতা আছে।

কবির সান্ত্বনা

দুঃখী মাত্রেই একটা কোন সান্ত্বনা খুঁজে। দুঃখকে সঙ্গীতে রূপদান একটা সান্ত্বনা। এই সান্ত্বনার জন্য কবি তাঁহার জীবনের প্রত্যেক বেদনাটিকে কাব্যে ছন্দোরূপ দিয়াছেন। প্রকৃত কবিতা হইতেছে কিনা তাহা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। যে ভাবেই হউক ছন্দে মূর্ত্তিদান করিয়াই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিতেন। সাহিত্যসৃষ্টি কবির লক্ষ্য ছিল না; প্রাণের ভার ছন্দোমরালীর পৃষ্ঠে চাপাইয়াই তিনি কৃতার্থ। নির্ব্বিচারে বেদনার এই অভিব্যক্তির মধ্যে কোন কোনটি শুভমুহূর্ত্তে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া প্রকৃত কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

গোবিন্দদাস কেবল কবি ছিলেন না—তিনি একজন সংসারী মানুষও ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস না হয় বেদনাকে ছন্দোরূপ দিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন;—সংসারী গোবিন্দদাস সান্ত্বনার জন্য তাঁহার সংসারটিকেই প্রাণপণে বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। পারিবারিক জীবনকেই আমি সংসার অর্থে ব্যবহার করিতেছি। সংসারের প্রতি অতিরিক্ত মমতাই আবার গোবিন্দদাসের কাব্যের অভিনব প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছিল।

পত্নীপ্রেম

পত্নীর প্রতি গভীর ভালবাসাটুকুকে কবি কাব্যে নানা ভাবে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের প্রিয়া "অর্দ্ধেক মানবী অর্দ্ধেক কল্পনা" নহে—

'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' রচিত নহে, যুগযুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের প্রেয়সী নহে। এ প্রিয়া রক্তমাংসের একটি পল্লীরমণী—পল্লীগৃহিণী মাত্র। রক্তমাংসের জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি যে ভালবাসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—কবির কাব্যে সেই প্রেমেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রিয়ার সহিত মিলনে মানুষ মাত্রেই যে আনন্দ পায়, বিরহে যে বেদনা পায়, কবি তাহার অতিরিক্ত কিছুই দেন নাই।

এই প্রেমের ব্যাপারেও কবির জীবনে বৈচিত্র্য ছিল। প্রথমা পত্নী অযত্নে অনাদরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার শোকে কবি অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন—অশ্রুধারার ফাঁকে ফাঁকে কবিতাও লিখিয়াছেন। তার-পর পুনরায় বিবাহ করিলেন—দ্বিতীয়া বধূকেও কবি সমানই ভালবাসিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রথমাকে একদিনের জন্যও ভুলিলেন না—

স্বর্গে একজন, মর্ত্তে একজন ;—দুইজন দুই দিক হইতে টানিয়াছে। এই আকর্ষণের মধ্যে কোন কবিকল্পনা বা ভণ্ডামি নাই—ইহা সম্পূর্ণ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। একের প্রীতি এবং অন্যের স্মৃতির আলোছায়ার সম্পাতে কবির মনে যে রসচিত্র ফুটিয়াছে তাহাতে বেশ অপূর্ব্বতা আছে।

বড়াল কবিও সেই চিত্রের অপূর্ব্বতা একদিন অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

হৃদয়ের একপ্রান্তে আজ জাগিতেছে দারুণ শ্মশান,
হৃদয়ের আর প্রান্তে আজ স্বর্ণপুরী হয়েছে নির্ম্মাণ।

কবি গোবিন্দদাস এই প্রীতি-স্মৃতির দ্বন্দ্বটিকে নানা ভাবে কাব্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন—

শ্মশান ধুইয়া তীরে　　চিলাই বহিছে ধীর
কলতানে মৃদুগান বনে বনে ঘুরি',
অকস্মাৎ পাশে তার　　বহে মন্দাকিনীধার,
ভীষণ গর্জ্জনে পদ্মা ব্যোম ভাঙ্গি চুরি'।

আবার—

প্রেমদা পদ্মার কূলে　　কোমল সেফালী ফুলে
করিয়া বাসরসজ্জা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই তীরে　　আমকাঠ দিয়ে শিরে
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়।

নাহি নিশি নাহি দিন　　দুজনেই নিদ্রাহীন
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে।
পাষাণহৃদয় স্বামী　　পানামা যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙে নামি দুজনার পানে।

দেহাত্মবাদ

আজ যে কাব্যে দেহাত্মবাদের জয় ঘোষণা হইতেছে—সেই দেহাত্মবাদ গোবিন্দদাসের প্রেমের কবিতাতেই সুরু হইয়াছিল।

"আমি তারে ভালবাসি রক্ত মাংস সহ", এই এক নূতন খেলা, ফুল, জাগিয়া যুবতী, মাঘে, কে বেশি সুন্দর ইত্যাদি কবিতায় কবি দেহাত্মক প্রীতিকে অভ্যুন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কবি দেহাত্মবাদকে তত্ত্বহিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন নাই সত্য—তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। এযুগের কোন কোন শক্তিশালী কবি কাব্যের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও তাহাকে তত্ত্বে পরিণত করিতে চাহিতেছেন। প্রেমের Idealism এ যাঁহারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগিবে। এ যুগে আর্টের সত্য অপেক্ষা ব্যাবহারিক সত্যকে কাব্যে অভিব্যক্ত দেখিবার জন্য যাঁহারা আগ্রহান্বিত—তাঁহারা গোবিন্দদাসকে গুরু-স্থানীয় মনে করিতে পারেন।

রসাভাস

রসাবিষ্ট মনকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে একটি মাত্র অবিমিশ্র মনোভাব পাওয়া যায় না—ইহা মনস্তত্ত্ব-সম্মত সত্য। কবি মিশ্রমনোভাবের মধ্য হইতে রসানুকূল মনোভাবটিকেই বাছিয়া কাব্যে রূপায়িত করেন। তাহা না করিলে রসাভাস হইবার সম্ভাবনা। কবিরা লিরিক রচনায় এই প্রথাই অবলম্বন করেন—উচ্চশ্রেণীর কবি মিশ্র মনোভাবকেও, রসাভাস না ঘটাইয়া, কাব্যে চমৎকার অভিব্যক্তি দিতে পারেন—গোস্বামী কবিদের কিলকিঞ্চিত ভাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গোবিন্দদাস রসসাহিত্যের চিরপ্রচলিত প্রথার ধার ধারিতেন না।—তিনি যেমনটি অনুভব করিতেন তেমনটিই প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। ফলে তাঁহার রচনায় প্রায়ই রসাভাস ঘটিত। যেখানে যেখানে রসাভাস এড়াইতে পারিয়াছেন—সেখানে সেখানে তাঁহার এই পদ্ধতি সাফল্য

লাভ করিয়াছে। কবির 'উলঙ্গরমণী' নামক সরস কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে। এই কবিতায় কবি রসাভাস এড়াইয়া যাইতে পারিয়াছেন।

দাম্পত্য প্রেমের কবি

গোবিন্দদাস দাম্পত্য প্রেমের কবি। কাজেই তাঁহার প্রেম-কবিতায় সাংসারিক জীবনের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সাংসারিক জীবনের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, ফলে তাঁহার প্রেমকবিতায় ভোগমাধুর্য্য অপেক্ষা কারুণ্যের প্রভাবই বেশী। সংসারের জ্বালা কবির দাম্পত্য প্রেমকেও জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছিল—তাই মাঝে মাঝে বলিয়া ফেলিতেন—

আমি দেখি নাগপাশে　　রমণী জীবন নাশে
আনন্দে বর্ব্বর ভাসে, বলে আলিঙ্গন।

সংসারের জ্বালা বা কবির নিজস্ব বিষাক্ত মনোভাবের কথা বাদ দিলেও যে কবি নারীকে তাহার কান্নার মধ্যেই পরিচ্ছিন্ন দেখে—তাহার মুখে একথা স্বাভাবিক। নারীকে যিনি Idealise করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন—

আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে।

আর যিনি নারীকে অৰ্দ্ধেক মানবী না বলিয়া পূর্ণ মানবী বলিতে চাহেন, তিনি বিষের কথা বাদ দিয়া কেবল অমৃতের কথা কি করিয়া বলিবেন? সকল মন্থনেরই শেষ গরল—নারীজীবন মন্থন করিয়াও যে স্মরগরলের উত্থান হয়—কবিকে তাহাও কণ্ঠে ধরিতে হয়।

উটের বাবলাডাল খাওয়ার গল্প শুনিয়াছি। চোয়াল হইতে রক্ত ঝরিতেছে, তবু উট চক্ষু মুদিয়া ভোজনানন্দ ভোগ করে। প্রেমসম্ভোগে কবি গোবিন্দদাসের অবস্থাও এইরূপ।

জীবনের সর্ব্ববিধ সম্ভোগে যিনি বঞ্চিত, বৈদগ্ধ্যজাত আনন্দও যাহার ভাগ্যে জোটে নাই—তিনি সন্তপ্ত জীবনের সান্ত্বনার জন্য কেবল কাব্য রচনাই করেন নাই—তিনি সুলভ প্রাপ্য রমণীপ্রেমসম্ভোগকে অকূল সাগরে ভেলার মত আশ্রয় করিয়াছিলেন। কবি ঐ সম্ভোগকে কাব্যের মধ্যেই স্থান দিয়াছেন। কাব্য ও রমণীরসসম্ভোগ তাঁহার জীবনে পাকে পাকে জড়াইয়া গিয়াছিল। দৈহিকতাকে বাদ দিয়া রমণী-রসসম্ভোগের কথা বলাকে তিনি ভণ্ডামি বলিয়া মনে করিতেন। যে culture কাব্যের তুয়ারে প্রহরী হইয়া স্থূল সম্ভোগকে কলালক্ষ্মীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেয় না—সে cultureএর বালাই তাঁহার ছিল না।

গোবিন্দদাস যেজন্য মধুর রসের কবি, সেইজন্য তিনি বাৎসল্য রসেরও কবি। কবি তাঁহার সন্তানদের সুখে রাখিতে পারেন নাই। তাহাদের কত সাধই মিটাইতে পারেন নাই—তাহাদের আবদারের উত্তরে তিরস্কার করিয়াছেন। বৎসলহৃদয় পিতার পক্ষে এ কি কম বেদনার কথা? কবিতায় তাহাদের সকল আকুলতা, কাতরতা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়া পিতৃহৃদয়ের সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

জন্মভূমি ও স্বদেশ

বাস্তবানুরক্ত স্থূলদর্শী কবি জীবনের কোন স্থূল উপাদানকেই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র ভিটের মায়াই তাঁহাকে কি আকুলই না করিয়াছে! কবির কাছে তাঁহার ভিটেটি পর্য্যন্ত জীবন্ত ছিল। পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিবিজড়িত ভিটেটি তাঁহার কাছে যেমন মিঠে ছিল, গ্রামখানিও তাঁহার তেমনি মিঠে ছিল। কবি-কঙ্কণকে তাঁহার দামুন্যা ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। কাব্যে কোথাও তাহার জন্য হাহুতাশ করেন নাই। গোবিন্দদাস তাঁহার ভাওয়ালের প্রতি তরুলতাকে ভাল বাসিতেন। কবি যে বলিয়াছেন, "ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ।" ইহা একেবারেই অত্যুক্তি নয়। জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রীতি তাঁহার কাব্যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

গোবিন্দদাস দেশভক্ত কবি ছিলেন। আমার মনে হয়—আপনার জন্মভূমির প্রতি অগাধ মমতাই দেশপ্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। জন্মভূমিকে হারাইয়া কবির প্রীতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই দেশপ্রীতি তাঁহার কাব্যে রসসৃষ্টি করিতে পারে নাই—ঐ প্রীতি বিকীর্ণ হইয়া তরল হইয়া পড়িয়াছিল—উহা conventionalityর গণ্ডীপার হয় নাই। জন্মভূমির প্রতি কবির অনুরাগই ছিল অকৃত্রিম, গাঢ় ও নিবিড়! স্বেচ্ছায় নহে—প্রবলের লাঞ্ছনায় অত্যন্ত

অনিচ্ছায় এই জন্মভূমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই কাব্যে এইরূপ রসোপাদানের কোন Convention দেশের সাহিত্যে ছিল না। তাই নির্ব্বাসিতের আর্ত্তনাদ রীতিমত সঙ্গীতেই পরিণত হইয়াছিল।

মগের মুলুক

প্রবলের অত্যাচার কেবল বেদনারই সৃষ্টি করে নাই—তাঁহার মনে রোষ ও প্রতিহিংসাকেও উদ্দীপিত করিয়াছিল, তাহাতে প্রকৃত কাব্যের সৃষ্টি হয় নাই সত্য—কিন্তু প্রখর জ্বালাময় বাঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে মেঘে বারিধারা ঝরে—সেই মেঘে বিদ্যুৎবজ্রও প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা কবি দেখাইয়াছেন। কবি মগের মুলুক না লিখিলেই ভাল করিতেন,—কিন্তু না লেখা তাঁহার চরিত্রের পক্ষে অস্বাভবিক হইত। যে কবি নিজের সমস্ত জীবন টুকু ছন্দস্রোতে ঢালিয়া দিয়াছেন—তিনি জীবনের এতবড় ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করিবেন কি করিয়া?

জীবনের কোন অঙ্গকে প্রচ্ছন্ন বা সংযত রাখা তাঁহার কবি চরিত্রের পক্ষে অসমঞ্জস। রসসৃষ্টি যাহার সাধনা নয়, সমগ্র জীবনকে তাহার ভাল মন্দ দোষগুণ আলো অন্ধকারের সহিত ছন্দে অভিব্যক্ত করাই যাঁহার ধর্ম্ম তিনি মগের মুলুক না লিখিয়া পারেন না। গোবিন্দদাসের মধুচক্রের মধু যেমন মিষ্ট, হুল তেমনি জ্বালাময়। হুল বাদ দিয়া মধুমক্ষীর কল্পনাই যে হয় না।

স্রোতের কবি

গোবিন্দদাসকে আমি বলি স্রোতের কবি—লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ ও বাচ্যার্থ—তিন অর্থেই।

গোবিন্দদাস যে প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহা বারিগর্ভা। বারিপ্রকৃতি তাঁহার জীবনকে তরল, চঞ্চল, সজলস্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছিল,—কাব্যেও ঐ সকল গুণ সঞ্চারিত হইয়াছিল,—কাব্যের ধারা তাই তরতর করিয়া বহিয়া গিয়াছে। বারিপ্রকৃতির কোন মাধুর্য্য বা কোন সৌন্দর্য্য তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। বারিপ্রকৃতিই কবির কাব্যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। বাঙ্গালার কোন কবি এমন করিয়া বারিপ্রকৃতির অঙ্কে সঞ্জাত ও প্রতিপালিত হইয়া তাহার মাধুর্য্য নিঃশেষে পান করেন নাই। বাংলার যে কবি সুরধুনী কাব্য লিখিলেন—তিনি গঙ্গার দুই তীরের কথাই বিনাইয়া বিনাইয়া বর্ণনা করিলেন—সুরধুনীর স্বচ্ছসলিলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আকাশের চন্দ্র অপেক্ষা স্বচ্ছসলিলে প্রতিবিম্বিত চূর্ণচন্দ্রই গোবিন্দচন্দ্রকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথকে যদি কাব্যকাননের কলাপী বলা যায়—গোবিন্দদাসকে বলিতে হয় কাব্যসরসীর মরাল।

স্রোতের আলঙ্কারিক অর্থ ভাগ্যস্রোতই বলো—আর শোকস্রোতই বল আর দুঃখস্রোতই বল—গোবিন্দদাসকে লক্ষ্যার্থেও 'স্রোতের কবি' বলা যাইতে পারে।

কবি সমস্ত জীবন ভাগ্যস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছেন—তাঁহার আত্মশক্তি প্রয়োগের উপায় ছিল না। স্রোত যে পথে লইয়া গিয়াছে, সেই পথেই চলিয়াছেন—যে ঘাটে তাঁহাকে ভিড়াইয়াছে সেই ঘাটেই ভিড়িয়াছেন—এই ভাসিয়া যাওয়ার সুর তাঁহার কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে! শোকের পর শোক পাইয়া, ব্যথার উপর ব্যথা পাইয়া, গোবিন্দদাসকে অশ্রুধারাতেই চিরদিন ভাসিতে হইয়াছে—তিনি জীবনে সন্তরণ শিখেন নাই—মাঝে মাঝে ভেলা যে পান নাই তাহা নহে, কিন্তু ভেলাকে বক্ষে আঁকড়িয়া রাখিবার শক্তি তাঁহার বাহুতে ছিল না। এই অকূলে ভাসার গানই তিনি চিরজীবন ধরিয়া গাহিয়া গিয়াছেন।

জীবনের সহিত যোগ

জীবনের সহিত কাব্যের এমন নিবিড় যোগ কোন কবির রচনায় এমনভাবে দেখা যায় না। শিল্পী অনেক সময় আপনার প্রাকৃত জীবনকে গোপন করিয়া স্বপরিকল্পিত কল্পজীবনকে অভিব্যক্ত করেন কলাসৃষ্টিতে। যাহা সুন্দর তাহাই শিল্পে অভিব্যক্তিলাভের যোগ্য—নিজের জীবন যদি কদর্য্য বা বিরূপ হয়, তবে শিল্পী তাহাতে কল্পনার মাধুরী মিশাইয়া সুন্দর করিয়া পুনর্গঠন করিয়া লন এবং সেই পুনর্গঠিত জীবনেরই অভিব্যক্ত হয় তাঁহার শিল্পে। গোবিন্দদাস এত শিল্পচাতুরীর ধার ধারিতেন না,—তিনি আত্মজীবনকে গোপন করিতে জানিতেন না, তাঁহার কল্পজীবন বলিয়া পৃথক জীবনও ছিল না। তিনি জানিতেন তাঁহার একটি জীবন আছে—তাহা স্থূল রক্তমাংসে গঠিত, বাস্তব

সুখদুঃখে ঘটিত। এই জীবনেরই অবিকল অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে তাঁহার কাব্যে। জীবনের সমস্ত দোষ গুণ, শ্রী, কুশ্রীতা সমস্তই কাব্যে সংক্রমিত হইয়াছে।

যাহা কিছু অনুভব করিয়াছেন তাহাই কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে শিষ্টসমাজের রীতিলঙ্ঘন হইল কি না, সাহিত্যমন্দিরের শুচিতা ক্ষুণ্ণ হইল কি না—শিল্পকলার শৃঙ্খলাসামঞ্জস্য রক্ষা হইল কি না, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিতে জানিতেন না। ইহাকে আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠতা, সরলতা ও নির্ভীকতা বলিয়া সুখ্যাতি করিবে কর—অসংযম, নির্বুদ্ধিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা কালচারের অভাব বলিয়া নিন্দা করিবে কর, গোবিন্দদাসের স্বরূপ ইহাই।

উপসংহার

গোবিন্দদাসের জীবনকথা যে জানে, সে কখনও তাঁহার নিকট মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস অথবা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের সৃষ্টি কোন কিছু প্রত্যাশা করিবে না,—তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট লিরিকই প্রত্যাশা করিবে। গোবিন্দদাসের জীবনে লিরিকের উপাদান ছিল বিস্তর। গোবিন্দদাসের মনোবৃত্তি, রসদৃষ্টি, ভাবপ্রকৃতি সমস্তই লিরিকেরই অনুকূল।

গোবিন্দদাসের যদি সংযম, সতর্কতা ও সামঞ্জস্যবোধ থাকিত এবং একটু উচ্চ অঙ্গের কালচার থাকিত তাহা হইলে গোবিন্দদাসের লিরিকের তুলনা মিলিত না।

যত বহুমূল্য ধাতুই হউক, যত দুর্লভ রত্নই হউক, খনি হইতে যেমন অবস্থায় তাহাকে তোলা যায়—ঠিক তেমন অবস্থাতেই সে তাহার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা পাইতে পারে না। জীবনের অবাধ অভিব্যক্তিমাত্রই সৎকাব্য হইয়া উঠিতে পারে না। সৎকাব্য কবিমনের সৃষ্টি। কবি-চিত্ত প্রসব-সহায়িনী ধাত্রী নহে—কবিচিত্ত,—জননী। জননীর সকল ধর্ম্ম কাঁটায় কাঁটায় প্রতিপালন করিলে সুপুষ্ট, স্বাস্থ্যবান সন্তানে অঙ্ক উজ্জ্বল হয়।

গোবিন্দদাসের দৃষ্টি ছিল unconventional. অনুভূতি ছিল গভীর, সত্যনিষ্ঠা ছিল প্রখর। কিন্তু তিনি এই সকলের উপযোগী সৃষ্টিশক্তির প্রয়োগ করেন নাই। হয়, তাঁহার সে শক্তি ছিল না—নয়, তিনি সৃষ্টিশক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা জানিতেন না। পরিপূর্ণ সৃষ্টিশক্তির প্রয়োগ করিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের পর তাঁহারই স্থান অবিসংবাদিত রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইত।

শতত্রুটি সত্ত্বেও গোবিন্দদাসের কাব্য বাংলা ভাষার সম্পদ, পূর্ব্ববঙ্গের পরম গৌরবের সামগ্রী। এই স্বদেশী সামগ্রীর আদরের দিনে, কেহ যদি মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় খদ্দরের মত সম্পূর্ণ স্বদেশী কবিকৃতি উপভোগ করিতে চাহেন—তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব—গোবিন্দ-দাসের কাব্য পড়।

গোবিন্দদাসের উদ্দেশ্যে রচিত কয়েক পংক্তি কবিতার দ্বারা প্রবন্ধের উপসংহার করি—

তোমার কবিপ্রতিভাটির প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরী নহে শিল্পশালার ভিড়ে
চেষ্টা করে হওনি কবি কবি হয়েই জন্ম নিলে
শৈবালশ্যাম বাংলা মাটি চিরে!

বাণী তোমার বজ্রবাণী, অগ্নিময়ী তোমার ঘৃণা
শৃঙ্গী ঋষির শাপের মত গতি,
লেখনীরে করলে আসি, মুষল হ'লো তোমার বাণী
ছিন্নমস্তা তোমার সরস্বতী।

তোমার প্রতি অত্যাচারের চিত্র যখন নেত্রে ভাসে
করালী-রূপ ধরে আমার বাণী
কন্দরূঢ় অমার্জ্জিত তোমার ভাষণ কণ্ঠে আসে
ভদ্রকালীর শাসন নাহি মানি।

অন্ন বিনা কণ্ঠনালীর জোর বাঁধিবে হায় কি দিয়ে?
চাওনি কিছু অন্ন দুটি বই।
শরাহত মরালসম মরলে জ্বালায় ছটফটিয়ে
গাইতে তুমি পেলে তেমন কই? *

* শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত কবির জীবন চরিত পাঠে।

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

৪৯

হলধর, ভুলি' সুমধুর সুরা—রেবতীনয়নবিম্বিত সে,—
করিলো যা' পান, রণ পরিহরি' কুরু-পাণ্ডবে মমতাবশে ;
পিয়ে সেই নীর সরস্বতীর, অন্তরে তুমি শুদ্ধ হবে,
হে সৌম্য, শুধু বাহিরে মাত্র বর্ণ তোমার কালোই র'বে।

৫০

যেয়ো কনখলে, জাহ্নবী যেথা হিমাচল হ'তে নামি' ধরায়
বিরাজে সগরতনয়গণের স্বর্গের পথে সোপান-প্রায় ;
গৌরীমুখের ভ্রূকুটিরে যে-বা করি' উপহাস ফেনচ্ছলে
ধরে শিব-কেশ, ঊর্ম্মি-কলাপে পরশি' ইন্দু ললাটতলে।

৫১

দিঙ্‌নাগ সম দেহার্দ্ধ নভে লম্বিত করি' বক্রভাবে
স্ফটিক-শুভ্র স্বচ্ছ সে নীর যবে তুমি পান করিতে যাবে,
তোমারি সুনীল ছায়াখানি তা'র স্রোতোমাঝে করি' সঞ্চরণ
অভিনব ঠাঁয়ে রচিবে রম্য গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন।

৫২

সেই গঙ্গার উদ্ভব যেথা, তুষারে শুভ্র সে হিমাচল,—
আসীন মৃগের নাভি-সুগন্ধে সুরভিত যা'র পাষাণতল,—
তাহারি শিখরে সুখাসীন হয়ে পথের ক্লান্তি হরিবে যবে,
শিবের শুভ্র বৃষের শৃঙ্গে পঙ্কের মতো প্রতীত হবে।

৫৩

বহিলে পবন দেবদারু শাখা-ঘর্ষণে যদি জ্বলি' অনল
স্ফুলিঙ্গে দহি' চমরী-পুচ্ছ করে হিমাচলে ব্যথা-বিভল,
সহস্রধারে ঢালি' বারি-ধারা কোরো দাবাগ্নি নির্ব্বাপণ,—
সার্থক হয় মহতের ধন আর্ত্তের ব্যথা করি' মোচন।

৫৪

শরভেরা সেথা উল্লম্ফনে সদা অঙ্গ-ভঙ্গ তরে
দূরপথচারী তোমারেই যদি লঙ্ঘিতে চায় ক্রোধের ভরে,
তাহাদেরে তুমি কোরো বিতাড়িত তুমুল করকা-বৃষ্টিপাতে,—
নিষ্ফল কাজে প্রয়াস করিয়া নিন্দিত কে-বা নহে ধরাতে ?

৫৫

সেথা শিলাতলে জাগে শিবপদচিহ্ন, যোগীরা যা চিরদিন
করে পূজা ; তুমি ভক্তিনম্র হৃদয়ে কোরো তা প্রদক্ষিণ,—
দরশনে তা'র দূরে যাব পাপ, বিশ্বাসী যে-বা শ্রদ্ধাবান্
লভে চিরতরে প্রমথের পদ মৃত্যুতে হ'লে দেহাবসান।

৫৬

পশিয়া পবন কীচকরন্ধ্রে, সুমধুর ধ্বনি উঠে যে নিতি,
কিন্নরীগণ মিলি গাহে সেথা শিবের ত্রিপুরবিজয়গীতি ;
হেন কালে যদি গিরিকন্দরে করো গর্জ্জন গভীর রবে
মৃদঙ্গ সম, তাহে শম্ভুর সঙ্গীত পূর্ণাঙ্গ হবে।

৫৭

হিমালয়তটে দর্শনীয় যা', হেরি' সে সকল, যেয়ো তা তোজে'
ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, হংসদ্বারে—ভৃগুপতি যশোবর্ত্ম সে যে !
ঐ পথে যেয়ো উত্তরে তুমি দীর্ঘ বক্র শরীর ধরি',—
বলিরে বাঁধিতে উদ্যত যেন বিষ্ণুর শ্যাম চরণ, মরি !

৫৮

সানুর সন্ধি বিভক্ত যা'র দশানন-করে, উর্দ্ধপথে
সুরাঙ্গনার দর্পণ সেই কৈলাসে যেয়ো অতিথি হ'তে ;
কুমুদশুভ্র তুঙ্গ শৃঙ্গে শোভিছে সে গিরি ঘেরি' আকাশ—
যেন-বা পুঞ্জীভূত মহেশের প্রতি দিবসের অট্টহাস।

৫৯

সদ্য-ছিন্ন গজদন্তের তুলা শুভ্র শৈল 'পরি
আরোহিলে তুমি দলিত স্নিগ্ধ অঞ্জন সম বর্ণ ধরি'
ধরিবে সে গিরি অপরূপ রূপ,—অপলক আঁখি তাকাবে লোকে,
বলভদ্রের শুভ্র অঙ্গে সুনীল বসন হেরিয়া চোখে।

৬০

ভুজগবলয় পরিহরি শিব বাড়াইলে বাহু, ধরি' সে কর
গৌরী যখন করে বিচরণ কৈলাসে কেলি-শৈল 'পর,—
উন্নত-নত করিয়া শরীর, স্তম্ভিত করি' সলিলরাশি,
আরোহণকালে মণি-তটে, তুমি রচিয়ো সোপান সমুখে আসি'।

৬১

তীক্ষ্ণ কঙ্কণাগ্রে হানিয়া, হে নীরদ, নীর ঝরায়ে তব
সুরাঙ্গনারা তোমারি অঙ্গে বিরচিবে ধারা-যন্ত্র নব ;
নিদাঘে তোমারে পেয়ে যদি, সখে, লীলাচঞ্চলা রমণীগণ
ছাড়িতে না চায়, দেখাইয়ো ভয়, করি' শ্রুতিকটু নাদ ভীষণ।

৬২

মানস-সরসে স্বর্ণ-কমল ফুটে—তা'রি বারি গ্রহণক্ষণে
সজল-বসনে আবরণ-সুখ বরষি' ঐরাবত-বদনে,
কাঁপায়ে কল্পতরু-কিশলয় অংশুক সম পবন-ভরে,
এ হেন বিবিধ ললিতা-লীলায় বিহরিবে, মেঘ, সে গিরি 'পরে।

৬৩

স্রস্তগঙ্গা-দুকূলা নগরী বিরাজে প্রণয়ী গিরির কোলে
প্রণয়িনী:সম ; ওহে কামচারী, চিনিবে না তা'রে অলকা বলে' !
উচ্চ সপ্ততল গৃহময়ী সে অলকা—যবে বরষা নামে—
শোভে জল-ঝরা মেঘে,—নারী যথা মুক্তা-খচিত অলকদামে !

———

(ক্রমশঃ)

বিধবা

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

কমলের স্বামী যেদিন প্রাণত্যাগ করিলেন সেদিন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল একমাত্র পাশের বাড়ীর বউ নীলা। নীলার স্বামী অতুল আসিয়া মৃতের সৎকার-ব্যবস্থা করিয়া গেল, আর ক্রন্দনরতা অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা কমলের শিয়রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল নীলা। সে অনভিজ্ঞা কিশোরী মাত্র, এরূপ একটি ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন কোন দিন হয় নাই। স্তোকবাক্য সে জানে না, তাই বিমূঢ়ের মতো শুধু কমলদি'র মাথায় একখানা হাত রাখিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল কখন রাত্রি প্রভাত হইবে।

কমলের দশ বছরের ছেলে রমেন কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরের স্তিমিত আলোকে তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি দেখিলেই যেন চকিত হইয়া ভাবিতে হয় এ সংসার অতি নির্ম্মম।

প্রভাত হইল। ঘুমন্ত কলিকাতা নগরী আবার গা-ঝাড়া দিয়া জাগিল। তখন নীলাও কমলের পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কতক্ষণ আর বসিয়া থাকিবে। খোকার সাড়া পাইয়া দুজনেই উঠিয়া বসিল। অশ্রান্ত অশ্রুধারার সঙ্গে যেন এক রজনীতেই কমলের যৌবন-কান্তি নিঃসৃত হইয়া গেছে।

কমল স্নান করিল, সদ্যোবিধবাকে যাহা যাহা করিতে হয় সবই করিল। নীলা ভিন্ন এখন তাহার নিকট জন আর কেহ নাই। পূর্ব্বেও স্বামী ও ঐ পুত্রটি ছাড়া আর কেহ ছিল না। অন্ততঃ তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাই আজ তাহার যাহা কিছু উপদেশ এই নীলার কাছেই নিতে হইবে।

অতএব বিধবা সধবা দুইজনে মিলিয়া বৈধব্যের যে একটি পরিপাটি রূপ গড়িয়া তুলিল তাহা দ্বারাই কমলের অতীত জীবন সম্পূর্ণ আবৃত করিবার রীতিমত ব্যবস্থা হইয়া গেল। পরিশেষে মনে হইল প্রকৃতির মধ্যে ঋতু পরিবর্ত্তনের মতোই ইহা স্বাভাবিক; যেন হেমন্তের স্বর্ণাঞ্চল আসিয়া অতি সহজেই শীতের শুভ্র বসনে ধরা দিয়াছে।

রমেন ইস্কুলে পড়ে, অতুল তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইল। আর কমলের সাথী হইল নীলা। এটি রমেনদের নিজের বাড়ী, কোন পূর্ব্ব-পুরুষের আমলের সম্পত্তি। তাহার পিতা কেরাণীগিরির অসচ্ছলতার মধ্যেও ইহার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব বজায় রাখিয়াছিলেন। একাংশের ভাড়ার কয়েকটি মুদ্রার উপর তাহাদের জীবন-যাত্রা এখন সংকীর্ণ পরিধিতে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু গৃহের ভিতরের সৌষ্ঠব আরও বাড়িল। পুত্রের কৌতূহলী দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা-প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে কমল তাহার বৈধব্য-ক্ষেত্র অতি চমৎকার ভাবে সাজাইয়া ফেলিয়াছে। সধবার দেহের প্রসাধন যেন দেহচ্যুত হইয়া সমস্ত কক্ষের আসবাবপত্রের মধ্যে একটি অতি পবিত্র নির্ম্মলতায় বিস্তারিত হইয়া যায়। শরীরের অযত্ন ধীরে ধীরে অশরীরী আত্মার কল্যাণ আয়োজনে দ্বিগুণ যত্নে ভরিয়া উঠে, গৃহের প্রত্যেক সজ্জা-বিন্যাসে।

তাই কমলদি'র ঘরের ভিতরে চাহিয়াই নীলা বুঝিল কমলের বিধবা মূর্ত্তির অন্তরালে একজন প্রবল সধবা অতি কৌশলে লুকাইয়া আছে। বায়ুভূত আত্মা নাকি গৃহের সান্নিধ্যে জমাট বাঁধিয়া থাকে, তাই ঘরের সকল দ্রব্যের মধ্যে তাহার রহস্য ধরিয়া রাখিবার এই প্রকাণ্ড আয়োজন। সমগ্র কক্ষ জুড়িয়া একটি পুরুষকে যেন প্রতিফলিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

শয়নের ভালো পালঙ্কখানি সাজানো, চাদরে আবৃত। একখানি সাধারণ চৌকীতে এখন মা ও ছেলে শয়ন করে। রমেনের পিতার ধুতি-জামা-জুতার প্রত্যেকটি সে ঘরে পূর্ব্বের যথাস্থানে রক্ষিত, অধিকন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রিয় বস্তু একত্র সংগৃহীত। কিন্তু কমলের পাড় দেওয়া শাড়ীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ঘরের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে স্বামীর একখানি ফোটো টাঙানো; তাহারি নীচে মেঝের উপর কমলের পূজার সরঞ্জাম।

সন্ধ্যার করুণ রশ্মিগুলি যখন পশ্চিমের জানালা দিয়া ঐ ফোটোখানির উপর পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন

কমল একবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রয়। তাহার স্মৃতির পুঞ্জীভূত বেদনার মতো ছবিখানি উদাস হইয়া উঠে। কমল সজল-নেত্র মুদিত করিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করে। হয়ত পাশে ফিরিয়াই দেখে রমেনও অপলক দৃষ্টিতে ছবি দেখিয়া তাহার পিতার মুখখানি আবার ভালো করিয়া মনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন সহসা উচ্ছ্বসিত ব্যথায় সে পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়ে।

তারপর ছবির উপর চন্দনের ফোঁটাগুলি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যায়, অন্ধকার নামিয়া আসে। তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া কমল পূজার আসনে আর একবার প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়ে।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া যায়। নীলা আসিয়া অবকাশের আলোচনা নানা বিষয়ে টানিয়া লয়, ইচ্ছা কমলদি'কে আর কোন মতে তাহার স্বামীর কথা মনে করিতে দিবে না। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই জাগ্রত হইয়া কমল স্বামীর দ্রব্যগুলির দু'একটা আবার গুছাইয়া লয়। আর নীলা চলিয়া গেলেই অনেকক্ষণ বসিয়া আবার অনেক কথা ভাবিয়া ফেলে। নিরুদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস আবার অনর্গল ছাড়িয়া দেয়। ঘরখানিকে আবার ভালো করিয়া স্বামীর স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। তাহার স্বামীর আরও যে যে দ্রব্য ভালো লাগিতে পারিত তাহা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে।

নীলা বড় মজার মেয়ে। তাহার বচনবাহুল্যে মনে হয় সে মুখরা বাক্যবিলাসিনা, কিন্তু কমল অনেক ভাবিয়া বুঝিল নীলার কোন কথাই সংলগ্ন নয়, সরলতার সঙ্গে তার নিবিড় যোগ। তাই এই একটি বালিকার আলাপমাধুর্য্যে তাহার কক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল। রমেন যেন অতি শীঘ্রই নীলাকে আপনার জন বুঝিয়া খুড়ীমা করিয়া নিয়াছে।

নীলা যখন এ বাড়ীতে পা দেয় তাহার চঞ্চল গতির শব্দে নিদ্রিতা কমল ব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠে, জানে আর পরিত্রাণ নাই। নীলা হাতে একখানা বই লইয়া প্রবেশ করে, এবং সারা দুপুর সেই বইয়ের আলোচনায় কমলকে অস্থির করিয়া তুলে। আবার বলে,—কমলদি' এ ঘরখানা যে একটা মিউজিয়ম্ করে তুলেছো! তোমার ঠাকুরপো বলছিল যে মৃত্যুর পর এমন সুন্দর সাজানো একটা ঘর পেলে তিনিও মরতে প্রস্তুত।—বলিয়া কৌতুকরসে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু সধবার মুখে এ সব কথা কমলের আদৌ ভালো লাগে না। সে মনে মনে আঘাত পাইয়া অস্বস্তি বোধ করে। নীলার ভাব দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া তাহার আলাপের মধ্যেই নিজেকে মগ্ন করিয়া ফেলে।

তবু—নীলার সে দিনের কথাটা যেন একেবারে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, নিষ্ঠুর, অসম্ভব। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা দিদি, মানুষটি যখন চ'লেই গেলেন তখন তাঁর ঘরখানাকে এমন ধারা সাজিয়ে রেখে লাভ কি? তাঁর সম্পর্ক তো সব চুকেই গেছে!

সম্পর্ক চুকিয়া গেছে! একি অদ্ভুত বাক্য! কমল স্তম্ভিত হইয়া গেল, এ বালিকা বলে কি? মুখে একটা কড়া জবাব আসিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না, ভাবিতেও বুক শিহরে। নীলাকে দেখিয়া যেন তাহার ভয় লাগে। শুধু কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া বলিল,—তবে কেমন ক'রে ঘর সাজাবো, বলো নীলা?

নীলা কিন্তু পূর্ব্ববৎ সহজ ভাবেই বলিল,—কেন, এখন তুমি তোমার ছেলের ও তোমার নিজের দরকার মতোই সাজাও।

—আমার ত এই দরকার। বলিয়া কমল আরও অধিক প্রশ্ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। পথে জনতার কোলাহল বাড়িয়া ওঠে; কলের চিম্নীগুলির ধোঁয়া কমিয়া আসে। ক্রমে গলির মোড়ে গ্যাসের আলো জ্বালা হয়, উপরের এলায়িত অন্ধকারের নীচে শহরবাসী নৈশবিলাসের জন্য নূতন আয়োজন করে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া একাকিনী কমল সন্ধ্যাকালের পানে চাহিয়া আছে। মন যেন গৃহের সমীপ হইতে বহুদূরে প্রয়াণ করে। তাহার ম্লান মুখে আরক্ত আভা, নিষ্প্রভ রুক্ষ কেশগুচ্ছে মৃদু শিহরণ, নয়ন-নিমেষ বিরল। তাহার

বক্ষের ভিতর আকাশের কোনো উর্দ্ধচারী পাখীর মতো উড়িয়া চলিবার জন্ম কে যেন ঘন ঘন ডানা ঝাপ্‌টায়।

নীলা যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে,—দিদি, এই তোমার দরকার হ'তেই পারে না। এতে তো তুমি শান্তি পাওনা দিদি, ভুল ক'রে নিজের অভাবটাকে জাগিয়ে তোলো, তোমার বুকের ফাঁক আরও বড় হয়ে ওঠে। তার চেয়ে মানুষের সঙ্গে মিশতে শেখো, মানুষের কাজ ক'রতে আরম্ভ করো, আনন্দ পাবে।

কিন্তু কমলের মন তাহাতে সায় দেয় নাই। সে দৃঢ়তার সহিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিয়াছে যে তাহার আর কোন মানুষে প্রয়োজন নাই, আর কোন কাজ সে জানে না। যে একটিমাত্র মানুষ তাহার ছিলো সে আজ দেবতা হইয়া গেছে, তাহারি পূজা সে করিবে,—যদি পুণ্যবলে আবার কোন জন্মে তাহাকে মানুষরূপে ফিরিয়া পাইতে পারে।

রমেন বাজার হইতে এক ঠোঙা ফুল লইয়া বাড়ী ফিরিল। সাগ্রহে সেগুলি লইয়া কমল মালা গাঁথে। গাঁথিয়া স্বামীর ছবিতে পরাইয়া নীচে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করে। বুক যেন হাল্কা হয়। তবু নীলার কথা কয়টি যেন একটা সংশয়ের দাগ কাটিয়া গিয়াছে। এ প্রণামের প্রয়োজন কি? সে পীড়িত হৃদয়ে পুত্রকে বুকে টানিয়া রাত্রিতে শয়ন করে।

সে রাত্রি আবার প্রভাত হয়। অন্ধকারের সকল গ্লানি ধৌত করিয়া শিশিরস্নিগ্ধ-প্রাতরালোক হাসিয়া উঠে। কমল জাগে। গৃহের অবশ্য করণীয় কাজের আহ্বানে শয়ন ছাড়িয়া বাহিরে আসে।

সে-দুপুরে নীলা একা নয়। তাহার সঙ্গে কলগুঞ্জনে গৃহ মুখর করিয়া প্রায় আট দশটি মহিলা আসিয়া তাহার কক্ষ ভরিয়া ফেলিল। কমল প্রস্তুত ছিল না। তাহাদিগকে কোথায় বসাইবে, কি বলিবে কিছুই না বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া রহিল। কিছুই করিতেও হইল না, সমাগতের দল নিজেদের ব্যবস্থা করিয়া লয়। সচ্ছন্দে বসিয়া পড়িয়া গল্প জুড়িয়া দেয়। ইহাদের নাকি কি একটা সমিতি আছে। কমলের মনে হইল একটা বিশেষ লক্ষ্যের দৃষ্টিতে ইহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রবল। কিন্তু কি যেন এক আড়ম্বরের আতিশয্যে কূলপ্লাবী।

ইহাদের বর্ণনা ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কমল নীলার মুখে শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মুখোমুখী বসিয়া নিজের প্রাণের গতি পরীক্ষা করিতে হইবে, এ ধারণা তাহার ছিল না। তাই সে নিজেকে ছোট মনে করিয়া অন্যমনা হইয়া রয়। ভাবে, ইহারা এ শক্তি কোথায় পাইল? দলের ঐ যুবতী বিধবা মালিনী দেবীর মুখে যে প্রস্ফুট হাসি তাহা ত কমলের পরিচিত নয়, সে যেন অপূর্ব্ব। তাহার প্রতি মন অবলীলায় আকৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গীতে যেন কমলের প্রাণে কিসের মূর্চ্ছনা বাজিয়া উঠে। কমলের বিস্ময় শিথিল হইয়া যায়,—সে যেন ধরা দিতে চাহে।

ঘরের শোভা দেখিয়া মালিনী বলেন,—কমলা দেবী, বেশ ত আপনি, সত্যি আপনাকে পেয়ে আমরা সুখী হলুম। এখন নিত্যি এসে জ্বালাতন করবো, অসন্তুষ্ট হ'লেও ফিরবো না। কারণ মানুষের দাবী নিয়ে আমরা চলি ব্যক্তিবিশেষের ভর্ৎসনায় আমাদের ভয় নেই। আর আপনাকেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,—আপনি অসহায় ন'ন্, বিশ্ব আপনার সহায়, জীবনের শতদলে আপনার হৃদয়-পাপড়িটিও গাঁথা আছে।

কিন্তু কমলের কি যেন দ্বিধা হয়,—এ কি হেঁয়ালি! সে কিছুই না বুঝিয়া শুধু অবাক্ হইয়া থাকে।

তাহারা যখন চলিয়া যায় কমল আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জনতার ব্যস্ততায় অবিন্যস্ত সজ্জাদ্রব্যগুলি সযত্নে সাজাইতে বসে। বন্যার জলকে দূরে ঠেলিয়া আশ্রয় মঞ্চকে বাঁচাইয়া রাখিবার ক্ষীণ উদ্যম।

৩

বাহিরের অসংখ্য লোকের মধ্যে পরস্পর কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, প্রত্যেকেই আপন স্বার্থ লইয়া বিচরণ করে, প্রত্যেক হৃদয় অপর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ইহাই ছিল কমলের ধারণা। কিন্তু আজ তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া প'ড়িল যে সমাজ নামে একটি সত্তা আছে,—এক বিশেষ গঠন, বিশেষ কার্য্যনিয়ম নিয়া উহা যেন সকল মানুষগুলির হৃদয়ে একখানি ঐক্যসূত্র যোজনা করিয়া মালারচনা করে। নীলার সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক, ঐ বধূদলের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক সম্ভাবিত, ঠিক সেই সম্পর্কটি যেন আরও একটা বৃহত্তর দলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সেইখানে মানুষ

তাহার ব্যক্তিত্ব প্রসারিত করিয়া মহান্ হইয়া উঠে; গৃহকে অতিক্রম করিয়া তাহার কার্যভূমি দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

তাই কমল ধরা দিল। সে গৃহের বাহিরে পা দিয়াছে। 'বধূকুঞ্জ' নামক যে সমিতিটি সেদিন তার বাড়ী বহিয়া কল্লোল তুলিয়া গেল তাহারি কার্য্যে সে যোগদান করিয়াছে। ইঁহারা নারীজাতির উন্নতিকল্পে চেষ্টা করে। আধুনিক পুরুষের পাশে নারীকে সমান আসনে দাঁড় করাইতে চায়। আর তাহারি সঙ্গে শিল্পকলার সাধনা করে, লোকহিতের আরও যথাসম্ভব অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ কার্য্যপঞ্জী তাহাদের প্রকাণ্ড।

কমল আর দ্বিপ্রহরে গৃহে থাকে না। স্কুলের ছুটি হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে ফিরিয়া আসে। তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। একদিন রমেন আসিয়া ঘরে মাকে না দেখিয়া বিস্মিত মনে খুড়ীমাদের বাসায় তাঁহাকে খুঁজিতে গেলো, কিন্তু সেখানেও তিনি নাই।

কিন্তু কমল সেদিন সঙ্কোচ অনুভব করিল না, স্নেহের সহজভাবেই রমেনকে বলিল,—ওই ঘোষবাড়ীর বউটির কলেরা হয়েছিল, তাই দেখতে গিয়েছিলুম রে।

জীবনের এই পরিবর্ত্তন ক্ষুদ্র বালক ধরিতে পারিল না। বলিল,—বেঁচে আছে ত মা? অসুখের সঙ্গে বাঁচিয়া না থাকাটাই তার কাছে এখন অধিক পরিচিত।

তারপর সেদিন আরও কিছু বেশী। সন্ধ্যা হইয়া গেছে তথাপি কমল ফিরে নাই। রমেন বিষণ্ণ মনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে আপনি সন্ধ্যাদীপ জ্বালিল। পিতার ছবির নীচে ধূনা দিয়া প্রণাম করিল, মায়ের হইয়াও আর একবার প্রণাম করিল। তারপর বারান্দায় আসিয়া সন্ধ্যার ধূসর আকাশের পানে চাহিয়া রহিল, যেমন ধারা তার মাও একদিন চাহিয়াছিল।

কমল ঘরে ফিরিয়া, পুত্রকে ঐ ভাবে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। তাহার শিরচুম্বন করিয়া খাটে বসাইয়া দিল। তারপর ত্বরিতে তাহার আহারের আয়োজন করিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আজ রমেনের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। মায়ের শিথিলতা তাহার নিকট ধরা পড়িতেছে। সে অভিমানে ভালো করিয়া আহার করিল না। মায়ের শয়নকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

গৃহস্থালীর কাজ শেষ করিয়া কমল যখন শয়ন ঘরে ক্লান্তভাবে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। কেন যে আজ এত দেরী হইল সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর ছবির দিকে চাহিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। যেন এক তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা তাহার দুইচক্ষুতে নির্গত হইয়া ছবির সমস্ত অবয়ব অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই যে তাহার দৈনন্দিন স্মৃতি পূজার আজ প্রত্যবয় ঘটিয়াছে তাহার জন্য ছবির ললাটে কি এতটুকুও ভ্রূকুটী জাগিয়া উঠে নাই? তাহার মুখে কি অবিশ্বাসের কুটিল হাসি একটি রেখাতেও ফুটিয়া উঠে নাই? তবে কেন,—তবে কেন এই ছলনা!

এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস কমলের বক্ষ ভেদ করিয়া সমস্ত গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কমল আবিষ্ট চিত্তে দাঁড়াইয়া রয়। তারপর আর্ত্ত রুদ্ধ স্বরে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে আছাড়িয়া পড়িয়া সে মেজের উপর লুণ্ঠিত হইল। অশ্রুতে তাহার পূজার আসন অভিষিক্ত হইয়া গেল। তাহার প্রাণের ভিতরে শেষ প্রশ্ন বাজিতে লাগিল,—ওগো, তুমি কি একেবারেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছো? স্নেহ-মায়া, রাগ-অভিমান, বিশ্বাস-সন্দেহ সব চুকাইয়া তুমি একেবারেই মুক্ত হইয়া গেলে? আমাকেও মুক্তি দিয়া গেলে?

তারপর সেই মেঝেতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ যেন সে আর একবার বিধবা হইয়াছে।

আবার রাত্রি প্রভাত হইল। কমল যখন জাগিল তখন ঘর ভরিয়া রৌদ্র হাসিতেছে। রমেন পাশের ঘরে পড়িতে বসিয়াছে। শরতের নির্ম্মল রৌদ্রে যেন মানুষের অন্তস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কমল আপনার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া উঠিল, সে হাসি অস্তমান শশীর শেষ জ্যোৎস্নার চেয়েও সুকরুণ। আজ তাহার মনে হইল তাহার গৃহ সম্পূর্ণ শূন্য, এত সব সরঞ্জাম সাজাইয়াও সে কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, চতুর্দ্দিকে একেবারে পরিষ্কার শূন্যতা। কেবল অতীত ব্যক্তির সজ্জাভূষণগুলি এক বৃহৎ অসঙ্গতি নিয়া খাপছাড়া দেখাইতেছে। ছবিতে ঝুলানো বেলি ফুলের মালাও যেন আজ অতীব বিসদৃশ।

সেদিন অপরাহ্নে স্কুল হইতে ফিরিয়া রমেনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পিতার সেই আবৃত খাটখানি খুলিয়া গুটাইয়া কোনের ঘরে রাখা হইয়াছে, লেপতোষকগুলি একটা বড় বাক্সের উপর ভাঁজ করা পড়িয়া আছে। ছবির শুষ্ক মালা আর নাই। নিরাভরণ ছবি আজ রমেন প্রথম দেখিল। ছবির নীচে মায়ের পূজার আসন আর নাই, বারান্দার পাশে ছোট কুঠুরীকে যেন ঠাকুর-ঘরে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

একসঙ্গে এই এতগুলি আকস্মিক পরিবর্ত্তন বালক সহিতে পারিল না। সে নিরুদ্ধ ক্রন্দনের স্বরে ডাকিল, - মা।

কমল খাবার হাতে ঘরে ঢুকিয়া ধীরে কণ্ঠে কহিল, কি বলছিস রমু?

রমেন কাঁদিয়া ফেলিল, বিগলিত অশ্রু তাহার বক্ষস্থল ভাসাইয়া দিল। কমল বুঝিল। সে নীরবে রমুর হাত ধরিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, বারান্দায় বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল।

বলিল,—দেখ রমু, ঘরে তোমার সেই মাসীমা'রা সব আসেন, বসবার জায়গা দিতে পারি নে, তাই খাটখানা ওঘরে সরিয়ে রেখেছি। কে কোন দিন ওটার ওপরেই ব'সে পড়বে এখুনি—

বালক পুত্রের নিকট যে এতখানি জবাবদিহি করিতে হবে তাহা সে আগে বোঝে নাই, তাই এমনি ভাবে একটা অসত্য কহিয়া ফেলিল।

রমেন কি বুঝিল কে জানে। সে নীরবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

৪

কমল প্রাণের ভিতর যে মুক্তির আভাস পাইয়াছে তাহা ক্রমেই প্রখর হয়। দিনে দিনে তাহার উত্তাপ বাড়িয়া অবশেষে এক দারুণ প্রদাহ জ্বলিয়া উঠিল। আর যেন কোন বন্ধন নাই,—মনের সমস্ত স্মৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়া এক শ্মশান-শয্যা রচনা করিয়াছে। কমল সেখানে যেন এক উগ্র বেদনায় সমার্ত্ত হইয়া আশ্রয় অভাবে নিজেকেই দুই হাতে জড়াইয়া ধরে।

সে আপনার মনে হাস্য করিয়া কল্পনা করিল, তাহার পুরুষানুক্রমের হিন্দুবৈধব্যের বিশাল সাধনায় আগুন জ্বলিয়াছে,—দেবতার নন্দন-বন ভস্মীভূত। পৃথিবীতে সে একা আসিয়াছিল আপন আত্মার জন্মগ্রহণের শাশ্বত অধিকারে; আজিও সে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে আপনার জীবনধারণের ন্যায্য অধিকারে। পথের পথিক সঙ্গী নিজের লক্ষ্যে চলিয়া গিয়াছে, সে কেন তবে আলেয়ার পিছনে তাহার আশায় ঘুরিয়া মরে?

বধূকুঞ্জের সেই বিধবা বধূ মালিনী দেবী আসিয়া বলিলেন—কমল, তোমাকে দেখে এখন আমাদের ভয় হয়। মনে ভাবি, তোমার মত দুর্ব্বলকে কেন আমরা দেশের কাজে নামিয়েছিলুম, বড় ভুল হয়েছিল। তোমার শক্তি কম বলেই এতটা স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে উঠেছো, চলতে তোমার পা টলে যায়। আমাদের সমিতির সীমাকেও লঙ্ঘন ক'রে তুমি ছুটে চলেছো, এতে কাজে কত বিশৃঙ্খলা আসে বলত!

যাহাদের জন্য একদা ছেলের নিকট জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল আজ আবার তাহারাই আসিয়াছে জবাব লইতে।......

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া কমল উত্তর করিল,—দুর্ব্বল আমি নই, আপনারাই। দেশের কাজের ছল করে আপনারা যে সমিতি গড়েছেন তা যে কত ক্ষুদ্র আপনারা জানেন না। ভাবেন গৃহটাকে মস্ত বড় ক'রে তুলছেন, আর এতে ক'রে নারী মহীয়সী হ'য়ে উঠছে। তা নয়, মালিনী দেবী। গোটা নারী টাকে আপনারা টুকরো টুকরো ক'রে অনেকখানি পথে ছড়িয়ে ফেলেছেন, এই পর্য্যন্ত। ব্যক্তির উদ্ধার করতে গিয়ে আপনারা তার বিরাট মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ে আবার তাকে সমিতির শিকলে বেঁধে রাখতে চান, কতকগুলো তত্ত্বের জালে জড়িয়ে তাকে আড়ষ্ট করে দিতে চান। তাই আমি জোর ক'রেই স্বেচ্ছাচারিণী হয়েছি, এ আমার খুসী।

মালিনী দেবী স্তম্ভিত হইলেন। কমলের এই অপরূপ খুসীর মূর্ত্তি ত তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই; তার এই কথাগুলি যেন প্রলাপ-বাক্য, সর্ব্বনাশের ইঙ্গিত মাত্র! তিনি চলিয়া গেলেন কারণ তখন একটি সভার সময়

হইয়াছে, প্রেসিডেণ্টের বাড়ী এখুনি যাইতে হইবে। কমলের কথা ভাবিয়া দেখিবার আর অবকাশ নাই।

নীলা আসিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। পড়ন্ত বেলার দীর্ঘ ছায়াগুলি গৃহের দেওয়ালে ভূতের মতো অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। কতক্ষণ নীরব থাকিয়া নীলা বলিল, দিদি, মনে আছে তো, কাল সতীশ বাবুর মৃত্যুর এক বছর হয়ে যাবে, বার্ষিক শ্রাদ্ধ করবার কি ব্যবস্থা করলে?

কমল নিজের এলো চুলের একগোছা মুঠায় চাপিয়া সচকিত হইয়া উত্তর দিল,—কোন দরকার নেই, মৃতের সঙ্গে এই সংস্কারের সম্বন্ধস্থাপনে ত' কোন লাভ নেই। আর আমি যা দরকার মনে করিনে তা কেন করতে গেলুম?

নীলার বহুদিনকার নিজের একটা কথা মনে পড়িল। কিন্তু সেদিন সে বোঝে নাই যে কমলের নিজের দরকার এতখানি বিপর্যাস্ত হইয়া যাবে।

কমল নিজের চুলে পাক লাগাইতে লাগাইতে বলিয়া গেল,—দেখো নীলা, তোমাদের সঙ্গে আমার আর পোষায় না। তোমাদের সমিতির ভেতর দিয়ে সমাজসেবা করতে গিয়ে আমি আমার রমুকে ঠকিয়ে এসেছি, আমার নিজের মাতৃত্বকেও পিছনে ধূলিসাৎ করে দিয়েছি। তাই এখন আর রমু আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না। সে বুঝেছে আমি তার ধ্যানের মন্দির ভেঙ্গে খেলার মাঠ তৈরী করছি।

বলিতে বলিতে বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া কমল অসহায় ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

নীলা অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। যাইবার পথে ভাবিতে লাগিল, যে মুক্তির সন্ধান আজ নারী করিতেছে তাহা সহ্য করিবার মত শক্তি কমলদি'র নাই,—কেন? তাহার নিজের আছে ত?

আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি রমেন এখনো ফিরে নাই। কমল চিন্তাকুল হইল। কলিকাতা নগরীর এই বিরাট যানবাহনের মধ্যে পড়িয়া তাহার অসহায় ছেলেটি আহত হয় নাই ত? কিন্তু শঙ্কা কিসের? সে ত একাকীত্বের গৌরব করিয়াছে।

এই কিছুদিন পূর্ব্বে সে যে মুক্তি অনুভব করিয়াছিল তাহা যেন পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া একটি মাত্র বালকের মুখে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কল্পিত শেষ যেন আবার এক গোপন আরম্ভ লইয়া করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহে। কই, সকল সম্বন্ধ ত চুকিয়া যায় নাই! তাহার স্বামীর অসীম দূরত্ব যে রমুর ক্ষুদ্র বক্ষে ধরা দিয়াছে, কমলের এত নিকটে সে......

রমু কোথায়? কমল অধীর হইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল। রাত্রির বিলাস আয়োজন তখন বাড়িতেছে, বিজলী আলোকে সমগ্র নগরী যেন বীভৎস পতিতার মতো রূপের ডালি সাজাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সভ্যতার বিকট মূর্ত্তি এমন নিপ্রেম ভয়ঙ্কর রূপ আর কোনদিন সে দেখে নাই। তাই শিহরিয়া আবার ঘরের ভিতর ফিরিয়া বসিয়া পড়িল।

সহসা চোখে পড়িল তাহার স্বামীর ছবিখানি যথাস্থানে টাঙানো নাই, কোথায় স্বামী?

কমল ঘরের চারিপাশে বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, কোথাও সে ছবির চিহ্ন নাই। শুধু রমুর বিছানার পাশে একটুকরা কাগজ পড়িয়া আছে। সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া কাগজখানা কুড়াইল। পড়িল রমেনের চিঠি। লিখিয়াছে তাহার আর এখানে ভালো লাগিতেছে না, তাই সে চলিয়া গেল।

কিশোর হাতের বড় বড় অক্ষরগুলি কমলের মুক্তি-শ্মশানের ধূমাঙ্কিত শিখার মতো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যেন খেলিতে লাগিল।

রমু চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে তাহার বাপের ছবি নিয়া গেছে। ভালই হইল, যাহার বুকে এখনো সে ছবি বাঁধিয়া আছে সেই ত তাহা লইবে, অন্যের ত তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

কমল বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল। আর যেন কিছুই ভাবিতে ইচ্ছা করে না। স্বামীর যে সজ্জাদ্রব্যগুলি এক-দিন চোখে অতি বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল আজ যেন তাহারা অলক্ষ্য হইয়া হাসিতে লাগিল, যেন তাহারা শতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আজ তোমায় মুক্তি দিলাম।

কিন্তু কমল ত মুক্তি চাহে না। রমু যদি আজ একটি-বার ফিরিয়া আসে সে এখনি তাহাকে আঁচলের ভিতরে বুকের মধ্যে বাঁধিয়া লইয়া বসিয়া থাকিবে; রমুর হৃদয়ে যে মানুষটি লুকাইয়া হাসিতেছে তাহার পায়ে আপনাকে লক্ষ শৃঙ্খলে বন্দী করিবে। কিন্তু কোথায় রমু?

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। নগরীর কোলাহল ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে। বাতায়নপথে ম্লান চন্দ্রালোক আসিয়া কমলের আর্দ্র নয়নের অশ্রু-বিন্দুগুলি যেন সস্নেহে লেহন করিয়া লয়।

মেঝের উপর অবলুণ্ঠিত কমল কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার হৃদয়ের নিশ্বাসে যেন নারী-জীবনের পরম মুক্তি শূন্যতা ছাড়িয়া আশ্রয় খুঁজিতেছে।

সত্যই সে আজ বিধবা।

খেলাঘর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

৩

নবী নওয়াজ যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম নিম্নলিখিতরূপ,—

গ্রামখানি বড় নয়, ছোটই। এবং ছোট বলিয়াই নবী নওয়াজদের আয়মাদারী ছোট হইলেও প্রতাপ ছিল অসম্ভব রকম বেশী,—অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, অথচ অত্যন্ত সহজ। শিক্ষায়-দীক্ষায়-সভ্যতায় গ্রামে মানুষ বলিতে একজনও ছিল না।

নবী নওয়াজদেরই দলিজে মোবারক মিঞা একটা মক্তাব মতন খুলিয়াছিল। মোবারকের বাড়ী ওখানে নয় বটে, কিন্তু কাছেই। নিজে সে নবী নওয়াজদের বাড়ীতেই 'তালবিলিম' থাকিত, সুতরাং খাওয়ার খরচ ছিল না। তার উপর পাঁচ বাড়ী হইতে ছেলেদের মাহিনা বাবদ টাকাটা-সিকাটা, এবং আলু-মূলা-চা'ল-ডা'ল পাঁচ রকম মিলিত। ইহার সমস্তটুকুই সে বাড়ী পাঠাইয়া দিত।

এই মোবারকের নিজের বিদ্যা বেশী ছিল না। কিন্তু ছুলিয়া-ছুলিয়া সেইটুকু আয়ত্ত করিতেই গ্রামের ছেলেদের ষোলোটা বছর পার হইয়া যাইত। সকালে-বিকালে মক্তাব; তামাকে-বিড়িতে এবং আরও বিবিধ প্রকারে পরিপক্ক হইবার ছেলেদের যথেষ্টই অবসর মিলিত। সুতরাং ষোলো বছর পরে মোবারকের মক্তাব হইতে যাহারা বাহির হইত, তাহারা একেবারে সাবালক হইয়াই বাহির হইত।

এই মক্তাবে নবী নওয়াজ নিজে পড়িয়াছে, তাহার দাদা পড়িয়াছে এবং তাহার ছোট ভাইও পড়িত। গ্রামের মধ্যে যে কয়টি লোকের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহারা সকলেই এই একই কারখানায় প্রস্তুত। কিন্তু সে অক্ষর পরিচয় এতই স্বল্প যে, নিরক্ষরদের সঙ্গে পার্থক্য অতি সামান্যই। এই সামান্য পার্থক্য লইয়া অহঙ্কার করা চলে না। সে অহঙ্কার নবী নওয়াজ করিতও না; আহারে-বিহারে, কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে নবী নওয়াজ কোনোদিন দূরত্ব রাখিয়া চলিত না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই তাহাদের প্রতাপ ছিল অখণ্ড।

নবী নওয়াজদের আয়মাটুকু অনেক কালের। তাহার নিজের বিশ্বাস, বহু পুরাকালের কোনো নবাব তাহার কোনো পূর্ব্বপুরুষের অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এই আয়মা দান করেন। সে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আর মেলে না, এবং আয়মাটিও ক্ষইয়া ক্ষইয়া এই টুকুতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু যাহা বস্তু নয়, যাহা নীলিমার মতো ফাঁকি তাহাই ইহাদের রক্তে অক্ষয় হইয়া আছে: অতীত গৌরবের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তাহারই কাহিনী সত্যে-মিথ্যায় মিশিয়া ইহাদের সকলেরই মনে-মনে পুঞ্জিত হইয়া আছে।

হৃত সম্পত্তির কিছু ফিরাইয়াছিলেন নবী নওয়াজের বাবা। প্রখর বিষয়বুদ্ধির সাহায্যে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। অনেক সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো ইচ্ছাই সফল করিবার সময় পাইলেন না। অধিকন্তু সেই অর্থ যাহাদের জন্য তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহাদের একটির বয়স তখন ষোলো, আর একটির বারো এবং সর্ব্ব-কনিষ্ঠটি একেবারেই শিশু।

এই দুঃসময়ে মোবারক মিঞা নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত বোঝা না তুলিয়া লইলে বিধবা জননী নাবালক ছেলে কয়টিকে লইয়া একেবারে অকূলে ভাসিতেন। লেখাপড়া শিখে নাই বটে কিন্তু গ্রামের লোকের আইনের বুদ্ধি এতই তীক্ষ্ণ যে, ধাক্কা সামলানো বিধবার পক্ষে অসম্ভব হইত। যাহারা টাকা ধার লইয়াছিল তাহারা ধার অস্বীকার করিল, দেখিতে দেখিতে অনেকগুলা জাল হ্যাণ্ডনোটও তৈরী হইয়া গেল, এবং এক বৎসরের মধ্যে দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে ছোট-বড় দশ-বারোটা মামলা নবী নওয়াজদের বিরুদ্ধে দায়ের হইয়া গেল।

বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র মোবারক মিঞার ছিল না। কিন্তু তাহার মস্ত বড় সাহস লইয়া সে সর্ব্বক্ষণ নবী নওয়াজের বড় ভাই দীন মহাম্মদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে। বছর পাঁচেক পরে ফল হইল এই যে, মোবারক সেই মোবারকই রহিয়া গেল, কিন্তু মামলা করিতে দীন মহাম্মদের জোড়া ও-অঞ্চলে আর কেহ রহিল না।

নবী নওয়াজ তখন ছোট, এবং সোলেমান তো আরও ছোট। বাস্তবাগীশ বড় দাদাটিকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় লাগিত। রান্না শেষ হইতে হয় তো আর তিন মিনিট দেরী আছে, কিন্তু দীন মহাম্মদের ততটুকু অপেক্ষা করিবারও তর সহিত না। সেটুকু সময় অপেক্ষা করিলে যে ট্রেণ ফেল হইয়া যাইবে এমনও নয়। তথাপি কলের ব্যাপার; এই যাঃ! বলিলেই সদরের মামলার দফা শেষ হইয়া যাইবে। দীন মহাম্মদ না খাইয়াই অধিকাংশ দিন চলিয়া যাইত। অথচ পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব জাহির করিবার জন্য দীন মহাম্মদ মোটেই চেষ্টা করিত না। না খাওয়ার ব্যাপার লইয়াও কোনোদিন সমারোহ করিত না। মামলা মোকর্দ্দমার কাগজপত্র লইয়াই সে এত ব্যস্ত থাকিত যে, ইংরাজিতে যাহাকে 'সীন ক্রিয়েট্' করা বলে, তাহার সময়ও মিলিত না। স্বভাবত সে নির্ব্বিরোধ ছিল। বাইশ বছর বয়সেই সে হৈ চৈ করাটা ছেলেমি মনে করিত। আইনের প্যাঁচ কষিয়া মামলা জেতা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো বিষয়ে তাহার আগ্রহও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না।

এই অগ্রজটির প্রতি নবী নওয়াজের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। মক্তাব ছাড়ার পর নিজে সে চাষ-বাস, গরু-বাছুর, মুনিস-রাখালের তত্ত্বাবধান করিত। আইন-আদালতের ব্যাপারটি কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। দাদার অতটুকু ছোট মাথার মধ্যে কি করিয়া অত সব গোলমেলে ব্যাপারের স্থান সঙ্কুলান হইয়াছে ইহা ভাবিতেই সে দাদার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত। দাদার খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া সোরগোল করিয়া বাড়ীর মেয়েদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত সে-ই। এবং যেদিন দাদাকে না খাইয়াই সদরে মামলা করিতে যাইতে হইত সেদিন আর সে বাড়ীতে কাক-চিল বসিতে দিত না।

কোনো হাঙ্গামে থাকিত না সোলেমান। পাশা এবং গান-বাজনার নেশাটা বেশী ছিল বলিয়া মক্তাবের বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সে বেশী সময় নষ্ট করে নাই। সকালে উঠিয়া খানিকটা কাঁচা দুধ পান করিয়া সে আড্ডা দিতে বাহির হইত, ফিরিত বেলা একটায়। তার পরে দুইটা আড়াইটার মধ্যে সাত-তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু নাকে মুখে গুঁজিয়া সেই যে বাহির হইত, ফিরিত রাত্রি বারোটায়।

প্রতিবেশীগণ মাঝে মাঝে আসিয়া নালিশও জানাইয়া যাইত,—ওহে নবী নওয়াজ, সোলেমানটার দিকে একটু নজর রেখো। ওটা যে একেবারে খারাপ হ'য়ে যেতে ব'সেছে।

প্রতিবেশীরা নিতান্ত মিথ্যা বলিত না। যে পাড়ায় সোলেমানের আড্ডা সেই পাড়ায় তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলিয়াই নিজের দলিজ ছাড়িয়া অত দূরে যাইত। কিন্তু নিতান্ত বদ্‌মেজাজি বলিয়া এই খবরটি নবী নওয়াজের কানে তুলিতে কেহ সাহস করে নাই।

সে হাসিয়া বলিত,—কি আর ও করবে মাইতোর মিঞা? বড় ভাই আছে, আমি আছি, ও যে-ক'দিন পারে হেসে-খেলেই বেড়াক। এ সব ঝঞ্ঝাটে যত না আসা যায় ততই ভালো। এই দেখ না, বড় ভাই আজ না খেয়েই গেল চ'লে। আমাদের জন্যেই তো। নইলে—

কিন্তু মাইতোর মিঞা সেদিন বিশেষ কারণেই আসিয়াছিল। মোড়াটা খুঁটির কাছে সরাইয়া আনিয়া নবী নওয়াজের হাতের ফরসি টানিয়া লইয়া প্রথম কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া তামাক খাইতে লাগিল। ইত্যবসরে নবী-নওয়াজ বড় ভাই সংসারের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতেছে তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়া বলিল,—এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে প্রাণ দ'রে কেউ মায়ের পেটের ভাইকে নামাতে পারে? তুমিই বল।

বলিয়া মাইতোর মিঞার মন্তব্য শুনিবার জন্য তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মাইতোর মিঞা এতক্ষণে চোখ মেলিল বলিল,—আমি বলি, ওর একটা বিয়ে-থা দাও।

নবী নওয়াজের বিশ্বাস, এই শুভ-কর্ম্মটি তাহারই 'সেরেস্তা'র অন্তর্গত। এইরূপ ব্যাপারে উৎসাহ অনন্ত। সে মোড়াটা একেবারে মাইতোর মিঞার সন্নিকটে টানিয়া

আনিয়া বলিল,—সেই চেষ্টাই করছি। পাহাড়পুরের মাজুম মিঞার নাৎনীর সঙ্গে। কিন্তু ছোঁড়াটা কেমন যেন স'রে স'রে বেড়াচ্ছে। তোমাদের কথা তো শোনে ও। দেখ না একবার চেষ্টা ক'রে।

মাইতোর মিঞার ঠোঁটের কোনে একটু কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল। কেন যে সে সরিয়া সরিয়া বেড়ায় সেই কথাটা জানাইবার জন্যই তাহার আসা।

সে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—আমি বলি, রহিম খাঁয়ের মেয়ের সঙ্গে হ'লে কেমন হয়?

প্রস্তাব শুনিয়া নবী নওয়াজ যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বলিল,—বল কি মাইতোর মিঞা? নিকে?

মাইতোর মিঞার বলিবার ইচ্ছা ছিল, ক্ষতি কি? কিন্তু বদ্‌মেজাজী নবী নওয়াজের মুখ-চোখের অবস্থা দেখিয়া সে কথা আর বলিতে ভরসা পাইল না।

নবী নওয়াজ বলিল,—সে হয় না, মাইতোর মিঞা। তার চেয়ে আমি যা বল্‌লাম, তাই দেখ।

সুতরাং রহিম খাঁর বিধবা কন্যার সহিত নিকার প্রস্তাব এইখানেই শেষ হইয়া গেল। কথাটা যথা সময়ে সোলেমানের কাছেও পৌঁছিল। সে মনে মনে গর্জ্জন করিল,—আচ্ছা।

কিন্তু মনের ক্রোধ মনেই রাখিতে হইল। বিপুল বলশালী বলিয়া নয়, অগ্রজ বলিয়াই তাহার কাছে নিজের মনের বাসনা জানাইবার মতো বুকের পাটা তার ছিল না। নিরুপদ্রব দাদাকে নবী নওয়াজ অত্যন্ত ভক্তি করিত বলিয়াই, বোধ হয়, ছোট ভাই-এর কাছ হইতে ভক্তির দাবী করিতে তাহার উপদ্রবের অবধি ছিল না। ছোট ভায়ের খাওয়া-পরা, এমন কি বিলাসিতার পর্য্যন্ত এতটুকু অভাব সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু তাই বলিয়া নবী নওয়াজের কথার একটুকু প্রতিবাদ করিলে দাদা তাহা ক্ষমা করিবে এমন ভরসা বড় হইয়াও সোলেমান করিতে পারিত না। সুতরাং সে চুপ করিয়াই রহিল।

তার পরে অনেকদিন কাটিয়া গেল। মাজুম মিঞার পৌত্রীর সহিত বিবাহ অতি তুচ্ছ কারণেই একদিন ভাঙ্গিয়া গেল। এবং ইহারা মাজুম মিঞাকে এক হাত দেখিয়া লইবার জন্য বদরগঞ্জের বিখ্যাত আলি হোসেনের মেয়ের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সোলেমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমান লোকের কল্পনা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে লাগিল। তাহারা প্রাণপণে সোলেমানের কাণ ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। বুঝাইয়া দিল, বিষয় নবী নওয়াজের একার নয়, সোলেমানেরও তাহাতে সমান অংশ আছে। ইচ্ছা করিলেই মামলা করিয়া চুল চিরিয়া নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে পারে।

সোলেমান বলে, ঠিকই তো।

তাহারা বলে, সোলেমান এখন সাবালক হইয়াছে। সে যাহাকে খুসী বিবাহ করিতে পারে। দাদাদের তাহাতে বলিবার কোনো অধিকার নাই।

সোলেমান সোল্লাসে বলে, নিশ্চয়ই।

তাহারা আরও বলে, বদরগঞ্জের যে-মেয়েটির সঙ্গে বিবাহের কথা হইতেছে, সেটি যেমন কালো, তেমনি কুৎসিত, ইহা তাহাদের স্বচক্ষে দেখা। বড় বংশের মেয়ে আসিয়া কি বেহেস্ত হাতে তুলিয়া দিবে? ইহার উপর, মেয়েটির বয়স নয় বৎসরের বেশী নয়। এই বৃদ্ধ বয়সে (তখন সোলেমানের বয়স ষোলো) সোলেমান কি কচি খুকীকে পলিতায় করিয়া দুধ খাওয়াইবে?

সোলেমান রাগের মাথায় নবী নওয়াজের বিরুদ্ধে মুখে যা' আসে বলিয়া যায়। লোকে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে। তা হাসুক। কিন্তু এত কাণ ভাঙ্গাভাঙ্গি সত্বেও সোলেমান দাদার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। নবী নওয়াজও পূর্ব্ববৎ বিবাহের সম্বন্ধ চালাইতে লাগিল। তবু গ্রামের লোকের আনন্দ আর ধরে না। বলে, একটা মস্ত বড় সম্পত্তিবিচ্ছেদের মামলা বাধিবার আর দেরী নাই। এমন কি, নবী নওয়াজের বলিষ্ঠ দেহের কথা ভাবিয়া একটা খুনো-খুনির আশঙ্কা পর্য্যন্ত মনে উঠে।

মস্ত বড় সম্পত্তিবিচ্ছেদের মামলা বাধিল না বটে, কিন্তু খুনোখুনির আশঙ্কাটা মিথ্যা হইল না। তবে তাহার

সহিত এই ঘটনার কোনো সম্বন্ধ নাই। ঘটনাটা অত্যন্ত তুচ্ছ, এবং এত তুচ্ছ উপলক্ষে একটা খুন হইয়া যাইতে পারে এ কথা মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে না। তথাপি এই তুচ্ছটাকে অবলম্বন করিয়াই একটি মানুষের সাধ আকাঙ্ক্ষা, হাসি ও আনন্দ চিরদিনের মতো শেষ হইয়া গেল।

আগের রাত্রে পাশা খেলায় চার বাজি হারিয়া আসিয়া সোলেমান সমস্ত রাত চোখের পাতা বুজে নাই। সকালে সেই চার বাজি শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছিল না।

তখনও বেশ ভোর হয় নাই। দীন মহাম্মদ ও নবী নওয়াজ দলিজের দাওয়ায় বসিয়া বদ্না লইয়া মুখ ধুইতেছিল। দীন মহাম্মদ আগের রাত্রে সদর হইতে ফিরিয়াছে। মনটা তাহার ভালো নাই। ও-পাড়ার ইয়াকুব তাহারই পয়সায় সদরে গিয়া তাহারই বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। ইয়াকুবের পক্ষে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সাক্ষ্য দেওয়া তাহার পেশা। যাহার কাছ হইতে বেশী টাকা পাওয়া যায়, তাহারই পক্ষে সে সাক্ষ্য দেয় ইহা দীন মহাম্মদ না জানিত তাহা নয়। কিন্তু টাকা কড়ির সমস্ত ব্যাপার ঠিক হইয়া যাওয়ার পর সে যে সদরে পা দিয়াই আরও দাঁও কসিবার চেষ্টায় বাঁকিয়া বসিল, ইহাতেই তাহার জেদ চড়িয়া গেল। সে সোজা বলিয়া দিল, ইয়াকুবকে সে আর একটি পয়সাও বেশী দিবে না, ইহাতে সে সাক্ষ্য দিক্, আর নাই দিক্।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া দীন মহাম্মদ স্থির করিল, একখানা জাল হাণ্ডনোট তৈরী করিয়া ইয়াকুবকে একবার হাই-কোর্ট দেখাইয়া আনিতে না পারিলে সে সায়েস্তা হইবে না। এইজন্য রাইগ্রামের জয়হরি ঘোষকে আজই তাহার বিশেষ প্রয়োজন। চাকরের হাতে চিঠি পাঠাইয়াও তাহাকে আনাইতে পারা যায়। কিন্তু কাজটা কাঁচা কাজ হইবে। জয়হরিকেও তো বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং নিজেদের কাহাকেও যাইতে হয়।

নবী নওয়াজ বলিল,—এই তো রাই গাঁ। কতটুকুই বা পথ! সোলেমান বরং ঘোড়াটা নিয়ে একবার যাক্। জলখাবারের বেলা হ'তে না হ'তে ফিরে আসবে।

এমন সময় সোলেমান চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল।

—এই তো সোলেমান! ওরে, ঘোড়াটা নিয়ে একবার যা তো রাইগাঁ। বিশেষ দরকার জয়হরি ঘোষকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি।

গ্রহের ফের! যে সোলেমান অত বড় বিবাহ ব্যাপার লইয়া দাদাদের মুখের সামনে একটা কথা বলিতে সাহস করে নাই, সামান্য পাশা খেলায় তাহার এমনই বুদ্ধিভ্রংশ হইল যে, সটান তাহাদের মুখের উপর বলিয়া বসিল,—আমি পারবো না।

গ্রহের ফের বই কি! এই সামান্য কথায় নবী নওয়াজ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কি? কি বললি?

সোলেমান আরও জোরে চেঁচাইয়া বলিল,—আমি পারবো না।

চক্ষের পলকে নবী নওয়াজের হাতের বদনা বিপুল বেগে সোলেমানের রগে গিয়া লাগিল; এবং "মা গো" বলিয়া সেই যে সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, আর উঠিল না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নবী নওয়াজ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর বলিতে পারিল না।

তাহার কান্নায় পাশের একটি কয়েদীর বোধ হয় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—জ্বালালে!

(ক্রমশঃ)

অবকাশ

শ্রীপ্রণব রায়

শিরাষ-পাতার ফাঁকে তৃতীয়ার চাঁদের ইসারা;
বাতাস উতল;
আকাশের বাতায়নে উঁকি দেয় লজ্জাবতী তারা—
চোখে তা'র হাসি আর সুমধুর ছল!
জ্যোৎস্না উঠেচে আজ, সব কাজে ঘটিতেছে ভুল:
দখিণার গানে
এত মিঠা মোহ আছে! দু'টি ছোট ভীরু জুঁইফুল
ভাঙ্গা টবে ফুটিয়াছে কখন্ কে জানে!

ঘর ছেড়ে উঠে এসো—আকাশের নীচে আছে ছাদ;
গৃহকাজ রাখ',
পড়ুক্ ললাটে তব চাঁদের করুণ আশীর্ব্বাদ,
অগোছালো এলোচুলে খোঁপা বেঁধ'নাক'।
দূর থেকে শোনা যায় 'বাস্' আর ট্রামের ঘর্ঘর,
পথ-কোলাহল;
তুমি থেকো একাকিনী হাত রেখে আলিসার 'পর
আজি এ-সন্ধ্যার মতো ক্লান্ত ও কোমল।

একটি মুহূর্ত্ত তরে চেয়ে দেখো দূর নভলোকে,—
ভুলে যেও বাসা;
ভেবো মনে, আমি বুঝি অবগাঢ় আকাশের চোখে
পাঠায়েছি স্নেহ আর কুশল-জিজ্ঞাসা।
আমারে চেনো না তুমি, তোমাকেও চিনি না আমিও-
নাই পরিচয়;
আজিকার অবকাশে তবু মোরা আত্মার আত্মীয়,
মনে মনে হোক্ আজি ক্ষণপরিণয়!

একটি মিনিট পরে জানি মোর মানসের মিতা,,
মিলাবে স্বপন;
বিরহের অবকাশে তবু অয়ি ক্ষণপরিণীতা,
মনে মনে রচিলাম্ মুহূর্ত্ত-মিলন॥

সমসাময়িক সাহিত্য

মাসিক বসুমতী

"হিন্দুসমাজে সমাজতন্ত্রবাদ"।—এই প্রবন্ধে লেখক বলিতে চাহিয়াছেন—আজকাল যে নানা অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে—আজকাল যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সমাজের কর্ত্তৃত্বের বিরোধ প্রায়ই বাধে—কতকগুলি লোক কুবেরের সম্পদ্ লইয়া বিব্রত—আর কতকগুলি লোক একেবারেই খাইতে পায় না—এই জাতীয় সমস্যা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার গুণে আমাদের দেশে পূর্ব্বে আদৌ ছিল না। বর্ণবিভাগের দ্বারাও সমাজে সমানভাবে ধনবণ্টনের একটা ব্যবস্থা ছিল, বর্ণবিভাগের গুণে সমাজের ভারকেন্দ্র ঠিক থাকিয়া যাইত। এককথায় প্রকৃত হিন্দু সমাজের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য অতি সুন্দর ভাবে সাধিত হইত অথচ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ ছিল।

লেখক যাহা বলিতে চাহিয়াছেন—তাহা সত্য হইতে পারে—হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান হইতেও ইহার প্রমাণ হইতে পারে না—দেশের ইতিহাস হইতেও ইহার যথাযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ শাস্ত্রের বিধান দেখিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা ধরা যায় না—কারণ শাস্ত্রে বিধান থাকিতে পারে—সে বিধান বর্ণে বর্ণে প্রতি-পালিত হইত কে বলিল? শাস্ত্রের এমন বহু বিধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে—যাহা সচরাচর প্রতিপালিত হয় নাই। আর দেশের ইতিহাস আমরা যতটুকু পাইয়াছি—তাহা রাজা ও ঋষিদের। জন-সাধারণের জীবনযাত্রার ইতিহাস বড় পাই না। জন-সাধারণের জীবনযাত্রার ইতিহাস না জানিলে জাতীয় ব্যবস্থা ও অবস্থার কথা জানা যায় না। লেখক গত শতাব্দীর সামাজিক অবস্থা দেখিয়া প্রাচীন অবস্থার কথা অনুমান করিয়া লইয়াছেন—আর একটা অনুমান তাহার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে—এখনকার ব্যবস্থা আর পূর্ব্বের ব্যবস্থা এক নহে—এখনকার অবস্থা যখন মন্দ তখন বিভিন্ন ব্যবস্থার শাসনের অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল ছিল।

লেখকের অনুমানকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না বটে—কিন্তু দৃঢ়তর প্রমাণ চাহিতে পারি। এদেশের প্রাচীন কালের সকল ব্যবস্থাই মন্দ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতিবুদ্ধিকে যেমন প্রশংসা করিনা—স্বপ্ন-যুগের সবই চমৎ-কার এই ধারণাও তেমনি প্রশংসনীয় নয়। ভারত বহুদিন হইতে স্বাধীনতা হারাইয়াছে, বিদেশীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই—স্বাধীনতা হারাইয়া একদিনের জন্যও ফিরিয়া পায় নাই বা সেজন্য প্রচণ্ড চেষ্টাও করে নাই ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই দুর্দ্দশা হইতেই বহুলোকের ধারণা জন্মে—প্রচীন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই মন্দ ছিল—যে ব্যবস্থার ফলে ভারত আত্মরক্ষা করিতে পারিল না—সে ব্যবস্থা কখনো আদর্শ ব্যবস্থা হইতে পারে না—এই প্রকারের অনুমানগত বিচারকে খুব বেশী গালা-গালি কি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে? অন্যপক্ষে স্বদেশ-প্রীতি ও অতীতের প্রতি অগাধ ভক্তিবশেও মানুষ দেশের সকল প্রাচীন ব্যবস্থাকে অনিন্দ্য মনে করিতে পারে।

উভয়পক্ষের মাঝখানে সত্য কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

মুসলমান-শাসনের হিন্দুসমাজ যদি লেখকের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়—কেবল হিন্দুসমাজের শাসন ও বিধানের সঙ্গে তখনকার অন্নসমস্যা বিজড়িত ছিল না—রাষ্ট্রীয় শাসন অনেক অকল্যাণেরই সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমান-শাসনে হিন্দুসমাজের ইতিহাস একেবারে দুর্ল্লভ নয়। আর যদি লেখক স্বাধীন ভারতের কথাই ভাবিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহাতে সত্যের সহিত প্রচুর স্বপ্নের মিশ্রণ ঘটাইতে হয়। স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের ইতিহাস আমরা কতটাই বা পাই? তবে হিন্দুসমাজের ব্যবস্থার দোহাই না দিয়াও আমরা অনুমান করিতে পারি প্রাচীন ভারতে অন্নসমস্যা একটা বড় সমস্যা ছিল না। শকহূনদের আক্রমণ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের দশা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—সেগুলি বাদ পড়িলে লক্ষ্মীশ্রী ও লোকের সুখ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার অভিযানে কুটীর শিল্পের ধ্বংসসাধন হইয়াছে—তাহাতে কুটীরবাসিগণের যে দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে যে দেশে কুটীর শিল্পের ধ্বংস হইয়াছে অথচ শিল্পীরা কল কারখানার কর্ত্তৃত্ব পায় নাই—সেই সেই দেশে একই অবস্থা। বর্ণবিভাগ থাকুক আর নাই থাকুক সকল দেশেই কুটীর-শিল্পেরই প্রাধান্য ছিল—সকল দেশেরই এক অবস্থা হইবার কথা। ইউরোপীয় দেশগুলির জনসংখ্যা বেশী নয়—তাহারা কল-কারখানার কর্ত্তৃত্ব পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ জাতি-বিভাগের ধারা এই কুটীর-শিল্পকে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল। তাহাতে কুটীর-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের দিক হইতে কি কোন লোক্সানই হয় নাই? লেখক বলিয়াছেন—

"আমাদের দেশের অকালকুষ্মাণ্ডগণ যে বিদ্বেষ দিগ্ধ নেত্রে তাঁহাদের পূর্ব্বজগণের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে?"

আপনাদের পূর্ব্বজগণের ব্যবস্থার প্রতি বংশধরের বিদ্বেষ-দিগ্ধ দৃষ্টি থাকিবে ইহা ত স্বাভাবিক নহে—বরং নির্ব্বিচারে ঐ ব্যবস্থাকে অনিন্দ্য মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিবে তাহাই স্বাভাবিক। অন্ধ ভক্তিতে নির্ব্বিচারে প্রাচীন সমস্ত ব্যবস্থাকে আদর্শ বলিয়া মনে না করিয়া কেহ যদি সত্যানুসন্ধানের জন্য সংশয় প্রকাশ করে অথবা ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করিতে চেষ্টা করে—তবে গালাগালি না দিয়া যুক্তি দ্বারা তাহার সংশয় দূর করা উচিত।

"নারীজাগরণ" —শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আজকাল সভ্য নারীরা যে স্বাধীনতার জন্য প্রমত্ত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া লেখিকা এই প্রবন্ধটি (অভিভাষণ) লিখিয়াছেন। আমরা গত আষাঢ়ের উপাসনায় নারী সংগতি নামক প্রবন্ধে আমাদের মতামত পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। লেখিকার প্রবন্ধে অনেক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ কথা আছে। দেশে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহা দেশের নারীদের আন্দোলন নয়—তাহা পুরুষেরই আন্দোলন, তাহাতে জনকতক নগরবাসিনী, স্বামী বা পিতার সম্পদে পুষ্টা সভ্য নারী যোগ দিয়াছে মাত্র। ইঁহাদের নিকট হিন্দুত্বের দোহাই দেওয়া ভুল—কারণ বহুদিনই ইহারা হিন্দুত্বের সংকীর্ণ (?) সীমা অতিবর্ত্তন করিয়াছে। সমাজধর্ম্মের বিশ্বজনীন আদর্শ হইতেই ইহাদিগকে দুই কথা বলিতে হইবে—'নারীসংগতি' প্রবন্ধে তাহাই বলা হইয়াছে।

লেখিকার প্রবন্ধটি তাঁহাদের জন্য নহে—প্রবন্ধটি হিন্দু কুললক্ষ্মীদের সতর্কীকরণের (warning) কাজ করিবে।

নারীর স্বাধীনতার আন্দোলনের একটি বিষয়ের কি মীমাংসা তাহা লেখিকা বলেন নাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে নারীর জীবিকার্জ্জনের জন্য স্বাবলম্বন-বৃত্তির কথা জড়িত আছে। যে সকল নারী কচিকাঁচা লইয়া বা নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়—অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অন্যের গলগ্রহ হইয়া পড়ে। দেবরের সংসারেই হউক, আর ভ্রাতার সংসারেই হউক তাহাদিগকে অন্নের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সকল নারীর স্বামিধন থাকে না, সকল দেবর সকল ভ্রাতাই কিছু বিধবা ভ্রাতৃবধূ বা ভগিনীর ভার হাস্যমুখে বহন করিতে চায় না।—বিশেষতঃ কচিকাঁচা-গুলির সুব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রে হয় না। অনেক অসহায়া বিধবাকে বড়ই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এরূপস্থলে নারী যদি স্বাবলম্বিনী হইতে শিক্ষা করে তাহা হইলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়—ক্লেশেরও লাঘব হয়। প্রাচীন সমাজে যে ব্যবস্থাই থাকুক বর্ত্তমান সমাজে তাহাদের জন্য কোন মর্য্যাদাকর ব্যবস্থা নাই। এরূপক্ষেত্রে নারী যদি স্বাবলম্বিনী হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে কি বলিয়া বুঝান যাইবে? হিন্দু সমাজ তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছে?

"স্বাস্থ্যপরীক্ষা" প্রবন্ধে রমেশ বাবু বলেন, বৎসরান্তে একবার করিয়া প্রত্যেকেরই সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান উচিত। শয্যাগত হইয়া পড়িবার আগে যে সতর্কতা বা সাবধানতা চলে, যে প্রতিষেধের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা হইতে দেহকে বঞ্চিত করা রীতিমত বর্ব্বরতা।

"কবির পরীক্ষা"—প্রবন্ধটি একটি উপাদেয় রচনা। প্রাচীনকালে রাজসভায় কি ভাবে কবি ও পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লওয়া হইত—কি ভাবে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করা হইত—এই প্রবন্ধে তাহার সবিস্তার বর্ণনা আছে।

এই প্রবন্ধে দুই একটি কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বকালের রাজারা দেশের চৌষট্টি কলারই অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

"শাস্ত্রে যে চৌষট্টিকলার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের যে কোন বিষয়ে নিপুণ লোকই রাজসভায় স্থান পাইত।"

গ্রাম্য ভাষায় যাঁহারা কাব্য-রচনা করিত তাঁহাদের সমাদর নাগর ভাষায় কাব্যরচয়িতাদের তুলনায় অল্প ছিল না। সাহিত্য,—সাহিত্যই, তাহা গ্রাম্য ভাষাতেই রচিত হউক—আর মার্জ্জিত ভাষাতেই রচিত হউক, এ জ্ঞান তখনকার বিদ্বৎসভারও ছিল।

কবি, পণ্ডিত ও শিল্পিগণ সকলেই রাজার প্রতিপাল্য ইহাতে যেমন গৌরব ছিল—অগৌরবও তেমনি ছিল। রাজার গুণগান না করিলে কাহারো আশ্রয় মিলিত না।

"ভারতীয় ভাবধারা ও স্বাধীন চিত্ত"। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের সুলিখিত প্রবন্ধ, বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলনের দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ। লেখক ভারতের দার্শনিক আদর্শের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—আমাদের তত্ত্ববিদ্যা কালক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্রে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে তত্ত্ববিদ্যার স্বাধীন ধারা ব্যাহত হইয়াছে। ভারতীয় স্বাধীন চিন্তার ধারা ধর্ম্মমতের সহিত মিশিয়া গিয়া যেন বালুকারাশির মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে তাহাকে ধর্ম্মমতের সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। শ্রদ্ধেয় লেখক ধর্ম্মতত্ত্বসম্পর্কে তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন—কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আমরাও সেই মত পোষণ করিয়া থাকি।

তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিলেন,—আমরা কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে চাই।

অধ্যাপক চারুচন্দ্র—আর্নল্ড বেনেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার একটি উপন্যাসের সারাংশ দিয়াছেন।

প্রবাসী

"হিন্দু মুসলমান"—রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে কবি দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়াছেন—

অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি—অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে বিস্মিত হই।

হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চল্‌বে না।

যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে, সেই গোড়ায়—নইলে কিছুতেই কল্যাণ নেই।

আমি হিন্দুর তরফ থেকে বল্‌ছি—মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক, আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সে জন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি।

এই সকল কথা কবিগুরু বরাবরই বলিয়াছেন। তাঁহার নানা প্রবন্ধেই এই সকল কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যার সময় তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত মত এই—

পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোলআনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোল আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মত অত্যন্ত বেশী টানাটানি না ক'রে আপোষ করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে—নৌকাডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে।

সর্ব্বগ্রাসীদল বলে—"ষোল আনার উপর চেপে না বসলে চার আনাও পাব না।" কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান সকল সর্ব্বগ্রাসীরই এক কথা।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো মহারাণা কুম্ভকর্ণের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু মীরাবাই-এর কথা কিছুই লেখেন নাই। মীরাবাই কি তবে ইতিহাসে স্থান পান নাই? কুম্ভ অনেকটা বিক্রমাদিত্যের মতই রাজা ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন বীর ছিলেন—তেমনি বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু গুণী জ্ঞানীর সমাবেশ হইয়াছিল—বহু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় কুম্ভ হিন্দুগৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজপুতানার পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা—রাণা কুম্ভ পীড়িত অবস্থায় আপনার পুত্রের দ্বারাই নিহত হ'ন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে "রামমোহন রায়ের কথা"—প্রবন্ধটিতে অনেক তথ্য পাওয়া গেল। ব্রজেন্দ্রবাবুর কাঁচির ধার বাড়ুক।

"মুখতাব ও মিশরের নব-জাগরণ" প্রবন্ধে মোহম্মদ এনামুল হক্ বর্ত্তমান মিশরের ভাস্কর্য্য কলার উন্নতির নিদর্শন দিয়াছেন।

সুনীতিবাবুর "দ্বীপময় ভারত" ধারাবাহিক চলিতেছে। জ্ঞাতব্যতথ্যের storehouse.

"ইসলামের প্রথম যুগে শিল্পকলা" সুলিখিত প্রবন্ধ—লেখক ইংরাজী ফরাসী কয়েকখানি গ্রন্থ অবলম্বনে এই মূল্যবান প্রবন্ধটির সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবন্ধটি বড়ই সময়োপযোগী।

লেখক বলেন—কোরাণে চিত্রকলা নিন্দিত হয় নাই সত্য,—কিন্তু হদিসে নিন্দিত হইয়াছে।

শাস্ত্রীয় নিষেধ সত্ত্বেও মুসলমানসমাজে চিত্রকলাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই—মুসলমান-চিত্রকলার অপূর্ব্ব সম্পদই তাহার প্রমাণ মুসলমান-চিত্রকলা রাজসভা ও অভিজাতদিগের আর্ট।

"সাহিত্য"।—শ্রীবিমল সরকার এম-এ—লেখক এক নিশ্বাসে রামায়ণ গান সারিয়াছেন। এটি একটি প্রবন্ধাকার লাভ করে নাই—একটি প্রবন্ধের outline মাত্র। ইহাকে সম্প্রসারণ করিলেই একটি ভাল প্রবন্ধ হইতে পারে।

ইনি সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"যা কিছু সাহিত্যে অর্থাৎ কোনও সভা সমিতি পারিষদ্ প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠানে সহযোগী সভ্যগণের মধ্যে আলোচিত, ব্যাখ্যাত, পঠিত বা গীত হতে পারে।" তিনি বলেন—আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য এই ভাবেই সৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতীয় সাহিত্যের উপাদান,—ইতিহাস বা পুরাণ। ইতিহাস বা পুরাণ এক-একটি সভ্যের সৃষ্টি। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রত্যেক কবির একটি করিয়া রাজসভার প্রয়োজন ছিল।

লেখক সাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়া প্রবন্ধিকাটির আরম্ভ করিয়াছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারেন নাই।

পঞ্চপুষ্প

সুধীবর হীরেন্দ্রনাথের শকুন্তলার অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। কেবলমাত্র অনুবাদের প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নাই—অনেক অনুবাদই হইয়া গিয়াছে। কেবল অনুবাদ মাত্র হইলে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূতও হইত না। লেখক মাঝে মাঝে টিপ্পনী যোগ করিয়াছেন এবং কাব্যাংশগুলির কাব্যানুবাদ দিয়াছেন। ভঙ্গীটা নূতন বটে। কিন্তু হীরেন বাবুর নিকট আমরা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশও পাইলাম না। টিপ্পনীগুলি অতি সংক্ষিপ্ত—তাহাতে আমাদের তৃপ্তি হইল না—সঙ্গে সঙ্গে রস সমালোচনা থাকিলে তাঁহার লেখনীর উপযুক্ত হইত। 'অয়মহং ভোঃ' বলিয়া দুর্ব্বাসা উপস্থিত হইলেন—প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিয়া গেলেন—লেখক কোন টিপ্পনাই করিলেন না। এখানেও যদি হীরেন বাবু নীরব থাকেন—তবে কোথায় তাঁহার টিপ্পনী বা মন্তব্য পাইব ?

কাব্যাংশের অনুবাদগুলি হয় পয়ারে, নয়ত দীর্ঘায়ত পয়ারে রচিত। শ্লোকগুলি যখন বিবিধ ছন্দে রচিত—অনুবাদেও ছন্দোবৈচিত্র্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম

"কথা"।—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ—

ধর্ম্ম-জগতে 'কথা'-কথাটি যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হইত, লেখক সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কথকতা ও কথামৃত এই দুইটি শব্দে কথার প্রকৃত অর্থ নিহিত আছে

"জগতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন"—জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে লাইব্রেরীর অবস্থা ব্যবস্থা কিরূপ লেখক তাহাই বলিয়াছেন। ইহা অনলঙ্কৃত বিবৃতি মাত্র—ঠিক প্রবন্ধ নহে।

পণ্ডিত "শশধর তর্কচূড়ামণি"—শ্রীনিখিলনাথ রায়। সংক্ষেপে পণ্ডিত মহাশয়ের জীবন-কথা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ও বিলাতী নাস্তিকতা-বাদের অভিযানে যখন হিন্দুর ভদ্র সমাজ টলমল করিতেছিল—তখন যাঁহারা আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায়সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। তাঁহার চেষ্টায় অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মতিগতি ফিরিয়াছিল।

এই যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস, প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ইত্যাদি মনীষিগণের আবির্ভাব। ইঁহারা যেন হিন্দু-সমাজকে বাঁচাইবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিকৃতবুদ্ধি শিক্ষিত সমাজকে পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোর শাসনে ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয় ও বেদান্তবাগীশের চেষ্টাও ছিল তাই।

গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ভক্তিভাবের প্রচার করিয়াছিলেন।—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হিন্দুধর্ম্মের একটা উচ্চতর আদর্শ পরিকল্পনা দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন "তোমরা যে ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়াছ, তাহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। —উহাতে অনেক গলদ আছে—আমি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি বুঝাইয়া দিতেছি।" এই ভাবে আহ্বান করিয়া তিনি আচারপালনের উপর বেশী জোর না দিয়া হিন্দুত্বের সার্ব্বজনীন আদর্শের ব্যাখ্যা করেন।

পরমহংস দেব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের একটি শোভন সামঞ্জস্য করিয়াছেন এবং একটি সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি করেন—তাহাতে বহু লোকেরই দ্বিধা সংশয় দূরীভূত হয় এবং এক ধর্ম্ম বা সমাজ ত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম বা সমাজ আশ্রয়ের অসারতা সকলেই বুঝিতে পারে।

এক দিকে কেশবচন্দ্র—অন্য দিকে তর্কচূড়ামণি—মাঝখানে পরমহংস দেব।

বঙ্কিম বাবু তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে শ্রদ্ধা করিতেন—ইঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যের নিবিড় সম্বন্ধ আছে।

সাধনায় প্রকাশিত ৺রামেন্দ্রসুন্দরের সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব নামক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করিয়া 'পঞ্চপুষ্প' সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। কারণ উহাই এ সংখ্যার প্রবন্ধ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। 'শান্তিপুর চিত্র' মন্দ হইতেছে না—ইহা ইতিহাস শাখার অন্তর্গত।

পঞ্চপুষ্পের একটি বৈশিষ্ট্য এই—ইহাতে ঐতিহাসিক রচনার আদর বেশি এবং ইহার আহুতি-বিভাগে প্রাচীনতার প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত হয়। চারি দিকে তারুণ্যের রুদ্র-অভিযানে ও অর্ব্বাচীনতার চণ্ড তাণ্ডবে দেশে প্রাচীনতার আদর্শ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে—এ সময়ে একখানি মাসিক পত্রও যে প্রাচীনতার মর্য্যাদা শ্রদ্ধাসহকারে রক্ষা করিতেছেন—তাহা আশারই কথা।

পঞ্চপুষ্পের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা আলোচনা, তালিকা, পল্লী সংকলন, আহুতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে পূর্ণ। এগুলি যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদ। একে একে লোক-শিক্ষার সকল ব্যবস্থাই লুপ্ত হইতেছে। মাসিক-পত্রগুলি যদি কেবল মাত্র গল্পোপন্যাস না ছাপাইয়া লোক-শিক্ষার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা উৎসর্গ করে তবে শিক্ষা-বিভাগকে যথেষ্ট সহায়তা করা হয়—জাতীয় জীবন গঠনেরও যথেষ্ট আনুকূল্য হয়।

—শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্যে বিবর্ত্তন

অধুনালুপ্ত 'কল্লোল'এর ১৩৩৪ সনের অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত "অন্তরের অন্ধকারে" ক্রমবিবর্ত্তনে বর্ত্তমান ভাদ্র-সংখ্যার "প্রবাসী"র "সংসার-স্রোতে" আসিয়া ঠেকিয়াছে। আরও পাঁচ বৎসর পরে এই গল্পটি "মৃত্যু-পথে" নামে অপর কোনও মাসিকে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা গল্প-লেখক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অগ্রিম নির্দ্দেশ দিয়া রাখিলাম। কবে কোন্ পত্রিকায় কে কি গল্প লিখিয়াছিল, তাহা মনে রাখিবার মতো স্মরণ-শক্তি কয়জন সম্পাদকের আছে জানি না—আমাদের নাই, সুতরাং প্রবাসী-সম্পাদক-বিভাগকে এই ত্রুটীর জন্য আমরা অভিযুক্ত করিব না। কিন্তু লেখকগণের নিকট এই সামান্য সততাটুকুও কি সম্পাদকেরা আশা করিতে পারে না?

সাময়িকী

চীনে জলপ্লাবনে লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আসাম, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ বন্যায় ভাসিয়াছে। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ভূমিকম্পে গ্রাম ও সহর ধ্বংস পাইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আন্দাজ করিতেছেন, একটা কিছু বিস্ময়কর বিপর্য্যয় আসিতেছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌ যাহাই বলুন—আমরা জানি কি আসিতেছে; আসিতেছে ভারতে স্বরাজ। প্রশ্ন উঠিতে পারে—ভারতে স্বরাজ আসিতেছে ত চীনে অত লোক মরে কেন? কিন্তু ভারতীয় স্বরাজসাধনার ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ প্রশ্ন তুলিবেন না। তাঁহারা বুঝেন—খাঁন্‌বাহাদুর আশানুল্লা দারোগা বিপ্লবী বালকের গুলিতে প্রাণ হারাইলে যে কারণে চট্টগ্রামে ক্রোড় টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দগ্ধ ও লুণ্ঠিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে, ঠিক সেই কারণে ভারতে স্বরাজ আসিবার জন্য চীনে লক্ষ লোকেরই প্রাণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতএব স্বরাজই আসিতেছে।

চট্টগ্রাম সহর লুণ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া সর্ব্বাগ্রে কাঁদিয়া উঠিল কলিকাতা কর্পোরেশন! কারণ আর কিছুই নহে, ঐ স্বরাজ আসিতেছে। রেজলুশন হইয়া গেছে—চট্টগ্রাম ব্যাপারের তদন্ত চাই। ঢাকায় যখন তদন্ত হইতে পারে চট্টগ্রামে না হইবার কোন কারণ আমরাও দেখিতেছি না।

লোকে প্রশ্ন করিতেছে—যখন দিবাভাগে সহর লুঠ হইতে লাগিল, তখন সাধারণ, অসাধারণ, সামরিক, পিটুনি ইত্যাদি নানা রকমের পুলিশ চট্টগ্রামে বসিয়া কি করিতেছিল? তদন্ত হইলেই আমরা জানিতে পারিব, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতেছিল। একথা অবশ্য কেহ বিশ্বাস করিবে, কেহ করিবে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, যাহারা এ-কথা বিশ্বাস করিবে তাহারা আজও বিনা তদন্তেই ইহা বিশ্বাস করে; আর এখন হইতে যাহারা এ-কথায় অবিশ্বাসী, তখনও তাহারাই এ-কথা অবিশ্বাস করিবে। সুতরাং তদন্ত হইলে কোন পক্ষেরই ত লাভ দেখা যায় না। আমরা বলি তদন্তে কোনই প্রয়োজন নাই। আমাদের মধ্যে যে যাহা জানিবার সে তাহা সমস্তই জানে।

কিন্তু চট্টগ্রামের ব্যাপারটা যেমন শুনা যাইতেছে, সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাইতে পারে—

খাঁন বাহাদুর আশানুল্লা নামে একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারে ফেরারী আসামীদের তদন্তকার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন। গত ৩০শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যার সময় চট্টগ্রামে একজন অল্পবয়স্ক হিন্দু যুবক তাঁহাকে পিস্তল দ্বারা হত্যা করে। সেই দিন রাত্রিতে পাঞ্চজন্য প্রেস ইত্যাদি স্থানে রাজসিক খানাতাল্লাসী হয়। পরদিন প্রাতঃকালে মুসলমান জনসঙ্ঘ দ্বারা একটি বড় হিন্দুর দোকান লুণ্ঠিত হয়। ঐদিন বেলা ১০টার সময় সেট্‌লমেণ্ট্‌ ময়দানে মৃত খাঁন বাহাদুরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সমবেত হন। সেইখানে ৫০,০০০ (এত লোকও ওদিকে আছে?) মুসলমান ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহরের অধিকাংশ হিন্দু দোকান ও কয়েকটী হিন্দুপল্লী মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা (ওদিকে এত দুর্ব্বৃত্তও আছে?) যথেচ্ছ লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য আনুমানিক এক কোটী টাকা। তাহার পর দিন হইতে সহরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত, তবে ঐদিকে পল্লীগ্রামে গোলমালের আশঙ্কা আছে। হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের সহিত একযোগে শান্তি স্থাপনে প্রয়াস পাইতেছেন।

অহিংস ও বিধিবিহিত উপায়ে কংগ্রেস বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমূল পরিবর্ত্তন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। এই আমূল পরিবর্ত্তনকে ঠিক সংস্কার বলা যায় না। এই কংগ্রেসের অধিকাংশ পরিচালক হিন্দু, এবং বলা যাইতে পারে সমগ্র শিক্ষিত হিন্দুসমাজ ইহার প্রতি মোটের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন। কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত ভিন্নমত, এমন শিক্ষিত হিন্দু অনেকই আছেন, কিন্তু ধরা যাইতে পারে সমস্ত শিক্ষিত হিন্দুই আকাঙ্ক্ষা করে হিন্দুস্থানে অনতিবিলম্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হউক। অশিক্ষিত হিন্দু শিক্ষিত হিন্দু দ্বারা পরিচালিত হওয়াই সম্ভব। অতএব

যাহারা তর্কশাস্ত্র ভালরূপ অধ্যয়ন করে নাই তাহাদের পক্ষে একথা ভাবা অস্বাভাবিক নহে, যে স্বরাজসম্পর্কে সমস্ত হিন্দুসমাজ এক দিকে আর গবর্ণমেণ্ট অপর দিকে।

মুসলমান শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এই স্বরাজ চাহেন না, একথা চাপিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষকে তাঁহারা হিন্দুস্থানই মনে করেন; সুতরাং অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান মুসলমান জনসঙ্ঘকে বুঝাইয়া আসিতেছেন যে কংগ্রেস-প্রার্থিত স্বরাজে তাহাদের ক্ষতি হইবে, কংগ্রেস মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী নহে। সুতরাং কংগ্রেসের বিরোধিতা করা অন্যায় নহে, বরং মুসলমানের কর্ত্তব্য। কংগ্রেস ও হিন্দু যখন একার্থবাচক হইল, তখন কংগ্রেসী স্বরাজ ঠেকাইতে হইলে মুসলমানকে হিন্দুর সহিত বিরোধ করিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের আরও অনেক কারণ আছে, আমরা এখানে স্বরাজী কারণের আলোচনা করিতেছি; কারণ চট্টগ্রাম-ব্যাপারের মূলে এই স্বরাজী কারণ বর্ত্তমান বলিয়া মনে হয়।

দেশে একদল বিপ্লবী আছে; তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ভারতে স্বরাজ আনয়ন। কিন্তু তাহারা অহিংস ও বিধিবিহিত উপায়ের পক্ষপাতী নহে, ইহার প্রমাণ বেশ প্রত্যক্ষ। এই বিপ্লবীদেরও প্রায় সকলেই হিন্দু। অতএব বিপ্লববাদী দলও কংগ্রেসের ন্যায় হিন্দু-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, কেবল তাহার কার্য্যাদি গোপনে সংঘটিত হয়

মোটা বুদ্ধিতে যে সব যুক্তি সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয় তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, স্বরাজী মাপকাঠিতে কংগ্রেস ও বিপ্লবী এক পক্ষে—অপর পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ও স্বরাজ বিরোধী মুসলমান। ভারতীয় ইংরাজ সমাজ যে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং সাধারণ বিরোধের অতীত। সুতরাং বাকী রহিল এক পক্ষে হিন্দু, অপর পক্ষে মুসলমান।

স্বয়ং গবর্ণমেণ্টও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বলিয়া দিয়াছেন যে পিটুনী পুলিশের কর হিন্দুমাত্রকেই দিতে হইবে, কারণ বিপ্লবীরা হিন্দু, অর্থাৎ হিন্দুরা বিপ্লবী; আর মুসলমানকে ঐ কর দিতে হইবে না, কারণ তাহারা রাজভক্ত। ঐ সহরে যে সামরিক আইন জারি হইয়াছিল তাহাও হিন্দু যুবকদের জন্য, মুসলমানদের জন্য নহে।

বিচক্ষণ ও স্থিরধী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে ভাল মন্দ পথ নির্ব্বাচন অপেক্ষা গন্তব্যস্থান প্রাপ্তির প্রতি অধিকতর টান থাকা অস্বাভাবিক নহে। যেহেতু অনেক হিন্দু একান্ত ভাবে ইচ্ছা করে যে হিন্দুস্থানে সত্বর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হউক, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকের এরূপ চিন্তা করা খুবই সম্ভব যে হিংসা-কলঙ্কিত বা অহিংসামণ্ডিত যে পথেই হউক, স্বরাজ যদি আসিয়া যায় ত আসুক। মহাত্মাপ্রবর্ত্তিত কায়মনোবাক্যে অহিংসাসাধন-নীতি যে অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারে নাই, ইহা সত্য।

উপর্য্যুক্ত যুক্তিপরম্পরার খিচুড়ি করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা এই—হিন্দুমাত্রই বিপ্লববাদী সুতরাং তাহারা রাজা ও রাজভক্তদের নির্য্যাতনযোগ্য। এই ধরণের কথাই ফিরিঙ্গ সংবাদ পত্রেও কিছুদিন হইল কীর্ত্তিত হইতেছে।

আলিপুরের জজ গার্লিক সাহেব বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হইবার পর হইতে ফিরঙ্গ-পত্রে ইহাও বলা হইতেছিল, —গবর্ণমেণ্ট যখন বিপ্লবীদের অর্থাৎ হিন্দুদের দমন করিতে যথেষ্ট দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছেন তখন রাজভক্তদের পক্ষে অবিলম্বে যাহা-হউক-একটা-কিছু করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এমন একটা কিছু যাহাতে এই হত্যার প্রতিকার রাজার হাত হইতে রাজভক্তের হাতে আসে। কাহাদের উপর এইরূপ যাহা-হয়-একটা-কিছু প্রতিকার প্রযুক্ত হওয়া উচিত তাহার ফর্দ্দও ঐ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছিল—যেমন চট্টগ্রামের ‘পাঞ্চজন্য’ প্রেস।

চট্টগ্রামে ঐরূপ প্রতিকারেরই বোধ হয় একটা পরীক্ষা হইয়া গেল; রাজভক্তরা বিপ্লবদমনে গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেরাই তাহার বিধান করিতে এক রাত্রের বেশী বিলম্ব করিল না। তাহারা ইংরাজী কাগজ পড়িয়া এ কাজ করিয়াছে তাহা নহে; যে খিচুড়ি ভক্ষণ করিয়া কাগজওয়ালারা একথা লিখিয়াছিল, সেই খিচুড়ি আজকাল গ্রামে গ্রামে মিলে। যে হিন্দু ব্যবসাদাররা কংগ্রেসের কথায় হরতাল করে তাহারা অবশ্যই কংগ্রেসী; কংগ্রেসী হইলে বিপ্লবী নহে কে বলিল? একজন বিপ্লবী যখন একজন রাজভক্ত মুসলমানকে হত্যা করিয়াছে, তখন অপরাপর রাজভক্তের অপরাপর বিপ্লবীদের দোকান লুট করিবার অধিকার জন্মিয়াছে, ইহা একরূপ সোজা কথা।

এই জাতীয় সহজ যুক্তি গার্লিকের হত্যা-দিবসে আদালতরক্ষী গোরা সার্জেন্টের মাথায় আসিলে সেদিন আলিপুরের উকীলকুল নির্ম্মূল হইতে পারিত।

কোন মুসলমান নেতা চট্টগ্রাম লুণ্ঠন ব্যাপার না শুনিয়াই বলিয়াছিলেন—এবার একজন মুসলমান কর্ম্মচারীকে (খাঁন বাহাদুরকে) হত্যা করা হইয়াছে; তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে ইহাদ্বারা কাহারও কাহারও প্রতিশোধ-স্পৃহা এমন বলবতী হইয়া উঠিতে পারে, যে এই ব্যাপার হইতেই দেশ হয়ত ভীষণ অন্তর্বিপ্লবে ডুবিয়া যাইবে। অনেক নেতা অপেক্ষা এই মুসলমান নেতা দেশের নাড়ীর খবর বেশী রাখেন তাহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণীর শেষার্দ্ধ হইতে ভগবান দেশকে রক্ষা করুন। দেশের এই দুর্দ্দিনের হিন্দুর শেষ সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাক্‌,—যে রংপুর জেলার মুসলমান কৃষক বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত হইলে বর্দ্ধমান জেলার হিন্দুবালকদের ভিক্ষাবৃত্তি করা অপমানজনক নহে। বাংলা যদি এই পুণ্যটুকুও বজায় রাখিতে পারে, তাহা হইলে হিন্দুমুসলমান-সমস্যা একদিন মিটিবেই।

তথাপি স্বরাজই দেখা দিতেছে মনে হয়। নচেৎ গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে রাজদণ্ড স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে দেশের লোকের হাতে (হউক তাহারা হিন্দু বা মুসলমান বা কেবলমাত্র দুর্ব্বৃত্ত) ২।১ রাতের জন্যও হস্তান্তরিত হইয়া পড়িতেছে কেন? আইন ও শৃঙ্খলা ত' হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্গত ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ জাতীয় স্বরাজ যাহাতে না আসে তাহার জন্য কংগ্রেসেরই অধিনায়ক গান্ধীজি আজ দীর্ঘ দিন তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থিত স্বরাজের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইলেও এটা বুঝা যায় যে তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন পথে অর্জ্জিত স্বরাজের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য। যে স্বরাজ বিভিন্ন ধর্ম্মজাতিবর্ণসমন্বিত ভারতের স্থায়ী কল্যাণ আনয়ন করিয়া সমগ্র বিশ্বের কঠোরতম দুঃখসমূহের নিবৃত্তির কারণ হইবে, তাহার পথই তিনি জীবন ভোর সন্ধান করিতেছেন। রক্তকলঙ্কিত পথে দেশে দেশে যুগে যুগে যে স্বরাজ আসিয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত বিশ্বে অরাজকতারই সৃষ্টি করিয়াছে। জগতে একাধিক কুরুক্ষেত্র সংগঠিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্য আজও সংস্থাপিত হয় নাই। মহাত্মার তপস্যা সেই ধর্ম্মরাজ্য আনয়ন।

আজ পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহাকে পাইতেই হইবে, না পাইলে জগতের কল্যাণ নাই; এই অপথে যাঁহার সাধনা, তাঁহার কার্য্য-পরম্পরার মধ্যে আমরা সব সময় সঙ্গতি দেখিতে পাইব না ইহা স্বাভাবিক। কারণ আমাদের দৃষ্টি ভারতের আপাতঃমঙ্গলের মধ্যেই নিবদ্ধ। তাই গান্ধীজিকে পদে পদে দেশবাসীর নিকট কৈফিয়ৎ দিয়া চলিতে হয়। বিলাতে না গেলেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়, গেলেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তিনি যে স্বদেশবাসীর মুক্তির নামে ভারত-কটাহে বিশ্বমুক্তির পাক চড়াইয়া নবতান্ত্রিক সাধনপরীক্ষা করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অধিকার আমরা তাঁহাকে দিই নাই, ইহা তাঁহার সহজলব্ধ। পরীক্ষার ফলা-ফল দেখিবার জন্য বিশ্ববাসী যে আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, তাহা অলস কৌতূহলবশতঃ নহে, বিশ্বের সকল মহাপ্রাণই আজ ক্ষীণভাবে অনুভব করিতেছেন যে মানবরাষ্ট্রের মহা-মুক্তি-রথের ঘর্ঘরধ্বনি বুঝিবা ঐ শুনা যায়!

এভাবে দেখিলে লর্ড উয়িলিংডনের সহিত বার্দ্দৌলি তদন্ত লইয়া কথাকাটাকাটি মহামুক্তিপাকে প্রক্ষেপ বা ফোড়নের স্বরূপই প্রতীত হইবে। বার্দ্দৌলির তদন্তের ফলে প্রজার কি সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে, এদিক হইতে ইহার বিচার করা সঙ্গত নহে। বড় জোর, আমলাতন্ত্রে ও প্রজাতন্ত্রে যে সংঘাত চলিতেছে তাহাতে নিজ নিজ ঘাঁটি হইতে কে আগাইল বা পিছাইল, এই দিক হইতে ইহাকে দেখা যাইতে পারে। সপার্ষদ ভারতের বড়লাট বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস বলিতেছে বলিয়াই তদন্ত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু কংগ্রেস বলিতেছে বলিয়াই তদন্ত করিতে হইল। সুতরাং প্রজাতন্ত্র আর এক পা অগ্রসর হইল; ভারতের দিক হইতে এইটুকু লাভ হইয়াছে বলা যায়; তদন্তের উপস্থিত ফল যাহাই হউক।

ভারতবাসীর মুক্তিদূত, সর্ব্ববিশ্বের শান্তিদূত, আজ অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে আর একবার মাত্র একজনের উপর এমনই গুরুভার পড়িয়াছিল—যখন পাণ্ডবদের দৌত্য বহিয়া হস্তিনার সম্রাটের সভায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শান্ত থাকিতে পারেন নাই—

আনিয়াছিলেন কুরুক্ষেত্র। তাহার ফলে ভারতে যে ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বুদ্ বুদের ন্যায় অচিরে লোপ পাইয়াছিল। হয়ত তাঁহারই অকৃতকার্য্যতার ফল আজও ভারতবাসী ভোগ করিতেছে। তিনি যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াই পাঁচ ভাইয়ের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করিয়াছিলেন। হস্তিনারাজ সূচাগ্রপরিমাণ ভূমি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

যে পরীক্ষায় স্বয়ং ভগবান উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই তাহাতে একজন মানুষ কি করে তাহাই দেখিবার জন্য সকলে সমুদ্রপারে চাহিয়া আছে। কিন্তু আশার কথা এই, এবার প্রার্থী রাজপুত্র নহে, দেশের জনসাধারণ; প্রার্থনা রাজ্যভোগ নহে,—মুক্তি; দাতা জন্মান্ধ সম্রাট নহে, একটী স্বাধীন দেশের প্রজাপুঞ্জ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় পার্থক্য, এবারকার দূত ভগবান নহেন—একজন মানুষ, যিনি জ্ঞাতসারে লীলা করিবেন না। তথাপি মানুষের শক্তি কতটুকু? সকল মানুষই লীলাময়ের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, গান্ধীজিও তাহার বাহিরে নহেন।

ধরা যাউক, মহাত্মার চেষ্টায় ভারতে স্বরাজ আসিল। কিন্তু স্বরাজ আসিলেও বাঙ্গালীর কি সুবিধা হইবে বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেলে সর্প ও ভেক একবৃক্ষে আশ্রয় লয় ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালী নেতারা জলে ভাসিতে ভাসিতেও বিরোধ করেন। শুনিতেছি বন্যাপ্রপীড়িত স্থান সমূহে সম্পূর্ণ Democratic উপায়ে ভোট লওয়া হইবে যে তাহারা সুভাষ বাবুর সাহায্যে বাঁচিতে চায়, না পি, সি, রায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের এবার বাঁচা হইবে কি না এই ভোটযুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে।

তাহার উপর এই নদীমাতৃক দেশের সমস্ত খালবিলই যে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে কচুরী পানায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ হইতে দেশ যদি বা রক্ষা পায়, এই কচুরী পানার হাত হইতে তাহার আর রক্ষা নাই। বাংলা হইতে যাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া গোলটেবিলে বসিতেছেন তাহাদের কাছে তার করা উচিত, যে অন্যান্য বিষয়ে অকারণ মাথা ঘামাইতে গিয়া তাঁহারা যেন সময়ের অপব্যবহার না করেন; সে ভার অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করিয়া বাংলার মহত্তর সমস্যা—অর্থাৎ এই কচুরীপানা-সমস্যার মীমাংসা তাঁহারা যেন গোল টেবিল বৈঠক হইতে করিয়া আসেন; নচেৎ বাংলার স্বরাজ-তরী কচুরীপানায় আটকাইয়াই বান্‌চাল হইয়া যাইবে।

সম্পাদকীয়

[বন্ধুবর নজরুল ইসলামের পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার সম্পাদকীয় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উঃ সঃ]

ভাই সাবিত্রী ও কিরণ,

তোমাদের 'উপাসনা'য় মুদ্রিত আমার একটি গান (প্রিয় তুমি কোথায়) 'জয়তী'তে বেরিয়েছে শুনলাম। 'জয়তী'-সম্পাদককে আমি যে গানটি দিয়েছিলাম—তা' আমার একেবারে মনে ছিল না; কেন না 'জয়তী' বোধ হয় তিন চার মাস অন্তর একবার করে' প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যে বোধ হয় ওর দেখা পাইনি।

এর অপরাধ একা আমার। তোমাদের এবং পাঠক-বর্গের কাছে এর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি—

—নজরুল।

বীমা-প্রসঙ্গ

"জীবনবীমা" কাগজখানি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালা কাগজের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'উপাসনা' পত্রিকাতে বীমা-প্রসঙ্গ প্রবর্ত্তিত হয়। এজন্য পূর্ণমাত্রায় প্রশংসার দাবী Indian Insurance Journal এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের। "উপাসনা"য় তিনি এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন; "উপাসনা"র অনুকরণে বা অনুসরণে ক্রমশঃ সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক বাঙ্গালা কাগজে আমরা বীমা-প্রসঙ্গ প্রবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি। "উপাসনা"য় বীমা-প্রসঙ্গ প্রবর্ত্তিত হইবার প্রায় এক বৎসর পরেই "জীবন-বীমা" পত্রিকাখানি "ইষ্ট ও ওয়েষ্ট"এর চীফ্ এজেন্ট শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহাশয়ের উদ্যোগ ও সহায়তায় প্রকাশিত হয়। এই কারণে "জীবন-বীমা"র উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য শ্রাবণ সংখ্যাখানি বোধ হইতেছে ইঁহাদের বিশেষ সংখ্যা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, সুরেশ চন্দ্র রায়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতির সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য লেখায় এই সংখ্যাখানির সৌষ্ঠব-সাধন করা হইয়াছে।

Indian Insurance Jorurnal এর বর্ত্তমান সংখ্যায় মিঃ এস বসু নামধেয় জনৈক পত্রলেখক Great India Insurance Ltd. কোম্পানী অযথা, অসম্ভব ও অকারণ ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। নূতন কোম্পানীর পক্ষে এই প্রকার অভিযোগ বিশেষ ক্ষতিকর ও অপমানজনক—অভিযোগের মধ্যে টাকার অঙ্ক ফেলিয়া যে ভাবে কোম্পানীর অসাধুতা ও বিশৃঙ্খলতার বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া জনসাধারণের মনে বিশেষ সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার প্রত্যেক সংবাদপত্রসেবীর আছে এবং জানিয়া শুনিয়া সাধারণ্যে সত্যকথা প্রকাশ না করাও উচিত নহে। কিন্তু একটি নব-সংগঠিত কোম্পানীর বিরুদ্ধে পত্রলেখকের এতবড় সর্ব্বনাশ-কর অভিযোগ Insurance Journal এর সম্পাদক মহাশয় যখন প্রকাশ করিয়াছেন তখন অভিযোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ তিনি নিশ্চয়ই পাইয়াছেন এবং কাগজপত্রের প্রামাণ্যও তিনি সতর্কতার সহিত বিচার করিয়াছেন ইহাই ধরিয়া লইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন গুরুতর অভিযোগ-প্রকাশের কোনও দায়িত্বই সম্পাদক মহাশয় নিজে গ্রহণ করেন নাই। অভিযোগ-পত্রের উপরই সম্পাদক মহাশয়ের মুদ্রিত সাফাই দেখিলাম--We do not hold ourselves responsible for the opinions of our correspondents.—Ed. I. I. J.—অর্থাৎ পত্রলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। আমাদের বক্তব্য এই যে এতবড় গুরুতর অভিযোগপ্রকাশ—যাহার উপর কোম্পানীর বাঁচা মরা নির্ভর করিতেছে—তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদক মহাশয়েরই বহন করা উচিত ছিল। পত্রলেখকের পত্র অপেক্ষা সংযত ও যুক্তিসমন্বিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের মূল্য অনেক বেশী। শুনিতেছি "গ্রেট ইণ্ডিয়া"র কর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ডিরেক্টরগণের নিকট উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নিজেদের বক্তব্য জানাইয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন পত্রস্থ হইয়াছে তখন তাঁহাদের বক্তব্য Indian Insurance Journal-এই সে বক্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত। মুদ্রিত অভিযোগ সম্বন্ধে জন-সাধারণের মনে যে ধারণা জন্মান সম্ভব প্রকাশ্যভাবে তাহা অপনোদন করাই "গ্রেট ইণ্ডিয়া"র সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

বন্যা-প্রপীড়িত নরনারীর উদ্দেশে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্দ্ধ পানে ডাকে ভগবানে।
> যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
> সাড়া দেন বীর্য্য রূপে দয়া রূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে
> সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয় হবে তার জয়।

কবি দ্রষ্টা, তাঁহার বাণী সার্থক হউক। দৈন্যদুঃখে নিপীড়িত দেশের জয় হউক। আমাদের মধ্যে যদি বীর্য্যরূপে ভগবানই না সাড়া দিলেন তবে কি করিয়া 'দৈন্য হবে ক্ষয়।' আমরা, যারা আজ কূলে দাঁড়াইয়া আছি—অকূলে যাহারা ভাসিতেছে তাহাদের প্রতিই যে আমাদের কর্ত্তব্য সকলের

চাইতে বেশী। জীবনবীমা কোম্পানী এ বিষয়ে নূতন কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে ভাল হয়। বন্যা-প্লাবিত স্থানের বীমপত্রগুলি যাহাতে চাঁদার টাকা সময়ে আদায় হইতেছে না বলিয়া নাকচ না হইয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা হওয়া উচিত। এই দৈবদুর্বিপাকে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাইলে জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির বিশেষ ক্ষতি। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জীবনবীমাকারীগণের সাহায্যে বীমা-কোম্পানীগুলির তৎপর হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়।

এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে সকলেরই অল্পাধিক কাজকর্ম্মের 'ঘাটতি' 'পড়্‌তি' দেখা যাইতেছে—কিন্তু সঞ্চয়ের যে কি সার্থকতা তাহা আজ সকলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। এই অর্থ-সঙ্কটে যাঁহাদের বীমাপত্র আছে তাঁহারা আপন আপন কোম্পানী হইতে পরিমাণমত ঋণগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ এবং বন্যা আমাদের দেশে যে প্রকার কায়েমী ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সঞ্চয় করিবার শিক্ষা যাহাতে দেশবাসীর সম্যক অধিগত হয় তাহার চেষ্টা প্রত্যেকেরই করা উচিত। অনাহার যে জাতির নিত্য-সহচর সে জাতির জাতীয়তা-বোধের কোনও অর্থই নাই। যেটুক আমাদের সাধ্যায়ত্ত পরাধীনতার দোহাই পাড়িয়া আমরা সেটুকুও করি না। অর্থনৈতিক অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপর জাতিগঠনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

"ইন্‌সিওরেন্স এসোসিয়েসন্ অব্ ইণ্ডিয়া"র কাজ-কর্ম্ম চলিতেছে শুনিতেছি। কিন্তু বীমাবিষয়ে অনুরাগী জনসাধারণের অবগতির জন্য তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার বিজ্ঞপ্তি যদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়—তাহা হইলে আর মামুলি সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ থাকে না। বীমা-সম্পর্কিত জনগণের হিতার্থেই যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানিবার অধিকারও সাধারণের আছে বলিয়া মনে হয়। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে সংঘ-শক্তির উদ্বোধন করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু সীমাবদ্ধ সংঘের বাহিরেও যে বৃহত্তর শিক্ষা-উন্মুখ জন-সংঘ আছে ইহা যেন এসোসিয়েসনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ ভুলিয়া না যান।

বীমার কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে ইহা বিশেষ আশার কথা। নিউ ইণ্ডিয়ার সুযোগ্য সেক্রেটারী ডাঃ এস্, সি, রায় মহাশয়ের এদিকের চেষ্টা এক দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম। বীমা-বিষয়ে অনুরাগী,—অথচ কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নাই—এইরূপ কোনও কোনও ব্যক্তিকে তিনি শুধু উচ্চশিক্ষিত বলিয়া বীমাক্ষেত্রে নামাইবার চেষ্টা করেন—কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এখন তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেক কোম্পানীকেই শিক্ষিতের প্রতি সশ্রদ্ধ হইতে দেখা যাইতেছে। হিন্দু মিউচুয়ালের অভিজ্ঞ সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, রায় তাঁহার ভ্রাতার উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইলে বীমা-বিষয়ে অভিজ্ঞ করিবার জন্যই তাঁহাকে নিজের অফিসে বসান। এই সুযোগ না পাইলে আজ মিঃ এস্, সি, রায় 'হিন্দুস্থান'এর মত বড় কোম্পানীর উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী

এসিয়াটিক লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের প্রথম বীমা-সমিতি— ১৯১৭ সনে ইহার গোড়াপত্তন হয়, ১৯২২ সনে এই কোম্পানী জীবন-বীমার কাজ সুরু করে। বর্ত্তমানে ইহার কাজ সমগ্র ভারতবর্ষে—সিংহল, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ইত্যাদি সর্ব্বত্র—কৃতকার্য্যতার সহিত চালিত হইতেছে।

১৯২৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর এই কোম্পানীর প্রথম মূল্যাবধারণ হয়—দেখা যায় যে সূচনা হিসাবে বহু অর্থব্যয় সত্ত্বেও ফণ্ডে কিছু বাড়্তি (Surplus) আছে—তাহার পরিমাণ অল্প কিন্তু কোম্পানীর চাঁদার পরিমাণ অন্য কোম্পানীর তুলনায় অতি সামান্য, সুতরাং এই বাড়্তির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নীচে কোম্পানীর গত দুই বৎসরের কাজের হিসাব দেওয়া গেল:—

বৎসর	১৯২৯	১৯৩০
পলিসি-সংখ্যা	৮৩৬	৭৭৯
নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণ—	১১,৪[illegible]	৯,৬৪,৭৫০৲
লব্ধ চাঁদা—	১,[illegible]৲	১,৫৬,৬৭৬৲
দাবীর পরিমাণ	১৯,৮৭০৲	৩২,৭৯৯৲
লাইফ ফাণ্ড—	২,৩৬,৬৮৫৲	[illegible]৬,০৭২৲
বাৎসরিক বৃদ্ধি—	৫১,০৬১৲	৬৯,৮৯০৲

এই হিসাব হইতে আশা করা যায় যে আগামী ডিসেম্বরে কোম্পানীর যে মূল্যাবধারণ হইবে তাহার ফলে কোম্পানী অনায়াসে বোনাস্ ঘোষণা করিতে সক্ষম হইবে।

গত বৎসরে কোম্পানীর নিখিল ভারতের ব্যবসায়-পরিমাণ ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৫০ টাকা—ইহার ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০৲ টাকার ব্যবসায়-সংগ্রহ হইয়াছে বাঙ্গালা হইতে। এই কৃতিত্বের জন্য আমরা কোম্পানীর বাংলার চীফ-এজেণ্ট এ. রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিতেছি। এ. রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর শ্রীযুক্ত অনিমেষ

এসিয়াটিক লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর চীফ-এজেণ্ট
শ্রীযুক্ত অনিমেষ রায় চৌধুরী

রায় চৌধুরী উদ্যমশীল কর্ম্মকুশল যুবক—তাঁহার পরিচালনায় কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ শাখার কাজ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে চলিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আগামী সংখ্যায়

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

—গল্প—

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে আষাঢ় মাসে প্রকাশিত আমার "নিবেদন", তাঁহার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছে। সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে সন ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সম্পর্কে "উপাসনা"র যাবতীয় আয়ের মালিক একা তিনিই ছিলেন, এখনও কোনও টাকা ঐ বাবদে অনাদায় থাকিলে স্বত্বাধিকারসূত্রে ঐ টাকা আদায় করিবার একমাত্র ক্ষমতা তাঁহারই আছে।

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

আগামী সংখ্যার 'উপাসনা'

পূজার পূর্ব্বেই আমাদের পত্রিকার যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সংখ্যা ও বিশেষ পূজা সংখ্যা একত্রে বাহির হইতেছে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, নরেশচন্দ্র, মোহিতলাল, কুমুদরঞ্জন, নজরুল ইস্‌লাম, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধকুমার, জগদীশ গুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির রচনা প্রকাশিত হইবে। বাংলার প্রবীণ ও নবীন অধিকাংশ কৃতী লেখকের কবিতা-প্রবন্ধে, গানে-গল্পে, চিত্রে এই সংখ্যাকে আমরা সাধ্যানুযায়ী উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক নন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সংখ্যার মূল্য হিসাবে চারি আনার ডাক টিকিট অগ্রিম পাঠাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
2, Wellington Lane, Dharamtala, Calcutta.

MUSK
SOAP
NATIONAL SOAP
& CHEMICAL WORKS

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে. সি. আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সহ সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

PHONE: CAL. 3418

OUR SERVICE WILL MERIT A CONTINUANCE OF OUR CORDIAL RELATION

UPASANA PRESS

FINE ART, COMMERCIAL & VARIETY PRINTERS.
PUBLISHERS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

4-A, [illegible] GHOSE STREET, CALCUTTA

১লা শ্রাবণ / ১৩৩৫

ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোম্পানী থেকে আমাদের উপাসনার ও মাসিক পত্রিকার সব ব্লকের কাজই আমরা করাই। ফোটোগ্রাফের আলো ছায়া ও অর্দ্ধের সূক্ষ্ম তারতম্য সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান এত বেশী— ব্লকের কাজ এঁদের হাতে খুব বেশী ভাল হয়। এঁদের যে জ্ঞান আছে ব'লে এক এবং বহু বর্ণের লাইন বা হাফটোন ব্লক নিশ্চিন্ততাতে এঁদের কাছে তৈরী করতে দিতে পারা যায়। এক রঙের আঁকা ছবি থেকে উপাসনার প্রচ্ছদপট যে রকম রঙ্গীন করে ছাপবার ব্লক এঁরা দিতে পেরেছেন—এ আগে ভাবিনি।

এই শিল্পকলায় এঁরা বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন এ জোর আমার আছে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,

সম্পাদক, উপাসনা

THE INDIAN PHOTO ENGRAVING CO.,

Process Engravers & Colour Printers

217, Cornwallis St., Calcutta.

Telephone—B. B. 2905. Telegram—"Duotype"—Calcutta.

গরমের দিনে স্নানের আনন্দ

মার্গোসোপ ও ক্যাষ্টরলে

গ্রীষ্মকালের অনিবার্য্য অস্বস্তিকর উপসর্গ, ঘামাচি, চুলকানি প্রভৃতি দূর করিয়া শরীর স্নিগ্ধ, মসৃণ ও উজ্জ্বলকান্তি করিতে আমাদের মনোমুগ্ধকর সুগন্ধযুক্ত নিমসাবান

মার্গোসোপ

এবং

সুদৃঢ়, ঘনকৃষ্ণ ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন সুদীর্ঘ কেশ উৎপন্ন করিতে বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত

"ক্যাষ্টরল"

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

"নিম টুথপেষ্ট" ও **'নিম দন্তমঞ্জন"** নিত্য ব্যবহার্য্য

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

৩৫।১, পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জ — সিটি ব্রাঞ্চ : ৫, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

লক্ষ্মী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮০ চৌরঙ্গী, কলিকাতা Phone, Park 1168

প্রধান পৃষ্ঠপোষক—ভবানীপুরের সুবিখ্যাত ধনকুবের ও মণিকার লক্ষ্মীবাবুর পুত্রগণ।

মূলধন—দশলক্ষ টাকা।

চলতি হিসাব (Current Account) দুই শত টাকা দৈনিক জমা থাকিলেও শতকরা তিন টাকা হারে সুদ দিয়া থাকি

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (Savings Deposit Account) শতকরা বার্ষিক ৪॥০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (Fixed Deposit) জমার টাকার তারতম্যানুসারে উপযুক্ত সুদের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য আবেদন করুন।

ইউ, এন, সেন
কোষাধ্যক্ষ

এ, এন, সেন,
সেক্রেটারী

ঘোষ ব্রাদার্সের

জুতা—

স্থায়িত্বে ও সৌন্দর্য্যে

অতুলনীয়

৮১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কে

কলিকাতা।

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—
২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

আশ্বিন—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

আশ্বিন—১৩৩৮

আশ্বিন—১৩৩৮

যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

বিশেষ-সংখ্যা

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে রসচক্র সাহিত্যসংসদের সদস্যবৃন্দের আমন্ত্রণে, গত ৬ই ভাদ্র কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার্থে বেলঘরিয়ায় একটি উদ্যান সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অধিকাংশ প্রবীণ ও নবীন যশস্বী লেখকগণ উপস্থিত হইয়া কবিকে মান-পত্র দেন।—যাঁহারা বিশেষ কারণ বশতঃ যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা পত্রে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। আশীর্ব্বাদী, মান-পত্র, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি একত্র করিয়া এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

বরণ-সঙ্গীত

কথা—শ্রীকালিদাস রায়]   [সুর—শ্রীঅতুল বক্সী

(দরবারী কানাড়া)

গানে গানে তব নন্দিত দেশ
তোমারে কি গান শুনাব কবি ?
প্রাণে প্রাণে তব ও মুরতি আঁকা
বৃথা রচি সুরে তোমার ছবি।
হে মধুসিন্ধু, রসতরঙ্গে
নব শ্যামলিমা দিলে এ বঙ্গে
তব পাদতটে সাজিবে কি ঘটে
চূতশাখা, মধুপর্ক হবি ?
তব বচনের রসমালঞ্চে
জাগে মধুমাস গুঞ্জরণে,
কোন ফুলে পূজি ? কোন ফুল নাই
তোমার কল্প-কুঞ্জবনে ?
তারকাপাঁতির কতটুকু জ্যোতি,
কি দিয়ে তোমার করিবে আরতি ?
অমৃত মরীচিমালা মণ্ডিত
করেছে তোমারে আপনি রবি।

নিম্নলিখিত সূচী অনুসারে সম্বর্দ্ধনা সভার কার্য্য-নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এই সূচী অনুসারে লেখাগুলি মুদ্রিত করা হইল। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের এবং রায় বাহাদুর অঘোর নাথ অধিকারী মহাশয়ের সরস ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদুটি তখন অনুলিখিত হয় নাই। সেগুলি মুদ্রিত করিতে পারা গেল না বলিয়া আমরা দুঃখিত।

সূচী

সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
বরণ-সঙ্গীত— শ্রীঅতুল বক্সী
৩। নিবেদন ও পত্রাদি পাঠ — শ্রীকালিদাস রায়
৩(ক)। গান— নজরুল ইস্লাম
৪। অভিনন্দন পাঠ— শ্রীমুরলীধর বসু
৫। কবিতা— শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৬। প্রবন্ধ— শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৭। কবিতা— শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। প্রবন্ধ— শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী
৯। কবিতা— শ্রীনরেন্দ্র দেব
১০। প্রবন্ধ— শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
১০(ক)। গান— শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
১১। কবিতা— শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
১২। প্রবন্ধ— শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১৩। কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ— শ্রীনরেন্দ্র দেব
৪। যতীন্দ্রমোহনের কবিতা পাঠ— শ্রীসুধীরচন্দ্র মিত্র
৫। সেলগরিয়ার নিবেদন শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র
৬। আশীর্ব্বচন রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী
৬। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বক্তৃতা
৭। অভিনন্দিতের অভিভাষণ
সভাপতির অভিভাষণ
সভাপতিকে ধন্যবাদ— শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
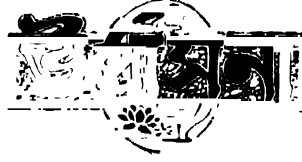
রসচক্রের নিবেদন

আমাদের এই রসচক্র-প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা চেষ্টা করিয়া গড়ি নাই—ইহা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন উদ্দেশ্য লইয়াও ইহার জন্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বন্ধু-সভা। এই সভায় যাঁহারা যোগ দেন তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্যিক, তাই ইহাকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়।

এই রসচক্রের কোন লিখিত বা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী নাই, ইহার সদস্য হইতে হইলে কোন চাঁদা দিতে হয় না—যিনি দয়া করিয়া ইহার বৈঠকে যোগদান করেন—তিনিই ইহার স্বয়ংসিদ্ধ সদস্য। যে কোন রসজ্ঞ ভদ্রলোক রস-চক্রকে আপনার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া ইহার বৈঠক বসাইতে পারেন। তাহার জন্য কোন বাধ্যতামূলক ব্যয় নাই। রস-চক্রে ইচ্ছা করিলে যে কোন সাহিত্য-সেবী, যে কোন সাহিত্য-রসিক তাঁহার যে কোন রচনা পাঠ করিতে পারেন। বৈঠক বসিলেই যে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে হইবে এমন কোন কথাও নাই। সাহিত্যিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং সাহিত্য সমাজের বাহিরের লোকের সহিত তাঁহাদের যাহাতে অবাধে অকুণ্ঠিত চিত্তে আলাপপরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে, যাহাতে হাস্য-কৌতুক গল্পগুজবের মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়,—সপ্তাহের ছয় দিন অন্নার্জ্জনের জন্য শ্রমজলপাত করিয়া যাহাতে রবিবারের সন্ধ্যাকালটা একটু নির্দ্দোষ আনন্দে কাটান যায়—তাহারই সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রাণের আগ্রহেই এই চক্রের জন্ম হইয়াছে।

বাঁধাধরা নিয়মকানুনের রুদ্ধ কক্ষে আমাদের দেশে কোন সাহিত্যিক-সঙ্ঘ বেশি দিন বাঁচে নাই—তাই আমরা এই রস-চক্রে অবাধ স্বাধীনতা রাখিয়াছি—ইহার সমস্ত দুয়ার জানালা আমরা খুলিয়া রাখিয়াছি। আপনা হইতেই ইহার জন্ম—আপনা হইতেই ইহা একদিন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ইহার জীবনে যেমন অবাধ স্বাধীনতা—ইহার মরণেও তেমনি অবাধ স্বাধীনতা আছে। প্রাণের প্রয়োজন বা আন্তরিক আগ্রহ যে দিন থাকিবে না—সেই দিনই এ চক্রকে মেদিনী গ্রাস করিবে।

এই রস-চক্র কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দলের প্রতিষ্ঠান নয়—ইহার মধ্যে প্রবীণ আছেন, নবীন আছেন—ঔপন্যাসিক আছেন—কবি আছেন, কাব্যাতঙ্কী আছেন—চিত্রকর আছেন সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, সাহিত্য-রসিক আছেন, আবার বেরসিকও আছেন, ধনী আছেন, দরিদ্র আছেন, হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, সংসারী আছেন—সংসারের বা'হরের লোকও আছেন।

এক বয়সের, এক জীবিকার, এক মতের বা এক ব্রতের লোক লইয়া রচিত প্রতিষ্ঠান ইহা নহে—কাজেই আলাপ আলোচনা অনেক সময় তর্ক-বিতর্কে পরিণত হয় অথবা সহজে থামে না। কেবল এক বিষয়ে মিল আছে—কিছুতেই মনোমালিন্য বা দ্বেষবুদ্ধির জন্ম হয় না। রস-চক্রকে ব্যঙ্গ করিয়া চরস-চক্রই বলো, আর রসনা-চক্রই বলো—তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে যাহাতে ইহা বিষ-চক্রে পরিণত না হয়, সে দিকে সকলেরই লক্ষ্য আছে

রস-চক্রের মধ্যে গলাগলিও নাই—দলাদলিও নাই। কোথাও কোন বৈঠকে যাহার ঠাঁই নাই, তাহার ঠাঁই এখানে আছে। রস-চক্রে যে সকল লেখক আছেন তাঁহাদের রচনাপ্রকাশের জন্য বিশিষ্ট কোন পত্রিকা নাই—যে কোন পত্রিকাতেই তাঁহাদের রচনা প্রকাশিত হইতে পারে, হয়ও তাই।

রসচক্রে আলাপ আলোচনা যে নানা প্রবন্ধে পরিণতি লাভ করিয়া মাসিকসাহিত্যের কিছু সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে—তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

রসচক্রে আমাদের মধ্যে একটা কথার প্রায় আলোচনা হইত—দেশে নটনটীর এত আদর, সন্তরণপটুদের ফুটবল-খেলোয়াড়দের এত আদর—দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিকে তাহাদের এত সচিত্র বিচিত্র গুণকীর্ত্তন আর সাহিত্যিকদের কোন আদর নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। অথচ উঁহাদের আদর করিতেছেন সাহিত্যিকরাই। সাহিত্যিকগণ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও ত' অত আদর দেখান না।

আমরা ঠিক করিলাম, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে যতটা কুলায় আমরা যোগ্য সাহিত্যিকদিগকে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিব। অবশ্য ইহাতে আমরা নিজেরাই ধন্য হইব। কবি যতীন্দ্রমোহনের কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই শুধু নহে, তিনি আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বহুকাল হইতে সাহিত্য-সাধনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের কথা ভাবিলে তাঁহার মর্য্যাদাদানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দেশে ঔপন্যাসিকগণের কিছু আদর আছে—তাহাদের গ্রন্থপ্রচার ও গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কবির আদর কই? আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাই যদি কবিকে তাঁহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান না করি, তাহা হইলে অন্যে কেন মর্য্যাদা দিবে? কবির মর্যাদা দান যদি অসঙ্গত না হয়—তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন যে সম্পূর্ণ সঙ্গত—একথা নিশ্চয়ই সকলে অনুমোদন করিবেন।

আমরা যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দনের দ্বারা সাহিত্যিকের মর্য্যাদাদানের সূত্রপাত করিলাম—ভবিষ্যতে আপনাদের সহযোগিতা লাভ করিলে অন্যান্য যোগ্য সাহিত্যিকগণকেও আমরা অভিনন্দিত করিতে পারিব এ ভরসা রাখি। প্রত্যেক যোগ্য সাহিত্যিকের প্রতিই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে।

সমবেত রসজ্ঞ ও সুধীগণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা আপনারা রসচক্রের আজিকার এই অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া ইহাকে সাফল্যশ্রীমণ্ডিত করুন। এবং তদ্দ্বারা আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

শ্রীকালিদাস রায়

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ

আশ্বিন, ১৩৩৮]　　　　[২৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশীর্ব্বাদী
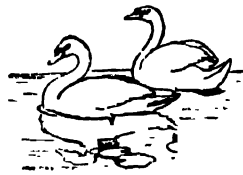
কল্যাণীয়

যুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচি—

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
　　নবীন বটে ছিলাম কোনো কালে।
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
　　ধ'র্‌ল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে॥

কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
　　এক বেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
　　ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।

ফাগুন-ফুলে ভরেছিলে সাজি
　　শ্রাবণ মাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন্‌ উঠে বাজি'
　　সুর-বাহারে দিক্‌ কানাড়ার মীড়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ভাদ্র, ১৩৩৮

পত্রালি

শরৎচন্দ্রের পত্র

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারিনে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো তারও যদি সাড়া না দিই তো শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয়, কোন দিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না সে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে যতীনকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস বন্ধু-বৎসল ভদ্র মন আছে যে তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার ক'রে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে-কানে যেন কত-কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে,—আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয়তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশি করতে পারতামনা সত্যি না হলে। যাক্ এ কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট,—হবেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে তার দামটি ছোট নয়। এ তো ট্যাঁটরা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে "জয়, যতীন্ বাগচীকি জয়!" বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রস-চক্রের প্রীতি-সম্মিলন। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন কয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্য-সেবককে সাদরে আহ্বান ক'রে এনে বলা—'কবি, আমরা তোমার সাহিত্য-সাধনায় আনন্দ লাভ করেচি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে,—তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও, আমরা তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই,—তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।' এই তো? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘট্‌লো,—আমি যেতে পারলাম না। কারণ, আমি বোধ করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম-স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগা ডেঙ্গু এসে জুটেচে। সকাল থেকে ছোট ছেলে-মেয়ে দুটির চোখ ছল ছল্ করচে, চাকর জন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েচে, আমার এক নাক বন্ধ অন্যটায় টিউব-ওয়েলের লীলা সুরু হয়েছে, রাত্রি নাগাদ বোধ হয় দেহ-মন-প্রাণ উৎসবে যোগ দিবেন আভাসে ইসারায় তার খবর পৌঁছোচ্চে। নইলে এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গর-হাজিরির ঢ্যারা টান্‌তে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাক্‌লেও কিছু কিছু হয়তো মনেও পড়বে। এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন ক'রে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেচে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্য-সেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসচে এবং চিরদিনই চল্‌বে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল এ কি হতে চললো? নিন্দে করার এ কি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানিপ্রচারের এ কি নির্দ্দয় অধ্যবসায়। কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায়, দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানা-হানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই

চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কত টুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক্, কামনা করি তোমাদের রস চক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলো-মেলো।

তা' হোকগে এলোমেলো, তবু এম্‌নি করেই বলি, তোমাদের রস-চক্রের জয় হোক্, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক্, এবং যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন। ইতি ৫ই ভাদ্র, ১৩৩১।

—শরৎদা

সাহিত্যরথী কবি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাইয়া যাহা বলিয়াছেন—কবি শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ তাহা লিখিয়া আনিয়াছেন।—

কবি যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে আমার বহু দিনের আলাপ। আমি চিরদিনই তার কবিতার অনুরাগী পাঠক। এই উপলক্ষে আমি উপস্থিত হ'তে পারলাম না, সেজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। যতীন্দ্রমোহনকে শুধু কবি হিসেবে নয়—মানুষ হিসেবেও আমি বড়ই ভালবাসি। তোমরা যতীন্দ্র-মোহনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে—কবি যেন দীর্ঘায়ু লাভ ক'রে বঙ্গ-সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে থাকেন—শ্রীভগবানের নিকট যতীন্দ্রমোহনের কল্যাণ ও তোমাদের অনুষ্ঠানের সাফল্য প্রার্থনা করি।

—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

University of Dacca,
Dacca Hall—Ramna, Dacca.
২০।৮।৩১

প্রিয়বরেষু,

যতীন ভায়ার অভিনন্দন-সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। যতীন্দ্রমোহন আমার প্রিয় বন্ধু, তার সাহচর্য্যে আমার জীবনের বহু দিবস মধুময় হয়েছে, সে সদানন্দ, বাক্যপটু, সুরসিক, মধুবাক্, তার লেখনী মধুবর্ষী, সে বাংলা সাহিত্যকে সুমধুর করেছে, তার ভাষার লালিত্য, শব্দের মাধুর্য্য, আর ভাবের নবীনতা তাকে আমাদের দেশের অগ্রগণ্য কবিদের মধ্যে স্থায়ী আসন দান করেছে। তার সম্বর্দ্ধনা বহু পূর্ব্বেই আমাদের করা উচিত ছিল, এত দিনে তোমরা যে করছ তাতে আমি আন্তরিক আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করছি। যতীন্দ্রমোহনকে আমার আন্তরিক প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছি ও আমার অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি। ভগবান তাকে সুস্থ রেখে আমাদের বন্ধুজনের ও বঙ্গসাহিত্যের আনন্দবিধান করুন।

তোমাদের কুশল কামনা করি।

তোমাদের বন্ধুত্বমুগ্ধ—
—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ORIENTAL MED. HALL,
Bhatta Bazar—Purnea
20. 8. 31.

প্রিয় কবিশেখর ভায়া,

তোমার পত্রখানি আমাকে একটু সৌভাগ্যের সুযোগ দিয়েছে, সেটা মফস্বলের লোকের অধিকারের বাইরে। সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রবাসী চিরদিনই 'দুঃখভাগিনঃ'। তাই—"ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা"। কিন্তু তোমার পত্রে আজ শুনতে পেলুম—আগামী রবিবার, কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী মশাইকে 'রসচক্রের' তরফ্ হতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হবে। একি অকস্মাৎ! তুমি সংবাদ হিসেবে লিখলেও, আমি সৌভাগ্য হিসেবেই পেলুম। ভারী আনন্দ হচ্ছে।

১২ বছর আগে, 'প্রবাসজ্যোতি'র সাহিত্য প্রসঙ্গে, আক্ষেপ করে লিখেছিলুম.....দেশে কবিতার পাঠক বাড়লেও, কবিতা-পুস্তক কিনে পড়বার লোক নেই বল্লেই হয়। গত বিশ বছরের মধ্যে কত শক্তিশালী কবি ও তাঁদের কাব্য আমরা পেয়েছি যা, বঙ্গবাণী মন্দিরের প্রিয় সম্পদ। তা থেকে চয়ন করে ২।৪ খানা Selection বেরুলেও যে, পাঠকেরা লেখকদের রস-পরিচয় পান, ও উপভোগ করে মুগ্ধও হন, কবিদেরও শ্রম সার্থক হয়। তাঁদের সমগ্র গ্রন্থ পাবার জন্যে তখন লোকের আগ্রহ স্বতঃই বাড়তে পাবে। সকল সভ্য দেশেই এ প্রথা আছে। আমাদের দেশের প্রকাশকেরা এ কাজটিতে হাত দিলে, আমার বিশ্বাস,—ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না; দেশ উপকৃত হবে, সাহিত্য-সমৃদ্ধির সাহায্য করা হবে। ইত্যাদি।

আজ ঘাটের কাছাকাছি এসে, শ্রদ্ধেয় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কে অভিনন্দিত করবার সঙ্কল্প দেখে স্বতঃই প্রার্থনা করছি, বাংলা দেশ যেন যোগ্যকে সম্মান দানে কোনো দিন কৃপণ না হয়। এ সম্মান দেশেরই সম্মান।

যতীন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেনি, বা ভাগ্য ঘটতে দেয়নি। তখন কাশীতেই থাকতুম, কিন্তু যেদিন তিনি শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্ত্তীর সারস্বত উৎসবে, সকলকে আনন্দ দিয়েছিলেন, আমি সেদিন অনুপস্থিত! আবার গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় যাই; সেথায় সুরেশের সঙ্গে অভাবনীয় দেখা। শুনলুম সুরেশ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর অতিথি! বললুম—বাঃ বেশ হয়েছে, চলো তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি। যাঁর কবিতা অত আনন্দ দেয়, তাঁকে দেখব না! ব্রাহ্মণ সন্তান অতিথি হতে আমারও তো বাধা নেই, বরং ধর্ম্ম রক্ষাই হবে। সুরেশ বল্লে—তিনি তো উপস্থিত নেই, বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাইরে গেছেন যে! ভাগ্য! যাক্।

এক সময়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' খুলে, প্রথমেই যাঁর কবিতা খুঁজতুম, আজিও যিনি বঙ্গবাণীর সেবায় অকুণ্ঠ, ছন্দে ও রসে ঋদ্ধ, বঙ্গ-ভারতী তাঁকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যে ও সামর্থ্যে রেখে দীর্ঘ দিন তাঁর সেবা গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনা করি।

আজ এই সুযোগে আমার আনন্দোজ্জ্বল সম্ভাষণ তাঁকে জানাচ্ছি, শুভ কামনাটা অন্যত্রে। তিনি আমাদের 'কেয়া ফুলের' সুবাস পুনঃ পুনঃ দিন; অন্ধ বধূর মর্ম্ম-ব্যথা আমাদের অসাড় হৃদয়ে সহানুভূতি আনুক, তাঁর অন্ধকার (?) আমাদের পথ দেখাক।

তোমাদের—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা
৩নং সুকিয়াস্ রো।

প্রিয়বরেষু,

ভাই কালিদাস, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যে 'রসচক্র'এর পক্ষ হইতে কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের সংবর্দ্ধনা করিতেছ ইহা বড়ই আনন্দের কথা, তোমাদের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটীর এই সাধু উদ্যোগে সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই সুখী হইবেন। নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে তোমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর ঘটিয়া উঠিবে না, আশা কবি তুমি ও 'রসচক্র'এর অন্য বন্ধুগণ আমার অনুপস্থিতি মার্জ্জনা করিবেন। তোমাদের উদ্যান-সম্মিলনী সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হউক, কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন এবং সমাগত সাহিত্যিকমণ্ডলী তোমাদের হৃদ্যতায় ও প্রীতিতে আপ্যায়িত হউন, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না বলিয়া বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি—তুমি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিভা ও সাহিত্যসাধনার প্রতি আমার হার্দিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমার পক্ষ হইতে জ্ঞাপন করিবে। কবিবর দীর্ঘকাল ধরিয়া, শতায়ু হইয়া, সুস্থ দেহে ও মনে বঙ্গভারতীর আসন তাঁহার নব নব কবিতা-পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে থাকুন, বাঙ্গালী জাতিও তাঁহার সৌরভে মুগ্ধ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার জয়গান করুক, কবির সাধনা যতদিন ধরিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্য থাকিবে ততদিন ধরিয়া জয়যুক্ত হউক, তাঁহার লেখনী মুমূর্ষু বাঙ্গালীজাতির পক্ষে অমৃতবর্ষিণী হউক, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি ৩রা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৮। তোমাদের

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০, ডোভার লেন্, বালিগঞ্জ
২১শে আগষ্ট, ৩১

পরমপ্রীতিভাজনেষু,

কবি-অভিনন্দনের নিমন্ত্রণ আজ এই মাত্র প্রাপ্ত হইলাম। আমি এখনই মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নিমতিতায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। রবিবার বিকালের মধ্যে আসিয়া উঠিতে পারিব না। দুরদৃষ্ট যে আমারই, ইহা বলাই বাহুল্য।

যতীন্দ্রবাবু আমার বাল্যবন্ধু। সে জন্য তাঁহার এই অভিনন্দনে আমার যে আনন্দ, তাহা অন্যের পক্ষে কখনই সুলভ নহে। তাহার পর আমি যতীন্দ্রবাবুর কবিতার একজন ভক্ত। তাঁহার কবিতায় একদিকে যেমন ছন্দের লীলায়িত গতি, অপর দিকে তেমনি ভাবের সংযত উচ্ছ্বাস। আমাদের দেশের বর্ত্তমান কবি-সমাজে তাঁহার একখানি গৌরবাসন যে অনেক উচ্চে রচিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। এই বরণীয় কবির প্রশস্তিতে যে আনন্দভোজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা আজ এই নানা প্রকার অশান্তি উদ্বেগের মধ্যেও আনন্দের বার্ত্তা বহন করিতেছে। সে ভোজে রবাহূত হইয়া গেলেও ধন্য হইতাম। নিমন্ত্রণ পাইয়াও যে যোগদান করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।

কবিবর যতীন্দ্রমোহনকে আমার অন্তঃকরণের অভিনন্দন ও বন্ধুপ্রীতি জানাইতেছি; আর আপনাদিগকে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

গুণমুগ্ধ—
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৪, বলরাম বসু ঘাট রোড
ভবানীপুর

ভাই কালিদাস,

আমি পীড়িত—শয্যাগত। আমি তোমাদের এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলাম না এজন্য বড়ই দুঃখিত।

তুমি জান, আমি চিরদিনই যতীনবাবুর রচনার অনুরাগী। এই উপলক্ষে আমার কিছু লিখবার এবং সভায় তা পড়বার ইচ্ছা ছিল। তা'ত হলোনা। তুমি আমার হ'য়ে সুহৃদ্বর যতীন্দ্রমোহনকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবে। প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হ'য়ে কাব্য-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করুন। ইতি—

তোমার
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

49, Georgetown
ALLAHABAD
9. 8. 31.

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে যে আপনারা অভিনন্দন দিতেছেন ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিবর ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর সহিত তাঁহার গভীর সখ্য ছিল। আমার ভ্রাতা তাঁহার উপর একটী কবিতা রচনা করেন। তিনিও তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

কবিবরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে যখন তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সপরিবারে আমার গৃহে পদার্পণ করেন। তিনি যে কবি-সমাজে অগ্রগণ্য তাহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে আমার বলা বাহুল্য মাত্র। এই পত্রে তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শুভবাসনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু এবং বঙ্গভাষার সেবায় উত্তরোত্তর সামর্থ্যবান করুন ইহাই প্রার্থনা।

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন! ইতি—

বিনীত—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

8-1-1B, Kirti Mitter Lane,
Shambazar, Calcutta.

শ্রদ্ধাঞ্জলি

'রসচক্র' আজ যাঁর অভিনন্দনের জন্য এই আয়োজন করেচেন এই সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি বঙ্গবাসী সাহিত্য-রস-পিপাসুর চিত্তে যে অমৃত-রস বর্ষণ করে'

এসেচেন তা' সাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন। কাব্য-রস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কবিবরকে আজ এই সমবেত শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে' রসচক্র সত্য সত্যই সম্মানিত হয়েচে। রবীন্দ্র-মণ্ডলের মধ্যে যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কটী সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজ আমরা তাঁহারই অভিনন্দনের জন্য যে সমবেত হ'তে পেরেছি সত্যই এ বড় আশার কথা, বড় আনন্দের কথা। রসচক্রের সাহিত্য-সাধন-জীবনের আজকার দিন একটী স্মরণীয় দিন হ'য়ে থাকবে, ইহা নিশ্চিত।

বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁহার দান কত বড়, ভাষাজননীর বেদীমূলে তাঁহার সুদীর্ঘসাধনা যে অনন্যসাধারণ সেকথা বলার জন্য আজ এখানে আসিনি; এসেচি, আমাদের এই আবাল্য সাহিত্যসাধক, কাব্য-রস-শেখর চিরনবীন কবি-বরকে আমাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দান কর্ব্বার জন্য আর বিশ্ব-পিতার চরণে আমাদের সমবেত প্রার্থনা জানাতে যেন বঙ্গবাসী দীর্ঘকাল ধরে' তাঁর লেখনী নিঃসৃত রসামৃতধারা পান কত্তে পায়।

এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ভাবে দু'একটী কথা বলার আছে; আশা করি, অবান্তর হলেও উপস্থিত বন্ধুগণ ত্রুটী গ্রহণ কর্ব্বেন না।

কি বালক, কি যুবক, কি প্রবীণ, কি বৃদ্ধ, সাহিত্য-সেবক মাত্রই তাঁর কাছে যে কত প্রিয়, কত আদরের বস্তু আর কি দরদ, কি স্নেহ দিয়েই যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি তাদের আপনার করে' নেন তা' যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেচেন তাঁরা সকলেই জানেন। সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে যে জাতি ধর্ম্ম উচ্চ নীচ বিচার নাই একথা তাঁর প্রকৃতি ও ব্যবহারে যেমন দেখেচি এমন আর কোথাও দেখিনি। সাহিত্যের কথা নিয়ে যে যখন, যে ভাবেই তাঁর কাছে গিয়েছে তখনই সহস্র কাজ ফেলে' তিনি তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেচেন। সাহিত্য-সাধনার সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে সাধক মাত্রকেই সাহায্য কত্তে তিনি যেন সতত প্রস্তুত হয়েই আছেন। আমার এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সাধনা জীবনের সর্ব্ব বিষয়ের প্রেরণার উৎস তিনিই। সাহিত্যসম্পর্কে অদ্যাবধি যা' কিছু লিখেছি, যা' কিছু বলেছি সে সমস্তই তাঁর প্রেরণার প্রতিধ্বনি। কাজেই আমার শারীরিক অসুস্থতা ও চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও এ সম্মিলনীতে যোগদান না করে' থাকতে পারিনি তাঁর চরণে আমার সভক্তি প্রণাম।

—শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

৬ই ভাদ্র, রবিবার ১৩৩৮

বোলপুর।
২০।৮।৩১

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার নিমন্ত্রণ-লিপি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রসচক্র কবিবর যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত সন্তোষ এবং আনন্দের কথা; ইহা তাঁহার প্রাপ্য—আমরা এতদিন ঋণগ্রস্ত ছিলাম।

আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিলাম না; আমার দুঃখের সীমা নাই। দূর হইতেই অনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিতেছি। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

কবিবরের সুদীর্ঘ কাব্যসাধনা আমাদের হৃদয়ের সহিত রসসংযুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করুক—তাঁহার আয়ুঃ নির্বিঘ্ন এবং দীর্ঘতম হইয়া দিন দিন অধিকতর রূপসমৃদ্ধ হউক—সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

সভাকে আমার নমস্কার জানাইতেছি। ইতি—

আপনাদের—
শ্রীজগদীশ গুপ্ত

গান

(কীর্ত্তন)

আমার অগ্রজোপম কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রীচরণারবিন্দে—

তুমি কোন্ পথে এলে হে মায়াবী কবি
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরী
এল রাজ-সভা ছাড়ি' ছুটি' গুণীজন
তোমার সে সুরে পাশরি।

তোমার চলার শ্যাম বনপথ কদম-কেশর কীর্ণ
কেয়ার বনের খেয়া-ঘাটে হ'লে
গোপনে কি অবতীর্ণ ?

তুমি অপরাজিতার সুনীল মাধুরী
দু চোখে আনিলে করিয়া কি চুরি ?
তোমায় নাগকেশরের ফণী-ঘেরা মউ
পান করাল কে কিশোরী ?

জনপুরী যবে কল কোলাহলে
মহোৎসব রাজসভাতলে
তুমি একাকী বসিয়া দূর নদীতটে
ছায়া-বটে বাঁশী বাজালে
উৎসব ভুলি' ভাঁটফুল তুলি'
বালিকা-রাণীরে সাজালে।

যবে রুদ্র আসিল ডম্বরু-করে
হানিয়া ত্রিশূল নীল অম্বরে,
তুমি ফেলিয়া বাঁশরী আপনা পাশরি'
এলে সে প্রলয়-নাটে গো,
তুমি প্রাণের রক্তে রাঙালে তোমার
জীবন-গোধূলি-পাটে গো !

হে চির-কিশোর, হে চির-তরুণ,
চির-শিশু, চির-কোমল-করুণ !
দাও অমিয়া আরো অমিয়া,
দাও উদয়-উষারে লজ্জা গো তুমি গোধূলির রঙে রঙিয়া

প্রখর-রবি-প্রদীপ্ত গগনে
তুমি রাঙা মেঘ, খেল আনমনে,
উৎসব-শেষে দেউলাঙ্গনে নিরালা বাজাও বাঁশরী,
আমি স্বপনে-জড়িত ঘুমে সেই সুর
শুনিব সকল পাশরি'।

প্রণত—নজরুল ইস্‌লাম

পরম শ্রদ্ধাভাজন—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রীকরকমলে—

হে কবিবর,

তুমি জীবনবিধাতার আশীর্ব্বাদে পঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া যষ্টি-ভরে দুরারোহ ষষ্টিশৈলপানে যাত্রা করিয়াছ,—আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তুমি সারস্বত সাধনায় রসসৃষ্টির দ্বারা গৌড়জনের মাধবী তৃষ্ণার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়াছ,—সংসার-বিষবৃক্ষের দুইটি অমৃত-ফলই আমরা তোমার সাহচর্য্যে লাভ করিয়াছি। আজ আমরা, তোমার অনুরক্ত সুহৃদ্বর্গ, তোমাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে অভিনন্দিত করি।

তুমি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও পতিত লাঞ্ছিত ও দীনহীনের কবি,—তাই তোমার অভিনন্দনে আজ ঘটা-সমারোহের কোন আড়ম্বর নাই। আমরা জানি, এই অনাড়ম্বর, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বচ্ছন্দ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তোমার রোচনীয়ই হইবে।

যে কয়েকটি ভাগ্যবান্ সাধক কবি-রবিকে তাঁহার উদয়াচলেই বরণ করিয়াছিলেন,—তুমি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার আশীর্ব্বাদ তোমার কাব্যে কৌমুদীরসে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আদর্শ-কাব্য বলিয়া গণ্য করিলে তোমার কাব্য-সাধনাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

তুমি এক বিষয়ে অন্বর্থনামা, সংযমগুণের জন্য 'যতীন্দ্র' নাম তোমার সার্থক। সংযম-গুণেই তোমার কাব্যকলা রসাঢ্য।

পশ্চিমবঙ্গে তুমি সর্ব্বপ্রথম পল্লীকবি। দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট সরল অনাড়ম্বর পল্লীজীবন তোমার লেখনীর কুহকস্পর্শে রসমূর্ত্ত।

তুমি দাম্পত্য-প্রেমের কবি।—দাম্পত্য-প্রেমের মাধুরী-স্পর্শে তোমার লেখনীতে যে রোমাঞ্চ জাগিয়াছে—তাহা বঙ্গ-সরস্বতীর শ্রীচরণের কমল-মৃণালে অক্ষয় হইয়া আছে।

তুমি বাংলার পারিবারিক জীবনের কবি।—পারিবারিক জীবনের মাধুরী তুমি যেমন আকণ্ঠ উপভোগ করিয়াছ, সেই উপভোগের আনন্দও তেমনি তোমার কাব্যে নানা ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এ যুগে তোমার করে দেশপ্রেমের বোধনশঙ্খ। দেশের অন্তরাত্মার ভীতিকুণ্ঠিত বাণীকে তুমি তোমার কাব্যে মুক্তি দান করিয়াছ। মুক্তি-তীর্থযাত্রি-দলের প্রাণে, হে চারণকবি, তুমি উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছ।

তুমি বাংলার শারদ-মাধুরীর কবি, তোমার করে বাংলার প্রাণমাতানো শানাই। তাহাতে আজিও আগমনী-বিজয়ার মেঘরৌদ্রময়ী মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হইতেছে।

নিসর্গ-মাতার আনন্দদুলাল কবি তুমি। তুমি ভৃঙ্গের মত ফুলে ফুলে মধুপান করিয়াছ,—প্রজাপতির ন্যায় শ্যামকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বিহার করিয়াছ,—চাতকের মত নবঘনস্নিগ্ধ গগনে গগনে তৃষ্ণার বারি যাচিয়াছ,—মরালের মত পদ্মবনে কুতূহলে কেলি করিয়াছ।

তুমি শোভন সামঞ্জস্যের কবি, অনুভূতির সহিত পদবিন্যাসের এমন স্বচ্ছন্দ সামঞ্জস্য কাব্যসাহিত্যে দুর্ল্লভ। তোমার কাব্যের অন্তরের ঐশ্বর্য্য যেমন অপূর্ব্ব—বহিরঙ্গ তেমনই অনবদ্য।—তোমার অলঙ্কৃতি এমনই

কল্যাণ-শ্রীমণ্ডিত যে, কোথাও অলঙ্করণের উপদ্রবে কাব্যের স্বচ্ছতা বা প্রসন্নতা নষ্ট হয় না—। তোমার কাব্যধারা স্বচ্ছন্দা ও প্রসন্না। তাহার গতি সাবলীল ও অবাধ,—কোথাও পাণ্ডিত্যের বিক্ষোভ নাই—তত্ত্বের আবর্ত্ত নাই,—শব্দাড়ম্বরের ফেনিলোচ্ছলতা নাই।

হে চির-নির্জ্জর, রসনির্ঝর কবি,—জরার অভিযান তোমার দেহের দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়া আজিও অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই। তুমি যতই প্রবীণ হইতে প্রবীণতর হইতেছ,—ততই তোমার কাব্যে নব নব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতেছে।—তোমার লেখনীর ওজস্বিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তোমার মনে চির বসন্ত,—তোমার জীবনে চির যৌবন।

বিশ্ববিধাতার কাছে আমরা আজ সমবেত প্রার্থনা করি,—তুমি সুদীর্ঘ আয়ুঃ ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আমাদিগকে নন্দিত কর এবং বার বার অভিনন্দিত হও।

৬ই ভাদ্র, ১৩৩৮ গুণমুগ্ধ—
বেলঘরিয়া (২৪পরগণা) রসচক্রের সভ্যবৃন্দ

তুমি কবি

তুমি কবি; তব গৌরব-রবি ঊর্দ্ধ গগন-পথে,
মোদের প্রণাম লহ অবিরাম, ধূলার ধরণী হ'তে
দিবস রজনী ওঠে জয়-ধ্বনি, সে ধ্বনি গরবে আজি
অমর কবির বন্দনা-গানে আমার বীণায় বাজি'
সুর-কুসুমের বরণ-মাল্যে করে অভিনন্দন
ভালে শোভে তব বিশ্ব-কবির শুভাশিষ-চন্দন!

ভবন ভুবন আকাশ পবন নদী গিরি বন ব্যেপে
হে চারণ-কবি, তোমার বীণায় সুর ওঠে কেঁপে কেঁপে;
নয়ন হইতে ঠিকরিয়া পড়ে হোমের অনল-শিখা,
ললাটে তোমার জ্বল জ্বল করে শুভযাত্রার টীকা!
দেবতা-মানব মানে পরাভব তব দ্বৈরথ রণে,
তব ভাগ্যের সূর্য্য উঠেছে শুভ মাহেন্দ্র খণে।

নব বসন্ত আনে অনন্ত রঙবাহারের মেলা,
প্রজাপতি আর টুনটুনি বনে করে খুনসুড়ি খেলা,
কিশলয় দল পরশ-বিভল লজ্জাবতী সে লতা,
অপরাজিতার দলে দলে ফোটে ফুলের মর্ম্মকথা।

গন্ধ মধুর, সে যে বহুদূর বিলাবার আয়োজন
রসের ফোয়ারা ছোটে ফলে ফলে, জানে তা তোমার মন।
ধূপ দহি' তা'র গন্ধ বিলায় প্রসাদন চন্দনে,
মালতীমালার মধু ঝরে' পড়ে আরতির নন্দনে।
নয়নের আলো সকল ভুলালো দেহের পরশ দিয়া,
অধরে অধর কাঁপে থর থর হেথা বিমোহিনী প্রিয়া!
দেহের সঙ্গে দেহের মিলন প্রাণে প্রাণ যায় গলে,
বসন্ত-সখা বিজয়মালিকা পরা'ল যাহার গলে,—
তারই পাশে তুমি কবি-মালাকর অনাদি কালের পথে
মালা গেঁথে যাও ফাগুন বনের ফুল্ল কুসুম হ'তে।
শ্যামা ধরণীর উৎসব-সভা তুমি তা'র সভাকবি
মধ্য গগনে কিরণোজ্জ্বল তব গৌরব-রবি।

শ্রাবণ-সন্ধ্যা আসিল ঘনায়ে নাগকেশরের বনে,
বর্ষা-নাগরী খোলে গুণ্ঠন তব প্রেম-ঈক্ষণে;
চির-বিরহের গোপন লেখায় ঝরিছে অশ্রুধার
তোমার হৃদয়ে ঘনাইয়া ওঠে সুর মেঘমল্লার।
ধারা বরিষণ, মেঘ-গর্জ্জন বিজন আঁধার রাতি,
অভিসারিকার আঁচল-আড়ালে জ্বলে কি না জ্বলে বাতি;
সেই দুর্য্যোগ আঁধার আলোক মরণ-দোলায় দোলে
বিরহ-মিলন দোঁহা পাশাপাশি চিরজীবনের কোলে।
হে কবি, তোমার হাতের রেখায় জ্বলে প্রতিভার শিখা,
অনাহত তব বীণা-ঝঙ্কারে রূপবতী নীহারিকা।

সতী রমণীর সিঁথির সিঁদুর প্রিয়-প্রেম-অনুরাগে
অরুণ-আলোর উজল প্রভায় যেথায় নিত্য জাগে,
যেথা সুন্দরী কল্যাণময়ী নিখিলে সর্ব্বসহা
দু'হাতে বিলায় স্নেহ ও পুণ্য—সে যে আনন্দ মহা;
তুমি কবি তা'য় ছন্দে গাথায় তুলিলে অমর করি'
লেখনী তোমার হয়েছে ধন্য নর-নারায়ণে বরি'।
তুমি কবি-শিশু করিলে নৃত্য শিশুর চরণতালে
চির-শিশুটির ঠিকুজি বিধাতা লিখেছে তোমার ভালে।

অত্যাচারীর শাণিত কৃপাণ যেথায় জাগায় ভীতি,
সেথা পথ বাহি' তুমি চল গাহি' নব জাগরণী গীতি;

হে দীনের কবি, ব্যথার মাণিক আঁধারে জ্বালায়ে ধরি'
দুঃখেরে দিলে রাজার মুকুট দীনের লজ্জা হরি'—
দৈন্যে করিয়া জীবন-ধন্য অবহেলি' পরমাদে
ছিন্ন কাঁথায় সোণার স্বপন বুনে যাও আহ্লাদে।
উদ্যত যা'র দু'হাতে দণ্ড সে দেখে কবির হাতে,
লীলাকমলের দলগুলি হায় ফুটিছে নিঠুরাঘাতে।
দক্ষিণ হাতে অমর লেখনী, বাঁ' হাতে কমল-মালা,
মিথ্যারে ছার করিয়া হাসিছে নয়নে বহ্নি-জ্বালা।
তুমি কবি, তুমি মানুষেরই কবি, করি তব জয়গান,
কণ্ঠে তোমার চিরজাগ্রত সত্যের ভগবান।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কবি যতীন্দ্রমোহন

কবিকে যখন সম্মান করি তখন আমরা নিজেরা ধন্য হই। সে সম্মান আমাদের নিজেদের কাছেই ফিরে আসে। আমাদের শ্রদ্ধা থেকে আমাদের নিজেদেরই পরিচয় আমরা পাই।

আজ এই যে কবি যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্দ্ধনায় আমরা মিলিত হয়েছি এর কারণ যদি শুধু বলি এই যে যতীন্দ্রমোহন বাঙ্গলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দিয়েছেন তাহলে কথাটাকে ঠিক পরিষ্কার করে বলা হয় না। এর আসল কারণ এই যে আমরা যতীন্দ্রমোহনের লেখায় আমাদের নিজেদের গোপন রসধারাকে খুঁজে পেয়েছি। যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্দ্ধনা তাই আমাদের নিজেদের রসবোধেরই প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যেক বড় কবির কৃতিত্বই এইখানে যে তাঁরা বাইরে থেকে মানুষকে ধমক দিয়ে কিছু শেখান না ভেতর থেকে তাকে আনন্দের বিদ্যুৎ-চমক দিয়ে তার নিজের লুপ্ত রসধারার সন্ধান দেখান। মানুষ তাঁদের লেখায় নিজেকেই ফিরে পায় অপূর্ব্বত্বের মায়ালোকে। তার ধূলি-ধূসর অভ্যাসমলিন প্রত্যক্ষের মাঝে সে আবিষ্কার করে অনাদি ও অসীমের রহস্যময় সঙ্গমতীর্থ।

কিছুই না জেনে কিছুই না বুঝে সুবাসের আভাসটুকু মাত্র পেয়ে যারা বাইরে হাতড়ে মরছে, হঠাৎ কবির যাদুতে আলো এসে পড়ে তাদের আপন মর্ম্মের মাঝখানটিতে যেখানে তাদের রসের কমল সঙ্গোপনে ফুটে আছে তাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

এই যাদু পৃথিবীর অতি অল্প কবিরই আয়ত্ত। যতীন্দ্রমোহন সেই সংখ্যাবিরল কবিদেরই একজন।

যে কবিতা পড়ে মানুষ নিজের সীমা অতিক্রম করতে না পারে সে কবিতা কবিতাই নয়। যে কবিতা আকাশকে এক সঙ্গে দূর ও নিকট করে, যে কবিতা নারীর মুখে ফেলে অপরূপ জ্যোতি, শিশুর মুখে দেয় নূতন কোমলতা, পৃথিবীর ওপরে মাখায় নূতন রঙের প্রলেপ, সে কবিতা যে দুর্লভ একথা অবশ্য বিশদ করে বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে এই বাঙ্গলা দেশে একই যুগে আমরা একাধিক এমনি কবিতার রচয়িতার দর্শন পেয়েছি। তাঁরা আসেন বলেই এই বৃদ্ধা পৃথিবীর বয়সের কথাটা আমরা মনে রাখতে পারি না, তাই প্রভাতসূর্য্য একেবারে আনকোরা আকাশের পাতায় টকটকে লাল কালীর অক্ষরে প্রতিদিন নতুন কাহিনীর শিরোনামা লেখে।

তাঁরা মানুষের জীবনের ওপর জগতের ওপর এই যে নতুন রঙ ফলান এটা তাঁরা কোন অজানা জগত থেকে আমদানি করেন না। জীবনের নিজস্ব যে রঙ সেইটেই তাঁরা অপূর্ব্ব কৌশলে বার বার ফুটিয়ে তোলেন। আর আমরা সবিস্ময়ে চেয়ে ভাবি পৃথিবীতে এমনটি আর কখন হয়নি। এ একেবারে নূতন!

প্রতিদিনের অতি ঘনিষ্ঠতায় আমরা চোখের সামনে যে ধূলিধূসর কুয়াশা রচনা করে সৃষ্টিকে অস্পষ্ট করে তুলি সেইটে সরিয়ে দিয়ে আসল রঙ জাগিয়ে তোলাতেই তাঁদের কলমের বাহাদুরী।

যতীন্দ্রনাথের হাতে এমনি সোণার কলম—সূর্য্যের প্রথম আলোর মত ঝক্‌ঝকে, মনের কুয়াশা তার স্পর্শ পাবামাত্র অন্তর্হিত হয়ে যায়

ভাবের ঐশ্বর্য্য আর কথার কারুকাজ, ছন্দের বৈচিত্র্য আর শব্দের ঝঙ্কার এসব নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কবিতা যাচাই করতে যেতেই হয় আনন্দের অন্দর-মহলে। সব ঐশ্বর্য্য সম্পদ নিয়েও সে মহল উত্তীর্ণ হতে পারে নি এমন কবিতার অভাব নেই দেশে। যে পাখীর পাখা আছে অথচ উড়তে পারে না, গলা আছে কিন্তু তাতে সঙ্গীত ওঠে না, এ সব কবিতা সেই জাতীয়। তাদের কারো কারো পাখার দুর্ব্বলতা উটপাখীর মত লম্বা ঠ্যাং-এর দৌড়ের দ্বারা ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা আছে কিন্তু সে চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত লোক হাসায়।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য বাহুল্যরূপে মনকে পীড়িত করে না। সুরুচি-সম্পন্না সুন্দরীর আভরণের মত তা আসল রূপকে পরিস্ফুট করে বেশী করে।

ছন্দের ও কথার খোলস ছাড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে যতীন্দ্রমোহনের কাব্য থেকে ফিরতে হয় না। মনের রসনা ছুঁতে না ছুঁতেই তা অপূর্ব্ব রসধারায় গলে সমস্ত হৃদয়কে সুবাসিত করে দেয়।

যতীন্দ্রমোহনের কথায় আপনা থেকেই আর এক কবির নাম মনে পড়ে যাঁর খ্যাতি আজ সাগর পার হয়ে—সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছি।

এঁদের দুজনের মধ্যে একটি মিল আছে, সে মিল অনুকরণের বা অনুসরণের নয়, অনুরণনের। এঁদের দুজনের কবিচিত্ত কতকটা যেন একই ভাবে একই সুরে বাজে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আজ পশ্চিমে ঢলেছে কিন্তু সম্প্রতি যতীন্দ্রমোহনের লেখায় যে নূতন জোয়ারের বেগ ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে তাঁর প্রতিভার মধ্যাহ্ন-কাল সমাগত বলেই মনে হয়।

আমারা যতীন্দ্রমোহনের দীর্ঘ কবি-জীবন প্রার্থনা করি, আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

যতীন্দ্র-বরণ

দিনের বেলায় রবির আলোয় মত্ত সবাই যবে
ভাবে না ত দিন ফুরালে কি দশাই যে হ'বে,
আঁধার পটে বিশ্ব-গগন
অমানিশা ঢাকবে যখন
উজল তপন, সোণার স্বপন কোথায়, তখন র'বে?
যাত্রা-পথের বার্ত্তা তখন তুমিই মোদের ক'বে!

মরমীজন জানে তোমার মর্ম্ম-মাঝেই স্থান,
সঞ্জীবনীরশ্মি তুমি নিত্য কর দান,
নয় সে ক্ষণপ্রভার আলো
ক্ষণ পরেই সব ফুরালো,
গাওনা কভু বজ্রতালে প্রলয় কালের গান,
পথ-ভোলারে নিত্য যে দাও পথেরই সন্ধান।

কাব্যাকাশে রবির পরে তুমিই ধ্রুবতারা,
স্নিগ্ধ কোমল স্থির অচপল তোমার জ্যোতিধারা,
লুপ্ত হ'বে নকল শিখা
খদ্যোতিকার ললাটিকা
দীপ্ত রবে নীহারিকার অতন্দ্র পাহারা
আলোক-রেখার অলোক-লেখায় কী পুলকের সাড়া!

মিথ্যা জলুষ ল'য়ে ফানুষ শূন্যে করে ভিড়,
কর্জ্জ-করা দীপ্তি তাদের প্রদীপটি মাটীর,
ভাবী কালে একটি ঝড়ে
নিভে যাবে একোত্তরে,
ভ্রান্ত পথিক বুঝবে তখন তোমার আলোই স্থির,
বুঝবে তখন তফাৎ কেমন সাচ্চা ও মেকীর।

সাহিত্যের এই কুরুক্ষেত্রে বাজাও পাঞ্চজন্য,
জাগরণীর মন্ত্র ছাড়া নাইক বাণী অন্য,
সাথে ল'য়ে পার্থ মিতা
শুনাও নব-জীবন-গীতা,
বাণীর চরণপ্রান্তে পাতা আসন তোমার জন্য
তোমায় বরণ করে রস-চক্র হ'ল ধন্য।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-প্রশস্তি

কবি যতীন্দ্রমোহন কতবড় কবি বা বঙ্গসাহিত্যে তাঁর প্রকৃত স্থান কোথায় এই সব জটিল প্রসঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মত সাহস এবং ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই। তবে একথা জোরগলায় বলতে পারি যে যতীন্দ্রমোহন এক-জন সত্যকারের কবি। তাঁর কবিতার মধ্যে সত্যকারের কবি-প্রাণের পরিচয় আমরা বার বার পেয়েছি।

অমুক কবিকে আমার ভাল লাগে কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে ছন্দচাতুর্য্য আছে। অমুক কবিকে আমার ভাল লাগে কারণ তাঁর প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রচুর পৌরুষ পাওয়া যায়। অমুক কবিকে আমার ভাল লাগে কারণ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে তিনি যথেষ্ট নূতনত্ব এবং অভিনবত্ব আমদানি করতে পেরেছেন। অমুক কবিকে আমার ভাল লাগে কারণ তাঁর মধ্যে বিদ্রোহ আছে—পুরাতনকে ভাঙবার সাহস এবং বীরত্ব আছে। এইসব ভাল-লাগালাগির মূলে প্রকৃত কাব্যরসাস্বাদনের অংশ কতটা বর্ত্তমান—তা ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু কবি যতীন্দ্রমোহনের কবিতা যে আমাদের মুগ্ধ করে সে আলাদা করে' ছন্দচাতুর্য্যের জন্য নয়, বিষয়বস্তুর নূতনত্বের জন্য নয়—প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বের জন্য নয়—তাঁর কবিতার মধ্যে বিদ্রোহ বা পৌরুষ আছে বলে ও নয়—তাঁর মধ্যে কবিত্ব আছে বলে, সরসতা আছে, দরদ আছে বলে প্রকৃত রূপমুগ্ধতা আছে বলে। কবি যতীন্দ্রমোহন ঠিক কতবড় কবি তা মাপযোক করে বলতে পারি না কিন্তু একথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে তিনি একজন সত্যকারের কবি। একথা বলতে পারি যে সৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ করেছে—সৃষ্টির সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য তার বুকের মধ্যে আলোছায়ার বিচিত্র রেখাপাত করেছে।

তিনি দুঃখবাদীও নন্, সুখবাদীও নন্, তিনি জড়-বাদীও নন্ আদর্শবাদীও নন্—তিনি কোন বাদেরই ধার ধারেন না—তিনি মুগ্ধনেত্রে এই সুন্দরী পৃথিবীর অনন্ত বৈচিত্র্য আকণ্ঠ উপভোগ করেছেন—এইখানেই তাঁর কবিত্বের উৎসমুখ, এইখানেই তার রসপ্রেরণার গোমুখীতীর্থ।

সৃষ্টির এই সুন্দর দেহের অন্তরালে কঙ্কাল থাকে থাকুক, তাই বলে লীলায়িত সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মাংসের বিকার বলে উড়িয়ে দেওয়ার মত অরসিকতা যতীন্দ্রমোহনের কাব্যকে কোথাও অশোভন করে তুলতে পারে নি। সুন্দরী যুবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গির মূলে মাংসের বিকার ছাড়া আর কিছুই নেই একথা জেনেও মানুষ স্ত্রীলোকের প্রেমে প্রতিদিন পড়ছে—তেমনি সৃষ্টির মূলে দুঃখ, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যু আছে, একথা জানবার পরও সৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে তার রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ আমাদের অন্তরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে আনে। কবি যতীন্দ্রমোহনের কবিতার মধ্যে এই আনন্দবার্ত্তার প্রতিষ্ঠানই আমরা বার বার শুনেছি।

মানুষ যখনই সৃষ্টির বাহিরের এই বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর আবরণটি সরিয়ে তার ভিতরের খবর নিতে উন্মুখ হয়েছে—তখনই তার চোখে পড়েছে একটি অখণ্ড তত্ত্ব—বর্ণহীন, আকারহীন একটি অখণ্ড সত্য। তা সে সুন্দরই হোক আর ভয়ঙ্করই হোক। এই অখণ্ড সত্যকে মানুষ যেখানে স্বীকার করে নিয়েছে সেইখানেই সে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সৃষ্টির আনন্দ বৈচিত্র্যের আনন্দ—লীলার আনন্দ—পরিবর্ত্তনের আনন্দ চঞ্চলতার আনন্দ। তত্ত্বের আনন্দ একের আনন্দ, স্থিতির আনন্দ। শিল্পির আনন্দ বৈচিত্র্যে বহুতে;—জ্ঞানীর আনন্দ একে, অখণ্ডে। সৃষ্টিটা নিষ্ঠুর একথাও সত্য নয় সৃষ্টিটা নিছক আনন্দেভরা একথাও সত্য নয়—এ দুইটাই অর্দ্ধসত্য। সবচেয়ে বড় সত্য এই যে এর বুকের উপর সুখ দুঃখের আলোছায়ার অনন্ত বিচিত্র খেলা নিত্যকাল ধরে চলেছে। সৃষ্টিকে যতই মানুষ একদিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছে তাকে নিছক সুখের দিক থেকেই হোক আর নিছক দুঃখের দিক থেকেই, অমনি একটা নির্দ্দিষ্ট মতবাদের বর্ণ-হীনতা তার কবিতাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে—তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। সৃষ্টিটা শুধুই আনন্দময় এই মতকে আগে থাকতে মেনে নিয়ে মানুষ যখন কবিতা লিখেছে তখন তা হয়ে উঠেছে স্বপ্ন-বিলাস, আর সৃষ্টির মূলে দুঃখই একমাত্র সত্য একথা মেনে নিয়ে মানুষ যখন কবিতা লিখতে বসেছে তখনই তা

হয়ে উঠেছে বড্ড বেশী স্থূল, বড্ড বেশী জড়, বড্ড বেশী বস্তুতান্ত্রিক। কবি সমগ্রকে দেখে বিচিত্রের মধ্যে। তাই সৃষ্টি তার কাছে দুঃসময়ও নয়, আনন্দময়ও নয়, বিচিত্র।

এই যে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজের মনকে বিচিত্র করে তোলা; এই যে চিরবিচিত্র উদার আকাশের মত নিত্য নূতন রং-এ নিজের চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে তোলা, এই হচ্ছে প্রকৃত কবির কাজ। কবি যতীন্দ্রমোহনের কবিচিত্ত ঠিক এমনই বিচিত্র, ঠিক এমনই নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল। সেখানে কত বিচিত্র অপূর্ব্ব রং-এর খেলাই না আমরা দেখলুম। কত বিচিত্র বর্ণ পরিবর্ত্তন হ'ল, আমরা মুগ্ধ নেত্রে উন্মুখ হয়ে প্রত্যক্ষ করলুম। সেখানে তত্ত্বের বালাই নেই; জোর করে টেনে আনা পৌরুষ নেই। ছন্দের সস্তা ভেল্কীবাজি নেই, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অহঙ্কার নেই, বিদ্রোহের আস্ফালন নেই, আছে কেবল চির পুরাতন, অথচ চির নূতন সহজ সরল রূপমুগ্ধতা, সেই অনাড়ম্বর শান্ত সংযত রসোপভোগ। তাই হে কবি, তোমার এই অভিনন্দন-সভায় সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসে এই কামনাই মনে মনে জাগছে—যে তোমার কবিতায় আমরা যেন সৃষ্টির বিচিত্র আনন্দরূপ আরো বেশী করে দেখতে পাই। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে সৃষ্টির বিচিত্র বর্ণসুষমা যেন আরও নিবিড় হয়ে আমাদের নয়নে ঘনিয়ে আসে। আমরা যেন ভুলে যাই আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাবো। আমরা যেন তোমার কবিতা পড়ে বলতে পারি জীবনকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উপভোগ করতে পেরেছি। তার মায়া আমাদের নয়নে অমৃতাঞ্জন লেপন করেছে। আমরা সৃষ্টিকে ক্ষণকালের জন্যও আপনার করে নিতে পেরেছি।

তোমার কবিতা পড়ার পর হে কবি—বসন্তের কুসুম-মালঞ্চ আমাদের চোখে যেন আরো পুষ্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শরতের স্নিগ্ধ পীত রৌদ্রটি আমাদের আঙ্গিনায় যেন আরো দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বর্ষার অবসাদময় নিরালা সন্ধ্যা যেন আরো বেশি করে আমাদের চিত্তকে ম্রিয়মাণ করে তোলে।

—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

অভিনন্দন

সুধুই কবি নও গো তুমি, বন্ধু বলেও জানি
কবির চেয়ে বন্ধুকে ভাই বুকের মাঝে মানি,
বিশেষ করে তোমার লেখা তাইত লাগে ভালো,
যতির মত সুসংযত শান্ত ভাবের আলো!
তীব্র যাহা—তিক্ত যাহা—নয় সে তোমার সুর,
নও গো তুমি হাটের কবি যশের লোভাতুর!
দ্রষ্টা তুমি, স্রষ্টা তুমি, ব'লবে যারা বোঝে,
মোহন তব তুলির 'লেখা' রূপের 'রেখা' খোঁজে!
হরণ করে চিত্ত তব চন্দ্রমুখর ধ্বনি,
নবীন তব 'নাগকেশরে' কোন্ সে 'জাগরণী'
বাজায় বুকে দুঃখে সুখে মন্দ্র মধুর বাণী—
গন্ধে উতল মর্ম্ম-কোষের অপরাজিতা খানি
চিরন্তনী রসের ধারা জোগায় নিতুই নব
কেমনে করে সে কথা আজ তোমার কাণে কব?

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মান-পত্র

এক এক যুগে এক একজন কবি বড় হন। রবীন্দ্রনাথের যুগে শুধু রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছাকাছি আর কেউ নেই, কিন্তু তিনি অনেক বড়, এত বড় যে আমরা তাঁর নাগাল পাইনে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে দেখা যাবে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী ছাড়া তাঁর সময়ের আর কেউ নেই। এমন যদি কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথ এত বড় না হলে যতীন্দ্রমোহনকে এত বড় দেখতে পেতাম না, তাঁর সঙ্গে আমাদের তর্ক নাই। যিনি কবি হয়ে জন্মাতে পারলেন, তিনি বড় হতে পারবেন না কেন? তাঁর সময়ের রাশীকৃত কবিদের যদি একবার ঢেলে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ধূলো-গুঁড়ো ঝরে' গিয়ে যতীন্দ্রমোহন ছাড়া চালুনিতে আর কেউ নেই। যতীন্দ্রমোহন আমাদের চোখে অনেক বড় কবি।

এইটুকু বললেই হয়ত হতো, কিন্তু এত বড় শক্তিশালী কবির প্রশংসা দু' লাইনে করে' কেনই বা সরে যাবো? দৈবদুর্বিপাকে বয়সে আমরা ছোট, তাই শ্রদ্ধাস্পদগণের সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে আমাদেরই ঘটে বিপদ। যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিষ্ঠা এমনি যে, এই অভিনন্দন-সভার সুযোগে তাঁর কাব্যের আলোচনা নতুন করে' করলে বে-মানান হবে, হয়ত বয়স্ক সাহিত্যিকদের আলোচনা-সমালোচনা নবীনদের পক্ষে ঔদ্ধত্যেরও লক্ষণ. কিন্তু এদিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসারও যে বিপদ আছে! শুনেছি ছোটদের প্রশংসা বড়দের কান পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। তবে ছোটদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা যে ছোট নয় এ কথা যতীনবাবু আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

যাঁরাই কবিতা লেখেন তাঁরাই কবি নন, যাঁরা কবি তাঁরাই লেখেন কবিতা। অনেকের কবিতা হয় পদ্য, ছড়া—অনেকের কবিতা হয় কাব্য। যতীন্দ্রমোহনের কাব্য-প্রতিভা তাঁর সহজাত। সাহিত্যের বাজারে অসংখ্য বার নাম প্রচার করে' যে-নামের বিজ্ঞাপন হয় তার একটা সস্তা যশ চোখে পড়ে, কিন্তু যতীনবাবুর সাহিত্যিক যশের মধ্যে খুব বড় একটি আভিজাত্য আছে, যেটা ভঙ্গুর নয়, দুর্ব্বল নয়—যার শিকড় অনেক নীচে নেমেছে। গভীরতা ও ঐকান্তিকতা যদি কবি ও কাব্যের মূল কথা হয় তাহলে যতীন্দ্রমোহনের আসন টলানোর মত' কবি তাঁর চারিদিকে রবীন্দ্র যুগের মধ্যে আর কেউ নেই। রবীন্দ্র সাহিত্যের আকাশে যতীন্দ্রমোহন হচ্ছেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিতা পড়ছি, সেদিনও যেমন লেগেছে আজো তেমনি। বাংলা ভাষা আছে দু'রকমের। এক সাধারণ ভাষা, আর একটি কবি-ভাষা। মাঝে মাঝে ভাবি সত্যকারের কবি-ভাষা যতীন্দ্রমোহন ছাড়া আর কারো জানা নেই, আর যাঁরা কবি আছেন তাঁরা লেখেন সাধারণ ভাষায়—যে ভাষায় খবরের কাগজ চলে, যে ভাষায় চলে নায়েব-গোমস্তার কাজ। যতীন্দ্রমোহনের অপরাজেয় রসভাষা ও তার মাধুর্য্যের কাছে তাঁর সমসাময়িক যে কোনো কবি নিজের দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য। যতীন্দ্রমোহন তাঁর ভাষা আয়ত্ত করেছেন অভিধান থেকে নয়, সরস্বতীর অঞ্জলী হাত পেতে নিয়ে। মনোরম পদলালিত্যে তাঁর সমকক্ষ তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আর কেউ নেই।

কিন্তু আজ সভায় দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্যের প্রশংসা করবার দিন নয়, সে চেষ্টাও আমাকে মানাবে না—আজ আমাদের সকলের আনন্দের দিন এই জন্যে যে আমাদের দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কবির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের সুযোগ পেয়েছি। আজকের দিনটি আমাদের সকলের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকুক।

ব্যক্তিগতভাবে কবিকে জানবার কিছু সুযোগ পেয়েছিলাম তাই আজ কেবল মনে হচ্ছে। আজকের এই দেশজোড়া বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরের দিনে যতীন্দ্রমোহনকে একাকী নিঃশব্দে নিস্পৃহ থাকতে দেখেছি। বলা অশোভন যদি না হয় তাহলে বলব, প্রশংসার লোলুপতাকে যতীন্দ্রমোহন কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অপরিমিত তাই অন্যের শ্রদ্ধা ভিক্ষা করার দৈন্য তাঁর নেই। প্রতিভাবান কবির দুর্ল্লভ অহঙ্কার তাঁর আছে কিন্তু সুলভ গর্ব্ব আমরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পাইনে। তাঁর সমস্ত জীবনই কবির জীবন, তাঁর অকপট ও সহৃদয় ব্যবহারের সঙ্গে সে-জীবন মিলে বন্ধুবান্ধবের নিকট মধুর হয়ে উঠেছে। তাঁর বন্ধু-বাৎসল্য ও অতিথি-সৎকার সর্ব্বজনবিদিত।

সেদিন আসতে আর দেরী নেই যেদিন এই কবির সত্য পরিচয় বাঙ্গালী জাতি মনে প্রাণে বুঝবে। অন্য যে কোনো কবির সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই আমরা ভাবি তাঁর সমসাময়িক কবির কথা, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই যে আমাদের মনে পড়ে—এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে? আমরা কায়মনোপ্রাণে বিশ্বাস করি জাতি একদিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার কথা বলতে গিয়ে যতীন্দ্রমোহনের কাব্যালোচনা না করে' পারবে না। এমন কবির অভিনন্দনের ব্যবস্থা করে' রসচক্র নিজের কৃতিত্ব অটুট রেখেছেন;

আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীকে নমস্কার করি।

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বন্ধুর অভিনন্দন-দিনে

অনেক বন্ধু এসেছে বন্ধু, তব অভিনন্দনে,—
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে সবার মনে।
গানের আড়ালে প্রাণের তন্ত্রী যে ব্যথার টানে কাঁপে,
এ হতভাগ্য নিবিড় গভীর সেই বেদনাই মাপে।
তব সঙ্গীত সার্থক হ'ল যাদের বেদনা গাহি',
তোমার তরণী পৌঁছিছে তীরে যাদের অশ্রু বাহি',
এই আনন্দ-দিনে
চেয়েছিল তারা অনিমন্ত্রিত আসিবে পন্থা চিনে'।
নিষেধ ক'রেছি, কেহ বা শুনেছে, কেহ তাহা শুনে নাই,
তাদের হইয়া, বন্ধু, তোমার মার্জ্জনা আমি চাই।

কাঁটাবন হ'তে বলে' পাঠায়েছে তোমার সাধের কেয়া,—
'বন্ধুরে ব'লো মোর শিরে আজও সমান ঝরিছে দেয়া।
কত কবি এল, কত কবি গেল, নিল অভিনন্দন,—
কেয়ার অঙ্গে নিবিড় হ'ল যে কণ্টক-বন্ধন!
আজও পাঠালাম বাদল বাতাসে গন্ধের উপহার,
আনন্দ-দিনে কেয়ার কথা সে স্মরে যেন একবার।'

তোমার পথের ঝরা শেফালীরা এসেছিল আজ ভোরে;
বেলা হ'ল যেই, মলিন মাধুরী আরবার গেল মরে'।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার হাতে হাতে হাত ধরি';
ব'লে গেল তারা;—'ব'লো বন্ধুরে আজিও অঝোরে ঝরি।'
দিয়ে গেল তারা মর্ম্মবৃন্তে ছোপানো উত্তরীয়;
ক'য়ে গেল তারা,—'শরতের শত শপথ স্মরিয়ো প্রিয়'!

হেরিনু বন্ধু,—বাদল-সন্ধ্যা বহি' যায় কুলু কুল,
ভেসে' এল তায় কোন্ সাঁঝদীপ, কোথাকার ঝিঙাফুল!
ভেসে যেতে যেতে ব'লে গেল তারা,—'ব'লো ব'লো বন্ধুরে,
এক গাঁয়ে ছিল বসতি মোদের, আজ চলি কোন্ দূরে!
ব'লো তারে—মোরা আলো ক'রেছিনু যে কুটীর যে আঙিনা,
আজ বাদলের আঁধারে হয়ত কঠিন হবে তা চিনা।
তবু ব'লো তারে ভাই;
সে ঘর আঙিনা আঁধারই রহিল, মোরা যাই ভেসে' যাই।'

শুধা'ল নিশীথে তোমার দেশের চরের চক্রবাকী;
'সন্ধান তার পেল কি বন্ধু, আমার হারানো পাখী?
সে যে বলেছিল নিশি হ'লে ভোর আবার মিলিবি তোরা;
এ জীবন-ভোর হয় নিশি ভোর; ভাঙ্গা ত লাগেনি জোড়া।
ব'লো ব'লো ভাই, মোদের বন্ধু তোমার মিতারে ব'লো;
তাদের গাঁয়ের অবুঝ পাখীর দিন-রাত এক হ'লো।'

এমনি কতনা এল রবাহুত, তাদেরই বারতা বহি'
এসেছি বন্ধু, বল তো কেমনে নিজ আনন্দ কহি?
এসেছি বন্ধু, মাথায় ধরিয়া আকাশের মেঘভার,
যার বুকে তুমি সাতরঙা ধনু টঙ্কারো বারবার;
এসেছি বন্ধু, দুপায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ,
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় জীবনশ্বাস।
নিষেধ ক'রেছি শোনেনি বন্ধু, সঙ্গে এসেছে চলি'
তোমারই বুকের মালঞ্চ হ'তে কীটেকাটা ক'টা কলি।

আপনা হারায়ে যারা বাড়াইল তোমার গানের গতি,
আপনা ফুরায়ে যারা পূরাইল তোমার প্রাণের ক্ষতি,
তাদের পক্ষে তোমারে হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

অভিবাদন

কবিকে অভিনন্দিত করার অর্থই হচ্ছে কলালক্ষ্মীকে লক্ষ্য করে' আনন্দ-অভিবাদন! গুণগ্রাহিতাই হচ্ছে রসবোধের প্রধান পরিচয়। তাই যতীন্দ্রমোহনের অভ্যর্থনা দিবসে তাঁর কাব্যের বিশ্লেষাত্মক সমালোচনার কথা উঠতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী সাহিত্যিকমণ্ডলীর যাঁরা আজ প্রৌঢ়তার প্রান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের কাব্যকীর্ত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্র নাথ দ্বারা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হ'লেও যতীন্দ্রমোহন এমন একটি ভাষালালিত্য ও ছন্দোমাধুর্য্য অর্জ্জন করেছেন যা তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। বাগাড়ম্বরে, তথ্যসম্ভারে তাঁর কবিতা আড়ষ্ট হয় নি, ছন্দ নিয়ে তিনি শ্রুতিকটুতার কসরৎ করেন নি, তাঁর কবিতা পাণ্ডিত্যের কৃত্রিমতা বা উপদেশ-বিতরণের শিক্ষকসুলভ প্রলোভন থেকে প্রতিনিয়ত মুক্ত রয়েছে। তাঁর বলিষ্ঠতা ভাষায় নয়, ভাবে। প্রসাধন একমাত্র তাঁর প্রসাদগুণ। সাবলীল ছন্দ, লীলায়িত ভাষা, সহজ অনুভূতি—কবিতায় এই তাঁর ঐশ্বর্য্য! এই তিন গুণের সমাহার তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে এত সুপ্রচুর কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আমার ঘোচেনি।

অনলঙ্কৃত ও অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য-চিত্রাঙ্কণে ও করুণ রসোদ্বোধনে তাঁর প্রতিভার জোড়া নেই। স্নিগ্ধ ও সুন্দর সংসার, মেঘ-ম্রিয়মাণ আকাশ, কণ্টকশয়ানা কেয়া, স্তিমিত সন্ধ্যা, বেপথুমতী বধূ ও তুলসীতলায় মৃন্ময় বাতি। এই সব রূপময় দৃশ্যাবলী গগনাঙ্গনে তারার কণিকার মতো তাঁর কাব্যের পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ হ'য়ে রয়েছে। জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনা-বর্ণনায় তাঁর সূক্ষ্ম সুচারু দৃষ্টি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই minutiæ আমরা টেনিসনে পেয়েছি।

কবি যতীন্দ্রমোহন অপেক্ষা ব্যক্তি যতীন্দ্রমোহন কম সমৃদ্ধিশালী নয়। ভাবে যেমন তিনি সুললিত, স্বভাবে তেমনি তিনি সৌম্য সুজন; ছন্দে যেমন সুমধুর, স্নেহবন্ধেও তেমনি অকপট ও অমায়িক; প্রসাদগুণ যেমন তাঁর স্বচ্ছ ও সহজস্নিগ্ধ, প্রসাদবিতরণেও তেমনি মুক্তহস্ত ও অকুণ্ঠিত। তাঁর সান্নিধ্যই একটি সুকোমল ও সুখপাঠ্য কবিতা।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় কঠিন বাস্তবতা মেঘলোকে মিলিয়ে গেছে, আমরা এক অনির্দ্দেশ্য আনন্দ-নিকেতনে নির্ব্বাসিত হ'য়েছি। এই সুমধুর নির্ব্বাসনবোধটুকুই বোধ করি কাব্যানুরাগীর পরম পুরস্কার। কবিতার পাখায় উড়ে' আমরা এমন এক মায়াপুরীতে উত্তীর্ণ হ'তে চাই যেখানে আমি আমার অনুভূতিটি নিয়ে একটি ম্লান মুহূর্ত্তে একাকী বিরাজ করবো। তারপর কঠিন মাটিতে সঙ্ঘর্ষে ও সঙ্ঘাতে কলহে ও কোলাহলে নেমে আসবো না-হয়, তবু একটি ক্ষণের জন্যে আলোকলোকে এসেছিলাম এই সান্ত্বনা—যতীন্দ্রমোহনের কবিতা পড়ে' মাঝে মাঝে হয়তো একাকী বোধ করি, হয়তো সেই আলোকলোকের পারে এসে দাঁড়াই।

যতীন্দ্রমোহন সুদীর্ঘ আয়ু ও সুবিস্তীর্ণ যশের অধিকারী হ'য়ে কাব্যানুশীলন করতে থাকুন, তাঁর সাধনা নির্ব্বিঘ্ন হোক এই প্রার্থনা করি।

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

সুস্বাগতম্

রসচক্র-সংসদের সদস্যবৃন্দ এই দূরস্থ হিতৈষীটির প্রতি সদয় হ'য়ে কেন তাঁদের অভিযান বেলঘরিয়ায় আনলেন এবং চক্রনেমিতলে আমার নির্জ্জনতা-প্রিয় মনটিকে কেন পিষ্ট করলেন, তা'র কারণ দু'টি। নগরবাসী তাঁরা—ভাদ্রের এই ভরন্ত পল্লিশ্রী আমন্ত্রণী পাঠিয়েছিল তাঁদের বিশেষ একটা উৎসবে! সে উৎসব প্রথমতঃ তাঁদের আনন্দিত করতে ও প্রধানতঃ অগ্রজ-প্রতিম কবি যতীন্দ্র-মোহনকে অভিনন্দিত করতে; নিন্দিত হবার জন্য এ অধম প্রকুল্ল মুখেই বর্ত্তমান। তা' আপনাদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করেছে!

কথা হ'য়েছিল একটি উদ্যান-সম্মিলনের আয়োজন করবার এবং তা'র তারিখ দেওয়া হয়েছিল ইং ১৬।৮।৩১; কিন্তু যেই মেসার্স বি, বি, ধরের বাগানখানি ঠিক করা হ'লো আপনারা জানালেন ১৬।৮।৩১ তারিখে কোনও অনিবার্য্য কারণে সেটা হবে না ও তা'র তারিখ পিছিয়ে ২৩।৮।৩১ করলেন। কিন্তু এই যে পশ্চাদ্‌গমন এতে বাগানের মালি থেকে মালিক কেউই সায় দিতে পারলেন না। ভেবে দেখবেন,—এটা অগ্রগমনেরই যুগ!

২৩।৮।৩১ তারিখে অন্য একটি দল সেখানে বাগান করবেন তা' আগে থেকেই ঠিক হ'য়ে ছিল। তা'র পরে অন্য একটি বাগানের অধিকারীর কাছে আবেদন করলুম। তিনি প্রসন্নচিত্তে বললেন—'তথাস্তু'। বাগানে গিয়ে কিন্তু দেখি দস্তুরমত রিফু ও তালি চলেছে এবং বেণু-বনচ্ছায়ার বদলে অট্টালিকার চতুর্দ্দিকেই বংশদণ্ড সমুদ্যত। বাঙালী—কিরূপে সে দণ্ডাঘাত হজম করবো? তা'রপরে উদ্যানের আশা পরিত্যাগ করতে এই গ্রামেরই উদার-হৃদয় এক ভদ্রলোক তাঁর সুরম্য বাড়ীটিতে এই উৎসব সম্পন্ন করবার বাসনা জানালেন—তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষাল। কিন্তু একটা আকস্মিক শোকের ছাপে পরদিনই তাঁরা অধীর হ'য়ে পড়লেন। সে গৃহে উৎসব যে একান্ত অশোভন হবে ভেবে' আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল!... পরে নানা দিক থেকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে তিনি তাঁর বিরাম-কক্ষ এই বৈঠকখানাটি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে তাঁর প্রশস্ত ও প্রশান্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তা' না হ'লে যে হ'লের আশ্রয়ে আমাদের এই উৎসব সম্পন্ন করতে হ'তো, তার সঙ্গে আমার বাল্যের স্মৃতি বিজড়িত ছিল। সেই স-বেত্র ও অত্যুগ্র গুরুম'শায়ের ছবিখানি যিনি গাধা পিটে ঘোড়া করতেন!

পল্লীর অনুপম সৌন্দর্য্য আপনারা উপভোগ করুন। সম্মুখের ঐ বর্ষা-ধৌত চিক্কণ দূর্ব্বাদলে, ঐ বিল্ব-বৃক্ষের পল্লব-বহুল শাখায় শাখায় এবং চতুর্দ্দিকের ঐ প্রাবৃট পুষ্পের অনিন্দ্য মাধুর্য্যে!

বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্যের দিকপাল আপনারা, এই ক্ষুদ্র ও নগণ্য পল্লীগ্রামে আপনাদের আগমনে কোন সে শুভ-সূচনা নিহিত আছে তা বলা কঠিন! তা'র ফল যে পরে আমরা নিশ্চয় লাভ করবো—এই সত্যই বিঘোষিত হোক্। কিন্তু উপস্থিত নানা ক্লেশানুভূতির ভিতর দিয়ে আপনাদের চলতে হ'বে। আমি আমার গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে স-শ্রদ্ধ ধন্যবাদ দিই আপনাদের এই শুভ পদার্পণে!

কবিবর যতীন্দ্রমোহনকে বলি—তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্যই আমরা এস্থানে একত্র হ'য়েছি এবং এর সুমধুর স্মৃতি উপস্থিত জনগণের মনে চিরদিন সঞ্চিত থাকবে আর এর আনন্দ আমি নিজে কখনো ভুলবো না।

কবি তিনিই, যিনি নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে পাঠককে এক আনন্দলোকের সন্ধান দেন। কবি যতীন্দ্র-মোহন আমাদিগকে তা' দিয়েছেন। এ জন্য আমি আমার পল্লীবাসীর পক্ষ থেকে পল্লীর সহজাত অনাড়ম্বর ভাষায় তাঁকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করি।

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

অভিনন্দিতের অভিভাষণ

আপনাদের আজকার এই সহৃদয় অভিনন্দনের সহৃদয়তা-অংশের জন্য আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কিন্তু দুঃখ এই, অভিনন্দন-অংশের তেমন প্রশংসা করে' উঠতে পাচ্ছি না। তার কারণ, মূলেই আপনাদের ভুল হয়েছে। হৃদয়াবেগ আপনাদের অভিনন্দিতের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে হয়ত মুগ্ধই করেছে এবং মুহ্ ধাতু প্রত্যয়ে ত শুধু মুগ্ধ শব্দই সম্পন্ন হয় না। হয়ত-বা ব্যক্তির বয়সের গুরুত্বই এক্ষেত্রে আপনাদের লঘুগুরুজ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে, এও হ'তে পারে।

সাহিত্যকে আমি চিরদিনই নেশার মধ্যে গণ্য করি এবং সে নেশা, বোধ করি, সকল নেশার রাজা। এই নেশা একবার পেয়ে বস্‌লে, মানুষের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নানা রূপে, নানা ভাবে তার উচ্ছ্বাসেরও অন্ত পাওয়া যায় না। সরস্বতী-সেবার নেশায় যাঁরা তন্ময়, সাহিত্য রসে যাঁরা বিভোর, পাত্রাপাত্রজ্ঞান তাঁদের কোথায়? এমন অবস্থায়, মায়ের পায়ের পদ্মটিকে, তাঁর বাহন হংসটিকে পর্য্যন্ত তাঁরা তাঁরই প্রতীক বলে' মনে করে' থাকেন। অনুরাগের হয়ত-বা লক্ষণই এই; তাই, মূর্ত্তির অভাবে বা অসদ্ভাবে, অনেক সময়, তাঁর বীণাটি, তাঁর পুস্তকটি, তাঁর দোয়াত-কলমটি পর্য্যন্ত তাঁরই যোগ্য পূজা পেয়ে থাকে—এ আপনারা লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন। ভক্তের পক্ষে তা'তে চরম সার্থকতাই থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভক্তিভাজনটি যে অভাজন নয়, এতে তার প্রমাণ হয় না। মায়ের নাম করে' রসচক্রে যাঁরা একবার বসে' গিয়েছেন, তাঁদের হাতে নিস্তার পাওয়া, তাই ভদ্রলোকের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে।

আপনারা মার্জ্জনা কর্‌বেন, আজকার এই সাহিত্য-বাসরে, এই আনন্দ-অনুষ্ঠান-পর্ব্বে একটা কথা আমি কিছুতেই আর ভুল্‌তে পাচ্ছি না। হাসিকান্নার হাঁরাপান্না বুঝি এম্‌নি করেই মানুষের ললাটে জড়ানো থাকে। তাই বিশেষ করে' আজকার এই দিনটিতে, দেশজোড়া দুর্দ্দিনের কথাটা কেবলই মনের মধ্যে আমার খচ্‌খচ্ কর্‌ছে। রাষ্ট্রীয় দুর্য্যোগ যখন দেশের আকাশকে ঘনঘটাচ্ছন্ন করেছে, ঠিক সেই সময়টিতে, চাবিধারের অন্নকষ্ট ও জলপ্লাবন যে কি দুর্গতিই লোকের ঘটাচ্ছে, সেই কথাটা থেকে-থেকে কেবলই আমার বারম্বার মনে পড়্‌ছে। ভাব্‌ছি, কেবল কবি না হ'য়ে যদি কর্ম্মী হ'তে পার্‌তাম, তা হ'লে এই দুর্দ্দিনে বুঝি মানুষ হয়ে অন্তত মনুষ্যত্বের সান্ত্বনা থাক্‌ত—কিন্তু যাক্ সে কথা

সাহিত্যরসের আকর্ষণ যে আপনাদের কত প্রবল, কাব্যানুভূতি যে আপনাদের কত দূর আত্মহারা করিয়ে দেয়, তার পরিচয় আজ চরম করেই আপনারা দিয়েছেন। আপনাদের প্রত্যেককে এবং সকলকে উপলক্ষ্য করে' সেই বঙ্গজননী বাগ্‌দেবীকে আজ আমার দেহমনের প্রণতি জানাচ্ছি। যতই অক্ষম হোক্, এই বাণী তাঁরই প্রতীক-রূপে আপনাদেরও আজ অভিনন্দিত করুক্।

দূরে থেকে, কাছে থেকে—যারা মোরে বাসিয়াছ ভালো,
যারা এই চিত্তপুরে জ্বালিয়াছ প্রদীপের আলো
স্নেহের দক্ষিণ দানে, উপেক্ষিয়া অক্ষমতা তার,
কম্পিত শিখার স্পর্শে তাদের জানাই নমস্কার
আজিকার আরত্রিকে। ধূমাঙ্কিত কলঙ্কের রেখা
যদি পড়ে' থাকে দীপে, সে তাহারি ললাটের লেখা।

চঞ্চল চপল বায়ু—বুঝিয়া বা না-বুঝিয়া হোক্,
যদি কোনোদিন সেই অতি শীর্ণ দীপের আলোক
নিবাইতে' চেয়ে থাকে প্রদীপ্তির অপরাধ জ্ঞানে,
তারো প্রয়োজন মানি' শিখামুখে সশ্রদ্ধ সম্মানে,

প্রসন্নতা যাচি’ তারি জানাই বিনীত নমস্কার;
শুধু স্নেহে নহে জানি, বায়ুস্পর্শে জীবন তাহার।

এ দীপ মাটীরই দীপ—চিরদীপ্ত সূর্য্যচন্দ্র নয়;
গৃহের পরিধি মাঝে সীমাবদ্ধ এর পরিচয়।
স্নিগ্ধপরিজনমুখে দিনান্তে পড়ে যে এর ছায়া,
বান্ধবজনের চোখে একান্তে বাড়ে যে এর মায়া;
বেপথু অন্তর নিয়ে নববধূ ইহারই আলোকে
স্বামীর সোহাগচিহ্ন ফুটাইয়া তুলে কালো চোখে।
এরি চারিপাশ ঘেরি’ সুবিরাট ভারত-কাহিনী
ঘরে-ঘরে রচি’ তুলে কল্পনার বিপুল বাহিনী;
দুখিনী চরকা কাটি’ করে তার অন্ন আয়োজন;
গৃহ-তুলসীর মূলে গৃহী হেরে নিত্য নারায়ণ
ইহারই অস্পষ্টালোকে; পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে
এরি ছায়ালোকতলে, ধূপগন্ধা মন্দিরের মাঝে।

অঙ্গনের আশেপাশে যদি-বা সঙ্কোচ-শঙ্কা মানি’
কভু সে মেলিয়া থাকে কুণ্ঠিত কম্পিত দৃষ্টিখানি,
আপনারে লয়ে সে যে আপনি মরিতে চাহে নিবে,—
কি জানি, কোথায় কেবা প্রগল্‌ভার অপরাধ দিবে!

দিতে চেয়েছিনু যাহা—পারিলাম, নাহি পারিলাম,
দীপের জীবনরাত্রে, বুঝিয়াছি, অতীত ত্রিযাম।
পীত পাণ্ডু প্রতিভায়, ক্লান্তিহরা অশীত বাতাসে,
মনে হয়, যাত্রাশেষা রাত্রি তার ভোর হয়ে আসে
এবারের মতো। ধূসর পূর্ব্বাশাতীরে অতিধীরে
এখনি উদিবে ঊষা জ্যোতির্ভাণ্ড বহি’ দীপ্ত শিরে;—
তারি হাতে দিয়ে যেতে পারি যদি এ মুমূর্ষু আলো,
বুঝিব—বাঁচিনু আমি, ভাবিব যে, ভাগ্য মোর ভালো!

তোমরা সকলে মোরে করো আজি সেই আশীর্ব্বাদ—
দীপ্তহীন ঊষালোকে মিটে যেন এ দীপ্তির সাধ।

নিম্নে প্রকাশিত পত্র কয়েকখানি ও কবিতাগুলি সম্বর্দ্ধনা-দিনের পরে পাওয়া গিয়াছে— সুতরাং সভায় এগুলি পঠিত হয় নাই।

মোহিতলালের পত্র

38. Nilkhet Road
P. O. Ramna, Dacca.
24-8-1931

ভাই কালিদাস বাবু,

চিঠিতে সমুদয় অবগত হইলাম। আপনার পূর্ব্বপত্রের উত্তর না দেওয়ার কারণ, সাহিত্য ও নিজ সাহিত্যিক জীবনপ্রসঙ্গে আমি বর্ত্তমানে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি; সাহিত্যের কিছু করিবার ক্ষমতা বা উৎসাহ আর নাই— ও সঙ্গ ও প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিলেই শেষের কয়টা দিন একটু শান্তিতে যাপন করা যাইতে পারে। আমাদের দিন গিয়াছে; এবং সম্ভবতঃ বাংলাসাহিত্যের এখন কিছুকাল মোহাবস্থা চলিবে। তাই সাহিত্যপ্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। আপনাদের রসচক্রের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাই তাহাতেও বিশেষ উৎসাহ বোধ করি না; তথাপি আপনাদের নিরুৎসাহ করিতেও চাই না—আপনাদের জীবনীশক্তির জিদ্‌কে তারিফ করি। পান্তাভাত বাতাস দিয়া জুড়াইয়া খাওয়ার যে করুণ দৃষ্টান্ত আছে তাহাই মনে পড়ে—আপনাদের রসচক্রের চক্রবর্ত্তীরা যদি সেই আত্ম-প্রবঞ্চনার সুখ পান তবে তাঁহাদের বাহাদুরী আছে। দুই যতীন্দ্র ও আপনি নিজে যে আসরে সমাসীন, তাহাতে কখনও রসের অসদ্ভাব হওয়া সম্ভব নয় বটে কিন্তু রস-পরিবেশনে অরসিকের পাত্র বিনা জলমিশ্রণে ভরিয়া দিতে পারেন কি? আজিকার এই তরুণোৎসবে তাড়ির পরিবর্ত্তে সোমরসের প্রচলন কি নিতান্তই চক্রান্ত-সাপেক্ষ নয়? দুয়ার জানালা ভালো করিয়া বন্ধ করিতে হয়, এবং অতিশয় মৃদুস্বরে সোম-সাম গাহিবার কালে, মাঝে-মাঝে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-স্বরে কিছু কিছু অথর্ব্ব-মন্ত্রও তাহাতে যোজনা করিতে হয় নতুবা একঘরে হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই 'রসচক্র' সম্বন্ধে আমার আশা আশঙ্কামুক্ত নয়। আপনার দ্বিতীয়-পত্রে আপনাদের সে অবস্থাসঙ্কটের আভাস আছে।

বাংলাদেশে কবি বা কাব্যের আদর এককালে কিছু ছিল। মধুসূদন দত্ত হাঁসপাতালে মরিলেও, তিনি জীবদ্দশায় যে স্নেহ, আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা অল্প নহে; তখনও বাংলাদেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই জাতীয় রসিক-সমাজ ছিল—বাঙ্গালী কবিতা বুঝিত। সহসা কাব্যের আদর্শ বদলাইয়া গেল কিন্তু বাঙ্গালীসাধারণের রসপিপাসা ভিন্নমুখী হইতে চাহিল না। রবীন্দ্রনাথকে ঘেরিয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালী, রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসভার মত, একটি অন্তরঙ্গ রসিকসমাজ বা রসচর্চ্চার Inner Circle গড়িয়া তুলিল—তাহার পর হইতে সাধারণের সঙ্গে চিত্তব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, ফলে বাঙ্গালীর সর্ব্বরসক্ষুধার তৃপ্তি-মার্গ হইল রঙ্গমঞ্চের নাটকাভিনয়; গিরিশঘোষ ও ডি, এল, রায় প্রমুখ কবিই হইলেন তাহাদের রসস্রষ্টা। এও ছিল ভালো; রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ভিন্ন সমাজে নিজ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া বাংলাসাহিত্যের aristocracy অক্ষুণ্ণ করিবার উপায় করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ Nobel prize পাওয়ার পর হইতে সাহিত্যের এই হীনযানী সম্প্রদায় বড় গোল বাধাইল, রবীন্দ্রনাথের মহাকবিত্ব একটা sentimentএর বস্তু হইয়া দাঁড়াইল, তাহা না বুঝিবার ভান না করিলে fashionable হওয়া যায় না। এই অবুঝ-ভক্তির প্রবল প্রবাহে কোনও রসবোধের বালাই আর রহিল না - মুড়ী ও মিছরী এক দরে বিকাইতে লাগিল—যাহা বুঝিনা তাহাই যখন উৎকৃষ্ট তখন যাহা উৎকৃষ্ট তাহাও বুঝিবার প্রয়োজন আর রহিল না। এমনি করিয়া জেলে-পাড়া ও বামুনপাড়া amalgamate হইয়া গেল। কবিতা বুঝিবার অধিকার সকলেরই আছে। ভালো লাগা না লাগার কোনও শাস্ত্র নাই— যাহা কস্মিনকালে বুঝি নাই এবং ভালো লাগে নাই তাহাও যখন উৎকৃষ্ট তখন ভালোমন্দ যাহা কিছুকে একটি উদার মনোভাবের দ্বারা বরণ করিয়া আত্ম-রুচির জয়ঘোষণায়, এবং রসবোধের ক্ষেত্রে সর্ব্বাশ্রয়ী 'ভূমা'র প্রতিষ্ঠায় আর কোনও বাধা রহিল না। এই গড্ডালিকা-বৃত্তির চরম পরিণাম অতি-আধুনিক সাহিত্য-সমাজে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন "মাল্লাদের জাত—কে দেয় কার—হাত"! এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের

ব্যক্তিগত প্রভাব গৌণ ও মুখ্যভাবে কাজ করিয়াছে ও করিতেছে। এ বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে তাহারাই সাহিত্যের 'অধিকারী' যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান রুচি ও রসবোধ এ সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; তাহারাই সাহিত্যস্রষ্টা যাহারা বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীয়ানকে অস্বীকার করিয়া আধুনিক যুরোপের হট্টগোলের চীৎকারটাকেই গ্রামোফোন যন্ত্রের মত বিকৃত করিয়া পথেঘাটে সাহিত্যিক পণ্যশালার বিজ্ঞাপনবৃদ্ধি করিতেছে। পত্রিকা-সম্পাদক ও পুস্তকবিক্রেতা ইহাদেরই পৃষ্ঠপোষক, না হইলে ব্যবসায় চলে না। এহেন সমাজে সরস্বতীর আসন কোথায়? যাঁহারা সারস্বত আদর্শের সাধনা করেন তাঁহারাই জাতিচ্যুত। আপনি লিখিয়াছেন মল্লবীর ও Cinema অভিনেত্রীরও সম্মান আছে, কবির নাই—ইহাই ত স্বাভাবিক! কবিকে চায় কে? কবিতায় যদি মল্লক্রীড়া ও Cinema অভিনেত্রীর হাবভাবপটুতা থাকে (হাবভাবপটুতাও নয়—বীভৎস নগ্নতা) তবে তাহাই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অভিজাত শ্রেণীর মাসিক পত্রগুলিতে দেখিতে পাই—এক রবীন্দ্রনাথের ছাড়া আর কাহারও কবিতা কখনও কোনও ক্রমে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাইতে পারে না; এবং ফোটো-সম্বলিত পরিচয় দাবী করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে চিত্রকর হওয়া চাই—তা যেমন চিত্রকরই হউন। কবিতার প্রতি এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার জন্যই কবিতানির্ব্বাচনেও কোনও ধর্ম্মভয় থাকে না। এ অবস্থায় আপনারা মনের দুঃখে যে প্রতীকারপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কাঁদিতে গিয়াও না হাসিয়া পারিতেছি না।

আমার মনে হয়, আজিকার দিনে যে সম্মান কবির পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে সে সম্মান দিতে পারে এমন লোকও নাই। আজিকার দিনে জনপ্রিয়তার কোন মূল্য নাই এই জন্য যে, এখন কবির প্রশংসাও মতবাদমূলক; কাব্যরসবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে Culture ধ্বংস পাইয়াছে। কোন কবিকে সম্মান করিব কেন? -না তিনি অভিনব নীতি বা মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন, তিনি সুন্দরকে অপমান করিয়াছেন;—অর্থাৎ যাহারা কোন কালে রসের ধার ধারিত না, এবং আজ কাল শিক্ষিতের নামে যাহাদের সংখ্যাধিক্য অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সেই বেরসিকতা ও রুচিহীনতার প্রশ্রয় যে দেয় সেই-ই কবি-সম্মানের অধিকারী। ইহাদের নিকট সম্মানলাভের লোভ দমন করাই সকল সুকবির আত্ম-সম্মানরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কাব্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহাতে আমাদের মত অ-কবির অসম্মানই গৌরবকর। বাংলাভাষার যে দুর্গতি দেশশুদ্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রাচীন ও নবীন যে ভাবে সমর্থন করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, সম্মান ত' দূরের কথা দাঁড়াইবার স্থানটুকুও আর রহিবে না। কবিতার এই গণিকাবৃত্তির যুগে যাহারা সাহিত্যের পণ্যশালার দালাল অথবা খরিদদার তাহাদের নিকট যদি সম্মানের আশা করিতে হয় এবং তাহা না পাইলে যদি দুঃখ হয় তাহা হইলে আপন কাব্যলক্ষ্মীর প্রতিই শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পায়। এ দুর্দ্দিনে কবির একমাত্র সান্ত্বনা নিজের একক নিঃসঙ্গ বাণীপূজার আত্মতৃপ্তি। আর একটা সান্ত্বনা এই বিশ্বাসে যে—যদি রসসৃষ্টি করিয়া থাকি অর্থাৎ যদি কাব্যের সত্যসাধনা করিয়া থাকি তবে যে অদৃশ্য রসসঞ্চারপথ গোপনে প্রাণ হইতে প্রাণে আনন্দ-সংবেদনার অবরাহিকারূপে বিরাজ করিতেছে, সেই পথে কত অপরিচিতের সঙ্গে মন-জানাজানি হইবেই, রসসৃষ্টির দ্বারা সেই আত্মীয়তা বা আত্ম-সম্প্রসারণ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

আপনাদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যদি কবিকে সম্মান দেওয়াই হয়, তবে তাহাতে আমার আস্থা নাই; কারণ এরূপ আত্মীয়-সমাজ, কবির প্রাপ্য যে সম্মান তাহা দান করিতে সমর্থ নয়। এ যেন "দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।" ইহার ভিতরে যেন একটা দৈন্য-বোধ উঁকি দিতেছে। আমার ঘরে আমার বন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা করিব—এ সম্বর্দ্ধনার যাহা কিছু মূল্য তাহা ঐ ব্যক্তিগত স্নেহ ও শ্রদ্ধা। যে সম্মান বাহিরের সমাজে কবির প্রাপ্য তাহার সম্বন্ধে অবিচার হইয়াছে বলিয়া আমাদের, অর্থাৎ কবির চিরভক্ত আত্মীয় কয়েকজনের নূতন করিয়া এই শ্রদ্ধা জাহির করার কোনও আবশ্যকতা আছে? আমরা কাহাদের প্রতিনিধি? নিশ্চয়ই নিজেদেরই!

তবে তাহাতে কবির সম্মান বৃদ্ধি পাইল কোথায়? বরং এই যে বাহিরের বিরুদ্ধেই যেন ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়া আমরা আমাদের শ্রদ্ধার দ্বারা একটা প্রতিবাদ-ভঙ্গি করিতেছি ইহাতে আমাদের বার্গবাসনার অভিমানই কি ফুটিয়া উঠে না? আমাদের যে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কাহারো মতামতের অপেক্ষা রাখি না, যে শ্রদ্ধার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাহিরের কেহ সংশয় প্রকাশ করাও আবশ্যক বিবেচনা করে না, তাহাকেই একটু ঘটা করিয়া বিজ্ঞাপন করিলে কবির অনাদায় সম্মানের কোন ক্ষতিপূরণ হইবে? আমার মনে হয় ইহাতে একটা কাঙালপনার ভাব ধরা পড়ে। তাই আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের সার্থকতায় আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু যদি বাহিরের দিকে না চাহিয়া কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ জনের আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটি একত্র-উৎসবের আনন্দ-উপভোগ করাই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনারা আমার সম্মান করিয়াছেন। কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্য আমার সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষকালের সহিত একটি সুখমধুর স্মৃতি-জড়িত হইয়া আছে। কতদিন হইয়া গেল তবু মনে হয় সেদিন—যতীন্দ্রমোহন তাঁহার তৎকালীন কলিকাতাস্থ গৃহে একটি অতিশয় ভাবপ্রবণ কবিতামুগ্ধ বালকের সাক্ষাৎ প্রায়ই পাইতেন, এবং সস্নেহে তাহার সেই কাব্যানুরাগকে লালন করিতেন। তখন আমি কবিযশঃপ্রার্থী ছিলাম না, কবিহৃদয়সন্ধানী ছিলাম। যতীন্দ্রমোহন সেকালের সেই পরিচয়হীন অর্ব্বাচীন বালককে এক মুহূর্ত্তে সমধর্ম্ম ও সমপ্রাণের অধিকারগৌরব দিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার ছন্দমাধুর্য্য ও লিপিকুশলতা আমাকে অপার বিস্ময়ে অভিভূত করিত—কি যে আনন্দ পাইতাম, আজ এই পরিণত বয়সের অভিশাপে তাহার কণামাত্রও ফিরিয়া পাই না। একটি অতি কোমল ও গভীর অনুভূতি, একটি সহজ ও সরল ভাবজীবনের রোমান্স, বাস্তবের খররৌদ্রদীপ্তির অবকাশে ছায়া-নিকুঞ্জের পত্রমর্ম্মর অথবা স্তব্ধ জোৎস্নারাত্রে স্রোতস্বিনীর কল-বাণার মত একটা অনতিপ্রকট উগ্রতাহীন যে তরুণ গভীর বেদনা তাঁহার কবিতার মধ্যে অনুভব করিতাম—সেই বাণার একটি পেলব ভঙ্গী ভাষায় ও সুরে আজও তাঁর কবিতায় বিদ্যমান। শ্রাবণ সংখ্যার 'উপাসনা'য় তাঁহার কবিতাটি এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই সুর ও তাহার ভাষা যতীন্দ্রমোহনের স্বকীয়। খাঁটি বাংলা লিরিকের একটি বিশিষ্ট রূপ এই সকল যতীন্দ্রমোহনী কবিতায় বাঙ্গালীর রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে (তাঁহার স্বকীয় কবিতাগুলিতে) প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটি অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর মধুর সম্পর্কের দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেখানে কোনও জোরজবরদস্তি নাই, কল্পনার দুরূহ প্রয়াস বা ভাবনার ধনুর্ভঙ্গ পণ নাই—আছে আলো-ছায়ার সহজ মাধুরী, সমবেদনার শরৎ-প্রসন্নতা। কিন্তু সবচেয়ে গৌরবজনক তাঁহার ভাষার শুচিতা। এইখানেই তাঁহার রবীন্দ্র শিষ্যত্বের সার্থকতা। রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন অগ্রগণ্য। বঙ্গভারতীর—সকল ভারতীরই—সেবকের পক্ষে ভাষাসম্বন্ধে যে দিব্য রুচি ও সহজাত নিষ্ঠার প্রয়োজন—যে গুণের অভাব ও সদ্ভাব সাহিত্যিক প্রতিভা-নির্ণয়ে সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ, যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্যসাধনায় সেই লক্ষণ চিরদিন বিদ্যমান; এই instinct তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই, মূলে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট তিনি কখনও হন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটা সর্ব্বত্র স্মরণযোগ্য। তাঁহার কাব্যে এই ভাষাই স্পন্দিত হইয়াছে, অতি সরল স্বাভাবিক সুখদুঃখ সৌন্দর্য্যসংবেদনায়, ভাব ভাষার idiomকেই আশ্রয় করিয়া বড় সুন্দর ভঙ্গি ধরিয়াছে। আমার মনে হয়, যতীন্দ্রমোহনের কবিশক্তির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট lyricগুলিতে একটি অতি simple emotionকে একটা বিশেষ ক্ষণ বা মুহূর্ত্তের তীব্রতায় উদ্ভাসিত করিতে পারেন—lyric অনুভূতিকে একটা dramatic situation এ মণ্ডিত করিয়া তাহাকে আরও real ও concrete করিয়া তোলেন। উদাহরণ স্বরূপ 'অন্ধবধূ'র উল্লেখ করা যাইতে পারে; এবারকার 'উপাসনা'র কবিতাটিও ওই ধরণের। কিন্তু তাঁহার অনেক কবিতার যে একটি মধুর করুণ লিরিক আকুতি

আছে—তার সরলতার মধ্যেই একটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য আছে—তাহাই বোধ হয় আমার সেকালের সেই unsophisticated প্রাণকে এমন করিয়া মুগ্ধ করিত। "বাতাবী কুঞ্জে সন্ধ্যার পর পুষ্পপরাগ-চোর। কলঙ্কী মন! চেয়ে দেখ আজ সঙ্গী মিলেছে তোর"—এর মোহ আজও ঘুচে নাই।

যতীন্দ্রমোহন একান্তভাবে বাঙালীর প্রাণ ও বাংলা ভাষার পূজারী। তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালীর গ্রাম-গৃহ-অঙ্গন শরৎ জ্যোৎস্নাগোধূলিতে স্নেহ-প্রেম-মমতার অমুখর গীতি-গুঞ্জনে ভরিয়া উঠে। আজিকার দিনে এ কবিকে চায় কে? এ যুগে বাঙ্গালী হওয়ার মত অপরাধ আর আছে কি? তাই যতীন্দ্রমোহনের মত কবি অপাংক্তেয়; তাঁর ভাষা বাংলা বলিয়াই তাহা অশ্রদ্ধেয়। আজ এই যুগ-সন্ধির মন্বন্তরে কিছু বলিয়া ফল নাই। কবিকে চিরন্তনী বঙ্গমাতার চরণে সমর্পণ করিয়া আপনারা তৃপ্তি লাভ করুন। ইতি আপনাদের

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

মাথরুন— ২৯-৮-৩১

কল্যাণবরেষু,

ভাই, শরীর ভাল নাই, তবু যতীন দাদাকে তোমরা অভিনন্দন দিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

আমি যখন সবে কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তখনি যতীন দাদার কবিযশ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার কবিতা আমরা আগ্রহের সহিত আবৃত্তি করিতাম। আজ আমি দূরে তবু এই দূর হইতেই তাঁহাকে আমার প্রণাম ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কবি যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্দ্ধনা সভায় না যাইতে পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে যতীন্দ্রমোহনের বাঁশী বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন সত্যেন্দ্রনাথের কলকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত, করুণানিধানের কোমল গীতের সঙ্গে তাহা যে ঐক্যতান সৃজন করিয়াছিল, আজও তাহা কানে বাজিয়া আছে। কবির লেখনীর যে মাধুর্য্য সে কমনীয়তা আজও ক্ষুণ্ন হয় নাই। বাঙ্গালা পাঠককে তিনি যে আনন্দ দান করিয়াছেন তার জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন করিতেছি

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বন্ধু-বরণ

কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বন্ধুবরেষু—

সেদিন তোমার বরণ-সভায় ছিলাম বসে চুপ ক'রে,
সভায় আমার মুখ ফোটে না—কাজেই থাকি একঘ'রে!
কথার মালা গাঁথ্‌লে কত দামী-কথার মালাকর,
তেমন মালা থাক্‌লে তোমায় পরিয়ে দিতাম কবিবর!

পোড়ো-জমির ঘেসো-ফুলে ছিটে-বেড়ার ঘর সাজাই,
ভাঁটুই ফুলে কেমন ক'রে তোমায় কবি-বর সাজাই?
সবাই যখন বল্‌লে তোমায়—কবি, গুণী, অতুল্য!
কোন্ অতীতের স্বপ্নে হ'ল চিত্ত আমার প্রফুল্ল!

আজও যখন প্রাণ-শিশু মোর চাঁদের চুমোয় চোখ মেলে,
সেই পুরাতন সখীর চুলে ফুলের বাতাস দোল খেলে,
ছাতের ভাঙা টবের চারায় একটা-ত্থটো জুঁই ফোটে,—
আমার স্মৃতি-'গ্রামোফোনে' তখন সে কি সুর ওঠে!

সেই সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে. সেই দোতালায় একটি ঘর,
একদিকে তার একটি বাগান—ভুলব কি আর সেই আসর?
দখিন-মুখো জানলা ঘেঁসে খাটো খোটো খাট পাতা,
হাতে তোমার থাকৃত ছোট সেই কবিতার হালখাতা!

সত্যেন. চারু. ধীরেন, মোহিত, করুণা আর মণিলাল,
সবাই গিয়ে ললিত-কলার আলাপ নিয়ে কাটান কাল।
আমার বয়স উনিশ কি বিশ—তোমার বেশী বছর কয়,
নয়ন ছিল চাঁদ্নি মাখা, হৃদয় ছিল কাব্যময়।

ফুল-শয্যার নতুন বধূ ঘরে আমার পথ চেয়ে—
তখন আমি তোমার সাথে বেহুঁস্ যেন মদ খেয়ে!
নিশুত নিশীথ! কণ্ঠে তোমার কাব্যমধুর বিনোদ বীণ,
গহীন রাতে নিদ্রাবিহীন চিত্তে আমার জ্ঞান

কবি রবির কিরণ-লোকে প্রজাপতি ছিলাম ঠিক.—
তোমরা ছিলে কেউবা মধুপ. কেউবা চকোর, কেউবা পিক
চন্দ্রালোকের তন্দ্রা ছেঁকে, মলয় হাওয়ার ছন্দতে
ধরতে কি সুর, ভরতে জীবন পারিজাতের গন্ধতে!

আজও দেখি আসর জুড়ে' অনেক কবি, সাহিত্যিক;
মস্ত কথায় ত্রস্ত হয়ে হারিয়ে ফেলি দিগ্বিদিক!
কিন্তু কোথায় কুঞ্জ তেমন—কাব্য-অলির গুঞ্জরণ,
আলা-ভোলা প্রেম-আলাপে জেগেই স্বপন-সঞ্চরণ?

শুনচ সখা? সেই আমাদের ঘর-পালানো দিনগুলি
ফুটলে গোলাপ আজও আসে—যেন শীতের বুলবুলি!
দূর-অতীতের নিদ্রা ভাঙায় বর্ত্তমানের সূর্য্যালোক,
সখা তোমার প'ড়ে শোনায় যৌবনেরি মঞ্জুশ্লোক।

বন্ধু, তোমার জয়-গীতালি স্মরণ-সিন্ধু-পার থেকে
ডালিমফুলি আমোদ এনে মরমে মোর দেয় এঁকে।
সবাই বলে—'জয় কবিবর!' আমি বলি—'বন্ধু, জয়
মনের কথা—নিন্দা এ নয়, সত্য কবে মন্দ হয়?

দুপুর বেলায় মেঠো-বাঁশী জাগায় যখন কল্পনা,
পুকুর-ঘাটে কালো জলের কলধ্বনির আল্পনা,
মৌমাছিদের সঙ্গে কে ঐ খুঁজচে ফোটা কুমুদ-ফুল?
পল্লী-দুলাল কোন্ কবি সে? বন্ধু আমার—নেইকো ভুল!

তোমার শ্যামল কাব্যলোকে কেয়া-কাঁদির দেয়ালায়
ভিজে-রোদের কাঁচা সোণা ঝরে চাঁপার পেয়ালায়
অন্ধ বধূ ঝল্‌কে চলে,—চল্‌কে ওঠে মোর আঁখি,
কবির পরে নয়তো তখন, বন্ধু পরেই চোখ রাখি।

কর্ত্তাভজা বাংলা দেশে নেই তো কবির পুরস্কার,
যাঁরা তোমায় মান দিয়েচেন তাঁদের করি নমস্কার।
কাঁটার কুড়ে কবির কুটির, কাঁটালিয়া তার জীবন—
পরিয়ে জলের তিলক তাঁকে কাব্য পড়ে এই ভুবন।

সাম্‌নে আরো এগিয়ে এস, হে পুরাতন বন্ধু মোর!
তোমার বিজয়-'জয়জয়ন্তী'র তান শুনে মোর মন বিভোর!
গুণীর সভায় পেলে অনেক কথার মাণিক আর চুনি,
আমি দিলাম সুখের অশ্রু—গরিব আমি, নই গুণী।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

দ্র ১৩৩৮ সাল লন পরা
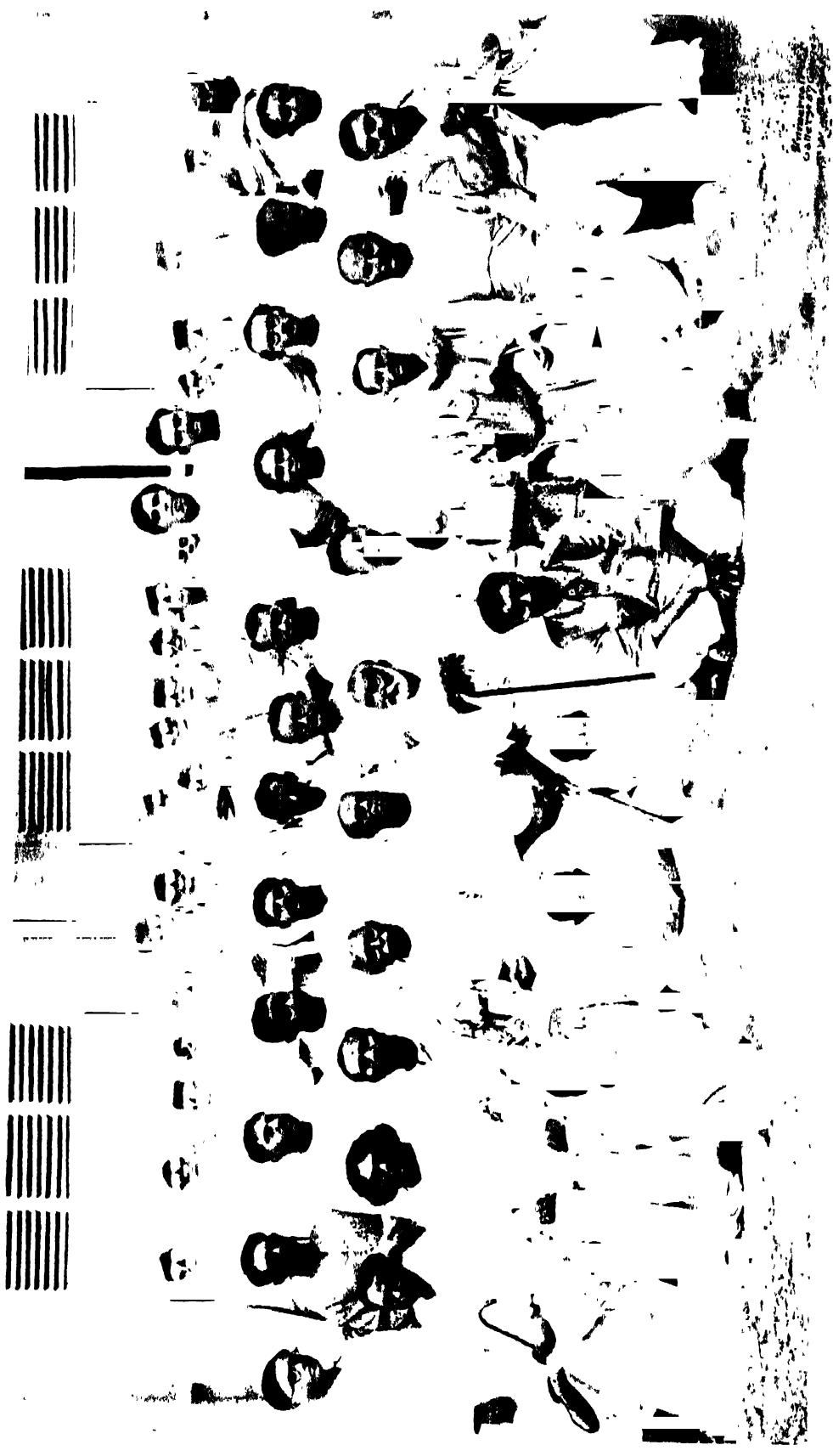
রায় অঘোরনাথ অধিকারী বাহাদুর যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সভায় তাহার প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—আমরা সানন্দে তাহার সরস বাক্যাবলী নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি।—

আশীর্ব্বাদ

সভাপতি মহাশয় কবিবরকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিতেছেন কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদ করিবার পূর্ব্বে কবিবরের সাহিত্যিক বন্ধুগণ তাঁহার প্রতি এত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন যে আমার আশীর্ব্বাদের কোনই প্রয়োজন দেখি না। শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন তাঁহার দুইটী পুত্র, দুইটী কন্যা, একটী ভাগিনেয় পুত্র ও আমাকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়াছেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই যে শ্রীমান কেন এতগুলি আত্মীয় স্বজন লইয়া সভায় যাইতেছেন। তিনি বোধ হয় পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে এই সভায় তাঁহার উপর যে পরিমাণ প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে তাহা তিনি একা বহন করিতে পারিবেন না। এই জন্যই বোধ করি, তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সভায় এই ভালোবাসার ভাব এত বেশী দেখিতেছি যে তাহা বহন করিতে আমাদিগকেও অশ্রুসিক্ত হইতে হইতেছে। তবে শেষে লৌকিকতা হিসাবে কেবল শ্রীমান যতীন্দ্রকে নয়, রস-চক্রের সমস্ত গুণী ও রসিকজনকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

শ্রীমান কালিদাস রসচক্রের বিবরণপ্রদানকালে কবি ও কাব্যে অনাদরের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সোজাকথায় তাঁহার বক্তব্য এই ছিল যে বাজারে গল্প ও উপন্যাস যে পরিমাণ বিক্রয় হয়, কবিতা ও কাব্যের সেরূপ আদর নাই; কথাও ঠিক। এই কথার উত্তরে আমি বলি মাছ তরকারীর মত, কবিতাও কাব্য হাট বাজারের জিনিষ নয়। ইহা হীরা-মুক্তার মত বন্ধ রাখিতে হয়, খুলিয়া রাখা চলে না। জহুরী ও ক্রেতাও ইহার কম। কাজেই যাহাদের অল্প পুঁজি ও তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া যাইতে হইবে, তাঁহারা খোলা জিনিষের মধ্যে যাহা যাহা আবশ্যক মনে করেন তাহাই লইয়া চলিয়া যান, ঢাকা জিনিষের বড় একটা খোঁজ লন্ না। আর খোঁজ লইবার মত পুঁজিই বা কয় জনের আছে, দরকারই বা কি? তাই বাজারে খোলা জিনিষের আদর বেশী। আবার যিনি যতদূর কাঁচা ও সরস করিয়া তাহা দেখাইতে পারেন, সাধারণের নিকট তাঁর জিনিষের আকর্ষণও তত বাড়ে। যে গল্পের নায়ক নায়িকা যত উলঙ্গ, সে গল্পের পাঠক তত বেশী। কবির কারবার জানার মধ্যে অজানাকে লইয়া, গল্প-লেখকের কারবার জানাকেই আরও বেশী করিয়া জানান—তা তাহাকে উলঙ্গ করিলে যদি লোকে খুসি হয়, তবে তাহাও স্বীকার। কবির অজানা অজানাই রহিয়া যায়—অজানাকে জানিতে হইলে, অচেনাকে চিনিতে হইলে, অসীমকে বুঝিতে হইলে যে পরিমাণ মানসিক শক্তির আবশ্যক তাহা আমাদিগের কয়জনের আছে?

"মনের বনে ফোটে যে সব ফুল
মনের মেঘে ওঠে যে সব তারা,
মনের দেশে বয় যে মলয় হাওয়া
মনের গাঙে ছোটে যে সব ধারা,
এমন ভাগ্য ধরায় আছে কাহার
দেখতে পায় যে অলেখা সেই ছবি"?

ঠিক কথা—এমন ভাগ্য যখন আমাদের নাই যে তোমাদের সেই অলেখা ছবি দেখি, তখন তোমাদেরও ভাগ্যে নাই যে আমাদিগের পয়সা তোমরা পাও। আমরা সকলে বনের ফুলই ভাল করিয়া চিনি না, মনের ফুল ত বহু দূরের কথা।

সেক্সপীয়রকে লোকে মাত্র সে দিন চিনিয়াছে—তাহাও ভাল করিয়া নয়। জার্ম্মানীর জারভাইনাস একটু চিনাইয়া দিয়াছেন। মাইকেল অর্থাভাবে হাঁসপাতালে মারা গেলেন এখন তাঁহার পুস্তকের কত রকমারী এডিসন হইতেছে। কবিবন্ধুগণকে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে ভাত কাপড় পাইবে না, তবে মরিয়া গেলে আমরা তোমাদের দানসাগর শ্রাদ্ধ করিব, ইহাই কবির

ভাগা—সকল দেশেই। তবে কবির কাব্য স্থায়ী পদার্থ। সাধারণ গল্প উপন্যাস সাময়িক নেশা চরিতার্থ করিয়াই বোধ করি শেষ হইয়া যায়। পয়সার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে লোকে ভাগ্যবান বলিয়া থাকেন, সেও বোধ হয়, নোবেল সাহেবের একটা খেয়ালের জন্য। তাহা না হইলে তাঁহার কাব্যের অবস্থাও হয়ত, এমন চলতি হইত না। কারণ আপনাদিগের অজানা অপেক্ষা তাঁহার অজানা যে সহস্র-গুণে আরও বেশী অজানা।

এখন আর একটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের পরেই যে শ্রীমান যতীন্দ্রের আসন তাহা হয়ত অনেকের মত। কিন্তু তাই বলিয়া এখনকার আরো কয়েকজন কবিকে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। তাঁহারাও যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন। যতীন্দ্রের মত বয়সে তাঁহারাও যতীন্দ্রের মত কবি বা তাঁহা অপেক্ষাও যে বড় হইবেন না—ইহাই বা আমরা মনে করিব কেন? তবে আজ আপনারা যতীনকে খুব বড় করিয়া দেখাইবার জন্যই অন্য সকলকে ছোট করিতেছেন, ইহা আজিকার উৎসবের পক্ষে যেমন সঙ্গত, তেমনি শোভন।

আপনারা আমাকে এই রসচক্রের রস আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনা-দিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী

যতীন্‌দা

ভাই বলি লোক-মাঝে করি অহঙ্কার
কবি-ভাই বলি' কাব্যে গরব আমার
সদানন্দ, সুরসিক, ভাষা-জননার
অন্ধ গেহে আনিয়াছ কোটি দীপালির

ভাস্বর জ্যোতির শিখা; মূর্ত্তি সারল্যের
দুদিনের নহ ভাই, বন্ধু,আবাল্যের;
কত দীর্ঘ দিন আর কত দীর্ঘ রাত
জীবনের সহি' বহু ঘাত-প্রতিঘাত
যাপিয়াছি দুইজনে সুখ দুঃখে নানা
বৌদির, তমালের—শুধু আছে জানা।

বলিতেছে জনে জনে 'যতীন বাগচির
সম্বর্দ্ধনে হও নাই কেন বা হাজির?
কহিয়াছি প্রত্যুত্তরে, 'প্রেমশ্রদ্ধা দিয়া
প্রাণে তাঁর সিংহাসন রেখেছি রচিয়া।'

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

যতীন্দ্রমোহনের বৈশিষ্ট্য

হঠাৎ সেদিন শরতের এক প্রভাতে যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন-সভায় যোগ দিবার জন্য 'রসচক্র' হইতে ডাক আসিল। ডাক পাইয়াই আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। এই-ই ত চাই। সুযোগ্য কবিকে তাঁর জীবদ্দশাতেই অভিনন্দনের অগুরু চন্দনে বরণ করাই ত দরকার। কবি গোবিন্দদাসের মত 'মৃতের চিতায় মঠ তুলিবার' দুঃখ যেন আমাদের আর না করিতে হয়। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, হেম, নবীনের প্রতিভার প্রশংসা করিতে গিয়া আজ ভক্তি ও ভাষায় আমরা কুলাইয়া উঠিতে পারি না, কিন্তু তাঁদের বাঁচিয়া থাকা কালে দেশের তরফ হইতে কখনো কোন অভিনন্দন তাঁহারা পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। আজ দেশের লোক প্রকৃতই গুণের আদর করিতে শিখিয়াছে; সে যুগের সে-জড়তা ও নিদ্রা হইতে আজ তাঁদের জাগরণ আসিয়াছে, আমার আনন্দের কারণ ইহাই।

কাল শরৎ-সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে, রবীন্দ্র জয়ন্তী আসন্ন, সেদিন কাজী নজরুলকে প্রীতির নজর দেওয়া হইল, আজ যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন-দিন। বাকী ক্ষমতাশালী কবি ও সাহিত্যিক যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতিভাও অভিনন্দনের দাবী লইয়া আজ আমাদের সামনে বড় হইয়া জড়ো হইয়াছে। একে একে তাঁহাদেরও অভিনন্দন হওয়া উচিত। আশা করি সত্বরই তাহা হইবে।

যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন আরো কিছু আগে হইলে ভাল হইত। রবীন্দ্রনাথের দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ধনীর সন্তান ও যথোপযুক্ত বিত্তের অধিকারী হইয়াও অনাড়ম্বর ও একান্ত জীবন যাপন করিয়া কবি তাঁহার নির্জ্জন কাব্যকুঞ্জ হইতে যে সমস্ত অমূল্য কুসুম চয়ন করিয়া একনিষ্ঠ মালাকরের মত মালা রচনা করিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরকে আনন্দের পর আনন্দ দিয়া এ যাবৎ ভরাইয়া আসিয়াছে। সত্যই সে সকলের তুলনা হয় না। যতীন্দ্রনাথের অক্লান্ত কবিত্বশক্তি, তাঁহার নিপুণ ছন্দের সাবলীল নৃত্যভঙ্গীর সহিত মিশিয়া তাঁহার আজীবনের সাধনাকে সাফল্য-শ্রী মণ্ডিত করিয়াছে, তাঁহার ছন্দের এই অনায়াস নৃত্যলীলার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে, বোধ হয় এককালে ইন্দ্রসভার রঙ্গভূমিতে তাহার স্থান ছিল, কোন একটা পদস্খলনের অভিশাপে মর্ত্ত্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নন্দনের লীলা ভোলে নাই এবং অমরাবতীর উপর এখনো তার দাবী আছে।

আমি কবির সকল কবিতা পড়িবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু যাহা পড়িয়াছি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছি, বারবারই তাহা পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার 'অন্ধবধূ', 'অশোক', 'নীহারিকা', 'কেয়াফুল', 'কৃত্তিবাস প্রশস্তি', 'রথযাত্রা', 'সাধনা', 'কাজলা দিদি' প্রভৃতি পড়িলে মুগ্ধ হইতেই হয় —তাহা সত্যই অনবদ্য।

যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নিকটতম শিষ্য। এই হিসাবে তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের তুলনায় তাঁহার স্থান ঠিক কোথায়, তাহা নিরূপণ করা অন্যের পক্ষে হয় ত সহজসাধ্য হইতে পারে, আমার পক্ষে নয়। আমি মনে করি, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে অনেকে যে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য হইয়া রবির প্রভাবে যতীন্দ্রমোহন আপন কাব্যে কোন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, গুরুর চিহ্নিত পথেই চক্ষু বুজিয়া তিনি চলিয়াছেন, তাহা ভুল। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু কিছু দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

১। বাংলাদেশের পল্লীসংসারের একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে—এই মাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই মাধুর্য্যকে তাঁহার কাব্যে প্রধান উপজীব্য করিয়া তোলেন নাই—এই অপূর্ব্ব কাব্যোপকরণটিকে কবিগুরু তাঁহার শিষ্যের জন্য রাখিয়াছেন। পল্লীপ্রকৃতির মাধুর্য্যও যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে যথেষ্ট আছে, কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত নিদর্শন দিয়া গিয়াছেন।

২। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন মধুর রসের খনি। ইহা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কবিগুরু এই গার্হস্থ্য জীবনের কোন কোন দিক তাঁহার শিষ্যের লেখনীর উপ-

জীব্যস্বরূপ সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দাম্পত্য জীবনের কথা। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে এই দাম্পত্য জীবনের অপূর্ব্ব রস-বৈচিত্র্য দেখিতে পাই।

৩। বাঙ্গালীর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মজীবনটির অনেক কথাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রসসৃষ্টির উপকরণস্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন উহাকে তাঁহার অনেক রচনার উপজীব্য করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু পাঠকের পক্ষে তাহা পরম হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ যতীন্দ্রমোহনের আগমনী বিজয়ার কবিতাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৪। রবীন্দ্রনাথ প্রথম এদেশে গাথা রচনা প্রবর্ত্তন করেন। যতীন্দ্রমোহনের গাথারচনার দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের গাথাগুলি কথা ও কাহিনী বা পশ্চাত্যের গাথাকবিতাগুলির অবিকল অনুকরণে রচিত নহে। যতীন্দ্রমোহনের গাথার ছাঁদ, ভঙ্গি, ঢং একটু নূতন ধরণের। এই গাথাগুলি পড়িলে মনে হয়, যতীন্দ্রমোহনের হয় তো ছোটগল্প রচনা চমৎকার উৎরাইয়া যাইতে পারে। শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের অনেক গুণই যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে বর্ত্তমান।

৫। লিরিক কাব্যে নাটকীয় ভাবের প্রবর্ত্তন যতীন্দ্রমোহনের একটি কবি-কীর্ত্তি। আজ কবি কিরণধন বা অপরাজিতা দেবী যে নাটকীয় ভাবের জন্য প্রশংসা পাইতেছেন, যতীন্দ্রমোহনেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতায় এই নাটকীয় ভঙ্গী ছিল, কিন্তু তাহা অন্য শ্রেণীর সামগ্রী। যতীন্দ্রমোহনের বহু কবিতাই এই নাটকীয় ভঙ্গিতে লিখিত হওয়ায় অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ অন্ধ বধূ, একা, গঙ্গাস্নান, আগমনী বিদায়, ডাক ইত্যাদি কবিতা ও সেদিনকার জলযাত্রা কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে।

৬। যতীন্দ্রমোহনের অনুবাদ কবিতাগুলির মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। অনূদিত কবিতাগুলিকে মৌলিক কবিতা বলিয়াই মনে হয়।

৭। যতীন্দ্রমোহনের দেশাত্মবোধসূচক কবিতাগুলির মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। একটু মনোযোগ সহকারে পড়িলে এই বৈশিষ্ট্য ধরা যাইবে।

৮। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় Intellectual Sentiment এর সঙ্গে Aesthetic Sentiment এর মিশ্রণ নাই। কেবলমাত্র Aesthetic Sentiment এর অবিমিশ্র অভিব্যক্তি একটা উপভোগ করার সামগ্রী।

৯। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় আলঙ্কারিক জটিলতা নাই—সেজন্য তাঁহার রচনা হয় প্রসাদগুণে স্বচ্ছ—নয় ওজোগুণে উজ্জ্বল।

১০। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যের ভাষা খাঁটি বাংলা ভাষা। যাঁহারা ইংরাজী পড়েন নাই তাঁহারা অতি সহজে এ ভাষা বুঝিবেন। মনে মনে ইংরাজীতে ভাবিয়া কখনও তিনি তাহা বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া কবিতা লেখেন নাই। বিদেশী ধরণের আলঙ্কারিকতা বা পদবিন্যাস তাঁহার রচনায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

১১। কোন একটি মতবাদ, তত্ত্ব, জীবনতথ্য বা চিন্তাসূত্রকে মেরুদণ্ডস্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিতাগুলি রচিত নয় বলিয়া কোথাও চিন্তার ধারাবাহিকতা রসের ধারাবাহিকতাকে অতিক্রম করিয়া উঠে নাই। যখন যে ভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছে—যখন যেরূপ বৈচিত্র্য তাঁহার নয়ন মন ভুলাইয়াছে তখনই তিনি তাহাকে ছন্দে রূপ দান করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন একসূত্রে কখনও ফুলের মালা গাঁথেন নাই—চারিদিকে ফুল ছড়াইয়া—ফুলের বনে বসিয়া বাঁশী বাজাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিলাম, এক নাটকীয় ভঙ্গিপ্রবর্ত্তন ছাড়া বাকী সবই রসসৃষ্টির উপকরণের বৈশিষ্ট্য। রসসৃষ্টির কোন অপূর্ব্ব ধরণের কাব্যসাহিত্যে যুগান্তরকারী নূতন ভঙ্গি তিনি কিছু দেন নাই—কয়জনই বা তাহা দিতে পারে? সকল শতাব্দীতে কোন দেশেই তত বড় কবি জন্মে না। রবীন্দ্রনাথের যুগে—রবীন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যতীন্দ্রমোহন যে রসসৃষ্টির উপকরণেও স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রাখিতে পারিয়াছেন, একটি নূতন ভঙ্গির প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন—কেবল সেইজন্যই তিনি দেশবাসীর অভিনন্দনের যোগ্য।

এইবার সর্ব্বশেষে যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত দু'একটী সদ্গুণের কথা বলিয়া আমার বলার শেষ করিব। প্রথম কথা,—গুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ভক্তি

অসীম; তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুবার বহুস্থলে আমি গুরুর প্রতি তাঁহার এই গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা পুলকের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দ্বিতীয় কথা,—তিনি অমায়িক, শিশুর ন্যায় সরল, নিরহঙ্কার, পরদুঃখকাতর এবং সর্ব্বোপরি অতিমাত্রায় বিনীত। এই সকল সদ্‌গুণের দ্বারাই তিনি তাঁহার বন্ধুগণের মনোহরণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার কালে আমার একটী বন্ধু আসিয়া আমাকে উপন্যাসের পরিবর্ত্তে প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়া বিরস কণ্ঠে জানাইলেন যে, এ দুর্ম্মতি আমার কেন, কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার মত জ্ঞান বিদ্যা এবং culture আমার আছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধুবর তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাহার এই কথায় আমি রাগ করিলাম কিনা। আমি সবিনয়ে হাসিয়া উঠিতেই তিনি কহিলেন,— "কিছুতেই আপনার রাগ হয় না জানি, এত বিনয় আর নিরভিমান আর কারও নেই।" আমি কহিলাম,— "আছে, এর চেয়েও বেশী আছে কবি যতীন্দ্রমোহনের।"

যাউক। অপ্রাসঙ্গিক কথা লইয়া ছোট প্রবন্ধকে আর বড় করিব না। আমার সর্ব্বশেষ কথা, স্বয়ং যতীন্দ্রমোহনকেই উদ্দেশ করিয়া বলিব। তিনি আমাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া অবসর লইলে চলিবে না। তাঁহার রচিত কাব্যরসামৃত পান করিয়া পিপাসা আমাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই, তাই তাঁহার মধুময়ী লেখনী হইতে আমরা আরও কাব্যরসধারা চাই। 'নীহারিকা'র 'বিদায়ে' তিনি বলিয়াছেন—

দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির 'পরে,
আসচে কানে কালো জলের ডাক,
তবু আমায় ফিরতে বলিস্ তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ।

কিন্তু আমরা কবির কথা শুনিব না, আমরা হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকিবই। তুমি—

.......................দিগ্বিজয়ী দানে,
পূর্ণ কর আকাশ পাতাল তোমার গানে গানে।
ব্যথায় ভরা বিরস দেশে
হরষ আবার উঠুক হেসে
উৎসারিত রসস্রোতের উচ্ছ্বসিত বানে।'

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর পত্র

বঙ্গ-সাহিত্যের রবীন্দ্র যুগে যে সকল নবীন কবির বাঙলায় উদয় হয়, এবং যাঁরা পাঠক সমাজে সুকবি বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী অগ্রগণ্য। আমি এঁদের রবীন্দ্র যুগের কবি বলছি এই কারণে যে, এই নবীন কবিরা একমাত্র কালের হিসেবে রবীন্দ্র নাথের পরবর্ত্তী কবি নন—লেখক হিসেবেও তাঁর অনুগামী। কি ভাষায় কি মনোভাবে হেম নবীন প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিদের কোনরূপ প্রভাব এঁদের কবিতায় লক্ষিত হয় না।

এই নবযুগের নব কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী আজও নিত্য নবীন কবিতা রচনা করে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করছেন। সুতরাং তাঁর গুণগ্রাহী লেখক ও পাঠকেরা যে মিলিত হয়ে তাঁর প্রতি নিজেদের ভক্তি ও প্রীতি জ্ঞাপন করতে উদ্যত হয়েছেন এ নিতান্ত সুখের কথা। এই উপলক্ষ্যে আমিও কবিকে আমার অর্ঘ্যদান করছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর লেখনি আরও বহুকাল ধরে— বাঙালী পাঠক সমাজকে নব নব আনন্দ দান করবে। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কাব্যে যতীন্দ্রমোহন

রবীন্দ্র যুগে যে কয়জন কবি সাহিত্যে টিঁকিবার মত কিছু দিয়াছেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁহাদের অন্যতম এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; কেহ কেহ তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। তথাপি তাঁহার কবি-দৃষ্টির সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির হুবহু মিল আছে এই রকমের একটা অভিযোগও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। এ অভিযোগ সত্য হইলে কবি হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের মৌলিকতা লইয়াই সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ অভিযোগটা সত্য কিনা তাহা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

কবির সহিত কবির দৃষ্টির তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে কবি-প্রতিভার মূল উৎসের সন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই স্বীকার করিতে হইবে রবীন্দ্র-কবিতা জ্ঞানমার্গের জিনিষ; রবীন্দ্র নাথের সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর যে কোন ভাবের কবিতার গোড়ার কথাই হইতেছে জ্ঞান—শিশু-জীবনের কবিতায় তিনি শিশু-মনের অন্তরস্থিত যে অপরূপ রহস্য-পুরের আভাস দিয়াছেন তাহা দার্শনিক চিন্তা সমুদ্ভূত; প্রেমকে তিনি যুগ যুগান্তের লোক লোকান্তরের দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—স্থূল সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া তিনি দেহাতীত চিন্তাতীত বিস্ময়স্বরূপের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন, মতবাদের দিক দিয়াও তিনি বিশ্ববাদী—মানুষকে তিনি এক অখণ্ড বিশ্ব-মানবের অংশরূপে দেখিয়াছেন; এ সমস্তই জ্ঞানমার্গের কথা—যুক্তি যেখানে শেষ হইয়া যায় সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে গিয়া এই জন্য তিনি মিষ্টিক্ হইয়া পড়িয়াছেন। উৎকর্ষাপকর্ষের কথা একেবারে না আনিয়া আমি শুধু বলিতে চাহি যতীন্দ্রমোহনের কবি-দৃষ্টি এ দৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহার শিশু-কবিতায় শিশু-সুলভ সরলতা ও স্বাভাবিকতাই দেখি, প্রেমকে তিনি প্রাণের প্রতি প্রাণের অনিবার্য্য আকর্ষণ রূপেই দেখিয়াছেন --ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য তাঁহাকেও সাড়া দিয়াছে, কিন্তু বাহিরের স্থূল সৌন্দর্য্যের অন্তর্লীন চিরন্তন কোন নিগূঢ় সত্তাকে তিনি স্বীকার করেন নাই—এই জন্য তাঁহার কবিতায় কোথাও অতীন্দ্রিয়তার ছায়া নাই—মতবাদের দিক দিয়াও বিশ্বের ভাব মোটেই তাঁহার চিন্তায় স্থান পায় নাই, মানুষ তিনি সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের অধীন নিত্যকার মানুষরূপেই দেখিয়াছেন এবং যে দৃষ্টিতে তিনি দেখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বাংলার নিজস্ব দৃষ্টি, এত খানি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া স্বীকার করি যতীন্দ্রমোহনের কবি-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি হইতে অভিন্ন? তবে রবীন্দ্রনাথের মত অন্তর্দ্রষ্টা কবি, যাঁহার চিন্তার রশ্মি জীবনের প্রত্যেকটী ছোট বড় স্তরকে উদ্ভাসিত করিয়াছে তাঁহার সহিত সুকবি মাত্রেরই কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। যতীন্দ্রকাব্যে তাই স্থানে স্থানে রবীন্দ্র-সাদৃশ্য অনুমিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কেন ইংরেজ কবিদের কাহার কাহারও সঙ্গেও যতীন্দ্রমোহনের কবি-দৃষ্টির সাদৃশ্য দেখা যায়—যেমন তাঁহার সহজ সরল অনাড়ম্বর পল্লী-কবিতাগুলি বার্নসের অনুরূপ, 'কাজলা দিদি', 'অন্ধ বধূ', সত্যদাস' প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের নিখুঁত চিত্রগুলি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের লাইনের, 'সমুদ্রের ফেনা', 'স্বপ্নের দেশে' প্রভৃতি কুহক-কল্পনার কবিতাগুলি কীট্সের ধরণের—তাই বলিয়া এগুলিকে কেহই অন্ধ অনুকরণ বলিবেন না।

যতীন্দ্রমোহনের কাব্যালোচনার প্রারম্ভে এই সকল কথার অবতারণা করিলাম এই জন্য যে তাঁহার কবিতা আমরা ভালবাসি। ভালবাসি তাহার কারণ আমাদের মনে হয় তিনি খাঁটী বাঙালী জীবনের কবি বলিয়া। বাঙালীর পূজা-পার্ব্বণ, বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আচার-অনুষ্ঠান, বাঙলার প্রকৃতি তাঁহার কাব্য-দৃষ্টিকে উদ্বোধিত করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁহার অধিকার কত তাহাও তাঁহার সহিত যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত তাঁহারা বিশেষ ভাবে জানেন; কিন্তু কোন বহির্ভাবই কবির ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিতে পারে নাই, তিনি নিজের চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, নিজের কান দিয়া শুনিয়াছেন, নিজের প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন—তাই দূর দূরান্তরের প্রভাব আসিয়াও তাঁহার অন্তরপুরুষটীকেই জাগ্রত করিয়াছে। এই খানেই যতীন্দ্র মোহনের বৈশিষ্ট্য এবং কবি হিসাবে তাঁহার

যে একটা নিজস্ব স্থান আছে তাহাও মনে হয় এই জন্যই। তাঁহার কাব্যের সমস্ত সুর লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ নাই—সে সময়ও এখন আসে নাই। আমাদের শুধু দেখাইতে চাই তিনি বাঙালীর কবি, বাঙলার প্রাণের সহিত তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির আন্তরিক যোগ আছে।—

বাঙালী চিরদিনই একটু অধিক পরিমাণে ভাব-তান্ত্রিক, অবাঙ্‌মনসোগোচর, অরূপ ঈশ্বরের কল্পনা ভাবতেরই জিনিষ কিন্তু বাঙালীর ধাতে তাহা ঠিক বরদাস্ত হয় নাই। বাঙালী ঈশ্বরকে আপন ঘরের লোক করিয়া লইয়াছে—আপনার সুখ দুঃখের সহিত বিচিত্র দেব দেবীর কল্পিত সুখ দুঃখের সম্বন্ধ জড়াইয়া এমন একটা স্বাভাবিক জীবন বাঙালী আবিষ্কার করিয়াছে যেখানে সাধনমার্গের কঠোরতা নাই, সহজ আনন্দে পুষ্প যেমন আপনার দলগুলিকে বিকশিত করিয়া তোলে তেমনি ভাবে বাঙালী আপনাকে আপনি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই বাঙালীর মহাদেব ভাঙড়, দুই সতীনের ঝগড়ায় ব্যতিব্যস্ত সন্ন্যাসী, শ্মশানবাসী—পুরাণে বা তন্ত্রে আমরা যে বিরাট দেবাদিদেবকে পাই ইনি তাঁহাদের কেহ নন্; ইনি আমাদেরই বাড়ীর পাশের অতি পরিচিত কেহ। বৃন্দাবন লীলার উপরও অনেক রকম আধ্যাত্মিক রূপক আছে শুনিতে পাই, কিন্তু বাঙালী তাহাকেও অতি সহজে আপনার রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া লইয়াছে—শিখিপুচ্ছ-পরা হাতে বাঁশী গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া মা যশোদা যে অশ্রু চোখে পথের পানে তাকাইয়া থাকেন তাহা আমাদের অতিপরিচিতা কোন গ্রাম্য জননীর একমাত্র পুত্রকে তার পাঠশালের সহপাঠীদের সঙ্গে খেরো-বাঁধান দপ্তরটা দিয়া 'লিখিতে' পাঠানর মতই মর্ম্মান্তিক করুণ! বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাধিকাকে আমরা কোন দিনই চিন্ময়ী হ্লাদিনী-শক্তিরূপে দেখি নাই—আমরা অতি সহজেই তাঁহাকে আমাদের অন্তঃপুরিকাদের ভীড়ের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছি; শক্তি-রূপিণী মহাশক্তি মাতাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে বুড়া মহাদেবের কৈলাসে বসাইয়া দিয়াছি এবং আগমনী ও বিজয়ার অনুচ্চ কারুণ্য দিয়া তাঁহার আসা যাওয়াকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার মত মহনীয় করিয়া লইয়াছি। বিদেশী লেখক এ সমস্তই আমাদের মূঢ়তা বা পৌত্তলিক মনোভাবের দৌর্ব্বল্য বলিয়া হাসিতে পারেন, কিন্তু পুঁথির পাতার অদেখা ঈশ্বরকে এমন অনায়াসে আপনার জীবনের মধ্যে আনিয়া আপনার অস্তিত্বের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া বড় সোজা কথা নয়।

বাঙালী জীবনের এই দিকটা বড় সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে—।

রথ, দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, কোজাগর পূর্ণিমা, শিব-রাত্রি, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বাংলায় প্রচলিত 'বারমাসের তেরো পার্ব্বণ' প্রত্যেকটী তাঁহার কবি-প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে—তাঁহার কাব্যে এ সমস্তই রূপ পাইয়াছে এবং কোথাও আধ্যাত্মিক মার্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করিয়া দুর্ব্বোধ্য আবর্ত্তের সৃষ্টি করেন নাই—শিক্ষা, দীক্ষা ও নাগরিক কষ্ট-কল্পনারহিত সাধারণ বাঙালী-চিত্তের সহজ দৃষ্টি দিয়াই তিনি এ সকল দেখিয়াছেন, তাই দেখি তাঁহার 'আগমনী'তে—

"মহাযোগীর বিকার দেখে গৌরীরও চোখ ছলছলে—
ত্রিনয়নার নয়ন-ধারা সম্বরে আজ কোন্ ছলে?
ভিখারী যে ভিক্ষা ভুলে কে দিবে তায় অন্ন তুলে—
নরুমালের শক্ত মূলে কে বসাবে অঞ্চলে?
বিদায় দেওয়া কি দায়, তবু মায়ের মাথায় মন গলে।"
—নাগকেশর

বাঙালীর মেয়েই বাপের বাড়ী হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর বাড়ী আসে, আবার শ্বশুর বাড়ী হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের বাড়ী যায়—এই চিরকরুণ, চিরমধুর চিত্র যাহা সেকালকার রাম বসু, দাশু রায়, গুরু ঠাকুরের আগমনী ও বিজয়ার গানে বাঙালীর প্রাণের পরতে পরতে আঁকিয়া রহিয়াছে, যতীন্দ্রমোহনের তুলিকায় সে চিত্র আরও সুন্দর, আরও ভাস্বর হইয়াছে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' একথা কবি স্বয়ং জানিলেও পাঠককে আচার্য্য ঠাকুরের মত গুরুগম্ভীর তত্ত্ব-কথা শুনাইতে বসেন নাই, তাই 'জন্মাষ্টমী'তে দেখি—

"গোপ গোয়ালার স্নেহের দুলাল, ক্ষীরসর ননীচোর—
বৃন্দাবনের বনের গোপাল, রাখাল সঙ্গী তোর!
নন্দ দুলাল, একি এ খেয়াল, একি লীলা লীলাময়,
দীনের বন্ধু, করুণাসিন্ধু, তাই কি এ পরিচয়।"
—নাগকেশর

যতীন্দ্রমোহন বাঙালীর প্রকৃতিগত সর্ব্বত্র শান্ত সংযত স্বাতন্ত্র্যটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের মত সামাজিক জীবনেও বাঙালীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—পিতা, মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পর সকলকে লইয়া যে সুসংবদ্ধ সঙ্ঘ-জীবন বাংলার গার্হস্থ্য আদর্শ ছিল, পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির উপদ্রবে এবং শোষণ-নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে তাহা অনেকটা খর্ব্ব হইলেও বাঙালীর প্রাণের শ্রদ্ধা এখনও তাহারই উপর;—দরিদ্র হারাধন ও ধনী নীলমণির বান্ধবতার মধ্য দিয়া কবি এই সাংঘিক জীবন-যাপন প্রণালীর আভাস দিয়াছেন—

"বান্ধবতা এম্‌নি জিনিস রসের—
হঠাৎ কিছুই রাখে না তা ধনের মানের বিদ্যা বা বয়সের!
তাইতে গরীব হারাধনের ঘরে
দিনের মধ্যে বারে বারে নীলমণি সে আসা-যাওয়া করে!
তার পুকুরের তার বাগানের মাছ ও তরকারী
সংসারে যা প্রত্যহ দরকারী
প্রায়ই আসে হারাধনের করে।"

—বন্ধুর দান

সামাজিক জীবনের যে কয়টা অত্যন্ত ব্যথার দিক সে দিক গুলিও কবি পরিপূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন। 'লাঞ্ছিত' কবিতায় ভাগ্যহীনা বালকটী আঘাতের পর আঘাত খাইয়া সতের বৎসর মাত্র বয়সে ইহকালের দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিলে কবি শুধু চারিটী কথায় সমস্ত চিত্রটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"সতের সবে বয়স যবে ত্যজিল প্রাণ বালা
—সপ্তদশ নিদাঘ সহি শুকাল বন-মালা।
গেল সে চ'লে, তাহার সাথে ফুরাল' মোর গান,
সে দিন হ'তে মানি না তোরে দয়াল ভগবান।"

—লেখা।

এই ছুতায় নানা যুক্তি তর্কের, দর্শন-বিজ্ঞানের নানা জটিল তত্ত্বের অবতারণা করা চলিত—কিন্তু কবির লেখনীর কী অপূর্ব্ব সংযম—শুধু দুটী সাদা কথার ইঙ্গিতে অত বড় বুক-জোড়া ব্যথাকে অমন সহজে ফোটান' সম্ভব হইয়াছে। এই সংযম কবির সমস্ত কাব্য-গ্রন্থের যে কোন স্থানে দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'বিধবা' কবিতাটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"নামায়ে দীপযুক্ত করে কিসের তব মিনতি,
চাওয়ার তব কি আর হেথা আছে গো—
কণ্ঠ বেড়ি টানিয়া বাস কাহারে কর' প্রণতি
দেবতা নিজে তোমারই কৃপা যাচে গো।"

—অপরাজিতা।

একখানি মূর্ত্তিময়ী বিষাদের চিত্রকে আমাদের চোখের সম্মুখে কবি খুলিয়া ধরিয়াছেন এবং নিঃশব্দ ইঙ্গিতে সমস্ত অকথিত অপরিপূর্ণতার ব্যথাকে আমাদের বুকের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ঠিক এই জিনিসটীকেই বিদেশী সমালোচনার ভাষায় বলে artistic restraint. ইহাই রসের ধর্ম্ম।

কিন্তু এই বাঙলা দেশ কেবলমাত্র ভাব-বিলাসী নিরীহ ভদ্রলোকেরই আবাসস্থল নয়। ইহার বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন স্তরের জীবন আমাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে আপনাদের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্বকে বিরাট বোঝার মত বহিয়া যাইতেছে তাহাদেরও যতীন্দ্রমোহন উপেক্ষা করেন নাই। যেখানে যাহা সত্য, যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহাকেই রসের আলিম্পনে যতীন্দ্রমোহন সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—এই জন্য তাঁহার কাব্যে বাঘিনী 'মঞ্জুব', সাঁওতাল 'জটাই', বাঁশী বিক্রেতা ফেরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানপারের সন্ন্যাসী, বেদে, সাপুড়ে, বিরহিনী ধীবরকন্যা, ব্যথিতা কৃষাণী, পারঘাটের মাঝি পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্তরের জীবনেরই আমরা সজীব আলেখ্য পাই এবং সর্ব্বত্রই দেখি তাহাদের সহিত কবির একটা অবিচ্ছেদ্য আত্মার সম্বন্ধ আছে—দরিদ্রের প্রতি ধনীর কুণ্ঠা-ক্লিষ্ট অনুগ্রহ-দৃষ্টি বা বৈচিত্র্যের প্রতি অসঙ্গত উৎসুক-দৃষ্টি কাহাকেও ব্যথা দেয় না অথবা সম্ভ্রমের ব্যবধান টানিয়া পরস্পরকে বিচ্ছিন্নও করে না, ঠিক সেই দৃষ্টিতেই তিনি তাহাদের দিকে তাকাইয়াছেন। যতীন্দ্রমোহনের মাঝি বলিতেছেন—

"তোমরা ভাব' ক্ষেত আর ফসল বৃষ্টি বাদল বান
ডুবল' কত বাঁচ্‌ল' কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল খবর নাই
আমি আমার নিয়মমত ঘাটের ডিঙা বাই।"

—লেখা।

ধর্ম্ম, সমাজ ও রীতি-নীতির ক্ষেত্রে যেমন, প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তেমনই যতীন্দ্রমোহন বাংলার বৈশিষ্ট্যটুকু বজায়

রাখিয়াছেন। বাংলার পথ ঘাট, গাছ-পালা, নদী-পুকুর অতল গভীর নীলাকাশ, দিগন্ত-প্রসারিত সবুজ মাঠ সর্ব্বত্রই একটা নিরুদ্বেগ মন্থরতার ভাব আছে—বাঙালীর স্বভাব-সুলভ সৌন্দর্য্য-প্রীতি এবং কদর্য্যতা ও রূঢ় হানাহানির প্রতি স্বাভাবিক বিরাগও সম্ভবতঃ এই অতিক্রিয়াশীল প্রাকৃতিক প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে বঙ্গ-প্রকৃতির এই কমনীয়তার দিকটা এবং মানব-মনের উপর তাহার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দিকটা যেমন সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়াছে তেমনটী আধুনিক কাব্যে বড় একটা দেখিনা। যতীন্দ্রমোহনের প্রকৃতি-দর্শনের একটু নূতনত্ব আছে—তিনি প্রকৃতিকে প্রকৃতিই রাখিয়াছেন, প্রকৃতির উপর মানুষী ভাবের আরোপ করিয়া তাহাকে মানব-মনের অঙ্গীভূত করিয়া দেখেন নাই। এই জন্য তাঁহার প্রাকৃতিক কবিতায় গভীরতা অপেক্ষা বিচিত্রতা অধিক—তাঁহার চিত্রাঙ্কণ-নৈপুণ্যের উৎপত্তিও ইহা হইতে বুঝা যাইবে। স্বরূপ—

"ঐ যে গাঁটী যাচ্ছে দেখা আইনের ক্ষেতের আড়ে
প্রান্তটী যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে—
পূবের দিকে আম কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা
জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা——।"

কবির অন্যান্য শ্রেণীর কবিতা লইয়া সম্প্রতি কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না—তাঁহার লিপি-চাতুর্য্য ভাষার স্বচ্ছ প্রসন্নতা, অন্তর্নিহিত ভাবের স্নিগ্ধ-করুণ মাধুর্য্য সম্বন্ধেও কিছু বলা হইল না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাঁহার দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-সাধনার বিশিষ্ট একটা দিক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তিনি বাংলার বাঙালী কবি। কবির জীবনকালে তাঁহার কাব্যের যথাযথ আলোচনা হওয়ার অনেক অন্তরায় আছে—তদ্ভিন্ন তাঁহার লেখনীর ক্রিয়া এখনো বন্ধ হয় নাই। কাজেই তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির পরিণতিনিরূপণেরও এখনো সময় আসে নাই। অনাগত যুগই কবির সত্যকার বিচারক—কিন্তু সেদিন কোথায় থাকিবেন তাঁহার আজিকার এই অগণ্য অনুরাগী পাঠক? তাই তাঁহার জীবন-কালে এ প্রয়াস শুধু কবির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদন বলিয়া মনে করাই সঙ্গত হইবে। —শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অন্তরের কথা

যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে এখন আর দুই মত নাই। রবীন্দ্র যুগে তাঁহার এবং তাঁহার মিতা যতীন্দ্রনাথের স্থান যে সকল কবির পুরোভাগে এ কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে আমি গৌরব বোধ করি। এবং এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবারও নাই। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি দুই এক কথা বলিতে চাই। যতীন্দ্রমোহনকে অন্তরঙ্গ হিসাবে জানিবার সুযোগ বোধ করি আমার চেয়ে অপর কাহারও বেশী হয় নাই। তিনি অতিথিবৎসল, বন্ধুবৎসল এ কথা অনেকেই জানেন এবং তাঁহার হৃদয়েরও কতকটা পরিচয় হয় ত অনেকেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভ করিবার সৌভাগ্য যে অনেকেরই হয় নাই, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। এমন গুণের আদর করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। কোন লেখকের উপর ঈর্ষাসঞ্জাত বিদ্বেষের কণামাত্রও তিনি অন্তরে পোষণ করেন না। নিজের রচনা সম্বন্ধেও তিনি একেবারে নিরহঙ্কার। কোন লেখককেই তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখেন না। ছোট বড়র পার্থক্য তিনি কোনদিন করেন না। আমি জানি কবি যতীন্দ্রনাথের ভিতর প্রতিভার পরিচয় যে দিন তিনি পাইয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহাকে প্রচার করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যগ্রতা। যতীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি আমাদের কতদিন পড়িয়া শুনাইয়াছেন। পড়িতে পড়িতে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবাবেশে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। যতীন্দ্রনাথ সত্যকার বড় কবি, তাঁহার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমার ন্যায় তুচ্ছ উপেক্ষিত লেখকের গল্পগুলিও তিনি কত আদর করিয়া পড়িয়া থাকেন। এবং এমনও দেখিয়াছি যে গল্পটি পড়িয়া তিনি যখনই আনন্দ পাইয়াছেন, সেই গল্পটি পড়িয়া পাঁচ জনের ভিতর সে আনন্দ বিতরণ করিতে এতটুকু কার্পণ্যও তিনি কোনদিন করেন নাই। এতখানি দরদ এতখানি সহানুভূতি আর কাহারও ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা আমি জানিনা, অন্ততঃ আমি ত দেখি নাই।

—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

যতীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

বিশ্বকবি-শিষ্যকুল-চূড়ামণি কাব্য-যাদুকর,
বাংলার কবি-কুঞ্জ-নন্দনের হে আচার্য্য-বর !
তোমার হিমাদ্রি হতে ঝরি' পড়ে মন্দাকিনী-জল,
অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে ভাব-রঙ্গে করিয়া পাগল—
তরুণ কবির দলে, ছুটিয়াছে তব কাব্য-ধার,
কভু সে মেদুর কভু উচ্ছ্বসিত। আনন্দ-বিহার—
করে সে যে স্বর্গলোকে, নেমে আসে কভু মর্ত্ত্যভূমে,
মৃত্যুরে সুন্দর করি' শমনের গণ্ডে আসি' চুমে।
পাতালে নামিয়া কভু বাসুকীর ফণা ধরে' টানি',
কৈলাস-শিখর-উর্দ্ধে রুদ্র-শিরে উর্দ্ধে তুলে আনি'।

আনন্দের স্বপ্ন দিয়া এ সৃষ্টি জড়ায়ে পাকে পাকে,
পুনঃ সে বন্ধন ওগো ছিন্ন করে প্রলয়ের ডাকে।
কৈশোরের কুঞ্জে বসি' শুনেছিনু তব বংশীগান,
তারুণ্যের সে উষায় পূজেছিনু তোমা' মুগ্ধ-প্রাণ।
যৌবনের রঙ্গভূমে দাঁড়ায়ে হেরিনু মুগ্ধ হিয়া,
তোমার বিজয়-রথ ছুটিয়াছে দিক্ হিন্দোলিয়া।
নমিনু সে দিন তোমা, পুনঃ আজি প্রৌঢ়ের সীমায়
চাহি বসে' তব পানে আনন্দে এ চিত্ত ভরে' যায়।
বিচিত্র তোমার গতি মুহুর্মুহু নাহিক বিরাম,
ছোটে রথ—উড়ে ধূলি—উঠে জয়—চিত্ত-অভিরাম।

কাব্যের সমর-রঙ্গে জয় রাজা তব অধিকার,
হে অগ্রজ, হে সুহৃদ, অনুজের লহ নমস্কার।

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যতীন্দ্র-স্তুতি

আধুনিক সাহিত্যের কবি-কুলমণি
রঙ্গের প্রদীপ্ত জ্যোতি যতীন্দ্রমোহন,
যাঁহার প্রভাবে ধন্য কাব্যের ভুবন
উদ্ভাসিত কবিদের অন্তর-অবনী ;
তারি মাঝে আপনার শুভ ভাগ্য গণি—
জীবনের পথে এ-যে প্রাক্তন মিলন
প্রতিদিন প্রতিপলে অনুভবে মন,
কী যেন পেয়েছি স্নিগ্ধ সৌরভের খনি।
গুরুদেব তাই বুঝি স্নেহ-ধারা যত
উজাড় করিয়া দেন বাগচা ভকতে
মধুর এ দৃশ্য সবে হেরুক্ নিয়ত
প্রলেপ পড়িবে প্রাণে বিষাদের ক্ষতে।
সিংহ-কবি মুগ্ধ তব স্নেহের প্লাবনে,
পেয়েছে তরুর ছায়া মরুর জীবনে।

—শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

অপূর্ব্ব কবিতা-রূপসী

[এই কবিতাটি কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন
বাগচীর কবিতা-রূপসীকে সম্বোধন
করিয়া লিখিত হইয়াছিল]
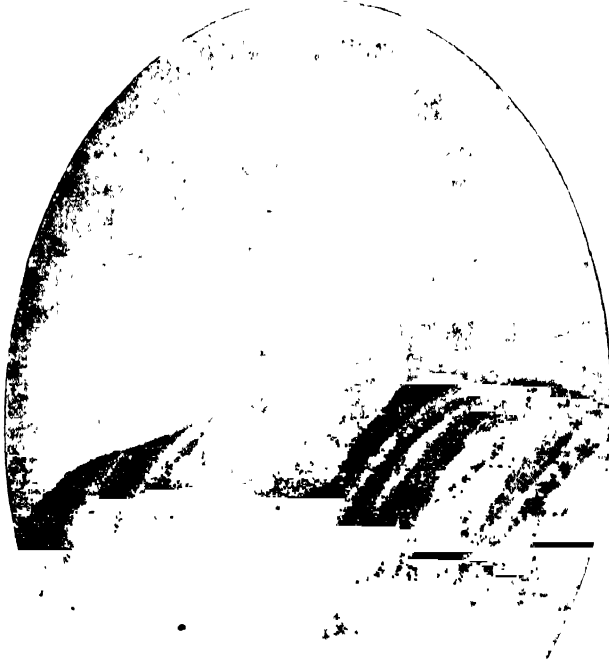
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অবাক্—বিস্মিত আমি ! হে রূপসী বুঝিবারে নারি.
তোমার ও হাবভাব লীলা !
বালিকার মত কভু উচ্ছৃঙ্খলা ! কভু প্রৌঢ়া নারী
নিয়ম-নিরতা শান্তশীলা।
নারী আলিঙ্গন-সম, কভু ঘোর আনন্দদায়িনী,
সুশীতল চন্দন-পরশ।
পৌষ-ভোরে কভু যেন গঙ্গাস্নান।—বেদনা-কারিণী
ভক্তচিত্তে তবু কি হরষ।

জীবনের মত কভু সুনিবিড় আহ্লাদ-কারিণী
রবিকরে পূর্ণ-প্রকাশিতা !
মরণের সম কভু সুগভীর মর্ম্ম-পরশিনী,
রহস্য-কুঝটি-বিজড়িতা !
বৈশাখী দিবার মত কভু তপ্ত-কাঞ্চন-মূরতি,
রাধা যেন করিয়াছে মান।
শারদীয়া পৌর্ণমাসী নিশি সম কভু স্নিগ্ধ অতি,
সুন্দরীর হাসির সমান।

অপূর্ব্ব রূপসী মরি ! তোমার মুখর চাহনিতে
থাকে গুপ্ত মরমের কথা,
সেফালি ইঙ্গিতে যথা বলি যায় ঝরিতে ঝরিতে
আপনার সৌরভ-বারতা।
বালবিধবার যেন অতি মৃদু মলিন হাসিতে
থাকে চাপা ঘোর আকুলতা ;
প্রথম ফাল্গুণে যথা থাকে চাপা চাঁপার কলিতে
বসন্তের পূর্ণ মাদকতা !

কভু চির-রঙ্গময়ী, সুন্দরী কবিতাবধূ সাথে,
রবি যেন খেলিছে আবীর।
একি বৃন্দাবনী হাসি !— পিচকারী ধরি দুই হাতে
দুজনেই আনন্দে অধীর !
ভক্ত গোপীবৃন্দ মরি, সারি সারি কদম্বের তলে,
—অঙ্গে শোভে ওড়না, চুনরি।
ময়ূর করিছে নৃত্য !—কল্পনা-যমুনা যায় চ'লে,
চারিধারে লীলার লহরী !

আমি জানি হে সুন্দরি, সতী তুমি, দেবের কুমারী,
কু-বাসনা নাহি তব চিতে।
দৈত্য যারা, হে অপূর্ব্ব অলোক-সামান্যা বরনারী,
নাহি পারে তোমারে বুঝিতে।
হেরি উমা মুখইন্দু,
ধ্যানে বসে ভক্ত হিন্দু।—
হাসি, ম্লেচ্ছ ভাবে "পৌত্তলিক"।
কি বুঝিবে গুণপণা তব দেবি !—দুষ্ট অরসিক ?

"অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" —স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সেন

যতীন্দ্রমোহন

বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জে
পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়াছে ফুল
মল্লিকা মালতী যূথী
গন্ধরাজ গোলাপ বকুল ;
রবির আলোতে নাচি'
রবিকরে মেলি দল সবে,
বিলাইছে দিকে দিকে
নিজ নিজ সুগন্ধ সৌরভে।
তুমি আসিয়াছ কবি,,
সাথে লয়ে পল্লীর গৌরব,
বাঙালার বাঙালীর
চিরন্তন আপন বৈভব।
তব কাব্য গাথা গানে
পাই তাই পল্লীর পরশ,
'ভাঁটফুল' 'নিমফল'
'চড়কের মেলা'র হরষ।
যে গান গাহেনা কেহ
তুমি যে গো সেই গীতি-কবি
যে চিত্র আঁকে নি কেহ
আঁকিয়াছ তুমি সেই ছবি।
নিদ্রিত জাতির কাণে
'জাগরণী' গীতি কে শুনায়
পরাজয়ি 'রেখা' 'লেখা'
অপরূপ 'অপরাজিতা'য়।
হে চারণ, পল্লীকবি,
বন্দি তোমা, হে বন্ধু আমার
যতীন্দ্র, অগ্রজকল্প,
লহ মোর প্রীতি-নমস্কার।

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষ যতীন্দ্রমোহন

কবি যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই জানেন। তাঁর লেখা এবং কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয় সকল শিক্ষিত লোকেই পেয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয়লাভের সৌভাগ্য সকলের হয় নি, হয়ও না। আজ বছর চোদ্দ হ'ল, যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছি। তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক কেমন জিনিস তা' আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমার একটা সংস্কার ছিল যে যারা যা লেখে নিজের জীবনে ঠিক তার উল্টো করে। যেমন থিয়েটারে যে যা অভিনয় করে, ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক তার উল্টোটি হয়। সাহিত্যিকদেরও অভিনেতা শ্রেণীর সমানই মনে করিতাম।

কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের সরস প্রাণের সংস্পর্শে এসে আমার ধারণা বদ্‌লে গেল। একদিনেই একেবারে অন্তরঙ্গ ভাব হ'য়ে গেল। বাড়ীর একজন ব'লে গণ্য হ'লাম। কবিকে 'যতীনদা' ব'লে ডাকতাম, কিন্তু কবি গৃহিণীকে 'মা' বলতাম। ছেলেপিলেরা আমার বড় প্রিয় ছিল—তাদের একটি—'ইলা' আজ নেই। 'ইলা' যাওয়ার পর থেকে ও-বাড়ীতে বড় একটা যেতাম না। ছোট্ট মেয়েটি যেন বাড়ী আলো ক'রে থাক্‌তো। বালিগঞ্জে নতুন যে-বাড়ীতে কবি এসেছেন—তার নাম 'ইলাবাস' দিয়েছেন। এই বিষাদ-স্মৃতি বোধ হয় কবির প্রাণে তুষানলের মত জ্বলছে। কিন্তু বাইরে যতীন্দ্রমোহন সেই চিরহাস্যময়। কথাবার্ত্তায় যতীন্দ্রমোহন অদ্বিতীয়। আমাদের দেশ থেকে সাবেকী মজলিসী ভাব চ'লে যাচ্ছে—কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের বৈঠকখানা জ্ঞানী গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিকের আদরের জায়গা। এখনও পাড়ায় কাজকর্ম্মের জন্য বৈঠক তাঁর বাড়ীতেই বসে।

কবির গৃহে যতীন্দ্রনাথ সেন, কালিদাস রায়, সাবিত্রী-প্রসন্ন নজরুল ইসলাম, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অতুলপ্রসাদ সেন এঁদের সমাগম প্রায়ই হয়। 'মরীচিকা'র কবি যতীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব যতীন্দ্রমোহনের হ'লেও আমার এ বিষয়ে গোড়ায় একটু হাত ছিল। 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাগুলি বোধ হয় ওয়েষ্ট্ পেপার বাস্কেটেই সমাধি লাভ করতো—কেষ্টনগরে থাকতে যতীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলি একদিন আমায় পড়িয়ে শোনান। আমি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নতুন একটি সুর পেয়ে যতীন্দ্রমোহনকে খবর দিই। তখন যতীন্দ্রমোহন 'যমুনা'র পরিচালক ছিলেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল 'যমুনা' বের করতেন। শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশ ক'রে 'যমুনা' বাংলা সাহিত্যের এক মহা উপকার করে। তার পর যতীন্দ্রনাথের "মরীচিকা" আর একটি নতুন সুর শোনায়।

আমাদের মত যুবকদের কাঁচা লেখাও "যমুনা"য় বেরুতো. তখন ছাপার হরপে নিজের লেখা দেখলে যে কি আনন্দ ও উৎসাহ হ'ত ব'লতে পারি নে। "যমুনা"র বেরোনোর দিন প্রতীক্ষা ক'রে চেয়ে থাকতাম। নিজের লেখা উল্টে-পাল্টে কতবার যে পড়তাম, তার ঠিকানা নেই! যতীন্দ্রমোহন এইভাবে আমাদের মত উদ্‌বাহু বামনকেও অনেক উৎসাহ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর ভাষা ও রচনা-বৈচিত্র্য অনুপম। উপন্যাসের দিকেও তিনি হাত ফলিয়েছেন। তাঁর মত ষোল-আনা সাহিত্যিক আজকের বাজারে খুব কমই পাওয়া যায়। সারা জীবন এক সাধনা এবং সেই সাধনায় উন্মত্ত হ'য়ে জীবনের সায়াহ্নেও তাঁর ভেতর যে উৎসাহ দেখেছি, তা বড় একটা চোখে পড়ে না।

আমাদের জাতির উপরে কবির একটা চাপা অভিমানও আছে. কিন্তু তাই ব'লে তিনি জাতির ভবিষ্যতে অবিশ্বাসী ন'ন। রাজনীতিচর্চ্চাতেও কবির উৎসাহ কম নয়। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগে আমার মানুষ যতীন্দ্রমোহনকে। তাঁর কথাবার্ত্তার ভেতর এমন একটা রস এবং ব্যঞ্জনা থাকে, যার আর তুলনা নেই। নদীয়ার মাটি রসালো, কবি সেই রসের ধারা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখেছেন। তাঁর রসের কথার ষ্টকও কম নয়।

সে-কালের এবং এ-কালের রাজাদের কথা হচ্ছিল। ইউরোপে আজ আট জন রাজা বেকারের দলে। কিন্তু সে-কালে আমাদের দেশের জমিদার রাজাদেরই বা কি প্রতাপ ছিল! যতীন্দ্রমোহন বললেন—"রাজা রাধাকান্ত দেবের শালা, অনেকের ভগ্নিপতির ধাক্কা!"

এইরূপ ছোট বড় কত কথার ভেতর দিয়ে আমরা কবির রসময় প্রাণের পরিচয় পেয়েছি। "সর্ব্বং রসাত্মকং বাক্যং কাব্যং" সংস্কৃত এই প্রবচনটি কবির জীবনে সার্থক হয়েছে। কবিতাকে আমরা একটা intellectual luxury হিসেবে দেখতে চাইনে—কাব্য কবির জীবনের প্রতিবিম্ব হওয়া চাই। সেটাই সাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের বেলায় এই দুর্ল্লভ সম্মিলন ঘটেছে।

—হেমন্তকুমার সরকার।

কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্য হইতে সময়োযোগী দুই কবিতা
হইতে কিয়দংশ চয়ন করিয়া দেওয়া হইল। উঃ সঃ।

* * *

এ যে দেখি, হায় বোধনের মাঝে
বাজে রোদনের ধ্বনি,
বিসর্জ্জনের বেদন ভরা যে
আনন্দ-আগমনী!
বিকচ কুন্দ কাশের আস্যে
হাসে পরিহাস বিকট হাস্যে
হাঁসের পাখায় বিধূনিত আজ
আকাশের অন্তর:
আলোর আড়ালে আঁধারের বাজ
গরজে নিরন্তর!

আর্ত্ত-পীড়িত পর পদানত
দুব্বল দীনহীন,
নিত্য-চকিত মৃত্যু-আহত
দিনে-দিনে ক্ষয় ক্ষীণ.—
তার চোখে এ কি প্রাণের দীপ্তি,
তার মুখে এ কি হরষ তৃপ্তি.
অন্ধ আগার ভেদ করি' তার
এ কি আলোকের শিখা.
উঠে' বসে রোগী করি' পরিহার
নিরাশার যবনিকা!

কোন্ উত্তরে হিমগিরিপারে
পড়িল স্নেহের সাড়া.
জাগিল লক্ষ বক্ষমাঝারে
মমতার মধুধারা!
মৃত্যুর বুকে অমৃত স্পর্শ
ফুটায় যেমন প্রাণের হর্ষ
টুটাইয়া দিয়া নিমেষের মাঝে
পুঞ্জিত অবসাদ:
উথলিয়া উঠে অশ্রুসাগরে
আলোর আশীর্ব্বাদ!

তাই আয় মাতা. আয় শারদীয়া
শ্মশান-সাহারা মাঝে,
দীর্ণ দলিত বক্ষে ঘা দিয়া
বাজা না যে সুর রাজে;
আশায় রিক্ত ব্যথায় তিক্ত
শত সংগ্রামে শোণিতসিক্ত—
তবু তারি মাঝে দিব তো' পূজা
জীবনরক্ত দানে.
দশ হাতে তাই নে মা দশভূজা
ভক্তের আহ্বানে।

—শরতে যতীন্দ্রমোহন

* * * *

দেশ যোড়া আজ এই হাহাকার কাগজ-ভরা ক্রন্দনে,
সত্যি কাঁদন কাঁদ্‌ত যদি, থাক্‌ত তাদের বন্ধন এ?
কান্না চোখের জল কি শুধু, কান্না মাঝে নাই কি প্রাণ?
প্রাণের কাঁদন শুন্‌বে বসে'- ভগবানের নাই কি কাণ?
দেশের যদি আত্মা কাঁদে, খোদা কাঁদেন সঙ্গে তার
প্রলয়-জলে বিশ্ব ভাসে বজ্রে জগৎ ভস্ম-সার!
পুরাণ খোলো—পাতায় পাতায় মিলবে তাহার নিদর্শন,
নরের মাঝে সিংহ সাজে, পদ্মে রাজে সুদর্শন!
'সম্ভবামি যুগে যুগে'—ইতিহাসের সত্য এ—
প্রতিদেশেই পাই দেখা তার প্রত্যক্ষে প্রত্যয়ে।

লক্ষ মানুষ বানে ভাসে—কোন দেশে হয় সত্য তা?
যে দেশ, শুনি, রাজার অধীন, ধর্ম্ম যাহার সভ্যতা!
লক্ষ মানুষ জলে ডোবে—মিথ্যা কথা নিশ্চিত এ—
পশু হ'লেও এমনি বলি আজো তোরা দিস্ দিতে?
তোরা, যারা দাঁড়িয়ে দেখিস্—নুইয়ে মাথা যোড়করে,
করকে তোদের যোড়ে বাঁধা কে রেখেছে জোর করে'?
মার খেয়ে সে খোদায় মারে সাচ্চা মানুষ-বাচ্চা যে,
মরে'ও তোরা ভিক্ষে মাগিস্, কাণ্ড তোদের আচ্ছা এ!
জাত-ভিখিরীর কপট কান্না- তোদের দেখে ঘেন্না হয়—
হাত থেকে যে ভিক্ষে করে—দান ত তাদের অপব্যয়!

* * * *

আজকে এল অন্নকষ্ট লক্ষ দশেক খস্‌ল তায়,
কাল্‌কে এল মহাপ্লাবন আধখানা দেশ ধস্‌ল হায়!
পরশু এল মহামারী—শীর্ণ হাতে ভিক্ষা চাই,
বাঁচাও রাজা, বাঁচাও ধনী নইলে মোদের রক্ষা নাই।
পায়ে ধরাই উপায় যাদের, উপায় তাদের ভীষণ শাপ,
তাদের বেঁচে থাকার চেয়ে কোথায় আছে এমন পাপ?
বাঁচতে যদি ইচ্ছা থাকে, বাঁচতে যদি সত্যি চাস্,
দু'হাত দিয়ে দে চুকিয়ে অধীন হওয়ার মিথ্যা ফাঁস।
বাঁচিস যদি, মানুষ হয়ে' বাঁচার উপায় কর আজই,
নইলে দে আজ লুপ্ত করে' বর্ত্তে' থাকার কারসাজি!

—বন্যা-সঙ্কটে শ্রীপ্রমোহন

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(শরৎ-জয়ন্তী ৩১ ভাদ্র ১৩৩৮ সাল)

"শরৎ-শর্ব্বরী"
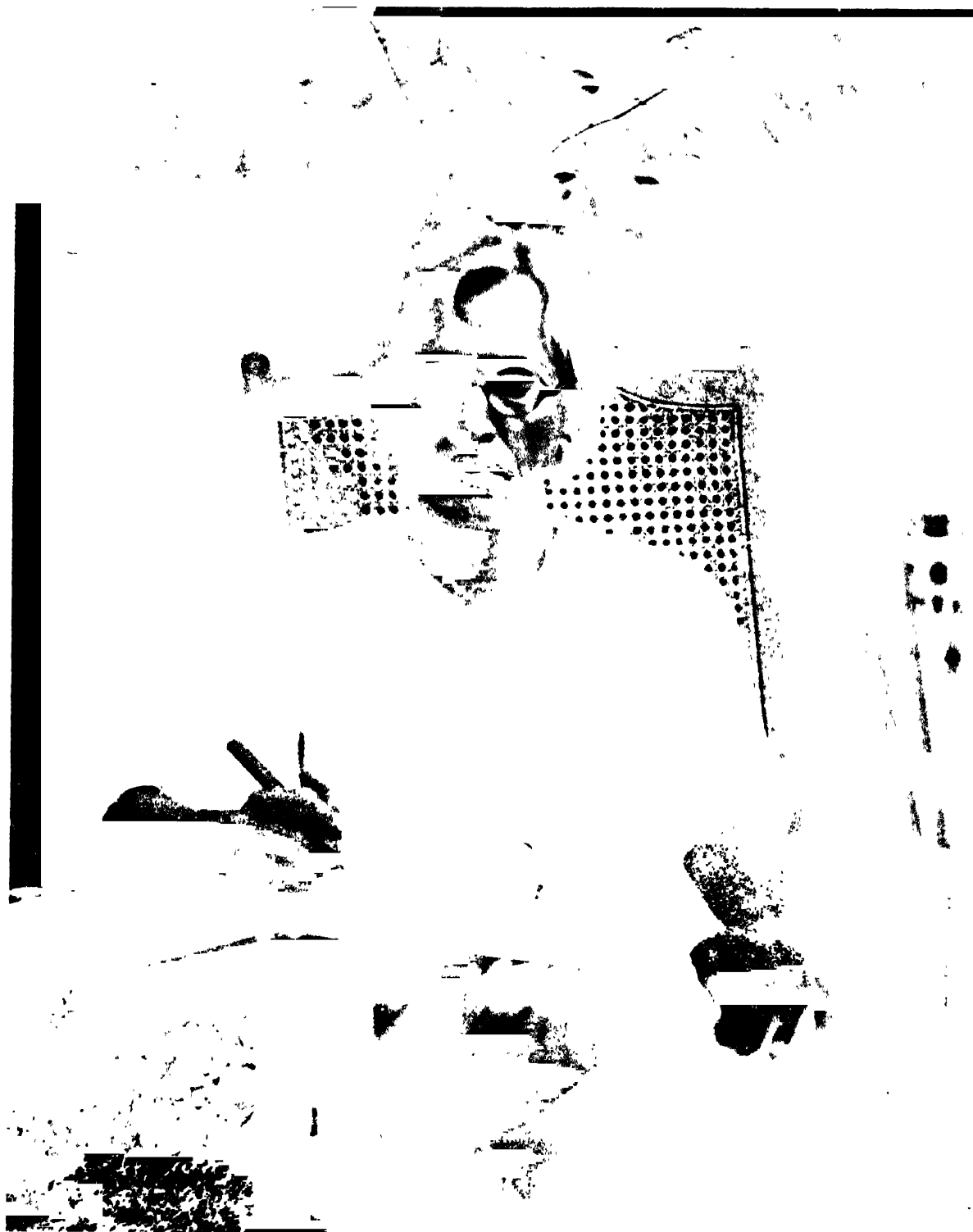
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নারী-জীবনের অসহ বেদনা বুকে
বিজন পথের গভীর অন্ধকারে,
রূপ-সন্ধানী ! জ্বালায়ে মনের আলো
কাহারে খুঁজিয়া ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে !

দলিত কুসুমে গাঁথিয়া তুলিলে মালা
দলে দলে তার ফুটিল প্রাণের হাসি,
কাঁটা বেছে তুমি বুকে নিলে তার জ্বালা
নব ফাল্গুন সৌরভে এল ভাসি'।

ধেয়ানের ধনে করিতেছ আরাধনা
অপরূপ রূপ-লাবণ্য-উপচারে,
পূজা-বঞ্চিত মানুষের দেবালয়
প্রদীপ্ত হ'ল আরতির দীপাধারে।

কবে দেখা দিলে মঙ্গল-উষাকালে,
শুকতারা সম নিতি নব সন্ধ্যায়
ভস্ম মুছিয়া সিঁদুর পরালে ভালে
সুখের ব্যথায় কাঁদে যৌবন হায় !

ধূপ সম দহি' গন্ধ বিলালে কবি,
হৃদয় ছানিয়া করালে অমিয়া পান।
পরাগ-পরশে পুলকাঞ্চন জাগে
তনু দেহ মন আবেশে কম্পমান।

কা'র তরে তুমি সাজিয়াছ বৈরাগী
পথের ধূলায় ধূসর সকল দেহ,
বিরহ ব্যথায় সজল যাহার আঁখি
গৃহ ছাড়ি' তুমি খুঁজিছ তাহারি গেহ।

সোনার স্বপনে কারে ধ্যান কর ধ্যানী,
সাজি ভরা ফুলে কা'র মধু হাসি ফুটে,
বেদনায় রাঙা করবীর মালাখানি
কা'র তরে তুমি বহিতেছ করপুটে ?

ভাগ্য তোমার, ফুটিল সন্ধ্যামণি,
হাসিল মালতী, কমল মেলিল আঁখি,
দখিনা হাওয়ায় চিরবসন্ত এল
কা'র হাতে তুমি পরালে রঙীন রাখী ?

পূর্ণ চাঁদের মায়া

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

পূর্ণিমা রাত্রি। আকাশের মহাপ্রাঙ্গণ থেকে পৃথিবীর রন্ধ্র রন্ধ্র পর্য্যন্ত—জ্যোৎস্না যেন আর ধরে না। সামনে প্রশস্ত গঙ্গা—কূলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত জোয়ারের জল ঠেলিয়া উঠিতেছে, আর একটান সজোর দক্ষিণা হাওয়ায় তাহার উপর বড় বড় ঢেউয়ের সারি জাগাইয়া তুলিয়াছে। পাশের খোলা জায়গাটার কোথায় একটা হেনার ঝাড় আছে, তাহা হইতে মাঝে মাঝে একটা তীব্র মিঠা গন্ধের গমক ভাসিয়া আসিয়া যেন নেশা ধরাইয়া দিতেছে। একটা পাখী ক্রমাগতই ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মাহেন্দ্রলগ্নে যেন একটা সঙ্গীতরাজ্যের সৃষ্টিতে মাতিয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতায় রাত্রিটা যেন আর নিজের মধ্যে আঁটিয়া উঠিতেছে না।

এমন একটি রাত্রির নিকট সতর্ক থাকাই ভাল, কেন না প্রত্যেক সুন্দরীর মতই এও কখন কখন একটা বিশ্রী রকম আত্মবিস্মৃতি ঘটায়।—আমি যে গুটি ষাট টাকার একটা কেরাণী,—আজিকার চাঁদের প্রশান্ত, অনবদ্য সৌন্দর্য্যের চেয়ে আমার যে বড় বাবুর ভ্রূকুটি-কুটিল মুখটির ধ্যান করাই বেশী দরকারি,—আজ এই দক্ষিণা হাওয়ায় মনের পাল না তুলিয়া দিয়া কাল আমার পাওনাদারদের মেজাজের হাওয়া কোন দিকে বহিবে তাহার হিসাব রাখিলে যে বেশী কাজ হয়—এসব প্রত্যক্ষ সত্যগুলা মনেই আসে না।—এমন রাত্রে, বিশ্বের এই সীমাহীন প্রসারতা, বায়ুর এই বেহিসাব ছড়াছড়ি দেখিতে দেখিতে মনে হয়—আমিও একটা প্রকাণ্ড কিছু হইতে পারিতাম।—ওপারের ঐ বিদ্যুৎ আলোকিত কলের একাধিপতি হওয়া, কি গঙ্গার ঐ যে পুলটা গড়িয়া উঠিতেছে, ওর চীফ ইঞ্জিনিয়ার হওয়া তার কাছে কিছুই নয়।—তবে হইলাম না কেন?—এর মীমাংসা করিতে গিয়া অনেক কথাই মনে পড়ে;—সংসারের নানান রকম ছোট বড় প্রতিকূলতা।—বহুদিন অতীত সে-সবের কোনটাকেই কিন্তু বেশ বাগাইয়া ধরিয়া আক্রোশ মেটান যায় না। এই সুদীর্ঘ চিন্তাধারার শেষে আসিয়া পড়ে বিবাহ ব্যাপারটা—যেন কূল পাই, এবং রাগের সমস্ত উচ্ছ্বাস লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ি বউয়ের উপর……

সেই আমার প্রথম যৌবনের অপরিমেয় প্রাণশক্তি যা' শতদিকে শতকল্পনায় বিকশিত হইয়া উঠিত—স্বদেশ, স্বাধীনতা, সাহেব ঠেঙান, বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা, সব জিনিষকেই ফুঁয়ে উড়াইয়া দেবার স্পর্দ্ধা—সেসব একনিমেষে আমারই উপর টেক্কা দিয়া, কে ফুঁয়ে উড়াইয়া দিয়া বসিল?—বৌ। যত নষ্টের কু এই বৌ। কী যে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়াছি—তাহার পর প্রতিদিনই নিম্ন গতি—প্রতিনিয়তই মনের এক একটা মহৎ বৃত্তির বলিদান। এখনও কি চেষ্টা করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? আমি কি সেই আমি নেই? একবার গা-ঝাড়া দিয়া দেখিলে হয় না?—ভৈরব হুঙ্কারে একটা নাড়া দিয়া মৃণালবদ্ধ হস্তী যেমন পদ্মবন দলিত করিয়া উঠিয়া আসে তেমনি ভাবে ওর সমস্ত মাধুর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া কি একবার বাহির হইয়া আসা যায় না⋯ ⋯মুক্তি যে চাই-ই—এ-রাত্রি যেন তাহারই বাণী ঘোষণা করিতেছে—আজই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্রত সুরু করিয়া দিতে হইবে যে……

—এই রকম সব উদ্ভট চিন্তা মনে আসে; অন্ততঃ এই বিশেষ পূর্ণিমা রাত্রিটিতে, গঙ্গার সামনে ছোট বাড়ীর খোলা ছাতটুকুতে বসিয়া এণ্ড্রু-উ-ডেভিড্‌সন্ কোম্পানীর ফোর্থ ক্লার্ক, আমাদের অনুকূল ভাদুড়ির মনে এই চিন্তার জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না। বাঁধা জীবন প্রণালীর কোনখানে কোন ছন্দপতন ঘটিত না—রাত্রে দিব্য ভালছেলেটির মত বিছানায় শুইয়া শুইয়া বধূ মালতীর নিকট সেই দিনটির একঘেয়ে হিসাব শুনিতে শুনিতে নিদ্রা, সকালে চটকল-মুহূর্ত্তে জাগরণ—ত্বরিত স্নান, আহার, আটটা ছত্রিশের গাড়ী ধরা, আফিস, আবার সন্ধ্যার সময় সেই বাড়ী—সব নির্ব্বিবাদে, বিনা ওজরে চলিয়া যাইত; কিন্তু এই সময় বাড়ীর মধ্যে একটি ব্যাপার ঘটিতেছিল যাহা সব ওলটপালট করিয়া দিল

—মালতীকেও আজ পূর্ণিমায় পাইয়াছে; কিন্তু অন্যভাবে, সে রন্ধন করিতেছিল, এমন সময় কেরোসিনের ডিবরিটা নিভিয়া যাওয়ায় খোলা জানালার মধ্য দিয়া ঘরটা হঠাৎ নীলাভ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে যে পঞ্চশরে বিদ্ধ হইয়া অচেতন হইবার দাখিল হইল এমন কথা নয়; তবে এই আগন্তুক জ্যোৎস্নাটা তাহার হঠাৎ যেন বেশী রকম মিঠা ঠেকিল, এবং যে-হাওয়াটা তাহার প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া কাজের অগোছ করিয়া দিল সে-ই আবার তাহার মনের কোথায় অন্য একটা প্রদীপ জ্বালিয়া কবেকার কতগুলা বিস্মৃত ঘটনাকে আলোকিত করিয়া দিল। ফলে এই হইল যে মালতীর হাতাবেড়ী ঠন্‌ঠনাইয়া রোজকার এই রন্ধনকার্য্যটা বিশেষ ভাল লাগিল না। ডালের হাঙ্গামাটা উঠাইয়া দিল এবং ডাল্‌না ও ভাজার কুটনা একত্র করিয়া তাড়াতাড়ি যেমন-তেমন করিয়া একটা ঝোল নামাইয়া লইল ও দুধটা জ্বাল দিয়া রান্নাঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিল।—বাহিরে রাত্রিটা আরও সুন্দর; মনে পড়িল এই রকম একটি ফুটফুটে রাত্রে—আজ হ'তে নয় বৎসর পূর্ব্বে একটি উৎসবের কথা—তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব।···সেদিনকার নিজেকে মনে পড়িল—আর মনে পড়িল রাঙা চেলী-পরা একজনকে—মুখে খড়কে দিয়া তোলা চন্দনের বঙ্কিম রেখা—ঠোঁটে সলজ্জ হাসির আভাস ..

বড় মেয়েটি একটা ছবির বই পড়িতেছিল; মালতী একটু দ্বিধার স্বরে প্রশ্ন করিল—"কোথায় রে?—বেরিয়েচে বুঝি?"

মেয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, প্রশ্ন করিল—"কে, মা?"

"তোর বাবা"—কথা দু'টি বলিতে একটু লজ্জা হইল আজ, কিন্তু লাগিল বড় মিঠা।

মেয়ে উত্তর করিল—"ছাতের ওপর, ডেকে দোব?"

"না, তুমি পড়।"

মালতী মেয়ের আনত মুখখানির পানে একটু চাহিয়া রহিল···সুন্দর মুখখানি—বাপের চোখ দুটি আর কোঁকড়ান চুল পাইয়াছে, আর ছোট্ট কপালটি আর টুকটুকে ঠোঁট দু'খানি নাকি তার দেওয়া···

ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দু'জনের মধ্যে কত-দিনের কত তর্কবিতর্কের কথা মনে পড়ে···

মালতী ঘরের মধ্যে গেল। রাত্রে আরশী দেখিতে মানা, তবুও যে চকিত ছায়াটি পড়িল তাহাতে টের পাওয়া গেল কতকগুলা ছোট চুলের ঘুঙরী ঘামে ভিজিয়া কপালে জড়াইয়া গিয়াছে—মেয়ের ছাঁচের ছোট্ট কপালটিতে···

চুলের গোড়া খুলিয়া আবার ভাল করিয়া আঁটিয়া বাঁধিল। আজ খোঁপা বাঁধা হয় নাই,—ঠাকুরঝি গিয়াছে পর্য্যন্ত এদিকে প্রায়ই হয় না।...থাক্ গিয়া, ও এলো খোঁপাই ভালবাসে...ওর এই সখের কথা মনে পড়ায় আবার লজ্জা আসে।

গন্ধরাজের গাছটি ফুলে আলো করিয়া রহিয়াছে; আজ ঠাকুরঝি থাকিলে জোর করিয়া পরাইয়া দিত চুলে,—যা দুষ্টু! ..তা' বলিয়া নিজে তুলিয়া খোঁপায় গোঁজা যায় না... ধ্যাৎ···

কাপড়খানায় হলুদের তেলের দাগ। মালতী আপনার কোঁচান নীলাম্বরী শাড়ীটির দিকে লুব্ধভাবে চাহিল। কিন্তু লজ্জাকে অতটা অতিক্রম করিতে না পারায় একটি কাঁচা আটপোরে সাড়ীই পরিধান করিল। দু'টি পান সাজিল। একটি নিজের মুখে দিয়া অপরটি হাতে রাখিল—ওপরে যাইবার বায়না ..

বেশ জ্যোৎস্না! চমৎকার···দিব্য হাওয়া···'ও' কতবার বলিয়াছে—"তুমি রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি সেরে একটু বাইরে হাওয়ায় এসে ব'সনা কেন?".. হইয়া ওঠে না···ওর যে মতলবে বলা—সে-সবের আর বয়স আছে নাকি?···

জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্নার ডেলার মত কখন দুইটি গন্ধরাজ ফুল তুলিয়া ফেলিয়াছে, অন্যমনস্কভাবে। খোঁপার নিকট হাত লইয়া যাইতে মনে পড়িল, ভাবিল—দূর, খোঁপায় পরা চলে না; হাতে থাকে থাক্ গিয়া, কি আর এমন দোষ হইবে তাতে?···

তাড়াতাড়ি একটু সুধরাইয়া-লওয়া নিজের রূপটির দিকে মনে মনে একটু দেখিয়া লইল। লজ্জাও করে···যেন নিজের কাছে ধরা-পড়িয়া-যাওয়া···আবার যা কবি মানুষ, একরাশ উচ্ছ্বাসের ছড়াছড়ি হইবে এখুনি...

আরশীতে আবার ভ্রূজোড়াটির ওপর হঠাৎ নজর পড়িল ...ঐ যাঃ—টিপ্ পরা হয় নাই—টিপ্ ওর চাই-ই যে!

মালতী ক্রমেই বেজায় কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল ; তাহারই মধ্যে কে যেন ক্রমাগত একটা চটুল হাসি হাসিয়া যাইতেছে—যেন ঠাকুরঝি তাহার মনের অন্তরালে বাসা বাঁধিয়াছে।

মালতী যেন এই অন্তরালবর্ত্তিনীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তা' কি করব বল ; মেয়ে মানুষকে অন্যের সখেই যে চল্‌তে হবে ; নয়তো এত রাত্রে টিপ্ পর্‌তে আমার ব'য়ে গেছে।"

কপালে একটি খয়েরের টিপ্ পরিল।

এই সময়-বরাবর ওদিকে স্বামী অনুকূল প্রকাণ্ড-একটা-কিছু না হইতে পারার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিতেছিল—"যত নষ্টের কু এই বৌ, কি যে একটা দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়াছি…"

—ভাবিতেছিল—"মৃণালবদ্ধ হস্তী যেমন পদ্মবন মথিয়া, পিষিয়া, উঠিয়া আসে, তেমনিভাবে ওর সমস্ত মাধুর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া কি বাহির হইয়া আসা যায় না?—সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দাঁড়ান যায় না?"

মালতী সিঁড়ি বাহিয়া, ছাতের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—"আজ মশাইয়ের জোচ্ছনা আর মলয় খেয়েই কাটবে; না আরও কিছু চাই?…"

সকলেই জানেন দাম্পত্য-ভাষায় এগুলো leading question জাতীয়। এর উত্তর একটি মাত্রই ছিল, জানাইয়া দেওয়া—'না প্রিয়ে, আজ বরং যাহা খাইয়া কাটিতে পারে তাহা তোমার দু'টি অধরে সঞ্চিত আছে—এই জ্যোৎস্না আর মলয় বায়ু তাহার ক্ষুধাটা তীক্ষ্ণই করিয়া দিয়াছে…'

ইহার পর যাহা হইবার আপনিই হইয়া যায়। মোটের ওপর এ-খোরাকটিও জোটে অথচ পেটের খোরাক যে বন্ধ হয় এমন নয়, বরং প্রীতি সেবার মাধুর্য্যে আরও উপভোগ্য হইয়া ওঠে।

কিন্তু অনুকূলের মাথায় আজ ভূত চাপিয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরীক্ষার এমন বিপুল সরঞ্জাম দেখিয়া সে মনে মনে সর্ব্ববিজয়ী বীরের মত দৃপ্ত হইয়া উঠিল। দুয়ারের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল—"ও, আজ দেখি সব অস্ত্র শানিয়ে এসেচো, ব'সো…আমাদের যতটা গোলাম ভাবো ততটা নয় ; অন্ততঃ অনুকূল শর্ম্মা তো নয়ই…"

নিতান্ত অবিচলিত ভাবে বলিল—"না, তা' আর কাটে কবে? কতদূর ভাতের ?"

মালতী যেন থতমত খাইয়া গেল। চৌকাঠ হইতে পা বাড়াইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া একটু শুষ্ক কণ্ঠেই বলিল—"দেরি?—দেরী কিসের—তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম ..বাড়া হবে ?"

রান্না ঘরের তাতে মুখটা এখনও লাল হইয়া আছে, তাহার ওপর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—আবার এই নূতন আঘাতে অপ্রতিভ ভাবটা…ক্ষণিক দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে যে! অনুকূল মনকে অতিরিক্ত রকম কড়া করিয়া আরও রূঢ় আঘাত হানিল ; বলিল—"তা' এত সাজের ধূম যে!"

মালতী অন্তরে অন্তরে যেন লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গেল। মনে হইল তাহার এই কপালের টিপ, গালে-টেপা পান আর কোঁচান শাড়ীটা তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন দাহ করিয়া দিতেছে। স্বামীর প্রথম উত্তরে একটু অপ্রতিভ মাত্র হইয়াছিল—একটা সন্দেহের সান্ত্বনা ছিল যে হয়ত সে সরল ভাবেই কথাটা বলিয়াছে ; কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিল এ জানিয়া শুনিয়া প্রত্যাখ্যানের আঘাত। হঠাৎ এ মনোভাবের কারণ বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার ইচ্ছাও ছিল না ; তবে এই অন্যায় অপমানটা তাহাকে বড় তীক্ষ্ণ ভাবে বিদ্ধ করিল। ঐটুকুর মধ্যেই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। অথচ পিছাইতেও পা উঠে না ; আর সামনের পথ তো নেই…

এই সঙ্কট হইতে স্বামীর প্রশ্নই আবার তাহাকে পরিত্রাণের পথ দেখাইল। অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল—"শুনলে কথাটা?—বলি, সেজে গুজে কোথাও বেড়াতে চললে নাকি ?"

মালতী শুষ্ক গলায় একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"হুঁ, একবার সইয়ের বাড়ী যাব ভাবছি।"

উত্তরটিতে অনুকূলের একটু হার ছিল। তবে আঘাতটা যে লাগিয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। প্রশ্ন করিল—"তা' কি ?"

"তাই বল্‌ছিলাম খেয়ে নিতে ; একটু দেরী হ'য়ে যেতে পারে ;—অনেক দিন যাইনি..."

অনুকূল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—"তা দুটো ভাত বেড়ে নিতে বেশ পারব। এত অপদার্থ ভাব কেন বল দিকিন ? অথচ এতদিন দেখচ আমায়..."

মালতীর মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল—"এতদিন দেখেছি বলেই ভাবি" ;—কিন্তু এই সময় হঠাৎ তাহার মাথায় একটা খলবুদ্ধি আসিয়া জুটিয়া গেল। বলিল—"সে বল্‌তে গেলে তো রান্না-বান্নাও ক'রে নিতে পার ; কিন্তু..."

অনুকূল রোখের মাথায় জালের মধ্যে একটা পা বাড়াইয়া দিল,—একটু গর্ব্বের সহিত বলিল—"আবার 'কিন্তু' কি, পারিই তো—বেটাছেলে হ'য়ে জন্মেচি..."

মালতীর দুষ্টু প্ল্যান মাথার মধ্যে জাঁকিয়া উঠিতেছিল, বলিল—"ছেলেপুলে মানুষ কর্‌তেও..."

"সচ্ছন্দে।...একটা সান্ত্বনাও থাকে যে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌চি"—দৃষ্টিটা ওপারের কলের বিজলির উপর গিয়া পড়িল।

মালতী কথাটা সহ্য করিতে না পারিয়া ভ্রুজোড়াটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"প্রায়শ্চিত্ত !"

"প্রায়শ্চিত্ত।...সাম্‌নের ঐ কলটা দেখচ ?—গোকুল কুণ্ডুদের ;—ওতে তিন ক্রোর টাকা খাটচে। সমস্ত দিনের পর রাত বারটা-একটায় একবার অন্দর-মহলে এল কি না এল ; ব্যস্—ঐ পর্য্যন্ত। ছেলেপুলের হাঙ্গাম নেই। মোহ আছে ; তবে সেটা কাজের মোহ—লক্ষ্মীর মোহ..."

বাধা দিয়া মালতী বলিল—"বুঝেচি, অর্থাৎ অলক্ষ্মীর মোহ নেই আর কি—"

অনুকূলের যেন একটু চমক ভাঙ্গিল ; বুঝিতে পারিল কথাটা অত্যন্ত রূঢ় হইয়া গিয়াছে ; এতটা রূঢ় করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না।...তবুও একেবারে অনুতাপের দুর্ব্বলতাটা প্রকাশ করিতে কেমন কেমন বোধ হইল ; তাই শুধু একটু নালিশের সুরে বলিল—"অমনি রাগ হোলো ?...আমি কি তাই বল্লাম ?...কথাটা বেঁকিয়ে না বল্‌লে..."

গ্রহের দোষ হইলে শোধরাইবার সময়েই ভুলগুলা আরও ঠেলাঠেলি করিয়া আসিয়া জোটে, অনুকূল আর কথাটা শেষ করিতে সাহস করিল না।

—অবসরও ছিল না ; কারণ শেষ করিবার পূর্ব্বেই মালতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"আমার কথা তো বেঁকা হবেই ;—আমার মন বেঁকা, আমার কপাল বেঁকা—কথা আর সোজা হবে কোত্থেকে ?—দেখতে যখন পার না, তখন আমার চলন পর্য্যন্ত বেঁকা ঠেক্‌বে। আর সব চেয়ে বেঁকা আমার বুদ্ধি—তাই সোজা মহাপুরুষদের কথা থাক্‌তে যাই।...ভাত বাড়া হবে ? না, না—বলা হোক্‌" সিঁড়িতে সজোরে পায়ের ঘা দিতে দিতে মালতী নামিতে লাগিল।

অনুকূলের মেজাজটা নরম হইয়া আসিতেছিল ; আবার সপ্তমে চড়িয়া বসিল।... ক্রমে তাহার মনে হইল সে দুনিয়ার কাহাকেও কেয়ার করে না।...ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদটা মাথার উপর উঠিয়া আসিয়াছে ; আকাশে ছোট ছোট তারাগুলা লুপ্ত।—চাই ঐ রকম সর্ব্বগ্রাসী পরিপূর্ণতা !"... সে কাহারও কাছে মাথা নোয়াইবে না।—ঘরে বউয়ের কাছে নয়,আফিসে বড় বাবুর কাছে নয়—আরও অনেক জায়গায় অনেক লোকের কাছে নয়। কী বউ ?—তা'র আবার মোহ ! কিসের বড়বাবু ?—তা'র আবার অত দেমাক্ !—আর সেই বেটা সার্জ্জেণ্ট—সেদিন অত তাড়াতাড়ির মধ্যে তাহার ট্যাক্সিটা সে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে অতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—কেরদানি করিয়া একটা হাত বাড়াইয়া দিয়া—বেটা নিজেকে ভাবে কি ?... এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী—আলো তাহার হাজার বাহু দিয়াও যাহাকে ধরিতে পারিতেছে না—তাহার মধ্যে এদের কর্ম্মক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ !...আর সে নিজে—কত বড়ই না সে হইতে পারিত !—এখনও যদি ইচ্ছা করে—যদি শুধু মন দিয়া ইচ্ছা করে মাত্র তো এত বড় হইতে পারে যে এ পৃথিবীতে তাহার সঙ্কুলানই হয় না।...না, আর দুর্ব্বলতা নয়—নিজেকে চিনিতে হইবে—চেনাইতে হইবে—দাঁড়াও অনুকূল তুমি মাথা তুলিয়া ; পৃথিবী তোমার পায়ে লুটাইয়া নিজেকে চরিতার্থ মনে করুক...

৬

মেয়েটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাত দেওয়া হবে বাবা?—মা জিগোস্ কর্‌লেন।"

অনুকূল বলিল—"না, তাঁকে যেতে বল বেড়াতে।"

মেয়েটি নামিয়া গেল; তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বল্‌লেন—বেড়াতে আর যাবেন না; বড্ড মাথা ধরেচে, যাচ্ছেন শুতে।"

অনুকূল মেয়েব মুখের দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। মাথা ধরার মানে সব সময় মাথা ধরা নয়—মেয়েদের পক্ষে আবার বেশীর ভাগ সময়েই নয়।

জিজ্ঞাসা করিল—"কাপড়টাপড় ছেড়ে ফেলেছে নাকি?"

—"ছাড়চেন।"

—"হুঁ! আচ্ছা বল্‌গে যা' শুতে; বল্‌বি—আমি বেড়ে নোব'খন—যখন খিদে পাবে।...উঃ..."

আবার আত্মচিন্তা চলিতে লাগিল। এবার আরও জোরের সঙ্গে চালাইবার চেষ্টা ছিল; কিন্তু এবারে গতির জন্য যেন মাঝে মাঝে লেজ মোড়া দিতে হইতেছিল। জ্যোৎস্নাটাও যেন ক্রমেই একটু একটু করিয়া খাদ মিশিয়া মলিন করিয়া দিতে লাগিল। খাসা দক্ষিণা হাওয়া—কিন্তু দক্ষিণা হাওয়ায় আবার যেন ক্ষুধাও বাড়ায় বলিয়া অনুকূলের বোধ হইতে লাগিল,—আবার এই জ্ঞানটিকে সে যতই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই যেন পেটের অনুভূতির মধ্য দিয়া সেটা স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

তখন স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার দয়া হইল। আহা, বড্ড সামান্য, বড্ড ছোট ওরা,—একটু কথার আদর পাইলেই বর্ত্তিয়া যায়, আবার একটু ইঙ্গিতের মধ্যে অনাদরের ভাব দেখিলেই মুসড়িয়া পড়ে।...পুরুষের এই বিরাট জীবন,—তাহার কোথায় এক কোণে একটু জায়গা করিয়া বেচারিরা পড়িয়া আছ—কাজ কি ওদের চোট্ দিয়ে—আমাদের জীবনে কতটুকুই-বা প্রভাব ওদের...

একটু পরে মেয়েটি আসিয়া সিঁড়ির দুয়ারের কাছে মাথাটি নীচু করিয়া দাঁড়াইল। মুখটি ভার-ভার।

অনুকূল মনে মনে হাসিল, মনে মনেই বলিল—"দেখ ব্যাপার!—বাপ খাবে না—একটু দেরি ক'রে খাবে, অমনি মেয়ের মুখ ভার—আর তা'র মা শয্যাধরা!

মেয়ে এবং তাহার মাকে কৃতার্থ করিবার জন্য অনুকূল বলিল—"আচ্ছা, যাও বল যে ভাত বাড়তে আমি আসচি।"

মেয়েটি কাছে সরিয়া আসিল; কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "মা কাউকেও ভাত দেবে না বলছেন, আমার খিদে পেয়েচে বাবা।"

অনুকূল বড় কৌতুক অনুভব করিল; মেয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা তুমি বলগে দিকিন—'বাবা খেতে আসচে', তা'হলে তোমায়ও দেবে; কিম্বা বলগে—'বাবা ডাকচে, আমায় ভাত দিয়ে ওপরে যাও; না হয় বরং বল—'বাবা একবার'..."

মেয়ে অভিমানের সুরে বলিল..."না বাবা, তোমার নাম ক'রলে খিচিয়ে উঠচেন, বললেন—'বাবা বাবা করতে হবে না আমার কাণের কাছে বেরো—দূর হ'...তুমি চল বাবা—মার কি হয়েচে, আমার ভয় ক'রছে .."

অনুকূল একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"বেশ ভাল ক'রে গুচিয়ে শুয়েচে নাকি?—মশারি ফেলে?"

"মশারি ফেলতে গিয়ে একটা কোণ ছিঁড়ে গিয়েছিল; টেনে সবগুলো ছিঁড়ে ফেলচেন। খোকাকে তোমার বিছানায় মশারীর ভেতর শুইয়ে দিয়েচেন।"

অনুকূল একটু শিহরিয়া উঠিয়াই কহিল—"আমার বিছানায়?—দেখ দিকিন অত্যাচার...নীচে অয়েল ক্লথটা পেতে দিয়েচে তো?"

"না, নিজে পাট ক'রে মাথায় দিয়ে শুয়েচেন। বললেন, 'এটা নিয়ে যেন কেউ টানাটানি না করে—বলে দিস্; আমার মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে একটু।"

অনুকূল ব্যস্তভাবে মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল; মুখে ক্রমাগতই—"কী গেরো বল দিকিন...না বাপু...ভ্যালা বিপদ তো?..."

যাইতে যাইতে মেয়েকে প্রশ্ন করিল—"আর মিন্তু? সে খেয়েচে?"

বাপ উঠিতে মেয়ে সাহস পাইয়া মার বিরুদ্ধে সজোরেই নালিশ করিল—"হ্যাঁ, খেয়েচে—মা তেমনি কি না—একটা থাপ্পড় খেয়েচে—বেচারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।"

—একটু পরেই আবার বলিল—"সেও তোমারই বিছানায় শুয়েচে বাবা।"

ততক্ষণ নীচে আসিয়াছে। নামিতেই জাপানী দেওয়াল ঘড়িটা যুক্তকর কপালে তুলিয়া তাহার ভাঙা গলায় গৃহস্বামীকে গৃহস্থালির মধ্যে অভ্যর্থনা করিল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া অনুকূল সত্রাসে কহিল—"বারটা! আর তোরা দিব্যি নিশ্চিন্দি হ'য়ে র'য়েচিস্?—জানাতে হয় না আমায়?"

"ওটা তো ঠিক নেই বাবা বাঞ্ছা মিস্ত্রি আজই মোটে কলে তেল দিয়ে গেল কি না। বললে—'তেল খেয়েচে এখন যদি দু'দিন একটু জোর চলে তো ঘাবড়ো না, মা-ঠাকরুণ"

অনুকূল বিরক্ত ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল—"কে ওর হাতে আবার ঘড়ি দিতে বলেছিল?…যত বারণ করি—"

"উঃ" করিয়া বিছানা হইতে একটি করুণ শব্দ উঠিল; মালতী আড়া মোড়া ভাঙিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "তোরা আর কাণের কাছে চীৎকার হানিস্নি, সবি;—আমায় একটু—শান্তিতে মরতে দে—উঃ—বাবা…"

অনুকূল একবার নিজের শয্যার দিকে এবং ঘরের সাধারণ বিশৃঙ্খলতার দিকে চাহিল; তাহার পর আস্তে আস্তে বধূর কাছে গিয়া শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"সত্যি সত্যিই মাথাটা ধরল নাকি?"—সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা শোধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"এযে সত্যি সত্যিই মাথা ধরেচে দেখচি; আমি ভাবলাম এক একবার যেমন…"

—আরও বেশীরকম ভুল হইয়া গেল দেখিয়া জড়িত জিহ্বায় আমতা আমতা করিয়া বলিল—"দেখচি এই সামান্যের মধ্যে বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে"

—তাহার পর আর সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ওদিকটাই ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"ওডিকলোন্‌টা কোথায় আছে?"

ক্ষীণ কণ্ঠে যতটা আওয়াজটা চড়ান যায় সে পরিমাণ চীৎকার করিয়া—(আর তাহাতে শব্দও নেহাৎ কমও হইল না)—মালতী বলিয়া উঠিল—"সবি, পোড়ারমুখী, কে তোদের—মায়া দেখাতে—ডেকেছে লা?…আমার 'মিথ্যে' আমার 'সামান্যে বাড়াবাড়ি'—আমার আদিখ্যাতা আমার থাক্—কে তোদের—আঃ—বাবাগো…"

চেঁচামেচিতে খোকা জাগিয়া উঠিল এবং কাঁদুনির সঙ্গে সঙ্গে বাপের বিছানাটি ভিজাইয়া দিয়া হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জাগিবার পূর্ব্ব-সূচনাস্বরূপ পাশ ফিরিয়া ক্রন্দনের ভঙ্গিতে একবার মুখটা কুঁচকাইয়া সে ঝোঁকটা কাটাইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

অনুকূল বেচারী নির্ব্বাক্ আতঙ্কে সবটা দেখিয়া শুনিয়া খানিকটা সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। অবস্থাটা এতই অপ্রত্যাশিত, তাহার মনে হইল যেন হঠাৎ নূতন কোথায় একা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মাথার মগজ আল্‌গা হইয়া যেন খুলীর মধ্যে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া বলিল—"যাই তবে; দেখিগে…বলছিলাম—একটু ওডিকোলন্ লাগালে ভাল হ'ত।"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অনুকূল সেইখানেই একটু দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর প্রয়োজনমত সাহস সঞ্চয় করিয়া আবার কহিল—"বলছিলাম ওডিকলোন্‌টা না হয় বের ক'রে…"

মালতী কনুইয়ে ভর দিয়া খানিকটা উঠিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"ওগো—না—না—না—না…"

অনুকূল আস্তে আস্তে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। —সেই প্রশস্ত গঙ্গা—অগাধ জ্যোৎস্না—আর মুক্ত বাতাস, —ওদের আত্মশক্তি যেন কূল ছাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ওদের এই দু'হাতে-বিলান-শিক্ষা সে কি কিছুতেই গ্রহণ করিবে না?

মেয়ে সবিতা ধীরে ধীরে আসিয়া গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"খোকা বড্ড কাঁদচে বাবা, দুধ গরম ক'রে দোব?"

অনুকূল মেয়ের মাথাটি সস্নেহে উরুতে চাপিয়া বলিল—"কেন, বাবা পারে না বুঝি?…তুমি বরং ওকে একটু চুপ করাও গিয়ে।"

কোঁচাটা তুলিয়া কোমরে গুঁজিয়া সপৌরুষে কাজে লাগিয়া গেল।—

উঁচু-করিয়া-টাঙান শিকেয় দুধের কড়া তোলা ছিল।

সকলেই স্বীকার করিবেন বোধ হয় যে গৃহস্থালির মধ্যে শিকে হইতে জিনিষ নামানর চেয়ে শক্ত কাজ আর দ্বিতীয়টি নাই—বিশেষ করিয়া একটু বেঁটে লোকের পক্ষে। প্রথমত, আপনি ধরিতে গেলেন;—আপনার স্পর্শ পাওয়া মাত্রই শিকেটি পাত্রসমেত সামনে একটু আগাইয়া গেল এবং সেখান হইতে একটি গতিবেগ লইয়া আপনার মাথার ওপর দিয়া শাঁ করিয়া গোটা তিন চার দোল্ খাইয়া গেল। আপনি বুদ্ধিমানের মত সড়িয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আরও একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া স্থির করিলেন—'না, পাত্রের তল-দেশ ধরিতে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই, একেবারে শিকের দড়িটা বাগাইয়া ধরিতে হইবে।' এবার তাহাই করিলেন এবং শিকে যেমন পূর্ব্বের মত নিজের ঝোঁকে সামনের দিকে হটিয়া গেল, আপনিও বুদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দু'পা আগাইয়া গেলেন; বুদ্ধি করিয়া দড়িটা আর ছাড়িলেন না। কিন্তু ছাড়িলেই যেন আসল বুদ্ধিমানের কাজ হইত, শুধু দড়ি নয়,—দড়ি, পাত্র, এমন কি সে-ঘরটা পর্য্যন্ত, সেটা টের পাইলেন পরে, যখন পাত্রস্থ তরল পদার্থের খানিকটা আপ-নার মাথার ব্রহ্মতলে পড়িয়া, বুকে পিঠে গোটাকতক তীব্র স্রোতের সৃষ্টি করিয়া নীচে নামিয়া গেল

আপনি যতক্ষণে আপনার সেই মাথার টিকি হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত মুছিয়া পরিষ্কার হইবেন ততক্ষণ নিজের অভিরুচিমত দোল্ খাওয়া রোধ করিয়া শিকাটি স্বস্থানে সুস্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উঠিয়া ঘার উঁচু করিয়া দেখি-লেন পাত্রটী ঈষৎ নমিত মুখে আপনার দুরবস্থার দিকে চাহিয়া আছে—আপনার বোধ হইল যেন একটু মিটি মিটি হাসির ভাবও আছে তাহাতে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকূল দুধ-মোছা গামছাটা মেয়ের হাতে দিয়া খুব সন্তর্পণে কড়াটিকে সিধা করিয়া বসাইল। মেয়ের নিকট লজ্জাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—"একে-বারে ছাপাছাপি দুধ ছিল।"

মেয়েও বাপকে সপ্রতিভ করিবার জন্য উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ—ই—তো; ওথলান দুধ ছিল বাবা; —যেই উথ্‌লে উঠেছে আর মা কড়া নামিয়ে সেই ওথলান দুধ জন্য—"

—বিছানা হইতে একটা কি-রকম শব্দ হইল; অনুকূলের মনে হইল যেন চাপা হাসির, কিন্তু পরক্ষণেই বেশ স্পষ্ট শুনিল—না কষ্টের "উঃ"—"আঃ" শব্দ।

কন্যাকে বলিল—"খোকাকে একটু হাওয়ায় নিয়ে যা দিকিন, ডেঁপোমি ক'রতে হবে না…"

নামাইবার সময় খুব সাবধান হইয়াছিল; এবার আর দুধ মাথায় পড়িল না; পড়িল নাকের উপর—অল্প একটু, দেখিবারও কেহ সামনে ছিল না।…সেটা আর গোঁফের সবটুকু তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিল।

উনানে আগুন আর সামান্যই আছে; সেই একেবারে পেটের মধ্যে; ওপরটা নিভিয়া গিয়াছে। অনুকূল হাতটা দেখিল—দুধটা গরম হইয়া যাইতে পারে;—যদি একটা বুদ্ধি করা যায়…

অনুকূল একটা চিমটা লইয়া উপরের নিভুন কয়লাগুলি এক একটী করিয়া অতি ধীরে ধীরে বাহিরে ফেলিতে লাগিল। এ আর এক বিপদ;—এত নিভুন কয়লা যে উনানের মধ্যে ছিল আগে তাহা জানা যায় নাই। যখন প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে, অনুকূল লক্ষ্য করিয়া দেখিল—একটী কয়লা তুলিলেই তাহার নীচেরটি মলিন হইয়া যাইতেছে।…তখন নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া এক একখানি করিয়া তপ্ত কয়লাগুলি উনানে আবার তুলিয়া রাখিতে লাগিল।

কয়েকখানি রাখিবার পর 'হু—স' করিয়া একটা শব্দের সঙ্গে সমস্ত উনানের কয়লাগুলি নামিয়া গিয়া খানিকটা আলগা ছাই সজোরে বাহির হইয়া আসিল।

সবিতা আসিয়া বলিল…"বাবা, খোকা যে কোন মতেই…"

অনুকূল ধমক দিয়া বলিল—"আঃ, যা না একটু বাইরে, সবাই এক সঙ্গে ভীড় ক'রে দাঁড়া'লে…দেশালাইটা কোথায়?"

দেশলাই-খোঁজা পর্ব্ব শেষ হইলে কাগজ পোড়াইয়া এবং ঘরময় ছড়াইয়া যখন দুধ জাল সারা হইল তখন জাপানী ঘড়ি-টার মতে একটা। সবি বেচারী ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ি-য়াছে। অনুকূল বাটিতে দুধ ঢালিয়া জুড়াইয়া খোকাকে বিছানা হইতে তুলিয়া আনিতে গেল, নিজের কৃতকার্য্যতার

মনটা একটু প্রসন্ন হইয়াছে; "এস, বাবা এস"—বলিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইল।···খোকা কোলে উঠিয়া, মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া পিতাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর হঠাৎ এমন ডুকরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল যে একসঙ্গে সবিতা ও তাহার মা ধড়মড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। সবিতা ভীত, অসহায় ভাবে বলিয়া উঠিল—"বাবা, ও বাবা, তুমি অমন হ'লে কেন?—আমার ভয় ক'রচে- বাবা ও বাবা গো!···"

তাহার মা স্বামীকে কিছু না বলিয়া মেয়েকে ধমকাইয়া বলিল—"ভয় ক'রচে; কেন একটা আরশি এনে দিতে পার না ততক্ষণ? দেখে আক্কেল হয়···এই ঠিক দুপুর রাত্তিরে···না, পোড়া সংসারে মলেও সোয়াস্তি নেই···"

—আবার কপাল টিপিয়া শুইয়া পড়িল।

খোকার আর মিন্তুর কান্না চলিয়াছে—পর্দ্দার পর পর্দ্দা চড়াইয়া—মাঝে মাঝে বাপের পানে চায় আর বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়ে। আর সবিব সেই ভীত অনুযোগ!

অনুকূল নিজেই আরশিটা লইয়া আলোর কাছে দাঁড়াইল।···ডুকরাইয়া ওঠার আর দোষ কি—উনানের কয়লা ধ্বসিয়া যে ছাইটা উঠিয়াছিল—সমস্ত তাহার মাথায় আর মুখে; যেখানটায় ছাই নাই সেখানটায় আছে কড়ার তলার কালী—সমস্ত মুখটা সাদা কালোর একটা দাবার ছক্ হইয়া উঠিয়াছে ···আরশির মধ্যে কে যেন অন্য একজন অনধিকার প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে!

অনুকূলের মনে হইল আরশি আছড়াইয়া, দুধ টান মারিয়া ফেলিয়া ছেলেমেয়েগুলাকে ঘা' কতক বসাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ে, কিম্বা দেশত্যাগী হয়;—দেশত্যাগী হইবার ইচ্ছাটাই উৎকট হইয়া উঠিল, কারণ তাহাতে মালতীর মুখ আর দেখিতে হয় না···

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া সাবান দিয়া মুখটা ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া লাগিয়া গেল। ইতি মধ্যে মিন্তু, খোকা মায়ের জন্য বায়না ধরিয়াছে, এবং তাহাদের মায়ের মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে।

অনুকূল ছেলে দুটাকে এক একটা করিয়া চড় কষাইয়া আরও কাঁদাইয়া তুলিল এবং সেই অবস্থাতেই দুধ গিলাইয়া বিছানায় ছাড়িয়া দিল।

মেয়েকে ভাত বাড়িয়া খাওয়াইল। প্রথমে ভাবিল নিজে উপবাস করিয়া থাকিবে—ওর রাঁধা আর নয়, এবার থেকে একেবারে স্বপাক।···তাহার পর আবার পৃথিবীর কাহাকেও গ্রাহ্য না করায় স্থির করিল—বরং অন্যদিনের চেয়ে বেশী করিয়া খাইবে। কার্য্যতঃ দুইটা দিকই বজায় রহিল—অনেক ভাত লইয়া বসিলও আবার তরকারির অবস্থা দেখিয়া দুইতিন গ্রাসের পর উঠিয়াও পড়িল।

জাপানী ঘড়ির দুইটার সময় যখন মশারি তুলিয়া বিছানায় প্রবেশ করিল তখন মাত্র মেয়েটি জাগিয়া আছে। বিছানায় খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে,—বাপকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সবিতা একটু ভীত ভাবে বলিল—"কেমন চমৎকার জোচ্ছনা বাবা···"

বাবা বলিল—"আর বক্তিমে ক'রতে হবে না—সবাই ঘুমুল আর তোমার পোড়া চোখে বুঝি ঘুম নেই?···"

শেষ রাতে অনুকূল স্বপ্ন দেখিতেছিল—গোকুল কুণ্ডু গলার শিরা ফুলাইয়া দেশশুদ্ধ আবালবৃদ্ধবণিতা সবাইকে টাকা কামাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহিত করিতেছে আর এমনই বক্তৃতার জোর যে সব চেয়ে অপারগ যারা সেই শিশুবৃন্দ পর্য্যন্ত যেন একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে...

ঘুমটা ভাঙিয়া গিয়া দেখিল—সে সব কিছু নয়—ওপারের কলে সাড়ে চারিটার ভোঁ বাজিতেছে আর কলের কাছে মিন্তু আর খোকা 'পরিত্রাহি' কান্না জুড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রের অনিয়ম অত্যাচারে তাহার নিজের মাথা ধরিয়াছে। একটু আচ্ছন্ন ভাবে সে পড়িয়া রহিল।···দিনটা কি ভাবে কাটিবে? কাচ্চাবাচ্চা, রেলগাড়ী, আফিস, রান্নাঘর—সমস্তর একটা জগা খিচুড়ী গোছের ছবি তাহার মনটা অভিভূত করিয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া অনুকূল একবার বধূর দিকে চাহিল,—স্বাস্থ্যপূর্ণ প্রগাঢ় নিদ্রার তৃপ্তি মুখখানাতে মাখান!

অনুকূল সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করিয়া লইল। এই তোমার মাথা ধরা?—তবে দেখ প্রকৃত যাহার মাথা ধরিয়াছে সে কি ভাবে কাজ করে···

তবে মালতীর জাগ্রত দৃষ্টির সামনে তাহার পৌরুষটা দেখান চাই। ছেলে দুটাকে খুব জোরে ধমক দিয়া চেঁচাইয়া

উঠিল—"কেন রাত থেকে—'ম্যা—ম্যা' করে চেল্লাতে সুরু করেচিস্?—আর কেউ নেই ?"

বিছানা হইতে নামিয়া, মশারি গুটাইয়া মিন্তুর হাতটা ধরিয়া নামাইল। মালতী জাগিয়া উঠিয়াছিল; রাত্রের সেই ক্ষীণ আওয়াজটা টানিয়া আনিয়া বলিল—"সবি, বল গিয়ে নিজেকে সামলাক্; দিনের বেলায় অত মন্দাক্তি খাটবে না; আমি ম'রতে ম'রতে সেরে নিচ্চি।"

"সবি, বল—মন্দর মন্দাক্তি সব সময়ই খাটবে" বলিয়া খোকাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া নীচে নামাইল, তাহার পর সবিতাকে তুলিয়া বলিল—"যা, দুটোকে বাইরে নিয়ে যা।"

মালতী শুইয়া পড়িয়া বলিল—"ভাঙে তো মচকায় না। আচ্ছা—বেশ .."

অনুকূল যতক্ষণে স্নান আহ্নিক সারিয়া উঠিল ততক্ষণ ঝি আসিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীসুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত সে উনান ধরাইয়া রান্নাবান্নার গোছ করিয়া দিল; সে সব-গুলাকে পুরুষসুলভ নিপুণতার সহিত অগোছ করিয়া অনুকূল যখন রন্ধনকার্য্য সমাধা করিল তখন আটটা ছত্রিশ কোন কালে হইয়া গিয়াছে। হরিশ হাঁক দিয়া গেল—"কৈ হে, আছ না গেছ ?" একদফা কাজ শেষ হওয়ায় অনুকূলের মনটা একটু হাল্কা ছিল; ইয়ার্কি করিয়া বলিল—"এই খাবি খাচ্চি, দেবি নেই; তুমি এগোও।"

ঝিকে বলিল—উঃ, ন'টা পনেরর হরিশ মিত্তির বেরিয়ে গেল, শিগ্‌গির ঠাঁই ক'রে দাও। আমি চট্ করে' জামা কাপড় প'রে নি ততক্ষণ। আজ দিন বুঝে ধোপা বেটাও কাপড় দিয়ে গেল, এখনও মেলান হয় নি।"

কাপড় পরিয়া ফতুয়া গায়ে তুলিয়াছে, ঝি আসিয়া বলিল—"ঠাঁই হ'য়ে গেছে।"

তাড়াতাড়ি ফতুয়ার হাত দু'টা গলাইতে গলাইতে অনুকূল বকিতে বকিতে ছুটিল—"ইস্, এত কড়া ক'রে ফেলেচে; যত বলি কড়া ইস্তিরি করিস্ নি..."

বোতাম দেওয়ার পূর্ব্বেই ভাত বাড়িতে বসিয়া গেল। ঝি হঠাৎ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট খানেক পরেই পাশের ঘরে যেন চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। মালতী কন্যাকে ডাকিয়া বলিল—"সবি, ব'লে দে—যদি ব্লাউজ্ প'রে রান্নাবান্না করবার সখ হ'য়ে থাকে তো একটা তোয়ের ক'রিয়ে নিতে; আমারটা ছেড়ে দিক্ এক্ষুনি; আর ওটা আমার শাড়ী; পরে একটু ফিঁকে হ'য়ে গেছে বলে ধুতি হয়ে যায়নি যে প'রে ব'সে আছে..."

অনুকূল খাইতে সুরু করিয়া দিয়াছিল; ঘাড় নীচু করিয়া দেখিল—তাহার মেটে রঙের ফতুয়া গায়ে দেয় নাই, এটা মালতীর গোলাপী রঙের ব্লাউজ্‌টাই—আর এ নরুণ পাড়ের ধুতি কোথায়!...মেয়ে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই দু'চার গ্রাস নাকে মুখে পুরিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

—ঐটুকুর মধ্যেই ঘামিয়া ওঠায় ব্লাউজের পাতলা কাপড় গায়ে শাঁটিয়া গিয়াছে, তাহার উপর সেই রকম আঁট; খুলিতে প্রায় পাঁচ মিনিট গেল।

ন'টা পনেরর গাড়ী ধরিতেই হইবে, কারণ তাহার পরেই ন'টা পঞ্চান্ন; সেটা আবার থ্রু প্যাসেঞ্জার, আধঘণ্টাই লেট্ থাকে, আবার লিলুয়াতে প্রায় পনের মিনিট দাঁড়ায়।

কোন রকমে জুতাটা পায়ে দিয়া আর কামিজ ও চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া অনুকূল এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

—অর্দ্ধেক রাস্তা হইতে আবার ছুটিয়াই ফিরিল—প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে;—মান্থ্‌লি টিকিটটা ধোপের জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই।...ষ্টেশনে যখন পঁহুছিল তখন গার্ডের গাড়ীর পেছনের লালটা দূরে দেখা যাইতেছে—বিদ্রূপের হাসির মত।

অনুকূল হতাশভাবে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। মনটা একবার আফিস হইতে ঘুরিয়া আসিল,—সেখানে বড় বাবুর খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলা সজারুর কাঁটার মত সিধা হইয়া উঠিয়াছে!

"যাক্, আর উপায় কি!"—বলিয়া অনুকূল চাদরটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া কামিজটা চড়াইয়া লইল।

ওপারের প্ল্যাটফরমে বেঞ্চের সমস্তটা দখল করিয়া একটা কাবুলী লম্বা চওড়া হইয়া শুইয়া নিদ্রা দিতেছিল। তাহার নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় এইরূপ দূরে থাকিয়া এক জন লোক হাত পা নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া তাহার এই অন্যায়ের আলোচনা করিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া

অনুকূল অন্যমনস্ক ভাবে কামিজের বোতাম দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল…

যখন কোন মতেই আর বোতাম লাগেনা তখন অনুকূলের নজর কাবুলীঘটিত ব্যাপার হইতে কামিজের দিকে ফিরিয়া আসিল।—দেখিল কামিজে বোতাম নাই বলিয়া লাগিতেছে না। কড়া-ইস্ত্রি দেওয়া কামিজটা মুক্তির আনন্দে যেন হাত পা ছড়াইয়া দিয়াছে!

রাগটা বউয়ের উপর হইল কি নিজের উপর হইল, —কি গোকুল কুণ্ডুর উপর হইল ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না।…এভাবে তো যাওয়া যায় না; আবার বাড়ীতে ছোটা ভিন্ন উপায় নাই।…উঠিতেই দূরে ডাউন লাইনের পাখাটা ঘাড় হেঁট করিল। একটা হিন্দুস্থানী কুলী বলিল "পাগলা গাড়ী হ্যায়, কভি এক ঘণ্টা লেট আতা হ্যায়, দশমিনিট পহিলেহি আ গিয়া…"

৫

দশটায় সময় আফিস। বারোটা বাজিতে যখন পঁচিশ মিনিট বাকী অনকুল অপরাধীর মত সঙ্কুচিত ভাবে নিজের টেবিলে আসিয়া বসিল। বড় বাবুর পিয়ন পরম শ্রদ্ধার সহিত একটি সেলাম ঠুকিয়া একটি স্লিপ দিল। বড় বাবুর তলব।

অনুকূল গিয়া যখন কামরায় দাঁড়াইল, বড় বাবু অত্যন্ত মনোযোগর সহিত তখন একটা গার্ডেন-পার্টির নিমন্ত্রণ-কার্ড দেখিতেছিলেন। অনুকূলের দিকে না চাহিয়াই বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন—"দিন, সইগুলো সেরে দি… আজ আবার এই গার্ডেন-পার্টির হাঙ্গাম আছে, ভালও লাগে না।"

অনুকূল একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল—"টোটাল গুলো একটু বাকী আছে, এক্ষুনি সেরে নিয়ে আসচি।"

বড়বাবু আশ্চর্য্য হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন— "এই দু'ঘণ্টার মধ্যে টোটাল করা হ'ল না!"

রাগে, অপমানে কথা বাহির হইতে চাহে না; অনেক কষ্টে অনুকূল কহিল—"আজ্ঞে, আজ একটু দেরী…"

"দু'চার মিনিট দেরী তো সবারই হ'তে পারে অনুকূল বাবু; আমারই আজ সা—ত মিনিট দেরি হ'য়ে গেল; কিন্তু তা'তে কি কাজ আটকায়?" অনুকূল কথাটাকে যেন ধাক্কা দিয়া গলা হইতে বাহির করিল—"আজ্ঞে, একটু বেশী দেরি হ'য়ে গেছে আজ,—এই আসচি।"

"'এই আসচি'!—এখন যে বারটা অনুকূল বাবু! না, আপনি ঠাট্টা ক'রচেন ভাল লোক পেয়ে।"

অনকূল মাথা নীচু করিয়া রহিল।

বড় বাবু তখন ধীর কণ্ঠে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট করিয়া কহিলেন—"সাহেব আমায় এসে পর্য্যন্ত তিনবার তাগাদা করেচে অনুকূল বাবু। একটু খাতির করে; অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা ক'রে রেখেচি।…কি জানেন?—আমাদের বিয়ে করা —ওর নাম কি, ইয়ে তো নয়—কাজ চায়।…এই আজই কবার বললে—'না বাবু, ও ফার্ষ্ট ক্লাস এম, এ-র কর্ম্ম নয়— বোধ হয় তোমার আমার মত মুখ্যুদের সম্বন্ধে শেক্‌সপিয়ার কি লিখে গেছে সেই নিয়ে রিসার্চ ক'রতে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।…তা'র চেয়ে বরং তুমি তোমার সেই ব্রাদার-ইন-ল'টিকে নিয়ে নাও…জেদাজেদি—আমি বললাম—আচ্ছা, দেখি আর একবার বুঝিয়ে সুজিয়ে।"

অনুকূলের একবার মনে হইল বলে—"ফার্ষ্ট ক্লাস এম. এ-র বদলে যদি আপনাদের ফার্ষ্ট ক্লাস রোগ (rogue) এর দরকার হয় তো তাই রাখুন"; কিন্তু রাত্রের জ্যোৎস্নার প্রক্রিয়াটা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল;—বড় বাবুকে হইলে না হয় এই রোখের মাথায় দু'একটা কথা বলা যাইত; কিন্তু বড় বাবুর শালাকে লইয়া বিদ্রূপ করিবার সাহস হইল না। তাহা ভিন্ন সে কয়দিন ধরিয়া আফিসে ঘুল-ঘুল করিতেছে, কাহার চেয়ারের উপর এই শ্যালকবপুখানির শুভাধিষ্ঠান হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল।

আস্তে আস্তে চলিয়া আসিতেছিল; দুয়ার পর্য্যন্ত আসিলে বড়বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, আর এক কথা; আমি আজকে পুরো আফিস ক'রতে পারব না, দেখচেনই তো— এক ফ্যাসাদ এসে জুটেচে। আমার এই কাজগুলো আপনাদের মধ্যেই চরিয়ে নিয়ে শেষ ক'রতে হবে; কাল আবার মেল ডে। ভেবেছিলাম আমার ব্রাদার-ইন্-ল'কে দিয়ে খাটিয়ে নোব—সে যেরকম ইনটেলিজেণ্ট—তায় এ

ঘণ্টাখানেকের ওয়াদ্দা; কিন্তু তা'তে আবার কারুর কারুর অভিমান হয়। —সেদিন শুনলেন তো নরেশ বাবুর কথা ?— 'আমরা কি ম'রে গেছি বড়বাবু যে ঐ দুধের ছেলেকে নাহ'ক কলম পিসিয়ে মারচেন ?"...

আফিস্ হইতে যতটা দেরি হইয়া গিয়াছিল, ফিরিতে তাহার অনুপাতে আরও দেরি হইয়া গেল। ষ্টেসনে যখন নামিল তখন রাত আটটা। সেই চাঁদটা অনেকখানি উঠিয়াছে—দেখিলে পিত্ত জ্বলিয়া যায়—কি আবার নূতন ফ্যাসাদ বাধাইবে...

বাড়ী ঢুকিবার পূর্ব্বেই সবিতা আসিয়া আনন্দে অধীর হইয়া জড়াইয়া ধরিয়া খবর দিল—"বাবা, বাবা, কেমন দিদিমা এসেচেন! আহা, অন্যের ঘাড়ে হাত দিয়ে চল্‌তে হয়, তবুও তো মেয়ে বাবা?—অসুখ শুনে কি থাকতে পারেন?—আমি যেমন মা'র মেয়ে মাও তো তেমনি..."

প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া অনুকূল হতাশভাবে বলিল— "দিদিমা! কখন এলেন তোর দিদিমা? তিনি তো আবার রাত্রিতে দেখতেও পান না আজকাল...আর একেবারে বদ্ধ কালা যে!..."

"না বাবা, আহা, তবুও তো পেটের মেয়ে? বলছিলেন 'ঝি গিয়ে যখন বললে—মালতী কাল থেকে উঠতে পাচ্চে না—আর বুঝি এ যাত্রা···"

"ঝি! আঃ, দেখ দিকিন নষ্টামি!—কে তা'কে গিয়ে সেখানে খবর দিতে বললে?...কালই তাকে..."

"মা বুদ্ধি করে ব'লেছিলেন বাবা। দিদিমাকে বলছিলেন 'যখন দেখলাম বড্ডই বাড়াবাড়ি হ'চ্চে—ঝিকে বললাম মাকে একটু খবর দে; আর দেখতে পাব কি না'···"

অনুকূল হাঁকিল—"ঝি!"

সবিতা বলিল—"ঝি তো নেই, মা বললেন—'ঝি, তুই এই টানা-পোড়েন ক'রতে বড় হাক্লান্ত হ'য়ে গেচিস, বাড়ী যা' জলটল তুলে রেখে। সে এসে একটা দিন চালিয়ে নেবে'খন—সাজোয়ান পুরুষ মানুষ···কাল আবার তোকে বস্তিবাটি ছুটতে হবে'···"

"বস্তিবাটি!"—অনুকূল আতঙ্কে একরকম চীৎকার করিয়া উঠিল। সেখানে তাহার পিস্‌শাশুড়ী আর শ্বশুর থাকে। ঘরদুয়ার বেচিয়া বৃদ্ধবয়সে বৈদ্যবাটিতে আসিয়া গঙ্গাবাসী হইয়াছে। প্রবল শুচিবেয়ে দম্পতি। একবার আসিয়াছিল,—আড়াই মাস ধরিয়া প্রতিদিন তৈজসপত্র হইতে ধোবার বাড়ীর কাপড় জামা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষ বর্ষার গঙ্গাজলে ধোওয়া হইত। যাইবার সময় ভাইঝিকে সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিল...তোদের কেরেস্তানি কাণ্ডর মধ্যে দু'দিনও থাকতে পারলাম না, মা, তা দুঃখু করিস্ নি। গঙ্গার কাছে পিঠে একটা বাসা নে; যদ্দিন বলিস থাকবো'খন .."

সে সব কথা ভুলিয়া আবার গঙ্গার কাছেই বাসা লওয়া হইয়াছে।

অনুকূল ঘরে প্রবেশ করিয়া জুতা জোড়াটা টান মারিয়া এককোণে ফেলিয়া দিল, কামিজটা তাহার উল্টা দিকে জ্বলন্ত প্রদীপের উপর পড়িয়া সেটাকে নিভাইয়া দিল; সে নিজে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ততোধিক অন্ধকার মন লইয়া, বিছানার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। সবিকে হাঁকিয়া বলিল—"দেখ সবি, তোরা যা ইচ্ছে তাই কর, আমি আর তোদের সংসারের মধ্যে নেই; কিন্তু আমায় যদি কেউ জাগাবি তো হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দোব—আমি ম'রে, প'চে, গ'লে থাকি, কারুর দেখবার দরকার নেই—তোদের সংসারে তোরা যা ইচ্ছে তাই করগে—।"

—তাহার পর বৈদ্যবাটির কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় 'যা'ইচ্ছা' করার একটা একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দরকারি ভাবিয়া বলিল—"কিন্তু যদি ঝি কাল বদ্যিবাটি যায় তো আমি দেশত্যাগী হব—এই ব'লে রাখলাম।"

*   *   *   *

বাড়ীর সময়টা জাপানী ঘড়িটার চার্জ্জে, সুতরাং রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক বলা যায় না; তবে চারিদিকে অনেকটা নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

অনুকূলের ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যাইতে তাহার কপাল হইতে একটি কোমল হাত সরিয়া গেল। পাশে চাহিয়া একটু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু অভিমানেই হউক আর যে জন্যই হউক্ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাঁকিল—"সবি, উনুন জ্বালায় জোগাড় ক'রে রেখেচিস্?"

সেই নরম হস্তটি আবার কপালে আসিয়া সঞ্চালিত হইতে লাগিল এবং নরম গলায় মিষ্ট অনুরোধ হইল—"খাবার তৈরি আছে, ওঠ, খাবে চল।"

"না, আমার হাত পা' আছে"—বলিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত অনুকূল উদ্যোগী হইয়া উঠিয়া বসিল।

একটু চুপচাপ; তাহার পর সেই নরম গলায় বেশ কড়া হুকুম হইল—"আমার রান্নাঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অধিকার নেই।"

অনুকূল উঠিতে যাইতেছিল, আবার বসিয়া পড়িয়া বক্তুর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল; নিজের কানদুটাকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। ভ্রূজোড়া কপালে তুলিয়া বলিল—"তোমার রান্নাঘর!…বিনা অনুমতি!…আর আমি…আচ্ছা বেশ, কাঁচা চাল তো আছে?…"

আবার ঠেলিয়া উঠিল। রান্নাঘরের মালিক আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারের সীমাটা বাড়াইয়া হুকুম করিল—"আমার ভাঁড়ার ঘর থেকে চাল নেবারও কারুর অধিকার নেই।"

অনুকূলের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; স্ত্রীরও বৃথা বাক্যব্যয় করা দরকার ছিল না। দু'জনে দু'খানি যেন নীরব প্রশ্ন আর নীরব উত্তরের মূর্ত্তি ধরিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনুকূল ব্যাপার বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; হাল ছাড়িয়া বলিল—"বেশ, উপোস ক'রে মরব, সে অধিকার তো আছে?"—বলিয়া শুইয়া পড়িতে যাইতেছিল, তাহাতেও বাধা দিয়া বধূ বলিল—"আমার বাড়ীতে সেটা আরও হ'তে পারে না—অকল্যাণ হবে—একে তো মাথায় ব্যথা ধরেই আছে—অকল্যাণে, অকল্যাণে…"

—হাসি সামলাইতে পারিল না। স্বামীরও ঠোঁটে সে হাসির একটু ছোঁয়াচ লাগিল। দু'জনের হাসির এই শুভ্রপতাকায় যে শান্তির সূচনাটুকু পাওয়া গেল সেটাকে প্রত্যাখ্যান করিবার প্রবৃত্তি কিম্বা উৎসাহ অনুকূলের আর ছিলই না; তাই তাহার সেই যে মহাদম্ভের কাল্পনিক উচ্চপদ—যাহা আসলে রাধুনীর পদেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেটাতে ইস্তফা দিয়া অনুকূল চব্বিশ ঘণ্টা আগেকার পুরাতন, বাধ্য কেরাণী-স্বামীটির মত উঠিয়া বসিল।

আহারে বসিয়া বলিল—"সামনের দোরটা বন্ধ ক'রে দাও তো, চাঁদটা চোখে ঠিকরে পড়চে।"

"মিচে নয়, যেন ড্যাবড্যাব ক'রচে বাপু; এর চেয়ে যখন একটা ফালির মত থাকে সেই ভাল"—বলিয়া স্ত্রী তাহাদের পুনর্মিলনের আসর হইতে যত ফ্যাসাদের গোড়া সেই পূর্ণচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়া পাখা হাতে করিয়া স্বামীকে আহার করাইতে বসিয়া গেল…

মুক্ত প্রেম

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

মসৃণ স্তব-গুঞ্জন তোমা
আমি কভু শোনাবো না ঃ
'কৃষ্ণকেশের উষ্ণ তিমিরে
লক্ষ আলোক বোনা।'
কহিবো না, 'তব লঘু নিঃশ্বাসে
বাসন্তী সৌরভ,
সূর্য্যের মত উজ্জ্বল তব
সৃষ্টির উৎসব।'
—বন্ধুর পথে দৃপ্ত নিশান
মুক্ত কেশের রাশি ;
যা-ই হও আর না-ই হও, প্রিয়ে,
আমি তোমা ভালোবাসি।

দুর্ব্বল মোহে বঞ্চনা-লোভে
মোরা চোখ ঠারিবো না,
দীপ্ত চোখের স্বচ্ছ আলোকে
আমাদের জানাশোনা।
নিত্য-যত্নে ভঙ্গুর প্রেম
করিবো না সঞ্চয়,
আমাদের প্রেমে খর-বন্যার
অজস্র প্রশ্রয়।
—মৃত্যুর মুখে মুক্ত কৃপাণ
তোমার উচ্চ হাসি ;
যা-ই হও আর না-ই হও, প্রিয়ে,
তোমারেই ভালোবাসি।

দুঃখের থেকে আশ্রয় মোরা
দেবো না পরস্পরে,
আমরা বহিবো দুর্জ্জয় প্রাণ
নির্ভয় নির্ভরে।
আর্ত্ত প্রেমের মত্ততা দিয়ে
শৃঙ্খল রচিবো না,
পূর্ণ জীবনে অগণ্য পথে
আমাদের আনাগোনা।
—মুদ্রিত চোখে স্বপ্ন-স্বর্গে
আমরা অবিশ্বাসী ;
যা-ই হও আর না-ই হও, প্রিয়ে,
আমি তোমা ভালোবাসি।

সায়ং শান্তি

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

প্রামাণিক শব্দটা রূপে ও সুরে অমধুর বলিয়া নীহার রঞ্জনের স্বীয় নাম সম্বন্ধে অত্যন্ত লজ্জা আছে। ঐ শব্দটার সঙ্গীত নাই; উহা দেখিতে শ্রীহীন—একটা পিণ্ডের মতন। কবিত্ববিহীন এবং লজ্জার বিষয় হইলেও বর্জ্জন করিবার জিনিষ নহে বলিয়াই উট যেমন কুঁজ বহন করে, তেমনি নীহারের সঙ্গে প্রামাণিককে সে প্রতি মুহূর্ত্ত বহন করিতেছে।

নীহার শব্দটার উপর প্রামাণিক শব্দটার সুষ্ঠু প্রতিক্রিয়া আদৌ হয় নাই—বরং প্রামাণিক নীহারকে যেন অভব্য করিয়া রাখিয়াছে। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রভৃতি সংযোজিত শব্দ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সমঝঙ্কারের মিলন মাধুর্য্যবশতঃই, আরাম দেয় বলিয়া; কিন্তু নীহার আর প্রামাণিক গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আরামপ্রদ মিলিত ছন্দের সৃষ্টি ত' করেই নাই, তাহারা একই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করে না…শঙ্খ এবং ঘণ্টার মত দুইটি পরস্পরবিরোধী যন্ত্র যেন দুইদিকে মুখ করিয়া বাজিতেছে।

কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে নীহার লাল হইয়া ওঠে, আর শেষ শব্দটা জড়াইয়া অস্পষ্ট করিয়া বলে।

যৌবনে ভাবুক হইতে হইবে ইহার যেমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, তেমনি যৌবনাবির্ভাবে বদ্ অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হইবে ইহারও কোনো হেতু নাই।

যৌবন আসিয়াছে বলিয়া নয়, অমনিই একটা অভ্যাস নীহারের আছে—রাস্তার কাগজ কুড়াইয়া পড়া; আস্ত কাগজ নয়, পোষ্টকার্ড নয়, সন্দেহজনক ছেঁড়া কাগজ। এই অভ্যাসটা যে কু তাহা নীহার না জানে এমন নয়—নতুবা সে তাহা লুকাইবে কেন? মানুষকে লুকাইয়া সে ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া পড়ে—পড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

মামলার আর্জ্জির ছেঁড়া টুক্‌রা, বাজার-ফর্দ্দের খানিকটা, ছেলেদের ক্লাস্ এক্সারসাইজের খাতার কিয়দংশ, লোকের প্রেমের আর ভিতরের খবরের খোঁজে এই সব কুড়াইতে কুড়াইতে একদিন দাড়ি-মাখান সাবানের ফেণা তার সাবা আঙুলে মাখামাখি হইয়া গেল। হাত ধুইয়া ফেলিয়া সেইদিনই এই অভ্যাস তার ত্যাগ করা উচিত ছিল—

কিন্তু "গোলাপে কণ্টক আছে, প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, চন্দ্রমার কলঙ্ক আছে", কাগজে সাবান আর কুচি দাড়ি থাকিবে না কেন! তাই বলিয়া কি মনকে ফিরান যায়!

খুঁজিতে খুঁজিতে ক্ষ্যাপার একদিন পরশ-পাথর লাভ হইল।

ঘটনার দিন সূর্য্য অস্তোন্মুখ হইতেই নীহার বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের বর্ণশোভা সন্দর্শন জন্য সে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব দিকে এবং অপরাহ্ণে পশ্চিমাভিমুখে যায়—

সেদিনও যাইতেছিল…

সূর্য্যাস্ত বড় মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে; বর্ণপ্লাবন এত প্রচুর আর এত প্রবল যে তাহা পশ্চিমাকাশ ভাসাইয়া, মধ্য-গগন ছাপাইয়া পূর্ব্ব দিগন্ত স্পর্শ করিয়াছে…বর্ণের বিভিন্নতা, গতি, পরিবর্ত্তনশীলতা, ঔজ্জ্বল্য, এবং বিকীরণ দেখিয়া নীহার অবাক্ হইয়া গেল…

সম্মুখের ছাদের আলিসার উপর হইতে এক ঝাঁক কপোত সহসা উড্ডীন হইয়া আকাশপ্লাবী আলোকগঙ্গার বর্ণবারি কয়েক বিন্দু পান করিয়া আসিয়া দলে দলে আবার আলিসার উপর বসিল।

নীহার এক মনে অগ্রসর হইতে লাগিল…

আকাশের আয়তন গৃহারণ্যের অন্তরালে খর্ব্ব হইয়া আসিল…ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া দ্বিচক্রযানারোহী চলিয়া গেল—চক্রোত্থিত ধূলার দরুণ আরামে বাধা পাইয়া নীহার বিরক্ত হইল…

এইদিকে বসতি "ঘিঞ্জি" হইয়া আসিয়াছে—

বেণে বাটির রাস্তা আসিয়া যেখানে বিনয় সান্যালের বাড়ীর দক্ষিণ ধারে আমলা বাটির রাস্তায় পড়িয়াছে সেই মোড়ে পৌঁছিয়া নীহার দেখিল, সম্মুখে কিছু দূরে ত্রিকোণা-

কুতি কিট্ সাদা রঙের একখানি কাগজ রাস্তার পাশে ঘাসের উপর পড়িয়া আছে—হরিতের উপর শ্বেত বস্তুটা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে···আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া নীহার দেখিল, কাগজখানির তিন বাহুর এক বাহু বড় সর্পিল অর্থাৎ টানিয়া ছেঁড়া···লেখা যদি কিছু থাকে তবে যে পিঠ ঘাসের উপর তথায় আছে···নীহারের প্রাণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল···

একটা স্থান হইতে পাশা খেলার জয়নাদ আসিতেছে—নীহার থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সেইদিকে কাণ পাতিয়া রহিল···

লাল কাপড়ে মোড়া একখানা খাতা বগলে করিয়া এ৲টি মুহুরী ক্লাসের লোক যেন হঠাৎ তার সম্মুখে আসিয়া পড়িল—নীহার চম্‌কিয়া চলিতে সুরু করিল—এবং তখনই মুখ ঘুরাইয়া দেখিল, ওদিক্ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিতেছে—তার হাতে একখানা কাস্তে' এবং মাথায় ছোট একটা ঘাসের বোঝা রহিয়াছে···

ইহাকে নীহার গ্রাহ্য করিল না—বুড়া চোখে ভাল দেখে কি না সন্দেহ; দেখিলেও কাগজপত্রের ব্যাপার অত বোঝে সোঝে না।

স্ত্রীলোকটির চোখের সামনেই হেঁট হইয়া নীহার কাগজ তুলিয়া লইল; উল্টাইয়া দেখিল, ছিন্ন পত্রাংশ···'লেটার পেপার' দামী···

লেখা রহিয়াছে " * * * নিও। ইতি।

তোমারই তরে তৃষিতা শান্তি।"

পাঠ করিয়া নীহারের ওষ্ঠদ্বয়ের দক্ষিণ সীমা হিল্লোলিত করিয়া অনিন্দ্যসুন্দর একটু হাসি ফুটিল···ঠায় দাঁড়াইয়া নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া সে হস্তাক্ষর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল···

ইহা যে স্ত্রীহস্তের অক্ষরমালা তাহাতে সন্দেহ নাই—অনেকগুলি রেখার লেখা পাকিয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে···

তারপর তার গবেষণার বিষয় হইল নামটি—

শান্তি—দ্বিঅক্ষরের নামটিতে একখানি কাব্য ঘনীভূত হইয়া আছে···এত বৃহৎ আর এমন অপরূপ সে কাব্য যে তাহার কাহিনীর আর রসের শেষ যেন নাই···কি সে ভাগ্যবান যাহার তরে শান্তি তার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইয়া আকুল চিত্তে বসিয়া আছে, আর সেই একতম ব্যক্তিকেই আহ্বান করিয়া শ্রান্তি নাই!···সম্পদশালিনী—উদ্দেশেই অকাতরে দান করিয়া চলিয়াছে।

তারপর নীহারের চোখে পড়িল, কাগজের গায়ে শান্তি নামটি বেশ মানাইয়াছে; অন্য নাম মানাইত না—সে নাম অপর ভাবরাজ্যে যতই চমৎকার হউক, আর যতই তার প্রতিষ্ঠা থাকুক!

তারপর 'তৃষিতা'···এই তৃষ্ণাটা কিসের তৃষ্ণা? নিজের কোন অসহনীয় তৃষ্ণার দুঃখ জানাইয়া তাহা নিবারণের জন্য সে আহ্বান করিতেছে! কেবল কাছে পাওয়ার তৃষ্ণা!··· যাহাকে জানাইয়াছে সে-ই জানে ···তথাপি তৃষ্ণা শব্দটার আবেদন নীহারকে মুগ্ধ করিল···স্থানমাহাত্ম্যে শব্দার্থের এখন নব নব উন্মেষ ঘটে, নীহার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইল।

বিরহের সঙ্গে বাসন্তী রঙের নিবিড় সম্বন্ধ—তাই নীহারের মনে হইল, তার বাসন্তী বসনাঞ্চলপ্রান্তে চাবি বাঁধা নাই—তাহা স্কন্ধচ্যুত হইয়া শিথিলদেহার ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছে; কবরী উন্মোচিত হইয়া গেছে; চূর্ণ কুন্তলপাশ পবনে দোদুল ছন্দে পৃষ্ঠে লুটাইতেছে··· লুটাইতে লুটাইতে এক সময় আকাশের দিকে সমুচ্চ হইয়া চলমান জলদ দলকে সম্ভাষণ করিতেছে···পীতাভ কেশাগ্র যেন তাহার লালায়িত প্রাণের অগ্নিনিভ শিখা—

নীহারের মনে পড়িল না যে, এটা কার্ত্তিক মাস; মেঘোদয় যদি হয় তবে সেই মাঘের শেষে।

'যাহা হউক, স্বপ্ন স্বপ্নই—

নীহার দেখিতে লাগিল, বিরহ-সন্তপ্তার নয়নকোণসঞ্চারী অশ্রুবিন্দুতে একদিকে নীলিমার ছায়া অপর দিকে লক্ষ-বিলম্বিত স্বর্ণহারের আভা পড়িয়া মেঘ বিদ্যুতের স্থির সম্মিলন ঘটিয়াছে।

তারপর বিবেচ্য ঐ 'নিও' কথাটা—

কি বস্তু সে পত্রযোগে দান করিয়াছে, যে দান প্রত্যাখ্যাত হইবে বলিয়া কিছু মাত্র শঙ্কা নাই! ভালবাসা না চুম্বন? স্বর্ণমুদ্রার বুকে রাজার মুখচ্ছবির মত ঐ কথাটাই যেন লিপিভাষণকে বহুমূল্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছে···

নীহার পত্রখানা পকেটে রাখিল এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন কি একটা সংশয় ভঞ্জন করিয়া লইল···

একেবারে সমাপ্তিতে সে ভালবাসা দেয় নাই, চুম্বনই দিয়াছে—বিদায়-চুম্বন···একটি নহে দুটি নহে—আরও। সে লিখিয়াছে হয় তো একবারই, কিন্তু প্রাণের ভাষা অক্ষরে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরেও তার অন্তরলোকে যে অশরীরী আদানপ্রদানের স্রোত চলিয়াছিল তাহা অশেষ··· তাহার একটি মাত্র সরসীর বুকে উৎপলের মত উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে—চোখে পড়িতেছে···

শান্তির নয়নপল্লবে যে ছায়া আর দৃষ্টিতে যে আবেশ ঘনাইয়াছিল—সুখহিল্লোল আর কৌতুক চপলতাসহ যে লিপ্সা শান্তির প্রাণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অনুভব করিয়া নীহার তদ্রূপযুক্ত একটি উত্তপ্ত ও আর্ত্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল···

—কি হে, কি ভাবতে ভাবতে চলেছ অজ্ঞান হয়ে?

পার্থিব প্রশ্নে নীহার চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল! চোখ তুলিয়া দেখিল, একজন না, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু পাঁচ সাত জন কালীতলার উঠানে বসিয়া আছে; সে ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা ছাড়িয়া একবারে বেড়ার ধারে আসিয়া পড়িয়াছে··· কখন দাঁড়াইয়াছিল, এবং তারপর কখন চলিতে সুরু করিয়াছিল তাহা মনে করিতে না পারিয়া নীহার হতবুদ্ধি হইয়া গেল—দু'পা পিছাইয়া আসিল···

দলের ভিতর হইতে প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল,—চলেছ কোথায় হে কবি?

—বেড়াতে বেরিয়েছি।

—এস, বস'

নীহার যাইয়া বসিল···

উহাদের যে গল্প চলিতেছিল তাহাই চলিতে লাগিল; সত্যব্রত বলিতে লাগিল,—সেই ভোরেই পঙ্কজ বাবু প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেলেন, দেখলেন, সন্ন্যাসী হনহনিয়ে আসছেন; পাশ বালিশের ওয়াড়ের মত লম্বা একটা গেরুয়া রঙের ঝোলা তাঁর কাঁধে ফেলা—মাঝখানটা কাঁধের ওপর দুই মুড়ো জিনিষের ভারে ঝুলে' পড়েছে···

পঙ্কজবাবু প্রণাম করলেন; সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করলেন, কিন্তু বিশেষ বিলম্ব করলেন না···

মিনিট দুতিন পরেই দেখা গেল, রূপপুর কুঠির মেজ' বাবু দারোয়ান নিয়ে ছুটে' আসছেন···ব্যাপার কি। অত ভোরেই? কিন্তু মেজ'বাবুর তখন দাঁড়াবার সময় নেই—তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করলেন, একটা সন্ন্যাসীকে এদিকে যেতে দেখেছেন?

পঙ্কজবাবু 'হুঁ' বল্‌তে না বল্‌তে মেজ'বাবু ততক্ষণে দশ-গজ এগিয়ে গেছেন···

তারপর শোনা গেল, ধনবতী শিখার সিন্দুক খুলে সন্ন্যাসী ঠাকুর—

নীহার জিজ্ঞাসা করিল,—শান্তি কার নাম হে?

প্রভাস বলিল,—বোর্ডের কেরাণী নবীন বাবুর ভাগনে—টাউন ক্লাবের সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

ভূপেন বলিল,—যাক্ তারপর সন্ন্যাসীর কি হ'ল?

সত্যব্রত বলিল,—খানাতল্লাসী হ'য়ে পৃথিবীতে যত প্রকারের চাবী আছে তার, আর বাঙ্গালী মেয়ের গায়ে যত প্রকারের অলঙ্কার থাকে তারও নমুনা বেরুলো।

—নগদ টাকা?

—নোটে টাকায় অজস্র; মুখোস্ পরচুলো পর্য্যন্ত··· উঠ্‌লে যে কবি? বস' বস'; শান্তি কে তা বল্‌ছি। বলিয়া সত্যব্রত নীহারকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল।

নীহার উৎসুক হইয়া বলিল—কে বল দেখি?

—কি জন্যে তাকে খুঁজছ' তা' আগে বলো।

মোহিত বলিল,—মেয়ে না ছেলে?

নীহার অকারণেই লজ্জা পাইল; বলিল,—যাকে চেন তারই একটা বর্ণনা দাও।

—একটি মেয়েকে চিনি সে দেখ্‌তে ভাল, একটি ছেলেকে চিনি সে-ও দেখ্‌তে ভাল—দুজনারই নাম শান্তি। কাকে তোমার দরকার? বলিয়া সত্যব্রত হাসিতে লাগিল।

—কাউকে নয়। বলিয়া নীহার উঠিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল...কল্পনার পক্ষ-প্রসারণ আর গুঞ্জরণ সে আর চায় না...একটি স্থানে সে বসিতে চায় যেখানে চেতনা রুদ্ধ হইয়া কেবল অজ্ঞানে মধুপান চলিবে···

—চল্লাম ভাই। বলিয়া প্রভাসের হাত এবং সকলের পাল্লা ছাড়াইয়া নীহার চলিয়া আসিল। .. হৃদয়-মুকুরে কল্পনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বহ্নি যেন আরো জ্বালাময় হইয়া ওঠে ... তাহারই চক্ষুর মণি-আধারে নিজেকে প্রতি-

বিস্মিত দেখিতে পাইলেই যেন মূর্চ্ছিত বুকে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন ফিরিবে!

গত বৈশাখে নীহারের শুভ বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রী কণিকা তাহার কল্পনার কোষে বাস না করিলেও অতিশয় সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বয়স্থা এবং শিক্ষিতাও বটে; সেই তখনও তাহাকে নীহার ফাঁকি দিয়া ডাকিয়া আনিয়া মুগ্ধ-চক্ষে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে—

নীহারের ছোট বোন্ কুঞ্জ বলিয়াছিল, দাদা বৌ-পাগ্লা। ঘুরে, ফিরে, কেবলই বৌকে দেখ্তে আসে…

সে কথা শুনিয়া কণিকা কুঞ্জের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়াছিল, আর নীহার নিজে অহঙ্কার বোধ করিয়াছিল; কিন্তু এখন তার মনে হইতে লাগিল, কণিকার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া শান্তির সঙ্গে হইলে বিশেষ তৃপ্তি পাওয়া যাইত…কণিকার যে বৈশিষ্ট্য এতদিন সে দেখিয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক—অচিন্ত্যনীয় সে মোটেই নয়…একেবারে মাটি-পোরে, ঘরোয়া।

অপূর্ব্ব একটা উন্মাদনা লইয়া নীহার বাড়ীতে আসিয়া উঠিল—

দেখিল, মা ধূপদানীতে আগুণ করিতেছেন; কয়লা ভাঙার হাতুড়ীটা দিয়া শানির উপর ঘাষয়া ঘাষয়া কণিকা ধূপ চূর্ণ করিতেছে, এবং কুঞ্জ তাহার পুতুল-বৌয়ের ঘোমটা তুলিয়া বৌদিকে মুখ দেখাইতেছে…

যে উল্লাস জীবনের আনন্দ আর আকর তাহা এখানে কই?

নীহার গম্ভীরভাবে উপরে উঠিয়া গেল—মা বলিলেন,—বউমা, যাও, কি চায় দেখ!

কুঞ্জ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—চায় না ছাই! অমনি মুখ করে' মানুষকে ভয় দেখায়।

মা হাসিতে লাগিলেন…

নীহার ঘরের ভিতর ঘুরিতেছিল—মনের একদিকে হাসি অন্যদিকে অসময়ের ভর্ৎসনা লইয়া কণিকা উঠিয়া আসিতেই নীহার বলিল,—তোমার নাম আমি রাখিলাম শান্তি। বুঝ্লে? কোন আপত্তি আমি শুন্‌ব' না।

কণিকা ইতিপূর্ব্বে স্বামীর অবাধ্যতা অনেক করিয়াছে, কিন্তু সে জিদের কি রাগের বশে…

'নূতন নূতন কত সাধই হয়' মনে করিয়া এখন সে মনে মনে হাসিয়া বলিল,—'আচ্ছা।' বলিয়া কণিকা চলিয়া যায় দেখিয়া নীহার বলিল,—'শোনো।'

কণিকা দাঁড়াইল—

আরো কাছে সরিয়া আসিয়া নীহার স্ত্রীর ওষ্ঠাধরে সেই শান্তিকেই চুম্বন করিল—চুম্বনটি অতর্কস্পর্শ আর ক্ষিপ্ত।

দুই অঙ্ক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রথম অঙ্ক

সহরতলীর ছোট একটা বাড়ী। পিছনে ডোবার আকারের একটা জলাশয়, নাম পুকুর। এই বাড়ীরই সদরের দিকেব দুটী কামরা। তাহারই বারান্দার ভাঙ্গা রেলিংয়ে নিখিলনাথ একটি লবঙ্গলতা জড়াইয়া দিতেছিলেন।

নিখিল। আজ এতটুকু কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই সমস্ত রেলিংটা ঢেকে যাবে।

সতীর প্রবেশ

সতী। আজ কোথায় যাবে বলেছিলে না?

নিখিল। হুঁ! মনেই ছিলনা। কটা বাজল? দশটা। আচ্ছা লতাটাকে ভালো ক'রে জড়িয়ে দি নৈলে পড়ে যাবে।

সতী। এখন ব'সে ব'সে ওই কর। যত অকাজ—

নিখিল। অকাজ বলছ সতী! দিন কয়েকের মধ্যেই দেখবে ভাঙা রেলিংটার উপরে কে যেন একখানা সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। দেখতে কি চমৎকার হবে সে! ছোট ছোট লাল ফুলগুলো—তুমি নিশ্চয় লবঙ্গ ফুল দেখনি! দেখ্‌লে—

সতী। দেখ্‌তে চাইনে আমি।

নিখিল। সত্যি বল্‌ছি সতী, ফুল ফুট্‌লে তুমি খুশী হবে। বৌটাটি—

সতী। ঘুরে এসে ব'লো গো, সব শুনব। বান্নাটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দি। খেয়ে বেরিয়ে পড।

নিখিল। (মুখ তুলিয়া) তুমি রাঁধছ আবার! মণি কোথায়?

সতী। সরকার-বাড়ীতে গেছে, কাল তার পরীক্ষে। ও বাড়ীর হাসির সঙ্গে পড়বে।

নিখিল। হুঁ! আচ্ছা চল। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে রাঁধতে নিষেধ করেছিল।

সতী। ডাক্তার অমন ব'লেই থাকে। যাক্ এসো তুমি। বিকেলে গয়লা আর মুদী দুজনেই আস্‌বে আবার!

নিখিল। আজ সাত তারিখ! আচ্ছা থাক্—বিকেলে ভাল করে জড়িয়ে দেব। কি রে মণি ওরকম—

চোখ মুছিতে মুছিতে মণির প্রবেশ

কাঁদছিস, কেন মণি?

মণি। হাসি বই দিলে না বাবা।

নিখিল। আচ্ছা কাঁদিস্‌নে পরশু এনে দেব।

মণি। কাল পরীক্ষে যে! (চোখ মুছিল)

নিখিল। আচ্ছ তবে আজই আনব'খন।

মণি। হুঁ্যা বাবা! তুমি এত বই লেখ, আমার পরীক্ষের বই লিখতে পার না? সবাই তা হ'লে আমাদের বাড়ীতে বই কিন্‌তে আসে।

নিখিল। আচ্ছা লিখব। যা তুই আমার চাদর আব জামাটা নিয়ে আয়তো!

মণির প্রস্থান

না এরকম ক'রে চল্‌তে পারে না! একটা কিছু ব্যবস্থা না কর্‌লে—

সতীর প্রবেশ

সতী। চাদর জামা কি হবে? খেয়ে যাবে না!

নিখিল। দেরী হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে ঘুরে এসে খাব'খন।

সতী। রোজ রোজ এই অনিয়মে—

নিখিল। নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে জীবন কাটানো যদি ভাগ্যে থাকৃত তা হ'লে ওই লাল তেতলা বাড়ীটাতে জন্মাতাম এবং—

মণি চাদর ও জামা লইয়া আসিল

নিখিল। (জামা পরিতে পরিতে) তুমি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কোরো, আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ঘুরে আস্‌ব। মণি এই লতাটাকে একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে দিস্।

মণি। তুমি বই এনো না বাবা।

নিখিল। কেন?

মণি। আমি হাসির কাছ থেকে আনব। তার রুমালে ফুল তুলে দিলে বই দেবে বলেছে।

নিখিল। তোর মা মানা করেছে বুঝি!

মণি। না, এনো না বাবা!

নিখিল। আচ্ছা দেখব'খন।

বাহির হইয়া গেল

সতী। মণি যা, ভাত বেড়ে খেয়ে নে। পান্তা ভাত খাসনি যেন!

মণি। ফেলা যাবে যে।

সতী। আমি খাব—

মণি। না লক্ষ্মী মা, তুমি খেয়ো না, কাশি হবে তোমার!

সতী। কিছু হবে না। যা তুই. আমি এখানে বসি একটু।

মণির প্রস্থান

সতী। আমার মত নিষ্ঠুর কেউ নেই! লতাটাকে এই অবস্থায় রেখে গিয়ে সারাটা পথ মন তার খুঁৎ খুঁৎ করবে। পাঁচ মিনিট আমার তর সৈল না!

লতাটীকে জড়াইয়া দিতে লাগিল

বিধু ঠাকুরাণীর প্রবেশ

বিধু। বলি হাঁগা, তোমরা তো বেশ এদিকে গোছ গাছ ক'রে নিলে দেখছি! ভাড়ার কথা ভাবছ?

সতী অপ্রতিভ হইয়া চাহিল

বিধু। অমন চেয়ে দেখছ কি?

সতী। না, কিছু না। কি বলছেন?

বিধু। মাস ধ'রে তো একশ' বার বল্লুম। ভাড়া দিতে হয় দাও, নৈলে পষ্ট ব'লে দাও, কর্ত্তা যেমন ক'রে পারেন আদায় ক'রে নেবেন।

সতী। ভাড়া তো দিতে চেয়েছি।

বিধু। দেবে না তো কি তুমি ইষ্টি কুটুম যে অমনি থাক্‌বে!

সতী। আপনার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে চাইনে, উনি টাকা আন্‌তে গেছেন। এলেই পাবেন।

বিধু। আন্‌তে তো রোজই যান। যাক্ আজ তাহ'লে সিন্দুকটা সাফ ক'রে রেখো।

প্রস্থান

সতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল

পথের মোড়। নিখিলনাথ মন্থর গতিতে চলিতেছিল। অকস্মাৎ পিছন হইতে সশব্দে একখানি মোটর কার আসিয়া উপস্থিত হইল।

সোফার। কালা নাকি মশাই!

আরোহী। ফুটপাথ দিয়ে যেতে পার না! আরে কে ও? নিখিল যে। এক্ষুণি যে খতম হ'য়ে যেতে।

নিখিল। কে বিনোদ! তোমারি গাড়ী বুঝি! চমৎকার নীল রং তো গাড়ীটার—আটলাণ্টিক ব্লু!

আরোহী। থ্যাঙ্কস্! এখন থেকে একটু দেখে শুনে পথ চোলো হে!

গাড়ী চলিতে সুরু করিল

নিখিল। চল্‌লে?

আরোহী। যেও আমার আপিসে—লায়ন্স রেঞ্জ। নাম ক'রে সেয়ারের দালাল বল্লেই দেখিয়ে দেবে।

গাড়ী চলিয়া গেল

নিখিল। খেতে পাচ্ছে তা হ'লে। সেয়ারের দালালী করে, মোটরেও চাপে মানুষকেও চাপা দেয়। কিন্তু গাড়ীখানার কি চমৎকার রং! রংয়ের পছন্দ দেখে মনে হচ্ছে বিনোদ একেবারে পাথর হ'য়ে যায়নি। এক সঙ্গে চার বছর পড়েছি, গড়ের মাঠে পা ছড়িয়ে ব'সে কত গল্প কত গান! পুরাণো সব কথা গুলো আজ মনে পড়ে যাচ্ছে।

জনৈক প্রতিবেশীর প্রবেশ

প্রতি। নিখিল বাবু যে। আপনার টিপ কি?

নিখিল। টিপ কিসের?

প্রতি। ঘোড়া! ঘোড়া! আপনি রেসে যাচ্ছেন তো?

নিখিল। আজ্ঞে না। আমি পাব্‌লিশারের কাছে—

প্রতি। ওঃ হাঁ, আপনি তো বই লেখেন আবার! আজ চলুন না রেসে—

নিখিল। খেলি নি কখনো।

প্রতি। তাতে কি? ওখানে ঢুক্‌লেই খেলা আপনি এসে যাবে। আমিও তো জানতুম না। এক শনিবারে গেলুম এক জনের সঙ্গে আর দোসরা শনিবারেই—ধর্‌লুম

ব্ল্যাক জুয়েল নিজের বুদ্ধিতেই। একেবারে পাঁচে পঁচিশ। আজ ভাব্ছি ডন জনকে ধর্‌ব। যাবেন?

নিখিল। আজ্ঞে থাক্ কাজে যাচ্ছি—

প্রতি। আচ্ছা নমস্কার।

প্রস্থান

নিখিল। যে যার মত একটা ক'রে পথ বেছে নিয়েছে। চল্‌ছে, পড়্‌ছে, তবু চল্‌ছে। গতির আর অন্ত নেই। এই চঞ্চল গতি-লীলার মাঝে শুধু এক আমিই বুঝি স্থবিরের মত—

ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল

৩

সতী বারান্দা ধরিয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল
মণি প্রবেশ করিল

মণি। (সতীর হাত ধরিয়া) খেয়ে নাও মা, অসুখ করবে তোমার!

সতী। আমার ক্ষিদে নেই রে।

মণি। ক্ষিদে নিশ্চয় আছে তোমার। মিছি মিছি দু'গ্লাস জল খেলে! খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি! বাবার আসতে দেরী হবে।

সতী। ঘরে পান নেই বুঝি!

মণি। পান খাবে মা? পুকুর পাড় থেকে গাছ পান কুড়িয়ে আন্‌ছি।

সতী। ওরা বক্‌বে, যাস্‌নি।

মণি। বাঃ বক্‌বে কেন? আমি ওদের গোয়ালঘর নিকিয়ে দিলুম যে—

প্রস্থান

সতী। আমার পেটে কেন এসেছিলি মা!

চক্ষু মুছিল

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল। এই নাও—

একখানি নোট দিল

সতী। দশ টাকা!

নিখিল। আঁ্যা, আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, ওই শেষ।

সতী। কুলোবে না তো!

নিখিল। তা জানি ব'লেই তো এই পাঁচ মাইল হেঁটে আস্‌ছি। তাঁরা বলেন কবিতা চলেনা—তাঁরা ছাপেন না। তবে অনেক দিন ঘোরাঘুরি কচ্ছি বলে :—ওই—

সতী। একটা কথা বল্‌ব—

নিখিল। বল—না আগে এক গ্লাস জল দাও—

সতী জল আনিয়া দিল, জল খাইয়া

নিখিল। এখন বল। আচ্ছা, না—তুমি খাওনি?

সতী। জল খেয়েছি।

নিখিল। মিছে কথা বলছ। মুখ শুকিয়ে গেছে তোমার। তোমার শরীরে অনিয়ম তো সৈবে না সতী, খেয়ে নাও তো।

সতী। তুমি—

নিখিল। আমি খেয়ে—না, একেবারে রাত্রে খাব, অবেলায় আর—

সতী। না, না খেয়ে নাও গে।

হাত ধরিল

নিখিল। আচ্ছা, কি বল্‌বে বল্‌ছিলে!

সতী। বল্‌ব? রাগ কর্ব্বে না?

নিখিল। না।

সতী। বুঝ্‌তে তো পাচ্ছ সব। তুমিও চেষ্টা কচ্ছ কিন্তু কিছুতেই—

নিখিল। বুঝি সতী, সব বুঝি। তুমি আগেও বলেছ শুনেছি। কিন্তু আজন্মের অভ্যস্ত নেশার মত এ আমার ধাতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এত দুঃখ কষ্ট এত অভাব—মুখে বলিনে বটে কিন্তু আমারও অসহ্য হ'য়ে ওঠে—তখনই মনে করি সব ছেড়ে দেব। পারিনে। অনেক দিন কবিতার খাতাটাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি—পরক্ষণেই পথ থেকে তাকে তুলে বুকে ক'রে এনেছি। কতদিন মনে করেছি লেখাপড়া ছেড়ে কোনও ব্যবসায় হাত দেব—কল্পনা মাত্রেই মনে হ'য়েছে চিরদিনের বন্ধুর সঙ্গে যেন জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে। বড় সংগ্রাম চল্‌ছে—

সতী। আচ্ছা থাক্ গে সে কথা! চল খাবে চল!

নিখিল। একেবারে সন্ধ্যায় খাব সতী! দু'বেলা খাওয়া আমার পক্ষে বিলাস—

সতী। পায়ে পড়ি তোমার! ওকথা বোলোনা। মণি! মণি—

প্রস্থান

নিখিল। লতাটাকে দেখ্‌ছি সতী জড়িয়ে দিয়েছে। সাম্‌নের মাসেই ফুল দেবে—যদি টবটাতে রীতিমত জল দেয়—এর সঙ্গে যদি একটা অপরাজিতা জড়িয়ে দেওয়া যায় তবে ভারী চমৎকার হয় কিন্তু। সবুজ জমিনের উপর লাল আর নীল ফুল—

নেপথ্যে : নিখিল বাবু! নিখিল বাবু!

আসুন!

প্রতিবেশী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন

প্রতি। দেখ্‌লেন তো?

নিখিল। কি?

প্রতি। সেই যে বল্‌ছিলুম না ডন জন। চোখ বুজে একেবারে থোক্‌ ধ'রে দিলুম পঞ্চাশ—চোখ মেলেই দেখি হাতে একশ' পঞ্চাশ এসে গিয়েছে।

প্রতি। মিথ্যে বল্‌ছি না কি মশাই? বল্লুম তো যেতে আমার সঙ্গে। সাম্‌নের শনিবারে আবার—

নিখিল। যান চলে যান! চলে যান বল্‌ছি—

প্রতিবেশী বিব্রত ভাবে প্রস্থান করিলেন

একশ পঞ্চাশ!

অন্ততঃ পেট ভ'রে খাবে একমাস—শুনুন মশাই—শুনুন—

প্রস্থান

সতী। কৈ গো, এস। কৈ কোথায় গেলেন আবার!

বিধু ঠাকুরাণীর প্রবেশ

বিধু। তোমার বাবু তো এসেছেন, এইবার আমায় বিদেয় কর।

সতী। হাঁা, এই নিয়ে যান।

টাকা দিল

বিধু। মাত্তর!

সতী। এর বেশী আর হোলোনা আজ।

বিধু। মা গো মা! তোমার মত ভাড়াটে যেন জন্ম না আসে! তা বাছা, তোমার স্বামী যত বাজে কাজ করেন—একখানা মুদীখানা ক'রে বস্‌লেই তো হয়। ও পাড়ার দিনু মুন্সীর বয়াটে ছেলেটা বেশ দু'পয়সা কামাই কচ্ছে—ও ছাই লেখা পড়া—

সতী। আমার স্বামী যা' ইচ্ছে তাই করুন—আপনি কে বল্‌বার?

বিধু। রাগ্‌ছ কেন বাছা? তুমি নিজেই তো বল্লে কাল—

সতী। আমি বলেছি ব'লে আপনিও বল্‌বেন নাকি!

বিধু। বুঝিনে বাবু তোমাদের মেজাজ! যা হোক্‌ আমার পাওনা গণ্ডা এই হপ্তার মধ্যে চাই—নৈলে কর্ত্তা যেমন করে পারেন—এ আমি ব'লে রাখলুম।

প্রস্থান

নিখিল উৎসাহিত হইয়া প্রবেশ করিল

সতী। খাবে না?

নিখিল। চল যাচ্ছি। একটা পথ পেয়েছি সতী! দুঃখ ঘুচ্‌লেও ঘুচ্‌তে পারে! বল্‌তে পারিনে—তবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখ্‌ব একবার। আর দেখ—আমার এক বন্ধু বিনোদ দালালী ক'রে বেশ দু'পয়সা আন্‌ছে—তার আপিসে গিছ্‌লাম, সে বল্লে—আচ্ছা বল্‌ব 'খন, চল।

প্রস্থান

সতী। ঠাকুর ওঁর সুমতি দাও!

দুই হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

১

বারান্দা

সতী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া ছিল। নিখিল ছাতা হাতে একখানি খবরের কাগজে কতকগুলি জড়ানো কাগজ লইয়া প্রবেশ করিল।

নিখিল। এখনও শুয়ে আছ?

সতী। কাছে বোস একটু।

নিখিল। না বস্‌তে পার্‌বোনা। এখুনই বেরোতে হবে। কাল শনিবার—রেস—

সতী। দেখ ওসব কোরোনা তুমি, তোমার পায়ে পড়ি! ওতে হবেনা তোমার—

নিখিল। বিরক্ত কোরো না! ওতে হবেনা, এতে হবেনা, এ আর আমি শুন্‌তে পারিনে। ঝাঁপ দিয়েছি। তল দেখ্‌ব।

সতী। কি হ'ল আজ?

নিখিল। কিছু না! না হোক্‌, তবু টাকা দেখ্‌ছি। কড়্‌কড়ে টাট্‌কা নোটগুলো টেবিলের উপর পুঞ্জীকৃত

হচ্ছে - ঝন্ঝন্ করে টাকা পড়্ছে। আবার শূন্য হ'য়ে যাচ্ছে। কারো পকেটে যাচ্ছে তো। কেমন ক'রে নিতে হয় এই টে জানিনে ব'লেই—

সতী। আজ কিছুই নেই ?

নিখিল। সিকে পাঁচেক হ'তে পারে।

সতী। ওঃ সে তো অনেক। মেয়েটাকে ডেকে বলতো কয়লা চাল আর ডাল কিনে আনুক্ !

নিখিল। মণি! মণি!

একখানি কাগজ হাতে করিয়া মণি প্রবেশ করিল

হাতে কি ওটা ?

সতী। ফেলে দে!

নিখিল। কি ও ?

মণি। মায়ের ওষুধের ফর্দ্দ।

নিখিল। কে দিলে ?

মণি। ডাক্তার বাবু। ও বাড়ীতে কাকীমার মাথায় টাক পড়্ছে, তাই দেখ্তে এসেছিলেন।

নিখিল। ডেকেছিলে বুঝি ?

সতী। না, মণির সাথে গিয়েছিলাম। তা' তিনি বল্লেন কিছু নয়।

মণি। কিছু নয়! মা মিছে কথা বল্ছে বাবা, ডাক্তার বল্লে—

সতী। চুপ্ কর রাক্ষসী !

নিখিল। নাও থাম! চেঁচামেচি শুন্তে পারিনে আর!

মণি। ওষুধটা এনো বাবা! বড় শক্ত ব্যারাম।

নিখিল। দাও, দেখব।

প্রস্থান

মনি। মা!

সতী। কি মা!

মণি। বাবা রাগ কর্ল্ল কেন মা ?

সতী। জানিনে। যা তুই উনুনটা জ্বেলে দে।

মণি প্রস্থান করিল

সতী। শেষে সব কেড়ে নিলে ভগবান্ !

চোখ মুছিল

নিখিল প্রবেশ করিল

নিখিল। সব জোচ্চ্বুরী ! একটা ওষুধের দাম না'কি বারো টাকা! টাকা অম্‌নি আসে কিনা ? ওকি, তুমি কাঁদ্‌ছ যে!

সতী। কৈ! (চোখ মুছিয়া) চোখে রোদ লাগছিল তাই।

নিখিল। বুঝতে পারিনে কিছু! যাক্—সকাল-সকাল চুটো ভাত সিদ্ধ ক'রে দিতে বল সেয়ার মার্কেটে বেরুতে হবে।

প্রস্থান

২

রান্না ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো বিষ্ণুর পট। তাহার সম্মুখে গলায় আঁচল জড়াইয়া মণি দাঁড়াইয়া

মণি। ঠাকুর! বাবা যেন আজ মায়ের ওষুধ কিন্‌বার টাকা পায়! তোমার লুট দেব ঠাকুর!

নিখিল প্রবেশ করিল

এই যে বাবা! টাকা পেয়েছ বাবা ?

নিখিল। পেয়েছিলাম, গিয়েছে। তোমার মা কোথায় ?

মণি। ওই ঘরে। তিনবার বমি করেছে—শুধু রক্ত। বাবা!

কাঁদিতে লাগিল

নিখিল। কাঁদিস্‌নে।

মণি। অল্প ক'রে ওষুধ কেনা যায় না বাবা ? এতটুকু ? পয়সা হ'লে বেশী ক'রে—

নেপথ্যে সতী—জল দিয়ে যা

মণি। যাই মা।

দ্রুত প্রস্থান

নিখিল। উঃ! মুক্তির সব দুয়ার বন্ধ! এক মৃত্যু ছাড়া।

নেপথ্যে সতী—ওগো কাছে এস একটু

যাচ্ছি। তোমার কাছেই মণি প্রার্থনা কচ্ছিল বুঝি! ভালো লোক চিনেছে। (বিষ্ণুর ছবিখানা উল্টাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন)

৩

সতী শুইয়া। মাথার কাছে একটা জল-চৌকির উপর গুটী কয়েক শিশি ও একটা বাটীতে বালি। দরজার কাছে ডাক্তার ও নিখিল।

ডাক্তার। আগে তো বলেন নি কিছু ?

নিখিল। কি বল্‌ব বলুন? সত্যি কথা শুনবেন? খালি হাতে কাউকে ডাকতে ভরসা হয় না! আজ পনেরো দিন ধ'রে বারোটা টাকা যোগাড় ক'রে ওষুধ কিন্‌তে পারিনি। অথচ মৃত্যু তিলে তিলে একজনকে গ্রাস কচ্ছে চোখের উপর দেখছি। আজ নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে—

ডাক্তার। থাক! বুঝছি আমি।

নিখিল। এখন কি কর্ব?

ডাক্তার। লড়াই করে দেখুন। দুটো ওষুধ একটা খাবার একটা মালিশের। মালিশটা সাবধানে রাখবেন, বিষ। ভরসা দিতে পাচ্ছিনে, তবু দেখুন শেষ চেষ্টা একবার।

মণির প্রবেশ

মণি। ডাক্তার বাবু! (কাঁদিয়া ফেলিল) মাকে ভাল ক'রে দিন্—আমি খুব ভালো উলের কাজ জানি—

ডাক্তার। হুঁ।

মণি। আপনার পায়ের পশমের জুতো বুনে দেব। মাকে আমার ভাল ক'রে দিন্!

ডাক্তার। আচ্ছা, ভাল হ'য়ে যাবেন।

ডাক্তার ও নিখিল বাহির হইয়া গেলেন

মণি। (সতীর নিকটে গিয়া) মাগো শুনছ? (সতী চাহিলেন) তুমি ভালো হ'য়ে যাবে ডাক্তারবাবু বলেছেন। খুব বড় ডাক্তার মা।

সতী। ভালো? আচ্ছা।

চক্ষু মুদিল

নিখিলের প্রবেশ

মণি। মা ভালো হ'য়ে যাবে বাবা!

নিখিল। হুঁ! তুমি রান্না শেষ ক'রে ফেলগে যাও।

মণি চলিয়া গেল

এখন কেমন লাগছে? (সতীর মাথায় হাত দিল)

সতী। ভালো। তুমি অত কাছে এস না—বড় ছোঁয়াচে ব্যারাম। বুকের ব্যথাটা বড়—

নিখিল। যদি আগে থেকে চেষ্টা কর্ত্তাম—

সতী। কম তো করান। একটু জল দাও।

জল পান করিয়া

আবার সংসারী হোয়ো পরিশ্রমী মেয়ে এনো—শুধু রূপ দেখো না।

নিখিল। ওসব বোকো না এখন শুয়ে থাক

সতী। বুকের ব্যথাটা যদি না থাকত!

চক্ষু মুদিল। নিখিল নতমুখে বসিয়া রহিল।

গভীর রাত্রি

ঘরের এক কোণে মণি ঘুমাইয়া তাহার কোলের কাছে পশমের জুতা বুনিবার সরঞ্জাম। অন্য কোণে সতী অচেতন অবস্থায় মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। নিখিল জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সতীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

নিখিল। রাখ্‌তে পার্‌লাম না তোমাকে! না—এটা মিছে কথা। রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম না। না, তাও সত্যি নয়। চেষ্টা করবার সামর্থ্য নেই, কি কর্ব্ব?

নিকটে গিয়া ডাকিল—সতী।

অজ্ঞান। এই টুকুই ওর শান্তি। যন্ত্রণাটা অনুভব কর্ত্তে পাচ্ছে না।

সতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

ওঃ! আর সৈতে পারিনে! জন্ম আছে—মৃত্যু আছে—বুঝি। কিন্তু এ আড়ম্বর—আয়োজন কেন? দিনের পর দিন এই যন্ত্রণা, এই দুশ্চিন্তার বোঝা বওয়া—বটে? কেন? মণি—না থাক্ ঘুমুচ্ছে। ওগো জেগেছ? নাঃ। ঘুমোও, ঘুমোও। প্রথম যেদিন এসেছিলে—বাড়ীতে উৎসবের হর্ষ-ধ্বনি আর তুমি আমার বুকের কাছে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আজও তেমনি—বিদায়ের রাত্রে—

সতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ওগো! একটু ওষুধ দাও—ঘুমের ওষুধ—বড় ব্যথা।

দিচ্ছি।

চৌকী হইতে ঔষধের শিশি তুলিয়া

এটা মালিশের। বিষ। ঠিক্ হ'য়েছে!

হাসিয়া উঠিল

সতী। কি, ও?

নিখিল। কিছু না। পেয়েছি—খুব ভালো ঘুমের ওষুধ সতী।

সতী। দাও।

নিখিল। দেব! না, গেলাসে ঢেলে রাখ্‌ছি। এখন না।...আর একটু দেখে নিই। দূরে গিয়া দাঁড়াইল

বেশী যন্ত্রণা হ'লে—ওই গেলাসে ঢালা রইল।

সতী। ওগো!

নিখিল। হুঁ। হাতের কাছেই ওষুধ। আস্‌ছি আমি! প্রস্থান

সতী। বড় ব্যথা—আর পারিনে! কই?

হাত বাড়াইয়া ওষুধের গ্লাস লইল

নিখিল। (ছুটিয়া আসিয়া) খেও না! খেও না! না—যাচ্ছি।

সতী। কি বক্‌ছ পাগলের মত!

নিখিল। না, ঘুমোও! ঘুমোও! আর ভয় নেই। প্রস্থান

গ্লাসের ঔষধ পান করিয়া সতী—ওঃ বুক গেল! ওঃ বুক গেল!

মণি। (জাগিয়া) কি মা, কি? বাবা—

সতী। জল! জল! জল পান করিল

নিখিল। কি মণি? খেয়েছে?

মণি। একি বাবা! মা—কেমন কচ্ছে যে?

নিখিল। হুঁ ওষুধ! ঘুমের ওষুধ। চুপ্‌! কাঁদিসনে ঘুমোতে দে! আঃ বাঁচ্‌লাম! বাঁচ্‌লাম! ছুটিয়া বাহিরে গেল

আড়াল

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

উষর মরু ভূমির তলে
রস উথলে,
তারি গানে মৌন দানে
ছড়ায় শ্যামলতা।
উপরে তার চিহ্ন নাই
তবু সদাই
দৃষ্টিহারা ফল্গুধারা
জাগায় সরসতা॥

প্রাবৃটে যবে ঘনায় কালো
অমল আলো
বদন ঝাঁপে; তরাসে কাঁপে
নিখিল থর থরে,
শরৎ তারি অন্তরালে
আরতি জ্বালে
দ্যুমণি-দ্যুতি স্বরগাকুতি
মরতে ভরভরে॥

চলার পথে যেদিনে নামে—
ডাহিনে বামে
হরিত-হরা করকা-ঝরা
শীতের হিমপাখা,
কুসুমাকর তারি আড়ালে
মলয়-থালে
সাজায় চুপে গন্ধ-ধূপে
পৌর্ণমাসী রাকা॥

ধরার যবে নয়নপুটে
সন্ধ্যা লুটে
রুদ্ধ প্রায় হৃদয়ে ছায়
নিবিড় গতি-তৃষা,
অস্ত পারে রক্তাধরা
উন্মুখরা
উষসী গাহে "কাটিবে নিশা,
মিলিবে গতি দিশা॥

চিত্ত-ব্রজে বাজায় বেণু
পরাগ-রেণু
হাটের মাঝে নিরালে বাজে
আপন গৌরবে।
লক্ষ ধূলি সাক্ষ্য তারে
অস্বীকারে
নিহিত রেণু একেলা ধূলি
চমূরে পরাভবে॥

নিথরে শুনি পাতিলে কাণ;
(কে গাহে গান)—
"নেপথ্যেরি বিবাগী-পথে
চল্‌রে পথহারা।
"পায় না আঁখি আভাষ যার
যবনিকার
পারে লুকায়ে প্রাণে ফুটায়ে
তুলে সে ধ্রুবতারা॥"

অবশেষে

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

১

বৃদ্ধ ব্রজনাথ যেদিন কন্যা রেবার বিবাহ দিয়া হরেনকে ঘরজামাই করিলেন সেদিন তাঁর স্ত্রী জগদ্ধাত্রী বাস্তবিকই খুসীর চোটে হাসিয়া ফেলিলেন। কাজটা এত সহজে হাঁসিল হইবে তাঁহারা আশা করেন নাই। কারণ আজ কালকার ছেলেরা ঘরজামাই হইতে চায় না, তাহারা স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী।

কিন্তু হরেন তাহার নিজের পিতাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল যে সম্পত্তি-লাভের এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ পায়ে ঠেলিতে নাই, এবং ইহাতে তাঁহার বাধা দিবার অধিকারও নাই। কারণ তিনি এরূপ একটি সম্পত্তি তাহাকে দিয়া যাইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আজকাল ওকালতী পাশের মূল্য ত নাই-ই, বরং তার পিছনে যথেষ্ট ব্যয় করিতে হয়। তৃতীয়তঃ নিজের বাড়ীতেই মা-বাপের কাছে বাস করিতে হইবে এ ধারণা একটা সেন্টিমেণ্ট্ (ভাববিলাস) মাত্র। হরেনের বিবাহিত বড় ভাই থাকে পুত্রবধূর হাতে, সাহায্য-প্রত্যাশার শেষ কারণটিও টিঁকিল না। অতএব পিতামাতা হাল ছাড়িয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন।

ব্রজনাথ বাবু সেকেলে হইলেও রেবাকে বেথুন স্কুল হইতে ম্যাট্রিক্ পাশ করাইয়াছিলেন। বৃদ্ধের এই বাৎসল্য-ঘটিত সখগুলি না থাকিলে হয়ত সমাজ আদৌ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে পারিত না। রেবা ম্যাট্রিক্ পাশ করিলেও ইংরাজী কিছু বেশীই পড়ে। এবং আধুনিক য়ুরোপের ও আমেরিকার নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে, তন্মধ্যে নারী-আন্দোলন একটি। নিজের দেশেও এ আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত বেশ অনুভূত হয়, এবং তাহারি ফলে সে স্কুলে মেয়েদের সর্দ্দারি করিয়াছিল।

এখন বিবাহ হওয়ায় সেই সর্দ্দারিটা নেতাগিরির ক্যামেরা প্র্যাক্‌টিসে (গৃহাভ্যাসে) পরিণত হইল। অর্থাৎ তাহার বাড়ীতে আসিয়া অনেক মেয়ে নানা বিষয়ে পরামর্শ নিয়া যায়, দুয়েকটা ছোট খাটো চা ও সাহিত্যের আসরে নিমন্ত্রণও আসে।

হরেনের এ বিষয়ে বেশ উৎসাহ আছে। কিন্তু বিবাহের পর আলাপ-পরিচয়ে বরবধূ উভয়ে বুঝিল দু'জনের অভিসার বিভিন্ন পথে। হরেনের পথটি মোটেই অভিসারের নয়, অভিযানের। সে বিপ্লবী। লেনিন-বাদ ও গান্ধী-বাদ এই দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, অর্থাৎ শ্রমিকজাগরণের রক্ত-পতাকার সঙ্গে ধনিক কলওয়ালাদের চাঁদায় চালিত কংগ্রেসের তিনরঙা খদ্দরী পতাকার কি করিয়া সমন্বয় করা যাইতে পারে—তাই লইয়া সে মাথা ঘামায়। তাই সে ক্যাপিটালিষ্ট্ (ধনাধিকারী) শ্বশুরের অর্থ শোষণ করিয়া কম্যুনিজম্ (সাম্যবাদ) প্রচার করে।

মত ভিন্ন হইলেও কাজ করিবার সমাজ একটাই, এবং গৃহে ফিরিয়া শয়ন করিতে হয় একই শয্যায়। তাই হরেন-রেবার প্রণয়-সম্পর্কে কোন ছায়া পড়িল না। বরং পরস্পরের আলোক পাইয়া উভয়ে যেন আরও সতেজ হইয়া উঠিল। উভয়েই হাসিয়া বলে,—বিবাহজীবনের সকল ট্রাডিশনে (গতানুগতিতে) আমরা দুজন বিদ্রোহী,—এবং ইহাই ভবিষ্যতের আদর্শ।

দিন ভালই কাটে। তবে বৃদ্ধা জগদ্ধাত্রীর দিন আরও ভালো কাটিত যদি তিনি কোলে একটি নাতী লইয়া আদর করিতে পাইতেন। তাঁহার স্নেহের প্রাণ, এতদিন পর্য্যন্ত কন্যা রেবাকে শিশুর মতই পালন করিয়াছেন, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এখন আর একটি ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে লইয়া সোহাগ করিবেন এই তাঁহার অন্তরের ক্ষুধা। তাই বিবাহের পর যখন দুই বৎসর কাটিয়া গেল, তখন তিনি মনে মনে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

ব্রজনাথ অতশত বোঝেন না। তবে তিনি চাহিতেন মেয়ে-জামাই বাড়ীতে বসিয়াই আমোদ-আহ্লাদ করুক। কিন্তু তাহারা বাহিরে বাহিরেই উৎসব করিয়া প্রায় সারা দিনমান যাপন করিয়া আসে, মাঝে মাঝে রাত্রির অনেকাংশ—এই তাঁহার বড় দুঃখ।

এই দুঃখ দেখিবার কেহ নাই। রেবা চাহে নারী-জাতির পরাধীনতার দুঃখ দূর করিতে। আর হরেন চাহে পতিত ও দুঃস্থকে অর্থ নৈতিক পরিত্রাণ দিতে। এই ছোট খাটো দুঃখ দেখিবার অবকাশ তাহাদের কই?

সেদিন বেলা আটটার সময় স্নান করিয়া পরিপাটি বেশ-ভূষা করিয়া রেবা আসিয়া হরেনের কক্ষে দাঁড়াইল। তাহার মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অতি কৌতুকময়। হরেন নির্ব্বাক্ ভাবে দেখিতে লাগিল। বলিল,—তুমি কি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, ক্ষীরোদ-মন্থনের মুক্তিস্বরূপা সম্মুখে উদিত হ'লে?

রেবা ললাটের অলক সরাইয়া কোপ-হাস্যে বলিল,—আবার লক্ষ্মী বলছো আমাকে? আমি ত বলে দিয়েছি স্বর্গের কোন দেবতার সঙ্গে আমার তুলনা তুলো না, আমি মানবী, নারী,—নারীত্বের সকল অধিকার আমি চাই—এই মর্ত্ত্যলোকে,—দেবী হ'তে চাইনে।

—ওঃ ভুলে হ'য়ে গেছে! আমিও সব সময় আঁস্তাকুড় আর বস্তিপল্লী নিয়ে গবেষণা করি কিনা—তাই মনের পাশে একটা শান্ত শুচিমূর্ত্তি স্বপ্নের মতো জেগে ওঠে, তাকেই বলছিলাম লক্ষ্মী।—তা, —এত শীঘ্রি স্নান করলি যে?

একখানি কার্ড টেবিলে রাখিয়া রেবা বলিল,—আজ সন্ধ্যায় বোর্ডিংয়ে একটা থিয়েটার করছি, তোমার নেমন্তন্ন। তারই জোগাড়ে চল্লুম, এখন আর সময় নেই। বলিয়াই সে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদের মতো তনুখানি মন্থর গতিতে বাহিরে লইয়া গেল।

মা ডাকিয়া শুধাইলেন,—কোথায় যাচ্ছিস্ রেবা?

একটা থিয়েটার হবে তারই জোগাড়ে,—মোটরটা আনতে বলি।—রেবার অপেক্ষা করিবার তখন সময় নাই।

বাল্যে রেবা একবার ইস্কুলে আবৃত্তি করিয়া একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিল। সেদিন জগদ্ধাত্রীর আহ্লাদের সীমা ছিল না। কিন্তু আজ তাহার থিয়েটার করিবার বার্ত্তা শুনিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামীর কাছে অনুযোগ করিলেন,—ওগো, রেবা কি অগ্নিধারা চিরকালই ধিঙ্গী থাকবে? হরেনও যে বড্ড ভালমানুষ, কিছুই বলেন না,—তুমিও কি কিছুই দেখবে না?

—আমি ত সবই দেখছি,—আর কতকালই বা দেখবো,—বলিয়া ব্রজনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু বসিয়া বসিয়া দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন।

২

জগদ্ধাত্রীর মনে সেই সামান্য বাসনাটুকু দিনে দিনে আরও প্রবল হইয়া সারাবুক তোলপাড় করিয়া তোলে। ছোট্ট একটী টুকটুকে চঞ্চল রাঙা শিশু ঘর জুড়িয়া খেলা করিবে; তাহার দুরন্তপনায় অস্থির হইয়া রেবা বলিবে,—আর পারিনে মা খোকাকে সামলাতে, বলিয়াই সে শিশুকে হয়ত দু'ঘা মারিতেই ছুটিবে,—জগদ্ধাত্রী ছুটিয়া গিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া একেবারে আঁচলের তলায় লুকাইয়া ফেলিবেন; বলিবেন,—পারিনে বল্লে তো চলবে না বাছা, এম্নি ক'রেই ছেলে বড় হয়, এম্নি ক'রেই মা হ'তে হয়!—

তাঁর কাছে সেই ত' স্বর্গ,—সংসার-ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা, নারী-জীবনের সেই তো সার্থকতা!

সেদিন সকাল বেলায় কি জানি একটা কাজে রেবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন টেবিলের উপর একটা শিশিতে কি যেন ওষুধ, কয়েকটা পিল। শুধাইলেন—রেবা এগুলি কি!

—ওগুলো খেলে ছেলে হয় না! বলিয়া রেবা সামান্য অপ্রতিভ ভাবে নখ খুঁটিতে লাগিল।

এরূপ অদ্ভুত কথা জগদ্ধাত্রী জীবনে কখনো শুনেন নাই। তাঁহার চোখের সামনে যেন গলিত শব-গন্ধময় একটা শ্মশানের ছবি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল, মনে হইল রেবা রাক্ষসী, পিশাচী!

তিনি কপালে হাত দিয়া মেজের 'পরে বসিয়া পড়িলেন।

রেবা একটু অভিমানের সুরে কহিল,—কেন মা, তুমি এসব ব্যাপারে কথা তোলো? তুমি তো জানো, আমি কখনও ছেলে কোলে ক'রে চুপ করে ঘরে ব'সে থাকতে পার্ব্বো না। তবে কেন বাজে ভাবনা করো?

জগদ্ধাত্রীর ভিতরটা যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন,—তুই না পারিস্ আমি তোর ছেলে পালবো, পোড়ামুখী।

—সকাল বেলায় কেন আমাকে গাল দিতে এলে? বলিয়া রেবা আবার জবাব করিল,—ছেলেকে তো আর তুমি ব'সে মাই খাওয়াবে না, মা। সে তো আমাকেই করতে হবে। আর জানো—তা'তে কি রকম চেহারা দেখতে খারাপ হয়ে যায়;—মাগো, কি বিশ্রী ঘিন্ ঘিন্ করে!

ইহার উপর আর কথা চলে না।

সেদিন রাত্রে ব্রজনাথের সঙ্গে একথা লইয়া জগদ্ধাত্রী কিছু তর্ক করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চাহেন না। তিনি যেন নির্লিপ্তভাবেই বলিলেন,—তুমি তো জানো না কিছু, ওই রকমই আজ-কাল হ'য়েছে। হরেনের টেবিলেও আমি ওই বিষয়ের কতকগুলো বই দেখেছি। কা'কেই বা দূষবে?

তাহার পরদিন সকাল হইতে জগদ্ধাত্রী তাঁহার মেয়ে জামাইকে কেমনধারা সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের দেখিলেই যেন তাঁহার অন্তরটা ভয়ে বিরস হইয়া যায়; তাঁহার নিজেরি গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আসে, যাহা বলিতে যা'ন ভালো করিয়া বলিতে পারেন না।—তাহারা তো মানুষ নয়,—রাক্ষস! নতুবা এম্নিভাবে দুই জনে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সম্ভাবী নাতী-নাতনীকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে? জগদ্ধাত্রী আপনার ঘরে ফিরিয়া আর্দ্র চোখ মুছিতে মুছিতে কান্না চাপিয়া রাখেন। তাঁহার বুকের আশায় এইবার জলাঞ্জলি দিয়া তিনি আপন মনে সর্ব্বদাই ব্যথাতুর হইয়া থাকেন।

কিন্তু.........

কয়েকমাস যাইতেই জগদ্ধাত্রী তাঁহার কন্যার প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন যে তাহার শিশির সকল ওষুধ ও হরেনের যাবতীয় পুঁথিপত্রই ব্যর্থ হইয়াছে।

রেবা তাহার কাজের ব্যস্ততায় এদিকটা খেয়ালই করে নাই। কিন্তু যেদিন তাহার মাতার আশা-হর্ষ-মুখর বাক্যালাপের মধ্য দিয়া নিজের অবস্থাটা অনুমান করিতে পারিল, সেদিন আর তার লজ্জার সীমা রহিল না। পর মুহূর্ত্তেই মনে মনে রাগ হইল যে তার অশিক্ষিতা মায়ের বর্ব্বর বাসনাটাই জয়ী হইবে, আর তার যৌবনকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার এত যে উদ্যম,—সব নিষ্ফল হইয়া যাইবে!

হরেন তখন ঘরে বসিয়া বস্তি-ব্যারাকে জন্মমৃত্যুর হার লইয়া অঙ্ক কষিতেছিল। রেবা ঝড়ের মতো প্রবেশ করিয়া কহিল,—দেখো তো কি মুস্কিল! এখন এর প্রতিকার কি? দুমাস পরে ফিল্মে আমার একটা ছবি তুলবার ব্যবস্থা হচ্ছে; আর ঠিক সেই সময়ে এই সব ফ্যাসাদ।

হরেন কিছুই না বুঝিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—তাই ত কি করা যায়!

—তুমি কর্ব্বে আমার মুণ্ডু!—বলিয়া রেবা টেবিল হইতে বইয়ের বোঝা ঘাঁটিয়া দুই খানি তুলিয়া নিয়া আবার বিদ্যুৎবেগে কক্ষ ত্যাগ করিল।

তাহার নারীত্বের সমস্ত দাবী অবশেষে ফিডিং-বট্‌ল্‌এ, শিশুর ঝিনুক বাটিতে পরিণত হইবে ভাবিতেই তাহার ভিতরের দারুণ বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

৩

জগদ্ধাত্রী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রেবার কোলে খোকা দেখিবার আশা-মুকুলটী তো অকালে বিনষ্ট হইলই উপরন্তু রেবা আজ মাসাবধি রোগে শয্যাশায়ী। ডাক্তার যে অভিমত দিয়া গেছে তাহা যেমনি ভয়াবহ, তেমনি কদর্য্য। একটি বিবাহিত বালিকা যে এতবড় দুষ্কৃতি করিতে পারে ইহা সকলেরই স্বপ্নাতীত। আর, বাহিরের প্রমোদ-উৎসব ও সৌন্দর্য্যনাশের অমূলক আশঙ্কাই যখন ইহার মূল কারণ, তখন ইহার জন্য দুঃখ করিতে গেলেও কেমনধারা বিসদৃশ ঠেকে। রেবা পাপ করিয়াছে কি পুণ্য করিয়াছে একথাও জগদ্ধাত্রী আর চিন্তা করেন না, শুধু ভাবেন রেবা এমন ধারা হইল কেন? এই কি আজকালকার ধরণ, তবে তো তাঁহার এতদিন বাঁচিয়া না থাকাই উচিত ছিল।

ব্রজনাথ গম্ভীরতর হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন,—দেখো, তোমার ষষ্ঠীর মানত টানত সব ফাঁকি, হরেনের বই-

গুলোর জোরই বেশী, তার মধ্যে বুড়োবুড়ীর কোন সখই টিক্‌বে না!

হরেনের বাইরের কাজে দুর্লভ অবকাশের মধ্যে একবার তিনি তার ঘরে ঢুকিয়া প্রসঙ্গটা তুলিয়া বলিলেন, শুধাইলেন—বাবাজী, এতটা করবার কি প্রয়োজন ছিল? কিসেরি বা লজ্জা আর কিসেরি বা অভাব তোমাদের?—বলিয়া বৃদ্ধ যেন তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

হরেন কথা বলিত কম, আবার যাহা কিছু বলিত তাহার মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ তাহার কোন কালেই ছিল না। তাই আজও বেশ সপ্রতিভ ভাবে সে উত্তর করিল,—

দেখুন, আমাদের এ প্রাইভেট (ঘরোয়া) ব্যাপারটা হয়ত আপনি ঠিক বুঝবেন না। এর মধ্যে দুজনের দুটো কারণ নিহিত আছে। রেবার পক্ষ থেকে শুধু এই বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার সকল নারীই যে সেই সনাতন মাতৃত্বের আদর্শটাই মেনে নেবে তা কখনো সত্যি হ'তে পারে না। বাইরের কাজের মধ্যে যখনই নারীজাতি নেমে আসবে তখনই তাদের কেউ কেউ সে আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হবেই, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকলেও অন্যায় কিছু নেই। সমাজের শুধু দেখবার ভুল। আর আমার দিক থেকে বক্তব্য এই:—বর্ত্তমানে আমি যে অবস্থায় আছি তার মধ্যে আমার যদি ছেলে হয়, তবে সে ছেলে নিজের চেষ্টায় কখনই জীবিকা উপার্জ্জন করবে না, অন্ততঃ সে ঘটনার সম্ভাবনা কম। সে তার পিতৃদত্ত সম্পত্তিটাই ভোগ করবে বা তার ভবিষ্যৎ সন্ততির ভোগের জন্যে আঁকিয়ে রেখে যাবে। তা হ'লেই তো ক্যাপিট্যালিজম্ (ধনতন্ত্রবাদ?) প্রথাটা আর কোন ক্রমেই ঘুচলো না। কিন্তু আমি চাই যেন প্রত্যেক ধনিকের কোন সন্তান অথবা উত্তরাধিকারী না থাকে, তার সকল সম্পদ যেন মৃত্যুর পর ষ্টেটের হাতে (সরকারে) সাধারণ উপকারের জন্য ন্যস্ত হয়। তাছাড়া আমি নিজে তো এখন কিছু রোজগার করিনে, সন্তান পালনের ক্ষমতা আমার নেই। যেদিন, নিজে কাজ ক'রে সন্তানপালনের সংস্থান করতে পার্ব্বো, বা দেশের সরকার আমার ব্যক্তিত্বের প্রতিদান স্বরূপ আমার সন্তানদের পালনের ভার গ্রহণ কর্ব্বে, সেদিন যেন আমার পিতৃত্বের অধিকার জন্মে, তার পূর্ব্বে নয়। আমার বর্ত্তমান চেষ্টাই তাই, দেশে বিপ্লব দ্বারা সমাজের সর্ব্বদিক দিয়ে আইন কানুন বদ্‌লে দেওয়া—

বলিতে বলিতে হরেন যেন ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছিল। সে হঠাৎ উঠিয়া জামা গায়ে দিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ দেখাইল।

ব্রজনাথ গম্ভীর ভাবেই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এতক্ষণ বই পড়িতেছিলেন কিংবা জামাতার কথা শুনিতেছিলেন তাহাও যেন উপলব্ধি করা দুরূহ। বক্তৃতার শেষ দিকটায় তাঁহার মুখে একটা জবাব আসিয়াছিল,—এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বুঝি তুমি তোমার দরিদ্র পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আমার সম্পত্তির ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিলে? কিন্তু অতটা নির্লজ্জ তিনি হইতে পারেন না। তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন।

রেবা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বায়োস্কোপের ছবি তুলিবার সম্ভাবনাটুকু রহিত হইয়া গেছে। বাহিরে বেশী চলা ফেরা আর তার সয় না, যাহা কিছু ঘরে বসিয়াই করিতে হয়।

ঠিক এই সময়ে আর এক দিকে সংঘাত বাধিয়া গেল। হরেনের এখন কাজের তাড়না যেন বাড়িয়াছে, অধিকাংশ সময়ই সে বাহিরে থাকে। এই বহির্মুখী ভাবের মধ্যে দেহের পাণ্ডুর শুষ্কতার কোন প্রকার ইঙ্গিত দিল কি না কে জানে। তবু রেবা যেন সেইটাই বুঝিয়া লইল। তাহার রুক্ষ মেজাজ আরও তাই রুখিয়া উঠে।

এখন বাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়াই রেবার অবসর সময় বেশী। আর যে মেয়ে কোনকালেই একটা কিছু না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই, তার যখন বাহিরের কর্ম্ম-নিয়োজন কমিয়া গেল, তখন ঘরের ভিতরেই একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ভারী হইয়া উঠিল। রেবা তাই এ সময়টা হরেনকে একান্ত ভাবে পাইতে চায়। কিন্তু পায় না।

দিনে দিনে উভয়ের মাঝখানে একটা প্রাচীর খাড়া হইয়া উঠে। রেবা বলে, তোমার লেবার ইউনিয়ান (শ্রমিক সঙ্ঘ) চুলোয় যাক্,—কুলী মজুরের বউ ঝি নিয়ে কর্ম্ম হয় না, কাব্য কিংবা ঐ জাতীয় কোন দুষ্কর্ম্ম করা হয়।

এ বিদ্রূপ বড় নোংরা ও তীব্র। হরেন সহ্য করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল,—দশজন বখাটের সঙ্গে বায়োস্কোপের ছবি তুলবার মতো রূপ নেই বলে যে রাগ হলো সেটা আমার ওপর ঝাড়বার কোন হেতু পাই নে।

এই রূপের খোঁটাও অসহ্য। ক্রমে উভয়ে যেন পরস্পরের নিকট বাস্তবিকই অমার্জ্জনীয় ভাবে অসহ্য হইয়া উঠিল।

রেবা তাহার নিগূঢ় মনের ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য নানা ব্যসনের মধ্য দিয়া যে রস-ধারার সন্ধান করিতেছিল সে রসের উৎস যখন নির্ণিত হইল তখন দেখিল সে উৎস দুর্ভেদ্য পাষাণ-সঙ্কটে উত্তপ্ত হইয়া গেছে। আর যে রূপায়তনের বাতায়ন হইতে হরেন তাহার নীচে নগরীর অসুন্দর দৈন্যের পানে দৃষ্টি ফেলিবার অবকাশ পাইয়াছিল, সেই রূপের কক্ষটী যেদিন সহসা জীর্ণ পাংশু হৃতশ্রী আকারে কাঁপিয়া উঠিল, সেদিন তাহার মনে হইল—জীবন বুঝি সত্যসত্যই পঙ্কিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে; —তাহার অর্থনৈতিক তন্ত্র-মন্ত্রগুলাই বুঝি জীবনের শেষ জিজ্ঞাসা নয়।

ব্রজনাথ এই ব্যবধানসঞ্চার কিছুদিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

অবশেষে সেদিন রাত্রিতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মর্ম্মাহত হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—ওগো, রেবার যে মাথার ঠিক নেই, তার আরও ভালো ক'রে চিকিৎসা করাও। হতভাগী বলে কিনা, সে এ বিয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আইনে নাকি তা চলে, না চল্লে খৃষ্টান হ'তেও সে রাজী,—হরেনের সঙ্গে নাকি তার মনে মিলছে না,—সে আর কাউকে বিয়ে করবে।

—ভালো করিয়া গুছাইয়াও সব কথা বলা হইল না। কেবল ফোঁপাইয়া উঠিয়া শেষ কালে বলিলেন,—এমন কোথাও দেখেছো নাকি?

ব্রজনাথ দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর করিলেন,—ঐটে শুধু দেখবার বাকী ছিল গো, এইবার দেখতে হবে। আমার ভাগ্যি ভালো, যে এক জীবনে অনেক কিছুই দেখে গেলাম।—বলিয়া তিনি একবার একটুখানি হাসিলেন।

ক্রন্দনের সুর আরও সপ্তমে চড়াইয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন,—ওগো, ও রাক্ষসীকে কেন আমি পেটে ধরেছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে ঐ সব ওষুধগুলো খাওয়াও নি?—

অশ্রুমতী

সুফী মোতাহার হোসেন

তুমি কাঁদ কেন কি বেদনা তব কহিবে না মুখ ফুটি,
শুধু অবিরল ব্যথা-ছল-ছল কাঁদিবে কি আঁখি দু'টি?
তোমার কাঁদনে ঘন বরিষণে কাঁদে যে শাওণ রাতি,
তব বেদনায় নিভে গেছে হায় চন্দ্র-তারকা-ভাতি!
আজি আঁধারের অকূল পাথারে অঝোর ধারায় ঝরি,
তোমার কাঁদনে কাঁদে মহাকাশ, কাঁদে বন গিরি দরি।
কত রাধিকার নব দেহাধার জাগর শয়ন 'পরি
ক্ষণে ক্ষণে আজি ওঠে ব্যাকুলিয়া অচেনা বঁধুরে স্মরি'
অসীম বিরহ ছায়া ফেলিয়াছে নিখিলের হিয়া ঢাকি,
সেথায় আঁচলে আবরি' নয়নে কেঁদে ওঠ থাকি থাকি।

বৈশাখী বায়ে এসেছিলে তুমি—মরুতে শীতল ছায়া.
নব-যৌবনা রূপসী নবীনা নয়নে কাজল মায়া।
নীল সাগরের মন্থন-সুধা এনেছিলে বুক ভরে,
শ্যামলী লতার ললিত সোহাগ লীলায়িত কম-করে।
নব বছরের নূতন আলোকে নিরখি সে শ্যাম মুখ
চৈত্রশেষের ভস্ম-বাসরে ভুলিলাম. মনো-দুখ।
তোমারে হেরিয়া নব উৎসাহে চম্পা ফুটিল শাখে,
গগনে গগনে গুরু গুরু ধ্বনি ডাক দিল বৈশাখে।
ঘন কালো কেশ এলাইয়া সুখে তুমি হোথা দূরে দূরে
উতলা বাতাসে উল্লসি উঠি ফিরিলে আকাশ জুড়ে।

তারপরে যবে ঘন কলরবে ছুটে এল ভীম ঝড়
লাখো নাগিণীর লক্ষ ফণায় গর্জ্জিল অম্বর ;
তীব্র নিখাদে ঝঙ্কারি বাঁশী, সর্ব্বনাশেরে স্মরি',
আছাড়ি আছাড়ি ভাঙিল টুটিল বিশীর্ণ বল্লরী ;
আঁখি ইঙ্গিতে বিদ্যুৎ হানি' ঝঙ্কারি কঙ্কণ,—
ম্লান চেতনায় বিকল বিধুর পূঞ্জিত পুরাতন,—
নির্দ্দয় নব যৌবনসুখে কঠোর পতনভরে
দূর করি দিয়া, আসন রচিলে চিরনবীনের তরে।
ঘন উলু দিয়া, শাঁখ বাজাইয়া, তীব্র বীণার তারে—
অপরিচিতের আগমনী ধ্বনি' তুলেছিলে বারে বারে।

বিদ্যুৎ-শিখা কোথা গেল সখি —কঙ্কণ ঝঙ্কার ?
ব্যাকুল পবনে শুনিতেছি শুধু সকরুণ হাহাকার।
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন শান্ত. চরণে বিবশ গতি.
অকূল আঁধারে মুখ লুকাইয়া কাঁদিছ অশ্রুমতী।
আজি অই তব অশ্রুসায়রে, বিনিদ্র দু'নয়নে
মোর বেদনার অশ্রুসায়র উথলিছে অকারণে।
আমার হৃদয়ে মেঘ জমিয়াছে. মত্ত হয়েছে দেয়া ;
না জানি কোথায় কাঁটার ব্যথায় গন্ধ ছড়ায় কেয়া।
ভরা যৌবনে তুমি কাঁদ সখি, তোমার কাঁদন সাথে.
মর্ত্ত্যের ব্যথা উঠিছে আকুলি মত্ত বরষা রাতে।

করকোষ্ঠীর ফল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নীলাদ্রিকুমার বিদ্যাসাগর কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত মমতার জন্যই হউক, অথবা গ্রহগণের সৌজন্যেই হউক সে এই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না। ক্রমাগতঃ দুই দুইবার ফেল্ হইয়া—সে ইহার একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ফেল্ বা পাশ হওয়া গ্রহগণের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থানের উপর নির্ভর করে। মঙ্গলের প্রতি শনির দৃষ্টি পড়িলেই হয় ফেল্ এবং বুধের প্রতি বৃহস্পতির আকর্ষণ হইলেই হয় পাশ। ইহাতে দুঃখিত বা উল্লসিত হইবার অর্থ কিছুই নাই। গ্রহগণের গতিবিধি অতি বিচিত্র। ধূর্ত্ত বিপ্রেরা গ্রহশান্তির উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে অর্থব্যয় ব্যতীত যজমানের অন্য কোনও ঐহিক বা পারত্রিক লাভ হয় না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কতখানি শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও নীলাদ্রি নিজের জীবনে দেখাইতে চেষ্টা করিত। পিতা বকিতেন, মাতা কাঁদিতেন, কিন্তু নীলাদ্রি তাহা তুচ্ছরূপে উপেক্ষা করিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করিত।

গ্রহ-দেবতার প্রতি নির্ভরের আর একটা ফল হইল এই যে, নীলাদ্রি হিন্দুশাস্ত্রে অত্যন্ত আস্থাবান হইয়া উঠিল। তাহার পিতা রায় সাহেব পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় সবডেপুটী কর্ম্ম হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী কার্য্যে সারা জীবন অতিবাহিত করিতে হওয়ায় তাঁহার আচার ব্যবহার ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া চায়ের পেয়ালা হস্তে তিনি প্রতিদিন গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতেন। গোয়ালার নিকট হইতে দু'পয়সার টাট্‌কা দুধ আনিয়া চা পান না করিতে পারিলে, তাঁহার স্বাস্থ্য ও মেজাজ যুগপৎ বিগড়াইয়া যাইত। নীলাদ্রি চা-পান পরিহার করিল। সকালে সন্ধ্যায় আহ্নিক না করিয়া সে জল গ্রহণ করে না। প্রথম প্রথম সে বড় বড় চুল রাখিয়া শিখা লুকাইয়া রাখিত। ক্রমে যখন ইহাতে লোকের সম্ভ্রমযুক্ত দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তখন দীর্ঘ শিখা সগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। ইহার সঙ্গে যখন রঘুবংশ ও ভট্টির দুই একটি শ্লোক কণ্ঠস্থ হইল, তখন আর কিছুরই অভাব রহিল না। নীলাদ্রি তাহার সাধন অঙ্গ সম্পূর্ণ করিল নস্যে। প্রথম প্রথম সে বুঝিতে পারিত না যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নস্যের সম্বন্ধ কি! অথচ দেখিত, যে প্রায়শঃ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাই নস্য-নেশাসক্ত। নীলাদ্রি একদিন গোপনে একটী কৌটা কিনিয়া এক আনা মূল্যের গোলাপী নস্য তাহাতে রক্ষা করিল। অবসর মত সে পরীক্ষা করিবে বলিয়া কৌটাটী কোটের রক্ষাধারে রাখিয়া দিল। কিন্তু যে কোনও কারণে হউক, কৌটাটীর ডালা খুলিয়া নস্য পড়িল পকেটে এবং তাহার ঘ্রাণ পশিল ব্রহ্মরন্ধ্রে। প্রথমটা হাঁচির প্রাবল্যে কিছু বিচলিত হইলেও শেষে দেখিল যে মস্তিষ্ক অত্যন্ত হালকা হইয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতে নীলাদ্রি নস্য গ্রহণ করা অধ্যয়ন, চিত্তস্থৈর্য্য ও ধারণাশক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক বলিয়া মানিয়া লইল। এই সকল কারণে তাহার সমবয়স্কেরা তাহাকে শাস্ত্রী বলিয়া ডাকিত।

নীলাদ্রি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অধ্যয়নের প্রতি পুত্রের অনুরাগের বহর দেখিয়া পিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সকল জিনিষেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, যাহা লঙ্ঘন করা একরূপ দুঃসাধ্য। সেই জন্য নীলাদ্রি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিল, তখন তিনি হাজার পাঁচেক টাকা পণে তাহার উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখনও সরদা আইন হয় নাই। রায় সাহেব পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া অনেকের পক্ষেই ভাগ্যের কথা। কাজেই পঙ্কজ বাবুকে বিশেষ চাপ দিতে হইল না। দশম বর্ষীয়া ইন্দুমুখীর পিতা কনক মুখুয্যে উপ-যাচক হইয়া নীলাদ্রির করে কন্যাকে এবং তাহার পিতার করে এক তাড়া নোট সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলেন।

তারপর যখন তিনি দেখিলেন যে জামাতা-প্রবর আই-এ পরীক্ষায় অন্নের জন্য প্রতিবারে লক্ষ্যভেদে অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল, তখন তাঁহার রোজ বিকালে একটু করিয়া জ্বর হইতে সুরু করিল।

২

মানবজীবন রহস্যময়। একথাটা সকলেই জানে। কেহ কেহ সে রহস্য দুর্ভেদ্য বলিয়া রাতকাণার মত জীবন-পথে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হয়। আবার কেহ কেহ সে যবনিকাটার প্রান্ত তুলিয়া এক একবার উঁকি মারিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। নীলাদ্রি এই শেষোক্তের দলে। ব্যর্থতার মধ্যেও সে যেটুকু শান্তিকে করায়ত্ত করিয়াছিল আধ্যাত্মিকতার দ্বারা, সেই শান্তিকে দৃঢ়ীকৃত করিবার মানসে সে চেষ্টা করিল ভবিষ্যতের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে।

গ্রে ষ্ট্রীটে একজন জ্যোতিষী থাকিতেন, তাঁহার নাম ছিল চণ্ডীপ্রসাদ। নীলাদ্রি একদিন এই জ্যোতিষীর দ্বারে উপনীত হইয়া এক টিপ নস্য গ্রহণ করিল। সে মনোযোগ সহকারে দেখিল একখানি হস্তের মানচিত্র দ্বারসংলগ্ন হইয়া ঝুলিতেছে। সেই মানচিত্রে হস্তের নানাবিধ রেখা অঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহাতে ১ হইতে ৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বসানো আছে। নীলাদ্রি দক্ষিণ হস্ত হইতে ছত্রটী বাম হস্তে চালান করিয়া দক্ষিণ হস্তটী বিস্তৃত করিল। দেখিল কয়েকটা রেখা ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই রেখাগুলির সংখ্যা ব্যতীত করচিত্র খানিতে আর কিছুই দেওয়া ছিল না। সুতরাং সে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়াও ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না।

সে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তির সম্মুখীন হইল। সে লোক দুই একটা প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিল যে আগন্তুক গণনা করাতে ইচ্ছুক এবং উপযুক্ত অর্থেরও অভাব নাই। সে তৎক্ষণাৎ একখণ্ড সাদা কাগজে নীলাদ্রির নাম লেখাইয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া নীলাদ্রিকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

জ্যোতিষী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া উপবিষ্ট। ভিতরের প্রকোষ্ঠ বলিয়া আলোকের তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই। জ্যোতিষী চসমার সাহায্যে একখণ্ড কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন,

'বস। ফিস্ আনিছ?'

নীলাদ্রি জানিত জ্যোতিষীর ফি দশ টাকা। সে পকেট হইতে ১০৲ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বিছানার উপর রক্ষা করিল। পরে বাম হস্তের দ্বারা নস্যাধার গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে পরম শান্তির সহিত নস্য লইল।

'কি জান্‌তি চাও?'

'ভবিষ্যৎ।'

'আরে ভবিষ্যৎ ত সগগলি জান্‌তি চায়! পরীক্ষা সম্বন্ধে না বিয়া সম্বন্ধে, না চাকুরী সম্বন্ধে—কোন্‌ডা?'

'সব, সব।'

'তার কারণে আর দুই টাকা চাই।'

নীলাদ্রি দুই টাকা রাখিল। জ্যোতিষী হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে যাইতে বলিলেন। পরে আপনার বাম হস্তের উপর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন।

'বাপ আছে, মা আছে, কেমন কিনা?'

'হুঁ।'

'মায়ের আছে অম্লরোগ, বাপ পয়সাডা ভাল বাসেন।'

'হু।'

'শিশুকালে বাতশ্লেষ্মার ক্ষেত্রে বিগার হইছিল তোমার?'

'হুঁ।'

'তিন বছর তিন মাস আগে বিয়া দিছে তোমার বাপে।'

'ঠিক।'

'বিয়াতে সুখ পাইবা না। ইস্ত্রী হইছেন অলক্ষণা পতি-ঘাতিনী।'

'কি? পতি-ঘাতিনী?'

'আরে বাপু, চুপ কর, শুন্যা যাও। কথা কও ক্যান্?' 'স্ত্রী জাতেঃ স্বামিনাশঃস্যাৎ পুংং সা জায়া বিনশ্যতি।' বুঝলে? ন্যাহাপড়ায় যুৎ হতিছে না। ফেল্ মারিছ দুই, দুইবার।'

'আশ্চর্য্য!'

'চাহরীর দেরী আছে। ভাল চাহরী অইব। সেই কালে মোনে করবা।'

'চাকরী এখন থাকৃগে। পরীক্ষা পাস কবে হবে, সেইটা বলুন।'

'হঃ! হঃ! পরীক্ষা পাস অইবা নাত কি না অইবা? গ্রহশান্তি চাই। গ্রহশান্তি চাই।'

নীলাদ্রি বুঝিল ওদিকটা এখনও মেঘাচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিল 'আমার স্ত্রী পতিঘাতিনী হবে বল্লেন: তার কি কোনও উপায় হতে পাবে?'

'উপায়? উপায়—ইস্ত্রীর সঙ্গে ঘর না কবা।'

নীলাদ্রি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল। সে অনেক চিন্তা করিতে লাগিল। বাড়ীতে কাহাকেও কিছু বলিল না।

৩

নীলাদ্রি মুখে কাহাকেও কিছু না বলিলেও, তাহার ব্যবহারে কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার জীবনযাত্রার পক্ষে স্ত্রী নামক পদার্থটী সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। নীলাদ্রি যে তাহার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করিত, তাহা নহে। সব সময়ে মৃত্যুরূপিনী একটা নারীর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা একত্রে বাস করিতে হইবে, এই চিন্তাই ছিল কষ্টকর; কাজেই কিছুতেই তাহার স্ত্রীকে পিতৃগৃহ হইতে আনিবার কল্পনাকে সে মনে স্থান দিতে পারিল না। সুতরাং ইন্দুমুখীর পিতৃগৃহ-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার কোনও আসন্ন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

নীলাদ্রির পিতা পঙ্কজ বাবু ভাবিলেন, এত সন্ধ্যা আহ্নিকের মধ্যে স্ত্রীর একটু স্থান হওয়া কঠিন বটে। নীলাদ্রির মাতা সংসারের পাষাণচাপে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিলেন। তাঁহার অম্লরোগ দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পঙ্কজ বাবু এ রোগ দুঃসাধ্য বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই এতদর্থে ডাক্তার কবিরাজকে পোষণ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। রোগ যখন বড় বেশী বাড়িয়া উঠিত, তখন পাড়ার ভূষণ কবিরাজের নিকট হইতে বিনামূল্যে দুই এক পান ভাস্কর লবণ আনিয়া সযত্নে সেবন করাইতেন।

নীলাদ্রি তাহার স্ত্রীটিকে একেবারে অনাবশ্যক মনে করিলেও, তাহার মাতা সংসারের পক্ষে এরূপ অনাবশ্যকতার একটু আধটু প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন। পৌত্রমুখদর্শনের আশায়, না হয়, বিধাতা বাদ সাধিলেন কিন্তু সংসারের ঝক্কি চিরদিন কে কুলাইয়া দেয়? বলিতেন,

'বাবা নীলু, আমি ত বুড়ো হয়েছি, আর পেরে উঠিনে সংসার দেখে কে?

নীলাদ্রির এ কথাটায় হর্ষবিষাদ উভয়ই যুগপৎ উপস্থিত হইত। বিষাদ এই জন্য যে, সে কিছুতেই পত্নীকে লইয়া ঘর করিতে পারিবে না। হর্ষের একটু আভাষ পাইত এই মনে করিয়া যে মাতা হয়ত আবার বিবাহ দিবার প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তিনি সেদিক দিয়াও যাইতেন না। তাঁহার মাতৃহৃদয় অসহায়া পল্লীবালার জন্য একটু বেদনা অনুভব করিত। আহা, এখন তার সোমত্ত বয়েস। কোনও সুখই সে ভোগ করিতে পাইল না। চিরদিনের জন্য তাহার পথে কণ্টক দিয়া রাখিব, এমন কোনও ব্যবস্থায় আমি সম্মত হইতে পারিব না, এমনই কিছু তিনি হয়ত ভাবিতেন।

ইন্দুমুখীর মাতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। তিনি ধরা-ছোঁয়া না দিয়া জবাব দিতেন। বধূমাতাকে আনিবেন বই কি! এই ছেলের পরীক্ষাটা চুকিয়া গেলেই সোনামণিকে আনিতে পাঠাইবেন। পরীক্ষার পড়া কি সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই! পরিবার কাছে নাই, তবুও ছেলের মন কোথায় উধাও হইয়া যায়। পরিবার সঙ্গে থাকিলে কি আর লেখা পড়া হয়? উনি বলিয়াছেন, এই আই-এ টা পাশ দিয়ে বি-এ টা পাস করিলেই সাহেবকে ধরিয়া ডেপুটীগিরিতে ঢুকাইয়া দিতে পারিবেন। সাহেবের নিকট ওঁর মান প্রতিপত্তি খুব।

ইন্দুমুখীর ম্লান মুখ আর একটু ম্লান হইল। তাহার মাতা দিন দুই, আড়ালে চোখ মুছিলেন। ইন্দুমুখীর পিতা কনক চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। প্রফুল্ল

কমলের মত ইন্দু কাঁদিয়া কাটিয়া চক্ষু ফুলাইল এবং মনে মনে যমের স্মৃতিশক্তির প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল।

পঙ্কজ বাবু সমস্তই শুনিলেন, কতক কতক বুঝিলেন। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের উপর জোর চলে না। পুত্রের সহিত যে মিত্রবৎ আচরণ করিতে হইবে, ইহা চাণক্যের যুগের কথা। এ যুগে মিত্রবৎ আচরণ করিতে চাহিলেও পুত্রপ্রবরেরা সে ধৃষ্টতা সহজে সহ্য করে না। কাজেই তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

আবারও নীলাদ্রি গ্রহশান্তির অভাবে ফেল করিয়া বসিল। ইহাতে তাহার নিজের আধ্যাত্মিক সাম্যাবস্থা কিছুমাত্র বিচলিত হইল বলিয়া বোধ হইল না। নস্যের খরচ আনাকয়েক বাড়িয়া গেল মাত্র। কিন্তু তাহার পিতার ধৈর্য্যের মাত্রা প্রায় লঙ্ঘিত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার শরীরও কিছুদিন হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নীলাদ্রিকে ডাকিয়া বলিলেন:

দেখ, বাপু আর কলেজের মাহিনা আমার পক্ষে দেওয়া অসাধ্য হয়ে উঠছে। আয় যা, তা ত জান?

নীলাদ্রি মস্তক অবনত করিল। পঙ্কজ বাবু আবার বলিলেন:

'বেয়াই বেঁচে থাক্‌লে, তাঁকে এই মাইনেটার ভার নিতে বল্‌তে পারা যেতো। কত দিন লাগবে তা ত বোঝা যাচ্চে না।'

নীলাদ্রি বুঝিল, সে পুনঃ পুনঃ ফেল্ করায় পিতা এই মৃদু ভৎ'সনা করিতেছেন। পঙ্কজ বাবু বলিলেন,

'দেখ্, বেয়ানের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে, শুনেছি! একবার গেলে হয় না?'

নীলাদ্রি ক্ষিপ্রতার সহিত বলিল, 'দোষ কি? একবার বেড়িয়ে আসুন না!'

'হতভাগা। আমি কি আমার যাবার কথা বলছি? যাবি তুই।'

'ওঃ।'

'কি বলিস্? একবার গিয়ে শাশুড়ীকে প্রণাম করে আয়। বৌমাকে নিয়ে আস্‌তেও পারবি, আর ঐ কথাটা একটু ইঙ্গিতে জানিয়ে আস্‌তে যদি পারিস্—'

'না, আমি সে পারব না। তাদের মেয়ে যখন আনব না স্থির আছে, তখন তাদের কাছে হাত পাততে যাওয়া হতেই পারে না।—'

"মেয়ে আনব না স্থির আছে—এর মানে কি? আমি ত কখনও এমন স্থির করি নি। তবে কে স্থির করলে?—

'আমি স্থির করেছি।'

'কেন?'

'সে আমি বল্‌তে পারব না। তবে এইটুকু আপনাদের জানিয়ে রাখলে দোষ হবে না যে ঐ মেয়ে ঘরে আন্‌লে আপনাদের ভাল নাও হতে পারে—'

'মেয়ে ঘরে না আনতেই যেটুকু লাভ হয়েছে, তার মূল্য কিছু কম নয়। পাঁচ হাজার টাকা আজকাল বাজারে চারটিখানি কথা নয় বাপধন। আমি ত মনে করি এবার মেয়ে আন্‌তে গেলেই ওর মা খুব ঘটা করেই পাঠাবে।—'

'তা পাঠাতে পারে এবং তাতে আপনাদের কিছু আর্থিক সুবিধা না হতে পারে তা' নয়। কিন্তু আমার অমঙ্গল হবে—'

'তোমার অমঙ্গল হবে? বৌ আন্‌লে অমঙ্গল হবে? পৃথিবীশুদ্ধ লোক বৌ নিয়ে ঘর করচে। এই আমরা বুড়িয়ে গেলুম, আর তোমার হবে অমঙ্গল। আমার মনে হয়, উল্টো হতে পারে; হয়ত এই বারে বারে ফেল করার দুর্ভাগ্যটা আর একজনের ভাগ্যে কেটে যেতেও পারে।—'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাপু? বলেই ফেলো।'

নীলাদ্রি গলা সাফ করিয়া বলিল:—

'বাবা আপনি বিশ্বাস করবেন যে বারে বারে আমি যে অকৃতকার্য্য হচ্ছি, এটা আমার দোষেই যে শুধু তা নয়। আপনার ছেলে এত বড় গাধা হতে পারে, এটা বোধ হয় আপনিও মনে করেন না। এ সব যা কিছু হচ্চে সে নিশ্চিত আপনার অলক্ষণা বৌমাটির জন্য। যে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক নিয়েছেন, তার এক পয়সা অবশিষ্ট থাকতে আমি হাজার চেষ্টায়ও পাস হতে পারব না।'—

পঙ্কজ বাবু হতবুদ্ধি হইয়া চেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন। পাঁচ হাজার টাকা সমস্ত উড়িয়া গেলে তবে ছেলে পাস হইবে!—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অঙ্গে ঘাম দেখা দিল।

পঙ্কজ বাবুর শরীর খুব অসুস্থ। তিনি সপরিবারে বায়ু পরিবর্তনের জন্ম কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। নীলাদ্রি কলেজ কামাই করিতে প্রথমে নারাজ ছিল। কিন্তু কি বলিয়াই বা পিতার সেবা করিতে বিরত হইবে? তাহার ধারণা ছিল যে যাহা হইবে, তাহা হইবে। নিয়তির গতি রোধ করিতে পারে, এমন সাধ্য কার? সে একদিন কাশীতে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। নীলাদ্রির মাতা বার বার বাবা বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পঙ্কজ বাবু অসুখের মধ্যেও একটু হাসিলেন।

তিনি দৈবকে বিশেষ মানিতেন না। দৈব বলিয়া কোথায়ও কিছু থাকিতে যে না পারে, তাহা নহে। তবে তাঁহার বিশ্বাস দৈব মহাশয় মানুষের জন্য অত মাথা ঘামাইবেন এমন প্রমাণ নাই। তিনি কতদিন ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা করিয়াছেন, কত দিন নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিয়াছেন, কত মাসদগ্ধা অগ্রাহ্য করিয়া উৎসব করিয়াছেন, কিন্তু দৈব কোনও দিন ভ্রূক্ষেপও করে নাই। সুতরাং সম্প্রতি দৈব যে এই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পশ্চাতে কোনও ষড়যন্ত্র করিবে, ইহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। তাহা হইলেও তিনি একদিন ত্রৈলঙ্গস্বামীর মন্দিরে নীলাদ্রিকে লইয়া উপনীত হইলেন। স্বামীজির এক শিষ্য করকোষ্ঠিতে পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা নিজের ও পুত্রের ভবিষ্যৎ গণনা করাইলেন। সাধু বাবা পঙ্কজ বাবুর রোগমুক্তি হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন, আর নীলাদ্রির সৌভাগ্যবতী বধূর কথা উল্লেখ করিলেন, পরীক্ষায় যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহা ঐ বধূর ভাগ্যে কাটিয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

নীলাদ্রি শুনিল। কিন্তু সাধুবাবার কথায়ও, পত্নীর সঙ্গলাভে যে তাহার অবশ্য মৃত্যু ঘটিবে না, এরূপ ভরসা কিছুতেই মনে জন্মিল না। 'স্ত্রীজাতেঃ স্বামিনাশঃস্যাৎ' মন্ত্রশক্তির মত তাহার মনকে সাঁড়াশি দিয়া ধরিয়া রহিল। সে তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না।

পঙ্কজ বাবুর মন কিন্তু দু'খানি তরুণ হস্তের সেবার জন্ম মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি প্রতিদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়া হনুমানঘাটে বসিয়া থাকিতেন ও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। নীলাদ্রি পিতার এরূপ অনাবশ্যক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিত না এবং তাঁহার অনুরোধ উপরোধ অবাধে উপেক্ষা করিত। তাহার নিজের মানসিক শান্তি অটুটই রহিল।

কিন্তু সহসা এক মাসীর অবির্ভাবে সে কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া পড়িল। এক দিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন এক মাসী হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাসী বলিলেন—

'কে বাবা, নীলু নয়? কড়া নাড়িতেই আমি বলি এ নীলু না হয়ে যায় না। আমায় চিন্তে পারছ না? আমি যে মাসী হই। না আপন বোন নয়, কিন্তু ঠিক মায়ের পেটের বোনেরই মত। আগে কখনও দেখ নি? তা দেখবে কোথা থেকে? সেই ছেলে বেলা থেকে কাশীতে এসে বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ে পড়ে আছি। তোমায় দেখেছি, তখন তুমি এই, এই বিড়াল ছানাটির মত। সে কি আজকার কথা, বাবা? সে আজকার কথা নয়। ওরে চাঁপা প্রণাম কর্, নীলুকে প্রণাম কর, এমন ছেলে হয় না, যেন চাঁদের টুকরো।'

চাঁপা চক্ষু নত করিয়া আসিয়া নীলাদ্রির পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। মাসীর দিকে চাহিতেই তিনি পরিচয় দিলেন—

চাঁপা? ওমা, চাঁপাকে চেন না? ও যে আমার ননদের মেয়ে। আহা কেউ নেই, ওর মা বাপ কেউ নেই। মাসী চক্ষু মুছিলেন।

নীলাদ্রি চাঁপার মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। চাঁপা সুন্দরী কি সাধারণ, তাহার বয়স বারো কি সতেরো, সে বিবাহিতা কি না, কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। তাহার ঘোমটাহীন মুখ দেখিয়া তাহাকে বালিকা বলিয়াই মনে হইল।

প্রথম দর্শনে যে ধারণা হইল, পরদিন সে ধারণা স্থির রহিল না। নীলাদ্রি দেখিল চাঁপা সুন্দরী এবং যুবতী। তাহার করুণ কোমল মুখখানি যেন লাবণ্যের সরোবরে ভাসিতেছে। নীলাদ্রি কিছু তটস্থ হইয়া পড়িল। চাঁপা নীলাদ্রির মাতার কাছেই থাকে। তাঁহার কাজে কর্ম্মে সহায়তা করে। নীলাদ্রির দর্শন-লিপ্সা সার্থক করিবার কোনও উপায় থাকে না।

কয়েক দিন পরে মাসী হঠাৎ গৃহদাহের সংবাদ পাইয়া যখন প্রস্থান করিবার সংকল্প করিলেন, তখন নীলাদ্রি তাঁহার প্রতি যে বিশেষ ভক্তিমান হইয়া উঠিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু যখন সে দেখিল যে মাসী একাই যাইতেছেন, তখন তাহার মন সুস্থির হইল। মাসী বলিলেন যে, এ বিপদে ঐ ডবকা মেয়েকে নিয়া তিনি কোথায় রাখিবেন। বোনের কাছে রাখিয়া যাওয়াই নিরাপদ। নীলাদ্রিও ঠিক সেই কথাই ভাবিতেছিল।

মাসী চলিয়া গেলেন। কিছু দিনের পরে তাঁহার প্রত্যাগমনের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কিন্তু তিনি যাহাকে রাখিয়া গেলেন, সে পঙ্কজ বাবুর সংসারকে পাইয়া বসিল। তাহার সেবা বেশীর ভাগ পাইতেন পঙ্কজ বাবু। নীলাদ্রি এই বিষয় প্রকাশ্যভাবে আপত্তি না করিলেও বুঝাইয়া দিতে ছাড়িত না যে, শুশ্রূষার প্রয়োজন তাহার নিজেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহার মাতা স্বামীর ভার অনেকটা চাঁপার উপর দিয়া পুত্রের সম্বন্ধে বেশী যত্নবতী হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে যত্ন নীলাদ্রি যে পছন্দ করিত না, ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেন না।

একদিন নীলাদ্রি মুখ ফুটিয়া বলিল—'তোমরা মা ঐ একবিন্দু মেয়েটাকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না।'

মাতা বলিলেন—'কেন রে কি হলো? তোর যে ভারি মমতা দেখতে পাচ্ছি।'

'ঐ ত। উচিত কথা বল্‌লেই রাগ হয়। মেয়েটা এ বাড়ীতে আসা অবধি একটুকু বসতে পায় না। হয় তোমার সংসারের কাজ করছে, নয় ত বাবার খাবার নয় বিছানা গোছ করছে। মানুষের ত একটু আধটু বিশ্রামের দরকার আছে।'—

'কি জানি বাপু, তোমাদের কোন সময়ে কার উপর দরদ হয়, তা বোঝা ভার! বেশ চাঁপাকে বিশ্রাম দেওয়া যাবে; আমার কাজ আমিই করব। বলে,—ঢেঁকির আবার স্বর্গ!'—

নীলাদ্রি বোধ হয় মনে মনে একটু লজ্জা অনুভব করিল; কারণ মায়ের ঐরূপ ঝঙ্কার শুনিয়া সে দুর্গা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও চাঁপার দর্শন পাইল না।

রাত্রে যখন নীলাদ্রি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন দেখিল যেন কাহার নিপুণ হস্তে আজ শয্যা সুচারুরূপে রচিত হইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল—তাহার মধ্যে সব চেয়ে বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিল—চাঁপার মুখের ছবিখানি! হঠাৎ অবগুণ্ঠনে মণ্ডিত হইয়া চাঁপা শয্যার প্রান্তে বসিল এবং নীলাদ্রির পদ সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নীলাদ্রি চমকিত হইয়া বলিল:

'ওকি করছ? আমার পা টিপ্‌তে তোমায় কে ব'লে দিল?'

চাঁপা নত মুখে বলিল:

'মা বলে দিয়েছেন।'

'ছিঃ ছিঃ সে কি হয়! মা বোধ হয় আমার কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তোমায় আসতে বলেচেন!'

'সে আমি জানি নি, বাবু, পা টিপে দিতে বলেচেন পা টিপে দিচ্ছি।'

'না, না সে কিছুতেই হতে পাবে না। আমায় মাপ কর, চাঁপা।'

'আমার নাম চাঁপা নয়।'

'তবে তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ইন্দুমুখী। আমি তোমার দাসী।'

মহাশ্বেতা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

মানস-সরসী তীর-তল
কমল-সৌরভময় ;
ঘন সে নীলজল নিরমল
গিরির ছায়া বুকে বয় !
ধবল-গিরি, তা'র শির' পর
ধবল তুষারে যে রবি-কর—
সে ছবি জলে করে টলমল্
মেঘের ছায়ে পায় লয় !
মানস-সরসীর তীর-তল
কমল-সৌরভময় ।

বনের ছায়া চুমে জলভার
তীরে যে দেবদারু-বন ;
অনাদি মর্ম্মর শুনি তা'র
সরসী-তীর নিরজন ।
সে বন ছায়া-তল ঘিরি হায়,
ঘুরিতে মন মোর বাহিরায় ;
শালের পল্লবে ধ্বনি কা'র ?
শিহরি' উঠি অকারণ—
বুঝি-বা অপ্সর-বনিতার
পর্ণে বাজে আভরণ !

গুল্ম-তিমিরের মাঝে দূর
পড়িছে ক্ষীণ রবি-কর—
আঁজলি-ভরা যেন চূর চূর
উজল মণি-নিরঝর !
যে রেখা-অঙ্কণে চারিপাশ
চামেলি ফোটে যেন, ফোটে কাশ—
সহসা সেথা যেন শুনি সুর
বুঝি-বা গাহে কিন্নর—
গুল্ম-তিমিরের মাঝে দূর
পড়িছে ক্ষীণ রবি-কর !

সে সুরে বায়ু বুঝি থেমে যায়
বনের ভাষা অবসান !
নীরবে ছায়া-নটী নেচে যায়—
নীরবে শুনি সেই গান ।
শুভ্র সোপানের চারিধার
সে সুর মায়া-ছবি রচে কা'র ?
শুভ্র হিম-গিরি-বন ছায়া
শুভ্রতম সুর তান ।
সে সুরে বায়ু বুঝি থেমে যায়
বনের ভাষা অবসান !

বসনে রাগ-রেখা নাহি তা'র
টগর-শ্বেত সেই বেশ ;
পদ্মবীজমালা করে তা'র—
শুভ্র নহে তবু কেশ !
উদার অম্বর যেন হায়,
ললাটে ছায়া তা'র সঁপি' যায়—
সুনীল মানসের নীর-ভার
সঁপিল নয়নের রেশ !
বসনে রাগ-রেখা নাহি তা'র
টগর-শ্বেত সেই বেশ ।

কোমল অঙ্গুলি তর তর
সেতার-বুক বহি' ধায়—
ঝরিছে সঙ্গীত ঝর ঝর
বায়ুর মনে মুরছায় !
ভাবিনু নর দেহ কেন আর,
নীরবে করি এরে পরিহার ।
মরাল-সম ধাই মন-সর
করুণ গান গাহি' হায়—
কোমল, অঙ্গুলি তর তর
সেতার-বুক বহি' ধায় !

কহিনু, 'দেবী, তুমি বাণী মোর
তোমারে ধ্যানে হেরি তাই'—
শুনিনু, 'ছিঁড়ে গেছে প্রেম-ডোর,
হেথায় গান গেয়ে যাই !'
শুনিনু, 'জীবনের গাহি' গান—
হেথায় হ'বে মোর অবসান,
সেতারে রাখি তাই আঁখি লোর,
হেথায় গান গেয়ে যাই !'
কহিনু, 'দেবী, তুমি বাণী মোর,
তোমারে ধ্যানে হেরি তাই !'

ওগো, পদ্মবীজমালা করে ওই
সেতারে শুনি রিণি রিণি—
কহিনু, 'দেবী, আমি হ'ব জয়ী
ও-কর-পল্লব জিনি' !
অধরে ক্ষীণ হাসি চমকায়
তরুর মর্ম্মর দূরে হায়—
কহিনু, 'বাণী, আমি হ'ব জয়ী
ও কর-পল্লব জিনি'
শুনিনু, 'আমি কা'রো প্রিয়া নই—
আমি যে চির বিরহিণী !'

পুস্তক-সমালোচনা

গীতা ও গীতাসহচরী—রামকৃষ্ণ লাহিড়ী কৃত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মূল শ্লোক, অন্বয় দীপিকা, সুস্পষ্ট অনুবাদ এবং বহু টীকা ভাষ্যের অনুসরণ পূর্ব্বক মূল শ্লোকের তত্ত্ব ও তাৎপর্য্যের গীতাসহচরী নামে কথিতা-ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সান্যাল বি, এ ৩নং বুগীপাড়া মেন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রায় সাড়ে চার শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর—। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান যুগে গীতোক্ত তত্ত্বের বহুল প্রচার বিশেষ প্রয়োজন। সংস্কৃত পাঠ সম্যক ভাবে গ্রহণ করিবার মত বিদ্যা আমাদের মধ্যে বহু ব্যক্তির নাই—সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকসাধারণের বিশেষতঃ আমাদের ঘরের মা ও ভগ্নিগণের হাতে এ পুস্তকের সমাদর হইবে। অনুবাদ অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল, কোথাও কষ্ট-কল্পিত বা আড়ষ্ট ভাব নাই। পাঠের আনন্দ অব্যাহত থাকে। আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

কাব্য-দীপালি—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। রায়, এম্, সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স। মূল্য ৪৲ টাকা।

ভূমিকায় বৎসর কালের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার সংবাদে আমরা একান্ত আশ্বাস লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশে কবিতা পুস্তকের বিক্রয় সংখ্যা আদৌ আশাপ্রদ নহে। কোনো কাব্যকার কবি যে এ বিষয়ে অন্যমত হইবেন, এমন আশঙ্কা আমরা করি না। কেননা বহুতর কবির মুখেই আমরা শুনিতে পাই যে পত্রিকার পত্রান্তরালেই তাঁহাদের কাব্য রচনার দরকার শেষ হইয়া যায়—পুস্তকাকারে রচনা-চেষ্টার আর উৎসাহ থাকে না। কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করিলে, তাহা বিক্রয় হইতে বহুকাল লাগে, খরচ পোষায় না। অনেক সুপ্রতিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠ ও অপ্রতিষ্ঠ কবির সাক্ষ্য হইতেই আমাদের এই অভিজ্ঞতা। এমন অবস্থায়, বিবাহের প্রীতি-উপহার লৌকিকতায় হউক বা আলমারী সাজাইবার সৌখীনতায় হোক্ এমন একখানি

কাব্যগ্রন্থ যে, অনতিকালমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণে পৌছিল, এ সংবাদ মন্দের ভালো।

যাহাহউক এক বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের নিঃশেষ সংবাদ হইতে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ হইতে আমরা ন্যায্য আশা করিতে পারি যে, প্রকাশক কোম্পানী এই গ্রন্থ প্রকাশে লাভবান হইয়াই দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়াছেন। শুনিয়াছি প্রথম সংস্করণের জন্য কোনো লেখককেই, এমন কি, সম্পাদককেও প্রকাশক কিছুই দেন নাই। বর্ত্তমানে লভ্যাংশ হইতে সম্পাদককে ও লেখক দিগকে সাধ্যমত দক্ষিণাদান করিবার ব্যবস্থা করিলে রায় বাহাদুরী কোম্পানীর ব্যবসাদরী ও বাহাদুরী একসঙ্গে বজায় থাকে। যে সকল কবি কাব্য-শ্রম হইতে কোনোদিন কিছু পাননা, প্রকাশকের এই অতি সহজ উদারতায় তাঁহারা উৎসাহিত হইতে পারেন। (শুনিয়াছি আর নাকি রায়-বাহাদুর বলিয়া প্রকাশকের নাম নাই!)

বাজারের মুখ চাহিয়া, এই সংস্করণে আদর্শের কিঞ্চিত তারতম্য ঘটিয়াছে এবং কাব্যবিচারে একটা অপক্ষাপতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু যাঁহাদের চক্ষে দূরবীক্ষণ আছে এই অপক্ষাপাতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব তাঁহাদের লক্ষ্য এড়াইবে না। ইহা উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা কষ্টকরও নহে, তবে সে স্পষ্টভাষণে অভিমতের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইবে আশঙ্কায় কথাটা ইঙ্গিতেই বলিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য যে অনুজার সাহায্যে যে কার্য্যভার কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ছিল, জায়ার সাহায্যে এবারে সেই সম্পাদন কার্য্য অধিকতর সহজ হইয়াছে—এ তথ্য গ্রন্থ পাঠে সত্য হইয়া উঠে।

——— —ব্যা

শতনরী :—শ্রীকরুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক :—বাগচী এণ্ড সন।

করুণা নিধান বাবু প্রতিষ্ঠাবান কবি—পূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প'ড়েছি, তাঁর কয়েকখানা বইয়েরও বেশ আদর আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা ব'লে রাখি করুণা নিধানের কবি হিসাবে গুণ অনেক থাকলেও দোষও কম নেই। ছন্দ দোষের কথা মারাত্মক হ'লেও উপস্থিত আমরা ছেড়ে দিলাম। করুণা নিধানের কবিতায় organic unityর একান্ত অভাব, স্থানে স্থানে যে প্রেরণাটুকু আসে সেইটুকুকে তিনি ভাষার বাহন দিয়ে খানিক দূরে ঠেলে দেন, যেই প্রেরণা সারা হয় অমনি anticlimax এর গড়ান্ বেয়ে ভাবটী আছাড় খেয়ে মাটীতে পড়ে। এই রকমের কবিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বর্ষায়' কবিতাটীর উল্লেখ করি—বর্ষাকে চঞ্চলা চপলা নৃত্যপরা বালিকার সঙ্গে তুলনা ক'রে তার পরের ছত্রেই 'কানে কাঁটা কই'এর উল্লেখ করা যেমন অসঙ্গত তেমনি বিসদৃশ ঠেকে! এই বিবোধের মূলে আছে অনুভূতির দুর্ব্বলতা। প্রাকৃতিক কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা ক'রলে দেখতে পাবেন করুণা নিধানকে appeal ক'রছে বহিঃ প্রকৃতির সমষ্টিগত অস্তিত্বকে, তার অন্তর্লীন কোন নিগূঢ় সত্ত্বকে তিনি টেনে বার ক'রতে পার্‌ছেন না; তাঁর শোক কবিতাতেও এই জন্যে সার্ব্বজনীন উপাদান তেমন কিছু নেই। যে দুঃখ একের সীমা ছাড়িয়া বহুর মধ্যে বিকাশ লাভ করে তাই সাহিত্য, যেমন In Memorium, 'এষা', 'স্মরণ'—'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।' তবু মৃত্যু কবিতাটী অমাদের ভাল লেগেছে

করুণা নিধান Introspective কবি নন্, তিনি প্রধানতঃ চিত্রের কবি, চিত্রাঙ্কণে তাঁর অসাধারণ পটুত্ব মেনে নিতেই হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-

"কমলা ফুলি ঘোমটা খুলি এলিয়ে দিয়ে চুল,
একলা ঘরে বাদশাজাদী চিঁড়তেছিল 'গুল'।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্কা পানে চায়,
সুকি রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌লে যুবা তায়।"

—বাদশাজাদী

আধ্যাত্মিক এবং প্রেম-মূলক কবিতাতেও তিনি প্রথমটা মনকে হয়ত বেশ কতকটা অতীন্দ্রিয়তার আভাষ দিলেন, একটা transcendent রাজ্যের ইঙ্গিত দিলেন; তারপর মেরুদণ্ডের জোরের অভাবে মধ্য পথে এসে কল্পনা didactic আড়ষ্টতা নিলে না হয় দুর্ব্বোধ হেঁয়ালির জাল বুন্‌তে সুরু করে দিলে। আর এই অবোধ্যতা এত বেশী দোষ যে মনে ক'রতে ইচ্ছে হয় কবি তা ইচ্ছে ক'রে করেছেন এই দোষে তাঁর ভাল ভাল কতকগুলি কবিতাকে ছেঁটে কেটে না নিলে উপায় নেই, মধ্যে মধ্যে এক একটা সুন্দর লাইন, এক একটা সুন্দর চিত্র, একটা সুন্দর ভাব—কাঁটার বনে ইতস্ততঃ জ্বলে' ওঠা জোনাকির মত ঝিকমিক্ ক'রে পাঠককে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। বস্তুতঃ যাঁরা কবির হাত থেকে solid কিছু পেতে চান্ তাঁরা শতনরী পড়ে হতাশ হবেন। মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেশ-বন্ধু আমাদের খুব ভাল লেগেছে। বেশ একটা স্নেহ-করুণ স্বাভাবিকতার প্রেরণা কবিতা ক'টীতে আছে, কিন্তু উৎসর্গ পত্রিকার নূতন কবিতাটী একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর ব'লে মনে হ'ল।

——— —সে

প্রত্যর্পণ-মূল্য বা সারেণ্ডার ভ্যালু কম হয় কেন ?

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

বীমাকারী সাধারণতঃ বীমাপলিসি সংক্রান্ত বিষয়ে মাথা ঘামান না এবং বীমা বিষয়ে কোনও প্রকার খোঁজ লন না। কাজেই যখন পলিসি কোম্পানিকে ফেরত দিয়া সারেণ্ডার ভ্যালু চাহেন তখন উহার অঙ্কটি দেখিয়া চটিয়া যান ও মনে করেন যে বীমা কোম্পানি তাঁহার টাকাগুলি অযথা আত্মসাৎ করিল। তিনি বাঁচিয়া আছেন ও কয় বৎসর প্রিমিয়ম চালাইয়া গিয়াছেন অতএব কোম্পানির উচিত তাঁহার টাকা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া। এইরূপ মনোভাবই বীমাকারীর হইয়া থাকে।

বীমাকারীগণ সাধারণতঃ জানেনই না যে বীমা এক চুক্তি বিশেষ। পলিসিখানা সেই চুক্তির রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল। এই চুক্তি বা কণ্ট্রাক্ট অনুসারে তিনি প্রতি কিস্তিতে টাকা দিতে বাধ্য এবং তিনি যতদিন চাঁদা দিবেন ততদিন কোম্পানীও পলিসিলিখিত সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ আইনতঃ যে চুক্তিতে লোকে আবদ্ধ হয় সে চুক্তি উভয় পক্ষের কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। যদি কোনও পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করে তবে সেই পক্ষ অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। বীমার ক্ষেত্রে কিন্তু বীমাকারী এ সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সুবিধা ভোগ করেন।

একবার পলিসি বাহির করিয়া দিবার পর কোনও কোম্পানি একথা বলিতে পারে না যে সে চুক্তির সর্ত্ত রক্ষা করিতে অক্ষম অতএব বীমাকারীর টাকা আর সে লইবে না। কিন্তু বীমাকারী যে কোনও সময়ে বলিতে পারেন যে তিনি আর বীমার টাকা চালাইবেন না। অর্থাৎ তিনি যে কোনও সময় চুক্তিভঙ্গ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণতো তাঁহাকে দিতেই হয় না বরং তিনি আবার অপর পক্ষকে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করান। অর্থাৎ কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া কোম্পানিকে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করান।

এই জন্য পূর্ব্বে প্রত্যর্পণ-মূল্য দেওয়া হইত না। কিন্তু যখন বীমা-কোম্পানির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন প্রতিযোগিতায় কোম্পানিরা বীমাকারীকে অপর কোম্পানি অপেক্ষা কি সুবিধা দিবে ইহারই অন্বেষণে প্রত্যর্পণ-মূল্যের আবশ্যকতা আবিষ্কার করিল।

ইংলণ্ডের অ্যাকচুয়ারী সমিতি পূর্ব্বে প্রত্যর্পণ-মূল্যের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেই উক্ত সমিতিতে আলোচনার ফলে বিবেচিত হয় যে প্রত্যর্পণ-মূল্য দেওয়া চলে তবে তখন ইহাও স্বীকৃত হয় যে বীমাকারীর প্রত্যার্পণ-মূল্য সম্বন্ধে কোনও হক্ (রাইট) নাই।

কিন্তু এখন আর বলা চলে না যে প্রত্যর্পণ-মূল্যে বীমাকারির কোনও দাবী নাই। কোম্পানিরা স্বয়ং তাঁহাদের বিবরণী পুস্তিকায় প্রত্যর্পণ-মূল্য দিতে স্বীকৃত হন এবং আইন অনুসারে তাঁহাদের যে হিসাব সরকারের নিকট পেশ করিতে হয় তাহাতে প্রত্যর্পণ-মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হয়। অতএব এখন তাঁহারা আইনতঃও ইহা দিতে বাধ্য।

সাধারণ বীমাকারী জানেন না যে তাঁহাকে বীমা করাইবার জন্য কোম্পানির কত টাকা খরচ হয়। প্রায়শঃ প্রথম বৎসরের চাঁদার সমস্ত টাকাটাই এজেণ্টের কমিশন, ডাক্তারের ফি, অ্যাটর্ণির ফি, সরকারি ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি বাবদ খরচ হইয়া যায়। অবশ্য চাঁদার মধ্যে এই টাকাটা ধরা থাকে কিন্তু সেটা এমন ভাবে ধরা থাকে যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ সময়টায় পলিসিখানি বহাল থাকিলে প্রতিবৎসরই কিছু কিছু করিয়া খরচাটা ফেরৎ পাওয়া যায়।

অতএব যদি মেয়াদের মাঝখানে কেহ প্রত্যর্পণ-মূল্য চাহিয়া বসেন তবে কোম্পানি যে টাকাটা খরচ করিয়া বসিয়া আছে সেটা না কাটিয়া রাখিয়া চাঁদার টাকা বীমাকারিকে ফেরত দিতে পারে না।

ইংলণ্ডের অ্যাকচুয়ারী সমিতি (Institute of Actuaries) এ সম্বন্ধে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐ বৎসর স্থিরীকৃত হয় যে, "প্রত্যেক পলিসি বাবদ যে রিজার্ভ বা আমানত জমা বছর বছর গড়িয়া উঠে তদ্দ্বারাই প্রত্যর্পণ মূল্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে।" কিন্তু প্রত্যর্পণ-মূল্য ঠিক করিবার সময় নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। সুস্থকায় ব্যক্তিরাই প্রত্যর্পণ-মূল্য চাহিয়া থাকেন। ক্ষীণ-স্বাস্থ্য ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপারগ ক্ষেত্রেও বীমার চাঁদা চালাইয়া যান ইহার ফলে মৃত্যুহারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা হয়।

২। বীমা সংগ্রহ করিতে গোড়ায় যে খরচ হয় ও পলিসিটী যতদিন বহাল থাকে ততদিন কোম্পানীর যে খরচ হয় সে খরচ ফেরত পাইবার অধিকার কোম্পানীর আছে।

এই কারণেই প্রথম বৎসরে কোনও কোম্পানিই প্রত্যর্পণ-মূল্য দিতে পারেন না। আজকাল কোম্পানীরা সাধারণতঃ তিন বৎসর পলিসি বহাল না থাকিলে প্রত্যর্পণ-মূল্য দেন না। কেহ কেহ দুই বৎসর পূর্ণ হইলেই দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যর্পণ-মূল্য কষিবার সময় প্রথম বৎসরের চাঁদাটা হিসাব হইতে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়।

এই নিবন্ধটী নিতান্ত সাধারণ পাঠকের জন্য এবং যে সকল এজেণ্ট এসকল বিষয়ে আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের জন্য লিখিলাম। কাজেই একটা জটিল বিষয়কে সরল ভাবে বলিতে গেলে যে অনেক কথা বাদ পড়িয়া যায় তাহা মনে রাখিয়া বিশেষজ্ঞ যেন অসহিষ্ণু না হইয়া পড়েন। আমার উদ্দেশ্য বীমাকারীকে বুঝান যে প্রদত্ত চাঁদা অপেক্ষা প্রত্যর্পণ-মূল্য কম হইল বলিয়া তিনি যেন কোম্পানীর উপর চটিয়া না যান এবং বীমার উপর বীতশ্রদ্ধ না হন। আমি এরূপ দু'একজন লোক দেখিয়াছি বলিয়াই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উপরে যে পলিসি রিজার্ভ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি তাহা কি সে বিষয় কিছু বলিলে প্রত্যর্পণ-মূল্য কেন কম হয় তাহা স্পষ্টতর হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ের এখানে অবতারণা করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ ও অনেকটা অবান্তর হইয়া পড়িবে এবিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে। তবে প্রথম বৎসরের টাকাটা কেন কোম্পানী একেবারেই প্রত্যর্পণ-মূল্য কষিবার সময় বাদ দেয় তাহা বুঝাইবার জন্য একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ধরুন দশজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল,—"আমরা যদি আগামী দশ বছরের মধ্যে মারা যাই তবে প্রত্যেকের পরিবারকে তুমি ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিবে। যদি বাঁচিয়া থাকি কিছু দিবে না। আমাদের নিকট বাৎসরিক কত টাকা চাও?" পাঠক দেখিবেন যে বীমা কোম্পানী অপেক্ষা সর্ত্ত সহজ কেননা দশ বৎসর পরে টাকা ফেরৎ দিতে হইতেছে না। আমাকে দেখিতে হইবে বৎসরে কয়জনের মৃত্যু হইবে। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে মৃত্যুহারের তালিকা অনুসারে বৎসরে একজন করিয়া মারা যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রথম বৎসরে দশ জন চাঁদা দিবে, দ্বিতীয় বৎসরে ৯ জন চাঁদা দিবে, তৃতীয় বৎসরে ৮ জন চাঁদা দিবে —এইরূপে দশ বৎসরে মোট চাঁদা পাওয়া যাইবে— ১০+৯+৮ ···· ······+১=৫৫। দশ বৎসরে আমার দায়িত্বের পরিমাণ দশ হাজার টাকা। ১০,০০০কে ৫৫ দিয়া ভাগ দিলেই বাৎসারিক চাঁদার হার পাওয়া যাইবে। এই ভাগের ফলে পাওয়া যায় ১৮২৸৵০ কিন্তু হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা ১৮৩৲ বাৎসরিক চাঁদা ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে প্রথম বৎসরে মোট আদায় হইল ১৮৩০৲। প্রথম বৎসরেই একজন মারা গেল; তাহাকে দিতে হইল এক হাজার। আমার হাতে রহিল ৮৩০৲। এখন যদি বাকী নয়জন আসিয়া বলে—"আমরা চুক্তির মধ্যে থাকিতে চাই না—আমাদের যাহা পাওনা হয় দাও।" তাহা হইলে তাহাদিগকে ৮৩০৲ টাকাই ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যেকের ভাগে ৯১৲ টাকা পড়িবে। চুক্তিকারীরা যাহা দিয়াছিল তাহার অনেক কম। এই ব্যাপারটা যদি কোনও কোম্পানীর হইত তবে কোম্পানী এই ৯১৲ টাকাও দিতে পারিত না। কেন না প্রথম বছর যে ১৮৩০৲ আয় হইল তাহা আনয়ন করিতে খরচ হয়তো ১৮০০৲ হইত। তদুপরি মৃত্যুর জন্য যদি ১০০০৲ দিতে হয় তবে ১৮০০৲ খরচ দাঁড়াইত। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় হইল বেশী। কাজেই প্রথম বৎসরের চাঁদা হইতে কোনও অংশই প্রত্যর্পণ-মূল্য বাবদ কোম্পানী দিতে পারে না।

অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

এই কোম্পানী ১৯২৫ সালে মছলিপত্তম সহরে স্থাপিত হয়। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের মধ্যে ভারতবিখ্যাত ডাঃ পত্তভাই সীতারামায়া, অনারেবল রামদাস পণ্টলু, শ্রীযুক্ত টি, প্রকাশম এবং শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর রাও প্রমুখ জননায়ক থাকাতে অচিরাৎ ইহার প্রতিষ্ঠালাভ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত ছিলাম। আমাদের সে প্রত্যাশা যে সার্থক হইয়াছে, নিম্নে ইহার কয় বৎসরের ব্যবসায়-অঙ্কের তালিকা হইতে সে কথা স্পষ্টই বোঝা যাইবে।

সন	বাৎসরিক আয়	লাইফ ফাণ্ড
১৯২৬	২৬,৭৮৭	৪,৭৬১
১৯২৭	৪৬,৯১৩	২৯,১৮২
১৯২৮	৮১,২৬৯	৫৬,২৭৬
১৯২৯	১,৬২,২৭০	১,১৭,২০৩
১৯৩০	২,০৩,৪৫৩	২,১৫,১২১

এত দ্রুত উন্নতি করিতে অনেক কোম্পানীকে দেখা যায় নাই। ইহা যে শুধু কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর কৃতিত্বের প্রামাণিক তাহাই নয়, এই কোম্পানীর বীমা-পলিসির দেয় অনেকানেক সুখ-সুবিধাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানী বার্ষিক চাঁদার উপর পলিসি-কারীকে শতকরা ২॥০ টাকা রিবেট দেয়। কোন প্রকার অতিরিক্ত চাঁদা না নিয়াও কোম্পানী অক্ষমতা বীমার ব্যবস্থা করিয়াছে। বীমাকারীদের পক্ষে এই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে ধনবিনিয়োগ ব্যাপারে কোম্পানী জাতীয় গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহকে (যেমন, কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক) সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বত্র স্থান দিতেছে। 'উপাসনা'য় আমরা এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ন্যস্ত টাকা যদি সরকারী তহবিলের গহ্বর পূর্ণ না করিয়া দেশের নিরন্ন কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থে নিযুক্ত হয়, তবে আমরা আশা করিলেও করিতে পারি যে এই ভারতবর্ষেই আবার আবাদে সোণা ফলিবে। এই কোম্পানী ইহার ন্যস্ত ৩ লক্ষ টাকার দেড় লক্ষ টাকা এই কল্পে নিয়োজিত করিয়াছে। আমরা কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের এই সাধু কার্য্যের সমর্থন করি। ন্যস্ত টাকার সুদ হইতে কোম্পানীর বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আসে। কোম্পানীর বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকারও উপর। দাবী পূরণ বিষয়ে কোম্পানী ইহারই মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইহারই মধ্যে কোম্পানী ৩১ হাজার টাকা দাবী দিয়াছে।

কার্য্যসূচনাতেই প্রাপ্ত চাঁদা ২৬,৭৮৭ টাকা হইতে কোম্পানীর সমগ্র ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া লাইফ ফাণ্ডে ৪,৭৬২ টাকা জমা পড়িয়াছিল। সেই জমার টাকা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে।

ব্যয়-সঙ্কোচের দিকেও কোম্পানী যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ১৯৩০এর ব্যয়-পরিমাণ হইতেছে শতকরা ৩৯। খুব কম কোম্পানীই এ পর্য্যন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যয়-সঙ্কোচের পরিচয় দিয়াছে।

প্রথম মূল্যাবধারণের ফলেই কোম্পানী হাজার করা বার্ষিক ১০৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং ইহার মধ্যে ফাঁকি নাই। ভারতবর্ষের কৃতী বীমাঙ্কবিদ্ পুণার শ্রীযুক্ত ম্যারাঠে এই মূল্যাবধারণ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"It is a matter for great congratulation that your Company has acheived a result which is very rare at such an early stage of a Life Insurance Company and I conclude this Report with the hope that the next valuation will disclose a still more satisfactory result enabling you to set a continuously good example to workers in the cause of Life Assurance in India."—অর্থাৎ কোনও বীমা কোম্পানীর পক্ষেই এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কৃতিত্ব গৌরবজনক, পরবর্ত্তী মূল্যাবধারণে কোম্পানী এতদপেক্ষাও অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইবে, এ ভরসা আমি রাখি।

কোম্পানী বঙ্গদেশ ও আসামের জন্য মেসার্স রায় এণ্ড কোম্পানীকে চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের অফিস কলিকাতায় ৩নং মিশন রো। আমরা ইহাদের পরিচালক কুমার শৌরীন্দ্র বাবু ও শৈলেন্দ্রবাবুকে জানি; সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত যুবক ইহারা, উদ্দেশ্যের সততা ও কর্ম্মকুশলতার জন্য ইহারা বীমা-ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবেন এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১৯২৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া'র যে মূল্যাবধারণ হয়, তাহার বিবরণী লিখিতে একচুয়ারী মহোদয় যেমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নীচে তাহার দুই একটি কথা তুলিয়া দিতেছি—

একটি বীমা-কোম্পানীর বিচার যতখানি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মরূপে করা যায়, তাহা করিয়াও দেখিতেছি, 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া' ইহার সমস্ত প্রকার দায়িত্বের জন্য যথেষ্ট মজুত তহবিল রাখিয়াও বাড়তি দিতেছে ৬ লক্ষ টাকা। আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে বাজার-চলতি সুদের বর্ত্তমান হার যদি কমিয়া যায়, তবে কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। আমার মতে বাড়তি তথাপি ৪ লক্ষ টাকা থাকিবে। অবশ্য কোম্পানীর বর্ত্তমান বোনাসের পরিমাণের (এণ্ডাউমেণ্ড ১৮ টাকা; আজীবন বীমা ২২৷৷৹ টাকা) এই হ্রাসে কিছুই আসিয়া যাইবে না, কেননা বোনাসের পরিমাণ, কমাইবার প্রয়োজন সে অবস্থাতেও হইবে না। অবশ্য কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে কেন কোম্পানী বর্ত্তমান বোনাসের পরিমাণ বাড়াইতেছে না, তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বৃদ্ধি-ঘোষণা কোম্পানীর এ অবস্থায় নিশ্চয় করা যায়, কিন্তু কি প্রয়োজন? উন্নতির গতি ধীর স্থির হইলে সে-সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই থাকে না,—এক দৌড়ে অনেকখানি ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইবারই বা কি দরকার?

ইহা হইল ১৯২৬ সনের কথা।

১৯২৬ সনের পর কোম্পানীর ব্যবসায়ের হিসাব নীচের তালিকায় দ্রষ্টব্য—

বৎসর		১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
আদায়ী চাঁদা		৪,৮৯,২৮৭	৬,১৬,৩৬২	৬,৫৭,৮৮৩
সুদ ও ডিভিডেণ্ড		১,৩৬,১৩৯	১,৩০,৬৬৭	১,৫৬,৪২২
দাবী	মৃত্যুজনিত	৫৯,৮৭৬	১,০০,৭৫১	১,২১,১৭৩
	বীমা কাল পূরণে	৫২,১৪৭	৫৪,৭৯৫	৩৭,১৮৮
কমিশন ও ব্যয়		১,৭০,১৬৭	১,১৬,২৬০	১,৯৭,০৪৫
		২৪,৪৯,১৯০	২৭,৯১,২১০	৩১,৫২,৫৪৮
বাৎসরিক বৃদ্ধি		৩,১৬,৬০৬	৩,৪২,০২০	৩,৬১,৩৩৮
চলতি বীমা		৯৯,৬৪,০৭২	১,২৪,৬১,৬৭৯	১,৩৬,৭১,৬৯৭

কিছুকাল পূর্ব্বে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া'র পরিচয় দিতে আমরা লিখিয়াছিলাম—জীবন-বীমা কোম্পানীর গুণাগুণ বিচারের যতগুলি মানদণ্ড আছে, তাহার যে কোনও একটি প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানী।—আমাদের সেই উক্তির সহিত উপরের একচুয়ারীর বিবৃতি ও ব্যবসায়ের হিসাব পাশাপাশি রাখিলে, যে-কোনও ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া' ভারতের বীমা-ক্ষেত্রের অন্যতম গৌরব।—

১৯০৬ সনে মাদ্রাজ শহরে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার গোড়াপত্তন হয়। পুরা তেইশটি বৎসর ধরিয়া এই কোম্পানী মাদ্রাজের বাহিরে ব্যবসায়-সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই। ফলে ইহার নিজস্ব বনিয়াদ এমন শক্ত হইয়াছে যে এখন বাহিরে যত খুসী ব্যবসায়-বিস্তৃতির চেষ্টা করিতে পারে। এই কোম্পানীর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিব—ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশী শতাধিক জীবন-বীমা কোম্পানীর মধ্যে মাত্র নয়টি কোম্পানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ এই যে, কোন স্কুলের শিক্ষক তাঁহার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা দ্বারা এই নয়টি কোম্পানীর কোন একটিতে বীমার চাঁদা দিতে পারিবেন—এই নয়টি কোম্পানীর একটি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া। কোম্পানী যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, সরকারের এই

নির্দ্দেশ অপেক্ষা বাড়া প্রমাণ আর কিছুই নাই। কোম্পানীর ট্রাষ্ট ফণ্ডের অছি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট।

কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ চীফ এজেণ্ট মেসার্স চৌধুরী দত্ত এণ্ড কোং (২ লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা)। ইঁহাদের শ্রীযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিঞা) ও শ্রীযুক্ত এম্. এন্. দত্ত মহাশয় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমরা ইঁহাদিগকে অমায়িক, সজ্জন, পরিশ্রমী বলিয়া জানিয়াছি। বীমা-ক্ষেত্রে ইঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ভবিষ্যতে সে খ্যাতি শতগুণ বাড়িবে বলিয়াই আমরা ভরসা রাখি।

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার ২২৩ পৃষ্ঠার স্থানে ৩২৩ পৃষ্ঠা হইবে। পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় এ অনুসারে পৃষ্ঠা পড়িতে হইবে। ৩৩২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ১১শ লাইনে এবং ৩৫১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ১৩শ লাইনে 'যতীন্দ্রনাথ' স্থানে 'যতীন্দ্রমোহন' হইবে।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
2, Wellington Lane, Dharamtala, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

বার্ষিক

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—

২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

মুর্শিদাবাদ সিল্ক ষ্টোর্স
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
গরদ—মটকা ও তসরের—
যা' কিছু সব মুর্শিদাবাদের দরেই
বিক্রয় করিয়া থাকি।

বিষয়-সূচী

কার্ত্তিক—১৩৩৮

ডোয়ার্কিনের
হারমোনিয়ম
৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আম-ই
প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা।
আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরণীয়।
ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২ সেট রীড্
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
মূল্য ৪৫

ণ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৮ | ৭ম স

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

সুর—'যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে'

জয়তু, জয়তু, জয়তু কবি,
জয়তু পূরব উজল রবি।

জয় জগত-বিজয়ী কবি,
জয় ভারত-গৌরব-রবি
বঙ্গমাতার দুলাল 'রবি'
জয় হে কবি।

হে কবি! তোমার মোহন তান,
নিখিল জনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি' তোমার দান
আজি গরবী—
হে বিশ্ব-কবি!

কভু বাজাও ভেরী গভীর সুর,
কভু বাজাও বীণা মৃদু মধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেম বিধুর,
—বিচিত্র কবি!

স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও
সুপ্ত দেশবাসীজনে জাগাও,
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও,
হে বীর কবি,
দেশ-প্রেমী কবি!

বিশ্বের উদার সমতলে
ভারতীর দেউল তুলিলে,
দেশ কালের ভেদ ভুলিলে,
কি নব ছবি—
হে কর্ম্মী কবি!

বিশ্বেশ্বরের চরণতলে
তব গীত-গঙ্গা সুধা ঢালে
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে,
হে দেব-কবি!*

---

* লক্ষ্ণৌ রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় গীত

স্ত্রীর জীবনে স্বামীর স্থান

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের অধিকার কতখানি ও তাহার পরিধি কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত—এই সমস্যা লইয়া আধুনিক সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা বহু প্রকার আলোচনা করিতেছেন। পুরাতন মতে ব্যক্তির সামাজিক জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়া রাষ্ট্র প্রভুত্বের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের ছিল। কিন্তু এখন পণ্ডিতগণ বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমাজের মধ্যে নানা শক্তিকেন্দ্রের সমাবেশ এবং ব্যষ্টির জীবন এই নানা কেন্দ্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। অতএব অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক অংশ বাদ দিয়া কেবল মাত্র অবশিষ্ট রাজনৈতিক জীবনটুকু নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে, তার বেশী বিন্দুমাত্র নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি বিশেষ অধিকারের কর্ম্মসঙ্ঘ মাত্র। বর্ত্তমান যুগে নারীর জীবনে স্বামীর স্থানও ঠিক এই প্রকার ক্রমশঃই কতকগুলি বিশেষ অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এই সীমার পরিধি কতখানি সংকীর্ণ—তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

নারী বলিতেছে, স্বামী যে তাহার ইহকাল-পরকালের দেবতা হইয়া তাহার সমগ্র জীবন করায়ত্ত করিয়া তাহাকে সেবাদাসা মাত্র করিয়া রাখিবে, বিধাতার এ অভিপ্রায় সৃষ্টির আদিতে ছিল না; সমাজের মন্দিরে এই অদ্ভুত দেবপূজার অবসান হইল। স্বামীকে তাহার বেদী হইতে নামিয়া আজ স্ত্রীর সমান পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়াইতে হইবে। স্ত্রী শুধু স্বামীর উপযোগী নয়, তাহার সহযোগী, আবশ্যক হইলে প্রতিযোগীও বটে। অতএব স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আর রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নয়, নব সাম্যবাদে উভয়ে কম্‌রেড্, অর্থাৎ কর্ম্মসহচর মাত্র। স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ তাহা আর জন্ম-জন্মান্তরের বিধাতানির্দ্দিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য নয়, তাহা শুধু সামাজিক প্রয়োজনে একটি বিধিবদ্ধ সর্ত্ত বিশেষ—যাহা আবশ্যক বা অসহ্য হইলেই বিচ্ছিন্ন করা চলে। এবং এ সম্বন্ধ যতদিন থাকে, ততদিনও স্বামী কেবল প্রেমের স্বতঃস্ফূরণে যতটুকু পাইবার ঠিক ততটুকুই পাইবে,—জোর করিয়া গতানুগতির বলে কিছুই আদায় করিয়া লইতে পারিবে না।

স্বামীর অধিকার লইয়া এই যে আন্দোলনের সূচনা দেখা যাইতেছে তাহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এ অধিকার পূর্ব্বে কতখানি ছিল, এখন কতখানি আছে ও স্বভাবতঃ কতখানি হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আমি কেবল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর পরিবার লইয়া আলোচনা করিব।

বাঙ্গালীর বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের যে ব্যবধান থাকে তাহাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদেশে বিবাহ হয় যুবকের সঙ্গে বালিকার, মিলন হয় যৌবনের সঙ্গে কৈশোরের। স্বামী পূর্ব্ব হইতেই এক উর্দ্ধতর স্তরে দাঁড়াইয়া সেখান হইতে যেন হাত বাড়াইয়া কিশোরী বধূকে দাম্পত্য-জীবনের উচ্চ মঞ্চে তুলিয়া লয় এবং এই কাজে আগ্রহ অপেক্ষা অনুগ্রহই যেন প্রবল। স্বামী তার মানসিক ক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া আপনার জ্ঞান-অভিজ্ঞানের ফসল লইয়া যে সম্পদ-ভাণ্ডার রচনা করে সেখানে তাহার কিশোরী বধূ আসিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, কারণ এ তাহার কাছে অভিনব, বিস্ময়কর। মনের এই পরিণতিতে সে তখন পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। তাই সে সহজেই আপনাকে দুর্ব্বল অনুভব করে এবং স্বামীর সোহাগে গলিয়া একেবারে তরল হইয়া টল্‌মল্ করিতে থাকে। স্বামী তাহাকে লইয়া খেলা করে, সে হয় খেলার পুতুল। স্বামী সাজে দেবতা, সে করে পূজা। এই পূজার উপচার তার হৃদয়ের সহজ বৃত্তি নয়,—তার মা-ঠাকুমা-মাসী-পিসীর কাহিনী-বর্ণিত, দৃষ্টান্ত-প্রণোদিত একটি অস্বাভাবিক ভক্তি-ভয়ের সংমিশ্রণ। এই অপূর্ব্ব ভক্তি-রসায়নে সে নিজেকে যথাসাধ্য জীর্ণ করিয়া স্বামীকে প্রকাণ্ড পরিস্ফুট করিয়া দেখে।

এই বয়সের ব্যবধান ক্রমেই কমিতেছে, কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে এ ব্যবধান দেখা যায়। যেমন,—বিবাহ হইল একটি পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে একটি বারো (এখন অন্ততঃ চৌদ্দ) বছরের বালিকার। যুবক যাহা বোঝে বালিকা তাহা তখনো বোঝে না, যুবক যাহা চাহে বালিকা তখনো তাহা দিবার জন্য প্রস্তুত নয়,

কিংবা দিবার আগ্রহ তার জন্মে নাই। কণামাত্র আদর পাইলেই এ বালিকা মজিয়া যায়, একটুখানি তাড়না পাইলেই কাঁদিয়া আকুল হয়। এদিকে যুবকের মনের বাসনা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে না; সে বিরক্তি-সন্তোষ-উত্তেজনা ও কাম-কাতরতার মধ্যে তাহার দাম্পত্যজীবন আরম্ভ করে। অথচ এই জীবনেও তার স্থান অতি অপরিসর। বালিকাকে সে যে নিজের ইচ্ছায় নিজের মতো করিয়া গড়িয়া লইবে তাহার জো নাই। বালিকা-বধূর অশনে-বসনে ধ্যানে-ধারণায় স্বামীর কোনও হাত নাই, এখানে বধূ তাহার স্বামীর আদর্শ-প্রভাবের বাহিরে। এখানে শ্বশুর-খাশুড়ী জা-ননদেরা তাহাকে শাসন করে। কোন্ রঙের সাড়ীখানি পরিলে তাহাকে মানায় ভালো, কোন্ গহনায় তার রূপের জৌলশ খোলে বেশী, তার বিচার করিবে সে নিজে নয়, তার স্বামীও নয়, বাড়ীর অপর গিন্নীরা অথবা প্রতিবেশিনীগণ। কোন্ পূজা সে করিবে না করিবে, কোন্ ঠাকুরের মানত করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিবে অন্য কেউ, স্বামী নয়। পূজার দিনে যখন বালিকা বধূটি আর সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধোজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিয়া সলজ্জ আনতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া দেবতাচরণে অঞ্জলি দেয় ও পুরোহিতের হাত হইতে যজ্ঞ-তিলক ললাটে আঁকিয়া লয়,—তখন স্বামী ভাবে এ তো অন্য কেহ, এ যে তার বুড়ি দিদিমা'রই একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। তাহার মধ্যে সে নিজের ছায়ার আভাস মাত্র পায় না,—যেন ধর্ম্মসেবার পুণ্যস্নানের তরঙ্গে সে ছায়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় বিলীন হইয়াছে। আবার এই বালিকাই যখন রঙীন সাড়ী-সেমিজে ভূষিতা, অলঙ্কার-মণ্ডিতা, অর্দ্ধোন্মুক্তনিচোলা, অন্যান্য তরুণীদের সঙ্গে পাশের বাড়ীতে ঈষৎগর্ব্বমন্থরগতিতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলে, তখনও স্বামী শুধু দূর হইতে একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়;—ভাবে, এ কাহার বধূকে দেখিলাম, ঠিক এই ভঙ্গীটি তো আমার তেমন পরিচিত নয়,—আমি ত নিশাচর পেচক মাত্র,—দিবসের উন্মুক্ত উজ্জ্বল বসন্ত-বৈচিত্র্যে তো আমার কোন অধিকার নাই।

এমনধারা ঘটিবার কারণ আছে। বধূর জীবনে সকল দিকে স্বামী তাহার হস্ত প্রসারণ করিতে তো পারেই না, এমন কি দিনের আলোকেও বধূর সঙ্গে তাহার পরিচয় নাই। রাত্রির অন্ধকারে গোপনে নিভৃতে নিঃশব্দে তাহাদের পরিচয়ের আরম্ভ হয়। সে অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল স্পর্শ করিয়া অনুভব উপভোগ করিতে হয়। তাই দেহের মিলনেই এ পরিচয়ের প্রথম যবনিকামোচন। সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে থাকিয়া স্বামী তার নববধূর জন্য রাত্রির প্রতীক্ষায় কৌতূহলী হইয়া বসিয়া থাকে। সে কৌতূহল বাসনায়, উত্তেজনায় পরিপূর্ণ, তাহাতে স্বভাবের শান্তভাব নাই। সেজন্য বাঙালী জীবনের এই প্রথম মিলনের অন্তরালে প্রকাণ্ড এক ফাঁক রহিয়া যায়, যে ফাঁক জোড়াতালি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে বহু বিড়ম্বনা সহিতে হয়।

মানুষের মন শান্তি-পিয়াসী। তাই যৌবনের সকল স্বপ্ন সফল করিবার জন্য উন্মুখ যুবক তার কিশোরী বধূকে বক্ষে জড়াইয়া আদরে-সোহাগে স্পর্শে-আঘ্রাণে একটি মনোহর মায়াপুরী রচনা করে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম মুকুলটিকে পূর্ণ বিকশিত করিবার জন্য কল্পনা-কাহিনীর কত না বসন্ত-বায়ুকে আমন্ত্রণ করে; আপনি ভৃঙ্গের মত তাহাকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া গুঞ্জন করে; জ্যোৎস্নালোকের কুহক লইয়া একটী সম্ভোগ-কোরক রচনা করে। কিন্তু হায়! রাত্রি প্রভাত হইতেই এ মিলন জ্যোৎস্নার মতোই করুণ হাসিয়া বিলীন হয়। এই মোহের স্বর্গ সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হইয়া যায়,—যেদিন দুয়েকটী শিশু-সন্তান আসিয়া তাহাদের নৈশ-শয্যা ক্রন্দন-মুখর করিয়া তোলে,—সেদিন দিনের অবকাশের মধ্যে অসুখ-বিসুখ কবিরাজ-ডাক্তার সাগু-বার্লি বাজার-হিসাব গহনা-মেরামতের জঞ্জাল দণ্ডে দণ্ডে স্তূপীকৃত হইয়া একটা বিশ্রী বিকট মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশিত করিয়া ফেলে। সেদিন স্বামী বেচারা সভয়ে শিহরিয়া দেখে,—তাহার সোনার কমলের পিছনে সংসার-অতলে এত দীর্ঘ কণ্টকিত মৃণাল প্রচ্ছন্ন ছিল! কমলের পাঁপড়ি ঝরিয়া যায়, মৃণালের কাঁটার ক্ষতচিহ্ন জাগিতে থাকে। দাম্পত্য-জীবনের যে দিকটায় স্বামী আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পাইত না, সেই দিকটা যখন সমস্ত বোঝা লইয়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, তখন সে বোঝা বহন করিতে

নানা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, সে শক্তির আস্ফালনে বিন্দুমাত্র মাধুর্য্য নাই। পূর্ব্বে বধূ-জীবনের সহিত সমগ্রভাবে পরিচয় ঘটে নাই বলিয়া এখন বাধে সংঘাত, খিটিমিটি, টানাটানি ও ছেঁড়াছিঁড়ি। আর ইহাকেই জোর করিয়া জোড়া দিবার প্রয়োজন হয় বলিয়াই স্বামী করে শাসন, বধূ হয় অবনমিতা দাসী।

বধূ রহে যে তিমিরে সে তিমিরে। তাহার খাওয়া-পরা ও অন্যান্য কাজের যে দিকটা পূর্ব্বে শাশুড়ী-গিন্নিরা নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাহা এখন আসিয়া পড়ে স্বামীর শাসনাধিকারে। অর্থাৎ স্বামী তাহার নিজের পিতামাতার হাত হইতে এইবার শাসনভার গ্রহণ করিয়া দ্বিগুণ বলে অটোক্রাসি (জবরদস্তি) চালাইতে থাকে। তরুণ জীবনে স্বামীর যে স্থানটুকু অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে সংকীর্ণ স্বপ্নে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মতো ঝাপট মারিত, তাহা এখন সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতা লইয়া স্ত্রীর জীবন অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে। এই বন্ধনের বিরুদ্ধেই আজ নারী বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছে।

নারীর এই বিদ্রোহ-বৈজয়ন্তী বয়ন করিয়াছে পুরুষ। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে করতালি দিয়া নাচাইয়া, বুলি বলাইয়া এক আনন্দ পাওয়া যায়, আবার তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে সে যখন স্বাধীনতার উচ্চ শাখায় বসিয়া আপন খেয়ালে শিস্ দেয় তখনও আমাদের আনন্দ কম নয়। তাই নারী-স্বাধীনতার সহায় হইয়া পুরুষ যেমন আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তেমনি এক মহত্তর আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছে। গৃহের মধ্যে গৃহস্থালী-কাজের যে দাসত্ব, অশিক্ষিত পরাধীন অবস্থার যে গ্লানি—সব আজ নারী মুছিয়া ফেলিতে চায়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের মধ্যে যে অবাধ গতি, যে সমান অধিকারগুলি আছে, আপন ভাগ্য আপনি চালিত করিবার যে গৌরববোধ আছে, সব আজ নারী জোর করিয়া লইতে চায়। এই জোরের সম্মুখে পুরুষ ইঞ্জিনের মতো। নারী নিজের শক্তিতে যত না চলে পুরুষ সম্মুখে রহিয়া তাহাকে আরও তত টানিয়া লয় কারণ পুরুষ পূর্ব্বের সামাজিক ব্যবস্থায় নিজেই সম্পূর্ণ সুখী ছিল না। যৌবনে ক্ষণস্থায়ী বাসর-ঘরের মোহ-মন্দিরনির্ম্মাণ ও তারপর গৃহকর্ত্তা সাজিয়া নারীর উপর সর্ব্ববিধ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব, মূর্খ নির্জ্জীব দুর্ব্বলের সঙ্গে অহরহ সন্ধির চেষ্টা,—এই যে বাঙ্গালীর সনাতন জীবন,—ইহাতে আর তৃপ্তি রহিল না। স্বামী চাহিল তার বধূ ঠিক তার মনের মতনই হইবে,—তাহাকে সে সম্পর্কের গোড়া হইতেই সুখে দুঃখে সম্পূর্ণভাবে জীবনসঙ্গিনী করিয়া নিতে পারিবে। তাহার বধূ হইবে শুধু একটা জড় পুতলী নয়,—সে হইবে পূর্ণবয়স্কা, শিক্ষিতা, সাহসী, ঘরে বাহিরে বিষাদে ব্যসনে রাজদ্বারে তার বান্ধবী ;—সে শুধু গিন্নীদল-পরিচালিত অতীত যুগের একটা কঙ্কালমাত্র নয়,—সে হইবে একটা জীবন্ত মানুষ।

নারীর এই কমরেড্‌শিপ্ অর্থাৎ সহচর-মূর্ত্তি পুরুষ নিজে রচনা করিয়াছে, আর নিজেরি শিল্প-সাধনায় সে বর্ত্তমান নারীত্বকে রূপ দিয়াছে। পুরুষেরি চেষ্টায় নারী শিক্ষিতা হইয়াছে, তাহার বিবাহ-বয়স কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে পৌঁছিয়াছে। এই চেষ্টার মধ্যে আরও একটী বিশেষ আবশ্যক-বোধ আছে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী পুরুষ মাত্রকেই প্রায় চাকুরী করিতে হয়। তাহারা ছেলে বউ লইয়া বিদেশে বাস করে। ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এখন সবাই প্রায় ব্যক্তিগত পরিবার, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ও তাহাদের সন্তান। অতএব গৃহে একটিমাত্র মেয়ে মানুষ লইয়া যখন বিদেশে বাস করিতে হয়, তখন তাহাকে পূর্ণবয়স্কা হইতে হয়, সাহসী হইতে হয়, নিভৃত গৃহের সন্তানের জন্য ও আরও পাঁচ জনের সঙ্গে মিশিবার জন্য শিক্ষিতা হইতে হয়,—'অশিক্ষিত পটুত্ব' ছাড়িয়া এখন তাহাকে নানা প্রকার শিক্ষিত পটুত্ব আয়ত্ত করিতে হয়। আর নগরজীবনের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে বিদেশী আবহাওয়া, নারীজীবনের মহিমময় কাহিনীর প্রশস্ত সাহিত্য, নানা 'বাদ'-অনুবাদ। তাহারি ফলে আজ পুরুষ তাহার স্ত্রীকে শিক্ষিতা করিল, সে ও সাগ্রহে শিক্ষামন্দিরে পা বাড়াইয়া দিল। তাহার জড়ত্ব ঘুচিয়া মুক্তি আসিল,—মুক্তির সঙ্গে আসিল স্বাধীনতার নেশা।

২

নারীর যখন চোখ ফুটিল তখন সে দেখিল,—এ পৃথিবী বিশাল, এখানে অসংখ্য সমস্যা, জ্ঞানের ভাণ্ডার

অনন্ত, চলিবার পথ প্রকাণ্ড। তাই চলিবার আবেগে সে গা ঝাড়িয়া নড়িয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বুঝিল সে বন্ধনে জর্জ্জর, সামর্থ্যহীন। তাহার অনেক কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই; যাহা চেষ্টা করিলে করিতে পারে তাহাতেও বিধি-নিষেধ তাহার অধিকার রাখে নাই।

বন্ধনের প্রথম সূত্র তাহার স্বামীর হাতে। এই সূত্র ধরিয়া স্বামী নিজের ইচ্ছামত অর্থের থলিটা খুলিয়া বন্ধ করেন, স্ত্রীকে তার অনুগ্রহের উপর সামান্য আসনে বাস করিতে হয়। এই অর্থনৈতিক অধীনতা যে সকল ক্ষেত্রেই অসহ্য, তা নয়। স্বচ্ছল পরিবারে ইহা অধীনতা বলিয়াই মনে হয় না, সেখানে যেন স্বামী স্ত্রীর একটা সমবায় ভাণ্ডার; উভয়েই লভ্যাংশ সমান ভাগ করিয়া লয়, কোন প্রকার ব্যাঘাতবোধ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রী স্বামীর মুখাপেক্ষী। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য নারী বলিতেছে,—স্ত্রীর এই অর্থনৈতিক বোঝা বহন করা,—এ ত স্বামীর একটা কর্ত্তব্য মাত্র, দাম্পত্য জীবনের একটা প্রিন্সিপল্ মাত্র। ইহার দোহাই দিয়া তিনি যে স্ত্রীর সমস্ত জীবনটাই দলিত করিবেন, এমন কথা হইতে পারে না। এ অর্থনৈতিক সম্পর্ক এখনো অনেক দেশেই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে তো এতখানি দাসত্ব নাই।

অর্থনৈতিক জীবন ছাড়িয়া আমরা যখন অন্যদিকে তাকাই তখন দেখি নারী অনেকখানি স্বতন্ত্র হইয়াছে। সে এখন নিজের ইচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছে, কয়টা ছেলেমেয়ে হইবে তাহাও হয়তো সে নিজের ইচ্ছায় নিয়মিত করিতেছে —কারণ, একাধিক বিবাহ এখন অসম্ভব বলিয়া এক স্ত্রীর মান-অভিমানের আদর-আব্দারের জোর বাড়িয়াছে—এখন স্বামী তার সহযোগী মাত্র। সমাজের মধ্যে প্রলয় না আনিয়া গৃহকে বাঁধিয়া রাখিতে যেটুকু দেনা-পাওনার দরকার তাহাই স্বীকার করিতে হইবে,—কেহ কাহাকেও একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

এই পরিবর্ত্তনে নারীর জীবন শুধু গৃহের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ নয়; বাহিরের কর্ম্মজগতেও তার পরিধি দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সেখানে নারী ভ্রমণ করে, শিক্ষা করে, বক্তৃতা দেয়, মাষ্টারী করে, ম্যাচ খেলা দেখে, পিকেটিং করে, জেলে যায়,—পুরুষ যাহা করিবে সে-ও তাহাই করিবে, কিছুমাত্র কম নয়। তাই আজ নারীরও কংগ্রেস আছে, সমিতি আছে। তাহার জন্য নব নব আইন চাই, চাই তাহার জন্মগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা। এই নূতন সমাজে নারী যতক্ষণ ঘরের মধ্যে ততক্ষণই তার স্বামীর প্রয়োজন, বাহিরে আর সকলের যাহা প্রয়োজন নারীরও তাহাই, কোন পার্থক্য নাই। এমন কি গৃহকে অস্বীকার করিয়া নারী যদি বাহিরের কর্ম্ম-জগতটাকেই তার জীবনের লীলাক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করে, তবে তার স্বামীতেও কোন প্রয়োজন নাই;—সে একলাই পথ চলিতে পারে, পথের পাথেয় সে আপনি সংগ্রহ করিবে। স্বামী-সোহাগের উঞ্ছবৃত্তি আর চলিবে না। ব্যক্তিত্বকে প্রবল করিয়া সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে নারীকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পতি-দেবতার পুণ্য-মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য নয়;—তাহার কর্ত্তব্য আজ তাহার অধিকারের প্রতিদান মাত্র।

নব যুগের দাম্পত্য-জীবনে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রবেশ করিয়াছে। প্রেম মানব-প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, ইহা যৌন-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই বৃত্তিতে তরুণ তরুণীর মিলন ঘটে। কিন্তু কেবল যৌন-প্রবৃত্তিতে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। বিবাহ হয় তখনি—যখন যুবক যুবতীর দেহ-মন, শিক্ষা-দীক্ষা পরস্পরের চিত্তাকর্ষক ও জীবনযাত্রার অনুকূল হইয়া উভয়ের সান্নিধ্যে পরিণতি লাভ করে। জীবন-যাত্রার এই আনুকৌল্য যখন খর্ব্ব হয়, তখন দাম্পত্য-জীবনে শৈথিল্য আসে, বিবাহ-বিচ্ছেদের আবশ্যক হয়। দাম্পত্য-জীবনের দ্বিতীয় বৃত্তি সন্তান-লালন (পিতৃ-বৃত্তি বা মাতৃ-বৃত্তি),—যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীর যৌবন সম্পর্ক ক্রমশঃ মাধুর্য্যে পরিস্রুত হইয়া একটি স্বচ্ছরূপ ধারণ করে, এবং এই মাধুর্য্যই অনেক স্থলে দম্পতীকে যাবজ্জীবন একত্র প্রণয়ে বাঁধিয়া রাখে। এই দুইটী বৃত্তির সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্কগুলি যখন পরম উপযোগী হইয়া সংহত হয়, তখনই বিবাহ সম্বন্ধ স্থায়িত্ব লাভ করে।

অতএব আমরা দেখিতেছি—যৌন প্রবৃত্তি ও সন্তান

লালন বৃত্তিতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক একটী স্বাভাবিক পারম্পর্য্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্য সকল দিকে স্ত্রীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার রহিয়াছে।

আধুনিক নারী এই স্বাধীনতাকে খুব বড় করিয়া দেখে। কারণ গাছের অবশ্য প্রয়োজনীয় শিকড়ের চেয়ে শাখা-পত্রের বাহুল্যই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য, এবং ঐ শাখা-পত্রের পরিপুষ্টি ব্যাহত হইলে গাছ বিকৃতরূপ ধারণ করে।

প্রথমতঃ নারী আজ অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভের প্রয়াসী। এজন্য তাহারা উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্ত্তন ও বাহিরে শ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে চাহে এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা দাবী করে। দ্বিতীয়তঃ পর্দ্দার বাহিরে পা বাড়াইলেই যে সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, এই অদ্ভুত সতীত্ববাদ তাহারা অস্বীকার করে। তাহারা বাহিরে সকলের সঙ্গে চলা ফেরা করিবে, যাবতীয় কর্ম্মে, উৎসবে যোগদান করিবে, সেখানে স্বামীর সন্দেহ-দৃষ্টির স্থান নাই। তৃতীয়তঃ দেশের ও দশের জন্য মহত্তর কাজ করিতে যদি ঘরকন্নার রাঁধা-বাড়া কাজ অবহেলা করিতে হয় ত' স্বামীর বলিবার কিছুই নাই; স্ত্রীর সে অধিকার তাঁহাকে মানিতে হইবে, গৃহস্থালীর জন্য তিনি প্রয়োজনানুসারে অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন। রাঁধা-বাড়া প্রভৃতি সেবার কাজটি যে বিবাহের পণের মতো একটা আনুসঙ্গিক লভ্যাংশ, এমন চিন্তা যেন স্বামী আর মনেও স্থান না দেন। অবশেষে বৈধব্যেও নারীর স্বাধীনতার অধিকার থাকিবে; তখনো যে পরলোকগত পতিটী দেবতা সাজিয়া স্ত্রীর মনোমন্দিরে অধিষ্ঠান করিবেন অথবা উপদেবতা সাজিয়া ঘাড়ে চাপিয়া পিণ্ড আদায় করিবেন, এমন কোন কুসংস্কার আর রহিবে না। প্রয়োজন মত সন্তানাদি পরিবারকে ত্যাগ করিয়া নারী তাঁর নিজের একটি সুবিধামত স্বতন্ত্র জীবন-ধারা নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। এই হইল আধুনিক নারী-আন্দোলনের মোটামুটি কথা।

এই আন্দোলন সার্থক হইলে, নারীর জীবনে স্বামী-বেচারার স্থান আর কতটুকু বাকী রহিল তাহাই হিসাব করিতে হয়। হিসাবে গোঁজামিল না দিয়া সাহসের সহিত বিচার করা উচিত। এ বিচারের মীমাংসা কবে হইবে আমাদের জানা নাই, তবে ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়,—বাঙ্গালীর জীবনে স্বামীত্ব ক্রমেই এক আণবিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বর্ত্তমানের সাধারণ হিসাবে আমরা দেখিতেছি,—

স্ত্রীর বেশভূষার ফ্যাশানের (রঙ্‌চঙ্‌) মধ্যে স্বামীর কোন মত টিঁকিবে না।

স্ত্রীর পান-ভোজনের রুচিতে তাঁহার কোন হাত নাই।

স্ত্রীর অর্থ-সঞ্চয়েও তাঁহার কোন অধিকার নাই।

স্ত্রীর বিলাস-ব্যসনে (সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ না হইলে) স্বামীর কোন আপত্তি চলিবে না।

স্ত্রীর জন-হিতৈষণা-কার্য্যে স্বামী কোন বাধা দিবেন না।

স্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনেও স্বামী অন্তরায় হইতে পারিবেন না।

স্ত্রীর সাহিত্যিক বা দার্শনিক মতবাদ স্বামী অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কেবলমাত্র তর্ক-আলোচনা করিতে পাইবেন,—এই পর্য্যন্ত।

আর অবশিষ্ট রহিল খুব সামান্যই।

স্বামীর স্থান রহিল কেবল যৌন সম্পর্কে, তাঁহার স্থান রহিল অবসর মত প্রণয়ের বিশ্রম্ভালাপে। তাঁহার অধিকার রহিল স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ও সন্তান-সম্ভাবনার সময় রক্ষণাবেক্ষণে। আর অধিকার রহিল স্ত্রীর সহযোগিতায় সন্তান পালনে। এতদ্ভিন্ন অন্য সকল কাজেই স্ত্রী কেবল দাম্পত্য-জীবনের সহজ বৃত্তিতে যে সাহচর্য্য এবং হৃদয়ের স্নেহবৃত্তিতে আনুগত্য স্বীকার করিবেন, সেইটুকু লইয়াই স্বামীকে পরম সুখে কাল কাটাইতে হইবে। ইহার বেশী নয়। স্বামী আর এখন নারীর জীবনে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব-নিয়ামক সভারিণ (একচ্ছত্র সম্রাট্) নয়, কয়েকটি বিশেষ কর্ম্মের জন্য শক্তি-কেন্দ্র মাত্র। ইহাই বর্ত্তমান যুগের দাম্পত্য-রাষ্ট্রে নিউ থিওরি অব্ সভারিণটি। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর জীবনে তোমার স্থান যতটুকু, মহাত্মা গান্ধী কিংবা বার্ণাড শ, অথবা অমুকানন্দ স্বামীর স্থান হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশী। এতে কোন আপত্তি চলিবে না।

আপত্তির কোন কারণও নাই। অধুনা বাংলাদেশে নারী প্রগতির বহর দেখিয়া অনেক পুরুষ (তৎসঙ্গে পুরাতন

গিন্নীরাও) সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আশঙ্কা ইহাতে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হইবে, দাম্পত্য-জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইবে, এবং সতীত্বের আদর্শ সংকুচিত হইয়া যাইবে। যদি বাস্তবিকই এই সমস্ত ঘটে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই সবই যে মানব-জীবনের চরম কথা, তা' কয়জন স্বীকার করে?

একথা অস্বীকার করা চলে না যে পশ্চিমদেশে নারী জাতির বর্ত্তমান স্বাধীনতা যে কারণে আসিয়াছে, আমাদের দেশেও আজ এতদিন পরে ঠিক সেই কারণেই নারী বন্ধন হইতে মুক্তি চাহে। য়ুরোপে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার পরেই সেখানে ব্যক্তি বড় হইয়া উঠিল। তখন দল-নায়ক ও জমিদারের ধর্ষণ প্রতিহত করিয়া সমাজ সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল ও পেট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলি অর্থাৎ কর্ত্তা-শাসিত পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল। ব্যক্তি যখন স্বাধীন হইল,—তখন আসিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখনি আবার যাহাতে সমানে সমানে বিবাদ না হয়, অতিবড়ো যাহাতে ছোটর উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে, (ন্যাচারাল্ সিলেকসনের বদলে যাহাতে র‍্যাশানাল্ সিলেক্শন হয়), তার জন্য সমবায় তন্ত্রের উদ্ভব হইল। ঐ সহযোগিতা ও সমবায়ের দ্বারাই আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ পরিচালিত হইতেছে অন্ততঃ হইতে চাহিতেছে।

কিন্তু মধ্যযুগের বৃহৎ সর্দ্দার-পন্থী পরিবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বসিয়া গেল সেইদিন,—যেদিন নারী তাহার সত্তাকে সাম্যের তক্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সমানাধিকার দাবী করিল। সেদিন গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজাইয়া যে বিবাহ হইল তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বাইবেলের উপর আসিয়া পড়িল ডিভোর্স ল (বিবাহচ্ছেদ আইন) -এর ছায়া।

বর্ত্তমানে নারী-স্বাধীনতাকে আর কেহ অস্বীকার করে না। তবে পশ্চিমে তার অত্যুগ্র মূর্ত্তিতে অনেকেই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা পুনরায় চরিতবিজ্ঞান (এথিক্স) যৌনবিজ্ঞান (সেক্সোলজি), সৌজাত্যবিজ্ঞান (ইউজেনিক্স) প্রভৃতি আলোড়ন করিয়া আবার নূতনভাবে বিবাহ-ব্যবস্থাগুলি সংশোধিত করিয়া সমাজে শান্তি ও স্বাস্থ্য আনিবার বিশেষ প্রয়াস করিতেছেন।

আমাদের দেশে গ্রামগুলি এখনও সেই মধ্য যুগের ক্লান-লাইফ-(পাল-জীবন?)-এর জীবিতাবশেষ। এখানে সেদিন পর্য্যন্তও গ্রামের মোড়ল ও পুরোহিতের অত্যাচারে সারাগ্রাম জর্জ্জরিত হইত, এবং গৃহে পুরুষের অত্যাচারের সীমা ছিল না। কিন্তু আজ সেই পুরাতন একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বাংলাদেশে অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে এদেশেও নারী-স্বাতন্ত্র্যের ফলে ইতিহাসের ঠিক ঐ পাশ্চাত্য ধারাটী পুনরায় প্রবাহিত হইবে কিনা এখনো বলা যায় না। কারণ এদেশের কৃষ্টি ও সমাজ-কাঠামো ভিন্ন প্রকারের। তথাপি যদি পাশ্চাত্য আদর্শেই এদেশের নারী জাগিয়া উঠে তাহা হইলেও আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আমরা যেটা পারিবারিক বিশৃঙ্খলা মনে করিতেছি তাহা অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ করিবে; হয়ত জাতির শৃঙ্খলা ও উন্নতি ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে। বিবাহ হইবেই। নরনারীর হৃদয়বৃত্তি যতদিন আছে ততদিন তাহাদের পরস্পরের আদান-প্রদানের একটী মিলনক্ষেত্র থাকিবেই। পরিবার ক্ষুদ্র হইবে বটে, কিন্তু লোপ পাইবে না। আর এই ক্ষুদ্র পরিবারেই ব্যক্তিত্ব আরও পুষ্টিলাভ করিয়া সতেজ হইবার অবকাশ পায়।

অতএব স্বামিগণের একেবারে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। অধিকাংশ নারী অবশ্যই বিবাহ-জীবন পালন করিবে। অবশিষ্ট নারীগণও সম্পূর্ণভাবে পুরুষের সাহচর্য্য ছাড়িয়া চলিতে পারিবেন না। তবে স্বামীর দেবত্ব এইবার ঘুচিয়া গেল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সমতুল্যই একটি মানুষ মাত্র হইয়া রহিলেন।

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

উত্তর মেঘ

বিদ্যুতে তব—সুন্দরী-শোভা, ইন্দ্রধনুতে—চিত্ররাজি
স্নিগ্ধ মন্দ্রে—সঙ্গীত সনে মৃদঙ্গ যেন উঠিছে বাজি'
সলিল-পুঞ্জে—মণিময় ভূমি ; অভ্রংলিহ—তুঙ্গতম—
সেই নগরীর সৌধনিচয় সর্ব্বথা, মেঘ, তোমারি সম।

২

কুন্তলে গাঁথা কুন্দ-কলিকা, করতলে শোভে লীলাকমল,
লোধ্র-পুষ্প-পরাগ মাখিয়া পাণ্ডুর চারু আননতল,
কবরীর 'পরে নব কুরুবক, কর্ণে শোভন শিরীষ রাজে,
সীমন্তে পরি' বরষার নীপ সাজে অলকার রমণীরা যে।

৩

তরুতে সেথায় নিতি ফুটে ফুল—মাতে অলিকুল গুঞ্জরণে,
সরসীতে নিতি ফুটে শতদল—রচিত মেখলা হংসগণে,
গৃহশিখী নিতি পুচ্ছ মেলিয়া সোল্লাসে করে কেকার ধ্বনি,
নিত্য জ্যোৎস্না তিমির হরিয়া রম্য করিয়া রাখে রজনী।

৪

আঁখিনীর ঝরে আনন্দে শুধু—ঝরে নাকো আর কোনো কারণে,
কুসুম-শরেই শুধু আছে তাপ—তারো শেষ প্রিয় সম্মিলনে,
প্রণয়-কলহ বিনা অলকায় অন্য কারণে বিরহ নাই
যক্ষেরা সেথা চির-যৌবন—ভিন্ন বয়স জানে না তাই।

৫

স্ফটিক-ভবনে তারকার ছায়া কুসুমের মায়া রবে গো রাতে,
যক্ষেরা সেথা বসি' আনন্দে শ্রেষ্ঠ রূপসী রমণী সাথে
কল্পতরু সুরা সুমধুর করে পান সবে, অমনি ধীরে
তোমারি ধ্বনির মতো গম্ভীর বাদ্য সেথায় বাজে গভীরে।

৬

সুর-বাঞ্ছিতা বালিকারা সবে সেথায় স্বর্ণ-বালুকাতলে,
মাণিক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, লুকায়ে, খুঁজিয়া বেড়ায় খেলার ছলে ;
মন্দাকিনীর শীতল সমীর অঙ্গে তা'দের ব্যজন করে,
তীর হ'তে তা'র তরু-মন্দার ছায়াদানে তাপ-দহন হরে।

যদি-বা বিম্বাধরা কামিনীর শিথিল-গ্রন্থি কটি-বসন
অনুরাগভরে চঞ্চল-করে প্রিয়তম করে আকর্ষণ,
ছুঁড়ি' কুঙ্কুমচূর্ণমুষ্টি প্রোজ্জ্বল মণি-দীপের 'পরি
লজ্জা আবেশে বিকল লক্ষ্য—সরমে রহে সে মরমে মরি'।

৮

পবনের সনে পশি' অলকার উচ্চ সপ্ততল-ভবনে
আলেখ্যরাজি মলিন করিয়া সলিল কণায়, সঙ্গোপনে
তোমারি মতন যত মেঘগণ শঙ্কায় ভয়ে শীর্ণ কায়ে
ধূম-রূপ ধরি' করে পলায়ন বাতায়ন-পথে চকিত পায়ে।

৯

তুমি আবরণ করিলে হরণ বিমল কিরণ বিতরে শশী,
ঝালরে-ঝুলানো চন্দ্রকান্তমণিসারি বারিকণা বরষি'
নিশীথে বিহার-ক্লান্তি নিবারি' সেবে গো সেথায় ললনাগণে
শিথিলিত ভুজবল্লরী যবে বল্লভবাহু-আলিঙ্গনে।

১০

গৃহে যাহাদের অক্ষয় ধন হেন কামিজন অলকাপুরে—
যক্ষরাজের যশোগীতি নিতি যা'রা করে গান মধুর সুরে—
সঙ্গে লয়ে সে কিন্নরগণে যত অপ্সরা-গণিকা সনে
সুখ আলাপনে নগর-বাহিরে বিহারে চৈত্ররথোপবনে।

১১

চলিবার বেগে খসি' অলকের পারিজাত ফুল ঝরে ধূলায়,
ঝরে কর্ণের স্বর্ণ-কমল, কেশ-কিশলয় ভুঁয়ে লুটায়,
লুটায় বেণীর মুকুতার মালা. লুটায় স্তনের ছিন্নহার,—
নারীরা যে রাতে অভিসারে মাতে—পড়ে' রয় প্রাতে চিহ্ন তা'র।

১২

কুবেরের সখা মহাদেব সেথা সশরীরে বাস করেন,—তাই
মধুপ-শোভিত ফুল-ধনু করে ধরিতে কামের সাহস নাই
তথাপি নারীর চারু ভ্রূভঙ্গে কামের কামনা সিদ্ধ হয়,—
অমোঘ চাহনী হানিয়া চতুরা জিনে লয় কামিজন-হৃদয়।

(ক্রমশঃ)

পথ

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এসেছে লালু একটা বেনামি-চিঠির মত। কবে যে কোথায় কোন মায়ের কোলে সে প্রথম এই পৃথিবীর আলো দেখেছে তা' সে জানে না। সে জানে পথ থেকেই তাকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। পথই তার মা।

অনেক দিনের কথা। হাটখোলার মোড়ে ভিড় করে লোকেরা কি দেখছিল—ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে জড়ানো ফুলের মত একটা সদ্যোজাত শিশু থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। আহা! কে এমন হৃদয়হীন আছে এই পৃথিবীতে যে এই কচি শিশুটীকে পথে ফেলে দিয়ে গিয়েছে!

হৃদয়হীন!—আধুনিক পৃথিবীর কাছে কথাটার দাম খুবই কম। হৃদয় এখন তার নির্দ্দিষ্ট দিক ছেড়ে আর একদিকে আশ্রয় নিয়েছে এসে। কিন্তু মজার কথা এই হৃদয় ছেড়ে গেছে যাদের—তারাই অপর দিকটাকে লক্ষ্য করে' এই হৃদয়হীন কথাটার সৃষ্টি করেছে। তবুও হৃদয়ের স্থান এই সুখ-দুঃখ-ভরা মানুষের পৃথিবীর মধ্যেই। এই খানেই তার সব গরিমা, সব মহিমা!

ভাড়াটে গাড়ীর এক গাড়োয়ান ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পথ থেকে—গাল-তোবড়ানো, চোখবসা, বখাটে নেশাখোর ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ান সে—পথের ভিড় কমে গেলে পরিত্যক্ত শিশুটীর কাছে কেবল সে-ই দাঁড়িয়ে রইল। কত লোক আসে কত লোক যায়। উঁকি দিয়ে চায় সবাই, আর একটু মুখ টিপে হাসে। এই হাসির পিছনে লুকানো কত না শ্লেষ বিদ্রূপ!—

কাছেই ছিল একটা বিড়ির দোকান। বিড়ি-ওলা গাড়োয়ানকে ডেকে বল্লে, কি করবি বল্ দেখি। ছেলেটা যে মারা যায়। লোক জন সবাই তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে গাড়োয়ান হঠাৎ ছেঁড়া ময়লা কাপড়শুদ্ধ ছেলেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরলে, বল্লে, নিয়ে চল্লুম ঘরে। মানুষ করব!—

তারপর গেছে অনেক দিন!—নিজের জীবনের এই অতীত ইতিহাস টুকু লালু ভাল করেই জানত। কিন্তু সে জন্যে সে কখনও আপনাকে ঘৃণিত বোধ করে নি, কারণ এজন্যে অপরের কাছ হ'তে ঘৃণা পাবার পথ সে রাখে নি।

তাই বুঝি পথের উপর লালুর একটা অহেতুক মায়া ছিল। দুপুরবেলা যখন পথ জনবিরল হয়ে, দগ্ধ রৌদ্রে ধু ধু করত একটা অতৃপ্ত তৃষার মত, তখন সে তার গাড়ীখানা ষ্টাণ্ডে দাঁড় করিয়ে সেই পথে পথে একা ঘুরে বেড়াতো। তার মনে হ'ত যেন এই পাথরে বাঁধানো মানুষের চির-পদধূলি-বওয়া পথই তার অত্যন্ত আপন—আর কোথাও কেউ নেই তার।

লালুকে মানুষ করতে করতে তার পালক পিতার একদিন পরপার থেকে ডাক এলো। যাবার সময় সে লালুকে দিয়ে গেল তার ভাঙাচোরা গাড়ী খানি আর কতকগুলো ভাঙাচোরা বাসনপত্র। যা বলে, গাড়োয়ানের ঘরে লালু কিছুদিন একটা মেয়েকে পেয়েছিল। লালু দেখেছে গাড়োয়ানের সঙ্গে তার বনিবনার মাত্রাটা কম হলেও মেয়েটীর রুক্ষ সৌন্দর্য্য ও কঠোর আচরণের মধ্যে একটী প্রেম ও স্নেহকরুণ নারী-হৃদয় উঁকি ঝুঁকি দিত যখন তখন। লালু তার হাতে অনেক মার খেয়েছে অনেক দিন। কিন্তু তবু তাকে সে ভালবাস্ত মায়েরি মতন। তাই যেদিন গাড়োয়ান বল্লে, লালু তোর মা আমায় ছেড়ে চলে গেলরে। তখন লালু বল্লে, আবার আস্‌বে বাবা, কোথায় বেড়াতে গেছে। গাড়োয়ান বল্লে, তুই জানিস্ নারে লালু। সে আর আস্‌বে না। যে যায় সে আর আসে না কথাটা লালু বিশ্বাস করলে না। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগ্‌ল ততই তাকে বাধ্য হয়ে এ কথাটা বিশ্বাস করতে হ'ল। কিন্তু যে শ্রদ্ধার চক্ষে একদিন সে তাকে দেখেছিল সে দৃষ্টি তার মনের মধ্যে তেমনি উজ্জ্বল হয়েই রইল। সে ভাব্‌লে যদি কখনো দেখা হয় তার সঙ্গে তবে জিগ্যেস করবে, কিসের অভাব ছিল তোমার? কি এমন তুমি পেয়েছিলে যার জন্যে দুটী বুক ভেঙে দিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়লে ঘর থেকে? দেখাও আর হল না। স্মৃতি তার ক্রমে ক্রমে মন থেকে মুছে যেতে লাগ্‌ল।

গাড়োয়ান মারা যাবার পর লালুর মনে হল পৃথিবীতে তার অবলম্বন করবার আর কিছুই নেই। রাজাবাজারের গোরস্থানে তাকে মাটীর তলায় শুইয়ে রেখে এসে লালু ঘরের দরজায় বসে' সমস্ত দিন কাঁদল। অন্তরের বেদনায় ভরা কান্না এই তার জীবনে প্রথম। কুটিল কালের নিষ্ঠুর অপহরণের ক্ষীণ প্রতিবাদে মাতা ধরণী যে কান্না কাঁদছে দিবানিশি, এই নিরক্ষর গরীব সহরের ঘোড়ায় গাড়োয়ান ছেলেটীর এই অক্ষম কান্না তারই একটী অস্ফুট প্রতিধ্বনি বুঝি। সব সত্যেরই মত এও একটী পরম সত্য।

মঙ্গলি আর তার মা থাকত সেই বস্তিরই পাশের একটা ঘরে। তারা নতুন বাড়ীর ছাতপেটার কাজ করে। ভোর হ'তে না হতে, আঁচলে চালছোলা মিরচা বেঁধে নিয়ে কাজে চলে যায়, সন্ধ্যেবেলা এসে ডাল ভাত রাঁধে। এক একদিন দুপুর বেলা লালু ঘরে ফিরে দেখেছে মা কাজে চলে গেছে আর মঙ্গলি মাটীর মেজেয় ছেঁড়া চাটাই-এর ওপর শুয়ে জ্বরে ছট্‌ফট্ করছে। আহা! সমস্ত দিন রোদে বসে থাকে! এই কচি বয়েস, জ্বর হবেই ত!—লালু তার মাথায় কপালে জল দিয়ে—তাল পাতার পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে। মেয়েটী সুস্থ হয়ে বলে, যাও ভাই, আমি ভালো হয়েছি।

একদিন লালু জিগ্যেস করলে, তোর বাবা কোথা থাকে রে মঙ্গলি। জ্বর ছেড়ে যাবার পর মঙ্গলি তখন দুমুঠো মুড়ি চিবোচ্ছিল। বল্লে, কি জানি ভাই। মা বলে আস্‌ছি বলে' গিয়েছে আর আসে নি। রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। হয়ত কোথাও ভারা থেকে পড়ে' গিয়ে মারা গেছে। লালু বল্লে, তোর বাবাকে তোর মনে পড়ে মঙ্গলি? সবেগে মাথা নেড়ে মঙ্গলি বল্লে, না ভাই, আমি তাকে কখনো চোখেও দেখি নি!—অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে লালু বল্লে, বিকেল হল। গাড়ী বার করি গে এবার। তুই ঘুমো মঙ্গলি! বলে সে চলে' গেল।

হাটখোলার সেই রাস্তায় একটা পাগলি এসেছে—ক'দিন থেকে। শুক্‌নো রুক্ষ এক বোঝা চুল নিয়ে ছেঁড়া কাপড় পড়ে' একটা বস্তার মত সে বসে থাকে পথের ধারে কেষ্টচুড়ো গাছতলাটায়! রাস্তার পাশেই একটা জলের কল। ছোট ছেলেরা জল খেতে এসে মজা করবার জন্যে তার গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। কিছুই বলে না সে। একবার মাত্র ছেলেদের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকায়। তার পর হাউ হাউ করে' কেঁদে ওঠে। ছেলেগুলো হো হো করে' হাসে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে একদিন লালু পাগলিকে দেখলো। একটা নারকেলের মালায় কতকগুলা পান্তা ভাত নিয়ে সে তখন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। লালুর মনটা হঠাৎ করুণায় ভরে' উঠল। দীনু ময়রার খাবারের দোকান থেকে এক পোয়া জিলিপি কিনে এনে সে বল্লে, তোর ভারি খিদে পেয়েছে, নারে পাগ্‌লি,—খাবি?—বলে সে তার মালার ওপর জিলিপির ঠোঙাটা আস্তে আস্তে রেখে দিলে। বুড়ি একবার তার মুখের দিকে চেয়ে জিলিপি খেতে আরম্ভ করলে। খাওয়া শেষ করে সে সহজ ভাবেই বল্লে লালুর মুখের দিকে চেয়ে—সোনার ছেলে তুই!—হ্যাঁরে আমার হারানো মাণিকটা কি তুই কুড়িয়ে পেয়েছিস্—বলতে পারিস্?—হ্যাঁ!—হবে বোধ হয় সতেরো বছর!—বলতে বলতে পাগ্‌লি তার ভাঙা কাঁচে আর ছেঁড়া কাগজে ভরা থলির ভেতর কি যেন খুঁজতে লাগল অতি ব্যগ্রভাবে! তার ঝুলির ভেতর দুটো পয়সা ফেলে দিয়ে লালু দূরে সরে' গেল!—কিন্তু মনটা তার যেন পড়ে' রইল ওই কেষ্টচুড়ো গাছের তলায়!

লালু ভাবতে লাগল এতদিন হাটখোলার পথে যাওয়া-আসা করচি এ পাগলিকে ত কখনো দেখিনি! কোথা থেকে এলো ও?—দিন রাত ওই পথের পাশে পড়ে থাকে। হয়ত সবদিন খেতেও পায় না!—কে জানে কেন ওর ওপরে করুণ সমবেদনায় লালুর বুকটা ভ'রে উঠল। গাড়ী নিয়ে বেরুতে সকালে আর ফিরবার সময় বিকালে সে তার খোঁজ নিয়ে ঘরে ফিরত!—

লালুর গলায় তামার মাদুলী ছিল একটা কালো কার দিয়ে বাঁধা! গাড়োয়ান মরবার সময় তাকে বলেছিল ওটা তুই খুলে ফেলিস্‌নি লালু!—ওইটে শুদ্ধু ই তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, ওটা রাখিস্ গলায় বেঁধে!—মাদুলিটা লালু খুলে ফেলে নি'—মাঝে মাঝে শুধু কার বদ্‌লিয়ে দিয়েছে।

—কখনো কখনো সে মাদুলিটা হাতে তুলে ধরে' অন্য মনে দেখেছে তার পানে চেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়েছে যেন আবছায়ার মত কত কথা আর ছবি!—

সেদিন সকালে পাগলি লালুর সেই মাদুলীটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছিল।—লালু হেসে বল্লে—ওটা সোনার নয় রে পাগলি—তামার।—স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পাগলি বল্লে—মিথ্যে কথা কই দেখি।—লালু খুলে দিলে মাদুলিটা তার হাতে।—উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ দেখে পাগলি তাকে মাদুলি ফেরৎ দিলে। চারটে পয়সা তাকে দিয়ে লালু নিজের কাজে গেল।

পাগলির এখন অনেক বদল হয়ে' গেছে। আর সে যখন তখন হাসে না বা কাঁদে না—যা তা বকাবকি করে না। সে সামনে গেলে অবাক্ হয়ে' তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খেতে দিলে মুখ নীচু করে' চুপিচুপি খায়। লালু ভাবলে এতদিনে বুঝি পাগলির মাথা ভাল হয়েছে। সে শুধালো, কোথায় তোর ঘর রে! যাবি সেখানে?—চল্, রেখে আস্‌ব আমার গাড়ীতে নিয়ে। পাগলি কোন কথা না বলে অনেকক্ষণ লালুর মুখপানে চেয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না, চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে' জল পড়তে লাগল।

সেদিন শেষ রাত্রে দীনু ময়রা এসে ডাকছিল—লালু! লালু!—ধড়মড় করে উঠে লালু বল্লে, কি ভাই!—সেই পাগলী তোকে ডাকছে!—বিকেল থেকে তার কলেরা হয়েছে। বোধ হয় বাঁচ্‌বে না। খপ্ করে' দেশলাই ধরিয়ে লালু গাড়ীর বাতিটা জেলে নিলে।—বাইরে এসে বল্লে, চল দেখি!—তুই যা!—আমার ভারী ঘুম পেয়েছে। আমি চল্লুম। বাঁচাতে আর কেউ পারবে না ওকে,—বল্‌তে বল্‌তে দীনু অন্য দিকের রাস্তা ধরে' চলে গেল। লালু এসে দাঁড়ালো সেই গাছ তলাটায়। সত্যিই পাগলির তখন শেষ অবস্থা—সমস্ত শরীর তার যেন শুখিয়ে কাঠ হয়ে কুঁচকে উঠেছে। মুখ নীলবর্ণ!—ইঙ্গিত করে' সে লালুকে কাছে আস্‌তে বল্লে। লালু মাটীর ওপর বাতিটা রেখে তার পাশে গিয়ে বস্‌ল। কোন রকমে জীর্ণ অক্ষম হাতখানা বাড়িয়ে পাগলি লালুর মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কানের কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বল্লে—লালু! লালু!—তুই গাড়োয়ান নস্, তুই আমার ছেলে—আমিই তোকে পথে ফেলে দিয়েছিলুম!—ওই মাদুলী আমিই পরিয়েছিলুম তোর গলায়।—আমি তোর মা,—বল্‌তে বল্‌তেই তার কথা থেমে এল। চোখ দুটো বুজে গেল, আস্তে আস্তে বাহু এলিয়ে পড়ল। যেন এই কথা কটা বল্‌বার জন্যেই সে এতক্ষণ বেঁচে ছিল। শেষরাতের থম্‌থমে অন্ধকারের মধ্যে লালু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো গাছতলায়!—

পথে তখন জনমানব নেই।—জোয়ান ছেলের পায়ের কাছে পাগলি মা মুখ থুব্‌ড়ে মরে পড়ে আছে—পথে!

কোন রকমে ঘোড়াদুটোকে চারটী দানা দিয়ে এসে লালু দরজা বন্ধ করে' মাটীর ওপর শুয়ে পড়ল।—অনেক দিন পরে কান্না পাচ্ছিল তার। বুকের ভেতর থেকে কি যেন ঠেলে উঠছিল। মাটীর উপর শুয়ে তার চোখের জল বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মত বেয়ে চল্ল।—এক একবার সে নিজেই ঠিক করতে পারলে না কেন এত কাঁদছে। চুপ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কান্না যে আপনি আসে। আর কাঁদতেই ভাল লাগে যে!—বুড়ি পাগ্‌লি যে মরবার সময় বলে' গেল সেই তার মা! কথাটা লালু নিজের মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারল না, তবুও কথাটা তার বুকের মধ্যে গিয়ে কোথায় যেন খোঁচা দিতে লাগলো। সে ভাবলে অসম্ভব কি? হয়ত হবেও তাই—!… কিন্তু, তার জন্যে কি যায় আসে!—পথে ফেলে দিয়ে সতেরো বছর পরে খোঁজ করতে আসা?—সব মিথ্যে কথা! পাগ্‌লির কথায় আবার বিশ্বাস কি!—দু'-বেলা তাকে খেতে দিতো, এই জন্যে হয়ত একটা মায়া পড়েছিল। মেয়ে মানুষ ত!…আবার চোখে জল আসে, বুক গুম্‌রে ওঠে!—

কাজ থেকে ফেরবার পথে মণ্ডলি লালুর দরজায় উঁকি দিয়ে যায়। সেদিন তখনো লালুকে শুয়ে পড়ে' থাকতে দেখে মণ্ডলি তার পাশে এসে বস্‌ল। তার মুখপানে চেয়ে বল্লে, কাঁদছিলি কেন রে লালু!—লালু উঠে জোর করে' হেসে বল্লে, দূর! কাঁদব কেন?—না ভাই!—কিছু নয়—কাঁদব কেন!—বল্‌তে বল্‌তে লালু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।—লালু চলে' গেলে মণ্ডলি অনেকক্ষণ চুপ করে'

বসে' রইল। তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে উঠে নিজেদের ঘরের দিকে গেল।—

দিনের পরে দিন যায়। পাগ্‌লির স্মৃতি লালুর মন থেকে একটু একটু করে' মুছে যেতে লাগল। সে আবার তার নিজের কাজ নিয়ে মেতে উঠল। কিন্তু কেষ্টচুড়ো গাছটার কাছ দিয়ে আসবার সময় রোজই সকালে বিকালে একবার অন্যমনা হয়ে' পড়ে। তার বুকটা একবার খচ্‌ করে' ওঠে। গাড়ী হাঁকিয়ে কিছু দূর গেলেই সে ভুলে যায়। জোরসে ছড় লাগিয়ে সে তখন গাড়ী হাঁকিয়ে দেয়!

তিন চার জন নতুন লোক এসেছে মঙলিদের ঘরে। কয়দিন থেকে ওরা আর কাজে যাচ্ছে না। ঘরের দেয়ালের বেড়া ফাঁক করে' লালু দেখলে ওদের ঘরে চলেছে খাওয়া দাওয়ার বেজায় ধূম। লোকগুলা যে কে তা' সে ঠাহর করে' উঠ্‌তে পারল না। সেদিন কি একটা পরব। গেল বছরে লালু এই দিনে একখানা রঙীন কাপড় কিনে দিয়েছিল মঙ্‌লিকে। মঙলির মা কাপড় নিতে আপত্তি করেছিল। বলেছিল, ওরা অজাত—ওদের কাপড় কেন নিবি মঙ্‌লি?—ওদের পরব—! কঠোর কণ্ঠে মঙ্‌লি বলেছিল, আমার ইচ্ছে—আমি নেব, তোমার কি?—লালু অজাত নয়! মা রেগে বল্লে, নয়!—কি করে' জানলি তুই!—মঙ্‌লি যে কি করে' জান্‌লে তা' সে বল্‌তে পারলে না। কিন্তু তার যেন সব সময়ে মনে হ'ত লালু তাদের জাতেরি একজন। উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে তার মা সব সময়ে লালুকে অজাত ভেবে বিচার করে' চল্‌ত, মঙ্‌লি সে কথা খেয়ালেও আন্‌ত না। কতদিন সে লালুর এঁটোই খেয়ে এসেছে।

সেদিন জাফরানি রঙের একখানা সাড়ি কিনে এনে লালু ওদের দরজায় গিয়ে ডাকল, মঙলি! মঙলি এলোনা। তার মা এসে বল্লে, কিরে লালু!—লালুর হাতে কাপড়খানা দেখে মঙলির মা বলে উঠ্‌ল, না না, ও তোর কাপড় নিতে পারবে না। তুই নিয়ে যা লালু!—লালু বল্লে, একবার ডেকে দাও চাচী মঙলিকে! রেগে উঠে মঙলির মা বল্লে, ঘরে লোকজন আছে, সে আস্‌তে পার্‌বে না। তুই যা লালু!—বলেই সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে' দিলে। রুদ্ধ দরজার সামনে লালু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের দিকে ফির্‌ল। তার চোখে জল এলো!

পরের দিন এক সময়ে লালু চুপ করে ঘরে বসে ছিল, হঠাৎ মঙ্‌লি কোথা থেকে এসে বল্লে, লালু কই কাপড় দে ভাই! লালুর মুখের মেঘ কেটে রোদ্দুর ঠিক্‌রে পড়লো। তার ভাঙা তোরঙ্গটার মধ্যে সে সযত্নে কাপড়খানি রেখে দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বার করে' মঙ্‌লির হাতে দিলে। মঙ্‌লি বল্লে, আমি আর বসতে পারব না ভাই! চল্লুম!—কাপড়খানি আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে!

দিন সাতেক পরে একদিন শেষ রাতে লালুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চম্‌কে উঠে বসে সে দেখলে মঙ্‌লি তার পাশে বসে আছে। ঘরে মিট্‌ মিট্‌ করে একটা বাতি জ্বলছিল। মঙ্‌লির মুখের দিকে চেয়ে লালু অবাক হ'য়ে রইলো—এলানো চুলে মঙ্‌লি দিয়েছে একরাশ নারকেল তেল, কপালে তার কাজলের ফোঁটা, চোখে কাজল পরা! পরণে তার একখানা ছোপানো হলুদে সাড়ী, গায়ে কতকগুলো রূপোর গয়না। চোখ রগড়ে লালু বল্লে, কোথাও যাবি বুঝি তোরা মঙ্‌লি! কি যেন বল্‌তে গিয়ে মঙ্‌লির ঠোঁট কেঁপে উঠলো, মৃদুস্বরে সে বল্লে, লালু, আমরা আজ ঘর যাব ভাই! ঘর যাবি? বেশ ত!—লালুর মুখে হাসি ফুট্‌ল। আবার আস্‌বি কবে?—মঙ্‌লি কোন জবাব দিতে পারল না। তার বড় বড় চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল পড়ল লালুর হাতের ওপর। বিস্ময়ভরে লালু বল্লে, কাঁদিস্‌ কেনরে মঙলি, কি হয়েছে! চোখ মুছে মঙ্‌লি উঠে দাঁড়ালো, দরজার কাছাকাছি গিয়ে চুপি চুপি বল্লে, ওরা আমাকে দেশে নিয়ে যেতে এসেছে। সেখানে আমার সাদি হবে!—বল্‌তে বল্‌তে সে বেরিয়ে চলে' গেল। পা দুটী তার থর্‌ থর্‌ করে' কাঁপছিল! ভোরের হাওয়ায় পিদিম নিভে গেল! অন্ধকারের মধ্যে লালু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল; তার মনে হল যেন সে একটা স্বপ্ন দেখছে!

ভাড়াটে গাড়ীর ঝর ঝর শব্দ শুনে লালু দৌড়ে এল বাইরে।—বস্তির ধার থেকে গাড়ীখানি চলে' গেছে—তখন অনেক দূরে। তার জান্‌লার ফাঁক দিয়ে হলদে সাড়ীর একটুখানি বেরিয়ে ছিল। কি ভেবে লালু চল্‌ল

গাড়ীটার পেছনে পেছনে। খানিকটা দূর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় রাস্তার বাঁকে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল!—বুকের ওপর থেকে যেন লালুর একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল, সে ঘরে ফিরল!—

দিন তিনেক পরে। দুপুর বেলা লালু ভাত খেয়ে সান্‌কি মাজ্‌ছিল এমন সময় বাইরে থেকে কি একটা শব্দ হ'ল! কে যেন তাড়াতাড়ি তার ঘরে এসে ঢুকলো। ঘরের দিকে ফিরে দেখ্‌লে লালু—মাথায় কাপড় দেওয়া একটা মেয়ে ঘরের ভেতর এসে চারদিক দেখছে। লালুর বুকখানা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। সান্‌কিখানা রেখে সে দরজার ধারে এসে দাড়ালো, মেয়েটি মঙ্‌লি—আলু থালু শুক্‌নো তার চুল। মুখে তিন চার জায়গা দিয়ে রক্ত পড়েছে, কে যেন শক্ত লোহা দিয়ে আঘাত করেছে। লালুকে দেখেই মঙ্‌লি তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। লালু যে কি কর্‌বে, কি বলবে ঠিক করতে পারলে না। সে বুঝতেও পারলে না, এমন সময় হঠাৎ মঙ্‌লি কোথা থেকে এলো! মঙ্‌লি কেঁদে কেঁদে বল্লে—লালু ভাই, এখান থেকে আমায় নিয়ে চল্!—আমি পথ থেকে পালিয়ে এসেছি! রাস্তায় মা আমার মারা গেছে! সেই লোক-গুলো আমাকে জোর করে সাদি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। তোর কাছ-ছাড়া হয়ে' আমি আর কোথাও থাক্‌তে পারবো না। এখান থেকে চল্—অন্য জায়গায় গিয়ে আমরা থাক্‌বো—নইলে সেই লোকগুলো এসে আবার আমায় ধরে নিয়ে যাবে!—মঙ্‌লির চোখের জলে লালুর পা ভেসে যেতে লাগলো! লালু কিছু বলতে পার্‌লে না। আস্তে আস্তে তার হাতখানি মঙলির মাথার ওপর বুলিয়ে দিতে লাগলো। মঙ্‌লি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো!

কলাবাগানের ওদিকে একটা ঘর লালুর জানা ছিল। বিকাল বেলা ঘরের ভাঙা বাক্স ও বিছানাপত্র গাড়ীতে চাপিয়ে সে মঙলিকে তার ভেতরে তুলে দিলে। তার পরে কোচবাক্সে উঠে গাড়ী চালাতে লাগলো। হঠাৎ তার মনটা একটা নতুন ফুর্ত্তিতে ভরে উঠলো। কোলাহল-মুখর বড়বাজারের রাস্তা তার চোখের সাম্‌নে একটা নতুন রূপ নিয়ে ভেসে উঠলো। এক একবার সে নিচু দিকে মুখ নামিয়ে বলতে লাগলো, মঙলি কি কচ্চিস! মঙলি বল্লে, আর কতদূর ভাই! লালু ঘোড়ার পিঠে ছিপ্‌টী মেরে বল্লে, এই যে এসে পড়লুম বলে'।

পথের ধারে ভিড় হয়েছে। লাল পাগড়ী মাথায় অনেকগুলো পুলিস কনস্টেবল একটা লোককে হাতকড়ি জড়িয়ে বেঁধেছে পিছমোড়া করে—তবুও সে লোকটা যেন গর্জ্জাচ্ছে কেউটে সাপের মত। যেন ছাড়া পেলে সব কটা লোককে এখুনি চিবিয়ে খেয়ে ফ্যালে! কোচ-বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে লালু দেখলে কাপড়ে-জড়ানো একটা মানুষ মাটীর ওপর পড়ে আছে, তাজা রক্তে তার কাপড় ভিজে উঠেছে। সে মেয়ে কি পুরুষ তা' লালু বুঝতে পারলে না। কেমন একটা কৌতূহল হ'ল তার! ভিড়ের পাশে এসে সে গাড়ী থামিয়ে নেমে এল কোচবাক্স থেকে! বল্লে, একটু বোস্ মঙলি, কি ব্যাপার দেখে আসি। দু' হাতে কোন রকমে ভিড় ঠেলে সে একটু ভেতরে ঢুকলো। বুঝলে মরা শরীরটা একটা মেয়েমানুষের—কে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। লালু শিউরে উঠলো। মরা দেহের মুখখানা কাপড়ে ঢাকা; আগ্রহভরে লালু সেদিকে চাইলে—যদি একবার দেখতে পায় মুখখানা!

হাতকড়ি-বাঁধা লোকটা সেই মরা শরীরটার দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে বলছিল, পালা দেখি, পালিয়ে কোথায় যাবি!—কত যত্নে কত ভালবেসে ঘরে রাখলুম, শেষে কিনা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা!—বেশ হয়েছে,—দিয়েছি সাবড়ে!—পাগলের মত লোকটা হি হি করে' হাস্‌তে লাগলো, দু'কস বেয়ে তার গাঁজলা ভাঙতে লাগলো।

একটা দম্‌কা বাতাস এসে মরা শরীরের মুখের কাপড়-খানা হঠাৎ খুলে দিল। সে দিক পানে চেয়ে লালু শিউরে উঠলো। এ মুখ যে তার চেনা!—কোথায় কবে দেখেছে!—হ্যাঁ মনে পড়েছে!—এ যে তার সেই মা!—গাড়োয়ানের ঘরে ছোট বেলায়, একেই যে সে মা বলে' ডেকেছিল!—দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে লালু হঠাৎ পাগলের মত ছুটে এসে কোচবাক্সে উঠে বসে' চাবুক মার্‌লে ঘোড়াকে! চাবুক খেয়ে ঘোড়া ছুটে চল্লো ঝড়ের মত পথের ওপর দিয়ে!—দু' পাশের লোক ভয়ে সরে দাঁড়াতে লাগলো—মঙলি ভয় পেয়ে বলে উঠলো, একটু আস্তে চালা ভাই। ভারি ভয় করছে আমার!—

লালু কোন জবাব দিলে না। গাড়ী চলতে লাগলো। কোন্ পথে কে জানে! যে-পথের বুকে লালুর ভূমিষ্ঠ হওয়া সেই পথেরই নির্দ্দেশে সে বুঝি আজও চলেছে। কাব্যে-সাহিত্যে সে-পথ আজও নামহীন, ঠিকানাহীন।

বাংলার পরিচিত পাখী

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

দোয়েল

বাংলার পরিচিত পাখীর বর্ণনায় দোয়েলেরই সর্ব্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত। কেননা দোয়েল আমাদের গায়ক-পাখী; গায়কপাখী হিসাবে এর স্থান প্রথম না হ'লেও দ্বিতীয় বটে। বিদেশীরা ব'লে থাকেন যে ভারতবর্ষে ভাল গায়ক পাখী নেই, কিন্তু দোয়েলের কণ্ঠস্বর শুনবার পর তাঁদের সেই ভ্রম হয়ত' ঘুচে যায়।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম গায়ক পাখী হচ্ছে "শ্যামা"। খাঁচার ভিতর এ পাখিটির সঙ্গে আমাদের পরিচয়; কেননা, এ পাখী জনপদের আশে পাশে বাস করে না—গভীর জঙ্গলে অবস্থান করে এবং তার সুললিত কণ্ঠের সুরবন্যায় বনভূমির নীরবতা ঝঙ্কৃত ক'রে রাখে। মানুষ তার কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য তাকে ধ'রে আনে। এ পাখী বন্দী অবস্থায় কোনও অসুবিধা ভোগ করে মনে হয় না; কেননা খাঁচার মধ্যে সে দিব্য আরামে থাকে, তার প্রভুর সঙ্গে সে সখ্যতা স্থাপন করে এবং খাঁচা থেকে সরিয়ে পক্ষিগৃহে রাখলে সে নীড়রচনা ক'রে সন্তান উৎপাদনও ক'রে থাকে।

"শালিক" প্রবন্ধে আমি আমাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির অভাবের কথা উল্লেখ করেছিলাম। অবান্তর হ'লেও "শ্যামা" সম্পর্কে তার আর একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারছিনা। বছর ছয়েক আগে "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রবাসীদলের এক বিশিষ্ট কবির এক কবিতা বের হয়। কবিতার নামটা আমি বিস্মৃত হ'য়েছি, তার বিষয় ছিল পল্লীর শোভাবর্ণনা। তাতে কবি আমাদের পল্লীতে যে সব পাখীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় তার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে "শ্যামা" "দোয়েল" উল্লেখ ক'রে গেছেন! কবি "শ্যামার" নাম মাত্র শুনেছেন বোধহয়, কিন্তু এ পাখীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া দরকার বোধ করেন নি। অবশ্য তিনি পাঠক ও সম্পাদকদের অজ্ঞতার সুযোগ পেয়েছিলেন। অথচ বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষ যখন 'সিভিলাইজড' হয়নি তখন কালিদাস যে মোটা মোটা কাব্যে পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদির বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাতে কোথাও এতটুকু সত্যের অপলাপ হয়নি।

যাক্, আমাদের দোয়েলের কথা হোক্। একে বাঙলার পরিচিত পাখী বলে' পরিচয় দিয়েছি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই দোয়েল পাওয়া যায়: পাহাড় অঞ্চলে এ পাঁচ হাজার ফুটের বেশী উঁচুতে ওঠে না। সুদূর টেনাসেরিমেও দোয়েল দেখতে পাওয়া যায়। আন্দামানের রসদ্বীপে দোয়েলের সংখ্যা খুবই বেশী—যাঁরা চৌদ্দ বছর ক'রে সেখানে কাটিয়ে এসেছেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারেন। বাংলাদেশে কিন্তু এমন নগর, গ্রাম বা জনপদ নাই যেখানে এই পাখী তার সুরের ধারায় দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করে' তোলে না। এর দেহের বেশীর ভাগই উজ্জ্বল কুচকুচে কালো, দুই পাশের ডানার মাঝখানে একটি করে' ফেণশুভ্র রেখা, আর বক্ষোদেশের নিম্ন ভাগ সম্পূর্ণ সাদা। লেজের অধোভাগের পতত্রগুলিও শুভ্র - এই সাদা পতত্রগুলি চোখে পড়ে যখন সে লেজটিকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে' পাখার মত ছড়িয়ে দেয়। এই সাদাকালোর বর্ণ-বিন্যাস পাখিটীকে বড়ই সুশ্রী ও মনোহর করেছে। দৈর্ঘ্যে পাখিটী আট ইঞ্চির অধিক নয়, কিন্তু দেহের গঠন অতি সুঠাম। এর চাল-চলনে একটা লীলায়িত ছন্দ আছে। যখন সে পুচ্ছটিকে উচ্চ ক'রে গাছের ডালে কিংবা কোনও মাটির ঢিপির উপর অথবা ঘরের বারান্দায় এসে ঘাড়খানি বক্র ক'রে বসে, মনে হয় সমস্ত বিশ্ব-চরাচরকে তাল ঠুকে সে বলছে—"আমার চাইতে সুন্দর কিছু দেখাও দেখি।"

দোয়েল বাস্তবিকই খুব নির্ভীক—মানুষের আশে পাশেই সে থাকে। বাগানের ভিতর দিয়ে অপ্রশস্ত পথে চল্‌তে চল্‌তে দেখতে পাবেন, এই পাখী ঠিক আপনার পথের মাঝখানে ব'সে কোনও কীটের স্বাদুতা পরীক্ষা করছে। আপনাকে দেখে চট্ ক'রে নিঃশঙ্কে পাখা মেলে উত্থান ক'রে সে অদূরে শাখাগ্রে গিয়ে বসল। সেখান থেকে কুঞ্চিত নয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করবে—আপনি সম্মুখ দিয়ে চলে যান, এতটুকুও গ্রাহ্য নাই। স্থির প্রকৃতির

বুকে এই ক্ষিপ্র, চঞ্চল পাখী তার চলাফেরার বিদ্যুৎ-গতি দিয়ে একটা সজীবতার সঞ্চার করে; গ্রামের ভিতর, অলস জড়তার মধ্যে একটা প্রাণের প্রবাহ এনে দেয়।

অতি প্রত্যুষে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সে নিবাস-বৃক্ষ পরিত্যাগ করে। কোনও একটী উচ্চ বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখার উপরে ব'সে গলা ছেড়ে সে সঙ্গীত সুরু করে। এই সঙ্গীত যেমন উচ্চ গ্রামে বাঁধা, তেমনি সুর-বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মাঝে মাঝে আসন পরিবর্ত্তন ক'রে ঝাড়া দেড় কি দুই ঘণ্টা সে লহরীর উপর লহরী সুর ঢেলে চারিদিক মুখর ক'রে তোলে। সমস্ত গ্রামপ্রান্ত যখন বেশ কিছুক্ষণ রৌদ্রে স্নান করেছে, তখনই সে গান থামিয়ে আহার অন্বেষণে মনোনিবেশ করে। মনে হয় এতক্ষণ সে প্রভাত-রবির বন্দনা করছিল। ফাঙ্ক ফিন নামক ইংরাজ লেখক বলেন যে এক নাইটিঙ্গেল ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় পাখী কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতায় দোয়েলের সমকক্ষ নয়। আবার সন্ধ্যার সময় সূর্য্য যখন পাটে বসছেন, তখন একবার দোয়েল খুব একটা উঁচু স্থানে ব'সে নিজের কণ্ঠের ঐশ্বর্য্য মুক্ত ক'রে দেয়।

এই পাখী জমির উপরই খাদ্য সংগ্রহ করে। পত্রান্তরালে বৃক্ষশাখায় সে তার আহারের জন্য বিচরণ করে না, বা উড্ডান অবস্থায় আহার্য্যসংগ্রহের চেষ্টাও করে না। মাঝে মাঝে আমাদের আঙ্গিনায়, ঘরের পাশে ছানচেতলায়, দাওয়ার নীচে এসেও উপস্থিত হয়। কীট পতঙ্গই তার একমাত্র ভোজ্য—শাকশব্জী ফলমূল নিরামিষ খাদ্য সে আদৌ পছন্দ করে না। কীটভুক্ এই দোয়েল পাখীর জন্য আমাদের বাগানের অনেক ফলফুল ও শাকশব্জীর গাছ নিরাপদে বৃদ্ধি পায়। শাকসব্জীর অনিষ্টকর অনেক কীটপতঙ্গের দ্বারা দোয়েল উদরপূর্ত্তি করে। কাজেই এই পাখী মানুষের হিতকারী বন্ধু। একে নির্য্যাতন, একে বন্দী করা কিংবা এর ধ্বংসের চেষ্টা করা মানুষের স্বার্থের দিক দিয়েও সমীচীন নয়।

যে সমস্ত কীটভুক্ পাখী যাযাবর নয়, যারা একই স্থানে থাকতে ভালবাসে তাদের মধ্যে সামাজিকতার অভাব, দল বেঁধে তারা বাস করে না। অনেকগুলি পাখী একসঙ্গে থাকলে আহার্য্য ক্রমশঃই নিঃশেষ হ'য়ে আসবে, তাই এরা একা বিচরণ করে। প্রত্যেকটি দোয়েলের নিজের নিজের একটা ক'রে তালুক আছে। এবং তার চৌহদ্দীও বেশ নির্দ্দেশ করা থাকে। এই চৌহদ্দীর বাইরে হয়তো অন্য একটি দোয়েলের বিচরণ-ক্ষেত্র। পাশাপাশি বাস ক'রে উভয়ের মধ্যে কেহ কখনও অপরের আড্ডায় যায় না। কদাচিৎ কখনও গিয়ে পড়লে যুদ্ধ লেগে যায়। "লীগ অফ বার্ডস্" গঠন না ক'রেও তাদের মধ্যে Self-determination-এর ব্যাপারটা বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। রংপুরে আমাদের বাসার পিছনে দুটি আম গাছের নীচে একজোড়া দোয়েল আড্ডা করেছিল। তারা সারা বছর সেখানে থাক্‌ত। প্রতি বৎসর সেই একই গর্ত্তে তারা বাসা রচনা করেছে।

দোয়েল এত অমিশুক যে তার গৃহিণীর সঙ্গে সম্বন্ধটাও খুব ঘনিষ্ঠ নয়। প্রায় সারাটা বছর দোয়েল-পত্নী ভর্ত্তার সব অবহেলা অগ্রাহ্য করে স্বামীর আশেপাশেই থাকে। কাছে গেলে দোয়েল প্রহার দেয় তাই বেশ দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলে। পতিগত-প্রাণা দোয়েল-জায়া ছায়ার মতই কিঞ্চিৎ ব্যবধান রক্ষা ক'রে পুরুষ দোয়েলের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এর কারণ দোয়েল পাখীর মধ্যে একপতিত্ব ও একপত্নীত্ব প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। দৈহিক সম্পদ পুরুষ-দোয়েলেরই বেশী। স্ত্রী-দোয়েলের দেহের বর্ণবিন্যাস একই রূপ তবে পুরুষের যে সকল স্থান ঘনকৃষ্ণ, স্ত্রী-দোয়েলের দেহে সে সব স্থান ফিঁকে কালো। বসন্তের পরই দোয়েল-জায়ার আদর আরম্ভ হয়। অন্যান্য অনেক পাখীর মত ঐ সময়টাই এদের প্রজনন-কাল। এই সময় দোয়েলের মনে পড়ে যে পত্নীর মনোরঞ্জন করা কর্ত্তব্য। এবং এই কর্ত্তব্যটী সে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। কণ্ঠে তখন তার সুরের ধারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে; শাখা হ'তে শাখান্তরে উড়ে উড়ে পুচ্ছখানি গর্ব্বভরে বিস্তার ক'রে বেড়ায়। আর যখন দোয়েল-পত্নী নীড় মধ্যে ডিম্বোপরি উপবিষ্টা থাকে, তখন অদূরে তার দৃষ্টিগোচরে কোনও উচ্চ স্থানে উপবেশন করে সে সুরের মদিরায় প্রকৃতিকে হর্ষ-ধ্বনিতে বিহ্বল ক'রে তোলে। জীবনসঙ্গিনীর রূপলালিত্যে ও কণ্ঠমাধুর্য্যে আত্মহারা হ'য়ে নীড়োপবিষ্টা

দোয়েল-পত্নী ডিম ফোটাবার একঘেয়ে কাজের অবসাদ ভুলে থাকে।

স্ত্রী-দোয়েল ও পুরুষ-দোয়েল পরস্পরের জীবনসঙ্গীই বটে। কারণ একটির মৃত্যু হ'লে অপরটি সাধারণতঃ আর অন্য সঙ্গী নির্ব্বাচন করে না। বিখ্যাত পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা মহাশয়ের পক্ষি-গৃহে দোয়েলের এক-পত্নীত্বের প্রমাণ পাই। সত্যবাবুর দুই জোড়া দোয়েল ছিল। কোন্ পুরুষটি যে কোন্ স্ত্রী-পক্ষীর প্রেমমুগ্ধ তা বুঝতে না পেরে সত্যবাবু একটি পুরুষকে খাঁচায় পুরে অপর পুরুষটিকে দুই স্ত্রী-পক্ষীর সঙ্গে একই গৃহে রাখলেন। মজা হ'ল এই যে দুইটি স্ত্রী-পাখীই একটি পুরুষকে পছন্দ ক'রল। সমস্যায় প'ড়ে ভদ্রলোক একটি স্ত্রী-পাখীকে বের ক'রে নিলেন ও খাঁচায় আবদ্ধ পুরুষ পাখীর সঙ্গে তাকে পাশের পক্ষি-গৃহে ছেড়ে দিলেন। তখন দেখা গেল যে এই শেষোক্ত স্ত্রী-পাখীটির প্রতিই পূর্ব্বের পুরুষ-পাখীটির অনুরাগ। কারণ দেখা গেল যে প্রথম পক্ষি-গৃহে পুরুষ-পাখী অনবরত স্ত্রী-পাখীটিকে তাড়া ক'রছে। অথচ সে বেচারী তারই প্রেমমুগ্ধা—তার পশ্চাদনুসরণ করে ও নির্য্যাতন সহ্য করে। পুরুষটি অনবরত পাশের পক্ষি-গৃহের তারের বেড়ায় গিয়ে বসে। একদিন সে তার সহচরী স্ত্রী-পাখীটির অনুরাগ প্রাবল্য সহ্য ক'রতে না পেরে তাকে প্রহার দিয়ে আধমরা ক'রে ফেল্লে। কাজেই তখন সেই স্ত্রী-পাখীটিকে সরিয়ে নিতে হোল। এদিকে দ্বিতীয় পক্ষি-গৃহেও একটি করুণ রসের অভিনয় চ'লল। যে স্ত্রী-পাখীটির জন্য প্রথমোক্ত পুরুষ দোয়েলের এত ব্যস্ততা সেটিরও অন্য পুরুষের সাহচর্য্যে মেজাজ খারাপ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে যাকে চায় তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্য একটি পুরুষের ঘাড়ে তাকে চাপান হ'য়েছে। এ পুরুষ বেচারী তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এলেই স্ত্রী-পাখীটি বেশ মুখনাড়া দিয়ে তাকে দূর ক'রে দেয়।—অনুরাগ লক্ষণের আতিশয্য দেখলে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অস্ত্র নখের ব্যবহারও আরম্ভ করল। তখন লাহা মহাশয় এই স্ত্রী-পাখীটিকে নিয়ে প্রথম পক্ষি-গৃহে ছেড়ে দিলেন; অতঃপর শান্তি স্থাপিত হোল।

এরা সাধারণতঃ দেয়ালের গায়ে কোনও গর্ত্তে নীড় রচনা করে। আমাদের বাসার পাখীটি একটি দেয়ালে নীড় রচনা করতো। পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখক ডগ্‌লাস ডেওয়ার সাহেব বলেন যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই নীড় রচনার সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কিনা সে বিষয়টা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। আমি কিন্তু উভয়কেই নীড় রচনা ক'রতে দেখেছি। স্ত্রীপুরুষে যেরূপ ভাব তাতে উভয়ের পরস্পরকে সাহায্য করাটাই সম্ভব। শুধু তাই নয়, স্ত্রী-দোয়েল যখন নীড়-মধ্যে ডিমের উপর ব'সে থাকে তখন পুরুষ-পাখী আহার্য্য জোগাড় ক'রে এনে স্ত্রীকে খাওয়ায় এও আমি স্বয়ং লক্ষ্য করেছি। এরা বৎসরে একবার মাত্র সন্তান উৎপাদন করে। ডিম পাড়ে সাধারণতঃ চারিটি। ডিমের গাত্রবর্ণ ফিকে নীলাভ সবুজ ও তদুপরি লালচে ফোঁটা। এই লালচে দানা-গুলি ডিমের মোটা দিকটাতেই বেশী জড়ো হয়।

বাগানের বৃক্ষশ্রেণীর নীচে যেখানে আলোছায়ার অনবরত লুকোচুরি চলছে, সেইখানে দোয়েল সারাদিন বিচরণ করে। তার দেহের শাদাকালো বর্ণ সেই আলো-ছায়ার সঙ্গে বেশ খাপ্ খায়। চুপ ক'রে যখন সে শাখাগ্রে ব'সে থাকে খুব কাছে গেলেও চট্ ক'রে নজরে পড়ে না। প্রকৃতি এমনি ক'রেই তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য শত্রুর হাত থেকে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রাণি-জগতের এই "সঙ্গোপনী বর্ণবিন্যাস" (Protective Coloration) সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিৎ অনেক কিছুই বলেছেন। এ বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করবো।

অনেকে একে খাঁচায় পুরে' পোষ মানাতে চেষ্টা করেন। পোষ হয়তো সে মানে কিন্তু কাজটা গর্হিত। কারণ সকাল সন্ধ্যায় আমাদের কুটীরপার্শ্ব থেকে যে আমাদের কর্ণে সুরধারা বর্ষিত করে। তার গান শুনবার জন্য তাকে খাঁচায় পুরবার দরকার কি? অর্থনৈতিক ক্ষতিও হ'তে পারে।

ভঙ্গুর

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

১

মেয়েটি মেঝের উপর হাত পা ছুঁড়িয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল...পাশে চুষিকাঠিটি অনাদরে গড়াইতেছে। খাটখানিতে একটি অর্দ্ধমলিন বালিশে বাঁ-হাতের কনুই-এ ভর দিয়া নির্ম্মল খাতার পাতায় তন্ময় হইয়া গল্প লিখিতেছে। সকালের এক টুক্‌রা কাঁচা রোদ্দুর আসিয়া নির্ম্মলের মুখে পড়িয়াছে,...সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নাই। মনের আকাশে রামধনুর সাত্‌টা রঙ ওকে আজ পাগল করিয়া তুলিয়াছে. সেই রঙ দিয়া গল্পের চরিত্রকে ও ফুটাইয়া তুলিতে চায়;...পৃথিবীর দিক দৃষ্টি দিবার ওর অবসর কোথায়?

হঠাৎ নীলিমা ডাকিল...'ওগো তাকাও না এদিকে একটিবার'...'...আঃ...' চ'খের ভুরু দুইটি নির্ম্মলের আশ্চর্য্য ভাবে কুঁচ্‌কিয়া উঠিল...। না ফিরাইয়াই বলিল...'জ্বালাতন ক'রে মার্‌লে দেখ্‌ছি, এ ছাড়া কি তোমার আর সময় নেই..?'

'...কী মুশ্‌কিল· আমি বুঝি ডাক্‌ছি...দেখই না চ'খ ফিরিয়ে...'

নির্ম্মল বিরক্তিভরে চ'খ ফিরাইল,—মেঝেয় শায়িত মমতা ঘাড় ফিরাইয়া নীল দুটি চ'খে তাহারই দিকে চাহিয়া পাছে...সারা মুখ খানি ভরিয়া ওর একটি দুর্ণিবার হাসির লহর ছুটিতেছে, · পার্শ্বে দণ্ডায়মান নীলিমার মুখেও হাসি—সে হাসি তৃপ্তির...,নির্ম্মল বহুক্ষণ ধরিয়া নীলিমা ও মমতার দিকে চাহিয়া রহিল ··চাহিয়া চাহিয়া ওর মনে হইল, সংসার-নীড়ের এই দুইটি প্রাণীকে ও যদি তা'র গল্পের ভিতর দিয়া ফুটাইতে পারিত · মমতার দুটি নীল চ'খ ঠোঁটের হাসি...মুখের লাবণ্য অর্দ্ধস্ফুট ভাষা...আর ন[illegible] বুভুক্ষু একটি প্রাণ যদি রেখার পর রেখা টানিয়া সপ্তবর্ণ রামধনুর মত রঞ্জিত করিতে পারিত...,তাহা হইলে তা'র সাধনা বোধ করি ব্যর্থ হইতনা..., কিন্তু ও কি তা' পারিবে?...নির্ম্মল ভাবিল এবার হাতের গল্পটি শেষ হইলেই এদের দুটিকে লইয়া সুর ভাঁজিবে..তা'র পর এম্‌নি এক সুন্দর প্রভাতে সৃষ্টির স্বর্ণরথ সে ছুটাইয়া দিবে এবং এতেই করিবে দিগ্বিজয়...

হঠাৎ আবার নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল ..'হাঁ...গো...তোমার সেই গল্পটা ত' আজও বা'র হ'লনা...?'

'...কোন্‌টা?'—নির্ম্মল একটু রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

'·· সেই যে....গায়ে কোর্ত্তা...পরণে পায়জামা...হাতে ডুগডুগি...তোমার কাছে এসে বহুক্ষণ ধ'রে লোকটা গল্প কর্‌ল·· তারই গল্প . .'

নির্ম্মল নীলিমার কথায় সজাগ হইয়া হাতের কলমটি রাখিয়া দিল...

কিছুদিন পূর্ব্বে এম্‌নি একটি লোকই ওর কাছে আসিয়াছিল বটে, অদ্ভুত তা'র চেহারা ..অদ্ভুত কথাবার্ত্তা। লোকটি আসিয়াছিল একটি নবাবিষ্কৃত ধন্বন্তরী ঔষধের ক্যান্‌ভ্যাস্‌ করিতে। এই অদ্ভুত-দর্শন লোকটিকে দেখিয়া পাড়ার একপাল কুকুরের যে কী চীৎকার....লোকটি ঘুঙুর পায়ে নাচিতেছিল আর গান গাহিতেছিল...

লোকটিকে দেখিয়া নির্ম্মলের কেমন একটু কৌতূহল হয়—এবং এই কৌতূহলের আড়ালে ওর নূতন একটি গল্পের প্লটও যে একবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল—একথা অস্বীকার করিলে অন্যায় হয়। কাছে ডাকিয়া নির্ম্মল যে কয়টি মুহূর্ত্ত লোকটির সহিত গল্প করে...তাহাতেই ওকে চিনিতে পারে! লোকটির সহজ সুন্দর হাসির ভিতর যাহা ছিল তাহা তা'র হাসি নয়—বেদনা—; গানের সুরে যাহা ছিল তাহা আনন্দ নয় অন্তরেরই অভিব্যক্তি! লোকটি চলিয়া গেল—,নির্ম্মল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আর একবার লোকটির জীবনের অধ্যায় গুলির উপর চ'খ বুলাইয়া লইল। এবং যে ইতিহাস সে পাইল তা' যেমনই করুণ...তেম্‌নি মর্ম্মস্পর্শী।...গল্প সে লিখিল এবং নীলিমাকে শোনাইলও। তা'র পর একদিন ছাপিবার জন্য সেটি তরুণ দলের

এক মাসিক পত্রে পাঠাইয়া দিল···সে হইল আজ দুই মাসের কথা·· কিন্তু সম্পাদকের চিঠি আসিল কই ?

নীলিমার কথায় নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। এমন কত গল্পই ত' সে মাসিকে পাঠায়...কিন্তু কয়টিই বা ছাপা হয়···হয়ত বেশীর ভাগই ফেরত আসে না। হয়ত সম্পাদকের কার্য্যালয়েই তারা চির-নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করে। অথচ লিখিবার সময় সে তো তা'র আপ্রাণ যত্নেই লেখে। প্রত্যেক চরিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর অনুভূতি তা'র কী গভীর ; দৃষ্টিটি একটুও এদিক ওদিক হইবার যো নাই। গল্পটি যতক্ষণ না শেষ হয়—, ততক্ষণ সব কিছু সে ভুলিয়া থাকে।···অসমাপ্ত গল্পটি কেমন করিয়া সে শেষ করিবে—শেষ হইলে গল্পের চরিত্র গুলি কি রকম হইয়া ফুটিবে . ,ইহাই ওর স্বপ্ন ! ·· কিন্তু সে স্বপ্ন আজ সার্থক হইল কই ?

···নির্ম্মলের মনে হইল, এই ক'টি বৎসর তা'র ব্যর্থ কাটিয়াছে···,তা'র ছাপা গল্প গুলি আজ মাসিকে স্থান না পাইলেও বঙ্গসাহিত্যের কোন অঙ্গ হানি হইতনা !··· একটি দুর্জ্জয় অভিমানে নির্ম্মলের অন্তরটি শুধু বার বার করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।···কিন্তু নীলিমাকেও ত' একটা উত্তর দেওয়া চাই···তা'র নিজের মর্য্যাদাটিকে সে কি আজ ক্ষুণ্ণ করিবে·· না তাই ও পারে !

নির্ম্মল বলিল 'গল্পটা বোধ করি অফিসে পৌছুয়নি নীলিমা, নইলে একটা উত্তর কি আর নাই পেতাম···'

নীলিমা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—'পৌছুয়নি ? ··হারিয়ে গেল তা'হ'লে,···আহা অমন সুন্দর গল্পটা·

নীলিমার চ'খে ঘনায়িত বেদনা। নির্ম্মল তা' লক্ষ্য করিল,—এই নারীটিই হয়ত তা'র অন্তরের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছিল,—অনাগত দিবস-রাত্রির কাছে কি যে তা'র আকুতি···হয়ত নীলিমা বুঝিয়াছিল !

নীলিমা আর কোন কথা কহিলনা,—মমতাকে মেঝে হইতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নির্ম্মল আবার তন্ময় হইয়া লিখিতে বসিল ..

২

একটি বৎসর অতীত হইয়াছে—

তরুণদলের কয়েক খানি অখ্যাতনামা কাগজে নির্ম্মলের অনেক ক'টি লেখা ছাপা হইয়াছে—কিন্তু নাম হয়নাই ! সে যে গল্পগুলি পত্রিকা-অফিসে পাঠায়, তরুণ সম্পাদকেরা তাহা ছাপান বটে,—কিন্তু কোন উৎসাহ তাঁ'রা দেননা—গল্প পাঠাইবার জন্য একখানি অনুরোধ-পত্রও লেখেন না।...নির্ম্মলের এই বেদনাটিই বড় দুঃসহ হইয়া উঠিল,—তাহার এত যত্ন এত অধ্যাবসায় সবই কি তবে ব্যর্থ হইবে ?

সংসারের অবস্থাও তেমন সুবিধাজনক নয়। বাপের সঞ্চিত মুদ্রাগুলি সুদী কারবারে খাটিয়া সংসারটিকে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।···ছোট্ট সংসার তা'র উপর পল্লীগ্রাম, তাই রক্ষা ;—তা' না হইলে এতদিন নির্ম্মলকে নিশ্চয়ই একটি কেরাণী বনিতে হইত,··· অশ্রান্ত কলম পিষিয়া জীবিকার সংস্থান দেখিতে হইত···

জীবন-সংগ্রামের গতানুগতিক পথ হইতে দূরে সরিয়া নির্ম্মল বেদনার মধ্যেও অনেক খানি স্বস্তি পায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশ অর্জ্জনের চিন্তাটি দিন দিন ওর মনের ভিতর পুষ্ট হইতে পাকে। সংসার এখন নির্ম্মলের চ'খে নিতান্তই গৌণ।···নির্ম্মল ভাবে···এই বাঁধা-ধরা ছন্দহীন জীবনের পথে মানুষ কী শান্তিই বা পায় ? এখানে প্রতিদিনই ত মানুষ একটা ব্যর্থ সংগ্রাম করিয়া মরিতেছে . মানুষের এই এত বড় ভুলটি দেখিয়া নির্ম্মলের মনটা সচেতন হয়,··· ভাবে, ওদেরই দুঃখদৈন্য লেখার ভিতর দিয়া সে একদিন ফুটাইয়া তুলিবে,···ঠিক যেমনি করিয়া দেখিতেছে তেমনি করিয়াই সে আঁকিয়া তুলিবে...এবং তা'র সৃষ্ট চরিত্রগুলি চিরদিন ধরিয়া মানুষের অন্তরে যোগাইবে আনন্দ-রস,··· . নির্ম্মল একটু আশ্বস্ত হয়···

নীলিমা সেদিন কাছে আসিয়া বলিল—'···হ্যাঁগো... গল্প না লিখে বই লেখনা কেন ?···সংসারেরও কিছু সাশ্রয় হয়···'

নির্ম্মল মাসিকে একজন শক্তিশালী তরুণ লেখকের একটি গল্প পড়িতেছিল—নীলিমার কথায় মুখ তুলিয়া চাহিল ! কথার অর্থটা উপলব্ধি করিতে ওর দেরী হইলনা,...এই বুদ্ধিমতী নারীটি তাহার উপরে আজ বুঝি বিশ্বাস হারাইয়াছে,...তাহার আপ্রাণ চেষ্টা যে

একটি সুনিবিড় ব্যর্থতার মধ্যেই নিঃশেষ হইবে…এই টুকুই সে জানাইয়া দিতে চায়…,নইলে সংসারের দিকে সে ওকে আজ অবহিত হইতে বলিবে কেন?

নির্ম্মল একটু ব্যথিত হইল,—নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিল,—…'আমি যে লিখি…এটা তোমার ইচ্ছা নয়…না নীলিমা…!

নীলিমা অপ্রতিভ হইল—বলিল…'আমি বুঝি তাই বল্‌ছি…'

'…তবে যে বই লেখার কথা বল্‌লে…'

নীলিমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—'…ও…এম্‌নিই…'

নির্ম্মল আর প্রশ্ন করিলনা,—আপন মনে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ কি মনে হইতেই নির্ম্মল আবার নীলিমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

নীলিমা দাঁড়াইয়া আছে…কোলে ওর মমতা—নির্ম্মল একদৃষ্টে চাহিয়া…!

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—'…কি দেখ্‌ছ অমন ক'রে বলত…'

—'দেখ্‌ছি তোমাকে আর মমতাকে…নীলি ..'

—'কেন গল্প লিখ্‌তে চাও না কি…'

নির্ম্মলের বুক্‌টা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল…নীলিমা ত' ঠিকই ধরিয়াছে…

'.. হ্যাঁ—যদি লিখি নীলিমা…'

'…বেশ হয়…তা' হ'লে এবার তোমার নাম বেরিয়ে যাবে'…

নির্ম্মলের বুক খানা নাচিয়া উঠিল,—বলিল—' নাম আমার বেরোবে নীলি…?'

'…বেরোবে বৈ কি,…আগে লিখেই ত শেষ কর…'

নির্ম্মল নিঃশব্দে একটু কি চিন্তা করিল,—তা'রপর গভীর কণ্ঠে বলিল—'আচ্ছা· ·দিন কয়েক যেতে দাও—'

' কেন…,আবার দেরী কেন ?'

নির্ম্মল একটি করুণ দৃষ্টি মেলিয়া বলিল—'হাতের গল্পটা যে এখনও শেষ হয় নি নীলি·· '

'…ওঃ…'—মমতাকে লইয়া ধীরে ধীরে নীলিমা প্রস্থান করিল,—নির্ম্মলের আর গল্প পড়া হইলনা! মাসিকখানা বন্ধ করিয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল…, একটি ছোট্ট নীড়…তা'র হাসি কান্নার মাঝখানে দুইটি প্রাণী…ওরাই ওকে বিশ্বমানবের কাছে পরিচিত করিয়া দিল… যাহা সে খুঁজিতেছিল…তাহাই সে আজ পাইল…আর তা'র বেদনা কিসের…দুঃখ কিসের ..

নির্ম্মলের মুখ খানি আসন্ন আনন্দ গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৩

সন্ধ্যা হইতেই সেদিন অবিনাশ আসিয়া হাজির। অবিনাশ নির্ম্মলের বাল্যবন্ধু…রেঙ্গুনে চাকরী করে। বছর পাঁচেকের মধ্যে সে গ্রামে ফিরে নাই। লম্বা ছুটি লইয়া কাল বাড়ী আসিয়াছে।

অবিনাশ আসিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া একেবারে নির্ম্মলের ঘরে ঢুকিল…সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নির্ম্মল তখন গল্প লিখিতেছে…

'…এই যে ভায়া…আরে এখনও কলম পিষছ দেখ্‌ছি…আলো কই ?'

পরিচিত কণ্ঠস্বরে নির্ম্মল একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অবিনাশ অঠাৎ এম্‌নি সময়ে আসিয়া যে তাহার তাক্‌ লাগাইয়া দিবে,—ইহা সে ভাবিতে পারে নাই! লেখার ঘোরটা তখনও নির্ম্মলের কাটে নাই,—তবু অবিনাশের দিকে চাহিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে তা'র কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অবিনাশের মুখ দিয়া নিজের কথা গুলি তুব্‌ড়ির মত ফুল কাটিয়া পড়িতে লাগিল… দুদিন থাকিলেই আপনা হইতে শরীর বলিয়া ওঠে…তাহার শরীর কি ছিল আর কী হইয়াছে…বৌ নাকি প্রথমে চিনিতে পারে নাই—…ছাই তা'দের এই পাড়া…গাঁ…না আছে স্বাস্থ্য…না শ্রী…আসিয়া অবধি মন টিকিতেছেনা…ছুটির দিন গুলি কাটিয়া গেলে বাঁচে…ইত্যাদি…

অন্ধকার কক্ষে নীলিমা আসিয়া নিঃশব্দে কখন আলো রাখিয়া গিয়াছিল…

অবিনাশের দিকে চাহিয়া নির্ম্মলের সহসা বিস্ময়ের সীমা রহিলনা,—

…সেদিনকার সেই প্লীহা-যকৃৎসার বন্ধুটির স্বাস্থ্য-শ্রী আজ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে…এ যেন সে অবিনাশ নয়!

অবিনাশ মৃদু হাসিয়া বলিল—'···তোমার শরীরটা বড় বিশ্রী হ'য়ে গেছে নির্ম্মল,······তা'র পর এখানেই জেঁকে বস্‌লে বুঝি···চাক্‌রী-টাক্‌রীতে আর ঢুক্‌লে না···তা' বাড়ী থেকে যদি চলে ত মন্দ কি···' বলিতে বলিতে নির্ম্মলের লেখার খাতাটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া···লিখিতাংশের উপর মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টি রাখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—'...আরে এখনও লেখ দেখ্‌ছি···,বই টই ছাপিয়েছ নাকি···?

নির্ম্মল একটু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, 'না '

'···তবে মাসিকেই লেখ ?'

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িল--- অবিনাশ ফের জিজ্ঞাসা করিল, —'পয়সা কড়ি কিছু পাও—?'

'···না···'

অবিনাশ বলিয়া চলিল—'···ঐ তো—রক্ত জল করে' লিখে দাও···সম্পাদক প্রবররা লেখা কাগজে ছেপে পয়সা নেবেন, লেখকদের দিকে মুখ তুলেও চাইবেন না···,···তা' তোমার লেখা ত' কাগজেই উঠেছে,—আমি ত একদিন ঢের চেষ্টা ক'রেও পারিনি ভাই,—অথচ কত রদি লেখা কাগজে স্থান পাচ্ছে—লেখকের নামও হ'চ্ছে,—সাধে কি আর ছেড়েছি নির্ম্মল—' অবিনাশ থামিল।

নির্ম্মল অবিনাশের কথাগুলি নিজেব দুঃখ দিয়া উপলব্ধি করিল।—তোরাজের জোরে অনেক বিশ্রী লেখাও যে কাগজে স্থান পায়,—একথা মিথ্যা নয়—অথচ বুকের রক্ত জল করিয়া যে লিখিল···তাহার লেখাটী হয়ত পড়িয়া দেখিবারও প্রয়োজন হয় না,···নাম ত' দূরের কথা।··· সাহিত্য-জগতের এই দারুণ পক্ষপাতিত্ব নির্ম্মলকে আজ বড় বেশী করিয়া বেদনা দিল।

ইহার পর আরও কয়েকটী ভাঙা ভাঙা আলোচনা ·· অবিনাশ নির্ম্মলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

অবিনাশের প্রস্থানের পর নিখিল বসিয়া বসিয়া আজ কত কিই না ভাবিতে লাগিল।···একদিন এই অবিনাশেরই সহিত সে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিয়াছে,—তখন অবিনাশকে না হইলে ওর এক দণ্ডও চলিত না—আর আজ!—আজ সে অবিনাশের সহিত নিঃসঙ্কোচে মিশিতেই পারিল না,—যেন অলক্ষ্যে কবে তাহাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে।- অবিনাশ আজ সুদূর প্রবাসের যাত্রী, —একটি কর্ম্মমুখর আবেষ্টনের মধ্যে জীবনের দিনগুলি সে সহজভাবে কাটাইয়া দেয় এবং তাতেই পায় একটী অবিচ্ছিন্ন আনন্দ,—আর সে···সে অই আলোক-সম্পর্কহীন অন্ধকার একটী কক্ষের ভিতর বন্দীর মত দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন একটী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে,—কবে কে তাহাকে চিনিয়া বাহির করিবে,—কবে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিখিল দেশবাসীর ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিত হইবে,—এই তার একমাত্র স্বপ্ন,...মানুষের এর চেয়ে নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

—অবিনাশকে দেখিয়া অবধি নির্ম্মলের বুকের ভিতর কোথায় একটী কাঁটা খচ্ খচ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল,—যেন এই পৃথিবীটির বাহিরে গেলেও আজ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত—

হঠাৎ নীলিমা আসিয়া কক্ষে ঢুকিল;—জিজ্ঞাসা করিল '—উনি বুঝি চাকরী করেন--?'

'—হাঁ—'

'তোমার ক্লাস্-ফ্রেণ্ড - ?'

'—হুঁ—'

নীলিমা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না,—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল অলক্ষ্যে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের উপর দৃক্‌পাত করিল।—নীলিমার কথার ভঙ্গীতে, মুখের ভাবে নির্ম্মল ওর অন্তরের ভাবটী স্পষ্টভাবেই ধরিয়া ফেলিল,—বুঝিল তা'র এই কর্ম্মবিমুখ জীবনটির উপর নীলিমার কেমন যেন একটি অশ্রদ্ধা আসিয়া জন্মিয়াছে—

অন্যদিন হইলে নীলিমা লেখার কথা পাড়িত, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কতভাবে তা'কে উৎসাহ দিত—আজ কিন্তু এ সম্বন্ধে সে কোন কিছুই উত্থাপন করিল না,—দুজনে নিস্তব্ধ কক্ষে নিঃশব্দেই কি ভাবিতে লাগিল—

সংসারে কিছুদিন হইতে টানাটানি পড়িয়াছিল। সুদী কারবারের টাকাটা সুদে আসলে আদায় হওয়া দূরে

থাক্,—আসলেই আদায় হইতেছে না। নির্ম্মলের কোন খেয়াল নাই,—অন্তঃপুর হইতে নীলিমা আর কত দেখিবে?

স্বামীকে নীলিমা চেনে,—সংসার হইতে এই মানুষটী কত দূরে তাহা সে জানে,—তাই অভাবের কথাগুলি সে নির্ম্মলের কর্ণগোচর করে না।—নির্ম্মল জানে সংসারটি আজও সুশৃঙ্খল অবস্থায় বিদ্যমান,—এর অশ্রান্ত গতিপথে কোথাও বাধা নাই,—চিরদিন এটী একই ভাবে চলিতে থাকিবে।

তবু কিছুদিন পরে নীলিমার পরিবর্ত্তনটা নির্ম্মলের সহসা চ'খে পড়িয়া গেল, নীলিমা আর পূর্ব্বের মত তাহার কাছে আসে না—সারাদিন সংসার লইয়াই ব্যস্ত,—ডাকিলেও কোন সাড়া মেলে না। আগে নীলিমা যখন তখন তাহার কাছে আসিত,—তা'র কাব্য-ভরপূর অন্তরটী হাসির ছন্দে মুখ করিয়া তুলিত,—নির্ম্মল স্বপ্নময় চ'খে নীলিমার দিকে চাহিয়া থাকিত—চাহিয়া চাহিয়া আসন্ন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনগুলি সে কল্পনা করিত,—সাহিত্য-জগতে সে যশস্বী হইয়াছে,—পৃথিবীর মানুষ তাহার অন্তরের পরিচয় লাভ করিয়াছে,—শাশ্বতকাল ধরিয়া সে তাহাদের অন্তর-রাজ্যে বিরাজ করিবে—সে ধন্য, সে সার্থক—এমনি কত কি,—কিন্তু আজ—আজ সে সুমধুর কল্পনাগুলি ঠিক তেমনি ভাবে তা'র মনের ভিতর আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায় কই? নীলিমা যে একটীবার আসিয়াও আজ উৎসাহ দেয় না,—মুখ ফুটিয়া দুটী সান্ত্বনার কথাও শোনায় না,—তবে কিসের আশায় সে বাঁচিয়া আছে?

নিজের নিভৃত কক্ষে বসিয়া নির্ম্মল আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছে,—এমন সময় পিয়ন আসিয়া একটি 'বুক্-পোষ্ট' দিয়া গেল,—এই 'বুক্-পোষ্ট'টির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নির্ম্মলের বুকের রক্ত কেমন হিম হইয়া উঠিল,—তাহারই লিখিত 'নীড়' গল্পটি আজ 'আরতি' অফিস হইতে ফেরত আসিয়াছে,—এই গল্পেই সে তাহার হাসি-কান্না-ভরা নীড়ের ছবিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল,—যাদের সে আজ বহুদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে—দেখিয়া দেখিয়া একটি অভিনব সৃষ্টির প্রেরণা সে তা'র অন্তরের ভিতর পোষণ করিয়াছে—তা'রাই যে তা'র বুকের রক্তে রাঙা হইয়া লেখনীর মুখ দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নির্ম্মলের সমস্ত অন্তরটি মুহূর্ত্তে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল,—সেদিন সে ভাবিয়াছিল,—অই একটী মাত্র গল্প লিখিয়াই বঙ্গ-সাহিত্যে সে নাম কিনিবে,—কিন্তু তা' আজ যে স্বপ্নের মতই ব্যর্থ হইল।

'বুক্-প্যাকেট্'টি কম্পিত হস্তে তুলিয়া লইয়া সেটী খুলিতে যাইতেই নির্ম্মল দেখিল,—অলক্ষ্যে নীলিমা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

নীলিমাকে দেখিয়া নির্ম্মল একেবারে বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'—আজ সে গল্পটা ফেরত এল নীলিমা—'

নীলিমা এ কথার কোন উত্তর দিল না,—হয়ত শুনিলই না। সহসা গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল—'মমতার কাল রাত থেকে অসুখ,—জ্বরে ধুঁকছে—ডাক্তারের কাছে যেতে হবে যে—'

নির্ম্মল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল,—নীলিমার সহিত পাশের কক্ষে আসিয়া দেখিল,—ছিন্ন-মলিন একটী শয্যার উপর মমতা শুইয়া আছে—মুখখানি ওর শীর্ণ ও পাণ্ডুর—হাত দু'খানি ইহারই মধ্যে কাঠির মত সরু হইয়া উঠিয়াছে—ঠোঁটে সে হাসি নাই—চ'খে দীপ্তি নাই,—নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

'—কবে থেকে মমতা এমন হ'ল নীলিমা?'

নীলিমা রুক্ষ স্বরে জবাব দিল—'—সে খবর নিয়ে তোমার দরকার কি বলত?—বলি যাবে—না—'

নির্ম্মলের বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—নীলিমার শীর্ণ মুখখানি আজ ঠিক পাথরের মতই কঠিন—চক্ষু দুটী দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে—

নীলিমার এই রুক্ষ-মূর্ত্তিটীর দিকে নির্ম্মল মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া চাহিয়া রহিল,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটী কথাও সে আজ বলিতে পারিল না,—হয়ত বলিবার কিছু ছিল না বলিয়াই সে বলিতে পারিল না, হঠাৎ নিজেরই অজ্ঞাতে নির্ম্মল এক সময়ে পথের মাঝখানে বাহির হইয়া পড়িল। —ওর ক্লান্ত দুটী চ'খের উপর তখন এক ভিন্ন জগতের ছবি,—অশান্ত কর্ম্ম-স্রোতের খরধারায় মানুষের কাব্যগুলি সেখানে তৃণের মতই ভাসিয়া যাইতেছে—আর অসহায় মানুষ একটী উন্মুখ আগ্রহে ওদেরই দিকে চাহিয়া আছে—

পথ চলিতে চলিতে নির্ম্মলের চ'খে আজ অন্ধকার নামিয়া আসিল—

কিরণধনের স্মৃতি

শ্রীকালিদাস রায়

কবি কিরণধন হঠাৎ চলে গেলেন। ভারতী-মজলিসের সবই একে একে চলে যাচ্ছেন - সত্যেন গেছেন, দ্বিজেন গেছেন—মণিলাল গেছেন—কিরণ গেলেন। আমাদের এখন পোঁটলাপুঁটলি বাঁধবারই পালা—ত্দিন আগে পিছে—কে কবে যে সরে পড়ব—তার ঠিকঠিকানা নেই! হিসাবনিকাশ চুকাবার দরকার আমাদের দলের সকলেরই। কবি কুমুদরঞ্জনের সেই তাসের ঘরের উপমাটা মনে পড়ে আজ।

কিরণধনের জন্য প্রাণটা কেঁদে উঠছে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, কে কার জন্য কাঁদে? দুদিন আগে-পিছের কথা যে বললাম সেটা তত্ত্ববাদীর মতো বলিনি,—প্রাণ থেকেই বলেছি। পারের যাত্রী যে পারে গেছে, তার জন্য শোক করবে কেন? কবি দ্বিজেন্দ্র বাগচি মশায় মারা গেলেন—সে জন্য কবি রমণীমোহন কত দুঃখই করলেন। ক'দিন বাদে শুনলাম তিনিও চলে গেছেন। এইত ব্যাপার! দীর্ঘ পরমায়ু বাঙ্গালীর ভাগ্যে ভগবান লেখেন নাই। দুই একজন যাঁরা দীর্ঘায়ু হ'ন—তাঁরাই ব্যতিক্রম Exception proves the rule.

কিরণধন চন্দ্র ছিলেন না, সূর্য্য ছিলেন না—ধূমকেতু ছিলেন না, ছিলেন কিরণধন তারকা মাত্র। সেই তারাটি খসে পড়ল। একটি তারার অভাবেই আজ গোটা ছায়া-পথটি খাঁ খাঁ করছে। কিরণধনের কথাতেই বলি—

বৃথা এখন সে কল্পনা খানিক বেজেই
ভাঙলো বাঁশী,
এমন হবে হঠাৎ কে তা জানে;
এখন তুমি কোন ঠিকানায় বুঝতে নারি,
তাকিয়ে আছি
আকুল চোখে চেয়ে আকাশপানে।

আমরাও আজ আকাশপানে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

কিরণধনের পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত। উত্তরপাড়ায় তাঁর বাড়ী ছিল। তিনি বেশ ভালো করে লেখা পড়া শিখেছিলেন—ইংরাজী ও দর্শনে এম-এ ছিলেন। বি-এলও পাশ করেছিলেন।—কিন্তু ওকালতি তাঁর ধাতে সয়নি—কোন কবিরই ও বিদ্যেটি ধাতে সয়না। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ চেষ্টার ক্রটী করেন নি কিন্তু কিছুতেই তিনি ওকালতিকে ভালবাসতে পারেন নি। কাজেই কিরণধন করতেন প্রোফেসারি। হাওড়ার নরসিং কলেজে তিনি ছিলেন প্রোফেসার।

ভারতীর মণিলাল ছিলেন কিরণধনের মাসতুতো ভাই। সেই সুবাদে তাঁর ভারতী-চক্রে আসা যাওয়া।

কিরণধন বেশী বয়সে কবিতা লিখতে সুরু করেন। জীবনের মস্ত বড় একটা দশা-বিপর্য্যয়ে তাঁর কবিত্বের স্ফুরণ। এই দশা-বিপর্য্যয় তাঁর পত্নী-বিয়োগ। পত্নী-বিয়োগের দারুণ ব্যথায় কবির দেহ মন ভেঙে পড়ল। মনের মুহ্যমানতা কালক্রমে একটু কমে এলে, মনের শোকাবিলতা জীবনের বর্ষাশেষে কেটে গেলে—অশ্রু-সরসীর স্বচ্ছতা যখন ফিরে এল—তখন তাতে কবিতার কমল কুমুদ ফুটতে লাগল। বেশী দিন তা ফুটে নি—সংখ্যাও তার বেশি নয়।

শরীর যে সেই ভেঙে গেল—সে শরীর আর সারল না। কোন রকমে দেহটাকে কয়েক বচ্ছর টেনে হেঁচড়ে আনছিলেন। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রত্যাশা কোন দিনই করি নি—তবে এত সহসা যে চলে যাবেন তাও ভাবিনি।

আমাদের রস-চক্রে মাঝে মাঝে তিনি আসতেন। নীরব ধীর প্রকৃতির লোকটি রসচক্রের হট্টগোলে হতবুদ্ধি হয়ে বসে বসে পান খেতেন। আর ঘড়ির পানে ঘন ঘন তাকাতেন—উত্তরপাড়ার যাওয়ার ট্রেন বিশেষ হট্টগোলে ফস্‌কে না যায়। সংসারের সকল তরঙ্গের উপরই প্রসাদী করবী ফুলটির মত তিনি ভেসেই বেড়িয়েছেন—তিনি যে ভাসতে ভাসতে অনন্তেরই কাছাকাছি যাচ্ছিলেন তা' আমাদের ভেবে দেখবার অবসরই হয়নি।

রস-চক্রের সদস্যগণ তাঁর রচনার ভক্ত। কতদিন তাঁর কবিতাগুলি নিয়ে আমাদের চক্রের মজলিসে আলোচনা হয়ে গেছে।

কিরণধনের পুঁজি খুব বেশী নয়। একখানি কবিতার বই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন—সেখানিকে আমরা বুকে ক'রে রাখব। তারপর মহাকাল তাঁর চিরন্তন পদ্ধতিতে যা ভাল বোঝেন করবেন।

আজকার দিনে তাঁর কবিতাগুলোর কথা একটু আলোচনা করি। কবি কিরণধনের কবিতার বৈশিষ্ট্য বুঝাতে প্রবন্ধ লেখার দরকার হয় না। তাঁর কাব্যের বিষয়-বস্তুর বা ভাব-সম্পদের মূল্যবত্তা, বৈশিষ্ট্য, অপূর্ব্বতা বা বৈচিত্র্য এমন হয়তো নয়, যার জন্য প্রবন্ধ রচনা করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। কবিতার সংখ্যাও বেশি নয়—নানা শ্রেণীর কবিতা তিনি লেখেন নি। উপকরণটা তাঁর কাব্যে বড় নয়। রচনা-ভঙ্গির মাধুর্য্য, চাতুর্য্য, লালিত্য, সৌকুমার্য্য—ও অনায়াস স্বাভাবিকতাই তাঁর কাব্যকে আমাদের অন্তরের ধন করে তুলেছে। তাঁর কাব্যে কি আছে বুঝাতে হলে তাঁর কবিতা গুলো হতে কতক কতক অংশ উৎকলন করে দেখাতে হয়; তাতেও ঠিক হল না—কারণ গোটা কবিতা না তুলে—কবির প্রতি সুবিচার করা হবে না—কবিতাগুলি ত' mechanical structure নয়—organic growth, কাজেই তাঁর বইখানি পড়ে দেখতে হয়।

তবু আজকার দিনে তাঁর কবিতার মধ্য হতে কিছু কিছু উৎকলন করে শোনাই।

বক্তব্যের মূল্যবত্তার জন্য নয়—প্রাণের উত্তেজনা কেমন উদ্দীপক ভাষায় কবি ব্যক্ত করতে পারতেন—তারই উদাহরণ স্বরূপ তুলছি—

আজকে আমার নতুন খাতা
তোদেরও ভাই নিমন্ত্রণ বুকে আমার আসন পাতা,
তোরা চামার? তোরা চাঁড়াল?
জল খেতে নেই তোদের হাতে
এমনি তোরা অস্পৃশ্য
বলেন যে সব মহাপ্রভু, তাদের টোলের
নইক আমি শিষ্য।
সত্যকারের চামার চাঁড়াল তারাই যারা
এমন সোনার বিশ্ব
অত্যাচারে কালো করে, ভরিয়ে তোলে ক্রন্দনে
ছুঁইনা সে সব শুদ্ধাচারী পৈতেধারী দুর্জ্জনে,
তাদের বাতাস লাগাইনাক গায়
আয় তোরা আয় বুকের 'পরে আয়।

এই যে ছন্দের গতিপ্রবাহ—ইহা আপনার বেগে কত অনায়াসে চলিয়াছে, ছন্দোধারার এই অনায়াস অবাধ অবলিত গতিই কিরণধনের রচনার বৈশিষ্ট্য।

আবার—

অহংকারে মাটির 'পরে পড়ছে না পা তোদের কারো
নীল আকাশের বুক চিরে তাই তোরা
সভ্যতার ঐ উড়িয়ে নিশান উড়িস চোড়ে উড়ো জাহাজ
ঊর্দ্ধদৃষ্টি স্তব্ধ বসুন্ধরা,
এইবারেতে হয়তো কোনো নতুন কলম্বাসে
অসীম শূন্যে করবে আবিষ্কার
আকাশ-সাগর মথন করে নতুন কোন আমেরিকা
পরীরা সব বাসিন্দিয়া যার।
ধন্য তোরা ওরে মানুষ ধন্য তোদের কীর্ত্তি-কলাপ
সভ্যতার আর রাখলি নাকো বাকী
কিন্তু একি দেখছি চেয়ে এমন সবুজ সোনার বিশ্ব
আগাগোড়াই রক্তে মাখামাখি,
উন্নতি আর সভ্যতা কি একেই বলে ওরে মানুষ
যুগযুগান্তের পরিশ্রমের ফল
ষোলো আনাই ভেজাল মেকি
গোয়ালিনীর দুধের মত
সেরেফ খাঁটি সাদা রঙের জল।

খাঁটি বাংলায় বিনাক্লেশে প্রাণের কথার এই যে Rhythmic অভিব্যক্তি তাই কিরণধনের রচনা-ভঙ্গিকে চমৎকারিতা দিয়াছে।

মিল অনেক দূরে দূরে—কোন প্রকার অলঙ্কৃতি নেই—মনে হয় লেখা অতি সহজ। ভাষাও জলের মত স্বচ্ছ, তরল—শব্দের জন্য কবিকে বিন্দুমাত্র থামতে হয় না—যে ভাষায় কবি কথা কইতেন ঠিক সেই ভাষা। কেবল Rhythm দেওয়ার গুণে এবং প্রাণের রস-প্রেরণায় সাধারণ চলতি গদ্য কবিতা হ'য়ে উঠেছে।

এতো গেল চলতি ভাষার উপর Rhythm যোগ করে রচনার অনায়াস গতি। Rhythm ও Rhyme দুইয়ের সমান প্রাধান্য রেখে অনায়াস ও সরস লীলাভঙ্গির সৃষ্টি—

এই ভাব এই আড়ি,	চুমু নিয়ে কাড়াকাড়ি,
তাড়াতাড়ি বাড়াবাড়ি	সব জিনিসে
রাত দিন অবিরল	কৌতুক লীলা ছল
অভিমানে রসাতল	প্রতি নিমিষে।
বেমালুম বুক ঠুকে	মিছে কথা কয় রুখে
জবাবটি মুখে মুখে	গাঁথা তৈরী।
অবুঝ সে নিষ্ঠুর	নেই বোধ কিচ্ছুর
ঘুমের সে দস্তুর-	মতো বৈরী।
...	...
নন্দনবন থেকে	চুরি ক'রে আনলে কে
পারিজাত ফুল, এ'কে	রাখ্‌বো কোথা ?
এ হাওয়ায় বাঁচবে কি	আলো জেলে নাচবে কি ?
বুকে রেখে চেয়ে দেখি	লেগেছে ব্যথা।

অনায়াস লীলা-ভঙ্গি ও ললিত সৌকুমার্য্য অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করেছে 'আন্ধারের আধ ঘণ্টায়'। নববধূর সাথে প্রেমিকের লীলার এমন ছায়া-চিত্রাবলী কোথাও দেখি নাই—

বেলফুল চাইনা, জুঁইফুল দাও
ও গানটা গেয়োনা এই গান গাও।

* * *

সারাটা বেলা ধ'রে বাঁধলুম চুল
দেখলে না চেয়ে তা এমনিই ভুল ?

* * *

না বলে না ক'য়ে তুমি কেন চুমা খাও
বলিনাক যত কিছু আশ্‌কারা পাও।

* * *

আমি ম'রে গেলে তুমি খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহু-ডোরে কারে বাঁধবে ?
ওকি ওকি চোখ থেকে পড়ে কেন জল ?
ম'রে কেন যাব আমি মিছে করি ছল।
জুঁই বেল চামেলি যা খুসী তা দাও
ও গালেতে চুমা খেলে এ গালেতে খাও।

কিরণধনের নিজস্ব ভঙ্গিতে রচিত একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'দুনিয়াদারি।' এটি একাধারে চিত্র, নাট্য, গল্প ও কবিতা। এমন অকৃত্রিম, স্বচ্ছ, সরল, সাবলীল ছন্দোগতি এক 'পলাতকা' ছাড়া কুত্রাপি নাই। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র ভাষাতেও একটু পোষাকী ভাব আছে। কিরণধনের 'দুনিয়াদারি' আগাগোড়া আটপৌরে ভাষায় রচিত। সাধারণ গদ্যকে কলমের সোনার কাঠির স্পর্শে কি ক'রে চমৎকার পদ্যে পরিণত করা যায় তা কবি দেখিয়েছেন। কবিতার রস উপভোগ করতে হ'লে গোটাটা পড়তে হয়—কারণ এটার একটা মেরুদণ্ড আছে। আমি রচনা-ভঙ্গির চমৎকারিতার উদাহরণস্বরূপ কিয়দংশ উৎকলন করে দেখাই—

আরে বন্ধু এসো এসো অনেক দিনের পরে দেখা,
কেমন আছ খবর ত' হে ভালো ?
ওরে রামা কোথায় গেলি ? দে' না তামাক
সন্ধে হলো, নেইক খেয়াল জাল্‌না ঘরে আলো।
কিহে তুমি খাও না তামাক ? সাধু পুরুষ হলে
আবার কবে ?
চা খেতে ত আপত্তি নেই ? এক পেয়ালা
চা পান করোই তবে।
আজকে রাতে ছাড়্‌ছি না'ক এই খানেতেই
তোমার নিমন্ত্রণ,
কোন্ ঠিকানায় আছ বলো ? খপর দিতে
পাঠাচ্ছি একজন।
ছেলেমেয়ে ক'টি হলো ? কত বড় তারা ?
বল কি হে ? একটি ছেলে সেদিন গেছে মারা ?
বলছিলে, কি কথা আছে ? চলো চলো
বারাণ্ডাতে চলো,
দিব্যি সেথায় নিরিবিলি, বইছে হাওয়া,
কি বল্‌ছিলে বলো ?

তার পর টাকা ধার নেওয়ার প্রস্তাব—সে প্রস্তাব শুনে বন্ধুর বক্তৃতা কোন পথে গেল তা সহজেই অনুমেয়।

কবিতাটী সুদীর্ঘ—দীর্ঘপথে কোথাও শ্রান্তি হয় না—পথের দুপাশে নতুন নতুন অপূর্ব্বতার বিস্ময়—কেবল ভাষার ভঙ্গিতে। ছন্দের প্রবাহ তর্ তর্ ক'রে টেনে নিয়ে যায়। যে কবিতার শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে উপায় নেই—সে কবিতা সাধারণ কবিতা নয়। শতকরা নব্বইটা কবিতার তো

আট দশ লাইনের বেশী পড়াই শ্রম-সাধ্য। কিরণধনের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এমনই স্রোতের ভঙ্গিতে লেখা, যে খুব উঁচু দরের হোক বা না হোক, প্রত্যেক কবিতাই শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে' উপায় নেই। এ যেন ভাটার টানে চলতে হয়—উজানের বেগ ঠেলে ভাবের উঁচু অঞ্চলের দিকে আর যেতে হয় না।

যাদের রচনা-ভঙ্গি স্বচ্ছ সরল, যারা সোনার কাঠির স্পর্শে অতি সাধারণ গদ্যকে সরস পদ্যে পরিণত করতে পারে—তারাই কৌতুকরসের কবিতাও ভাল লিখতে পারে। কিরণধনের হাতে এ রসটা খুব ভালো জমত—শুধু জমত কেন?—কিরণধনের কবি-ধাতুর মধ্যেই কৌতুকরসটা ফল্গুর মত থেকেই গিয়েছিল—মাঝে মাঝে তা অন্য রসের সঙ্গে মিশেও যেত। কিরণধনের অবিমিশ্র কৌতুক-রচনার উদাহরণ—গিন্নী ও নামকাটা সেপাই। 'বাহবা বেড়ে' উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ কবিতা।

গিন্নীর চিত্রটী চমৎকার—

এই দেবী পক্ষে থাকবেনা রক্ষে
বউয়েরে না আন্‌লে ছেলে হবে খাপ্পা।
ভাবি যাই তীর্থে সংসার মিথ্যে
নোড়বো যে, নড়বার জো আছে কি এক পা।
ঠাকুরের রান্না কর্ত্তা যে খান্ না
বুড়ো হ'লে বায়নার থাকেনাক অন্ত।
জ্বলে যায় পিত্তি শুনে শুনে নিত্যি
রকমারি ফারমাস, তবু নেই দন্ত।
... ...
দেহ আর বয়না খাটুনিও সয়না
একটু হেঁটেছি যাই পাদুখানা ফুল্‌লো
দু দণ্ড বস্‌বো তারপিন ঘোষ্‌বো
অমনি যে বাড়ীময় হৈ চৈ উঠ্‌ল।
খুকি বড় কাশ্‌ছে স্যাক্‌রা না আস্‌ছে,
বালা ভেঙে করোগেট চুড়ি দেবো গড়তে।
উঃ একি বাত গো কাল সারা রাত গো
ঘুমুইনি, বাঁচি পেলে বিছানায় পড়তে।

বলা বাহুল্য, কিরণধনের রচনা-ভঙ্গিতে শিশু-কবিতা ভাল উৎরাবারই কথা। সত্যই কিরণধনের শিশু-কবিতাগুলি হ'ত অপূর্ব্ব। যাঁদের মৌচাক পড়ার অভ্যাস আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এ মধুর আস্বাদ পেয়েছেন। নতুন খাতাতে কয়েকটি ঐ শ্রেণীর কবিতা আছে। পারুল চাঁপাকে ছেলেদের কবিতা যেমন একদিকে বলা যায়, তেমনি রসিকদের জন্য সরস লিরিকও বলা যায়। এ কবিতাটি মোহিতলালের সেই কবিতাটির ধরণের যেটি বিস্মরণীতেও আছে, আবার সুনির্ম্মল যেটিকে ছোটদের চয়নিকাতেও ঠাঁই দিতে পেরেছেন। আমি 'শিউলির বিয়ের' কথা বলছি। 'ভাই বোনে' কবিতাটিকে খাঁটি শিশু-কবিতা বলতে পারা যায়। আর 'মায়ের বিপদ' কবিতাটির জুড়ি সারা শিশু-সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া কঠিন। এইটিকে আগাগোড়া না তুল্লে চলে না—

ফুটবলের ঐ মাঠের দিকে
যাচ্ছ যখন ট্রাইসিকেলে চ'ড়ে
ঝটকা হাওয়া এম্‌নি উড়ে এলো
উল্টে মাগো গেলাম আমি প'ড়ে।
খপ ক'রে না সাম্‌লে নিয়ে উঠে,
পালিয়ে যেমন আসতে যাব ছুটে
সাম্‌নে দেখি আস্‌ছে চেপে উটে
একটা কালো মস্ত বড় বুড়ো।
দেখেই ত সেই চওড়া সাদা ভুরু
বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো দুরু দুরু,
ঠোঁট দুটো পাঁউরুটির মতো পুরু
লম্বা দাড়ি যেন শোনের নুড়ো।
বল্লে,—"আরে ভয় পেওনা খোকা,
আমায় দেখে পালায় কিরে বোকা?
চিনিস না তাই লাগছে মনে ধোঁকা
আমি হচ্ছি ছেলেধরার মেসো।
যে সব মায়ে দুষ্টুপনা করে
নে যাই ধোরে ঝুড়ির ভিতর ভ'রে,
বন্ধ রাখি অন্ধকারের ঘরে
মিল্‌বেনাক খুঁজলে নানা দেশও।"
তাই বলি মা সারা দুপুর ধ'রে
যাস্‌নেকো ঘুম পাড়াতে মোরে
রোদ্দুরে তোর খোকা যদি ঘোরে
বকে ঝকে করিসনিক মানা।

দৈবে যদি টের পেয়ে সে বুড়ো
নে যায় তোরে ধ'রে চুলের চুড়ো
হামানদিস্তেয় হাড় করে দেয় গুঁড়ো
হাত ভেঙে দেয় চোখ করে দেয় কাণা।

আর একদিনে ঠিক দুপুরের বেলা
একলা ছাতে ওড়াচ্ছি মা ঘুড়ি,
বাড়ীখানা ঘুমিয়ে প'ড়ে আছে
যাচ্ছে হেঁকে বেলোয়ারি চুড়ি।
এমন সময় কালো মেঘের থেকে
নামলো কে এক চমকে গেলাম দেখে,
কোমরটা তার পড়ছে নীচে বেঁকে
যাচ্ছে দেখা দাঁতে কালো মিশি।
পরণে তার একটা ছেঁড়া কাঁথা,
ধুতরো ফুলের মতন সাদা মাথা,
গলাতে তার হাড়ের মালা গাঁথা
বল্লে "আমি জ'টে বুড়ির পিসি'।

একটা কথা বলছি কানে কানে
ভয় পেওনা কেউ যেন না জানে,
দুষ্টু মাদের ছোঁ মেরে এক টানে
নে যাই আমি উড়িয়ে কালো মেঘে।
সেথায় তাদের শুইয়ে কোলের পরে,
খাইয়ে দি দুধ ঝিনুক ভ'রে ভ'রে
কাজল দিয়ে চোখ দি কালো ক'রে
কাঁদলে পরে বকৃতে থাকি রেগে।"
তাই বলি মা অমন করে আর
দুধ খাওয়াতে চাস্ না বারেবার,
একলা যদি ঘাট ও পুকুর ধার
বকে ঝকে আসিস্নাকো তেড়ে।

দৈবে যদি টের পেয়ে সে বুড়ি
উড়িয়ে তোরে নে যায় মেরে তুড়ি।
চুরি ক'রে হাতের সোনার চুড়ি
জব্দ করে হাজার রকম ফেরে।

এইবার কিরণধনের অন্যান্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতার একটু পরিচয় দিই। 'দ্বীপান্তরে' কবিতাটি কবির একটি নামজাদা কবিতা। দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত বিপ্লবী যুবক যত নিষ্ঠুর নির্ম্মলই হোক্—তার বাঙ্গালী প্রাণটির খবর কবি রাখেন—

হায় কোথা সে মেঠো হাওয়া
বাংলা দেশের মিঠে জল ?
বেল চামেলি ফুলের ফসল
প্যায়রা আতা দালিম ফল ?
হায় কোথা সে গেল আমার
সাধের পোষা পায়রা গো,
বোল গুলি সে কোথায় এখন,
বুকজুড়ানো ভায়রা গো।
আর সে আমার খোকা বাবু
অভিমানী আব্দেরে,
বায়না যে তার মুহুর্মুহুঃ।
ভোলায় এখন কে তারে ?
আর কি এখন মা তার তেমন
আলতা পরে! চুল বাঁধে।
হায় অভাগী তোর তরে যে
আজো আমার প্রাণ কাঁদে।
নির্ব্বাসনের দণ্ড শিরে
তাঁহারি জয় গান গাহো।
ঘোরাও ঘানি পাকাও দড়ি
পাথর ভাঙ হেঁইয়া হো।
আয়রে খুনী। জড়িয়ে তোরে—
ইত্যাদি।

'উড়ো চিঠি'—একটি চমৎকার কবিতা। পল্লী-শোকটা এ কবিতার বড় কথা নয়, ঐ বেদনাটা কবির মনের রস-চক্রে উঠ্‌লে তার কি স্বরূপ হয় তারই নিদর্শন—

কে পাঠালো উড়ো চিঠি বসন্তের এই
বক্ষীন হাওয়ায় ?
ও ফুলেরা জানিস তোরা
কোনখানে সে কোন ঠিকানায় ?
গোলাপ বলে,—"তার ঠিকানা
আমার ভালো আছে জানা,

বকুল বলে "না-না না-না"
কাজ কি গোলাপ, পরের কথায় ?"
চাঁপা বলে,—"কথা আমি
কইবোনাক তোমার সনে।
মানুষগুলো এমনি খেলো
কিছু কি তার রয়না মনে!
আমিত কই যাইনি ভুলে
সেই কালো সেই রেশমী চুলে,
নরম নরম দুই আঙুলে
আমায় তুলে পর্‌তো খোঁপায়।"
... ...
সাঁজের তারা মৌন প্রাণে
রইল চেয়ে মুখের পানে,
চাঁদের আলোও রয় নীরবে
এলিয়ে পড়ে ঝিমিয়ে নেশায়।
ঝিঁঝির পাঁয়জর বাজিয়ে পায়ে
আঁচল বায়ে নিভিয়ে বাতি
কে এলোরে? কে এলোরে
নিঝুম রাতি নিঝুম রাতি
বল্লে,—"ক্ষ্যাপা এই আঁধারে
খুঁজে খুঁজে মরিস্ কারে?
সে যে নদীর অপর পারে
রয়েছে তোর আশায় আশায়।"

"বেশ্যা" কিরণধনের একটি চমৎকার সৃষ্টি—বড় করুণ কাহিনী।

"আব্দারের বেড়ি" একটি সুন্দর রচনা। প্রত্যাসন্ন বিরহের বেদনা পত্নী-হৃদয়ের অশ্রু-সিক্ত অসম্মতিকে অবলম্বন করে কেমন রসে পরিণত হয়েছে, তার নিদর্শন এই রচনাটি।

চেয়ে দেখ আকাশের চোখ ছল ছল,
মেঘ ডাকে গুরু গুরু এলো বুঝি জল।
কাল রাতে ভালো ক'রে হয়নিক ঘুম,
কাঁদ্‌বে যে খোকা তাকি আগে জানতুম।
শোবো তারে নিয়ে আজ আলাদা না হয়
দেখো দেখো হবে ঘুম, আজ নিশ্চয়।
আমি যেন পর তবু খোকাত আপন
দেখ লেখা চোখে ওর মৌন বারণ।
আয় খোকা তোরে নিয়ে দূরে স'রে যাই,
শুয়ে শুয়ে ছড়া গান গল্প শোনাই,
হোস্ নাক তুই ওর মত নিষ্ঠুর
বউমা যা বলে, দিস্ সায় মঞ্জুর।
ইত্যাদি—

'ভিখিরী' কবিতাটিতে ভিখারীর মনের নানা ভাবের মিশ্রিত বেদনাটি সরস রূপ ধরিয়াছে—

কতবার মনে ভাবিয়াছি, চুরি
করি কারো টাকা বুকে মেরে ছুরি
ধর্ম্মাধর্ম্ম নেইক কিছুরি
ভিত্তি,
নেই ঈশ্বর নেই পরকাল,
প্রহেলিকা এই দৃষ্টির জাল,
অন্ধ জড়াণু-রচিত বিশাল
পৃথ্বী।
ক্ষমিওনা প্রভু ক্ষমিওনা মোর
তোমা'পরে এই সন্দেহ ঘোর,
চুরি না করিয়া—মনে মনে চোর
পাপীকে,
দাওগো শাস্তি যত তুমি পারো,
মেরেছত প্রভু, আরো মারো, আরো
আমিই হারিকি তুমি প্রভু হারো
দেখি কে?

আবার দেনদারের মনের শঙ্কা-সংশয়ের মিশ্র দ্বন্দ্বটি কেমন রস-রূপ ধরেছে—

বাবার নিজের হাতের পোঁতা উঠানে
কৎ বেলগাছে
নতুন মালিক এসে যদি ভয় হয়
কোপ দেয় পাছে।
মার—লক্ষ্মী পুজোর ভোগ ঘরে
নিত্য ধোয়া গঙ্গাজলে ম্লেচ্ছয়ানি কেউ করে,
দেউলে' যে জন তার কেন মন হয়গো এমন
সাত পাঁচে।

মেয়েটা এই ভুগছে জ্বরে ভিজিট দেব
কোত্থেকে?
ডাক্তারে চায় নগদ নগদ বাজার খাতির
নেই দেখে।
ওসে—যায় যদি সে বাক্ মরে,
কাঠের পয়সা না জোটেত মাটি খুঁড়েই দিস্
গোরে।
ষাট্ ষাট্ ষাট্ বাছা আমার অদৃষ্টে তোর
এই লেখে?

'যদি সে' কবিতাটির কারুণ্য রস-মধুর,—প্রিয়াহারার স্বপ্নটি আন্তরিকতার অশ্রুতে ছলছল করছে। এই কথা-গুলোই ও সংসারের হতশ্রীতার কথা অন্যান্য পত্নীহারা কবি-রাও বলেছেন, কিন্তু বলবার ভঙ্গি ও রচনার অলক্ষিত চাতু-র্য্যের গুণে কিরণধনের কবিতাই রস-গৌরব লাভ করেছে।

যদি সে ফিরে এসে—
বসন অঞ্চলে মুছায় আঁখি জলে
ভুলায় কত ছলে আর
ছ'গাছি চুড়ি বাজে রিনিয়া মাঝে মাঝে
নরম দুটি হাতে তার।
"কেমন, আছ ভাল? হয়ে যে গেছ কালো
না দেখে এই কটা মাস
এই যে আমি এই তোমারি প্রিয় সেই
বঁধুগো নহে পরিহাস।
আথনা আথ চেয়ে বলে সে চুমা খেয়ে
অমৃত মিঠে নহে তত,
যদি সে বাহুডোরে বাঁধিয়া ফেলে মোরে
আদর করে শত শত
যদি সে এলোচুলে কাঁকণ বাহুমূলে
ছেলেকে কোলে তুলে, কয়—
"চাহিয়া দেখ দেখি বাছারা হয়েছে কি
স্নেহের এই পরিচয়?"
মুখরা সে আমার যদি সে একবার
আমার কাছে ফিরে আসে
কঠিন কয় কথা জুড়াতে মনোব্যথা
আবার ফিরে ভালবাসে।

পিপাসা মায়া কাঁদে খালি
মলিন চিতা-ধূমে কঠিন মরুভূমে
কেবলি বালি আর বালি।
পাখী না গাহে গান চাঁদের আলো ম্লান
কুসুমে পরিমল নাই।
... ...
উড়িছে ছাই শুধু ছাই।

মোহিতলালের মৃতপ্রিয়া কবিতাটির কথা মনে পড়ে। তার চমৎকারিত্ব একদিকে, এর চমৎকারিত্ব অন্যদিকে।

ঘুমপাড়ানি গান—একটি চমৎকার রচনা—

সে মোর প্রিয়া নাহিক আজ
নাহিক সেই গান
কাঁদছে দুটি আকুল শিশু
কাঁদছে দুটি প্রাণ।
আর কে তাদের ঘুম পাড়াবে
ভুলিয়ে ভালবেসে?
ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে।
ঘুমোয় ছেলে জুড়োয় পাড়া
জুড়োয়নাক বুক—
পড়ছে মনে একশোবারি
হারিয়ে-যাওয়া মুখ।
আঁধার হেরি চারিদিকেই
খুঁজে না পাই দিশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

বুলবুলিতে যখন সমস্ত সোনার ধান খেয়ে যায়—তখন খাজনা দেওয়ার জন্য চোখের জল ছাড়া আর কিছু বাকী থাকে না। কিরণধনের অশ্রুকণাগুলি মুক্তায় পরিণত হয়েছে, এটাই কেবল সান্ত্বনা। কবির 'ডাকাতের গানে' রুসিয়ার বাণী গর্জ্জন করছে।

খালিপেটে যবে কেটেছিল রাত,
ছেলে-মেয়ে নিয়ে এক মুঠো ভাত,
কেউ দিয়েছিল? পেতেছিনু হাত
লাঠি তলোয়ার ছেড়ে।

আমাদের মিছে দাও অপবাদ
এ চির-স্বর্ণ-লৌহ-বিবাদ
ছাপাছাপি নদী ভাঙবেই বাঁধ
যাও যত তাকে তেড়ে।

'প্রতীক্ষায়' কবিতাটীর চিত্রমালা বেশ হৃদয়গ্রাহী খোকার ব্যথাটী খোকার হৃদয় দিয়ে ব্যথা অনুভব করেই লেখা। 'ব্যথার স্মৃতি' কবিতাটীর কয়েক পংক্তি তুলে কাব্য-পরিচয় শেষ করি—

জীবনের মত বসন্ত গত,
কাঙ্গালের মত সরিয়া,
পড়ে পথপাশে মিছে থাকি আশে
চোখে জল আসে ভরিয়া।
চুড়িওলা হাঁকে, জানালার ফাঁকে
কত জনা ডাকে, 'এ বাড়ী।'
আধ ঘোমটায় মুখ দেখা যায়,
মন চমকায় ফি-বারই।
চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা
চলে যায় সরাসর ঐ।
উদ্বেগ মাখা পথ-চেয়ে-থাকা
বুকে-করে-রাখা চিঠি কৈ?
মরণের পর নেই ডাকঘর
নইলে খবর নিত সে।
এটি ওটি সেটি লিখে চার পিঠই
একখানা চিঠি দিত সে।
একি জাল বোনা, হায় কল্পনা।
মনে আল্পনা আঁকা গো,
মরি কত ছলে স্মৃতি-শতদলে
ধুয়ে আঁখি জলে রাখা গো।

কিরণধনের রচনা-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য উৎকলিত অংশগুলি হ'তে নিশ্চয়ই বোঝা গেল। রসসৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি গোটা কবিতা হ'তে রসের পরিচয় পেতে হবে। উৎকলিত অংশ হ'তে কতকটা আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে। আর ঐ রচনা-ভঙ্গির লালিত্য, তারল্য ও সাবলীলতাও রসেরই পরিপোষক।

আর দুটি কথা বলে নিবন্ধটিকে শেষ করতে চাই।

খাঁটী বাংলা ভাষায় খাঁটী বাঙ্গালী জীবনের অনুভূতি ও খাঁটী বাঙ্গালী সংসারের ভাবমাধুর্য্যকে এমন অলঙ্কৃত, সরল, তরল, স্বচ্ছ ভঙ্গিতে খুব অল্প কবিই অভিব্যক্ত করেছেন। অকৃত্রিমতা ও গভীর আন্তরিকতা কিরণধনের রচনার প্রধান উপজীব্য। দেশব্যাপী কৃত্রিমতায় ভরা জটিল অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক কবিতা পড়ে পড়ে বিরক্তি লাগলে পাঠক যেন কিরণধনের নতুন খাতা পড়েন—একটু স্বস্তি পাবেন—প্রাণটা জুড়োবে। বাঙ্গালার আর দুইজন কবি এই ভাবেই অন্তরের অনুভূতির অভিব্যক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু রচনার বহিরঙ্গের দিকটায় তাঁরা ততটা মনোযোগ দেন নাই। ফলে, কলা-সৌষ্ঠবের দিক হ'তে তাঁদের লেখায় খুঁত থেকে গেছে। কিরণধনও চেষ্টা করে কলা-সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করেছেন তা নয়—কিরণধনের চিন্তা ও অনুভূতিরই অঙ্গীভূত কলাসৌষ্ঠব-বোধটি। এটা স্বভাবতই তাঁর জন্মে গেছে, কি art of concealing artটা তিনি অনেক অভ্যাসের ফলে আয়ত্ত করেছেন—তা রচনা পড়ে বুঝবার উপায় নেই। কিরণধন কার শিষ্য তা ধরবার জো নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এ যুগে কেউ এড়াতে পারে নি—কিরণধনও পারে নি। কিন্তু কিরণধন রবীন্দ্রনাথের শিষ্য ন'ন। কিরণধনের অনুভূতি ও চিন্তার ধারা ও প্রকাশ ভঙ্গি সকলের হ'তে পৃথক। নানা কবির নানা জিনিষ যোগ করলে হয়ত কিরণধনের রসদৃষ্টি ও রসসৃষ্টির পদ্ধতিটিকে পাওয়া যেতে পারে।

এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে, কিরণধনের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার বা প্রাচীন ভারতের কোন সম্বন্ধ নেই। কিরণধন নবযুগের কবি—আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনটিকেই কবি তাঁর কাব্যে সরস ক'রে ফুটিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক উপকরণটির জন্য তাঁর কাব্য-কক্ষের দুয়ার জানালা খোলা ছিল। কিরণধন রচনার যে ভঙ্গি অনুসরণ করে গেলেন—এই ভঙ্গিই পরবর্ত্তী কবিরা কিছুকাল অনুসরণ করবেন ব'লে আমার ধারণা। তাদের হাতে এ ভঙ্গির যথেষ্ট উন্নতি হয়ত হবে, কিন্তু কিরণধনের নামটি বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হ'য়ে থেকে যাবে।

যাকে বলে great poem কিরণধন তা লেখে নি—তাঁর কাব্যের উপাদানে কোন বড় তত্ত্ব, তথ্য, রহস্য বা সমস্যা নেই—ভাবের গভীরতার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল না। এককথায় তাঁর লেখায় intellectual sentiment একেবারেই নেই। Intellectual sentimentকে একেবারে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র æsthetic sentimentএর সাহায্যে কেমন ক'রে এ যুগেও রস সৃষ্টি করা যায় তা কিরণধন দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় রসেরই প্রাধান্য। আজকালকার পাঠক ভাবকে বা ব্যঙ্গার্থকেই কাব্যের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য ব'লে মনে করে না—রস যে কাব্যের প্রাণ তা পাঠক বুঝতে শিখেছে—তাই ভরসা হয়, কিরণধনের কাব্য আদৃত হবে এবং টিকেও যাবে।

কিরণধনের ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে ইংরাজী, পার্শী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী - সকল জাতির শব্দেরই সমান অধিকার। কিরণধন অনুসরণ করেছেন passage of least resistance. ফলে ভাবপ্রকাশের পক্ষে যে শব্দ যখনি স্বাভাবিক ভাবে যুগিয়েছে, নির্বিচারে তিনি তাই গ্রহণ করেছেন—ভাববার বা নির্ব্বাচন করবার ক্লেশ তাঁকে স্বীকার করতে হয়নি। এমনি তাঁর রচনাগুলি যে তাতে কোনটাই অশোভন বা অসমঞ্জস হয় নি। আর একটা কথা—অনেক কবিরই পত্নী-বিয়োগ হবার দুর্ভাগ্য ঘটেছে—পত্নী-শোকে তাঁরা কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু সে সব কবিতা শান্ত সংযত প্রৌঢ় জীবনের অভিব্যক্তি। তরুণ কবি তার প্রিয়াকে হারালে তার যৌবনের কি দুর্দ্দশা হয়—তার নিঃসঙ্গ যৌবন কি বেদনা অনুভব করে—সেটির সঠিক খবর পাওয়া যায় কিরণধনের কবিতায়। যে শোক কবির জীবনই হরণ ক'রে ক্ষান্ত হলো, সে শোক আর শান্ত সংযত সহনশীল প্রৌঢ় কবির শোক এক নহে। প্রৌঢ় কবির শোক কবিতার অন্তরালে সান্ত্বনা উঁকি দেয়। কিরণধনের কবিতায় হাহাকারের সুর সেই একজনকেই কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে। চক্রবাকীকে বধ করলে চক্রবাক যেমন ক'রে আর্ত্তনাদ করে—এ যেন তেমনি আর্ত্তনাদ। সেই আর্ত্তনাদকে কবি রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন—এইখানেই কবির কৃতিত্ব।

কবি তাঁর বেদনার গান গাইবার জন্য নতুন ভাষার আশ্রয় নেন নি। যে ভাষাতে তিনি দাম্পত্য-জীবনের লীলাবিলাসের গান গেয়েছিলেন—সে ভাষা তিনি ভুলতে পারেন নি—কণ্ঠে তাঁর সে ভাষা থেকেই গিয়েছিল—সেই ভাষাতেই তিনি আর্ত্তনাদ করেছেন—যে ছন্দে তিনি প্রিয়াকে সোহাগ করেছিলেন—সেই ছন্দেই তিনি প্রিয়ার বিয়োগ-ব্যথারই অভিব্যক্তি দিয়ে গেছেন।

কবিকে উদ্দেশ ক'রে আজ বলি—ভাই, তুমি কবিতায় সত্যানুভূতি ছাড়া আর কিছুকে প্রশ্রয় দাও নাই—তোমার কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। তা যদি হয় তবে তুমি কি জীবন যাপন করছিলে তা আমরা বুঝেছি। তাই তোমার বিয়োগে আজ আমরা অশ্রুপাত করবো কি না ভাবছি। ওগো কবিচক্রবাক, এতো তোমার সন্ধ্যা নয়—এ তোমার জীবনের প্রভাত। চক্রবাকী সারা রাত্রি তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। তার সুখের সাহারা আজ মিলনের গুলেস্তান হোক।

কবির জীবদ্দশায় যে গানটি রচনা ক'রে তার নতুন খাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম সেই গানটি তুলে আপাততঃ বিদায় নি—

তোমার ভাই—নতুন খাতা নতুন পাতা	
	কল্পতরুর ডালে ডালে।
আলোতে—	নাচছে কিবা, কোন উদাসী
	বেণুর তানের তালে তালে।
বেদনার—	তরুণ কচি অরুণ বোঁটায়,
তব প্রেম—	করুণ শুচি শিউলি ফোটায়।
শিশিরে—	ধৌত যে প্রেম স্নিগ্ধ যে প্রেম
	যুগে যুগে কালে কালে।
মোদের—	এ রবির জগৎ, জাগছে হেথায়
	কতই গ্রহ উপগ্রহ,
তারাটী—	তারার পানে চায় যে তবু,
	চায় বুকে তায় অহরহ।
শরতের—	চাঁদ জাগে, তার জ্যোৎস্না মাখি,
রবিরে—	ভক্তিভরে মাথায় রাখি
তারকা—	কিরণ তোমার জুড়ায় আঁখি,
	গভীর প্রাণের দরদ লহ।

হৃদয়-মাল্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ফিরে চাও বালা, আমার এ মালা
ভাল করে' তুমি পরখ কর,
ক্ষণ-মিলনের এ শুভ লগনে
অন্তর-দীপ তুলিয়া ধর !
ভাল করে' দেখ সে দীপ-আলোকে
এ ফুল কখনও পড়েছে কি চোখে,
বাসনার নব দলগুলি তা'র
রঙীন হয়েছে নবীনতর !

কত আশা করে' গেঁথেছি এ মালা
জীবনের সাধ পরাব গলে,
পরশে তাহার কাঁপিয়া উঠিলে
কি ব্যথা জাগিল মরম তলে ?
নয়ন-মোহন ভোরের স্বপন
অন্তরপুরে ছিল কি গোপন,
আজিগে সহসা ভুলে-যাওয়া গান
মনে পড়ে' গেল নয়ন-জলে !

এমন জ্যোৎস্না !—কাছে সরে' এস.
বাহু-বন্ধনে জড়ায়ে রাখি'—
জীবন-মরণ রাঙাইয়া দিবে
করপল্লবে রঙীন রাখী— ।
বুকে মাথা রাখ. চোখ তুলে চাও.
চুমায় চুমায় ভুবন ভুলাও,
মিলন-সন্ধ্যা মন্থর হোক্
তব অলকের গন্ধ মাখি' ।

তনু দেহ তব কেন শিহরায়
তপ্ত বুকের পরশ লেগে.
পরশ-বিধুর বিগত দিনের
মলিন মাধুরী উঠে কি জেগে ?
তোমার দীর্ঘনিশ্বাস বায়
মালার এ ফুল যদি বা শুকায়,
তব মালঞ্চে কবি-মালাকর
ফুল দল লবে আবার মেগে ।

আমার এ মালা দিইনি কাহারে
গাঁথা মালা মোর গিয়েছে ঝরি'-
পথে পথে তোমা খুঁজিতে আবার
তুলেছি পুষ্পপাত্র ভরি' ;
কত চেনা মুখে পড়িয়াছে আলো,
হয়ত কাহারে লাগিয়াছে ভালো,
কেহ হাসিয়াছে নিকটে আসিয়া
কেহ বা দাঁড়াল দু'বাহু ধরি' !

এ মালা তাইত লুকায়ে রাখিনু
বুকের আড়ালে জানেনি কেহ,
পুষ্প-পরাগে করে' প্রসাধন
জানে না তাহারা ফুলের স্নেহ ।
আমারে চাহিল, চাহিল না মালা,
জানে না তাহারা ফুলের কি জ্বালা.
তাইত তোমারে খুঁজি বারে বারে
পথে পাব বলে' ছেড়েছি গেহ

আপনা বিলাতে যদি দেখা দিলে
শেফালি বনের পুষ্পরাণী,
আজি কোজাগরী, হে প্রেম-নাগরী,
সরমে দিও না ঘোমটা টানি
ব্যথা জান বলে' তোমারে জানাই
মম জীবনের কত বেদনাই,
তোমারে জানাই ধূলি-বিমলিন
বিফল মালার মরম-গ্লানি

মুখ পানে চেয়ে যদি কথা কও
দেখিবে সেথায় আরতি করে'
এ দুটি তৃষিত নয়ন-প্রদীপ
কম্পিত শত শঙ্কা ভরে' ;
চির-রহস্যে ঢাকা আলো ছায়া
তারই মাঝে তুমি লভিয়াছ কায়া,
দিনু শরতের অশ্রুধারায়
হৃদয়-মালা তোমারি করে !

খেলাঘর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

৪

এই পৃথিবী যেন বিধাতার খেলাঘর। রক্ত-মাংসের মানুষ লইয়া নিরন্তর কি নিষ্ঠুর খেলাই না চলিতেছে! ছোট ছেলে কাচের পুতুলকে আদর করিতে করিতে নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই যেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে,—বুকে এতটুকুও ব্যথা বাজে না,—তেমনি করিয়া মানুষকে লইয়া অহরহই তাঁহার খেলা চলিতেছে। কিন্তু কেন?

নবী নওয়াজের চোখের জল তখনও অঝোরে ঝরিতেছিল। একটা চাপা-কান্না অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাহার বুকের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়া ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় বিলীন হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের মন তখন এই ঘর, এই পৃথিবী, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ছাড়াইয়া বহুদূরে উড়িয়া চলিতেছিল:

এই বিপুল পৃথ্বী,—এমনি কোটি কোটি গ্রহ কল্পনাতীত বিশাল একটা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছে—ওই মঙ্গল,—ওই বৃহস্পতি—ওই শনিগ্রহ পলকের মধ্যে চোখের সুমুখ দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল,—এক-একটা সূর্য্য আগুণের পিণ্ডের মতো ছুটিয়া চলিয়াছে—এমনি কোটি কোটি সূর্য্য,—সংখ্যা নাই, শেষ নাই, কেবলি ছুটিতেছে—তারপরে?—স্থান নাই, কাল নাই, আলো নাই, অন্ধকার নাই,—

বিশ্বেশ্বরের চোখের সুমুখ হইতে সমস্ত দৃশ্য একেবারে অবলুপ্ত হইয়া গেল,—এত বড় বিরাট জগতের মধ্যে একটি মানুষকে সে কল্পনাতেই আনিতে পারিল না। অত বড় গ্রহ হইতে একটি কীটাণুসৃষ্টি পর্য্যন্ত সমস্তই সেই বিধাতার খেলা। কিন্তু এই খেলা কেন? অত বড় গ্রহ সৃষ্টি করিবারই বা অর্থ কি, অত ক্ষুদ্র কীটাণু সৃষ্টি করিবারই বা সার্থকতা কি?

বিশ্বেশ্বর ভাবিতেছিল,—এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে মানুষ তাহার খেলাঘর পাতিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সে গড়িয়া তুলিয়াছে,—"আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার গ্রাম, আমার দেশ"। এবং তাই লইয়া মারামারি কাটাকাটির শেষ নাই। যাহার নিজের পরমায়ু অতি স্বল্প, দু'চোখে যাহা পড়ে তারই উপর তাহার অধিকার-বোধ অপরিসীম; বিধাতার চোখের উপর সে আজ দ্বিতীয় বিধাতা সাজিয়া বসিয়াছে। একটি মানুষ অপর মানুষের জন্য নীতি পড়ে, বিধান দেয়, শাসন করে, শাস্তি ও শৃঙ্খলার বেড়াজাল রচে। অদৃশ্যে বসিয়া হয় তো বিধাতা এই ভঙ্গুর প্রাণীর দম্ভ দেখিয়া হাসেন!

ঘরের ও কোণে তখন দুটি কয়েদীর মধ্যে নিগূঢ় ফিস্‌ফাস্ চলিতেছিল। মহিম স্পেশাল ওয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দীদের "ফালতু";—সকালে উঠিয়া গিয়া তাঁহাদের চা-তৈরী করা হইতে বাসন-মাজা পর্য্যন্ত সকল রকমে পরিচর্য্যা করে। লোকটি নারীহরণ ঘটিত কি-একটা অপরাধে মোটা রকম সশ্রম কারাদণ্ড ভুগিতেছে। "ফালতু গিরি" তাহার কারাদণ্ডের সশ্রম অংশ। তাহার অবস্থা অন্য কয়েদীদের চেয়ে অনেকটা ভালো। রাজবন্দীদের চোখে-চোখে একটু যত্নেই থাকে,—অর্থাৎ রাজবন্দীদের দেওয়া তেলটা- সাবানটা গায়ে মাখিতে পায়, এবং জেলে সব চেয়ে যা দুষ্প্রাপ্য সেই বিড়ির তাহার অভাব নাই।

এমন অবস্থাতেও মহিম একটা দুষ্কার্য্য করিয়া বসিয়াছে। বেঙ্কো-গাঁটকাটার সহিত সেই পরামর্শই চলিতেছিল। রাজবন্দীর সোনার বোতামটি সে চুরি করিত না, চুরি করা তাহার অভ্যাসও নাই। কয়দিন হইতেই কখনও টেবিলের উপর, কখনও বালিশের নীচে, কখনও বা বইগুলির ফাঁকে বোতাম-সেটটি দেখিয়া আসিতেছে,—কোনো দিন লোভ হয় নাই। তাহার দুর্ম্মতি, একদিন রাজবন্দীদের অসাবধানতা-প্রসঙ্গে এবং নিজের সততা প্রমাণের জন্য এই কথা বেঙ্কো-গাঁটকাটার নিকট উল্লেখ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে বেঙ্কোর ক্রমাগত প্ররোচনায় শেষ পর্য্যন্ত সে আর লোভ সামলাইতে পারিল না।

বেষ্ট পাকা লোক। সতেরো বৎসর বয়স হইতে জেল খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। দুই মাসও বাহিরে বসিয়া থাকে না, আবার জেলে ফিরিয়া আসে। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, জেলেই তার রোজগার হয় বেশী। মেয়াদও তাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—আর মাস চারেক বাকী। সুতরাং উপার্জ্জন সম্বন্ধে তৎপরতা আরও বাড়িয়াছে। বিশেষ কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার বালক পুত্র আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছে, কয়দিন হইতে তাহার জননী ও ভগিনীর সন্ধান মিলিতেছে না। বেচারী নিরাশ্রয়ের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ঘটনায় যে দুই জনের উপর তাহার সন্দেহ হয়, তাহাদের নামও সে বলিয়া গিয়াছে।

ছেলেটি আফ্‌শোষ করিয়া বলিয়াছে,—কি বল্‌বো বাবা, আমি ছেলে মানুষ, গায়ের জোরে ওদের সঙ্গে পারবো না। কিন্তু অন্ধকারে বাগ্‌মত যাকে পাবো, তাকে আর—

পিতা সোৎসাহে ছেলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিল,—আর চার মাস রে ব্যাটা, চার মাস সবুর কর্। তারপর বাপ-ব্যাটায় এক সঙ্গে জেল খাটবো—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ছেলে পরমোল্লাসে হাসিয়াছিল। জেলে যখনই সে দেখা করিতে আসিয়াছে, বাপের কাছ হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সমস্ত সংসারের তিন মাস রাজার হালে চলিয়া যায়। জেলের মধ্যে তাহার পিতার তেজারতী কারবার আছে তাহাও সে শুনিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারে জেলের উপর তাহার একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

বেষ্টোর নিজের চরিত্র সম্বন্ধে কোনো উচ্চ ধারণা নাই। তাহার জীবনে সে নিজের স্ত্রীকে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়া অনেক বার অপরের স্ত্রী ও কন্যা লইয়া উধাও হইয়াছে। কতদিন স্ত্রীর চোখের সুমুখেই নিজের শয়নকক্ষে পরস্ত্রী লইয়া তাণ্ডবলীলা করিয়াছে। যে পল্লীতে সে থাকে, সেখানে কোনো পুরুষ এবং কোনো স্ত্রীলোকই চরিত্র লইয়া অহঙ্কার করে না। নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে বিশেষ শ্রদ্ধাবান নহে। কতদিন অকস্মাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই সে দেখিয়াছে, উঠানের এক কোণে বেড়া দিয়া ঘেরা রান্নাঘরখানির মধ্যে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া তাহার স্ত্রী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, এবং বেড়ার ওধারের লোকটি তাহাকে দেখিয়াই চট্ করিয়া সরিয়া গেল। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সে অনেক সময় এ সব দেখিয়াও দেখে নাই।

কতদিন তাহার স্ত্রী সকল অপরাধ প্রকাশ্যভাবে এবং সগর্ব্বে স্বীকার করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহিয়াছে। তথাপি সে নিষ্কৃতি দেয় নাই। হয়তো ভালোবাসার জন্য নয়,—সে বুঝিয়াছে, পরস্ত্রী লইয়া দুই-দশ দিন স্ফূর্ত্তি করা চলে, কিন্তু সময়ে-অসময়ে দু'মুঠা ভাতে-ভাত ফুটাইয়া দিবার জন্য একজন স্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজন। হয়তো, নীড় বাঁধিবার মোহ তাহারও মনের গভীরে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। কে জানে! কে জানে, হয়তো তাহার বাঁধা নাড়ে ঘা পড়াতেই আজ তাহার সমস্ত অন্তর প্রতিহিংসাগ্রহণে এমনি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে!

তখনও তাহার ছেলে আসিয়া নিদারুণ সংবাদ দিয়া যায় নাই। প্রত্যহ রাত্রে মনে-মনে আপনার সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়াছে;—জেল হইতে বাহির হইয়া কোন্ প্রেয়সীর জন্য কি চাই, তাহাও প্রত্যহ একবার নূতন করিয়া হিসাব করা চাই। রঙ্গিণীর বয়স হইয়াছে, তবু তাহার ডুরে সাড়ী পরিবার লোভ যায় নাই; তাহার জন্য ভালো দেখিয়া একখানা ডুরে সাড়ী কিনিতে হইবে। পেভাতের কাঁচা বয়স, সহজে কাছে ঘেঁসিতে চায় না, ছল করিয়া কেবল চোখে-চোখে দূরে-দূরে ফেরে; তাহার জন্য কি দিলে ঠিক শোভন হয়, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, তখন তার নিজের স্ত্রীর কথা মনেই পাড়ত না। এখন মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। শীঘ্রই ছাড়াইয়া আনিবে বলিয়া দিনের অন্ন-সংস্থানের জন্য ধরা পড়িবার ঠিক আগের দিন সেই যে স্ত্রীর রূপার পৈঁছাটি বারো আনায় বাঁধা দিয়াছিল, তাহা আর ছাড়াইয়া আনিবার সময় হয় নাই। সে কি রামসুখ লোহারের কাছে আজও আছে? সুদে-আসলে সে হয়তো বিক্রয়ই হইয়া গিয়াছে।

আপন মনেই রাগিয়া বলে,—চুলোয় যাক্। তাকে কি আর ঘরে নোব? তাকে কুটি-কুটি ক'রে কাটলে তবে রাগ যায়।

মাঝে-মাঝে তার বিস্ময়ও লাগে। যে লোকটির সঙ্গে তার স্ত্রী পলায়ন করিয়াছে, সে যেমন কদাকার, তেমনি

কয়লার মতো কালো ; বড় বড় ভাঁটার মতো লাল চোখ, অত্যন্ত পুরু ঠোঁট, চোখ বসিয়া গিয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙ্গা। কোনো স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় এমন লোকের শয্যাংশ কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না ;

বেষ্টো আপন মনেই হাসে ; স্ত্রীর উদ্দেশে বলে,—এমন পিবিত্তিও তোর মনে-মনে ছিল !

মহিম তখন সোল্লাসে বর্ণনা করিতেছিল, কিভাবে সেই সোনার বোতাম-সেট্‌টা সে সরাইয়া ফেলে এবং বেষ্টোকে এমন ভরসাও বার-বার দিল যে, বাহির হইয়া গিয়া সে সুদক্ষভাবেই বেষ্টোর সাকরেদী করিতে পারিবে।

বেষ্টো কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবিতেছিল। মহিমের মতো সাকরেদ পাওয়ায় সে যে উল্লসিত হইয়াছে এমন ভাবও দেখা গেল না।

সে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, বেশ ফর্সা মেয়ে একটা হতকুচ্ছিৎ লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে ?

তার মনে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হইতেছিল, ছেলে যে কথা বলিয়া গিয়াছে তাহা হয়তো সত্য নয়। তার স্ত্রীর না হয় বয়স ত্রিশের কাছে, কিন্তু কন্যা তো ষোড়শী এবং তাহাকে সুন্দরীই বলা যায়। সে কেন অপর একটি কুৎসিত লোকের সঙ্গে চলিয়া যাইবে ?

কিন্তু সোনার বোতাম বাবদ নগদ কিছু হাতে আসিবার সম্ভাবনায় মহিমের মেজাজ দিল-দরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। সে অবলীলাক্রমে বলিল—

—আলবাৎ। শুনবি তাহ'লে ?—আমাদের পাড়ায় মতি ড্রাইভার থাকতো, কোন্ ডাক্তারের বাড়ীতে মটর চালাতো। একদিন হঠাৎ এক মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত ! তার রূপ দেখে তো অবাক্ ! মেম সাহেবের মতো রং,—যেন ফেটে পড়ছে। বছর আটাশ-উনত্রিশের বেশী বয়স নয়। একেবারে পরী, মাইরি। সে ভাই, তার চলন, বলন, কথার ধরণ—

মহিম আর বলিতে পারিল না। বেষ্টোকেই বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

বেষ্টো হাসিয়া হাতখানি সরাইয়া দিয়া বলিল, তারপর ?

—তারপরে একদিন সকালে পুলিস এসে বাড়ী ঘেরাও —আর মতি-ড্রাইভারের হাতে ইয়া হাতকড়ি। সেই ডাক্তারের বৌকে সে ফুস্‌লে এনেছে। আমরা বললাম,—হুঁ, হুঁ, বাবা ! কিন্তু কোথায় কি ?—

মহিম ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুই বললে বিশ্বাস করবি নে মাইরি,—কিন্তু মেয়েটা কোথায় ঘরের মধ্যে কি করছিল, একেবারে হুড়্‌মুড়্ ক'রে পুলিসের মধ্যেখানে এসে এমন ইংরিজি বলতে লাগলো যে দারোগা একেবারে থ'—

চটাং করিয়া একটা তালি মারিয়া বলিল,—একেবারে থ'—। সুড্ সুড্ ক'রে মতিকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

বেষ্টো চিৎ হইয়া শুইয়া গভীর মনোযোগের সহিত সমস্ত ঘটনা শুনিতেছিল। বলিল,—আর মতি ?

মহিম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে পাশের একজন কয়েদীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল,—দুঃ শালা !

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া মহিম বলিল,—মতির তখন কাপড়ে-চোপড়ে—। ছাড়া পেয়েও তার কান্না থামে না। তখন ভাই,—তখন ভাই—(মহিম ছ্যাঁচড়াইয়া গিরিশের কাছে সরিয়া আসিল)—মেয়েটা তার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সে যে কি আদর করতে লাগলো, তা আর কি বলবো। মেয়েটি কত সাহস দিলে, কিন্তু মতি-ড্রাইভার কি মানে ? সে যত কাঁপে, তত কাঁদে।

এইখানে মহিম থামিল। আপন মনেই বলিল,—আর আমি শালা এক শ্যাওড়াতলার পেত্নীকে নিয়ে ছ'বচ্ছর ছিঁ ঘরে ! বাঁচানো চুলোয় যাক্, ছুঁড়ী দিলে ঠেলে জেলে ! একবার বেরুই তো—বলিয়া সেই শ্যাওড়াতলার পেত্নীকে এইখানে বসিয়াই শাসাইয়া রাখিল।

বেষ্টো বলিল,—মতি বেঁচে গেল ?

মহিম ঠোঁট উল্টাইয়া জিহ্বা ও তালুসংযোগে এক প্রকার শব্দ করিয়া বলিল,—ওঃ ! বাঁচা অমনি সোজা কিনা ? তিনটি হাজার টাকা খেসারৎ গুণে নিয়ে তবে ডাক্তার ছাড়লে।

—মতির কি অনেক টাকা ?

মহিম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নড়াইয়া বলিল,—মতির অষ্টরম্ভা! টাকা দিলে মেয়েটা। কড়কড়ে নোট ফেলে দিয়ে মতির হাত ধরে টেনে নিয়ে মটরে বসালে। কাছারী ভেঙ্গে লোক জুটলো তাকে দেখতে। সে গেরাহ্যিও করলে না। ভঁক্ ভঁক্ ক'রে মটর দিলে ছেড়ে।

—হুঁ—বলিয়া বেষ্টো-গাঁটকাটা আপন মনেই কত কি ভাবিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল,—সে মেয়েটা আছে এখনও?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মহিম বলিল,—কে জানে ভাই, আছে না গেছে। ওসব থাকবার মেয়ে তো নয়। তবে আমি যখন আসি তখন তো ছিলো।

বেষ্টো বলিল,—হুঁ!

বহুদিন আগে যখন সে জেলের বাহিরে ছিল, তখন টকটকে লাল-পাড় একখানি সাদা সাড়ী-পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছিল। আজও তাহাকে সে ভোলে নাই। সেই মেয়েটিকে এই মেয়েটির আসনে কল্পনা করিয়া সে শুধু ভাবিতেছিল,—অত বড় ডাক্তারের প্রাসাদে যাহার মন ভরিল না, সেই বরাঙ্গনা মতি-ড্রাইভারের কুঁড়ে ঘরের ছোট অঙ্গনে হাঁপাইয়া ওঠে না?

একটু পরে মহিম বলিল,—কিন্তু এদানি মেয়েটাকে ড্রাইভার বড় দুঃখু দিতো।

দুঃখ দেওয়ার কথায় বেষ্টো অজ্ঞাতসারেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মহিমের দিকে পাশ ফিরিয়া বলিল,—কি রকম? কি রকম?

—টাকা-পয়সাও ছিলো না আর। প্রায়ই খিটমিট হোতো। মাঝে-মাঝে মেয়েটাকে মার-ধোরও করতো।

বেষ্টো বিরক্ত হইয়া কহিল,—মাগী চলে যায় না কেন?

এ প্রশ্নের মহিম জবাব দিতে পারিল না। সুন্দরী, শিক্ষিতা, ধনী-গৃহিণী, পুত্র-কন্যা এবং রূপবান, বিত্তবান, গুণবান স্বামী ছাড়িয়া কেন যে একটা অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত-রুচি ড্রাইভারের ঘর করিতে আসে এবং সহস্র নির্য্যাতন কেনই বা মুখ বুঁজিয়া সহ্য করে এ প্রশ্নের জবাব বোধ হয় যে বিধাতা মানব-মনকে বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু মানব-মনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মহিমের কোনো কৌতুহল ছিল না। প্রভাতের বেশী দেরী নাই। ইহারই মধ্যে বোতাম-সেট্‌টি সামলাইতে হইবে এবং সে কাজে বেষ্টো-গাঁটকাটার সাহায্য নহিলে চলিবে না।

সে বেষ্টোকে একটা খোঁচা দিয়া বলিল—বোতামটা নে?

বেষ্টো বিরক্তভাবে বলিল—দে।

মহিম একগাল হাসিয়া বলিল,—মাইরি আর কি? টাকা দে? পাঁচ টাকার কমে হবে না কিন্তু। আমার পাঁচ, তোমার পাঁচ, আর-

অন্যদিন হইলে খানিকটা দর কষাকষি না করিয়া বেষ্টো ছাড়িত না। কিন্তু আজ আর দর কষিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে কোথা হইতে পাঁচ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া বিরক্তভাবে বলিল,—এই নে।

নোটখানি লইয়া মহিম তাহার হাতে বোতামটি গুঁজিয়া দিল। বেষ্টো চক্ষের পলকে কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

এ কোণে নবী নওয়াজ ও বিশ্বেশ্বরের চোখে তখনও ঘুম আসে নাই। কি একটা অসহ্য জ্বালায় দুজনেই উস্‌খুস্ করিতেছিল।

শেষ প্রহরে প্রহরী বাহিরের বারান্দা দিয়া খট্‌খট্ করিয়া টহল দিতেছিল। ভোরের তখন বেশী দেরী নাই।

নবী নওয়াজ আস্তে আস্তে ডাকিল,—মাষ্টের!

বিশ্বেশ্বর সাড়া দিল না, শুধু চোখ মেলিয়া চাহিল।

নবী নওয়াজ ভারী গলায় বলিল,—আচ্ছা, আমার ভাই যে মারা গেল, তার জন্যে আমার চেয়ে কি হাকিমের শোক হয়েছে বেশী?

বিশ্বেশ্বরের উত্তর দিবার কিছু ছিল না। সে নবী-নওয়াজের মুখের পানে নীরবে চাহিয়া রহিল।

নবী নওয়াজ আর একটা কি বলিবার চেষ্টা করিল। পারিল না, শুধু দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

নারী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ যুগান্ত ধরি'
চেয়ে আছি আমি তব মুখপানে,
হৃদয় উঠিল ভরি'
মদিরার মত দেহ-সৌরভ পানে
অজানা কৌতূহল
নয়নের দিঠি করিল বিচঞ্চল ;
পোহাইনু বিভাবরী
তোমার গোপন অন্তর-সন্ধানে !

করুণায় উন্মুখ
ওই আঁখি দু'টি বারি-বিদ্যুৎ-ভরা।
উল্লাসে কাঁপে বুক—
এত দিনে বুঝি একান্তে দিবে ধরা !
ওগো রহস্যময়ী
দেখাও এবার অন্তরতমা কই ?
চঞ্চল উৎসুক
দেখিব বলিয়া ছুটিয়া আসিনু ত্বরা।

দূর হ'তে মনে হয়
তোমার ও রাঙা অধরের সাথে
কত মোর পরিচয় !
রভসরঙ্গে রজনী করেছি ভোর !
টুটিয়া বেণীর বন্ধ
আসে মোর পাশে তব কুন্তলগন্ধ,—
করে যেন অনুনয়
চির-পরিচিত ওই দু'টি বাহু-ডোর ;

বুকে বুকে বেঁধে লই,
অধরে অধর খুঁজে পরিচিত বাণী ;
নয়নে চাহিয়া রই,
নয়ন-মুকুরে ধরিব মরমখানি।
যৌবন-ভরা দেহে
সন্ধান করি সুগহন গেহে গেহে ;—
কিছু নাই দেহ বই !—
কাঁদিছে মরম মরমের সন্ধানী।

মর্ম্মে পশিতে নারি
দেহ-দুর্গের দ্বার খুঁজে নাহি পাই।
হায় নিষ্ঠুর নারী,
ব্যথা ছাড়া তব দিবার কি কিছু নাই ?
কিছুই দিবে না যদি
ইঙ্গিতে তবে ডাক কেন নিরবধি !
ঝরে শুধু আঁখিবারি
তবু চির দিন তব স্তুতি-গান গাই

চেনা-অচেনা

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

১

যাক্ সব চুকে গেছে। আমার কল্পনা-প্রবণ মস্তিষ্কে সে কথাটা যেন স্বপ্নের মত একবার জেগেছিল। পরস্পরের কাছে আমাদের বিদায় নেওয়া হ'য়ে গেছে অথচ তোমায় আমার মনের কোন কথা জানাই নি। কতবার বলি বলি করে' বলা হয় নি। প্রতি সন্ধ্যায় তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে নিজেকে শত রকমে দোষী করেছি; সারা রাত ধরে' ভেবেছি আবার কখনও দেখা হবে, তখন কেমন করে' সব কথা তোমায় গুছিয়ে ব'লব। কিন্তু রাতের আসা যাওয়ার ত একটা শেষ আছে। তোমার সঙ্গে আমার মিলনের শেষ সন্ধ্যাও দিগন্তে মিলিয়েছে। অথচ, তোমায় কিছুই বলিনি। কাল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবো, তোমার সঙ্গে প্রথম মিলনের দিন যেমন অচেনা ছিলুম অপরিচয়ের সেই সমস্ত ব্যবধান আবার আমাদের মাঝখানে জেগে উঠবে।

আমার মনে হয় তুমি হয়ত আমার মনের কথা সব বুঝেছ। তুমি না জানলে কি আর তোমায় এমন করে ভালবাসতে পারি! কিন্তু, তোমায় যে আমি নিজ মুখে কিছু বলিনি, তাই ভেবে আমি খুব খুসী হয়ে উঠছি। কোন্ অধিকারে তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করি বলত'— নিজের জীবনের উপর যার কোন হাত নেই—মাসের শেষে বাঁচব কিনা তাই জানি না! এসব জেনে শুনেও কোন মেয়েকে ভালবাসা জানাতে যাওয়া আমার কাছে পৌরুষের কলঙ্ক বলে' মনে হয়।

কথাটাকে নিজের কাছে বেশ স্পষ্ট করে নিতে চাই, যাতে সেটা কাঁটার মত সময় অসময়ে মনের পাতে না বাজে, কাজের বিঘ্ন না ঘটায়। ধর, তোমায় আমার প্রেমের কথা জানাতুম আর তুমি যদি আমার ভালবাসাকে বরণ করে' নিতে—তার ফল কি হ'ত? সে ত কেবল দুঃখ। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুজনে একত্র হ'তে পারতুম না, আর এই সুদীর্ঘ সময় তোমার কাছে কত নিঃসঙ্গ মনে হ'ত! তুমি কেবলই ভাবতে, কেমন করে' আমি ভাল থাকব, নিরাপদে বাঁচব। অথচ সে ভাবনাই সার। যদি আহত হ'তুম, তুমি আমায় মৃত মনে করে' নিজের জীবনকে সর্ব্ব-গৌরব-বঞ্চিত মনে ক'রতে। আমি আহত হ'লে তুমি ত' আর আমার কাছে থাকতে পেতে না। তোমার ত' নিজের একটা কর্ম্মক্ষেত্রে আছে, প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য আছে। সুদূর মার্কিণ থেকে এসে তোমরা যে অসহায় ফরাসী শিশুদের সেবার ভার নিয়েছ। তারপর ধর আমি হয়ত বিকলাঙ্গ হ'তে পারি,—ফরাসীর পক্ষে যুদ্ধের আঘাত-চিহ্ন তার প্রসাধন, আত্মোৎসর্গরূপ নব-ধর্ম্মের সে যে বিগ্রহ! আমাদের কাছে কিন্তু তা একেবারে বীভৎস। বিকলাঙ্গ লোককে সারা জীবনের সঙ্গী করে' নেবার দুঃখ দেবার মত হীনতা আমার নেই। আর, সত্যি কথা ব'লতে কি দিনের পর দিন তুমি আমায় দেখে অন্তরে অন্তরে বেদনা পাবে, তা আমি কোন চোখে দেখব? আর, শেষ কথা, যুদ্ধে আমি ম'রতেও পারি—কিছু তো ঠিক নেই। যদি তোমায় বিয়ে করতুম, তা হ'লে সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে' তোমার জীবন কেবল ব্যর্থতায় ভরিয়ে তুলতুম। আমার ভালবাসার কথা যে আমি কিছু বলিনি, তাই ভেবে আজ আমি সত্যিই সুখী।

আবার দেখ, যদি বা মুখ ফুটে বলতুম, তুমি হয়ত আমার উপর বিরক্ত হ'তে, রাগ ক'রতে, আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রতে। অবশ্য তাতে যে তুমি অন্যায় ক'রতে তা বলি না, কারণ আমি তারই উপযুক্ত। আমায় প্রত্যাখ্যান করাটাই ঠিক হ'ত, কারণ যুদ্ধের সময় এই রকমের বাগ্‌দান, এই সব ত্বরিত বিবাহ—আমার কাছে ভারি বিসদৃশ লাগে। এগুলোকে আমি একটুও বিশ্বাস করিতে পারি না। তবু—মুখে আমি যতই বলি, অন্তরের গহনে কে যেন কেঁদে উঠে। যৌবনের প্রথম জাগরণের সমস্ত চাঞ্চল্যকে একটা 'না' দিয়ে নিরস্ত করি কেমন করে'? না—এ সব নিয়ে আর ভাবব না—মন যে আমার ক্রমে বিরস হ'য়ে উঠে।

এখনও কিন্তু তোমায় বলবার সময় আছে। শুধু টেলিফোনটা উঠিয়ে নিয়ে তোমায় ডাকা। আচ্ছা, যদি বলি? তুমি তা হ'লে কি জবাব দেবে? বিবাহ-প্রস্তাবের এ এক অদ্ভুত উপায় বটে। রাত দুটোয় জেগে উঠে প্রেতের মত একটা ক্ষীণ গলার আওয়াজ শুনছি—'আপনি অমুক—? আজ সারা সন্ধ্যা যে আপনার সঙ্গে ছিল, আমি সেই লোক —শুধু আজ সন্ধ্যায় কেন, প্যারিসে ছুটীতে এসে যত সন্ধ্যা যাপন করেছি, আমি সেই। আপনাকে যে ঘুম থেকে জাগিয়েছি, সে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ব'লে'—আপনি কি আমায় বিয়ে ক'রতে পারেন?'—

এ জীবনে যা কিছু হ'তে পারত তা আর ভাবব না। স্মৃতি শুধু আমার কাছে প্রিয় হ'য়ে থাক্। মাটীর নীচে স্যাঁতা ট্রেঞ্চে বসে' শীতে যখন মনটা নিরানন্দ হবে, তখন সাধনা ক'রব এই সুখ-স্মৃতির স্বর্গে ফিরে যেতে। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের পরাব গল্প রচনা করে' নিজেকে শোনাব—তোমার সঙ্গে দেখা ক'রবার কথা দিয়ে কেমন করে' ঘটনাচক্রে সে কথা রেখেছি, সেই গল্প।

মাসকয়েক পূর্ব্বের—সেই রাত্রের কথা কি তোমার মনে পড়ে? যুদ্ধে আহত হ'য়ে ব্রিটিশ মিশনে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তার কিছু দিন আগে আমেরিকা আমাদের দলভুক্ত হ'য়েছে। ট্রেঞ্চের মধ্যে মানবাত্মার অপূর্ব্ব গৌরবের ব্যাখ্যান ছিল আমার কাজ। বক্তৃতার শেষে হলটা যখন খালি হ'য়ে এসেছে, কে একজন তোমায় নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করে' দিলে। শুনলুম যুদ্ধের অত্যাচারে যে সব শিশু নিঃসহায় হ'য়েছে তাদের সেবার ভার নিয়ে একদল মেয়ের সঙ্গে তুমি ফ্রান্সে যাত্রা ক'রছ। তোমার চোখের পানে চাইলুম। কি দেখলুম? সে রহস্যময় দৃষ্টি আমি কোন কালেও ভুলতে পারব না। আমার সামনে তুমি দাঁড়িয়েছিলে, দীর্ঘ, ঋজু একটী তন্বী, গোলাপের সরু ডালের উপর ছোট একটী কুঁড়ির মত, পাপড়িগুলি তখনও ভাল করে' খোলে নি। যুদ্ধে যে সব গ্রাম ও নগর নষ্ট হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাদের কথা আমি বেশ জানি; এই ধ্বংসের কাজে আমিও অনেক সাহায্য করেছি। কামানের গোলার আঘাতে মাটী ফেটে যে সব গর্ত্ত হয়েছে, তার মধ্যে এখনও কত শত শব প'চছে। সেই বিকট বীভৎসতার মধ্যে তোমাকে আমি দাঁড় করাতে পারলুম না। সে শ্মশান-চিত্রে তোমার সুকোমল লাবণ্যের কোন স্থান যে হ'তে পারে এ কথা ভাবতে আমার ব্যথা লাগল।

তখন আমি তোমায় কি বলেছিলুম, মনে নেই—ফরাসী-দেব ধুলোঘাঁটা ছেলেদের অপরিচ্ছন্নতার কথা বোধ হয়। নিতান্ত বাজে কথা, একেবারে অবান্তর কোন কিছু নিশ্চয়ই। তারপর পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম। সে রাত্রি জেগে কাটিয়েছি, নানা ভাবনায়। পরদিন তোমায় শুভ-যাত্রা জ্ঞাপন করে' টেলিফোন করলুম, সে শুধু তোমার মধুর কণ্ঠস্বর শোনবার লোভে। তুমি তখন জাহাজে চ'ড়েছ। প্রতিজ্ঞা করলুম ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে যেমন ক'রেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব। কেমন করে' যে তা সম্ভব সে কথা সেদিন ভাবি নি। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম এবং সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন ক'রেছি।

এই কি অদৃষ্ট! ছুটী পাবার কথা নয়, অথচ জল-কাদার পাতাল-পুরী থেকে প্যারিসের পরী-রাজ্যে মুক্তি পেলুম। পথে মনে হ'য়েছিল এবার হয়ত তোমায় দেখতে পাব। প্যারিসে মাত্র একটী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়ে শুনলুম, তুমি তার সঙ্গেই আছ। এ কি শুধু অকস্মাতের ঘটনা! আমার কিন্তু মনে হয় এর মধ্যে আরও কিছু আছে।

প্রথম দিন তোমার দেখা পেলুম না। পরদিন তুমি নিজে এসে আমায় ডাকলে। আমার জন্যে পথ ব'য়ে আসার ক্লেশ তুমি স্বীকার করেছ, এ ঘটনা আমার কাছে শুভ লক্ষণ ব'লেই মনে হ'ল। খুব স্পষ্ট না হ'লেও এটা বুঝলুম, তোমার আমার সেই হঠাৎ পরিচয় একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আমাদের চারিদিকে যেন একটা রহস্যের জাল বোনা চলছে, আমার সম্বন্ধে তাই যেন তোমার এত কৌতূহল। এ হয়ত আমার আত্মগর্ব্ব, কিন্তু শুধুই কি তাই? অবশ্য আত্মগর্ব্বের দোষ কি বল? সৈনিকের জীবন ত' জানো। জীবনের এই স্বল্পতাকে এমনি করে' মূল্যবান না করে' কি কেউ পারে?

তোমার সঙ্গে যে দিন দেখা হ'ল, সে দিন রবিবার। খুব সাহস ক'রে তোমায় নিমন্ত্রণ করলুম আর তুমি নিঃসঙ্কোচে তা গ্রহণ করে' আমায় অবাক করে' দিলে।

মনে হ'চ্ছে, দুপুরে তোমায় ডাকতে যাবার পথে আমার প্রতি মনোভাব, আমার প্রতি পদক্ষেপ যেন মনে গাঁথা আছে। কোমর-বন্ধ আর জামার বোতাম ঘসে মেজে পরিষ্কার ক'রতে আমার যে কত সময় গেল, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। পুরুষেরা এই রকম। তুমি বোধ হয় খুব হাসছ। কিন্তু নিজেকে রমণীয় করে তোলার জন্যে তুমিও বোধ করি এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছ। যদি নাও কাটিয়ে থাক, তবু এই কথাটা ভাবতে আমার ভাল লাগে।

মনের মধ্যে কি আন্দোলনই চ'লছিল। সরলভাবে সব কথা ব'লব কি? অন্তরে আমার সব গোলমাল হ'য়ে গিয়েছিল। আশা, বাসনা, সন্দেহ, আর তোমার কাছে পাছে অদ্ভুত কিছু বলে' পরিচিত হই, এই ভয়—এই ক'টা এক সঙ্গে মনের মধ্যে যাতায়াত সুরু ক'রে দিলে। তোমার জন্যে আমার বড় মন কেমন ক'রছিল। আমার দেহ-মন ভরে' উঠেছিল তোমার কাছে পাবার দুরন্ত বাসনায়। আশা হ'চ্ছিল, তোমারও মনে হয়ত' বাসা বেঁধেছে এই ধরণের বাসনা। সন্দেহটা কেন, জান? মনের মন্দিরে তোমার যে মূর্ত্তি গড়ে' তুলেছি, তোমায় দেখে পাছে তার দুর্লভত্ব নষ্ট হ'য়ে যায়, পাছে তা সাধারণ হ'য়ে পড়ে। আমার স্পর্দ্ধা কত দেখেছ? অবিশ্বাস ক'রবার আর জায়গা পাই নে। আমি নাকি আশঙ্কা করেছিলুম, তুমি হয়ত সাধারণ মেয়ের মত, যে কোন দশ জনের মত, যাদের সঙ্গে প্রত্যহ পথ চ'লতে দেখা হয়। আর তোমার কাছে পাছে অদ্ভুত কিছু ঠেকি এই চিন্তা বিভীষিকার মত আমায় পেয়ে বসেছিল।

কি জানি মেয়েদের এই ভাব হয় কি না! দেখেছ, ভালবাসায় পড়লে পুরুষকে কি ভয়ানক অসুবিধা পোয়াতে হয়। তার প্রেমের প্রতিদান পাবে কিনা সে বিষয়ে সে আদৌ নিশ্চিত নয়। আর আমার ত' এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার কোন অধিকার নেই। মুখের আলাপ ছাড়া তোমার কাছে আমি একজন অপরিচিত বই আর কি।

তোমার হোটেলে গেলুম। দারোয়ানকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে, একটু সন্দিগ্ধ ভাবে তাকিয়ে কড়া সুরে সে জানালে যে আমার আসার খবর তোমায় এখনি জানাবে। ফিরে এসে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন সে বল্লে, তুমি এখনি নামছ। অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম। কতক্ষণ—খুব সম্ভব পাঁচ মিনিট, কিন্তু সে যেন দীর্ঘ এক শতাব্দী। একটা করে' সেকেণ্ড টিক করে' চলে' যায় আর নিজের ব্যবহারে নিজের উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠি। কত সামান্য পরিচয়ে তোমার উপর জুলুম ক'রছি, এতে তুমি আমায় কি ভাববে তাই ভেবে সারা হ'চ্ছি।

সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। মৃদু খসখস শব্দ। তারপর দেখি তোমার সুকোমল হাতখানি আমার দিকে প্রসারিত করে' সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—বালিকার মত সহজ, বন্ধুর মত হৃদ্য। তোমার হাতখানি হাতে নিলুম—এক অপূর্ব্ব পুলক আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে দিলে। মনে হ'ল যেন নব জীবনে জেগে উঠেছি। দীর্ঘ দারুণ পরিশ্রমের সমস্ত ক্লান্তির পরে বিশ্রামের আবেশ সুখের মত আমার হৃদয় আচ্ছন্ন ক'রলে। যুদ্ধের বর্ব্বরতা, শীত আর যুদ্ধক্ষেত্রের নানাবিধ দুর্গতি থেকে মুক্তির দিনগুলি হাঁসপাতালে শুয়ে শুয়ে গোণবার যে অবিমিশ্র সুখ এ যেন তারই সহোদর। না, যা লিখছি তাতে আমার কথা আদৌ বলা হচ্ছে না। এ একেবারে অসম্পূর্ণ—আমার সে অনুভবের কণা মাত্রও এ চিঠিতে আমি ব্যক্ত ক'রতে পারছি না। তোমার করস্পর্শের কথা ব'লছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমার চোখের মমতা-মাখা দৃষ্টিই আমায় সব চেয়ে অভিভূত ক'রেছিল।

প্রথম মিলনের সঙ্কোচ ও লজ্জা তখন কেটেছে; সহরের বিস্তৃত রাজপথে আমরা বেড়াচ্ছি আর বাতাসের জোয়ারে ভেসে-আসা তুষার-কণা মুখে চোখে এসে লাগছে। একবার একটা ট্রামে উঠলুম, পথ ভুল হ'য়ে গেল। আবার অন্য ট্রামে উঠে গন্তব্যনির্ণয় চ'লতে লাগল। কত গল্প, কত প্রশ্নই যে উঠল। ট্রাম ছেড়ে আবার নামলুম পথে। তোমার পাশে পাশে চলার গর্ব্ব যে আমার মনে কতখানি জমেছিল তা তুমি লক্ষ্যই কর নি। কত লোকই বারে বারে তোমার দিকে ফিরে ফিরে চাইলে—তুমি দেখলেই না। তোমার এই অভ্যাসটা কিন্তু আমার বেশ লাগে—নিজের সম্বন্ধে তোমার এই আনন্দময় ঔদাসীন্য।

আচ্ছা, আমার ছবিখানা একবার কল্পনা কর ত'! আমি তখন সমস্ত গ্লানি, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সকল মালিন্য থেকে

মুক্ত হ'য়ে এসেছি। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সেই অপূর্ব্ব রাজ্য থেকে তখন ছুটী পেয়েছি যেখানে মানুষের একমাত্র চিন্তা কেমন করে' বীরের মত প্রাণ দেবো, যেখানে নারী বা শিশুর দেখা কোন কালেই মেলে না, মনের কোমল বৃত্তিকে যেখানে মানুষ প্রশ্রয় দিতে সাহস পায় না পাছে সেই অবকাশে কাপুরুষতা তাকে আশ্রয় করে, যেখানে আত্মার সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কোন শ্রী নেই, যেখানে ভবিষ্যতের সব উচ্চাশা অবলুপ্ত! বাইবেলের সেই কুষ্ঠগ্রস্ত লাজারসের মত সে-দিন আমি যেন নব দেহ লাভ করে' প্যারিসের সুন্দরীশ্রেষ্ঠার পার্শ্বচরের গৌরব লাভ করেছি। জীবনের সকল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত যে মানুষ শ্মশানের মলিনতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তার কাছে এর চেয়ে পরম বিস্ময় আর কি হ'তে পারে? জানতে ভারি সাধ হয়, তুমি কি ভেবেছিলে!

কাফেতে খেতে গিয়ে কি মজাটাই হ'ল। কি খাব তা ফরমাস ক'রতে পারি না, ফরাসী বলতে বাধে। ভাগ্যে তুমি ছিলে, অথচ গোড়ায় দুষ্টু মেয়ের মত শুধু মুখ টিপে হাসছিলে। চার পাশের লোকগুলো কত অদ্ভুত। তাই নিয়ে কত হাসি চ'লছিল আমাদের মধ্যে। কিন্তু হাসবার কথা তো নয়! পৃথিবীর কোন্ পারাপার থেকে অকস্মাৎ কিসের ফেরে আমরা দু'জনে কাছাকাছি এসেছি। এইটাই কি সবচেয়ে অদ্ভুত নয়?

কাফে থেকে যখন বাইরে এলুম তখন বরফ প'ড়ছে, পশম-কোমল তুষারকণা হীরকচূর্ণের মত তোমার চুলে আর জামায় চক্ চক্ ক'রছে। তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে ক'রছিল না। লুক্সেমবার্গ বাগানে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব তুললুম। ভাগ্যক্রমে ঢাকা ট্যাক্সি মিলল। সেই প্রথম তোমায় একলা কাছে পেলুম! সে এক বিচিত্র অনুভূতি। আমাদের দুজনের কথা জড়িয়ে গেল। দুজনেই এক সঙ্গে চুপ করলুম। বুকের ভিতর যেন ঝড়ের মাতামাতি। এই বাইরের জগত থেকে তফাৎ হওয়া, তোমায় একলা কাছে পাওয়া—এইটাকে আমি মনে মনে যেমন ভরিয়েছি, মাসের পর মাস তেমন একান্ত মনে কামনাও করেছি। কিন্তু কাছে পেয়ে তোমার সম্বন্ধে আমি অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলুম, তোমার সৌন্দর্য্য আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হ'ল—আমায় যেন ভিতরে ভিতরে তোমার রূপ বারে বারে আঘাত ক'রলে। তখন আমি ভাবছিলুম—আজও তা ভাবি—হয়ত তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। তোমায় যেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখছি; বরফ-ঢাকা জানলার গায়ে তোমার মুখের একটি পাশ সুন্দর, উজ্জ্বল; আর দেখছি তোমার যুক্ত করের অচঞ্চল স্থৈর্য্য। পাশে ছিলে অথচ তোমায় তখন যেন একেবারে অপ্রাপ্য মনে হ'চ্ছিল—স্বপ্নের মত, যেন যে কোন মুহূর্ত্তেই তুমি অবলীলায় শূন্যে বিলীন হ'তে পারো। মাথার মধ্যে নানা কথার কত যে চলা ফেরা, কত যে কাণাকাণি। কথাগুলো খুবই সত্য কিন্তু মুখ ফুটে ব'ল্লে হাস্যকর শোনাত' নিশ্চয়ই। আর সময়ও খুব বেশী ছিল না। একবার ভেবেছিলুম, যদি কপালে থাকে তবে আমার ছুটী ফুরোবার আগেই আমাদের বিয়ে হ'য়ে যাবে।

আবার যখন ভিড়ের মধ্যে এসে পৌঁছলুম, তখন চিন্তার ধারা বদলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার গতিও বাড়ল। পরস্পরকে তখন আর সংশয়ের চোখে দেখছি না—আমাদের মধ্যে ভয়ের ব্যবধান তখন ঘুচেছে। গ্যালারীতে একখানি ছবির সামনে আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম—ছেলেদের ঘরে টেবলের মাঝখানে বাতি জ্ব'লছে, শিশুর দল তার চারপাশে খেলায় মত্ত, আর পাণ্ডুর চাঁদ জানালায় উঁকি দিচ্ছে। ছবি দেখে, ঘরের কথা স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত অনেক ব্যথা মনে জাগল। ছবিখানি এঁকেছেন এক স্কচ শিল্পী। অক্সফোর্ডে পড়বার সময় তাঁকে দেখেছিলুম। তোমাকে ত সেই চেষ্টনাটের ডাল চুরির কথা বলেছি, এই শিল্পীর এক ছবির উপাদান সংগ্রহ ক'রতেই ভোরে উঠে ওয়ার্ডেনের বাগানে ঢুকেছিলুম।

লুক্সেমবার্গ বাগানে বেড়াচ্ছি, আর মনে হ'চ্ছে যুদ্ধ যেন কোথায় দূরে সরে' গেছে। পথ পিছল বলে' হাত ধরে' তোমায় নিয়ে যাচ্ছি আর অনিচ্ছায় যে আমার হাতে হাত রেখেছ এই ভেবে মনে মনে কেবলই হাসি এসেছে। পুকুরের জল জমে' বরফ হ'য়ে গেছে, লোকেরা তার উপর ভিড় করে' স্কেটিং ক'রছে—উঠছে, পড়ছে আর আনন্দের কোলাহল উঠছে।

নোৎরডামে গিয়ে দেখি মেয়েরা একমনে সেখানে প্রার্থনা ক'রছে শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা তাদের চিরকালের মত ছেড়ে গেছেন। ক্রমে আমরা সীন নদীর তীর বেয়ে এগিয়ে গেলুম—অস্তগামী সূর্য্যের অন্তিম কিরণে সীনের জল যেন রক্তধারার মত। মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রবার ত' সময় আসে নি, আমাদের বয়স ত' খুব বেশী নয়। কিন্তু আমার সমস্ত তৃপ্তি বিস্বাদ হয়ে গেল। তুমি হঠাৎ বল্লে, তোমার কোথায় নিমন্ত্রণ আছে; এখনি যেতে হবে।

"আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি?"

"বেশ তো!"

তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠলুম। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলুম যাতে তোমায় না ছাড়তে হয়—"রাত্রে কি করবেন স্থির করেছেন কি?" তুমি থিয়েটারে যাবে ভেবেছিলে; ভাগ্যক্রমে টিকিট একখানা বাড়তি ছিল, আমার নিমন্ত্রণ হ'ল। ফিরতি পথে যে কথাটা আমার মনে গানের মত বাজছিল তা হ'চ্ছে যে তুমিও আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাও না—।

তুমি কত ধীরে ধীরে চল। বোধ হয় সে রাত্রে আমিও প্রথম এটি লক্ষ্য করেছি। তোমার আসার শব্দ কেউ শুনতে পায় না। এই দেখি তুমি নেই, নিমেষ গেল, তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমার চোখ দুটি যেন সর্ব্বদাই একটি শান্ত মৌন হাসির আভায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। তারা যেন যা-কিছু জানবার সব জেনেছে এবং বিশ্বের সমস্ত বিপর্য্যয়ে বিচলিত না হ'য়ে পুলক বোধ করছে। জীবন যে তোমায় কোনদিন উদ্বিগ্ন ক'রেছে তা আমার বিশ্বাস হয় না। আজ ভাবছি, আমার মনের বলবার মত কথাগুলি যদি মুখ ফুটে তোমায় সে রাত্রে ব'লতুম তাহ'লে তোমার মুখের আর চোখের ভাবে কিছু পরিবর্ত্তন ঘ'টত কি? কি জানি!

প্রথম থেকেই তুমি আমায় এত বিশ্বাস ক'রেছিলে। প্রেমিকের কাছে এর চেয়ে শুভ-লক্ষণ আর কি হ'তে পারে! কিন্তু আমার সব চেয়ে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে যুদ্ধে কামানের মুখে এগিয়ে যাবার ভয় জয় করে' আচম্বিত মৃত্যু-সম্ভাবনায় সারাক্ষণ নির্ব্বিকার থেকে শেষে এক তরুণীর সান্নিধ্যে কেঁপে কেঁপে সারা হচ্ছি।

তোমায় এতক্ষণ ধরে' যা লিখছি, তা পড়ে দেখব বলে' লেখা থামালুম—আচ্ছা, আমি লিখছি কেন? তুমি ত' এ সব কোনদিনই পড়বে না। ঘণ্টা দুই আগে ত তোমায় এ সব কথা বল্লেই পারতুম! এখন যে অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। আমরা মাঝে মাঝে দু এক ছত্র লিখব, পরস্পরের কাছে এই কথা দিয়েছি—সে ত' শুধু কথার কথা। তার চেয়ে বেশী কিছু লেখা উচিত হবে কি? তোমায় আমি যে চিঠি পাঠাবো, তা একেবারে কেতাদুরস্ত, যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত, পরিমিত। সাধারণ পরিচিত মানুষকে যেমন লিখি ঠিক তেমনই।

এই বোধ হয় তোমার কাছে আমার শেষ বিদায় চাওয়া, সেই বোধ করি আমাদের শেষ দেখা। কথাটা ব্যথার মত বুকে বাজ্‌ছে। যুদ্ধের মুখে ফিরবে ক'জন? যে বোমার আঘাতে আমার জীবন যাবে, তা বোধ হয় এতক্ষণে জার্ম্মাণ বারুদখানায় জমা হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চের পাশ দিয়ে চলেছি, কি একটা ছুটে এল, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা—অন্ধকার, ব্যস, সব শেষ! অমন করে' সংক্ষেপে বিদায় নেওয়া আমার নিতান্ত বিশ্রী বলে' মনে হয়। পরস্পরের সুখের আশা জ্ঞাপন করে' ধন্যবাদ—হাতের একটু স্পর্শ তারপর সব কথা অ-বলা রেখে অসীম শূন্যের মধ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা!

তুমি ত আর এ সব কোন কালেই পড়বে না, তাই একটা মজা করব মনে করেছি। যা সব লিখছি, তোমায় তা পাঠাব না। এই রকম করে চিঠি লিখে মনের সব কথা বলে যাব। যদি বাঁচি, যুদ্ধের শেষে একদিন তুমি সব চিঠিই একসঙ্গে পেয়ে যাবে। যদি তার আগেই মার, তুমি তাহ'লে কিছুই জানবে না। আমার এই গোপন প্রেম তোমায় কোন ব্যথাই দেবে না।

আমার স্বপ্ন-জগতে এখন তোমার নিত্য আবির্ভাব। এই শেলের গর্ত্তের মধ্যে, এই অবাস্তব রাজ্যে! আর মনে হয় তুমি প্রকৃতই আমারি!

চুপ করে থেকে বোধ হয় ভাল করিনি। বোধ করি আমার নীরবতার মূলে ছিল একটা মিথ্যা গর্ব্ব, অনাবশ্যক অহঙ্কার। সৈনিকদের বিবাহ সম্বন্ধে সেদিন তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলুম যে কাজটা নিতান্ত স্বার্থপরতা। 'প্রথমে তিনি নীরব ছিলেন যেন আমার

কথায় কোন মনযোগ দিচ্ছেন না, তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অপ্রত্যাশিত তেজের সঙ্গে বল্লেন, "তাকে আমি বিয়ে করলেই ঠিক করতুম।" তাঁর কাহিনী আমি পরে শুনেছি। এক ফরাসী সেনা-নায়কের কাছে তিনি বাগ্‌দান করেছিলেন—মৃত্যু এসে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মেয়েটি রেডক্রশে যোগ দিয়েছেন। তাঁর একান্ত কামনা যুদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয়, প্রথম সারের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বুক জুড়ে কি অশান্তি! আচ্ছা, বিদায়ের দিনে আমরা পরস্পরের চোখ চেয়ে যেমন করে হেসেছিলুম, এঁদেরও মুখে কি সেদিন সেই হাসি ফুটেছিল?

শেষ ক'দিন আমরা কি সুখেই ছিলুম। পরস্পরের মধ্যে কত অন্তরঙ্গতা। সেই সব অতীত সুখ-কাহিনীতে স্মৃতির ভাণ্ডার আমার পরিপূর্ণ—বিচারবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার পাকা রঙে তার সবুজ আজও নষ্ট হয়নি। আজ রাত্রে—আজ শেষ রাত্রে, সুখের চরম হয়েছে—নয়? সেই প্রথম দিনের কাফে, তারপর অপেরা। গল্পে এত মত্ত ছিলুম যে, সময় ভুলে দেরীতে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন গান সুরু হ'য়ে গেছে। ক্ষতি কি! তোমার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পাব বলেই ত অপেরায় যাবার ছল। রাত বাড়ল—অপেরার শেষে প্যারিসের উদ্যান-পথ। ক্রমে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেবার সময় হ'ল। অদৃশ্য ট্যাক্সি পাবার চেষ্টায় কি মজাটাই হ'ল, ভাগ্যে বাড়ীর গাড়ী একটা পাওয়া গেল। সেই শেষ মুহূর্ত্তে, তুমি কি আমার কাছে কিছু আশা করেছিলে? আমি শুনলাম, তোমার সঙ্গে যে সব কথা বলছি তা নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু গলার স্বরটা যেন আমার নিজের নয়। কথা বলেই চলেছি। কত দেরী হ'য়ে গেল—এত দিনের অন্তরঙ্গতা, অথচ কি বলে বিদায় নেব জানি না। তুমিও বিচলিত হয়েছিলে। বুকের ভিতরে তখন কি চাঞ্চল্য! তুমি বল্লে "বিদায়।" আমি তার প্রতিধ্বনি তুললুম। "চিঠি লিখতে ভুলবেন না ত?" হাত দুখানি আমার মুঠোর মাঝ থেকে টেনে নিয়ে তুমি মাথা নাড়লে, তারপর পিছন ফিরে দৌড়ে উপরে উঠে গেলে।

তোমার দেখা পেয়েছি বলেই অন্তরে বাহিরে আমি পুলকিত হয়ে উঠেছি। যে বেদনা বহন করে আমি যুদ্ধে ফিরে যাবো তার জন্যেও আমি খুসী। এতদিন কি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছি। এর আগে কোন মেয়েকেই আমি ভালবাসিনি। এখন ত ভাবতে পারব—সে বোধ হয় সব কথা জানতে পেরেছে। বার বার মনে হবে, কেন তোমায় মুখ ফুটে মনের কথা বলিনি। মনে ক'রব, হয়ত সেও আমার কথা এমনি করে ভাবছে! তোমার সম্বন্ধে কত গল্প নিজেকে শোনাব, যেন তুমি সত্যই আমার। তোমার মুখখানি থাকবে আমার চোখে চোখে,—তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার স্নিগ্ধ-মধুর ব্যবহার সব-কিছুই আমার স্মৃতির সাথী। এবার আমি নিজেকে ছাপিয়ে উঠব, তোমাকে যে আমি দেখেছি! যদি মরি, খুসী হয়ে মরতে পারব।

কত রাত হয়ে গেছে। এইবার যাত্রা সুরু! ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই আমায় সহর ছাড়তে হবে। তুমি যে আমার খুব কাছে আছ, সেই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করছে, এত কাছে যেন কথা কইতে পারি। দেখেছ, টেলিফোনের লোভ এখনও সামলাতে পারছি না কিন্তু,—প্যারিস আর যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম সার কামানের মাঝখানে কোন টেলিফোনের তার নেই—!*

২

ট্রেন ছাড়বার বেশী দেরী ছিল না, কিন্তু তোমায় কিছু ফুল পাঠিয়ে দেবার মত সময়ের অভাব হয়নি। সেগুলো গোলাপ, গাঢ় লাল। আমার সঙ্গে অপেরা দেখতে যাবার সময় তুমি যে রঙের গোলাপ পরেছিলে, সেই রকম। সেদিন অনেক ফুল কিনেছিলুম, যেমন মনে লাগলো, তেমনি কিনলুম, শেষ মুহূর্ত্তে কিন্তু আমার নামের কার্ডখানা তার মধ্যে গুঁজে দিতে ভুলে গেছি; কে যে ফুল পাঠালো তা তুমি বুঝতে পারবে কি? আন্দাজ কি আর করতে পারনি? মনে পড়ে, আগে তোমায় একবার ফুল পাঠালুম, তুমি প্রাপ্তিস্বীকার করলে না! কেন বলত? পাছে তোমার মনের কথা জানতে পারি সেই ভয়ে? বেশ, যতদিন না শুকিয়ে ঝরে যায়, ফুলগুলো তোমায় আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে!

* *Love of an unknown soldier.* Published by John Lane & Co.

এখন আমি যেখানে আছি, সেখানে ফুলের কথাটা কিন্তু ভারি অসঙ্গত, নিতান্ত অবাস্তব।

নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, সারা অঙ্গ কাদায় ভরে গেছে। আমার এত বিস্ময় লাগছে যে এই মানুষটাই অদূর অতীতে প্যারিসে তোমার পাশে পাশে বেড়িয়েছে!

আমাদের বর্ত্তমান আস্তানা হয়েছে একটা dug outএ, যেখানে বাইরের ট্রেঞ্চের যত জল একেবারে বৃষ্টিধারার মত পড়ছে। ব্যাপার খুব চমৎকার। পাছে ভুলে যাই, রসিক শত্রুদল মাঝে মাঝে নানা রকমে তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন। আমাদের পদাতিক সৈন্যদল অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কারণ শীঘ্রই একটা তীব্র আক্রমণের আশঙ্কা আছে। চারিদিকে প্রচুর অগ্নিবর্ষণ চলেছে এবং তার মধ্যে অল্প অল্প গ্যাসের গন্ধও পাচ্ছি। সংবাদ-বাহকদল কেবলি আসা যাওয়া করছে—সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে নামছে আর বাইরের যত কাদা ঘরের মধ্যে জমিয়ে যাচ্ছে। আমার কনুয়ের কাছে একটা বাতি সামান্য আলো দিয়ে গলে গলে পড়ছে। আমি বসে আছি একটা পেট্রোলের বাক্সের উপর, গদীর বদলে দু-পাট করে একটা চট পেতে নিয়েছি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সারারাত জেগেই কাটাতে হবে।

তুমি আজ কত দূরে—যা কিছু আমি ভালবাসি, সে সবই কত দূরে! তবু যেন তোমায় দেখতে পাচ্ছি! আপন মনে তোমার কাজ করে চলেছ—তোমার সেই সেবাস্পদ অসহায় শিশুর দল নিশ্চিন্ত আরামে যে যার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি ত বলেছিলে যে হূনেরা তোমাদের উপরও সময় সময় গোলা চালায়, গ্যাস ছাড়ে। নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমি ভাবতে চাইছিলুম—না তুমিও যে পুরুষদের সঙ্গে এই মরণ-খেলায় যোগ দিয়েছ, এতে আমি সত্যই খুসী। মনে হচ্ছে, তোমার সুন্দর বেশ-ভূষা সব দূরে সরিয়েছ, প্যারিসে বোধ হয় সব পড়ে আছে—এখন তোমার ধাত্রীর বেশ। তুমি তো ক্যাপটেন, না? তা হলে তুমি আমার উপরে, কারণ আমি মাত্র সাব-অলটার্ণ। কিন্তু পদের গুরুত্ব নয়, আমি তোমার সম্বন্ধে যা কিছু ভেবেছি, তুমি তার সবেরই উপরে। বিলাস আর নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে নিশ্চিত বিপদের মুখে পরের ছেলের ভার নেওয়া ত কম সাহসের কাজ নয়! আশ্চর্য্য, তোমার মধ্যে এই বীরত্বের সম্ভাবনা কোন দিন আমার মনে জাগেনি। প্যারিসে যতদিন ছিলুম, তোমাকে সবার সেরা সুন্দরী বলেই শুধু জেনেছি, তার চেয়ে আর বেশী কিছু নয়। সুন্দরী তুমি দেহে আর মনে। কত মেয়েই ত দেখলুম। তুমি বুঝি সবার চেয়ে ভদ্র, শান্ত আর মমতাময়ী। যখনই তোমার সেবাব্রতচারিণী রূপটি আমার মনে জাগে, একটা অলৌকিক জ্যোতি যেন তোমায় ঘিরে থাকে। আন্তরিক সেবার মধ্যে এমন একটা পবিত্রতা আছে যা সকল সৌন্দর্য্যকে ছাপিয়ে ওঠে।

আমার চিঠির শেষ লাইনের শেষ কথাটার উপর যে কালি ছড়িয়ে গেছে, সেটা সব আমার দোষে নয়। আমাদের এই পাতাল-পুরীর দরজায় জার্ম্মানদের একটা শেল এসে পড়লো, একজন মারা গেল, দুজন জখম হ'ল আর বাতিটাও নিভে গেল। লোক দুটির আঘাতের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এই শেষ করলুম। মৃত লোকটি পথের উপর পড়ে আছে—আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছে। ছেলে মানুষ—এই সেদিন আমাদের দলে যোগ দিলে। এ রকম দুর্ঘটনা হয় আমাদেরি দোষে। আমাদের উপর শুধু এগিয়ে যাবার হুকুম আছে। আমরা কেবল সামনে চলি, কাজেই যে সব ট্রেঞ্চ আমরা জয় করে দখল করি সে গুলোর সম্বন্ধে মনোযোগ দেবার কোন অবসরই পাই না। শত্রু যখন ছিল তখন তাদের প্রয়োজন হিসাবে এর মুখগুলো ঠিক দিকেই ছিল, কিন্তু আমাদের বেলা শত্রুর গোলার অব্যর্থ সন্ধানের জন্যেই যেন সেগুলোর সার্থকতা—এই ত যুদ্ধ!

যুদ্ধে যোগ দিতে আমার বেশী দেরী হয় নি—বলব, কত দেরী? উইলিয়াম টেলের জীবনী নিয়ে দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয় শোনা আর সেই বিচিত্র বিদায় নেবার চার রাত পরেই। যাত্রাশেষে গন্তব্য স্থানে পৌছে না পেলুম ঘোড়া, না পেলুম সহিসের খোঁজ। দলের অফিসে টেলিফোন করলুম; ঘোড়া নিয়ে যখন লোক এল তখন সারা রাত পার হয়ে গিয়েছে! পথের মাঝে ডোবা আর খালের জল জমে বরফ হয়ে কাঁচের পাতের মত দেখাচ্ছে। কি ভয়ানক ঠাণ্ডা। আবার বেশীর ভাগ পথ, ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে হল। পিছনে পিছনে

তাদের টেনে নিয়ে চল্লুম—পিছল, বন্ধুর পথে। আকাশের চাঁদ যেন বাটালি দিয়ে খোদাই করা শক্ত পাথরের ফুল। বিপর্য্যস্ত গ্রামগুলো যেন প্রেত-পুরীর মত। জমাট ঘন অন্ধকার তাদের বুক চেপে রয়েছে। সবে সেই দিন আমাদের দল সেখানে উঠে এসেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলার একশেষ!

আমাদের আস্তানার কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় তিনটে। ঘোড়া আর মানুষ এই দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জায়গাটা একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। বেশীর ভাগ বাড়ীতে দেওয়ালগুলোই কেবল দাঁড়িয়ে আছে আর সব ভেঙ্গে পড়েছে। আমাদের দলের সৈন্যরা একটা বড় গোলাবাড়ীতে এসে জুটেছে। আমার থাকবার জায়গা যে কোনটা সে কেউই বলতে পারে না, এত রাত্রে খোঁজাখুঁজি করেই বা কে? বিচার বিবেচনা ছেড়ে বিছানাটা পেতে, জুতোটা খুলে এক কোণে শুয়ে পড়লুম। হোটেলের বিলাসিতা, গরম স্নানাগারের আর দুধের মত শাদা চাদরের বিছানার আরাম থেকে এ অবস্থায় আসা একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন নয় কি? এখন বোধ করি বুঝেছ, তোমায় এত দূরে মনে হচ্ছে কেন?

এর চেয়ে অনেক আকস্মিক পরিবর্ত্তন আমার ভাগ্যে ছিল। পরদিন প্রাতে ছ'টার পরেই আর্দ্দালী এসে আমায় জাগিয়ে দিলে—শত্রুর গতিবিধি-পর্য্যবেক্ষণকারী দলের সঙ্গে আমায় যেতে হবে। সাজগোজ করতে বেশী দেরী হ'ল না—পোষাক পরে শোবার এই দেখছি একটা বড় সুবিধা। ক্লান্ত ঘোড়াটার পিঠে আবার জিন কসা হ'ল—তারপর পিছলে, পা ঘসে ঘসে সেই কাচের মত পথে যাত্রা সুরু।

গিয়ে দেখি আমাদের দল একটা সরু উপত্যকার মধ্যে জমা হয়েছে। এ উপত্যকার নাম তুমি জানো। নাই বা নামটা বল্লুম। মনে আছে তো বছর খানেক আগে ফরাসিরা এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে একে বিখ্যাত করেছে! সে হাতে হাতে যুদ্ধ—এত কাছাকাছি যে সঙীন তো দূরের কথা, ছোরা মুখে করে সৈনিকদের পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়েছিল। পাহাড় তলীর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কত মৃত দেহ আজও পড়ে আছে। দু মুঠো মাটি তাদের উপর ছড়িয়ে দেবার মত কেউ ছিল না। এখন সব দেহের উপর বরফের আবরণ পড়েছে, কিন্তু চলার পথে পায়ের তলায় তাদের হাড়গুলো যে ঠেকে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। খানিক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে আমাদের একটা কামান লুকানো আছে, শত্রুর শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দেবার জন্যে মরণ যন্ত্রটিকে কি বিচিত্র রঙেই সাজান হয়েছে!

মাটীর নীচে একটা গর্ত্তের মধ্যে মেজরকে পেলুম। আমাদের দেখে খুব খুসী। হুকুম হ'ল এখনি বেরিয়ে পড়া চাই। তাড়াহুড়ি কিছু খেয়ে দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

এখানে আজ নিয়ে তিন দিন আছি। সৈন্য দলে যোগ দিলে ভাববার বা মন ভার করবার সময় থাকে না। এ দেখছি একটা পরম লাভ। আমার অবস্থা প্রায় সাধারণ সৈনিকের মত হয়ে পড়েছে। আমার না আছে কম্বল, না আছে বালিশ, না অন্য কিছু। তাড়াতাড়িতে সব জিনিষ-পত্র ফেলে চলে এসেছি। রাত্রে ট্রেঞ্চ কোটটা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকি। কম্বল নেই বলে বিশেষ যে অসুবিধা হচ্ছে, তা নয়, কারণ প্রায় সারা রাত এদিক ওদিক করে বেড়াতে হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার সময় পাই কখন জানো? সকাল ছটা থেকে বেলা এগারটা ......বাইরে কি যেন একটা হচ্ছে— * * *

না, ব্যাপার কিছুই নয়, কে একজন ভয় পেয়ে, বিপদে সাহায্যের জন্যে যে হাউই ছোড়ে তাই ছেড়েছে। জার্ম্মাণদের আস্তানা আন্দাজ করে কিছুক্ষণ গোলা বর্ষণ করলুম। যদি শত্রুপক্ষের কিছু মতলব থাকে তবে তা ত্যাগ করতে হয়েছে। চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ। শুধু দূরে আমাদের বাঁ দিকে মাঝে মাঝে আনাড়ি হাতে টেপা টাইপ-রাইটারের মত মেশিন-গানের পট পট শব্দ শোনা যাচ্ছে। শত্রুদের আস্তানা থেকে মাঝে মাঝে এক-একটা হাউই আকাশের দিকে উঠছে।

কোন দিন যদি ভালবাসায় পড় আর মাথায় যদি প্রচুর কল্পনা থাকে, তবে এহেন রাত্রে কত পরীর গল্পই যে রচনা করা চলে। হাউই-এর সাদা আলো বারে বারে অন্ধকারের বুক চিরে আকাশের দিকে ছুটছে, অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে

একটা অবাস্তব পরী-রাজ্যের কল্পনা জাগাচ্ছে আর আমার মনে আনছে প্যারিসের শত স্মৃতি!

তোমার কথাই হঠাৎ মনে আসে। তোমার অঙ্গভঙ্গী, চলা ফেরা, কথাবার্ত্তার কত বিশেষত্ব, যা তখন লক্ষ্যই করি নি। গেটেল প্যাভিলনের কথা তোমার মনে পড়ে? অন্য সম্ভ্রান্ত মার্কিন মেয়েদের সঙ্গে তুমিও আমেরিকানদের জন্যে জিনিষ-পত্র বিক্রী করছিলে। কতক্ষণ বসে বসে আমি তোমায় দেখলুম। সিগারেট কিনবে বলে কত লোক যে ভিতরে এল। তোমায় যে দেখে তার চোখে আর পলক পড়ে না। একটা কিছু কেনা শেষ হয় আর অন্য কিছু নেবার ছলে তোমার কাছে এসে দাঁড়ায়। বেচারী, ভদ্রতার খাতিরে আবার বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। অবান্তর কথা বলে তোমার সঙ্গে কথা কইবার তাদের কি ব্যর্থ প্রয়াস। বারে বারে কত লোকই এল, তোমায় আর একটীবার চোখ ভরে দেখে যাবে। কি দুষ্টু তুমি! নিজেকে সাধারণ দোকানী মেয়ে বলে চালাবার চেষ্টায় কত ভঙ্গীই তুমি করলে। তুমি বুঝেছিলে যে সবাই তোমায় দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। সত্যি, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছিল, সে রাত্রে। তোমার মাথায় ছিল মখমলের একটা ছোট টুপি। কপালের উপর বাঁকা ভাবে বসান ছিল বলে তোমার ভ্রূর সূক্ষ্মতা তাতে আরও ফুটে উঠেছিল। আমেরিকায় আমাদের ক্ষণিক মিলনের দিনে তুমি এই টুপিটাই পরেছিলে।

কে তুমি? কি তুমি? যতই তোমায় জানতে চাইছি ততই যেন আমার কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছ। এর মধ্যেই অবাস্তব হ'য়ে উঠেছ। এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দেশে তোমার চিন্তাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোন মতেই মেলাতে পারছি না। প্রাণ-চাঞ্চল্যের তুমি যে সুন্দরী ঝর্ণা, জীবনের তুমি যে বিগ্রহ। * * * আমার কথা কি কোন দিন তোমার মনে আসে; এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কি তুমি আমার কথা ভেবেছ? যে জীবনের মধ্যে আমি পা বাড়িয়েছিলুম তার ছবি কি কোন দিন মনের চোখে দেখেছ, কল্পনায় এঁকেছ? তোমার কাছে আমি কে? একদিনের পরিচিত—শত আকস্মিক ঘটনার অন্যতম? বেশ একটা হাসি খুসি-ভরা রসিক লোক, ক্ষণিকের তরে মনের আঁচল ছুঁয়ে চলে গেল। সামনে বা পিছনে কি যে আছে, আমাদের মধ্যে সে কথার আলোচনা হয় নি কোন দিন। যে কয় ঘণ্টা হাতে পেয়েছি পরস্পরের সাহচর্য্যে তা চরম ভেবে উপভোগ করে নিয়েছি। কিন্তু সেই পরম সুখের মধ্যেও আমার মনে একটা বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল—অনিবার্য্য বিচ্ছেদের চিন্তা আমার মনে অনির্ব্বাণ দীপের মত জ্ব'লত। কে যেন ভিতর থেকে সাবধান করতো "এই শেষ, এই শেষ —শেষ।"

তোমায় যদি আগে পেতুম। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে। কোন দ্বিধা করতুম না—আমি গর্ব্বভরে জানিয়ে দিতাম আমি তোমায় ভালবাসি। আজ আর তা পারছি না। মুখ ফিরিয়ে পথের দিকে দেখছি আর চোখে ঠেকছে সেই ছেলেটির পায়ের বুট—কম্বলের নীচে তার দেহের আভাষ। একদিন সেও মানুষ ছিল—এক নিমেষে তার সব শেষ। হয়ত সেও কোন মেয়েকে ভালবাসত! বোধ হয় সে মেয়েটিকে সে কথা একদিন জানিয়েছে। হয়ত না জানালেই ছিল ভাল। অথচ তোমার সেই বন্ধুটি যে দুঃখ করেছিলেন, তাঁকে বিয়ে করলে ভালই হ'ত। এ এক সমস্যা - নিজের দিক থেকে বিচার করে দেখে মনে হয় তোমায় জানালেই বেশ হ'ত—চুপ করে থেকে নিজের উপর অন্যায় করেছি বিস্তর। তার পর তোমার হাত। কিন্তু সে যে স্বার্গপথের মত, লোভীর পথ—তাই সে ব্যবস্থার উপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।

এই আর একটা চিঠি লিখলুম, যা কোন দিন তোমার চোখে পড়বে না। যে চিঠি তুমি পাবে তা একেবারে অন্য রকমের। তোমার পদবী ধরে তোমায় সম্বোধন করব—কয়েক পংক্তিতে জানাবো যে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছি, আর জানতে চাইব তোমার দিনগুলি কেমন চলছে।

ভাবছি, তুমি আমায় চিঠি লিখবে কি? তোমায় যখন সে কথা জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি সলজ্জভাবে মাথা দুলিয়েছিলে, সেটা কি ভদ্রভাবে অস্বীকার করার ইঙ্গিত? তুমি সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে যাচ্ছ, আমি এখনি সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তুমি একটিবারও ফিরে চাইলে না। যদি আর কয়েক দণ্ড তুমি আমার কাছে থাকতে, তাহলে হয় ত আমার মনের সব কথাই তোমায় বলে ফেলতুম। না বলেই কিন্তু আমি ভাল করেছি। তা ছাড়া মনে হচ্ছে আমার বলবার মত সকল কথাই তুমি হয় ত জানতে।

ভোর হয়ে এসেছে, এইবার আমায় প্রভাতী নিদ্রার আয়োজন হবে।

(ক্রমশঃ)

———

সে আজ অনেক দিনের কথা। বৈশাখ মাসে খর দুপুরে আড়াই ক্রোশ মেঠো রাস্তা ভেঙে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ষ্টেসনে পৌঁছিয়া জমাদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু গাড়ী কখন আয়েঙ্গা"। জমাদার সাহেব ডান হাতের লাল নীল পাখা বাঁ বগলে রাখিয়া, বাঁ হাতের তেলোয় একটু খৈনি ঢালিয়া ডা'ন হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া রগড়াইয়া মুখে দিয়া, একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কাঁহা যাইয়েগা?" ব্রাহ্মণ শশব্যস্তে বলিলেন, "এই বাবা রাণাঘাটকা দিকে।" "গাড়ী আবাহি চলা গিয়া" বলিয়া জমাদার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কখন গাড়ী পায়েগা বাবা?" জমাদার সাহেব মুখ ফিরিয়া, তালিমারা নীল কোটাবৃত পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিয়া "রাত দশ বাজে" বলিয়া সশব্দে রওনা দিলেন। জমাদার সাহেবের নালবাঁধান নাগরার আওয়াজ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে অনন্তে বিলীন হইল। ব্রাহ্মণ বেকুবের মত খানিক আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া "তারা ব্রহ্মময়ী" বলিয়া বাঁ হাতের "ধূলিপটলপঙ্কিল" ছেঁড়া চটিজুতা জোড়া ও ডা'ন হাতের সচ্ছিদ্র (নেটের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) ছাতাটি প্লাটফরমে ফেলিলেন ও কোমরে বাঁধা গামছা খানি খুলিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে পুত্রের হাত হইতে ছোট সতরঞ্চখান লইয়া বিছাইয়া, চিনে বাজারের "নবাবজান" মার্কা ক্যাম্বিসের ব্যাগটীকে "পিধানমসি" করিয়া "জয় জগদম্বা" বলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন ও চক্ষু মুদ্রিত ও ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কত কি চিন্তা ও দুশ্চিন্তা করিতে লাগিলেন। ছেলেটীর বয়স কম; সে প্ল্যাটফরমের এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া সর্ব্বচিন্তাহর তাম্রকূটের শরণাপন্ন হইতে বৃদ্ধের ইচ্ছা হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন। "নবাবজান"-তালাবদ্ধ চাবিটী ব্রাহ্মণের পৈতায় বাঁধা; সেটা রুদ্রাক্ষ-মালার সঙ্গে এমন ভাবে জড়াপট্‌কি বাধাইয়াছে যে সুবিধা মত ব্যাগের গায়ে লাগান যায় না। ঘাড় নীচু করিয়া অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর চাবি লাগাইয়া ব্যাগ খোলার দুরাশা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ "নাবাবজানে"র এক কোন দু'-হাত দিয়া সজোরে ফাঁক করিয়া হুঁকো, ক'লকে ও একটী টিনের চোঙ্গা বাহির করিলেন। চুঙ্গী হইতে তামাক লইয়া কল্‌কেয় ভরিয়া কয়লা দিয়া আগুন ধরাইতে গিয়া দেখেন দেশলাই নাই! শ্রীকৃষ্ণের হিরণ্যকশিপুবধের মত ব্রাহ্মণ ব্যাগের নাড়ীভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন, "নবাবজানে"র জানান্ত হইল কিন্তু দেশলাই মিলিল না। কয়লার গুঁড়া মাখান হাতখানি মাথায় দিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এদিকে ছেলেটী প্ল্যাটফরমের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে

দেখিল একটু উঁচুতে কয়েকটা লাল রং-এর বালতি ঝুলান আছে ও তাহার উপর কাল রং-এর লেখা FIRE। বালক নূতন ইংরাজী শিখিতেছে; সে বলিয়া উঠিল এফ, আই, আর, ই, ফায়ার; ফায়ার মানে আগুন। মেঘধ্বনিশ্রবণে ময়ূরের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কি?" বালক আবার বলিল—এফ, আই, আর, ই, ফায়ার; ফায়ার মানে আগুন। "মা তোমার ইচ্ছা" বলিয়া ব্রাহ্মণ সহর্ষে তামাক-ভরা ক'লকে লইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কোথায় আগুন রে খোকা;" খোকা বালতি দেখাইয়া দিল। বালতি একটু উঁচুতে, কাজেই ভিতরে

একটি লাল রং-এর বাল্তি ঝুলান আছে ও তাহার উপর কাল রং-এর লেখা FIRE. সে বলিয়া উঠিল—এফ, আই, আর, ই, ফায়ার।

কি আছে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ হাত পুড়িবার ভয়ে অতি সন্তর্পণে বালতির ভিতরে হাত দিয়াই বিরক্তি সহকারে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা, এ যে জল! তুই আগুন দেখলি কোথায়?" বালক আবার বলিল, "ঐ যে ঐ বালতির গায়ে লেখা এফ, আই, আর, ই, ফায়ার; ফায়ার মানে আগুন।" ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোর মাথা, বালতির ভিতর জল যে রে।" বালক আবার বলিল "না বাবা, হ্যাঁ বাবা, এফ, আই, আর, ই, ফায়ার, ফায়ার মানে আগুন, এম, আই, আর, ই, মায়ার, মায়ার মানে কাদা।" ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "রাখ তোর ইংরিজি; কাদা আর আগুন এক সঙ্গে! কি অদ্ভুত ভাষা!" ইংরাজী ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ পুনরায় তাঁহার সতরঞ্চে গিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং চক্ষু বুঁজিয়া সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন যে বাড়ী ফিরিয়াই স্কুল হইতে ছেলের নাম কাটাইয়া তবে আর কাজ।

অনেকটা এই রকমের একটা ব্যাপার আমার নিজের জীবনেও ঘটিয়াছিল। মামার বাড়ী যাইতেছি, মনে খুব আনন্দ; গাড়ী আসার তখনও অনেক দেরী। মায়ের কাছ থেকে কোনও রকমে ফস্কাইয়া প্ল্যাটফরমের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে লেখা—"Gentle man". আমি তখন নূতন Grammar পড়িতেছি, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম - Gentleman masculine, feminine Gentlewoman, Lady." মনে মনে ভাবিলাম ওটা বোধ হয় ভদ্রলোকের বসিবার স্থান ও ওখানে অনেক ভদ্রলোক আছে। কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম—একটী অর্দ্ধেক দেওয়াল দেওয়া ঘর, বা ঘরের মত, চারিদিকে নর্দ্দামা, একদিকে একগাছি বিপুলকায় ঝাঁটা, দুইটী বড় বড় বালতি, একটী মাটীর কলসী। ঘরে ভদ্রলোকের নাম-গন্ধও নাই, যে গন্ধটুকু

আছে তাহা ফেনাইলের। দেখিয়াই বুঝিলাম স্থানটী বিশ্রামের জন্ম নয়, অন্য উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, এবং উহা Gentleman ও Gentlewoman সকলের পক্ষেই অবারিত-দ্বার। "অবারিত দ্বার" কথাটা ঠিক বলা যায় না, কারণ সে ঘরের দ্বার আদৌ নাই।

যাহাই হউক, সে সময়ে manএর প্রাধান্যই বেশি ছিল, তাই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উদ্দেশেই Gentleman শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিছুকাল পরেই দেখিলাম পুরুষের এই অন্যায় আব্দার ও অকারণ দাবী স্ত্রীজাতি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের পাওনা গণ্ডা বখরা করিয়া আধা আধি করিয়া লইলেন, ফলে ষ্টেশনে একটী টিনের ছোট ঘর উঠিল, ঘরটী সমান দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে ঝাড়ু বালতি হাতে একটী রমণী মূর্ত্তি অপর ভাগে ঐরূপ একটী পুরুষ মূর্ত্তি চিত্রিত। Gentle man শব্দটা একটু misleading ছিল ও উহাতে consistencyরও অভাব ছিল। এখন দুই দিকে দুইটী চিত্রে relevancy ও consistency বেশ ফুটিয়া উঠিল, সব গোল মিটিল, "পাড়া জুড়ুলো," কারণ "আজ থেকে হ'লো ভাগ সমান সমান।"

তখনকার মত মিটিল বটে, কিন্তু মিটিয়াও মিটিল না। কারণ the world is progressing কাজেই যাহারা পুরুষের নিকট হইতে অর্দ্ধেক দাবী বখরা করিয়া লইল, তাহারা ক্রমে আরও প্রবল হইয়া উঠিল, এবং নিজেদের নূতন নূতন অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞাপন-ব্যাপী প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল, এবং এখনও চলিতেছে অর্থাৎ কালিদাস বর্ণিত কর্ণাটরাজের কীর্ত্তির ন্যায় "নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি"। কাজেই আজ কাল বাজারে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, বেরাস্তায়, অলিতে, গলিতে, রেলে, ষ্টিমারে, ট্রামে, দেওয়ালের গায়ে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় যে সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই রংবেরং ও ঢংবেঢংএর নারী-চিত্রে ভরা।

প্রত্যেক কেশতৈলের বিজ্ঞাপনে একটী সুকেশা নারী চাই-ই-চাই। যেন সুগন্ধি তৈল কেবল স্ত্রীলোকেরই কেশ-রঞ্জন করিতে সমর্থ এবং ঐ তৈল পুরুষে মাথায় দিলে হয় "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" উঠিয়া যাইবে, না হয় সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়া টাক পড়িবে, মাথার ভিতর আগুন জ্বলিবে ও মন ক্ষুব্ধ করিবে। Essence, soap, cream প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেখিলে মনে হয় সেগুলি প্রমীলার রাজ্যের জন্যই প্রস্তুত, উহাতে পুরুষের কোনও অধিকার নাই। সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়ম প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে স্ত্রীমূর্ত্তি অনিবার্য্য। অবশ্য এর একটা relevant ও consistent explanation দেওয়া যে না যায় তা নয়; কারণ সরস্বতী ঠাকুরুণ হ'লেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সঙ্গীতাদি হ'লো কলা বিদ্যা বা art এর অন্তর্গত। কাজেই ঠাকরুণের জাতের একটা চেহারা খাড়া করা অসঙ্গত নয়। তবে এটাও ঠিক যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সমস্ত যন্ত্রীদিগের নামের প্রসিদ্ধি আছে, তাহাদের একটীও স্ত্রী নয়, সবগুলিই পুরুষ। আজ কাল আবার Art বলিলে আমরা সকলেই বুঝি History, Logic, Sanskrit কাজেই হয়ত কালে ঐ সমস্ত বিষয়ক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে দেখিব কোনও বিদ্যাধরী ডানা মেলিয়া পৃথিবীর উপর, রতিশক্তি বটিকার ন্যায়, History of Rome, Logic, শকুন্তলা প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের গরদ মটকা, gramophone, wrist-watch, প্রভৃতির বিজ্ঞাপনেও দেখি সেই একঘেয়ে নারী-চিত্র বা বৈচিত্র্য।

ঔষধাদির বিজ্ঞাপনেও নারী-চিত্রের যথেষ্ট প্রাবল্য বা প্রাকট্য দেখা যায়, তবে একটু বিশেষত্ব আছে। বালামৃত বিজ্ঞাপিত করিতে মায়ের কোলে বেশ একটী নধর শিশু দেওয়া হইয়াছে; কেন বাপের কোলে কি বেমানান হইত? অবশ্য বাধকারি, প্রদরারি প্রভৃতি ঔষধ সম্বন্ধে কোনও কথা নাই, কারণ ওসব ব্যাধি অপর পক্ষের একচেটে, উহাতে পুরুষের কোনও প্রকার দাবীদাওয়া, সত্ত্ব স্বামিত্ব বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এজাতীয় বিজ্ঞাপনে নারীমূর্ত্তি থাকাটা relevant ও consistent সন্দেহ নাই; কিন্তু অগ্নিদীপক বটিকার বিজ্ঞাপনে ওটা ঠিক মানানসই হয় না।

বিজ্ঞাপনে নারী-চিত্র দেওয়া ব্যাধিটা যে কেবল আমাদের দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, অন্য দেশেও ইহার যথেষ্ট বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়! গোয়ালিনী মার্কা দুধ, Ovaltine, corns, superfluous

hair, সিগারেট, এমন কি মোটরকার, মোটর টায়ার প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের ঠিক ঐ একই অবস্থা।

এসব ত গেল physical side of the phenomenon; ইহার একটা psychological aspectও আছে। স্থিরভাবে চিন্তা করিলে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয় যে এই বিশাল বিজ্ঞাপনরাজ্যের সিংহাসনে দেবী প্রতিষ্ঠা করিল কে? দেবী স্বয়ংই সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে রণজয় করিয়া রাজ্যেশ্বরী হইয়াছেন, না অপর কোনও ভবানী পাঠক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবীরাণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের জন্য একটু research দরকার। Search করিলেই দেখা যায় বিজ্ঞাপন-দাতা বা বিজ্ঞাপন-লেখক প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ। সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাটা মানবের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে পুরুষেই। "তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" বলিয়া বর্ণনা পুরুষ কালিদাসই করিয়াছেন। যে বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়ে যায়" তিনি পুরুষই। বঙ্কিম বাবুর "রূপের তরঙ্গ"ই বা মন্দ কি? এই ভাবে অনুসন্ধান করিলেই বেশ দেখা যায় যেখানেই নারীরূপ বর্ণনার বাহাদুরী ও মাধুর্য্য, সেখানেই বর্ণনাকারী পুরুষ। পুরুষ পুরুষের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া জোর বলিয়াছেন "খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল", অথচ শ্রীমতী রাধিকার সেই খগচঞ্চু নাসিকাকে বিদ্যাপতি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই:—

"নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলী
ভুজগী নিশাস পিয়াসা।
নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি-সন্ধি নিবাসা॥"

অর্থাৎ লোমলতারূপ সর্প নাভিবিবরে বাস করত। কিন্তু সর্প বায়ুভুক্ ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; তাই নিশ্বাসবায়ু ভোজন করিবার জন্য ক্রমে উর্দ্ধে গমন করিতে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া শ্রীরাধিকার নাসিকার দিকে দৃষ্টি পড়িল এবং উহাকে সর্পভোজী গরুড়ের নাসিকা বলিয়া ভ্রম হওয়ায় ভয়ে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া কুচগিরিদ্বয়ের সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণনাও কম নয়। তিনি বলিয়াছেন "শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে"। বৈষ্ণব কবিরও ঠিক এই ভাবের বর্ণনা দেখা যায়:—

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে॥
কুচ-ভয়ে কমল কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ ভয়ে কনক মৃণালপঙ্কে রহু
কর ভয়ে কিসলয় কাঁপে।

সাহিত্য-জগতে এবম্বিধ রমণীরূপ বর্ণনার অন্ত নাই, এবং দেখা যায় সর্ব্বত্র কবি পুরুষ। নারীর সৌন্দর্য্য, পুরুষের চক্ষে; তাই পুরুষের পক্ষে এবম্বিধ স্বাভাবিক অস্বাভাবিক ভাবে নারীরূপ বর্ণনা করা সম্ভব হইয়াছে। আজকাল সাধারণের নিকট উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের লেখা যে সমস্ত নভেল নাটক সুপরিচিত, সেগুলি পড়িলেই বেশ দেখা যায়, লেখিকা স্ত্রী-চরিত্রের খুঁটিনাটি, মনের ভাব ও বাক্যের ভঙ্গি, সমস্তই বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু রূপবর্ণনার সময় তাঁহাদিগের কলম আর চলে নাই। ইহার একই মাত্র কারণ, রমণী রমণীর সৌন্দর্য্য দেখে না, কেবল নাকই সিঁটকায়, কাজেই বর্ণনা করিতেও পারে না।

এই ভাবে বিজ্ঞাপনদাতাদিগের মনস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে একটা conclusionএ পৌঁছান যায় যে, because পুরুষেরা স্বভাবতঃই নারী-সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও রমণীদিগের দিকে সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, therefore বিজ্ঞাপনে রমণীমূর্ত্তি থাকিলে নিশ্চয়ই সাধারণের দৃষ্টি সে দিকে সহজেই আকৃষ্ট হইবে। বহিস্তত্ত্ব আলোচনা করিলেও মনে হয় Medical collegeএর নিকট footpathএ পানওয়ালার দোকানে tiffin hourএ অতিরিক্ত ভিঁড়টাও বিজ্ঞাপনদাতাগণের চিন্তার বিষয় ছিল। যাহাই হউক না কেন, বিজ্ঞাপনদাতাগণের একটু ভুল হইয়াছিল। কারণ বিজ্ঞাপন যে কেবল পাঠকের জন্যই, পাঠিকার জন্য নয়,

তা ত নয়। এই ভুলটী পরে কেহ কেহ সংশোধন করিয়াছেন ; কারণ দেখি "রতিবর্দ্ধক" প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে যাত্রাদলের বিদ্যাসুন্দরের মত সাজ পোষাক দিয়া যুগল মূর্ত্তির অবতারণা করা হইয়াছে। মনে হয়—"ভবতি বিজ্ঞতরঃ ক্রমশো জনঃ"।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ যদি তাঁহাদের নারী-প্রীতিটা একটু গণ্ডির ভিতর রাখিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে কোনও কথা ছিল না ; কিন্তু তাঁহারা দাঁড়ি-পাল্লা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিত্রে নারী-প্রীতি দেখাইতে গিয়া তাঁহারা নিজেদের দলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি hair oil, soap, essence cream, সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়ম প্রভৃতি সখের ও আরামের জিনিসগুলো ত সবই মেয়েদের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; আবার ঔষধগুলির বিজ্ঞাপনের মধ্যেও একটু বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। Headache cure, Healing balm প্রভৃতি সামান্য সামান্য ব্যাধির ঔষধের বিজ্ঞাপনে রমণী মূর্ত্তির অভাব নাই। কিন্তু শ্বাসারি, কাশারি যক্ষ্মারি, বাতনিসূদন প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে দেখি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ রোগীটি অভাগা পুরুষ ও সালঙ্কারা হাবভাববিশিষ্টা যুবতী পরিচর্য্যাকারিণীটি নারী। তবুও কতক ভাল যে, কঠিন ব্যাধিতে অন্তিমকালে পরিচর্য্যা করিবার ও সান্ত্বনা দিবার একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেখানেই দেখি কুষ্ঠ ও ক্ষত প্রভৃতির বিজ্ঞাপন, সেখানেই দেখি বেচারা পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ ও ক্ষত, বিকৃত বদনে যেন শেষ দিনের অপেক্ষায় বা আশায় আছে। তাহার পরিচর্য্যার জন্য 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' কল্পনা করিতেও বিজ্ঞাপনদাতা কুণ্ঠিত। এটা কিন্তু বাস্তবিকই স্বজাতি-বিদ্রোহ।

শ্বাসারি, কাশারি, যক্ষ্মারি বাতনিসূদন প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে দেখি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ রোগীটি।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতার বেশ একটু sense of proprietyও দেখি এবং সেখানে সুখ্যাতি না করিয়াও পারা যায় না। কোষ্ঠশুদ্ধি মোদকের ও সরলভেদী বটিকার বিজ্ঞাপনে গাড়ুহস্তে ধাবমান পুরুষমূর্ত্তিটা বেশ সুসঙ্গত ও মানানসই হইয়াছে সন্দেহ নাই ; ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই, বরং ব্যবস্থাটা সুখ্যাতিরই কথা। কারণ নারীজাতি স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা ; কাজেই তাহাদিগকে চিত্রক্ষেত্রে দাঁড় করান রুচিবিরুদ্ধ ; বিশেষতঃ ব্যবস্থা করিলে বিজ্ঞাপনদাতার বিরুদ্ধে যে মানহানির বা লজ্জাহানির মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা ছিল না, তাও নয়।

এসব ত গেল কল্পিত চিত্রের কথা। বিলিতি journal গুলিতে আজ কাল horse-race, boat-race, swimm-

ing competition, এবং polo, tennis, প্রভৃতি খেলার যে সমস্ত আদি ও অকৃত্রিম photo দেখা যায়, তাহাতেও দেখিতে পাই মহিলাগণ মহলদিগের অধিকৃত মহল ক্রমেই অধিকার করিতেছেন। ইহার ফলে হয়ত foot-ballএর বিজ্ঞাপনে একদিন দেখিব half-pant পরা কোনও রমণী ধরা-"মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং" করিয়া দক্ষিণ চরণ আকাশের দিকে উঠাইয়া আছেন ও ঊর্দ্ধে একটি foot-ball, তাহার গায়ে লেখা Cleopatra। জানিনা কালে কালে—

"অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি"।

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

হাফ প্যাণ্ট পরা কোনও রমণী ধরা "মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং" করিয়া দক্ষিণ চরণ আকাশের দিকে উঠাইয়া আছেন ও ঊর্দ্ধে একটি ফুটবল—তাহার গায়ে লেখা Cleopatra.

'শতনরী'-সমালোচনা

(প্রতিবাদ)

'উপাসনা'-সম্পাদক মহাশয়,

মাননীয়েষু—

আশ্বিন সংখ্যার 'উপাসনা' দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। স্বনামধন্য কবি যতীন্দ্রমোহনের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ, কবিতা, আলোচনা, চিঠি-পত্র সত্যই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। যে কবি দীর্ঘকাল বঙ্গ-বাণীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া বিচিত্র কাব্য-রচনায় কৃতিত্ব-লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে এইভাবেই সম্মানিত করিতে হয়—এবং আপনি আপনার পত্রিকায় কবি-সম্মান-দানের সে সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া কাব্য-রসিক সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন,—ইহা নিঃসন্দেহ।

'উপাসনা'র এই সংখ্যাতেই কবি যতীন্দ্রমোহনের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁহারই সমসাময়িক কবি করুণানিধানের বিখ্যাত কাব্য-সঙ্কলন 'শতনরী'-সম্বন্ধে যে আলোচনাটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও দেখিলাম। আপনাদের 'পুস্তক-সমালোচনা' 'সমসাময়িক সাহিত্য' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি যত্নসহকারেই পড়ি—সেগুলি বেশ সুলিখিতও হয়; ইহার পূর্ব্বে 'আহরণী', 'অমাবস্যা', 'মরুমায়া', 'দীপান্বিতা' এবং শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কাব্যগ্রন্থ-সম্বন্ধে বিস্তৃত, সরস সমালোচনাগুলি পড়িয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম; আপনি নিজে একজন খ্যাতনামা কবি, আপনার পত্রিকায় কবি ও কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনাগুলিই ত তাহার একটি বৈশিষ্ট্য হইবে—এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকা অনুচিত। কিন্তু, ভাবিয়া দেখিবেন, 'শতনরী' সমালোচনা-কালে বোধহয় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

পত্রিকার আকার-বৃদ্ধি, পূজার ব্যস্ততা, প্রেসের গোলমাল প্রভৃতি নানা কারণ থাকিতে পারে—সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারটিকে অসাবধানতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়! কিন্তু তাহাও একটি ত্রুটি—বিশেষতঃ আপনাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় সে ত্রুটি বড়ই অশোভন হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

ভাষার প্রকাশভঙ্গীর দোষে সমালোচনাটি দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যেমন—"anticlimax-এর গড়ান বেয়ে ভাবটি আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে।"

"করুণানিধানকে appeal করছে বহিঃপ্রকৃতির সমষ্টিগত অস্তিত্বকে, তার অন্তর্লীন কোন নিগূঢ় সত্বকে তিনি টেনে বার করতে পারছেন না।"

"...এই জন্যে সার্ব্বজনীন উপাদান তেমন কিছু নেই।"

"তিনি প্রথমটা মনকে হয়ত বেশ কতকটা অতীন্দ্রিয়তার আভাস দিলেন..."

"একটা transcendent রাজ্যের ইঙ্গিত দিলেন"

"তারপর মেরুদণ্ডের (?) জোরের অভাবে মধ্যপথে এসে কল্পনা didactic আড়ষ্টতা নিলে..."

"কবির হাত থেকে solid কিছু পেতে চা'ন..."

'anticlimax এর গড়ান,' 'নিগূঢ় সত্ব', 'সার্ব্বজনীন উপাদান,' 'হয়ত বেশ কতকটা' 'transcendent রাজ্য,' 'মেরুদণ্ডের জোর' 'didactic আড়ষ্টতা'—প্রভৃতিতে রচনাটি যেমন দুর্ব্বোধ্য, আড়ষ্ট, তেমনি ছাপার ভুলে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ সমালোচকের 'হাত থেকে' আমরাও 'solid কিছু' পাইলাম না। 'শতনরী' গ্রন্থখানি পড়িয়া তিনি ভাবিয়াছেন অথবা শুনিয়াছেন অনেক, কিন্তু 'অনুভূতির দুর্ব্বলতা'য় ও প্রকাশের অক্ষমতায় তাহা তাঁহার হাতে অতি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য বহু অবহেলিত সাধনার মত সমালোচনাও আমাদের দেশে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। কবির কাব্য সাধক-সমালোচকের সমালোচনা ব্যতীত সুপরিচিত এবং পরিপুষ্ট হয় না। কাব্য-সাধনার মত সমালোচনাও একটি সাধনা। 'সহৃদয়' আমাদের দেশে বিরল—সেইজন্য রস-চর্চ্চা ও সাধনার আভিজাত্য বিনষ্ট হইয়াছে। বিদেশী সাহিত্যের রস-বিচার ও প্রাচ্য সাহিত্যের (বিশেষ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের) রস-বিচার-পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান কাব্য-কথা-সাহিত্যের সমালোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু যাহা প্রয়োজনীয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না—সেইজন্য উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা, অবহেলা, মূর্খতায় কবি ও কাব্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। সেইজন্যই পল্লবগ্রাহিতার আড়ম্বরে আমাদের দেশের সমালোচনা-সাহিত্য বাধাগ্রস্ত। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস, শ্রীযুক্ত কালিদাস

রায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখ সুধীবৃন্দ তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে সমালোচনা-সাহিত্যের উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছেন। বিদেশী কাব্য-সমালোচনা জটিল মনে হইলে অন্ততঃ সেগুলির পরিচয় গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

এখন 'শতনরী'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই ভালো। কথায় কথায় আলোচনা দীর্ঘ না হইয়া পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন—করুণানিধানের 'ছন্দ-দোষের কথা মারাত্মক হ'লেও আমরা ছেড়ে দিলাম।' ভঙ্গীটি লক্ষ্য করিবার বিষয়; করুণানিধান যেন অব্যাহতি পাইয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িবেন! আমরা ত করুণা-নিধানের ছন্দোবৈচিত্র্য, নিপুণ শব্দ-শিল্প, স্বচ্ছ বিশদ উজ্জ্বল ভাষার প্রশংসা করি। কাব্যের form বা রূপ-ই ত তাঁহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য; ছন্দোদোষের কথা ছাড়িয়া দিয়া সমালোচক ভুল করিয়াছেন; তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহার শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইতাম।

করুণানিধানের কাব্যে organic unityর অভাব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। অলঙ্কারসন্নিবেশে, বিশুদ্ধ ভাষাপ্রয়োগে, ভাবের অকৃত্রিমতায়, সর্ব্বোপরি সহজ সরল ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে তাঁহার কাব্য রূপেরসে সমুজ্জ্বল। "বর্ষায়" শীর্ষক কবিতাটির সজীবতা, সরলতা এবং ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বস্তু। কবির শিশু-সুলভ সরল দৃষ্টিতে বর্ষার বালিকা-মূর্ত্তি, এবং "কই যায় কানে হেঁটে," "—আনারস-রাজ, পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ" "নেবুর কুঞ্জের মধুর গন্ধ চন্দন-দীঘি পারে" প্রভৃতি বর্ণন-সৌন্দর্য্য বঙ্গ-পল্লীর বর্ষা-দৃশ্যের মাধুরীর সহিত যথার্থ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। অনুভূতি কোথাও দুর্ব্বল নহে—দুর্ব্বোধ্য জটিল জালে আবদ্ধ হইয়া অনুভূতি কোথাও স্বচ্ছতা হারায় নাই,—প্রকাশভঙ্গীর এমন একটি সূক্ষ্ম বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা আর কোন কাব্যে দেখি না—

"বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে মোতির সাতনরী—
কদম-কেশর শিউরে উঠে পড়বে ঝরি' ঝরি'
মাঠের কোণে যা'বে দেখা—
বৃষ্টি-ধারার চিকে ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার পরে নারিকেলের সারি।"

প্রকৃতি তাঁহার চঞ্চল, সরল বালিকা-মূর্ত্তিতেই কবিকে দেখা দিয়াছেন, প্রকৃতির "অন্তর্লীন নিগূঢ় সত্ত্ব"কে টানিয়া বাহির করিবার কাজ কবির নহে তাহা দার্শনিকের।

"সার্ব্বজনীন উপাদান" শব্দটি বোধ হয় universal appeal এর বার্থ বঙ্গানুবাদ।

করুণানিধানের 'উদ্দেশে' শীর্ষক শোক-কবিতাটি আপনার 'উপাসনা'তেই একবার উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল। কবিতাটি প্রথমে মানসীতে প্রকাশিত হয়। প্রিয়-বিয়োগের আর্ত্ত হাহাকারই কবিতাটির প্রাণ :—

"যে দুখ ঘুরিয়া মরে দেহের পাকে
পৌঁছে না আত্মার উপর থাকে —

কবিতাটিতে কবি সে মহা দুঃখের পারাবার উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সে কথা বড় মর্ম্মান্তিক, বড় করুণ এবং সেই কারুণ্যের সাশ্রু প্রতিচ্ছবি এই কবিতাটিতে আমরা পাই বলিয়াই সেটি আমাদের নয়নে অশ্রু টানিয়া আনে। বিশ্ব-জনীনতার দার্শনিক কুয়াসার মধ্যে কবিতাটি হারাইয়া যায় না; তাই বোধ হয় সমালোচক মহাশয় কোন যুক্তি না দেখিয়াই বলিতেছেন —"তবু মৃত্যু (*) কবিতাটি আমাদের ভালো লেগেছে।" দুঃখের বিষয়, কবিতাটির নাম 'মৃত্যু' নয়।

সমালোচক মহাশয়ের "transcendant রাজ্য" এবং "didactic আড়ষ্টতা" আমাদের নিকট আড়ষ্ট রহিয়া গেল। ইহার জন্য তিনিই প্রকৃত পক্ষে দায়ী; সমালোচনা লিখিতে বসিয়া তিনি যে বাণী প্রচার করিতেছেন না— যুক্তি চাই, বিচার চাই, কোনো সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে উদ্ধৃত কবিতাংশ চাই—এ সকল কথা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সে জ্ঞানের কোনো পরিচয় সমালোচনাটিতে পাওয়া গেল না!

"কবির হাত থেকে solid কিছু"র অর্থ সমালোচক মহাশয় কি ভাবে করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কাব্য কবিতা হইতে আমরা "রস"ই গ্রহণ করিতে চাই; "রস" নামক বস্তুটি 'solid' কিনা সে বিষয়ে বিচারের ভার বৈজ্ঞানিকের উপর দেওয়া ভালো। কবি-চিত্ত সমুদ্ভূত কাব্য পাঠক-চিত্তে কি ভাবে লোকের পর লোক অতিক্রম করিয়া 'রস-লোক' বা 'রস-চক্রে' গিয়া পৌঁছে, সে তথ্য "কাব্য পরিমিতি" পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়! তথাপি "solid কিছু"র কোনো কিনারা পাওয়া শক্ত! বোধ হয় সমালোচক মহাশয় নূতন কোনো দার্শনিক তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহু বাদানুবাদ থাকা সত্ত্বেও কাব্য যে তত্ত্ব নয়, একথাটি মানিয়া লওয়া দুঃসাধ্য নহে। অতএব করুণানিধানের কাব্য যে তত্ত্ব না

* কবিতাটী 'মীনু'—'মৃত্যু' নয—মুদ্রাকর-প্রমাদ।—উ: সঃ

হইয়া কাব্য হইয়াছে - সমালোচকের ভাষা হইতে এই তথ্যটি আবিষ্কার করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

নিবেদন ইতি
ভবদীয়—শ্রীঅমিতাভ মৈত্র

[কবি করুণানিধানের 'শতনরী'র সমালোচনা—উচ্চ প্রশংসায় মুখর হইলেও তাহা স্থান-কাল-পাত্রবিচারে যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সংখ্যায় মুদ্রিত করা কখনই শোভন হইত না; গুণাগুণ বিচার করিয়া যুক্তি ও প্রমাণপ্রয়োগে সমালোচনাটি উচ্চ শ্রেণীর হইলেও তাহা যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনাসংখ্যায় মুদ্রিত হইলে আমাদের ক্রটি সমানই রহিয়া যাইত। যাহা হউক অনবধানতার এই ক্রটির জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। আমরা সকলের কাছে, বিশেষ করিয়া 'শতনরী'র প্রবীণ কবির নিকট, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রতিবাদসম্পর্কে অনেক কথা বলিবার আছে।—এখন আমরা এই প্রতিবাদটি নির্ব্বিচারে ছাপাইলাম।—নিরপেক্ষ সমালোচনা অতি অল্প লোকেরই মুখরোচক হয়—কিন্তু তাহার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে একথা অমিতাভ বাবুর উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কবির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রাখিয়াও তাঁহার কাব্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা করা সাহিত্যিক ভব্যতা বা সম্পাদকীয় শিষ্টাচারের বহির্ভূত নহে।—উঃ সঃ]

বীমা-প্রসঙ্গ

আমরা 'নিউ ইন্‌ডিয়া' এসিয়োরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর বর্ত্তমান বর্ষের একখানি উদ্বৃত্ত-পত্র সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।—১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় মোটের উপর চাঁদা আদায়ের বৃদ্ধি ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৫৫৲ টাকা এবং দাবী পূরণে হ্রাস ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৩৭৲ টাকার। ১৯২৯-৩০ সনে নিউ ইণ্ডিয়া এযাবৎ সমস্ত বীমা-কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যবসায়ের অঙ্ককে হার মানাইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে তদপেক্ষাও ব্যবসায় বৃদ্ধি হইয়াছে। বারান্তরে উদ্বৃত্ত-পত্রের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

'গ্রেট ইণ্ডিয়া' ইন্‌সুরেন্স লিমিটেড-এর সম্পর্কে হাওয়ান ইন্‌সুরেন্স জার্ণালে প্রকাশিত একখানি পত্র বিষয়ে আমাদের মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম। তদুত্তরে আমরা কোম্পানীর নিকট হইতে একখানি পত্র ও তৎসহ 'হাওয়ান ইন্‌সুরেন্স জার্ণাল'-এর পত্রের প্রতিবাদার্থ মুদ্রিত একখানি ইস্তাহার পাইয়াছি।

বাংলাদেশে যতগুলি ভারতীয় বীমা কোম্পানী ব্যবসায় করিতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই অবাঙ্গালী। বাঙ্গালী জনসাধারণের মনে ক্রমেই এই ধারণা পুষ্টিলাভ করিতেছে যে বীমা-ব্যবসায়ে বাঙ্গালার কৃতিত্ব বোম্বাই কিম্বা মাদ্রাজ অপেক্ষা কম। 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ' এর ব্যবসায়বৃদ্ধির পরিমাণে জনসাধারণের এ বিশ্বাস দূরীভূত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 'ন্যাশন্যাল' হাত বদ্‌লাইয়াছে। অপরাপর বাঙ্গালী কোম্পানীর এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে।—নব-সূচিত 'মেট্রোপলিটন'-এর এদিক দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে।

'স্বদেশ' পত্রিকা 'উপাসনা'র 'এসিয়াটিক'-এর আলোচনা নিয়া ব্যঙ্গ-রস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। উপাসনা-সম্পাদককে বীমাবিদ্ একচুয়ারী পদদানের জন্য তিনি অনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বীমা-কোম্পানীকে পত্রিকা মারফৎ আবেদনও করিয়াছেন দেখিলাম। বন্ধুজনের এ প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। ইতিপূর্ব্বে তিনিই কিন্তু লিখিয়াছিলেন—"উপাসনার কবি সম্পাদকের নিকট আমরা 'জীবন-বীমা'র বৈজ্ঞানিক দিকের আলোচনা প্রত্যাশা করি না।" যাহা প্রত্যাশা করেন তাহার একটী তালিকাও দিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে—। 'গাল্পিক-সম্পাদক' বন্ধুর সে আকাঙ্ক্ষা আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়া লজ্জিত আছি। কিন্তু 'স্বদেশ'কে পত্রিকা-পরিচালনার একটী অতি প্রাথমিক 'সাধারণ উপদেশ' আমরা শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে বাধ্য হইতেছি—সেটি এই যে প্রত্যেক কর্ম্ম-ক্ষেত্রেরই স্তর বিভাগ আছে—জীবন-বীমার চীফ্ এজেণ্ট হইতে হইলে যেমন প্রথমতঃ ন্যূনপক্ষে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকার কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া—বহু বর্ষের পরিশ্রমে তবে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়, তেমনই পত্রিকা-পরিচালন-ক্ষেত্রে রুচির দিক দিয়া, পরিচালন-দক্ষতার দিক দিয়া ক্রমশঃ এমন একটি স্তরে পৌঁছিতে হয় যেখানে সম্পাদকীয় পদের মর্য্যাদা স্বগুণলব্ধ হইয়া পড়ে। তা' ছাড়া শ্রেষ্ঠ পত্রিকা সম্পাদন করিবার সাধু ইচ্ছা পোষণ করিলে পত্রিকায় অভব্য ও অযথা ইঙ্গিত সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ পাইয়াছি :-

চৈতালী-ঘূর্ণী (উপন্যাস)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচমিশেলি (সাহিত্য-রচনা)—শ্রীঅবনীনাথ রায়।

উদাসীর মাঠ (গল্প গুচ্ছ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

বাস্তবিকা (ব্যঙ্গ-সাহিত্য)—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।

ভাদুড়ী মশাই (উপন্যাস)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি।

আগামী সংখ্যায় পুস্তকগুলির সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
2, Wellington Lane, Dharamtala, Calcutta.

UPASANA—Regd. No. C. 1695.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা]

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—

২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

কে, সি, বসুর বার্লীর নূতন পরিচয় আর কি দিব ?

(মেসিনে প্রস্তুত ও হস্তদ্বারা পৃষ্ট নহে)

K.C. BOSE & CO'S INDIAN

৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

এ যাবৎ

খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা

সাধারণতঃ এই বার্লীর ব্যবস্থা দিয়া

আসিতেছেন।

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY
1lb. net
Prepared only of Genuine & Selected Grains.
K.C. BOSE & Co.
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA
TO REMOVE COVER CUT ROUND TOP OF LABLE WITH PENKNIFE

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য !

জানা জিনিষ ব্যবহার করুন !

কে, সি, বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টিম বিস্কুট ও বার্লী ফ্যাক্টরী, কলিকাতা

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত করে, হজম-ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার- কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং—গিরগাঁও, বোম্বাই।

বিষয়-সূচী

অগ্রহায়ণ—১৩৩৮

কালিপুর-আশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ ঃ—

পুস্তকের নাম	মূল্য	লেখক
১। জগৎস্বপ্ন		শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ
২। ক্ষেপীর খেয়াল	৷৷০	যোগেশ্বরী সরস্বতী
৩। তত্ত্বকথা	১৷৷০	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রফেসার
৪। ঐ ২য় খণ্ড	১৲	„ „
৫। সদ্‌গুরু ও রাজযোগ	১।০	শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস বি, এ
৬। সত্যযুগ	৷৷০	„
৭। ঋষিযোগে স্মৃতি	১৲	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় বি, এ
৮। মুমুক্ষুর বিচার	৷৷০	শ্রীপ্রতিভা সাংখ্যশাস্ত্রী ও শ্রীযোগেশ্বরী সরস্বতী
৯। পূর্ণানন্দের প্রলাপবাক্য	১৲	শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
১০। ঠিক বেঠিক	৷৷০	
১১। রামপ্রসাদের 'মা'	৷৷৵০	
১২। উপদেশাবলী	৷৷০	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
১৩। আশ্রম চতুষ্টয় (ব্রহ্মচর্য্য)	৸০	„ সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী
(ছাত্রজীবন) ছাত্রদের জন্য	৷৷০	কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ
১৪। তত্ত্ব-সঙ্গীত	৴০	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত

আশ্রমাচার্য্য—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, কালিপুর আশ্রম

কামাখ্যা (পোঃ), কামরূপ (আসাম)।

বালজাক

পুতুলের চোখে

যেমন খুসী যা' তা' চশমা পরালেই চলে

কিন্তু
আপনার চোখের চশমা দিতে
হ'লে যে সব নোতুন যন্ত্র
বেরিয়েছে তাই দিয়ে
সূক্ষ্ম পরীক্ষা করা দরকার।

আবার
এই সব যন্ত্র ব্যবহার ক'রতে হ'লে
চোখের শারীরতত্ত্ব আর
আলোক-বিজ্ঞান ভাল
ক'রেই জানা চাই।

আমাদের
পরীক্ষাগারে জগতের
ভিন্ন ভিন্ন দেশের
সেরা যন্ত্র আছে।

—০—

আমাদের
পরীক্ষার ধারা একেবারে
নোতুন ধরণের। এর
তুলনায় আগের প্রথা
একেবারে ছেলে-খেলা।

প্রেসিডেন্সী ফার্ম্মেসী

বসু এণ্ড সন্

চক্ষু-পরীক্ষক ও চিকিৎসক

২০৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ১৭৪২

১৬৭, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

২৪শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ | ৮ম সংখ্যা

সর্ব্বহারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নবীন সূর্য্যের আলো, খর-রশ্মি দ্বিপ্রহর দিবা
বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে চিরদিন হয়েছে মলিন,
সর্ব্বসহা পৃথিবীর কলঙ্কের সীমা আছে কিবা
উদ্ধত পতাকা তলে দম্ভ যদি রহে সমাসীন!

বিপুলা পৃথ্বীর ভার চিরন্তন সহিছে বাসুকী,
দরিদ্র বলিয়া তবু নির্য্যাতন সহিতেছে যা'রা,
তা'দেরই বিক্ষোভ-তাপে বিদীর্ণ সে বজ্র অগ্নিমুখী
নিরন্ধ্র, এ অন্ধকারে উন্মুক্ত করিবে রুদ্ধ কারা।

অনন্ত দুর্য্যোগ রাত্রি,—দুর্গম বন্ধুর পথ বাহি'
যা'রা আজ চলিয়াছে দীপ্ত দীপ বক্ষে আগুলিয়া,
নবীন প্রভাতে তা'রা সাম্যের বিজয় গান গাহি'
দাঁড়া'বে মন্দির-তলে,—আর্ত্তধ্বনি যাইবে থামিয়া।

সহস্রের কণ্ঠে কণ্ঠে জয়োল্লাস উঠিবে আকাশে,
বিকলাঙ্গ দরিদ্রের পদ-ভরে পৃথ্বী টলমল,
হীন দম্ভ ধূলি হ'য়ে নিরুপায়ে উড়িবে বাতাসে
বহিবে পাষাণ ভেদি' করুণার অশ্রু সুনির্ম্মল!

দেবতারে দূষেনাক', হাস্য-মুখে করিছে বরণ
দুর্ভাগ্যের পরিহাস,—অগ্রসরি' চলিছে সম্মুখে,
পীড়নের অস্ত্রাঘাত দুই হাতে করি' সম্বরণ
সত্যের আশ্রয়ী তা'রা উচ্চ-শির দাঁড়াইবে রুখে।

আঘাত সহিয়া বুকে আপনারে চিনিয়াছে তা'রা,
নিষ্ঠুর নিয়তি সনে অনিবার্য্য তাদের সংগ্রাম,
আপনারে রিক্ত করি' উৎপীড়িত যা'রা সর্ব্বহারা
মানব-জাতির বুকে লেখা র'বে তাহাদেরি নাম।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যাম চলিয়া গিয়াছে। রাজু তাহার সেই চাটাই-খানির উপর বসিয়া ভাবিতেছে; "শেষে কি এই করিলাম, কাজটা কি ঠিক হইল, কেনই বা এইরূপ হইল?" রাজু যদি শিক্ষিত হইত তাহা হইলে এই সময় সে নিজেকে নানা বাছাবাছা কঠোর বিশেষণে বিভূষিত করিয়া তৃপ্তি পাইত কিন্তু শত চেষ্টাতেও নীচতা বা বিশ্বাস-ঘাতকতার আরোপে কৃতকার্য্য হইত না; তাহার অন্তর হইতে অদৃশ্য কেহ তাহার কার্য্যের সমর্থন করিতেছিল; তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্ম-পীড়ার কারণ, নিজের দৌর্ব্বল্যের জন্য লজ্জাধিক্যর; এই অহেতুক দৌর্ব্বল্য তাহার নিজের মধ্যে এতদিন কোথায় এমন ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল—যাহা দিনেদুপুরে ভেল্কীবাজির মতন দুর্ব্বোধ্য! শ্যামের স্বাধীনতালাভ, তাহার কার্য্যের ফলে সে সুখী—বন্দী অপেক্ষা প্রহরীর যাতনা অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। শূন্য-নয়নে সময়ের প্রতি লক্ষ্য নাই, শ্রীনগরে অতঃপর কি ঘটিবে, কে কি ভাবিবে, সেখানে তাহার দ্বার চির-রুদ্ধ হইল কি না এই সব আবোল্‌তাবোল্; ভিতর হইতে একটা সংকল্প ধীরে পরিস্ফুট—কর্ত্তার নিকট যাইয়া সে আত্ম-সমর্পণ করিবে; তিনি যে শাস্তি দিবার হয় নিজে দিবেন, তিনি ছাড়া জগতে তাহার আপনার কেহ নাই। নিশ্চয় তিনি পুলিশের হাতে তাহাকে দিবেন না। হারাধনকে কাহার কাছে রাখিয়া সে জেলে যাইবে? হারাধনের প্রতি একটা মনের মধ্যে স্বাধীন করুণার ভাব আজ তাহার নিকট আত্ম-পরিচয় দিল। অবশেষে রাজু উঠিয়া নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময়ে অদূরে ক্রীড়ারত হারাধন চীৎকার করিয়া রাজুর দিকে দৌড়াইয়া আসিল, কি একটা জানাইবার বিপুল অথচ নিস্ফল চেষ্টায় তাহার মুখ বিকৃত; রাজু প্রথমে ভাবিল বন্য জন্তু হইবে। হাতের দা হাতে রহিল, চক্ষের পলকে হারাধনকে পিঠের উপর ফেলিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল—কিয়দ্দূরে কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি—

দারোগা—হাঁা! আর ওই ধীরেন মণ্ডল লাঠি হাতে; দারোগার হস্তে বন্দুক।

একজন কনষ্টেবল হাঁকিল "হুজুর—আসামী।" রাজু দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া উঠিল।

দারোগা বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এক পা নড়লেই গুলি কর্ব্ব।"

উত্তরে রাজু এক লম্ফে অশ্বত্থের মোটা গুঁড়ির আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া—দক্ষিণ মুখে, গাছকে আড়াল রাখিয়া ঝড়ের বেগে দৌড় দিল।

দারোগা বাবু শ্রীনগরে বদলি হইবার পূর্ব্বে যে-থানা অলঙ্কৃত করিতেন, সেখানে 'বেশ দু-পয়সা' ছিল, ফলে ব্যয়বহুল কতকগুলি অভ্যাসের তিনি দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীনগর তাঁহার অপ্রীতিকর, ইন্দ্র সরকার তাঁহার পদ-মর্য্যাদা স্বরূপ যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা পরিমাপে অনুগ্রহের দান মাত্র; স্বীয় প্রতাপে কম্পিত-হৃদয় পক্ষগণের নিকট নজর আদায় তাঁহার শ্রীনগর-অভিজ্ঞতায় দুর্ল্লভ। ধীরেন মণ্ডলের নালিশ গ্রাহের মধ্যে আনিতে তিনি প্রথম প্রণোদিত হইলেন। অক্ষয়ের আকস্মিক জমিদারী সেরেস্তায় প্রতিষ্ঠা ও চন্দ্রপাঠকেরর অর্থব্যয়ে ইচ্ছা-দর্শনে মনে করিলেন বুঝি এতদিনে বিধি মুক্ত-হস্ত হইবেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে সেই দুই জনের মতপরিবর্ত্তনে, বিধিকে আবার বাম দেখিয়া তাঁহার চিত্তে ক্ষোভ ও মানব-চরিত্রের উপর ঘৃণা জন্মিল।

এই সময় ধীরেন আসিয়া নিবেদন করিল—গরীবের মতের স্থিরতা আছে। দারোগা বাবুর লুপ্ত উদ্যম আবার ফিরিয়া আসিল; ফরিয়াদীর যখন দৃঢ়তা আছে তখন চিন্তা কি? সরকারী কর্ত্তব্য একটা আছে, বেসরকারী লাভের আশাও অল্প নহে—পাঠকের ন্যায় দারোগাও মৃতা হরিমতীর অপহৃত ধনরত্নের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহা হস্তগত করিবার নির্য্যাতন-প্রণালীও তাঁহার আয়ত্ত,—একবার রাজুকে পাইলে হয়। অগ্নিকাণ্ডের পরের দিন

ধীরেন সংবাদ আনিল রাজু জঙ্গলে লুকাইয়া আছে, চেষ্টা করিলেই ধরা পড়িবে। দারোগা বাবু ধড়াচুড়া আঁটিতে সেইদিন হইতেই আরম্ভ করিলেন—অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে—পাঠকের গোলা নষ্ট হইয়াছে। একটা না একটা ফেরে রাজু পড়িবেই—তখন? তিন চারিদিন পরে পাঠক মাড়োয়ারীর নামে টাকাচুরীর মামলা করিল। অবিলম্বে তদন্তের জন্য অনুরোধ করিয়াও সামান্য জলপানি দিয়া গেল—এই তদন্তও সেই জঙ্গলে। দারোগা বাবুর ভাগ্য-লক্ষ্মী ওই জঙ্গলেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন নিশ্চয়। Emergency work এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া দারোগা বাবু সদল বলে পথ-প্রদর্শক ও উৎসাহীরূপে ধীরেনকে সাক্ষী করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাই ব্রজকিশোরের পক্ষ হইতে শ্যামের আকস্মিক নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা ডায়েরী করাইতে আসিয়া—থানা বন্ধ দেখিয়া অক্ষয় ফিরিয়া গেল।

দুইদিন ধরিয়া জঙ্গল ঝাড়িয়া তাহারা মাড়োয়ারীকে পাইল বটে কিন্তু সে আধখানা মাড়োয়ারী। নোটের পোঁটলা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, বেশ ছিন্ন, মূর্ত্তি উদ্‌ভ্রান্ত, দেহযষ্টি কম্পমান। মাড়োয়ারী বনের মধ্যে পথ হারাইয়াছিল, দিগ্‌ভ্রম হইয়া ভয়ের তাড়নায় কেবল ছুটিয়া বেড়াইয়াছে—দিনে ঝোপের মধ্যে খস্ খস্ শব্দ হইয়াছে, নদীতে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যাইবে, পশ্চাতে যেন গুরুভার দেহবিশিষ্ট জীবের সতর্ক গতিশব্দ; তৃষ্ণা নিমেষে শুকাইয়া গেল, মাড়োয়ারী দৌড়াইতেছে; রাত্রে বৃক্ষশাখার সন্ধিস্থলে নিরাপদে নির্ব্বাচিত বিশ্রাম-স্থান, নিদ্রাদেবী পরিশ্রান্তের আবেদন সবেমাত্র মঞ্জুর করিয়াছেন, বৃক্ষের শাখান্তরালে যেন অশরীরী এক মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, মাড়োয়ারী বৃক্ষচ্যুত হইয়া ছুটিয়াছে; ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, রাজুপ্রমুখ দস্যুগণ, ভূতপ্রেত কবন্ধ মাড়োয়ারীকে অহর্নিশ তাড়া করিয়া দৌড়াইয়াছে; কোথায়, কোন্ দিকে, কতক্ষণ, মাড়োয়ারীর সে সংজ্ঞা আদৌ ছিল না। পুলিশের হাতে পড়িয়া সে বাঁচিল; সময়োচিত সম্ভাষণ আপ্যায়ন ও হস্তে রজ্জু বন্ধন সমাপন হইলে তাহার ধড়ে প্রাণ, কণ্ঠে ভাষা আসিল। "যো করে রামজী" এই বলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইল।

সুলভ এবং প্রাথমিক উপায়ে তাহার চৈতন্য সম্পাদন হইলে প্রশ্নে প্রশ্নে এইটুকু জানা গেল যে, রাজু এই জঙ্গলেই আছে, পাঠকের টাকাটা রাজুই চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে, কি কানন-পর্য্যটনের সময় কোথাও অসাবধানে ন্যস্ত হইয়াছে, মাড়োয়ারী তাহা দারোগা বাবুর অনুমানের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত; অপরাধীর সংখ্যাবর্দ্ধনে জনকরা অপরাধ ভাগে কমিয়া যায় এইরূপ একটা আইন-বিরুদ্ধ অথচ চিরপ্রচলিত বিশ্বাস বোধ হয় তৎকালে তাহার মনোরাজ্যে অবস্থান করিতেছিল। দারোগা বাবু টাকার গন্ধে আত্মহারা; সরকার বা পাঠক একদিকে ও অন্যদিকে স্বয়ং, ইহাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা কি অনুপাতে হইবে, তাহারই কল্পনা সাদরে নিমন্ত্রিত। ধীরেনের উৎসাহ সীমাহারা, তাহার অনুমান অব্যর্থ হইয়াছে, আর চির-লাঞ্ছিত চির-পরাজিতের মনে আশু নির্য্যাতন করিবার সুযোগ ও জয়ের নিশ্চিত আশায় একটা মত্ততা আছেই। মাড়োয়ারী নানারূপ বিচিত্র বন্ধন-কৌশলের নমুনাস্বরূপ একজন সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলে অমিতবিক্রমে অনুসন্ধান পুনরায় আরম্ভ হইল।—অরণ্যের যে অংশে মাড়োয়ারী ধরা পড়িল, সেটী ছোট নদীর বাম দিক ও অল্প-পরিসর; দারোগার আদেশমত আরও একদিন সেই স্থানটী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, নদীর অপর পারের গভীরতর অরণ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। দুই দিন পরিশ্রমের পর ব্যর্থতা ও ক্লান্তিজনিত পরস্পরের সাহচর্য্যে তিক্ততা যখন সকলকে অভিভূত করিতে উন্মুখ সেই সময় ধীরেন একটী সূত্র বাহির করিল; সেই ক্ষীণ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া তাহারা অবশেষে দেখিল, রাজুর কুটির—তাহার পর রাজু ও হাবাধন।

রাজু শাসনবাক্য ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যখন দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, তখন প্রথমে দারোগা বাবু বন্দুক উদ্যত করিলেন, কিন্তু মানুষের উপর গুলি চালান, বিশেষতঃ যাহারা প্রথম এই কার্য্য চেষ্টা করে, তাহাদের পক্ষে কত কঠিন দারোগা বাবু বুঝিলেন। প্রাণের প্রতি সম্ভ্রম-বৃদ্ধি সভ্যতার একটি লক্ষণ; দারোগা বাবু বন্দুক নামাইয়া হুকুম দিলেন, "পাকড়ো"; মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে ধীরেন তীরের মতন ছুটিল, কনেষ্টবল দুইজন তাহার

অনুগামী হইল।—জীবের পশ্চাতে তাড়া করার একটা নেশা আছে, আদিম মানবের আহার-সংগ্রহ-প্রথা হইতে বোধ হয় মানুষের স্বভাবে একটা বিশেষ উপাদান মিশিয়া গিয়াছে—মৃগয়ার আমোদ তাহারই সাক্ষ্য দেয়—সুযোগ পাইলেই অন্তরের আদিম বৃত্তি সভ্যতার বল্গা দাঁতে চাপিয়া আপন পথে দৌড়াইতে পারে।

রাজু একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে হারাধনকে কোমরের গামছা দিয়া পৃষ্ঠে জোরে বাঁধিয়া লইয়া আবার দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধাবমান হইল; লক্ষ্য বড় নদীর দিকে স্থির—মধ্যে নদীর ব্যবধান আনিতে পারিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবার আশা। রাজুর আর একটা উদ্দেশ্য, ধীরেন ও অন্য দুই জনের মধ্যে দূরত্ব যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করা, কারণ নদীতীরে তাহাকে একা পরাজিত করিতে বিলম্বও হইবে না এবং নদী পার হইয়া পুলিশের হাত এড়াইবার সুযোগও পাওয়া যাইবে। ধীরেন যে অনতিবিলম্বে তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহ। রাজুর গতি বন্য মহিষের ন্যায়—দ্রুত হইলেও পৃষ্ঠে বোঝা থাকার জন্য স্বচ্ছন্দ নহে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্রমে বিস্ফারিত নয়ন, ওষ্ঠাধর দৃঢ় সংকুচিত; আর ধীরেন দৌড়াইতে বাঘের ন্যায় লম্ফে লম্ফে, কখন বা উন্মুক্ত স্থানে লাঠির উপর ভর দিয়া, তাহার চক্ষু ক্রূর উল্লাসে অর্দ্ধ নিমীলিত, কিন্তু আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ঈষৎ উন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের ফাঁকে বিকশিত দন্ত, হিংস্র জন্তুর ন্যায়—ধীরেন বৃদ্ধ না হইলে পাল্লা এতক্ষণ চলিত না। ভীত চকিত এক দল বুনো শূয়োর রাজুর পাশ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, অগ্রে বরাহ-মাতা বিপুল দেহ লইয়া ইঞ্জিনের মত বাঁশী বাজাইয়া ছুটিয়াছে, পশ্চাতে শাবকের ট্রেন; একটা গুরু পতনশব্দে রাজুর গতিরোধ হইল। পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে দেখিল —ধীরেন শূকর পরিবারকে পাশ দিতে গিয়া বেগ সামলাইতে পারে নাই, পড়িয়া গিয়াছে—আর অদূরে বরাহ-পিতা, মাটিতে তীক্ষ্ণ দন্তের শান্ দিতেছে। শত্রুর শেষ সম্বন্ধে, চাণক্য পণ্ডিতের অভিমত বোধ হয় বরাহ-পুঙ্গবের মানস-পটে তখন জাজ্জ্বল্যমান।

বিচারের সময় নাই। পরিণাম-চিন্তারও সময় নাই; ধীরেনের হস্তচ্যুত লাঠি তুলিয়া রাজু বল্লমের মত ধরিল ও পিছনের পায়ের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল —সঙ্গে সঙ্গে একটা বরাহ আসিয়া লাঠির অগ্রে পড়িল। লাঠি দ্বিখণ্ডিত, বরাহ লক্ষ্যান্তর হইয়া অবাধে সমবেগে ও আক্রোশে ছুটিল আর রাজু ধরাশায়ী হইল। প্রথম উঠিল ধীরেন, তখন কনষ্টেবলদ্বয়ের চীৎকার অদূরে শুনা যাইতেছে। ধীরেন রাজুর 'দা'খানা কুড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"আর পালাবে কোথায়? এখন ধরা দাও।" রাজু তখন কনুইয়ের উপর ভর দিয়া মূর্চ্ছিত হারাধনের আঘাত কতখানি লাগিয়াছে তাই দেখিতেছিল; ধীরেন অগ্রসর হইতেছে—তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুলের উপায় নাই তথাপি রাজু উত্থান-চেষ্টা মাত্র করিল না; ধীরেন নিকটে একেবারে তাহার উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। খুনের আগুণ তাহার চক্ষুতে ধক্‌ধক্ করিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে রাজু এক প্রচণ্ড পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; সিপাহী দুই জন তখন একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে ভাঙ্গা লাঠির একটুকরা ছিল; সম্মুখবর্ত্তী সিপাহীর মুখ লক্ষ্য করিয়া রাজু সেই লাঠি নিক্ষেপ করিয়া অদূরে নদী-তীরলক্ষ্যে আবার ছুটিল। কিন্তু বিলম্বে তাহার সুযোগ এখন তিরোহিত; তথাপি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এই ভাবে সে ছুটিয়াছে। ধীরেন আহত শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। তাহার মধ্যে তখন মানুষ বলিয়া কোন জীবের লেশমাত্র অবশিষ্ট নহে; একধারের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সিপাহীদেরও রক্ত গরম।

নদীর ধারে আসিয়া রাজু আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল; সেখানে পাড় অতিশয় উচ্চ, সহজ অবতরণের কোনও উপায় নাই। পৃষ্ঠে মূর্চ্ছিত বালকসহ ঝম্প-প্রদান নিজের পক্ষে না হইলেও বালকের পক্ষে অবধারিত মৃত্যু। পশ্চাতে নদী, সম্মুখে হিংস্র পশুর ন্যায় আততায়ী; রাজু নিকটে পতিত একটি শুষ্ক বৃক্ষের গুঁড়ি দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। সবল তাহার চক্ষের ভাষা। অগ্রসর হইলেই প্রথম জনের মস্তক সেই বিশাল গুঁড়ির আঘাতে চূর্ণ হইবে জানিয়া সিপাহীরা থমকিয়া দাঁড়াইল; ধীরেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল।

তাহারা কতক্ষণ এই ভাবে থাকিত, পরিণামই বা কিরূপ ধরিত তাহা চিরকালের জন্য 'হইতে পারিত'র মধ্যে রহিয়া গেল। নদীর তীব্র উচ্ছ্বসিত স্রোতে সেই সময় নিকটের পাড় খানিকটা ধ্বসিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাজু টাল সামলাইতে না পারিয়া, ঘুরিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া গেল।

কনষ্টেবল দুইজন আতঙ্কে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, ধীরেনের শূন্য দৃষ্টি বিরাট শূন্যে কি যেন খুঁজিতেছে। ভ্রুক্ষেপহীন নদী আপন গতিতে, আপন পূর্ণতায়, আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে আত্মহারা—দৃক্-পাতও নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে ললিত থিওফিল গতিয়োর 'মাম্‌সেল দিমপিন্' পড়িতেছে; এইবারেই সে এফ-এ, পাশ করিয়াছে। সুধীর বাবু মোহন সুচারু বেশে, বিলাতী এসেন্সের গন্ধ বাহিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ঘর-টি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"—তোমার মা চিঠি দিয়াছে—তোমার বাপের বড্ড অসুখ—পত্রপাঠ যেতে; তুমি যাবে কি? আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেণ ধরব, হোক্ প্যাসেঞ্জার—আমার রাত্রি ছাড়া ট্রেণ ভাল লাগে না; দিনের বেলা দাঁত-বার-করা ষ্টেসনগুলো প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে থাকে। চারু আমায় যেতে লিখেছে। নীচে একটু পুনশ্চ দিয়ে তোমার যাবার কথা আছে, বোধ হয় কর্ত্তা শিখিয়েছেন—এক ছেলে, দেখতে প্রাণ চাইবে বই কি! হাঃ হাঃ হাঃ।"

সুধীর বাবুর ইচ্ছা নয় যে ললিত সাথী হয় সেই জন্য শেষের দিকটায় একটু শ্লেষ ছড়াইয়া বক্তব্য শেষ করিলেন, কিন্তু ললিত তাহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিয়াছে। মর্ম্মে আঘাত লাগিল যতটা, সুধীর বাবুকে ক্ষুন্ন করার লোভ তদপেক্ষা অধিক, সে বলিল, "আমি যাব—ষ্টেসনে দেখা হবে এখন।" "তাড়াতাড়ি একটু বেরিও" এই বলিয়া সুধীর বাবু বিদায় হইলেন।

ষ্টেশনে যথা সময়ে গিয়া ললিত দেখিল, একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় সুধীর বাবু মুটেদের মাথা হইতে দুইটী কেস্ নামাইতেছেন; আবাল্য-পরিচিত এই কেস সুধীর বাবুর শ্রীনগরযাত্রার অবশ্য সহচর ও তাহাদের অবার্থ পরিণাম ললিতের অজ্ঞাত নহে; সেই জন্য সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বাবার অসুখ যে।"

সুধীর বাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সস্নেহে একটি কেসের উপর চাপড় মারিয়া বলিলেন, "অসুখেরই দাওয়াই যে!" তারপর সম্মুখে উপবিষ্ট ললিতকে নিরুত্তর দেখিয়া এবং নিজের মন্তব্যের যোগ্যতর সমর্থন প্রকাশ করিতেই হউক অথবা নীরবতা অস্বচ্ছন্দতার অপনোদনার্থেই হউক বলিতে লাগিলেন, "সব credit এ বুঝলে? তোমার বাবার এই credit আমিই পড়ে হড়ে করে দিইছি—নইলে সহর আর পাড়াগাঁ—কেউ বা পোঁছে?—হাঁ আর ব্যবসাদার বটে এই সাহেবরা;—আমাদের দেশে ধারে জিনিষ বেচবে তো মাথা কিনে নেবে যেন, দোকানদার নাক সিঁটকে ভাববে অধমর্ণ, খাতক—অধম; আর তাদের কাছে ধার দেওয়া মানেই খাতির করা—এমন কি একটা লোককে প্রশংসা কর্ত্তে হলেই বলবে লোকটার credit ভাল, বাজারে বেশ credit আছে; বেশ ধার পায় এই ওদের পরথ; খাতা পত্রেও দেখ বাঁয়ে ডাইনের তফাৎ—তোফা জীতা রও বাবা সাহেব। সব বিষয়ে তারা সেরা, আমরা তাদের বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলের নখ।"

ললিত সহ্য করিতে পারিল না; রাগের জোয়ার আটকাইয়া সে বলিল—"ভারি ভাল সাহেবরা; সাহেবরা বাঙ্গালীর চেয়ে নিশ্চয়ই হীন। আমরা বুঝিনা জানিনা তাই।"

সুধীর বাবুও একটা উত্তর দিয়াছিলেন কিন্তু ললিত আর বাদানুবাদ করিল না। গতিয়ো খানা সে পথের খোরাক্ হিসাবে সঙ্গে আনিয়াছে—তাহারই পৃষ্ঠাবিশেষে তাহার মনটা আটকা পড়িয়া আছে। সুধীর বাবুও নিজের পথের খোরাক্ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকটী সোডার বোতল ও সোডাকে রঙ্গীন করিবার জন্য অন্য তরল পদার্থের বোতল। সমস্ত পথটা একটা ভাষা ভঙ্গীহীন সংগ্রামে অতিবাহিত হইল।

ভোরে পাল্কীতে উঠিবার সময়, সুধীর বাবু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"তোমাদের ইন্দ্র সরকার কিন্তু ফাঁপরে পড়বে। সকালে উঠে শুনবে, চিড়িয়া উড় গয়া - হাঃ হাঃ ভারী ঘোড়েল বুড়ো, কিন্তু আমার কাছে নাকের জলে চোখের জলে, হাঃ হাঃ—এখন ক'দিন কলকাতায় বসে বসে আঙ্গুল কামড়াক, যে কলকাঠি করে এসেছি বাছাধন কলকাতা ছেড়ে নড়তেও পার্ব্বে না।" ইন্দ্র সরকারের কলিকাতাগমনের বার্ত্তা ললিতের অজ্ঞাত কিন্তু স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থেও সে সুধীর বাবুর সহিত, বিশেষতঃ এই অবস্থায় বাক্যবিনিময় করিতে প্রস্তুত নহে। সদরের গোমস্তার ইঙ্গিতে বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে তুলিল।

ব্রজকিশোরের অসুখ বেশ বাড়িয়াছে; মুখে সে মত কেহ ব্যক্ত না করিলেও, সকলেই অন্তরে বুঝিতেছে—অসম্ভবরূপ বাহ্যিক পরিবর্ত্তন চক্ষু এড়াইবার মত নহে। মানুষটা যেন ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের স্থানে স্থানে মাংস দলা পাকাইয়াছে। বাহুর চর্ম্ম শিথিল ও লোল; মুখভাব বেদনাজ্ঞাপন আবার অনুকম্পার উদ্রেকও করে; কবিরাজ মহাশয় অম্লশূলের চিকিৎসা করিতেছেন, এখন শয্যাত্যাগ পর্য্যন্ত কষ্টকর বলিয়া ব্রজকিশোরের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে তাঁহার সদরের প্রিয় শয়ন-কক্ষেই রাখা হইয়াছে। দেহের রোগ এখন আত্ম-প্রকাশে সঙ্কোচহীন; প্রতি অবয়বে, প্রতি জীবন-কেন্দ্রে তাহার করুণ কুৎসিত কালিমাখা পতাকা উড়াইয়া স্বীয় অধিকার ঘোষণা করিতেছে—রূঢ় রুক্ষ তাহার ভাষা, কঠোর কর্কশ তাহার স্বভাব

শ্যামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যেদিন সফল হইয়াছিল, সেই দিন অধিক রাত্রে যখন চাকর আসিয়া জানাইল যে ছোট বাবুকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তখন ব্রজকিশোর প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং স্বস্তি অনুভব করিলেন—কিন্তু তাহা যেমন অলীক সেইরূপ ক্ষণিক। অনুশোচনার বীজ চক্রান্তের প্রথম হইতেই উপ্ত ছিল এখন ক্ষণে ক্ষণে নব নব শাখাপল্লব-বিস্তারে বিচিত্র বিশাল মহীরুহে পরিণত হইতেছে। এক শ্রেণীর চিন্তার উগ্রতা লয় হইতে না হইতে আর এক শ্রেণীর উৎকট চিন্তা আসিয়া তাহাদের প্রকোপে রুগ্ন দেহ মনকে বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে। সুধীর বাবুর টাকা সংগ্রহের সামর্থ্য বা চেষ্টা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও, টাকার জন্য তিনি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ততটা উদ্বিগ্ন নহেন; মুক্তিলাভের পর শ্যামের সহিত চাক্ষুষ করিবেন কি প্রকারে এবং যদি চক্রান্তের সহিত তাঁহার সংশ্রব প্রকাশ হইয়া পড়ে তা হইলেই বা কি হইবে, এই সকল দুশ্চিন্তা তাঁহাকে এখন উদ্বেল ও শঙ্কিত করিতেছে। ব্রজকিশোর লাভবান আদৌ নহেন, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। সামান্য অসুবিধা, এতটুকু অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের ভয়ে, সরল সহজ পথ বর্জ্জন করার পরিণাম, নিরর্থক বহু অসুবিধার সৃষ্টি, সেই অপ্রীতিকরকেই সমাদরে শিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনা না দিয়া তাহাকে যেন অবশেষে বিজয়মত্ত নাদির শাহের বেশে আহ্বান করা—।

সুধীর বাবু যখন ব্রজকিশোরের রুগ্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন তখন ভগ্নীও তথায় উপস্থিত। ভগ্নীর প্রশ্নপূর্ণ কটাক্ষের উত্তরে তিনি স্বীয় কটিদেশে অর্থসূচক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্রজকিশোরের, "কি হইল?" ব্যস্ত সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদে সম্মতি ও সাফল্যজ্ঞাপক গ্রীবা-হেলন করিলেন। স্বামী স্ত্রী, দুই জনেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উদ্বেগের মূল ও মুখ্য বিষয়ের নিবারণে উভয়েই প্রসন্ন।

সংসারে আমরা সাধারণতঃ স্বীকার করি না যে বিমাতা-লাঞ্ছিত মাতৃহীনের অপেক্ষা সপত্নীপুত্রগ্রস্ত দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর দুর্দ্দশা কোন অংশে ন্যূন নহে, একদিকে যেমন পরলোকগত মাতার পবিত্র স্থানে অপরাকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া নিয়ত ক্ষোভ, অন্যদিকে সেইরূপ নারী মাত্রেরই সাধের গঠিত কল্পনা-রাজ্যে এই বৈষম্য, স্বামী সোহাগের নিরবচ্ছিন্নতায় এই প্রতিবন্ধকে অবিরাম জ্বালা; বিশেষতঃ সেই নারী যদি নিজে পুত্রসুখে বঞ্চিত ও সপত্নী-পুত্র মাতার গৌরবের উপযুক্ত হয়। চারুবালার ক্ষেত্রে তাই হইয়াছে। নারীজীবনের পূর্ণতায় বাধাপ্রাপ্ত, বুভুক্ষু হৃদয়ের ব্যর্থ-সম্ভার, নিজের সম্পূর্ণ সমর্পণে দাম্পত্য-জীবনের অসামঞ্জস্যের দ্বারা জর্জ্জরিত নারীর হৃদয় সকল দিক্ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যে শেষ অবলম্বন নিজের স্বার্থকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিবে তাহার আর বিচিত্র কি? স্বার্থ প্রবল হইলে ভয়ের

সৃষ্টি—ভয় মানুষকে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য করে। চারুবালার ভয়, অগ্রজের যত্নে পরিপুষ্ট; তাঁহারই পরিশ্রমে বিবেক-বিচারহীন পথ ভগ্নীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত। শ্যামকে এইরূপে বন্দী করার মূলে এই ভয় যতটা ছিল, আক্রোশও ছিল ততটা; অন্তরের নিভৃত অজ্ঞাত কোণে, মানস-পুত্রের কল্পনাগঠিত আদর্শের সহিত শ্যামের সাদৃশ্য যে-ক্ষতকে জীবন্ত করিতেছে—তাহার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, শ্যামই।

চারুবালা আগ্রহ ও উদ্বেগে ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন। সুধীর বাবুর আইনের কূট বুদ্ধি ও ভ্রাতার সদিচ্ছা একাধারে তাঁহার স্বার্থ-যজ্ঞের প্রধান সহায়; সেইজন্য তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যাহাতে একটা বিবাদ বাধিয়া না যায়, পীড়াপীড়ি জেদাজেদিতে আসল কথা বাহির হইয়া গিয়া—তাঁহার বহু পরিশ্রমে ও কৌশলে লব্ধ নিজস্ব সম্পত্তি হস্তচ্যুত না হয় সেই জন্য তিনি অগ্র-পশ্চাৎ-বিবেচনা-হীন একটি ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্যবস্থা ত' হইল, উদ্যম সফলও হইল; কিন্তু আক্রোশ-পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার সূচনা হইল। নিজের অলক্ষ্যে, শ্যামের পক্ষ-সমর্থক অন্তরের লুব্ধ মাতৃত্ব, কোথা হইতে তাঁহাকে যেন অনবরত খোঁচা মারিতে লাগিল; ভয় তখন নাই সুতরাং আক্রোশের এই বিপরীত মূর্ত্তির প্রতাপ অখণ্ড। ললিতের প্রতি তাঁহার দ্বেষ সদা অন্তর্মুখী রহিয়াছে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত এই মমতার সঞ্চার সম্ভব হয় নাই। ভ্রাতার আগমন, টাকাটার যোগাড় হইয়াছে এই শুভ সংবাদে যখন অবশিষ্ট ভয়টুকু সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, তখন সেই প্রচ্ছন্ন অপর বৃত্তিটি, হৃদয়ের মধ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্যামের চিন্তাতে অবাধ্য হৃদয় কেন যে দ্রবীভূত হইয়া আসে!

ব্রজকিশোর 'টাকা আসিয়াছে' এই সংবাদে যেমন একদিকের দুশ্চিন্তা সমস্ত হারাইলেন, অমনি আর একদিক হইতে দুশ্চিন্তারাশি আকর্ষণ করিয়া আনিলেন; এখন শ্যামকে মুক্তি দেওয়া যায় কিরূপে, বন্দী করা অপেক্ষা মুক্তিদান যে আরও অনেক কঠিন, সে মুক্তিদানে কত জটিলতা, কত লজ্জা, কত বিপদ লুকাইয়া আছে! কত সতর্কতা, কত দক্ষতা, কত কর্ম্মোদ্যম তাহাতে আবশ্যক! রোগজীর্ণ মস্তিষ্ক পথ বাহির করিতে অক্ষম, আর অন্যদিকে ভ্রান্তির গ্লানি, 'গতস্য শোচনা'—যদি অত ব্যস্ত না হইতাম, তাহাকে সম্মুখ হইতে অপসারিত করিবার বাসনায় জ্ঞানহীন না হইতাম; কোনও মতে তাহাকে সামলাইয়া রাখিতাম—এই সব। জগতের বহু ভ্রান্ত, এইরূপ ভ্রমসংশোধনে অপারগ না হইলে অবিচার অত্যাচারের ভার অনেক লাঘব হইত। ব্রজ-কিশোরের রহিয়া গেল ভ্রান্তির মর্ম্মান্তিক উপলব্ধি, অনুশোচনা ও নিজের অক্ষমতায় দারুণ দুঃখ। পত্নীকে কিছু বলিবার উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন কক্ষে কেহ নাই।

চারুবালা ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতেই, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ললিত অতিরিক্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দিল। ললিত কক্ষের মধ্যে এক পা বাড়াইতেই পিতাপুত্রে চারি চক্ষু এক হইল; সারা জীবন ধরিয়া যে সুদৃঢ় প্রাকার দুইজনে দুইজনের মধ্যে খাড়া করিয়াছেন তাহা অবহেলা করিবার সমূহ অক্ষমতা দুই জনেই যুগপৎ উপলব্ধি করিলেন; ব্রজকিশোর নয়নকোনে অবাধ্য অশ্রুকণা গোপন করিতে মুখ ফিরাইলেন; ললিত অসহায় ভাবে কক্ষের এদিক ওদিক কিয়ৎকাল শূন্য দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। নিজের জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহাকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল যে স্বাভাবিক স্নেহধারা হইতে সে নিজেকে সযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিয়া সংসারেও একটা বিচিত্র জটিলতা আনয়ন করিয়াছে।

সুধীর বাবু প্রসাধনে ভ্রমণ-গ্লানিমুক্ত হইয়া, ভগ্নীর সম্মুখে জলযোগে বসিয়াছিলেন, তখন চারুবালা কথা পাড়িলেন, "ওঁর অসুখ কেমন বুঝেছো দাদা?"

সুধীর বাবু বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন, "সুবিধে মনে হচ্ছে না; গতিক খারাপ।"

চারুবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার কি হবে?"

সুধীর—"সেই জন্যেই ছুটে এসেছি আমি সব সব কাজ ফেলে। ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করলে, আজই হোক্ দুদিন পরেই হোক বিপদ আপদ এলে, তাকে সামলান যায়; তবে আমি যেমন বলি, আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস

রেখে, সেইভাবে চলতে হবে, তবেই আমার দ্বারা কোনও উপকার হতে পারে আর না হ'লে এখন থেকেই বল, আমি আর জল ঘাঁটি না।"

চারু—"দাদা, তোমার উপর নির্ভর করব না তো কার ওপর করব, আমার কে আছে? কি উপায় বল?"

সুধীর—"কাজ খুব শক্ত। পারবে ঠিক?"

চারু—"বলেই দেখ।"

সুধীর—"তোমার নামে যে এলাকা কিনিয়ে দিয়েছি, সেটা আমার নামে করে দিতে হবে; তাতে সুবিধে এই হবে যদি সরিকরী বিবাদ লাগে, কেউ আর কথাটি কইতে পারবে না; তারপর তোমার জিনিষ তোমার, আমি দরকার মত দেখা শুনা করে দেব মাত্র। দেওর-পোরা হাঙ্গামা কর্ত্তে গেলে যা ওইটে নিয়েই গোলমাল কর্ত্তে পারে; টাকাকড়ি নগদ এসব কোনও গোলমাল সহজে টিকবে না, আমি বেশ জানি।"

চারু—"কেন? তাদের সব আর্দ্ধেক ভাগ আছে যে?"

সুধীর—"আমি তোমাদের ষ্টেটের নিয়ম সব দেখেছি ভাল করে, যে সরিকদার অনুপস্থিত থাকবে বরাবর, সে এখানকার খরচা বাদে যা যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তাতেই ভাগ পাবে, আর এখানকার সরিকদার ইচ্ছামত দেনা না করে খরচ করে যেতে পাবে, হিসেব থাকলেই হোলো, কারণ খরিদ স্থাবর যা হবে তাতে অবশ্যি তাদের ভাগ আছে; তাহলে বুঝতেই পারছো, কোনখানে টান পড়বে? এখন কি মত তোমার বল?"

চারু—"বুঝতে পাচ্ছি কতকটা! তুমি যা বল্লে আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।"

সুধীর—"তাহ'লে শোনো, আমি কাগজপত্র সব ঠিক করে এনেছি—অক্ষয়কে সহরে পাঠিয়ে আমি রেজেষ্ট্রির বন্দোবস্ত যাতে এইখানেই হয়, তাই করিয়ে নেব, তুমি সই দিয়ে দেবে।"'

চারু—"দাদা তুমি যা বলবে, আমি তোমার কথার বার নই।"

সুধীর—"আর তোমার দেওর-পো যে টাকা চাইছে সেটা আমি নিজে হাতে, ব্যাপার বুঝে কায়দামত দেব।"

চারু—"সে তো আমাদের ভালই।"

সুধীর—"আর সে টাকা যে আমি দেব তার বদলে আমার সেই দলিলখানা চাই—আমাদের পৈত্রিক ভিটে, ভাড়াটে বাড়ী সব সেই দলিলে বন্ধক দেওয়া আছে, রায় মশায়ের কাছে। সে দলিল আমায় দিতে হবে।"

চারু—"দাদা, সে দলিল যে অনেক টাকা—আর এতো সামান্য টাকার; কেমন করে হবে?"

সুধীর—"তা বলবে বই কি, এখন আর বাপের বাড়ীর টান থাকবে কেন, ছেলে বেলার কথা সব ভুলে এখন মস্ত জমিদারের গিন্নী—। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ দত্ত বাবুদের দেনার জন্যেও আমি দায়ী আছি যে—তাহ'লে শোধবোধ হয় কি না ভেবে দেখ—আমি অন্যায় কথা বলব কেন?"

চারু—"হ্যাঁ তাহলে হয় বটে; কিন্তু এই টাকাটা কেবল উসুল দিয়ে রাখলে হয় না? দলিল খানার এখন থেকে কি দরকার?"

সুধীর—"চারু, আমার ওপর কি মোটে দয়ামায়া নেই, তোমার খোকার যে আমার ওপর ভালবাসা, ও দলিল তার হাতে পড়লে আমাদের গাছতলায় বসতে হবে, সেইটে তুমি চাও?

চারু—"না, না তা কেন!"

সুধীর—"তবে এখানে থাকলে সে দলিল তার হাতে পড়বেই এটা ঠিক। আর আমার কাছে থাক্‌লে, এখন থেকে মিটিয়ে নিলে, আমার বিপদ নেই আর তোমাদেরই বা ক্ষতি কি—দত্ত বাবুরা টাকা চাইলে তোমরা দেবে না—তখন আমার কাছ থেকে তারা আদায় কর্ব্বে—সব টাকাটা শোধ হয়ে যাবে—দেওর-পোর টাকা আর ওদের টাকা মিলে তোমার দলিলের টাকার সমানই হবে।—এখন আর আপত্তি আছে কি?"

চারুবালা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না আপত্তি নেই; তবে ওঁর কাছ থেকে বুঝিয়ে আমি দলিল নিয়ে আসি গে।"

সুধীর—"সে তোমার ওপর ভার আর অক্ষয়কে এখুনি একবার ডেকে পাঠাও আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে।"

"আচ্ছা" বলিয়া চারুবালা চলিয়া গেলেন—। দাদার

কথায় যেটুকু খটকা লাগিয়াছিল তাহা যুক্তি দ্বারা অপসৃত হইল; এখন আর সন্দেহ মনে কিছু নাই।

চারুবালা চলিয়া গেলেন, অক্ষয় আসিল। সুধীর বাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সহিত জমাইয়া ফেলিলেন; দুই একটি সুনির্ব্বাচিত বিচক্ষণ প্রশংসাবাদে অক্ষয় আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত। চারুবালাকে দৌত্য-কার্য্যে ও কার্য্যসিদ্ধির জন্য দুই তিনবার সেই পথে যাওয়া আসা করিতে হইল; প্রথমবারে তিনি দেখিয়া গেলেন অক্ষয় বিমোহিত হইয়া বসিয়া আছে; দ্বিতীয়বারে দেখিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মন্ত্রশক্তিতে বোতল গেলাস আনিয়া ফেলিয়াছেন, অক্ষয়ের ভাব অনেকটা ভক্ত হনুমানটির ন্যায়, বোধ হয় অমৃত আস্বাদনের ফল। শেষবারে কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিতে দেখিলেন অক্ষয়ের মুখ খুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দেহের সকল কজাও শিথিল, হস্তদ্বয়ের অত্যধিক সবলতায় তাহা অনুমেয়—চারুবালাকে দেখিয়া অক্ষয় আবার ধ্যানস্থ হইল।

ব্রজকিশোরের তখন একমাত্র ও প্রচণ্ড ব্যাকুলতা শ্যামের জন্য টাকা প্রস্তুত রাখা, অন্য বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই; বস্তুতঃ চতুষ্পার্শ্বে যে জটিল জাল ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া স্থান সংকীর্ণ করিতেছে—তাহাতে তিনি বিহ্বল, নিরুপায়—তাহার উপর আবার রোগের সিঁদকাটি বুদ্ধি অপহরণ করিয়াছে। তাই পত্নী প্রমুখাৎ সুধীর বাবুর যুক্তি-জাল তাঁহাকেও অনায়াসে বেড়িয়া ফেলিল; পত্নীকে দিয়া দলিল আপনার সিন্দুক হইতে আনাইয়া দলিলের পশ্চাতে 'টাকা বুঝিয়া পাইলাম' লিখিয়া সহি দিয়া দিলেন; শেষে এইটুকু কেবল বলিলেন "টাকা নিয়ে দলিল হাতে দিও সময় কাল বড় খারাপ।—এখন ললিতকে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে সঁপে দিতে পারলেই আমার কাজ ফুরোয়।" এই শেষ কথাটী গৃহস্থালির পরিদর্শনে, স্বামী ও নব আগন্তুকদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা-নির্দ্দেশে, সকল কার্য্যের মধ্যে অহরহ সেইদিন চারুবালার কানে বাজিয়াছিল—স্বামী পত্নীর জন্য কিছু ভাবিলেন না, এই অভিমানের ব্যথা; কিন্তু তিনি নিজের ভার যে নিজের স্কন্ধে স্পষ্ট তুলিয়া লইয়াছেন, নিজের ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠার জন্যই এত আয়োজন এত কৌশল—সেগুলিকে অবজ্ঞা করিয়া সে অভিমানকে বাহিরে রূপ দিবার মুখ আর কোথায়? স্বামীর রোগ আজ যেন বেশী করিয়া তাঁহার হৃদয়ের এক নূতন স্থানে ব্যথা দিতেছে;—রোগ যে আরোগ্য হইবার নহে সে কল্পনা মনের সম্মুখে আনা বড় কষ্টকর অথচ বৃথা আশায় নিজেকে ছলনা করা তাঁহার ধরণ নহে—। তাই ঐ ধারণাকে, পারিবারিক গুপ্ত কলঙ্কের ন্যায়, মনের এক পাশে কোণঠেসা করিয়া রাখিতে তিনি সচেষ্ট।

সুধীর বাবু ভগ্নীর হস্ত হইতে দলিলখানি লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া অক্ষয়কে বলিলেন, "তুমি সাক্ষীর সই করে রাখ, কাজ এগিয়ে থাক্।" অক্ষয় সাক্ষ্যের সহি দিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধীর বাবুর নয়ন অন্বেষণ করিল, কিন্তু বৃথা—সে সম্পূর্ণ উদাসীন। উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া সুদূর অসীমে, স্থির লক্ষ্য। অক্ষয় দলিলখানি সুধীর বাবুর সম্মুখে রাখিতে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল; দলিলের একটি কোণ ঈষৎ ছিন্ন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সেই শ্যাম কোথায়—একবার চাক্ষুষ করাও—দেখি কোন্ পানির মাছ সে। তাকে মিটোবার ভার এখন আমার।"

চারুবালা ভ্রাতাকে একটু অন্তরালে লইয়া নিম্নকণ্ঠে শ্যামের ব্যাপার বর্ণনা করিতে যেন নিজের মনেই সুধীর বাবু বলিয়া উঠিলেন, "শত্রুর শেষ আর ঋণের শেষ—।" কথার ধরণে এমন কিছু ছিল যাহা চারুবালার মস্তিষ্কে একটা ক্রূর ছবির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—একটা চাপা আর্ত্তনাদের মত কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল "দাদা!"—যেন মাতা পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। কম্পিত-কলেবর ভগ্নীর প্রতি কৃত্রিম বিস্ময়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুধীর বাবু বলিলেন, "আরে ঠাট্টা বুঝলে না তুমি; ভারী ছেলে মানুষ—তা'হলে এক কাজ কর—ও দলিল তোমার কাছে থাক্—আমি যখন শ্যামকে টাকা দেব তখন নেব—হাজার ভয় থাক্ আমার আইন মেনে চলতে হবে—টাকা না দিয়েই দলিল নিয়ে নেব সে পাত্রই আমি নই।"—চারুবালার ইচ্ছা ছিল দলিলের বদলে তখনি টাকা নেওয়া; কিন্তু সে কথা উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই ভ্রাতার স্বেচ্ছাকৃত সাধু প্রস্তাব তাঁহার মুখ বন্ধ করিল। অগত্যা দলিলখানি লইয়া তিনি রাখিতে গেলেন।

এইবার সুধীর বাবু আমোদে সাঁতার দিলেন, অক্ষয় পাল্লা না দিলেও, অনুকরণে স্বীয় উৎসাহ ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হইল না; এমন সঙ্গে এইরূপ সহজ আমোদ উপভোগ তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। দানপত্রাদি সঙ্গে প্রস্তুত আছে, দলিলের কার্য্য শেষ, সুধীর বাবুর আনন্দ অপ্রতিহত, উৎস অফুরন্ত না হইলেও বিরাটগর্ভা—দুই-চুইটি কেস্। সাহেবেরা কাজের সময় কাজ, আমোদের সময় আমোদ করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার দ্বিতীয় ভাগ পুস্তকে সেই শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। সুধীর বাবুর হাতে এখন আপাততঃ কাজ নাই; আর অক্ষয়, "মহাজনো" ইত্যাদি। নৈশ ভোজনের সময় সে আনন্দের জাহাজ প্রথম নোঙ্গর করিল।

এদিকে বাজুর নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া শ্যাম দ্বিপ্রহরের সময় বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ক্লান্তিতে দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের অগ্নি শরে জর্জ্জরিত শ্যামের নিকট একই রাস্তা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে মনে হইয়াছিল, 'আহা, এই পথ যেন শেষ না হয়; মন্থর নিশ্চিন্ত গতি যেন জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত এমনিই জ্যোৎস্না কিরণ প্লাবিত, স্নিগ্ধ মাধুরীপ্লুত স্বপ্নাবিষ্ট পথ বাহিয়া চলিয়া যায়, সমাপ্তির পূর্ব্বেই যেন অগাধ অনন্ত বিস্মৃতি আসে; আর আজ মনে হইতেছে 'এ পথের এ গতি কতক্ষণে অবসান হইবে'।" শকটচক্রনিপীড়নে মৃদু গঞ্জনা-নিরত রাস্তার কঙ্কর আজ প্রতি মুহূর্ত্তে অনভ্যস্ত নগ্নচরণকে, তীব্র হিংসায় ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে; বনের শ্যামল আলিঙ্গনে অলস চক্ষুদ্বয় আজ অপ্রতিহত ঔজ্জ্বল্যে দগ্ধ হইতেছে। তাহার উপর ক্লান্তি, আজন্ম বিলাসে লালিত ব্যক্তির দৈহিক ক্লান্তি—শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, মন কিন্তু মানিতে চাহে না। তাই শ্যাম উঠিতে পড়িতে হোঁচট্ খাইতে খাইতে যথাশক্তি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে—কতক্ষণে শ্রীনগর উপস্থিত হইবে, সেখানে তাহার বড় জরুরি কাজ—এই চিন্তা।—এখন আর সে রহস্যে নির্য্যাতিত নহে; সেই দিনই প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এক ঝলক আলোকের ন্যায় তাহার মনের উপর পড়িয়াছিল—তাহার উপরে এই আকস্মিক অত্যাচারের কারণ এখন পরিষ্কার। জ্যাঠাইমার কথাগুলি তাহার মনে পড়িতেছে—"টাকা একেবারে না দিলে তাহারা কি করিতে পারে—।" তাই সে মরিয়া হইয়া চলিয়াছে! সমস্ত দেহের, অবয়বের কাতর মিনতিতে কর্ণপাতও করিতেছে না। ওই পূর্ব্বদৃষ্ট ডোমপাড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়েগুলি; আর কি, গ্রামের সীমানা আর বেশী দূর নহে, সূর্য্যের প্রাখর্য্যও শীঘ্রই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিবে। চল, চল, কানের মধ্যে কি একটা শব্দ হইতেছে না? যেন জগতের সমস্ত কোলাহল পরস্পর স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া এক অভিনব রূপে একাকার হইয়া বিলীন হইল; একি শব্দ-রাজ্যের অভ্যুদয়? চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত দৃশ্য পুঞ্জীভূত হইয়া, দূরলক্ষিত বিশাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ফেণরাশির মত প্রতীয়মান; আবার পলকে নিজ নিজ স্বরূপ ধারণ করিতেছে। আষাঢ়ের আকাশ বিকট নীল, যেদিকে তাকাও নীল ছুরিকার আভার চমক; তাই বুঝি এই নীল নগ্নতাকে এত যত্নে ঢাকিয়া রাখে? নীলের জন্মকালীন তেজ মানব-নেত্রের অসহ্য। আজ আকাশে কি একটাও মেঘ নাই? মাথার উপর এই প্রচণ্ড নীল, চতুর্দ্দিকে ধাঁধাঁ, কর্ণে অবিশ্রাম বিরাট গর্জ্জন; স্পন্দনে, নিঃশ্বাসে, ললাটের শিরার আস্ফালন বেতালা; শিরার মধ্যে ফুটন্ত রক্তের মিনতি; কিছু নাঃ! চল, চল, পবিত্র মুমূর্ষর নিকট শেষ প্রতিজ্ঞা পণ্ড করিবার আয়োজন চলিতেছে—চল, চল! গ্রাম আর অর্দ্ধ-ঘণ্টার পথ!

শ্যামের সম্মুখে চতুর্দ্দিক একবার সহস্র সূর্য্যের কিরণে ঝলসিয়া, নিমেষে অনন্ত রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া পড়িল, একটা পৈশাচিক চীৎকারের পর সীমাহীন বিশুদ্ধ নীরবতা ব্যাপ্ত—তাহার চৈতন্যহীন দেহ পথিপার্শ্বে আপনা হইতেই লুটাইয়া পড়িল—প্রকৃতি নিজের জিদ্ বজায় রাখিয়াছে; ছয় ঘণ্টার পদব্রজে পনর মাইল একাদিক্রমে রৌদ্রতাপে চলা সহ্য করিতে সে প্রস্তুত নহে; পা'দুটি রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে।

ধরণীর তপ্ত ক্ষুব্ধবক্ষে সান্ত্বনা সহানুভূতির বাণী লইয়া স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে দেখা দিল, স্বীয় বর্ব্বরতায় অপ্রতিভ তপন প্রস্থানবেগ দ্রুত করিলেন; শ্যাম চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মূর্চ্ছার অবসরে প্রকৃতি যেন পরিতৃপ্ত; অবসাদও কতকাংশে দূরীভূত; পূর্ব্বের চাঞ্চল্য, মানসিক

উচ্ছৃঙ্খলতা অন্তর্হিত, মস্তিষ্কে সুস্থ সংযত বিচার পুন প্রতিষ্ঠিত। শ্যাম উঠিয়া শান্ত ক্লিষ্ট চরণে অগ্রসর হইতে লাগিল; শ্রীনগরে গিয়া আগে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়া লইতে হইবে, পূর্ব্বে একবার জ্যাঠামহাশয়কে নির্ব্বিবাদে প্রায়শ্চিত্তের দোষক্ষালনের সুযোগ দিতেই হইবে—তার পর যাহা করা উচিত এবং দরকার তাহাতে তিলমাত্র পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না; বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, অত্যাচার, ইহার প্রতিশোধের বাসনায় মানুষ সহজেই নিজে অন্যায় করিয়া বসে—এইরূপে পর্য্যায়েপর্য্যায়ে, পুরুষানুক্রমিক, যুগে যুগে অন্যায়ের বংশরক্ষা ও বৃদ্ধি—শ্যাম ইহাই ভাবিতেছিল; মূর্চ্ছায় তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব কাটিয়া গিয়াছে, এখন সে সুচিন্তিত সংকল্পে স্থির।—

দেউড়ীতে লোক নাই; সমস্ত পুরী যেন সারা অঙ্গে হীনতা লেপিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একটা ম্লান আত্মসমর্পণের ভাব,—'আমি জঘন্য আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা কর।' শ্যাম দেউড়ী অতিক্রম করিয়া চলিল; দক্ষিণ দিকের উদ্যানের মধ্যে কিসের কোলাহল হইতেছে? বহু কণ্ঠের মিশ্রিত গুঞ্জনের মধ্যে, মাঝে মাঝে একটি কণ্ঠের হুঙ্কার নিনাদ। শ্যাম সেইদিকে চলিল; অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ এইরূপ একটা গণ্ডগোল, ভিড়ের মধ্যে সহজ—তাই শ্যাম সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

সুধীরবাবুর প্রথম রাত্রির আনন্দে বাধা পড়িয়াছিল, শারীরিক ক্লান্তির জন্য; কিন্তু পরদিন সকাল হইতেই তিনি শোধ তুলিতে আরম্ভ করিলেন; আজ দানপত্রে চারুবালা স্বাক্ষর করিয়াছেন, অক্ষয় সাক্ষ্যের সহি দিয়াছে, আগামী কল্য রেজিষ্ট্রির বন্দোবস্ত করিতে অক্ষয় যাত্রা করিবে। সুধীর বাবু বিমল আনন্দে ভাসমান, বড় ষ্টিমারের সঙ্গে যেমন গাধাবোট—অক্ষয় তেমনই সুধীর বাবুর কাছাকাছি আছে; প্রথমে সঙ্কোচে, ব্রীড়ায় অল্প অল্প মাত্রায়, তাহার পর ক্রম-নির্ভরপরায়ণতা; আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠিল। সুধীর বাবুর প্রতি গেলাসে তাহার এক চুমুক এই অনুপাতে মাত্রা বাঁধিয়া গেল। সুধীর বাবু তাহাকে ছাড়িতে নারাজ; অগত্যা মধ্যাহ্ন ভোজন দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া সারিলেন; বেলা দুইটা হইতেই দুইজন উদ্যান-শোভা উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইলেন। পুষ্পলোভে, পুষ্পবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সৌন্দর্য্যপ্রাহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। পরিণামে কৌতূহলগ্রস্ত দর্শকবৃন্দের আবির্ভাব ও তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। এই সময়েই শ্যামের অভ্যুদয়। জনতা নূতন দৃশ্যে পুরাতনকে ভুলিয়া গেল, নূতনের নিকট আরও কিছু চূড়ান্ত রকমের ব্যবহার, জীবনযাত্রার চিরাভ্যস্ত মাখামাখি কসরৎগুলির অতিরিক্ত কিছু দর্শনলালসায় জনতা প্রতীক্ষায় মূক ছিল, এমন সময়ে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছোটবাবু যে, ছোটকর্ত্তার ছেলে, ফিরে এসেছেন!' সবর আন্দোলন, প্রশ্নোত্তরের ঘটা পড়িয়া গেল, সমবেত কণ্ঠস্বরের উপর শ্যামের কথা শুনা গেল, "এখানে কি হয়েছে—কিসের গোল হচ্ছে?" উত্তরে জনতা ছিন্ন হইয়া তাহার সম্মুখে এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রকাশ করিল—এক অপরিচিত ভদ্রবেশী, এক হস্তে বোতল, অপর হস্তে এক সমূল উৎপাটিত গাঁদা ফুলের গাছ, তাঁহার পরিধানে ধুতি খসিয়া পড়িতেছে।—আর পশ্চাতে অক্ষয়, অক্ষয় যুক্ত করে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে আর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

সুধীর বাবুর রক্ত চক্ষু আহ্নিক গতিতে চলিয়াছে—দৃষ্টি বার্ষিক গতিতে শ্যামকে আপাদ মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল; তারপর কণ্ঠ খুলিয়া গেল, "Avaunt, who art thou?" প্রেত দর্শনে হ্যামলেটের উক্তির খিচুড়ী। শ্যাম মৃদু হাস্যে বলিল—"আপনি কি এই বাড়ীতে এসেছেন?" জনতার মধ্যে একজন কর্ম্মচারী বলিল—"উনি সুধীর বাবু। কলকাতা থেকে কাল এসেছেন; বড় কর্ত্তার এ পক্ষের সম্বন্ধী।"

সুধীর বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"ড্যাম্ সম্বন্ধী, আমি মহাজন নোটিশ, প্লেন্ট, ডিগ্রী, এটেচ্, ওয়ারাণ্ট, এরেষ্ট, দখল, বাস্। তুমি কে হে?"

শ্যাম—"আজ্ঞে আমার নাম, শ্যাম—আমি নন্দ বাবুর ছোট ছেলে।"

সুধীর—"Lies—শ্যাম? তবে শাড়ী কেন?" সত্যই ডগ্‌ডগে লাল কস্তা-পেড়ে শাড়ীর প্রতি এতক্ষণ কাহারও লক্ষ ছিল না। সুধীর বাবু এক কথায় রণ জয় করিবার বিজয়-গৌরব প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করিতে করিতে

চলিয়া গেলেন, শ্যামও বহু কষ্টে জনতা-বেষ্টনী ভেদ করিয়া বহির্ব্বাটির অভিমুখে অগ্রসর হইল; প্রতি পাদক্ষেপে, বেদনা মাথায় টঙ্কার দিতেছে। ললিত এই সময়েই উদ্যানের কোলাহলের অর্থভেদ-মানসে সদর দরজা দিয়া আসিতেছিল; সুধীর বাবু তখন দালানের দিকে চলিয়া গিয়াছেন; সামনা সামনি হইতেই শ্যাম ও ললিত উভয়েরই গতিরোধ হইল।

ললিত বলিল—"কে তুমি?"

শ্যাম ললিতকে অনুমানে চিনিতে পারিয়া বলিল—"আমি শ্যাম; তুমি ললিত না?"

ললিত সবিস্ময়ে বলিল "ছোটদা? কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে গিয়েছিলে, এ বেশ কেন? অসুখ করেছে নাকি, কি হয়েছে? চল, চল আমার ঘরে যাই। ওদিকে নয়, এদিকে সিঁড়ি বাইরে দিয়ে; চল সেখানে গিয়ে কথার উত্তর দেবে; একি চেহারা হয়েছে! চল আমি ওপরে জল আনিয়ে নেব। চলিতে চলিতে বলিল, "যাক্ এতদিন পরে চাক্ষুষ হ'ল।"

স্রোতের মুখে শ্যামও হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া দিয়াছিল; ব্যথা গ্লানির জুলুমও যেন কমিয়া আসিয়াছে। সে হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল—"কেন? চিঠিতে চাক্ষুষ হয় নি? বেশ জমেছিল।"

ললিত উৎসাহে তাড়াতাড়ি শ্যামকে এক প্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ি অতিক্রম করিল। শয়ন-কক্ষে শ্যামকে বসাইয়া, বাহিরে গিয়া, আজ বোধ হয় জ্ঞানোন্মেষের পর জীবনে প্রথম ভৃত্যকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল এবং সেইরূপ উচ্চকণ্ঠেই তাহাকে যথাযথ আদেশ দিয়া, শ্যামের নিকট ফিরিয়া আসিল; তাহার হৃদয় বুভুক্ষু, বহুকাল উপবাসী, তাই এখন চপলতার তুফান ছুটাইতে চাহে। ভাই, আত্মীয়, বন্ধুলাভে হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে; স্নেহ সহানুভূতির চির পিপাসার স্নিগ্ধ-বারি—স্বচ্ছ আধারে সম্মুখে, আয়ত্তের মধ্যে—অলীক নহে, নিশ্চিত, বাস্তব।

(আগামীসংখ্যায় সমাপ্য)

গান

সুদূর পথের বঁধু—চিনি না তা'রে;
আসে যায়, ফিরে চায়,—বারে বারে।
বিজন বনের ফুল নাম না জানি,
দখিনা বহিয়া গেল গুণ বাখানি',
পথে যেতে বড় ভাল লাগিল তা'রে।
জানি,—সে ফুল ঝরিয়া যাবে পথেরই ধারে।

আদরে রাখিনু বুকে বনের পাখী,
তবু বেদনায় মরে, কোথায় রাখি?
বন-হরিণীর মায়া,
তারকা-পথের ছায়া,
নিমেষে মিলায়ে যাবে স্বপন-পারে।

চণ্ডীদাস-রজকিনী

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর নাম যেন "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।" চণ্ডীদাসের নাম মনে আসিলেই রজকিনীর নাম স্বতই মনে উদিত হয় ও চণ্ডীদাসের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে রজকিনীর উল্লেখ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহ কেহ স্বকীয় অজ্ঞতা প্রযুক্ত রজকিনীকে চণ্ডীদাসের অবৈধ প্রণয়-পাত্রী সাব্যস্ত করিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ছিদ্রপচ্ছলে শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতেও ত্রুটী করেন না।

চণ্ডীদাস ও রজকিনীর মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিতে গেলে, চণ্ডীদাসের স্বরচিত পদাবলীকেই অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার অনেক পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সহজসাধ্য নহে। চণ্ডীদাসে প্রেম ও ভক্তির সম্যক সমাবেশ ছিল এবং তিনি যে একজন যোগী পুরুষ ছিলেন ও যোগসাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ও তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। এই প্রেম ভক্তির আবেশে তিনি যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত ধারণাই করিতে পারিবে না, এবং তাঁহার যোগসাধনার যে সঙ্কেত তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহাও সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই চণ্ডীদাসের অনেক পদ সাধারণের জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। মহাজনবাক্য বোদ্ধার স্বকীয় কল্পনা ও সংস্কারানুরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিতে গেলে, তাহার বিরূপ অর্থই হইয়া পড়ে, কাজেই চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনীর সম্বন্ধও অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট বৃত্তি-সম্বন্ধেই পরিণত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের জীবনী ও পদাবলী আলোচনা করিলে পরিষ্কারই অনুমান করা যায় যে, চণ্ডীদাস ও রজকিনী একই সাধনপ্রণালীর সাধক ছিলেন ও উভয়েই সাধনমার্গে উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। সমধর্ম্মী ও সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা নৈকট্য-বন্ধন দেখা যায়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যেও দেখা যায় "ভাল ছেলে"দের একটা দল থাকে ও "খারাপ ছেলে"দের একটা দল থাকে। এই "দল"এর অর্থ আর কিছুই নয়, সমবয়স ও সমান অবস্থাপন্ন ছাত্রদিগের মধ্যে পরস্পর সৌখ্য। সাধন-মার্গেও সেইরূপ এক সম্প্রদায়ের ও এক অবস্থার সাধুদিগের পরস্পর হৃদ্যতা দেখা যায়। চণ্ডীদাস এবং রজকিনীও সেইরূপ সাধন-বলে উভয়েই একই রসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই প্রীতিরই অপর নাম "পিরীতি"। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ "পিরীতি" শব্দের কদর্থ কল্পনা করিয়াই তাহাতে পাশব কামের আরোপ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উপনিষদে দেখিতে পাই ব্রহ্মকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বা আত্মা, রসের স্বরূপ ও সর্ব্বরসের আধার। যাঁহারা সাধনবলে সেই ব্রহ্ম-রসের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কি বিষয়জ ও ইন্দ্রিয়জ রসে আসক্ত হওয়া সম্ভব? চণ্ডীদাস নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :—

"প্রেমের পিরীতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়"

ইহা দ্বারা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, চণ্ডীদাস ও রজকিনীর "পিরীতি"তে দেহ-সম্বন্ধ ছিল না। রজকিনী সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন :—

"রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়"

ইহা ছাড়াও তিনি যে ভাবে রজকিনীকে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাতেও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় "কামগন্ধ নাহি তায়"। তিনি রজকিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :— (ক) "তুমি হও মাতৃপিতৃ" (খ) "তুমি বেদমাতা গায়ত্রী" (গ) "তোমায় গুরু করি মানি"

সাধনপথে তাঁহারা একে অপরের সাহায্যকারী ছিলেন বলিয়া একে অপরকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যেখানে কামভাব বিদ্যমান সেখানে মাতা, পিতা, গুরু, বলিয়া সম্বোধন কল্পনা করিতে পারা যায় না। রজকিনীর

দেহত্যাগ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ এ দেশে প্রচলিত আছে যে, চণ্ডীদাস দেহত্যাগ করার পরই রজকিনী যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যে রজকিনী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে সক্ষম অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু যাঁহার করায়ত্ত, তিনি কি কখনও কামের আয়ত্ত হইতে পারেন? কাজেই চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন "কাম গন্ধ নাহি তায়"।

চণ্ডীদাসের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই তিনি একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। চলিত গ্রাম্য-কথায় শুনিতে পাই "কাম থাকিতে প্রেম হয় না"; মহাজন প্রণীত সঙ্গীতেও দেখিতে পাই :—

"কাম রিপুতে যার বাসনা তার সাথে তো প্রেম হবে না
কাম থাকিতে প্রেম হবেনা ব্রজগোপীর ভাব না নিলে ॥"

চণ্ডীদাসে ভগবৎ প্রেম জন্মিয়াছিল, অথচ তিনি একজন নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের জন্য লালায়িত, একথা কোনও চিন্তাশীল মানবই স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা সম্বন্ধেও কোন মতভেদ দেখা বা শুনা যায় না। ভক্তি জিনিষটা কত দুর্লভ ও কিরূপ সাধনসাপেক্ষ তাহা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেই অনুমিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বজন্মে কতিপয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোনও এক দাসীর গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঐ দাসীপুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টান্ন ঐ বালককে খাইতে দিতেন। এইরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতেই উত্তরোত্তর ঐ বালকের 'চিত্তশুদ্ধি' হইতে লাগিল ও ক্রমে তাহার ধর্ম্মে 'রুচি' জন্মিল। ঋষিগণ প্রতিদিনই কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন এবং ঐ বালকও তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিত। এইভাবে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বালকের ভগবানে রতি জন্মিল। ক্রমে ঋষিদিগের উপদেশে তাহার অপ্রতিহতা 'মতি' সমুৎপন্ন হইল ও নিজকেই সেই প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া তাহার জ্ঞান জন্মিল।

কালে ঋষিগণের মুখে ভগবানের অমল যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তাহাতে ঐ বালকের অচলা 'ভক্তি' জন্মিল। ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, সৎসঙ্গ, গুরূপদেশ ও সেই উপদেশানুরূপ মনন, নিদিধ্যাসনাদির অভ্যাসবশে সাধকের যথাক্রমে চিত্তশুদ্ধি, ধর্ম্মে রুচি, ভগবানে রতি ও মতি জন্মে এবং অবশেষে জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া সাধনার পরিপক্কাবস্থায় ভক্তির উদ্রেক হয়। এই ভক্তিবলেই দাসীপুত্র কালে দেবর্ষি নারদ নামে আখ্যায়িত হইয়া দেবতাদিগেরও পূজ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে যে কয়েকজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ চিরকুমারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, নারদ তাঁহাদিগের একজন। ভক্তি-বলেই নারদের পক্ষে চিরকুমার থাকা সম্ভব হইয়াছিল, কারণ ভক্তি ও কাম পরস্পর বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট। কামের বিষয় রতিক্ষেত্র, সেখানে ভগবানের অধিকার নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূ রতি এবং ভগবানের রতিক্ষেত্র ভক্তহৃদয়, যেখানে কামের অধিকার নাই, অর্থাৎ "কামগন্ধ নাহি তায়"। কাজেই চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রেমভক্তিবিশিষ্ট হৃদয়ে যে, কামের গন্ধমাত্রও ছিল না, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যায়, চণ্ডীদাস বলিয়াছেন :—

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা"

ইহার অর্থ, চণ্ডীদাসের বহিরিন্দ্রিয়বিক্ষেপ নিবৃত্ত হইয়াছে ও তাঁহার চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখী অর্থাৎ আত্মমুখী হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে সম্মুখে বিষয় বর্ত্তমান থাকিলেও ইন্দ্রিয় আর সেই বাহ্য বিষয়ের জন্য চঞ্চল হয় না ও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেও বিষয়স্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গীতার ভাষায় বলিতে গেলে চণ্ডীদাস ঐ অবস্থায় "বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা", অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে তাঁহার মন তখন আসক্ত নয়; কারণ তখন তাঁহার জ্ঞানে "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে" অর্থাৎ তিনি তখন বুঝিয়াছিলেন যে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত ভোগ দুঃখজনক। চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হইলে কখনও এবম্বিধ অবস্থা জন্মিতে পারে না। পতঞ্জলি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। চণ্ডীদাস যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়াই বলিয়াছিলেন "আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে"। এবম্বিধ অবস্থাপন্ন সাধককেই যোগারূঢ় বলা যায় :—

"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।"

পতঞ্জলি আরও বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইলেই স্বস্বরূপে অবস্থান ঘটে অর্থাৎ সাধকের আত্মস্বরূপ লাভ হয়। চণ্ডীদাসেরও চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফলেই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ ঘটিয়াছিল। চিত্তবৃত্তি যাহার নিরুদ্ধ তাহার পক্ষে কামবৃত্তির অধীন হওয়া অসম্ভব।

চণ্ডীদাস একজন যোগিপুরুষ ছিলেন এবং তিনি যে ভাবে যোগ-সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ করিয়া আত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আভাষও তিনি তাঁহার পদাবলীতে দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশে সেই সাধন-প্রণালী জানা না থাকিলে, চণ্ডীদাসের ঐ ইঙ্গিত বোধগম্য হয় না। চণ্ডীদাসের কোনও কোনও রচনায় "সহজ-সাধন" সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। অনেকেই ইহার কদর্থ কল্পনা করেন; আবার অনেকে বলেন সহজ শব্দের অর্থ সোজা। এই দুই-এর কোনটীই ঠিক নয়। শব্দটী 'সহজ'— সহ জায়তে ইতি, (সহ + জন + ড) অর্থাৎ যে সাধন দেহের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়াছে তাহাই "সহজ"। প্রত্যেক মানবদেহে অহর্নিশ যে আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া স্বতঃই চলিতেছে ও যে ক্রিয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে, সেই ক্রিয়ার নামই সহজ ক্রিয়া। এই ক্রিয়া প্রত্যেক দেহের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে ও এই ক্রিয়া লোপ পাইলেই জীবের মৃত্যু ঘটে। এই সহজ ক্রিয়া অবলম্বনে যে সাধন তাহারই নাম সহজ সাধন; কেহ কেহ ইহাকে সহজ প্রাণায়ামও বলেন। চণ্ডীদাস এই ক্রিয়া অবলম্বনে সাধনাপ্রণালী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সামান্য একটু আভাষ দিয়া গিয়াছেন:—

"প্রেমের যাজন শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস
সাধন যখন করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস॥
তাহা হইলে মনবায়ু সে
আপনি হইবে বশ
তা হইলে কখন না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে যশ॥"

উপরের পদে "এড়ায় টানিবা শ্বাস"টুকু লক্ষ্যের বিষয়। দেহস্থ স্বাভাবিক ক্রিয়া যখন ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষিত হয় তখনই আমাদের শ্বাস গ্রহণ হয়, আবার যখন ক্রিয়াটী স্বতঃই নিম্ন দিকে গমন করে তখন প্রশ্বাসে অভ্যন্তরস্থ বায়ু বহির্গমন করে। চণ্ডীদাসের "এড়ায় টানিবা শ্বাস" এর অর্থ—সাধন কালে ঊর্দ্ধ ক্রিয়ামূলক শ্বাসের সহিত দীর্ঘ প্রণব অভ্যাস করিবে। রামপ্রসাদের পদেও ঠিক এই ভাবের আকর্ষণ বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়াযোগে সাধনের উল্লেখ আছে:—

"যখন উজান আসবে উজিয়ে যাবে
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা"

মহাজন প্রণীত গ্রাম্য সঙ্গীতেও শুনিতে পাই:—

(ক) যদি সাধু হইতে চাও
তবে উজান দিকে বৈঠা বাও
(খ) ভাবের ভাবুক যারা পার হয় তারা
প্রেম নদীর ঐ ধার চিনে
দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে
যারা স্বরূপ সাধন জানে
(গ) চল ভাবুক নেয়ে উজান বেয়ে
খেয়া দিয়ে যাই ঘাটে

উল্লিখিত পদগুলিতে উজান শব্দের অর্থ দেহস্থ স্বাভাবিক আকর্ষণাত্মক ক্রিয়া (attraction) ও ভাটা শব্দের অর্থ বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া (repulsion)। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন এই আকর্ষণাত্মক ক্রিয়া অবলম্বনে দীর্ঘ প্রণব করিলে "মন আপনি হইতে বশ"। দীর্ঘ প্রণব অভ্যাস দ্বারা যে মন প্রশমিত হয় তাহার প্রমাণ শাস্ত্রেও যথেষ্ট পাওয়া যায়:—

"দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোবাজ্যং বিজীয়তে"

তন্ত্রাদিতে দীর্ঘ প্রণব জপের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়:—

(ক) "প্রণবাদি সমুচ্চারাৎ প্লুতান্তে শূন্যভাবনাৎ
শূন্যয়া পরয়া শক্ত্যা শূন্যতামেতি ভৈরবি"
(খ) "দীর্ঘং প্রণবমেব হি যোগিনামেব হৃদ্গতং"

এই ঊর্দ্ধ ক্রিয়া অভ্যাসের ফলে দেহের ক্রিয়া স্বভাবতই ঊর্দ্ধগ হইয়া যায় এবং তখন সাধককে আর নিম্ন ক্রিয়া-মূলক কামাদি বৃত্তির অধীন হইতে হয় না। তখন তিনি—

"ঊর্দ্ধদণ্ডোর্দ্ধরেতাশ্চ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রোর্দ্ধযোগবান্
ঊর্দ্ধং পদমবাপ্নোতি যতিরূর্দ্ধচতুষ্কবান্।"

অভ্যাস বশে দেহে ঊর্দ্ধ আকর্ষণ সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন :—

"রতির করণ রবির কিরণ
যেমত জলেতে লাগে
অন্তরে অন্তরে শুষ্ক করে তারে
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে"

যে আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা হওয়া স্বাভাবিক, সেই ক্রিয়ার সাধক চণ্ডীদাসের পক্ষে বিকর্ষণাত্মক নিম্ন ক্রিয়ামূলক ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হওয়া যে কখনও সম্ভব হইতে পারে না তাহা বালকেও অনুমান করিতে পারে।

দেহস্থ সহজ ক্রিয়া অবলম্বনে সাধনের আর একটী সঙ্কেতও চণ্ডীদাস দিয়া গিয়াছেন :—

'নিদ্রার আবেশে দেখ কপালপানে চেয়ে'

এই "কপাল পানে চাওয়া"র অর্থ দ্বিতলে অর্থাৎ ভ্রূ-মধ্যে লক্ষ্য রাখা। ভ্রূ-মধ্যে মন সমাধানের উপদেশ বহু শাস্ত্রে দেখা যায়। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

'প্রয়াসকালে মনসা চলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগ বলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"

শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক এই প্রকার উপদেশ আছে :—

"তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধ সপ্তায়তনোঽনপেক্ষ:
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি
নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরংগত:।"

এই ভ্রূমধ্যকে উপনিষদাদি বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন নাম দিয়াছেন, যথা আজ্ঞাচক্র, দ্বিদল, সত্যলোক, অমৃত স্থান, আকাশ স্থান, শিব স্থান, গুরু স্থান, কূট বা কুট স্থান, নাসাগ্র, নাসিকা মূল, হৃদয়, দহর. হংস স্থান, গুহা, বিষ্ণুলোক, ত্রিবেণী, বিরজা, বারাণসী, কাশী, অবিমুক্ত, ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে কয়েকটী মাত্র শাস্ত্রবচন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

(ক) ভ্রুবোর্লাট মধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিত:

(খ) "ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটস্তু নাসিকায়াং তু মূলত:
অমৃতস্থানং বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥"

(গ) "ভ্রূমধ্যে সচ্চিদানন্দ তেজ কূট রূপং তারকং ব্রহ্ম"

(ঘ) 'বারাণসী মহাপ্রাজ্ঞ ভ্রুবোর্ঘানস্য মধ্যনে"

(ঙ) "গুরু স্থানং ললাটঞ্চ"

(চ) 'ভ্রুবোর্মধ্যে শিব স্থানং মনস্তত্র বিলীয়তে"

বঙ্গদেশের বাউল সঙ্গীতে ও মুসলমান ফকিরদিগের গানেও এই ভ্রূমধ্যকে লক্ষ্য করিয়া পদ দেখিতে পাওয়া যায় :—

(ক) "হায়রে তোর চোখের কাছে মাণিক নাচে
দেখলিনে চোখ বুঁজে রলি"

(খ) "ও তুই রূপের মানুষ দেখতে পাবিরে
ত্রিবেণীর ঘাটের পারে"

উদ্ধৃত পদ দুইটীতে "চোখের কাছে" ও "ত্রিবেণী" শব্দ ভ্রূমধ্যকে লক্ষ্য করিয়া এবং "মাণিক" ও "রূপের মানুষ" শব্দ ব্রহ্মজ্যোতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কি প্রণালীতে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিলে মনের লয় ও ব্রহ্ম-জ্যোতির অনুভব হয় তাহা গুরুগম্য ও সেই অনুভূতি দীর্ঘ সাধনসাপেক্ষ।

সহজ সাধন সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে
সহজ পিরীতি বলিব তারে"

এখানে 'নিজ দেহ দিয়া' শব্দের অর্থ 'দেহাত্মবোধ পরিশূন্য হইয়া'। দেহই আত্মা এই ভ্রান্ত জ্ঞানই বন্ধনের কারণ ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। এই দেহাত্মবোধনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সহজ সাধনের চরম ফল আত্মজ্ঞান লাভ কখনও সম্ভব নয়। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের পদেও দেখিতে পাই, তিনি বলিয়াছেন :—

"এবার দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি"

এখানেও "দেহ বেচে" শব্দের অর্থ—"দেহাত্মবোধ-পরিশূন্য হইয়া"। দেহাত্মবোধরহিত হইবার একমাত্র উপায় ভ্রূমধ্যে মনের লয় করা।

সহজ সাধক সম্বন্ধে আর একটী কথা চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন :—

সহজ মানুষ নিত্যের দেশে
মনের ভিতর কেমনে আইসে"

পদটী পড়িলেই মনে হয় সহজ মানুষকে ধরিবার জন্যই সহজ সাধন। কিন্তু তাহাকে ধরা অনায়াসসাধ্য নহে, কারণ সেই মানুষের স্থান "নিত্যের দেশে" নিত্য শব্দের অর্থ অবিনশ্বর। একমাত্র আত্মাই অবিনশ্বর, তাই চণ্ডীদাস সেই অবিনশ্বর আত্মাকেই নিত্যের দেশের সহজ মানুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গীতাতেও দেখি ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোয়ং সনাতনঃ"

সেই নিত্যের দেশ কোথায় তাহার আভাষও চণ্ডীদাস দিয়া গিয়াছেন :—

"সহস্রদল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয়
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আশ্রয়"

উপনিষদাদিতে আত্মাকে "অবাঙ্‌মনসোগোচর" বলিয়া বর্ণনা দেখা যায়। আত্মা, বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়াই চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন :—

"মনের ভিতর কেমনে আইসে"

অর্থাৎ যিনি মনের অগোচর তাঁহাকে মনের বিষয়ীভূত করা যায় না; করিতে গেলেই তাঁহাকে স্বকীয় কল্পনাকারেই আকারিত করিতে হয়। কাজেই যে আত্মা মনের গোচর, তাহা স্বরূপতঃ আত্মস্বরূপ নয়, তাহার স্বরূপ কল্পনাই।

সাধনার কোন্ অবস্থায় "সহজ মানুষ"এর সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহার আভাষও চণ্ডীদাস দিয়া গিয়াছেন :—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে।"

অর্থাৎ অজ্ঞানতিমিরান্ধের পক্ষে সহজ মানুষ দর্শন হয় না। সদ্‌গুরুর কৃপায় স্বরূপসাধনের চরম সীমায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ সহজ মানুষের রূপ অনুভূত হয় না, ইহাই চণ্ডীদাসের উক্তির উদ্দেশ্য। দেখিতে পাই রামপ্রসাদও তাঁহার কেলে মাকে "তিমিরে তিমিরহরা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপনিষদেও দেখি ব্রহ্মকে "তমসঃ পরস্তস্থ সঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হই-। এই অন্ধকারের পর যে জ্যোতিস্বরূপ নিত্য সর্ব্বগত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্যোতি-সাধক মাত্রেই সাধনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া অনুভব করেন। উপনিষদ এই জ্যোতিকে বর্ণনা করিতে গিয়া উপমা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছেন :—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চ চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মাগ্নিঃ"

চণ্ডীদাস সেই আত্মজ্যোতি উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলপদ্মে রূপের আশ্রয়।"

এখানে "রূপ" শব্দের অর্থ কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনঃকল্পিত রূপ বা আকার নহে; চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইলে যে আত্মজ্যোতি অনুভূত হয়, সেই জ্যোতিকেই চণ্ডীদাস "রূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এই রূপই "জ্যোতিষমপি তজ্জ্যোতিঃ"।

রূপতন্ময়তা লাভ হইলে ক্রমে সাধকের শব্দতন্ময়তা জন্মে। এই শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও শব্দ নয়, শাস্ত্রে ইহাকে বলে "আকৃত নাদ", শাস্ত্রান্তরে ইহার নাম "অনাহত ধ্বনি"। সাধকপ্রবর গোবিন্দ চৌধুরী এই ধ্বনিকে প্রণব ঝঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

আজ্ঞাচক্র ভেদি চল সহস্রারে যেখানেতে সদা প্রণব ঝঙ্কারে
গোবিন্দানন্দ পাইলে তাহারে, আর আসিতে হবে না সংসারে ॥

চণ্ডীদাসও এই অনাহত ধ্বনি অনুভব করিয়া বলিয়াছেন :—

হ্রীং সে অক্ষর তাহার উপর
নাচে এক বাজীকর
এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর ॥
দুন্দুভি বাঁশীটি যখন বাজিবে
তা' শুনে মরিবে যে
রসিক ভকত ভুবনে ব্যক্ত
সখীর সঙ্গিনী সে ॥

এই অনাহত ধ্বনিকেই কেহ কেহ শ্যামের বাঁশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন—

"যমুনা উজান বয় কালার বাঁশী শুনিতে।"

এই 'যমুনা উজান বহায়' অর্থ দেহস্থ স্বাভাবিক ক্রিয়া ঊর্দ্ধগ হওয়া। যে সাধকের দেহক্রিয়া স্বতঃই সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগ তিনি নিয়তই শ্যামের বংশীধ্বনি শ্রবণ করেন। চণ্ডীদাসের এই অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বংশীধ্বনিকে যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সাধকের অবস্থাভেদে ধ্বনিরও বিভিন্নতা হয়। শাস্ত্রে তাই এই অনাহত শব্দকে দশবিধ বলিয়া বর্ণনা আছে :—

"চিনীতি প্রথমঃ, চিঞ্চিনীতি দ্বিতীয়ঃ, ঘণ্টানাদস্তৃতীয়ঃ, শঙ্খনাদশ্চতুর্থঃ, পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদঃ, ষষ্ঠস্তালনাদঃ, সপ্তমোবেণুনাদঃ, অষ্টমোমৃদঙ্গনাদঃ, নবমো ভেরীনাদো, দশমো মেঘনাদঃ।"

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কোনও কোনও স্থলে, "পরকিআ" (পরকীয়া) ও "পরকীয়" শব্দটী দেখা যায়—"পরকীয়া ধন" "পরকীয়া রস" "পরকীয়া রতি" "পরকীয় সাধন" ইত্যাদি। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি "পরকীয়" শব্দের অর্থ করেন "পরস্ত্রী সম্বন্ধীয়" ও এই অর্থের পরিপোষণোপলক্ষ্যে চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনীর সম্বন্ধ উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। মূর্খতাই এবম্বিধ অর্থের একমাত্র ভিত্তি। "পর" শব্দের অর্থ "পরমাত্মা", "পরব্রহ্ম" ইত্যাদি। এই অর্থে "পর" ও "পরম" শব্দের প্রয়োগ উপনিষদে ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—

(ক) সুষুম্না তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মরূপিণী

(খ) প্রণবো হি পরো ভবেৎ

(গ) নির্ভিদ্য মূর্দ্ধণ বিসৃজেৎ পবং গতঃ।

পরকীয় শব্দের প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা সম্বন্ধীয়। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্র বাক্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে যাহারা অক্ষম তাহাদিগের কদর্থপরিপূর্ণ ব্যাখ্যাতে আস্থা স্থাপন করিতে চণ্ডীদাস বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন :—

"মরম না জানে ধরম ব্যাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥

যে মন্ত্র অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাস দেহস্থ স্বাভাবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও সহজ মানুষের দর্শন লাভ করিয়া নিত্য বংশীধ্বনিতে স্বকীয় মনকে নিরন্তর লীন রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিতও তিনি তাঁহার রচনায় দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই মন্ত্রসাধনার কৌশল সদ্‌গুরুর উপদেশসাপেক্ষ। যে মন্ত্রাভ্যাস বলে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া "নিত্যের দেশে বা পতঞ্জলির ভাষায় বলিতে গেলে "স্ব-স্বরূপে" আত্মার অবস্থিতি লাভ ঘটে শাস্ত্রে তাহাকে অজপা মন্ত্র ও অজপা গায়ত্রী বলিয়া বর্ণনা করা আছে। এই মন্ত্র অন্যান্য নামেও বর্ণিত আছে যথা :—অনাহত মন্ত্র, হংস মন্ত্র, সোঽহং মন্ত্র, ব্রহ্ম মন্ত্র, মূলমন্ত্র, প্রাণমন্ত্র, পুং প্রকৃতি মন্ত্র, শিবশক্তি মন্ত্র, শিক্ষা মন্ত্র ইত্যাদি। উপনিষদ, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রে এই মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বহু উক্তি দৃষ্ট হয়। উত্তর গীতায় ও শ্রীমৎভাগবতে দেখিতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে এই মন্ত্রসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। এই মন্ত্র জপ করিতে হয় না বলিয়াই ইহার নাম অজপা ও মূলাধার হইতে ইহার উৎপত্তি ও ইহা সর্ব্ব মন্ত্রের মূলস্বরূপ বলিয়া ইহার অপর নাম মূলমন্ত্র :—

(ক) "ভাবনস্তস্য মন্ত্রস্য জপমাত্রং ন বিদ্যতে
অজপা তেন বিখ্যাতা শিবশক্তি সমন্বিতা"

(খ) 'মূলত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্রানাং মূলাধারসমুদ্ভবাৎ
মূলস্বরূপলিঙ্গত্বান্ মূলমন্ত্র ইতি স্মৃতঃ"

এই মূলমন্ত্র বা হংসমন্ত্র সাধন ও প্রণব-সাধন একই কথা। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন—"হংসপ্রণবয়োরভেদঃ" এবং এই হংস মন্ত্রই অভ্যাসবশে ক্রমে নাদে অর্থাৎ শ্যামের বংশীধ্বনিতে পরিণত হয় তাহার প্রমাণও উপনিষদে পাওয়া যায়—"হংসো নাদে লীনো ভবতি"।

চণ্ডীদাস মূলাধার হইতে উৎপন্ন এই হংস মন্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

'মূলচক্র হয় হংস যোগের আশ্রয়।"

দেহস্থ স্বাভাবিক উর্দ্ধাধঃ ক্রিয়ামূলেই হং ও সঃ এই দুই শব্দের উৎপত্তি, তাই তন্ত্রেও দেখিতে পাই :—

"সঙ্কোচশ্চ বিকাশশ্চ হং স ইত্যক্ষরদ্বয়ম্"

উপনিষদেও দেখা যায় :—

"সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ
অজপা তেন বিখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষদা সদা"

এক্ষণে এই ঘোর কলিকালে মানবগণ সাধারণতঃ উদরপোষণ চিন্তাপরায়ণ, কাজেই বর্ত্তমান কালে এই সাধনার উপদেষ্টা ও উপদেশানুরূপ সাধন করিবার পিপাসা ও শক্তিসম্পন্ন মুমুক্ষু সাধকের অভাব; তাই এই স্বরূপ সাধন দেশ হইতে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বহু কাল পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন :—

"শিবশক্তিময়ং মন্ত্রং মূলাধার সমুদ্ভবং
তস্য মন্ত্রস্য বৈ ব্রহ্মণ শ্রোতা বক্তাচ দুর্লভঃ"

রামপ্রসাদ, গোবিন্দ চৌধুরী, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণও এই মন্ত্রসাধনা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বরচিত সঙ্গীতেই তাহা বলিয়াছেন চণ্ডীদাসও এই মন্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক
অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক"

চণ্ডীদাসের এই সঙ্কেত সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত বোধগম্য হইবার নহে। সাধন-পথের পথিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত সাধক সম্ভবই নয় ও গুরুকৃপা ব্যতীত কোনও সাধকই অষ্টপাশ মুক্ত হইয়া সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তাই জগদ্‌গুরু দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া গিয়াছেন :—

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা"

ধূলাখেলা

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ধানের ক্ষেতের মেঠো পথটি ধরে'
আপন মনে ঘোরা-ফেরার বেলা,
দেখতে পেলাম আমার পথের পরে
চাষার ছেলে মাণিক করে খেলা।

উলঙ্গ তার শরীর ধূলা মাখা
কোমরেতে ঘুন্‌সিটুকু আঁটা ;
দেখনু ফেলে চরণ আঁকা বাঁকা—
দু'হাত তুলে নেচে নেচে হাঁটা।

ধূলা নিয়ে মাথায় করে' রাখে,
আপন মনে কিযে ব'কে যায় !
সুদূর পথে গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
অলস বেলায় সূর্য্য ডুবে যায়।

সোনার ধারায় সোনার কিরণ আসি,
ছড়িয়ে প'ল সোনার মুখে বুকে।
চাষার ছেলে আপন মনে হাসি ;
ধূলা নিয়ে খেলছে গভীর সুখে।

পথের পাশে সবুজ ধানের ক্ষেতে
হেমন্তেরি শ্রান্ত বিকাল বেলা,
খেলছে বাতাস অলসতায় মেতে ;
ধানের শিষে ঢেউ-এর ছেলেখেলা।

ঘুঘু ডাকে উদাসকরা সুরে
পথভোলা মন কোথায় আজি চলে ;
গুণগুণিয়ে মৌমাছিটি ঘুরে
আধেক ফোটা শ্বেতকমলের দলে।

কাশের বনে ফুল গিয়েছে ঝরে' :
রিক্ত শাখা আজকে শেফালির !
আজ শরতের বিদায়-লিপি করে—
হেমন্ত কি ফেল্‌ছে আঁখিনীর !

দিন ফুরাবার একটু খানি বাকি
হেমন্তের এই শ্রান্ত-বেলায়
সকল দেহ ধূলায় মাখামাখি
চাষার ছেলে মেতেছে খেলায়।

ধূলারে সে করল খেলার সাথী,
ধূলার মাঝে পাতল খেলা-ঘর।
ধূলার মাঝে খুঁজ্‌ছে আতিপাতি
কে যে তাহার আপন কেবা পর।

ধূলার সাথে প্রথম জানা শোনা ;
চোখ মেলিতেই প্রথম প্রভাত-বেলা
মাঠের পথে করতে আনা গোনা
দেখেছিলাম চাষার ছেলে খেলা।

বার্দ্ধক্য-স্বপ্ন

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

আমরা দুইজন বুড়া ও বুড়ী। যৌবনের নিটোল পরিপাটি যে রূপটি তরুণী-কক্ষের কলসীর জলের মতো ছলছল করিয়া টলিয়া উঠিত, তাহা নিঃশেষে ঝরিয়া গিয়াছে।

ঝরিয়াছে অনেক কিছুই! শিথিল চরণে আর চলিবার শক্তি নাই,—সময়ের বৎসর-চক্রে অক্লান্ত ঘুরিতে ঘুরিতে সে শক্তির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে,—পিছনের সুদীর্ঘ পথে খুঁজিয়া মরিলেও আর এক কণা ফিরিয়া পাইব না। স্ফীত চিক্কণ কপোল-ভাগে আজ শুধু দুইটা সঙ্কুচিত বিবর,—যেন আরও দুইটা হাঁ—মৃত্যুর পূর্ব্বে ভোগ্যা পৃথিবীকে গিলিয়া খাইতে চায়। নয়নের নিম্নে কালিমা-রেখা,—যেন রূপ-দর্শনের অশেষ ক্লান্তি তার গাঢ় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। দৃষ্টি স্তিমিত…

এই স্তিমিত দৃষ্টিতেই অপাঙ্গে চাহিয়া দেখি পার্শ্বে বসিয়া আমার চিরদিনের জীবন-সঙ্গিনী প্রিয়া।

প্রিয়া? সে রূপ আর নেই! বিসর্জ্জিত প্রতিমার বর্ণ-বিন্যাস-হীন শুধু একটা শুষ্ক তৃণ-যষ্টি-ময় কঠোর কাঠামো! রস-পুষ্ট দ্রাক্ষা ফল সম অধর-পুটে আজ দারুণ শুষ্কতা! এলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ-কুন্তলে যে কাল-নাগিণী ফণা বিস্তার করিত, আজ শুধু তাহার পাংশুল নির্ম্মোক-খানি গভীর আলস্যে পড়িয়া আছে,—তবে দেখিলে বোঝা যায় এ-নাগিণীর একদা বিষের অন্ত ছিল না। পীনবক্ষের রহস্যময় আবরণ আর নাই, তাহার নিরাভরণ নগ্নতা আজ আর কাহারো কৌতূহল আকর্ষণ করে না।—কিছুই নাই!

কিন্তু আছে। ঐ চক্ষু দুটি। উহারা যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি আছে। হয়ত দৃষ্টি উহাদের আমারি মত অস্পষ্ট, কিন্তু যখনি ঐ উন্মীলিত পদ্মের ভিতরে মণিটীর পানে চাহিয়া দেখি' তখনি চিনিতে পারি—সেই একজনকে।

তাই চাহিয়া থাকি। ঐ দুইটি চক্ষুর ভিতর দিয়া দৃষ্টি ছুটিয়া যায় বহুদূরে,—একেবারে সেই প্রথম রাত্রির শুভ দৃষ্টি পর্য্যন্ত। সে দৃষ্টি যেন আজও বাঁচিয়া আছে। নিশ্চয়ই আছে! ফাল্গুনের সেই বাসন্তী-সন্ধ্যার উৎসবমুখরিত গৃহপ্রাঙ্গণে ব্রীড়ারক্ত কপোল-কক্ষে সেই যে দু'টি সলাজ নম্র আঁখি, আজিও যেন তাহারাই সংসার-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে একখানি বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া বলে,—'নয়ন না তিরপিত ভেল।' সেই ভাষাই যেন আমার বুকের ভিতর ডুকরিয়া উঠে,—যেন গ্রামোফোনের রেকর্ডে সে বাঁধা পড়িয়া গেছে,—কল টিপিলেই বাজিয়া উঠে। তাই মাঝে মাঝে কলটি টিপিয়া দিই। বৃদ্ধ-বয়সের নিকর্ম্মা অবকাশের একটি অদ্ভুত খেয়াল!

সন্ধ্যার শুকতারাটি যখন অন্তিমের উদাস দৃষ্টির মতো আকাশের সুনীল মৃত্যুর বুকে ভাসিয়া উঠে,—বুড়ী তার মৃণ্ময় প্রদীপটি জ্বালিয়া নিয়া আমার ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসে, আমি তার মুখের পানে চাহিয়া রই। চক্ষের পলক থামিয়া যায়, হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত চলে। চমকিয়া উঠি। দেহ কাঁপিয়া উঠে; সঙ্কুচিত জীর্ণ বক্ষে কিসের প্রসারণ উদ্বেল হইয়া পড়ে—আলিঙ্গনের জন্য! ভবিষ্যতের আশায়-ঘেরা যৌবনের যে তৃষিত দৃষ্টিখানি সেই ফুলশয্যারের পরিচয়ের অবগুণ্ঠন-তলে উঁকি মারিয়াছিল,—সেই যেন আবার আমার স্তিমিত নয়নের কোণে কোণে ফিরিয়া আসে—শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার অন্তরালে অস্তমান ভানুর করুণ রশ্মিটির মতো।

আগুন এখনও নিভে নাই। ঘরের প্রদীপ-শিখা ঝির-ঝিরে হাওয়ায় নাচিয়া নাচিয়া উঠে। বুড়ীকে আহ্বান করি। সে আমার নিকটে আসে।

পাশের কক্ষে ছেলেরা সাংসারিক ব্যাপারে ব্যস্ত; সাত বছরের নাতীটা দর-দালানের চারিদিকে বিড়াল ছানাটা ধরিবার জন্য ছুটিয়া বেড়ায়; বাহিরে প্রাঙ্গণে গাছের তলায় চাঁদের আলো স্বপ্নের জাল বোনে। বুড়ী ধীরে ধীরে আমার পাশে আসিয়া বসে, বলে,—কি?

—"দেখো, আর ক'দিনই বা বাঁচবো, চলো দুজনে বৃন্দাবন গিয়ে বাস করি।"

—"চিরকালই ত ব'লে আসছো, গেলে আর কই?"

—"না, না, এবার ঠিক যাবো। যমুনার জল আমার বড় ভালো লাগে: পরিষ্কার তরতরে জল—শ্রীরাধার অশ্রুধারা, ভক্তের চিরদিনের পিপসার শান্তি।"

বুড়ী আমার গা ঘেঁসিয়া আরও চাপিয়া বসে।

—"কিন্তু, তেষ্টা আরও বেড়ে যায়, চান ক'রে বুকের জ্বালা নেবে না, মনে হয় ডুব দিয়ে মরি।"

বুড়ী বলে,—"তা সত্যি।"

—"কিন্তু মরতেও ইচ্ছে হয় না, মনে হয়, ঐ জলে বুক ভাসিয়ে চিরকাল কাঁদি।"

বুড়া বলে,—"কাঁদবে কেন? তার চেয়ে ম'রে শান্তি পাওয়াই ত ভালো।"

তাই ত! কাঁদিব কেন? সারা জন্ম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাঁচিয়া যাওয়ায় কি তৃপ্তি আছে? কিন্তু মরণে কি শান্তি পাওয়া যায়?

বড় পিপাসা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের অশ্রু নিজে পান করিব, তাই ত কাঁদিতে ইচ্ছা করে। বুড়ী, তুমিও আমার চোখের জল—যৌবনের পিপাসা ফাটিয়া বাহির হইয়াছিলে। তুমি আমারি ভিতরের জিনিষ, তোমাকে আমি পান করিতেছি। শ্রীরাধাও ত অনন্তকাল কাঁদিতেছেন,—আপনার অশ্রুধারায় শ্যাম সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শ্যাম কালিন্দীকেই ত অনন্তকাল ধরিয়া পান করিতেছেন। কিন্তু তৃষ্ণা ত মিটে না!...

প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠে। শরীরে কিসের পুলক-শিহরণ মাতিয়া যায়। সহসা বুড়ীর হস্তখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিশ্চল বসিয়া থাকি।

তৃষ্ণা? কামনা? না, কাঁদিবার ইচ্ছা?...

কিসের তৃষ্ণা? এই বুড়ী ত আজ বাদে কাল মরিবে। চিতার আগুনে সব শেষ! ধূ ধূ করিয়া লেলিহান শিখায় পুড়িয়া সমস্ত দেহ ছাই হইয়া যায়!

কিন্তু ঐ খানেই কি সব শেষ? হয় ত নয়। সে-ছাই ছড়াইয়া পড়ে,—মৃত্তিকার কণার সঙ্গে মিশিয়া অনন্তলোকে মিলাইয়া যায়; সেই চিতা-ভস্মই ত আবার রসের ক্ষুধায় কাঁদিয়া উঠে। বৃক্ষ-লতার পাতায় পাতায়, পুষ্পের পরাগ রেণুতে, তৃণের শীর্ষে শীর্ষে সেই ত আবার সর্ব্বগ্রাসী পিপাসা নিয়া কাঁদিয়া উঠে,—জলের পিপাসা, আলোর পিপাসা, আকাশের পিপাসা—বাঁচিয়া থাকার অনন্ত পিপাসা!

হায়, সেই চিতা-ভস্মও কাঁদে! আমি যেমন কাঁদিতেছি শৈশবের আবদার নিয়া, যৌবনের তৃষ্ণা নিয়া, বার্দ্ধক্যের অতৃপ্তি নিয়া,—আমার এই দেহের ভস্মও তেমনি কাঁদিবে। রোদনের শেষ কোথায়? বিশ্ব ব্যাপিয়া ক্রন্দসী প্রকৃতি কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

২

বুড়া হাঁ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আমার হাতের উপরে একবার হাত বুলায়, হয়ত ভালো লাগে। তারপর ছাড়িয়া দিয়া নাতীকে কোলে নিয়া আদর করিতে বসে। বোধ হয় আরও বেশী ভালো লাগে।

বার্দ্ধক্যের ভীমরতি! বেশ বসিয়া থাকি—সহসা মনে হয় আমি বৃদ্ধ নই। বুড়ীর বিশীর্ণ চিবুকখানি সহসা তুলিয়া ধরিয়া গ্রীবা প্রসারিত করি। দেহে রোমাঞ্চ। বুড়ীর আশ্চর্য্য লাগে। নাতীটা অবাক্ হইয়া তাকাইয়া দেখে, আবার হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলে।

বুড়ী সরিয়া যায়। নাতী লাফাইয়া কোল অধিকার করিয়া আপনার মুখ বাড়াইয়া দেয়। আমি দুর্ব্বল হস্তে তাহাকে প্রাণপণে বুকে জড়াইয়া লই। অসংখ্য চুম্বনে বিরক্ত হইয়া সে আপনাকে ছিনাইয়া মুক্ত করে। বুড়ী তাহার পিছনে চলিয়া যায়।

* * * *

রজনী দ্বিপ্রহর। তামাক খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। গড়গড়ার নলটা বুকের উপর সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। হয়ত ঠিক নিদ্রা নয়,—তন্দ্রিত মনে ভাবিতেছি, কি স্বপ্ন দেখিতেছি জানি না।

অনেক কিছুই চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে,—ছিন্ন ভিন্ন, জীর্ণ দীর্ণ, ধৌত গলিত অসংখ্য ছবি; কিন্তু অসংলগ্ন নয়।

মৃত্তিকা-নিম্নে খনন-লব্ধ বহু শতাব্দীর পুরাতন ফ্যারাও রাজার সখের তৈয়ারী একটি আর্ট-গ্যালারীর মতো। ছবিগুলি যেন সচেতন হইয়া বলে—আমরা এখনো মরি নাই,—তোমার আজিকার রাত্রি যেমন জাগিয়া আছে, তেমনি জাগিয়া আছি।

শুনিয়া আমি হাসি; ছবিগুলির অস্পষ্ট আচ্ছন্ন অবয়ব স্পষ্টভাবে দেখিবার জন্য সজোরে চক্ষু বিস্ফারিত করি। সব অদৃশ্য হইয়া যায়। শুধু দেখি, বুড়ী আমার বুকের উপর হইতে সর্পিল নলটি সরাইয়া রাখিতেছে।

স্তিমিত প্রদীপের তৈল কমিয়া আসিয়াছে। বেশ অন্ধকার। বাহিরে বেলগাছটায় একটি পেচক ডাকিয়া উঠিল। বুড়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

মাথা ধরিয়াছে, বুকে পিঠে অসহ্য জ্বালা। কয়েক দিন হইতেই শরীরের অবস্থা ভালো নয়। ছেলে ডাক্তার ডাকিতে চাহিয়াছিল, নিরস্ত করিয়াছি। বলিয়াছি, ও কিছু নয়, বুড়ো হ'লে অমন হয়।

বুড়ীর চোখে তন্দ্রা, তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম। সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল, শুধাইল, কি? বলিলাম,—শোন, বড় জ্বালা! এসো কাছে এসো—একেবারে বুকের উপর। এসো আজ দুজনে এক সঙ্গে মরি। বুড়ী আবার চমকাইল; শিহরিয়া বলিল, সে কি? বলিলাম,—এই যে, আমার আফিঙের কৌটায় বিষ আছে, নাও, খাও—তুমি অর্দ্ধেক, আমি অর্দ্ধেক। বুড়া অবাক্। মন্দ কথা নয়ত; গিয়া প্রদীপটা উস্কাইয়া দিল—আরও একটু আলো! তারপর বুড়া হাত বাড়াইয়া বলিল—কই, দাও; ছাড়াছাড়ির চেয়ে এই ভালো।...

অসহ্য যন্ত্রণা বিষের। দুই জনে পরস্পরকে বুকে বুকে যথাসাধ্য জড়াইয়া ধরি,—প্রগাঢ়তম আলিঙ্গন! অব্যক্ত জ্বালায় উভয়ের দেহ যেন গলিয়া ঝরিয়া এক হইয়া যায়। বক্ষের ভিতরে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায়। দুই জনে মিলিয়া যেন মৃত্যুর একটি পরিপূর্ণ মূর্ত্তির মতো পড়িয়া থাকি। তারপর ধীরে ধীরে জ্বালা কমিয়া আসে। স্পর্শের অনুভব শিথিল হইয়া আছে, যেন পরম আলিঙ্গনে সম্পূর্ণতা আসিয়াছে।

শুধু মনে হয়—আছি। চক্ষে যেন এখনও জগৎটা অদৃশ্যমান স্বপ্নের মতো ভাসিতেছে। এই জগৎ এখনি অন্ধকারে লীন হইয়া যাইবে? অন্ধকার—বড় অন্ধকার! জীবনের সুন্দর পৃথিবী ঐ বুঝি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। আমি কোথায়? এখনো আছি। কিন্তু শুধু 'আছি' নয়, আর কে আছে? বুড়ী কই? রূপহীন অস্তিত্বের এই একত্ব আমি চাহি না,—জীবনের রূপসী দ্বিতীয়া আমার কই? আমি তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে চাই...

* * * *

জোরে চক্ষু মেলিলাম—ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, শয়ন করিয়া আছি আমার পালঙ্কের উপর। পার্শ্বে আমার প্রিয়া, বুড়ী নয়, পঞ্চদশী বালিকা; আমার বয়স বাইশ। বধূর চোখে প্রশান্ত নিদ্রার ছায়া, তাহারি নীচে আনন-কমলে তৃপ্তিময় বিকাশ। তাহার বামকরপল্লব গভীর নির্ভরতায় আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়াছে। সেই সুস্পষ্ট বাস্তব ছবিটির পানে নিবদ্ধ-দৃষ্টি চাহিয়া রহিলাম,—আমার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ধীরে, কেন জানি, নয়নে অশ্রু ঘনাইয়া আসে; বৈষ্ণব কবিতার একটা অর্দ্ধ বিস্মৃত পদ মনে জাগে—'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

ব্যাল্‌জাকের প্রতিভা

শ্রীফণীন্দ্র পাল
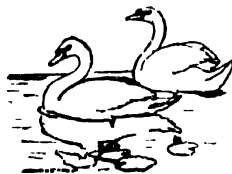
সুষুপ্ত রাত্রির তন্দ্রালু নিথর আকাশের নীচে উপরতলার ঘর; বড় টেবিলটির উপর তেলের বাতিটি তখনও প্রদীপ্ত—সবুজ রঙের আবরণের ওপাশে একটি মানুষের ঝাঁকড়া চুলে ঘেরা প্রকাণ্ড মাথাটা তাহার সম্মুখে কাগজের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। বৃহৎ বাড়াটিতে একটিও শব্দ শোনা যায় না; গ্রীষ্মের প্রখরতার জন্য উন্মুক্ত বাতায়নটি দিয়া বহু নিম্নের নিদ্রিত প্যারিসের অসম নিশ্বাসের মৃদু গুঞ্জন ভাসিয়া আসে। বলনাচের মজলিশের শেষ নর্ত্তকীটি বহুক্ষণ নাচের পোষাক খুলিয়া শয্যাশ্রয় লইয়াছে, যে সমস্ত বিক্রেতারা সবার পূর্ব্বে হাটে যাইবার জন্য ব্যস্ত তাহাদের এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। এমন কি প্রণয়মত্ত যুবক যুবতীরা হঠাৎ জাগিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে—তাহাদের চাপাকণ্ঠের মৃদু রেশ প্যারিসের অসংখ্য প্রাচীরের আড়ালে মিলাইয়া যায়।

কিন্তু এই সঙ্গীহীন বিনিদ্র মানুষটী টেবিলের নিকট বসিয়া; তাহার হাতের ক্ষিপ্র চঞ্চল লেখনীটি একটির পর একটী সাদা কাগজে স্ফুলিঙ্গের মত অবিরাম কথার গাঁথুনী গাঁথিয়া চলে।

প্যারিসে তিনি প্রহরী। রাজধানীর শীর্ষে বসিয়া রাত্রির পর রাত্রি তাঁহার চোখে ঘুম নাই, শতাব্দীর প্রতি ঘণ্টার সকল পরিবর্ত্তন, বিভিন্ন গতির হেতু-অনুসন্ধানের কর্ত্তব্যের জন্যই যেন তাঁহার বাঁচিয়া থাকা—এ যুগের চিরজাগ্রত সতর্ক প্রহরী তিনি। সুখ দুঃখের চেতনা লইয়া যে মানুষগুলি এখন তাঁহার ঘরের বহু নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন তাহাদের জাগ্রত মহুর্ত্তগুলির অতি সুপরিচিত উপাখ্যান, তাহাদের ব্যর্থ প্রণয়ের সকরুণ ইতিহাস আর সার্থক প্রেমের পরিতৃপ্ত উল্লাস। প্রতিদিন জীবন মরণ যুদ্ধে নশ্বর প্রাণীর বাঁচিয়া থাকার যে প্রয়াস, যে ব্যাকুলতা, যে কঠোর দুঃখ দৈন্য সন্তাপের পুঞ্জীভূত ব্যথিত হাহাকার তাই তাঁহার রচনার ভিতর সুতীব্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে. অপরিসীম সহানুভূতিতে সে রচনা উদার। সেই গভীর নিশীথের দুয়ারে বসিয়া তিনি বিষণ্ণ মূক অন্ধকার-জীবনের মুখে দিলেন ভাষা, লাঞ্ছিত অপমানিত নিরাশের বুকে দিলেন আশ্বাস।

ফরাসীদেশের নিকট ও দূর অধিবাসীরা তাহাদের জীবনের বাস্তব গল্পগুলি তাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়াছে-উপরতলার জানলার সম্মুখে দাঁড়াইলে প্যারিসের ভাইগুলিকে তিনি দেখিতে পান—আশে পাশের সেই ছোট ছোট গ্রাম, অসম্পূর্ণ সহরের জীবনযাত্রার সহিত নিত্য তাঁর দেখাশোনা, দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ তাঁর পরিচয়।

জীবন প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিল তিনি এখানে বসিয়া তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের সৃষ্টি করিতেছেন, কত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের চরিত্রগুলি সমবেত হইল; তাহাদের জীবনের গতিতে তিনি দিলেন সুর। তাঁহার নিকট নানা ভঙ্গীতে মানব-মানবীরা আসিয়া দাঁড়ায়—মুসাফির, জীর্ণ কুঁড়ের অতৃপ্ত অধিবাসী, প্রাসাদের অধিকারী ডিউক মার্কুইসের দল, এমনি স্বতন্ত্র স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মানব ও মানবসমাজের সমষ্টি—সংখ্যায় প্রায় দুই হাজারের উপর। এই বিশাল পৃথ্বীর বিস্তীর্ণ পথে তাহারা যেন যাত্রী-সঙ্ঘ আর তিনি ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিয়া তাহাদের পথের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। একটি যুগের প্রতিকৃতি নেওয়ার কাজ তাঁহার হাতে, একটি সূক্ষ্মজগতের পর্য্যবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহারই।

এইবার তিনি সহচরকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য উঠিলেন. এই দীর্ঘ বিনিদ্র বিভাবরীতে সে পাশে না থাকিলে তাঁহার বাঁচা দুষ্কর—সে তাঁহার জীবনীশক্তির উদ্দীপনার সহায়—শয্যার পাশেই একটি আয়না ঝুলানো। সেখানে একজনের চেহারা প্রতিফলিত, শ্বেত শ্লথপরিচ্ছদ তাপসের মত নিজের প্রতিকৃতি তাঁহার চোখে পড়িতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকার ফলে তাঁহার শরীর স্থূল এবং সেই কারণে পরিচ্ছদের বন্ধনী-ফিতাগুলি

বাঁধা না হইয়া ঝুলিয়া আছে; ত্রিশের কোঠায় যে মানুষ সবেমাত্র পৌঁছিয়াছে তাহার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ রকমের বৃহৎ তাঁহার গ্রীবা, আর নিশ্বাসরুদ্ধ মানুষের আরক্ত মুখের মত তাঁহার মুখ সর্ব্বদা বর্ণোজ্জ্বল। প্রকাণ্ড মাথার নীচে দীর্ঘ উন্নত নাসিকা, পুষ্ট অধরোষ্ঠ—নিবিড় ঘন কেশ, বিভক্ত চিবুক—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সংযমবিরুদ্ধ রুচিহীন অমার্জ্জিত ভোগবিলাসীর পরিচয়।

তাঁহার কবিবন্ধু গতিয়ো কিন্তু বলিয়াছেন, "তাঁর দুটি চোখ কী আশ্চর্য্য! তাদের ভেতর আছে প্রাণের অফুরন্ত সাড়া, প্রতিভার দীপ্তি, চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি। তন্দ্রাহীন রজনীর অত্যাচারেও সে চোখে শিশুর স্বচ্ছতা, কুমারীর দৃষ্টির অপরূপ মাধুর্য্য। প্রাচীরের পরপারে হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত সেই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনায়াসে গিয়া পৌঁছায়; তাহাকে প্রবঞ্চনা করা চলে না। সে চাহনিতে দুষ্ট ছেলের দুরন্তপণা থাকিয়া যায়। সে-দুটি চোখ যেন এক মহিমান্বিত নেতার, দৃপ্ত বিজয়ীর…"

দেখিলে কবি বলিয়া মনে হয় না। এমন কি ফরাসীদের সঙ্গেও তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই। রুক্ষ স্থূল চেহারার ভিতর অদ্ভুত দুটি চোখে যেন যোগীর তন্ময়তা মাখানো। সন্ন্যাসসাধনার মত সেই জন্যই বুঝি তিনি দিনরাত্রির আঠারো ঘণ্টা কাজের নেশার ভিতর নিজেকে স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন দিয়াছেন।

প্রত্যূষে দিবসের কোলাহল সুরু হইয়াছে তখনও ক্লান্ত কম্পোজিটারের দল অপ্রসন্ন মনে টাইপ্-কেসের সম্মুখে বসিতেই দেখে সুন্দর অথচ দ্রুত হস্তাক্ষরের গোছা গোছা পাণ্ডুলিপি। সে রচনার লেখা পড়া অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এই লেখকটির বাস্তবতার সীমা নাই। এখনি হয়তো আর এক বোঝা রচনা উপস্থিত হইবে সুতরাং তাহাদের ক্ষিপ্র হওয়া ছাড়া অন্য উপায় কি?—বেচারীরা হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

মধ্যাহ্নে তাঁহার সঙ্গে হয়তো কোন বন্ধু সাক্ষাৎ করিতে আসে। প্রতি রাত্রের নব নব সংগ্রামে জয়ের উন্মাদনায় তিনি তখন দীপ্তিমান, উচ্ছ্বসিত। প্রচুর আহারের পর গল্প করিতে আরম্ভ করেন। আলাপ আলোচনায় তাঁহার প্রাণের উন্মত্ত আবেগ সর্ব্বদা প্রবহমান, সর্ব্বদা তাঁহার ভিতর গতির চাঞ্চল্য, ব্যবসার ফন্দী ও মতলব উদ্ভাবন কল্পনায় সকল সময়ে তিনি উদ্‌গ্রীব।' আমোদ করিবার অবসর তাঁহার কোথায়? কে যেন সকল সময়ে তাঁহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

এই শ্রান্তিক্লান্তিহীন আশ্চর্য্য মানুষটিই ব্যালজাক্, ফরাসী জীবনের সত্যদ্রষ্টা, ফরাসী কথা-সাহিত্যের সুনিপুণ শিল্প-গুরু।

বেমব্রাঁর মত ব্যালজাকেরও নীচ বংশে জন্ম। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের কেহ চাষা, কেহ শ্রমিক কেহ বা মজুর। ব্যালজাকের পিতা বাল্যকালে মাঠের কাজ করিতেন। সেখানকার ধর্ম্মযাজকটি কি জানি কেন সেই কৃষক ছেলেটিকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। ফলে, তাঁহার পিতা মাঠ ছাড়িয়া অফিসারের পদে নিযুক্ত হন এবং এই সূত্র ধরিয়া আপনাকে মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবিষ্ট করান। এই আবর্ত্তনের ফলে তিনি একটি ভাল চাকুরী পান, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে একটি তরুণীর সঙ্গে পরিণীত হইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন ও সেই নগরের রাজকীয় শাসন-বিভাগে কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবৈধ সন্তানের স্বপক্ষে তাঁহার কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ আছে এমন কি লেখনী হাতে তিনি নিজের একটি চিত্রও আঁকাইয়াছিলেন, কিন্তু এই ভঙ্গী তাঁহাকে একেবারেই মানায় নাই। যে সকল শ্রমিক যুদ্ধে গিয়া নেপোলিয়ানের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছে তিনি দেখিতে ঠিক তাহাদেরই মত বলিষ্ঠ। তিনি র‍্যাবেলায়ের মত গ্রাম্য অসংস্কৃত চতুরতায় পূর্ণ, সুখবিলাসী ও রসিক ছিলেন। আপনার সমস্ত স্বাস্থ্য, প্রফুল্লতা ও সাহস তিনি তাঁহার পুত্রকে দান করিয়া গিয়াছেন।

অতৃপ্ত, বায়ুকুণ্ঠ, স্নেহ মমতাহীন স্বভাবের নারী ছিলেন ব্যালজাকের জননী। পরে ব্যালজাক নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার মাতা তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন—"আমি মনে করি—আমি চির জীবন মাতৃহারা; জন্মাবার পর থেকে ধাত্রীরা আমায় মানুষ করেছে। পৃথিবীতে আমার আসার প্রথম দিন হ'তেই মা আমাকে ঘৃণা করেছেন। চার বছর হ'তে ছ'বছরের ভেতর মাত্র রবিবার দিন আমি মার দেখা পেতাম। সাত বছর হ'তে চোদ্দ বছরের মধ্যে

মাকে আমি দেখেছি মাত্র দুইবার। বাবা বলেন যে পৃথিবীতে মার চেয়ে বড় শত্রু আমার আর হবে না।"

সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের নূতনত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবক ব্যালজাক তাঁহার গৃহের সঙ্কীর্ণ নিরানন্দ গণ্ডীর বাহিরে ছুটিয়া গেলেন। Vendomeর বিদ্যালয়ের দিনগুলি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠোর। ক্লাসের সময়ের পরেও তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখা হইত, প্রহারের পরিমাণও তাঁহার ভাগ্যে ছিল প্রচুর। সেখানকার লাইব্রেরীর ভার ছিল একটি বৃদ্ধ যাজকের হাতে। ব্যালজাককে তিনি তাঁহার পুস্তকাগারে নিজের ইচ্ছামত অধ্যয়ন করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। শৈশব যে বালকটিকে কোন শিক্ষাই দেয় নাই, কৈশোর সেই ছেলেটিকে অতৃপ্ত অধ্যয়ন-তৃষ্ণায় মাতাইয়া তুলিল। তিন বৎসর ধরিয়া তিনি অবিশ্রান্ত পড়িয়া চলিলেন, উন্মাদের মত ব্যগ্রচিত্তে অনাহারে লোভাতুর ভিখারীর মত। কিন্তু এত বেশী উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইল, কিছুদিন পরেই অসুস্থ বালক ব্যালজাককে ঘরে আনা হইল; জরাক্রান্ত, অবসন্ন, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অর্দ্ধচেতন অবস্থায় তিনি শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

প্রকৃতির সেই প্রথম সতর্কীকরণ ব্যালজাক যদি ভ্রূক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন যে অত্যন্ত সুখ ও শান্তিময় হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপও তাঁহার সাহিত্যের অমূল্য দান হইতে বঞ্চিত থাকিত। কিন্তু নিয়তির হয়ত' ইচ্ছা ছিল যে সাহিত্যের এই সকল অপূর্ব্ব অবদান শুধু তাঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে —সুতরাং প্যারিসে বিদ্যাশিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইবার পর আইন শিক্ষাকালে বিশ্বগ্রাসী পাঠের নেশায় তিনি লেখক হইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বিশ বৎসর।

একটি চমৎকার নাটক রচনা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রখ্যাত করার উচ্চাশা তাঁহার মধ্যে ছিল। নিজের প্রচুর কল্পনাশক্তির সম্বন্ধে তিনি সচেতন। কিন্তু রাজনৈতিক বা ব্যবসায়ের পথ ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করার মূলে ছিল তাঁহার অধ্যয়ন-তৃষ্ণার্ত্ত মনের স্বাভাবিক বিকাশ। প্রথমে লেখক হওয়ার আসক্তি বা সাহিত্যের সাহায্যে অমর যশের আকাঙ্খা তাঁহাকে এই জীবনের পথে পরিচালিত করে নাই। সম্ভ্রম, অর্থ ও স্বাধীনতার লোভই তাঁহাকে সাহিত্যের পথে টানিয়াছিল।

শ্রমিকজাতীয় দরিদ্র, নগণ্য ব্যালজাকের সম্মুখে অর্থ ও সম্ভ্রমের দুরারোহ পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের শিখরে তাঁহাকে উঠিতেই হইবে। বিশবৎসর বয়সে ব্যালজাক অভিযানে বাহির হইলেন। সেই অদম্য প্রচেষ্টার যে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যের দুরূহ সাধনাদ্বারা যে সাফল্য তিনি অধিকার করিলেন, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিরল। বিশবৎসর হইতে সুরু করিয়া ত্রিশ বৎসর ব্যাপী সাধনার পর যখন তিনি সর্ব্বোচ্চ শিখরে গিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার জীবনীশক্তির উষ্ণতা নিঃশেষ হইয়া গেছে; অপরিসীম অবসন্নতার বেদনায় তিনি লুটাইয়া পড়িলেন—মৃত্যু তাঁহাকে পৃথিবীর গৌরবান্বিত আসন হইতে ছিনাইয়া লইল। সাহিত্য-সংগ্রামের বিজেতা ব্যালজাক সেখানে পরাজিত হইলেন।

ব্যালজাকের পিতামাতা তাঁহাকে আদর্শ আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রায় প্রবেশ না করায় তিনি পিতার আশ্রয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

বিতাড়িত ব্যালজাক প্যারিসের একটি নগণ্য পল্লীতে স্বল্প ভাড়ার ঘরে আশ্রয় লইলেন। ব্যালজাকের লেখনী চলিতে লাগিল, পদদেশে ধূমায়িত কফির পেয়ালা। সকাল বেলার আহারের খরচ মাত্র দুই সু, ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য একদিন অন্তর মধ্যাহ্নে আহার করেন, তাহার খরচ লাগে মাত্র নয়টি সু। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমার আহারের খরচের চেয়ে তেলের জন্য খরচ হয় বেশী। ঘরের আলোর জন্য ঘরের ভাড়ার চেয়ে আমার বেশী ব্যয় হয়।"

চারিপাশে তাঁহার নির্দ্দয় দুর্ভিক্ষ। দারিদ্র্যের সহিত তাঁহার এই সংগ্রাম দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ ও শান্তিহীন। তন্দ্রাহীন শর্ব্বরী একটির পর একটি অতিবাহিত হইতে লাগিল—ব্যালজাক্ বাসয়া বসিয়া Alexandrian ছন্দের মাত্রা দিয়া নাটকাকারে Cromwellএর জীবনী রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কেবলি মনে হইতেছে পদ্য লেখার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ জগতে বোধ হয় আর নাই;

হয় ছন্দপতন, নয় মিলের ভুল কোথাও না কোথাও লাগিয়াই আছে। অবশেষে একদিন নাটকটির শেষ অঙ্কের যবনিকা টানিয়া তিনি সেটি তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে পড়িয়া শুনাইতে চলিলেন। নির্ম্মম বিদ্রূপের মাঝে সেদিন সেকি ভীষণ পরাজয় তাঁহার!

সকলেই ভাবিল নিজের অক্ষমতার পরিচয় যখন জানিতে পারিবেন তখন তাঁহার আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া আর গতি কি! তিনি মাথা নাড়িয়া প্রফুল্লভাবে বলিলেন, —'বিয়োগান্ত কিছু বা নাটক লেখবার শক্তি আমার নেই। বোধ হয় উপন্যাসে আমার হাত খুলবে।'

আবার সেই নিদ্রাহীন রজনীর অক্লান্ত অধ্যবসায়। ফলে তেইশ হইতে ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে দুই ডজন নভেল লিখিয়া ফেলিলেন। এই সকল রচনার ভিতর তাঁহার প্রতিভার কোন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু ছদ্মনামে সেগুলি বাজারে চালাইয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

এই সঙ্গে তিনি একটি ছাপাখানাও খুলিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত লেখক রিচার্ডসনের মত নিজের রচিত পুস্তক নিজে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়া ধনী হওয়ার আকাঙ্খায় তখন তিনি ব্যস্ত। কিন্তু নানা দুর্বিপাকে পড়িয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সফল হইল না; এমন কি ছাপাখানাটিও উঠিয়া গেল।

সাতাশ বৎসর বয়সে এই উদ্যম এবং প্রমিসরি নোট, ঋণদাতাদের ব্যবহার, শাসন-বিভাগের নানা নিয়ম কানুন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলে সমসাময়িক সাধারণ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার একটি ভাবপ্রবণগভীর অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন পরিস্ফুট হইল। বিশেষ করিয়া কতকগুলি ঘটনার জ্ঞান তাঁহার প্রগাঢ়তা লাভ করিল। এই অভিজ্ঞতার পর তিনি বুঝিলেন স্বপ্নের ছড়াছড়ি করার সময় সে নয়। জীবনে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে মতামত তাহাই তিনি রচনায় আলোচ্য করিলেন। ব্যালজাকের তখন জ্ঞান হইয়াছে যে অর্থই হইতেছে যুগের প্রকৃষ্ট প্রলোভন। সুতরাং যুগ অনুযায়ী লেখার চেয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আর অন্য কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে!

দুই বৎসর পরেই ব্যালজাকের খ্যাতি লাভ হয়। আটাশ হইতে ত্রিশের মধ্যে তিনি নিজের নামে "Scenes de la Privee"র দুই খণ্ড "Peau de Chagrin" এবং "Contes Drolatiques"'এর প্রথম দশটি রচনা প্রকাশ করেন। সুদ-খোর Gobseck এর চরিত্র তাঁহার প্রথম চমৎকার মৌলিক সৃষ্টি।

ইহার পর ব্যালজাক আরও বিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত অবধি তাঁহার এক উন্মাদ আশা ছিল যে আপনার প্রতিভার প্রভাবে তিনি পূর্ব্বের সমস্ত বিফলতা রদ করিয়া লক্ষপতি হইবেনই। ঋণ পরিশোধ ও নিজের ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জনের প্রয়োজন লইয়া তিনি সর্ব্বদা কোন একটি সুযোগে অর্থবান হওয়ার চেষ্টায় থাকিতেন। Beaumarchais ও Voltaire তাঁহাদের রচনা দ্বারা ধনী হওয়ার কল্পনা করিতে পারেন নাই বরং দারিদ্র্যের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও হিসাবী ছিলেন। কিন্তু ব্যালজাকের এই দৃঢ় বিশ্বাসের সম্মুখে ছিল Scottএর সাফল্যের উদাহরণ।

কিন্তু তাঁহার এত অর্থ-তৃষ্ণা কেন? প্রণয়িনীদের খেয়াল খুসীর জন্য অথবা জুয়াখেলার নেশার জন্য এত অর্থের প্রয়োজন হয় না, অথচ কি কারণে তাঁহার এই অর্থগৃধ্নুতা ও প্রচুর ঋণ?—তাঁহার একটি খেয়াল ছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ কিনিয়া তিনি ঘর সাজাইতেন।

মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও সারত্ব সম্বন্ধে যিনি প্রধান লেখক এবং যিনি ক্ষণপ্রভা, নিঃসার অভিজাত নারীদের ধ্বংসাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন সেই ব্যালজাকের পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কাম্য ও উচ্চাকাঙ্খা ছিল অভিজাত সমাজে নিজেকে প্রবেশ করানো।

রেমব্রাঁ তাঁহার মধ্যজীবনে জগতকে দিতে চাহিয়াছিলেন অদ্ভুতত্ব ও আড়ম্বরের দৃশ্য। কিন্তু তিনি তাঁহার ঘরের সজ্জা, সুন্দরী স্ত্রী সাস্কিয়া, শৃঙ্খলের ও আয়নার স্বপ্ন আর চিত্রকরের দৃষ্টিতে আলোছায়ার বিন্যাস লইয়া বিভোর ছিলেন।—সাস্কিয়ার মৃত্যুর পর যেদিন তাঁহার জীবনের মায়ামুগ্ধ স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল সেদিন তিনি ছোট রূপসজ্জাহীন ঘরে বসিয়া রাজার মত করিয়া ভিক্ষুকদের রূপ দিলেন রঙের লীলায়। কিন্তু ব্যালজাকের জীবনে এই উন্মত্ততা চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে এবং এই মোহময় মিথ্যা

বাসনার নিকট তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। জনসমাজের শক্তিসম্পন্ন কঠোর এই সমালোচকের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দম ইচ্ছা পার্লামেণ্টের জন-প্রিয় নেতা হওয়া নয়, ফ্রান্সের অভিজাত সমাজের সমকক্ষ হওয়া। এজন্য তিনি ঋণ করিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের নরনারীদের ভোজ অবধি দেন। এমনি ব্যালজাকের অভিজাত হওয়ার স্পৃহা।

নিজের রচনার সম্বন্ধে ব্যালজাকের আত্মবিশ্বাস অগাধ। তিনি তাঁহার রচনার ভাব ও ভাষা অপহরণ নিষেধ করিবার জন্য আইনের সাহায্য লইয়াছেন অনেকবার। মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে একটি ভূমিকা লিখিয়া ফেলিতেন। সেই ভূমিকা-সম্বলিত পুস্তকের দুইটি সংস্করণ দুই দিনের মধ্যেই বাজারে বাহির হইত। একটি পত্রিকা বাহির করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে এই পত্রিকাটি অন্যান্য সমস্ত কাগজকে চাপাইয়া যাইবে। অবশেষে একদিন দেখা গেল পত্রিকাটির জন্য তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। উপন্যাস ও গল্প-রচনা ছাড়া তিনি ছোট ছোট চরিত্র-চিত্রণ, সম্পাদকীয় ও সংবাদ-পত্রে প্যারিসের পত্র লিখিতেন। তামাক, মদ, নূতন সচিব সভা, মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি, ভাল আহার প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার কোন বন্ধুকে একদিন বলিয়াছিলেন—"Every thing must file past, the light penny literature as well as the society novels and the great thoughts which no one understands."

কাজ করিবার প্রচুর শক্তি সম্বন্ধে নিজের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল প্রচুর। সেইজন্য স্বেচ্ছায় তিনি নূতন নূতন কাজের দায়িত্ব লইতে সাহস করিতেন এবং কাজের পরিমাণের সহিত তাঁহার পরিশ্রমের পরিমাণও বাড়িয়া চলিত। ব্যাল্জাক্ বলিয়াছেন,—"If the artist does not plunge into his work like Curtius into the abyss, if he does not toil within the crater like a miner buried alive.. then he is guilty of murdering his talent. For this reason the same reward, the same laurels are held out to the poet as to the leader of an army" এই প্রচুর কর্ম্মশক্তির ফলে বাইশ বৎসর সাহিত্য-সাধনায় শতাধিক সম্পূর্ণ উপন্যাস পৃথিবীর চারিদিকে ব্যালজাকের খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ব্যালজাকের প্রথম বয়সের ছবিতে দেখি একটি যুবক, বিস্তৃত উদার উৎসুক দুটি চোখ—সে চোখে না আছে চিন্তার গাম্ভীর্য্য, না আছে জাগার অতি সতর্ক চেতনা; তিনি তখন শুধু বাস্তব-জগতের প্রতি বস্তুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছেন। যাহা কিছু শোনেন অথবা পাঠ করেন সব কিছু তাঁহার মনে চিত্রের মত রূপান্তরিত হয়। সমসাময়িক জীবনের আহ্বান তাঁহার ক্ষমতাকে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার সাহায্য করিয়াছে। সেই জন্যই অতীতের আলোচনা তাঁহার রচনায় কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়; এবং অতীত বিষয় লইয়া তাঁহার যে কয়েকখানি পুস্তক আছে তাহা একেবারে বাদ দিলেও তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

ইতিহাসের ভিতর শুধু একটি স্থান তাঁহার প্রিয়, সে ফ্রান্স; —বর্ত্তমানের ফ্রান্স, অদূর অতীতের ফ্রান্স। প্রথমে তাঁহার ফ্রান্সের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল স্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, পরে ইহা তাঁহার সকল কাজের ভিতর সুপরিস্ফুট প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাকে শুধু জাতীয়তা বলা চলে না। তাঁহার নভেলের বিভিন্ন চরিত্রের সম্যক বিকাশের জন্য যে পট-ভূমিকার প্রয়োজন ফ্রান্সে সেই সুবিধা তিনি অত্যন্ত নিকটে পাইয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু কোন দিন কেবল মাত্র নিজের প্রয়োজনের অংশগুলি বাছিয়া বাছিয়া পড়েন নাই, তথাপি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি সব কিছু ধরিয়া রাখিয়াছে—কথা, অংশবিশেষ, অভিব্যক্তির ভঙ্গী কিছুই তাঁহাকে ছাড়িয়া যায় নাই; স্বভাব-লেখক বলিয়া কল্পনার সাহায্যে নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ব্যালজাকের প্রভূত পরিমাণে থাকার দরুণ কোনখানেই তাঁহাকে নিজের জীবন-যাত্রার কাহিনী হইতে ঘটনা সঞ্চয় করিতে হয় নাই। সেক্স্পীয়ারের মত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নাই; সাধারণের বাহিরে যে টাইপ-চরিত্র আছে ব্যালজাকের সকল-

কথাবার্ত্তা তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার রচনার Vaurtin কিম্বা Gobseck, Lucien অথবা Rastignac, Esther ও Delphine কোন চরিত্রটি স্বভাবজাত নয়।—Romantic উপন্যাস-রচয়িতারা সাধারণতঃ বাস্তবজগতের সাধারণ মানুষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের নায়ক-নায়িকাগুলিকে রূপ দেন। এমন কি গোটেও কখন কখনও এই উপায় অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু রচনার ভিতর টাইপ সৃষ্টি করা সত্বেও ব্যালজাকের সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং বাস্তবিকতা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর বোধ তাঁহাকে অসার আলোচনার বিপদ হইতে মুক্তি দিয়াছে, ফাঁকা কথায় তাঁহার সাহিত্য মর্য্যাদা হারায় নাই।

তাঁহার রচনার চরিত্রগুলির ভিতর এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য ও অসাধারণত্ব আছে যাহার জন্য কোনদিন তাহাদের রেখা আমাদের মন হইতে মুছিয়া যায় না; চিরকালের জন্য তাহারা অবিস্মৃত। মনে হয়, যেন কোন দূর স্মৃতির অন্তরস্থ ঘটনাগুলি বর্ত্তমানের ছায়ায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। কোনদিন তত্ত্ব অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য তাঁহাকে আগ্রহান্বিত করে নাই। কেবল বিশ বৎসর বয়সে যখন লিখিতে প্রচেষ্টিত ছিলেন তখন নগরের উপকণ্ঠে গিয়া মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য শ্রমিক, নিরাশ্রয় ছন্নছাড়া মানুষের জীবন ও শিশু-চরিত্র নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু পরে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"Observation became mechanical with me. Without surveying the body, I could delve into the mind. Yes, through comprehending all the details of people's lives, I was able to go beyond them. I could share another's experiences, by putting myself in his place."

ব্যালজাক তাঁহার উপন্যাসের পশ্চাৎপটের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। সেই সময়ের প্যারিসের সহিত নিবিড় পরিচয় ও তাহার সম্বন্ধে নির্ভুল বিচারজ্ঞান ব্যালজাক ব্যতীত বোধ হয় আর কাহারও নাই। বর্ণনা-বিবৃতির জন্য তিনি অনেক সময়ে প্যারিসের নানা স্থানে, বিভিন্ন সমাজে অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া ঘুরিয়াছেন। আকাশে তারা নাই—নিশীথের সুপ্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন প্যারিসের পথে পথে কালো ক্লোকে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ব্যালজাক চলিয়াছেন।

নেপোলিয়ান ও ব্যালজাকের প্রতিভা একই স্তরের। এই দুইটি চরিত্রের প্রধান উপকরণ ও বিশেষত্বের ধারার ভিতর কোন তারতম্য দেখা যায় না—উদার কল্পনা ও বিপুল উদ্যমের সম্মিলিত শক্তি তাঁহাদের দুইজনকেই কীর্ত্তিমান করিয়াছে।

ব্যালজাক বলিয়াছেন—"আমার প্রশস্ত কল্পনাই আমার অস্থিরতার হেতু। একটির পর একটি করিয়া কত চিন্তা, কত অসংখ্য ঘটনা আমার মনের বনে চিরদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছে। তথাপি আমার কল্পনা যেন এখনও কুমারীর মত অকলঙ্কিত, আয়নার মত নির্ম্মল, ছায়ার মত স্পর্শাতীত।...কিছুই আমার নিকট পুরাণো হয় না—একবার যা' আমার মনকে সামান্য আন্দোলিত করেছে, বহুকাল পরেও বোধ হয়, যেন সেসব পরশুকার ব্যাপারের মত প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট। গাছ, নদী, পাহাড়, বনানী, একটি ছোট কথা, চকিত চাহনি, বিপদ, সুখ, উত্তেজনা এমন কি যে কোন ব্যাপারের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত আমার ভেতর প্রতিকৃতি রেখে গেছে। প্রতিদিন তাদের নূতন বলে মনে হয়, আমার স্মৃতিতে প্রতিমুহূর্ত্তে তারা তীব্র উজ্জ্বলতা নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

এই যে বিশ্বের দিকে ব্যগ্র অনুভূতির অগ্রসর, নিজের এই বিশ্বাস হইতে এমনি করিয়া ব্যালজাকের অতৃপ্ত আকাঙ্খা, ভালবাসা, উদ্বেলতা আহরণ করিয়াছে—ইহাই তাঁহার অশান্তির একমাত্র কারণ। সেইজন্য এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ লেখকটির মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয়তার প্রতি সুপরিস্ফুট আসক্তি থাকিয়া থাকিয়া আবেগাকুল হইয়া ওঠে। যৌবনে তিনি magnetism ও mesmerism সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতেন। পরে তিনি Swedenborgএর আলোচনা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। Mental telepathyতেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল প্রচুর। ব্যালজাকের "Seraphita" পুস্তকে তাঁহার এই মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়।

কিন্তু তাঁহার প্রচুর উদ্যম সত্বেও ব্যালজাক কতকগুলি বিষয় হইতে পিছু হটিয়া গিয়াছেন।—তিনি মনে করিতেন সে সব তাঁহার শক্তির বাহিরে। নিজের এই দুর্ব্বলতা তিনি একটি চিঠির ভিতর স্বীকার করিয়াছিলেন—

"If when I go to bed, I am not tired and sleepy, then I am lost, for the moment just before falling asleep, when one is delivered up to himself and the infinite, is a disastrous one for me." ইহার সম্পূর্ণ ভাবের গভীরতা কতখানি, ব্যালজাক নিজেও বোধ হয় তাহা ভাবিয়া লেখেন নাই।

ব্যালজাকের স্বাভাবিক সীমা এই পর্য্যন্ত। যখন উৎসাহহীন নিশ্চেষ্টতার নির্জ্জনতায় নিজের দেখা পান তখন তাঁহাকে সেই যুগের প্রকৃত আবহাওয়ার ভিতর নিতান্ত বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়

"পুরোহিতের স্থান আজ লেখকরা অধিকার করেছে—লেখকই সান্ত্বনা দেয়, অপরাধ তাহার নিকট ঘৃণা, সে-ই ভবিষ্যৎ বক্তা। গির্জ্জার সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় না, সেই স্বর পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি বজ্রগম্ভীর শব্দে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। মানব-জাতি তার সম্মুখে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শুনছে তার বাণী, —তার কাব্য আর তার এক একটি শব্দ বা যুদ্ধ-জয়ের চেয়েও গৌরবময়। সে শতাব্দীর ধর্ম্ম সঙ্গীতগায়কদের প্রধান। এ যে কতদূর সত্য তার উদাহরণ হচ্ছে—Tacitus, Calvin, Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Constant, ও Stael."

ব্যালজাক সংবাদ পত্রের বিষয়ে বলিয়াছেন—Now it is the newspaper. If but fifteen men of talent in France were to be united under one leader as great as Voltaire, the farce of so-called constitution, the enduring power of mediocrity would be at an end."

ত্রিশ বৎসর বয়সে সামাজিক সংস্কারের বাসনা ব্যালজাকের মনে অত্যন্ত প্রবলভাবে আধিপত্য করিতেছিল। যদিও বাহ্যিক ব্যবহারে তাঁহাকে সামাজিক গোঁড়ামির ভক্ত বলিয়া মনে হইত কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন বিপ্লবী। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মত হইতেছে সমাজে সাম্যবাদপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার যথাসম্ভব ক্ষমতা আনা প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাজশাসনের কোন ক্ষমতা থাকার দরকার নাই।

গোটের পর প্রথম Non-Romantic সুলেখক ব্যালজাক তাঁহার একটি উপন্যাসের যুবক নায়কের মুখ দিয়া অর্থ-সমস্যার একটি প্রশ্ন করিয়াছেন—প্রথমতঃ তাহার প্রেমের বিনিময়ে সে নায়িকার প্রেম লাভ করিয়াছে কিনা ও প্রেয়সীর নিকট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় গাড়ীভাড়া দিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি? অন্য লেখকের মধুর ভাবময় উপন্যাসের নায়ক যেখানে একটি পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত ঘরের ভিতর উৎফুল্লভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে সেখানে ব্যালজাকের নায়ক ধূলাকীর্ণ মধ্যবিত্ত হোটেলের আলোহীন ঘরে দীনভাবে পড়িয়া থাকে

গতিয়ের নিকট হইতে জানা যায়, একদিন ব্যালজাক ভিনাস-দে-মিলো-র প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই অপরূপ ভাস্কর্য্যের প্রতি তাঁহার বিন্দু মাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া, তাঁহার অতি নিকটে একজন সুসজ্জিতা প্যারিসিয়ান নারীকে প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাঁহার সময়ের নূতন সৌখীনতার প্রতি এতই তাঁহার অনুরাগ।

ব্যালজাক যতই বর্ত্তমানের সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন ততই তাঁহার অভিজ্ঞতা সমসাময়িক সমাজের সমালোচনার ইচ্ছাকে উন্মুখ করিয়া তুলেন। তিনি তাঁহার লিখিত উপন্যাসের ও ভবিষ্যৎ রচনার কল্পিত নায়কনায়িকাদের সম্মিলিত জীবনের ঘটনা লইয়া একটি বৃহৎ বহুখণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসের কল্পনা করিলেন—ইচ্ছা, সেই সময়ের আচার ব্যবহারের কাহিনী তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যালজাক ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাঁহার বোনের নিকট যাইয়া উল্লাস-কলরোলের সহিত ঘোষণা করিলেন—"সমস্ত বাধাবিঘ্নের প্রাচীর ভেঙে আমি প্রতিভার বিরাট গৌরবান্বিত পথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার ক্ষমতার কাছে হার মেনে এইবার তোমাদের নমস্কার করতে হবে।"

ফরাসী সাহিত্যে এই পরিকল্পনা তখন অনুপম, অদ্বিতীয়। এ শুধু Michael Angeloর সৃষ্টির সুরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যালজাক বলিয়াছেন—"In these studies of manners I will paint the play of emotions and turmoil of life...Nothing shall be for-

gotten, not a single age or trade, neither politics, law, nor war.···Then in the philosophical studies I will establish the why of the emotions and wherefore of life.···In this way I shall have imbued everything with life—by idealizing the type and making the individual typical."

তিনি বলিলেন "এইরূপে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির সকল ব্যবহার ও চরিত্র বর্ণিত হবে, তাদের বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে কোন ব্যবধান বা শিথিলতা থাকবে না—আমার এই কল্পনাকে কাজে পরিণত করলে পাশ্চাত্য দেশের আবর্যোপন্যাস রচিত হবে।" মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে লোকসমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সাহিত্যের সাহায্যে ব্যালজাকের যে অপূর্ব্ব দান, তাহার নাম 'Comedie Humaine.'

শেক্‌সপীয়ার ও ব্যালজাকের সাহিত্যে একটিমাত্র মিল আছে—দুইজনের চরিত্রসৃষ্টির প্রাচুর্য্য। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ অনেক—ব্যালজাক করিয়াছেন কল্পনার সহায়তায় নূতন নূতন চরিত্রসৃষ্টি, শেক্‌সপীয়ারের সে বিষয়ে কোন নিপুণতা নাই। ব্যালজাক বর্ত্তমান হইতে তাঁহার চরিত্রগুলির টাইপ সন্ধান করিয়াছেন, শেক্‌সপীয়ারের চরিত্রগুলি ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের নিকট হইতে ধার করা। সমসাময়িক জীবনকে ব্যালজাক পৌরাণিকত্বে রূপান্তরিত করিয়াছেন, শেক্‌সপীয়ার পৌরাণিকত্বকে সমসাময়িক সাজে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা দুইজনেই মানব-চরিত্র-চিত্রণের কঠিন কাজে প্রভূত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সেইজন্য বহু শতাব্দীর পর আমরা তাঁহাদের রচিত নায়কনায়িকাদিগকে খুঁজিয়া পাই জনসমাগমের মাঝখানে, ভ্রমণের পথে, প্রণয়-লীলার তন্ময়তায়, রাজনীতির ক্ষেত্রে। তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত মানবমানবীরা পৃথিবীর বাস্তব মনুষ্যগুলির সহিত অভিন্ন—এককালে যাহারা বাঁচিয়া ছিল, আগামী কালে যাহারা আসিবে, এই দুই সাহিত্যিকের সৃষ্টি যেন তাহাদেরই লইয়া।

ব্যালজাক নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি গল্প-লেখক, তাঁহার মতে কাব্য ও নাটকের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তাঁহার নাটক-রচনার মক্‌সও গোপনে গোপনে চলিতেছিল—সেই নাটকের অভিনয়-সাফল্যে অকস্মাৎ অর্থবান হওয়ার আশাই তাঁহার এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল।

গতিয়ে ব্যালজাকের নাট্যকার হওয়ার অক্ষমতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাট্যকার হওয়ার বিঘ্ন অনেক—উপন্যাসের এক একটি পরিচ্ছেদে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘতার সুবিধা আছে কিন্তু নাটকের দৃশ্যগুলি নিজের ইচ্ছামত দীর্ঘ করা চলে না। এই সীমার বন্ধন ব্যালজাকের নাট্যকার হওয়ার অন্তরায়। ব্যালজাকের ভিতর ছিল এক অবাধ্য চাঞ্চল্য—বিপ্লবী সীমার মানা মানে না। দুর্দ্দম অশ্রান্ত বেগের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার প্রকৃত বিস্তারের জন্য এই ব্যগ্রতার প্রয়োজনও ছিল। এই অস্থিরতার আর একটি হেতু হইতেছে—নিষ্ঠুর দারিদ্র্য আর অদম্য অর্থপিপাসা।

বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব ব্যালজাককে অস্থিরতা এবং অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে ফেলিয়াছিল। কবি ও উন্মাদের মনস্তত্ত্ব যাঁহারা বোঝেন না তাঁহারা বিস্মিত হইবেন যে, যে-সাহিত্য-স্রষ্টা জগতকে এত নির্ভুলভাবে লোকসমাজের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন তিনিই আবার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এমনি ভ্রান্ত বিচার করিলেন কি করিয়া! সকল চাপল্যের মূলে ছিল তাঁহার অর্থচিন্তা—মধ্যরাত্রে একদিন ব্যালজাক তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন—"বিছানা ছেড়ে ওঠো, আমাদের যে এখনি যাত্রা করতে হবে।"

"সে কি! তুমি কি পাগল হ'লে?"—বন্ধু বলিল।

"তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও, আমাদের এখনি মোগল সাম্রাজ্যে না গেলেই নয়। ভিয়েনায় হ্যামার আমায় যে আংটিটি দিয়েছিল আজ সন্ধ্যাবেলা সেটি তুর্কীয় রাজ-দূতকে ভয়ঙ্কর বিস্ময়ান্বিত করেছে। তিনি বললেন—আপনি জানেন কি, আপনার আঙুলের আঙটিটি একজন সিদ্ধ পুরুষের। এটি একশ বছর আগে মোগলদের কাছ হ'তে অপহৃত হয় এবং যে এই আঙটিটি ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে তাকে অজস্র ধনরত্ন পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে।"—সেদিন অনেক কষ্টে ব্যালজাককে মোগল সাম্রাজ্যের দিকে যাওয়ার এই মিথ্যা উন্মত্ততা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা হইয়াছিল। এমনি অলীক চিন্তার অস্থিরতায় তাঁহার মন সতত আক্রান্ত ছিল

নাটকরচনার প্রশান্তির বিরুদ্ধে এই প্রকার মনের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত করে। সাধারণতঃ, চিত্রকর, কবি ও গায়কদের চেয়ে নাট্যকার ও ভাস্করদের মনের একাগ্রতা ও প্রশান্তি অধিক প্রয়োজন।

এক এক সময়ে ব্যালজাক তাঁহার নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইতেন। ভেনিসে একদিন একটি নারী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন—'আপনার স্বপ্নকে আপনি বাস্তব বলে সর্ব্বদা ধারণা করেন।' তিনি আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিলেন—'In these few words you have hit upon the gravest secret of my life.'

একচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি একজনকে গোপনীয় পত্রে জানাইয়াছেন—'আজ তোমার কাণে আমার একটি আন্তরিক গোপন অভিলাষ জানাচ্ছি। আমি খ্যাতির চেয়ে সুখশান্তির আনন্দকে পেতে চাই এবং তার জন্যে আমার সমস্ত সাহিত্য, সকল অধ্যবসায় হ'তে পরাঙ্মুখ হ'তে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ব না।'

ব্যালজাকের উদ্দামতার পিছনে ছিল সতেজ প্রফুল্লতার বিহ্বল উল্লাস—শুধু সেই জন্য তাঁহার পরিশ্রম করিবার শক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল; জীবনের যে কঠোর দুঃখ-দৈন্য, মানসিক পরিশ্রমের যে অপরিমেয় ক্লান্তি, শুধু তাহা অফুরন্ত এই প্রাণের উল্লাসের ভয়েই তাঁহার অসাধারণ মনটিকে দুর্ব্বলতায়, পঙ্গুতায় আক্রান্ত করিতে পারে নাই। ব্যালজাকের এই হৃষ্টতার সম্বন্ধে গাতয়ো বলিয়াছেন—"There was no situation or need, no weariness, no renunciation, not even a sickness, which could suppress this mighty joviality."

যে ব্যালজাক সমস্ত জীবন ধরিয়া সমাদর, ঐশ্বর্য্যের চাক্‌চিক্য ও অর্থের পিছনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়াছেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ আনন্দ ছিল সেই আভিজাত্যের অশান্ত কলরোল হইতে সুদূরে—তাঁহার গ্যারেটের উঁচু ঘরটির নিস্তব্ধতায়, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার তন্ময়তার মুহূর্ত্তে। ঢিলা জামা গায়ে ব্যালজাক নবাবী ভঙ্গীতে বসিয়া; তিনি তখন লিখিতেছেন—"আমার সকল দুঃখকষ্টের সন্ধান জানলে তুমি নিশ্চয় শিউরে উঠতে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের মত আমি সমস্ত বেদনা ভুলে যাই—যখন আমার ছোট টেবিলটির সামনে কলম হাতে বসে আমি হাসি, তখন আমি পরিতৃপ্ত।"

চিঠির কয়েকটি চমৎকার লাইনে জীবনের উদ্দেশ্য ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে একাকার করিয়া ব্যালজাক লিখিলেন—"A vision, as brief as life and death, deep as an abyss, great as the sound of a sea; a woman, which even the devil would be made happy to possess; work calls, all the ovens are heated, the ecstasy of conception conceals the subsequent listness; such is the artist, the humble instsument of a will, apparently the freest, in reality a slave."

ব্যালজাকের সমসাময়িক দুইজন সাহিত্যিক Dumas ও Eugene Sue. ত্রয়ীর ভিতর ব্যালজাকের আসন সর্ব্বাগ্রে।

ব্যালজাকের রচনার চরিত্রগুলির সত্যতা ও বৈচিত্র্য ছাড়া আর একটি অত্যাশ্চর্য্য গুণ লক্ষ্য করিবার বিষয়—সে রচনার ঘন-সন্নিবিষ্ট ঘটনা জাল। ব্যালজাকের সমসাময়িক লেখকের মধ্যে যাঁহাদের সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য ও জীবনকে নিরীক্ষণ করিবার একটি নূতন ভঙ্গী আছে তন্মধ্যে Hugo ও George Sandএর স্থান কিছু উঁচুতে—সত্যকার সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহাদের দান, জগত কিছু বেশী দিন মনে করিয়া রাখিবে। যে সমালোচকরা Theophile Gautier, Alfred de Musset ও Charles Nodierকে তুচ্ছ-জ্ঞান বা অল্প শক্তিশালী বলিয়া মনে করেন না, অন্ততঃ তাঁহাদের Victor Hugo ও George Sandকে ফরাসী সাহিত্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া অস্বীকার করা উচিত নয়।—এই দুইজন শুধু প্রকাশ-ভঙ্গিমার টেক্‌নিক্‌-সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন নাই। কিন্তু ঘটনাজালের সংবদ্ধ-সমাবেশের দিক দিয়া ব্যালজাক Hugoকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন, চরিত্র-চিত্রণের যথার্থতা ও বৈচিত্র্য বিষয়ে George Sand তাঁহার নীচে। Sand-এর চরিত্রগুলি অস্পষ্ট সীমারেখার ভিতর সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যের গঠন-সৌষ্ঠবের সার্ব্বত্রিক নিবিড়তার সম্বন্ধে ব্যালজাকের পরিশ্রম সার্থক—যে সার্থকতা Hugo কোনদিন অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

ব্যালজাকের জীবনকে দেখিবার ভঙ্গী, অকপটতা তুলনাহীন। কিন্তু তাঁহার বাস্তবতায় মাঝে মাঝে কবিত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে—একেবারে কাব্যহীন নীরস রচনায় কি করিয়াই বা সত্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে? এই কাব্যভার কখনও তাঁহার সমগ্র কল্পনার উপর ছায়া ফেলিয়াছে, কখনও বা আংশিক চিন্তার ভিতর সীমাবদ্ধ। ব্যালজাকের যে কোন রচনার আসল প্রকৃতি অত্যন্ত বাস্তব, কল্পনাত্মক রচনাতেও তাঁহাকে আমরা সর্ব্বদা বিষয়-বস্তুর মধ্যস্থলে দেখিতে পাই।

ব্যালজাকের সুস্পষ্ট ও বাস্তব সাহিত্য-দৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই বিশেষত্বের জন্যই অন্যান্য জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও কবির মত স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধের আতিশয্য তাঁহার সাহিত্যের উপর অসংযত বিস্তার পায় নাই। যে-প্রেম সর্ব্বদিকে পরিতৃপ্ত হইতে চায় তাহার দুর্ব্বিনীত কামনা মানুষের একমাত্র আনন্দ নয়। অবশ্য এই জাতীয় প্রেমের সার্থকতা মানবের অস্তিত্বের সঞ্জীবতা আনে, কিন্তু ইহার পরিণতি ব্যর্থতায়। প্রণয়মত্ত নায়ক নায়িকার মনস্তত্ত্ব ছাড়িয়াও জীবনের বিকাশ উদার।

সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন নিজের প্রাণ-শক্তির নিশ্বাস দিয়া মানুষকে প্রাণবন্ত করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন তেমনি ব্যালজাক তাঁহার *Tempo* (গতির উন্মাদনা) দিয়া তাঁহার রচনার চরিত্রগুলি সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচনার বিচিত্র নরনারী সৃষ্টির মধ্যে একটিমাত্র স্বভাবের মানুষ শুধু চিত্রিত হয় নাই—সে নিশ্চেষ্ট বিভ্রান্ত মানুষের প্রকৃতি। আর একটি দিকে ব্যালজাকের সাহিত্যে অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়—juvenile heroine সৃষ্টির অক্ষমতা তাঁহার উপন্যাসে লক্ষিত হয়। তাঁহার রচনার ভিতর বৈধ জীবন-পদ্ধতির ও সৎপথে পরিচালিত কুমারী-নারী-চরিত্র অল্প বিস্তর অর্দ্ধস্ফুট রহিয়া গেছে। ব্যালজাক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"To depict many virgins, what is wanted is—Raphel." তাঁহার রচিত কুমারী-চরিত্রের প্রতি কাজ ও কথায় মনে হয় যে তাহারা এক কল্পনাবিলাসী কবির সৃষ্টি। Eve Chardon, Pierrette Lorain ও "Peau de Chagrin"এর Pauline-(যদিও এই মেয়েটি শেষ পর্য্যন্ত কুমারী ছিল না)-কে দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা Madona di San Sistoর পবিত্র তেজে সর্ব্বদা প্রোজ্জ্বল।

Henry James বলিয়াছেন—"Women are the key-stone of 'Comedie Humaine.' If the men were taken out, there would be great gaps and fissures; if the women were taken out, the whole fabric would collapse." Jamesএর এই সমালোচনার জোর প্রতিবাদ করাও চলেনা, যদিও ব্যালজাকের কয়েকটি রচনায় পুরুষ-চরিত্রই প্রধান। এ কথা সত্য যে তাঁহার পুরুষ-চরিত্রগুলি নারী-চরিত্রের মত সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে নাই। —তাঁহার প্রধান আদর্শ চরিত্র অস্বাভাবিক, তাঁহার সম্ভ্রান্তবংশের শিক্ষিত মার্জ্জিত পুরুষরা নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সচেতন। ব্যালজাকের রচিত যুবক আমাদের মুগ্ধ করেনা—তাহারা প্রায় সকলেই আত্মাস্তিত্ববাদী, সৌখীন ও বিলাসিতাপ্রিয়।

George Sand ব্যালজাকের উপন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"the novel of Balzac was but the frame and pretext for an almost universal examination of ideas, sentiments, trades, arts and localities."

Saint-Beuve বলিয়াছেন যে ব্যালজাক সর্ব্বত্র সমাজ সম্বন্ধে অনুশীলন ও বিচার করিয়াছেন। কিন্তু Madame Sandএর মতে ব্যালজাক সাহিত্যের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন—সর্ব্বসময়ের মানব-প্রকৃতির যথার্থ বিচার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

ব্যালজাকের সাহিত্যের বিচারান্তে এই কয়টি প্রশ্ন মনে জাগে—তাঁহার শক্তি কি উদার ও বহুদূরদর্শী? মনুষ্যত্বের সন্ধানে তাঁহার অনুসন্ধান কতখানি সফল ও সে প্রচেষ্টার ভিতর গাম্ভীর্য্যের অভাব আছে কিনা? তাঁহার বিবৃতি কি অপক্ষপাতী? এবং তাঁহার আবিষ্কার সত্যই অকৃত্রিম কিনা?—প্রত্যেকটির উত্তরেই ব্যালজাকের কোন বিচ্যুতি বা ত্রুটি নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

উত্তর মেঘ

১৩

নানা বর্ণের বিবিধ বসন, নয়ন-ভুলানো, সুরা মধুর.
পল্লবদল, ফুল্ল কুসুম,—বিচিত্র আভরণ প্রচুর,
চরণ-কমল-রঞ্জন তরে অলক্ত-রাগ,—এমনি সব
রমণীয় যত রমণী-ভূষণ—কল্পতরুই করে প্রসব।

১৪

সেই অলকায় কুবেরালয়ের কিছু উত্তরে আলয় মম.
দূর হ'তে তা'র দেখিবে তোরণ শোভায় ইন্দ্রধনুর সম।
দুয়ারে তরুণ মন্দার-তরু, প্রিয়ার পালিত সুতের মতো ;
হাতে যায় ধরা কুসুমগুচ্ছ. অনুচ্চ ফুলভারাবনত।

১৫

মরকতমণি-রচিত সোপানে, হে মেঘ, সেথায় শোভে সরসী,
ঢাকে তা'র জল স্বর্ণ-কমল বৈদূর্য্যের নালে বিকশি'।
সেই সরোবরে সদা কেলি করে পরম হরষে হংসচয়.
তোমারে দেখেও অতি-নিকটের মানসের কথা ভুলিয়া রয়।

১৬

আছে তীরে তা'র ক্রীড়ার পাহাড়—চূড়া গড়া চারু ইন্দ্রনীলে,
কনক-কদলী-ঘেরা চারিধার, সুখী হবে তা'র শোভা দেখিলে।
চমকে বিজলী প্রান্তে তোমার,—বলো সখে, ব্যথা বহি' কেমনে ?—
তোমা' পানে চেয়ে প্রিয়ার সাধের শৈলটি আজি পড়িছে মনে !

১৭

কুরুবকে ঘেরা মাধবীকুঞ্জ আছে সেথা, আর তাহারি কাছে
অশোকে কাঁপিছে পল্লবকুল, ফুল্ল বকুল দাঁড়ায়ে আছে।—
একটি—আমারি সঙ্গে প্রিয়ার বাম-চরণের পরশ চায়,
অন্যটী চাহে দোহদচ্ছলে তারি মুখ-সুধা সিধু-ধারায়।

১৮

তরু-দুটি মাঝে স্ফটিক-বেদীতে স্বর্ণের বাস-যষ্টি পাতা,
নবীন বেণুর সম প্রভাময় মণি-মরকতে মূলটী গাঁথা।
দিবসের শেষে তোমারি বন্ধু ময়ূরটী এসে বসে সেথায়,
কাঁকন বাজায়ে করতালি দিয়া তালে তালে প্রিয়া তা'রে নাচায়।

১৯

হে সাধু সুহৃদ্, এই সঙ্কেত স্মরণ রাখিয়া সে গৃহে যাবে,
দুয়ারে দু'ধারে শঙ্খ পদ্ম অঙ্কিত আছে দেখিতে পাবে।
আমার বিরহে সে গৃহ এখন শ্রীহীন হয়েছে সুনিশ্চয়,—
সূর্য্য অস্তাচলে গেলে চলি' নলিনীর শোভা মলিনই হয়।

২০

ত্বরিতে পশিতে করিশিশু সম সহসা ক্ষুদ্র শরীর ধরি'
পূর্ব্বকথিত সে লীলা-শৈলে বসিয়া রম্য সানুর 'পরি—
জোনাকি যেমন জ্বলে থাকি থাকি— তেমনি ক্ষণিক মৃদু আলোকে
অন্তঃপুরে চকিতে চকিতে চেয়ে দেখো চারু চপলা-চোখে।

২১

সেথা রয় সতী রূপসী যুবতী.—বিধির প্রথম রচনা সম,—
কৃশ তনুলতা, সুচারু দশন, অধর পক্কবিম্বোপম;
ক্ষীণ কটিতট, নাভিটি গভীর, চাহনী চকিতা মৃগীর মতো;
শ্রোণী-ভারে তা'র গতি মন্থর, স্তন-ভরে তনু ঈষৎ নত;

২২

সে-ই প্রিয়া মোর স্বল্পভাষিণী, সখে, সে যে মোর দ্বিতীয় প্রাণ;
চক্রবাকীর মতো একাকিনী সহচরা-হারা ব্যথিত ম্লান।
দিবসের পরে দীর্ঘ দিবস কাটিছে তীব্র বিরহ-দুখে,—
শিশির-মথিতা কমলিনী সম আছে শোভাহীন মলিন মুখে।

২৩

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলেছে নয়ন, ঝরে অবিরল অশ্রুধার;
উষ্ণশ্বাস ফেলি' অনুখন পাংশু হয়েছে ওষ্ঠ তা'র;
এলোকেশতলে আছে আধো-ঢাকা করতলে-রাখা আননখানি,—
চন্দ্রমা যেন মলিন কিরণ মেঘ-আবরণ অঙ্গে টানি'।

২৪

অথবা দেখিবে মোরই লাগি প্রিয়া গৃহদেবতার পূজায় রত;
কিম্বা, বিরহে কৃশতনু ভাবি, আঁকে মোর ছবি মনের মতো;
কিম্বা শুধায় পিঞ্জরে-পোষা মধুর-বচনা সারীরে দেখি'—
"প্রভু তোরে এত বাসিত যে ভালো, রসিকা লো, তা'রে মনে পড়ে কি?"

(ক্রমশঃ)

খঞ্জ মনুষ্যের উপাখ্যান

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। অথচ তাহা হইতে একটা অশান্তির ঝড় উঠিয়া অমৃতের শান্ত নীড়কে সপ্তাহের মধ্যে বিপর্যাস্ত করিয়া তুলিল।

কথাট এই, প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে অমৃত বৈঠকখানায় বসিয়া আছে. ডাকপিয়োন আসিয়া তাহার হাতে একখানি মণি অর্ডারের কুপন দিয়া গেল। সে নাকি বেণারসের কোন আভাবতী দেবীর নামে কুড়ি টাকা পাঠাইয়াছিল—তাহারই প্রাপ্তি-স্বীকার। অমৃত ত' অবাক!

বেণারসে ত' সে জন্মাবধি যায় নাই আর আভাবতী দেবী নামে কোন মহিলাকে কখনো চক্ষেও দেখে নাই—অথচ হাতের কুপন খানিতে তাহারি নামের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী স্বাক্ষর এ, এল, সেন, ৯৭-বি, সার্পেন্‌টাইন রোড, শাঁখারীটোলা, কলিকাতা; এবং মেয়েলি হাতের বাঁকাবাঁকা অক্ষরে বাংলায় শ্রীমতী আভাবতী দেবী স্বাক্ষর দিয়া টাকা গ্রহণ করার প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরাজী লেখাটা অবশ্য ভিন্ন হাতের ইহা বলাই বাহুল্য।

অমৃত কুপন খানি এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া তিনবার পড়িল, সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকার ভাবিল কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল সার্পেন-টাইন রোড বলিয়া বোধ হয় কলিকাতায় অপর রাস্তা থাকিতে পারে, পথ ভুলিয়া তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আবার ভাবিল পাশের বাড়ীর কাহারো নয়ত? ও বাড়ীটার নম্বরও ৯৭। সে ছাড়া আরো এ, এল, সেন থাকাও ত' অসম্ভব নয়। চাকরটাকে দিয়া একবার ও বাড়ীতে খোঁজ লওয়াইতে হইবে।

ভৃত্য 'সদা' আসিয়া জানাইল সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে, আফিস যাইতে হইবে। তাড়াতাড়িতে কুপনখানি টেবিলের প্যাডের নীচে চাপা দিয়া অমৃত স্নান করিতে উঠিয়া গেল।

বাস্। তারপর যেমন কুপন প্যাডের নীচে তেমনি চাপা পড়িয়া আছে এবং অমৃত সে কথা একদম হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পনের দিন পরে আবার সেইরূপ একখানি কুপন অমৃতর হাতে আসিয়া পড়িল। এবার অমৃত দেখিল পূর্ব্বেকার কুপনের 'সার্পেন্‌টাইন রোড' সংশোধিত হইয়া 'লেন' হইয়াছে। অমৃত প্যাডের তলা হইতে পূর্ব্বপ্রাপ্ত কুপনখানি বাহির করিয়া মিলাইল, ঠিক সেই হাতের লেখা; সেই এ, এল, সেন—সেই কুড়ি টাকা, —বাঁকা বাংলা অক্ষরে সেই শ্রীমতী আভাবতী দেবী।

অমৃত 'সদা'কে ডাকিয়া পাশের বাড়ীতে কুপন দুইখানি পাঠাইয়া দিল। পাঁচ মিনিট পরে 'সদা' কুপন দুইখানি অমৃতর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ওঁনাদের নয়'। সেইদিন কুপন দুইখানি পকেটে পুরিয়া অমৃত অফিসে লইয়া গেল। পাঁচজনকে দেখাইয়া যদি ইহার কিছু 'সুরাহা' করিতে পারে।

অফিসে ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইল। টিফিনের সময় অমৃতর টেবিলটি ঘেরিয়া একটি জরুরী পরামর্শ-সভা জমিয়া গেল।

কেশিয়ার অনুকূল বাবু বয়োবৃদ্ধ। তিনিই হাঁকিয়া উঠিলেন বেশী। বলিলেন, 'হয়েছে, এ্যাদ্দিনে আপনার স্কন্ধে ভর করলেন অমৃত বাবু, একটু সাবধানে থাকবেন। মঙ্গলবাবু উৎকর্ণ হইয়া বলিলেন, 'কি রকম?' অনুকূল বাবু অতিরিক্ত রকম গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'রকম ভাল। মহাপ্রভুরা একবার যাঁর স্কন্ধে চড়বেন তাঁর ইহকাল পরকাল ঠাণ্ডা!'

কানাই বাবু বলিলেন, 'কাদের কথা বলছেন আপনি?' অনুকূল বাবু বলিলেন, 'যাদের কথা বলছি সবাই বুঝতে পেরেছেন আপনারা—আর নামে কাজ কি? অমৃত বাবু, এক্ষুণি এর বিহিত করুন, নইলে কোনদিন আমাদের শুদ্ধ টানবে!'

কানাই বাবু বলিলেন, 'আপনার কথায় দু'পক্ষকে টানা যায়। এক ভূত আর পুলিস। ব্যাপারটা যে ভৌতিক নয় এটা সবাই স্বীকার করবেন। দ্বিতীয়তঃ এটা যে পুলিস কেসও নয় এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।'

রাগিয়া অনুকূল বাবু বলিলেন, 'আপনি থামুন মশাই, ভূত আমি কোন জন্মেও মানিনে। আমি ঐ কর্ত্তাদের কথাই বল্ছিলুম। যে দিন কাল পড়েছে—একবার ঠেকালেই সোণা!'

যামিনী বাবু ঘাড় দোলাইয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'এ বাবা, দস্তুর মত' লাভ এ্যাফেয়ার্স!—এদ্দিন অমৃত বাবু ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলেন—এবার হাটময়!'

কানাই বাবু বলিলেন, 'আমায় ভার দিন অমৃত বাবু, আর কিছু টাকা দিন আমি এ রোম্যান্স সলভ করে-দিচ্ছি।'

হীরেন বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিলেন—এখন বলিলেন, 'এতে টাকার দরকার এলো কোত্থেকে শুনি?'

কানাই বাবু বলিলেন, 'যদি প্রয়োজন হয় আমায় কাশী পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে হবে না?'

রাগিয়া অনুকূল বাবু বলিলেন, 'যত সব চ্যাংড়ার দল জুটেছে এক জায়গায়—যা ইচ্ছে করগে যা। মরবি তোরাই মরবি—আমার কি? তখন কিন্তু বলতে হবে যে হাঁ অনুকূল বাবু বলেছেন একটা কথা!' নিতান্ত বেচারার মত অমৃত অনুকূলকে চাপিয়া ধরিল, 'কি করবো আপনিই বলুন অনুকূল বাবু'—

অনুকূল বাবু পাশের মঙ্গল বাবুর টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, "তবে শোন বলি,—এই সেদিন কাশী ষড়যন্ত্র মামলা হ'য়ে গেল, রাধারাণী দেবী না কেবীর দ্বীপান্তর হ'য়ে গেল, কতগুলো ভদ্রলোককে কি নাজেহালটাই না করলে! এও একটা গেল! অমৃত বাবু—এম-এ পাশ করেছেন, কাগজে নাম টাম আছে অমনি দৃষ্টি পড়েছে। এই দু'একখানা কুপন-টুপন বাড়ী থেকে বার করে আবার এক ফ্যাঁসাদ বাধাবে—এই মতলব আর কি!'

অনুকূল বাবু একটু থামিলে সকলেই এক একবার মুখ চাওয়া-চায়ই করিলেন। অমৃতের মুখ একেবারে বেগুনী হইয়া উঠিল। অনুকূল বাবু গলা শানাইয়া আবার আরম্ভ করিলেন, "এখন এক কাজ কর গিয়ে—সটান ব্যাপারটা পুলিসের হাতে তুলে দাও। যা করতে হয় তারাই করবে।'

মঙ্গল বাবু বলিলেন, 'তার মানে 'আঁচড়ে ঘা বার করা!' যদি ব্যাপারটা বাস্তবিকই তাদের মাথায় এখনো না এসে থাকে এতে তাদের জোর করে মনে করিয়ে দেওয়া হবে।'

হীরেন বাবু বল্লেন, 'তার চেয়ে আপনি পোষ্টাফিসে যান অমৃত বাবু, গিয়ে দু'টো কাজ করতে পারেন—'

সকল ঘাড়গুলি এক সঙ্গে হীরেন বাবুর দিকে ঘুরিল। হীরেন বাবু বলিলেন, 'পোষ্টমাষ্টারকে গিয়ে বলুন এবার আভাবতী দেবীর নামে কাশীতে যে টাকা পাঠাতে আসবে তাকে ডিটেন করিয়ে আমায় টেলিফোন করবেন। আমরা গিয়ে তাকে ধরতে পারব আর নয়ত আভাবতী দেবীর পুরো ঠিকানাটা নিয়ে আসুন। তাকে একখানা চিঠি দেওয়া যাক।'

কানাই বাবু বলিলেন, 'কোন লোককে ফর্ নাথিং ডিটেন করবার ক্ষমতা পোষ্টাফিসের নেই, তা জানেন? আর পুরো ঠিকানাই বা পোষ্টাফিস পাবে কোথা, তাদের ত কোন রেকর্ড থাকে না খাতায়।

দু' একজন বলিলেন, 'তাওত বটে, তবে উপায়?' অনুকূল বাবু বলিলেন, 'পুরো ঠিকানাটা পেলে আমার এক দিদি-শাশুড়ী কাশীবাস কচ্ছেন, তাঁকে জানালে সব হদিস্ মিলে যেত। তবে এখন এক কাজ করুন অমৃত বাবু, কুপন দু'খানা এনক্লোজ ক'রে পি-এম-জিকে একখানা চিঠি দিন যে আমি কোন লোককে টাকা পাঠাই নি অথচ আমার নামেই বা কুপন গুলো আসছে কেন—এর খবর নাও!'

তখন সেই প্রস্তাবই সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইল। মঙ্গলবাবুর চিঠি লেখায় হাত যশ আছে, তিনি ড্রাফ্‌ট্ করিলেন, যামিনী বাবু টাইপ করিলেন। অমৃত চিঠি ছাড়িয়া দিলে সকলে যে যাহার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

তিন দিন পরে অমৃতের নামে ডাকবিভাগ হইতে এক-খানি ছাপান পোষ্ট কার্ড আসিয়া জানাইল চিঠি যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে এবং অনুসন্ধান চলিতেছে।

ডাকবিভাগের অনুসন্ধানের ফল জানিবার জন্য অমৃত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহার দশগুণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন তাহার অফিসের সহকর্ম্মীরা। কুপনাবভ্রাটের আলোচনা এখন তাহাদের অফিস ডিউটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ভাবে আরো এক সপ্তাহ কাটিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর অফিস হইতে ফিরিয়া আহারে বসিয়া অমৃত দেখিল পার্শ্বে স্ত্রী মেনকার স্থানটি দখল করিয়া বসিয়া তাহার ছোট বোন রাণী বাতাস করিতেছে। অমৃত জানিত মেনকার এটি অতি প্রিয় কার্য্য। সারাদিনের পর এই সময়টিতে সব কাজ ফেলিয়া তাহার খাইবার সময় পাশে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে 'ওটা খাও—এটা খাও' বলিয়া সাধিয়া অনুযোগ করিয়া, ঘরের সব খবরটুকু তাহাকে দিয়, বাহিরের সব খবরটুকু তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া সে আনন্দ পায়। আর তাহার নিজেরও এমন অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে যে মেনকার হাসি, গান, তাহার পাখার মৃদু বাতাসটুকু চুড়ির শব্দটুকু খঞ্জনের মত চঞ্চল ও উজ্জ্বল আঁখি-তারা দুইটির নাচনটুকুর তালে তালে, বসিয়া বসিয়া, পুরা দেড় ঘণ্টা ধরিয়া না খাইলে তাহার যেন তৃপ্তি হয় না। তাই তাহার অনুপস্থিতিতে মনে একটা বিস্ময় জানাইতেই অমৃত রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোর বৌদি কোথা রে?'

পাখা থামাইয়া রাণী জবাব দিল, 'দুপুর থেকে বৌদির ভারী মাথা ধরেছে। সারাদিন কিছু খায়নি ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে।'

কিছু না বলিয়া অমৃত খাইতে লাগিল এবং কিছু পরেই রাণীকে বলিল, 'যা তোকে আর বাতাস করতে হবে না।'

খুসী হইয়া রাণী পাখা রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া সারিয়া অমৃতও উঠিয়া পড়িল।

অমৃত ঘরে ঢুকিতেই মেনকা ধড়মড় করিয়া মেঝে হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিছানার নীচে হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া অমৃতর উদ্দেশে বিছানার উপরই ছুড়িয়া দিয়া বলিল, 'টাকা পাঠিয়েছিলে তার রসিদ এসেছে।'

পরমুহূর্ত্তেই সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

বিছানা হইতে কাগজখানি তুলিয়া অমৃত দেখিল বেণারসের শ্রীমতী আভাবতী দেবীর স্বাক্ষর-সম্বলিত কুড়ি টাকা প্রাপ্তির তৃতীয় কুপন। উদ্বেগ ও বিরক্তিভরে অমৃত শুইয়া পড়িল।

গল্প করিবার লোক না থাকিলে বিছানায় পড়িবামাত্র অমৃতর চোখে রাজ্যের ঘুম আসিয়া জড়ায়। আজ কি-জানি কেন তাহার ঘুম আসিল না। এ পাশ ও পাশ করিয়া মশা তাড়াইয়া অস্বস্তি ভোগ করিতে করিতে বাইরের ঘড়িটায় এগারটা বাজিল, তখনো মেনকা শুইতে আসিল না। পাশের ঘরে রাণী গল্ গল্ করিয়া কাহার সহিত বকিয়া যাইতেছিল, অমৃত তাহাকে হাঁকিল—'এই রাণী, শুনে যা—'

রাণী আসিলে তাহাকে ধমক দিয়া অমৃত বলিল, 'রাত্তির এগারটা বাজল এখনো গজ্‌গজ্ কচ্ছিস্ কেন? শুগে যানা; রাত দুপুর পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়ে আড্ডা দেবেন সব, আর মাসকাবারে বিল শোধ করবো আমি বার টাকা, চোদ্দ টাকা!'

রাণী সুড় সুড় করিয়া পলাইতেছিল, অমৃত তাহাকে হাঁকিয়া বলিয়া দিল, 'তোর বৌদি'কে ডেকে দিয়ে যা—'

রাণী ফিরিয়া আসিয়া সভয়ে বলিল, "তুমি শুয়ে পড় বড়দা', বৌদি ওঘরে শুয়েছে। আমি মশারি ফেলে দিচ্ছি।"

একটা ছোট্ট হুঁ বলিয়া অমৃত পাশ ফিরিয়া শুইল। রাণী পাখা দিয়া মশা তাড়াইয়া মশারি ফেলিয়া তাহার চারিপাশ গুঁজিয়া দিয়া আলো নিভাইয়া চলিয়া গেল।

শুইয়া শুইয়া রাগে অমৃতর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

সে ভাবিল সংসারে সে নিতান্তই মন্দভাগ্য। ঘাড়ের উপর এমন একটা বিপদ ঝুলিতেছে তাহার উপর সংসারেও যদি এইরূপ অশান্তি ভোগ করিতে হয় ত মানুষের বনে না গিয়া উপায় কি? যেমন তেমন বিপদ নয়, পুলিশ কেশ। যাহাতে জ্ঞানতঃ তাহার তিনপুরুষে কেহ পড়ে নাই। তাও হয়ত পলিটিকাল! অফিসের অনুকূল বাবু যাহা বলিলেন তাহাতে জেলও হইতে পারে, দ্বীপান্তরও হইতে পারে নয়ত বিনা বিচারে কোন অস্বাস্থ্যকর ক্যাম্পে 'ডিটেন' করিয়াও রাখিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের খেয়ালের উপর ত কেহ কথা কহিতে পারিবে না। যদি তাহার এই দশা হয় তখন কোথায় থাকিবে এই সংসার আর কোথায় থাকিবে তাহার মান-অভিমান! অমৃতর মনে কেবলি দুর্ভোগটার কথা খোঁচা দিতে লাগিল। গভীর

রাত্রে অনাগত বিভীষিকায় সে বিনিদ্র হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে আর স্ত্রী তাহার আপন খেয়ালে পাশের ঘরে অকাতরে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে!

সে কোথায় বিপদের পরিমাণটা বলিয়া স্ত্রীর নিকট পরামর্শ লইয়া সান্ত্বনার প্রত্যাশায় ছুটিয়া আসিল আর স্ত্রীর এই ব্যবহার! এদেরই ত শাস্ত্রকারগণ সখী ও সচিব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! এরাই না সহধর্ম্মিণী! আরে রামোঃ—!

ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বাজিল, বারটা বাজিল, সাড়ে বারটা বাজিল, একটাও বাজিয়া গেল। তখন অমৃত অনুভব করিল তাহার মাথা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে! সে উঠিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকিয়াও অমৃত মেনকাকে ডাকিতে সাহস করিল না। ভাবিল রাণীটা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে গজ্ গজ্ করিতেছিল, কি জানি যদি এখানেই শুইয়া থাকে। দুইজনে গলায় গলায় ভাব কিনা! আন্দাজ করিয়া অমৃত নিমেষের জন্য সুইচ-টা টিপিয়াই বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল তাহার ভয় অমূলক। মেনকা একলাই শুইয়া আছে। সে ধীরে ধীরে পাশে বসিয়া তাহার একখানি হাত তুলিয়া ধরিল। মেনকা যেন ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল—সে সজোরে হাতখানি কাড়িয়া লইল।

অমৃত আবার তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—'মানু, ওঘরে চল—'

'থাক, খুব হয়েছে'—বলিয়া মেনকা হাত ছাড়াইয়া লইয়া ফিরিয়া শুইল।

বিরক্তিভরে অমৃত বলিয়া উঠিল—'কি হ'ল তোমার, খুলে বলই না ছাই! কেন অমন কচ্ছ?'

মেনকা পিছন ফিরিয়াই জবাব দিল, 'কিচ্ছু হয়নি, তুমি যাও এঘর থেকে।'

অমৃত দুষ্টুমি করিয়া বলিল—'আমি যাবনা ত, এখানেই শোব' বলিয়া সত্য সত্যই শুইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া মেনকা বলিল, 'বেশ আমিই ওঘরে যাচ্ছি।'

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া অমৃত দুই হাতে মেনকার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল 'স্তাখ, ঘরে বাইরে যদি আমাকে এরকম জ্বালাতন ক'র ত আমাকে বনে গিয়ে বাস করতে হবে'—

মেনকা বলিল, 'বনে কেন, কাশী ত আরো ভাল জায়গা'—

কথাটা না বুঝিয়া অমৃত বলিল, 'তার মানে?'

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, 'তা হলে ঐ কথা তুমি বিশ্বাস করেছ?'

মেনকা বলিল 'এতে অবিশ্বাসের ত কিছু নেই।'

অমৃত তাহাকে বুঝাইতে বসিল যে ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যা। সে ইহার কিছুই জানে না। কাশীর আভাবতী দেবীকে সে জানে না, তাহাকে টাকাও কখনো পাঠায় নাই। ইতিপূর্ব্বে আরো দুইখানি কূপন আসিয়াছিল, সেগুলি সঙ্গে দিয়া সে পোষ্টাফিসে এ বিষয়ে খোঁজ লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, তাহাকে নাকাল করিবার জন্য ইহা পুলিসেরও একটা চাল হইতে পারে ইত্যাদি।

ফল তাহাতে বিপরীত হইল। ইতিপূর্ব্বে আরো দুই খানি রসিদ আসিয়াছে; যদি মিথ্যা হইত তবে এমন মজাদার খবরটা অমৃত নিশ্চয়ই তাহাকে লুকাইত না। এতদিন ঘর করিয়া এ বিশ্বাসটুকু তাহার উপর মেনকার হইয়াছে। যখন লুকাইয়াছে—তখন নিশ্চয়ই গলদ আছে। সে অধৈর্য্য হইয়া জবাব দিল, 'আমি ত কৈফিয়ত চাইছি না তোমার কাছে। এখন তুমি যাবে, না আমি যাব ঘর থেকে? এমন রাত দুপুরে ঢলাঢলি আমার ভাল লাগছে না।'

এক শ্রেণীর লোক আছে, বুদ্ধির গোচরে যাহা সে সবই তাহারা সহ্য করিতে পারে এবং তাহার বাহিরে গেলেই ধৈর্য্য হারাইয়া বসে। অমৃত সেই প্রকৃতির ছিল। সহজে রাগিত না এবং যদি কখনো রাগিত তবে ভীষণ একটা কিছু না করিয়া ছাড়িত না। আজ মেনকার ব্যবহারে ও বাক্যে সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, 'বেশ করবো, ঢলাঢলি করবো পাঁচশো বার করবো। আমি কারো খাই না পরি যে তার হুকুম মত আমার চলতে হবে। কাশীতে টাকা পাঠিয়েছি বেশ করেছি। আমার রোজগারের টাকা আমি

যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দেবো—তাতে অপরের মাথা ব্যথা কেন ?'

এক নিশ্বাসে অমৃত হয়ত আরো অনেক কিছু বলিয়া যাইত কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইতেছিল তাহাকে মুখে আঁচল চাপা দিয়া, ফোঁপাইয়া মেঝের লুটাইয়া পড়িতে দেখিয়া অমৃত থামিয়া গেল এবং সে ক্রন্দনবেগ ক্রম-বর্দ্ধমান বুঝিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি পা টিপিয়া টিপিয়া অন্ধকারে নিজের ঘরে পলাইল।

বিছানায় শুইয়া অমৃত ভাবিতে লাগল তাহার অপরাধটা কোথায় ? মা সন্ধ্যা হইতে গম্ভীর হইয়া আছেন আর স্ত্রীর অবস্থা ত এই ; এখন সে দাঁড়ায় কোথা ? টাকা ত আর সত্য সত্যই পাঠান হয় নাই। আর পুরপ্রাপ্ত কুপন দুইখানির কথা বাড়ীতে না জানানর ত্রুটি তাহার কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত বলিয়াই মনে হইয়াছিল ; কেন না মেয়েছেলেদের নিকট এ সংবাদ জানাইয়া কোন ফল ত ফলিবেই না অধিকন্তু তাহাদের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে মাত্র। কিন্তু তাহার পরিণাম যে এমন হইবে কে জানিত ! বেশ, সকলেই আপন আপন খুসীমত রাগ অভিমান করিতে পারে, এবার সেও করিবে। অফিসে অনেকদিন ছুটি পাওনা আছে, কাল এক মাসের জন্য দরখাস্ত দিয়া যদি সম্ভব হয় রাত্রের ট্রেণে কোথাও বাহির হইয়া পড়িবে। মনে মনে প্রোগ্রাম ঠিক করিতে করিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে। চোখে মুখে জল দিয়াই অমৃত কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিল। কি কি জিনিষ সঙ্গে লইবে তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া রাণীকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ, দুপুর বেলা ভাত খেয়ে এই গুলো সব ওই বড় 'হোল্ড অল্'-টায় গুছিয়ে রাখবি—একটাও যেন ভুল না হয়। যাবার সময় এক টাকা বকসিস্, বুঝলি ?'—বলিয়া রাণীর মাথায় একটা চাপড় দিয়া স্নান করিতে গেল।

রাণী বলিল, 'কোথায় যাবে দাদা ?—'

অমৃত কল্-তলা হইতে চেঁচাইয়া বলিল, 'ফরাক্কাবাদ'। খাওয়া তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে মা আসিয়া অমৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁরে, কোথায় যাবি তুই ?

অমৃত বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল—আপিসে যদি ছুটি পাওয়া যায় দিন কতক বাইরে ঘুরে আসব মনে কচ্ছি।

মা বলিলেন—তা আমায় কিছু বলিস নি কেন ? আর এ দারুণ বর্ষায় লোকে বাইরে যায় !

অমৃত বলিল—আগে ছুটি-ই মঞ্জুর হোক। আর বেরোবার সময় তোমায় বলে যেতুম।

মা বলিলেন—এখন কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না। যেতে হয় পূজোর পর যাস—

গম্ভীর হইয়া অমৃত বলিল—না মা, বারণ ক'রো না, আমায় যেতেই হবে। মনটা ভয়ানক চঞ্চল হয়েছে !

মুখ ভার করিয়া মা বলিলেন—তা বেশ যেও। এখন ত আর নেহাৎ ছোটটি নও যে ধরে রাখব। কি যে ব্যাপার তোমাদের আমি কিছু বুঝতে পারি না ! কাল কোত্থেকে এক রসিদ এসে হাজির। কাশীতে কোন মেয়ের কাছে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে ছিলি কেন ? বৌটা কাল থেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।—ঐ একটা মেয়ে আমার গলায় ঝুলছে—তার একটা গতি করতে হবে, আর তুই চল্লি শুধু শুধু দেশ বেড়াতে। যা ইচ্ছে কর—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, জামা কাপড় পরিয়া অমৃত নীচে হইতে রাণীকে চেঁচাইয়া ডাকিয়া জানাইয়া গেল—'মনে থাকে যেন, এক টাকা।'

সঙ্গে সঙ্গে অমৃতকে শুনাইয়া উপর হইতে মেনকা হাঁকিল 'সদা, চোরবাগান যাব, একখানা গাড়ী ডাক'—

চোর বাগানে মেনকার বাপের বাড়ী।

অফিসে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া, শিলং-এর একখানা টিকিট কিনিয়া অমৃত বৈকালে ট্রামে বাড়ী ফিরিতেছিল। নেবুতলার মোড়ে চাহিয়া দেখিল ফুটপাথ দিয়া তাহার বন্ধু ধরণী যাইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া ট্রাম হইতে অমৃত নামিয়া পড়িল।

ধরণী বলিল 'আরে তোর ওখানেই যাচ্ছিলুম যে !'

অমৃত বলিল 'চল্, কিন্তু ক'দিন ডুব দিয়েছি- কোথা ?

ধরণী বলিল, 'আর বলিস কেন, সংসারের জ্বালায় কি আর নিশ্বেস ফেলতে পাচ্ছি। দেশে গিছলুম,—অসুখ

বিসুখ, মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। তারপর তোর বাড়ীর সব ভাল?'

বলিতে বলিতে মুখ মচকাইয়া অমৃত বলিল—বাড়ীর সব সেদিক দিয়ে ভাল, কিন্তু বড় ভাবনায় পড়েছি ভাই। তারি ঠেলায় আজ রাত্রের ট্রেণে শিলং যাচ্ছি। কোথেকে এক মণি অর্ডারের কুপন—

মুখের কথা প্রায় কাড়িয়া লইয়াই ধরণী জিজ্ঞাসা করিল—'তিন খানা পেয়েছিস্ ত?'

অমৃত থমকিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল, 'তুই শুনলি কোথেকে?'

খানিকটা দম্‌কা হাসিয়া ধরণী বলিল, 'সেগুলো আমারি কুপন যে; কাশীতে শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে টাকা পাঠিয়েছিলুম। তিনি অভাব জানিয়ে চিঠি লিখে-ছিলেন, অথচ বাড়ীর কারুর ইচ্ছা নয় যে তাঁকে সাহায্য করা হয়। কাজেই আমার পকেট থেকে যাচ্ছে এবং তোমার হাত দিয়ে। এতদিন তোকে বল্‌ব বল্‌ব মনে ক'রে একদম হজম ক'রে দিয়েছি। তারপরেই তো রেশে গেছলুম। কেন কিছু হয়েছে নাকি?'

'বিলক্ষণ' বলিয়া অমৃত সংক্ষেপে বাড়ীর ব্যাপারটা ধরণীকে বুঝাইয়া বলিল, 'এখন তুই এক কাজ কর,—'

হাসিয়া হাত জোড় করিয়া ধরণী বলিল—'যো-হুকুম'।

অমৃত বলিল, 'তুই আগে বাড়াতে যা। গিয়ে ব্যাপারটা সব খুলে তাদের বুঝিয়ে বলবি, তারপর আমার সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে দুঃখু ক'রে কাল আবার আসবি বলে চলে যাবি। খবরদার, আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল জানাস্‌নি। দেখি না শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়! আমি টিকিট ফিরিয়ে দিয়ে আসি। অনর্থক কতকগুলো টাকা তোর জন্যে খস্‌ছিল—'

ধরণী সায় দিয়া বলিল—'বাঁচিয়ে দিয়েছি ত—এখন খ্যাট্ দিচ্ছ কবে বল?'

'কাল—কাল্ এখন আমাদের বাড়ী যা, আমি বল্লুম'—বলিয়া অমৃত ট্রাম ধরিতে ছুটিল।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া অমৃত হুড় হুড় করিয়া বরাবর নিজের ঘরে গিয়া উঠিল এবং হাঁক-ডাক টানা-হ্যাঁচড়া করিয়া সারা বাড়িটাকে সচকিত করিয়া তুলিল। ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—'ঠাকুর আমার খাবার 'টিফিন-কেরিয়ারে' ভরে দাও।' চীৎকার করিয়া 'সদা'কে বলিল—'সদা, একখানা ট্যাক্সি ডাক'—'হোল্ড-অল্'টা টানাটানি করিতে করিতে হাঁকিল, 'রাণি, শীগ্‌গির এদিকে আয়, কিছু ভরা হয় নি। পোড়ারমুখী, বাঁদরী, সমস্ত দুপুর করেছ কি? একটা কথা শুনবে না, খালি টাকা দাও, জুতো দাও, গানের বই দাও। এবার চেয়ো কিছু!—'

মেনকা আসিয়া একবার ঘরের ভিতর উঁকি দিয়াই চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই কোথা হইতে আচম্বিতে ঘরের দরজা কে টানিয়া বাহির হইতে তাহাতে শিকল লাগাইয়া দিল।

ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া অমৃত হুঙ্কার দিল—এটা কি হোল? এর মানেটা কি?

কেহ মানে বলিয়াও দিল না, কোন প্রত্যুত্তরও আসিল না।

দ্বিগুণ চীৎকারের সহিত দরজায় ধাক্কা মারিয়া অমৃত গর্জ্জাইতে লাগিল—'ভেঙে ফেল্‌ব দরজা, আমার সঙ্গে ইয়ারকি! যত কিছু বলা যায় না, তত আস্পর্দ্ধা বাড়ছে সব। চেনেনা আমায়! ট্রেণের সময়, শীগ্‌গির খুলে দিয়ে যাক্ বল্‌ছি'—তাহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া বলিল—'এর বেলায় আর কেউ কিছু দেখ্‌তেও পায় না, শুনতেও পায় না! আর যত দোষ আমার বেলায়।'

আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া গেল। মেনকা আস্তে আস্তেই ঘরে ঢুকিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়া-ইয়া অমৃতকে অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলিল—'অমন ক'রে চীৎকার করছ কেন, পাড়ার লোক কি ভাবছে বলত!'

অতিরিক্ত ক্রোধের ভাণ করিয়া অমৃত বলিল—'ভাবুক গে, আমার ট্রেণের সময় বয়ে যাচ্ছে আর আমি চেঁচাব না? রাণীটাকে বলে গেলুম আমার জামা কাপড় গুছিয়ে, দরকারী জিনিষগুলো এর ভেতর পুরে রাখ্‌তে, সে কিচ্ছু করেনি—আর আমি চেঁচাব না?'

স্নিগ্ধ স্বরে মেনকা বলিল, 'আমি বারণ করেছিলুম তাই সে কিছু করেনি। কোথায় যাবে তুমি? বিবাগী হ'য়ে?'

কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত অমৃত বলিল 'আমার যেখানে খুসী যাব। আমি কাশী যাব।'

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মেনকা বলিল, 'কেন বন্ধুর শাশুড়ীকে দেখ্‌তে নাকি? কিন্তু আমি ত তোমায় ছাড়তে পারি না।'

অমৃত জিজ্ঞাসা করিল—'মানে?'

মেনকা বলিল, 'পুলিসের লোক এসেছিল। তারা নাকি সন্ধান পেয়েছে যে তাদের ভয়েই তুমি আজ বাইরে পালাচ্ছ। তখন তুমি ছিলে না, আমায় বলে গেছে, এসে যেন না আবার পালাতে পারে। তাহলে আমাকেই দায়ী করবে না কি!'

মুখ খিঁচাইয়া অমৃত বলিল, 'তারা দড়ি-টড়ি দিয়ে যায় নি ? বলে যায়নি যে সে যা'তে না দৌড়ে পালাতে পারে, এই দড়ি দিয়ে ক'শে বেঁধে রেখ ?'

হাসিয়া মেনকা জবাব দিল—'ওমা, তা আবার দেয়নি, দু'গাছা শক্ত দেখে দড়ি দিয়ে গেছে।'

অমৃত বলিল—'তবে আর দেরী কেন ? বার কর তোমার দড়ি। কোথায় গলায় না হাতে দেবে ?'

'দেখা যাক্, যেখানে সুবিধে বুঝবো'—বলিয়া মেনকা তাহার দুইখানি কমল পাণি দুই পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া কি একটা করিতে যাইতেছিল—

—নীচে ধরণীর গলা শোনা গেল—'অঘোরতো আছিস্ নাকি ? মাসীমা অঘোরতো কোথা ?'

মা জবাব দিলেন—'যেমন হয়েছে আমার পাগলটা, তেমনি একটা পাগলীও জুটেছে। দুটোতে মিলে ওপরে ভূতের নেত্য করছে দেখ্‌গে যা'—'

পাশের ঘরে রাণী তখন সুর করিয়া তাহার পড়া পড়িতেছিল—আই মেট এ লেম ম্যান। লেম ম্যান মানে খঞ্জ মনুষ্য, খোঁড়া লোক—

—

অভিমানী

শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী

জননী যে এসেছিল দ্বারে,
কেমনে ফিরালি তারে
ওরে মূঢ় অবোধ সন্তান,
অভিমানে আত্মহারা মায়েরে করিলি অপমান।
ধরণী সাজা'ল অর্ঘ্য কাশ, কুন্দ, রক্তজবাদলে
হিমগিরি চঞ্চলিয়া জলধারা ঝরিল উপলে,—
নীলাকাশ ভরে' গেল, দিকে দিকে স্তব-গুঞ্জরণ,
শেফালি পড়িল ঝরি' বন্দি' মা'র রাতুল চরণ।
তুই শুধু চিনিলি না. এত ক্ষোভ—এত অবসাদ,
আহ্বান ফিরিয়া গেল, শিরে নিলি গুরু অপরাধ !

অভিমানে ফিরে গেল মাতা তোর রাজরাজেশ্বরী
শরৎ-আকাশ ভরি'
আলোড়িত জননীর ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস
মা কহিছে সন্তানেরে "আমারে করিলি অবিশ্বাস ?"

মা যে এসেছিল দিতে বিজয়ার বিজয়ের টীকা,
আজি নির্ব্বাপিত হায়, হোমানলদীপ্ত-বহ্নিশিখা !
ধূর্জ্জটী উঠিছে রুষি' সন্ত্রস্তে পলায় অংশুমালী
সহসা চাহিয়া দেখে নীলাকাশ হ'য়ে আসে কালি।
সন্তানের এ বিদ্রোহ বিশ্বেশ্বর সবে না নীরবে
এ নহে ভাঙ্গড় ভোলা, কৃত্তিবাস ডম্বরুর রবে
নাচিতেছে ভয়াল ভীষণ,
মহিষীর অপমানে মহেশের সর্ব্বনাশা পণ !
আপনার 'পরে কেন নিলি এই ব্যর্থ প্রতিশোধ
শক্তিহীন হতভাগ্য, কে তোর জাগাবে আত্মবোধ ?

চেনা-অচেনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

৩

এইমাত্র ডাক এল। গোলাগুলি আসে যে গাড়ীতে তাতে ডাকও আসে। "ডাক এসেছে", কথা দুটো কাণে বাজলো ও সেই সঙ্গে লোকদের দৌড়ধাপের শব্দ শুনতে পেলুম। ভাবতে ভারি আশ্চর্য্য লাগে যে চিঠিগুলো কতদূর দূরান্তরে যাতায়াত করে। অবিরাম অগ্নি ও গ্যাসবর্ষণের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র-বাহন এই চিঠিগুলি কত নিরাপদে এসে পৌছয়। কখনও হরকরার থলিতে, কখনও রসদবাহী জানোয়ারের পিঠে আবার কখনও বা যুদ্ধ-সংগ্রামের গাড়ীতে। কামানগুলো যেখানে আছে, দিনের বেলা সেখানে চলাফেরা অসম্ভব, কাজেই ডাক নামান হয় রাত্রে। লোকেরা সব সার বেঁধে দাঁড়ায়! হাতাহাতি করে শেল-গুলো মাটীর নীচে বারুদ রাখবার গর্ত্তে আগে জমা করে। বিপদের সম্ভাবনা তো কম নয়। এদিকে মায়ের, স্ত্রীর, প্রণয়িনীর চিঠি থলির মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। লুব্ধ সন্তান, স্বামী বা প্রণয়ীর কাতর দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আরও কিছুক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হবে। শেষ শেলটা গর্ত্তে জমা করা হয়ে গেল আর এতক্ষণের ত্বরিত কর্ম্মীদল মেজরের পাতাল-কক্ষের দরজায় ভিড় করতে ছুটল। তিনি থলির উপর ঝুঁকে মোম-বাতির আলোতে খামের উপর লেখা নামগুলো চীৎকার করে পড়েন। থলি ক্রমে খালি হয়ে আসে। শূন্য থলিটা তিনি একবার উল্টো করে ঝেড়ে দেখেন। এর পর সারা দিন-রাত বাড়ী থেকে আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। ক্রমে ভিড় পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেই অন্ধকার আবার নির্জ্জন হয়ে উঠল।

আমার মত কর্ত্তাদলের মানুষকে ঘরে বসে অপেক্ষা করতে হবে, আমাদের চিঠি বয়ে আনবে আর্দ্দালি। এ এক ধৈর্য্যের পরীক্ষা! উচ্চ পদের দাম বুঝি এমনি করেই দিতে হয়। কি জানি কেন মনে হয়েছিল, আজ রাত্রে তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবোই। ডাক এসেছে শুনে পদের সকল মর্য্যাদা ভুলে বেরিয়ে পড়লুম, যেন বাহক জানোয়ারগুলোকে লাইনের বাইরে রাখা হয়েছে কিনা এই তদারক করাই আমার উদ্দেশ্য। কি অপূর্ব্ব রাত্রি! তারা আর তুষার যেন অন্ধকারের আবলুষের উপর রূপার মিনা। আগুনের আলোর চারপাশে এরই মধ্যে লোকেরা নীরবে বসে চিঠি পড়ছে। কম্পিত অগ্নি-শিখার মত তাদের হৃদয়ও বুঝি উদ্বেল চঞ্চল। চলছি, আর পায়ের তলায় জমা তুষার ধূলো হয়ে যাচ্ছে। মনে হ'ল, যেন ক্ষণেকের জন্যে যুদ্ধের সব হাঙ্গামা থেমে গেছে, সবাই যেন ক্ষণকালের স্মৃতি, শান্তি ও স্নেহের কোলে ফিরে গেছে।

পথে আমার আর্দ্দালির সঙ্গে দেখা। হাতে তার এক তাড়া চিঠি। সেগুলির ভার নিয়ে মাটীর নীচে নায়কদের মেসে ফিরে এলুম। টেবলের উপর জমা করে এক চাহনিতেই দেখে নিলুম তোমার কাছ থেকে আমার নামে কোন চিঠিই আসে নি। আমার নামের তিন খানা চিঠির উপরেই চেনা হাতের লেখা। কথাটা শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে, না? জগতে আমার বলতে যা কিছু আছে, সবার চেয়ে তোমার দাম আমার কাছে বেশী, সবার চেয়ে তুমি আমার কত আপন, অথচ তোমার হাতের লেখা আমি কখনও দেখিনি! তাই ভাবছি, পরস্পরের কাছে আমরা কতখানি অপরিচিত!

আমাদের মেসে সকলেরই আজ চিঠি এসেছে। সব চেয়ে বেশী এসেছে জ্যাকের। তার স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি এসেছে চারখানা। অপূর্ব্ব তার বিবাহের কাহিনী। মোটে এক সপ্তাহের আলাপ, তারপর বিয়ে এবং দিন চারেকের হানিমুন। সে মিলন-বাসর ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই জ্যাক ফ্রান্সে চলে এল। আজ বছর দুই হ'ল তার বিবাহ হয়েছে কিন্তু সমস্ত জীবনে সে স্ত্রীর সঙ্গে ত্রিশ দিনও কাটিয়েছে কি না সন্দেহ! প্রেম ও বিবাহের এমন দ্রুত গতি ও পরিণতি, এর আগে আমি কোন দিন দেখিনি। আমি কিনা তার

সব চেয়ে বড় বন্ধু, জ্যাক আমার কাছে কিছু তাই গোপন রাখে না।

আমাদের মেজর পেয়েছেন একখানি চিঠি। তাঁর প্রণয়িনী তোমারই মত ফরাসী হাঁসপাতালে কাজ করেন। আমার ধারণা সে মেয়েটি মেজর সাহেবকে মাঝে মাঝে বেশ একটু জব্দ করেন। আমাদের দলপতির সঙ্গে কেউ যে রসিকতা করতে পারে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবু তাঁকে তো খুব খুসী দেখছি না, গম্ভীর ভাবে খোলা দিকে চেয়ে তিনি কেবলই ভ্রূকুঞ্চন করছেন।

তারপর বিল লেন। এ ভদ্রলোক আছেন ভাল প্রকৃতি একটু চঞ্চল বটে, কাজে কিন্তু বেশ চতুর। তাঁর প্রণয়িনী আছেন ইংলণ্ডে, আগামী ছুটীতে তাকে বিয়ে করবার নানা জল্পনা চলছে। বিল বেচারী সারাদিন ভয়ে ভয়ে থাকে; পাছে বিয়ের আগেই শেলের আঘাতে তার জীবন ও কল্পনা সব শেষ হয়ে যায়। আমি ভুল বলেছি, ভয় কথাটা ঠিক নয় কারণ বিপদের মুখে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাবার সাহস আমাদের চেয়ে তার একটুও কম নয়। বিল চিঠির পাতা উল্টে যাচ্ছেন আর আপন মনে হাসছেন।

আর একজন আছেন আমাদের দলে—ষ্টীফেন। চমৎকার নক্সা আঁকে। তাকে কেউ কোন দিন চিঠি লেখে না। মানুষটি দেখতেও যেমন চমৎকার, ব্যবহারও তার তেমন হৃদ্য, মধুর। চিঠিগুলো যখন রোজ বিলি হয়, ষ্টীফেন আদৌ চঞ্চল হয় না, কারণ কারো কাছে সে বোধ করি কোন কিছুই প্রত্যাশা করে না। আমরা যখন যে যার চিঠি পড়ি, সে মাথা নীচু করে একাগ্র মনে ম্যাপের লাইন টানে।

তুমি আমায় চিঠি লেখনা কেন? আমি দিন গুণ্‌ছি। যতদিন দেরী হওয়া সম্ভব তা হাতে রেখেও দেখেছি যে, কাল তোমার একখানি চিঠি আসা উচিত ছিল। আজ ভেবেছিলুম নিশ্চয়ই পাবো। অনাদি কাল থেকে প্রেমিকরা হতাশা দূর করবার জন্যে যত রকম মিথ্যা ওজর মনে মনে রচনা করে নিজেকে স্তোক দেয়, আমিও তাই করেছি, আজও করছি। তুমি নিতান্ত ব্যস্ত। চিঠি লিখেছ, হয়ত ডাকে দিতে ভুলে গেছ; ডাকে দিয়েছ, পথে কোথায় দেরী হচ্ছে। মনের কোণে মেঘের মত কত ভাবনা আবার জমে উঠে; তুমি হয়ত আমার কথা একটুও ভাবো না। আমি যে তোমায় ভালবাসি, একথা শুনে হয়ত সত্যিই বিস্মিত হয়ে যাবে। আমি তোমায় ভালবাসি একথা জান বলেই হয়ত আমায় চিঠি দাও না। কত কথাই যে মনে জাগে। চোখ বুঁজে তোমার সঙ্গ-স্মৃতির ধ্যান করি; তোমার মুখখানি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কি মমতাময়ী তুমি! আমার উপর হয়ত তোমার কোন দরদ নেই। অবশ্য, যদি মনে করতুম তবে আমায় ভাল না বেসে কি তোমার পরিত্রাণ ছিল! তোমায় যে আপন করে জানব, সেই ছিল আমার আশার অতীত। আমার প্রাপ্যের অনেক বেশী। যুদ্ধের মধ্যে যে প্রেমের আসন পড়বে, এযে একেবারে অভাবনীয়। সারা জীবন ধরে এই প্রেমের প্রীতির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করলুম। অথচ স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে যখন যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লুম তখনই তোমাকে পেলুম। এ যেন ভগবানের দান। আমার এ কথা তুমি হয়ত কোন দিনই জানবে না, আমি কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট।

এই অদ্ভুত রাজ্যে, সাহস যেখানে কর্ত্তব্যের ছদ্মবেশে ঘুরছে, সেখানে আমরা যে সব আশাই পিছনে ফেলে এসেছি। এখানে আশার মমতা করা মানেই কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। সাহসী হ'তে হ'লে প্রতিদিনের জন্যেই বাঁচতে হবে। আগে আমি কি আত্মম্ভরী ছিলুম! সুখের নানা কল্পনায় একেবারে বিভোর! বলিষ্ঠ জীবন যাপন করবো—এই হবো, এত করবো—হাতের মুঠোয় জগতকে ধরে রাখবো!—

ভবিষ্যতে চল্লিশ বছরের মত কত মতলবই ঠিক করে রেখেছিলুম। মনে হয়েছিল, অনেক পুরুষপরম্পরা মানুষের ভাগ্য আমার কাজের উপরেই নির্ভর করবে। তারপরই এই যুদ্ধের আবির্ভাব। অথচ কোন কালে যে যুদ্ধ করতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কোন লোককে যে আমি হত্যা করতে পারি, এ যেন চিন্তার অতীত ছিল। শুধু তাই নয়, ওর মধ্যে আমি কেবল বিভীষিকাই দেখেছি। উচ্চাশা ও ব্যক্তিত্ব ডুবিয়ে যা কিছু শিক্ষা পেয়েছি তা দূরে ফেলে এমন পথ নিতে হবে যা নিজের কাছেও তারি বিশ্রী। এমন অবস্থায় নিজেকে আনতে হবে, যাতে সব শক্তি পঙ্গু

হয়ে যাবার সম্ভাবনা, মরণের ডাক যেখানে ক্ষণে অক্ষণে বেজে উঠে। এই তো যুদ্ধ!

না, তোমার সম্বন্ধে কোন আশাই আমি আর বুকের মধ্যে পুষবো না। তা হলে ক্রমে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমার জীবনে তোমার ক্ষণিক আবির্ভাবই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর একটিবার, যদি শেষ বারের মত তোমায় দেখতে পেতুম, আমার গোপন বেদনা যদি অস্ফুট গুঞ্জনে জানাতে পারতুম। আমার সাহস হয়ত আরও বেড়ে যেত।

তোমায় আর কিছু লিখবো না মনে করছি। একলা বসে বসে এই চিঠি লিখে জানিয়ে রাখা এক সর্ব্বনাশা সখ হয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দাম এতে অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। আমি আজ বুঝতে পারছি, কত মধুর, কত গৌরবান্বিত করা যায় এই জীবনকে। যদি আজই এই জীবনকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে পারতুম, মনে আমার শান্তি আসত! বিদায়ের ক্ষণে তুমি মাথা না ফিরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গিয়েছিলে যেমন করে, জীবন থেকে তেমন করে বিদায় নিতে আমারও যে ভারী সাধ!

৪

তোমার চিঠি! কি মিষ্টি চিঠি তোমার—তুমি যেন চিঠিখানিকে ভরে আছ! আমার পাশে তোমার স্পর্শ অনুভব করছি—তোমার স্বর যেন কাণে বেজে উঠছে। এ যেন তোমার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে নিয়েছি, লুক্সেমবার্গ বাগানের পিছল পথে যেমন করে তোমার হাত ধরেছিলুম। কতবার যে তোমার চিঠি পড়েছি, তা গুণতে পারি না। সব কথাগুলি আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে, তবু বার বার না দেখে তৃপ্তি পাচ্ছি না। তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। সেই গহন রাতের কথা! চারিদিকে সব আলো নেবানো, পথগুলি যেন বদ্ধ কালো নদীর মত শব্দহীন, প্রাণহীন, মরণের বাঁসা! তারপর আকাশের কোলে অকস্মাৎ চাঞ্চল্য—মেসিন গানের পট পট শব্দ আর অন্ধকারের বুকে এরোপ্লেনের জ্বলন্ত আবির্ভাব। ঘরের ছাদের উপর বোমার শব্দ।' আচ্ছা, তুমি কি ভয় পাও নি? চিঠিতে ভয়ের কোন আভাষই ত নেই।

তুমি লিখেছ "নিজের দিক থেকে বিচার করে মনে হয়, এরকম একটা ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ থেকে আমি বুঝলুম, এখানে আমার কত কাজ।" এ তোমার আত্মম্ভরিতা; কিন্তু এর ভিতরকার বীরত্বকে বা সাহসকে আমি অস্বীকার করি না। যুদ্ধের প্রথম সারে আমরা পুরুষের দল যে গৌরব বোধ করছি, তোমার মধ্যেও দেখছি আপন কর্ম্মে সেই বোধের প্রকাশ। আত্মবিসর্জ্জনের এই মহান সুযোগ সব মানুষকেই আকর্ষণ করেছে। আমার কিন্তু মনে হয় শান্তির দিনে এ সুযোগের অভাব হয়নি, শুধু দেখার মত চোখেরই ছিল অনাটন। কি জানি, সে আত্ম-বিসর্জ্জনে এত মহত্ত্ব হয়ত ছিল না—!

তুমি যে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছ, তা নিয়ে আমার ভাববার কথা অনেক; কিন্তু আমি ভাবছি না। বিপদের আগুনে তোমার মনে যে আলো জ্বলেছে, এতেই আমি খুসী। একদিন ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে যোয়ান অফ আর্ক ঘোঁড়ায় চেপে যুদ্ধে নেমেছিলেন। তোমার মধ্যে ততখানি নাটকত্বের অবকাশ নেই, কিন্তু বীরত্ব তোমাদের সমান। অবশ্য তোমার বাহন হচ্ছে ঘোঁড়ার বদলে ফোর্ড কার, বর্ম্ম হ'ল মার্কিন রেডক্রশের উর্দ্দি এবং শিশুহত্যা নয় শিশু-রক্ষা হ'ল তোমার কাজ। সত্য কথা বলতে কি, তোমার কাজটাই আমি বেশী পছন্দ করি। তুমি হয়ত বলবে যে তোমার কাজকে আমি বেশী দাম দিচ্ছি, ব্যাপারটা অথচ খুবই সাধারণ। স্বীকার করি, ফ্রান্সে এটা খুবই সাধারণ। পরের জন্যে নিজের প্রাণ দেওয়া ফরাসীদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে এ অভ্যাস যে কারো নেই। কেবলি নিজেকে নিরাপদে রাখব, ফিফ্থ্ অ্যাভেনিউতে এ চেষ্টা ত বিরল নয়।

কি অভাবনীয় বৈচিত্র্য তোমার জীবনে। তোমরা, আমেরিকানরা, সাধারণতই ভাবালু নও। তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এত বেশী যে আর সব মনোভাব তাতে চাপা পড়ে গিয়েছে। তোমার কথাই বলি। অতুল সম্পদ আর শত বিলাসের মোহ হেলায় ঠেলে, হাজার মাইল দূরে তুমি দাসীর কাজ করতে ছুটে এসেছ। যে কোন মুহূর্ত্তে মরণের মুখোমুখী হওয়া অসম্ভব নয়, অথচ তোমার মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা আমি দেখছি না। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ

আলোয় ধরে তোমার বীরত্বকে তুমি খর্ব্ব করেছ, যেন সেটা কিছু নতুন নয়। ফরাসীরা কিন্তু একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির তাদের পা যেন মাটীতেই পড়ে না, তারা যেন সারা জীবন এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়ছে। বর্ত্তমানকে তারা দেখে ইতিহাসের আলোয় এবং মনে করে তাদের রক্ত ভবিষ্যতের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল লাল ধারায় গড়িয়ে চলেছে। আমরা ইংরাজেরা নিজেদের গৌরব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, তবে মুখ ফুটে আমরা তার আলোচনা করি না। আমরা কাজ করি বিরাট কিন্তু তার কথা বলতে ব্যবহার করি সহিসের ভাষা। দুটো জিনিষকে আমরা খুব ডরাই, আত্মপ্রশংসা আর আত্মপ্রকাশ। মনে যত কিছুই বাজুক বা বাধুক, অবহেলার ছলে সেটাকে ঢাকতে চাই। তোমাদের মধ্যে কিন্তু এই ছলের জুয়াচুরীটা নেই। তোমরা পরের জীবন রক্ষা কর কিম্বা ট্যাঙ্গো নাচো—সাধারণ বা অসাধারণ এই ধরণের প্রভেদ তোমরা কর্ম্মের মধ্যে সৃষ্টি কর না। যে কাজ করতে যাচ্ছ, সেটা করবার মননটুকুই তোমাদের মুগ্ধ করে। কেবল কাজটার জন্যে তোমাদের কোন উৎসাহ নেই। সেই কারণে, যা কিছুই কর তাতে তোমাদের মাথা ঘুরে যায় না।

একটু আগে আত্মপ্রকাশের কথা বলছিলুম। ইংরেজ মাত্রেই সেটাকে ঘৃণা করে আর লুকোবার চেষ্টা করে। আমার কথাই বলি। তোমার কাছে ভালবাসার কথা কেন তুললুম না, বলতে পারো? পাছে তোমায় কোন রকমে বিচলিত করি। যে লোক যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা মেয়েদের পক্ষে শক্ত নয় কি? লোকটার জন্যে তোমাদের মনে করুণা ছাড়া আর কোন ভাবই জাগে না, অথচ মনে হয়, সেটা যেন ভালবাসা। নিজের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-প্রকাশের লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলুম বলেই, বলি বলি করেও সেকথা তোমায় জানাই নি, অথচ সেই ভাবের বশেই এই নোংড়া গর্ত্তের মধ্যে বসে কাগজের উপর রাশি রাশি মনের কথা ছড়াচ্ছি। এর না আছে কোন উদ্দেশ্য; না কোন মানে—এ একেবারেই পণ্ডশ্রম—।

জীবনকে নিয়ে আমি মহা-সমস্যায় পড়েছিলুম। যুদ্ধের আগে জীবন-যাত্রা ছিল আমার ভয়ের কারণ। কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে নানা রকম কল্পনা করতুম, কাজে কিছু করতে হলে কত দ্বিধা সংশয় মনে জেগে উঠত। সামরিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমি একটা উদ্দেশ্য পেয়েছি, সাহস করে বাঁচতে আর প্রয়োজন হলে কৃতজ্ঞ মনে মরতে শিখেছি। এখন বুঝতে পারছ, তোমাকে দেখবার পর থেকে আমার আগেকার উদ্দেশ্য কি রকম ঘুলিয়ে গেছে। নারীকে ভালবাসব অথচ ভবিষ্যতের কল্পনাকে আমল দেব না, নিয়ত তার অভাব বোধ করব অথচ হাল ছেড়ে বসে থাকব—এ যে একেবারে অসম্ভব!

যত কিছু বলি না কেন, আমাদের মিলনের অভাবনীয় বৈচিত্র্য আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। এ যেন মধ্য যুগের এক ঘটনা—প্রাচীন কাহিনীর গন্ধে ভরপুর। সাধারণ লোকে টেনিস পার্টিতে তার ভাবী স্ত্রীকে প্রথম দেখে, থিয়েটারে অনুরাগ জানায় আর গির্জ্জায় গিয়ে বিয়ে করে। তুমি আর আমি কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও গেলুম না। আমাদের প্রথম পরিচয় হ'ল আচম্বিতে আমেরিকার এক সহরে, বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে। আলাপ হল প্যারিসে—উদ্দেশ্য-হীন অন্যমনস্কতায় তখন পথে পথে ঘুরছি। আলাপশেষে পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম, সৈনিকের কর্ত্তব্য তখন দুজনকেই ডাক দিয়েছে।

আমাদের জীবন সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে—বিপুলা ধরণী আমাদের সামনে দীর্ঘ বিস্তারে পড়ে আছে; অন্তরের চিরদীপ্ত আদর্শসাধনায় আমরা ত্যাগ করেছি এ ধরিত্রীর সকল মোহ, যৌবনের বিরাট সম্ভাবনার আশা, হস্তামলকবৎ লব্ধ প্রেম। অথচ কি বিচিত্র আমাদের জীবন! আমি নরহত্যা করি আর তুমি জীব-ধাত্রী। সেবা করে আহতকে তুমি বাঁচিয়ে তোলো। তবু কোথায় যেন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধের মধ্যে একটা মিল আছে। এই অভাবনীয় ধ্বংস-লীলার মধ্যে এই অপরিচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধের মধ্যে তোমার তনুগন্ধবাহী চিঠির পাতা আমার কাছে আসে আর আমার লেখা পাতা তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছায়। না, আমি যা কিছু তোমাকে উদ্দেশ করে' লিখি, তার সবগুলিই অবশ্য তোমার কাছে যায় না। এই জরা, দুঃখ, দারিদ্র্য ও বেদনার উপরে আমাদের আত্মা অম্লান সৌন্দর্য্যে জেগে উঠেছে।

জগতের ইতিহাসের সব চেয়ে কুৎসিত ব্যাপার আমাদের চারদিকে নিত্য ঘটছে। কিন্তু এই সবের সঙ্গে লড়াই করতে হবে বলেই আমাদের আত্মা ভিতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, আত্মপ্রসার লাভ করছে। এ জাগরণ আমার কাছে অভাবনীয়, পরম বিস্ময়কর। প্রিয়া আমার, তোমার মার্কিণি মনে কি কোন উত্তেজনাই জাগে নাই ?

তোমার চিঠি আমার কাছে কোনখানে এল বলতে পারো ? তোমার প্রথম চিঠি ? উপত্যকার পাশ দিয়ে লম্বা একটা উঁচু জমি আছে, মস্ত একটা চড়াই। এখন সেটা বরফে ঢাকা। এরই পাশে গুহার মত ট্রেঞ্চের সার। এইখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কত লোক অজানা ও অতীত অপরাধের ফলে মরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। জার্ম্মানই হোক আর ফরাসীই হোক, আজ বছর খানেক পরে তাদের সমানই দেখাচ্ছে—তফাৎ শুধু পরের দেওয়া উর্দ্দিগুলোয়। এইখানে ট্রেঞ্চগুলো মৌমাছির চাকের মত। অনেকগুলোই এখন নষ্ট হয়ে গেছে। এরই একটায় বসে শত্রুর অদৃশ্য এক লক্ষ্য-পথে দূরবীণ দিয়ে তাদের গতিবিধি দেখা আমার কাজ। কাল হঠাৎ কুয়াশার অন্ধকার খানিকটা কেটে গেলে আমি দেখলুম, জার্ম্মাণরা সব কাজে লেগেছে। জায়গাটা ম্যাপের কোনখানে স্থির করে নিয়ে গোলন্দাজদের টেলিফোনে খবর দিলুম। ক্রমে কুয়াশার ঘোর কাটল। দেখলুম শত্রুদল গ্র্যাপনেল নিয়ে খোলা মাঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ছুটল। আমি অনুসরণ করলুম, আমার দৃষ্টিসীমা ক্রমেই বেড়ে চল্লো। নিরাপদ হবার পক্ষে তাদের একমাত্র বাধা ছিল, কাঁটা তারের একটা বেড়া। তারা সেই তারের তলা দিয়ে দুটো তারের মাঝ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল আর সেইখানেই আমাদের গুলির আঘাতে পোঁতা পেরেকের মত মাটীতে গাঁথা হয়ে রইল। আমি গুণলুম—দশজন। আরও দশজন আহত। শান্তির দিনে একটা কুকুর মারলেও আমার পক্ষে তা কষ্টকর ছিল আর এখানে এমন করে' নরহত্যা করতেও আমার রুচি বা বিবেকে বাধছে না। অদ্ভুত ! পাতালপুরীর এই অন্তরালে আমি যেন আকাশে ভগবানের মত সুখাসীন। জগতের বিচিত্র লীলা দেখছি, খেয়াল মত নির্দ্দেশ করছি কার বা কাদের মরবার পালা এল।

ঠিক এইখানেই তোমার চিঠি এল আজ ভোরের বেলায়। তোমার চিঠি ! এক চোখে তোমার রচনা পড়ছি, অন্য চোখে শত্রুর গতিবিধির আভাষ লক্ষ্য করছি। সম্ভবত, কুয়াশার আড়ালে বসে' কোন জার্ম্মাণ গোলন্দাজও ঠিক এমনই করছে। সেও আমার মত বাঁচতে চায়, তার ভালবাসার মানুষটাকে সে আমারই মত দেখবার জন্যে উৎসুক। আমার সঙ্গে তার কোন শত্রুতাই নেই, অথচ যদি সুবিধা পায় তবে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমায় হত্যা করতে তার বাধবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এটা নিতান্ত যান্ত্রিক। যে হাত আঘাত করছে, সে হাত লোক-লোচনে অদৃশ্য। ক্রমওয়েলের সেনাদল শত্রুর সামনাসামনি লড়েছিল, দায়ুদের গাথা গাইতে গাইতে তারা মরণের মুখে ছুটেছিল ; আর আমরা কামানের জমাট ধোঁয়ার আড়ালে, ট্রেঞ্চ থেকে গোপনে বাইরে আসি আর শত্রু-সংহার-শেষে নিঃশব্দে ট্রেঞ্চে লুকোই।

পরস্পরকে আমরা কতটুকু জেনেছি, কতটুকু দেখেছি, আমাদের যা সত্য প্রকৃতি, প্যারিসে তা দুজনের কাছে ধরা পড়বার অবকাশ হ'ল কই ? বেল্ট আর বোতামের পিতল ঘসে মেজে চকচকে করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, সামাজিকতা বজায় রেখে গল্পগুজব করেছি, ভব্যতার সামান্য ত্রুটিতে কুণ্ঠিত হয়েছি, ওজন করে খেয়েছি। লোকের মন হরণ করবে বলেই যেন তোমার সাজপোষাক চালচলন। তোমার সামান্য অসুবিধার চিন্তায় সেদিন আকুল হয়েছি আর আজ শুধু হত্যা করবার সুযোগ খুঁজছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তে সুযোগের অপেক্ষা করছি। আর তুমি সৈন্য দলের পিছনে ময়লার মধ্যে দিয়ে নিজের কাজে চলেছ ! পরস্পরের কাছে সব কথা পরিষ্কার করে' বলবার আর উপায় নেই, কিন্তু সেই সাধারণ তুচ্ছ জীবনের আবর্জ্জনা-স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, নির্ভীকভাবে মৃত্যু বরণ করার মধ্যেও গৌরব আছে।

কুয়াশার মেঘ কাটছে আর আমার দৃষ্টিকে খরতর করতে হচ্ছে, কেউ না আমার চোখ এড়িয়ে যায়।

এই আর একখানি চিঠি শেষ হল। ভবিষ্যতে যে দিন যুদ্ধ থামবে, তোমায় সব কথা বলবার ফুরসৎ পাবো, সে দিনের জন্যে একে অপেক্ষা করতে হবে। প্রিয়া আমার, যোয়ান অফ আর্ক আমার। বিদায়—তোমার পাওয়ার

গোলাপের সৌন্দর্য্য, তোমার রেড ক্রশের কর্ত্তব্য, সকলের কাছে বিদায়। ডরমেনের (Dormen) গহন বনে জোয়ান স্বপ্ন দেখেছিল! আর তুমি স্বপ্ন দেখেছ নিউ ইয়র্ক সহরের গগনস্পর্শী প্রাসাদ-কক্ষে। তোমরা দুজনেই কর্ত্তব্যের আহ্বানে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছ। তোমাদের জীবনের মাঝে যত শতাব্দীরই ব্যবধান থাক্, তোমাদের আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৫

আজ তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, তোমার কাছ থেকে একটি লাইনও পেলুম না। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার আশা করবার আমার অধিকার কি বল? তুমি আমায় লিখবেই বা কেন? তোমার কাছে আমি পথিক বই আর ত কিছুই নই! যদি আর কিছু বলে তোমার ধারণা হ'ত তা হলে তুমি কি না যাচিয়ে ছাড়তে। আচ্ছা, যদি বিদায়-রাতে তোমায় সব কথা খুলে বলতুম। কি হ'ত তাই ভাবছি। তুমি যে কেমন করে আমায় গ্রহণ করতে তা বুঝতেই পারছি না। তবু, তুমি যে আমার অভাব বোধ করছ, একথাটা ভাবতে আমার ভারি সাধ হয়। কোন মেয়ে যে আমার জন্যে ভাবছে এ জ্ঞানটা এই নিঃসঙ্গ, নিরালা জীবনে বড় প্রীতিপ্রদ—মনে বলের সঞ্চার করে।

কি লিখলুম পড়ে দেখছি। যা লিখেছি তা আদৌ পুরুষোচিত হয়নি। এই যে নিজের উপর করুণা, এটি সৈনিকের সব চেয়ে বড় শত্রু। সহ্য করবার একমাত্র উপায় নিজেকে ভোলা—নিজের দেহ, নিজের দুঃখ-বেদনা, নিজের কোন জিনিষেরই বিশেষ করে দাম না দেওয়া আর খুব বড় করে দেখা উচিত এই জীবন-মৃত্যুর খেলাকে যাতে আনন্দে যোগ দিয়েছি, সেই আদর্শকে যার জন্যে যুদ্ধের পঙ্কিল পথে স্বেচ্ছায় নেমেছি।

প্রতি সৈনিকের জীবনে এমন একটি অবস্থা আসে যখন সে আর সহ্য করতে পারে না। দেহে সে হয়ত সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ের ফলে সে বোঝে যে সেদিন এগিয়ে আসছে যেদিন দেহ মন একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। হয়ত সেদিন এল না, কিন্তু ভেঙ্গে পড়বার দিন যে ক্রমে এগিয়ে আসছে এই নিঃসংশয়তায় মানুষটা একেবারে ভয়ে অভিভূত হয়ে যায়। মোটমাট ব্যাপারের মধ্যে তার এই দুর্ব্বলতা ও ভয় আত্মপ্রকাশ করে। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা এতদিন তাকে বিশ্বাস করে এসেছেন, কিন্তু এই সময় থেকে তার উপর লক্ষ্য রাখেন। সন্দেহ করেন মানুষটিকে নয় তার সাহসের শক্তিকে।

আমাদের দলে এমন একজন ছিল। সুদক্ষ ও দুঃসাহসী নিশানাদার, টেলিগ্রাফিষ্ট প্রভৃতি নিয়ে একটা দল তৈরী করা হ'ল। তাদের কাজ হচ্ছে এগিয়ে এগিয়ে চলা—শত্রুর অগ্রগামী দলের সন্ধান নেওয়া। মোটের উপর সব রকম বিপদের মুখে গোলন্দাজদলের সঙ্গে তাদের সংস্রব রাখতেই হবে। খবর পাঠাবার তার যদি নষ্ট হয়, গোলা-বর্ষণ যতই ভীষণ হোক, লাইন্‌সম্যানকে তা মেরামত করতে হবে। আমি যার কথা বলছি সে লাইন্‌সম্যান। যুদ্ধের প্রথমেই সে যোগ দিয়েছিল, সাহসের জন্যে তার খ্যাতি ছিল প্রচুর। কিন্তু প্রায় দুবছর এই সাহসের কাজের মধ্যে তার স্নায়ুগুলো দুর্ব্বল হয়ে গেল। প্রথমে দু-একটা কাজে তা ধরা পড়লেও, আমরা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু ক্রমে সকলের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, এলোমেলো, মনে শত উদ্বেগ যাতে সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে না পালায়। গোলাবর্ষণের মধ্যে সে শান্ত ঘোঁড়ার মত কেঁপে কেঁপে উঠত। আমাদের উচিত ছিল, তাকে অবিলম্বে ছুটী দেওয়া; কিন্তু লোকাভাবে তাকে মুক্তি দেওয়া তখন অসম্ভব। এ অবস্থায় লোকটির উপর দয়া স্বাভাবিক কিন্তু একেবারে অনুচিত, কারণ তার এ ভয় সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে। সৈনিকের কাছে তার কর্ত্তব্য-পালনটুকুই শুধু আশা করা হয়, তার দিক থেকে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করা চলে না। এ বেচারী একদিন সত্যই সাহসী ছিল অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটছে আর সে নিজের মনে মনে বুঝছে যে সে কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কয়েকজন যে তার এ অবস্থার কথা জানতে পেরেছি, এই ভাবনাই হ'ল তার কাল। অন্তরে যে তার সাহসের অভাব ছিল না তা জানি, কারণ শেষ পর্য্যন্ত সে হাল ছাড়েনি।

আমরা যেখানে ছিলুম সেখানে জার্ম্মাণ গোলন্দাজের অগ্নিবৃষ্টি সারা দিন রাত আমাদের ব্যস্ত করে তুলেছিল।

যে কোন মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে এমন একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের নীচে তখন আমাদের আস্তানা। এর মধ্যে শত্রুরা অব্যর্থ লক্ষ্যে এখানে কয়েকটা গুলি চালিয়েছে। একদিন হঠাৎ দেখি আমাদের সেই লাইনসম্যান তার জামাটা খুলে ফেলছে। প্রশ্ন করা হল, সে তাতে কানই দিলে না। একমনে পোষাক খুলে ফেলে যেখানে খুব গোলাবৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে সে ছুটে চলে গেল। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল সে!

নিজের উপর করুণা বা মমতার এই শাস্তি। তাইত সব সময়ে সাবধানে থাকতে হয়। তোমার কথা আর বেশী করে ভাবব না। এমন করে কাজে মন দেব যেন তোমায় আমি কোনদিন দেখিনি। আমায়—

কিন্তু এ যে প্রকাণ্ড মূর্খতার কথা! স্মৃতির হাত থেকে আমার পরিত্রাণ কোথায়? কিন্তু এ স্মৃতি আমার পক্ষে কোনদিনই বোঝা হবে না। যুদ্ধের শেষে যদি বাঁচি, তোমায় আমি খুঁজে বার করবো—এই আশা আমার মনের মন্দিরে শক্তির মণিদীপ।

এখন কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সকল সংস্রব ত্যাগ করা উচিত। যে কাজে আমরা উভয়েই হাত দিয়েছি তার মধ্যে আত্মপ্রীতি বা আত্মম্ভরিতার কোন স্থানই নেই।

* * * *

সপ্তাহ খানেক আগে অদ্ভুত ঘটনাচক্রে একখানা বই পেয়েছি, তাতে আমার সঙ্কল্পটা আরও দৃঢ় হয়েছে। আমাদের পদাতিক দল যাতে এগিয়ে যেতে বাধা না পায়, সেইজন্যে শত্রুদের তারের বেড়া কাটবার প্রয়োজন হয়। ম্যাপের বাঁকা লাইন দেখে, কোনদিক থেকে বাস্তবিকই তারটা পাওয়া যাবে, তা বলা ভারি কঠিন। গ্রাপনেল দিয়ে তার কেটে আর বন্দুকের গুলিতে খুঁটী উপড়ে দেওয়া অবশ্য সহজসাধ্য, কিন্তু যার হাতে এ কাজের ভার থাকে, তাকে সকল দিক বিবেচনা করে অগ্রসর হ'তে হয়। উচ্চ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একদিন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, এ দুঃসাহসিক কাজের ভার কে নেবে। ট্রেঞ্চের ধারে ধারে ঘুরে আর অজানা দেশে বেরিয়ে পড়ে এমন একটা স্থানে আঘাত করতে হবে, যাতে আমাদের কাজ সুকর হয়।

আমার একটা উঁচু জায়গা জানা ছিল। সেখান থেকে আমার অভিপ্রেত স্থানটা দেখতে পাওয়া যায়। সেটা একটা কামানের গর্ত্ত, এখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। জায়গাটা, আমাদের কি জার্ম্মাণদের, তা বলা শক্ত। একটা সঙ্কীর্ণ নালা দিয়ে সেখানে পৌছান যায় তবে শত্রুর দৃষ্টিপথে পড়বার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, কারণ ঐ পথটির দিকে বন্দুক উঁচু করে একদল ওঁৎ পেতে আছে। বিশেষ করে একটি জার্ম্মাণকে আমাদের বিশেষ ভয়; সে যেন অব্যর্থলক্ষ্য। আমাদের দলের লোকেরা তার নাম দিয়েছে "বাচ্চা বিলি"। তার হাত এড়াবার জন্যে, ভোরের কুয়াশা কাটবার আগেই মাটীতে প্রায় শুয়ে শুয়ে সেইখানে পৌছলুম। সঙ্গে ছিল একজন টেলিফোনিষ্ট। ঠিক করলুম সারাদিন থেকে, কাজ করে রাত্রে আস্তানায় ফিরে যাবো।

সেখানে গিয়ে দেখি এক বীভৎস ব্যাপার। প্রবেশ-পথে রাশিকৃত মৃত জার্ম্মাণ দরজা আগলে আছে। মনে হয় তারা গর্ত্ত থেকে বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গোলন্দাজের অব্যর্থ গুলিতে প্রাণ দিয়েছে! হাত দিয়ে কেউ চোখ ঢেকে, কেউ বা মুখ ঢেকে এমন অসহায় ভাবে পড়ে আছে, যে দেখলে মায়া হয়। যাই হোক, এগিয়ে দেখি গর্ত্তটা ধুলোবালিতে ভর্ত্তি, দূর থেকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। পাশেই একটা পাতাল-ঘর পাওয়া গেল, নীচে নামবার সিঁড়িও ছিল। নেমে দেখি, সরু তারের মাচান দেওয়া একটা ঘর। ডান দিকে একটা সুড়ঙ্গ—তার অপর মুখের দিকে এগিয়ে গেলুম। কুড়ি গজ দূরে আবার একটা কামরা। মৃতদেহ, ধ্বংসস্তূপ আর ভিজে মাটীর হাওয়ায় স্থানটা যেন বিষিয়ে উঠেছে। মাথার উপরে অনেক দূরে আলোর আভাষ পাওয়া গেল। কাছে বিজলী-বাতির ব্যাটারী ছিল, তার আলোতে যা দেখলুম তা সত্যই চমকপ্রদ।

মাচার ধারে প্রকাণ্ড এক জার্ম্মান বসে আছে। প্রায় তিন সপ্তাহ হ'ল সে মরেছে কিন্তু দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত। তার পায়ের কাছে মাটীতে একখানা বই পড়ে ছিল, তারই হাত থেকে খসে পড়েছে। সেটা কুড়িয়ে নিলুম। অদ্ভুত! তার মলাট আবার খবরের কাগজ দিয়ে যত্নে মোড়া। কি বই জান? এইচ, জি, ওয়েলসের "দি রিসার্চ্চ ম্যাগ নিফিসেন্ট"। পাতা উল্টেই দেখি একটা

চিহ্নিত অংশের পাশে জার্ম্মান ভাষায় কি মন্তব্য লেখা। ওয়েল্‌স লিখছেন, "আমাদের সবায়ের মত জীবনকে সে একভাবে নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু সবায়ের ভাগ্যে যা ঘটে, জীবন তাকে নিয়ে গেল ভিন্ন পথে। জীবনে তার কত মহৎ উদ্দেশ্য ছিল…" এইখানে পেন্সিলের দাগ শেষ হয়েছে। আমি এই দার্শনিকের দিকে চাইলুম। আজ সবায়ের চোখের আড়ালে মাটীর নীচে মরে পড়ে রয়েছে সে। মুখে বড় বড় দাড়ি, চোখ দুটি ভিতরে বসে গেছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, আর হাবা মানুষের মত মাথাটা যেন ঘাড়ের উপর নড়্‌ নড়্‌ করছে। তার রগের উপর একটা আঘাতের চিহ্ন, একটা বোমা এসে লেগেছিল! মনে হল যেন শুনতে পাচ্ছি, তার মাথার ভিতরে সেই কথাগুলো বাজছে—"জীবনে তার অনেক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সবায়ের ভাগ্যে যা ঘটে, তার জীবনে তার ব্যতিক্রম হয় নি। জীবন তাকে নিয়ে গেল এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে, এক অপ্রত্যাশিত দিকে।"

দৈহিক যন্ত্রণায় যেন আমি কাতর হয়ে উঠলুম। শুধু এই মৃত জার্ম্মানটির জন্যে নয়—এ পৃথিবীর সকলের জন্যেই আমার মন কেমন করছিল। এর পরে আলকাৎরার মত কালো সুড়ঙ্গে ধূলো ঢাকা মৃতদেহের চড়াই-উৎরাই ঠেলে বাইরে যাওয়া ভয়ানক বীভৎস বলে মনে হল।

প্রবেশ-পথের সর্ব্বোচ্চ ধাপে বসে আমি বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলুম। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যে বই প্রকাশিত হয়েছে, পাতালপুরীতে বসে জার্ম্মান বীর তা কেমন করে পেলে, তাই ভাবছি। পরে বুঝলুম। বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দাগ দেওয়া। পাশে পাশে কখনও ইংরেজীতে কখনও বা জার্ম্মান ভাষায় চমৎকার সব মন্তব্য। এদুটি হাতের লেখাও ভিন্ন।

চিহ্নিত অংশগুলি পড়লুম। প্রায় সব অংশগুলি ভয় ও ভয় জয় করা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি। "ভয় জয় করার মধ্যেই মহৎ জীবনের ভিত্তি"—এ লাইনটা বেশ করে দাগ দেওয়া ছিল।

এক জায়গায় আছে, "বাল্যকালে মনে করতুম যে ভয়কে চিরদিনের মত জয় করব। তা কিন্তু হয় না। আমি সব সময়েই দেখেছি যে প্রতিবারেই নতুন করে ভয়কে দমন করতে হয়।" ইংরেজ ভদ্রলোকটির মন্তব্য তার জাতের উপযুক্ত—"ঠিক তাই। কিন্তু সে কথা স্বীকার না করাই উচিত।"

বইয়ের মালিক এই ইংরেজকে মেরে, বই পড়ে জার্ম্মান বীর যা টীকা রচনা করেছেন তা সে পাতা ছাড়িয়ে পরের পাতে চারিয়ে গেছে। জার্ম্মান ভাষায় দখল বড় বেশী নয়, কাজেই তাঁর মন্তব্য বুঝলুম না।

বইয়ের শেষ চিহ্নিত অংশটি চমৎকার। জার্ম্মান বীর এবার চুপ করে গেছেন, কিন্তু ইংরেজের মন্তব্য সংগ্রহ করে রাখবার মত। উক্তিটা হচ্ছে—"ছেলেবেলা থেকেই ভয়কে বেনহ্যামের একটা সুগভীর লজ্জার বিষয় বলে ধারণা ছিল এবং এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তির জন্যে ছিল তার প্রাণপণ চেষ্টা। তার মনে হ'ত, যে ভয় পায়, সে সম্ভ্রান্ত হতে পারে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে বুঝতে পারলে যে ভয় পায় সকলেই। প্রকৃত সম্ভ্রান্ত শুধু সেই জন ভয়কে যে জয় করে, অগ্রাহ্য করে, একেবারে মন থেকে ছেঁটে ফেলবার প্রয়াস করে না।" ইংরেজ ভদ্রলোকের মন্তব্য হচ্ছে—"দিব্য বলেছ, এইবার পথে এস ত খুড়ো!"

কুয়াশা এখনও কাটে নি—তার কোন চিহ্নও দেখছি না। কাজেই, এই অজানার দেশে, এই শীতের সকালে মন ভার না করে', বেনহ্যাম নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের জীবনে মহৎ ভাবে বাঁচবার সমস্যাটার সম্যক আলোচনায় মন দিলাম।

নিজের চরিত্রের খানিক অংশ বুঝতে পেরে, কখনও কি তুমি ভাবতে বসেছ—'কি অদ্ভুত আমি—সত্যিই কি আমি এই রকম?' এমন কথা কি কোনদিন তোমার মনে হয়েছে? অপরে যেমন করে' তোমার সম্বন্ধে ভাবে, নির্ম্মম হয়ে নিজের সম্বন্ধে তুমি কি কোনদিন বিচারাসনে বসেছ? বইখানি পড়তে পড়তে আমার কিন্তু ঠিক ঐভাবই এসেছিল।

আমার মনে হয়, এই বেনহ্যামটি একটি বিশ্রী রকমের আত্মম্ভরী জীব। তার মুখের একটা ছবি আমার মনে জাগছে। সাদা মুখ, কপাল যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মস্তিষ্ক যে পরিমাণে বেশী, দেহটি সে অনুপাতে ছোট। খুব কম বয়সেই বেনহ্যাম আবিষ্কার করলে যে তার ভিতরে

কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে এবং যা কিছু পীড়া সে পায় তার কারণ এ জগতে সঙ্গতির একান্ত অভাব। কাজেই সে দ্রুত সিদ্ধান্ত করলে যে নিজেকে সুস্থ করতে হলে জগৎটাকে আগে সামলান প্রয়োজন। অবশ্য তার উপায়-চিন্তা মেনে নিয়ে জগৎ আদৌ সোজা ভাবে চলতে রাজী হ'ল না। কোন কালেই তা সে হয় না। চিরকালই এ জগৎ তার যীশু-খ্রীষ্টদের ক্রুশে বিঁধে মারে।

আমাদের বেনহ্যাম কিন্তু সত্যিই স্বপ্ন দেখলে যে সে দ্বিতীয় যীশু হ'তে পারে। নতুন এক রকমের দেব-মানব। প্রেমে নয় মানসিক উৎকর্ষতার মধ্যে দিয়ে মানুষকে সে মহান করে তুলতে পারে। এদিকে বেনহ্যামের একটা বিপদ ছিল। তার নিজের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সিদ্ধান্তগুলোতে সে মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারতো না। দেবত্ব তো দূরের কথা। কোন জিনিষেই সে একেবারে স্থির সিদ্ধান্তই করতে পারতো না। সে ছিল ভীরু। বলিষ্ঠ জীবন যাপনে তার প্রয়াসের অন্ত ছিল না, কিন্তু মরবার দিন পর্য্যন্ত ভয়কে সে জয় করতে পারে নি। ছোট ছেলে-দের উপর তার দরদ খুব কমই, অথচ শূন্য দৃষ্টিতে নিজেদের বাল্য-স্মৃতির অবিরাম জাবর কাটতে তার ক্লান্তি নেই; কেবলই বক্‌বক্ করছে।

ভালবাসবার উপর তার লোভ ছিল খুব বেশী অথচ এমন ব্যবহার করত যে, মেয়েরা তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারতো না। এদিকে যে প্রেম সে লাভ করেছে তা ধরে রাখবার মত ধৈর্য্যের তার ছিল অভাব। রাশি রাশি লোককে বাঁচাবার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠতো, কিন্তু হাতের কাছে প্রতিবেশীকে রক্ষা করবার তার না ছিল কোন ইচ্ছা, না কোন চেষ্টা। সব অবস্থায় এবং সব সময়ে সে তার সৎ ইচ্ছাগুলোকে বস্তু থেকে তফাৎ করে কেবল মাত্র ধারণা বা কল্পনার উপর বাজে খরচ করে ফেলতো। সারা জীবন ধরে একটা প্রকাণ্ড আত্মবিসর্জ্জনের কল্পনায় কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা করল, কিন্তু কাজের জগতে নেমে সে সাধনাকে সম্পূর্ণ করবার মত মনের সাহস তার কোনদিনই হ'ল না।

ছোট ছোট দয়ার কাজ ছেড়ে, মহাদেশের দুঃখ মোচ-নের চেষ্টায়, নিজের জীবনটাকে সে তিক্ত করে তুললে, নিজেকে এ বিশ্বের করুণাময় সম্রাট করে তোলাই ছিল তার স্বপ্ন-বিলাস। এই বিলাস-লালসে সে সাধারণ মানুষের মধুময় স্নেহ-প্রেমের ললিত বন্ধনগুলি সজোরে ছিঁড়ে দূরে সরিয়ে দিলে। ক্রমে মনে দেউলে হয়ে সে মরে গেল। দাঙ্গাকারীদের উপর সৈন্যদের গুলি চালান নিবারণ করবার উদ্দেশ্যে নিতান্ত অদ্ভুত ও অক্ষম ভাবে আর্দ্দালীর ঝাড়ন নাড়তে নাড়তে সে মরে গেল। মেঘে-বোনা পতাকা উড়িয়ে, কল্পনার রথে কালের পথে সে ছুটে চলেছে,—এই ছিল তার প্রিয় স্বপ্ন। বাস্তবিক, সে যা করেছিল, তা যেন, বজ্রায়ুধ ইন্দ্রের উদ্যত অস্ত্র রুমাল দিয়ে নিবারণের হাস্য-কর প্রয়াস! ইন্দ্র যখন তার আদেশ অমান্য করলেন, বেনহ্যামের সে কি অপরিসীম বিরক্তি।

অদ্ভুত এই বেনহ্যাম! কিন্তু শুধু কি একা সেই অদ্ভুত! আজ যে ব্যক্তি তাকে নিয়ে পরিহাসে মত্ত, তার অতীত জীবনটা যদি কেউ জানতো! অতীত কেন— আজও বুঝি আমার মধ্যে বেনহ্যামত্বের অভাব নেই। তোমাকে যে ভালবাসি, এই কথাটা গুছিয়ে বলবার জন্যে কত চিঠিই রচনা হচ্ছে; কিন্তু, কোনদিন কি এ চিঠি তোমার চোখে পড়বে! অথচ, মুখ ফুটে বলবার আমার সাহস কোথায়? বেনহ্যাম যেমন নিজেকে বোঝাত, আমিও তেমন নিজেকে বোঝাচ্ছি যে তোমার কাছে প্রেম নিবেদন না করাটাই সুন্দর ও সঙ্গত। মানুষের যা সচরাচর করা উচিত, তাতে আমার হাজার দ্বিধা অথচ, জ্যাক হোর্ণ্ট তার স্ত্রীকে লাভ করবার সময় কোন সংশয় করে নি। আমি হয়ত আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেছি, কিন্তু নিজের মত বা মতলব সম্বন্ধে আমি যে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তুমি ত দেখেছ, সব জিনিষকে দশদিক থেকে দেখবার আমার শক্তি আছে। ফলে, সাধারণ লোকে যেখানে কাজে নামে, আমার বিচার আর ফুরোয় না। এই হ'ল আমার দুর্ব্বলতা! জীবন আমার এই জন্যই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। না, একেবারে চলে যায় নি বোধ হয়—তবে যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত তার পরশ আমি পাই নি!

কি বিচিত্র জীবন আমায় ধরা দিয়ে চলে গেল। আজ মরণের সামনে সব সময়ে বেঁচে আছি কিনা, তাই বুঝছি

এতদিন জীবনের ধরাছোঁয়া পাই নি কেন! আমার স্বপ্নগুলো বাস্তবের সংস্পর্শে পাছে কলঙ্কিত হয়, সেই ছিল ভয়। অক্সফোর্ডের পড়া শেষ করে পার্লামেণ্টে যাবার চেষ্টা করলুম। আমার বিশ্বাস ছিল বছর দশের মধ্যে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করে ফেলবো। দলের ভিতর এসে দেখি, আর কোন নীতি নয়, রাজ-নীতির পুরু পর্দার অন্তরালে চলেছে শুধু নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির তাণ্ডব। যখন কেবল ভোটের দরকার, তখনই দেখি রাজ নীতিজ্ঞের দেশের দুঃখে সজল-আঁখি। মনে আমার প্রতিবাদ জমে উঠল, পার্লামেণ্টের আসন ছেড়ে, গরিবদের বস্তীতে বাসা বাঁধলুম। সেখানে গিয়ে জানলুম, দারিদ্র্য ওরই মধ্যে নিরাপদে, নিরাপত্তিতে বাস করছে আর পরোপকার ব্যাপারটা যেমন নোংড়া, তেমনই কুৎসিত। নিজেদের আত্ম-সন্তোষের উপর বীতরাগ হয়ে, আমি চলে গেলুম রাশিয়ায়। সেখানে যে নব-বিদ্রোহ জেগে উঠেছে, তার ডাক এসেছিল মনের কাছে। আবার নিজেকে মোহমুক্ত করলুম; দেখলুম আমার সমবেদনার কোন দরকার নেই সেখানে। দেখে অবাক হলুম, যুবারা সব নিজের নিজের চোখ উপড়ে ফেলে বলে বেড়াচ্ছে যে, রুষ-সম্রাট তাদের চোখ কাণা করে দিয়েছে, এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত বলে দেশের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করছে। বিস্ময় লাগে যে পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নেই, নিজেদের বিকলাঙ্গ করে' কুৎসিত করবার জন্যেই যারা জন্মায়, এবং পরের ঘাড়ে সে দোষ চাপাতে আদৌ দ্বিধা বোধ করে না।

দেশ থেকে দেশে, দল থেকে দলে ঘুরে মরলুম, আর জীবন আমায় পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ভবিষ্য-যুগের মঙ্গল-কামনার ব্যাকুল বাসনায় আমি প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সুন্দর মাধুর্য্যকে কি অবহেলাই করেছি।

তারপর বাধলো এই যুদ্ধ। যে মিথ্যা ভদ্রতার আবরণে আমরা নিজেদের ঢেকেছিলুম, তা ছিঁড়ে ফেলে নব কর্ত্তব্যের বর্ম্মে নিজেদের সজ্জিত করলুম। কেমন করে যে মহৎ জীবন যাপন করা চলে তা জানতুম না। ভগবান একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে মরবার সুযোগ দিলেন। জীবন নিয়ে আমাদের এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখে দেখে বোধ করি বিশ্বনিয়ন্তার শ্রান্তি এসেছিল, তাই নরকের শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে এ জীবনের সব কিছুই কত সত্য হয়ে উঠেছে। ঘৃণার ও অবিশ্বাসের সমস্ত ভূত আমাদের মন থেকে নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়েছে—মানুষের চোখে যেন উদ্ভাসিত হয়েছে আত্মার অনির্ব্বাণ জ্যোতি। যেখানে পাপকে দেখবো, সেখানেই তাকে আঘাত করবার মত প্রাচীন ঋষিদের সেই আদিম শক্তিটা যেন আমরা পুনরায় অর্জ্জন করেছি। আজ ধোঁয়া-ধুলায় আকাশ যখন ঢেকে যায় তখন আর সন্দেহ করি না যে, মেঘের ওপারে স্বর্গ ভেসে চলেছে।

"আমাদের সকলেরই মত জীবনকে সে একভাবে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সবায়ের ভাগ্যে যেমন হয়, জীবন তাকে নিয়ে গেল একেবারে এক ভিন্ন পথে—জীবনে কত উদ্দেশ্য ছিল—" পাতালপুরীর আধ আলো অন্ধকারে বসে এই সব কথাই মনে এল। জার্ম্মাণ ভদ্রলোকটীও মরবার আগে এই সব কথাই ভেবে গেছেন এবং তাঁরও আগে এই সব ভেবেছেন এই বইয়ের মালিক ইংরেজ ভদ্রলোকটী। মহৎ কাজ করবার জন্যে তাঁরা দুজনেই প্রস্তুত ছিলেন—চেষ্টাও করেছিলেন তাঁরা—অথচ তাঁরা ছিলেন পরস্পরের শত্রু। যুদ্ধের আগে এই ভাব-বৈষম্য নিয়ে ভারি গোলে পড়তুম। সমন্বয়ের কত ব্যর্থ চেষ্টাই না করেছি। আজ আর সমন্বয়-প্রয়াসের কোন কথাই মনে আসে না—বিরাটের আভাষ পেয়ে সে দিনের ছোটখাট মতলবগুলো মনেই আসে না। আমার বড় সাধ হচ্ছিল যে জার্ম্মাণটি যদি আমার মনের সব কথা জানতে পারতেন!

কুয়াশা এখনও কাটে নি। খাবার সময় আবার সেই সুড়ঙ্গ ভেদ করে ভয়াবহ ঘরের মধ্যে গিয়ে সেই জার্ম্মাণটির পাশে খাবারের অংশ রেখে এলুম। মনে হ'ল, এতেই ইনি সব জানতে পারবেন। মৃত্যুর স্পর্শে আমাদের সমস্ত বৈরিতা লুপ্ত হয়েছে—বন্ধুর মত আমরা খাবার ভাগ করে খেয়েছি!

(ক্রমশঃ)

চীন-জাপান সঙ্ঘর্ষ

শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

মাঞ্চুরিয়ায় চীন-জাপান সম্পর্ক দিন দিনই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। নন্নী নদীর সেতু লইয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, রয়টারের খবরে প্রকাশ তাহাতে ৩৬ জন জাপানী সৈন্য হত ও ১৪৪ জন আহত হইয়াছে এবং ২০০ জন চীন সৈন্য হত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পরে এত বড় যুদ্ধ আর হয় নাই।

কিন্তু এই ঘটনা বিন্দুমাত্রও আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহুদিন হইতেই এই দুই জাতির মধ্যে বিরোধ-বহ্নি ধোঁয়াইতেছিল। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান-অধিকৃত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ের কিয়দংশ বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ার ফলে সে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ ঘটনার জন্য কে দায়ী তাহা এখনও প্রহেলিকাচ্ছন্ন কিন্তু টোকিওর খবরেই প্রকাশ ইহার ২০ মিনিটের মধ্যেই মধ্যরাত্রে জাপানী সৈন্য সমগ্র জেলা অধিকার করিয়া বসে। তাছাড়া তাহারা চীন সৈন্যের ছাউনী দখল করিয়া লয় ও মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেনের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে প্রবেশ করে। টোকিওর খবরে আরও প্রকাশ যে পূর্ব্ব-চীন রেলওয়ে জংসন চাংচুনেও তিন স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়। কিন্তু প্রায় সব স্থানেই জাপানী সৈন্যেরাই জয়লাভ করে; যদিও সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় ৩,৩১,০০০ চীনা সৈন্যের স্থানে জাপানী সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ১২,০০০! মুকডেনের নিকটে চীনা সৈন্য ছিল ১৫,০০০ এবং জাপানী সৈন্য মাত্র ২,০০০!

কিন্তু এ সকলই জাপান পক্ষের খবর। চীন-পক্ষ চীন সৈন্য কর্ত্তৃক দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে লাইন বিধ্বস্ত করা ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করে। তাহারা বলে জাপানী সমরপন্থীগণ বহুকাল হইতেই মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ বাধাইবার ফন্দি আঁটিতেছিল এবং তাহারা নিজেরাই এ কাজ করিয়া চীন সৈন্যের উপর দোষারোপ করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ার গভর্ণর মার্শেল চেঙ্গ বলেন যে যাহাতে জাপানী সৈন্যগণ বিরোধের কোনরূপ অজুহাত পাইতে না পারে তার জন্য তিনি কিছুদিন পূর্ব্বেই মুকডেনের উত্তর শিবিরের সৈন্যগণকে অস্ত্রত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কাজেই জাপানীগণ ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে যখন আক্রমণ করে তখন তাহাদের প্রতিরোধ করিবার উপায় ছিল না। যাহা হউক ১৫ই সেপ্টেম্বরের ব্যাপারের ফলে চীন জাতিসঙ্ঘের প্রাথমিক সহায়তা (first aid) চাহিয়াছে ও জাপানের বিরুদ্ধে অকারণ আক্রমণের (unprovoked military attacks) অভিযোগ আনিয়াছে। জাতি-সঙ্ঘের সর্ত্তের ১১ ধারা অনুসারে (article XI of the covenant) চীন গভর্ণমেণ্ট সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতিকে অনুরোধ করিয়াছে যেন তাহারা অবিলম্বে এর প্রতিকার করেন এবং পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে জাতি-সঙ্ঘ মহাসমস্যায় পড়িয়াছে। বলা হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে ইহার আর এরূপ পরীক্ষা কখনও উপস্থিত হয় নাই। জাতি-সঙ্ঘের এই সমস্যার কারণ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা কিছু আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

মাঞ্চুরিয়ার অবস্থান চীন সাধারণতন্ত্রের উত্তর প্রান্তে। রুষ-অধিকৃত সাইবেরিয়া ও জাপান অধিকৃত কোরিয়ার কিয়দংশ তাহার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। তাহার আয়তন প্রায় ৩,৮২,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ জাপানের আয়তনের প্রায় তিন গুণ। মাঞ্চুরিয়ার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য—বিশেষতঃ তাহার কৃষিজাত, খনিজ ও অরণ্য-সম্পদ—চীনের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী প্রচুর। উহার আয়তনের এক-চতুর্থাংশ কৃষির উপযোগী এবং এর মধ্যে এখনও অনেক অংশ অকর্ষিত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে মাঞ্চুরিয়ার জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৯০ লক্ষের মধ্যে। তন্মধ্যে ১০ লক্ষ জাপানী (কোরিয়ান সহ) অধিবাসী, দেড় লক্ষ রাশিয়ান, পাঁচ শত বৃটিশ, প্রায় ১২ শত জার্ম্মাণ, তিন শত ফরাসী, তিন শত আমেরিকান ও সতের শত অন্যান্য দেশীয়।

১৮৯৪-৫ খৃষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধের পর রুষ গভর্ণ-

মেণ্ট পূর্ব্ব-চীন রেলওয়ে গঠন করে। ১৯০৪।৫ খৃষ্টাব্দের রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে তাহার কিয়দংশ (দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে) এবং কুয়ানচুঙ্গ প্রদেশের লীজ lease) জাপানের অধিকারে আসে। তখন পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়ার কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই। চীনের অন্যান্য অংশের তুলনায় ইহা দস্যু-অধ্যুষিত, ও অনুর্ব্বর বলিয়াই পরিচিত ছিল। মূল চীনে তখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বন্দর প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গগুলি দেখা দিয়াছে কিন্তু মাঞ্চুরিয়া বলিতে গেলে তখনও বন্যভূমি মাত্র। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরে মাঞ্চুরিয়ার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। এখন মাঞ্চুরিয়া কেবল চীনের সমকক্ষ নয় কোন কোন বিষয়ে চীনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তার অন্যতম কারণ এই যে অন্তর্বিপ্লবের জন্য যখন চীনে গঠনকার্য্য একরূপ বন্ধ ছিল তখন মাঞ্চুরিয়ায় তাহা অবাধে চলিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হারবিন ক্ষুদ্র একটী গ্রাম্য সহর মাত্র ছিল এখন তাহা বিশাল নগরী ও তাহার জনসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। সেইরূপ যে ডেরিয়েনের নামও তখন কেহ জানিত না আজ তাহা চীনের দ্বিতীয় বন্দর! এই ত্রিশ বৎসর মাঞ্চুরিয়ায় চীন অধিবাসীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং তাহার বহির্ব্বাণিজ্য ৩৫ গুণ বাড়িয়াছে। এখন সমগ্র চীনের বহির্ব্বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশের জন্য মাঞ্চুরিয়া দায়ী

জাপান দাবী করে যে এ পরিবর্ত্তন দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ের সাহায্যে প্রধানতঃ তাহারই প্রচেষ্টার ফল যদিও এ কাজে চীন, রুষ এবং অন্যান্য দেশের সহায়তার কথাও সে অস্বীকার করে না। জাপানের এ দাবী উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। অবশ্য চীনের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়ার উন্নতি সাধন করে নাই—করিয়াছে নিজেরই স্বার্থের প্রেরণায় এবং কতকটা প্রাণেরই দায়ে। জাপানের ক্রতবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ভরণ-পোষণ কেবল জাপান হইতে হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাঞ্চুরিয়ার জনসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৭৬ জন; জাপানে তাহা ৪২১ জন। কাজেই জাপানের তুলনায় মাঞ্চুরিয়া খুবই জনবিরল। এ অবস্থায় জাপান যে চীনের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগে তাহার অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় বাসসংস্থান করিতে চেষ্টা করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। এবং সে করিয়াছেও তাহাই। ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান বা জার্ম্মানের মত জাপান কেবল লুণ্ঠনের জন্যই মাঞ্চুরিয়ায় আসে নাই—সে আসিয়াছে সেখানে ঘর বাঁধিতে। আজ মাঞ্চুরিয়া দশ লক্ষ জাপানীর বাসস্থান। ইহা অসম্ভব নয় যে জাপান একদিন মাঞ্চুরিয়াকে গ্রাস করিতে পারিবে এরূপ আশাও করিয়াছিল। কিন্তু চীনের নব জাগ্রত জাতীয়তা তাহার সে আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এখন তাহাকে বুঝিতে হইতেছে যে মাঞ্চুরিয়ায় তাহাকে প্রবাসী হইয়াই থাকিতে হইবে।

কিন্তু সকল জাপানীই যে তাহা বুঝিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। অন্যান্য স্বপ্নের মত সাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্নও মানুষ দুদিনেই ভুলিতে পারে না। অনেকে মনে করেন জাপানের সামরিক বিভাগ মাঞ্চুরিয়ায় সাম্রাজ্যবিস্তারের যে স্বপ্ন একদিন দেখিয়াছিল তাহা আজও ভুলিতে পারে নাই; তাহারা বহুদিন হইতেই একটা অজুহাতের অপেক্ষা করিতেছিল—দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল লাইন বিধ্বস্ত করা তাহাদেরই কারসাজি।

এখানে কয়েকটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। চীন যখন আত্মকলহে মগ্ন তখন অন্যান্য দেশের মত জাপানও নিজের সুবিধা মত চীনের নিকট হইতে অনেক সন্ধিপত্র লিখাইয়া লয়। এর প্রায় সবগুলিই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এই সকল সন্ধির ফলে চীনের প্রায় সব প্রধান নগরই বিদেশীর অধিকারে বহু বিভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগকে কন্‌সেসন (concession) বলা হয়। এই সব নগরে প্রত্যেক প্রধান দেশেরই এক একটি করিয়া কন্‌সেসন আছে এবং সে সব কন্‌সেসনে তাহাদের অপ্রতিহত প্রভাব। বিদেশীর স্বার্থরক্ষার জন্য এক একটি কন্‌সেসন এক একটি দুর্গ বিশেষ।

বলা বাহুল্য কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই নিজের অধিকারের মধ্যে বিদেশীর এরূপ প্রভাব সহ্য করিতে পারে না। চীন সাধারণতন্ত্রও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে কিন্তু ইংরাজ, আমেরিকান, জাপান, ফরাসী কেহই তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহাদের প্রধান কৈফিয়ৎ এই যে চীন সাধারণতন্ত্র

এখনও আভ্যন্তরীণ শান্তি বিধানে অক্ষম। এ অবস্থায় তাহারা নিজেদের ধনজনরক্ষার ভার চীন গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

মাঞ্চুরিয়ায় যে সমস্যা উঠিয়াছে তাহাও এইরূপ সন্ধিরই ফল। রুষ যখন জাপানের নিকট দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল-লাইন হস্তান্তরিত করে তখন রুষ ও জাপান উভয়েই পরস্পরের রেল লাইন রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রহরী রাখিবার অধিকার অক্ষুন্ন রাখে। বলা বাহুল্য এই রেল লাইনগুলিও কনসেসন বিশেষ। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জাপান জবরদস্তি করিয়া "একবিংশ দাবী" নামে এক সন্ধি-পত্র লিখাইয়া লয়। তদ্দ্বারা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল লাইনের লীজকে ২০০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবত্তর করা হয় এবং অন্যান্য সুবিধার মধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়ার নয়টি খনি-বহুল জিলা শোষণ করিবার অধিকার পায়। তৎপূর্ব্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পিকিঙের সন্ধি-পত্রে জাপান এই চুক্তিটি সংযুক্ত করিয়া লইয়াছিল যে যে পর্য্যন্ত চীন নিজে বিদেশীর ধনপ্রাণরক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত জাপানের নিজের রেল-প্রহরী রাখিবার অধিকার বজায় থাকিবে। কিন্তু চীন সাধারণতন্ত্র এখন মাঞ্চুরিয়ায় শান্তিবিধানের ভার নিয়াছে। কাজেই সে দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার রেল লাইন অঞ্চলে জাপানী সৈন্যের উপস্থিতি বরদাস্ত করিতে পারে না। অপর পক্ষে জাপান দস্যুর উপদ্রবের উল্লেখ করিয়া বলে যে জাপানকে রেল লাইন অঞ্চলে সৈন্য রাখিতেই হইবে। তাহা না হইলে মাঞ্চুরিয়ার সুদূর প্রান্তে যেরূপ অরাজকতা চলিতেছে রেল লাইন অঞ্চলেও তাহাই চলিবে। চীন-জাপানের বর্ত্তমান কলহের ইহা একটি প্রধান কারণ।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর কারণ চীনের জাপানী দ্রব্য বয়কটের আন্দোলন। এই আন্দোলন কোরিয়ার চীনা অধিবাসীদের প্রতি জাপানী গভর্ণমেণ্টের আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথম চীনের রাজধানী নানকিং ও সাংহাইএ আরম্ভ হয়। এখন তাহা উত্তর চীনেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই বয়কট আন্দোলনে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। পূর্ব্বে চীনে এ সব আন্দোলন রাজনীতিকরাই চালাইতেন এখন বণিকরাও ইহাতে যোগদান করিয়াছে। এই আন্দোলন কিরূপ সুনিয়ন্ত্রিত তাহা এক টিণ্টসিনের দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। এই সহরে ১৭টি বণিক সমিতি (merchants' guild) চীন বণিক-সভাকে (Chinese Chamber of Commerce) এই আন্দোলনে সাহায্য করিতেছে। আন্দোলন চালাইবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে তার অধীনে ৪০ জন পরিদর্শক মজুত জাপানী মাল পরীক্ষা করিয়া থাকে ও ৮৭ জন কর্ম্মচারী রাস্তায় পাহারা দেয়, যেন জাপানী মাল স্থানান্তরিত হইতে না পারে। চীনা কুলীদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যেন তাহারা জাপানী বণিকদিগকে জাহাজ হইতে মাল নামাইতে সাহায্য না করে। বণিক-সমিতিগুলি আর জাপানী মাল আমদানী না করিতে রাজী হইয়াছে। পরিদর্শকদের কাজ বণিকগণ তাহাদের প্রতিশ্রুতি যাহাতে পালন করে তাহা দেখা। কিওমিংটাঙের স্থানীয় শাখারও একটি বয়কট কমিটি আছে। এই কমিটি নিজের পরিদর্শক ও পিকেটদের সাহায্যে বণিক-সমিতির কাজ যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করে।

বলা বাহুল্য জাপান এ আন্দোলনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন জাপানের মুকডেন অধিকার চীনকে জাপানবিরোধী আন্দোলন হইতে বিরত করিবার জন্য ও নিজের পূর্ব্ব অধিকার (treaty rights) বজায় রাখিবার জন্যই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চীন এ ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। জাতিসঙ্ঘ একটা আপোষ-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উভয় পক্ষকেই যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছে এবং জাপানকে আরও অনুরোধ করিয়াছে তাহার সৈন্য যেন অবিলম্বে মাঞ্চুরিয়া হইতে সরাইয়া লয়। জাপান বলিয়াছে সে রেল লাইন পর্য্যন্ত সৈন্য সরাইয়া লইতে প্রস্তুত আছে যদি জাতিসঙ্ঘ এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে চীন জাপানীদের ধনপ্রাণরক্ষার ভার লইবে, জাপানবিরোধী আন্দোলন বন্ধ করিবে এবং পূর্ব্ব-সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে জাপানীর সকল অধিকার মানিয়া চলিবে। অপর পক্ষে যে পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সৈন্য থাকিবে সে পর্য্যন্ত চীন আপোষের কোন কথায়ই কান দিতে প্রস্তুত নয়। জাতিসঙ্ঘ জাপানকে জানাইয়াছে যে তাহারা জাপানকে অন্য সকল বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে

পারে কিন্তু সন্ধি-সর্ত্ত সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। কিন্তু জাপান এই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট নয় কাজেই জাতিসঙ্ঘের চেষ্টায় এখন পর্য্যন্ত ফল কিছুই হয় নাই। এদিকে মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা দিন দিনই অধিকতর সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। নন্নী নদীর যুদ্ধের পর আরও বহু সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং উভয় পক্ষের সমরায়োজনও বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৭ই নভেম্বর হইতে মাঞ্চুরিয়া সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য প্যারিসে জাতিসঙ্ঘের বৈঠক বসিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ ছিল যে ঐ তারিখের মধ্যে জাপানকে সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য জাপান সে নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াছে। অবশ্য সেজন্য তাহার অজুহাতের অভাব নাই। চীনের সমরায়োজন তার অন্যতম।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে জাতি সঙ্ঘ এ সমস্যার কি সমাধান করিবে। একবার গুজব রটিয়াছিল যে জাতি-সঙ্ঘ জাপানকে জব্দ করিবার জন্য তাহাকে একঘরে করিবে অর্থাৎ জাপান হইতে তাহাদের প্রতিনিধি সরাইয়া লইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিবাদও আসিয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে জেনেভার আদর্শবাদীরাই এই গুজবের জন্য দায়ী, জাতিসঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষের মনে এমন কথাও জাগে নাই। এদিকে জাপান জাতিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়াছে এবং শাসাইয়া দিয়াছে যে বেশী বাড়াবাড়ি করিলে সে সঙ্ঘের সংশ্রব ত্যাগ করিবে। কিন্তু সমস্যা শুধু এখানেই নয়। জাপান আজ মাঞ্চুরিয়ায় যাহা করিয়াছে ইতিহাসে সঙ্ঘের পাণ্ডারা বহুবার তাহা করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় যে সুবিধা আজ জাপান ছাড়িতে প্রস্তুত নয় চীনে তাহারই জন্য এই সেদিন মাত্র ইংরেজ ও তাহার মিত্রেরা আগুন জ্বালাইয়াছিল এবং আজও তাহারা সে সুবিধা আঁকড়াইয়া আছে! তবুও জাপানের পক্ষে বলিবার আছে। কারণ জাপানকে তার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার জন্য অন্যত্র স্থান অনুসন্ধান করিতেই হইবে। সে স্থান তাহাকে অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকায় দেওয়া হয় নাই যদিও এসব দেশে বাসোপযোগী বহু স্থান অনধিকৃত পড়িয়া আছে। আজ মাঞ্চুরিয়ায় সে স্থান সে নিজেরই প্রচেষ্টায় করিয়া লইয়াছে। ইংরেজ বা আমেরিকান ঠিক এইরূপ সমস্যায় পড়িয়া—চীনে আসে নাই—তাহারা আসিয়াছে কেবল শোষণেরই জন্য। এ অবস্থায় যে অধিকার ইংরেজ বা আমেরিকান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয় কোন্ মুখে তাহারা তাহা জাপানকে ছাড়িতে বলিবে আর বলিলেই জাপান তাহা কেন ছাড়িবে? এইখানেই জাতিসঙ্ঘের প্রধান সমস্যা। আজ যদি তাহাকে চীনের জাতীয় দাবী স্বীকার করিয়া কোন মীমাংসা করিতে হয় তবে তাহার প্রধান পাণ্ডাদের অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। আর সে ত্যাগ বেশী দিন চীনেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না—তার জের অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিবে। সঙ্ঘের পাণ্ডারা সে ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত আছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কাজেই জাতি-সঙ্ঘের চেষ্টায় কোনরূপ আপোষ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না যদি না চীন তার জাতীয় দাবী অনেকখানি ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু জাপানের মত চীনও জাতি সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া তার মুখোস চিরদিনের মত উন্মোচন করিয়া দিতে পারে। সুতরাং জাতি-সঙ্ঘের সমস্যা মহাসমস্যাই বটে।

লেখার সময় পর্য্যন্ত এ বিষয়ে শেষ খবর জাতিসঙ্ঘ মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে জাপানকে রেল লাইন অঞ্চলে সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা ও চীন-জাপান সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন পাঠাইবে এবং এই কমিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া আপোষের ব্যবস্থা করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করা হইয়াছে যেন তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত থাকে। এদিকে জাপান মাঞ্চুরিয়ার বহু নগর দখল করিয়া লইয়াছে এবং মাঞ্চুরিয়ায় চৈনিক আধিপত্য লোপ করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে। কথা উঠিয়াছিল যে মাঞ্চুবংশের শেষ সম্রাটকে মুকডেনের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। পরবর্ত্তী খবরে প্রকাশ যে মুকডেনের জাপান-প্রতিষ্ঠিত নূতন গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই মুকডেন, কিরিন ও হাইলুঙ্কিয়াঙ্গ প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য প্রচার করিয়া একটি সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে। মাঞ্চুরিয়ার অবশিষ্ট প্রদেশ জেহোলও নাকি এই আন্দোলনে যোগদান করিবে, যদিও চীন-সীমান্তের অধিকতর নিকটে বলিয়া সে এখনও ইতস্ততঃ করিতেছে। বলা বাহুল্য জাপানের এ ষড়যন্ত্র সফল হইলে মাঞ্চুরিয়ায় চীনের আধিপত্য তিরোহিত হইয়া প্রকারান্তরে জাপানের প্রতিপত্তি হইবে। জাতিসঙ্ঘের এ ব্যাপারে কি মত তাহা জানা যায় নাই। তবে মাঞ্চুরিয়ায় একটি দুর্ব্বল সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সঙ্ঘের পাণ্ডাদের সকলেরই তাহাতে কিছু কিছু সুবিধা হইবে। এ অবস্থায় জাপান সৈন্য সরাইয়া লইলেই চীনের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চীনকে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কাজেই পূর্ব্বের ন্যায় এবারও জাপানের সৈন্য সরাইয়া না লইবার অজুহাতের অভাব হইবে না। সুতরাং জাতি-সঙ্ঘের সিদ্ধান্তে বেশী কিছু ফল হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

পত্রিকার পত্রান্তরালে যে সকল কাব্য-রচনা আজকাল বেশীর ভাগ চোখে পড়ে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে দেখা যায়, সাধারণতঃ পাঁচ রকম শ্রেণীতে তাহারা বিভক্ত। অবশ্য এমনতর রচনাও মাঝে মাঝে দুয়েকটী থাকে, যাহাদের সম্বন্ধে এ বিভাগ ঠিক খাটে না কিন্তু তাহা সংখ্যায় অত্যল্প এবং ব্যতিক্রম মাত্র। পাঁচজনে যেমন পাঁচ-রকম ভঙ্গীতে কথা কয়, আলোচ্য কবিতা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

প্রথম, একশ্রেণীর রচনা দেখিতে পাই, যাহার ভাষা ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্দ বলিবার কিছু নাই। তাহাদের গঠন-পারিপাট্য, বিন্যাসভঙ্গী ও বর্ণচাতুর্য্য দেখিলে দূর হইতে উচ্চশ্রেণীর রচনা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাছে গেলেই সে ভ্রম-অপনোদনে সময় লাগে না। মনে হয় একি হইল? কোনো প্রকার রসের গন্ধ-সম্বন্ধও যে নাই! যেন একে-বারে প্রাণহীন! আপাতদৃষ্টিতে শোভা সজ্জায় যাহাকে সত্য-কার ফুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা কাগজের, শোলার, ন্যাকড়ার নয়ত-বা মোমের! পত্ররচনার মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে, কিন্তু সত্যকার পত্রাবকাশে তাহা অচল।

দ্বিতীয় প্রকার কবিতাগুলির পাদপূরণের জন্যই যেন জন্ম! রচনাশেষে ফাঁক থাকিলে, তাহা পূরণ বা প্রসা-ধনের জন্য যেমন tail piece নামে ফুল ফল বা জীবজন্তুর চিত্রাংশ দিয়া তাহা পরিপূরণের মুদ্রাযন্ত্রগত ব্যবস্থা আছে, এই শ্রেণীর রচনা তাহার অতিরিক্ত নহে। এতদ্ভিন্ন কবিতা সম্বন্ধীয় অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা বিধেয় তাহাদের থাকিতে পারে না। এই সকল রচনায় কাব্যোপযোগী বিষয়, বস্তু বা রস-বিন্যাসের কোনো প্রয়োজন নাই। মিল করিয়া দুই ছত্র, চারি ছত্র বা ছয় ছত্র যেখানে যেমন ফাঁক পড়িবে, লেখকের নামসহ সেইখানে গুঁজিয়া দেওয়াই তাহার সার্থকতা।

অপর এক শ্রেণীর রচনা আছে যাহা নূতনত্বের মুখোস পরিয়া পাঠকচিত্তকে অভিভূত করিবার প্রয়াস পায়। নূতন ঢং, নূতন শব্দ, নূতন প্রকাশভঙ্গী, নূতন সজ্জা প্রভৃতির সাহায্যে ইহারা নূতনতর কাব্যসৃষ্টির অভিমান লইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে চায়। বিষয়বস্তু কাব্যোচিত হইল কিনা, ভাব বা রসপ্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার হইতেছে কিনা, চিন্তা-প্রণালী সহজ ও সুসঙ্গত হইতেছে কিনা—এ সকল লক্ষ্যের বিষয় নহে। নূতনত্বই তাহার প্রধান দাবী, অদ্ভুতত্বই তাহার বিশিষ্টতা গ্রাম্যতা, জড়ত্ব, অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্য যাহার অঙ্গের ভূষণ, ইন্দ্রিয়প্রধান বিকৃত ইঙ্গিতই যাহার অস্পষ্ট উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়, নূতনত্বের লোভ যতই হউক, এই অভিনবত্বের উচ্ছ্বাসও পুরাতন কবিবিশেষের ভঙ্গীবিশে-ষের অনুকৃতি-কৌতুকের (parody) পন্থা অতিক্রম করিতে অক্ষম। কিন্তু যশের পথে লোভই একমাত্র পাথেয় নয়। মানসিক ইন্দ্রিয়বিলাস বা কল্পনাসাহায্যে পরকীয়া প্রেমের অভিনয়ই এই শ্রেণীর কবিতার প্রধান অবলম্বন।

আরও এক প্রকার রচনা দৃষ্ট হয়, সাহিত্যিক ন্যাকামি বা ভণ্ডামিই যাহার প্রধান উপকরণ। নিজের মধ্যে বলিবার কথা নাই, আপন অন্তরের অনুভূতিতে যাহার জন্ম হয় নাই, যে সকল রসবোধ বা চিন্তা আত্মস্থ নহে, অপরের চিন্তা বা চেষ্টার ফল—দুই বৎসর বা দশ বৎসর পূর্ব্বে অন্যে যাহা কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, তাহারই অংশবিশেষ আপনার করিয়া চালাইবার ভানে এই সকল চর্ব্বিত-চর্ব্বণের উৎপত্তি। নূতন ভাবে, নূতন ভঙ্গীতে বা রচনারীতিতে প্রকাশ করি-বার শক্তিও এই সকল কবিতার নাই, অথচ আত্মপ্রকাশের দাম্ভিকতার বিন্দুমাত্র অভাব নাই। ইহা plagiarism-এর এক নূতন সংস্করণ মাত্র। এই সকল রচনার প্রধান উপকরণঃ—দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রেম—পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীপ্রীতিতে যাহার আরম্ভ ও বিকাশ এবং বৃহত্তর জাতীয়তা বা দেশানুরাগে যাহার সমাপ্তি।

পঞ্চম শ্রেণীর রচনায় যদিও উচ্চতর শক্তি ও অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক রচনা-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি চিন্তাধারার অসামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলাচ্যুতিদোষে এবং প্রসাদ-গুণের অভাবে তাহা এমনি কর্কশতাদুষ্ট যে কবিতা পাঠ করিতে গিয়া কাব্যের স্থানে কস্‌রৎ এবং রসব্যঞ্জনার স্থানে দার্শনিকতা দেখিয়া দেহমন ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া উঠে। গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া এই সকল লেখক, নব-ভাবোন্মেষিণী প্রতিভার অভাবে ও রসসৃষ্টিশক্তির পঙ্গুতায়, যাহা সহজ ভাবের উপযুক্ত তাহা কৃত্রিমতার কঠিন আবরণে প্রকাশ করিয়া এবং যাহা সরল ভাবে বলিবার, একটা সমারোহ ও বৈশিষ্ট্য দেখাইবার লোভে তাহা বাঁকাইয়া পেঁচাইয়া বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ফলে, যে রসটুকু তাঁহার রচনার অন্তর্নিহিত থাকে, তাহা এমনি বিকৃত বিরস হইয়া উঠে যে পাঠকচিত্তের বিরক্তি আনয়ন করে।

—

প্রচলিত রচনা লইয়াই আমাদের বক্তব্য, রচয়িতা সম্বন্ধে অর্থাৎ কোনো কবির সম্বন্ধে কটাক্ষ বা ইঙ্গিত এ মন্তব্যের উদ্দেশ্য নহে কারণ অধিকাংশ কবিই সর্ব্বদা একজাতীয় লেখা লেখেন না এবং লিখিলেও সব কবিতাতেই দোষ গুণ সমান ভাবে ফুটেনা। ইহা সাধারণ কথা।

—

'সাহিত্যে বিবর্ত্তন'—

শ্রীযুক্ত 'উপাসনা' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

ভাদ্র মাসের উপাসনায় 'সাহিত্যে বিবর্ত্তন' পড়িলাম। আপনাদের ধারণা হইয়াছে যে ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'কল্লোল'এ প্রকাশিত আমার 'অন্তরের অন্ধকারে' গল্প এবং ১৩৩৮ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সংসার স্রোতে' এই দুইটি গল্প এক। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। অন্তরের অন্ধকারে গল্পটি আমি ১৩৩৪ সালের ৬ই আষাঢ় তারিখে লিখিয়াছিলাম এবং 'সংসার স্রোতে' গল্পটি ১৩৩৭ সালে লিখিয়াছি এবং লেখার সময়ে পূর্ব্বের গল্পটি আমার হাতের কাছেও ছিল না। আপনাদের কাগজের মন্তব্য পড়িয়া আমি পুনরায় গল্প দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িয়া দেখিলাম। বোঝা গেল দুইটি গল্পের মধ্যে কথাবার্ত্তায় কতকগুলি লাইনের মিল আছে এবং এক গল্পের আখ্যানভাগের সঙ্গে অন্য গল্পটির আখ্যানভাগের আংশিক মিল আছে। আংশিক এই জন্য যে 'সংসার স্রোতে' গল্পটিতে নায়কের Sex সম্পর্কীয় চরিত্রগত অবনতি কিছু দেখান হয় নাই কিন্তু 'অন্তরের অন্ধকারে' গল্পটিতে ইহা দেখান হইয়াছে। সে যাহাই হউক এইরূপ মিল আবিষ্কৃত হওয়াও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং সেজন্য আমি লজ্জিত। আমার কেবল ইহাই বলিবার আছে যে এই মিল ইচ্ছাপূর্ব্বক করা হয় নাই এবং পরবর্ত্তী গল্পটি লিখিবার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পের বিষয় আমার স্মৃতি-পথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। তবু যে এইরূপ মিল হইয়াছে ইহার কারণ,—আমার মনে হয়, সম্ভাবনাযুক্ত জীবনের ব্যর্থতার যে theme তাহা আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তাহাই আমার অগোচরে গল্পের মধ্যে স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। পরবর্ত্তী গল্পটিকে পূর্ব্ববর্ত্তীর নামে চালাইবার অসাধু সংকল্প থাকিলে দুই গল্পের অন্ততঃ common line গুলি তুলিয়া দিতে পারিতাম।

সুধীজন যে আমার গল্পগুলি এত খুঁটাইয়া পড়িয়া আমাকে সাবধান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি। ইতি

শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
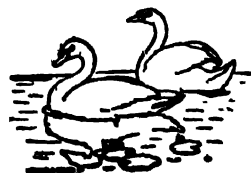
পুস্তক-সমালোচনা

গিরিশ-প্রতিভা।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ইউরোপের যে কোন সাহিত্যে দেখতে পাই সেক্সপিয়ার নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন সে-সাহিত্যের সব চেয়ে যাঁরা চিন্তাশীল। ফ্রান্সে ভিক্টর হিউগো, জার্ম্মানীতে শ্লেগেল্, জারভিনাস, নরওয়েতে ব্রান্স, ইংলণ্ডে ডাওডেন্, ব্রাড্‌লে, র‍্যালে—। এঁদের কেউ দেখিয়েছেন সেক্সপিয়ারের চরিত্র-বিশ্লেষণ, কেউ দেখিয়েছেন নাট্য-কলা, কেউ বুঝিয়েছেন তাঁর জীবনের philosophy—এই রকম ক'রে আজ তিন শ' বছর ধ'রে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন পণ্ডিত তাঁদের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে সেক্সপিয়ারের বিশ্লেষণ ক'রেছেন। ফলে আজ আমরা মনে করি 'যা নেই সেক্সপিয়ারে তা নেই দুনিয়ায়'। কিন্তু সত্যিই হয়ত' সেক্সপিয়ারকে তত বড় ব'লে মনে হ'ত না যদি না এই সব সমালোচকের রস-দৃষ্টি তাঁর ওপর পতিত হ'ত! বস্তুতঃ সুকবির সফলতার জন্যে সু-সমালোচকের ও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের সাহিত্যের আর পাঁচটা অভাবের মধ্যে সমালোচনার অভাবটাও অত্যন্ত প্রবল; কালিদাসের মত কবির ওপরও এই জন্যে একাধিক শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা বই কেউ খুঁজে বের ক'রতে পারবেন না।

কাজেই গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও প্রতিভা নিয়ে হেমেন্দ্র বাবু এত বড় বইখানা লিখেছেন দেখে বিশেষ আগ্রহ সহকারেই তা প'ড়েছি। হেমেন্দ্রবাবুর লেখক-সমাজে খ্যাতি আছে তাছাড়া যে বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ ক'রেছেন তাতে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব বেশী—সুতরাং আমাদের আশা ক'রবারও অনেক ছিল। বলা দরকার আমরা আশানুরূপ পুরস্কৃত হ'লেও কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মনে হ'য়েছে বইটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। প্রথমে লেখক গিরিশচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, এটি অতি বিস্তৃত না হ'য়ে ভালই হ'য়েছে। কবির জীবন কচিৎ ঘটনাবহুল হয়, বিশেষ বাংলার কবির জীবন বাংলার মৃত্তিকার মতই উপদ্রবহীন সমতল দেখতে পাই। ব্যবহারিক জীবনের নিত্যকার খাওয়া-শোয়া ছাড়া কবির আর একটি জীবন আছে—এটী তাঁর আত্মিক জীবন। বহির্জ্জীবনের মত এ জীবনেরও একটা ক্রমিক গঠন-প্রক্রিয়া আছে—এর প্রস্তর যুগ, তাম্রের যুগ ইত্যাদি এই বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে একটী সমাহিত কবি-চিত্ত কী ভাবে পূর্ণতার দিকে এসে পৌঁছায় তাই দেখান' কবি-জীবনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য গিরিশচন্দ্রকে লেখক তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু নাট্য-কবিকে নাটকীয় চরিত্রের ভেতর থেকে টেনে আনায় বিপদ আছে। সেক্সপিয়ারকে আমরা হ্যাম্‌লেট্, ওথেলো, লিয়ার কিম্বা ফলষ্টাফে পাই কি না পাই এ প্রশ্ন উঠে প'লে বিশেষ সঙ্কট উপস্থিত হয়। এ বিবাদের মীমাংসা হয় তখনই যখন আমরা মেনে নিই যে সেক্সপিয়ারে সব জিনিসেরই উপাদান ছিল—তাঁর কবি-চিত্তের নিগূঢ় রসানুভূতি সব কিছুকেই ধ'রেছিল অথচ সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র একটা সত্তাও তাঁর ছিল—গিরিশচন্দ্রেরও তেমনি শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গলই সব নয়, আবুহোসেন, আলাদিন, যোগেশেও গিরিশচন্দ্রকে আমরা পাই। আবার মানুষ গিরিশচন্দ্রকে পৃথক রূপেও পাই, হেমেন্দ্রবাবু সেদিক দিয়ে গিরিশ-জীবনীর আলোচনা করেন নি। কিন্তু যাক্ সে কথা। গিরিশ-প্রতিভার evolution এ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব একটী প্রধান এবং প্রথম কার্য্যকরী উপাদান। এই অংশ হেমেন্দ্রবাবু এত বেশী ক'রে আলোচনা ক'রেছেন যে কোন কোন স্থান অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে হয়। কবিকে কাব্যের দিক দিয়ে দেখলেই ঠিক হয়, তাঁর ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানগত উৎকর্ষতার মূল্য যাই হোক রস-সাহিত্যের পর্য্যায়ে তা সাপেক্ষিক মাত্র। কাজেই ঠাকুরের প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা কী ভাবে স্ফূর্ত্ত হ'য়েছিল সেইটী হ'চ্ছে সব চেয়ে মূল্যবান, হেমেন্দ্রবাবু সেদিকটা খুব সংক্ষেপে আলোচনা ক'রেছেন।

এর পর লেখক বাংলা নাট্যালয়ের উৎপত্তি ও পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন এবং রঙ্গালয়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধ ও অভিনয়শিল্পে গিরিশের নৈপুণ্য নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। এটী সত্য ও মূল্যবান জিনিস হ'য়েছে—বাংলা নাট্যালয়ের ইতিহাসের দিক থেকে

এবং গিরিশ-প্রতিভা-বিশ্লেষণের দিক থেকেও। এর পরই গিরিশ-গ্রন্থাবলীর সুদীর্ঘ আলোচনা—এটী যেমন সারবান ও তথ্যপূর্ণ তেমনই অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল। এই অধ্যায় গুলির মধ্যে সবচেয়ে দরকারী হ'চ্ছে 'সিরাজুদ্দৌলা, মীর-কাসিম ও শিবাজী'; গিরিশচন্দ্রের বাজেয়াপ্ত এই বই গুলি অনেকের দেখ্বার সৌভাগ্য হয়নি। লেখক অনেক অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিয়ে এই লুপ্তপ্রায় নাটকগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রেছেন, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক-গুলি সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে—। আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার যেমন গিরিশচন্দ্রের নাটককে তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নিয়েছেন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক, তেমনই রচনার সময় হিসাবে ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেকটী পর্য্যায় কোন্ পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে এবং তিনটী পৃথক অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে তিনি যে যে বিশিষ্ট বাণী দিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে মূলতঃ কোন ঐক্য আছে কি না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করলে তাদের æsthetic valueই বা কি তা একটু সংক্ষেপে দেখালেই ভাল ক'র্তেন। এই অধ্যায়গুলি আরম্ভ করবার পূর্ব্বে একটী প্রকাণ্ড অপূর্ণতার আঘাত আমাদের বাজে। গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে-কার বাংলা নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথাই লেখক বলেন নি; গিরিশচন্দ্রের নাটক ত আসমান্ থেকে আসে নি, তারও একটা অভিব্যক্তির ধারা আছে। নবীন বসুর বাড়ীর 'বিদ্যা-সুন্দর', নাটুকে রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব', মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ', 'সধবার একাদশী' কী ভাবে ক্রমোন্নতির ধারা ধ'রে 'প্রফুল্ল', 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌরব,' 'যায়সা কি ত্যায়সা' 'বেল্লিক বাজার'এ এসে রূপ নিল এবং গিরিশচন্দ্রের সম-সাময়িকদের মধ্যে অমৃতলাল, অমরেন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ রায় ও অব্যবহিত পরের দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের রচনা-রীতির পার্থক্য কোথায়, তা না দেখালে গিরিশ-নাট্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। গিরিশ ঘোষ কত বড় dramatist তা তাঁর আগের ও পরের বাংলা নাট-কের খোঁজ না নিলে বোঝা যায় না। কিন্তু হেমেন্দ্র বাবু গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন গোড়া থেকেই মেনে নিয়েছেন, পাঠককেও নিতে বাধ্য ক'রেছেন—প্রমাণ তিনি কিছু করেন নি।

আর একটা কথা গিরিশী নাটকের medium সম্বন্ধেও কিছু লেখা দরকার ছিল। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ আবিষ্কার করেন—গিরিশচন্দ্র আবার মাইকেলী অমিত্রা-ক্ষরকে ছেঁটে কেটে নাটকীয় কথোপকথনের উপযোগী ক'রে আর একটী ছন্দঃ বের ক'রেছেন—হারাণ রক্ষিত মহাশয় যাকে ব'লেছেন, 'গৈরিশ ছন্দ'—সেক্সপিয়ারের ট্রাজেডীতে ব্যবহৃত যে ছন্দকে Saintsbury প্রভৃতি unstopt বা runon line নামে অভিহিত ক'রেছেন—এ ছন্দঃ অনেকটা তারই অনুরূপ। বাংলানাটকে এই ছন্দের ব্যবহার গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। হেমেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নি।

সব শেষে একটী অনুক্রমণিকায় আজ পর্য্যন্ত যত বাংলা নাটক অভিনীত হ'য়েছে তার বিবরণ প্রদত্ত হ'য়েছে। এই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সমস্ত বইয়ের একটি chronological table দেওয়া থাকলে ভাল হ'ত। অভিনয়-ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের সহকর্ম্মী অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ ও অমৃত লাল এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের জীবনী ও শিল্প নৈপুণ্য সম্বন্ধে কোন আলোচনাও প্রাসঙ্গিক হ'তো।

অন্য সব দিক দিয়ে বইটী বিশেষ মনোজ্ঞ হ'য়েছে। লেখক সত্যকার দরদ দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন; তাঁরপ্রয়াস সফল হ'য়েছে।—এ সব ত্রুটির উল্লেখ ক'রলাম শুধু লেখক সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা আছে বলেই। গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও প্রতিভা আলোচনাকে আমরা আরও সম্পূর্ণ, আরও সুন্দররূপে আমরা পেতে চাই ব'লেই। ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অবিনাশ বাবুর বই ছাড়া দ্বিতীয় অবলম্বন আমাদের কিছুই ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিশেষ ক্ষোভ ক'রে ব'লেছিলেন, "গিরিশ ও বঙ্কিমকে আমি শ্রেষ্ঠ লোক বলি কেন? যে লেখকের মধ্য দিয়ে কোন জাতির নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক, এই জন্য গিরিশ শ্রেষ্ঠ, বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ। আমাদের সাহিত্যে এ হেন গিরিশ ও বঙ্কিম নিয়ে এখনও আলোচনা হয় নি—এর চেয়ে দুঃখের কথা কি থাকতে পারে?" হেমেন্দ্র বাবু

পরলোকগত মহাত্মার এই ক্ষোভ দূর ক'রেছেন এজন্য আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

— শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রহস্য-ধারা।—"পাঞ্চজন্য"-প্রণেতা শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, ২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

গুরু বিষয় লইয়া লঘুকণ্ঠে আলোচনা করার মধ্যে যে চপলতা আছে তাহা সময় সময় মুখ-রোচক হইলেও অন্তরের আশ্রয় সে পায় না। হাসিয়া কথা কহিলেই যে সে কথাটার গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে না ইহাও সত্য নহে। সৌরেশ বাবুর 'রহস্য-ধারা' লঘুচ্ছন্দে লিখিত একখানি নিবন্ধ পুস্তক; কিন্তু অন্তর্লীন গাম্ভীর্য্যের দরুণ পুস্তকান্তর্গত নিবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক এবং চিন্তার খোরাক হইয়াছে। বয়স্যের তুচ্ছ রহস্যের কথায় চোখে জল আসে দেখা গিয়াছে। ঐরূপ কথা জ্ঞানপূর্ণ হইবার প্রয়োজন নাই; আমাদের প্রাণে অনুকম্পন জাগাইতে পারিলেই তাহা সার্থক। এই ঐকান্তিকতা গুণে এই পুস্তকখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

তুচ্ছ বস্তু তুচ্ছ কথা আমাদের সম্মুখে নিয়তই উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাহারা আমাদের দৃষ্টির গোচরে থাকে না। বর্ণ-পরিচয়, ধারাপাত, বোধোদয় আমরা সকলেই পড়িয়াছি। বিদ্যারম্ভের দিনে তাহারা আমাদের হাতে পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহাদের ছাড়িয়া আসার পর তাহাদের কথা আমাদের মনে পড়ে নাই। কিন্তু লেখক তাহাদের স্মরণ করিয়া বর্ণ-পরিচয় হইতে সুরু করিয়াছেন। বর্ণ-পরিচয়ের বালকেরও সুপরিচিত "ইট", "আম" প্রভৃতি ছোট ছোট শব্দগুলি অবলম্বনে লেখকের যে গভীর বেদনা অভিনব পদ্ধতিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তাহাও বোধ হয় অনেকের সুপরিচিত, কিন্তু অনেকের দ্বারাই সুচিন্তিত নহে। লেখকের সুচিন্তার ধারা বর্ণ-পরিচয়ের শব্দগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই উহা আমাদের কাছে যেন আরও পরিচিত ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে

সাংসারিক জীব হিসাবে এবং জাতির অঙ্গ হিসাবে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, গিঁঠে গিঁঠে ঘুন ধরিয়াছে—ইহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার লোকের অভাব নাই; কিন্তু আহত না করিয়া দেখাইয়া দিবার লোকের অভাব আছে। রহস্য-ধারার লেখায় আমরা সেই স্বচ্ছন্দজাত হাসিটুকু পাই, যাহার লক্ষ্য আমাদের গ্লানি বিচ্যুতি হইলেও তাহা বক্র নহে, তাহা উপহাস নহে; তাহা লেখকের সুগভীর অন্তর্বেদনারই প্রতিচ্ছবি।

ভাষা আর একটু মার্জ্জিত এবং প্রাঞ্জল হইলে লেখা আরো সবল হইত। তৎসত্ত্বেও পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেকে নিজের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবেন।

—বিশারদ।

পাঁচ মিশেলী।—শ্রীঅবনীনাথ রায়। ডি, এম, লাইব্রেরী,—মূল্য ১৲ টাকা।

পাঁচ-মিশেলী বইটি আমাদের ভাল লেগেছে এর রচনা-ভঙ্গীর নূতনত্বের জন্যে। আমাদের গদ্য রচনার ধরণ আজকাল অত্যন্ত একঘেয়ে হ'য়ে প'ড়েছে, মৌলিক চিন্তার অভাবে মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রতে বড় কেউ সাহস করেন না, ক'রলেও কৃতকার্য্য হন না। অবনী বাবুর রচনায় আমরা এ দুটি জিনিষই পেইছি, এ জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সমালোচনা কেবল মাত্র style এর জোরে বাঁচতে পারে না, তার অন্তরের দিকটাই হ'চ্ছে আসল জিনিস। সেদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে কত বড় দৈন্য আছে তা আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলির পাতা উল্টালেই বুঝতে পারা যায়। কোন বই 'অনবদ্য' কি না ব'লতে পারলেই এবং 'আর্ট', 'ইন্‌টেন্‌সিটি' প্রভৃতি গোটাকতক চল্‌তি গালভরা কথা আওড়াতে পারলেই সমালোচক 'খুব ব'লেছি' ভাবেন, পাঠকও তারিফ করেন। বস্তুতঃ সমালোচনা একটা আর্ট—আলোচিত বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে সমালোচকও নূতন রসদৃষ্টির আলিম্পনে মৌলিক সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারেন—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা তার উদাহরণ। অবনী বাবুর রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবু যথার্থই ব'লেছেন যে 'সমালোচনা করা আর জজিয়তি করা যে এক নয় এ জ্ঞান লেখকের

আছে।' অবনী বাবু শরৎ-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ক'রেছেন এবং এই দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টির অন্তরের দিকটা ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা ক'রেছেন, সফলকামও হ'য়েছেন। দু'একটা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতের মিল হয় নি—কথাটা ব্যক্তিগত মতের কথা। বিনা প্রয়োজনে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে ক'রে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারটাও আমাদের একটু খারাপ লেগেছে। সেটাও উপেক্ষণীয় দোষ।

মোটের উপর বইটি খুবই ভাল হ'য়েছে এবং এর আদর হবে, অন্ততঃ হওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি।

ওমর খৈয়াম।—অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, প্রণীত। ৫, নরসিংহ লেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এ পর্য্যন্ত "রুবাইয়াৎ"এর কয়েকখানি অনুবাদ আমাদের পড়িবার সুযোগ হইয়াছে।—কিন্তু এমন সরল ও সরস অনুবাদখানির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে অন্যান্য "রাজ" বা "শোভন" সংস্করণগুলি হইতে ইহার বিশিষ্টতা উপলব্ধ হইবে। শ্যামাপদ বাবু নবীন কবি—তিনি বহিরঙ্গ প্রসাধনের লোভ সামলাইয়া যে একখানি অনাড়ম্বর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার মার্জ্জিত রুচিরই পরিচয় পাওয়া গেল। যাঁহারা মূল গ্রন্থ পড়েন নাই তাঁহাদের কাব্য-রস আস্বাদনে আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকা এবং ওমর-এর মতবাদ বিশেষ সাহায্য করিবে।

কবি বলিয়াছেন—"দার্শনিক ওমরের চেয়ে কবি ওমরের আসন অনেক উচ্চে"—আমরাও এই মতের সমর্থন করি। অনুবাদক আলোচ্য গ্রন্থে তাহার এই অভিমতের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে করি।

অনুবাদের মধ্যে পদ-লালিত্য, ছন্দ-মাধুর্য্য ও ভাব-সার্থকতা রক্ষিত হওয়াতে বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। নিম্নে কয়েক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

উষার আলোর তপ্ত চুমায়
　সূর্য্যমুখী শিহরে যখন ফোটে,
তা'র পাশে হায় মৌন ব্যথায়
　শিউলি তখন ধূলার পরে লোটে।

—০—

ভাগ্যে যদি ফুল না ফোটে
　এই গোলাপের কাঁটাই আমার প্রিয় ;
দিনের আলো পাইত' ভালো
　নইলে আঁধার এ-ই পরমাত্মীয়

এই কথাটির সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নাই,—ছন্দের সাবলীল গতিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে—তবু ভালই লাগে।

ওই তটিনীর তট নিরালায়
　শান্ত শীতল ওই পথে সম্মুখে
আল্‌গোছে, ভাই, চরণ ফেলো—
　নইলে ব্যথা বাজবে তৃণের বুকে।

—অতি সুন্দর!—ছোট বইখানির পাতায় পাতায় এমনি কাব্য-রস পরিবেশন করিয়া কবি আমাদের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন।

—খুব একটি আশা ও আশ্চর্য্যের কথা, দশ বৎসরের কিশোর শিল্পী শ্রীমান স্বরিন বাবু (তিনি আবার কবিও শুনিতেছি) "ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্র ক'খানি" আঁকিয়াছেন। এমনি একখানি সুখপাঠ্য বই-এর আদর দেখিলে আমরা সুখী হইব।

দাম্পত্য-রহস্য ও রমণী-রহস্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত, পুষ্পপাত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কালিঘাট হইতে প্রকাশিত।

—যৌনতত্ত্ব যে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে একটা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে—তাহা আজ পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত Sexologyর বইগুলির উল্লেখ করিয়া আমরা প্রমাণ করিতে চাই। কিন্তু যৌন-সম্পর্কে লিখিত আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের বহু উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রতি আমাদের অনাস্থাই বোধ হয় এই সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পঠন-পাঠনে শৈথিল্য আনিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায় মহাশয় সম্মিলনীতে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমাদের একমত বলিয়া তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।—"নারীর যৌন-জীবন রীতিমত জটিল, তাহার যৌন-জীবনের জ্ঞানের উপরে তাহার নিজের স্বাস্থ্য, লাবণ্য, আয়ু, বল ও সৌভাগ্য যেমন এক দিকে নির্ভর করিতেছে, অন্য দিকে তাহার সন্তানের ইহ পরকালও নির্ভর করিতেছে। নারীকে গর্ভ ধারণ করিতে হয়, সন্তান প্রসব করিতে হয়, সন্তান পালন করিতে হয়। এতবড় গুরু দায়িত্ব পুরুষের নাই। প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য আপন পত্নীকে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের সহায়তা করা।" জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এই দুইখানি পুস্তক সে জ্ঞানলাভে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়াই মনে করি। পুস্তক-দুইখানি প'ড়্যা—গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

রায় রামসুন্দর ঘোষ বাহাদুর

শ্রীসুবোধ রায়

আধুনিক সভ্যতার বহু সুখ-সুবিধা আছে। বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বলময় তার চাক্‌চিকা, চিত্তোন্মাদকারী তার মোহ। এই গতি ও বর্ণময় সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া আমাদেরও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। জীবনধারণের ও জীবনকে সুখৈশ্বর্য্যময় করিবার প্রতিযোগিতার
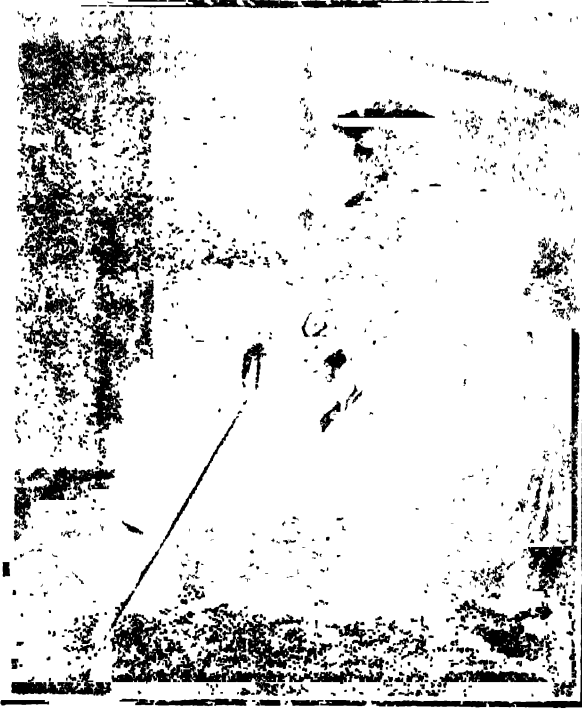
রায় রামসুন্দর ঘোষ বাহাদুর

ক্ষেত্রে আমরাও প্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশ করিয়াছি বটে কিন্তু সেই ব্যূহের মধ্য হইতে বাহির হইবার পথ জানি না। ফলে, চিন্তা-বিহীন এবং সময়ে সময়ে উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্মস্রোতে ডুবিয়া আছি। আমরা কি পাইলাম ও কি হারাইলাম তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত আমাদের নাই।

আধুনিক যুগের যুগ-দেবতা বিজ্ঞান। এই দেবতার পরিচারক যন্ত্র। এই দেব ও দানবের প্রাধান্যের ফলে আমরা মানবকে হারাইতে বসিয়াছি। মানের জন্য নয়, খ্যাতির জন্য নয়, আর্থিক আড়ম্বরের জন্য নয়, স্নেহ, দয়া, নিঃস্বার্থ সেবা, সরল দেশ-প্রীতি প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় একদিন যে সকল বাঙ্গালী অনাড়ম্বর সহজ জীবনের মধ্য দিয়া মানব-ধর্ম্মের শান্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মত জীবন আজকাল আর বড় একটা চোখে পড়ে না। এইরূপ একজন খাঁটী বাঙ্গলা মায়ের সন্তান ছিলেন স্বর্গীয় রায় রামসুন্দর ঘোষ। তাঁহার সরল ও সুন্দর জীবনের একটা ছবি দিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানকে খাটো করিয়া অতীতকে বড় করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। এই আলোচনার মধ্য দিয়া অতীত জীবনের কোন হারামণির সন্ধান যদি মিলে তাহা হইলে তাহার আলোকে বর্ত্তমান জীবনের আদর্শহীন হতাশাময় দিকটা হয়তো কিছু পরিমাণে দীপ্তিময় হইয়া উঠিতে পারে। রামসুন্দরের সবিস্তার তথ্য ও ঘটনাপূর্ণ জীবনী পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রদত্ত বিবরণী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

রায় রামসুন্দর ঘোষ বাহাদুর জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত সাবডিভিসনের রাজীবপুর গ্রামে ১৮২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ গ্রামের ৺ গঙ্গানারায়ণ ঘোষের চার পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। রামসুন্দর বাল্যকালে রাজীবপুর গ্রামেই তৎকালীন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ইনি একদিন গুরু-মহাশয়ের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া বরাবর পাঠ-শালা হইতে একেবারে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার মাতুলালয় নৈহাটীতে গিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল ৺ রামধন মিত্র মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন—"আমি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বটে কিন্তু আমি মূর্খ হইয়া থাকিব না। আমি পড়িব।" তাঁহার স্নেহময় মাতুল মহাশয় তাঁহার ভাগিনেয়ের আব্দারে তাঁহাকে হুগলি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই জন্য রামসুন্দরকে প্রত্যহ নৈহাটী হইতে গঙ্গা পার হইয়া কলেজে যাইতে হইত। রামসুন্দর দরিদ্রের সন্তান,

প্রত্যহ নৌকা করিয়া পার হইবার পয়সা দিতে পারিতেন না, সেজন্য নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে গঙ্গা সন্তরণের দ্বারা পার হইয়া কলেজে যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নির্ভীক, তেজস্বী ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন, ঐ গুণগুলি তাঁহার শেষ বয়স পর্য্যন্ত ছিল। হুগলী কলেজ হইতে তিনি তৎকালীন জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ-পদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হন এবং সেখানেই সিনিয়ার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু সিনিয়ার পরীক্ষা তাঁহার দেওয়া হয় নাই। তিনি দরিদ্রের সন্তান, কলেজের লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনিয়া নৈহাটীতে পড়িতেন। সেই পুস্তকগুলি হঠাৎ একদিন চুরি যায়, অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়া যায় নাই। রামসুন্দর সে কথা কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানান। কলেজের কর্তৃপক্ষ সেই পুস্তকগুলির দাম চাওয়াতে রামসুন্দর তাহা দিতে অপারগ হন, ফলে লজ্জায় হুগলী কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মধ্যম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺বঙ্কুনারায়ণ ঘোষের সাহায্যে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। রামসুন্দর তাঁহার এই মেজদাদার বড়ই অনুগত ছিলেন। মেজদাদা সেই সময়ে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। সেই অল্প বয়সেই রামসুন্দরকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিবার পর কলিকাতায় বিসূচিকা রোগে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। রামসুন্দর ভ্রাতার শোকে বড়ই কাতর হন। কলিকাতা থাকিবার খরচ নির্ব্বাহের জন্য বঙ্গের কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কোন কার্য্য প্রার্থনা করেন। কবি প্রভাকর প্রেসে রামসুন্দরকে প্রভাকরের একজন সব্ এডিটররূপে ভর্ত্তি করেন। এইরূপে রামসুন্দর যাহা পাইতেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে খরচ নির্ব্বাহের জন্য দিতেন এবং মাতুলের বাসায় থাকিয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার মধ্যমাগ্রজের মৃত্যুতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা এত শোকাতুর হন যে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন এবং পিতার কার্য্যক্ষমতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। রামসুন্দরের সামান্য রোজগারই তখন সংসারের একমাত্র সম্বল হয়। রামসুন্দর মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে রাজীবপুরে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাপ-মাকে দেখিতে যাইতেন। এই সময়কার একটি ঘটনা বিবৃত করি। রোগশয্যায় মাতাকে রামসুন্দর দেখিতে গিয়াছেন, একদিন থাকিয়া মাতার সেবা করিয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিতেছেন—সঙ্গে মাত্র চারটী পয়সা জল খাবারের জন্য ছিল। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন যে একজন চিংড়ি মাছ বিক্রয় করিতেছে, রামসুন্দর তাহা দেখিয়া সেই চার পয়সায় চিংড়ি মাছ কিনিয়া মাতাকে আনিয়া দিলেন। মাতা চিংড়ি মাছ ভালবাসিতেন, হয়ত জীবনে আর খাইতে পাইবেন না, এই ভাবিয়া মাতৃবৎসল পুত্র তাঁহার সম্বল চারটি পয়সাই মাতৃসেবায় খরচ করিয়া শুষ্কমুখে সেই দশ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া সন্ধ্যায় কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর রামসুন্দরের সাংসারিক কষ্ট আরও ভীষণ হইল। এদিকে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সুবিধার জন্য তাঁহাকে প্রেসের কার্য্যও ত্যাগ করিতে হয়। সেই সময়ে তাঁহার নৈহাটীতে ৺গোপমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন, বাসায় অনেক লোক থাকিত, সকলেই পালা করিয়া রন্ধনাদি করিতেন। রামসুন্দরকেও পালা খাটিতে হইত। রামসুন্দর রাঁধিবার সময় প্রদীপের তৈল অভাবে, উনুনের পাশে বসিয়া পাঠ করিতেন। একদিন সেই অবস্থায় রামসুন্দরকে দেখিয়া তাঁহার মাতুল মহাশয় প্রত্যহ তাঁহার পড়িবার জন্য তৈলের খরচ বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার হইয়া পালা খাটিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার দিন যখন সমাগতপ্রায়, তখন রামসুন্দর একদিন রাজীবপুরের বাড়ীতে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার মুখাপেক্ষায় প্রায় অনশনে দিন যাপন করিতেছেন। ইহার পরই তিনি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা গিয়া তিনি কষ্টম-হাউসে কেরাণীগিরীর কার্য্যে ভর্ত্তি হয়েন। এই কার্য্য ১৫ দিন করিবার পর মেডিকেল কলেজের তৎকালীন সহৃদয় প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন রামসুন্দরকে দেখিয়া এবং তাঁহার অবস্থার বিষয় জানিয়া তাঁহার পরীক্ষা যে কয়দিন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্থসাহায্য করেন এবং তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে ফিরাইয়া আনেন। রামসুন্দর বহু সম্মানের সহিত

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ-শত টাকা মূল্যের পারিতোষিকের সহিত বাড়ী আসেন। সেই সময়কার গ্রামের একটী ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। রাজীবপুর গ্রামে একজন বিদ্যারত্ন মহাশয় ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামসুন্দরের তৃতীয়াগ্রজ ঈশানচন্দ্র ঘোষের বড় বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুপত্নী সেই সময়ে প্রসব-বেদনায় বড় কাতর ছিলেন, এমন কি বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। ঈশানচন্দ্রের অনুরোধে ও তদীয় বন্ধুর কাতর প্রার্থনায় রাম-সুন্দর লুকাইয়া সন্ধ্যার সময় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীতে গিয়া সুপ্রসব করাইয়া প্রসূতিকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ও গ্রামস্থ অন্যান্য বৃদ্ধগণ এই কথা শুনিয়া রামসুন্দর বিদ্যারত্ন মহাশয়দের জাতিপাত করিয়াছেন বলিয়া রামসুন্দরকে মারধর করিবার চেষ্টা করেন। এই কথা শুনিয়া রামসুন্দর কলিকাতায় সেই রাত্রেই পলাইয়া আসেন এবং মেডিকেল কলেজে চাকরি গ্রহণ করেন। তৎপরে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, পাঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশে চাকরী করেন। চাকরীগ্রহণের সময় হইতেই রামসুন্দরের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। সিভিল ও মিলি-টারী দুই বিভাগেই কার্য্য করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করেন। বেতন ও প্র্যাক্‌টিসে অর্থ উপার্জ্জনও অনেক করেন। স্যার গুরুদাস, স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র ও তৎকালীন অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কলিকাতায় থাকা কালীন তিনি হারাণ ঘোষ প্রমুখ বড় বড় লোকের ও বহরমপুর থাকাকালীন মুর্শিদাবাদ নবাবের, মহারাণী স্বর্ণময়ীর, অন্নদা বাবুর ও অন্যান্য বড়লোকের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। ইনি গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন। বড় বড় লোকের বন্ধু হইয়া, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ও গভর্ণমেণ্টের নিকট অত্যুচ্চ সম্মান পাইয়াও রাম-সুন্দর নিরহঙ্কার ও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন তিনি সরকারী কাজে নানা স্থানে বেড়াইতেন, তখন তিনি বহু গ্রাম হইতে ভদ্রলোকদের নিষ্কর্ম্মা মূর্খ ছেলেদের লইয়া আসিয়া ভ্যাক্‌সিনেটরের কার্য্য করিয়া দিয়া কত লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। এই-রূপ প্রায় ১৫০।২০০ শত জন ভ্যাক্‌সিনেটর তাঁহার নিকট কাজ করিত। যখন উহারা কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার বাড়ীতে প্রায় বৎসরের মধ্যে তিন মাস থাকিত, তখন তাহাদের খাইবার খরচ নিজ হইতে দিতেন।

তাঁহার কলিকাতার বাসায় তাঁহার গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ প্রায় ২০।২৫ জন বালক তাঁহার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিত ও অন্যান্য কাজ করিত। লেখাপড়ার দিকে তাঁহার বড় বেশী দৃষ্টি ছিল। রাজীবপুর গ্রামে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যায় এক্ষণে ঐ বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের রাস্তাগুলি সমস্ত পাকা করিয়া দেন এবং রাজীবপুর গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে কলিকাতায় আসিবার সুবিধার জন্য একটি রীতিমত বড় রাস্তা প্রায় ৭।৮ মাইল ব্যাপী তৈয়ার করাইয়া দেন। আবার পশ্চিম দিকে আর একটি রাস্তা প্রায় ১১ মাইল ব্যাপী ঐরূপ বড় করিয়া নৈহাটী অবধি প্রস্তুত করান। রাজীবপুরে একটি পোষ্ট আফিসও স্থাপন করান। এইরূপে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা ও রাস্তা ইত্যাদির দ্বারা রাজীবপুরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া বহির্জ্জগতের সহিত নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করেন। রাজীবপুর এখন একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ও ভদ্রলোকের বাসভূমি। বলিতে গেলে রামসুন্দরই ইহার স্থাপয়িতা ছিলেন। পেন্সন লইয়া যখন তিনি বরাবর রাজীবপুরেই বাস করেন, তখন গ্রামস্থ লোকের কথা দূরে থাক্‌, দূরবর্ত্তী পাশের গ্রামে রোগী দেখিতে গিয়া কখনও ফি লইতেন না। আজও পর্য্যন্ত সেজন্য রামসুন্দরকে দেশের লোকে পূজা করে। রাজীবপুর বিদ্যালয়ে তাঁহার একটি স্মৃতি-ফলক ও একটি দীর্ঘ হল তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এতদ্ভিন্ন তিনি যেদিন রায় বাহাদুর সনদ প্রাপ্ত হন সেদিনকার সেই সভার একটি বিবরণী ১৮৭৫ সালের ২১শে জুনের হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় যে প্রথম জীবনে সরকারী চাকরী লইয়াই তিনি দাক্ষিণাত্যের ভীল জেলায় গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সে-দিনের সনদ-প্রদান-সভার সভাপতি তৎকালীন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ সেভার্স (Dr. Chevers) বলেন :—

There in a remote wild district, which was then a terror to most of your country men, you organised a Charitable Dispensary for the relief of the almost savage tribes who surrounded you.

অতঃপর সরকারী সামরিক ও অসামরিক নানা হাঁসপাতালের চিকিৎসকরূপে তিনি ভারতের বহু স্থান বিশেষতঃ যুক্ত-প্রদেশ ও উত্তর পাশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ সেভার্স বলেন :—

"You appear to have opened four important Dispensaries at Bhopawar, at Ambala, at Dehra Ghazi Khan and at Leia. If in ancient Hindusthan he who dag a well and planted a tree was reverenced as a public benefactor, what shall be the respect accorded to him who organised four district hospitals for the relief of unnumbered thousands of suffering human beings?"

ডাঃ সেভার্সের উক্তি একান্ত সত্য। তখনকার বিপদ-সঙ্কুল গমনাগমন ও সংবাদ আদান প্রদানের অসুবিধাপূর্ণ কালে বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশে তিনি অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন ইহাতে তাঁহার বাস্থ্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সাহস ও মানুষের প্রতি একান্ত ভালবাসা সূচিত হয়।

এই বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে তিনি বাঙ্গলায় টীকার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন। টীকা লওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে এদেশবাসীর মন হইতে এখনও সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। সেইজন্য অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয় যখন আমরা রামসুন্দর ঘোষ সম্বন্ধে ডাঃ সেভার্সের এই উক্তি পড়ে:—"Your immediate superior reported in February last, that within two years you vaccinated 1,63,000 persons." এই Vaccination Department এর প্রবর্ত্তনের সময় তিনি যে বহুসংখ্যক বেকার ভদ্র যুবকের বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে এই একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর দেহান্ত ঘটে। যে ত্যাগ, সহনশীলতা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা স্বর্গীয় রামসুন্দর ঘোষের চরিত্রে পরিস্ফুট তাহাই সত্যকার বাঙ্গালী চরিত্র। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সময় তিনি গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করেন নাই। সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়া তিনি তাঁহার জন্মভূমি স্বীয় গ্রামকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর চরিত্রে আবার এইরূপ সহজ দেশপ্রীতি, সরল অনাড়ম্বর কর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বার্থশূন্য জন-সেবার এষণা ফিরিয়া আসুক।

পরিচয়

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

উষার সীমন্ত ঘেরি' কুহেলির বিচূর্ণ কুন্তল,
পল্লবে নীহারসম কাঁপে দূর পূবালি পবনে!
সেখানে অরুণ-রেখা রাখিলাম প্রথম চুম্বনে—
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তা'র শিহরিয়া উঠিলো অঞ্চল!

আদিম অরণ্যে যবে জেগেছিলো চকিত মর্ম্মর,—
কঠিন শৈলের দেহে, কেয়াগন্ধে রোমাঞ্চিত ফণী,
বিদ্যুৎ-নির্ঝরে যা'র শুনেছিলে চুম্বনের ধ্বনি—
সেই আমি ফিরে এনু—কহিলাম: 'ধরো মোর কর'।

ছায়ার গুণ্ঠনে তব মাধুর্য্যের পরম বিস্ময়,
ঝঙ্কারি' ফিরুক মোর চেতনার গহন পর্ব্বতে।
ধীরে খোলো বাতায়ন,—বাহিরেতে মেঘ মেলি' চাও
সজিনা ফুলের গন্ধ!—ঘুঘু যেন ডাকে কোথা হ'তে!
যন্ত্র-জগতের গান থেমে যাবে সন্ধ্যার সময়,—
তখন কহিবো কানে: 'মোর পানে নয়ন ফিরাও'।

খেলাঘর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

৫

সুদীর্ঘ কাল পরে ভায়ের বিয়োগ-ব্যথা হয়তো নবী নওয়াজ ভুলিয়াছে। মানুষের শোক বেশী দিন বাঁচে না। কিন্তু মানুষের সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া দিনযাপনের দুঃখ তাহাকে বিঁধিয়া-বিঁধিয়া জজ-সাহেবের পাথরের মতো শক্ত, ভাবলেশহীন মুখটি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাইকে সে ভুলিয়াছে, কিন্তু যে তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাকে নিয়ত মনে পড়ে।

ঘানি টানিয়া, পাথর ভাঙ্গিয়া, দড়ি পাকাইয়া শুধু তাহার হাতেই কড়া পড়ে নাই, মনেও কড়া পড়িয়াছে। তাহার পূর্ব্বের ভদ্র মনের আজ অল্পই অবশিষ্ট আছে। চিন্তাধারারও সামঞ্জস্য নাই। তথাপি দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সে অনেক কথা ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কূল-কিনারা পায় না! পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ চমকাইয়া থামিয়া পড়ে; চিন্তার খেই হারাইয়া বিহ্বলের মতো চারিদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চায়। তারপরে আবার কাজে মন দেয়, এস্তু একটা অস্বস্তি থাকিয়া যায়,—কি যেন হারাইয়া গেছে।

এ জীবনে অনেক কিছুই সে হারাইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন্‌টির মূল্য সব চেয়ে বেশী তাহা কে বলিবে? বস্তুর কি মূল্য আছে? বিশেষ মুহূর্ত্তে বিশেষ বস্তু অমূল্য হইয়া উঠে। নবী নওয়াজের কখনও মনে হয়, এই সময় যদি তাহার ছোট মেয়েটিকে একবার কোলে করিতে পাইত,—বিনিময়ে সে সর্ব্বস্ব দিতে পারিত। কখনও মনে পড়ে স্ত্রীকে, কখনও—

কিন্তু তাহার আবার সর্ব্বস্ব! তার আবার বিনিময়!

নবী নওয়াজ অনেক কিছুই ভাবিতে চেষ্টা করে: ওই জজ সাহেবটি হয়তো আইনের জাহাজ। কিন্তু জজ তো মানুষের বিচার করে না, করে তাহার অপরাধের। আইনও মানুষের দুর্ব্বলতা ক্ষমা করে না। সবলতর পারিপার্শ্বিক ঘটনার স্রোতে মানুষ কুটার মতো ভাসিয়া চলে।—তাহার কৃত কর্ম্মের দায়িত্ব সকল সময়ে তাহার নিজের নয়। কিন্তু সে হিসাব রাখিতে গেলে বিচারের ব্যবসা চলে না। আইনের খাতায় তাই মানুষের চেয়ে তার অপরাধের হিসাবটাই বড়।

এই কথাই সে ভাবিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এমন করিয়া ভাবিতে পারে না। মধ্যপথে সকল চিন্তা ঘোলাইয়া ওঠে। আবার এমনি চিন্তায় সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটাইবারও উপায় নাই। পরের দিনের খাটুনি আছে। সুতরাং নিদ্রা যাওয়ার প্রয়োজন।

তখনও খানিকটা রাত্রি আছে। পরের দিনের খাটুনির কথা ভাবিয়া নবী নওয়াজ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। পরিশ্রান্ত শরীর চিন্তার কুয়াশার মধ্যে ধীরে ধীরে এলাইয়া পড়িল।

কিন্তু সে কতক্ষণই বা! তাহার ঘুম কেবল জমিয়া আসিয়াছে এমন সময় ঢং ঢং শব্দে সকালের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তারপরে আবার সেই অতি পুরাতন দৈনন্দিন কর্ম্ম।—

বিশ্বেশ্বরকে এখনও পর্য্যন্ত কোনো কাজই করিতে হয় না। সকলে কাজে যায়, সে সমস্ত সকাল-বিকাল একবার এ-জানালার গরাদে ধরিয়া, একবার ও-জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে, ক্লান্তি বোধ করিলে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়ে। ঘুম আসে না, আবার উঠিয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়ায়।

স্পেশাল ওয়ার্ডের পাঁচালের ধারের নেড়া গাছটি দক্ষিণের জানালা খুলিলেই চোখে পড়ে। এক জোড়া চিল কাঠি-মুঠি দিয়া তাহার একটা ডালে বাসা বাঁধিয়াছে। একটা ছানাও হইয়াছে,—অতি কদাকার চেহারা; ছোট্ট পালকহীন মাথাটা উঁচু করিয়া মাঝে মাঝে খাবারের জন্য চেঁচায়। তার মা'টি দিবারাত্রি তাহাকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকে। দূরের আর একটি ডালে মদ্দা চিলটি নিতান্ত নিঃস্পৃহভাবে তুরীয় লোকের প্রাণীর মতো ঝিম্ হইয়া

বসিয়া থাকে। ওই শাবক, তাহার জননী এবং সযত্ন গঠিত নীড়, কিছুরই উপর যেন তাহার আকর্ষণ নাই। কেবল মাঝে মাঝে এক একবার রান্নাঘরের দিকে লোলুপ-দৃষ্টিতে আড় চোখে চায়, এবং সুযোগমত ছোঁ মারিয়া কখনও মাছের নাড়ি-ভুঁড়ি, কখনও বা অন্য কিছু আনিয়া বাসার কাছে ফেলিয়া দিয়া আবার তেমনি নিঃস্পৃহভাবে দূরের ডালটিতে গিয়া বসে।

গোটা কয়েক কাক কিছুদিন হইতে বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদেরও বাসা বাঁধিবার সময় আসিতেছে। কিন্তু কাঠি-মুঠি সংগ্রহ করিবার কষ্ট তাহারা স্বীকার করিতে চায় না, চিলের বাসাটি ভাঙ্গিয়া তাহারই কাঠি-মুঠি দিয়া বাসা বাঁধিতে চায়। সেদিন মাদী চিলটি কোথায় গিয়াছিল। মদ্দাটি যে দূরে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া আছে কাকটি বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে নিঃশঙ্ক-চিত্তে চিলের বাসা হইতে কাঠি-মুঠি সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। ছানাটি প্রাণভয়ে চেঁচাইতেই চিলটি সোঁ করিয়া আসিয়া এমন ভাবে কাকটিকে ঝাপ্‌টা মারিল যে, প্রথমে মাটিতে এবং সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে সে পলায়ন করিল।

তারপরে আরম্ভ হইল যুদ্ধ ;—

মাদী চিলটি আসিয়া ছানার কাছে বসিল। অপর পক্ষে গোটা বিশেক কাক গাছটিকে বেড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া কা কা করিতে লাগিল, এবং সুযোগ পাইলেই চিলটির মাথায় ঠোকর দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাক লঘু-পক্ষ যখন-তখন যে কোনো দিকে বেঁকিতে পারে। চিলটি একবার করিয়া ঝপ ঝপ্ করিতে করিতে তাড়া করে, আবার নিজের ডালটিতে ফিরিয়া আসিয়া বসে।

এমনি চলিল মিনিট পনেরো। তারপরে কাকগুলিও ক্লান্ত হইয়া নিজের নিজের স্থানে চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর দক্ষিণের জানালাটি খুলিয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। ওই শাবকটির কল্যাণে দুটি চিলে আজ বাসা বাঁধিয়াছে। একটি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ছানাটির পাশে বসিয়া থাকে। যেদিন অঝোরে বৃষ্টি ঝরে সেদিন দুটি পক্ষ মেলিয়া দিয়া ছানাটিকে বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করে। আহার নিদ্রা একরকম বন্ধই করিয়াছে। আর একটি যেখানে যাহা পায় ঠোঁটে করিয়া আনিয়া বাসায় ফেলিয়া দেয়,—শিশুটির মা ঠোঁটে করিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাওয়াইয়া দেয়। বাসাটিকে মদ্দা চিলটি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করে।

আদালতে হলফ্ পড়িয়া কিম্বা দেবতা সাক্ষ্য করিয়া ইহাদের বিবাহ হয় নাই। বাচ্ছাটির খাওয়ানোর জন্য বাধ্য করিবার কোনো আইনও নাই। তবু সন্তানটিকে বাঁচাইয়া বড় করিয়া তুলিবার কোনো ত্রুটিই কোনো পক্ষের নাই। আগামী বারে এই ছানাটিই যখন বড় হইবে তখন তাহাকে তাহার বাপ-মা কেহই চিনিতেও পারিবে না। ছানাটিকে বড় করিবার দায়িত্ব শেষ হইয়া গেলেই ইহাদের কে যে কোথায় যাইবে তাহারও কোনো স্থিরতা নাই। আগামী বারে আবার নূতন মিথুন নূতন ডালে বাসা বাঁধিবে, আবার একটি নূতন প্রাণীকে বাঁচাইয়া তোলার দায়িত্বপালনে।

বিশ্বেশ্বর আপন মনেই হাসিল।

এমন সময় হাঁফাইতে হাঁফাইতে নবী নওয়াজ আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিশ্বেশ্বরকে একরকম টানিয়া এক কোণে লইয়া গিয়া মুখ-চোখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—ভালো খবর আছে মাষ্টের।

তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া 'মাষ্টের' অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। নবী নওয়াজের সমস্ত মুখ অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল,—খবর খুব ভালো, মাষ্টের। বোধ হয় আজকেই, না হয় কাল নিশ্চয়ই আপনাকে সাহেবদের ওয়ার্ডে পাঠাবে। আফিস থেকে নিট্ খবর নিয়ে আসছি।

'সাহেবদের ওয়ার্ড' সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরের কোনো জ্ঞানই ছিল না। সুতরাং কোনো উল্লাসের চিহ্নই তাহার মুখে দেখা গেল না।

নবী নওয়াজ তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাতে একটু চাপ দিতে দিতে বলিল,—বেশ থাকবেন ওখানে। খাওয়া, শোওয়া, থাকা, সব দিকেই তোফা আরাম,—কোনো তক্‌লিফ নাই। দিব্যি থাকবেন। আলগ্-আলগ্ ঘর,—চেয়ার দেবে, টেবিল দেবে, একেবারে কংগ্রেসের বাবুদের মতো।

বলিয়া বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া কি যেন উত্তর প্রত্যাশা করিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর কোনো উত্তরই দিল না। ঠিক ব্যাপারটা তখনও পর্যান্ত সে উপলব্ধি করিতেই পারে নাই।

নবী নওয়াজ আবার বলিল,—এখানে অনেক কষ্টই হোল আপনার,—খানা-পিনা সব বিষয়েই। তারপরে ভদ্দর লোকের ছেলে আপনি। ওই শালা চোরদের সঙ্গে কি থাকতে পারেন?

বিশ্বেশ্বর এবারও কোনো উত্তর দিল না।

নবী নওয়াজ বলিল,—তবু আপনাকে পেয়ে দু'দিন বেশ কাটলো। দুটো মনের কথা কইবার লোক পেয়েছিলাম।

সে হাতের উলটা পিঠে চোখ মুছিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—আচ্ছা, আমাকে ওখানে কেন পাঠাচ্ছে জানো?

—বলেন কি মাষ্টের? আপনার তরফ থেকে দরখাস্ পড়েছিল যে। ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে, পেটে এলেম আছে, এই চোথা জায়গায় থাকবেন কেন?

—আচ্ছা, 'সাহেবদের ওয়ার্ড'এ যারা থাকে তারা সব লোক ভালো?

নবী নওয়াজ হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—"ভালো লোক কি জেলে আসে, মাষ্টের? ওরাও কেউ খুনে, কেউ চোর। বাঙালীও আছে, তবে সাহেবই বেশী। তাই খাতির পায় বেশী।

কথাটা বিশ্বেশ্বর প্রথম শুনিল। একই অপরাধে অপরাধী,—কেউ কালা, কেউ ধলা; কেউ ধনী, কেউ গরীব। সুতরাং ব্যবহারের বৈষম্য। কথাটা সে ঠিক মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল,—

—আমিও খুনে, তুমিও খুনে। অথচ, তুমি থাকবে খারাপ জায়গায়, আর আমি থাকবো ভালো জায়গায়—শুধু আমার তদ্বির করার লোক আছে ব'লে?

—বিলকুল তদ্বিরে হয় মাষ্টের,—তদ্বিরে হয়। আমিও 'সাহেব ওয়ার্ড' এই থাকতাম। কিন্তু তদ্বিরও তেমন হয়নি; আর আপনার মতন ইংরিজিও জানিনে।

বিশ্বেশ্বর শুধু বলিল,—আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্য নয় মাষ্টের,—আশ্চর্য্য কিছুই নয়। জেলের কানুন শুনলে অবাক হবেন তবে বলি শুনুন,—

—আচ্ছা নবী নওয়াজ, আমি যদি 'সাহেব ওয়ার্ড'এ না যাই,—আমি যদি বলি, এইখানেই থাক্‌বো?

নবী নওয়াজ শশব্যস্তে বলিল,—অমন কাজটি করবেন না মাষ্টের। এই নরকে মানুষ থাকে? দু'দিনে খাটিয়ে আর আস্ত রাখবে না।

বিনা পরিশ্রমে বিশ্বেশ্বরের দিন আর কাটিতে চাহে না, রাত্রে ঘুম হয় না। খাটুনির কথায় সে তাড়াতাড়ি বলিল,—

এরা আমাকে কাজ দেয় না কেন, নবী নওয়াজ? চুপ করে যে দিন কাটে না।

বিশ্বেশ্বরের আগ্রহ দেখিয়া নবী নওয়াজ না হাসিয়া পারিল না। বলিল,—

—কি কাজ পারেন আপনি? ঘানি টান্‌তে পাবেন? —ছোবড়ার দড়ি পাকাতে, ঘাস ছিলতে, মাটি কোপাতে পাবেন? পাথর ভাঙতে?

নবী নওয়াজ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

কাজের ফর্দ্দ শুনিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখ শুকাইল। বলিল, —আর কোন কাজ নেই?

—আর কি কাজ দেবে, শুনি! ছেলে পড়ানোর পাঠ তো এখানে নেই। এখানে থাক্‌লে এই কাজ। তবে 'সাহেব ওয়ার্ড'এ গেলে প্রেসে কাজ মিল্‌বে, খাটুনি কম। দিব্যি থাক্‌বেন। আর যদি হাঁসপাতালে দেয়, তা হ'লে তো—

নবী নওয়াজ দুইটি আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া কেল্লা ফতের ইঙ্গিত করিল।

গলা খাটো করিয়া বলিল,—ফল, দুধ, ডিম খান না কেন লুকিয়ে-চুরিয়ে। দু'দিনে শরীর সেরে যাবে। বান্দা-কেও তখন যেন মনে রাখবেন।

বলিয়া নবী নওয়াজ কৌতুকভরে দু'টি হাত জোড় করিল।

ঠিক সেই সময় সমস্ত কয়েদী হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে কেহ বাজাইতে আরম্ভ করিল থালা, কেহ মগ্, কেহ বা বাঁ হাত কাণে লাগাইয়া এবং ডান হাত

আকাশে তুলিয়া থাম্বাজ আলাপ সুরু করিল। আর তারই তালে-তালে জন কতক ছোঁড়া একটা হাত কাঁকালে আর একটা হাত মাথায় দিয়া কোমর ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিল।

সে এক বিপর্যয় কাণ্ড।

বিশ্বেশ্বর ও নবী নওয়াজ তখন ইহাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া এক কোণে দেওয়ালে পিঠ লাগাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর ফিস ফিস্ করিয়া বলিল,—এদের খাটুনি কি অল্প?

নবী নওয়াজ শুধু বলিল,—ওরে বাপ্!

কানাই ছোক্‌রা ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে,—একেবারে বুকের হাড় গোণা যায় এমন রোগা। অত্যন্ত ঢিমা তালে ভিড়ের বাহিরে বাহিরে সে যখন নাচে তখন মনে হয় একটি কলের পুতুলকে অনন্ত কালের জন্য দম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—এ নাচ আর থামিবে না, এমনি ঢিমা তালে ভিড় বাঁচাইয়া চলিবে।

কানাই একবার নাচিতে-নাচিতে ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—এ ছোক্‌রা কি ক'রে খাটে?

নাচিবার জন্য নবী নওয়াজের মনটাও উসখুস্ করিতেছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের আগমনের পর দিন হইতে কেন যেন ইহাদের সঙ্গে মিশিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল।

সে পরমোৎসাহে নৃত্য দেখিতে দেখিতে বলিল,—অভ্যেস হ'য়ে গেছে।

হাসি, গান, নৃত্য ও বাদ্যে ঘরের মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া গেল। এ যেন আর বন্ধ হইবে না।

এমন সময় বাহিরে কয়েক জোড়া বুটের শব্দ পাওয়া গেল।

ব্যস!—

চক্ষের পলকে সমস্ত গীত-বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। যে যার নিজের পুঁটুলি লইয়া নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। ইহারাই যে এতক্ষণ মাতামাতি করিতেছিল কাহারও মুখে তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। কেবল কানাই সকলের পিছনে বসিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁপাইতে লাগিল। এত দাপাদাপি তাহার রোগা শরীরে সয় না।

তখনি জেলার সাহেব জামাদার ও এক দল সিপাহী সঙ্গে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত কয়েদী সসম্ভ্রমে সারিবন্দী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।

জেলার সাহেব লোক খারাপ নয়। বাড়ীতে উগ্রমূর্ত্তি মেম সাহেব, সেখানে কাঠি করিবার উপায় নাই,—প্রায়ই বাহিরে-বাহিরে ঘোরে; খাবার সময় ভিজে বেড়ালটির মতো বাড়ী যায়,—বাহিরে কয়েদীদের মধ্যে আসিলেই মেজাজ রুক্ষ হইয়া ওঠে। তাহার দাপে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়।

জেলার আসিয়াই কাহাকেও বুঁটের গুঁতা দিয়া, কাহাকেও বেতের ছড়ি দিয়া খোঁচাইয়া পুঁটুলি খুলিতে আদেশ করিল।

সোনার বোতাম চুরি লইয়াই এই কাণ্ড।

এবং কি করিয়া কি হইল ভগবান জানেন, বোতাম বাহির হইল বিশ্বেশ্বরের খোলা বিছানার মধ্য হইতে।

বিশ্বেশ্বর তখনও ব্যাপারটি ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। সাহেব বেত উঁচাইয়া একেবারে তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ক্যায়সে চোরি কিয়া?

বিশ্বেশ্বর অবাক্!

সে শুধু নিষ্কম্প স্বরে বলিল,—I didn't.

সাহেব উঁচানো বেত নামাইয়া লইল। ইংরাজিতে বলিল,—তবে তোমার কাছে এলো কি ক'রে?

—জানি না।

সাহেব অনেকক্ষণ তীব্র স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরও সোজা তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া রহিল,—এতটুকু কাঁপিল না, একবারও চোখ নামাইল না।

বিশ্বেশ্বরের পাশেই নবী নওয়াজ দাঁড়াইয়া ছিল। সাহেবের চোখ গিয়া তাহার উপর পড়িল।

—তুম্ চোরি কিয়া, শালা।

নবী নওয়াজ দু'হাত জোড় করিয়া বলিল,—নেহি

সপাং করিয়া তাহার পিঠে বেত পড়িল।

সাহেব গর্জ্জন করিল,—আল্‌বৎ কিয়া।

নবী নওয়াজ আর্ত্তস্বরে বলিল,—নেহি হুজুর।

সাহেবের তখন রোখ চাপিয়া গিয়াছে।

—তব্ কোন্ লিয়া?—বোলো—বোলো—বোলো—জল্‌দি বোলো—

সাহেব নবী নওয়াজের মুখের উপর অবিশ্রান্ত বেত বর্ষণ করিতে লাগিল।

বেতের পর বেত খাইয়া নবী নওয়াজ তখন আর চেঁচায় না। খানিকক্ষণ নীরবে বেত খাওয়ার পর সে শুধু বিশ্বেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—ওহি লিয়া হুজুর।

সাহেবের বেত থামিল।

—তুম্ জান্‌তে হো?

—হাঁ, হুজুর।

সাহেব ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল,—liar.

নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া অসহায় কয়েদীর ভীরুতা লইয়া কৌতুক করিতে সাহেবের ভালো লাগে।

সে দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গীতে কোমরে দুই হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজিতে বলিল,—

—তোমার নাম বিশ্বেশ্বর?

—হ্যাঁ মহাশয়।

—তোমাকে নির্জ্জন সেলে বন্ধ রাখার হুকুম এসেছে।

জেলের নিয়ম বিশ্বেশ্বর জানে না;—চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিল,—Say, thank you.

বিশ্বেশ্বর রাগে গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কতদূর পড়েছ তুমি?

—এম-এ।

সাহেব চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—Oh my!

—কি করেছিলে তুমি? বোমা?

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—না। খুন।

সাহেবের চোখ আরও বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এম, এ, পাশ করিয়া মানুষ বোমা তৈরী করে, ইহাই জেলার জানে। তাহারা যে খুনের অপরাধেও জেল খাটিতে আসে এ ধারণা জেলারের ছিল না।

বলিল,—কি রকম?

বিশ্বেশ্বর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—স্ত্রীকে খুন করেছিলাম।

সাহেবের নিজের স্ত্রী ছয় ফুট লম্বা। নিজেই কখন খুন হয় এই ভয়ে সাহেবকে পালাইয়া বেড়াইতে হয়। স্ত্রীকে খুন করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বিশ্বেশ্বরের উপর সাহেবের শ্রদ্ধা জন্মিল।

আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল,—Splendid!

কিন্তু কয়েদীদের সুমুখে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া জেলার লজ্জিত হইল। তখনই কঠিন হইয়া বলিল,—তোমাকে টিকটিকিতে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম হয়েছে।

টিকটিকির কথায় বিশ্বেশ্বর ভয় পাইয়া গেল। বলিল,—কেন?

—কৈফিয়ৎ চাও?

বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া গেল।

সাহেবের গাম্ভীর্য্যের আবরণ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। সে বিশ্বেশ্বরকে সরাইবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

জেলার চলিয়া যাইতেই কয়েদীদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। কিন্তু কর্ম্মচারী যত নিম্নপদস্থ হয়, তাহার তেজ তত বেশী। জমাদারের হুঙ্কারে গুঞ্জন থামিয়া গেল।

জমাদার বিশ্বেশ্বরকে হুকুম দিল,—উঠাও তল্‌পী!

একটু আগে নবী নওয়াজ খবর দিয়াছিল, বিশ্বেশ্বরকে 'সাহেব ওয়ার্ড'এ পাঠানো হইবে। এখন হুকুম হইল টিকটিকির। টিকটিকির সহিত বিশ্বেশ্বরের কখনও সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, উহা ইংরাজি T এর মতো একটা যন্ত্র, যেখানে উলঙ্গ করিয়া বাঁধিয়া কয়েদীদের প্রহার করা হয়। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া উঠিল। তল্‌পী বাঁধিতে গিয়া বাঁধিতে পারে না।

টিকটিকির স্বরূপ জানে নবী নওয়াজ। ইতিপূর্ব্বে নিজে একবার সে-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। সে আর থাকিতে পারিল না। জমাদারের পা জড়াইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। লজ্জায় হাত দিয়া চোখ মুছিতে পারিল না। জমাদারের দিকে মুখ আড়াল করিয়া পুঁটলি হাতে লইয়া বলিল,—চলো, জমাদার সাহেব।

নবী নওয়াজ কান্নাও থামায় না, পাও ছাড়ে না। কাতরকণ্ঠে কেবলি বলে,—ওর কোনো দোষ নেই জমাদার সাহেব। ও চুরি করে নি।

অথচ এই নবী নওয়াজই বিশ্বেশ্বরকে চোর বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল।

জমাদারের ইয়া গোঁফ, তার সঙ্গে গালপাট্টা। রসিকতার ধার ধারে না। সে নবী নওয়াজকে বেতের খোঁচা দিয়া বলিল,—আরে, কেয়া জেনানাকা মাফিক রোতে হো, উল্লু; ইস্‌কো 'সাহেব ওয়াড' মে লে যাতা হায়। উস্‌মে রোণেকো কেয়া হুায়?

তবে সবই জেলারের রসিকতা?

নবী নওয়াজ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। ছাতা-পড়া দাঁত বাহির করিয়া সে বলিল,—দেখলেন মাষ্টের, আমি বলেছিলাম হুকুম এসেছে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের তখন কথা কহিবার অবস্থা নয়। সে জমাদারের পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

নবী নওয়াজ অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও দমে নাই। সে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বেশ্বরের একটা হাত ধরিয়া চুপি চুপি বলিল,—আমি সব ওয়ার্ডে যাই মাষ্টের। আবার বিকেলে দেখা হবে।

বিশ্বেশ্বর শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—আচ্ছা।

বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেল। নবী নওয়াজ এক দৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। যখন পিছন ফিরিল, তখন রোগা কানাই কোমর ঘুরাইয়া গান ধরিয়াছে,—

আমার প্রাণের রাধা কমনে গেল
গেল না বলে।
আমি যমুনাতে প্রাণ সঁপিব
হায়! হায়!—

বাকী লাইন কানায়ের মনে পড়িল না, সে শুধু শুধুই কোমর ঘুরাইতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ডজন থালা-বাসনও বাজিয়া উঠিল।

নবী নওয়াজ অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—চোপ্ শালারা।

এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কোমর ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিল,—

হায়, হায়, গেল না বলে—

(ক্রমশঃ)

বীমা-প্রসঙ্গ

'উপাসনা'র নিয়মিত লেখক বন্ধুবর শ্রীসুধীন্দ্র লাল রায়, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানীর লক্ষ্ণৌ শাখার কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত 'ওরিয়েণ্ট্যাল'এর অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত থাকিয়া তিনি যে বীমাভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, এতদিনে তাহা একটি বাঙ্গালী কোম্পানীর কার্য্যে লাগিল দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান' বাংলার গৌরব স্যর রাজেনের সৃষ্টি,—তিনি গুণের কদর বোঝেন। বাঙ্গালী কোম্পানীগুলির পতাকাতলে আমাদের বর্ত্তমান বন্ধুর ন্যায় অপরাপর গুণী বাঙ্গালীকে ক্রমে ক্রমে সমবেত দেখিলে আমরা খুশী হইব।

পুণার অ্যাডিসনাল সেসন্স জাজ শ্রীযুক্ত এন্, আর, গুণ্ডিলের আদালতে পিপ্‌লস্ ওন্ প্রভিডেন্ট এণ্ড জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সম্পর্কে যে মাম্‌লা সুরু হইয়াছিল, তিন মাস ধরিয়া শুনানির পর তাহা শেষ হইয়াছে। ২৫০০ দলিল এবং ২৩৮ জন সাক্ষ্য আদালতকে সাহায্য করিয়াছে। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের ২৩ জনের ১৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কারাদণ্ড দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিচারকের নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—I venture to express the hope that the legislature of this country will undertake suitable legislation to stifle a recrudescence of such pestilential companies like the one I have had the misfortune to deal with in this case.

ইতিপূর্ব্বে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির পরিচালন বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পবিচালক মণ্ডলীর সততা ব্যতিরেকে এই সব কোম্পানী চলিতে পারে না। বাংলায় এই প্রকার ২১টি প্রতিষ্ঠান আছে, ইহার মধ্যে ৭টি সাধারণ জীবন-বীমার কাজ করিয়া থাকে, ৫টি জীবন-বীমার সহিত বিবাহ-বীমার কাজ করেন, ৩টি অবসর-বীমা (retire-

ment) এবং ১টি বাৎসরিক বীমার (annuity) কাজ করেন। যাহাকে বলে dividing plan কিম্বা call system—তাহা অধিক প্রভাব বাংলা দেশে বিস্তার করিতে পারে নাই।

বীমা-বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরও অজ্ঞতা এত বেশী যে প্রভিডেন্ট কোম্পানীর দোষগুণ বিচার তো দূরের কথা, কোনও দুই কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস, বার্ষিক বিবরণী ইত্যাদি আদ্যন্ত পড়িয়াও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর—এ অবস্থায় এজেন্টের কথা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই। ফলে যাহা হয়, পুণার এই মামলা তাহার একটি উদাহরণ মাত্র। দেশবাসীকে বীমা-বিষয়ে শিক্ষিত না করিলে এ বিপদ হইতে রক্ষা নাই বলিয়াই মনে হয়।

ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান 'লয়ড স' কিছুদিন হইল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একটি আমেরিকান কোম্পানীর চাকুরিয়াদের সততা সম্পর্কে ইহারা দায়িত্ব নিয়াছিলেন। ইহাদের একজন মোট সাত লক্ষ পাউণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ফলে লয়ড্‌সের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
2, Wellington Lane, Dharamtala, Calcutta.

—তুমি আর আমি—

ইহা এখন আর গোপন করা যায় না, ওটীন এখন সকলেরই সুপরিচিত। অনেক স্ত্রীলোকেই এখন জানেন যে ওটীনের গুণাবলী এমন—যে ইহার ব্যবহারে অধিক বয়সেও নারীযৌবনসুলভ হাবভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়—এ সত্য আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতি রাত্রে ৫ মিনিট কাল ওটীন ক্রীম দ্বারা দেহ মার্জ্জনা করিলে দৈনিক স্বাভাবিক ক্ষয় পূর্ণ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

প্রতিদিন নিয়মিত ওটীন স্নো ব্যবহার করিলে দৈনিক রৌদ্রতাপ, বাতাস, বৃষ্টি, ধুলা, হাসি এবং কান্নাজনিত স্বাভাবিক ক্ষয় পূর্ণ করিয়া আপনার যৌবনোচিত সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বিকশিত করিতে পারিবেন।

ওটীনজাত দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ, এবং প্রসাধনব্যাপারে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে প্রাণিজাত কোনও পদার্থ নাই, এবং প্রস্তুতকালের প্রথম হইতে প্যাকিংকাল পর্য্যন্ত ইহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয়।

ওটীন ক্রীম—

রাত্রিকালীন ব্যবহারের জন্য—ইহা চর্ম্মকে পরিষ্কার, কোমল ও উজ্জ্বল করে।

ওটীন স্নো—

দিবাভাগে ব্যবহারের জন্য—ইহা রৌদ্র, বাতাস, ধুলা ও ঘর্ম্মের প্রতিষেধক ও দৈনিক ব্যবহার্য্য।

বাজারে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

UPAŚANA—Regd. No. C. 1695.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা]

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲] কার্য্যালয় [illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা । ফোন — [illegible] ২৯১৮ [প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

PHONE : CAL. 3418

OUR SERVICE WILL ... CONTINUANCE OF OUR CORDIAL RELATION

UPASANA PRESS

FINE ART, COMMERCIAL & VARIETY PRINTERS.
PUBLISHERS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

4-A, SARAT GHOSE STREET, CALCUTTA.

১লা শ্রাবণ /১৩৩৫

ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোম্পানী থেকে আমাদের উপাসনার ও মাসিক পত্রিকার সব ব্লকের কাজই আমরা করাই। ফোটোগ্রাফের আলো ছায়া ও বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্য সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান যত বেশী— ব্লকের কাজ তাঁদের হাতে তত বেশী ভাল হ'বে। এঁদের সে জ্ঞান আছে ব'লে এক রঙ বহু বর্ণের লাইন বা হাফটোন ব্লক নিশ্চিন্ত মনে এঁদের কাছে তৈরী করতে দিতে পারা যায়। এক রঙের আঁকা ছবি থেকে উপাসনার প্রচ্ছদপট যে এমন রঙীন করে ছাপবার ব্লক— এঁরা দিতে পারবেন— এ আশা করিনি।

এই শিল্পকলায় এঁরা বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন— এ ভরসা আমার আছে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, উপাসনা

THE INDIAN PHOTO ENGRAVING CO.,

Process Engravers & Colour Printers

217, Cornwallis St., Calcutta.

Telephone—B. B. 2905. Telegram—"Duotype"—Calcutta.

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—

বিষয়-সূচী

পৌষ—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

পৌষ—১৩৩৮

মহিলা বান্ধব ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলের জন্য

আদর্শ পাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

প্রধান সম্পাদিকা—

মিস্ রূত, ই, রবিনসন

বাঙ্গালোর।

ক্যানারীজ ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিস্ এম, এম, বগ্বী,

কোলার টাউন।

হিন্দী, উর্দ্দু, ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিস্ চেষ্টার,

মোরাদাবাদ, ইউ, পি,

বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিসেস, বিকেন ও মিস হালদার,

পাকুড়, ই, আই, আর, লুপ।

মহারাষ্ট্র ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিস ক্লেনার,

ক্লাব ব্যাক রোড।

বাইকুল্লা বোম্বাই।

তামিল ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিসেস এইচ, এফ্, হিলমার,

মেথোডিষ্ট পাবলিশিং হাউস, মাদ্রাস।

বাঙ্গলা ভাষার অনুবাদক—বাবু এস্ বিশ্বাস।

এক কপি মহিলা বান্ধব একই ঠিকানায় এক বৎসরের জন্য

মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ বার আনা।

মাতা মেরী

২৪শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩৮ | ৯ম সংখ্যা

স্মৃতির পূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ক'দিনের তরে বুঝি এসেছিল বাপেরই বাড়ীতে,
প্রত্যহ ঊষার সঙ্গে এই ঘাটে করে' যেত স্নান ;
অত ভোরে কে উঠিবে ? শুনি নাই কথাটি কহিতে,
স্নানান্তে ফিরিয়া যেত পদচিহ্নে আঁকিয়া সোপান।

সরসীর পদ্মদল সাথে সাথে মেলিয়া নয়ন
আসন্ধ্যা রহিত চাহি' বুঝি-বা দেখিতে আর বার !
পাপিয়ার অভিযোগ তারস্বরে কাঁপাত গগন,
চঞ্চল সফরীদল গন্ধজলে করিত বিহার।

বহুদিন হ'ল গত—মনে নাই কি ছিল বয়েস,
দেখেছিনু রূপ শুধু—যে রূপ ভুলায় অন্য কথা !
বৎসর অতীত প্রায়, আজিও ভরিয়া অন্তর্দেশ
তার মনে আনে শক্তিময়ী করুণার ব্যথা।

কি কাজ সাক্ষাতে আর—সুখে থাক্ স্বামীর ভবনে ;
তিনটি দিনের পূজা কেন যে, বুঝেছি তাহা মনে।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামকে লইয়া ললিত যে কি করিবে তাহা মনে আসিতেছে না ; অভ্যর্থনা সম্ভাষণ সবই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে হইতেছে—শেষে বলিল, "ছোটদা, কাকার এত বেশী অসুখের খবর তুমি আমায় দাওনি কেন ? আমার যাওয়া উচিত ছিল ; যাক্ সে কথা—এই নাও আমার কাপড়খানা পর—এ শাড়ী কার ? কি হয়েছিল, আমায় সব বল এখন। এসে শুনলাম তুমি এসেছো, বাবার সঙ্গে কি টাকা নিয়ে বচসা হওয়ায় ইন্দ্র কাকা কলকাতা গেছেন আর তুমিও রাগের মাথায় কোথায় চলে গেছ—এর বেশী জানার চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারিনি।—আমাদের ওস্তাদজীও চলে গেছে আর কে খবর দেবে আমায় ? নাঃ, আগে চল স্নান করে নেবে বেশ করে, দালানে জল দিয়ে গেছে—আমি দাঁড়াব সেখানে—চল ; পায়ে কি হয়েছে দেখি ? হোক ধুলো—এঃ একবারে থান্ থান্ হয়ে গেছে—কি করেছ ! আগে স্নান করে নাও তারপর ওষুধ দেওয়া যাবে—আছে আমার কাছে।—" এতদিনের শান্ত মুখচোরা ললিত আজ দুর্দ্দান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে ; শ্যাম বহুপূর্ব্বে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, না করিলে তাহার নিষ্কৃতি থাকিত না।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শ্যামের আগমন-বার্ত্তা দ্রুত গতিতে রোগশয্যায় ব্রজকিশোরের নিকট পঁহুছিল—আপাদমস্তক কম্পিত কলেবর মেতা পাইকের মুখে এই সংবাদ, স্তব্ধ, হতভম্ব ব্রজকিশোর শুনিলেন। মেতা রাজুর সেই নৈশ আক্রমণের সহায় ছিল। ব্যাকুল ভয়ার্ত্ত মনে একরাশ শক্তি সংগ্রহ করিয়া ব্রজকিশোর অন্তঃপুরে যেখানে চারুবালা, সেই একই সংবাদশ্রবণে বিমূঢ় অবস্থায় অলস হস্তে শাড়ীর আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন, টলিতে টলিতে গিয়া উদ্‌ভ্রান্ত আবেগে তিনি পত্নীর পা জড়াইয়া ধরিলেন, "দাও টাকা, আর দেরী কোরো না ;—দাও আর ছল ওজরে দরকার নেই—দাও, টাকা দাও—কোন কথা বলবার আগে ওকে টাকা দিয়ে দাও।"—"কর কি ? কর কি ? সর্ব্বনাশ !" চারুবালা বিদ্যুৎগতিতে পা ছাড়াইয়া লইলেন, "আমাকে ডেকে পাঠাতে হয়, এই শরীর নিয়ে—"

স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ও মাগো কি হবে ! দাদা, দাদা, ও যুধিষ্টির !" কেহ সে দিকে ছিল না, কোন সাড়া পাইলেন না ; তখন নিজেই দ্রুতপদে গিয়া দুই তিনটি বালিশ আনিয়া কক্ষতলে মেজের উপর স্বামীকে সযত্নে শয়ন করাইলেন। ব্রজকিশোর তখন বাক্‌শক্তিরহিত, কেবল চক্ষুর ভাষা গভীর মিনতি জানাইয়া পত্নীকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে।

চারুবালা স্বামীর শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "ভেবো না, আমি টাকা দিচ্ছি—যেখান থেকে পারি দেব—তুমি সুস্থ হও আগে—।"

রাগ, হিংসা, অভিমান, স্বার্থ সকলকে ছাপাইয়া, আকুল প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া, অন্তরে জাগে চিরন্তন স্ত্রীজাতি। নারী চির-জীবন এই অন্তরের 'স্ত্রী'কে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিতে পারে না ; কল্যাণ-চিন্তা মূর্ত্তি ধরিয়া সেবারূপে ফুটিয়া উঠে ; সে সেবা বাধা পাইলে অন্তরে অদৃশ্য অগ্নি-রূপী অভিমান জ্বালাইয়া সারা জীবনকে অবলীলায় তাহাতে আহুতি ঢালিয়া দেয়। চারুবালার কর্ণে অবিরাম বাজিতেছে, "ওগো টাকা দাও" চক্ষে স্বামীর পাণ্ডুর শীর্ণ-মুখের সেই করুণ মিনতি-ভরা চাহনি।

সুধীর বাবুর আমোদের জাহাজখানা হঠাৎ ঘচাৎ করিয়া চড়ায় ঠেকিয়া গেল ; তলদেশ হইতে শীর্ষ-পার্শ্ব পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিয়া দুলিয়া কাঁপিতেছে। আজীবন ছোট ভগ্নীটিকে তিনি অবজ্ঞাই করিয়া আসিয়াছেন ; আজ যে ঘটনাসমষ্টি তাঁহাদের জীবনকে জটিল করিয়াছে, তাহার মূল পত্তন হইতে তিনি ভগ্নীকে নিজের খেলনা, হাতের যন্ত্র জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত ; ছোট শিশুকে লোকে যেমন উৎসাহ দিবার জন্য 'বাহবা বাহবা' করে, বালকের কৃতিত্বে বয়োজ্যেষ্ঠেরা

যে বিজ্ঞতাব্যঞ্জক বিস্ময়ভাব দেখান, সুধীর বাবুর এতাবৎ আচরণ সেই জাতীয়; আজ হঠাৎ প্রজ্বলিত অঙ্গারখণ্ডের অন্তর্নিহিত ভীম বিভীষিকা প্রকাশ করিয়া চারুবালাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সুধীর বাবুর নেশার ঘোর শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; অক্ষয় তখন অনুপস্থিত।...কে যেন সুধীর বাবুকে বুঝাইয়া দিল—আজ সমানে সমানে—প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞান করিলে তাহারই হস্তে স্বীয় অমোঘ মৃত্যুবাণ তুলিয়া দেওয়া হয়। চারুবালা সন্ধি বিগ্রহ উভয়েরই জন্য প্রস্তুত, অবিচলিত ভাবে, স্থির কণ্ঠে আসিয়া ডাকিলেন, "দাদা, নেশা কি কেটেছে এখন?"

সুধীর বাবু কষ্ট-হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঃ, নেশা আবার কি হয়েছে? কি বলছ, বল।"

চারুবালা—"দলিল এনেছি; টাকা দাও।"

সুধীর—"তাহলে ওই শাড়ী-পরাই—শ্যাম? আচ্ছা ডাকো তাকে, এম্নি টাকা দেওয়া হয় না; রসিদ চাই, তার রসিদ দেবার কি অধিকার আছে তার প্রমাণ চাই; সহরে যেতে হবে, কলকাতাও যেতে হবে; অমনি অমনি টাকা দাও, আর দিয়ে দিই? আঁটঘাট বেঁধে তবে দেব; ওই শাড়ী-পরা মানুষকে আমার এক তিল বিশ্বাস হচ্ছে না;—আর দলিল তোমার কাছেই থাক্—আমি ওকে টাকা দিয়ে তারপর তোমার কাছ থেকে যখন হয় দলিল চেয়ে নেব। তোমার আমাকে বিশ্বাস না থাকতে পারে, আমার তোমাকে বিশ্বাস আছে। তোমরা শেষটায় ফ্যাসাদে পড় এমন কাজ আমি জেনে শুনে হতে দেব না; ডাক তাকে, জেরা করি।"

চারু—"অত করবার এখন সময় নেই দাদা, মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, তুমি টাকা দাও; ফাঁকি পড়তে হয় আমরা পড়ব। এখুনি টাকা দিতে হবে, আর কিছু বুঝি না, বুঝতে চাইনা; বাবার তালুকমুলুক কিছু চাই না আমার—দাও, সে দানপত্রও ফিরিয়ে দাও; আর এই দলিল নিয়ে টাকা দাও—।"

সুধীর—"আমার কথা শুনেই দেখ না, ক্ষতি কি তোমার? যা বলি তাই কর।"

চারু—"না, না, তুমি টাকা দাও।"

সুধীর বাবু টাকা সঙ্গে আনেন নাই; তাঁহার অভি-প্রায় এই ছিল যে, দলিলে টাকা উশুল দেওয়াইয়া শ্যামকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় ওজর আপত্তি আগে হইতেই মনে ঠিক করা ছিল। কলিকাতা গিয়া সুবিধামত ভাবে শ্যামকে কিছু হয়রাণ করিয়া টাকা দিতে হয় দিবেন; হয়রাণ করার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে; হয়রাণ হইলে লোকে তাঁহার সুবিধা করিয়া দেয়, ইহাই তাঁহার অভিজ্ঞতা। কিন্তু ব্রজকিশোরের অসুখ হইল তাঁহার সহায়; দলিলখানি আশাতীতভাবে সম্পূর্ণ চুক্তি করাইয়া লইতেই তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন; এখন বাকী কাজটুকু—শ্যামকে টাকা দিবার জন্য, নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া। দানপত্র সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য এতটা অসাধু ছিল না—কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে, এই সময়ে ভগ্নীটী বেঁকিয়া বসাতে তিনি একটু ফাঁপরে পড়িলেন; সঙ্গে অনুমান দেড় হাজার টাকা মাত্র ছিল—রেজেষ্ট্রী ইত্যাদি আন্দাজ করিয়া; অতএব এখন তাঁহাকে রাগের ভাণ করিতে হইল। দানপত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাও; পরে পস্তাবে, তখন দাদাকে আবার অনুরোধ কর্ত্তে এসো না।"

চারুবালা দানপত্র তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "টাকা?"

সুধীর—"টাকা নেই।"

চারুবালার চক্ষুতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি জান, আমি সব কর্ত্তে পারি; টাকা তোমার কোমরে আছে, তুমি আসামাত্র আমায় বলেছ,—এখানে আমাদের জোর—জোর করে টাকা নেব—দিয়ে দাও।—"

সুধীর বাবু ভীত হইলেন; তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত সড় সড় করিয়া পায়ের চেটোতে নাবিয়া গেল—এখানে গুম খুন করিলেও বাধা দিবার কেহ নাই, সুযোগ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান; আর চারুবালা এখন আর সে চারুবালা নাই, তাহা তিনি বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছেন। কোমরে একটি কাপড়ের থলিতে টাকা ছিল; তাহা বাহির করিয়া ভগ্নীর প্রতীতি জন্মাইবার জন্য—কোমরে হাত দিতেই চমকিয়া উঠিলেন; একে ভয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম তাহার পর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল; এত আকস্মিক ও অকপট এই পরিবর্ত্তন যে চারুবালা বলিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে? চুরি হয়েছে

নাকি ?" সুধীর বাবু কোনও মতে এইটুকু উচ্চারণ করিলেন "হুঁ।"—দুইজনেরই কণ্ঠস্বর চাপা, ভারি। সুধীর বাবু কত টাকা, কি বৃত্তান্ত তাহা আর ভাঙ্গিলেন না; যখন চুরি গিয়াছে, তখন যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন—দেড় হাজারও যা আর লাখও তাই। টাকার পরিমাণ ভগ্নীর অনুমানের উপরই রহিল; চারুবালা অত টাকা নেই মানে বুঝিয়া ছিলেন, বুঝি পুরো টাকা হইতে পাঁচ দশ হাজার বা কিছু কম আছে।—সুধীর বাবু নিমেষের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"অক্ষয়—আর কেউ নয়।" সত্যই তিনি অক্ষয়কে সেই থলি হইতে কিঞ্চিৎ উপহার দিয়াছিলেন, সে ভিন্ন আর কেহ এই থলির অস্তিত্ব জানে নাই, এবং সে-ই সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বস্তুতঃ অক্ষয় সেই থলি কুড়াইয়া পাইয়াছে এবং পাইবামাত্র চিনিয়াছে, থলি কাহার। কিন্তু মনে আশা, যদি হাতে আসিয়াছে, বিঘ্ন না ঘটাইয়া হাতে থাকিতে চাহে, তাহাতে অযাচিতভাবে বাঘড়া দেওয়া কেন; আর যদি সন্দেহ তাহার উপরে পড়ে তখন সে সাধু সাজিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ পাইবে, বলিতে পারিবে—মাতাল মানুষ, পাছে আবার হারাইয়া অন্য কাহারও হাতে পড়ে, সেইজন্য কাছে রাখিয়াছিলাম—এখন এই ফেরৎ নাও; আর ভাগ্য দেবী যদি সত্যই সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়, দুঃখপ্রকাশ অধিক পরিশ্রমসাধ্য নহে—আর ভাগ্যদেবীর এতাবৎ কার্য্যকলাপে তাঁহার সুমতি হইয়াছে বলিয়াই অক্ষয়ের অনুমান।

চারুবালা গোলমাল বাহিরে যাইতে দিলেন না; কেহ কিছু জানিল না; যুধিষ্ঠিরকে স্বামীর নিকট বসাইয়া তিনি অক্ষয়কে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন; ভাইকে চক্ষুর আড়াল করিতে তাঁহার ভরসা হইতেছে না। অক্ষয় কক্ষে প্রবেশ করিতেই, তাহাকে দৃষ্টি-বাণে বিদ্ধ করিয়া চারুবালা কঠোর স্বরে বলিলেন—"তোমার এত বড় বুকের পাটা, লাখ টাকা চুরী করে বসলে; ভাল চাও তো দাও বার করে! এখুনি দাও—না হলে গায়ের চামড়া আস্ত থাকবে না; বের কর কোথায় রেখেছ। আইন আদালত পরে; আমি যদি এখুনি টাকা না পাই, তোমায় জ্যান্ত এ ঘর থেকে ফিরতে হবে না জেনো।" কথাগুলি যে প্রচ্ছন্ন শক্তিতে কত তীব্র তাহা অক্ষয়ের ব্যবহারে প্রকাশ পাইল; ধুতির ভিতর হইতে সে থলিটি বাহির করিয়া দিল। সুধীর বাবু নোটগুলি গণনা করিবার ভাণে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "আর বাকী কোথায়? এ-যে দেড় হাজারও পুরো নয়।"

অক্ষয়—"আর নেই।"

চারু—"নেই তোমার মুণ্ডু! তুমি কাল-সাপ—লাখ টাকার মধ্যে কেবল হাজার—তোমার নেহাৎ মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি; যাও শীঘ্র নিয়ে এসো বাকী টাকা; দাদা তুমি সঙ্গে যাও, চোখের আড়াল কোরো না চোরটাকে। আর যদি দুজনে ষড়যন্ত্র থাকে, যুক্তি করে সরে পড়, প্রাণ নিয়ে পালাও। আমি আর তোমাদের ভরসা কর্চ্ছি না। আগে থেকে যদি চেষ্টা কর্ত্তাম।"

সুধীর বাবু অক্ষয়ের সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন; চারুবালা আবার দরজার নিকট হইতে তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"যদি টাকা ফিরিয়ে আন এখুনি, তা'হলে আমি আর উচ্চবাচ্য করব না।" চারুবালা এই বলিয়া একাকী কিয়ৎকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন। এদিকে সদর মহল অতিক্রম করিতেই, সুধীর বাবু অক্ষয়কে অতি সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন,—"এই পাঁচশো টাকা দিচ্ছি, এই মুহূর্ত্তে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা কর; সেখানে তাকে রেখে সটান্ কলকাতা; আমার সঙ্গে সেখানে দেখা হবে, আমার ঠিকানা তুমি জান; আর গোলমাল না করে, চট্‌পট্ সরে পড়। এদিকে ব্যাপার বুঝছো? Transportation case হয়েই আছে; তুমি সামনে না থাকলে আমি সামলে নেব, কোন চিন্তা নাই; শেষে ঠিক হয়ে যাবে; দাঁড়িও না, যাও।" এই বলিয়া অক্ষয়ের হাতে কতকগুলি নোট গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

অক্ষয় দুর্ব্বল ভাবে একবার বলিল, "কিন্তু অত টাকা ছিল না।"

সুধীর বাবু তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—"তার সাক্ষী কে? যাও, পরে ঠিক হয়ে যাবে সব; দুঘণ্টা আমি কাউকে দেখা দিচ্ছি না। এরই মধ্যে তুমি অন্তর্দ্ধান

হবে।" সুধীর বাবু দ্রুত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; অক্ষয় নিজের পথ দেখিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

ব্রজকিশোরকে তাঁহার শয়নকক্ষে শয্যার উপর শয়ন করান হইয়াছে; কবিরাজ মহাশয় আসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসিয়া আছেন; ব্রজকিশোরের বাক্-শক্তি অনেকটা ফিরিয়াছে; স্ত্রীকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বলিলেন, "টাকা পেয়েছ? আমার সামনে শ্যামকে আন; ডাক তাকে এইবার, ললিতকেও ডাক।" চারুবালা—"আসছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্যাম ও ললিতের মধ্যে কথাবার্ত্তা বেশ প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে; অবশ্য কথা বলিবার বেশী ললিতেরই; বিভোর বক্তা, তাহার প্রথম জীবনের নির্ব্বাচিত ঈপ্সিত সাথীকে কাছে পাইয়া, উচ্ছ্বাসের আবেগে, নিজের উত্তেজনায়, শ্রোতার সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে, আত্মহারা। প্রতি আশা, প্রতি বিশ্বাস, প্রতি চিন্তা, প্রতি অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে ঝালাইয়া লইবার সুযোগ, এক মহান্ ক্ষণ, তাহার জীবনে সমুপস্থিত; নিজের ব্যক্তিত্বকে নগ্ন করিয়া দেখাইতে পারায় পূর্ণ তৃপ্তি আছে। হরিমতীর কন্যা, হারাধন, রাজু, অনুতাপ, সংশোধনে অক্ষমতা, দুর্ব্বলতার ইতিহাস, সকলই বিবৃত হইয়াছে। শ্যাম তাহার শ্রীনগরে আসা হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী সংক্ষেপে গোচর করিল; রাজুকে সে এখন চিনিয়াছে; তাহারই বিষয় লইয়া দুইজনেরই চিন্তা এক প্রণালীতে চলিয়াছে; কথা সবেমাত্র বন্ধ হইয়াছিল; রাজুর জন্য কি করা যায়, উভয়েরই মনে তাহার আন্দোলন। শ্যাম ললিতের কথা ভাবিতেছে—ললিতকে তাহার ভাল লাগিয়াছে—তাহাকে নিজের আড়ালে রাখিয়া সমস্ত জীবন চলিতে হইবে—এই সংকল্প তাহার মনে স্বতঃই স্থির। ললিতও ভাবিতেছিল, "ছোটদার টাকার জন্য কি করা যায়—বাবার অসুখ, কাকে বলি?" এই সময় ভেজান দরজা ঠেলিয়া চারুবালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ললিত চমকিয়া উঠিল, শ্যাম বলিল, "জ্যাঠাইমা?" চারুবালা—"হ্যাঁ বাবা, আমি তোমারই কাছে এসেছি।—ওঁর বড় অসুখ বেড়েছে; বাড়ীতে বিপদ, এর মধ্যে চোর ডাকাতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে—আমি মেয়ে মানুষ কোন দিকই বা সামলাই; তাই তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি;—এই আমার লোহার সিন্দুকের চাবী নাও, আমার গহনাপত্র ছাড়া নগদও দশ বার হাজার আছে—সব তোমার হাতে থাক,—তুমি একবার গিয়ে ওঁর সামনে বলবে, জ্যাঠাইমা আমার সব টাকা দিয়েছেন; তোমার টাকার জন্যই ওঁর অশান্তি আর সেই ভাবনায় রোগ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। কেন জানি না, আমি বড় ভরসা করে এসেছি—অন্যায় হলেও তুমি আমার কথা ঠেলবে না। বল, রাখবে?"

শ্যাম—কেন, ইন্দ্রকাকা যে টাকার জন্যে কলকাতা গেছেন; সুধীর বাবু এখানে এসেছেন; তবে কি টাকা সেখানে পাওয়া গেল না? আর যদি দু পাঁচ দিন দেরী হয়ই, তার জন্যে চাবী রাখার কি দরকার; টাকার জন্যে এত ভাবনা কেন? জ্যাঠামশাই একটু সুস্থ হ'ন আগে, তখন হবে।

চারু—না বাবা তুমি বুঝছ না; লজ্জার কথা আর কি বলব, এখন সময় নেই; টাকা মোটেই হাতে নেই; ছিলও না, যোগাড়ের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কি যে হ'ল সব ধাঁধাঁর মত ঠেকছে। এখন এই চাবী তোমার কাছে জামিন থাক্—তুমি ওঁকে গিয়ে কথাটা বলে এসো; কষ্ট থেকে ওঁকে অব্যাহতি দাও।

শ্যাম—"টাকা নেই একবারে তা আমি ভাবিনি। যদি অন্য কেউ হাতিয়ে থাকে বলুন উদ্ধারের চেষ্টা করা যাবে। আর যদি জ্যাঠামশাই নিজে নষ্ট করে থাকেন, তাহ'লে আমাদের ভাগ্য। ভাগ্যের সঙ্গে ঝগড়া চলে না। বাবার কাছে মৃত্যুর সময় কথা দিয়েছি বলেই, আমি ব্যস্ত হয়েছিলাম। আগে থাকতে সব খোলসা করে বল্লে সবাই মিলে যা'হয় একটা উপায় স্থির করা যেত। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যে টাকা দেবার মৎলব নেই। তাই আমাকে বনবাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি অতটা খারাপ নয়; কেবল যোগাড়ের সময় পর্য্যন্ত আটকে রাখা, তাই নয় কি?" চারুবালা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বে শ্যাম আবার বলিল—"তা চাবির কোনও দরকার নেই; আমি বলছি গিয়ে, চলুন।" ইহার আগে শ্যাম কথা কহিতেছিল,

কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া নহে। অনেকটা নিজের মনের সঙ্গে যেন।

চারুবালার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ; তিনি শ্যামের কাছে আসিয়া চাবির রিং তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"তোমার কাছে থাক্; এসময়ে তুমিই আমার ভরসা; তোমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত। আমার পেটের ছেলে নেই; তোমার মার দুটি আছে, আমি কি একটি পাব না?"

ললিত এতক্ষণ স্থির হইয়া সব শুনিতেছিল, এইবার শ্যামের নিকট আসিয়া তাহার হাতে আর একটি বড় চাবি দিয়া বলিল, "ছোটদা, ওই লোহার সিন্দুকে আমার মার সমস্ত গহনা, আর হাতখরচের টাকা জমান আছে। সে কম নয়। এ সময় কাজে লেগে যাবে; চাবি তুমি নাও।"

চারুবালা ললিতের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্যামকে শীঘ্র আসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্যাম ললিতের কথা ভাল করিয়া শুনে নাই।

ললিত শ্যামের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া বলিল, "ছোটদা, ভাবছ কি? তুমি বাবাকে একবার বলে এসো—আমি তোমার টাকা ধার করেও যোগাড় করে দিতে পার্ব্ব; তা ছাড়া আমার হাতে মা'র আর ওঁর গয়নাও রয়েছে। তারপরও যদি আমার কিছু থাকে, সে সব তোমার; তুমি যা হাতে করে তুলে দেবে তাই নেব, শপথ করে বলছি। এখন দাঁড়িও না, চল বাবার কাছে—আগে ওঁকে সামলান দরকার। এই সুধীর বাবুটি একটি সাক্ষাৎ নরপিশাচ, ওঁর চক্রান্ত আমি অনেক বুঝতে পেরেছি। তাঁর কবল থেকে সবাইকে বাঁচতে হবে।"

শ্যাম—আমি সমস্ত বুঝতে পার্ছি—চল এখন। অন্যমনস্ক ভাব সে দূরে ঠেলিয়া দিল। এতক্ষণ নারী-জীবনের ব্যর্থতা বেদনাপ্লুত একটি মূর্ত্তি তাহাকে বিহ্বল করিতেছিল—"আমি সব বুঝতে পারছি" এ কথা সে ললিতকে বলে নাই নিজের মনকেই বলিয়াছিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শ্যাম বলিল—"এ সময় ইন্দ্র কাকা থাকলে বড় সুবিধা হত, ও লোকটা খাঁটি।"

ললিত—"সে সব ভাবনা আমার; আমি তাঁকে শীঘ্র আসবার জন্য খবর পাঠাচ্ছি। আর ততক্ষণ মুখুয্যে আছে ওই বুড়ো খাজাঞ্চি—সেও বেশ চালাক লোক আর খাঁটি; তাকেই কাল সহরে পাঠাব টাকার চেষ্টায়, সে আমায় একটু ভালও বাসে। তার একটি মা-মরা ছেলে আমার বয়স হয়ে মারা যায়, বুড়োর সংসারে আর কেউ নেই। সে সব ভার আমি নিয়েছি। তুমি কেবল বাবাকে কোন মতে শান্ত কর আর সুধীর বাবুটিকে দাবিয়ে রাখ—বুঝলে ছোটদা?" ব্রজকিশোরের শয়ন-কক্ষের দ্বারের নিকট শ্যাম চাবিগুলি ললিতের হাতে দিয়া বলিল—"তোমার কাছেই রাখ; আমার কাছে বড় হারিয়ে যায়।" তার পর তাহারা রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল।

ব্রজকিশোর একটু সুস্থ হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় আর একবার ঔষধ সেবন করাইয়া, 'আশু নিরাপদ' মত প্রকাশ করিয়া গেলেন; যাইবার সময় ললিত ও শ্যামকে নিভৃতে বলিয়া গেলেন, "প্রাণ ও দেহের সম্পর্ক 'নলিনীদলগত জলমতি তরলং' অতএব বিষয়াদি ব্যাপারের অনুষ্ঠানে দীর্ঘসূত্রতা অভিপ্রেত নহে।" শ্যামকে সেবায় নিরত দেখিয়া চারুবালা আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন; ভ্রাতার অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন। ললিত কাছারী-বাড়ীর দিকে মুখুয্যের সাক্ষাতাভিলাষে চলিয়া গেল।—ললিতের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। মুখুয্যে জোরের সহিত আশ্বাস দিয়া বলিল "খোকা, এ আর শক্ত কথা কি? তবে ইন্দ্র আসুক, তার পরামর্শ না নিয়ে কাজ করলে তার মনে কষ্ট হবে; আর আমি কালকে লোক দিয়ে চিঠি সদরে পাঠাব, সেখানে তাকে দিয়ে আসবে—দুদিনে ইন্দ্র যদি এসে না পড়ে, তখন দেখা যাবে। গয়নাগাটির কিছু দরকার নেই—তাতে মান খোয়ান। বুড়ো কর্ত্তার আমলে ধারকর্জ্জ অনেক কর্ত্তে হয়েছে—কখন আটকায় নি—কিছু ভেবো না।"

কর্ত্তার অসুখ বাড়াবাড়ি। কাছারীতে কাজকর্ম্ম একরকম বন্ধ; গল্পগুজবের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক।—ললিত চলিয়া আসিল। ব্রজকিশোর যদি ইন্দ্র সরকারকে লুকাইয়া ধারের চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কোন অসুবিধাই ছিল না; কিন্তু পীড়া যে সেইখানেই। আর সুধীর বাবুর যে কোন কারসাজি ছিল না তাহা নহে।

শ্যাম ও ললিত খাইতে বসিয়াছে—চারুবালা দুইজনের আসন ঈষৎ তফাতে করাইয়াছিলেন, ললিত আসনখানি

টানিয়া ঘেঁসিয়া বসিল। ভ্রাতার জন্তও আসন পাতা হইয়াছে।—দাসীরা এদিক ওদিক দেখিয়া আসিয়াছে; চারু-বালা উদ্বিগ্ন—আবার কি নূতন কেলেঙ্কারী ঘটিবে, শেষে লোক জানাজানি আটকান যাইবে না—কিন্তু অন্তরের ভাব মুখে প্রকাশ নাই। এমন সময় সুধীর বাবু সশরীরে আবির্ভূত হইয়া কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আসনে বসিয়া বলিলেন, "দাও আমায় খেতে দাও, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে; ব্যবস্থা একেবারে করে এলাম; পাল্কী নয়, পাঠক না ঠক্‌ঠক্ কে এক বেটা আছে তারই গরুর গাড়ী; তারও আবার ঘরপোড়া, টাকাচুরী এই সব মামলা আছে, সহরে একদিন থেকে তদারক করে যেতে হবে। হ্যাঁ আর সে ছোঁড়াটা পালাল, শেষ পর্য্যন্ত; যেমন সব লোক জোটাও তোমরা, আমি কি অত জানি; তোমা-দের নিজের লোক, আমিও তাই বিশ্বাস করে ফেলেছি; এখন আর তার ভবিষ্যৎ মাটী করে কি হবে, সম্পর্ক একটা আছে; নিজেদেরই ঢোল বাজান। তবে আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা কর্ব্ব; যদি পাই সে আমাদের বরাত; দলিল অবিশ্যি তোমার কাছেই থাক্, আমি এখন চাই না।"

চারুবালা কোন উত্তর দিলেন না। সুধীর বাবু আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। শ্যাম ও ললিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও একটা নূতন চক্রান্তের শেষ অঙ্ক, এইটুকু উপলব্ধি করিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। শ্যাম জ্যাঠাইমার মুখভাব অবলোকনে প্রশ্ন করিতে বিরত হইল; ললিত তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "ছোট দা, ওকে ইন্দ্র কাকা আসা পর্য্যন্ত যেমন করে হোক আট-কাতে হবে; হয় তুমি বল, না হয় আমিই স্পষ্ট করে বলি সে কথা।" উত্তরে শ্যাম তাহাকে চারুবালাকে লক্ষ্য করিতে বলিল ও নিষেধসূচক ভ্রূকুটি করিল। চারুবালার মুখ তখন বাসি মড়ার মতন সাদা আর ছোট হইয়া গিয়াছে—বিস্ফারিত নেত্রে পলক নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর নিশীথে, নিদ্রা আর জাগরণের মিশ্রিত অবস্থায় ব্রজকিশোর ছটফট করিতেছেন; হঠাৎ সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, চারুবালা তাঁহার মুখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন; মুখখানি বড় কাছে, বড় প্রাণময়, জীবন-রাজ্যের আহ্বানে ভরা; সত্যই তাঁহার স্ত্রী বড় সুন্দরী; ললিতের মাতাও সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু সে যেন পটে আঁকা, মরিয়াও সে সৌন্দর্য্যের কোনও ক্ষতি হয় নাই; তাহাতে মনের মধ্যে এমন বেদনা-পুলক, বাসনা-তৃপ্তি দোলা খায় না; চারুবালা যেন প্রাণে টল্‌টল্, ভঙ্গুর, নশ্বরের বার্ত্তা নিয়া অন্তরের দ্বার অবারিত করিয়া লয়। অপেক্ষা রাখে, ব্যাকুল হয়। ব্রজকিশোরের অন্তরের হাহাকার কণ্ঠে বক্ষে ঠেলিয়া উঠিল, নীরবে। স্বামীকে সুপ্তোত্থিত দেখিয়া চারুবালা মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুমি জেগেছো? দেখি ওষুধ খাওয়াই। কালকে সহর থেকে ভাল ডাক্তার এসে পৌছবে। কত বলেছি আগে—একজন ভাল ডাক্তার এনে গ্রামে রাখ; ডাক্তারখানা রয়েইছে; গ্রাহ্য করোনি, সে আমার কপাল। কেমন লাগছে এখন?" ব্রজকিশোর চারুবালার একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "ঠিক করে বল, কি মনে হয়—বাঁচবো?" উত্তেজনার জন্যই কি কণ্ঠস্বর এত পরুষকঠোর না, ব্রজকিশোর জীবনে আজ সত্যকে ব্যাকুলভাবে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন?

চারুবালা বলিলেন, "ছিঃ ওসব কথা ভাবতে নেই; ভেবে ভেবেই অসুখ বেড়ে গেছে; নিশ্চয় সেরে যাবে।"

ব্রজ—ভাবতে আর পার্চ্ছি কৈ—তা হ'লে অনেক কাজ এই সময় করে যেতাম। যাক্ সুধীর বড় সময়ে টাকাটা দিয়ে বাঁচিয়েছে—এসময় একটা ঝঞ্ঝাট বাধলে তোমারও অসুখ হ'তে বাঁচান বড় মুস্কিল হত।

চারু—ওগো, আমি আর ও তালুক চাই না; তুমি আমার গলায় ঐশ্বর্য্য দাও নি, দিয়েছ কালসাপ—রাখলেও বিপদ ফেলতে গেলেও বিপদ—কেবল লজ্জা, কেবল লজ্জা। আর যে ছেলে সারাজীবন বাপের দিকে ফিরে দেখল না; আমি যার কেউ নয়, সে কি আর আমাকে স্বস্তিতে মরতে দেবে?"

ব্রজ—"সুধীর তোমার হয়ে দেখাশুনা করবে, তোমার ভয় নাই।" তালুক নিজের নামে করানর কাহিনী প্রকাশ হওয়াই তাঁহার এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ বলিয়া চারুবালা গণ্য করিতেছেন—তালুকের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে। ললিত যখন স্বামীকে মুগ্ধ করিয়া বিমাতার

নিজ নামে সম্পত্তি করানর কৌশল ইঙ্গিত করিয়া শ্লেষের হাসি হাসিবে, সেই কথা ভাবিয়া চারুবালা বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন; যদি সম্মুখে না হাসে, পরোক্ষে, আপন মনে হাসিবেই, আর তিনি নিশ্চয় তাহা অনুভব করিয়া মরমে মরিয়া থাকিবেন। কিন্তু ব্রজকিশোর এই আক্ষেপোক্তি ভুল বুঝিলেন।—তাই 'তোমার ভয় নাই' এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র চারুবালা আর থাকিতে না পারিয়া কোনক্রমে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনবেগ চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্রজকিশোর ভাবিতে লাগিলেন, আজ বোধ হয় পূর্ণিমা, না এত হইবে না; বোধ হয় ত্রয়োদশী, বাহিরে কি জ্যোৎস্নার ছটা; আর চাঁদ যেন চারুবালার মুখটি ধার করিয়া লইয়াছে।

প্রভাতে ললিত রোগীর ঘরে বসিয়া আছে, ব্রজকিশোরের তখন বিঘোর অবস্থা; বাহিরের দালানে শ্যাম ও চারুবালা দাঁড়াইয়া—সুধীর বাবু কাহারও নিকট বিদায় ল'ন নাই, চলিয়া গিয়াছেন। শ্যাম প্রশ্ন করিল, "জ্যাঠাইমা আপনি কাল বলেন নি, টাকা জ্যাঠামশাই নষ্ট করেছেন, না, অন্যলোকের হাতে পড়েছে। যদি অন্যের হাতে পড়ে থাকে, আমার বলা উচিত, উদ্ধারের চেষ্টা কর্ত্তে হবে; এ সময় জ্যাঠামশাই পড়ে'—টাকাকড়ির কথা আপনি যা জানেন আমায় বলা ভাল; আমি পর নই।" চারুবালার বড় প্রলোভন হইল, সব কথা বলিয়া মুক্তিস্নান করিয়া ফেলেন। কিন্তু সংকল্প দৃঢ় হইবার পূর্ব্বে লজ্জা আসিয়া তাহাকে বাধা দিল; অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "যদি কিছু নষ্ট হয়ে থাকে, সে আর ফিরবে না; আর আমার সাধ্যমত তোমাদের আর নষ্ট হতে দেবো না; যদি হবার মত দেখি তাহলে তোমাদের আগে বলব, গোপন রাখব না জেনো; ইন্দ্র ঠাকুরপো এলে ওদিকের সব বুঝিয়ে দেবে; ভেতরের তহবিল আমার হাতে থাকে, যা কমবেশী তা সময়ে বুঝিয়ে তোমাদের দিতেই হবে আমাকে। চাবী তোমায় দিয়েছি; আমার পেটের ছেলে ভেবে আমি তোমাকে বলছি—তোমাকে যদি আরও আগে পেতাম আজ আমি সুখী হতাম; এইটুকু জেনো, মেয়ে মানুষ ভুল করে, কিন্তু সেই ভুলের লজ্জা কলঙ্ক ঢাকতেও সে প্রাণপণ করে। এর বেশী এখন আমায় জিজ্ঞাসা করো না—তুমি জানলে খোকাও জানবে, সে আমার অসহ্য।"

বলি বলি করিয়াও তালুকের কথাটা বলা হইল না; ভাবিতেছিলেন খরিদী সার্টিফিকেট খানা আঁচলে বাঁধা আছে, বাহির করিয়া ফেলিয়া দেন, ভ্রাতার বন্ধক দলিল খানিও সেই সঙ্গে; কিন্তু ললিতের নিকটে মাথা হেঁট করা অসাধ্য। যদি শ্যাম বলিত আমাকে বলুন ললিত জানিবে না, তাহা হইলে চারুবালা যেন নিষ্কৃতি পাইতেন।

কিন্তু শ্যাম তাঁহার কথায় কেবল বলিল, "কেন, ললিত আপনার ছেলে, সে কি পর?"

চারু—সেকথা বোলো না; দেখলে না, আমি কাল যখন তোমায় চাবী দিলুম ও কেবল আমাকে ভেঙ্গচি কাটার জন্যই তোমাকে ওর চাবীটা দিল; আমার মনের কত দুঃখ, ওর বাপের কি অবস্থা, ভেবে একবার লজ্জাও হোলো না।

শ্যাম গভীর চিন্তামগ্ন হইল। তাহার মনে চারুবালার জন্য কাতরতা, ব্যথা,—ললিতের জন্য সহানুভূতি; সে স্থির করিয়াছে তাহার যথাসাধ্য সে এই দুই জনের মধ্যে, মা ও ছেলের মধ্যে, সংযোজক হইয়া থাকিবে, দুই জনের মধ্যে ফাঁকা স্থানটা নিজেকে দিয়া ভরাট করিয়া অন্যায় অনিশ্চিতকে স্থানভ্রষ্ট করিবে। মুখে বলিল, "আমার বড়দা'র যত আব্দার, মা সহ্য করে; তুমি আমার সব আব্দার শুনবে?"

চারুবালা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কি আমার ছেলে হবে?" শ্যাম দেখা হইবার পর এই প্রথম জ্যাঠাইমাকে আভূমি প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। চারুবালা কম্পিত হস্ত তাহার মাথায় রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব্রজকিশোর জড় চেতন অবস্থার মধ্যে দুলিতে দুলিতে, হঠাৎ দেখিলেন শয্যাপার্শ্বে পুত্র; একটি দুর্ব্বল হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য, স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, বিকার কি বাস্তব জানিবার আগ্রহে স্বতঃই আন্দোলিত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ললিত একবার সসঙ্কোচে গৃহের চতুর্দ্দিকে বিশেষতঃ উন্মুক্ত দ্বারের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া হাতটি

নিজের হাতে তুলিয়া লইল; প্রগাঢ় তৃপ্তিতে নয়ন একবার মুদ্রিত হইয়া পুনরুন্মীলিত হইল; সরল অপ্রতিহত দৃষ্টি বিনিময়ে পিতাপুত্র কাহারও নেত্র শুষ্ক নাই; অশ্রুর ধরধারায় সারা জীবনের অভিমান, আবর্জ্জনা দ্রব হইয়া বাহির হইতেছে। পিতা পুত্রকে জীবনের অনেক কথা একে একে বলিলেন; টাকা লইয়া যে ভাবে জটিলতা দাঁড়াইয়াছিল ও যে ভাবে তাহার সমাধান হইয়াছে, তাঁহার যেমন জানা ছিল পুত্রের গোচর করিলেন। ললিত বাদার এলাকার কথা শুনিল; দলিলের কথা শুনিল; কিন্তু সুধীর বাবু যে দলিল চুক্তি উসুল করাইয়া টাকা দেন নাই সে কথা পিতার নিকট ভাঙ্গিল না; সুধীর বাবুর চক্রান্ত এখন তাহার নিকট লিপিবদ্ধ কাহিনীর ন্যায়। পিতা অনেক উপদেশ দিলেন, লেখা-পড়া ছাড়িও না, বিদ্বানকে অবসর-পীড়ার জ্বালায় সজ্ঞানে ক্ষুণ্ন মনে অধঃপাতে যাইতে হয় না। এ সমস্ত সাধারণ মামুলি কথা, কিন্তু স্থান কাল পাত্র বিশেষে গুরু ও গম্ভীর। তাহার পর পিতার অনুরোধ বিমাতার যেন কোনও কষ্ট না হয়। তাঁহার মানসিক ক্লেশের কারণ যেন ললিত না হয়; সুধীর বাবু অসময়ের বন্ধু, তাহাকে যেন পুত্র তাচ্ছিল্য না করে।

ললিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"বাবা, আমি যেমন করে পারি, বাদার এলাকা যাতে ওঁর নামেই থাকে তাই করব। আর যতদিন উনি আছেন, আমি বিষয়সম্পত্তির উপর কোনও দাবী রাখব না, নিজের খরচ পাশ করা পর্য্যন্ত আমার মা'র টাকা থেকে চলবে; তারপর উপায় করে নেব। আপনি কিছু ভাববেন না; আর উনি না ডাকলে আমি এ বাড়ীতেও আসব না। আপনাকে কথা দিচ্ছি।" কিছুক্ষণ পরে পিতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ ভাবে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া ললিত বাহিরে আসিল, সম্মুখে বিমাতা; শ্রাম নাই। সদ্য স্বার্থত্যাগের শ্লাঘায় সুধীর বাবুকে লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না; তাহার বিশ্বাস এই দলিলঘটিত ব্যাপারে বিমাতা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে লিপ্ত, হেতু সপত্নী-পুত্রের প্রতি ঈর্ষা ও পিতৃকুলের প্রতি অনুরাগ। সে চারুবালাকে বলিল "বাবার কাছে সব শুনেছি। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি তোমার যাতে সব বজায় থাকে তার ব্যবস্থা কর্ব্ব। আর এ বাড়ীতে না ডেকে পাঠালে এই আমার শেষ আসা; বিষয়ের আরে আমার কোনও দরকার নেই।" চারুবালা প্রস্তরমূর্ত্তি।

ললিত বলিতে লাগিল, "সুধীর বাবু যে দলিল ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছেন, বাবা জানেন না; তাঁর বিশ্বাস টাকা তিনিই দিয়েছেন; আমি অবশ্য সে ভুল ওঁর ভাঙ্গিনি।" ললিত চলিয়া যাইতেছিল, চারুবালা দীপ্ত মূর্ত্তিতে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; কম্পিত হস্তে অঞ্চলের গ্রন্থি কতক খুলিল, কতক ছিন্ন হইল। দলিল খানি ললিতের দিকে বাড়াইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "এই নাও দলিল—তুমি নালিশ করে' আদায় কর। আমার আপত্তি নাই, মত আছে।" ললিত দলিলখানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—"এ দলিলে যে নালিশ চলবে না, উসুল হবে না, তুমি জান, সেইজন্যে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে আমায় দিচ্ছ কেন? তোমার কাছে থাক্। এ দলিলের কোন দাম নেই। এক পয়সাও না।" চারুবালা বুঝিলেন, —ধীরে ধীরে নহে, বিদ্যুৎ-গতির ধারা বাহিয়া চক্ষের সম্মুখে নামিয়া আসিল ভ্রাতার কলুষ-পঙ্কিল নগ্ন আত্মার চিত্র, জ্যোতির্ম্ময় দিবালোকের মধ্যে স্থির হইয়া রহিল সেই ছবি।

চারুবালা ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন, "না, না, তুমি নালিশ কর্ব্বে; আমি বলছি কর, আমি সাক্ষী দেব, টাকা দেয় নি, ঠকিয়ে সই নিয়েছে।"

ললিত—তুমি জান রায়বংশের কর্ত্রীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান, জেরার সম্মুখে ফেলা, আমাদের প্রাণ থাকতে হবে না; তুমি নালিস করতে বল্লে কি আমি মনে করে বসব যে না জেনে তুমি বলছ; যখন কাজ সেরে রেখেছে, উসুল সই মায় সাক্ষীসাবুদ পর্য্যন্ত, তখন সব আগে থেকে ঠিক করেই করা হয়েছে।

ললিত চলিয়া গেল, যাইবার সময়ও বলিল, "ও দলিলে কোন দরকার নেই; আমি ওর কথাই আর মুখে আনব না; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

চারুবালা স্বামীর শয্যায় গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। ব্রজকিশোরের তখন আবার বিঘোর অবস্থা; পত্নীর প্রায়শ্চিত্তের জ্বালা দূরের কথা, তাহার সান্নিধ্যও তখন রোগবিকৃত মস্তিষ্কে অনুভূত হইল না।—চারুবালা সেইখানে পড়িয়া বালিকার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

(উপসংহার)

অতীত আসিয়াছে; অতীত যায়, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রতি জীবনে আবার একাধিক-বার ফিরিয়াও আসে; অতীতের এই স্বধর্ম্মবিপরীত আচরণ, এই ভবিষ্যতের স্থান দখল করিয়া বসা,—যে-সময় ভবিষ্যৎ যায়-যায় তখন অতি অবশ্য ঘটনা হইয়া উঠে। ব্রজকিশোরের জীবনে অতীত আসিয়াছে। আজ তাই অতীতের প্রতি স্মৃতি, একে একে, দলে দলে, কাতারে কাতারে, ক্ষীণ মনটির নিমন্ত্রণে ব্রজকিশোরের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া বসিয়া আছে। নিমজ্জমান যেমন নিঃশ্বাসরাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্বাসরোধকারীর আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে দীন দুর্ব্বল শক্তিতে যথাসাধ্য প্রাণবায়ু অন্তরে টানিয়া লয়, সেইরূপ ভবিষ্যৎহীন অন্ধকারে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে ব্রজকিশোরের তন্দ্রাচ্ছন্ন চৈতন্য অতীতকে আহ্বান করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বর্ত্তমান একটা অংকিত আলোক-রেখার মত ক্ষণিক ফুটিয়া উঠিতেছে। নিজ পরিশ্রমে সৃষ্ট জীবনের শত বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের ব্যর্থ চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে। ইন্দ্র সরকারকে নানারূপ উপদেশ দিতেছেন, ইন্দ্র সরকার কাঁদিতেছে। শ্যামকে নানারূপ অনুরোধ—ললিতকে দেখো, রাজুকে বাঁচিও। চারুবালাকে সান্ত্বনা। পুত্রকে মনের কথা, অসংলগ্ন ভাষায়, কখন বা স্বগত উক্তি--নানারূপ; সকলকে চমকিত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে—"রাজু আমারই ছেলে, আমি বলছি আমার ছেলে।" সজ্ঞান, অজ্ঞান অবস্থার সীমানায় দাঁড়াইয়া কত সত্য ও প্রলাপের মিশ্রণ। চারুবালা স্বামীর নিকটে অবস্থান করিতেছেন, চক্ষু শুষ্ক। ললিত কক্ষের এক পার্শ্বে।

ক্রমশঃ ব্রজকিশোরের মনে অতীতের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের বেষ্টনী-ব্যূহ দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতেছে। কতরূপ অতীত! 'কি করিয়াছি', তাহার তিরস্কার; 'যদি করিতাম', তাহার মৃদু ভর্ৎসনা; 'কেন করিলাম', তাহার গঞ্জনা। সকল প্রকার অতীতের হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলির মধ্যে বর্ত্তমান বাস্তব ক্রমবিলীয়মান; ছায়ারাজ্যের জীবের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সকলের ইতস্ততঃ গতিবিধি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অতীতের এই প্রভাব অক্ষুন্ন হইয়া আসিয়াছে। নিমন্ত্রিতের শিষ্ট মূর্ত্তি আর তাহাদের নাই; তাহাদের কদর্য্য চীৎকারে শ্রবণ এখন পরিপূরিত; দীর্ঘ তাহাদের প্রসারিত গ্রীবা; তাহাদের পূর্ণ বিকশিত মুখবিবর, ভয়কারজনক; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ চক্ষু, প্রাচীন হিংসার অভিজ্ঞানে কুটিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দুর ন্যায়, কিন্তু বিশ্বের সমষ্টিগত ক্রূরতার অভিব্যক্তি সেখানে স্পষ্ট; তাহাদের দাহিকা শক্তি অন্তঃস্থলকে অন্বেষণ করিতে পটু।

মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজকিশোরের চৈতন্য একবার এই বিকটদর্শনদের তাড়াইতে শেষ চেষ্টা করিল—অতীতের স্মৃতিদল তাহা গ্রাহ্যমাত্রও করিল না। কদর্য্য ভক্ষণে গুরুভার দেহ লইয়া নড়িবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই; আহারলোভে তাহাদের আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিও লুপ্ত! স্থির, নিশ্চয়, অবশ্যম্ভাবী তাহাদের জঘন্য লালসার পরিতৃপ্তি। লোভে টলিতে টলিতে তাহারা নিকটে আরও নিকটে আসিল, তাহাদের পক্ষনিঃসৃত শ্মশানগন্ধ ব্রজকিশোরের চৈতন্য সম্পূর্ণ হরণ করিল। (সমাপ্ত)

ধর্ম্ম ও সমাজ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

সমন্বয়
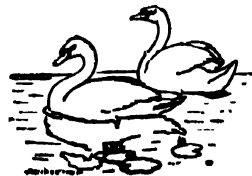
কণাদ বলচেন, যা উন্নতি ও মুক্তির হেতু তাই হচ্চে ধর্ম্ম। স্বামী বিবেকানন্দ কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলেচেন, "অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ যা ঘটায় তাই ধর্ম্ম।" এর চাইতে ধর্ম্মের সুন্দর সংজ্ঞা বোধ হয় জগতে আর কখনও তৈরী হয় নি। স্বামিজী প্রতিশব্দে ইংরাজী "Religion" কথাটা ব্যবহার করেচেন বটে, কিন্তু নিবেদিতা তাতে আপত্তি করে বলেচেন, "Religion" শব্দে ইংরাজী ভাষায় যা বোঝায়, তাতে হিন্দুর "ধর্ম্ম" শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ জ্ঞান হয় না। ধর্ম্ম হচ্চে মানুষের মনুষ্যত্ব, জীবের জীবন, শিল্পীর শিল্প, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান, সাধুর সত্য। ধর্ম্মের জন্য রাম বনে গিয়েছিলেন, অক্ষ-রঙ্গে পাণ্ডবেরা নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় অবস্থান করেছিলেন—ধর্ম্মের জন্য পদ্মিনীর জহর ব্রত, লক্ষীবাইয়ের যুদ্ধযাত্রা।

হিন্দু মুসলমানের গো-বধ নিয়ে যে দাঙ্গা বাধে সেটা ধর্ম্ম হেতু নয়, প্রাচীন আচার ব্যবহারের অবশেষ নিয়ে। কৃষিপ্রধান ভারতবাসীর নিকট গরু একটা মস্ত সম্ভ্রমের বস্তু, পক্ষান্তরে মরুভূমির সন্তানদের এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ পশুপালন ও বধের দ্বারা তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের জীবন ধারণ করতে হয়েচে।

হয়ল্যাণ্ড ভারতকে বুঝতে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনিও একেবারে গোলক-ধাঁধাঁয় পড়ে গেছেন। কারণ তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, সাম্প্রদায়িক ভাবে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দেখেন, সে গণ্ডীর মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম অবচ্ছিন্ন হয় নি, অনেক জিনিষ তার বাইরে পড়ে রয়েচে। অথচ হিন্দুর ধর্ম্ম না বুঝলে হিন্দুস্থানকেও বোঝা হবে না, এটা নিশ্চিত। দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস পুরাণ, যাগযজ্ঞ, জন্মান্তর, মুক্তি, দেবদেবী, মূর্ত্তি প্রতীকের সহিত অটুট সম্বন্ধ নিয়ে বিরাট হিন্দু-প্রাসাদ নির্ম্মিত। খণ্ডভাবে এর অধ্যয়নের দ্বারা অখণ্ড হিন্দু ধর্ম্মের জ্ঞান হবে না, যতক্ষণ না একেবারে গোটাটা না নেওয়া যায়।

ধর্ম্ম যদি উন্নতি ও মুক্তির হেতু হয়—অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ করিয়ে দেয়, তা হলে সেখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান কোথায়? মানুষকে যদি স্বাধীন ভাবে তার মনের ও দেহের গঠনানুপাতে ধর্ম্মসংগ্রহে সাহায্য না করা যায়, তবে তার বৃদ্ধি ত' অচল হয়ে রবে। একটা জামা যেমন সকলের গায়ে লাগে না, একই ওষুধে যেমন সব রোগ সারে না, তেমনি কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিশেষ বিশ্বের প্রতি ব্যক্তির অন্তর্দ্দেবত্বার বিকাশের হেতু হবে, তা কী করে বলা যেতে পারে? অঙ্কুর বা ভ্রূণ, সে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়ে উঠচে, তার বিচিত্র আকৃতি, রূপ, উপাদান, গঠন, প্রকৃতি, অভ্যাস, অঙ্গগতি, আবৃত্তি ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে; হেতু হ'চ্ছে পৃথক অবেষ্টনী (environment)—আলো, বাতাস, জল, মাটি, উত্তাপ ও খাদ্য। একই প্রকার আলো বাতাস সকলের উপযোগী হতে পারে না। বহুর পক্ষে তা ধ্বংসেরই কারণ হয়। জল ও মাটির ভিন্নতায় উদ্ভিদেরও জীবন-যাত্রার প্রণালী বিভিন্ন হয়ে ওঠে। বিষুব-রেখার জীব জন্তুর কি উত্তর মেরুর আবহাওয়ায় বসবাস করা সম্ভব?

তবে স্বাভাবিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আছে—যেমন এক জাতীয় বৃক্ষের অপর জাতি (species)। একই ভাবাপন্ন লোকের একটা বিশেষ ধর্ম্ম উপযোগী হতে পারে। তবে এটাও ঠিক যে সেটা কখনও বলপূর্ব্বক নেওয়ান (proselytise) যেতে পারে না। তার মস্তিষ্কের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে তাকে সহজ ভাবে স্থানান্তরিত হতেও দিতে হবে; কিন্তু আবার এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেন কখনই অপরের অনিষ্ট সাধন করতে না পারে, এটাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অপরকে ধ্বংস করে' নিজের উন্নতিসাধন, "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest) প্রভৃতি পশুনীতি জীবের নিম্ন স্তরেই সম্ভব, উচ্চ স্তরে নয়। আমার উন্নতি যখন আবেষ্টনীসাপেক্ষ তখন তার প্রতি ত' আমার কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। গো-দুগ্ধ পানের দ্বারা জীবন ধারণ করে' তার বধসাধন একটা অমানুষিক ব্যাপার। তা হলে আর বৃদ্ধ পিতামাতার

মাংসভোজী প্রশান্ত-দ্বীপবাসীদের চাইতে আর্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা কোথায়? প্রকৃতি-সহায় রাজা, তার পীড়ক হবেন কি করে'? (১) উন্নতির লক্ষণ হচ্ছে, "সর্ব্বভূতহিতে রত"। আত্মার যত প্রসার হবে, দেবত্ব ও পূর্ণত্বের যত সম্পূর্ণতা আসবে ততই ত' জীবন হবে "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়"। রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্ম্মের প্রচার, উপনিবেশস্থাপন, শ্রমশিল্পের উন্নতি সবই ভাল, যদি তা অপরের ধ্বংস করে' স্বার্থকে পুষ্ট না করে। প্রাকৃতিক সকল শক্তিই যখন আপেক্ষিক, নানা বিচিত্র শক্তিসংযোগে যখন নব শক্তির প্রাদুর্ভাব, তখন মানব-সভ্যতার কেন্দ্র সাহায্য বা সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না কেন? (২)

অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িকের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে নীতি বা সত্যের অবগতির জন্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত, তার অন্তর্দ্দেশে তাঁরা গমন না করায় বহিরঙ্গ সাধনেরই তাঁরা ভক্ত। সাধনাকে সিদ্ধির আসনে বসিয়ে পূজা করায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ ঘটে। অথবা কোন বিশেষ সাধন-মার্গে অগ্রসর হয়ে কিছু আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির পর, সেই বিশেষ পদ্ধতির উপর এমন একটা বিশ্বাস ও আসক্তি আসে যে, অপরের পদ্ধতি মিথ্যা বলেই বোধ হয়।

তখন "মাতুয়ার" বুদ্ধি হেতু শিষ্যগণকে তাঁর সাধন মার্গই একমাত্র সত্য বলে' উপদেশ করেন; ফলে অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধা আপনি এসে পড়ে এবং যবন, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, হিদেন প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তিহেতু নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞে দেখা যায় রাজারা ব্রাহ্মণদের পরিবেষক ছিলেন; (৩) এবং এই রাজাদের মধ্যে চীন, ম্লেচ্ছ, যবন, পারসিক, শক, হুন, তুষার (তুর্ক), রোমক (৪) প্রভৃতি দেশীয়েরাও ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জামাই (দুঃশলার পতি) জয়দ্রথের যবনী স্ত্রীও ছিল। (৫) কিন্তু কালে পরস্পর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ঐ সকল জাতিরা একেবারে হিন্দু ধর্ম্মের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। এর হেতু ধর্ম্ম নয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ। ভগবান বলচেন—"যাঁয়াই ভাগবদ্ধর্ম্ম যুক্ত, তা সে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্যই হোক, তাদেরই মুক্তি হবে।" (৬) চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সেলুকাসের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, শক তোরামন, মিহিরকুল শৈব ধর্ম্ম গ্রহণ করে' ভারতবাসী হলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে যখন মোগল পাঠানেরা ভারতবর্ষে আসে তখন ভারতবাসীরা তাদের মানব-জাতি হিসাবেই গ্রহণ করেছিল, 'নেশান' (nation) হিসাবে নয়। (৭) কালে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষে দুটো পৃথক 'নেশান'এর সৃষ্টি হলো এবং দ্বন্দ্ব এমন প্রবল ও হীনোচিত হয়ে দাঁড়াল যে, খাবার সময় কলাপাতার উল্টো বা সোজা দিকের শ্রেষ্ঠতার ওপর ধর্ম্ম নির্ভর করতে লাগলো। অথচ প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যবন ও গ্রীকদের সঙ্গে এবং পরবর্ত্তী যুগে মুসলমান তুর্কী ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের কৃষ্টির যথেষ্ট আদান প্রদান ছিল। প্রমাণ—জ্যোতিষ, দর্শন, গণিত ও বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুবাদ পরস্পরের দেশে এখনও পাওয়া

(১) সনৎসুজাত বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ব্বতন রাজাদের অপেক্ষা প্রজাগণের নিকট অধিক কর গ্রহণ করে সে নৃশংস। (মহাভা, উদ্‌প, ৪২ অ)। উশীনর বলেন, যে রাজা অন্যের প্রতিপালনার্থ সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ ব্যয় করেন, তিনি ধর্ম্ম ও যশঃ লাভ করিতে পারেন না। (ঐ, ঐ, ১৭৭ অ)।

(২) The development of all living organisms is effected through certain energies and substances that are conducive to the growth and manifestation of life. It is the environment and physical surroundings that supply these life-sustaining factors to the organisms.

It is absolutely necessary to realise the whole situation of the human world at the time, and minutely study the array of world forces that has been the result of mutual intercourse between the several peoples in social, economic, intellectual, and political matters.—The Science of Histoy and the Hope of Mankind, P. 13+23, by Benoy Kumar Sarcar.

(৩) সভাপর্ব্ব ৪৮। (৪) রোমক, রোম নহে। ইহা বোধ হয় ইজিপ্ট-নিবাসীদের আদিম নাম "রোমাতু"। ইহার অর্থ "মানুষ"। মহাভারতে ইহাদের "রোমা" বলিয়া নির্দ্দেশও দেখা যায়। (ভীষ্ম পর্ব্ব ৯অ)। (৫) স্ত্রী পর্ব্ব ২২। (৬) গীতা, ৯।৩২।

(7) We had known the herds of Mogul and Pathans who invaded India, but we had known them as human races, with thier own religions and customs, likes and dislikes,—we had never known

যায়। মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য প্রথম তরবারী ধারণ করেন, পরে জয়োৎসাহ এবং রাষ্ট্রলিপ্সাই তাঁদের তরবারির দ্বারা কোরাণ স্বীকার করান'য় প্ররোচিত করে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। উদার ধর্ম্মের আশ্রিতেরা এমনি করেই অনুদার হয়ে পড়েন। মুসলমান ও খৃষ্টান উভয়েই এই দোষদুষ্ট। ওয়েলস বলেছেন "মুসলমানেরা অত্যধিক অনুদার, এবং খৃষ্টানদের ভেতরও এর প্রভাব আছে।" (৮) কিন্তু স্বামীজির মতে মুসলমানেরা অনুদার হলেও আদিম জাতির সর্ব্বনাশ করে নি। যেথায় ইউরোপী আগমন সেথাই আদিম জাতির বিনাশ।…… স্পেনের আরাব, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কোথায়? কৃশ্চানেরা ইউরোপী আত্মীদের কি দশা এখন করেচে! (৯) বার্ণার্ড সও মুসলমানদের সম্বন্ধে আশান্বিত। তিনি বলেন, "I believe the whole British Empire will adopt a reformed Mahometanism before the end of the century"—এ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিমার্জ্জিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করবে, এই আমার বিশ্বাস। আমাদের মনে হয় এই পরিমার্জ্জিত মুসলমান ধর্ম্মটি আর কিছুই নয়, স্বামিজীর "Islamic body with a Vedantic brain" —মুসলমান ধর্ম্মের সামাজিক সমতার সহিত বৈদান্তিক উদার আধ্যাত্মিকতার সংযোগে যে আগামী নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান লক্ষিত হচ্চে, তাই ভবিষ্যৎ সভ্য মানবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলে গৃহীত হবে। আগামী সহস্র বৎসরের মহামানব, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে যে সুযোগোপযোগী অত্যুদার মত—"ভক্তের জাতিভেদ নেই" এবং "যত মত তত পথ"—প্রকাশ করেছেন, তা ধীরে ধীরে মানবের বাস্তব জীবনে ও মস্তিষ্কে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করচে এবং অদূর ভবিষ্যতে অনুদারতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে সকল দেশের, কালের, ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের ভাবে, ভাষায় ও ব্যবহারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই। এই মহাভাবের সহকারী কারণ বিজ্ঞান ও আবিষ্কার। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, "একা নদী বিশ ক্রোশ।" দূরত্বই ভেদ সৃষ্টি করে, ভাষা ও কৃষ্টি পৃথক করে ফেলে, যা থেকে অসংখ্য সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উৎপত্তি। বিজ্ঞান সেই "দূরকে নিকট করেচে", তাই মিলন অবশ্যম্ভাবী।

কেবল দূরত্ব বিভাগ সৃষ্টি করে না—বিজয়িবিদ্বেষও বিভাগের অপর কারণ। যখনই কোনও প্রবল জাতি বলপূর্ব্বক অপরের সমাজে, শাসনে, আচারে, ব্যবহারে বা উপাসনায় হস্তক্ষেপ করে, তখনই বিজাতি বা বিধর্ম্মী শব্দের উৎপত্তি হয়। মহাভারতের কর্ণ পর্ব্বে, যেখানে শল্য ও কর্ণের বিবাদবর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সিন্ধু (Indus) ও তাহার শাখা কুভা বা অবগা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর তট-ভূমে অবস্থিত মদ্রক (W. Punjab), কাম্বোজ (E. Kashmir), সৈন্ধব (Sindh), সৌবীর (Beluchistan), বাহীক বা বাহ্লীক (Bulkh), আরট্ট (Attock), প্রস্থল বা পুরুষপুর (Peshwar), খস (S. W. Afghanistan), বসাতি (Baltistan—N. Kashmir), দরদ (N. W. Kashmir), শিবি (N. Beluchistan), হেতুমৎ বা হারীত (Herat), গান্ধার (Kandahar) প্রভৃতি দেশে গৌড়ী সুরা, শক্তু, মৎস্য, গোমাংস, কাঞ্জি, লশুন, ভৃষ্ট, যব, অপূপ, পলাণ্ডু, বরাহ, মেষ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্রমাংস, মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রদুগ্ধ ও দধি ব্যবহার চলিত অথচ তাহারা হিন্দু ছিল। মদ্ররাজ শল্যের ভগ্নী মাদ্রী, নকুল, সহদেবের মাতা। কর্ণ ঐ দেশীয়দের ম্লেচ্ছ ও অনাচারী বলে গাল দিয়েচেন। এখন এরা মুসলমান ও অস্পৃশ্য। যখন মহম্মদ বিন কাশেম বা গজনাভির (Gazni) মামুদ আসেন তখনও

them as a nation. We loved and hated them as occasions arose; we fought for them and against them, talked with them in a language which was thiers as well as our own, and guided the destiny of the Empire in which we had our active share— Nationalism, P. 8.

(8) Mohommedanism, with its fierce proselytism, has, I suppose, the blackest record of uncharitableness, but most of the Christian sects are tainted, to a degree beyond any of the anterior paganisms, with this same hateful quality. It is thier exclusive claim that sends them wrong, the vain ambition that inspires them all to teach a uniform one-sided God and be the one and only gateway to salvation.—The New Machiavelli, P. 53, by H. G. wells.

(৯) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—পৃঃ ১১৮—২০।

ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ সত্বে বর্ত্তমান কালের ন্যায় এতটা বিজাতীয় ভাব উভয়ের মধ্যে ওঠে নি। কারণ পৃথ্বীরাজের সময়ের অপগা-তট দেশীয় (Afghanistan) লোকদের আচার ব্যবহার শল্য, জয়দ্রথের সময়কার মত একই ছিল। তাদের আগমনে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের (East Punjab) লোকেরা একটুও আশ্চর্য্য হয় নি। শালক (Sealkot) থেকে জর্ত্তিক (Zoroastrian land) পর্য্যন্ত তাঁরা বিশেষ ভাবেই অবগত ছিলেন। (Zoroaster = জরত + ত্বাষ্ট্র। ইনি পূর্ব্ব পারস্যের উপাসিত দেবতা)। তৎকালীন পারস্য দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র জেন্দা-বেস্তা ও ঋগ্বেদের শব্দের সাদৃশ্য দেখুন—

বেদ	জেন্দ	বেদ	জেন্দ
অসুর	অহুর	হৃদয়	জাবদয়
সোম	হোম	হস্ত	জস্ত
সপ্ত	হপ্ত	বরাহ	বরাজ
মাস	মাহ	হোতা	জোতা
অস্মি	অহংমি	আহুতি	আজুতি
সন্তি	হন্তি	হিম	জিম
অসু	অহু	বাহু	বাজু
বিবস্বৎ	বিবস্থ্যৎ	অহি	অজি
দুহিতর	দুঘতর	বরুণ	বরেণ
পশু	পশু	সম	সিম্
মিত্র	মিথ্র	ঋত্বিজ	ঋথ্বী
মন্দ	মন্থ্র	অশ্ব	অশপ
অর্য্যমন্	ঐর্য্যমন্	ইষু	ইষু
বায়ু	বায়ু	রথ	বথ
বিত্রহন্	বিরিথঘ্ন	অপাংনপাত	অপাংনপাত
গন্ধর্ব্ব	গন্ধর্ভ	দুরক্ষো	দ্রুক্ষ
মেধা	মেজদা	ভিস্বতি	জবৈতে
যদা	যথা	নশ্যতি	নশৈতি
এতাং	ঐষং	শৃণোতি	হমোতি
		বাচম্	বাচম্ ইত্যাদি।

কিন্তু কালে এক ঈশ্বর মানা সত্ত্বেও শাসন, আচার, ব্যবহার, ভাষা, খাদ্য ও ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন হেতু বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকদের ছুঁলে আমাদের এখনও জাতিচ্যুত হতে হয়। তাই মনে হয় অবরুদ্ধ, বিষাক্ত-রক্ত, ক্রমধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের রক্ষার জন্য চাই কেবল উদারতা। জ্ঞানের তীব্র কঠোর স্পর্শে দেহের, মনের ও সমাজের অযৌক্তিক কুসংস্কারের শৃঙ্খল ঝন্‌ঝনিয়ে খুলে পড়ুক—পবিত্র করসম্পাতে নতুন মানব, নতুন জীবন, নতুন সমাজ প্রবুদ্ধ হোক। বেদ-পুরুষের আবির্ভাবে বেদ জয়যুক্ত হোক। জ্ঞান বুদ্ধিহীন সুখশান্তি ভেঙে দেয় বটে, কিন্তু অসীমের আনন্দ-ছবি লোকচক্ষের গোচর করে ধরে। মিথ্যার অনুনয় সম্বন্ধে সে বধির। মহাকাল সময়ের অক্ষরে যে বেদ লিখতেন, অজস্র অশ্রুর ঝরণায় তার একটী বর্ণও মোছবার নয়, একটি বর্ণও তার মিথ্যা নয়। জ্ঞানীর এমনি প্রতাপ যে সে বলে, "আমার একটি কথা মিথ্যা হলে আমার সব কথা মিথ্যা।"

অনেকে বলেন, অত্যধিক উদারতার ফলে "ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণত্বের" (১০) ধ্বংস হবে। আমরা বলি, অত্যুদার মহাভারতীয় যুগে বাগ্‌বজ্র, অগ্নিমুখ ব্রাহ্মণেরা যেমন ভূস্বামী ছিলেন, এখনও তেমনি থাকবেন—যদি তাঁরা তপস্বী হন, জ্ঞানী হন। অতীতের অভিসন্ধি তাঁদের মঙ্গলময়ই ছিল—জাতির রক্ষার জন্যই তাঁরা অনুদারতার আশ্রয় লন। তপোশক্তিহীন হওয়ায় দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত প্রাচীরের পর প্রাচীর দিয়ে তাঁরা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আজ অর্গল ও শৃঙ্খলভারেই অনুদারতার প্রাচীর আপনি ধ্বসে পড়চে—মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু বিধিনিষেধের দুর্গাবরুদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। আমরাও বলি ব্রাহ্মণই জগতের আদর্শ। "ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব" যদি মানুষের সাত্ত্বিক ধর্ম্ম হয়, একটা রক্ত মাংসের শরীরের যথেচ্ছ কর্ম্ম না হয়—তবে ব্রাহ্মণত্বেরই revival এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যাপার। উপায়—রাজনীতি নয় ধর্ম্ম, যুদ্ধ নয় আধ্যাত্মিকতা, সংকীর্ণতা নয় উদারতা, হিংসা নয় সহানুভূতি, দয়া নয় প্রেম, দান নয় সেবা, কর্ম্ম নয় পূজা, আচার নয় চরিত্র, কণ্ঠ নয় মর্ম্ম, গ্রন্থ নয় তাৎপর্য্য, পাণ্ডিত্য নয় বৈরাগ্য, গৃহকোণ নয় মুক্ত আকাশতল, পট্টাচ্ছাদন নয় বহির্ব্বাস।

(১০) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা শাংকর-ভাষ্য উপক্রমণিকা দেখুন।

ব্রাহ্মণ শঙ্কর, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীচৈতন্য, বলদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, "ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে" (১১) ধর্ম্ম ভাণ্ডার রক্ষার জন্য কলিযুগেও প্রায় প্রতি শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বামিজী বলচেন, (১২) "এই পবিত্র ভারত-ভূমিতে যে কোনও নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—"ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে"। ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণরূপ আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইউরোপে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত নিজ পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে উচ্চ বংশীয় ছিলেন, এই প্রমাণ করিতে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন; আর যতক্ষণ না প্রমাণ করিতে পারিতেছেন যে, পর্ব্বতনিবাসী, পথিকের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনকারী, কোন মহা অত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই শান্তি পান নাই। অপর দিকে আবার ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ কৌপীন-ধারী, অরণ্যনিবাসী, ফলমূলাহারী, বেদপাঠী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তদীয় বংশের উৎপত্তি—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এদেশে যদি কোন প্রাচীন ঋষিকে পূর্ব্ব-পুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার—তবেই তুমি উচ্চ জাতীয় নতুবা নয়! সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আধ্যাত্মিক সাধন-সম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। ব্রাহ্মণ আদর্শ, আমি কি অর্থে বুঝি?—আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব তাই, যাহাতে সাংসারিকতা একেবারেই নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। হিন্দু জাতির তাহাই আদর্শ। শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন আইন নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন—তাঁহার বধদণ্ড নাই, একথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছে, সে ভাবে অবশ্য ইহা বোঝা ভুল; প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিক ভাবে এ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায়—যাঁহারা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও প্রেমলাভ ও বিস্তারেই নিযুক্ত,—যে দেশ কেবল এমন ব্রাহ্মণগণের দ্বারা—সৎস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা—অধ্যুষিত, সে জাতি ও দেশ যে সর্ব্বপ্রকারে বিধিনিষেধের অতীত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কথা কি? এবংবিধ জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্য সামন্ত, পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন? (১৩)

"তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরেরই অন্তরঙ্গ স্বরূপ। আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্য-যুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহা-ভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। (১২) আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্য যুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চ বর্ণকে নিম্ন করিয়া আহারে বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া, জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়—তবেই এই জাতিভেদসমস্যার মীমাংসা হইবে। তোমরা আর্য্য, অনার্য্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে; তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ;—সে আদেশ এই—'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্ন-তম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদর্শ শুধু ভারতেই থাকিবে তাহা নহে—সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানু-যায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্ম্মিক—অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানব জাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিতে পারিবে।" (১৫)

(১১) মনু, ১।৯৯। (১২) ভারতে বিবেকানন্দ ৮৪ পৃঃ (৬ সং)। (১৩) মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব ৬৯ অধ্যায়। (১৪) ঐ ১৮৮ অধ্যায়।

(১৫) ভারতে বিবেকানন্দ পৃঃ ১৫৪—৫৭ (৬ সং)।

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

উত্তর মেঘ

২৫

নয়তো প্রেয়সী মলিন বসনে বীণাখানি তা'র লইয়া কোলে
উচ্চকণ্ঠে মোরই নাম-গাঁথা গানখানি তা'র গাহিবে বোলে
নয়নের জলে ভিজায়ে আবার মুছিতে মুছিতে তন্ত্রীগুলি
নিজেরি রচনা সুর-মূর্চ্ছনা বারে বারে, হায়, যায় গো ভুলি'।

২৬

না হয়, দেখিবে দেহলীতে রাখা ফুলগুলি প্রিয়া মাটিতে রাখি'
গণিছে কেবলি মিলনের দিন, আর কতদিন রয়েছে বাকি।
কিংবা সে মোর সঙ্গ-সোহাগ সম্ভোগ করে কল্পনায়,—
প্রিয়-বিরহিণী অঙ্গনাদের এইরূপে, শুনি, দিবস যায়।

২৭

দিনে গৃহমাঝে রহে নানা কাজে, তেমন ব্যথা যে বাজে না তাই,
ভুলিতে নিশির বেদনা নিবিড় তোমার সখীর কিছুই নাই !
মোর বারতায় তুষিবারে তা'য় সেথা জানালায় বসিয়ো গিয়া—
ভূতলে শয়ন বিছায়ে যখন নিশি জাগরণ করিছে প্রিয়া।

২৮

বিরহশয়নে হেলি' এক পাশে আছে তনুখানি ব্যথা-মলিন—
যেন প্রাচীমূলে কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকলাটি ক্ষীণ।
মোর সনে সুখ-বিহারে যে-রাতি কাটিত একটি নিমেষ প্রায়,
বিরহদীর্ঘ সে-যামিনী যাপে তিতিয়া তপ্ত আঁখিধারায়।

২৯

বাতায়ন-পথে অমৃত-শীতল জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িলে মুখে
পূর্ব্ব প্রণয়ে তা'র পানে চেয়ে অমনি নয়ন ফিরায় দুখে ;
জলভরা আঁখি পল্লবে ঢাকি'—স্থল-কমলিনী বাদল-মেঘে
না ফুটি' না মুদি' রহে যথা—প্রিয়া না রহে ঘুমায়ে, না রয় জেগে

৩০

তাপিত অধর-কিসলয় তা'র উষ্ণশ্বাসে,—তাহারি তাপে
তৈলবিহীন শুদ্ধস্নানে রুক্ষ অলক কপোলে কাঁপে।
স্বপনেও যদি সম্ভোগ লভে---নিদ্রার লোভে রয়েছে তাই !—
হায়রে, যে-চোখে জল ভ'রে আছে, নিদ্রার সেথা কোথায় ঠাঁই

৩১

কুসুমের মালা পরিহরি' প্রিয়া করিয়াছে কেশে বেণী-রচন,
শাপান্তে আমি আনন্দে গিয়া করিব যা' হেসে উন্মোচন।
কপোল হইতে দিতেছে সরায়ে বারে বারে অচ্ছিন্ন-নখে
সেই এক-বেণী, রুক্ষ বিষম,—পরশেই পায় দুঃখ, সখে।

৩২

দেহে নাই বল, ভূষণ সকল খুলিয়া প্রেয়সী যাতনা-ভরে,
সুকোমল তনু দিতেছে এলায়ে বারে বারে ভূমিশয়ন পরে।
তোমারো নয়নে ঝরাবে সে নবজলকণা-রূপে অশ্রুবারি,—
করুণায়—চিরকোমল যে-জন—সহজেই গলে হৃদয় তা'রি

৩৩

আহা, মোর লাগি' কত অনুরাগী, জানি সখে, তব সখীর মন,
তাই মনে লয় প্রথম-বিরহে নিশ্চয়ই তার দশা এমন।
সৌভাগ্যের গর্ব্ব আমায় বৃথা প্রগল্‌ভ করেনি ভাই,—
কহিনু যা' সব, অচিরেই তুমি আপনার চোখে দেখিবে তা-ই।

৩৪

খেলে না সে চোখে চারু কটাক্ষ—চূর্ণ অলকে রয়েছে ঢাকা;
পরেনি কাজল,—বিনা মদিরায় নয়নে নাহি ভ্রূভঙ্গ বাঁকা;
তুমি কাছে এলে মৃগনয়নার কাঁপিবে উর্দ্ধে বাম নয়ন,—
মীনসঞ্চারে চঞ্চল নীল পদ্মের শোভা ফুটে যেমন।

৩৫

আমার নখের ক্ষতের চিহ্ন যে-উরুতে আজি নাহি প্রিয়ার,
দৈবের বশে মুক্ত যাহার চির-আদরের মুক্তাহার,
সম্ভোগান্তে যা'র 'পরে আমি বুলায়েছি কর বারংবার,—
সরস-কদলী সম সুগৌর সেই বাম উরু কাঁপিবে তা'র।

৩৬

ওহে জলধর, যদি-বা তখন প্রেয়সী আমার ঘুমায়ে থাকে,
পশ্চাতে বসি' একটি প্রহর প্রতীক্ষা কোরো,—ডেকো না তা'কে;
প্রণয়ী আমায় প্রিয়া যদি পায় সুপ্তির ঘোরে সুখ-স্বপনে,
কণ্ঠচ্যুত কোরো নাকো তা'র বাহুলতা গাঢ়-আলিঙ্গনে।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

ব্যক্তিকে লইয়া সমাজ গঠিত হয় বলিয়া প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করিয়া গঠন করিবার একটা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা আছে। প্রাচীনকালে ইহা ছিল সামাজিক, তাই গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিংবা তথাকথিত ভারতের সাধনা, বর্ত্তমানের মাটীতে কতখানি সম্ভব তাহা নিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। ব্যাবহারিক জগতে আমরা বর্ত্তমানে বাঁচিয়া থাকি, বর্ত্তমানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা ছয় সাতটি শিশুর জন্মদাতা অভিভাবক, সুতরাং বলিবার অধিকার আছে।

"মডার্ণ" যুগে রাষ্ট্র শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্য স্কুল কলেজের উদ্ভব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্কুল কলেজগুলিতে মানুষ তৈরী করার প্রচেষ্টা যে খুব বেশী তাহা বলা যায় না। এখানে পুঁথির ভারে ছেলেদের সহজ-বুদ্ধি চাপিয়া মারিবার ষড়যন্ত্রটি খুব স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন যতগুলি বিষয় পঠিত হইত, কিংবা যে কয়খানি পুস্তক পড়িয়া আমরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতাম, এখন তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার একটা চেষ্টা দেখি বটে, কিন্তু সে চেষ্টা না থাকিলেও যে আমাদের বংশধরগণ আমাদের অপেক্ষা কম শিক্ষিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

এখনকার পাঠ্য-নির্ব্বাচকগণ মনে করেন যে স্কুল-জীবনেই ছেলেদের মস্তকে আসমুদ্র-হিমাচলের জ্ঞান-ভাণ্ডার ঠাসিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে যে অনেকের মাথা ফাটিয়া ফোঁপরা হইয়া যায় তাহা জানিবার মত মনস্তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না;—তাহা থাকিবার দরকারও তাঁহারা মনে করেন না। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক, কিংবা ডি-পি-আই বিভাগই হউক,—ইঁহাদের এ ধারণা নাই যে ছেলেরা "দেখিয়া" যতটা শেখে, "শিখিয়া" ততটা শেখে না। এই কারণেই তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতি, কুফল প্রসব না করুক, নিষ্ফল হয় নিশ্চয়ই।

দৃষ্টান্ত দিতেছি। ছেলেদের পাঠ্য-তালিকায় "স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে বেশ সুন্দর সব পুস্তক আছে। এই গুলিতে কি প্রকারে কেরোসিনের সাহায্যে ম্যালেরিয়া মশকের বংশবৃদ্ধি নিবারণ করা যায় সে কথা আছে; কলেরার ও বসন্তের প্রতিষেধক সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশও আছে। এগুলি হয়তো শিক্ষক মহাশয়ই ভাল করিয়া বুঝেন না, ছেলেদের পিতামাতাও এসব জ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীন। কাজেই ছেলেরা কাণ পাতিয়া শোনে ও একবার হাই তুলিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলে। আবার, গৃহমধ্যে নিষ্ঠিবনত্যাগ কিংবা মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে উপদেশগুলি গলাধঃকরণ তাহারা করিতে পারে না। কেন না, যে-শিক্ষক মহাশয় তাহাকে শিক্ষা দেন—তাঁহার মুখের গন্ধে হয়তো কাছে যাওয়া যায় না। কিংবা তিনি হয়তো পাঠ-ঘরের মধ্যেই মুহুর্মুহু নিষ্ঠিবন ত্যাগ করেন। তদুপরি যদি গৃহে পিতামাতাকেও ঐরূপ আচরণ করিতে দেখে তবে সোনায় সোহাগা। ফলে চোখের দেখা ও পড়িয়া শেখার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়।

স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞানার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে পথ-নির্দ্দেশ করা ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা জাগাইয়া তোলা। চরিত্র-গঠন ইত্যাদি অবান্তর উদ্দেশ্য আধুনিক স্কুল কলেজের ঘাড়ে চাপাইতে চাহি না। জ্ঞানার্জ্জনের আনন্দ যদি ছেলেদের মনে না জাগান যায়, তবে শিক্ষার ফল কি হইল? এখনকার পাঠ্যতালিকা দেখিলে বিদ্যাভ্যাস বিভীষিকা বিশেষ বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানার্জ্জনের যে আনন্দ আছে তাহা যদি ছেলেরা উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে সে বিদ্যাভ্যাসের ধার দিয়াও সে হাঁটিবে না। এই জন্যই দেখা যায় যে, স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যখন ছেলেরা জীবন-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় তখন জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা ছাড়িয়া 'রহস্য-সিরিজ'এর কাটতি বাড়াইয়া তোলে। আধুনিক

বাংলায় স্যার আশুতোষের মত পণ্ডিত কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। বর্ত্তমান জগতের এমন বিষয় নাই যাহাতে তাঁহার ব্যাবহারিক দখল ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্কুল-জীবনে কি তিনি বহু পাঠ্য-বিষয়ের ভারে নিপীড়িত হইয়াছিলেন? সম্ভবতঃ উহার অভাবটাই তাঁহার মেধা ও ধী-শক্তির বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল। আজকালকার বিদ্যালয়ে হয়তো আশুতোষ বাবু স্যর আশুতোষে পরিণত হইতেন না।

এখনকার শিক্ষা-প্রণালী দেখিলে মনে হয় যে উদ্দেশ্যটা যেন সরাসরি এক একটি এডিসন বা স্যার জগদীশ তৈরী করা—যেমন, কোনও গেঞ্জি মোজার কারখানায় হু হু করিয়া গেঞ্জি মোজা তৈয়ারী হয় তেমনি একটা কিছু—! জ্ঞানার্জ্জনের আনন্দরস প্রথম জীবনে আস্বাদন করা থাকিলেই উত্তর কালে জ্ঞানান্বেষণ-প্রবৃত্তি প্রবল হয়। এবং তাহারই ফলে এক একটি জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও বিবেকানন্দের উদ্ভব হয়। এ যেন 'রোয়া' ধানের মত। স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে যে নিজ শিকড় ফেলিয়া জীবন ও চেতনা লাভ করে,—তাহাকে যখন জীবনের সুপরিসর কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া 'রোয়া' দেওয়া হয় তখন সে বাহিরের আবহাওয়ায় সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও আপনার শক্তিকে সঞ্চিত ও অন্তর্নিহিত রাখিয়া ফলে ফুলে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু আমাদের এ শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি? ছেলেদের পঞ্চাশখানি বহি মুখস্থ করিতে হইবে; পড়া না পারিলে শিক্ষক ঠেঙ্গাইবেন; এবং সেই ভয়ে বাড়ীতে সব সময়টুকু পুস্তকে মুখ গুঁজিয়া থাকিতে হইবে।—নহিলে, যদি সে রাজনীতিচর্চ্চায় মাতিয়া উঠে! এইরূপই একটা আশঙ্কা কি আমাদের পাঠ্যনিয়ামকদের মনে ছিল? আকাশের তারার নীরব আশীর্ব্বাদ, পাখীর কলকাকলী, বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি—এ সব হইতে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণ করিবার অবকাশ ও অবসর তাহাকে দেওয়া হইতেছে না কেন?

আমাদের দেশের শিক্ষকদের অনেক তোড়জোড় করিয়া 'আর্ট অব টিচিং' শিখান হয়। যে দেশ হইতে ইহা আমদানী করা হইয়াছে—সেই ইউরোপ ও আমেরিকায় টিচিংকে একটা কলাবিদ্যায় পরিণত করা হইয়াছে। সে দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাবহারিক প্রয়োগ এখানে দেখিতে পাই না। আমাদের শিক্ষকরা 'আর্ট অব টিচিং' শিখিতেছেন না "আর্টফুলনেস্" (artfulness) অব্ টিচিং আয়ত্ত করিতেছেন বুঝা কঠিন। শিক্ষকদের দোষ দিব না। যে দেশে তাঁহাদিগকে স্কুলের খাতায় ৭০৲ টাকা সহি করিয়া ৩৫৲ টাকা পকেটস্থ করিতে হয়, সে দেশে শরীরের খোরাক যথেষ্ট উদরস্থ হয় না। কাজেই "আর্ট" ছাড়িয়া "আর্টফুলনেস"এর দিকে স্বতঃই মন ঝুঁকিয়া পড়ে।

আমাদের শিক্ষা-বিভাগের ভার নাই "ভড়ং" আছে। আমার মনে আছে আমাদের স্কুলে একটি কাঁচ-ঘেরা কাষ্ঠাধারে (শো-কেসে) কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড ও নানাবিধ শস্যের নমুনা রক্ষিত ছিল। যে-শিক্ষক এগুলি একত্র করিয়াছিলেন তিনি পরিদর্শক মহাশয়ের নিকট প্রশংসা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ছেলেদের লাভ কি হইল? গৃহপ্রকোষ্ঠে বসিয়া কয়েক খণ্ড প্রস্তর নাড়িয়া চাড়িয়া সে কিছুই শেখে না। উন্মুক্ত প্রান্তরে গিরিপাদমূলে যাইয়া ভূপৃষ্ঠের স্তরবিন্যাসের পরিচয় যত সহজে আয়ত্ত হয়, যে আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হয় এবং যেরূপ নিবিড় ভাবে মনে গাঁথিয়া যায়, সে-খবর শিক্ষক ও শিক্ষা-বিভাগ হয়তো রাখেন, কিন্তু কাজে এ প্রণালী দেখিতে পাই না কেন?

আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে আনন্দ নাই। ফলে, জীবনের সৌন্দর্য্য ও লালিত্যবোধ বিদূরিত হয়। এবং তৎসঙ্গে চরিত্রের এমন একটা জিনিস বালক হারাইয়া বসে, যাহার অভাবে জাতিহিসাবে আমাদের উন্নতির সমূহ বিঘ্ন হইতেছে। এই জিনিসটি power of initiative বা সহজ বুদ্ধির নৈপুণ্য।

মানব-শিশু অত্যন্ত চিন্তাশীল জীব। সে সব সময়েই ভাবে, চিন্তা করে ও দৃশ্যমান বস্তুর কার্য্যকারণনির্দ্ধারণে ব্যস্ত থাকে। তাহার বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে নিয়মিত করার চেষ্টাই সকল শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য। যে কোনও কাজের মধ্য দিয়াই ইহা সম্ভব—শুধু বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগের দ্বারা নহে। কেন না "মনঃসংযোগ"টা আগে তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে—তার পর পুস্তকে মন

দেওয়া চলে। শিশুর মনে কয়েকটি বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয় :—

১। আনন্দ; ইহাতে শুচিতা ও সৌন্দর্য্যবোধ আসিবে এবং ইহাতেই তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। আমাদের শিক্ষা-বিভাগ শিশু-জীবন যতটা নিরানন্দ ও ভয়াবহ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্বারা ছেলেদের স্কুল-জীবনে আনন্দের খোরাক জুটিবে ডি-পি-আই বিভাগ যাহা করিতে পারেন নাই, তিনি তাহা করিয়া দেশের মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় দত্ত মহাশয়-প্রদর্শিত "ফোক ডান্স" (folk-dance) যদি শিক্ষাবিভাগ প্রচলিত না করেন তবে তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে।

২। একাগ্রতা : সদাচঞ্চল মনকে সংযত করিয়া চিন্তাশক্তি একটি মাত্র বিষয়ে নিবিষ্ট করিবার ক্ষমতাবলে মানুষ সময় ও দূরত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। আজ পর্য্যন্ত একাগ্রতা ব্যতিরেকে মানুষ কোনও বড় কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই। অথচ বর্ত্তমান শিক্ষাধারার মধ্যে ইহা শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। ছেলেদের কাজের মধ্য দিয়া মনোনিবেশের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে ও মনের একাগ্রতা আনয়ন করিতে শিখাইতে হইবে। কয়েক বৎসর স্কুলের পরিচালনা-কার্য্য করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহা হইতে আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে পারি যে প্রত্যেক স্কুলে "চরকা" ও "তকলী"র ব্যবস্থা করা নিতান্ত বিধেয়। চরকাকাটার ফলে বালক একাগ্রতা, ধীরতা ও শৃঙ্খলা শেখে। কৃতকার্য্যতার অপার আনন্দ অনুভব করে এবং আত্ম-নির্ভরতা লাভ করে। এবং এই আত্মনির্ভরতা না থাকিলে power of initiative কোনও দিন আসে না। আমি লক্ষ্য করিয়াছি আমার বহু ছাত্রের এতদ্বারা চরিত্র-বিকাশের সুবিধা হইয়াছে।

৩। পর্য্যবেক্ষণ শক্তি; আমরা অনেকেই চলাফেরা করি বটে কিন্তু আশে পাশে লক্ষ্য করি কতটা? বাল্যকালে "আইজ অ্যাণ্ড নো আইজ" অর্থাৎ "দেখা ও না-দেখা" নামে এক পাঠ আমাদের পড়িতে হইত। পাশ্চাত্ত্য জাতির এদিকে খুব নজর। কেননা এই শক্তির অভাব হইলে সৈন্য পরিচালনা, নৌ-পরিচালনা ও বড় বড় কারখানা পরিচালনার দক্ষতা আসে না। এদেশে চোখ ব্যবহার করিয়া মনকে চালিত করিবার কোনও চেষ্টা নাই। এখনকার ছেলেরা সবাই "না-দেখা"র দলে। বিচার-বুদ্ধির সহিত চোখের ব্যবহার করার ফলেই কর্ম্মজীবনে মানুষ কুশলী হইতে পারে। বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা বালক বালিকার মধ্যে স্বতঃই আছে। শুধু অনুশীলনের অভাবে তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। শিক্ষা দেওয়ার নামে ছেলেদের initiative নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। একটা বুদ্ধিমান জাতির প্রতি এতখানি অবিচারের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

শিক্ষায়তন-গুলিতে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির উন্মেষের জন্য প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। প্রাণিতত্ত্বের মধ্যে পক্ষি-তত্ত্বের আলোচনা সহজ-সাধ্য হইতে পারে। শিক্ষকগণ ইহা সত্বর আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবেন, ছেলেদের আনন্দবর্দ্ধক হইবে; অভিভাবকদেরও ভীতিপ্রদ হইবে না, কেননা ইহাতে খরচ বেশী নাই।

এমনই করিয়া নানা দিক দিয়া প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মোড় ফিরাইবার একটা আশু প্রয়োজন আছে—যে প্রয়োজন হয়তো দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত।

চেনা-অচেনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

৬
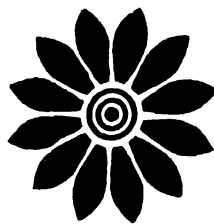
তোমার চিঠি! তোমার দীর্ঘ চিঠি! আজ সকালে সামনের লাইন থেকে ফেরবার পথে কামানের সারের কাছে গেলুম। আজ ঠিক সেই রকমের দিন যেদিন আকাশে বাতাসে বৈচিত্র্যের, সৌভাগ্যের লক্ষণ নানা আকারে ফুটে উঠে আকাশ যেন অনেক উপরে উঠে গিয়েছে, সাদা মেঘের টুকরো নৌকার পালের মত যেন দুলছে। পায়ের নীচে কাদা শুকিয়ে যাচ্ছে আর বাতাসে যেন নব বসন্তের আমেজ। এমন দিনে লণ্ডনে আমরা প্রিম্‌রোজ ফুলের খোঁজ করি, আর নিউইয়র্কে তোমাদের রাস্তায় কোন ফুল বিক্রী হয়? একদিন, যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তুমি আমায় ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউতে বেড়াতে নিয়ে যাবে, সেদিন তা জানতে পারব। এমন দিনেই মাথায় শত কল্পনা জাগে, ভবিষ্যৎটা কাছে চলে আসে, মনে মনে অনুভব হতে থাকে যে, এ জীবন চিরকালের।

আমরা যখন নিউইয়র্কে মিলব, তখন প্যারিসে তুমি যে পোষাক পরেছিলে, তার চলন উঠে যাবে। তুমি কি রকম সাজবে তাই ভাবছি। শুধু আমায় খুসী করবার জন্য হয়ত তুমি —কি বল? না, না, অত বেশী আমি কেমন করে আশা করব? কোন পুরুষকে খুসী করবার জন্য কোন মেয়েই দুবছরের পুরানো বাসন্তী রঙে সাজতে পারে না।

যুদ্ধটা কি রকম তা হলে কিছু দেখছ? তুমি বেশ স্পষ্ট করে' আমায় লিখতে পারনি, তবু তোমার চিঠির মধ্যে আমি সে কথাটা ভালই বুঝেছি। একমাস আগে গুজব শুনেছিলুম, ফরাসীদের একটা সৈন্যাবাস জার্ম্মাণ আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে। তুমি যে সেখানে থাকতে পার, এ-কথা আমার মনেই হয়নি। সেই জন্যই কিন্তু আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিজে সাহসী হওয়া সহজ, কিন্তু তুমি বিপদের সীমার মধ্যে আছ খবর পেলে আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠত। তোমার মনে আছে ত, যুদ্ধের প্রথম সারের খুব কাছাকাছি এক হাসপাতালে তোমায় পাঠাচ্ছে শুনে, আমি কি রকম প্রতিবাদ করেছিলুম? আমার বাচালতায় হয়ত সেদিন তুমি বিরক্ত হয়েছিলে। আমাদের সঙ্গে এই মরণ-খেলায় যোগ দেবার তোমার কি অদ্ভুত আগ্রহ! তুমি তখন যা বলেছিলে তা আজও আমার মনে আছে—"তোমাদের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের জীবনের দাম কম -জগতে মেয়ের অভাব হবে না। তোমরা যদি মরণের যোগ্য বলে ছাড়া পাও, তবে আমরা কেন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব?" কথাটা মনে পড়ছে আর আমার জীবনে তোমার পরিচয়ের গৌরব বোধ করছি। তোমার জন্য আমার গর্ব্ব হচ্ছে।

এইবার তোমার সুদীর্ঘ নীরবতার কারণ বুঝলুম। অবশ্য চিঠি-লেখা বন্ধ করবার সামরিক হুকুম না থাকলেই কি তুমি লিখতে পারতে। তোমার কাজের কি আর অন্ত আছে? তোমার চিঠি পড়ছি আর সেই ভয়ানক দিনগুলোর কল্পনা করছি, জার্ম্মাণরা যেদিন লাইন ভেঙ্গে ভিতরে চলে এল। তোমায় যেন দেখতে পাচ্ছি। বোমার আঘাতে জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ সহরের পথে যাতায়াত করছ, অসহায় শিশুরক্ষার ভার যে তোমার উপরে। এতেও তোমার তৃপ্তি হ'ল না। যুদ্ধের মধ্যে থাকবার আশায় আহতদের সেবার ভার নিয়েছ। বেশ মেয়ে তুমি!

মৃত্যুর নিমন্ত্রণে গান করতে করতে বাজনার তালে তালে পা ফেলে যারা যাত্রা করে, সেই সব সৈনিককে তুমি দেখেছ; পথের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহ দিয়েছ। চরমোল্লাসে তারা তোমায় চুম্বন উড়িয়ে অভিবাদন করেছে—আর হাসি-মুখে তুমিও সে চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছ! অনেকের পক্ষে তুমিই শেষ নারী-মূর্ত্তি, যাকে তারা এ জগতে দেখে গেল। মহান্ ত্যাগের সামনে সব জিনিস কত সরল, কত সুখাবহ। মার্কিন রেড ক্রশের

উর্দ্দিপরা তোমার ছবি আমার চোখে ফুটে উঠছে—তোমার মাথার সাদা ওড়নাটা পিছনে দুলছে, মুখখানি তোমার আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তোমার পাশ দিয়ে মৃত্যু-চিহ্নিত সৈন্যদল অবিরাম এগিয়ে চলেছে—বীরত্বের আনন্দে বিশ্বের সব কিছুই তাদের কাছে তুচ্ছ!

তুমিই আবার সেই দলকে ফিরে আসতে দেখেছ, সেই বিরাট প্রবাহের রক্ত-মাখা ছোট ছোট ঢেউগুলো—হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই, খোঁড়াতে, খোঁড়াতে, ডুলিতে শুয়ে, তাড়াতাড়ি সব হাসপাতালের মধ্যে আশ্রয় নিলে। তুমি আমায় যত কিছু লিখেছ, তার মধ্যে সব চেয়ে মনে বেজেছে সেই লোকটির কথা, যার দুখানি ঠোঁটই উড়ে গিয়েছে, অথচ কৃতজ্ঞতার আবেগে শুধু ব্যাণ্ডেজটা তোমার জামার উপর যে চেপে ধরলে।

তুমি লিখেছ, যদি তোমায় এখন দেখি তবে অনেক পরিবর্ত্তনই আমার চোখে ঠেকবে। এত রাত্রি যে বিনিদ্র যাপন করেছ, বারে বারে যে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছ—আগুনে ধাতুর যে বিশুদ্ধি, তোমার মধ্যেও সেই পরিবর্ত্তন আমি কামনা করেছি, আজও করছি।

তা হলে তোমার বন্ধুর মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হ'ল। তাঁর সেই চাপা-কান্নার হঠাৎ প্রকাশের মত তীব্র কণ্ঠের উক্তি আমি ভুলিনি—"তাকে বিয়ে করলে ভালই করতুম।" প্রণয়ী যুদ্ধে মারা যাবার পর থেকে তিনি যে কেবলই বিপদ-বরণ ব্রত নিয়ে ছিলেন, এবার তার উদ্‌যাপন। তাঁর প্রিয়তমের মরণ-ভাগ্যে ভাগ বসিয়ে, তিনি এখন নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এই যে ভাবনাটা তাঁর মনকে সাপের মত ঘিরে ধরেছিল, মনে হয়ত এর মধ্যে বিবেকের দংশনও ছিল। তোমার কি মনে হয়? হয়ত যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর প্রণয়ী তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ইনি রাজী হন নি। আমার ত তাই মনে হয়। মরণোন্মুখ প্রিয়তমকে শেলের আগুন থেকে নিজের দেহ দিয়ে রক্ষা করার মধ্যে হয়ত অপূর্ব্ব একটা সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু কর্ম্ম-জগতে তার মূল্য কতটুকু! তুমি ত লিখেছ যে, তোমার বন্ধু কোন রকমে প্রাণ-বিসর্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তবু মনে হয়, তাঁর মৃত্যুর অপরিসীম ব্যর্থতা মরণকে আরও মধুর, আরও বীর্য্যময় করে তুলেছে।

তাঁকে দেখে কিন্তু এ ধরণের মেয়ে বলে আদৌ আমার মনে হয় নি। আমি ভেবেছিলুম তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত, স্বার্থপর আর ভারি হিসেবী মানুষ। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা হয়ত বেশীই ছিল, তবে তার অন্তরের কোমলতা ধরা পড়েছিল সেদিন সেই কথায়—"তাকে বিয়ে করতুম যদি—।" যুদ্ধকে তুমি গাল দিতে পার, কারণ এর মত সাহসের বাজে খরচ জীবনের আর কোন কাজেই হয় না; কিন্তু বন্ধুর জন্য কেমন করে অবলীলায় মরতে হয়, সে শিক্ষা আর কিছুতে পাওয়া যায় কি? সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে গৌরব প্রচ্ছন্ন তা প্রকাশ করে দেবার শক্তি কেবল যুদ্ধেরই আছে—শান্তির মধ্যে তার সম্ভাবনা কোথায়!

এখন তুমি "অপেক্ষাকৃত নিরাপদে" আছ—সেটা কি রকম, তাই ভাবছি। আবার তুমি লাইনের পিছনে অসহায় শিশুদের সেবায় মন দিয়েছ। লিখেছ, ছোট গ্যাসটনকে তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে। মাত্র ছ'দিনের শিশু; আশি-বছরের বুড়োর মত তার মুখ আর আকাশের মত নীল চোখ দুটি। তুমি লিখেছ 'বেশ সুখে আছ', অথচ যেখানে বাসা পেয়েছ সেটা একটা 'বদ্ধ আর অস্বাস্থ্যকর জায়গা'। বেশ আছ!

তোমায় একটা গোপন কথা বলব? প্যারিসে যখন তোমার সঙ্গে ছিলুম, তখন আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এ কাজে তুমি বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। যখন তুমি যুদ্ধের প্রথম সারের কাছে যাবে বল্লে, তখন আমার স্পষ্টই মনে হ'ল যে, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, সে সম্বন্ধে তোমার এক বিন্দুও ধারণা নেই। তোমায় দেখে এমন কোমল, সুন্দর ও ভঙ্গুর মনে হয়েছিল! জীবনে তোমায় কারো জন্যে কোন কাজ করতে হয় নি। শুধু সাজ-পোষাক করেছ আর গাড়ী চড়ে বেড়িয়েছ। কোন কাজ করতে হলে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা তোমার ছিল না। তোমার চোখে সাধারণ জীবন সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞতার দৃষ্টি দেখেছিলুম, তা কেবল সম্ভ্রান্ত জীবনেই সম্ভব, কারণ অনেক দাম দিয়ে সে অভিজ্ঞতা কিনতে হয়। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস অভিজ্ঞতা আরও দুর্ল্লভ। যুদ্ধের পশ্চিম রঙ্গভূমির বীভৎসতা তোমার ধারণার অতীত—তার গৌরবটুকুও

তোমার চির-অপরিচিত। তোমার চার-পাশে ছিল শান্তি আর বিরামের আবহাওয়া।

হোটেলে বা থিয়েটারে যখন তোমার পাশে বসে অন্য সব মানুষগুলির দিকে চাইতুম, তখন প্রায়ই মনে হ'ত, এই যে সব লোক আজ হাসছে, ছ'মাস পরে এরা থাকবে কোথায়? সেই অজানার দেশে শেল-দীর্ণ মাটির উপর, এদের আমি গাড়ী থেকে পড়ে-যাওয়া বস্তার মত অসহায় ভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। মুখ তাদের কুৎসিত ভাবে বদলে গেছে আর তাদের দৃষ্টিহারা স্থির চোখ পরিবর্ত্তনশীল আকাশের দিকে মিথ্যাই খোলা আছে।

ভেবেছিলুম এসব তুমি কিছু জান না। কোন কালেও জানবে না। ভালবাসায় পড়লে সাধারণ পুরুষের যা সাধ হয়, আমিও তা থেকে মুক্তি পাই নি। আন্তরিক কামনা ছিল, কাছে পেলে, তোমায় অবাস্তবের খাঁচায় বন্ধ করে রাখব; জীবনের রূঢ়তার, রুদ্রতার, বীভৎসতার কোন খবরই তুমি পাবে না। তোমায় নিয়ে এ নিষ্ঠুরতার ও মূর্খতা করবার সুযোগ যে পাই নি, সে আমার সৌভাগ্য। কত বড় অন্যায় করতুম—তা হ'লে তোমার এ ফুল-তনু করুণার অসি নিয়ে যুদ্ধের মাঝে আত্ম-বিসর্জ্জনে আসতে পারত না। আজ তুমি বীরের প্রেয়সী, সেদিন তুমি ছিলে শুধু খেলার পুতুল!

আজ মনে পড়ছে,—একবার তুমি আমায় বলেছিলে, "ধনী হয়ে জন্মাবার কি কষ্ট! সবই তৈরী! তোমায় কিছু করতে হয় না, যেন কিছু করতে তুমি জন্মগ্রহণ কর নি, তোমার কাছ থেকে সেদিক থেকে কেউ কিছু আশাও করে না।" তুমি চাইতে—কি যে চাইতে, তা তুমি নিজেই জানতে না। কিন্তু তোমার ঈপ্সিত বস্তুটি যে সুন্দর, তোমার মনের মত, এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। বিবাহের রঙ্গমঞ্চে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে নতুন করে নিজের জীবনে তোমার মায়ের ভূমিকা অভিনয় করবে, এ চিন্তা কোন দিনই তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ ছিল না। তুমি চেয়েছিলে মাটী ছেড়ে উঠতে, উড়ন-জাহাজে চড়ে আকাশে উড়তে, তারায় তারায় ধাক্কা দিয়ে ফিরতে, গ্রহ-নক্ষত্রের বিশাল প্রাঙ্গণে নতুন খেলার মাঠের সন্ধান করতে। তোমার চাওয়া বোধ করি ব্যর্থ হয় নি। জার্ম্মাণ-আক্রান্ত সহরে গোলাবৃষ্টির মধ্যে বাস করে আর যে-সব সৈনিক মরণের মুখে ছুটে চলেছে, তাদের হাসিমুখে বিদায় দিয়ে তোমার স্বপ্ন বুঝি সফল হ'ল।

সত্যই কি আমাদের খুব কষ্ট হয়? বোধ হয়—না। কাদা আর আঘাতের ক্ষত, দৈহিক যাতনা বা আরামহীনতার শত অসুবিধা আমি অস্বীকার করি না। মন যদি আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে জ্বলে জ্বলে উঠে, সেদিন এ শারীরিক অসুবিধা যে আগুনের ইন্ধন বই আর কিছু নয়!

তুমি আর আমি জীবনকে ভয় করতুম বিভিন্ন দিক দিয়ে। আজ অন্যায়প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে দুজনেই আমরা ভয়কে জয় করেছি। যে জগতে আজ আমরা বিচরণ করছি, এ সাহসের জগৎ। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে আছি বলে' আমাদের সাহস যেন আরও বেড়েছে। আমাদের পক্ষে সেইটিই যে সব চেয়ে বড় ত্যাগ; একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, নিজেকে 'না' বলবার জন্য মানুষের একটা ঝোঁক চেপে যায়; মানুষ বৈজ্ঞানিকের মত কৌতূহলী হয়ে উঠে শুধু আবিষ্কার করতে—তার আত্মত্যাগের সীমা-রেখাটা কোথায়!

যখন তুমি শিশুদের কথা লেখ, তখন মনে হয়, তাদের যেন চোখের সামনে দেখছি—কাছে পেয়েছি। এখানে কামান-গর্ত্তের পিছনে বসে দেখি, তুমি দুহাত দিয়ে তাদের ছোট দেহ বেষ্টন করেছ, তাদের ছোট ছোট মাথা তোমার বুকে পরম সুখে লুটিয়ে পড়েছে। আমার চোখে আজও তুমি কিশোরী—হাতীর দাঁতে-গড়া তন্বী প্রতিমার মত অনুপম তোমার সৌন্দর্য্য। একটা অবর্ণনীয় স্বর্গীয় পবিত্রতায় তুমি মণ্ডিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েবেষ্টিত তোমার ছবিখানি যখন মনে আসে, তখন এমন সব ভবিষ্য দিনের কথা মনে জাগে, এ জীবনে যাদের দেখা কোন কালেই পাবার আশা নেই। মুহূর্ত্তের জন্য আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি। এ যুদ্ধে যারা প্রাণ দিল, তাদের সন্তান সন্ততি তাদের অমরত্বের বিজয়-নিশান। কত মানুষকেই দেখলুম—সকালে হাসি মুখে জেগে উঠল, আর রাত না শেষ হতেই চিরদিনের মত স্থির হয়ে ভূমি-শয্যা নিলে।

না—এ সব চিন্তা আমার অযোগ্য; কালির রেখায় মূর্ত্ত হয়ে তোমার দৃষ্টিগোচর হবার কোন অধিকারই এদের নেই।

তুমি লিখেছ—"বিদায়! যুদ্ধ যে কেমন তা দেখেছি বলে লিখছি যে, নিজের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন—যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী বিপদের মুখে এগিয়ে যাবেন না।"

বন্ধু আমার, যে-সব বিপদ লোকে এড়ায়, তার মুখে সাহস করে' যাব বলেই যে আমি এখানে এসেছি। ভাল সৈনিকের একমাত্র প্রমাণ যে সে আশার অতিরিক্ত কাজ করতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু আমার একটি মিনতি কি তুমি রাখবে? বলব কি? যদি সরে যাবার ভদ্র উপায় থাকে, তবে লক্ষীটি, বোমা-বর্ষণের মধ্যে তুমি থেক না।

তোমার চিন্তায় মন আমার আজ ভরে আছে। তোমার মুখ ত' তোমার কণ্ঠস্বর—যে স্বরের জন্যে তুমি বিশেষ করে' তুমি হয়েছ, তাই মনে করবার চেষ্টা করলুম। দূর ভবিষ্যতে, যুদ্ধ না থামা পর্য্যন্ত, তোমায় দেখবার আশা এত কম যে, আমি ভয় পাই পাছে সত্যিই তুমি যা, তার চেয়ে তোমায় বাড়িয়ে দেখি। প্রাচীন শিল্পীদের ছবি সম্বন্ধে একথাটা কত বেশী খাটে তা বোধ হয় তুমি জান—সাধারণ চিত্রকর সে চিত্র পুনরুদ্ধারের ভার নিলে তার ভিতরের সমস্ত আন্তরিকতাটুকু নষ্ট করে' দেয়—। আমার স্মৃতিতে তোমায় এমন নিখুঁত নির্দ্দোষ করে' দেখতে ইচ্ছা হয় না, যার ফলে তুমি অসাধারণ বা অমানুষ হয়ে ওঠ।

প্রথমে যখন তোমায় ভালবাসলুম তখন আমার মনে তোমার এই অনধিকার প্রবেশে একটু বিরক্ত হয়েছিলুম, কিন্তু আমি বুঝেছি সেটা মোটেই অনধিকার প্রবেশ নয়। সেটা কিছুই নয়, কারণ আজ পর্য্যন্ত আমার জন্যে তুমি কিই বা করেছ। কোন কারণে যদি আমি চিঠি লেখা বন্ধ করতুম, তা হলে তোমার কাছ থেকে এক ছত্র লেখাও পেতুম না। তুমি ছবির মত হাসিমুখে কাছে ডাক অথচ কত দূরে থাক—বিনা চেষ্টায় তুমি আকর্ষণ কর অথচ কেমন নীরব থাক!

এই যুদ্ধে আমি দেহে মনে অমিতবলশালী হতে চাই; প্রভূত কষ্ট স্বীকারে আমার যেন কোন কুণ্ঠা না থাকে। শেষ বিদায়ের বাঁশী যেদিন বাজবে সেদিন যেন অনুতাপ করবার আমার কিছু না থাকে। যখন আমরা সবাই অর্থ সঞ্চয় আর যশ লাভের স্বার্থপর চেষ্টায় ঘোরাফেরা করছিলুম তখন ভালবাসাকে একটা অসুখ বলে সন্দেহের চোখে, অবিশ্বাসের চোখে দেখতুম, অথচ সর্ব্বদাই—সত্যি কথা বলি—প্রাণপণ আগ্রহে আমি এরই জন্যে উৎসুক হয়ে উঠতুম। প্রেম বারম্বার আমায় পাশ কাটিয়ে চলে' গেছে। উন্নতির চেষ্টায় উঠে পড়ে' লেগেছিলুম। জীবনে কত বড় বড় কাজ করতে হবে। নিজেকে স্তোক বাক্যে ভোলাতুম "জীবনে অবসর পাব যখন প্রেমের চর্চ্চা তখন করা যাবে।" চিরদিনই আমি একটা হালছাড়া খেয়ালী। দৃষ্টির অগোচর যা আছে তা পাবার লোভে যা কিছু পেতে পারতুম সে সবই ছেড়ে দিয়েছি। নারীকে যা দেবার যোগ্য এমন একটা কিছু অর্জ্জন করবার বড় সাধ ছিল, তাই বোধ হয় অপেক্ষা করছিলুম।

তারপর এই যুদ্ধ। ভাগ্যকে যাচাই করবার সুবিধা পেলুম। পরের সুখের পথে কাঁটা না হয়ে নিজের মুক্তির জন্যে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিলুম। দুবছর ধরে' আমি সোজা দাঁড়িয়ে আছি—সমস্ত বিপদ, সমস্ত বেদনা একা বহন করেছি। আজ তুমি আমার জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছ!

আগে আগে শত্রুর আক্রমণ লক্ষ্য করতুম আর নানা রকম চিন্তা আমার মনে জাগতো। সাক্ষাৎ মরণের পানে চাইতুম আর ভাবতুম এই সব মৃত মানুষগুলোর ছেলে মেয়ে আছে কি না? এই সব গতায়ু লোকের চেয়ে অনাগত শিশুদের জন্মাতে না পারার বেদনাটুকু আমায় একেবারে আকুল করে' তুলতো। নিজের জীবনেও সেই বেদনা বোধ করতুম, একটি ছোট শিশুর জন্য আমার সমস্ত হৃদয় যেন বুভুক্ষু হয়ে উঠেছিল—আমার মৃত্যুর পরে, দূর ভবিষ্যতে যে শিশু আমারই মত হয়ে উঠতো! আমার জীবন নাট্যের স্বার্থপরতার অঙ্কে এটাকে শিশু-বুভুক্ষার ভূমিকা নাম দিলেও দিতে পারো। মায়ের লালন পালন থেকে আরম্ভ করে' শেষ বয়স পর্য্যন্ত যা কখনও

পুরাণো হয় না সেই অংশটা আমার হৃদয়ে অপূর্ণ অবস্থায় অপেক্ষা করছিল। অসহায় শিশুর দল যেমন করে' তোমার প্রতীক্ষা করে, এ ঠিক সেই রকমের প্রতীক্ষা। তোমায় যখন প্রথম দেখলুম তখন থেকেই আমার অন্তরের সে কান্না ঘুচলো। এ যুদ্ধের খেলা আর যখন ভাল লাগে না, সহ্য-শক্তির শ্রান্তি আসে, নিষ্ঠুরতাও যেন বিশ্রাম চায়, আর সাহসী হবার অবিরাম চেষ্টায় মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন এক বিচিত্র ছবি আমার মাথায় রূপ ধরে —শুধু তুমি আর আমি একটা অন্ধকার ঘরে বসে' আছি; আগুন জ্বলছে; তুমি বসেছ একটা বড় আরাম কেদারায়, আর আমি তোমার পাশে মাটীতে ছোট ছেলের মত জড়সড় হয়ে আছি—তোমার জানুর উপর মাথা রেখে তোমার হাত দুখানি নিয়ে খেলা করছি! সৈনিকের উপযুক্ত স্বপ্ন নয়? না—? কিন্তু শক্তিমান হতে হতে যে অবসাদ আসে; আমার জীবনে যে কটা গণা দিন আছে তার মধ্যেও অন্ততঃ, আমায় কেউ একবার শুধু ভালবাসে এই বাসনা যে মনের মধ্যে অহর্নিশ গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে।

কি সব অদ্ভুত কথা তোমায় লিখছি! তুমি যে আমার জীবনের সব খানি, কোনো আভাসে ইঙ্গিতে তো তোমায় তা জানাই নি! আমার উপর তোমার যে কিছু দরদ আছে, তুমি যে আমার জন্য ভাবো একথা ভাববার কোন কারণ তো তুমি কখনো দাও নি!

অথচ সাধারণ লোকের মধ্যে ভালবাসা ত বিরল বলে' মনে হয় না, আমার গোলন্দাজ দলে এমন কোনো সৈনিক বা অনুচর নেই যার নিজের 'মাধবী' বা 'মাধুরী' নেই। তাদের চিঠি সবই আমায় পরীক্ষা করতে হয়, কাজেই এদের হৃদয়ের গোপন কথা ভাল রকমই আমার জানা আছে। তাদের মধ্যে অনেকে একেবারে পুরোপুরি ডন জুয়ান; প্রায় জন ছয় মেয়েকে একই ভণিতায় চিরস্থায়ী প্রেমের প্রতিজ্ঞা জানাচ্ছে। অনেক চিঠির খামের উপর এই বিচিত্র অক্ষরগুলি লেখা থাকে—**s. w. a. k.**—যার অর্থ হচ্ছে চুম্বন দিয়ে বন্ধ (**sealed with a kiss**)--নিছক বাজে কথা, কারণ চিঠি বন্ধ করা আমারই কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ।

চুম্বন দিয়ে বন্ধ—বেচারী মেয়ের দল; তারা জানে না যে পাছে তারা ভুলে যায় তাই এই সব লিখে শেষ বাঁধনের চেষ্টা হয়েছে।

শিশুর মত আজ তোমায় পাবার ইচ্ছে করছে। পুরুষ যেমন করে' মেয়েকে চায় তেমন করে' নয়। তোমার পরশ আমার প্রয়োজন, তোমার অঞ্চল আমার নিরাপদ আশ্রয়। যাই ঘটুক আমি তোমারই, এই সব কথা নিশ্চিন্ত ভাবে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। ম্যাথু আর্নল্ডের একটা কবিতা আমার মনে পড়ছে; যখন পড়েছিলুম তখন বিদ্রূপ করে' অগ্রাহ্য করেছিলুম; আজ কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি—

> Come to me in my dreams and then
> By day I shall be well again;
> For then the night will more than pay
> The hopeless longing of the day.

অথচ আমার মনে হয় এই লাইন কটা লেখার পরেই তুমি যদি ম্যাথু আর্নল্ডকে দেখতে তাহলে তাঁকে নিতান্ত আত্ম-সংহত ও নির্ব্বিকার বলে' বোধ হ'ত। শিশুর মত রাত্রে জেগে উঠে নিতান্ত একা, নিঃসহায় বোধ করার যে বেদনা তা তাঁর ভিতরে গুমরে উঠতো অথচ বহির্জ্জগতে তিনি যেন বিশ্বের সমস্ত ভাবাবেগের উপর মনের সমস্ত বিবেচনার বরফ চাপিয়ে বেরিয়েছেন!

শিশুর মত রাত্রে হঠাৎ জেগে নিতান্ত একা বোধ করেছে কোনদিন! আজ আমার অবস্থা ঠিক তাই। আমি ঘুমিয়ে ছিলুম। তুমি চুপি চুপি আমার বিছানার কাছে এসে আমায় জাগিয়ে দিলে, আর জেগে উঠে দেখি তুমি কখন চলে' গেছ। আমি শুধু তোমাকেই চাই, চাই অন্ধকারের মধ্যে আমার হাতে তোমার হাতের আর আমার কণ্ঠে তোমার বাহুর নিবিড় পরশ!

যদি এমনি করে' লাগাম ছেড়ে দি তবে তোমায় সব কথা বলে' ফেলবো, কিন্তু বলা ত' আমার ভাল হবে না। তোমায় আমি ভুলবই, যেমন তুমি আমায় ভুলেছ। ভুলেছ কি তুমি? নিজেকে বাইরে এনে দেখতে হবে—আমার সত্য সত্তাকে জানতে হবে। যে বড় যন্ত্রটা জগতের উদ্ধারের জন্য লড়াই করছে আমি তাতে আটকান একটা সামান্য পেরেক বই আর কিছুই নই। এমন একজন মানুষ

যে কালই মরতে পারে অথচ তাতে জাতির যাত্রার কোন ক্ষতিই হবে না। কি তার দাম? অস্নাত, বিশ্রী একটা লোক, একটা পুরাণো যুদ্ধক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলার মধ্যে বসে' তার ভাগে যে অণুর মত সামান্য একটু কাজ পড়েছে তাই করছে। আমার কাজের অংশ! কিন্তু এই অংশটুকুই যে আমায় মনে রাখতেই হবে। আমার কাজ থেকে যদি আমায় থামাও তবে তোমায় নিশ্চয়ই ভুলে যাবো। এমন লোকের অভাব নেই যারা মনে রাখতে পারে—তারা, যাদের ছেলে আছে, স্ত্রী আছে, প্রণয়িনী আছে। আমাদের দুর্ব্বল হবার যো নেই, কারুকে মনে রাখবার যো নেই! আমাদের কেবল এগিয়ে যেতে হবে! যে উদ্দেশ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি তা সফল করতে হলে জীবনকে সস্তা করে' বন্ধুর পথ দিয়ে কামান টেনে কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে! যদি এর জন্য নরকের শক্তিকেও পরাস্ত করতে হয়, এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা কেউ তা থেকে পিছপাও হব না!

তবু……আর ছল করে' কি লাভ? আমাদের প্রত্যেকের মনের মাঝে একটি ছোট ছেলে আছে যে বিছানায় শুয়ে বায়না করে, আর দুর্ব্বল ছোট হাতে অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দেয়। এ হয়ত সত্যি—কিন্তু আমাদের মুখের রেখা দেখে কে তা বুঝবে?

৮

আমার মনে হচ্ছে যে আমার ভিতরকার ইংরেজটি নিজেকে জাহির করছেন, কারণ জীবনে তুমি আমার সব চেয়ে বড় সুখ, অথচ দুঃখের কান্নার মধ্যে কেবলই তোমায় টেনে আনছি। তোমার পক্ষে এটা আদৌ প্রশংসার কথা নয়, একটুও প্রীতিকর নয়। না, আমি আর এমন করে' লিখবো না। আনন্দের অভাব প্রেমহীনতারই রূপান্তর। যদি একটু তলিয়ে দেখ ত' দেখবে এটা অধর্ম্ম, কারণ বিধাতার বিশ্বের মঙ্গলের উপর সন্দেহই এই অসুখের ভিত্তি। আমার মনে হয় অসুখী লোকেরা যা খোঁজে তা পায় না—তাদের তা না পাওয়াই উচিত।

টমাস হার্ডির উপন্যাসে যখন কোন লোক বিপদে পড়ে সে বলে, "অদৃষ্টে ছিল তাই এমন হ'ল।" একথায় তার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমি একে অদৃষ্ট বলি না, আমি বলি—সময় বুঝে কাজ করার শক্তির অভাব। হার্ডির নায়ক যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে, সে তখনই ভাবতে থাকে যে সে হয়ত সত্যিই ভালবাসে নি। সে কখনও নরম কখনও গরম হয়ে ন্যাকামি করেই চলে—তাতে আর একটা লোক এসে জোটে, আর তখনি প্রথম লোকটা যেন বুঝতে পারে যে এই মেয়েটিকে তার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, আর মেয়েটি আবিষ্কার করে যে অন্যদিকে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করা বিশেষ দরকার। ছোকরা তখন মরিয়া হয়ে উঠে—মানুষ-বাচ্ছার মত অগ্রসর না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর পথ খোলা রেখে দেশ ত্যাগ করে' চলে' যায়। প্রথমের কাছ থেকে ফিরেই মেয়েটি দ্বিতীয়কে বিয়ে করে, কিন্তু বর্ত্তমান স্বামীর সঙ্গে উচিত ব্যবহার না করে' পয়লা নম্বরের জন্যে হা-হুতাশ জুড়ে দেয়। এমনি করে' অতীতের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে এবং তার ফলে বিবাহিত জীবনটাকে যতদূর পারে বিশৃঙ্খল করে' তোলে। জীবনের বন্ধুর পথে সে কেবলই পায় আঘাত, কারণ সে কোথায় যাচ্ছে তা দেখে ত' চলছে না। আঘাতের মাত্রাটা যখন যথেষ্ট হয়ে ওঠে, প্রথম নম্বর তখন দেশে ফিরে আসে এবং বুঝতে পারে যে মেয়েটিকে তার আর কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তার অনুপস্থিতিতে সে অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কেউ কাউকে দোষ দেয় না, সুগভীর বিষাদের সুরে কেবল বলে—"এমনি অদৃষ্ট!" আর সেইখানেই বই শেষ হয়ে যায়।

হার্ডি লেখেন ভারি সুন্দর কিন্তু তিনি সত্যবাদী হলে আরও খুসী হতুম। লোক যখন কাপুরুষ হয়ে ওঠে, তখনি জীবনটা একটা বিশ্রী ব্যাপারে দাঁড়ায়। ভগবানকে ধন্যবাদ, অতীতে যত অব্যবস্থিতচিত্তই থাকি ফ্রান্সে এসে চরম পর্য্যন্ত যেতে শিখেছি। আমরা সবাই জুয়াড়ী। পুরো ঘুটী নিয়ে মৃত্যু আমাদের বিরুদ্ধে খেলছে। আমাদের বাজী হচ্ছে সম্মানিত জীবন; যদি জীবন হারাই গৌরব ত' থাকবে!

তোমায় যে সব কথা লিখেছি তা যদি তুমি দেখতে ত ভারি লজ্জা পেতুম। সেগুলো দেখার অযোগ্য। আমার গৌরবের, মহত্ত্বের রূপটা তার মধ্যে ফোটে নি। নিজেকে যেমন করে' এঁকেছি আমি ঠিক তেমন নই—বাস্তবিকই

আমি ওরকম নই। কাজ যতই বিশ্রী হোক, তাতে আমি স্বেচ্ছায় যোগ দিই; দলের সেরা লোকদের সঙ্গে সমান পাল্লায়। কোথায় কিছু গোল হ'লে আমি কাতর হই না। যা তার ফলাফল তা সহজভাবে গ্রহণ করি। তোমার বেলা শুধু তোমার মুখ চেয়ে স্বেচ্ছায় এই মৌনিতা আমি বরণ করে' নিয়েছি; আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই এবং যুদ্ধে যেমন নিচ্ছি, এ বিষয়েও ফলাফল সহজ ভাবেই নেব। কিন্তু বন্ধু! একটি মাত্র কথা আমার স্বপক্ষে বলতে চাই—কি আচম্বিতেই তুমি আমার সামনে এসেছ! আমার অন্তরে কি ব্যাকুলতাই তুমি জাগিয়েছ! তোমার এই আবির্ভাবে সেই এক ভবিষ্যতের স্পষ্ট আভাস পেলুম যা আমি কখনও ভোগ করতে পাব না। অথচ তোমার আশা ছাড়বার আগে এ জীবনে যা কিছু আশা করেছিলুম তা সবই তোমার কাছে পেতুম। তুমি কি বুঝছো না? অনেক দিনের বুভুক্ষায় আমি লোভী হয়ে উঠেছি। জাগবার আগেই আমি কেঁদে উঠেছি। বাইবেলে একটা গল্প আছে না, যে সেণ্টপিটার গির্জ্জার চলতি ছায়াটা গায়ের উপর পড়ে' রোগ সারাবার আশায় লোকেরা সহরের পথে রোগীদের শুইয়ে দিত। সেই রোগীদের কাছে যেমন সেণ্টপিটারের ছায়া, আমার কাছে তুমি তেমনি। আমার জীবনের পথে তোমার আবির্ভাব আমার সব রোগ থেকে নিরাময় করেছে—কিন্তু ছায়ার চেয়ে আরও বেশী পাবার লোভটাও বাড়িয়েছে। তুমি যে সব সহর দিয়ে যাবে সেখানে তোমায় অনুসরণ করতে পারবো না, এ চিন্তায় মন যে আমার শূন্য হয়ে যায়।

যাক্ সে ভাবনা চুকেছে। তোমায় ভালবাসি বলেই আমি সুখী হবো। সুখী না হওয়াটা যে বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা যা করছি তার ভিতরকার মহত্ত্বের স্বপ্নটা কোন দিন আমার মাথা থেকে যায় নি, এখন সেটা আবার নতুন আলোয় ও বীরত্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কামানের গর্ত্ত তৈরি করবার জন্য বালিভরা থলি সাজান, ভাঙ্গা ট্রেঞ্চে বসে' বসে' দিনের পর দিন চৌকী দেওয়া এবং শত্রুর বন্দুকের গুলি ও গ্যাসের ধোঁয়া অবিরাম সহ্য করা এই সমস্তই বাইরের দিক থেকে বিচার করলে যতই একঘেয়ে ও বিরক্তিজনক মনে হোক না কেন, আজ আমি এর মধ্যে উপন্যাসের চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি। তুমি যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছ, আর হঠাৎ এই যুদ্ধটা একেবারে আর্থারের গল্প হ'য়ে উঠলো, যার মধ্যে আমি নায়ক আর তুমি নায়িকা। আমি আগে বলতুম যে সবায়ের মুখ চেয়ে এ যুদ্ধে এসেছি, এখন মনে মনে বলি—এ শুধু তারই জন্য। যার জন্য আমি যুদ্ধ করছি সেই মঙ্গলের তুমি যেন মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ।

গ্যাষ্টন-ডি-ফোয়ার (Gaston de Foix) কথা কখনও শুনেছ? ইতালির নব যুগে সেই ছিল সব চেয়ে দিলখোলা যোদ্ধা—পাতলা একটা ছোক্রা, অন্তরে তার হাসির উৎস, কড়া মদের মত তার চোখ আর চুল তার মধু রঙের। সে যেদিন খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াত, দেশের প্রতি পরাজয় বিজয়ে পরিণত হ'ত। যখন কোন অবরুদ্ধ সহরের দেওয়াল রক্তে এত পিছল হয়ে উঠতো যে কেউ বেয়ে উঠতে সাহস করতো না—সে তার মোজা জুতো খুলে ফেলতো—কি এক সয়তানী বুদ্ধিতে ডান হাতটা পিছনে বাঁধতো আর বাঁ হাতের কব্জিতে তার প্রণয়িনীর রুমাল বেঁধে সেই হাতেই তলোয়ার বাগিয়ে আক্রমণকারী দেশ-সৈন্যকে বিজয়ের পথে চালনা করতো। এই সব ভয়ানক বিপদের সামনে যে সে যেত তার এক মাত্র কারণ তাতে তার প্রণয়িনীর গৌরব বাড়বে।

হাতে বাঁধবার মত রুমাল আমার নেই, কিন্তু তোমার চিঠি ক'খানি আমার বুকের কাছেই আছে—সেগুলিকে মন্ত্রপূত কবচের মত আমি সব সময়ে সঙ্গে রাখি। তুমি যে একথা জান না তাতে কিছু এসে যায় না। এ যুদ্ধের সঙ্গে আমার প্রেমের ভারি একটা মিল আছে, কারণ দুটোই সমান অজানা। ইহুদী কুলগুরু মোজেসের মতই আমরা পাহাড় বেয়ে উঠি এবং আর কখনও ফিরি না। যাদের আমরা মারি তাদের কখনও চোখে দেখি না এবং যখন মরি তখন অজানা হাতের আঘাতেই মারা পড়ি। আমাদের কোথায় কবর দেওয়া হয় তা কেউ জানে না। আমাদের চিঠিতে আমরা কোথায় আছি তার আভাস মাত্র থাকে না। আমাদের ঠিকানা সেই একঘেয়ে নিতান্ত বিশেষত্বহীন b. e. f. France. আমরা কি করছি তা লেখবার উপায় নেই, মনে মনে আমরা যা কিছু করি তাই শুধু লিখতে পারি। নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে ফেলবার এই যে বিশ্বের দাবী এ ভারি চমৎকার! গ্যাষ্টন-ডি-ফোয়া তার দুঃসাহসিক কাজ থেকে ফিরতো

আর সহরগুলো তার সম্মানের জন্য ফুলের মালায় সাজান হতো—কবিরা তার সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করতো। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে চলতো সেই সমস্ত গানের মহল্লা, তার নামে ভোজের উৎসব হতো এবং তরুণ বীর তার প্রণয়িনীর সঙ্গে এই সবে যোগ দিত, নিজের রক্তে ছোপান রুমাল তার হাতে বাঁধা—সে জানতো তার ভালবাসাই তার সাহসের মুক্ত উৎস।

কিন্তু আমরা এখন এত বেশী বীরের সংখ্যা বেড়ে গেছে যে বেছে নেবার কেউ নেই—আমরা জাতকে জাত বীর হয়ে উঠেছি। সাহসী হওয়াটা এখন নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং সাহসী না হওয়াটাই এখন একটা ঘৃণ্য ব্যতিক্রম।

ট্রেঞ্চ থেকে আমরা লণ্ডনের ধূসরতার মধ্যে চলে যাই সবায়ের অলক্ষিতে, হয় ছুটীর গাড়ীতে সচল বস্তার মত, নয় আহতের খাটিয়ায় শুয়ে। আমরা সংখ্যায় এত বেশী যে আমাদের মধ্যে কেউ যদি একেবারেই না ফেরে খুব কম লোকেই তা লক্ষ্য করে। প্রণয়িনীর স্মরণ-চিহ্ন হাতে বেঁধে গ্যাষ্টন-ডি-ফোয়ার মত সাহসের খেলা করা সহজ, যখন তুমি জান যে সমস্ত ইতালি তোমায় অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে; কিন্তু অলক্ষিতে, রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়া, অসাধ্য সাধন করা, অথচ তাকে খুব সাধারণ বলে' চালান, পুরস্কৃত না হয়ে বাঁচা, আর ভিড়ের মধ্যে মরা অথচ মরতে পেয়েছ বলে কৃতজ্ঞ হওয়া—এই রকম নির্ভীকতার তুলনা আর কখনও মিলবে কি? আমাদের সামান্যতম সৈনিকের মধ্যেও এই রকম নির্ভীকতা যথেষ্ট। আমি ভালবাসি এদের—আমার এই দলের লোকদের। স্বর্গে যদি 'খাকী' না থাকে তাহ'লে আমি ভারি অসোয়াস্তি বোধ করব।

সেদিন রাত্রে forward-observation postএ একজনের বদলে কাজ করতে গেলুম। ভাঙ্গা ট্রেঞ্চের মধ্যে একটা বিশ্রী ময়লা গর্ত্ত—সেখানে আবার একহাঁটু কাদা, তাও আবার শিরিষের মত জুতায় আটকে যায়। সে চলে' যাবার সময় একখানা Scribner's Magazine ছুঁড়ে দিলে, ছেঁড়া-খোড়া, মলিন, আমাদের সমস্ত মাসিক পত্রের মতই একটা পুরাণো সংখ্যা। সে বল্লে, "এর মধ্যে একটা কবিতা আছে। তার নাম 'স্বর্গীয় প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে'—সেটা সত্যি—পড়ে' দেখো।"

ট্রেঞ্চের পাশে সেই ময়লা গর্ত্তের মধ্যে বসবার বন্দোবস্ত করে' দেওয়ালে একটা বাতি বসিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলুম। পড়লুম—

"The sunlight shall not easily seem fair
To you again,
Knowing the hand which once amid your hair
Did stray so maddeningly
Now listlessly
Is bitten into mire by the summer rain.'

'হা ভগবান' বলে' বোধ হয় আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, কারণ আমার টেলিফোনওয়ালা মুখ তুলে বল্লে—'কি বলছেন মশায়!' আমি চমকে উত্তর দিলুম 'কিছু না'। কবিতাটি মেয়ের লেখা; তাঁর নাম দেখতে ভুলে গেছি। এখন আর পাওয়া যাবে না। আমি ভাবছি যে তিনি আমেরিকায় থেকে সেই জিনিষটাকে কেমন করে' প্রকাশ করলেন যা আমরা নিত্যই দেখছি অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছি না।

যখনই আমি কাদার উপর মৃতের নিস্পন্দ হাত ছড়ানো থাকতে দেখি তখনই মনে পড়ে—

"The hand which once amid your hair
Did stray so maddeningly."

Sommeতে কত হাত, পা জলের মধ্যে থেকে আমরা টেনে তুলেছি!

দ্বিতীয় স্তবকটা আমার স্মরণ হচ্ছে না—তৃতীয়টি অনেকটা এই রকম—

"He died amid the thunders of great war
His glory cries
Even now across the lands; perhaps his star
Shall shine for ever
But for you never
His wild white body and his thirsting eyes"

এই শেষ লাইনে আমার আত্মা যেন তোমার আত্মাকে আহ্বান করছে, এই ছবিটা আমার মনে জাগে। এ যে আর সহ্য করতে পারছি না। "His wild white body and his thirsting eyes!"

তোমার এসব কথা না জানাই যে খুব ভাল। তা ছাড়া যেদিন ঈপ্সিত গৌরব অর্জ্জিত হবে সেদিন এই wild white bodyকে কি কেউ মনে রাখবে? ধন্যবাদ ভগবানকে, তুমি আমায় স্পর্শ করতে শেখনি, আমার প্রয়োজনীয়তা বোধও তোমার নেই। আমাদের মধ্যে রইলো শুধু কয়েকখানা প্রীতি-কর চিঠি, যার কতকগুলো হয়ত এর মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে; কালের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া প্যারিসে পরস্পরের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মেলা-মেশার সুখময় স্মৃতি আর আমার জন্য তোমার অন্তরে একটুকু করুণা। এর জন্য তোমায় কোনদিন অনুতাপ করতে হবে না। আশা করি তোমার এর চেয়ে আর বেশী কিছুই মনে থাকবে না। তুমি হয়ত বলবে—"আর কিছু না হোক লোকটী ছিল বেশ! কিন্তু আমি যে আর সইতে পারি না। শরীরের জন্যে আমি ভাবি না, তার আর দাম কি! আমার অন্তর যে তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে উঠছে আর আমায় ফিরতে দিচ্ছে না—আমায় শুধু ঠেলে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। কোন্ দিকে? কি জানি কোন্ দিকে!

(ক্রমশঃ)

“বাংলার পরিচিত পাখী”

শ্রীমণীন্দ্রনাথ আচার্য্য

বিগত কার্ত্তিক মাসের উপাসনায় শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক লিখিত “বাংলার পরিচিত পাখী—দোয়েল” প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ আলোচনা পক্ষিবিজ্ঞান শাস্ত্রের দিক হইতে সমীচীন বোধ করি। মূল প্রবন্ধের আকার ও প্রতিপাদ্য বিষয় অনুপাতে আলোচনা সাধ্যমত সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। সন্দর্ভের মুখপাতে শ্রীযুক্ত রায় সহযোগী পত্রিকা প্রবাসীর জনৈক লেখকের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন—“তিনি পাঠক ও সম্পাদকের অজ্ঞতার সুযোগ পেয়েছিলেন।” এই উক্তির জন্য শ্রীযুক্ত রায় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু যে সুযোগ পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক পাইয়াছিলেন, সেই সুযোগ বর্ত্তমান লেখককে অবাধে ছাড়িয়া দিতে আমরা নারাজ,—উপাসনার পাঠকের পক্ষে সেটা একটা অপবাদ হিসাবে থাকিয়া যাইবে। তাই তাঁহার রচনাকে বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে চাই।

শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন—“যে সমস্ত কীটভুক্ পাখী যাযাবর নয়, যারা একই স্থানে থাকতে ভালবাসে তাদের মধ্যে সামাজিকতার অভাব, দল বেঁধে তারা বাস করে না।” ইহা বোধ করি লেখকের মত এবং তাঁহার ব্যক্তিগত গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ফল। এই উক্তির কারণও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আমরা শর্ত আধুনিক পক্ষিবিজ্ঞান গ্রন্থ অবলম্বনে পাঠকগণের নিকট বিনীত ভাবে জানাইতে চাই যে, ভারতের পাখার তালিকায় ভূরি ভূরি বিহঙ্গ আছে, যাহারা কীটভুক্ অথচ যাযাবর নয়, তথাপি তাহাদের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে দল বাঁধিয়া থাকা। তাহাদের মধ্যে “সামাজিকতার অভাব” নাই। যথা, “ছাতারে” এবং ছাতারে বংশের (Family *Timaludae*) প্রায় সমস্ত পাখী। এই বংশান্তর্গত ৩৫টি গণের (genus) পাখীরা সম্পূর্ণরূপে gregarious এবং বাকী ২০টি গণভুক্ত বিহঙ্গ দলেদলেই থাকে, যদিও সে দল বৃহৎ হয় না (small parties)। দলে দলে বিচরণ করে বলিয়া ছাতারের নাম “সাত ভাই” (ইংরাজের নিকট Seven Sisters)। ছাতারের অতি নিকট তিন চারিটি জাতি নিম্ন বাংলায় এবং সুন্দরবনের জঙ্গলে স্থায়ীভাবে দলে দলে বাস করে। “শালিক” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রায় স্বয়ং। এই শালিক কীটভুক, যাযাবর নয়; তথাপি সে দল বাঁধে। যে বংশের পাখী শালিক, সেই বংশে কতকগুলা sedentary (অর্থাৎ যাযাবর নয়) গণভুক্ত পাখী আছে, যাহাদের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে দলে বিচরণ করা; যথা—পাউই, গুয়েল্যাকড়া, বামুনি-ময়না প্রভৃতি। “সাত সখী” (ইংরাজি নাম Minivet) পাখী বাংলায় বিরলদর্শন নয়। দলে বিচরণ করার জন্য ইহার এই নাম—কীটভুক্ উহারা, যাযাবর নয়। “বাঁশপাতী” আর একটি বাংলার অত্যন্ত সাধারণ পাখী (ইংরাজি নাম Bee-eater), gregarious; আকাশমার্গে মৃদু কলধ্বনি করিতে করিতে উড়ন্ত বাঁশপাতীর ঝাঁক প্রায়ই দেখা যায়। “তালচটা” (Swallow Shrike) দলে বাস করে; আবাবিল ও চামচিকি বা বাতাসিয়া যদিও ভিন্ন ভিন্ন গণের পাখী, তথাপি দলবদ্ধতা ইহাদের সকলেরই বৈশিষ্ট্য অথচ তাহারা যাযাবর নহে এবং কীটই তাহাদের খাদ্য। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন দেখি না। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীযুক্ত রায়ের উক্তি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। এইবার লেখক তাঁহার এই উক্তির যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহার আলোচনা সঙ্গত মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—“অনেকগুলি পাখী একসঙ্গে থাকলে আহার্য্য ক্রমশঃই নিঃশেষ হ'য়ে আসবে, তাই এরা একা বিচরণ করে।” লেখকের এই যুক্তিই যদি যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে কীটভুক্ বিহঙ্গ মাত্রেরই একা বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি দাঁড়াইয়া যাইত। দল বাঁধিয়া ধান্য-ক্ষেত্রে অথবা চষা মাঠে “গো-বকে”র কীটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইবার ছবি বাংলার পল্লীদৃশ্য হইতে মুছিয়া যাইত। পাখীর খাদ্যাভাবের আশঙ্কার বিষয় চিন্তা করিয়া বোধ হয় শ্রীযুক্ত রায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাখীর মনে এই চিন্তা কতটুকু থাকিতে

পারে, তাহা পাঠক বিচার করিবেন। বৈজ্ঞানিক নিকল্‌স বলেন—Nothing is clear than that birds are by nature tolerant and more or less sociable creatures। জীবরাজ্যে অহরহঃ যে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে জয়ী হইতে হইলে দলবদ্ধতা পাখীর ব্রহ্মাস্ত্র বলিলেও চলে। মিঃ নিকল্‌স লিখিয়াছেন—In the dead season, when the struggle for existence between bird and bird is supposed to be most severe, we see always flocks of gulls, flocks of titmice, flocks of larks and finches and buntings, assembled without any jealous exclusiveness between species. এই "dead season" হইতেছে শীত কাল, যখন পৃথিবীর অনেক যায়গায় তুষার-পাত হয় এবং পাখীর খাদ্য নিতান্ত কম হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব এত যে, পাখী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া ইহারা একেবারে লোপ পাইবে এরূপ মনে করা চলে না। স্থানবিশেষে কীটের সংখ্যাহ্রাস দেখা গেলেও পাখী তাহার অবাধ গতিবিধির দ্বারা অপর কোন আহার্য্যবহুল স্থানের সন্ধান করিয়া লয়। অতএব আহার্য্যের অভাবের আশঙ্কা আমাদের মত পাখীকে করিতে হয় না। পাখী হয় তো দলে থাকিবার সুবিধাটা বেশী বোধ করে। দলের সংখ্যাধিক্যের জন্য শুধু যে শত্রুর কবল সহজে এড়াইতে পারা যায় তাহাই নয়, অধিক সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগে অভাবনীয় বিপৎপাতের নিবৃত্তিও করা চলে। একাকী অপেক্ষা দল বাঁধিয়া আহার্য্য-সন্ধানেরও সুবিধা অনেক। একটা ক্ষুদ্রদেহ 'টিট্' পাখীর (বাংলায় 'রামনোরা' এই বংশের বিহঙ্গ) পক্ষে কীটান্বেষণ দুরূহ কার্য্য, অনশনে মৃত্যুর সম্ভাবনা তাহার কম নয়। এই সম্পর্কে বিহঙ্গতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত নিউটন লিখিয়াছেন, A single Titmouse searching alone might hunt for a whole day without meeting with a sufficiency, while if a dozen are united by the same motive, it is hardly possible for the plan in which the food is lodged to escape their detection, and when discovered a few call-notes from the lucky finder are enough to assemble the whole company to share the feast.

শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন "প্রত্যেকটি দোয়েলের নিজের নিজের একটা করে তালুক আছে। এবং তার চৌহদ্দীও বেশ নির্দ্দেশ করা থাকে। এই চৌহদ্দীর বাইরে হয়তো অন্য একটি দোয়েলের বিচরণ-ক্ষেত্র। পাশাপাশি বাস ক'রে উভয়ের মধ্যে কেহ কখনও অপরের আড্ডায় যায় না। কদাচিৎ কখনও গিয়ে পড়লে যুদ্ধ লেগে যায়। 'লীগ অফ বার্ডস' গঠন না ক'রেও তাদের মধ্যে Self-determination এর ব্যাপারটা বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হ'য়ে থাকে।" Self-determination কথার প্রয়োগে অনুমান হয় স্বীয় খাদ্য-ভাণ্ডার যাহাতে নিঃশেষ হইতে না পারে তাহার উপায়-উদ্ভাবনা-মানসে কলহপ্রিয় দোয়েলের স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লেখক উহার "তালুক" কল্পনা করিয়াছেন। বিষয়টা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। "প্রত্যেকটি দোয়েলের নিজের" যেটা তালুক, সেটা হইতেছে তাহার চৌহদ্দীযুক্ত "বিচরণ-ক্ষেত্র" বা "আড্ডা"; অপর একটা দোয়েল কখনও এই আড্ডায় যায় না, পাশা-পাশি বাস করে সে আর একটা আড্ডায়। প্রত্যেকটি দোয়েলের "তালুক" আছে বলিলে বুঝিতে হয়, মাত্র একটা পাখীকে কেন্দ্র করিয়া এই তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলে দোয়েল-পত্নীর স্থান কোথায়? শ্রীযুক্ত রায়ই বলিয়াছেন "প্রায় সারাটা বছর দোয়েল-পত্নী ভর্ত্তার সব অবহেলা অগ্রাহ্য করে' স্বামীর আশেপাশেই থাকে। কাছে গেলে দোয়েল প্রহার দেয় তাই বেশ দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলে। পতিগতপ্রাণা দোয়েলজায়া ছায়ার মতই কিঞ্চিৎ ব্যবধান রক্ষা ক'রে পুরুষ দোয়েলের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।" এই যে "দূরত্ব" এবং "ব্যবধান" পক্ষিদম্পতির পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহাতে দুইটা পৃথক্ তালুকের সৃষ্টি হয় কি? না, প্রত্যেক তালুকে পুং এবং স্ত্রী-পক্ষীর দুইটা সত্ত্বাই বজায় থাকে? লেখকের রংপুরের "বাসার পিছনে দুটি আমগাছের নীচে একজোড়া দোয়েল আড্ডা করেছিল। তারা সারা বছর সেখানে থাকৃত। প্রতি বৎসর সেই একই গর্ত্তে তারা বাসা রচনা করেছে।" ইহাতে কি বুঝায়?

যখন "প্রতি বৎসর একই গর্ত্তে তারা বাসা রচনা করেছে" লেখক বলিতেছেন, তখন তিনি কেমন করিয়া লিখিয়াছেন "প্রত্যেকটি দোয়েলের নিজের নিজের একটা করে তালুক আছে" ? লেখকের বিবরণপাঠে আমাদের সংশয় থাকে না যে, পাখীটার "তালুক"-জ্ঞান সারা বছর ধরিয়াই থাকে। প্রসিদ্ধ পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ লেগ সাহেব তাঁহার বিশাল গ্রন্থে দোয়েল নিবন্ধে লিখিয়াছেন—These consort together when not breeding। অর্থাৎ জননেতর ঋতুতে দোয়েল পাখীগুলার (বিশেষতঃ পুং পক্ষীগুলার) পরস্পর মেলা-মেশার অভ্যাস আছে। লেগ সাহেব দোয়েলের রুক্ষ ও কলহপ্রিয় স্বভাবের এবং মল্লযুদ্ধের কথা বিশদভাবে লিখিয়াছেন ; পাখীটার তালুকজ্ঞানের কথা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। পক্ষি-বিজ্ঞানপাঠে জানা যায় যে, পাখীর তালুকের কথা একটা "থিওরী" মাত্র। এলিয়েট হাওয়ার্ড ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও অসীম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ফলে যে রহস্য উদ্ঘাটনে সফলকাম হইতে পারিয়াছেন তাহা দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে সাধারণ-ভাবে সকল পক্ষী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, মাত্র শীতপ্রধান দেশের কতকগুলা বিহঙ্গ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে এই থিওরীর পক্ষপাতিত্ব করেন, অনেকে আবার ইহার পোষকতার প্রতিকূলে। ভারতবর্ষের বিহঙ্গ সম্পর্কে ইহার অবাধ প্রচলনে দোষ অনেক। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ববিশারদ হুইস্‌লার বলেন —Very little is as yet known about the question of Territory, in the sense of a particular area in which a single bird or a pair of birds claim domination, so far as others of their own species are concerned. The sense of Territory is far from general. In many species it certainly does not exist at all, in the majority it is probably not very strong, and in almost all cases it is confined to the breeding season. এই breeding season কথাটির উপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তালুক-থিওরী যে ক্ষেত্রে খাটে, তথায় প্রায়ই পাখীর প্রজনন-ঋতু এবং উহার জননেন্দ্রিয়-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে উহার সাময়িক চিত্ত এবং দেহগত বৈলক্ষণ্যগুলা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝানো দরকার। জীববিদ্যার ছাত্রগণ এবং যাঁহারা পাখীর শবদেহ বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, পক্ষীবিশেষের জননেন্দ্রিয় উহার প্রজনন ঋতুতে পরিণতি লাভ করে, তখন উহা বেশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকট হয়। অন্য সময়ে ইহার সঙ্কোচন এত বেশী থাকে যে, প্রায় লক্ষ্য হয় না। তখন পাখীটার সত্তা neuter, উহার চালচলনও উহার প্রকৃতিগত neuter phase মাত্র, শারীর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে ইহার অভিব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক ইহাকে unsexing process বলিবেন। ইহার ফলে বিহঙ্গ-জীবনে দাম্পত্য-বন্ধন বিলুপ্ত হয়, যৌন আকর্ষণ থাকে না, স্ত্রীপক্ষী বিশেষের প্রণয়িগণের মধ্যে বিদ্বেষ দূরীভূত হয়, মৈথুন এবং প্রাগ্‌মৈথুন ঋতুর পূর্ব্বরাগসূচক লীলা ও সঙ্গীতোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় না। তখন পাখীর তালুকের প্রয়োজনীয়তা কি থাকিতে পারে ? কিন্তু সন্তান-জনন-ঋতুতে পাখীর শারীর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের ফলে উহার দেহের ও মনের, স্বভাবের ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামাজিকতা লোপ পাইতে থাকে ; কলহ-প্রিয়তা তখন পাখীর সময়োচিত সাধারণ লক্ষণ। পাখীর সন্ততিজিতক্ষেত্রে তাহার "তালুক"-জ্ঞান এই কলহ-প্রিয়তার চরম অভিব্যক্তি। শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সারা বছর ধরিয়া দোয়েলের প্রকৃতি ও "তালুক"-জ্ঞান লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ যে কত দূর বিজ্ঞানানুমোদিত, পাঠক তাহা বিচার করিবেন।

লেখক দোয়েলের দেহগত বর্ণবিন্যাসে protective coloration (সঙ্গোপনী বর্ণবিন্যাস ইহার পরিভাষা দিয়াছেন) লক্ষ্য করিয়াছেন ; তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন "এ বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা" করিবেন। "বাগানের বৃক্ষশ্রেণীর নীচে যেখানে আলোছায়ার অনবরত লুকোচুরি চলছে, সেইখানে দোয়েল সারাদিন, বিচরণ করে।"—শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন। ইহাতে কি বুঝিব যে পাখীটা "বাগানের বৃক্ষশ্রেণীর নীচে" ভূমিতে সারাদিন থাকে ? অর্থাৎ এক হিসাবে কি দোয়েল ground bird ? আলো-ছায়া ভূমির উপরে নিক্ষিপ্ত থাকিলে পাখীটার শাদা

কালো বর্ণ আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কি? শাদা এবং কালো দুইটাই বৈজ্ঞানিকের মতে এত "conspicuous colour" যে এরূপ স্থলে মানুষের নজর কখনই এড়াইতে পারে না। কাক, ফিঙে দুইটাই কালো রং-এর পাখী; বৃক্ষশাখায় বৃক্ষনিম্নে ভূমির উপর, প্রাঙ্গণ বা ছায়াশীতল পুষ্করিণীতটে যেখানেই থাকুক নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তদ্রূপ শাদা রংও আমাদের নজর এড়াইতে পারে না, বিশেষতঃ লেখকবর্ণিত স্থানে। জীববিজ্ঞানবিশারদ বেডার্ড লিখিয়াছেন -There are numerous examples of coloration the very reverse of protective, which nevertheless cannot be regarded as "warning" ···· the most prominent instances are animals which are entirely white or *largely marked by white*। শ্রীযুক্ত রায় আমাদের ground bird বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে দেখাইবেন যে তিনি লিখিয়াছেন -"চুপ ক'রে যখন সে শাখাগ্রে ব'সে থাকে, খুব কাছে গেলেও চট্ করে নজরে পড়ে না।" ইহাতে আমাদের বুঝিতে হইবে, দোয়েল বৃক্ষ শাখায় বিচরণশীল arboreal পাখী। তাহা যদি হইল সবুজের ফাঁকে "আলোছায়ার লুকোচুরি" যেখানে, সেখানে শাদা আর কালো কি হিসাবে protective? বৈজ্ঞানিক ফ্রঙ্ক বেডার্ড protective coloration প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন - Tree-frequenting animals are often green in colour. Among vertebrates numerous species of parrots, iguanas, tree frogs and the green tree snakes are examples। জীববিজ্ঞান মতে protective coloration থিওরীর মূলীভূত বস্তু হইতেছে যে, কোনও একটা জীবের বর্ণবিন্যাস এরূপ হওয়া চাই যাহাতে উহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য বজায় থাকে, এবং সে আততায়ীর চক্ষু এড়াইতে পারে। এতরূপ সামঞ্জস্যরক্ষায় জীবটার অবয়ব এবং আচরণ অনেক ক্ষেত্রে উহার সহায় হইয়া থাকে। বৃক্ষশাখায় সবুজবর্ণ এইজন্য জীববিশেষের protective coloration। পণ্ডিতপ্রবর গ্র্যাহাম কার 'টিয়া' জাতীয় পক্ষী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—**the green of the plumage matches the chlorophyll green of the vegetation with such extraordinary accuracy that I have actually had difficulty in finding a specimen which I had brought down, even when I had marked the exact spot at which it reached the ground, until I felt for it with my hands among the grass**। পল্লীবীথিকায় অথবা উদ্যানের বৃক্ষরাজির নিম্নে ভূমির উপরে বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির মাঝে শাদা এবং উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের আত্মগোপন-শক্তি কতদূর, পাঠক বিচার করিবেন। ভূমিতে বিচরণশীল অথবা প্রকৃতপক্ষে আত্মগোপন-তৎপর পক্ষীবিশেষের বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিশারদ হুইসলার লিখিয়াছেন—The colour is a mixture of greys and browns diversified with black and buff markings, so that the plumage of the bird exactly harmonises with the surface of bare dry ground and vegetable rubbish that lies upon it। সহৃদয় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করিতে চাহি না। সহজেই বুঝা যায় যে, শাদাবর্ণ এত জোর চোখে পড়ে, ইহা এত conspicuous যে মেরুখণ্ডে polar ও arctic region-এ ইহার protective বা আত্মগোপন-প্রবণতা আছে; ফেনশুভ্র সমুদ্রতটে সেখানে রশ্মি ও আলোকের বিচ্ছুরণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, সেখানেও শাদা রং-এর সার্থকতা উপলব্ধি হয়। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ এ্যালেনের ভাষায় এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতে চাই—Many sea-birds are black and white, as eiders, guillemots, anks; or bluish and white, as adult gulls or terns, whose color environment is of relatively simple lights and shades, sky and sea Birds living in sunlit foliage tend to be yellow or yellowish green with black markings Such as many of the warblers, goldfinches, orioles, certain weaver finches; thicket-dwellers are dull brown, as song & white-throated sparrows, certain thrushes.

আলোচনা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। উপাসনার পাঠকগণের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ ইত্যাদি দোষারোপের ভয়ে এত কথা

বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাই না। তবে লেখক মহাশয় যে দোয়েলের একপত্নীত্বের প্রমাণ দিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা পাখী পোষেন, তাঁহাদের অনেকেই হয় তো অবগত আছেন যে, যদি দুইটা দোয়েল (একটা পুং ও একটা স্ত্রী) দুইটা বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত অবস্থায় ক্রয় করিয়া aviaryর মধ্যে একত্র কয়েক মাস ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায়, প্রজনন ঋতুতে উহারা অনায়াসে দাম্পত্য-জীবন যাপন করে; ডিম্ব এবং শাবক যথাক্রমে প্রসূত হয় ও জন্মগ্রহণ করে। এই ব্যাপারের সদুত্তর পাইতে হইলে পাখীর সন্তানজননকালে উহার জননেন্দ্রিয়-পরিণতিরূপ শারীর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পাখীকে এই সময় নূতন করিয়া উহার মনোমত পত্নীর সন্ধান ও মনোহরণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়; হয় তো অনেক ক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্ব বৎসরের পূর্ব্ব সঙ্গিনীর জন্যই এইরূপ ক্রিয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। একপত্নীত্বের দাবী দোয়েল করিতে পারে কি না ভারতীয় পক্ষিবিশেষজ্ঞেরা এখনও পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না।

আর একটি কথা। দোয়েল "পাহাড় অঞ্চলে পাঁচ হাজার ফুটের বেশী উঁচুতে ওঠে না"—ইহা লেখকের উক্তি। বিশেষজ্ঞ হুইস্‌লার বলেন যে, ৬,০০০ ফুটেও ইহাকে দেখা যায়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, সুধী পাঠক-সমক্ষে লেখকের ত্রুটি উত্থাপিত করিয়া অনর্থক শক্তিক্ষয়ের উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ রচিত হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে পক্ষিতত্ত্বোৎসুক্য প্রায় দুষ্প্রাপ্য—সে দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু লেখক নিজেই স্বীকার করিবেন আমাদের পর্য্যবেক্ষণ-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হইতে দূরে থাকিলে পদে পদে ভ্রমে পড়িতে হইবে। পক্ষিজীবন-পর্য্যবেক্ষণ আমাদের অবসর-বিনোদন বা খেলার বস্তু নহে। তজ্জন্য আমাদের পড়াশুনা ও জ্ঞানার্জ্জন আগে হইতে দরকার। ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণার সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া চাই।

জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর মহোদয় আমার এই আলোচনাটি প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

গান

(গজল)

হায় পাষাণী, ফুল বেগরে কি হবে ছার ফুলদানী,
ধূপের ধোঁয়ায় গন্ধ মিলায় দহন-ব্যথায় হার মানি।

নিবিয়ে বাসরঘরের বাতি, পোহায় রাতি আপশোষে,
কারবালাতে দিল্ দহে যা'র, কি হবে তা'র দিল্‌খোসে
আর সহে না মরুমায়ার পথ ভুলাবার হাতছানি।

অন্তরধন চাইছে যেজন মোতির মালায় ভুল্‌বে কি?
উত্তরী বায় শীতল চুমায় দোলনচাঁপা দুল্‌বে কি?
ফুল-ব্যাসাতির নাইক সাথী, নাই স্বপনের আসমানী।

অসময়

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

বাইশ বছর চাকরির পর এই প্রথম জেলখানার ভার। রাখাল বাবুর দিন কাটে আফিসে। সকালে সাতটা থেকে বারোটা; মাঝখানে ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম; শেষ, কোন দিন রাত আটটায়, কোন দিন ন'টায়। ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নয়নতারা। বয়স সবে আঠারো। বিবাহের পরে এতদিন ছিল বাপের বাড়ী। এই প্রথম স্বামীর সঙ্গে পাহাড়ের দেশে ঘর করিতে আসিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, সুমুখে, পিছনে, দিকেদিকে প্রসারিত সহস্র-শীর্ষ হিমালয়। উপরে, নীচে, সাপিল-গতি বনপথের ধারে ধারে লাল রঙের চিমনি-ওয়ালা বাড়ী; দীর্ঘ-দেহ পাইনের বন; পথের নীচে, ঘরের জানালায়, গাছের শিরে স্বচ্ছন্দ-গতি মেঘের খেলা। নয়নতারা প্রথম দৃষ্টিতেই মুগ্ধ হইয়া গেল। সকালের কাজ শেষ হইলেই শোবার ঘরের জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়। ঐ উঁচু পাহাড়টার গা' বাহিয়া যে ছায়াঘন পথখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারি উপর দিয়া পাহাড়ী মেয়েরা পিঠের উপর "ডোকো" চাপাইয়া গান গাহিয়া চলিয়া যায়। সেই স্বচ্ছ, অকুণ্ঠ, তরল কণ্ঠের সুর—কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট—তাহার কানে আসিয়া লাগে। মনে হয় যেন পরীর দেশ!

কিন্তু সমস্ত জিনিষের মধ্যেই একটা ক্লান্তি আছে। প্রকৃতির মূক-সঙ্গ মনকে বেশী দিন সাড়া দিতে চায় না। নয়নতারারও মনে হইতে লাগিল, সে নিতান্ত একা, এই নিঃসঙ্গ দিন যেন আর কাটে না। বারোটা কখন বাজিবে তাহার জন্ত সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। রাখাল বাবু আসিতেন, কোন রকমে স্নানাহার সারিয়াই শয্যায় আশ্রয় লইতেন। নয়নতারা স্বামীকে পান দিয়া, তাড়াতাড়ি নাকেমুখে কিছু একটা গুঁজিয়াই এঘরে আসিয়া দেখিত, তাঁহার নাক ডাকা সুরু হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত নিরাশায় তাহার উন্মুখ বুকখানা দমিয়া যাইত। বিছানার একধারে শুইয়া পড়িয়া সেও ঘুমাইতে চেষ্টা করিত, ঘুম আসিত না; এপাশ ওপাশ করিয়া বেলা গড়াইয়া যাইত। রাখাল বাবুও উঠিতেন, মুখহাত ধুইয়া নিঃশব্দে লুচি চর্ব্বণ করিয়া আফিস চলিয়া যাইতেন। নয়নতারার বিকাল বেলাটা আর কিছুতেই শেষ হইতে চাহিত না। ক্রমে ইহাতেও ক্লান্তি আসিয়া পড়িল। এ ঘরে সে আসাই ছাড়িয়া দিল। রাখাল বাবু দিবানিদ্রা শেষ করিয়া চাকরকে হাঁকডাক করিয়া, অনেক দিন না খাইয়াই চলিয়া যাইতেন। নয়নতারা পাশের ঘরে শুইয়া সবই শুনিতে পাইত; কিন্তু উঠিত না। আশা করিত, একটু অনুযোগ অন্ততঃ আসিবে কিন্তু আসিত না।

রাখাল বাবু লক্ষ্য করিলেন, সংসারের কাজে আর সে শৃঙ্খলা নাই। সকাল বেলা, গরম জলটা আর হাতের কাছে পাওয়া যায় না। বাড়ী ফিরিতেই স্ত্রী আর আগের মত ছুটিয়া আসিয়া টাই খোলে না। ধরা-চুড়া বিছানার উপরেই থাকে, কেহ আসিয়া তৎক্ষণাৎ গুছাইয়া রাখে না। রান্নার ভিতরে আর সে স্বাদ নাই। প্রায়ই একটা কিছু ভুল থাকে; হয় বেশী লঙ্কা, নয়তো কম নুন। রাখাল বাবু মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না। তাহার আফিসের কাজ ঘণ্টাখানেক বাড়িয়া গেল।

সেদিন দুপুর বেলা আফিস থেকে ফিরিয়া দেখিলেন, নয়নতারা শুইয়া আছে। জামাটা খুলিতে খুলিতে কহিলেন, এরকম অসময়ে শুয়ে যে? অসুখ করেনি তো?

কোন উত্তর নাই। বিছানার কাছে আসিয়া আর একবার প্রশ্ন করিলেন, কি ব্যাপার অসুখটসুখ করেছে নাকি?

স্ত্রী বালিশে মুখ রাখিয়া কহিল, না, মাথা ধরেছে।

"মাথা ধরেছে? ওরে, ও, কি নাম তোর, যা দিকিন্ শীগ্‌গির করে। ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়"—বলিয়া নিজেই খড়ম পায়ে ডাক্তারের বাসায় চলিলেন।

মিনিট পনেরো পরে ডাক্তার লইয়া আসিয়া দেখিলেন, নয়নতারা রান্না-ঘরে। "এদিকে এসো, ডাক্তার বাবু এসেছেন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল; ওষুধ দেবেন 'খন।" কিন্তু কেহই আসিল না; ব্যাপারটাও বুঝাইয়া বলিল না। ডাক্তার খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন রাখাল বাবুর খাওয়া অসম্পূর্ণ রহিল, কিন্তু সেজন্য কেহই অনুযোগ দিল না। বিকাল বেলা আফিসে যাইবার সময় চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর মা কি করছে রে?

—শুয়ে আছেন।

আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিমল রাখাল বাবুর সহকর্ম্মী, কলেজ থেকে বাহির হইয়াই আসিয়াছে জেলখানায়। লাল ফিতা বাঁধা ফাইল দেখিলে তখনো বুক কাঁপে; কেরাণীর হিসাবে ভুল খুঁজিতে গিয়া নতুন ভুলের সৃষ্টি করে। জেলের আফিস হইলেও জানালা দিয়া দূরে ঐ টংলু পাহাড়ের মাথার উপর একটি ঘন পাইন বন চোখে পড়ে। প্রতিদিন বিকাল বেলায় সেইখানটায় মেঘের রাজ্যে অস্তমান সূর্য্যদেব যখন একটি মায়ালোক সৃষ্টি করেন, বিমলের ফাইল আর অগ্রসর হইতে চায় না। আজ একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। এক গাদা অগোছালো কাগজের উপর পাথরের কাগজ-চাপা চাপাইয়া ফাউন্টেন পেনের মুখে খাপ পরাইতে পরাইতে চাহিয়া দেখিল, ওপাশের টেবিলে রাখাল বাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন। হাসিয়া কহিল, অমন করে কি ভাবছেন, দাদা, চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

রাখাল বাবু মাথা না তুলিয়াই গম্ভীরভাবে কহিলেন, কাজ আছে।

কাজ তো আছেই, এবং থাকবেও। কিন্তু এই চমৎকার সন্ধ্যাটা তো আর থাকছে না।

রাখাল বাবু জবাব দিলেন না। বিমলও অপেক্ষা করিল না। টুপিটা তুলিয়া লইয়া শিষ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া যাহা দেখিল, একেবারে অপ্রত্যাশিত না হইলেও নিত্যনৈমিত্তিক নহে। অন্য দিন এই সময়ে দেখা যায়—পাচক মহারাজ উনুনের ধারে বসিয়া ঝিমাইতেছেন, আর তাহার উপর ভাত বা ডাল আপন মনে পুড়িয়া যাইতেছে। খাইবার সময় পোড়া-গন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজ বলেন—হুজুর, কয়লাটা এবার ভাল এসেছে, বড্ড আঁচ; কিংবা বলেন, "ডালটা বড্ড কড়া ভাজা ছিল।" আজ রান্নাঘর অন্ধকার, কাহারও কোন সাড়া নাই। বসিবার ঘরের মেজের উপর একটা কম্বলের পুঁটুলি পড়িয়াছিল। কি মনে করিয়া খোঁচা দিতেই মহারাজ উঠিয়া বসিলেন, এবং চারিদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাড়ে তিন বাজ গিয়া? বিমলের ইচ্ছা হইল, ঐ মাথার উপরেই সাড়ে তিন কেন সাড়ে সাতাশ বাজাইয়া দেয়। কিন্তু তাহাতে লাভ নাই, পেট জ্বলিতে সুরু করিয়াছিল। কহিল, একটা কিছু খাবার করে নিয়ে এসো, জলদি। পাচক প্রস্থান করিল এবং মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—আটা শেষ হইয়াছে। "আচ্ছা আটা নিয়ে এসো।" আধ ঘণ্টা পরে আটা আসিল, কিন্তু আর সাড়া নাই। বিমল ডাকিল, কি ব্যাপার?

আজ্ঞে, কয়লা নাই।

বিমলের পেটের ভিতরটাই ততক্ষণে পুড়িয়া কয়লা হইতে সুরু করিয়াছিল। শুইয়া পড়িবে কিনা ভাবিতেছিল, এমন সময় দেখিল দরজা ঠেলিয়া রাখাল বাবুর চাকর ঘরে ঢুকিতেছে। হাতে একটি থালায় কতকগুলি লুচি, আর কিছু মিষ্টান্ন। বলিল, মা বলেছেন সবটা খেতে হ'বে।

একটী অপরিচিতা মহিলার দেওয়া লুচি-সন্দেশের সদ্ব্যবহার ঠিক ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে কিনা, এই ভাবিয়া বিমল একটু ইতস্তত: করিতেছিল, হঠাৎ পাশের বাড়ীর জানালা খোলার সঙ্গে সেদিক চাহিতেই তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যিনি কখনো বাহির হন না, দৈবাৎ সুমুখে পড়িলে দেড় হাত ঘোমটা টানেন, তিনি আজ পরদা সরাইয়া একেবারে অনাবৃত মুখে জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই নীরব, অথচ সুস্পষ্ট অনুনয়ের মাধুর্য্যটুকু তাহাকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করিয়া দিল। চাকরের হাত থেকে নিঃশব্দে থালাটা লইয়া নিঃশেষ করিয়া উঠিল। এই স্বজনহীন প্রবাসে আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল—খাওয়ার মধ্যে একমাত্র উদর-পূর্ত্তি ছাড়া আরো কিছু আছে।

বেড়াইতে বাহির হইয়াও ঐ বাতায়নলীনা, সলাজ-কুণ্ঠা নারীর নিঃসঙ্গ-বেদনাটুকু তাহার মনের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

২

জেলের কাছে লোকের বসতি কম। বেড়াইতেও বড় একটা কেহ আসে না। নয়নতারা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ভিড়ের মধ্যে মানুষ। আজ তার এই বন্দী-জীবনের মধ্যাহ্ন-গুলি কাটাইবার জন্য একমাত্র নিদ্রা-ভিন্ন অন্য সঙ্গী নাই। সেই চেষ্টাই চলিতেছিল। সহসা একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল বিশ্বাস করাই শক্ত। তাহারি বয়সী একটি মেয়ে, একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নয়নতারাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করিয়া কহিল, আমরা কাগমোড়া থেকে আসছি; এটি ছোট দেওর। শুনলাম আপনি একা আছেন, একটু গল্প করতে এলাম। আপনি তো আমাদের পাড়ায় কখনো যাননা।

এইটুকু স্নেহের সুর নয়নতারা যেন কতকাল শোনে নাই। উত্তর দিতে গিয়া তাহার গলাটা ধরিয়া গেল; কহিল, আমি তো কাউকে চিনিনা।

চেনা কি গোড়াতেই হয়? ওটা করে নিতে হয়; এই যেমন আমি করছি, একেবারে আপনার বাড়ী চড়াও করে'।

নয়নতারা মেয়েটিকে সমাদর করিয়া বসাইল এবং তারপরেই মেয়েদের যাহা হয়—মিনিট পনেরোর মধ্যেই সুখ দুঃখের এমন দীর্ঘ কাহিনী সুরু হইয়া গেল, যেন তাহারা কত শিশুকাল থেকে পরিচিত এবং বন্ধু। ঘণ্টা-খানেক পরে মেয়েটি কহিল, এবার তবে উঠি ভাই, আর একদিন আসব।

এত শিগ্‌গির! আর একটু ব'সোনা?

নাঃ। অফিসের ছুটির সময় হ'ল। খাবারটাবার গুছিয়ে রাখতে হবে তো? বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই আগ্রহের অর্থ অন্তর দিয়া না হইলেও নয়নতারা বুদ্ধি দিয়া বুঝিল। তবু কহিল, খাবার গুছিয়ে দেবার অন্য লোকও তো আছে।

তা আছে। তবু—শত থাকলেও—বলিয়া মেয়েটি থামিল। নয়নতারা কহিল, তবে আর কি?

মেয়েটি কৃত্রিম কোপের সঙ্গে কহিল, তবে আর কি? তুমি যেন কিছু জানোনা? একেবারে সাধু?

নয়নতারা আর কথা কহিল না; বুঝিল, যে রাজ্যের কথা হইতেছে, সেখানে সে একেবারে বিদেশী।

মেয়েটি চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। মেয়েটি কথায় কথায় বলিয়াছিল—রবিবার আসবো মনে করে-ছিলাম, ছুটি মিলল না। সমস্ত দুপুরটা আটকে রাখলে, এমনি লোক।

নয়নতারা বলিয়াছিল, অনুপস্থিত ভদ্রলোকের ঘাড়েই তো সব দোষ চাপালে। কিন্তু সত্যি ঘটনাটা কি বল দিকিন। তিনি আটকালেন, না আট্‌কে পড়লে?

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—সেটা তো নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারো।

স্বামী-গর্ব্বিতা নারীর সেই লাজ-রঙীন গণ্ড দুইটি মনে পড়িয়া, নয়নতারার অন্তস্থল থেকে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

জানালা থেকে উঠিয়া আসিয়া ঘরের বড় আয়নাটার সুমুখে দাঁড়াইতেই সে শিহরিয়া উঠিল—এ যেন অন্য কেহ। কতকাল চুল বাঁধা হয় নাই। রুক্ষ চুলে জট পাকাইয়া গিয়াছে। সেকথা কেহই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় নাই। মেয়েটি বলিয়াছিল, কি বলব ভাই, একদিন বিকালে তাড়াতাড়িতে চুল বাঁধা হয়নি। রাতের বেলায় সেগুলোর ওপর এমনি অত্যাচার সুরু হ'ল যে মাঝ-রাতে আলো জ্বেলে চুল বেঁধে তবে নিস্তার। কথাটা নয়নতারার মনে নড়িয়া চড়িয়া ফিরিতে লাগিল। এবং কী মনে করিয়া বহুদিন পরে আজ সেও হঠাৎ চুল বাঁধিতে বসিল। সিন্দুরের টিপ পরিতে গিয়া লজ্জায় গণ্ড দুইটি লাল হইয়া উঠিল। নিজের সেই সলজ্জ মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসি চাপিতে পারিল না। কাপড় জামাও ময়লা হইয়া গিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া সমস্ত সাড়ীগুলি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল, কোনখানা তাহার গায়ের রঙের সঙ্গে খাপ খায়। অনেক বাছিয়াও পছন্দ হইল না। তখন স্থির হইল, চোখ বুঁজিয়া

যেখানা হাতে ওঠে, তাহাই পরিবে। হাতে যেটা উঠিল, সেটা বৌভাতের কাপড়—তাহার স্বামীর হাতের প্রথম দান। এই বস্ত্রখানি দিয়াই তিনি তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ সংসারের লক্ষ্মীর আসনে বরণ করিয়াছিলেন। নয়নতারার বড় লজ্জা হইল। কিন্তু তবু যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে সেইখানিই পরিয়া ফেলিল। একটা শিশি থেকে খানিকটা গন্ধও মাখিয়া লইল।

বহুকাল পরে আজ কেন যে তাহার মনের মধ্যে একটু দক্ষিণা বাতাসের মৃদু গন্ধ কোন্ গোপন সুপ্ত আকাঙ্ক্ষায় একটা দোলা দিয়া গেল, সে জানে না। খানিকক্ষণ এঘর ওঘর করিয়া মনটা ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার ইতস্ততঃ করিল; একবার মনে হইল, ছিঃ। তারপর হঠাৎ চাকরকে ডাকিয়া কহিল, বাবুকে ডাক দিকিন্।

চাকরটি তাহার মায়ের মুখে এহেন আদেশ কখনো শোনে নাই; অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মাইজিটি ধমক দিয়া কহিলেন, কথা কানে যায় না? বাবুকে ডেকে দে। তারপর সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হইল—ছিঃ ছিঃ, চাকরটার সুমুখে—

রাখাল বাবুর আফিসে ভীষণ ব্যস্ততা। কয়েদি খালাস যাইবে। কেতাবের সঙ্গে তাহারি নাম ধাম বিবরণ মিলাইয়া লইতে গিয়া তিনি হাঁকিয়া চলিয়াছেন—নাম কি? বাপের নাম? ঘর কাঁহা, কতদিনের মেয়াদ? কি মোকর্দ্দমা? কেৎনা মাপ্ মিলা?—এই ঝড়ের মত প্রশ্ন-বাণে বেচারী "খালাসী" একেবারে হতভম্ব; কোন উত্তর মুখে জোগাইল না। রাখাল বাবু সেজন্য অপেক্ষাও করিলেন না। ষষ্ঠ প্রশ্নে পৌঁছিয়া হুঙ্কার দিলেন, কাপড়ালতা সব মিল গিয়া?—কয়েদি ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, শিউচরণ—সম্ভবতঃ প্রথম প্রশ্নের জবাব।

রাখাল বাবুর গলা চড়িতে লাগিল, রূপেয়া পয়সা কুছ থা? কাঁহা যায়গা? ইত্যাদি। এমন সময়ে ভগ্ন-দূতের মত চাকরটি আসিয়া কহিল, মা ডেকেছেন।

রাখাল বাবু বাধা পাইয়া রুখিয়া উঠিলেন, কেন?

চাকর সবিনয়ে জানাইল, জানিনা হুজুর।

বল্‌গে এখন সময় নেই।

ও পাশের টেবিলে বসিয়া বিমল একটা দরকারী চিঠির খসড়া কাঁদিতেছিল;—সমস্যা কঠিন। কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর কয়েদিদের জন্য তামাকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হুঁকার কথা লেখা নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হুঁকা চলিতে পারে কি না।

রাখাল বাবুর হুঙ্কারে হুঁকা সম্পর্কীয় সব তথ্য গুলাইয়া গেল। কহিল, ওটা না হয় আমিই করছি, আপনি দেখে আসুন না? দরকারী কিছু থাকতেও পারে।

হাঁ, তুমিও যেমন ক্ষেপেছ। এমন কী দরকার হ'তে পারে? এই, তোর মার কাছে জেনে আয় কেন ডেকেছে। আচ্ছা, দাঁড়া আমিই যাচ্ছি। আবার কোনো অসুখবিসুখ, হয়তো ডাক্তার বাবু—আচ্ছা থাক আমিই—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন।

নয়নতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ স্বামীর পায়ের শব্দ পাইতেই লজ্জায় মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ হয়তো কী মনে করিবেন। এই সাজ-গোজগুলো কোথাও লুকাইতে পারিলেই যেন সে বাঁচে। রাখাল বাবু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না। ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া সোজা প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে? ডেকে পাঠিয়েছ কেন? নয়নতারার মনটা সহসা এতটুকু হইয়া গেল। নীচের দিকে চাহিয়া সকুণ্ঠ মৃদু কণ্ঠে কহিল, এমনিই।

এমনি মানে? বল বল আমার কাজ আছে। শরীরটা—

কাজ পরে হবে। তুমি কিছু খেয়ে যাও। বড্ড মুখ শুকিয়ে গেছে।

বাপরে মরবার সময় নেই, তো খাবার।

নয়নতারা তিরস্কারের সুরে কহিল, কী যে বল তার ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে অনুনয় করিয়া কহিল, বেশি দেরি হ'বেনা। লুচি কখানা শুধু ভাজতে বাকী। তুমি আমার উনুনের ধারে এসে বসো, এখ্খুনি করে' দিচ্ছি।

না—না, উনুনের ধারে দরকার্ নেই। এইখানেই দাও। আমি বসছি।

নয়নতারা নিঃশ্বাস চাপিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে খাবার আসিতেই রাখাল বাবু কোন দিক না চাহিয়া সবেগে ধ্বংস করিয়া চলিলেন এবং

কোন মতে শেষ করিয়াই প্রস্থান করিলেন নয়নতারা কহিল, পানটা—

ভুতোকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। আর, ঠাণ্ডা লাগিয়োনা, আমার বড্ড কাজ। আমি—।

নয়নতারা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। পান দেবার মত উৎসাহ আর খুঁজিয়া পাইল না।

এমনি তো রোজই ঘটে; নূতন কিছুই নয়। তবু কেন জানিনা, আয়নার সুমুখে আসিতেই নয়নতারার সর্ব্বাঙ্গ-জোড়া সযত্ন-রচিত প্রসাধন যেন একসঙ্গেই তাহাকে তীব্র কণ্ঠে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। যে আঁচলখানা, এই কিছুক্ষণ আগে পরম সোহাগভরে বুকের উপর টানিয়া লইয়াছিল, তাহার স্পর্শটুকু এখন সর্প-স্পর্শের মত তাহার সমস্ত মন দারুণ গ্লানি এবং বিতৃষ্ণায় ভরিয়া দিল। নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিয়া নয়নতারা খাটের পাশে সরিয়া আসিল। কাপড় জামা খুলিয়া সেই ময়লা কাপড় খানি পরিল। তারপর জানালায় দাঁড়াইতেই নিতান্ত অকারণেই দুই চোখ ভরিয়া জল ছুটিয়া আসিল। সন্ধ্যা আ'সল, রাস্তার বাঁকে, উপরে নীচেও বন, গৃহের আশে পাশে তারার মত সহস্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল। উপরের পথ বাহিয়া একটি বৌ সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর সঙ্গে বেড়াইয়া চলিয়া গেল। নয়নতারা জানালা থেকে সরিয়া আসিয়া ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

রাখাল বাবু আফিসে ফিরিয়া গেলে বিমল কহিল, কি দাদা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?

কি করবো? জিজ্ঞেস করলাম, কী দরকার, বললে এমনিই।

আর অমনিই চলে এলেন?

তবে কি বসে থাকতে বল?

বিমল যেন আপন মনে বলিল, না, না। আমি কিছুই বলি না। আপনাকে এ কথা বলা বিড়ম্বনা যে ঐ দরকার না থাকাটাই সব চেয়ে বড় দরকার।

রাখাল বাবু সেদিকে কান দিলেন না। শিউচরণের বদলে পাছে রামচরণকে খালাস দিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় আর একবার সেই বেচারীকে প্রশ্নবাণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তারপর খাতা খুলিয়া তাহার শরীরের দাগ (personal descriptions) মিলাইতে সুরু করিলেন। "ডান কানের বাঁ ধারে—এক ইঞ্চি উত্তর পশ্চিম কোণে আধ ইঞ্চি কালো তিল"—হ্যাঁ। "বাঁ পায়ের গোড়ালীর পেছনে দুই ইঞ্চি উপরে, দেড় ইঞ্চি লম্বা, সওয়া ইঞ্চি চওড়া বেগুনে রংএর কাটার চিহ্ন—কৈ দেখি? হ্যাঁ।"
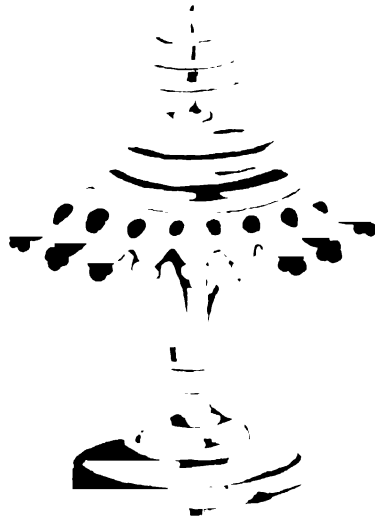
শুল্ক-দ্বন্দ্ব ও ভারতবর্ষ

শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দা পৃথিবীব্যাপী। এমন কোন দেশ নাই যাহা এই অর্থনৈতিক ঘূর্ণীপাকের আবর্ত্তে না পড়িয়াছে। সকল দেশেই এর প্রতিকারের চেষ্টা চলিতেছে—কিন্তু ফল তাহাতে কিছুই হইতেছে না বরং দিন দিনই ব্যাধি জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। জাতি-সঙ্ঘের অর্থনীতি সমিতি এই সমস্যার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই ব্যবসায়-মন্দা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে। কারণ ইহা উৎপাদন (production) ও ব্যবহার (consumption) এই দুই-এর সর্ব্বব্যাপী সমতার অভাব হইতে ঘটিয়াছে। সমিতি যে সব কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ।

১। ব্যবহার :—

(ক) কৃষিজাত বহু দ্রব্যের (চাউল, দাল, গম ইত্যাদি) ব্যবহার বাড়িয়াই চলে না—খুব সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বাড়ে কমে। অবশ্য ইহা ব্যবহারকারীর ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা যতটা বাড়িতে পারে এই সব দ্রব্যের চাহিদা ততটা বাড়িতে পারে না। কাজেই যখন এই সব দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন হয়—তখন তাহাদের সবটাই ব্যবহারে লাগান দুরূহ হইতে পারে।

(খ) শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ব্যবহারকারীর সংখ্যাবৃদ্ধির উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানতঃ তাহার আয়ের উপরেই নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এরূপ বহু কৃষক আছে যাহারা শুধু বিবাহের সময়ে জুতা কিনে; যদি তাহাদের আয়ে কুলাইত তবে তাহারা প্রতি বৎসরই কিনিত।

(গ) কৃষক ব্যতীত যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদের বর্দ্ধিত আয় খাদ্যদ্রব্যক্রয় অপেক্ষা অন্যান্য অভাব-পূরণেই বেশী ব্যয়িত হইয়াছে

(ঘ) গত কয়েক বৎসরে কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবহারে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তুলা-ব্যবসায়ীরা নকল সিল্ক উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে প্রতিযোগিতা পাইতেছে! মদের ব্যবহার কমিয়াছে এবং তার যায়গায় চা, কফি প্রভৃতি পানীয়ের ব্যবহার বাড়িয়াছে। ফল, তরকারী, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম ইত্যাদির ব্যবহার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

(ঙ) সর্ব্বত্র শান্তির অভাব হেতু লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়িতে পারিতেছে না। এশিয়ার স্থানে স্থানে রৌপ্য মুদ্রার অধোগতির ফলে এই অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

২। উৎপাদন :—

(ক) কোন কোন খাদ্য দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। কোন কোন দেশে এত বেশী পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে যে উৎপাদনকারীরা তাহা লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না; যদিও নানা কারণে পৃথিবীর স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষও ঘটিতেছে। এই তথাকথিত অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণ (১) কৃষিকার্য্যের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতি এবং (২) যুদ্ধের ফলে বিশৃঙ্খলা।

(খ) খরচ কমাইবার জন্য মানুষ ও পশুর পরিবর্ত্তে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গত ১০ বৎসরে যন্ত্রচালিত লাঙ্গলের (tractor) সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেখানে ২,৪৬,০০০টি tractor ছিল, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া ৮,৫৩,০০০তে দাঁড়ায়। রুষের Five-year Planএর অধীনে বহু সংখ্যক tractor ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে সেখানে প্রায় tractor ছিলই না।

(গ) বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক (technical) উন্নতি; বিশেষতঃ উত্তম বীজ ও সারের ব্যবহারও এই অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য দায়ী।

৩। যুদ্ধের ফলে বিশৃঙ্খলা :—

(ক) এই বিশৃঙ্খলার ফলে ইউরোপের বাহিরের দেশ সমূহেও উৎপাদনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। যুদ্ধরত দেশসমূহের খাদ্য যোগাইবার জন্য দূর দেশ সমূহকে উৎপাদন বাড়াইতে হইয়াছিল। নিউজিলেণ্ড, আরজেন্টাইন ও অষ্ট্রেলিয়া যুদ্ধের সময় বৎসরে ৩৫ কোটি পাউণ্ড মাখন রপ্তানি করে।—১৯০০ খৃষ্টাব্দে সেই রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫ কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের তুলনায় চিনির উৎপাদন কিউবাতে ২৫ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ৫০ লক্ষ টন এবং যবদ্বীপে ১৫ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ২৫ লক্ষ টন হয়।

(ঘ) রুষের অন্তর্ব্বিপ্লবও ইউরোপের বাহিরের দেশ সমূহের উৎপাদন বাড়াইয়া দিয়াছে।

৪। মুদ্রা-বিপর্য্যয় :—

(ক) কোন দেশই মুদ্রা-বিপর্য্যয়ের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় নাই।

(খ) ১৯২৯ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মূল্যের অধোগতি ব্যবসায়-মন্দাকে বাড়াইয়া দিয়াছে।

৫। সংরক্ষণ নীতি :—

(ক) যুদ্ধের ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বতন্ত্র হইবার ঝোঁক স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিয়াছে।

(খ) শস্যের (cereals) উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(গ) এই বাণিজ্য শুল্ক ছাড়া পরোক্ষ ভাবেও সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগ করা হইতেছে।

(ঘ) কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় (sanitary) পুলিস আইন বাণিজ্য শুল্ক অপেক্ষাও আমদানীর অধিক বাধা জন্মাইতেছে।

(ঙ) এক দিকে যেমন আমদানীকে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দেওয়া হইতেছে অপর দিকে তেমনি সর্ব্বপ্রকারে রপ্তানীর সাহায্য করা হইতেছে।

উপরোক্ত কারণগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে জাতিসঙ্ঘ অতিরিক্ত কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। এর ফলে কৃষকের আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং তাহারা প্রয়োজন সত্ত্বেও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যও কমাইতে হইয়াছে ও তাহাতে শিল্প-ব্যবসায়ীদের বহু ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ নয়। গত মহাযুদ্ধের ফলে সকল জাতিই অর্থনৈতিক বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে। এখন আর কোন দেশই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। পূর্ব্বে যে সব দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারা আজ কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়াই সন্তুষ্ট নয়—শিল্প বিষয়েও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে তাহাদের শিশু শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য আমদানী শুল্কের প্রাচীর বেশী করিয়া তুলিয়া দিয়াছে। এর ফলে শিল্পপ্রধান দেশ সমূহের সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে জার্ম্মানীর অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন জার্ম্মানীকে গত মহাযুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি মিত্র-শক্তিসমূহকে প্রতি বৎসর বহু টাকা দিতে হয়। প্রধানতঃ শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের দ্বারাই জার্ম্মানী এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে এ টাকা যোগাড় করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাধারণ ক্রয়শক্তি হ্রাস ও বিদেশের শুল্ক-প্রাচীরের দরুণ জার্ম্মানী উৎপন্ন মাল বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। ফলে জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু জার্ম্মানীর সমস্যা আজ আর শুধু জার্ম্মানীরই সমস্যা নয়—ইহা এখন সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার এবং প্রকারান্তরে সমস্ত পৃথিবীরই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে জার্ম্মানী দেউলিয়া হইলে কেবল যে মিত্র-শক্তিবৃন্দ ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবেন না তা নয়। জার্ম্মানীর সঙ্গে নানা সূত্রে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িত। জার্ম্মানীর সর্ব্বনাশের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে।

এদিকে "শুল্ক-দ্বন্দ্ব" বাড়িয়াই চলিয়াছে। সকলেই জানেন নানা কারণে ইংলণ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু দেশ স্বর্ণমান রহিত করিয়াছে এবং কোন কোন দেশ স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে; যাহা প্রায় স্বর্ণমান রহিত করারই সামিল। স্বর্ণমান রহিত করার ফলে পাউণ্ডের

স্বর্ণ-মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সেই অনুপাতে বিলাতী দ্রব্য বিদেশে সস্তা হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে বিদেশী দ্রব্যের পাউণ্ড-মূল্যও সেই একই কারণে অনুরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই বিলাতী জিনিষ বিদেশের বাজারে যেরূপ সুবিধা পাইতেছে বিদেশী জিনিষ বিলাতের বাজারে তেমনি অসুবিধা পাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও ইংলণ্ডের সমস্যার সমাধান হয় নাই, তাই তাহারা বিলাতী শিল্প-ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য মুক্ত-বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করিয়া সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে ও প্রায় সকল আমদানী দ্রব্যের উপরই শুল্ক বসাইয়াছে। এই দুই কারণে ইংলণ্ডের শিল্প-ব্যবসায়ীদের খুবই সুবিধা হইবার কথা ছিল। কিন্তু ইংলণ্ড যতটা আশা করিয়াছিল ততটা সুবিধা পায় নাই। কারণ প্রায় সকল দেশই নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। ফলে বিদেশের বাজার সকল দেশের নিকটই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং সকলকেই আপন আপন উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য অধিকতর ভাবে স্বদেশের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

এই শুল্ক-দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের কতকগুলি সুবিধা আছে যা অন্য কোন দেশেরই নাই। কারণ ভারতবর্ষের বাজার তাহার প্রায় একচেটিয়া এবং কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশেও সে বাণিজ্যের অনেক কিছু সুবিধা পাইয়া থাকে। তার উপর টাকাকে পাউণ্ডের সহিত জুড়িয়া দিয়া ইংলণ্ড ভারতের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। কারণ পাউণ্ডের স্বর্ণ-মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে টাকার স্বর্ণমূল্যও হ্রাস হইতেছে এবং তার ফলে ভারতের বাজারে স্বর্ণমান দেশসমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখনও টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময়ের হার ১ শিলিঙ ৬ পেন্স থাকায় বিলাতী দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। ডলারের সঙ্গে পাউণ্ডের বর্ত্তমান বিনিময়-হারের তুলনা করিলে দেখা যায় স্বর্ণমান রহিত করার পর পাউণ্ডের (এবং সেই সঙ্গে টাকারও) স্বর্ণমূল্য শতকরা ৩০ গুণেরও উপর কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতের বাজারে অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংলণ্ড এই অনুপাতে সুবিধা পাইতেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইংলণ্ড তাহার বহির্ব্বাণিজ্যে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছে না। কারণ ভারতবর্ষ আর্থিক দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহার ক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রায় নাই বলিলেই চলে। তা ছাড়া গোল-টেবিল-বৈঠকের ব্যর্থতা ও গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফলে যদি আবার বিলাতী বর্জ্জন আরম্ভ হয় তবে এই সামান্য সুবিধাটুকুও থাকিবে না।

ভারতবর্ষের পরেই কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডমিনিয়ন ইংলণ্ডের ভরসাস্থল। ইংলণ্ডকে কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্য বহু পরিমাণে বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়; কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিও শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি অনেক পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে। এ অবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরের সুবিধাজনক একটা বাণিজ্য-ব্যবস্থার চেষ্টা ইংলণ্ড বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডের যতটা গরজ ডমিনিয়নসমূহের ততটা গরজ হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ ইংলণ্ডকে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া যতটা বেগ পাইতে হয় ডমিনিয়নসমূহকে তাহাদের কাঁচা মাল লইয়া ততটা বেগ পাইতে হয় না। তা ছাড়া অন্যান্য দেশের ন্যায় ডমিনিয়নসমূহও শিল্পবিষয়ে স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভরশীল হইতে চেষ্টা করিতেছে। এ সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব কেনাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্ত হইতে যতটা বুঝা যায় ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা আশাপ্রদ নহে। কারণ স্বর্ণমান রহিত করার ফলে পাউণ্ডের স্বর্ণ-মূল্যের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই কেনাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা বিলাতী দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় আগামী সাম্রাজ্য-সভায় ইংলণ্ড যাহা আশা করিতেছে তাহা ব্যর্থ হওয়া একরূপ সুনিশ্চিত। কাজেই শুল্ক-দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের যে সুবিধার কথা বলা হইয়াছে তাহা সত্যকারের চেয়ে কাল্পনিকই বেশী। সুতরাং অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডকেও নিজের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য স্বদেশের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। এই শুল্ক-দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী ফল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্কোচ এবং সেই অনুসারে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনর্গঠন। এই বিপর্য্যয়ে সকল দেশেরই অল্প বিস্তর অসুবিধা অনিবার্য্য কিন্তু এই দুঃখভোগ হইতে নিষ্কৃতলাভের জন্য বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-ব্যবস্থাকে বজায় রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে দুঃখভোগের পরিমাণ ও সময় উভয়ই বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু এই দারুণ শুল্ক-দ্বন্দ্বকেও ছাড়াইয়া যে কথা আজ ইউরোপ ও আমেরিকাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইতেছে জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থার কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্ষতিপূরণের দাবী ও নানারূপ ঋণভারে নিপীড়িত জার্ম্মানী আজ সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। শীঘ্রই এ সব সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা না হইলে জার্ম্মানীতে রাষ্ট্র-বিপ্লব সুনিশ্চিত। বলা বাহুল্য সেরূপ ব্যবস্থা আমেরিকা, ফরাসী, ইংলণ্ড ইহাদের সকলেরই ত্যাগস্বীকারসাপেক্ষ। কারণ ক্ষতিপূরণ ও বাণিজ্য ঋণ এ উভয় ব্যাপারে ইহারাই জার্ম্মানীর প্রধান পাওনাদার। কিন্তু সে ত্যাগ-স্বীকারে এখন পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিণাম কল্পনা করিয়া নিজেদের স্বার্থেরই খাতিরে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা একটা রফা করিবেন এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু জার্ম্মান সমস্যার সমাধান ইউরোপের শান্তি ও শিল্প বাণিজ্যের পুনরুত্থানের পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন সে সমস্যার সমাধান হইলেই আমাদের আর্থিক সকল দুর্গতির অপনোদন হইবে এরূপ আশা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না, যদিও এরূপ আশা আমাদের দেশেও অনেকেই করিতেছেন দেখা যায়। কারণ জার্ম্মান সমস্যার সমাধান হইলেও বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দার প্রধান দুইটি কারণই থাকিয়া যায়। তার প্রথমটি অতিরিক্ত কৃষিদ্রব্যের উৎপাদনের ফলে ও অন্যান্য নানা কারণে সাধারণ ক্রয়শক্তির হ্রাস এবং দ্বিতীয়টি বর্ত্তমান শুল্ক-দ্বন্দ্ব। অবশ্য এরূপ আশা যাঁহারা করেন তাঁহারা জার্ম্মান সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে এই অপর দুই কারণেরও তিরোধান বোধ হয় কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে জার্ম্মান সমস্যার সমাধানের জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন তাহার সাহায্যে এই অপর দুই সমস্যার সমাধানও খুবই সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এ যুক্তির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ জার্ম্মান সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব দেশের সহযোগিতার প্রয়োজন, শুল্ক-দ্বন্দ্বের বিবর্ত্তির পক্ষে শুধু তাহাদেরই সহযোগিতাই যথেষ্ট নয়। ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যই সুবিধাজনক। কিন্তু যে সব দেশ শিল্পব্যবসায়ে নূতন ব্রতী হইয়াছে তাহাদের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য ধ্বংসের পথেরই নামান্তর মাত্র। এ অবস্থায় এ বিষয়ে কোন আন্তর্জ্জাতিক বন্দোবস্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান শিল্প-দ্বন্দ্বকে আমাদের আর্থিক সমস্যার কারণ মনে করাই একটা মস্ত বড় ভুল। ইহা আমাদের সমস্যার কারণ নয়—আমাদের সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করিবার একটি লক্ষণ মাত্র। এ সমস্যা বর্ত্তমান শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যনীতিরই অপরিহার্য্য পরিণতি। এ বাণিজ্যনীতির মূলমন্ত্র বহুকে রিক্ত করিয়া একক ধনী করা—বহু দেশকে শোষণ করিয়া এক দেশকে সমৃদ্ধ করা। সমগ্র ভারতের বস্ত্র-ব্যবসায়কে ধ্বংস করিয়া লেঙ্কাসায়ারের রাজৈশ্বর্য্য এ নীতিরই ফল।

এই একই কারণে সাধারণ ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি সম্বন্ধেও আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতায় কোন স্থায়ী সুফল আশা করা যায় না। সকলেই জানেন এ সমস্যা দেখা দিয়াছে প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও চীনে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে যাহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতিই তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ভারতের কুটীর-শিল্পকে ধ্বংস করিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ইংলণ্ডই করিয়াছে। আজ ভারতীয় কৃষকের আয় বাড়াইতে হইলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য নীতির নাগপাশ হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। সে মুক্তি ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গেই কেবল সম্ভব। কিন্তু আজ যাহারা নিজেদের গরজে ভারতবর্ষ ও চীনের কৃষকের আয় বাড়াইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা এরূপ কোন শুভ উদ্দেশ্যের স্বপ্নও দেখেন না। তাঁহারা চাহেন রৌপ্যের স্বর্ণ-মূল্য বাড়াইয়া এই সব কৃষকের ক্রয়-শক্তি অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবার শক্তি বাড়াইতে। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থায় আর যাহারই যত সুবিধা হউক ভারতীয় ও চীনা কৃষক যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিবে।

ভারতবর্ষের সমস্যা অসংখ্য; তাহার আর্থিক-সমস্যা পর্ব্বতপ্রমাণ। কিন্তু অন্যান্য সমস্যার ন্যায় এ সমস্যার সমাধানও ভারতবাসীকে নিজেরই চেষ্টায় করিতে হইবে। আমেরিকার রৌপ্য-ব্যবসায়ী বা ইংলণ্ডের ধনকুবের আমাদের সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে এ দুরাশা যদি আমরা করি—তবে এ দুর্ভাগ্য দেশের এখনও অনেক দুঃখভোগ বাকী আছে।

রুবাই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগো সুন্দরি, আঁধার রাত্রি গেল !
কমল খুলিছে,—কমল-নয়ন মেল !
বাতায়ন ধরি দাঁড়াও নিমেষ-কাল,—
লজ্জায় উষা হোক আরো লালে-লাল।

কাঁকণ-ক্বণিতে হিম-নিরুদ্ধ বাস
চমকি শিহরি ফেলুক দীর্ঘশ্বাস ;
খণ্ডিতা যত ফুল কামিনীর দলে
নয়ন ভরুক্ শিশির অশ্রুজলে।

জাগো এণাক্ষি—জাগো এণাক্ষি অয়ি !
অধরে বক্ষে সোহাগ-চিহ্ন বহি ;
রাত্রির দীপ নিভিয়াছে,—নাহি আর
রাত্রির মোহ, রাত্রির আঁধিয়ার।

মিলন-সুখের মোহের স্বপন মুছি'
নয়নে ফুটাও আলোক শুভ্র-শুচি,
আঁধারের ফুল পোহাইতে বিভাবরী
নিঃস্ব নিশার নিশ্বাসে যাক ঝরি।

মুছিয়া ফেলুক অলস তন্দ্রাজাল
কাজলে-কিরণে আঁখি দুটি সুবিশাল !
বঁধূর কণ্ঠে বাহু-বন্ধন খোলো,
বিদায়-চুমার নিদয় লগন হোলো।

দিবাপানে কেন কুটিল দৃষ্টি হানো ?
কেন ভ্রূভঙ্গে ভুজঙ্গ-ফণা আনো ?
এখনো কি অয়ি মিটে নাই প্রিয়-তৃষা
হায় শঙ্কিত অতৃপ্ত মৃগদৃশা ?

ভয় নাই ওলো আবার আসিবে রাতি,
নামিবে আঁধার জ্বলিবে সন্ধ্যা-বাতি,
যৌবন-ফুল শুকাবেনা দিনে-দিনে
রবি-কর দাহে বারিসিঞ্চন বিনে !

তপনপীড়নে তৃষা যদি আরো বাড়ে,
বুক ফাটে তবু নিভিতে দিওনা তারে।
দিনের মরুভূ পার হয়ে ওগো মৃগি,
মিলিবে শীতল গভীর নিতল দীঘি।

দিনের আড়াল অসহ মানিছ মনে ?
কেমনে বাঁধিবে পলাতক যৌবনে ?
তোমার প্রেমের সুমহিম গৌরবে
যৌবন, ধনি, স্তম্ভিত হয়ে রবে।

—মোচন করগো বাহু-বন্ধন-পাশ,
বক্ষের মাঝে পুঞ্জিত নিশ্বাস।
রাত্রির দীপ নিভিয়াছে—নাহি আর
রাত্রির মোহ, রাত্রির আঁধিয়ার।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

লর্ড একটনের আধুনিকতম একখানা বইয়ে প'ড়েছিলাম, "Of all the wonderous phenomena in history the services of illustrious foreigners for the cause of an alien civilization strike me most with deepest admiration." বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসের গোড়ার দিকে খোঁজ ক'র্‌লে আমাদেরও এই কথাই ব'লতে ইচ্ছে হয়! আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্র একটী অপরিহার্য্য উপাদান—রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম সব কিছুর যেখানে যা গলদ ঢুকেছে তা নিয়ে আন্দোলন ক'রতে হ'লে আমরা প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ সংবাদপত্রেরই শরণাপন্ন হই—বস্তুতঃ সংবাদপত্রের চেয়ে জাতির নিজস্ব জিনিষ এখন আমরা আর কল্পনাই করতে পারি নে। কিন্তু এই বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশ ক'রেছিলেন বাঙালীরা নয়, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। শুধু সাময়িক পত্রই নয়, বাংলা গদ্যই ব'ল্‌তে গেলে মিশনারীদের সৃষ্টি; বাংলা ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও দর্শন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই রচনার সূত্রপাত তাঁরাই প্রথম করেন। আজ আমরা 'মথি লিখিত সুসমাচার'এর কথা তুলে হাসতে ছাড়িনে, কিন্তু ইতিহাসের মর্য্যাদা রাখতে হ'লে কেরী, মার্শমেন, হ্যাল্‌হেডকেই আমাদের গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পর্য্যায়ে তুলতে হবে। কিন্তু যাক সে কথা, এ বিষয়ে কিছু জানতে হ'লে আচার্য্য প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির উপাদেয় আলোচনা পাঠকরা প'ড়ে নিতে পারেন। আমরা উপস্থিত শুধু সাময়িক পত্রের কথাই বলি।

বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্রের নাম 'দিগ্‌দর্শন'। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরামপুর থেকে মিশনারীদের চেষ্টায় এই পত্রিকা বের হয়। ঐ বছরই ৩১শে মে আর একখানি পত্র তাঁরা বের করেন, তার নাম 'সমাচার দর্পণ'। 'দিগ্‌দর্শন' হ'ল সাহিত্য-পত্রিকা আর 'সমাচার দর্পণ' সংবাদপত্র। এই দুটী পত্রেই ইংরাজী, বাংলা উভয় ভাষাতেই লেখা থাকত। প্রথম সংখ্যার 'দিগ্‌দর্শন'এ আমেরিকার আবিষ্কার, ভারতের ভৌগলিক বিবরণ, ভারতের পণ্য দ্রব্যের ইতিহাস, আকাশ-ভ্রমণ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কথা ও স্থানীয় বিবরণ—এই কটী লেখা প্রকাশিত হয়। এ হ'তেই ঐ পত্র বিষয়-সম্পদে কতদূর উন্নত ছিল তা অনায়াসে অনুমান ক'রতে পারা যায়। 'সমাচার দর্পণ' মূলতঃ সংবাদ-পত্র হ'লেও এতে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ধর্ম্ম-বিবরণ ও উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। এ ছাড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রাপ্ত-পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সেকালের উপযোগী অন্যান্য জিনিষও এতে স্থান পেত'। এক সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ'এ কোন অল্প-শিক্ষিতা হিন্দু-মহিলার পত্রে দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম ক'রে অবসর সময়ে চরকায় সুতো তৈয়ারী ক'রে প্রত্যেক নারীই কিরূপে কিছু কিছু উপরি আয় ক'রতে পারেন সে সম্বন্ধে বড় সুন্দর পরামর্শ আছে। আর এক সংখ্যায় তদানীন্তন ইঙ্গ-বঙ্গ কবি কালীপ্রসাদ ঘোষের ইংরাজী কবিতার একটী মনোজ্ঞ সমালোচনা প'ড়েছিলাম। এই দুই পত্র থেকেই সেকালকার কলিকাতার অনেক ছোট বড় বিচিত্র গল্প জানতে পারা যায়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে যার মূল্য অত্যন্ত বেশী। ভাষা-সাহিত্যের দিক থেকেও এদের অনেকটা নিজস্ব দাম আছে—রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের ভাষা প'ড়ে আজ আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু এই উন্নততর অবস্থায় আসতে বাংলা ভাষাকে কী অভাবনীয় গঠন-পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়ে আস্‌তে হ'য়েছে তা জানা যায় শুধু মিশনারী যুগের এই কাগজ দু'টীর সন্ধান ক'রলে।

আমরা উভয় পত্রেরই পুরাতন ফাইল থেকে নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ ক'রবার জন্য।

"বঙ্গভূমির প্রধান উৎপন্ন বস্তু ধান্য, তাহার অনেক অন্য অন্য দেশে প্রেরিত করা যায়; দৈবাৎ কখন ফসল না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ হয়, এরূপ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমিতে ও হিন্দুস্থানের অন্য অন্য ভাগে কখন কখন হইয়া-

ছিল, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল—। এই দুর্ভিক্ষ অদ্যাপীও বঙ্গভূমিস্থ লোকেদের মন হইতে লুপ্ত হয় নাই।" (১)

"৯ই মে রবিবার শ্রীযুক্ত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, যে সেই সভাতে জাতির প্রতিনিধি কিংবা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল।" (২)

'তিমিরনাশক' বলে আরও একখানি পত্রিকা মিশনারীরা বের করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য 'বেঙ্গল গেজেট' ব'লেও একখানা কাগজ সম্পাদন ক'রতে আরম্ভ করেন। অনেকে 'তিমিরনাশক'কেই বাংলার প্রথম সাময়িক পত্র ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। ডক্টর সুশীল কুমার দে মহাশয়ের 'Bengali Literature in the 18th Century' বইতে বোধ করি 'তিমিরনাশক'কেই প্রথম বাংলা পত্রিকা বলা হ'য়েছে। 'Life and Works of Carey, Marshman and Ward' পুস্তকে কিন্তু আমরা আমাদেরই মতের সমর্থন দেখতে পাই।

এর পরই বাংলা দেশে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কাল। ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কারক ব'লেই রাজা রামমোহনের সমধিক খ্যাতি হ'লেও সাহিত্যের দিকেও তাঁর একটা বিশিষ্ট দান আছে—যদিও সাহিত্য তাঁর সংস্কার কার্য্যেরই সহায়ক মাত্র ছিল। দেশের জনমত গঠন ক'রতে হ'লে, বা দেশীয় অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে চিত্তবৃত্তির আদান প্রদান ক'রতে হ'লে জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়েই ক'রতে হবে একথা রামমোহন সম্যক হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিলেন, তাই শেষ জীবনে তিনি 'সংবাদ-কৌমুদী' নাম দিয়ে একখানি সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮১৯)। এই পত্রে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ইতিহাস সর্ব্ববিষয়ক প্রবন্ধই থাকত, এবং রাজা স্বয়ংই সমস্ত প্রবন্ধ লিখতেন। কত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কী অসাধারণ অধিকার ছিল তা 'সংবাদ-কৌমুদীর' যে কোন সংখ্যার পাতা উল্টালেই বুঝতে পারা যায়—তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখা আবশ্যক যে রামমোহনের লেখায় আগাগোড়া এমন একটা ভাষাগত জড়তা লক্ষিত হয়, যাতে মনে হ'তে পারে তিনি মূল না লিখে সমস্তই অন্য কোন ভাষা থেকে অনুবাদ ক'রে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে মিশনারী বাংলার ভাষায় রামমোহনী বাংলা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতা অধিক দেখা যায়—এর কারণ আমরা বারান্তরে আলোচনা ক'রে দেখাতে চেষ্টা ক'রব।

নিম্নে আমরা 'সংবাদ-কৌমুদী' থেকে একটী অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত ক'রছি।

—"অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে হে বাদশাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশ কালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদশাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে সমীপাগত হইতে দিবাতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবেক, সুতরাং অন্য বাদশাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে"। (৩)

'সংবাদ-কৌমুদী'র জীবনকালেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর' বের্ করেন। ঈশ্বর গুপ্তকে সকলে কবি ব'লেই জানেন; তাঁর গদ্যরচনার নমুনা স্বরূপ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বইয়ে যে অংশটুকু উদ্ধৃত ক'রেছেন তা হ'তে তাঁকে একটী পঞ্চম শ্রেণীর কদর্য্য গদ্য-লেখক ব'লেই সকলের ধারণা হয়, কিন্তু যাঁরা 'সংবাদ প্রভাকর' প'ড়েছেন তাঁরা জানেন গদ্যরচনার ওপরেও তাঁর কেমন অধিকার ছিল; ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি পদ্য অপেক্ষা গদ্যই তিনি লিখ্তেন ভাল। তাঁর 'মৈত্রী' শীর্ষক প্রবন্ধ অনেক পাঠ্য-পুস্তকে আজকাল স্থান পেয়েছে; এটী 'প্রভাকর' থেকে উদ্ধৃত এবং সাহিত্যের দিক দিয়ে একটী অনবদ্য রচনা......। গুপ্ত কবিই সর্ব্ব প্রথম বাংলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করেন। 'প্রভাকর'এ তিনি রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, নিধু বাবু, হরু ঠাকুর, রাম বাবু, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের

(১) দিগ্‌দর্শন—এপ্রিল, ১৮২০। (২) সমাচার দর্পণ—২২শে মে, ১৮১৯। (৩) সংবাদ-কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪

কবিতা ও গান সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেন এবং তাঁদের জীবনী ও প্রতিভার আলোচনা করেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিক থেকেও 'প্রভাকর' বিশেষ সহায়তা ক'রেছে, লেখকগঠন বিষয়ে। পরবর্ত্তী কালের রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, 'সোমপ্রকাশ'এর সম্পাদক দ্বারকানাথ প্রভৃতি প্রথম বয়সে এই প্রভাকরেই হাত পাকিয়েছিলেন। 'প্রভাকর'এ শেষোক্ত তিন জনের মধ্যে একবার যে কবিতা-যুদ্ধ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ শচীশ বাবুর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে দ্রষ্টব্য। সেকালকার শিক্ষিত সমাজে গুপ্ত কবির কবিতারও যেমন সমাদর ছিল, 'প্রভাকর'এরও তেমনই কাট্তি ছিল—ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই দ্বার্থ ক'রে বলে গেছেন—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচরে।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকরে॥"

প্রভাকর থেকে কিছু তুলে দেওয়া যাচ্ছে—

"এদিকে যবন সেনারা বাহুবলবিস্তার পূর্ব্বক নগর তোলপাড করিতে লাগিল। জগঝম্প-ধ্বনি করিয়া কতই দম্ভ করিতেছে, লম্ফ মারিতেছে, ঝম্প দিতেছে, ভূমিকম্প হইতেছে!......সকল দ্বারেই মহা গণ্ডগোল, সকল দ্বারেই সৈন্যের কোলাহল। ভূতোগত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া উঠিল। ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া সকল দ্বারে আঘাত করিতেছে, যাহা দেখিতেছে তাহাই হরিতেছে—মারিতেছে—সারিতেছে"। (৪)

১৮৩০ খৃঃ অব্দে 'প্রভাকর' সাপ্তাহিক ও তৎপরে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে প্রাত্যহিক রূপে প্রকাশিত হয়—মাসিক প্রভাকরও কিছুদিন চ'লেছিল।

১২৫৩ সালে 'পাষণ্ড-পীড়ন' এবং ১২৫৪ সালে 'সাধুরঞ্জন' নাম দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত আরও দু'খানি কাগজ বের্ করেন। এই সময় গুড়্গুড়ে ভট্চার্য্যির (গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ) 'রসরাজ'এর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে। এই বিবাদের উল্লেখ ক'রে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত'এ লিখেছেন,—

"কলিকাতার পথে দুইটী মেহতরের মধ্যে কলহ বাধিলে উভয়ে যদি নিজ নিজ হণ্ডিকা হইতে ময়লা লইয়া পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করে তাহা হইলেও এতদূর কদর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয় না।"

একদিকে 'প্রভাকর'এর ভেতর দিয়ে যেমন একটী সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠ্ছিল যাতে দেশের তরুণ ও প্রবীণ সকলেই রঙ্গ-রস ও আলাপ আলোচনাকে উৎসাহ ও নব নব প্রচেষ্টার (experiment) দ্বারা সঞ্জীবিত ক'রে তুল্ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নায়কতায় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। 'তত্ত্ববোধিনী' মূলতঃ পারমার্থিক পত্রিকা হ'লেও কেবলমাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাদ প্রতিবাদ ও গতানুগতির সংস্কার নিয়েই ব্যস্ত থাক্ত না। অক্ষয় দত্ত নিজে ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; মিশনারী যুগের পূর্ব্বোক্ত পত্রিকা দুটীতে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অনেক থাক্ত, এ ছাড়া 'বিজ্ঞান-সেবধি' 'কিমিয়া বিদ্যাসার' 'পদার্থ বিদ্যা', অশ্বাবলী' প্রভৃতি বিজ্ঞানের (বিভিন্ন শাখা অবলম্বনে) পৃথক বইও কয়েক খানি রচিত হ'য়েছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি যে মিশনারী যুগে বাংলা গদ্য সবে মাত্র গ'ড়ে উঠ্ছে। কাজেই তখনও পর্য্যন্ত এসব বিষয়ে গভীর ভাবে আলোচনা চলার মত শব্দসম্পদ বাংলা ভাষায় আসেনি কিন্তু অক্ষয়কুমারের যুগে বাংলা গদ্যের গঠনক্রিয়া অনেক খানি পূর্ণতার দিকে এসেছে, কাজেই প্রথম বাঙালী বিজ্ঞান-লেখক ব'ল্তে গেলে অক্ষয়কুমারেরই নাম উল্লেখ করা সঙ্গত। তিনি 'চারুপাঠ' 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়' প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা', 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বই লিখেছেন তার সবই প্রথম 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'মহাভারতের অসম্পূর্ণ অনুবাদ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ঋগ্বেদ সংহিতা' অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর বক্তৃতা ধারাবাহিক ভাবে 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হ'ত। প্রাচীন পত্রিকাগুলির মধ্যে এক 'তত্ত্ববোধিনী'ই আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে, অক্ষয়কুমারের পর এর সম্পাদন-ভার পর্য্যায়ক্রমে রবীন্দ্র-অগ্রজরা গ্রহণ করেন; এখনও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্র বাবু এর সম্পাদক। সত্যেন্দ্রনাথের সম্পাদনকালে (১৮১৬ সালের আশ্বিন মাসে) মাইকেলের প্রসিদ্ধ 'আত্মবিলাপ' কবিতা এই 'তত্ত্ববোধিনী'তে বের্

(৪) সংবাদ প্রভাকর—১লা বৈশাখ, ১২৬১ সাল।

হয়। 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রথম আমলে খ্যাতি এত অধিক ছিল যে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এর প্রতি সংখ্যা অনূদিত হ'ত।

প্রাচীন 'তত্ত্ববোধিনী' থেকে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

"কাল যত অতীত হইতেছে, কুসংস্কারও তত রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। লোকে অসভ্য অবস্থায় যেমন শরীরের অঙ্গবিশেষ ছেদন করিত, অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি হওয়াতে উহা আর যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময় আত্মার প্রতি লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও প্রীতি প্রভৃতি আত্মার যে সমস্ত বৃত্তি অতি পবিত্র এবং যেগুলি ঈশ্বরের দ্বারে গমন করিবার একমাত্র অবলম্বন, এই অবস্থায় তাহাদের মস্তকে শাণিত অসি প্রহার করা হইয়াছে।" (৫)—থিওডোর পার্কারের জীবনী।

এই সময় কয়েকটী বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম্ম ও সামাজিকতাব সমর্থনকল্পে অনেকগুলি পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু স্থায়ী ইতিহাসের দিক দিয়ে এসব সাম্প্রদায়িক কাগজের মূল্য অত্যন্ত কম। কাজেই আমরা এর পর একেবারে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'সর্ব্ব শুভকরী'তে চ'লে আসতে পারি। মদনমোহন 'শিশু শিক্ষা'র লেখক ব'লেই প্রসিদ্ধ—'বাসবদত্তা'র জন্য তাঁর কবি-খ্যাতিও আছে, কিন্তু সম্পাদক মদনমোহনের খবর অনেকেরই রাখবার সুযোগ হয় নি। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে মদনমোহন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ব-নামে 'সর্ব্ব শুভকরী' প্রকাশ করেন।

'সর্ব্ব শুভকরী' প্রসঙ্গে একটা কথা উঠে পড়ে, যদিও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তা একটু অবান্তর শোনাবে। মিশনারীরাই বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা এবং রাজা রামমোহন এই উদ্যোগের প্রথম ফল। মিশনারী যুগ ও তত্ত্ববোধিনী যুগের মধ্যে মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধান, অথচ এইটুকু সময়ের মধ্যেই পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান এদেশে এমনভাবে প্রচারিত হ'য়ে যায় যে অক্ষয়কুমার কোঁতে, হক্সলি প্রভৃতির মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে নিজের লেখার মধ্যে আয়ত্ত ক'রে নিতে সমর্থ হন। কিন্তু তবুও আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে পাশ্চাত্য বিদ্যার হাতে আত্ম-সমর্পণ তখনও দেশের শিক্ষিত সাধারণে করেন নি……প্রাচ্যের আদর্শে উজ্জীবিত একদল পণ্ডিত পাশ্চাত্যের এই নবতন আদর্শের সামনে নিজেদের কী ছিল আর কী আছে তারই একটা সজীব মূর্ত্তি খাড়া ক'রে দেখাতে চেষ্টা করেন; বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি এই দলের প্রতিনিধি এবং এই দলের মুখপত্র হিসেবে 'সর্ব্ব শুভকরী' ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতের পরিচালিত ব'লেই 'সর্ব্ব-শুভকরী' অন্ধ গোঁড়ামি ও সংস্কারপরায়ণতার কেন্দ্র ছিল বুঝ্‌লে ভুল করা হবে…এতে যে সব বিষয়ে আলোচনা হ'ত তার দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই একথা আমরা বুঝতে পা'রব। 'শৈশব-বিবাহ', 'বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'মানবগণের সম্বন্ধ', 'সুরাপান নিষেধ' প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এতে বেরিয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় 'সর্ব্ব-শুভকরী' অল্প দিনের ভেতরই আভ্যন্তরিক বিবাদের ফলে উঠে যায়। এই পত্রের প্রথম সংখ্যা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

"যাচ্‌ঞা করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোক সঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ নিরস্ত হয়, দুর্ব্বিনয় দোষ ও অধর্ম্ম প্রবৃত্তি রূপ মহারোগশান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ।" (৬)

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসার সংগ্রহ'এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ আদর্শের মিলনের চেষ্টা দেখতে পাই। মিত্র মহাশয় স্বয়ং ছিলেন উভয় দেশীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে পরম পণ্ডিত; তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিমাপ কোন দিন কেউ ক'র্‌বার সাহস করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'জীবন-স্মৃতি'তে 'সাহিত্যের সব্যসাচী' নামে অভিহিত ক'রেছেন, "এমন জিনিষ খুব কমই ছিল যাহা তিনি অনুশীলন করেন নাই এবং এমন অনুশীলনও তিনি খুব কমই করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার পরিপূর্ণ দখল না ছিল।" কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে রাজা তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফল বেশীর ভাগই বিদেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর 'Beef in Ancient India', 'History of Orissa', 'Sanskrit Mss.' প্রভৃতি পুস্তক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ; বাংলা ভাষায় তিনি অল্প

(৫) 'তত্ত্ব-বোধিনী'—৭ম কল্প, প্রথম ভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৯।

(৬) 'সর্ব্ব-শুভকরী'—১৮৫১, বামাগণের বিদ্যা শিক্ষা।

যা দিয়ে গেছেন তা এই 'বিবিধার্থ'এর স্তম্ভেই সঞ্চিত আছে —এতে তিনি স্বয়ং নানা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, তদ্ভিন্ন তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদন প্রভৃতি এতে স্ব স্ব রচনা প্রকাশ ক'রতেন ; মাইকেলের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' এই 'বিবিধার্থ'এই প্রকাশিত হয় এবং রাজা স্বয়ং এবং রাজনারায়ণ বাবু তার সমালোচনা ক'রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য সাধারণকে বুঝিয়েছিলেন। 'বিবিধার্থ'এর প্রবন্ধগুলি একত্র ক'রে একখানা বই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিম্নে রাজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের যে সমালোচনা ক'রেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। এই সূত্রে ব'লে রাখি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনা ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় আরম্ভ ক'রলেও ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ লেখকদের আদর্শে রাজেন্দ্রলালই প্রথম সত্যকার সমালোচনা লিখেন—

-'বহুকালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতার বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশ সিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কয়েক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত প্রেতের পরিবর্ত্তে মানুষিক ঘটনার উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। * * * শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু ইংরেজী উপন্যাস-লেখকের মধ্যে স্কট নামা একজন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পর পর তিনখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। * * * তাঁহার রচনার চাতুর্য্য ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।" (৭)

'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক আর একখানি মাসিকেরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'রহস্য-সন্দর্ভ'এর 'নদী আর কালগতি' কবিতাটী সম্ভবতঃ অনেকেই তৃতীয় ভাগ 'পদ্য-পাঠ'এ প'ড়ে থাকবেন। এ কাগজখানি অল্প দিনের মধ্যেই উঠে যায়। উল্লেখযোগ্য কোন লেখা এতে বের হয় নি।

এর পর আসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' ; বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা দেশে 'বঙ্গদর্শন'এর আবির্ভাব কি নব যুগের সূচনা ক'রেছিল তা নিজের কথায় না' বলে কবি-গুরুর যাদুকরী ভাষায় ব'লতে ইচ্ছে করি—

"বঙ্গ-দর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনির' এবং মুষলধারে ভাব-বর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র, বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। রামমোহন বঙ্গ-সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।...রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ-সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ......যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নব-জাগ্রত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।" (৮)

'বঙ্গ-দর্শন' সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা না ক'রলে কিছুই বলা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের স্থানাভাব। বঙ্কিমের পূর্ব্বে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা কী ছিল তা আমরা মোটামুটি দেখিয়েছি, পরে কী হ'য়েছে তাও আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে। এই পুরাতন ও নবীন দুটী ধারাকে দু'হাতে ধ'রে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের শিখরদেশে অভ্রভেদী হিমালয়ের মত অবিচল গৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে তাঁর অফুরন্ত ভবিষ্যৎ, পিছনে অনন্ত অতীত !

'বঙ্গ-দর্শন'এ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি সমস্তই একে একে প্রকাশিত হ'য়েছিল , তদ্ভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান অনুশীলনের যে কোন শাখারই ওপর তিনি অগণ্য প্রবন্ধ রচনা ক'রে গেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ'এ দুভাগে এই সকল প্রবন্ধের অনেক গুলি প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু এখনও অনেক লেখা তাঁর 'বঙ্গ-দর্শন'এর পৃষ্ঠাতেই চাপা আছে। এমনি একটা লেখা থেকে আমরা এ স্থলে কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্নপ্রসবিনীর সন্তান, সকলেই সে কথা মনে করিয়া জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকাল কি বাহু বলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

(৭) বিবিধার্থ সার-সংগ্রহ—সম্বৎ ১৯২১ ; বঙ্কিমচন্দ্র।

(৮) সাধনা—১৩০৮।

মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় যাইতেছে? দেশভেদে কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?" (৯) মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে।

বঙ্কিম-যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সকলেরই মুখপত্র ছিল, এই 'বঙ্গ-দর্শন'। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর এঁরা সকলেই ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'এর নিয়মিত লেখক। এঁদের সকলকে নিয়ে তারাপুঞ্জবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনার প্রতিভার প্রভায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত ক'রে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ-দর্শন'এর সম্পাদকতা ছেড়ে দিয়ে 'প্রচার' বের ক'র্তে আরম্ভ ক'র্লে প্রথমে সঞ্জীবচন্দ্র পরে রবীন্দ্র-নাথ এই ভার নেন্। নবীন বাবুর 'আমার জীবন'এ 'বঙ্গ-দর্শন'এর এই সময়টুকুর খানিকটা গুপ্ত ইতিহাস আছে। বঙ্কিমী-চক্রের শ্রেষ্ঠ লেখকদের নিজেদেরও কয়েকখানি কাগজ ছিল—দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশ'এর কথা আগেই ব'লেছি, তা ছাড়া যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'আর্য্য-দর্শন' অক্ষয় সরকারের 'সাধারণী' ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব'এর এককালে বিশেষ সমাদর ছিল। 'বঙ্গ-দর্শন'এর কিছু পরেই সম্ভবতঃ ভূদেব বাবু 'এডুকেশন গেজেট্' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন, এটী প্রধানতঃ শিক্ষাসংক্রান্ত কাগজ হ'লেও নিছক্ সাহিত্যের দিক দিয়েও এতে অনেক লেখা থাকৃত—হেম বাবুর প্রসিদ্ধ 'পদ্মের মৃণাল' কবিতা ও নবীন বাবুর 'অবকাশরঞ্জিনী'র অনেক কবিতা প্রথমে 'এডুকেশন গেজেট'এ প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট'এর বয়স প্রায় ষাট বৎসর হ'তে চ'লল, এর প্রায় সম-সাময়িক হ'চ্ছে ঠাকুর পরিবারের 'ভারতী'। ১২৮৬ সালে 'ভারতী' প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র অগ্রজ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন এর সম্পাদক। প্রথম সংখ্যার 'ভারতী'তে তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদ বধ'এর সমালোচনা বের হয়। পরবর্ত্তী কালে কবি এই সমালোচনার উল্লেখ ক'রে নিজেকে নিজেই অনেক ইঙ্গিত ক'রেছেন; বয়সোচিত অসহিষ্ণুতা এই লেখাটীর প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠায় প্রবন্ধটী সুলিখিত হ'য়েও সাহিত্যে স্থান পাবার অনুপযুক্ত হ'য়েছে। দুঃখের বিষয় এটা এখনও কবির 'আধুনিক সাহিত্য'এ ছাপা হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পর স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর পর সরলা দেবী এর সম্পাদন-ভার নেন্। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধ'রে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভার অবদানাবলী প্রকাশিত ক'রেছেন। যাঁরা রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য ক'র্তে ইচ্ছে করেন তাঁরা ধারাবাহিক ভাবে প্রথম বর্ষ থেকে 'ভারতী' পড়লেই বিশেষ উপকৃত হবেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

'নব্য ভারত', 'জন্মভূমি', 'প্রদীপ' প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলে সেকালকার আর একমাত্র স্মরণীয় পত্রিকা হ'চ্ছে সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য'। সমালোচক হিসাবে সমাজপতির সুনাম-দুর্নাম দুইই অত্যন্ত অধিক। রবীন্দ্র-নাথের 'নষ্ট নীড়'; 'চোখের বালি', 'কড়ি ও কোমল' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'ছবি', 'বিলাসী' প্রভৃতির তিনি যে সব সমালোচনা ক'রে গেছেন তাতে উদার দৃষ্টির একান্ত অভাব দেখ্তে পাই। কিন্তু সমাজপতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁর জীবন-কালে সাহিত্যে যথেচ্ছাচার জিনিসটা মোটেই প্রশ্রয় পেত' না। সমাজপতির চাবুককে সেকাল-কার লেখকরা বেশ একটু ভয় ক'রে চ'ল্তেন। নলিনী বাবুর বইয়ে দেখি রজনী সেন ব'লেছিলেন, 'সমাজ-পতি না ম'লে আর বই ছাপাচ্ছি নে'। সমাজ-পতির লেখার নিদর্শন স্বরূপ সাহিত্য থেকে একটু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

"ধর্ম্মকে অনুশীলনের অপর নাম বলাতে 'নেশান' সম্পাদক কিছু আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন অনুশীলন আত্মগত, ধর্ম্ম পরগত। অনুশীলনে আত্মোন্নতি, ধর্ম্মে অপরের ভাবময় ভক্তিময় উপাসনা। * * * এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, সাধ্য সাধন ভেদে অনুশীলন ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইলেও মূলতঃ তাহারা একই।......অনু-শীলনের মুখ্য সাধন নিষ্কাম ভক্তি অর্থাৎ সকল বৃত্তির অফলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরমুখিত্ব। অতএব ভক্তিভাব ধর্ম্মভাব হইতে বিমুক্ত নহে।" (১০)

আমরা এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মাসিক ও সাপ্তাহিকের কথাই বলে এসেছি, সংবাদপত্রের কথা বিশেষ কিছুই বলা হয় নি। বস্তুতঃ 'সমাচার দর্পণ' ছাড়া বাংলা সংবাদপত্রের কোন খানিই পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। এই পর্য্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাগজ হ'চ্ছে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'। স্বর্গীয় শিশির ঘোষ ও তাঁর অগ্রজ মতিলাল

(৯) বঙ্গ-দর্শন—জুলাই, ১৮৭৩।

(১০) 'সাহিত্য'—১৩০০। অনুশীলন ধর্ম্ম: বঙ্কিমচন্দ্র।

ঘোষ বাংলা 'অমৃত বাজার'এর সম্পাদকতা ক'রতেন, তার-পর প্রেস-অ্যাক্টের উপদ্রবে কি ক'রে 'অমৃতবাজার' রাতা-রাতি ইংরাজীতে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছিল সে কথা অনেকেই জানেন, হয়ত প্রথম সংখ্যার ইংরাজী 'অমৃতবাজার'ও অনেকেই দেখে থাকবেন, তার বিজ্ঞাপন, সংবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু বাংলাতেই লেখা ছিল। 'অমৃত বাজার'এর অব্যবহিত পরেই যোগেন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' এবং কাব্য বিশারদের 'হিতবাদী' ………সেকালকার এই তিনখানি কাগজই নির্ভীকভাবে রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা ক'রত। তার মধ্যে 'বঙ্গবাসী'র ইন্দ্রনাথ (পঞ্চানন্দ) ও 'হিতবাদী'র কাব্যবিশারদ বিদ্রূপাত্মক লেখায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। ইন্দ্রনাথের—

"সিমলা নামেতে গিরি অতি ভয়ঙ্করী
ব্যোম-পথ আগুলিয়া আছে দিবানিশি
যেন ধূর্জ্জটির জটা গগনের গায়ে,
অথবা রে ঐরাবত উঠিছে আকাশে"—

প্রভৃতি ব্যঙ্গ-কবিতা সেকালকার পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ ক'রেছিল। কাব্য-বিশারদই 'বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমি কি মার সেই ছেলে' গানের রচয়িতা, সহজ প্রতিভা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান প্রতিভাকে তিনি যে ভাবে হতাদর দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। 'কুসুমে কীট'এর কথা না তোলাই ভাল। উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বসুমতী' এবং শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সহচর' এর অল্প পরের কাগজ। এক 'সহচর' ছাড়া অপর সব ক'খানি কাগজই আজ পর্য্যন্ত টিঁকে আছে এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন ক'রেছে। পাঁচকড়ি বাবুর 'নায়ক' অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

এই প্রবন্ধে আমরা বাংলা সাময়িক পত্রের উৎপত্তি ও পরিণতির একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়েছি এবং এই কিঞ্চি-দধিক একশত বৎসরের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য সব কিছু কী ভাবে ধীরে ধীরে ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়েছে তাও দেখাতে চেষ্টা ক'রেছি। বাংলা গদ্যের উৎপত্তি বাংলা সাময়িক পত্র দিয়ে সূচিত হয়, কাজেই আমরা বাংলা গদ্যের ক্রম-বিকাশের ধারাটীও এই সূত্রে বরাবর দেখিয়ে গেছি। ছোট বড় অনেক কাগজের কথাই বাদ দিতে হ'য়েছে। আমরা খাঁটী ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করি নি। সাহিত্যের দিকটাই আমাদের বিশেষ ক'রে

সাহিত্যকে দুটী পৃথক স্তরে ভাগ করা যায়, একটী স্থায়ী, অপরটি সাময়িক। চিন্তা-জগতের চিরন্তন যে সমস্ত প্রশ্ন তাই হ'চ্ছে স্থায়ী সাহিত্যের উপজীব্য—সাময়িক সাহিত্য সম-সাময়িক জীবন নিয়েই ব্যস্ত। এই জন্যে যে সময়ের যে কাগজ সে সময় পেরিয়ে গেলে তার মূল্য বেশী নয়; কিন্তু তবুও তার ভেতর থেকে সাহিত্য ও ইতিহাস উভয় শাখারই মূল ধারাটি টেনে বের করা যায়। আমরা এখানে প্রথম দিকটি দেখিয়েছি।
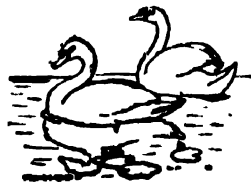
উপাসনা

"শাশ্বত কবি রবিরে নমস্কার।" সাবিত্রীপ্রসন্ন

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ১১ই পৌষ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইয়াছে। কবির সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সেদিন দেশবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহার শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য প্রদান করা হয়।

এই উপলক্ষে কলিকাতা টাউনহলের সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র অতি অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে পর্য্যাপ্ত পুষ্প এবং পল্লবমালায় সুসজ্জিত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদীর উপর কবির আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে কথা ছিল। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই চারিদিকের আসনগুলি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রধান নাগরিক শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কবিকে লইয়া টাউনহলের মধ্য দিয়া সোপানশ্রেণী বাহিয়া সভাস্থলে আগমন করেন। সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া কবিকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর কবিকে কলিকাতার মেয়র বিধানচন্দ্র রায় বেদীর উপর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে লইয়া যান।

প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় কবিকে মাল্যে বিভূষিত করেন এবং নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন:—

অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততি বর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমগ্র সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে,
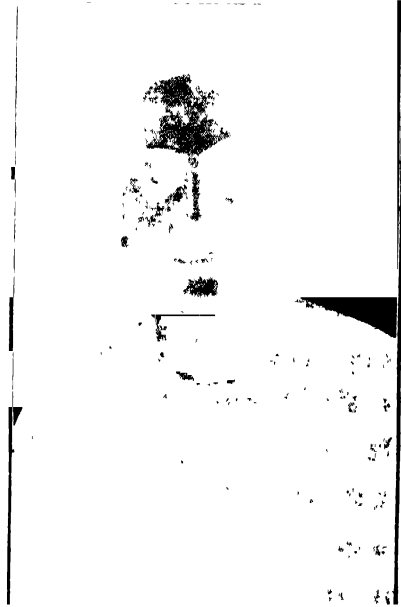
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন, তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনী-নিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে

মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দেমাতরম্।

তোমার গুণ-গর্ব্বিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য-বৃন্দের পক্ষে শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—মেয়র।

কবির উত্তর

একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজ-মহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবী কালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই, আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসংবর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুন, ইহার প্রবর্ত্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী ক্ষালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ, ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি।

অতঃপর রবীন্দ্র জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কবিকে অর্ঘ্য দান করেন। কবিকে ধূপ, দীপ, শঙ্খ, দূর্ব্বাদল, চন্দন এবং সচন্দন পুষ্পোপচারে অর্ঘ্য প্রদত্ত হয়। কয়েকটি বালিকা অর্ঘ্যসম্ভারপূর্ণ থালিগুলি কবির নিকট বহন করিয়া লইয়া যান এবং সেগুলি কবি স্মিতহাস্যসহকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন।

অর্ঘ্যদান

এতচ্চন্দনমত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বলং শীতলং
দীপোঽয়ং প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কান্তঃ স্থিরং দীপ্যতে।
ধূপোঽয়ং তব কীর্ত্তিসঞ্চয় ইবামোদৈর্দ্দিশোবপ্নুতে
মাল্যং নির্মলকোমলং তব মনস্তুল্যং সমুদ্ভাসতে॥
কম্বুস্থাপিতমেতদম্বু সরসং কাব্যং ত্বদীয়ং যথা
পুষ্পশ্রেণিরিয়ং গুণালিরিব তে পশ্যজ্জনাকর্ষণী।
অর্ঘ্যং তাবদিদং কৃতং তব কৃতে দূর্ব্বাঙ্কুরাদ্যন্বিতং
নম্বেতৎ প্রতিগৃহ্যতাং করুণয়া স্বস্ত্যস্তু তে শাশ্বতম্॥

আপনার শীলের ন্যায় এই চন্দন চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ও শীতল, আপনার রমণীয় প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ স্থিরভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার কীর্ত্তিরাশির ন্যায় এই ধূপ সৌরভে সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করিতেছে। আপনার মনের ন্যায় নির্ম্মল ও কোমল এই মাল্য উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার কাব্যের ন্যায় সরস এই জল শঙ্খে স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং আপনার গুণসমূহের ন্যায় এই কুসুমগুলি দর্শকগণকে আকর্ষণ করিতেছে। দূর্ব্বার অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা আমরা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। আপনি করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। আপনার শাশ্বত কুশল হউক!

প্রশস্তিপাঠ

ভেদো যস্য ন বস্তুতোঽস্তি ভুবনে প্রাচী প্রতীচীতি বা
মিত্রত্বং প্রকটীকৃতং চ সততং যেনাত্মনঃ কর্ম্মণা।
বিশ্বং যস্য পদং প্রসিদ্ধমনিশং সত্যে চ যস্য স্থিতি
র্ভূয়াৎ তস্য জয়ো রবেরবিরতং তেনাস্তু তৃপ্তং জগৎ॥

যাঁহার প্রাচী ও প্রতীচী বলিয়া ভুবনে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই, যিনি সতত নিজের কর্ম্মের দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি মিত্র, বিশ্বই যাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান এবং সত্যেই যিনি নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরাম জয় হউক ও তাহা দ্বারা জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক!

শান্তিপাঠ

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।

তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোঽহং যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ॥

পৃথিবী শান্তিময় হউক! অন্তরীক্ষ শান্তিময় হউক! দ্যুলোক শান্তিময় হউক! জল শান্তিময় হউক! ওষধি-সমূহ শান্তিময় হউক! বিশ্বেদেবগণ আমাদের জন্য শান্তিময় হউক! এখানে যাহা কিছু ভয়ানক, যাহা কিছু ক্রূর, যাহা কিছু পাপ, তাহা আমরা সেই সকল শান্তি দ্বারা, সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করি! তাহা শান্ত হউক! তাহা শিব হউক, সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

অতঃপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন :-

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অভিনন্দন

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী-দিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্তুতি-তম জন্মতিথি উপলক্ষে সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায় সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে —দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত-বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মণীষী, আপনি শতায়ু হইয়া এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া, মুক্ত হস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঊনচত্বারিংশৎ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আদ্য-বার্ষিক উৎসব মন্ত্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্টিতম জন্মদিনে সংবর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধি-ক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু-ধন্য আপনি মানবের বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া, যুগযুগান্তলব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্তে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ-গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি শ্বাস, কবি-কোবিদের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন; যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ স্বস্তি॥

কবির উত্তর

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল—একথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা-সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার

পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে যাঁহার হস্ত অদ্য স্তব্ধ যাঁহার বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরেণ্য জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন, এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্ত-কালকে উজ্জ্বল করিলেন এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।

তৎপরে পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করেন।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

শ্রীকবীন্দ্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়!
মাননীয় মহোদয়,

হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে আপনার সপ্ততি-বর্ষ প্রাপ্তির অবসরে আমরা আপনাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি এবং আপনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীমান্, ভারতবর্ষে অনেক প্রতিভাশালী এবং প্রভাব-শালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যাপ্ত ধন এবং যথেষ্ট সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন। রাজপুতনার চারণ কবিগণ অনেক সাময়িক কবিত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা ইতিহাসের স্বরূপ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছেন। সেইরূপ হিন্দী কবিগণ মোগল সম্রাট পর্য্যন্ত নিজেদের কবিতার চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাকবি ভূষণ তো আপনার কবিতার দ্বারা হিন্দুরাজ্য পুনঃ সংস্থাপনে প্রভূত সাহায্যই করিয়াছিলেন। আপনিও আপনার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি প্রভাবে স্পৃহনীয় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

কবীন্দ্র! আপনি বিশ্বভারতী স্থাপনা করিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সম্মিলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কীর্ত্তি-কৌমুদী চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে। আমাদের সভ্যতার প্রতিনিধি স্বরূপে আপনি ইউরোপে ও এসিয়ার দেশসমূহে যে প্রকারে ভারতের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা পুনরায় আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আপনাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন।

কবি-ভাষণ

উত্তরে কবি বলেন—আজ হিন্দী ভারতী সহোদরা বঙ্গ-ভারতীকে সম্মানিত করিলেন। দৈব কৃপাতে আমি এই শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ যে হইতে পারিয়াছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। কবির হৃদয় কখনও আপনার জন্মস্থানের সীমার ভিতর বদ্ধ থাকিতে পারে না, আর যদি তাঁহার যশঃ ঐ সীমা পার করে, তাহা হইলে তিনি সৌভাগ্যবান। হিন্দী সাহিত্যের দূতরূপে আপনারা আমার এই সৌভাগ্য বহন করিবার জন্য আসিয়াছেন. এজন্য আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইহার পর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী কবিকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন এবং নিম্নলিখিত কবিতাটির দ্বারা অভিনন্দিত করেন :—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

জয়ন্তী-অর্ঘ্য

হে কবি! জয়ন্তী-অর্ঘ্য নিয়ে হাতে তোমার স্মরণে
সুদূর প্রবাস হ'তে এই পথে, কবি-নিবেদনে,
এলো যারা, সেকি তারা বয়সের দাবী শুনে তব?
তাতো নয়, দেখি রূপ, অপরূপ, চির অভিনব;
বয়সের সীমা তব, নিত্য নব নর্ত্তনের কোলে,
সপ্ততি বৎসর বুকে, সাত বৎসরের শিশু দোলে,
সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন; সময়ের হিসাব না রাখে,
বিস্মিত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে সুধু থাকে।
কার চোখে এত দীপ্তি? কার বাণী নিত্য বহমান?
কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে বিশ্বের কল্যাণ
অফুরন্ত প্রাণ-রসে;—সে যে এই শিশু চিরন্তনী,
যুগে যুগে হে প্রবীণ! গাহ নবীনের জয়ধ্বনি।
বাঙ্গালার বুকের দুলাল! সত্যদ্রষ্টা! হে অমর কবি!
কালক্ষয় করে তুমি জয় গেয়ে যেও সুরের পূরবী।

চির সবুজের সমারোহ নিত্য হোক জীবনে তোমার,
প্রবাসের ভালবাসা-ভরা, ধর এই অর্ঘ্য উপচার।

ইহার পর আমেরিকা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার হকিন্স আমেরিকাবাসীর পক্ষ হইতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় নিম্নলিখিত অর্ঘ্যপত্র পাঠ করেন।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজ গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্য-গণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারংবার নত শিরে নমস্কার করি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদোপলক্ষে—
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, সভাপতি।

কবির উত্তর

বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত, একথা আমার মন সহজে ও সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান, কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যা-খ্যাত, কোথাও বা সে বাষ্পহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্য-ক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতঃই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিল। সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে সেই আশ্চর্য্যরূপ দেখি-লাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অদ্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়া-ছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ, কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠ-সাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনো বুঝিবা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন, তখনো হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভালো ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালায় শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্র-ভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেই জন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধ স্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত —"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটী বিস্তর আছে, সাধনার কোন অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি চুনিয়া চুনিয়া বিচার করি-

বার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশকে তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বর দান করিল। আমার জীবনে এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষের মতোই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত তবে অদ্যকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

পরিশেষে "গোল্ডেন বুক অব ঠাকুর কমিটি"র পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে উক্ত গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

অতঃপর "বাংলার মাটী, বাংলার জল" গানটী সুমধুর কণ্ঠে গীত হইবার পর অনুষ্ঠানটীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সাহিত্য-সভার সভাপতি
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

আমরা সমবেত হয়েচি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিতে। তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকাল তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা' সকলের বড় —আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি, সেই কথাটাই ছোট করে জানাবো ব'লেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বা'র হই। ঠিক বিশ্ব-কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রার নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সংবর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্য-পাঠে মনো-নিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সংবর্দ্ধনার ঘটা—এমনি কোরে বোধোদয় পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এমনি করে একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে; তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব-শতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখাপেক্ষী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল চোখের জলে। তারপরে বহুদুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণা ছিল না যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে!

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য-উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাশ ক'রতে এবং উকীল হ'তে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ বাড়ীর উকিল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরানো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয় বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের কোরলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা"—আর বেরোলো "ভবানী পাঠক"। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হোলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল-ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে।

একই স্কুলে বেশিদিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না। প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'চ্চে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে প'ড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হ'লো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনোদিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে প'ড়েছি,—কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কা'কে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কিনা,—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—করাও ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যক্ষ আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবা'র ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে

বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু অকালে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ক'রতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তা'তে ভুল যদি থাকে তো থাক, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হ'য়ে আছে।

জানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয়ত বা অর্থহীন; কিন্তু গোড়াতেই আমি ব'লেচি যে আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত। আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটা কয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন করে যেতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যে ভাবে লাভ ক'রেছি তা জানালাম। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেচি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গলা সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেম্নি অক্ষম। আরো বলে দিলেন যে তোমরা যদি একাজ কর, কখনো ভুলো না যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্যবিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখত।

পরদেশী

"বনফুল"

তোমারে দেখিয়া সহসা লেগেছে ভালো
তাইত নিভৃতে জ্বালায়ে মনের আলো,
পরাণ ভরিয়া তোমার আরতি করি
—তোমার মূরতি স্মরি।

আমার এ ভালো লাগার কাহিনী
জানিবে না তুমি কভু,
মনের কথাটি ক্ষণিক খেয়ালে
—লিখিয়া গেলাম তবু।

আমার ঘুমেতে স্বপন আঁকিয়া আঁকিয়া
মনের মাঝারে পরশ-মাধুরী রাখিয়া,
শোভন সরমে মোহন মোহের আড়ালে
—সহসা আসিয়া দাঁড়ালে

তোমার সজল উজল নয়নকিনারে
কে আজি বাজাল আমার মনের বীণারে
কি সুর বাজিল—রঙীন মায়ার লাবণি
—স্বপনে তুমি তা ভাবনি।

স্বপনে তুমি তা ভাবনি কখনও শোভনে
তোমার মাঝারে কি হেরি গোপনে গোপনে,
ছন্দে ও গানে মরমখানিরে উজাড়ি
—কহি, "আমি তব পূজারী"—

জানি তুমি মন ক্ষণিক মানসহারিণী
পলকে মিলাবে, তবুত বলিতে পারিনি
তুমি শুধু মায়া, তুমি ক্ষণিকের মায়া গো
—শুধু ছলনার ছায়া গো!

অমিল

শ্রীঅসিতা রায়

ট্রেণ ছুটে চলেছে—

আমি ? আমিও যে ঠিক ব'সে আছি তা নয়। প্যারী না কোথায় কোন্ এক ঝর্ণার ধারে যে নায়ক তন্ময় হ'য়ে ব'সে আছে, তারি খোঁজে চলেছি আমি। নায়ক একজন 'ম'সিয়ে'। হাঁটুর উপর মাথা রেখে, কি জানি কা'র কথা সে ভাবছে—কোন চ'লে-যাওয়া যুগের ভুলে-যাওয়াকে!

ছোট্ট ঝর্ণা। ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ করে ব'লেই ঝর্ণা। জলের গুড়ো কাব্যালোকের চূর্ণ অলকের মত গায়ে এসে লাগে। নায়ক এসব টেরও পায় না। অতীতের ধ্যানে সে মত্ত। হঠাৎ গেল সে-ধ্যান ভেঙে, এলেন কে এক ম্যাদাময়সেল্।

দুজনে চোখে চোখে চেয়ে। কেউ কিছু বলে না। এমনি ক'রে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর আস্তে আস্তে নায়ক বল্লে, চিন্তে পারো? এর উত্তরে 'হাঁ' বল্লেই মানায়, কিন্তু নায়িকা বল্লে 'না'।

আপনার বড়ো ভোলা মন। এখনো ত বছর পোরেনি। অথচ সেদিন 'ভুলবনা' ব'লে কত কথা। বেশ! তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ছোঁয়া সাত সমুদ্র পার হ'য়ে আমার গায়ে এসে লাগে।

এসব আমার বানানো কথা নয়। জনৈক 'ম'সিয়ে'র যে গল্প সকালে পড়েছিলাম, তারই ধুয়ো এখনো মনকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। যাহ'ক নায়ক বেশ পাকা। সে বল্লে, যা মনে নেই, তা মনে করিয়ে দেবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও হচ্ছে না। কিন্তু সে অতীতকে ছেড়েও ত এখন আমরা নতুন ক'রে দুজনকে চিন্তে পারি, এক হয়ে মিলতে পারি। পারিনে? পারি— তা'হলে···পাশের একটা কালো পাথরের উপর রুমাল বিছিয়ে দিয়ে নায়ক বল্লে, বসুন—

নায়িকা ঈষৎ হেসে বসে।

সুরু হ'ল কথা—একথা, সেকথা, ওকথা, নানান কথা।

ট্রেণ থাম্ল। আবার ছুটল—

র‍্যাপারটা চুল পর্য্যন্ত টেনে দিলুম। রাত একটা। ঘুমোব?

এদিকে মনের মাঝে সেই ম'সিয়ে আর ম্যাদাময়সেল কথা বলে চলেছে। একথা ওকথা—

এমনি ক'রেই হয়ত ভাল চল্তে পারত, কিন্তু চলল না। হঠাৎ কি ক'রে যেন কি হয়ে গেল। আস্তে আস্তে ম'সিয়ে মিলিয়ে এলো, তার আসনে জেঁকে বসলাম শ্রীমান আমি। ওদিকে রুমাল পাতা ঠিকই আছে, নেই কেবল গাউন আর গাউনের মালিক সেই ম্যাদাময়সেল। তার যায়গা দখল করেছে, বালিগঞ্জের চায়ের মজলিশ থেকে সদ্য-উঠে-আসা এক তরুণী। যাক্, কথা তবু চলল। একথা সেকথা, দেশের কথা, ঘরের কথা, কাজের কথা, অকাজের কথা, দেহের কথা, মনের কথা, কত কথা। হঠাৎ আমি বলে উঠ্লাম, মিস্ রয়—

সে যে কখন মিস্ রয় হয়ে গেছে, তার সাক্ষী আমি নই।

মিস্ হেসে বল্লে, কি—

আমি বল্লাম, এই ঝর্‌ঝর্ ঝর্ণা চিরদিন থাক্‌বে, থাক্‌বে না? থাক্‌বে—

ঐযে প্রতিদিনের পথিক লালচে রঙে ভুবন রাঙিয়ে বিদায় নিচ্ছে, প্রতিদিন এই ঝর্ণার জলকে, গাছের ফলকে সে বিদায়-চুম্বন দেবে। আকাশে যে দু-একটী তারা চোখ মেলছে, চিরদিন তারা অমনি চাইবে। সত্যি নয়?

সত্যি। মিস্ রয় অবাক হয়ে যায়।

তার দিকে একবার চেয়েই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

বল্লাম, থাকব না কেবল আমরা। থাকব না আমি, কারণ আমি যাচ্ছি কাল দু'হাজার মাইল উত্তরের খোঁজে, থাকবে না তুমি, কারণ হয়ত—মিস্ রয় বল্লে, আমি করেছি দক্ষিণের জাহাজে 'বুক'—

তবেই দেখ!

তরুণী চম্‌কে তাকাল।

আমি বলে চল্‌লাম—থাক্‌ব না শুধু আমরা। কেউ যাব উত্তরে, কেউ যাব দক্ষিণে। মাঝে পড়বে নদ-নদী-গিরি, অকাশ-ভুবন—এও হায় সইত, কিন্তু মাঝে পড়বে, মিষ্টার বোস, মিস্ সেন্; কাজেই—একটু থেমে বল্‌লাম—এমন মুহূর্ত্তে যদি কিছু চাই, তাকি অন্যায় হবে?

মিস্ রয় হেসে বল্লে, চাইলে অন্যায় হবে না। তবে সেই চাওয়াকে মেনে নিলে হয়ত অন্যায় হবে।

বল্‌লাম, সে পরের কথা। এখন চাইতে দাও আমাকে—হাজার মাইলের দূরত্বকে কমিয়ে নিয়ে সেখানে থাক্ শুধু মনুষ্য-দেহের উষ্ণতার ব্যবধান, এ চাওয়া আমার নয়—

বেশ—

দেখা না হওয়াই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে পাল্‌টে দিয়ে আমাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান হ'ক, একটী সন্ধ্যা ও একটী প্রভাত, এ চাওয়া আমার নয়—

বেশ—

বল্‌লাম, আমাদের মাঝে থাক্ চিঠির দোতা, কালি-কলমের দৌরাত্ম্য, এ চাওয়াও আমার নয়। মনে থাকার মাহাত্ম্যে, ভাল লাগার, ভালবাসার আনন্দে, ছাড়াছাড়ির বেদনা লুপ্ত হ'ক, এ চাওয়া আমার নয়—

তবে—

আমি বলে গেলাম, আমি চাই একবার দেহের স্পর্শ, মনের স্পর্শ, তারপর? তারপর বলব না, দাঁড়াও, কিছু বলব না, শুধু বল্‌ব—নমস্কার—তারপর আমি যাব উত্তরের মেরুতে, তুমি যাবে দক্ষিণের মেরুতে—

তরুণী চম্‌কালো—

খানিকক্ষণ ভাবতে দিয়ে বল্‌লাম, রাজী?

মুখে সে যা বল্‌লে বোঝা গেল না; চোখের ভাষার লেখা পড়লাম, যতটুকু 'না' তার তিন গুণ 'হাঁ'।

টেনে নিলাম,—হঠাৎ উঃ—হিস্ করে একটা শব্দ, সাথে সাথে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম, উঃ—

একটা সাপ, পায়ে—

মাথার ঝাঁকানীতে মুখের র‍্যাপার সরে গেল। বিজলীর আলো যেন ফণার মত বিঁধ্‌ল দুই চোখে। আর তার সাথে সাথে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল, আমায় মাফ্ করবেন। দোরটা আস্তে খোলা উচিত ছিল—তা—বেশী লেগেছে কি? বল্‌তে বল্‌তে সে এগিয়ে আস্‌ছিল, আমি বল্‌তে গেলাম, না—না—লাগেনি এমন কিছু আর—শেষ করতে পারলাম না, বলে ফেল্‌লাম, একি আপনি কোত্থেকে?

যাকে বল্‌লাম, সে চম্‌কে চাইলে, বল্‌লে, আপনি আমায় চেনেন না কি?

হাঁ। আপনার বুঝি মনে পড়ছে না মিস্ রয়?

সে বল্‌লে, আমি ত মিস্ রয় নই, ভুল করেছেন আপ্‌নি।

এর পরে আর বলা চলে না। র‍্যাপারটা আগের মতই টেনে দিলাম; ভাবছি, একি হ'ল। আবার মিস্ রয়ের সেই চাউনি ভেসে উঠ্‌ল, 'না'এর চাইতে 'হাঁ' যেখানে বেশী।

সারা মন ব'লে উঠ্‌ল, ভুল হতেই পারে না।

বল্‌লাম, কি মনে করেন আপনি আমাকে?

তরুণী বল্‌লে, একথা কেন?

বল্‌লাম, আপনি কি ভাবেন? যা বলবেন তাই বিশ্বাস কর্ব? আমার কি চোখ নেই? কান নেই? আপনি মিস্ রয় নয়? হাঁ আপনিই মিস্ রয়।

এবার তরুণী বল্লে, কে সে?

বলে চল্‌লাম, দূরের বনে যখন সূর্য্য ডুবছে, কোলের বন তার পরশে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল,—নিশান্তের অতিথ দিনান্তের শেষ কথাটি সকলকে বল্‌তে এসেছে। গাছকে বল্‌লে, পাতাকে বল্‌লে, ফুলকে, ফলকে, ঝর্ণার জলকে চুমো দিলে, কেমন সপ্রতিভ, তার পর দাঁড়ালো তার সাম্‌নে যে ফুল নয়, অথচ যে ফুল, যে জল নয়, অথচ যে ঝর্ণার জল, যার পানে চেয়ে সেই অতিথি আর চাইতে পার্‌ল না। থম্‌কে দাঁড়ালো। সূর্য্যে পড়ল যার প্রতিবিম্ব, যার লজ্জার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠল সূর্য্যের বিজয়-স্বপন, সে বিজয়িনী কে? সে-ই ত মিস্ রয়—

—যাকে বল্‌লাম, 'এসো'।

যে বল্‌লে—না আসব না; অথচ যে এল; সে কে? সেই ত মিস্ রয়—মনে পড়ে? পড়ে না। এখনো বুকে

পরশ যেন লেগে আছে, অধরের মদির হরষ যেন জেগে আছে, সে কে? 'মনে পড়ে?

তরুণী বলতে গেল, না। সে আমি নয় আর কেউ—

না—না—দু'দণ্ডও হয় নি। এখনি ভুলে যাব? যাকে পেয়ে ধন্য হলাম, সার্থক হব,—এমনই সময় পায়ে -

তরুণী হেসে উঠল, ও আপনি স্বপ্নের কথা বলছেন—

হাসি তার দেখে কে!

কতক্ষণ চুপ করে রইলাম তারপর হাসি থামলে বললাম,—হয়ত স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নের রাণীর সাথে আপনার যে কোনই পার্থক্য নেই।

সে বললে, তা ব'লেই কি আমি স্বপ্নের রাণী হ'য়ে যাব? যাক! আমি সান্তাহারে নাব্‌ব। কোথায় যাব? পুরী। যেখানে......আর শুনতে চাই নে, আমি ব'লে উঠলাম, মিথ্যে ভাঁড়াবেন না আর।

সে তার বিছানা গুছাতে গেল; আমি বাধা দিলাম। বললাম, আর ভাঁড়িয়ে লাভ নেই। আপনাকে চিনেছি আমি।

সে আমার মুখের দিকে তাকাল, অবাক হ'য়ে—

বললাম, মিস্ রায় বলেছিল, সে দক্ষিণে যাচ্ছে। আপনিও তাই। এও যদি মিলল, তবে পার্থক্য কেন থাকবে একটুকুতে?

কোথায় মিল?

কোথায়? সব যায়গায়। প্রথমে, আপনার মতই তার দেহের শোভা, যাকে বলি মুনির মনোলোভা। এর চেয়ে বড় কথা,—তাকে আমার ভাল লেগেছিল, আপনাকেও লাগে। তারপর স্বপ্নের রাণী দক্ষিণের জাহাজে বুক করেছে, আপনি যাচ্ছেন সেই দক্ষিণেরই দেশে। আমি না হয় দার্জ্জিলিঙের টিকিট কাটব। কিন্তু সকলের বড় মিল কোথায় জানেন?

কোথায়?

বলতে হ'ল: আমি তাকে নিজের করে' পেতে চেয়েছিলাম, আপনাকেও চাই।

একথা যেন সে শোনে নি এমনি ভাবে বললে, অমিল, পার্থক্য তা'লে কোথায়?

বললাম, প্রশ্নের বেলা নয় উত্তরের বেলা। যখন তাকে বললাম, যাবে যাও, থাকতে বলি নে, আসতে বলিনে, মনে রাখতে বলি নে, শুধু একবার তোমায় দেহ-মনের আনন্দে পেতে চাই। তারপর বলব নমস্কার। তুমি যাবে দক্ষিণে, আমি যাব উত্তরে। ব'লে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজী! ...এ পর্য্যন্ত বেশ মিলচে। কিন্তু, তার উত্তরে সে বললে 'না'; তার চোখের ভাষায় ধরা পড়ল, 'হাঁ'এর চাপে 'না' হারিয়ে আছে। অমিল যে আজ সেই ঘটনাতে। কেন এ অমিল?

অমিল!

চোখের উপর তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বললাম, না—না—আমারই ভুল। এইখানেই সব চাইতে মিল। টেনে নিতে গেলাম তাকে। হাতটা যেমন ক'রে চেয়েছিলাম, তেম্‌নি করেই এল, কিন্তু কানে এল—

বাবুজী, উতরে গা নেহী?

ধ্যুত্তোর—

ভাবছি, একি স্বপ্ন না সত্য? আগেরটা স্বপ্ন, না পরেরটা? না দুটোই?

অনিবার্য্য কারণে এই সংখ্যায় 'খেলাঘর' প্রকাশিত হইল না। সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

অহল্যা

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

ইন্দ্র ও অহল্যার আখ্যান বীজাকারে আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই। বৈদিক সাহিত্যে (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৩।৪।১৮, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.৭৯, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ১।১ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।১২) ইন্দ্র 'অহল্যায়ৈ জার' অর্থাৎ অহল্যার উপপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গল্পটী পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে পরবর্ত্তী রামায়ণাদি গ্রন্থে। ইন্দ্র কামার্ত্ত হইয়া গৌতমের অনুপস্থিতিকালে গৌতমের বেশ ধারণ করতঃ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌতম-পত্নী অহল্যা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি কুতূহল বশতঃ (দেবরাজকুতূহলাৎ) তিনি প্রবৃত্তি দমন করিলেন না, ব্যাভিচারিণী হইলেন। গৌতম আসিয়া দেখিতে না পান এইজন্য ইন্দ্র তাড়াতাড়ি আশ্রম হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না—ইন্দ্র আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌতমরূপী ইন্দ্রকে দেখিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রকে এই বেশে দেখিয়াই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন 'তুমি বৃষণরহিত হও'। অহল্যাকে তিনি অভিশাপ দিলেন 'পাপীয়সি, যেহেতু তুমি ঈদৃশ দুষ্কার্য্য করিয়াছ এই জন্য তুমি বহুকাল অবলম্বনহীনা, ভস্মশায়িনী এবং লোকের অদৃশ্যা হইয়া নিরন্তর সন্তাপ অনুভব করতঃ এই বনে অবস্থান কর। রামচন্দ্র এই বনে আগমন করিলে তাঁহার আতিথ্য করিয়া তুমি পাপমুক্তা হইবে এবং আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবে'। এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া গৌতম তপস্যার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন। কালক্রমে রামচন্দ্র গৌতমাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পাপনির্ম্মুক্ত মূর্ত্তি অন্যের অদৃশ্যা অহল্যাকে দেখিয়াই তাঁহার পাদধারণ করিলেন। অহল্যাও রামের যথাযোগ্য আতিথ্য করিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। গৌতম দিব্য দৃষ্টিতে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া হিমালয় হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অহল্যাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। জনকপুরোহিত গৌতমপুত্র সাতানন্দ বিশ্বামিত্রের মুখে মাতার শাপমুক্তি-বৃত্তান্ত ও সৌভাগ্যের বিষয় অবগত হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। রামায়ণে বর্ণিত (বঙ্গীয় রামায়ণ ১।৪৯—৫০, বোম্বে রামায়ণ ১।৪৮—৪৯)। কথাংশের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই আখ্যানে একটী জিনিষ আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই—অহল্যা গৌতম-বেশধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং গৌতমও এই জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করেন নাই। তিনি অভিশাপচ্ছলে পত্নীকে প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যবস্থা দিলেন এবং এই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার মন পাপপরিশূন্য হইলে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

রামায়ণ আদিকাব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার বয়স সম্বন্ধে অনেক মতামত থাকিলেও ইহা যে খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে রচিত তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কাজেই রামায়ণে বর্ণিত অহল্যার গল্প একটী অতি প্রাচীন কালের ভাবধারারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ভাবধারাটী এই—আজন্মশুদ্ধা নারীর যদি কদাচিৎ স্খলন হয় এবং তাহা যদি ইচ্ছাকৃতও হয় তাহা হইলেও তিনি সমাজ এবং স্বামী ও পুত্র কর্ত্তৃক বর্জ্জনীয়া হইবেন না। অনুতাপাদি কার্য্যদ্বারা তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে এবং ইহাতে তাঁহার মন পবিত্র হইলে সমাজের আদর্শ পুরুষও তাঁহার চরণবন্দনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতেও আমরা এই ব্যবস্থাই দেখিতে পাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধ্বী নারীর বহু প্রশংসা এবং ব্যভিচারিণী নারীর বহু নিন্দা আছে সত্য, কিন্তু কচিৎ ব্যভিচারের জন্যই নারী বর্জ্জনীয়া হইবে এই ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই—আছে মনোদুষ্টা এবং কর্ম্মদুষ্টা নারীর শাস্তির বিধান এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান (মনু ৫।১০৮, ১১।১৭৭—১৭৮, বশিষ্ঠ ৩।৫৮, ২১।৮, ১২—১৩, বিষ্ণু ৮.৮)। পরবর্ত্তী যুগে এই আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং জ্ঞানকৃত অপরাধ অমার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাই মনে হয়। কারণ এই অহল্যার গল্পটীই রামায়ণের পরবর্ত্তী পুরাণাদি গ্রন্থে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

মহাভারতে (উদ্যোগপর্ব্ব ১২।৬, শান্তিপর্ব্ব ৩৫১।২৩) অহল্যাকে ইন্দ্রধর্ষিতা বলিয়া দেখিতে পাই। অধ্যাত্ম্য রামায়ণেও (১।৫) ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই উল্লিখিত আছে। অহল্যার অমতে বা অজ্ঞানে ইন্দ্র তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন 'ধর্ষণ' কথাটী দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মপুরাণে (৮৭) স্পষ্টই উল্লিখিত রহিয়াছে অহল্যা ইন্দ্রকে জানিতে না পারায় তাঁহার পাপ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। রামায়ণমঞ্জরী গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত। বোম্বের, বাঙ্গলার এবং কাশ্মীরের রামায়ণ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্ষেমেন্দ্র এই উপাদেয় গ্রন্থ সরল সংস্কৃতপদ্যে রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্রের সময় অহল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীতে পরিণতা হইয়াছেন। তিনি কিরূপে ঈদৃশ পুণ্যবতী অহল্যাকে স্বেচ্ছাকৃতব্যভিচারসম্পন্না বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন? কাজেই অহল্যা ইন্দ্রকে জানিতে পারেন নাই, এইরূপ বলিয়া ক্ষেমেন্দ্রকে অহল্যার সাধ্বীত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে (রামায়ণমঞ্জরী ১।৩০১)।

সমাজের বৃহত্ত্বের বা পরিপুষ্টির যতই সঙ্কোচ হয় ব্যক্তির উপর কঠিনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইদানীন্তন সমাজের সতীত্বের আদর্শও তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইচ্ছাকৃতই হউক অনিচ্ছাকৃতই হউক আজ কাল নারীর স্খলন সমাজ ক্ষমা করিতে চায় না। ফলে বারবণিতার বৃদ্ধি বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ স্খলিতা নারীর অবলম্বনীয় হইয়া পড়ে। যাহারা অতি সহিষ্ণু তাহারা সমাজের অজ্ঞাত কোণে নিত্য অব্যবহার্য্য অবস্থায় থাকিয়া অতি দুঃখের দিন যাপন করে। এই অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে অন্যতম স্মৃতিকার দেবল। দেবলস্মৃতি (আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ) মুসলমানগণের ভারতবিজয়ের পরে রচিত বলিয়া মনে হয়। ম্লেচ্ছগণ নারীর উপর অত্যাচার করিলে লঘু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই সে সমাজ এবং স্বামীর দ্বারা পরিগৃহীতা হইতে পারে এই স্মৃতিতে এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। এতটা উদার মত পোষণ করে বলিয়াই বোধ হয় এই স্মৃতিখানা নিবন্ধকারগণের নিকট ততটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে নাই।

আজকাল শক্তির অভাবেই হউক বা কারণান্তরেই হউক নারীর ধর্ষণ দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ষিতা নারীর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা ভাবিবার বিষয়। অহল্যা গল্পটী এই ভাবনার পথে দিগ্‌দর্শন করুক, ইহা কামনা করি।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি' আমার বক্তব্য সম্বন্ধে অসত্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। ছোটখাটো কথার মালমশলায় পাঠকের মনোরঞ্জনকল্পে অনেক শ্রুতিসুখকর সংবাদ প্রচার হইয়া থাকে এবং এই প্রকার সংবাদের অভাবে 'শনিবারের চিঠি'রই বা চলে কি করিয়া? কিন্তু একজনের মুখের বা মনের কথা অন্যের মুখে দিয়া, আলোচনা রসাল ও ঘনীভূত করিবার চেষ্টা করিলে নির্দোষের উপর অবিচার হওয়া অনিবার্য্য।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের সহিত নাট্যনিকেতনে আমার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে রসচক্র বা বিশ্বপতি বাবুর সহিত 'উপাসনা'য় প্রকাশিত 'শতনরী'র সমালোচনার কোনও সম্বন্ধ নাই একথা তাঁহাকে আমি স্পষ্টই জানাইয়াছিলাম।

"সমালোচনা প্রেসে দিবার পূর্ব্বে রসচক্রের রসিকদের সম্মুখে (কালিদাস বাবু ও বিশ্বপতি সেই দলে ছিলেন) পড়া হয়।" এমন কথা আমি বলি নাই। 'উপাসনা'-সম্পাদকের বিবেকবুদ্ধির তালাচাবি এখনও পর্য্যন্ত 'রসচক্র'এর হাতে হেপাজত করা হয় নাই। সুতরাং কোনও প্রবন্ধ প্রকাশের যোগ্য কি অযোগ্য, তাহার বিচারের জন্য 'রসচক্র'এ উহা উপস্থিত করার কোনও কারণই ঘটিতে পারে না।

সমালোচনাটি যতীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার দুই মাস পূর্ব্বের লেখা—প্রুফ হইয়া প্রেসেই পড়িয়া ছিল।—ঐভাবে সমালোচনাটি না যাইতেও পারিত, কিন্তু আমাদের ছাপাখানা এবং কাগজের নূতন ব্যবস্থা, বাড়ী-বদল ইত্যাদিতে আমরা এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে অনবধানতায় ঐ লেখাটি ছাপা হইয়া গিয়াছিল। এ জন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে ক্রটি-স্বীকার করিয়াছি।" সজনী বাবুকে আমি বলিয়াছিলাম —যতীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা সংখ্যায় 'শতনরী'র এরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া খুবই অশোভন হইয়াছে, তবে করুণা বাবুর কাব্যসম্বন্ধে সমালোচনায় যে কথা বলা হইয়াছে মূলতঃ তাহার সহিত শুধু আমার নিজের নহে, প্রবীণ কবিগণেরও অনেকের মতের মিল আছে। শেষোক্ত কথার ধুয়া ধরিয়া বোধ হয় 'শনিবারের চিঠি' 'সম্মিলনী'র উপর 'চাপান' গাহিয়াছেন। এই প্রকার ব্যক্তিগত ভাবে একজনের উপর অবিচার করিয়া সাহিত্য-বিচারের সার্থকতা আছে কি?

আর এক দিকের দুঃখও কম নয়। বন্ধুত্বের খাতিরে গোপনে মনের কথা সকলের কানে কানে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু লিখিতভাবে কেহ কিছু বলিতে চান না। নিন্দাবাদ হইলে মনে মনে যে অল্পাধিক খুসী হ'ন না তাহাও হলফ করিয়া বলিতে পারার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। সাহিত্যিকের এই মনের দীনতা দেখিলে সত্যই প্রাণে আঘাত লাগে।

'সম্মিলনী'র পত্র-প্রেরক নুটবিহারী বাবু সেদিন কালিদাস বাবুর বাড়ীতে আমাকে জেরা করিয়া 'সম্মিলনী'র মারফতে ওকালতির জমি তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন ;—তাঁহার বিশ্বাস আমার "সহায়তা" পাইয়াই 'শনিবারের চিঠি' 'রসচক্র'এর উপর অন্যায় কটাক্ষ করিয়াছেন।—কোনও ভদ্রলোকের মুখের কথার উপর বিশ্বাস করা না করা নুটবিহারী বাবুর ইচ্ছা। তাঁর ওকালতির সুবিধা হইলে তিনি 'আপ্ত' রুচি অনুসারে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন।—বলিয়াছেনও তাই। তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'র বিবৃতি সত্য নহে বলা সত্ত্বেও তিনি বলিয়াছেন —"উপাসনা সম্পাদক যদি বলে থাকেন নন্দগোপাল বাবুর লেখা সমালোচনাটা 'রসচক্র'এ পঠিত হয়েছে তবে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন আর যদি না বলে' থাকেন তা' হ'লে তাঁর নিজের কাগজে এর প্রতিবাদ করা উচিত।"

রসচক্রের সভ্য হিসাবে নুটবিহারী বাবুর লিখনতৎপরতার প্রশংসা করিতে হয় কিন্তু আমার "নিজের কাগজে" "প্রতিবাদটা" বাহির হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে—একজনকে subjunctive mood এও মিথ্যাবাদী বলিবার অভব্যতা হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিতেন।

"চৈতালী-ঘূর্ণী"

শ্রীকিরণকুমার রায়

আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব অস্বীকার ও অতিক্রম করিবার একটি ধুয়া কিছুদিন হইতে শোনা যাইতেছে। প্রায় ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা অবশ্য হাস্যকর রকমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই রকম চেষ্টা মাত্রই যে হাস্যকর একথা কেহই বলিবেন না। বিশেষ করিয়া যখন দেখি, কোনও রচনা এই চেষ্টা কিম্বা আন্দোলনের বিন্দুমাত্র ছাপ না নিয়া ব্যক্তিগত প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে তখন বর্ত্তমানের এই দূষিত সাহিত্যিক আবহাওয়াতেও স্বস্তির নিঃশ্বাস টানিয়া বাঁচি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালী-ঘূর্ণী' ব্যক্তিগত প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্যের এমনই একটি প্রমাণ এবং এ প্রতিভা যে বিদেশী-সাহিত্য-পাঠপুষ্ট পরগাছা-প্রতিভা নয়, বইখানি যিনি পড়িবেন, তিনিই একথা স্বীকার করিবেন।

কি কারণে জানি না, রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্যের পরিধি ও প্রভাব এড়াইয়া চলিবার এই প্রয়াসকে আমরা সকলে মিলিয়া বস্তুতান্ত্রিক আখ্যা দিয়া বসিয়াছি। এবং বাংলা ভাষায় যাহা কদাচিৎ দেখা গিয়াছে, সেই বস্তুতান্ত্রিকতাকে অতি-ব্যবহারে ও অপব্যবহারে যতদূর সম্ভব মলিন ও অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যরচনার শক্তি অর্জ্জন করিতে আজও আমাদের বাকী আছে। আমাদের অস্থিমজ্জায়, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে যে ভাবপ্রবণতা পুরুষানুক্রমে বহিয়া আসিয়াছে, তাহাকে না মানিয়া চলিবার সামর্থ্য সাধনার অপেক্ষা রাখে। তবে পারিপার্শ্বিক জগৎ যে-পরিমাণ দ্রুত পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহাতে আমাদের এ ভাবপ্রবণতার আয়ু আর বেশী দিন নাই, একথা বলিতে পারা যায়।

তারাশঙ্কর এই পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক হইতে বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে-পারিপার্শ্বিকে মানুষের বুভুক্ষা—মাত্র অন্নবস্ত্রের অভাব—তাহার যুগযুগসঞ্চিত নীতিবোধকে, সংস্কারকে পরাস্ত করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—তারাশঙ্কর সেই পারিপার্শ্বিকের শিল্পী। 'চৈতালী-ঘূর্ণী'র বিষয়-বস্তু তাই সম্পূর্ণ বাস্তব।—কিন্তু এই বিষয়-বস্তু যে পদ্ধতিতে গ্রথিত ও রচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ মাত্রায় আদর্শবাদমূলক। আদর্শবাদী শিল্পীর স্বকীয় ছাপ 'চৈতালী-ঘূর্ণী'র প্রতি-পৃষ্ঠায়, প্রতি কাহিনীতে ছড়াইয়া আছে।

আলস্যের অবসরে বিদেশী গণ-সাহিত্য-পাঠের ফলপ্রসূত এক প্রকার রচনা আমাদের সাহিত্যে আজ রাশীকৃত আবর্জ্জনা জমা করিতেছে—প্রথমেই বলিয়া রাখি যে 'চৈতালী-ঘূর্ণী' তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ফ্যানের হাওয়া আর দক্ষিণা বাতাসে যে পার্থক্য, এ পার্থক্য সেই শ্রেণীর। 'চৈতালী-ঘূর্ণী'র প্রত্যেকটি অক্ষর দ্রষ্টার আন্তরিকতা ও বক্তব্যর সত্যতা সপ্রমাণ করে। দারিদ্র্যের নগ্ন বীভৎসতা আমাদের সচরাচর পরিদৃশ্যমান জগতে অতি সাধারণ ঘটনা। ইহার নিত্যনৈমিত্তিকতাকে দূর করিয়া আমাদের বিবশ মনকে নাড়া দিবার জন্য যে অনন্যসাধারণ দরদ প্রয়োজন, 'চৈতালী-ঘূর্ণী'তে তারাশঙ্কর প্রমাণ করিয়াছেন সেই দরদ শিল্পী-হাতের যে শাশ্বত জিওনকাঠি তাহার তিনি অবিসম্বাদী অধিকারী। সেই জিওনকাঠি যে-কাহিনী ও যে-চরিত্রের উপর তিনি বুলাইয়াছেন, সেই কাহিনী ও চরিত্র এক মুহূর্ত্তে স্পষ্ট, প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের কাহাকেও কিম্বা কিছুকে অগ্রাহ্য করি কি ভুলিয়া যাই, এমন সাধ্য নাই।

'গোরা'র কৈলাশকে, কিম্বা 'শ্রীকান্ত'এর প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তীর কাহিনী কে ভুলিয়াছে, ভুলিতে পারিয়াছে? 'চৈতালী-ঘূর্ণী'রও মামলাবাজ সরকার, সুদখোর দত্ত, কাবুলীওয়ালা, সাতু ঠাকুরঝি, যোগী মোড়লের বৈঠক, রাম, রামের মেয়ে হিমি, ছোট-মিস্ত্রী, বড় মিস্ত্রী, বাউরীপাড়া, শশন, রাখনা, মাদ্রাজী ম্যানেজার, কেরাণী শিবকালী, টাইপিষ্ট সুরেন—কাহাকে ভুলিব? সকলে মিলিয়া মনের মধ্যে ভীড় করিয়া আসে। চরিত্র-সমাবেশে 'চৈতালী-ঘূর্ণী' অপূর্ব্ব—বিচিত্র!—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীর সূত্র দিয়া এই বিভিন্ন চরিত্রের সাহায্যে মূল একটি আখ্যানকে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির যে-পরিচয় 'চৈতালী-ঘূর্ণী'তে পাইয়াছি তাহাকে অসামান্য শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করিতেছি না।

বাংলাদেশের একদা-বর্দ্ধিষ্ণু, বর্ত্তমানে ধ্বংসমান একটি পল্লীর চাষী গৃহস্থ গোষ্ঠ ও তাহার পত্নী দামিনী 'চৈতালী-ঘূর্ণী'র

নায়ক ও নায়িকা। গ্রাম ঐশ্বর্য্য হারাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাষীও রিক্তসম্পদ—সে-সম্পদ এখন কাবুলিওয়ালা ও মহাজন গ্রাস করিয়াছে। ঘরে বসিয়া স্ত্রীর সহিত দুটি কথা কহিবার সামান্য আনন্দটুকুও গোষ্ঠ ভোগ করিতে পায় না—কাবুলী-ওয়ালা দ্বারে আসিয়া ঋণের তাগিদ্ দেয়—গোষ্ঠ ভয়ে পালায়। কাবুলীওয়ালা তাহার স্ত্রীর সহিত অশ্লীল রসিকতা করিয়া ফিরিয়া যায়। সে-অপমান না মানিয়া উপায় নাই। ওদিকে ঘরে রুগ্ন শিশুপুত্রের চীৎকার, বিরক্তিতে গোষ্ঠ মাঠে চলিয়া যায়। এই মাঠই তাহার এখন একমাত্র সান্ত্বনা—সেখানেও কিন্তু পেয়াদার রক্ত আঁখি। অথচ এই মাঠও থাকে না—মিথ্যা মোকদ্দমার নীলামে তাহার জোত বিক্রয় হইয়া যায়। রুগ্ন সন্তান পথ্য ও ঔষধের অভাবে মরে। এবং ইহারও কিছুদিন পরে ইহাদের মাথার উপরের ভিঁটাটুকু বন্যায় ভাসিয়া যায়। এইখানে প্রথম পর্ব্ব শেষ।

আখ্যানের দ্বিতীয় পর্ব্বে পল্লীর চাষী গৃহস্থ গোষ্ঠ শহরের কলের মজুর। দারিদ্র্যের নূতন আব্‌হাওয়ায় গোষ্ঠের রঙ্ বদ্‌লাইয়াছে তাহার অপরাপর সঙ্গীদের সহিত সে মদ খাইয়া বাড়ী ফেরে, দামিনীর উপর অত্যাচার করে। কুলীবস্তির এই নগ্নতায় দামিনীর রূপ-যৌবন মারাত্মক হইয়া উঠে, তাহার লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকে না।—গোষ্ঠের অবহেলা, ক্ষুধার জ্বালা, লাঞ্ছনা আর পরিবেষ্টনী দামিনীর মনকে কাবু করিয়া ফেলে। ওদিকে কলে ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে—এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, উদরের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠে এবং এক্ষেত্রে যাহা ঘটে, সেই—নিজেদের মধ্যেই কলহান্তে আহত গোষ্ঠ হাসপাতালে বুঝি মরিতেই যায়।

হয়তো নিরক্ষর অথচ শিক্ষিত রুচি ও মনোবৃত্তির অধিকারী এই দম্পতীর দুঃখের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে চোখ ভরিয়া জল আসে না, চোখে জ্বালা ধরে—মনে হয় কে ইহাদের এমন সাজা দিল,—নিষ্ঠুর বিধাতা না, তদপেক্ষাও যে নিষ্ঠুর সেই মানুষ ও তাহার সমাজ-ব্যবস্থা!

আট বয়সের দামিনী যখন গোষ্ঠের ঘরে আসে, তখন তাহার একটি সমবয়সী খেলার সাথী জুটিয়াছিল সুবল। সমবয়সী ছেলেমেয়ের মিতালী জমিতে দেরী হয় নাই। বয়সের সঙ্গে সুবলের মনে এই মিতালী রূপে-রসে অপরূপ হইয়া উঠিল—দামিনী বুঝিয়া দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুবলের তখন ফিরিবার উপায় নাই। সুতরাং তাহাকে গোষ্ঠের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইল। সুবল মহান্ত, ভিক্ষাজীবী, কিন্তু ভিক্ষার ঝুলিতেই তাহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার; সেই ভাণ্ডার সে দামিনীর পায়ে উজাড় করিয়া দিতে চাহে, সাহসে কুলাইয়া উঠে না। দামিনীর রুগ্ন শিশুর জন্য সে কবিরাজ ডাকিতে যায়, কবিরাজকে ভিজিটের টাকাটা দেয়,—অলক্ষিতে দামিনীর নিরাভরণ হাতের জন্য একজোড়া শাঁখা তাহার ঘরে রাখিয়া যায়—ফলে গোষ্ঠের মনে বেশী করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠে।…গোষ্ঠ ও দামিনী গ্রাম ছাড়িলে সুবল তাহাদের পিছু পিছু গিয়া সহরের রাস্তার মোড়ে পান বিড়ি, মুড়িমুড়্‌কির দোকান খোলে—বুঝি দামিনীকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিবার শক্তি তাহার ভালবাসার নাই—ইচ্ছাও নাই। কলের মজুর, মাতাল গোষ্ঠ—দামিনীর প্রতি অত্যাচার করে—সুবলের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। সে দামিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফেরে, তাহার পরণের শাড়ী কিনিয়া আনে,—পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যে দামিনী সে-বস্ত্র উল্লাসে গ্রহণ করে—কিন্তু পরক্ষণেই অনুশোচনার জ্বালায় তাহা পুড়াইয়া ফেলে।—সুবল ফিরিয়া যায়।

গোষ্ঠ, দামিনী ও সুবল প্রত্যেকের পরিণতি গ্রন্থকার অন্তরালে রাখিয়া ভালই করিয়াছেন, কেননা সে পরিণতি আঁচিয়া নেওয়া কঠিন নয়।—স্পষ্ট করিলে সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষকদের পক্ষে হয়তো বইখানি অপাঠ্য হইত।

আমি মূল গল্প যাহাকে বলিয়াছি, সেটিকে পটভূমিকা হিসাবে ধরিয়া, গোষ্ঠ দামিনী ও সুবলের এই ভালবাসার কাহিনীকে অনেকে পুস্তকের প্রধান অংশ বলিতে চাহিবেন—এমনই নিপুণতার সহিত এই সকল-দিক-দিয়া-ব্যর্থ ও বঞ্চিত প্রেমের কাহিনী তারাশঙ্কর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—কীটদষ্ট পুষ্পের চাইতেও বুঝি ইহা করুণ হইয়া বুকে বাজে।

মূলতঃ অবশ্য বইখানি দারিদ্র্য-সাহিত্য—জমিদার-মহাজনের শোষণবাদ ও কৃষক-শ্রমিকের অসহায় পেষণের ফলে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা আজ মনুষ্য-সভ্যতার অস্তিত্বকেও প্রশ্ন করিতে চায়—বইখানির আদ্যন্ত সেই প্রশ্নে ভরা।

ভগবানকেও ইহা জবাবদিহির মধ্যে ফেলিয়াছে—

"কে রক্ষক ?
রক্ষক ভগবান কতদূরে কে জানে !
লোকে ভগবানকে ডাকেও।
কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না
কিম্বা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর !
তবু উচ্চকণ্ঠে ওরা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে।"

ইহার অশিক্ষিতা নায়িকা ভগবানকে ডাকিতে চাহে না, বলে,—

'কি হবে ডেকে ?"—

নির্য্যাতিত মনুষ্যের নির্য্যাতনের হেতুকে ইহা প্রশ্ন করিয়াছে—

"চিরনত যে দূর্ব্বাদল সেও পদদলনে পত্রপুষ্প হারাইয়া বিদ্রোহ করে, শুষ্ক তৃণাঙ্কুর পায়ে ফোটে।

এরা কিন্তু তাও পারে না ; হয়ত বুঝিবা বুকের মাঝে রাগও জাগে না। যুগযুগান্তর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে পিষ্ট হইয়া বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

না, পাষাণও রৌদ্রে, আগুনে উত্তপ্ত হয়।

এরা তবে কি ? এরা প্রকৃত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অস্বাভাবিক এরা। মানুষের সৃষ্টি-করা সভ্যতার মাঝে ধ্বংস-হওয়া মানুষের তুলনা বিধাতার সৃষ্টির মাঝে নাই।"

বর্ত্তমান সভ্যতার সমগ্র অভিযানকে ইহা সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে —

"আদি যুগে উদরের ক্ষুধায় মানুষে মানুষের মাংস খাইয়াছে—আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটি জাতি অপর জাতির বুকের রক্ত অদৃশ্য শোষণ-হরণ করে—আজ একটা মানুষেরই ক্ষুধা বোধ করি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করিয়াও মেটে না।—ক্ষুধার তাড়নায় একের অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নাই ; মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় যীশুর সাধনা আজ ধর্ম্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রশে নিস্পন্দ, ব্যর্থ ; বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক !"

দুর্ব্বল হস্তে পড়িলে এই প্রশ্নরাশি কোনও উপন্যাসের পৃষ্ঠায় বেমানান্ হইত, কিন্তু এ উপন্যাসে ইহারা নিজে-দিগকে মানাইয়া নিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অবশ্যম্ভাবিত্বের দাবীও সপ্রমাণ করিতেছে—। এই প্রসঙ্গে সেই পুরাণো কথাটি মনে পড়ে, তত্ত্ব কিম্বা দর্শন রস-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে কি না —। 'চৈতালী-ঘূর্ণী' পড়িয়া এ-কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে তত্ত্ব ও দর্শনের ঠাসবুনানি থাকিলেও, রচয়িতা যেখানে সত্যকার শিল্পী, সেখানে রচনা সত্যকার সাহিত্যরস হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হয় না, পক্ষান্তরে দর্শন কিম্বা তত্ত্ব যাহাই বলি, রসের ভিয়ানে পড়িয়া তাহা উপাদেয় হইয়া উঠে।

'চৈতালী-ঘূর্ণী'র খুঁটিনাটি ইহার একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠ ও দামিনীর প্রথম প্রণয়ের সম্পর্কে রাত্রে আয়না দেখিবার কলঙ্কের কথা, সাতু আর দামিনীর খুনসুটি, বসতবাটি ছাড়িবার প্রাক্কালে প্রচণ্ড ঝটিকাকে পিঁড়া পাতিয়া শান্ত হইয়া বসিবার নিমন্ত্রণ, দুর্ভাগ্য দলের মাতলামির প্রলাপ, 'ইস্কাবনের টেক্কারে প্রাণ রুপিতনের টেক্কা' ইত্যাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয়ে জীবন-বিধাতার তিক্ত ও মধুর লীলারূপটি তারাশঙ্কর এমন ভাবে আঁকিয়াছেন, যাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে সচরাচর মেলে না। ইহার আর একটি মনোজ্ঞ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যাহাকে আমি বলিব ইহার কাব্যাংশ—। সবুজ মাঠে গোষ্ঠের বুকখানা জুড়াইয়া গিয়াছে,

'হাতে পোঁতা তরকারীর বীজের চারার কাছে বসিয়া আঙুলের ডগা দিয়া সন্তর্পণে' সে 'মাটী সরায়, একটি প্যাঁকাসে নরম অঙ্কুরের প্রত্যাশায়—তরুণী নারী যেমন ভাবী-সন্তানের স্বপ্ন দেখে'—

—অপূর্ব্ব ! মনের কোণে কোণে এই সকল কথা অস্ফুট-স্বরে গান গাহিয়া ফিরিতে থাকে—। এই মাঠের পথেই চলিতে চলিতে আখের পাতাগুলি ইসারা করিয়া গোষ্ঠকে ডাকে, ধানের ডগাগুলি বলে,—

"ধান, ধান, ধান—ধান রাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান।"

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার পরে আমাদের সাহিত্যে নাম করিয়াছে এমন উপন্যাসের অভাব নাই—কিন্তু সমা-লোচকের মানদণ্ডটি একটু মাত্র এদিক ওদিক না করিয়া বিচার করিলে সেই সব উপন্যাসের কয়খানি টিঁকিবে তাহা বলা খুব কঠিন নহে—। কিন্তু তারাশঙ্করের 'চৈতালী-ঘূর্ণী' যে বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।.

আমরা তারাশঙ্করের দ্বিতীয় উপন্যাসের অপেক্ষায় উন্মুখ থাকিলাম। *

* চৈতালী-ঘূর্ণী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক :—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স। ১৫, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ১৲ টাকা।

বীমা কর্ম্মী-সম্মেলন

গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকায় যে বীমাকর্ম্মী সম্মেলন হইয়াছিল তাহার সভাপতি বোম্বে লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

"বন্ধুগণ ও সহকর্ম্মীগণ,

ভারতীয় বীমা-কোম্পানী সমূহের এজেণ্টদের প্রথম সম্মেলনে আপনারা আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার প্রতি যে মহান্ শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আপনাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গত তিন বৎসর ধরিয়া জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশও কঠোর আর্থিক দুরবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও ভারতীয় বীমা-কোম্পানী সমূহ সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের নিজের অবস্থা বেশ ভালরূপে বজায় রাখিয়া অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে —এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট উন্নতি করিতেও সমর্থ হইয়াছে। যাঁহারা বীমা-কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের কর্ম্মপ্রেরণা, উদ্যম ও উৎসাহের জন্যই এই আনন্দদায়ক পরিস্থিতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, সমস্ত বীমা-কর্ম্মীগণের পক্ষে আরও ঘন ঘন মিলিত হইয়া পরস্পরের মত ও কার্য্য-পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং যাহাতে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলি অধিকতর সুষ্ঠুরূপে ও দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।

যদি বর্ত্তমান যুগে আমরা কোন দেশের ব্যাঙ্ক সমূহে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দ্বারা ঐ দেশের সমৃদ্ধি বা উহার দারিদ্র্যের পরিমাপ করি তাহা হইলে প্রত্যেক দেশে প্রচলিত জীবন-বীমার পরিমাণ দ্বারাও ঐ দেশের ভবিষ্যত বংশীয়দের আর্থিক উন্নতি বা উহার অভাবের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। একটী সংস্কৃত শ্লোকে আছে—কাক, কচ্ছপ, এবং ইতর প্রাণীগণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এই যে মানুষকে কেবল তাহার নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় না, যাহাতে তাহার অভাবে তাহার স্ত্রী ও শিশু সন্তানের খাদ্যসংস্থান হয় তাহার ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হয়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বলা যায় যে মানব জাতির সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার এবং এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যের ভিত্তির মধ্যেই বীমার প্রয়োজনীয়তা নিহিত। অন্য দিকে বীমা-কোম্পানীগুলি প্রত্যেক দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষ ভাবে—বিশেষ ভাবে কেন সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে। এজন্য বীমা-কর্ম্মীগণ যেন একথা স্মরণ রাখেন যে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ও জাতির গঠনকার্য্যে তাঁহাদের কাজের একটা মহা গুরুত্ব আছে, এবং তাঁহাদের এই কাজ একটী মহৎ কাজ।

জীবন-বীমা ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে আমেরিকার স্থানে সব চেয়ে উচ্চ। আমেরিকায় গড়প্রতি প্রত্যেক লোকের মাথাপিছু ৩ হাজার টাকার জীবন-বীমা আছে, আর ভারতবর্ষে উহার পরিমাণ ৩ টাকা মাত্র। সম্ভবতঃ উহার কারণ এই যে গত ১৯১১ হইতে ১৯২৫ সন এই ১৫ বৎসরে আমেরিকায় গড়পড়তায় প্রত্যেক জীবনের স্থায়িত্ব ৯ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করি আপনারা এ কথা জানেন যে আমেরিকার বীমা-কোম্পানীগুলির সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ ৫ হাজার কোটী এবং ইংলণ্ডে ১২ শত কোটী টাকা। কিন্তু ভারতে উহার পরিমাণ মাত্র ১৭ কোটী টাকা। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে এই সঞ্চিত মূলধন হাস্যাস্পদ রকমে কম। গত ১৯৩০ সনের জুন মাসে মাত্র একটী সোমবারে নিউইয়র্ক লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানী ২,২৪,৪৩,০০০ ডলার অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় ৯ কোটী টাকা মূল্যের ৬৭০৮ টী জীবন-বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। আমেরিকার জনসাধারণ জাতিগঠনকার্য্যে কি ভাবে সাহায্য করিতেছে উহা হইতে তাহা বুঝা যায়। উহাতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে আমরা যদি ভবিষ্যৎ বীমাকারিগণকে উপযুক্ত পরিমাণ জোর দিয়া বীমার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে পারি এবং একথা

তাঁহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি যে জীবন-বীমা আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদেরই অধিক উপকারে আসিবে, তাহা হইলে আমাদের দেশেও লোকে ক্রমেই অধিক পরিমাণ টাকার বীমা করিবে। বীমা-বিক্রেতাগণের পক্ষে উপরোক্ত ভাবে কাজ করাই তাঁহাদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

কাজেই বিদেশী কোম্পানীগুলি অধিক পারিশ্রমিক দিলেও আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে কাজ করিতে হইবে। দেশ আজ স্বাধীনতার জন্য এক মহান্ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে - কাজেই দেশের প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীলোক ও শিশুকে মাত্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এ কথা যথাযথ ভাবে বলা চলে যে ব্যবসায় সমূহের মধ্যে বীমা ব্যবসায়ই একমাত্র ব্যবসায় যাহা দ্বারা স্বরাজলাভ সম্ভবপর হইতে পারে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি অত্যন্ত মন্থর এবং উল্লেখের অযোগ্য ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসরে এই ব্যবসায়ে আন্তরিক ও বিস্তৃতভাবে কাজের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলি যুক্তি-সঙ্গত গর্ব্বের সহিত একথা বলিতে পারে যে তাহারা প্রচার কার্য্য, ব্যাপক ভাবে ক্যানভাসিং এবং সাধু উপায়ে ও সব চেয়ে কম ব্যয়ে দেশব্যাপী কাজ দ্বারা জাতির ক্রমেই অধিক পরিমাণে ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সেবা করিতেছে। জাতির আর্থিক জীবনের এক শাখায় এবং যে শাখায় ভারতবর্ষ অনেক উন্নতি করিয়াও উন্নত দেশ সমূহের সমকক্ষ হইতে আরও অনেক কাজ করিবার ইচ্ছা রাখে, সেখানে বীমা-কর্ম্মীদের মধ্যে বৈধ প্রতিযোগিতা ও সাহচর্য্য এই উভয়েরই প্রয়োজন আছে। প্রতিযোগিতা দ্বারাই বীমা-কোম্পানীগুলি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে পারে। আজ বীমা ব্যবসায়ের যে অংশ বিদেশী কোম্পানী গুলি দখল করিয়া আছে এবং যাহা ভারতীয় কোম্পানীরই প্রাপ্য তাহাকে হস্তগত করিতে হইলে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির এজেন্টদের মধ্যে সাহচর্য্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সাহচর্য্যই শক্তি—উহা বীমা-কর্ম্মীগণকে প্রমাণ করিতে হইবে এবং এ কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে খেলার দলের একজন অন্যের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া খেলায় অবতীর্ণ হইলে যেমন কোন টিমই ভাল কাজ দেখাইতে পারে না সেইরূপ বীমা কোম্পানীর এজেন্টগণও পৃথক পৃথক কাজ করিয়া তেমন সুফল দেখাইতে পারেন না। বর্ত্তমানে বীমা কর্ম্মীদের মধ্যে সাহচর্য্যের ভাব দেখা যাইতেছে—উহা তাঁহাদের মঙ্গলের নিদান। যে সব বীমা কোম্পানী জীবন-বীমা ছাড়া অন্যান্য প্রকার বীমার কাজ করেন তাঁহাদের নিজেদের একটী প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতীয় জীবন-বীমা-কোম্পানীগুলিরও নিজেদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। উহাতে এই বুঝা যায় যে বীমা-কর্ম্মীগণ —যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি দ্বারা বিরাট বীমা ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদেরও নিজেদের মধ্যে একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় বীমা-কর্ম্মীদের এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি একবার এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং এজেন্টগণ সঙ্ঘবদ্ধ হন তাহা হইলে বীমা-কোম্পানীগুলি এজেন্টগণকে প্রকৃত প্রস্তাবেই বীমা-সৌধের স্তম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে বাধ্য হইবেন এবং বুঝিতে পারিবেন যে এজেন্টদের উপর কোন অবিচার করিলে উহা দ্বারা নিজ নিজ কোম্পানীর ভিত্তি মূলই ধ্বংস করা হইবে। অবশ্য উহা দ্বারা আমি ইহা বুঝাইতে চাহিনা যে বীমা কোম্পানীগুলি সাধারণ ভাবে এজেন্টগণের উপর অবিচার করিয়া থাকে। যদি এজেন্টগণের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তবে উহার দ্বারা বীমা কোম্পানীগুলিও বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবে। তবে এই প্রতিষ্ঠানকে বীমা কোম্পানীগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পরিচালিত করা উচিত হইবেনা। যাহাতে উভয়ের প্রতিষ্ঠান উভয়ের সাহায্য করিয়া পরস্পরের মঙ্গল বিধান করিতে পারে তজ্জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। বোম্বাইয়ে একটী ইনসিউরেন্স ব্রোকার্স এসোসিয়েশন আছে। আমি আশা এবং প্রার্থনা করি যে এই সম্মেলন একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে—ইহা ক্রমেই অধিক শক্তিশালী হইবে এবং উন্নতির পক্ষে নব নব আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে।

এই ধরণের সম্মেলনের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বীমার আর্থিক দিক সম্বন্ধে জনসাধারণকে আরও পরিষ্কার ভাবে সজাগ করা এবং দেশের জনসাধারণের

স্বার্থের দিক হইতে বীমা-কোম্পানীর এজেন্টগণ যে প্রয়োজনীয় কাজ করিতেছেন তৎসম্বন্ধে লোকের আরও অধিক সহানুভূতির উদ্রেক করা। বীমার এজেন্টগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বীমার মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে ও ব্যবহারিক উপায়ে জ্ঞানলাভ করেন ইহাও দেখা দরকার। প্রত্যেক বড় বড় সহরে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই ধরণের শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত। আমি অবগত হইলাম যে কলিকাতাতে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি বীমা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বোর্ড গঠন করিয়াছেন কিন্তু এখনও উহা কাজ আরম্ভ করে নাই। এই ধরণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এস্থলে উহাও বলা আবশ্যক যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্র কৃতী বীমাকর্ম্মীর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এস্থলে আমি স্বীকার করিতেছি যে জনসাধারণের বীমা বিষয়ে যদি স্পষ্টতর ধরণা থাকিত তাহা হইলে বীমা কর্ম্মীগণ যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইতেন তাহা তাঁহারা বর্ত্তমানে পাইতেছেন না। অনেক সময়েই বীমার এজেন্টকে একটা জঞ্জাল বলিয়া গণ্য করা হয়, তাঁহার আবির্ভাবকে ভাল'র চক্ষে কেহই দেখে না, তিনি বীমার প্রস্তাব করিলে তদ্দ্বারা তাঁহাকেই অনুগ্রহ করা হইবে এরূপ ভাব দেখান হয়। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যদি কেহ বীমা করিতে রাজী হন তাহা হইলে বীমাকারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করেন যে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতে তিনি রেহাই পাইলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বীমার এজেন্টগণ তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই উক্তির সত্যতা সমর্থন করিবেন। যে স্থলে বীমা-কর্ম্মীগণ কৃতজ্ঞতা পাইবার যোগ্য সেই স্থানে তাঁহারা অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে অপমান লাভ করেন এবং বীমার এজেন্টগণকে একথা মনে রাখিতে বলা হয় যে বীমাকারী এজেন্টের একটা মহা উপকার করিলেন। আর জনসাধারণের মহদুপকার করিবার জন্য বীমাকর্ম্মী সর্ব্বত্র উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য হইলেও তাঁহাকে একজন বাজে দালাল—একটা উপগ্রহ বিশেষ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। আজ এখানে যে সব বীমাকর্ম্মী সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা যেন এই সঙ্কল্পবদ্ধ হন যে তাঁহাদের এই অপমান দূর করিবার জন্য তাঁহারা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন। যদি তাঁহারা আরও গভীর ভাবে আত্মসম্মানজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হন এবং যদি নিজ ভদ্রতা ও মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কাজ করেন তাহা হইলেই উহা সম্ভব হইতে পারে। জনসাধারণের কাছ হইতে বীমাকর্ম্মীগণ যে সব কারণে তাঁহাদের ন্যায্য মতে প্রাপ্য সম্মান পান না তাহার অন্যতম কারণ এজেন্টদের নিজেদের মধ্যে অশোভন প্রতিযোগিতা। আমার মনে হয় যে বীমা-কোম্পানী সমূহের বেশী পরিমাণ কাজ দেখাইবার অশোভন লোভ বশতঃ প্রত্যেক ভবিষ্যৎ বীমাকারীর কাছে দলে দলে এজেন্টগণ যাইয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারা নিজ নিজ কোম্পানীর বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণনা না করিয়া একে অন্য কোম্পানীর দোষ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। যদি একদল কর্ম্মীর কাজ এই হয় যে পরস্পর পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিতে হইবে তাহা হইলে এই সব কর্ম্মীদের কেহই জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারে না। কাজেই যদি বীমার এজেন্টগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা পাইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই কোম্পানী সেই কোম্পানীর নিন্দা অথবা এই কর্ম্মী অথবা সেই কর্ম্মীর নিন্দা করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহাকে নিশ্চয় বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বীমা-কর্ম্মীদের প্রাপ্য মর্য্যাদা লাভ করিবার আরও অনেক উপায় আছে। কিন্তু আমি এখানে সেই সব কথা বিস্তৃতভাবে বলিতে চাহি না। কেননা সম্মেলনেই এই সব বিষয় আলোচিত হইয়া উহার উপযুক্ত পন্থা নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রয়োজনবোধে বীমা-কর্ম্মীদের সম্বন্ধে আমি এই সব মন্তব্য করিলাম। এক্ষণে আমি বীমা-কোম্পানীগুলিকে দুই একটী বিষয় বলিতে চাই। এজেন্টগণের নিয়োগ এবং তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি উৎকৃষ্ট ভারতীয় বীমা কোম্পানী তাঁহাদের পক্ষে হিতকারী নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এমন অনেক কোম্পানী আছেন যাঁহারা ভাল এজেন্ট সংগ্রহ করিবার সময় নীতিবিগর্হিত কাজ করিয়া বসেন। এক অফিস হইতে দুর্ব্বিনীত অথবা ব্যবসায়ের পক্ষে অহিতকর কাজ করিবার জন্য একজন এজেন্ট পদচ্যুত হইয়াছেন এবং তাহাকে অন্য কোম্পানী

সাগ্রহে কাজ দিয়াছেন—এই ধরণের ঘটনা বিরল নহে। বীমা আফিসের এই ধরণের কাজের ফলে শ্রেণী হিসাবে এজেন্টগণের অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা। তারপর আমরা প্রায়ই এই ধরণের ঘটনার কথা শুনিয়া থাকি যে একজন এজেন্ট কোন কোম্পানীর নিকট ভাল কাজ দেখাইলে আর এক কোম্পানী তাঁহাকে আরও প্রলোভনজনক সর্ত্ত দিয়া ভাগাইয়া নিতেছেন। এইভাবে এজেন্টগণের স্থায়ী স্বার্থ বলি দিয়া কোম্পানীসমূহ লাভবান্ হইতেছেন। এক্ষণে আমি এই চিত্রের আর এক দিক দেখাইতেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীমা-কোম্পানী ও এজেন্টগণের মধ্যে চুক্তিপত্র এমন ভাবে সম্পাদিত হয় যে যাহার ফলে কোম্পানীই অধিকতর সুবিধা পাইয়া থাকে। উহার ফলে অধিকাংশেরই এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে যদি উভয় পক্ষে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে চুক্তির এমন ভাবে অর্থ করা হয় যে এজেন্টগণের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রত্যেক বীমা-কোম্পানীর কার্য্যপন্থা এমন ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহার ফলে তাঁহারা বৈধ উপায়ে ভাল এজেন্ট পাইতে পারেন এবং তাঁহাদিগকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিয়া কাজে রাখিতে পারেন। যদি এজেন্টের মনে এই ধারণা জন্মায় যে তিনি যে কোম্পানীর প্রতিনিধি সেই কোম্পানী তাঁহার প্রতি ন্যায় বিচার করিবেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী কিছুতেই উক্ত এজেন্টকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া ভাগাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। আমি আশা করি এই সম্মেলনে বীমা-কোম্পানী এবং বীমার এজেন্টগণের মধ্যে ন্যায্য ও সঙ্গত সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে বক্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

এস্থলে আমি সংক্ষেপে কি কি কারণে ভাল এজেন্ট সংগ্রহের জন্য বীমা-কোম্পানীগুলির মধ্যে অশোভন প্রতিযোগিতা হয় ও এজেন্টগণের প্রতি অনুদার ব্যবহার করা হয় তাহার আলোচনা করিব। বিশেষ ভাবে গত তিন বৎসরে এই দেশে স্বদেশীয় আদর্শে ক্রমেই অধিক লোক অনুপ্রাণিত হইতেছে এবং জনসাধারণের এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে যদি ভারতের রাজনীতিক ও আর্থিক মুক্তি সাধন করিতে হয় তাহা হইলে ভারত হইতে প্রতি বৎসর বিদেশী কোম্পানীতে প্রিমিয়াম হিসাবে যে দশ কোটী করিয়া টাকা চলিয়া যাইতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করুন—ভারতীয় ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন—ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা করুন—এই সব উক্তি এখন আর লোকে প্রাচীন কালের মত অস্থায়ী ভাবপ্রবণতা বলিয়া মনে করে না—এখন লোকে এই সব কথা অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বীমা সম্বন্ধে এই সব কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে সব বিদেশী কোম্পানী এতদিন ভারতে প্রচুর কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা আর পুরাতন সর্ত্তে সেই পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে পারে না। অভারতীয় কোম্পানীর কাজের পরিমাণ বেশ ভালরূপেই কমিয়া গিয়াছে এবং ফলে কি করিয়া তাহারা তাহাদের হৃত ব্যবসায়ের কতকাংশ পুনরায় দখল করিতে পারে, তজ্জন্য তাহারা নানা অভিসন্ধি করিতেছে। এই উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম উপায় হিসাবে তাহারা বীমা-কোম্পানীর এজেন্টগণকে এমন সব পারিশ্রমিক দিতেছে যাহা অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী ভারতীয় বীমা-কোম্পানী সমূহের পক্ষে প্রদান করা সম্ভবপর নহে। উহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে নূতন কাজের জন্য বীমা-কোম্পানীগুলিকে যে ব্যয় করিতে হয় তাহা আর্থিক দিক হইতে মঙ্গলজনক নহে। তবে ইহা একটা আনন্দের বিষয় যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের এজেন্টগণের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই এই প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। এজেন্টগণের মধ্যে অধিকাংশের উপরই জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অহিতকর এই সব চালবাজি কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং তাঁহারা সকলেই ভারতীয় কোম্পানীতে জড়িত হইয়া আছেন।"

অতঃপর তিনি ফ্রি ইন্‌সিয়োরেন্স ও রিবেট দানের ভবিষ্যৎ পরিণতি আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্যশেষে বলেন—

"আমার অভিভাষণে আমি অনেক কথাই বলিলাম, এবং উহা দ্বারা আপনাদের ধৈর্য্যের উপর চাপ দিয়াছি। আমি অনেক প্রকার সমস্যার কথা উপরভাসা রকমে উল্লেখ করিয়াছি। আমি আশা করি আপনারা এই সব কথা যথোপযুক্ত বিবেচনার সহিত ও চিন্তার সহিত আলোচনা করিয়া এমন সব প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন যাহাতে বীমা

কর্ম্মীদের মর্য্যাদাবৃদ্ধি পায় ও তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তার প্রসার ঘটে। ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে উহা দ্বারাই ভারতীয় বীমা-ব্যবসায় উহার উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে। ভগবান এই কার্য্যে আমাদের সহায় হউন।"
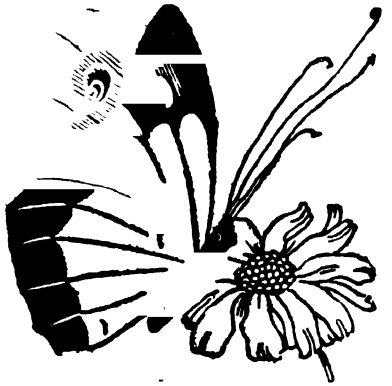
Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the Metropoiitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

যদি আপনি শয়ন করিবার পূর্ব্বে ধীরে ধীরে ওটীন ক্রীম দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া অবসাদগ্রস্ত পেশীগুলিকে সতেজ করেন, তাহা হইলে রাত্রি যত অধিক হউক না কেন আপনি সুনিদ্রা উপভোগ করিতে পারিবেন।

যাঁহরা কখনও ওটীন ব্যবহার করেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে ক্লান্ত দেহচর্ম্মের উপর এই সুন্দর, আরামপ্রদ, উপকারী, আনন্দবর্দ্ধক দ্রব্যের কি অশ্চর্য্যজনক ক্ষমতা।

দিনের পর দিন—সুখে কিম্বা দুঃখে—যেরূপেই আপনার দিন যা'ক না কেন, আপনার দৈহিক শ্রী অল্পাধিক নষ্ট হইবেই; প্রতিদিনই তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। ওটিন ক্রীম ব্যবহার করিলে গাত্রচর্ম্ম ও পেশীসমূহ পরিস্কার, সুসংস্কৃত, সতেজ ও কোমল হয়, এবং যুবাজনোচিত কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য বজায় থাকে।

ওটীন ক্রীম—প্রতি রাত্রে ব্যবহারের জন্য।

ওটীন স্নো—দিবাভাগে ব্যবহারের জন্য—ইহা মাখিবামাত্রই গাত্রচর্ম্মের সহিত মিলাইয়া যায় এবং চর্ম্মকে কোমল ও সুশ্রী করে।

বাজারে সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কুপন—নমুনাস্বরূপ ওটীন ক্রীম, ওটীন স্নো, ওটীন সাবান, ওটীন ফেস্ পাউডার, ১টী বড় ওটীন শ্যাম্পু পাউডার, ওটীন সৌন্দর্য্য পুস্তক আমাতে পাঠাইবেন। এই সঙ্গে ।৵০ মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান হইল।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

দি ওটীন কোম্পানী

১৭ নং প্রিনসেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

U. S. 2

UPASANA—Regd. No. C. 1695.

জল-নিকাশের
সকল ব্যবস্থার নিমিত্ত
ডেমিং পাম্প
ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছে
লিখিলে সচিত্র মূল্য-তালিকা পাঠান হয়।

সোল এজেণ্ট—
এ, টি, আলিহুসেন এণ্ড কোং
২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

লক্ষ্মী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮০ চৌরঙ্গী, কলিকাতা Phone, Park 1168

প্রধান পৃষ্ঠপোষক—ভবানীপুরের সুবিখ্যাত ধনকুবের ও মণিকার লক্ষ্মীবাবুর পুত্রগণ।

মূলধন—দশলক্ষ টাকা।

চলতি হিসাব (Current Account) দুই শত টাকা দৈনিক জমা থাকিলেও শতকরা তিন টাকা হারে সুদ দিয়া থাকি।

সেভিংস ব্যাঙ্ক (Savings Deposit Account) শতকরা বার্ষিক ৪৷৹ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (Fixed Deposit) জমার টাকার তারতম্যানুসারে উপযুক্ত সুদের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য আবেদন করুন।

ইউ, এন, সেন
কোষাধ্যক্ষ

এ, এন, সেন,
সেক্রেটারী

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত

আহরণী।—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলী হইতে সঙ্কলিত আদর্শ চয়ন-গ্রন্থ—১৸৹

ঋতু-মঙ্গল (২য় সংস্করণ)	...	৸৹
বল্লরী (৩য় সংস্করণ) ...	...	৷৷৹
রস-কদম্ব (কমিক গানের বই)	...	৷৷৶৹
লাজাঞ্জলি	...	৷৷৶৹
ক্ষুদকুঁড়া	...	৷৷৹
পর্ণপুট ১ম (৪র্থ সংস্করণ)	...	১৷৹
পর্ণপুট ২য় (২য় ঐ) ...	...	১৷৹
ব্রজবেণু (২য় ঐ) ...	...	১৲
চিত্রচিতা	...	১৶৹
বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ (গদ্য গ্রন্থ)		১৹
ছেলেদের মহাভারত ... (ঐ)		১৲

প্রাপ্তিস্থান :—রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ
পি ২৩০-৩ রসা রোড, টালিগঞ্জ ; বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্তের
—গ্রন্থাবলী—

গল্প

১। বিনোদিনী। ২। শ্রীমতী।
৩। রূপের বাহিরে।

উপন্যাস

৪। মহিষী। ৫। অসাধু সিদ্ধার্থ।
৬। লঘু গুরু। ৭। তাতল সৈকতে।

জগদীশচন্দ্রের গল্পগুলি গোলাপের মত মনোরম, সহজ উজ্জ্বল এবং রসপূর্ণ।

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। বৎসরের যে কোন মাস হইতে কেহ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—

৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

মাঘ—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

মাঘ—১৩৩৮

ডোয়ার্কিনের
হারমোনিয়ম
৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই
প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা।
আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরণীয়।
ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২ সেট রীড্
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।
৮।১নং ডালহাউসি স্কোয়ার

ভবানী-মন্দিরে শিবাজী

২৪শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৩৮ | ১০ম সংখ্যা

অনপায়িনী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আকাশে ঘনাল দুর্যোগ ঘন তামসী নিশা,
মেঘ-গর্জ্জনে কেঁপে ওঠে বুক পাইনা দিশা।
গৃহ অরণ্য এক হয়ে আসে ঝড়ের মুখে,
আগুসরি পথ কেমনে পথিক দাঁড়াবে রুখে?
দু'চোখ মেলিয়া খুঁজে মরি তোমা অচেনা পথে,
আলোকের রাণী নেমে এস তব স্বর্ণ-রথে!

নেমে এস দেবি, ইন্দ্র-ধনুর সরণি বাহি'
তৃষিত মর্ত্ত-মানব-নয়ন রয়েছে চাহি';
নয়নানন্দ নন্দন-দীপ কম্প্র শিখা
জ্যোতি-মহিমায় মহামানবের মন্ত্র লিখা;
মিনতি জানাই, প্রণতি করিয়া তোমারে ডাকি,
শোধন-বহ্নি জ্বালিয়া রাখিতে আসিবে না কি?

জ্যোতির্ম্ময়ি গো, নখর-দীপ্তি পরশে তব
প্রস্ফুট হোক নব জীবনের চেতনা নব।
এস সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী তরুণী উষা,
পরাও রিক্তা ধরণীর গায় স্বর্ণ-ভূষা!
শক্তিদাত্রি, তোমার তড়িৎ-দৃষ্টিপাতে
অবনমিতের আত্মবোধন করগো প্রাতে।

এসগো স্বস্তি-মুক্তি-দায়িনী উজ্জ্বল-বিভা,
তোমার প্রসাদে অন্তরলোকে প্রকাশে দিবা!
হে অনপায়িনি, স্মরণ-বাহিনী আহবনীয়া
অন্ধ নয়ন খোল গো অমিয় পরশ দিয়া।
জাগো কল্যাণি, তত্ত্ববোধিনি, অন্ধকারে
শুনিতে কি পাও ঘন করাঘাত বন্ধ দ্বারে?

অভয় মন্ত্রে ঘুচাও অলস মনের গ্লানি,
ভয়-ভাবনার মোহ-কূপ হ'তে তোল গো টানি।
জাগো নিরুদ্ধ গহন গুহার মর্ম্মতলে,
নির্ম্মোক ভাঙ্গি' জাগুক নিঝর বিপুল বলে।
বনে কান্তারে দুর্গম পথে বিঘ্ন নাশি'
নির্ম্মাল্যের শ্বেত শতদল উঠুক হাসি।

জাগো শাশ্বতি, জাগো ওগো মৃত-সঞ্জীবনি,
বিজয়ী বীরের মণি-মুকুটের মধ্যমণি!
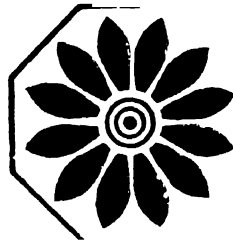
বিজ্ঞানের গল্প

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

সূর্য্যের কথা

বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে হয়েছে তার একটা মতবাদের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া গিয়েছে। বিশ্ব যে বহু ব্রহ্মাণ্ডেরই সমবায় এবং ব্রহ্মাণ্ড যে অসংখ্য তারকা-সমষ্টি, তারও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে

আমাদের যে সূর্য্য, তা আসলে একটা তারা। তারা ও সূর্য্য একই পদার্থ; নামটা কেবল ভিন্ন। সূর্য্য তার গ্রহরূপ পুত্রকন্যার জন্মদাত্রী ও পালনকর্ত্রী। শাস্ত্রে সূর্য্যদেব পুরুষরূপেই কল্পিত হন; লৌকিক ভাষাও সূর্য্যকে পুরুষ ভাবেই গ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সৌর-জগতের যে নূতন উৎপত্তিবাদ প্রচার করে, তাতে সূর্য্যের মাতৃত্বই সূচিত হয়। পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে—নূতন সৃষ্টিবাদ মতে শূন্যে বিচরণশীল অন্য এক নিকটগামী বৃহত্তর সূর্য্যের আকর্ষণ প্রভাবে আমাদের সূর্য্যদেহ হ'তে যে বাষ্পপদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয় তাই কালক্রমে শৈত্যসংস্পর্শে জমাট বেঁধে গ্রহপিণ্ডে পরিণত হয়। গ্রহের জন্মরহস্য যদি সত্যই এই-ই হয়, তবে সূর্য্যকে গ্রহমাতা ও অপরিচিত সেই আগন্তুক সূর্য্যরাজকে গ্রহপিতা বলাই ঠিক।

অসংখ্য তারার মধ্যে সূর্য্য একটা তারা; আমরা এই তারাকে সূর্য্য নাম দিয়েছি, কেননা আমাদের জীবনের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিনাশের সঙ্গে তার তাপালোকের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ আছে।

জীবমাত্রেরই জীবন শক্তির মূলে হ'ল protoplasm বা 'প্রাণপঙ্ক'। এই জীবসার বা প্রাণপঙ্ক আসলে কতকগুলা অতীব জটিল অথচ প্রাণময় nitrogen ও carbon ঘটিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ; জড়ে এই প্রাণসঞ্চার সূর্য্যালোক বিনা সম্ভবই হ'তো না। সূর্য্যের উত্তাপ না পেলে শীতল এই জড় গ্রহ-দেহে রসরূপ জলের তরলতা থাকৃতো না; তরল জলের অভাব হ'লে protoplasm (প্রাণপদার্থ) তৈরী হ'তেই পারতো না। কাজেই শুধু যে গ্রহের জড় দেহের সৃষ্টি সূর্য্য হ'তে হয়েছে তা নয়; জড় গ্রহে জীবসঞ্চারেরও মূলে র'য়েছে সূর্য্যের তাপ ও আলোক।

সুতরাং জগজ্জ্যোতি ও জগজ্জীবন এ-হেন সূর্য্যের জীবনচরিত একটু বিশদভাবে জানা ভাল।

অসংখ্যকোটী সূর্য্যের মধ্যে আমাদের সূর্য্য একটী ছোট-খাটো সূর্য্য হ'লেও অন্য এক কারণে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের কাছে সূর্য্য-তত্ত্ব আলোচনার একটা মূল্য আছে; এবং সূর্য্যের আদর-কদরও তাদের কাছে তার জন্য বেশী।

সূর্য্য সব চেয়ে নিকটতম তারা; পৃথিবী হ'তে তার দূরত্ব ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল; এর পরই যে নিকটতম সূর্য্য, তার দূরত্ব হচ্ছে ৪॥ আলোকবর্ষ; অর্থাৎ ২৭ লক্ষ কোটী মাইল! বেশী ভাগ সূর্য্যই শত, সহস্র বা লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্ত্তী; এক্ষেত্রে তারাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হ'লে—পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা নিকটতম তারার সাহায্যেই ভাল রকম হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা তাই সব চেয়ে ঘরের কাছের তারাটীকে ভাল করে' বোঝা-পড়া করে' সেই জ্ঞান-সাহায্যে দূরবর্ত্তী তারাদের দেহতত্ত্ব আলোচনা ক'রবার সুবিধা বুঝেছেন।

পৃথিবী হ'তে সূর্য্যের দূরত্ব হ'চ্ছে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল। কথায় শুনতে কোটী ক্রোশ! কিন্তু সে-যে কতটা দূর তা আমাদের বোধে আসে না; বুদ্ধিতে সাড়াই দেয় না। কাজেই জানা-শোনা জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে তুলনা ক'রে বোঝালে একটু ধারণা জন্মাবার আশা করা যায়। কোনো লোক যদি সূর্য্যে পৌঁছবার জন্য যাত্রা করে, তা হ'লে সে ৬৫০ বছর পরে গন্তব্যে উপনীত হবে।

দেহের বাহির হ'তে অনুভূতি স্নায়ু দিয়ে সেকেণ্ডে ৪০০ ফুট বেগে মস্তিষ্কে পৌঁছায়; যদি এমন কেউ লম্ব-হস্ত থাকেন যে, এখান হ'তে হাত বাড়িয়ে সূর্য্যের গাত্র স্পর্শ ক'রতে পারেন, তা হ'লে সেই স্পর্শজনিত উত্তাপ-বোধ মস্তিষ্কে তার পৌঁছাবে ৪০ বৎসর পরে!

এই সূর্য্যের মধ্যে আমাদের সূর্য্যটী মাঝারি সাইজের সূর্য্য হ'লেও তার আয়তন বড় কম নয়। পৃথিবীর ব্যাস-রেখা হ'ল প্রায় ৮০০০ মাইল; কিন্তু সূর্য্যের ব্যাস-রেখা হ'ল ৮৬৫০০০ মাইল! ১৩ লক্ষটা পৃথিবীকে দলিত করে' পিণ্ডীভূত করলে, একটা সূর্য্য-সমানায়তনের গোলক হবে! কি প্রকাণ্ড এই সূর্য্য-দেহ! আবার অন্যান্য অতিকায় সূর্য্যের তুলনায় এই সূর্য্য কত ছোট! বিটেলজুস্ বা আর্দ্রা তারকাটা এতই বিপুল মাত্রায় বড় যে, এক কোটীটা সূর্য্য একত্র ক'রলে—তবে আর্দ্রার সমানায়তন হবে। আর্দ্রার ব্যাস-রেখা ৩০ কোটী মাইল।

পৃথিবী হ'তে সূর্য্য আয়তনে ১৩ লক্ষ গুণ বড় হ'লেও বস্তুঘনত্বে সূর্য্য-পদার্থ পৃথিবীর সিকিমাত্রা। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্য মোটে ৩৩২০০০ গুণ বেশী ভারী। পৃথিবী আগা-গোড়া নিরেট জমাট ধাতু পাথরে তৈরী; কিন্তু সূর্য্য আগা গোড়া খুব হাল্কা ও পাতলা এবং লঘু গ্যাসে তৈরী। তার মধ্যপিণ্ডটাই সাধারণ বাষ্পের সমান ঘন; এই মধ্য পিণ্ডকে ঘিরে যে জ্বলন্ত গ্যাসের আবরণ আছে—তার লঘুত্ব এত বেশী যে ধারণা করা যায় না।

তারা বা সূর্য্যমাত্রেরই দেহপদার্থ এমনি লঘু সূক্ষ্ম গ্যাসে তৈরী। এই লঘুত্ব এত বেশী যে, আর্দ্রা নক্ষত্র সূর্য্য হ'তে কোটী কোটী গুণ বিস্তৃত-আয়তন হ'লেও ভারে (বস্তুত্বে) মোটে ৩৫ গুণ বেশী। অর্থাৎ সূর্য্যে যে পরিমাণ পদার্থ-রাশি আছে, আর্দ্রাতে তার চেয়ে ৩৫ গুণ মাত্র পদার্থ বেশী আছে। কিন্তু এই ৩৫ গুণ বেশী পদার্থ এত লঘু ও পাতলা ভাবে ছড়ানো আছে যে, তা সূর্য্য অপেক্ষা কোটী গুণ বেশী স্থান দখল করে' আছে। কাজেই বোঝা যায়, আর্দ্রার দেহ-পদার্থ কত লঘু গ্যাসাকারে বিদ্যমান। আর্দ্রার দেহ-বাষ্প অপেক্ষা ধরণীর বাতাসের ঘনত্ব হাজার গুণ বেশী!

সূর্য্যের মূলদেহ অত্যুত্তপ্ত একটা গ্যাস বা বাষ্পগোলক, এবং তার ব্যাসরেখা ৮ লক্ষাধিক মাইল। এই গোলককে আবৃত করে' আছে একটী জ্যোতির্মণ্ডল (photo-sphere); এটীর গভীরতা ৮০০ মাইল। ভূদেহের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) যে সম্বন্ধ, সৌরদেহের সঙ্গে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সেই সম্বন্ধ। আমাদের বায়ুমণ্ডল যেমন oxygem, nitrogen, প্রভৃতি নানারকম মূলপদার্থের মিশ্রণজাত, সৌর জ্যোতির্ম্মণ্ডলও তেমনি নানারকম জানিত অজানিত মূল-পদার্থের মিশ্রণে গঠিত; তবে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মূলপদার্থগুলা, মনে হয় ভার অনুসারে থাকে থাকে সাজানো। সব বাইরের থাক বা স্তরটা calcium পদার্থের। তার নীচে hydrogen এবং barium এর দুই স্তর; তারও নীচে অন্যান্য মূলপদার্থের স্তর। পৃথিবীতে সুলভ ৯২ রকম মূল পদার্থের অন্ততঃ—৪০ জাতীয় মূল পদার্থ যে সূর্য্যে আছে, তা নিশ্চয়ই জানা গিয়েছে। বাকী গুলাও যে সূর্য্যে আছে, তার একটা সঙ্গত কারণ এই যে, পৃথিবী সূর্য্যেরই দেহজাত কন্যা।

এই যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল এবং তার ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের স্তরগুলা, এখানে সে পদার্থ কি ভাবে কি অবস্থায় আছে? জ্যোতির্ম্মণ্ডলের উত্তাপ ৬০০০ ডিগ্রি! এই উত্তাপে পরমাণুগুলা আস্ত বা গোটা থাকতে পারেই না। প্রবল বেগে ছুটাছুটী ক'রতে ক'রতে পরমাণুগুলার পরস্পরে ধাক্কাধাক্কি লাগছে—এবং ভেঙ্গে অঙ্গহীন হ'য়ে প'ড়ছে।

"পরমাণু ভেঙ্গে যাচ্ছে!" এ কী রকম নূতন কথা? পরমাণু আর সেকালের ধারণামত নিরেট কঠিন অবি-ভাজ্য জড়কণা নয়; এখনকার ধারণায় পরমাণু দুই জাতীয় তড়িৎশক্তি কণার সমন্বয়ে গঠিত ব'লেই প্রতিপন্ন হ'য়েছে। মাঝখানে একটা বা একাধিক positive তড়িৎ-কণার বিন্দু; তাকেই মাঝে রেখে খুব দূরে দূরে প্রবল বেগে প্রদক্ষিণ ক'রছে একটা বা একাধিক negative তড়িৎ-কণার দল।

কেন্দ্রের শক্তিবিন্দুকে বলে proton। পরিধির শক্তিবিন্দুকে বলে electron। সব পরমাণুর গঠনভঙ্গী একই। কেন্দ্র ও পরিধি প্রান্তের দুই জাতীয় শক্তি-কণার সংখ্যাভেদে মূল পদার্থের জাতিভেদ। কোনো এক জাতীয় পরমাণু দেহের ইলেকট্রন বা প্রটনের কমতি বাড়তি হ'লে সেটা অন্য জাতীয় পরমাণু হয়ে যায়। খুব প্রচণ্ড তেজের প্রভাবে পরমাণুর ইলেকট্রন হানি ঘটতে পারে।

সূর্য্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ৬০০০ ডিগ্রি উত্তাপের প্রতাপে পরমাণুগুলা আস্ত বা গোটা থাকতে পারে না, তাদের ইলেকট্রন হানি হয়ে যায়। এই বিমুক্ত ইলেকট্রনগুলার

প্রবাহই negative electricityর স্রোত। জ্যোতির্ম্মণ্ডলটা বিবিধ মূল পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গঠিত হ'লেও, পদার্থের পরমাণু গুলা ভাঙ্গাচোরা অবস্থাতেই আছে। এই সব কক্ষচ্যুত ইলেক্‌ট্রন সেকেণ্ডে ১০০ মাইল বেগে ছুটাছুটি করছে। ফলে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের স্তরগুলা সর্ব্বদাই প্রবল ইথর তরঙ্গে ও তড়িৎ-ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে র'য়েছে।

সূর্য্যের বহির্ম্মণ্ডলেই এইরূপ তাপমাত্রা, এবং তাহার অবস্থাও এইরূপ বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ; অভ্যন্তরভাগে মূল দেহগর্ভের অবস্থা যে কি ভয়ানক, তা ভিতরের উত্তাপ মাত্র হ'তে অনুমান ক'রতে হবে। উপরিভাগের ৬০০০ ডিগ্রি উত্তাপ ক্রমশ ভিতর দিকে বাড়তে বাড়তে ১০ লক্ষ ডিগ্রিতে পরিণত হয়, হ'য়ে একেবারে কেন্দ্রভাগে ৪ হ'তে ৬ কোটী ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠছে। এই হৃৎকম্পকারী উত্তাপ মাত্রার চোটে সূর্য্যগর্ভের অবস্থা যে কী মূর্ত্তি ধরে' আছে, তা কল্পনারও অতীত।

সূর্য্য-দেহের উপর সময়ে সময়ে আর এক শ্রেণীর আশ্চর্য্য পদার্থ দেখা যায়। চাঁদে যেমন কলঙ্ক আছে; সূর্য্যের ভাস্বর দেহেও তেমনি কলঙ্কমালা আছে। চন্দ্র-কলঙ্ক হ'তে এ গুলির পার্থক্য এই যে, সৌর কলঙ্ক (sun spots) নগ্ন চক্ষে দেখা যায় না; সৌর কলঙ্ক সর্ব্বদাই রূপান্তর লাভ করে; সংখ্যায় কমে বাড়ে; তাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে এবং স্থিতিকালের স্থিরতা নাই। সৌর কলঙ্কগুলি সূর্য্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডলে ছোট বড় বিবিধ আকারের ঘূর্ণী গহ্বর মাত্র। জলের উপর ঘূর্ণী বা eddies যেমন, এও তাই। কলঙ্কগুলির background টা তুলনায় ভয়ানক দীপ্ত ও উত্তপ্ত ব'লে অপেক্ষাকৃত শীতল এই গর্ত্তগুলা বাহির হ'তে কালো দেখায়। এই গর্ত্তগুলা সূর্য্যদেহের আয়তনের তুলনায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ দাগ বলে' মনে হয় কিন্তু আসলে এদের বিশালতা ও গভীরতা ভয়ানক। এই গর্ত্তগুলার বিস্তৃতি আয়তনভেদে ৫০০ হ'তে ৪০০০০ মাইল পর্য্যন্ত। ১৯১৭ সালের আগষ্টে একটা বিপুলকায় সৌর-কলঙ্ক দেখা দিয়েছিল; তার স্থান ব্যাপ্তি (area) ৩৬০ কোটী বর্গ মাইল! সঙ্গে সঙ্গে তার আরো ১৩টা গর্ত্ত দেখা দেয়; এই সবগুলায় সমগ্র দেশব্যাপ্তি ৬৭০ কোটী বর্গ মাইল হয়। ১৩৫ টা পৃথিবী পিণ্ডীভূত হলে ঐ গর্ত্তের মুখ বোঁজাতে পা'ত।

জ্যোতির্বিদ্‌দের কাছে সৌর কলঙ্কগুলার মূল্য এইজন্য যে, এদের এই স্থানপরিবর্ত্তনের গতি ও বেগ মাত্রা হ'তে সূর্য্য সম্বন্ধে দু'একটা প্রধান তত্ত্ব জানা গেছে। প্রথম—সূর্য্যদেহ কঠিন জড়পিণ্ডময়; দেহ তার বায়বীয় (gaseous); দ্বিতীয়—সূর্য্যগোলক নিজ অক্ষদণ্ডে ২৭$\frac{1}{2}$ দিনে আবর্ত্তন ক'রছে (rotation)। সৌর কলঙ্কগুলির স্থিতিকালের একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নাই। গড়ে মাসাবধিকাল এদের আয়ুপরিমাণ। খুব বেশী হয় তো এক বৎসরের বেশী নয়।

সৌর কলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না এটাও বিবেচিত হ'য়েছে। অনুমান হয় মাত্র যে, একটা সম্বন্ধ আছে; তবে সেটা কি রকম তার কোনো নিরাকরণ হয় নি। এই পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে যে, যে-বছর সূর্য্যের দেহে এই সব ক্ষতের সংখ্যাধিক্য ঘটে, সে-বার সৌরমণ্ডলে খুব একটা বিপ্লবের অবস্থা আসে। সূর্য্যের তাপালোক বিকিরণে একটা মাত্রাধিক্য ঘটে।

সৌর তেজোমণ্ডলটীর সব উপরের যে স্তর, সেটা হ'লো সব-চেয়ে হালকা hydrogen গ্যাসের স্তর, এই স্তরটীকে chromosphere বা বর্ণমণ্ডল বলা হয়, এই কারণে যে—তারই উপর হতে লাল টক্‌টকে জ্বলন্ত শিখা সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উপরে উঠছে। এই শিখাগুলা আসলে দহ্যমান hydrogen গ্যাস ছাড়া কিছু নয়। শিখাগুলির দৈর্ঘ্য বড় কম নয়; দশ বিশ হাজার মাইল তো বটেই; কখনো কখনো লক্ষাধিক মাইলও ঊর্দ্ধে উঠে। পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণের সময় আবরণকারী চন্দ্রমণ্ডলের অন্তরালে এই শিখাগুলাকে বর্ণমণ্ডলের প্রান্ত হতে রক্তজিহ্বার মত লক্‌লক্ করে' ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে উঠতে দেখা যায় এবং বর্ণ-মণ্ডলের গভীরতা ৫০০০ মাইল।

বর্ণমণ্ডল ও সৌরশিখা

সূর্য্যের উপর ও গর্ভভাগের প্রচণ্ড উত্তাপমাত্রার আভাস উপরে দেওয়া হ'য়েছে। ১১২° ডিগ্রি উত্তাপেই আমরা ভয় পাই; ৬০০০° ডিগ্রি হ'তে ৬ কোটী ডিগ্রির উত্তাপ যে কি, তার পরিচয় দেবার মত ভাষাই আমাদের নাই। এই প্রচণ্ড উত্তাপে প্রায়-অবিনশ্বর যে এটম তাও ভস্ম হয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞ বিশ্বতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা যুক্তিবিচারযোগে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে, সূর্য্যগুলির বয়স ৫ হইতে ৮ লক্ষ-কোটী বৎসর। এই পরিমাণ কাল ধরে' সূর্য্য প্রচণ্ড মাত্রায় তাপ ও

আলো ব্যয় করে' এসেছে এবং এখনো আরো প্রায় ঐ পরিমাণ কাল ধরে' সূর্য্যের ব্যয়বাহুল্য চ'ল্তে থাক্‌বে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এক ভগ্নাংশভাগের জ্যৈষ্ঠমাসের উত্তাপমাত্রাই আমাদের কাছে ভীষণ ও ভয়াবহ মনে হয়; সমগ্র ভূভাগ যা উত্তাপ পায়, তার ধারণা তো আমাদের হয়ই না; অথচ এই পৃথিবী সূর্য্যবিকীর্ণ সমগ্র তাপালোকের কতটুকু পায় জানেন? সূর্য্যের দেহ হ'তে উত্থিত উত্তাপ-পরিমাণের ২২০ কোটী ভাগের এক ভাগ মাত্র পায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবী গ্রহটী!

এই অফুরন্ত বিপুল উত্তাপের তীব্রতা কি ভয়ানক! পৃথিবী হ'তে সূর্য্য পর্য্যন্ত কেউ যদি একটা বরফের স্তম্ভ খাড়া করে, যে স্তম্ভের ব্যাস-রেখা ২১/৪ মাইল, উচ্চতা যার ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল, আর সূর্য্য যদি তার সমস্ত উত্তাপ-শক্তি ঐ স্তম্ভে কেন্দ্রীভূত করে, তা হ'লে ১ সেকেণ্ড মাত্র সময়ে সমস্ত স্তম্ভটা গ'লে জল হ'য়ে যায়।

কোথা হ'তে এত উত্তাপ সূর্য্য-গর্ভে নিরন্তর জন্মাচ্ছে? কোথায় তার মূল উৎস? তিন রকম উপায়ে এই উত্তাপমাত্রা উৎপন্ন হ'তে পারে—

(১) কয়লার মত কোনো দাহ্য পদার্থের দহন হ'তে তাপ জন্মাতে পারে।

(২) প্রচুর পরিমাণ উল্কা শিলা সূর্য্যে এসে প'ড়ে ভস্ম হ'য়ে উত্তাপ উৎপাদন করতে পারে।

(৩) সূর্য্যদেহ সঙ্কুচিত হ'য়ে তাপ বিকিরণ করতে পারে; কিন্তু নানারূপ বিচার বিবেচনা ও গবেষণা করে' স্থির হয়েছে যে, উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের কোনোটাই সম্ভব নয়।

গণনাযোগে বুঝতে পারা গিয়েছে যে, সমগ্র সূর্য্য-দেহটা যদি নিরেট খাঁটী একটা পাথুরে কয়লার পিণ্ড হ'তো তা হ'লে সেটা ৬০০০ বছরেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। সূর্য্যে অগণিত সংখ্যায় উল্কা-শিলার পতনে তাপোৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয়; তবে সেরূপ পরিমাণে অবিরাম উল্কা পতনের কোনো প্রমাণ নাই। অন্ততঃ গ্রহগুলা তা হ'লে সেই উল্কা বৃষ্টির কতকটা পরিচয় পেতো।

সৌরদেহ সঙ্কোচের ফলে উত্তাপ বিকীর্ণ হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রতি বৎসর ৩০০ ফুট দেহ-সঙ্কোচ হ'লে তবে এই পরিমাণ উত্তাপ জন্মাতে পারে; কিন্তু ১০ হাজার বছর ধরে' এই মাত্রায় সূর্য্যদেহ ছোট হ'তে থাকলে তবে মানুষের চোখে এই হ্রাসের অনুভূতি ধরা পড়ে' মতটা প্রমাণীকৃত হতে পারে। তা ছাড়া অনেক কারণেই এই মতটাও তত সন্তোষজনক নয়।

সম্প্রতি যে থিওরীটা বিজ্ঞান-জগতে সমাদর লাভ করেছে তা হচ্ছে এই যে, সূর্য্যের এই আলোক ও উত্তাপ উৎপত্তির মূল উৎস হ'চ্ছে জড়পদার্থের ধ্বংস বা লয়। জড়পদার্থ যে পরমাণুপুঞ্জে গঠিত, সেই পরমাণুগুলাই মূলে লয় পাচ্ছে—অর্থাৎ তেজ বা শক্তিরূপে রূপান্তর লাভ ক'রছে। দুই বিপরীত জাতের তড়িৎ শক্তিকণা পরস্পরাকৃষ্ট হয়ে জড়পরমাণু ভাব ধরে' আছে; কোনো কারণে এই দুই রকমের শক্তিকণা proton এবং electron পরস্পর বন্ধনচ্ছিন্ন হ'লেই পরমাণুর জড়ত্ব ঘুচে গিয়ে শক্তিত্ব এসে পড়ে। সূর্য্য ও তারকাদের গর্ভে এই জড়-বিলয় ব্যাপার (dematerialisation of matter) চ'লছে তথাকার প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে।

আচার্য্য Eddington এর মতে, সূর্য্য বা তারকাদেহে তাপালোকের সৃষ্টি হ'চ্ছে, প্রথম, পরমাণুর রূপান্তর লাভ দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ, পরমাণুর আত্মহত্যার দ্বারা।

পরমাণুর গঠনতত্ত্ব আলোচনাকালে দেখা গিয়েছে, এই রূপান্তরপ্রাপ্তি ব্যাপারটা কি—

প্রত্যেক জাতীয় মূল পরমাণুর দেহে একটা নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক proton ও electron আছে। তাদের সংখ্যা হ্রাস হ'লে পরমাণুটা অন্য জাতীয় পদার্থ-পরমাণু হয়ে পড়ে। Radium ধাতু পরমাণু যদি চারটী electron হারায় তবে তা lead পরমাণুতে পরিণত হবে। Hydrogen পরমাণু যদি আর একটী electron লাভ করে তবে তা helium পরমাণু হবে। একেই বলে পরমাণুর রূপান্তরপ্রাপ্তি। যে যে জাতীয় পরমাণুর এই electron চ্যুতি আপনা হতেই ঘটে, তারা হল ভাস্বর বা radio-active element। পৃথিবীতে যে সব পরমাণুর atomic number ৮৩ বা ততোধিক, তাদেরই এই রূপান্তর ঘটে। সূর্য্য ও তারকাদের দেহে এই শ্রেণীর ভাস্বর, ভারী ও ভঙ্গুর নানাজাতীয় দিব্য পরমাণু (lucid atoms) আছে এবং তাদের এই ইলেক্‌ট্রন হানির ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হ'চ্ছে।

দ্বিতীয় উপায়—পরমাণুর আত্মধ্বংস বা লয় সাধন। অনেক সময় প্রচণ্ডতম উত্তাপের ফলে ইলেক্‌ট্রন গিয়ে প্রটনের সঙ্গে ধাক্কা খায়; ফলে (দুই বিপরীত-ধর্ম্মী শক্তিকণা বলে) দুইই ধ্বংস হ'য়ে যায়, এবং তাদের স্থানে এক ঝলক তড়িৎ-চুম্বক শক্তি উৎপন্ন হয়। এই electro-magnetic শক্তিবিন্দুই উত্তাপ ও আলোকরূপ ধ'রে মহাশূন্য পথ অতিক্রম করে' পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহে উপনীত হয়। পরমাণু-ধ্বংসজাত শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং পরিমাণ অপরিমিত। এক বিন্দু জলের পরমাণু লয় ক'র্‌তে পারলে ২০০ horse-power শক্তি সংবৎসর ধরে' পাওয়া যাবে। এই পরমাণু-ধ্বংস মানুষের এখন সাধ্যাতীত হ'লেও সূর্য্য ও তারকার তাপ রহস্য অবিদিত নয়।

অতি বড় সুন্দরী

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

মেয়ের নাম নয়নতারা।

নামকরণের ইতিহাসটা আগে একটু বলিয়া রাখা ভাল।

সন্তান সম্ভাবনার বয়স ছাড়াইয়া জীবনের পথে অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াও যখন হঠাৎ জয়া অসম্ভবটাকে সম্ভবপর প্রমাণ করিয়াছিল, তখন সংসারের অপর প্রাণী দুইটী একরূপ নাচিয়াই উঠিয়াছিল বলিতে হইবে।

লক্ষ্মণ মুদি ও তাহার ভগ্নী প্রমদা।

আনন্দে দিন গণিতে গণিতে লক্ষ্মণ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বল ত কি হবে!

সলজ্জ হাস্যে জয়া বলিয়াছিল—তুমিই বলনা।

লক্ষ্মণ বলিয়াছিল—ছেলে।

জয়া বলিয়াছিল—আমি বলছি মেয়ে।

জয়ার নিকট কথাটা শুনিয়া প্রমদা বলিয়াছিল, যা হয় একটা আসুক্ বাপু, এমন ক'রে আর পারা যায় না।

যথাসময়ে জয়ার কথা মত মেয়েই আসিয়াছিল এবং প্রমদার অক্লান্ত চেষ্টায়—সুপ্ত ও জাগ্রত অসংখ্য দেবতার দলকে, পূজা পাইয়া সেই দারুণ বর্ষায়ও একবার গা-মোড়া দিয়া পাশ ফিরিতে হইয়াছিল।

একরত্তি ফুটফুটে মেয়েটি মায়ের কোলে পড়িয়া কাঁদে, হাসে আর সংসারে কাজ করিতে করিতে প্রমদা দিনে-রাতে সতর বার ও দোকানে যাইতে আসিতে লক্ষ্মণ সাত বার উঁকি মারে।

মেয়ের পয়ে দোকানে লক্ষ্মীর পদধূলির আকাঙ্ক্ষা করিয়া লক্ষ্মণ বলিয়াছিল,—মেয়ের নাম লক্ষ্মী রাখ্‌বুরে প্রমদা।

জয়া বলিয়াছিল—আমি কিন্তু সাবিত্তিরি নাম রাখ্‌বো মনে ক'রেছিনু।

সগর্ব্বে হাত দুইটিকে উঁচু করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া চড়া গলায় প্রমদা বলিয়াছিল—নাম ওর রাখা হ'য়ে গেছে। তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রমদা হাসিয়া বলিয়াছিল—ওর নাম নয়নতারা।

ষষ্ঠী পূজার পর জয়ার কোল হইতে খুকীকে টানিয়া লইয়া প্রমদা বলিয়াছিল—তোর মেয়েকে আমি নিলুম বৌ, দাদাকে বলিস্। তারপর শিশুর সর্ব্বাঙ্গ অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিয়া তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া বুকের ভিতরটীতে চাপিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

সে অনেক দিনের কথা—

তারপর সেই ছোট মেয়েটিকে লইয়া সংসারের তিনটি প্রাণী যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে বসিয়া লক্ষ্মণের প্রায়ই দোকান কামাই হইত, প্রমদা সারাদিন পাড়া-বেড়ান ছাড়িয়া তাহাকে ধোয়াইয়া-মুছাইয়া, সাজাইয়া-গুজাইয়া, কাজল-টিপ পরাইয়া দিন কাটাইত; আর জয়া সংসারের কাজ করিতে করিতে তাহাদের রকম দেখিয়া শুধু হাসিত।

রাস্তা হইতে পাড়া-পড়শীদের ডাকিয়া ভাইঝিকে দেখাইয়া প্রমদা বলে—দেখত মোড়লখুড়ি, রংটা এর পর ভাল খুল্‌বে না!

মোড়ল-গিন্নী বলেন—হ্যাঁ, খুব রং হবে তোর ভাইঝির।

প্রমদা বলে—চোখ দুটো ভাসা ভাসা আছে তবে নাকটা একটু খ্যাঁদা খ্যাঁদা, ও বড় হ'লে থাক্‌বে না, কি বল ভাই গঙ্গাজল!

তাহার গঙ্গাজল বলে—হ্যাঁ, তবে চুল বোধ হয় কম হবে—

হাঁকাইয়া প্রমদা বলে—রামোঃ—কালী ঠাকুরের মত চুল হবে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে যদি ভাল থাকে—গাঁয়ের সেরা মেয়ে হবে, তুমি দেখে নিও।

মোড়ল-গিন্নী হাসিতে গিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া ফেলেন।

জয়া অনুযোগ করিয়া বলে—অত আদর তোমরা দিও নাক' মেয়েটাকে ঠাকুঝি, এর পর মাথায় চ'ড়ে বস্‌বে।

প্রমদা বলে—চ'ড়বেইত মাথায়। আমার মাথায় চ'ড়বে, আমার বাবার মাথায় চ'ড়বে—তোর কি? তুই যেমন আছিস্ তেম্‌নি থাক্।

জয়া হাসে। মনে মনে বলে—আহা তাই করুক্। অল্প বয়সে নিজের কপাল পুড়িয়ে ব'সে আছে—কি নিয়েই বা জগতে বাঁচবে।

* * * *

নয়নতারার রূপের জৌলুষটা বিশেষ করিয়া সাধারণের চোখে পড়িয়া গেল সেই দিন, যেদিন হাটতলার মিটিং-এ আসিয়া গ্রামের জমিদার বাবু পাড়ার কৌতূহলী আর পাঁচ-জন ছেলেমেয়েদের মাঝে নয়নতারাকে দেখিয়া, ডাকিয়া আদর করিয়া কোলে বসাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তরে মেয়েটী অসঙ্কোচে বলিল, "আমার নাম তারা।"

জমিদার বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবার নাম?"

নয়নতারা বলিল, "লক্ষ্মণ"—

প্রশ্ন হইল, "লক্ষ্মণ কি, তোমরা কারা?"

তারা বলিল, "বাবা শুধু লক্ষ্মণ, আমরা সরকার-রা।"

ডাক পড়িল লক্ষ্মণের। দোকান ছাড়িয়া লক্ষ্মণ কর-জোড়ে হাজির হইল।

জমিদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কর?

লক্ষ্মণ মুদিখানা দোকানের উল্লেখ করিল। তারপর, কয়টি ছেলে-মেয়ে, সংসারে খাইতে কয়টী, দোকানের অবস্থা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া জমিদার বাবু বলিলেন, "মেয়েকে লেখা পড়া শেখাচ্ছ ত?"

সসঙ্কোচে লক্ষ্মণ জানাইল—হুজুর, অবস্থা খারাপ, কোথায় পাব—?

যাইবার সময় জমিদার বাবু গ্রামের মেয়ে-স্কুলের শিক্ষককে ডাকিয়া নয়নতারার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন ও নয়নতারার হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিয়া বলিলেন, "খুকি সন্দেশ খেয়ো।"

তখন নয়নতারার বয়স মোটে সাত বৎসর।

গাঁয়ে ছেলে-মেয়ের মা-বাপেরা দিনকতক হিংসায় ফুলিয়া উঠিয়া তারপর আপনিই কুঁকড়াইয়া গেল, এবং নয়নতারা রীতিমত প্রত্যহ বই শ্লেট বগলে পুরিয়া স্কুলে যাইতে লাগিল।

গর্ব্বে আনন্দে একগাল পানে খানিকটা দোক্তা পুরিয়া নয়নতারার পিসি আবার দুপুর বেলার দিকে খানিকটা পাড়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * *

লোকে বলে মেয়েছেলের বুদ্ধি নাকি খুবই তীক্ষ্ণ! স্কুলে শিক্ষকদের কাছে নয়নতারার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়া তাহার পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়াইতে লাগিল, তেমনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপের জৌলুষও খুলিতে লাগিল।

পড়শীরা জয়াকে বলে—তোর নয়্‌নী রাজার রাণী হবে—দেখে নিস্!

জয়া হাসিয়া বলে—যদি হয়, তোমাদের আশীর্ব্বাদেই হবে দিদি।

পাড়ার হিতৈষী মাতব্বরয়া বলেন—লক্ষ্মণ, মেয়ের পাত্তর দেখ্‌ছ'?—তোমার বরাতে দেখ্‌ছি ভোগান্তি আছে!

লক্ষ্মণ মুখ সিঁটকাইয়া বলে—আজ্ঞে, সবে এই ন'য়ে পা দিয়েছে।

মোড়ল মশাই আঁৎকাইয়া বলেন—এ্যাঁ, তবে তো গৌরীদানের কাল উৎরে গেছে—তুমি কল্লে কি হে!

নিজের ক্ষমতার সীমা দেখাইয়া লক্ষ্মণ জবাব দেয়—টাকাকড়িও ত জোগাড় ক'রতে হবে মোড়ল মশাই।

ক্রোধে কৃষ্ণকায় শরীরটাকে বেগুনী করিয়া দ্বিগুণ চীৎকারে মোড়ল হাঁকেন—টাকা আগে না ধর্ম্ম আগে? ঘটি-বাটী বেচে, না হয় অতুল পাঠকের কাছে খত লিখে টাকার জোগাড় কর। আমরা বেঁচে থাকতে পাড়ার মধ্যে একটা অনাছিষ্টি ঘটতে দোব না—তা ব'লে রাখ্‌ছি! কি বল হে গণেশ?—

হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া, নাক-মুখ বুঝি বা চোখ দিয়াও একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া স্থানটীকে প্রায়ান্ধকার করিবার চেষ্টায় লক্ষ্মী পালের দিকে হুঁকাটী বাড়াইয়া দিয়া গণেশ কহিল—সে কথা আর ব'ল্‌তে!

পাত্র-সন্ধানের দোহাই দিয়া লক্ষ্মণ সরিয়া পড়িল।

হঠাৎ সেদিন মোটর হাঁকাইয়া কলিকাতা হইতে পঞ্চু বিশ্বাসের বাড়ীতে তাহার কোন এক কুটুম্বের দল হাজির

হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোষ্ট্র-নিক্ষিপ্ত মধুচক্রের মত মোটর গাড়ীখানিকে ঘিরিয়া একটি মধ্যাকৃতি জনতার সৃষ্টি হইয়া পাড়া সরগরম করিয়া তুলিল।

অন্দর মহলেও কিছু কম হইল না। বাহিরে কর্ত্তা ও ছেলেরা, ভিতরে গিন্নী ও মেয়েরা সমবেত জনতার একমাত্র দ্রষ্টব্য হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

তাঁহারা নাকি এতদিন পশ্চিমে কাটাইয়া, একটা রাজার ঐশ্বর্য্য লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় বাস করিতে আসিয়াছেন। সামনের ফাল্গুনে বড় ছেলেটির বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু ভাল মেয়ে পাওয়া যাইতেছে না।

পঞ্চু বিশ্বাস গৃহিণীকে বলিল—আমাদের এখানে একটী ভাল মেয়ে আছে। যদি পাড়াগাঁয় গরীব কুটুম করেন ত' মেয়েটীকে একবার দেখাতে পারি।

গৃহিণী মেয়ে দেখিতে চাহিলে—নয়নতারার উদ্দেশে লোক ছুটিল। সংবাদ পাইয়া নয়নতারার পিসি পাশের বাড়ী হইতে দুইখানা গয়না, একখানা ভাল কাপড় চাহিয়া নিজের মনোমত সাজাইয়া গুছাইয়া ভাইঝিকে লইয়া বিশ্বাসদের অন্দরে হাজির হইল। মেয়ের রূপ দেখিয়া কলিকাতার গৃহিণীর পছন্দ হইল, তবে বয়স কম বলিয়া তিনি অনুযোগ করিলেন। বলিলেন—ছেলের আমার ইচ্ছে, গাহিয়ে-বাজিয়ে, বেশ লেখা পড়া জানা একটী ডাগর মেয়ে হয়'ত ভাল—

নয়নতারার পিসি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, বলিল—তারাও আমাদের লেখাপড়াটা খুব শিখেছে, চারখানা বই রোজ পড়ে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি পড়' মা ?—

নয়নতারা বলিল—প্রাথমিক শিক্ষা—দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত—

গৃহিণী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া শুধু বলিলেন—ওঃ—

মেয়ে দেখা হইয়া গেল। পরে খবর পাঠাইবেন বলিয়া কুটুম্বেরা মোটর হাঁকাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। সমবেত জনতার ঈর্ষ্যাকুটিল ও সপ্রশংস দৃষ্টির মধ্য দিয়া মূর্ত্তিমতী বিজয়-লক্ষ্মীর মত নয়নতারাকে লইয়া প্রমদা গৃহে ফিরিল।

২

* * * *

এই দেখাই নয়নতারার কাল হইল!

পঞ্চু বিশ্বাসের নিকট প্রমদার ঘন তাগিদেও কলিকাতা হইতে কোন খবরই আসিল না। তা না আসুক, লক্ষ্মণ এবং প্রমদা নয়নতারার সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্তই ছিল। আজ না আসিলেও একদিন যে ঐরূপ কলিকাতা হইতে মোটর বা জুড়ি হাঁকাইয়া তাহাদের ভাবী কুটুম্বেরা নয়নতারাকে "পাকা দেখিয়া" যাইবে এটা তাহারা কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহাদের মেয়ের মত মেয়ে গাঁয়ে ক'টা আছে ?

আর নয়নতারা, ঘরে বাহিরে নিজের রূপের খ্যাতি শুনিয়া নিজের সম্বন্ধে একটু উঁচু ধারণাই পোষণ করিতেছিল। পঞ্চু বিশ্বাসের বাড়ীতে সেই বরটিকে ত' সে দেখিয়াছে। গোলগাল, ধবধবে ফর্সা, চোখে সোনার চশমা, হাতে বাঁধা ঘড়ি ও আংটি, কি সুন্দর পোষাক, আয়নার মত চকচকে জুতো, গায়ে কি সুন্দর আতরের বাস্! বর ত' অমনিই হয়! ঐ বরের সঙ্গে বিয়ে না হইলেও একদিন যে রূপ-কথার কোন রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া তাহাকে ঐ মেঘের ফাঁকটুকু দিয়া নিজের রাজ্যপানে লইয়া যাইবে—এই আশায় নয়নতারার কচি মন উন্মুখ হইয়াছিল।

যাইবার পথে সে রাজপুত্তুরকে রামধনুর ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে বলিবে। কেননা জ্যোৎস্নার খানিকটা গায়ে মাখিয়া লইলে রংটা তাহার রাজপুত্তুরের মতই হইবে এবং আঁচল ভরিয়া একরাশ তারার ফুল তুলিয়া লইবারও তাহার প্রয়োজন। রাজপুত্তুরের কোলে বসিয়া নিজের সব চেয়ে লম্বা কেশটী ছিঁড়িয়া সেই ফুলগুলি দিয়া মালা গাঁথিয়া রাজপুত্তুরের গলায় পরাইয়া দিবে। বিনিময়ে রাজপুত্তুর যেন মুকুটের বড় মাণিকটাতে তাহাকে একবার হাত দিতে দেয়, খাপ্ থেকে চক্‌চকে তলোয়ারটা বাহির করিয়া দেখায় আর পক্ষীরাজের লাগামটা একবারটি তাহার হাতে ছাড়িয়া দেয়! শ্বশুরের রাজধানীর নহবতের রাগিণী নয়নতারার কানে এখন থেকেই রণিয়া উঠিতেছে!

ইহাদের ভাবগতিক কিন্তু জয়ার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে ধূলার ধরার মানুষ—ভবিষ্যতের চেয়ে বর্ত্তমানকেই সে সুখ দুঃখ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়।

স্বামীকে বলে—ওগো, নিশ্চিন্দি হ'য়ে থেক'না, তোমার যেমন থ্যামতা তেমনি একটা পাত্তর দেখ। নয়নীর ভাগ্যে থাকে, গরীবের ঘরেই ওর সুখ হবে। আমরা দুঃখী, কাজ কি আমাদের জমিদার কুটুমে ?

লক্ষ্মণ 'হুঁ—না' করিয়া সারে। বলে, চেষ্টা দেখ্ছি।

দোকানের পুঁজি ভাঙ্গিয়া হা-ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া অপেক্ষা বিনা পয়সায় বড় লোকের ঘরে মেয়ে গছাইয়া ভবিষ্যতের একটা কিনারা করিবার স্থানটাই লক্ষ্মণের মনে এখন শ্রেয় ও প্রেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রমদা রাগিয়া বলে—বোয়ের যেমন কথা! সোনার পিরৃত্তিমেকে আমি বাঁদরের গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারব না।

জয়া হাসিয়া বলে—যত বাঁদর বুঝি গরীবের ঘরেই জন্মায় ঠাকুজ্যি ?

জয়ার তাড়নায় লক্ষ্মণ ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিল বটে কিন্তু মনের মত একটারও খোঁজ পাইল না।

মা ও মেয়েতে সেদিন পুকুরঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল।

জয়াকে সম্বোধন করিয়া পালেদের মেজ'গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ বৌমা, নাত্নীর বিয়ের কোথাও ঠিক ক'রলে ?

ভীতিব্যঞ্জক করুণ সুরে জয়া জবাব দিল—না খুড়িমা, ঠিক কোথাও হয়নি! দেখা শোনা ত কতই হ'চ্ছে, থ্যামতা সে রকম নেই কাজেই মনের মত জুটছে না। তারপর কণ্ঠস্বরে একরাশ মিনতি মাখাইয়া বলিল—দেখ না খুড়িমা, কোথাও যদি তেমন একটি ছেলে পাও; তোমাদের পাঁচজনার মুখ চেয়েও বুকে ভরসা পাই!

সান্ত্বনা দিয়া পাল-গিন্নী বলিলেন—তবে যে লক্ষ্মণ ব'ললে চণ্ডীপুরে কথাবার্ত্তা একরকম ঠিক হ'য়েছে, খালি দেনা পাওনা মিট্‌লেই হয়!

জয়া বলিল—কথা হ'য়েছিল বটে কিন্তু আমিই বারণ ক'রেছি খুড়িমা। পাত্তরটির বয়সও ঢের হবে আর দেখতেও নাকি কুশ্রী। তোমরা ত' দেখ্‌চ খুড়িমা; মেয়েটার মুখ চেয়েই না আমি মত দিতে পারিনি। দু'টা নয় ন'টা নয়, একটাকে গভ্ভে ধ'রেছিনু, তাকেও যদি সুখী ক'র্‌তে না পারনু ত বৃথাই জন্ম! তাই একটু ফুট্‌ফুটে ছেলের কথাই ব'লছিনু।

রাগিয়া পালগিন্নী বলিলেন—তা যখন খরচ ক'র্‌তে পারবে না, তখন অত বাচ-বিচার ক'রলে ত চল্‌বে না। নইলে ছোট্ট টুক্‌টুকে ছেলের কি অভাব ?...

সায় দিয়া জয়া বলিল—সে ত' কথাই খুড়িমা; দেখি, একান্ত জোগাড় ক'ত্তে না পারি, ঐখানেই দিতে হবে—

একগলা জলে গা ডুবাইয়া, মুখে একমুখ জল পুরিয়া সেই জল জিভের ডগা দিয়া সামনের দুইটী দাঁতের ফাঁকে বাহির করিতে করিতে নয়নতারা এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল;—এখন মায়ের শেষ মন্তব্য শুনিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—ইস্, সেখানে বে ক'র্‌লে ত'!—কথাটা শুনিয়া পাশের আর পাঁচজন হাসিয়া উঠিল, হাসিতে গিয়াও জয়ার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং পালগিন্নী বিস্ময়ে অবাক ও কাঠ হইয়া গেলেন।

একটী ঠোঁট্‌কাটা বৌ বলিল—কোথাও স্বয়ংবরা হচ্ছিস্ নাকি তারা ?

মরিয়া হইয়া দৃপ্তভঙ্গিতে নয়নতারা জবাব দিল—দরকার হ'লে ক'র্‌তে হবে বৈ কি।

পালগিন্নী গম্ভীর হইয়া কল্‌সী ভরিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন, জয়া আর একবার মিনতি জানাইয়া স্মরণ করাইয়া দিল—তা হ'লে একটু সন্ধানে থেক' খুড়িমা, আমাদের আর কে-ই বা আছে।

একটু ঠেশ্ দিয়া পালগিন্নী জবাব দিলেন—তোমাদের সুন্দরী মেয়ে ভাবনা কি? আর অমন পঞ্চু বিশ্বেস র'য়েছে!

পথে যাইতে যাইতে দু'একজনকে সামনে পাইয়া পালগিন্নী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—কালে কালে কত হ'ল, পুলি পিঠের ল্যাজ বেরুল!

শ্রোত্রীরা উৎকর্ণ হইয়া বলে—কি হ'য়েছে দিদি ?

শুন্‌বি ত আয়—বলিয়া পালগিন্নী তাহাদের মনে পরম বিস্ময়কর একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল জাগাইয়া গৃহের উদ্দেশে আগাইয়া চলেন।

* * *

দিন যায়।

একটির পর একটি করিয়া ত্রয়োদশ বসন্ত এক একটি বিশিষ্ট লাবণ্য-সুষমায় নয়নতারার তনুলতা মুঞ্জরিত করিয়া তুলিল।

যথারীতি নয়নতারা পড়া ছাড়িল, বরের বাপেদের দুয়ারে দুয়ারে ছুটিয়া লক্ষ্মণ সরকারের "পায়ের সুতা" ছিঁড়িল, প্রমদা ও জয়ার মুখের অন্ন ঘুচিল, প্রতিবাসী মেয়ে পুরুষদের নয়নতারার বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া মাথা ধরিল, গ্রামের শিক্ষিত অবিবাহিত সম্প্রদায় স্থানে-অস্থানে সময়-অসময়ে মৌমাছির গুঞ্জন তুলিল—সমস্তই হইল, কেবল নয়নতারার বর জুটিল না।

মেয়ে দেখিতে আসিলে লক্ষ্মণ বলে—মশাই, এমন মেয়ে দু'চার খানা গাঁয়ে খুজে—

কথা শেষ হয় না, বরের বাপেরা বলে—গেরস্থ ঘরে আমরা রূপ নিয়ে ধুয়ে খাব, না আলমারীতে সাজিয়ে রাখব? আমাদের কানা-খোঁড়া হবে না, গতর থাকবে, কিছু এদিকেও প্রেত্যাশ থাকবে—এমনি হ'লেই যথেষ্ট।

দোকানের তহবিলের পরিমাণ স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ চুপ করিয়া থাকে। তার পরেই খবর দেবার কথা।

সেদিন মারিকদের নন্দর মা, নয়নতারার পিসিকে জিজ্ঞাসা করিল—বলি হ্যাঁগা বড় মানুষের ঝি, নয়নীর কোথায় সম্বন্ধ ক'রলে? ছ্রাবণের ক'টা দিন গেলেই ত' আবার তিন মাস অকাল পড়বে! আর ত' মেয়ে রাখতে পারা যায় না।

প্রমদা জবাব দিল—হয় নি কোথাও ঠিক; পোড়ারমুখোরা চোখের মাথা খেয়েছে! এমন মেয়ে আমার, তবু বলে ট্যাকা চাই। আরে আবাগীর ব্যাটারা, ট্যাকাই যদি দেবো ত' তোদের পায়ে তেল মাখাব কেন? অমন লাট্ সায়েবের ছেলের সঙ্গে বে দিতে পারি!

নন্দর-মার নন্দ কোন কলের বড় মিস্ত্রি। অনেক টাকা মাহিনা পায়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঘর-বাসী হয় নাই। তাহাকে নয়নতারার ফাঁসে জড়াইয়া ঘরবাসী করিবার দুরাশায় নন্দর মা প্রস্তাব করিল—তা গাঁয়েই একটু চেষ্টা চরিত্তির করলে না কেন?

ঝাঁঝাল সুরে প্রমদা বলিল—গাঁয়ে কার কি আছে? বাইরেই যত হাঁক-ডাক, জান্তে ত কিছু বাকী নেই—ভেতরে সব হাঁড়ি-ঠন্-ঠন্! গাঁয়ের মুখে আগুন!

কথাটা নন্দর মার গায়ে লাগিল। বলিল—তা যা ব'লেছ! আমার নন্দ বলে, মা, তুমি এখানে এসে থাক। আমি কত বোঝাই, বলি—না বাবা, তাকি হয়? গাঁয়েই তুই একটু কুঁড়ে তোল্, চেরকাল ত' আর এমনি বাউণ্ডুলে হ'য়ে বেড়ালে চল্‌বে না। তা এবার বোধ হয় মতি ফিরেছে—বলে, মা, ইঁট গড়াব!—বলিয়া আনন্দে-গর্ব্বে দিশেহারা নন্দর মা একগাল হাসিয়া ফেলিল।

যে ছেলে তোমার, নতুন ঘর হ'লে আবার না ব'লে বসে—মাগীটাকে ঘরে এনে রাখব!—বলিয়া নয়নতারার পিসি পুকুর ঘাটের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া ছেলের নিন্দা করাতে প্রমদার গমন-পথের দিকে চাহিয়া সমস্ত শরীরকে বামে ও দক্ষিণে আন্দোলিত করিয়া নন্দর মা মুখে এক প্রকার হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া বলিল—তবু যদি খ্যামতা থাকৃত!

তারপর মুখ ঘুরাইয়া ঘরে ফিরিল।

দুপুর হইতে পাশের বাড়ীতে ছোট বৌ বিভার ঘরে তাসের আড্‌ডা জমিয়াছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে ক্রমাগত কয়েক দান হারিয়া, আর নয়, বাড়ী যাই বলিয়া নয়নতারা উঠিয়া পড়িল।

দাসেদের স্বর্ণ বলিল—কাল একটু সকাল ক'রে আসিস্ তারা—

নয়নতারা বলিল—আমার ত' ঝাড়া হাত পা,—তোর বর না ঘুমুলে ত তুই আর আসতে পারবি না।

স্বর্ণ বলে—এমনি মজা, হ'লে তুইও পারবি না।

তারা বলে—মা-ইরি, দরকার নেই পেরে—

ইন্দিরা বলে—আগে ওর হ'কই বর; সমস্ত রাত ত জেগেই কাঁদে—

বীণা বলে—ঠাকুজি, তোর দুঃখু আর সইতে পারি না ভাই, যতদিন না হয়, তুই আমারটি নিয়ে ঘর-সংসার কর—

স্বর্ণ বলে—হ'লে পর তুই ওরটা নিবি?

তারা বলে—তোদের সব পুরোণো হয়ে যাবে, আমি তখন নতুন পাব!

বীণা বলে—তুই যে ভদ্দিনে পুরোণো হ'য়ে যাবি ভাই!

ইন্দিরা বলে—পাবি ব'লে ত মনে হয় না—এততেও তোর মুখে হাসি আসে!

চোখ নাচাইয়া তারা বলে—হাসি হাসব না ত কি?

হাসির বায়না নিয়েছি।
হাসি আশি টাকা মণ,
হাসি মাঝারি রকম!

বীণা সায় দিয়া বলে—তোমায় নেয়নি কেন যম?

তারা পা বাড়াইয়া বলে—খেতে লুচি আলুর দম!

স্বর্ণ ও ইন্দিরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

তারপর বিভা ঘরে সন্ধ্যা দেখাইতে আসিলে, অপ্রস্তুত হইয়া চারিজনেই ছুটিয়া পালায়।

* * * *

পাশের মাখনহাটি গ্রাম লক্ষ্মণের বাড়ী হইতে পোয়াটাক পথ। সেখানকার উদ্ধব সামন্তের অবস্থা বেশ ভালই যাইতেছিল, জমি জায়গা ছাড়া কিছু তেজারতিও ছিল। সংসারে স্ত্রী,... তিনটি পুত্র ও দুইটি পুত্রবধূ, এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী ছাড়া কেহ ছিল না। তেজারতিতে সুদ আদায় করিলেও আসলে লোকটি কিন্তু মন্দ ছিল না। দুই বেলা হরি-নাম জপিতেন, লোকের আপদে-বিপদে সাধ্যায় সাহায্য করিতেন এবং সংসারে সিকি পয়সা অপব্যয় দেখিলে সেদিন বাড়ীর ত্রিসীমায় কাক-চিল পর্য্যন্ত বসিতে দিতেন না। বড় ছেলেটী চাষ-আবাদ দেখিত, মেজ সুদ আদায় করিয়া বাজার হাট করিত। কেবল তিনি মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন ছোটকে লইয়া।

পাঠশালা হইতেই পাঁচকড়ি মা-সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিয়াছিল। প্রথমে বিড়ি, তারপর তামাক, সিদ্ধি, বোতল শেষ করিয়া এখন গাঁজায় হাত পাকাইতেছিল। ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সে সমান উৎসাহে স্থানে-অস্থানে আড্ডা দিয়া বেড়াইলেও দুই-বেলা খাবার সময়টিতে ঘরে হাজিরা দিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি রাখিত না।

মণ্ডল-গোষ্ঠীতে বিলাসিতার স্থান ছিল না। তাহাতে পাঁচকড়ির কি? প্রয়োজন হইলেই মাতাপিতার বাক্স হইতেই তাহাকে পকেট খরচা চালাইয়া লইতে হইত। গ্রামে 'কাপ্তেন' বলিয়া তাহার যে 'সার্টিফিকেট' প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাহার মাথার চুল হইতে পায়ের নাগরা পর্য্যন্ত দেখিলেই সার্থকতর বলিয়া মনে হইত। বর্ত্তমানে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটু কানাঘুষা চলিতেছিল।

বাপ রাগিয়া বলে—বাইশ বছর তোকে বসিয়ে খাইয়েছি, আর নয়। যে যার রাস্তা দেখ, নয় ত' খোরাকী দিয়ে আমার সংসারে খেতে হবে! বড়—কুড়ি, মেজ—পনের, তুমি—দশ, এখন এই হিসাবেই দাও—

একটুও না ভাবিয়া পাঁচকড়ি জবাব দেয়—মনে কর না ছ'মাসের খোরাকী আমার আগাড়ী পেয়েছ—এখন ওদের কাছ থেকে আদায় ক'রে সংসার চালাও!

রাগিয়া বাপ বলে—তোকে দিতে হবে না, তুই আমার বাড়ী থেকে বেরো হারামজাদা। আজ তোকে কে ভাত দেয় দেখ্‌ছি!

পাঁচকড়ি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া যায়।

বাপ বধূদের ও স্ত্রীকে শাসাইয়া বলে—আজ ওকে যে ভাত দেবে, সে আছে আর আমি আছি। কুরুক্ষেত্তর ক'রব তা'হলে।

কিন্তু সংসারে যে বয়াটে ছেলের মা থাকে, তার কি কথনো ভাতের অভাব হয়? এ ক্ষেত্রেও হয় নাই, অধিকন্তু মণ্ডল-গিন্নী ভিতরে ভিতরে পাঁচকড়ির বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধানও করিতেছিলেন।

সন্ধান পাইয়া লক্ষ্মণ এইখানে আসিয়া টোপ্‌ ফেলিল। কর্ত্তার কাছে তাড়া খাইয়া লক্ষ্মণ গিন্নীর শরণাপন্ন হইল। গিন্নী তাহাকে অভয় দিয়া, একদিন শীতলা পূজা দিতে গিয়া নয়নতারাকে দেখিয়া আসিলেন। মেয়ে দেখিয়া তিনি জয়া ও প্রমদাকে আশ্বাস দিয়া আসিলেন যে, নয়নতারাকে তিনি বৌ করিবেন-ই!

বুঝাইয়া-শুঝাইয়া, কাঁদিয়া, মাথা খুঁড়িয়া গিন্নী মণ্ডলের মত করাইলেন। মণ্ডল মেয়ে দেখিয়া ভাবিলেন 'দেখা যাক, সুন্দরী বৌ পাইয়া ব্যাটা যদি টিট্‌ হয়!' কাজেই দেনা-পাওনার হাঙ্গামা লক্ষ্মণকে বিশেষ সহ্য করিতে হইল না,—সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

জয়া কিন্তু বলিল—হ্যাঁ ঠাকুর্‌ঝি, ছেলের চরিত্তির ত' শুন্‌ছি ভাল নয়! মাতাল, তার ওপর আরো উপসগ্য র'য়েছে। মেয়েটা চোখের জল সার ক'র্‌বে না ত?

প্রমদা জবাব দিল—হ্যাঁ,—তুমিও যেমন, বেটাছেলের ও দোষ ধত্তব্যই নয়। বয়সকালে একটু আধটু সবারই থাকে, আবার আপনিই শুধ্‌রে যায়।

অন্যমনস্কভাবে জয়া সায় দেয়—গেলেই ভাল!

নয়নতারা আর কথা কয় না। ভাবে, যা হয় হাঙ্গামা চুকিয়া যাক্‌। নিত্য এ জ্বালাতন ভাল লাগে না। মা-বাপের অধর্ম্ম ভোগ, ঘরে বাহিরে তারও কম নয়!

বিবাহের দিন স্থির হইয়া নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত সারা হইয়া গেল। এদিকে বার পাঁচ-সাত ভেদ বমি করিয়া লক্ষ্মণ লোকান্তরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সরিয়া পড়িল।

অনেকে বলিল—এক বৎসর কালাশৌচ।

টোল হইতে বিধান লইয়া অগ্রহায়ণের শেষেই কিন্তু বিবাহ হইয়া গেল। অরক্ষণীয়া সকলেরই গলার কাঁটা হইয়া বিঁধে!

বর-ক'নে চলিয়া গেলে শূন্য ঘরে পড়িয়া ননদ-ভাজে খুব কান্নাই কাঁদিল। কাঁদিয়া বুক হাল্কা করিতে চাহিল কিন্তু বুঝিল না, যে-পাথর লক্ষ্মণ চাপাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, চোখের জলে তাহাকে গলান সারা জীবনে ঘটিয়া উঠিবে না।

ফুলশয্যার রাত্রে পাঁচকড়ি নয়নতারাকে প্রথম প্রশ্ন করিল—হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে কার সঙ্গে তোর বেশী ভাব ছিল!

নয়নতারা বলিল—ভাব আবার কার সঙ্গে থাকবে!

হাসিয়া পাঁচকড়ি বলে—তবে যে শুন্‌লুম চৌধুরীদের ফটুকের সঙ্গে তোর গলায় গলায় পীরিত ছিল।—

নির্ব্বাক নয়নতারা পিছন ফিরিয়া শুইল।

পাঁচকড়ি তাহাকে সাধিল, ভয় দেখাইল, টানাটানি করিল, রাগ দেখাইল, শেষে গালাগালি দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া যাইতে বলিল।

নয়নতারা নিঃশব্দে বিছানা হইতে নামিয়া মেঝেয় একখানি মাদুর বিছাইয়া, সেই দারুণ শীতে আঁচল মুড়িয়া শুইয়া পড়িল।

ভোর রাত্রে আর একবার পাঁচকড়ি নয়নতারাকে আয়ত্তে আনিবার বৃথা চেষ্টায় নীচে তাহার শয্যা-পার্শ্বে গিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাবগতিক দেখিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া, চোখ লাল করিয়া শুধু 'আচ্ছা' বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারার রূপের পাড়াভরা সুখ্যাতি পাঁচকড়ির অন্তরে গর্ব্বের ভাব আনিলেও আসলে কিন্তু সে তৃপ্তি পাইতেছিল না। অধিকারী হইয়াও যখন শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া রূপের অধিকারিণী আত্মদান করিয়া তাহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে দিল না, তখন পাঁচকড়ির মত লোকের রাগ হইবারই কথা! বাহিরে তাহারা অরূপের সেবা করিতে পারে কিন্তু ঘরে সুরূপে তাহাদের পা না চাটিলে তাহাদের মন উঠে না!

নয় দিনের দিন যখন নয়নতারার বাপের বাড়ী ফিরিবার কথা উঠিল তখন পাঁচকড়ি মাকে বলিল—হ্যাঁ মা, আর সেখানে যাবারই কি দরকার!

মা বুঝিলেন—ছেলে রূপসী বৌকে কাছ-ছাড়া করিতে নারাজ! হাসিয়া বলিলেন—আহা সেকি কথারে, বিয়ের ক'নে বাপের বাড়ী ফিরবে না? এই সেদিন অত বড় সব্বনাশ হ'য়ে গেল; মা আর পিসি ওর হয়ত' রাস্তার ধারে ব'সে আছে। এখন যাক্‌, দরকার হ'লে নিয়ে আসব।

কথাটা পাঁচকড়ির ভাল লাগিল না। ঝাঁঝিয়া বলিল—তুমি জান না মা,—ওসব নষ্ট-দুষ্টু মেয়ে মানুষের বাপের বাড়ী না যাওয়াই ভাল। গিয়ে খালি চলাবে বইত' নয়।

মা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া ছেলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই নয় দিনে ছেলে-বৌয়ের মধ্যে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। অন্ততঃ অমন রূপে-গুণে লক্ষ্মী মেয়ের সংস্পর্শে সবারই হওয়া উচিত।

পাঁচকড়ি তাঁহার সে সন্দেহ দূর করিয়া বলিল—এই বয়সে ও অনেক কীর্ত্তি করে এখন মিট্‌মিটে ডান সেজেছে মা! কিছু আর শুন্‌তে বাকী নেই আমার। বরং এখানে

থাকলে লাখি খাঁ্যাংরা খেয়ে যদি ঢিট্ হয়! তেজ ত' তুমি দেখনি!

মা সব বুঝিলেন। শিহরিয়া বলিলেন—চুপ চুপ, ও কথা বল্‌তে নেইরে। এক-বাড়ী কুটুম; তুই এখন এখান থেকে যা। কাকে কি ব'ল্‌তে হয় শিখ্‌লিনি এখনো? বৌমা আমার মা লক্ষ্মী!

পাঁচকড়ি হাসিয়া, ঘড়ির দিকে চাহিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য "ড্রেস-চেঞ্জ" করিতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

মণ্ডল গিন্নী একান্তে পাইয়া নয়নতারার দুইটী হাত ধরিয়া অনুযোগ করিল—তোমায় বরণ ক'রে ঘরে তুলনু মা, তবু ছেলে আমার ব'য়ে যাবে! হতভাগা ছেলে আমার; তার ওপর রাগ করিস্‌নি,—শেষে তোকেই ভুগতে হবে। বুঝি বেড়াতে বেরুচ্ছে—যা, মা—যা, এই বেলা ঘরে যা, বাপের বাড়ী যাবি একবার দেখা ক'রে আয়। মা, সোয়ামীর কাছে মেয়ে মানুষের নীচু হ'য়েই থাকৃতে হয়, তাতে লজ্জা নেই, যা—বলিয়া তিনি প্রায় ঠেলিয়াই নয়নতারাকে পাঁচকড়ির ঘরের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

আয়ত করুণ চোখ দুটী শাশুড়ীর চোখে একবার তুলিয়া ধরিয়া ম্লান হাসিয়া, বস্ত্রাঞ্চল গুছাইয়া নয়নতারা বাহিরে যাইতে, মণ্ডলগিন্নী মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশে মানত করিলেন।

একখানা আয়নার সামনে মুখটা উঁচু করিয়া সুসজ্জিত পাঁচকড়ি তখন মুখের উপর দুই হাতে একখানা রুমাল ঘসিয়া মুখ প্রায় রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নয়নতারা প্রণাম করিয়া উঠিয়া হাসিয়া বলিল—আমি যাচ্ছি তা হ'লে—

এত কাণ্ডের পরও নয়নতারা যে তাহাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বিদায় লইতে আসিবে ইহা পাঁচকড়ি আশা করে নাই। তাই একটু চঞ্চল হইয়া বলিল—তা, হাঁ—আচ্ছা যাচ্ছ?—আমায় নিয়ে চল না—

অব্যক্ত একটা দুঃসহ ব্যথায় নয়নতারার সারা অন্তরটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামীর এমনি আদর, এমনিতর অনুরোধ স্ত্রীলোকের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয়, কত বড় সৌভাগ্যের পরিচায়ক নয়নতারার তাহা অবিদিত ছিল না। তাহার অদৃষ্টে সেই সুযোগ আসিল বটে কিন্তু কত বড় ব্যঙ্গের বেশে আসিল, তাহা সে সারা অন্তর দিয়াই অনুভব করিল। বুকখানা তাহার বিরাট শূন্যতায় হাহাকার করিয়া উঠিল। কঠিন হইয়া সে জবাব দিল—কেন, পাহারা দিতে নাকি?

পাঁচকড়িও আঘাত পাইল। নয়নতারার হঠাৎ আবির্ভাবে সে ভাবিয়াছিল—অন্ততঃ আজিকার দিনটা সম্ভাষণে প্রীতি-মধুর হইয়া উঠিবে। তাই আঘাতটা গায়ে না মাখিয়া সে নয়নতারার লাবণ্যোচ্ছল তনু-লতার পরশ-প্রার্থনায় তাহার দুইটি হাত নিজের হাতে টানিয়া ধরিল। মুহূর্ত্তের জন্য নয়নতারার সারা দেহ অপূর্ব্ব উন্মাদনায় আকুল হইয়া, অবশ হইয়া লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের কাছে উন্মুখ পাঁচকড়ির প্রসাধন-সুন্দর মুখ হইতে একটা বিকট দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া নিমেষে নিজেকে মুক্ত করিয়া নয়নতারা দারুণ ঘৃণায় ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লালসা-দীপ্ত শার্দ্দূলের দৃষ্টি লইয়া পাঁচকড়ি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নয়নতারার গমনপথের দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল।

* * *

পাঁচকড়ির উচ্ছৃঙ্খল গোপন অত্যাচার তাহার প্রথম যৌবনের অটুট স্বাস্থ্যসম্পদের তলায় এতদিন চাপা পড়িয়া ছিল। কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার মত বিবিধ কুৎসিত ব্যাধি তাহার শরীরকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়াও এতদিন বাহিরটা ঠিক রাখিয়াছিল। এবার সবগুলি একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

বিবাহের কিছু পূর্ব্ব হইতে, কি লোভে জানি না, মায়ের পরামর্শে পাঁচকড়ি ভাল হইতে চেষ্টা করিল। দিন কয়েক ছিলও ভাল। তাহার রকম দেখিয়া বন্ধুরা তামাসা করিল—কি রে, একেবারে যে গুড্ বয়্! কি মতলব বাবা!

পাঁচকড়ি বলিল—জন্মাবধি ব্যাড্ বয়ের পার্ট রিহার্স্যাল দিয়ে আসছি, এবার দিন কতক গুড্ বয়ের-টা ট্রেই করি। নেমন্তন্নে চাট্‌নি খাওয়া হে।

বন্ধুরা বলে—যা'হক, শেষ-রক্ষা ক'র।

মা ভাবিলেন—ছেলের মতি ফিরিয়াছে। পাঁচটি পয়সা কপালে ঠেকাইয়া তিনি তুলিয়া রাখিলেন—হরির লুটের জন্য!

হাসিয়া কর্ত্তাকে গিয়া বলিলেন—তোমার ছেলে সত্যি এবার ভাল হবে গো! এইজন্যেই বে' দেবার আমার এত তাড়া।

মণ্ডল স্তিমিত চোখে বলিলেন—যদি ভাল হয় ত' মনে কচ্ছি বিয়ের কিছু টাকা দিয়ে ওর শ্বশুরের দোকানটায় ওকে বসাব। দোকানখানা চ'লছিল ভাল।

তারপর বিবাহ হইয়া গেল। বৌ দেখিয়া পাঁচকড়ি খুব খুশীই হইল। আর একবার তার ইচ্ছা হইল—দিনকতক "গুড্ বয়" হইয়া দেখিবে। কিন্তু সেই বৌ যখন নয় দিন তাহার বাড়ীতে থাকিয়া পাড়াশুদ্ধ লোকের সুখ্যাতি কুড়াইয়া কেবল তাহারই বুকে দাগা দিয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন তাহার আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। কিন্তু সে খানিকক্ষণের জন্য। তারপরই যেন নয়নতারাকে শাসন করিবার জন্য পাঁচকড়ি অসম্ভব হিংস্র হইয়া উঠিল। আগে সে আখ্ড়ায় ব্যাড্ বয়ের পার্ট রিহার্স্যাল দিত এখন আসরে নামিল। এবং পরে শয্যা গ্রহণ করিল।

মা প্রমাদ গণিলেন, মণ্ডল গুম হইয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

জয়া সব শুনিয়া কাঁদিয়া বলে—ঠাকুর্‌ঝি, কি হবে?

প্রমদা বলে—হবে আবার কি? অসুখ ক'রেছে ভাল হ'য়ে যাবে। অসুখ আর কার না হয়!

জয়া বলে—না ঠাকুর্‌ঝি, শুনলুম খুব বাড়াবাড়ি। তুমি একবার যাও

প্রমদা ছোট একটি পুঁট্‌লিতে আধ সের মিছরি, দুইটা বেদানা, গোটাচারেক কমলালেবু বাঁধিয়া পাঁচকড়িকে দেখিতে গেল; জয়া হরির তলায় লুটাইয়া পড়িল আর সব দেখিয়া শুনিয়াও নয়নতারা তাস হাতে করিয়া ছোট বৌ বিভার ঘরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

সারাদিন গেল, নয়নতারার পিসি ফিরিল না। জয়া রাস্তার পানে চাহিয়া সদরদরজায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। নয়নতারা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি এক প্রহরের পর প্রমদা ফিরিয়া জানাইল—ব্যারাম খুব শক্ত। দুইজন ডাক্তার অনবরত বসিয়া আছে। পাঁচকড়ির মা ত' পাগলের মত হইয়া গিয়াছে—কচি বৌ দুইটা আর কয়দিক সামলাইবে। কাল ভোরেই আবার তাহাকে যাইতে হইবে এবং বোধ হয় দু' একদিন থাকিতেও বা হয়!

সকালবেলা যাইবার সময় জয়া বার বার করিয়া বলিয়া দিল—কেমন থাকে ঠাকুর্‌ঝি, খবর দিও,—আমি হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকব।

পাঁচকড়ির অসুখের কথা পাড়ার সবাই শুনিয়াছিল। দুই একজন সহৃদয়া প্রতিবেশিনী 'আহা' বলিয়া জয়াকে প্রবোধ দিতে আসিয়া হালটা মালুম করিয়া গিয়াছে। পুকুরঘাটে স্নানার্থিনীগণকে তাক্ লাগাইয়া দিয়া পালেদের মেজ'গিন্নী চোখ কপালে তুলিয়া ও মুখ সরু করিয়া বলিল—গণকারটা যা বল্লে, তাই হ'ল বাপু! এখনো ছ'মাস হয় নি!

দালালদের সৈরভ বলে—কি ব'লেছিল গা সই-মা!

ঘাটশুদ্ধ সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠে।

পালগিন্নী বলে—সেবার একজন গণকার আসেনি! সবাই হাত-টাত দেখালে, ওষুধ-টষুধ পেলে, নয়নীর-মা নয়নীর হাত দেখিয়ে বল্লে 'দেখত বাবা, কোথাও ত' মেয়েটার কিনারা হ'চ্ছে না, আর কদ্দিন ভোগাবে?' হাত দেখে গণকার বল্লে—'এক মাসের ভেতরেই বিয়ে হবে—।' তারপর নয়নীকে নিয়ে নয়নীর মা চ'লে যাবার পর মুখ সিঁটকে গণকার বল্লে, 'ইস্,—হলদে কাপড় ঘুচ্‌বে না'।

কথাটা শুনিয়া সবাই শিহরিয়া উঠে।

বিভা বলে—সোয়ামীর অমন ব্যারাম, তা মেয়ের একটু হেলদোল আছে! দিব্বি খাচ্চে-দাচ্চে, আর তাস খেলে ইয়াকি দিয়ে বেড়াচ্ছে!

পালগিন্নী ঘাটের পথটায় একবার চোখ ফিরাইয়া, মুখ মচ্‌কাইয়া বলিলেন—ওতে কি আর পদার্থ আছে? কলও ঘনিয়ে এসেছে, দেখনা—।

কদমতলায় রোদ পোয়াইতে বসিয়া অবিবাহিত সম্প্রদায়ও টিপ্পনি কাটিতে থাকে।

জহর বলে—অমন মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিলে; ওই কি ওর উপযুক্ত হাস্‌ব্যাণ্ড? কলকতায় জন্মালে কোন ব্যারিষ্টার কি জমিদার লুফে নিত!

যুগল বলে—তোমরাও ত' নিতে পার্‌তে হে! লক্ষণ সরকার যখন গাঁ শুদ্ধ লোকের পায়ে তেল মাখিয়ে বেড়িয়েছে—তখন মুদির কথা কি কেউ গায়ে মাখ্‌লে! থাক্‌ত তার দু'দশ হাজার, কত ছেলে শুদ্ধ বাপ তার পায়ে আছড়ে পড়্‌ত। এখন আর ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

গজেন কলেজে পড়ে। সে বলে—তখন অতটা খেয়াল হয়'নি হে, এখন হ'লে সব্বার অমতেও আমি ওকে 'ম্যারি' করতুম। ওর 'লাইফ'টাও 'স্পয়েল্ড' হতনা। আমার 'লাইফ'টাও 'ফিল্ড্ আপ্' হ'ত।

বাঞ্ছা বলে—'গুড্ লাক্' থাকা চাই হে!—

যুগল বলে—"নন্ বাট্ দি ব্রেভ্ ডিজার্ভস্ দি ফেয়ার"—

জহর বলে - তাই এখন যে ব্যাধামে প'ড়েছে ছোক্‌রা, কি হয় বলা যায় না।

গজেন বলে—তাহ'লে আমরা "ভিলেজ ইয়ংমেন্ এসোসিয়েসন্" থেকে তুমুল আন্দোলন তুলব—"উইডো ম্যারেজের" জন্যে!

ওদিকে পাঁচকড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রমদা সেই যে গিয়েছে তিন দিন হইল এখনো ফিরে নাই। জয়া পাড়ার এক বর্ষীয়সী বিধবাকে নয়নতারার কাছে রাখিয়া কনিয়াড়ার শিবের মন্দিরে "হত্যা" দিয়াছে;- সেও আজ দুইদিন হইল।

পাঁচ জনার 'আহা' 'উহু' প্রভৃতি সমবেদনার জ্বালায় নয়নতারা পাড়া বেড়ান বন্ধ করিয়াছে।

আজ অনেক দিনের পরে নয়নতারা ঘরে বসিয়া সেলায়ের বাক্সটা পাড়িল, কিন্তু বার-দুই-তিন হাতে সুচ ফুটিতে একখানা বই লইয়া বসিল।—এ বইখানি সে স্কুলে 'প্রাইজ' পাইয়াছিল।' অনেকক্ষণ বসিয়াও কিছু অর্থ-বোধ না হওয়াতে বই মুড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আজ তাহার নিজের অবস্থাটাই ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। জীবনেতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠার প্রতি ছত্রটী স্মৃতিপথে জাগিয়া তাহাকে এক বিরাট রিক্ততার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই দেখাইতে পারিল না। আজ সে অনুভব করিল—দিনে দিনে তিল তিল করিয়া বেদনার কি কঠিন পাহাড়ই তাহার বুকের মধ্যে জমাট বাঁধিয়াছে অজ্ঞাতে, তাহার হাসিয়া বেড়ান'র তলে তলে। আজ সময় বুঝিয়া একটা দুর্নিবার রোদনবেগ সারাটী দেহ তার আন্দোলিত করিতেই সে চট্ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল!

বাহিরে দাঁড়াইয়া সে উৎকর্ণ হইয়া দূরাগত একটা কাল্পনিক ক্ষীণ শব্দের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিল একাগ্রমনে—কিন্তু সে বৃথা! আজ তাহার মনে পড়িল শ্বশুর-বাড়ীর কথা। স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী, বড়জা, পিসিমা —আজ না জানি, একটা লোককে ধরিয়া রখিবার জন্য তাহারা যমের সঙ্গে কি সংঘর্ষই বাধাইয়া তুলিয়াছে। মনে হইল সেও একবার যায়।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল তাহা নয়নতারার স্মরণে আসিল না। সচেতন হইয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল—আজ শূন্য বাড়ীটা তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজার মা সন্ধ্যার সময় শুইতে আসে—কিন্তু সন্ধ্যারও ত' এখনো দেরী রহিয়াছে। ততক্ষণ সে একেলা থাকিতে পারিবে না। বিভাদের বাড়ী যাইবার জন্য সে ঘরে চাবি দিতে যাইতেছিল, সহসা উচ্চ আর্ত্তনাদে ফিরিয়া দেখিল—তাহার পিসিমা বিস্রস্ত কেশ-বাসে আসিয়াই উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িল।

চোর পড়িলে আধ ঘণ্টার মধ্যে যেখানে একজনার সাড়া পাওয়া যায় না, সেখানে নয়নতারার পিসির ফিরিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল সারা গাঁ তাহাদের উঠানে আসিয়া জমিয়াছে। সদর বাড়ীতে নন্দর-মার গলা শোনা গেল—হবে না, দর্পহারী মধুসূদন কি নেই?

নয়নতারা খানিকক্ষণ অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পিসিমার পানে চাহিয়া হঠাৎ 'মাগো'—বলিয়া তাহার বুকে আছাড়িয়া পড়িল।

তখনো জয়া শিবের মন্দিরে জামায়ের আয়ু প্রার্থনায় 'হত্যা' দিয়া পড়িয়াছিল।

কালিদাসের রঘুবংশে ভরত বড় না লক্ষ্মণ বড় ?

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণে ভরত লক্ষ্মণের অগ্রজরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। 'মহাবীর চরিত', 'উত্তর চরিত', 'অনর্ঘ রাঘব', 'ভট্টিকাব্য', প্রভৃতি গ্রন্থেও ভরতের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—কেবল মাত্র কালিদাসই এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম সাধন করিয়াছেন দেখিতে পাই। 'রঘুবংশ'এর আলোচ্য অংশ গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভরত অপেক্ষা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই সর্ব্বতোভাবে কবির অভিপ্রেত। অবশ্য জন্ম-প্রকরণে কবি এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত করেন নাই—প্রথম একটী শ্লোকে ভরতের জন্ম এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে একত্রে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে কে বড়, কে ছোট, অনুমান করা কঠিন; বরং লক্ষ্মণের পূর্ব্বে ভরতের জন্ম বিবৃত হওয়ায় ভরতকেই বড় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র। কারণ রাম লক্ষ্মণাদির বিবাহ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"পার্থিবীমুদবহদ্রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম্।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধ্বজসুতে সুমধ্যমে ॥"

(১১—৫৪)

অর্থাৎ "রঘু-কুল-তিলক রাম পার্থিবী সীতাকে বিবাহ করিলেন, তৎকনিষ্ঠা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণ এবং যে বীর্য্যবান্ দুইজন তাঁহাদের অনুজ ছিলেন, তাঁহারা সুমধ্যা কুশধ্বজ-তনয়াদ্বয়কে বিবাহ করিলেন"।* ত্রয়োদশ সর্গ হইতে আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল—

"দুর্জাতবন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃ প্রহর্ত্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে ॥"

(১৩—৭২)

উক্ত শ্লোকে রামচন্দ্রের অযোধ্যাপ্রত্যাগমন এবং ভরতাদির সহিত পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত নবীন দাসের বা অন্য কাহারও অনুবাদ হাতের কাছে না থাকায়, আমরা শ্লোকটীর স্বকৃত গদ্যানুবাদই প্রদান করিলাম। "এই ভল্লুক এবং বানরের অধিপতি আমার বিপদকালের বন্ধু; এই পৌলস্ত্য সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তী যোদ্ধা ছিলেন—রঘুনন্দন আদর করিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে, ভরত, লক্ষ্মণকে অতিক্রম করত উভয়কে বন্দনা করিলেন।"

মল্লিনাথ 'সঞ্জীবনী' টীকায় 'ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণং'-এর এইরূপ অর্থ করেন—"অনুজমপি ব্যুৎক্রম্য, আলিঙ্গনাদিভিরসম্ভাব্য ভরতঃ ববন্দে"।

কিন্তু এরূপ অর্থ আদৌ সমীচীন বোধ হয় না; কারণ লক্ষ্মণকে অতিক্রম করত সুগ্রীব ও বিভীষণকে বন্দনা করায় লক্ষ্মণেরও প্রণামাধিকার সূচিত হইতেছে। নতুবা 'ব্যুৎক্রম্য' কথাটির সার্থকতা কি? S. Roy ও বলেন, "Indeed Bharat cannot be accused of 'ব্যুৎক্রম' unless Lakshman is supposed to be his senior." p. 144.

৭৩ সংখ্যক শ্লোকে কালিদাস এই গোলমালের একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন—

"সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণ-ব্রণ-কর্কশেন ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥"

(১৩—৭৩)

অর্থাৎ "তারপর (ভরত) সৌমিত্রির (লক্ষ্মণের) সহিত সঙ্গত হইল। তিনিও অবনত মস্তক ইহাকে উঠাইয়া, ইন্দ্রজিৎ-প্রহরণকৃত ব্রণে কর্কশ বক্ষঃস্থল দ্বারা ইহার বাহু মধ্যকে যেন নিপীড়িত করিয়াই গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।" †

এই শ্লোকের অন্বয় ও টীকা লইয়া মল্লিনাথের সহিত আমাদের স্থানে স্থানে বিশেষ মতভেদ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'সঞ্জীবনী' হইতে সেইরূপ কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীঞ্চ পরন্তপঃ। অভিবাদ্য ততঃ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ ॥' ইতি ভরতস্য কানিষ্ঠ্যং প্রতীয়তে। কিমর্থং জ্যৈষ্ঠ্যমবলম্ব্য অনার্জবেন শ্লোকো

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদ।

† শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুবাদ।

ব্যাঘাতঃ? সত্যম্। কিন্তু রামায়ণ-শ্লোকার্থঃ টীকাকৃতোক্তঃ শ্রূয়তাম্ :—"ততো লক্ষণমাসাদ্য ইত্যাদি শ্লোকে আসাদনং লক্ষ্মণ-বৈদেহ্যোঃ, অভিবাদনং তু বৈদেহ্যা এব। অন্যথা পূর্ব্বোক্তং ভরতস্য জ্যৈষ্ঠ্যং বিরুধ্যতে" ইতি।"

মল্লিনাথ রামায়ণের সহিত সমন্বয়রক্ষার্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা একান্ত অনৃজু ও কষ্টকল্পিত বলিয়াই অনুমান হয়। মল্লিনাথের অন্বয় অনুসারে 'সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে সঃ' এইখানে একটী বাক্য সারা করিয়া 'নম্রশিরসং এনং ভৃশমালিলিঙ্গ' ইত্যাদি অপর বাক্যটী আরম্ভ করিলে কোন ক্রমে ভরতের জ্যেষ্ঠত্ব বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে অর্থ কদাচ সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আধুনিক টীকাকারদের মধ্যে Prof. Nandargikar প্রভৃতিও এবিষয়ে মল্লিনাথকে সমর্থন করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ শ্লোকটীর এইরূপ অন্বয় করা আবশ্যক, "তদনু (ভরতঃ) সৌমিত্রিণা সংসসৃজে। সঃ সৌমিত্রিঃ চ নম্রশিরসম্ এনং (ভরতং) উত্থাপ্য রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণব্রণকর্কশেন উরঃস্থলেন অস্য (ভরতস্য) ভুজমধ্যং ক্লিশ্যন্নিব ভৃশম্ আলিলিঙ্গ।"

এইরূপ অন্বয়ই যদি কবির অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, লক্ষ্মণ ভরত অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—বেশ মানিয়া লইলাম লক্ষ্মণ ভরত অপেক্ষা বড়; কিন্তু কালিদাস এ আদর্শ পাইলেন কোথা হইতে? আর মল্লিনাথই বা রামায়ণের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষার্থ এরূপ অনৃজু ব্যাখ্যা করিলেন কেন? উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া যাইতেছে;—মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণের প্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা কখনও চিরন্তন বিশ্বাসের বিরুদ্ধতাচরণের পক্ষপাতী নহেন; তদ্ভিন্ন যেখানে কবির উক্তির সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতের ঐক্য না হয়, সেখানে একটা টানাবোনা কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যা খাড়া করিতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। আমাদের বিবেচনায় কবিকে কোন দিক দিয়া সমর্থন করা যায় কি না তাহা না দেখিয়া, কেবলমাত্র সমন্বয়ের অনুরোধে এইভাবে তাঁহার অভিপ্রায়কে খর্ব্ব করা টীকাকারের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। রামায়ণে ভরতকে লক্ষ্মণ অপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে বলিয়া যে 'রঘুবংশ'এও যেন তেন প্রকারে তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে তাহার কি সঙ্গত কারণ আছে? ফলতঃ কালিদাসকে সমর্থন করিবার অন্য উপায় যথেষ্ট আছে।

প্রথমতঃ—কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ভাস লক্ষ্মণকে ভরতের জ্যেষ্ঠরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ভাসকৃত 'প্রতিমা' নাটকের সপ্তম অঙ্কে দেখিতে পাই—

"ভরতঃ—আর্য্য, অভিবাদয়ে।

লক্ষ্মণ—এহ্যেহি বৎস! দীর্ঘায়ুর্ভব।"

এস্থলে কোনরূপ বিকৃত অর্থ করিবার সুযোগ আছে কি? ভাসের 'স্বপ্ন বাসবদত্ত' নাটকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় কালিদাসের উপর ভাসের প্রভাব কত অধিক তাহা প্রভূত যুক্তিতর্ক সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, কালিদাস হয় ত ভাসের আদর্শেই লক্ষ্মণকে ভরতের অগ্রজরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ভাসের রচনাবলী এতদিন পর্য্যন্ত অপ্রচলিত থাকায় মল্লিনাথ সম্ভবতঃ প্রতিমা নাটক পড়িবার সুযোগ পান নাই, কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া অবান্তর যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—'পদ্মপুরাণ' মতেও লক্ষ্মণ ভরতের অগ্রজ; বনগমনোন্মুখ লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া এখানে সুমিত্রা বলিতেছেন, "গচ্ছ ত্বং ভরতাগ্রজ"। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মহাশয়েরা সব কূল বজায় রাখিয়া 'ভরতাগ্রজ এ'র এইরূপ অর্থ করেন;—"ভরতঃ অগ্রজঃ যস্য"; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়দের শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার গুণটী যে বিলক্ষণ আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং কেহই এ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া লইবেন কি না সন্দেহ! এমনও হইতে পারে, হয় ত কালিদাস 'পদ্মপুরাণ' মতেই লক্ষ্মণকে ভরতের অগ্রজরূপে কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে অনেকের মতে 'পদ্মপুরাণ'এর রচনাকাল কালিদাসের পূর্ব্বে, কালিদাসের পুস্তকাবলী হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।* শকুন্তলার আখ্যান-

* ম্যাক্‌ডোনেল্ কৃত History of Sanskrit Literature দ্রষ্টব্য।

ভাগ 'মহাভারত' হইতে গৃহীত হইলেও খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে ইহাতে কালিদাস 'পদ্মপুরাণ'এর অনুসরণ করিয়াছেন মনে হয়; যেমন, 'পদ্মপুরাণ'এ দুর্ব্বাসার অভিশাপের কথা আছে, শকুন্তলাতেও আছে; 'পদ্মপুরাণে' অনসূয়া-প্রিয়ংবদা আছে এবং প্রিয়ংবদা কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার ক্রোধ-প্রশমনের কথা আছে—কালিদাসেও তাহাই আছে; পক্ষান্তরে মহাভারতে দুর্ব্বাসার বা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার নাম-গন্ধও নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।—'বিক্রমোর্ব্বশী'তেও কালিদাস পদ্মপুরাণের অনুগামী হইয়াছেন; সুতরাং এরূপ অনুমান কি একেবারেই অসঙ্গত যে কালিদাস 'পদ্মপুরাণ' মতে লক্ষ্মণকে ভরতের অগ্রজরূপে দাঁড় করাইয়াছেন? *

সর্ব্বশেষে বক্তব্য যে, কাহারও সম্মানহানি করা বা গায়ের জোরে একটা মনগড়া 'থিওরি' খাড়া করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বহুদিন হইতেই 'রঘুবংশ'এর এই অংশটুকু লইয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে; আমি আমার বিশ্বাস ও যুক্তিমত ইহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার পাইয়াছি তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও বড় গলা করিয়া কিছু বলিবার অধিকার আমার খুব বেশী নয়, কাজেই যোগ্যতর ব্যক্তি পরে ইহা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমি বিশেষ আনন্দের সহিতই তাহাতে যোগ দিতে প্রস্তুত রহিলাম।

রূপ-কমল

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

মানস-সরসী নীরে সুষমার স্বর্ণ শতদল
অস্ফুট কলিকা যবে কল্পনার কনক-মৃণালে,
জননী-জরায়ুসম কোরকের কুক্ষি-অন্তরালে
গুমরি মরিতেছিল বিকাশের বেদনা-বিহ্বল।
শিয়রে সরসী-জল ছল ছল তরঙ্গ-উছল
সোহাগে গাহিতেছিল কলস্বরে জাগরণী গান,
দুয়ারে হানিতেছিল আলোকের আকুল আহ্বান,
মলয়ের সুখস্পর্শে সারা অঙ্গ শিহর চঞ্চল।
মধুলোভী অলিদল গুঞ্জরিয়া প্রণয়ের গীতি
মুখ বৃথা চুমি হুতাশে ফিরিত নিতি নিতি॥

আলো-ছায়া-মায়াভরা জীবনের গোধূলি লগনে
স্বপন রূপার কাঠি পদতলে বসিয়া বুলায়,
চেতনা সোনার কাঠি লঘু করে শিয়রে দুলায়,
হিল্লোলিত দেহ-মন কভু সুপ্তি কভু জাগরণে,
শুভ্র শশিলেখা সম তুমি সেই যুগ সন্ধিক্ষণে,
সুবর্ণ-চম্পক-কলি সমতুল করাঙ্গুলি দিয়া
অস্ফুট কমল-কলি যেই হাসি ছুঁইলে আসিয়া,
সুষমার শতদল বিকশিল বিচিত্র বরণে।
তোমারি ফোটান ফুল তব তরে আনিয়াছে কবি,
লহ অর্ঘ্য—ধন্য হোক তব কর-পরশন লভি॥

* অধুনা লুপ্ত 'জন্মভূমি' পত্রিকায় 'কালিদাস ও পদ্মপুরাণ' সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে; অল্প কয়েক বৎসর হইল 'ভারতবর্ষে' 'ভাস ও কালিদাস' লইয়াও কিছু বাহির হইয়াছে। আবশ্যক হইলে পাঠকগণ ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।—লেখক

চেনা-অচেনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

৯

এসেছে - তোমার তৃতীয় পত্র এসেছে। তুমি যত দেরী করবে ভেবেছিলে তার চেয়ে অনেক দেরীতে এসেছে, কারণ আজ সপ্তাহ খানেক হ'ল আমরা একটা নতুন আক্রমণের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়েছি। এই যুদ্ধের মধ্যে এইটাই নাকি সবচেয়ে বড় আক্রমণ, সবাই ত এই রকম বলছে। এক জায়গায় এত বেশী সৈন্য ও কামানের সমাবেশ আগে ত কখনও দেখিনি। আটদিন যুদ্ধ-সরঞ্জামের গাড়ী ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়েনি। দলের পর দল সৈন্য, কামানের গাড়ী, ট্যাঙ্ক (tank)—সবই একদিকে চলেছে। উন্নততর সৈন্য-সমাবেশ-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। এই যে এত বড় ব্যাপার - বিপুল বাহিনী, অথচ পথের মাঝে কে যে কোথায় আছে তা নিমেষের মধ্যেই খবর করা যাচ্ছে।

যে পথে আমরা যাবো, তার নিশানা কোরে তবে আমরা যাত্রা করেছি - দিনে ক'মাইল যাবো, কোন্ কোন্ গ্রামে আমরা বিশ্রাম করবো, কোথায় জল সংগ্রহ করবো, ভারবাহী পশুর চারণের বন্দোবস্ত কোথায় হবে—এর প্রত্যেক ব্যাপার জেনে শুনে বন্দোবস্ত কোরে তবে যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। ঘড়ির কলের মত আমরা চলেছি, না কোন গোলযোগ, না কোন বিশৃঙ্খলা।

আমাদের অনেকগুলো বুড়ো রোগা ঘোড়া মারা গেল; সারা শীতটা তারা কাদায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে—কামান টানবার জন্য তাদের শেষ সামর্থ্য টুকু খরচ কোরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যখন তারা চলতো তখন আমার বড় কষ্ট হোত। এতদিনের মেশামেশির ফলে তাদের চালকেরা তাদের স্নেহ করতো—সেই বিদায়ের ক্ষণে বেচারীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। সত্যি, ভালবাসা দেবার জন্যে মানুষ কি উৎসুক! তারা সেনানায়কদের ভাল বাসে, পরস্পরকে ভালবাসে, এই সব মূক জানোয়ারও তাদের প্রীতি থেকে বঞ্চিত নয়। তুমি ভাবতেই পার না হত্যা যাদের ব্যবসা তারাও এত ভাল বাসতে পারে!

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জমির উপর পৌছনটা ভারি চমৎকার। চারিদিকে বসন্তের চিহ্ন। যুবকহীন এই দেশে ছেলেরা সব সাধারণ কাজে লেগেছে, আর মেয়েরা দেখলুম চাষ করছে। খুব বুড়ো আর খুব ছোটরাই শুধু কাজে নামেনি। এই থেকেই জানা যায়, ফ্রান্সের কতখানি ক্ষতি হয়েছে।

পুরানো ট্রেঞ্চ ছেড়ে নতুন জায়গায় যাওয়ার কি মজা! আমরা যে সব ট্রেঞ্চ ছেড়ে এসেছি, নতুন গুলো সেই রকমই খারাপ। তফাৎ শুধু রকমের, তাতেই কত আনন্দ! কিছু কাল যুদ্ধের সামনের দলে থাকলে দেখবে, এর সবটুকুই তোমার জানা হয়ে গেছে—এতে এত বিরক্তি লাগে যে, মরতে ইচ্ছে করে। সব সময় তোমার মন যেন ভারি। কেবল মাত্র নূতনত্বের লোভে একটা খারাপ কাজ করতেও তোমার মনে কিছুই লাগে না। পথে আমরা সব রকম গ্রামেই থেমেছি; বড় লোকের বাগান-বাড়ী থেকে আস্তাবল পর্য্যন্ত সব জায়গায় ঘুমিয়েছি। আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়তুম যে, পা ছড়াবার জায়গাটুকুরই শুধু অপেক্ষা, হাঁ, আর সকালে উঠে কিছু খাবারের। রোজ সকালে আমরা চারটার সময় উঠতুম। যতক্ষণ না দিনের আলো চলত ততক্ষণ কামানের গাড়ী সমানে চলেছে। তারপর কামান সাজান আর কুচ-কাওয়াজের পালা। তারপর ঘাটী আগলান ও অশ্বারোহী পাহারা ঠিক করা হোত এবং সব শেষে রাতের মত আশ্রয়-সংগ্রহের ব্যবস্থা। কাজেই ঘুমোবার বস্তার মধ্যে ঢুকতে প্রায় দশটা বেজে যেত। পর দিন আটটার সময় তাঁবু খালি হয়ে যেত—একেবারে পরিষ্কার—যেন কেউ সেখানে ছিল না। রাত্রে আবার অগ্নি তাঁবুর আলো জ্বলে উঠতো আর সেই আগুন ঘিরে যাত্রী সৈন্যদল ভিড় জমাতো। চতুষ্পদী যারা রচনা করে,

সামনের দিকে অগ্রসর সৈন্যদলের যাত্রার সঙ্গে জীবনের অস্থায়িত্বের তারা একটা সুন্দর তুলনা দিতে পারে।

আমরা এখন যেখানে আছি, সেখানে পাতালপুরী রচনা করবার সময় পাইনি। কামানের গর্ত্ত করতেই আমরা সবাই ব্যস্ত; এর পরে হবে সৈন্যদের থাকবার জায়গা—আর সবশেষ তৈরী হবে কর্ম্মচারীদের। একটা ট্রেঞ্চের তলায় আমার ঘুমোবার বস্তাটা পেতে শুয়েছি। এটার কিন্তু কবরের সঙ্গে ভারি মিল আছে, বিশেষতঃ যখন অন্ধকারে ঠাণ্ডা দেওয়ালে হাত ঠেকে তখন সত্যই অন্তিম আধারের কথাটা মনে পড়ে। বৃষ্টি না পড়া পর্য্যন্ত বেশ আরামে আছি—দুঃখ করবার কিছুই নেই। সব জিনিষই দেখছি ক্রমে অভ্যাস হয়ে যায়। অথচ না ভেবেও পারি না যে, সহরের সামান্যতম ভিখারীও আমাদের চেয়ে ভাল জায়গায় আছে।

এই নতুন আক্রমণে আমরা সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। এর জন্যে কি দাম যে দিতে হবে, তা আমরা বেশ জানি। এর মধ্যে গোলাবৃষ্টি বেড়ে গেছে—জার্ম্মাণরা যে আমাদের মতলবের খবর রাখে, এ তারই প্রমাণ। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, যারা যাত্রা কোরে এই ব্যূহের মধ্যে ঢুকলো তাদের মধ্যে কজন বেরিয়ে ফিরে আসবে। এরা কি সব অন্ধের মত এলোমেলো ভাবে মরবে—কিংবা কেউ কি তাদের নাম জানে, যারা এই মাস শেষ হবার আগে স্থির হয়ে মাটি নেবে? ভগবানকে আমার অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়!

বাতাসে এক বিচিত্র ঔৎসুক্য ও গোপনতার আভাস ভাসছে—রুদ্ধ-প্রতীক্ষার এক ফল্গু-স্রোত যেন এর তলা দিয়ে বয়ে চলেছে। লোকেদের কাজ দেখে বোঝা যায় যে, তারা সবাই এটা বেশ অনুভব করেছে। কামান রাখবার জায়গাগুলো শেলের আক্রমণ থেকে যতদূর বাঁচানো সম্ভব তার জন্যে তাদের পরিশ্রমের ক্রটী নেই। তাদের কাছে গেলে শুনতে পাবে যে, তারা পরস্পরকে বলছে "এই আক্রমণে নরকের সাত দুয়োরই খুলে যাবে।" আবার গুজব শুনছি আমাদের পিছনে অশ্বারোহী সৈন্যদল বেশ জমায়েত হচ্ছে—এ যেন প্রলয় বাধাবার জন্য কোমর বেঁধে লাগা!

এই খানেই তোমার চিঠি পেলুম—আমার ঘুমোবার বস্তার মধ্যে ঢুকবার ঠিক পরেই। আমার উপরে ট্রেঞ্চের ধারে কার পায়ের শব্দ হ'ল!—তার পরেই আমার লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি কি জেগে আছেন, মশায়? একটা চিঠি এসেছে আপনার।" তাকে চিঠিখানা নীচে ফেলে দিতে বল্লুম। খামের উপর ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারীর আলো ফেলে তোমার হাতের লেখা যখন চিনলুম তখন কল্পনা করতে পারো, কি উন্মত্ত আগ্রহে আমি দেশলাই খুঁজেছি। বাক্স একটা পেলুম, কিন্তু সেটা ভিজে, কাজেই বাতি জ্বালাবার আর উপায় রইলো না। তোমায় আমি দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রাখলুম—সভ্য ব্যবহার যেন আমি জানি না। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম—এত দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল যাত্রার পরে তুমি আমার কাছে এসেছ আর তোমার কোন অভ্যর্থনা না কোরে দুয়ারের পাশে তোমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি—না, আমার ব্যবহার আমার অযোগ্য—নিতান্ত অভব্য!

একই ট্রেঞ্চের মধ্যে আমার মাথার কাছে পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে জ্যাক হোল্ট। আমার গালাগালিতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল; আমি ত আর স্বর্গদূত নই; এমন সময়ও আসে, যখন আমার ভাষা একটু বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। জানো, কয়েক বিষয়ে জ্যাক ভারি মজার লোক; রোজই একটা থলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে সে ঘুমোয়। মনে হয়, তার বৌ তাকে এটা পরতে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন, বোধ হয় তিনি এটি নিজে বুনেছেন। জ্যাক যখন আমাদের সমস্ত বিদ্রূপ সহ্য করেও এটা পরে তখন এ ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখতে পাই না। সে যখন তার মধ্যে মাথা রেখে কথা বলে তখন তার গলার স্বরটা চেপে যায়, মনে হয় যেন মুখের ভিতর আস্ত একটা গরম আলু পুরেছে। আমি গালাগালি করেই চলেছি দেখে সে কি একটা বলবার চেষ্টা করলে। শেষটা আমি শুনলুম—"ওই ব্যাটারীর আলোতেই কাজ চালাও—আমার বৌয়ের চিঠি পড়তে আমি প্রায়ই ওইটেকে ব্যবহার করি।" এদিকে আমার আলোটা আবার কম-জোর; ব্যাটারীটা প্রায় পুড়ে এসেছে।

যদি কিছু না মনে কর, তবে অনুরোধ করছি একবার আমার ছবিটা কল্পনা কর—সরু একটা কবরের মধ্যে বোসে তোমার টানা অক্ষর-সমাবেশ বানান জোরে জোরে পড়ছি

এমন একটা আলোয় যার তেজ দুটো জোনাকীপোকার সমান। অনেক সময় তোমার অনেক কথার ভুল মানে করেছি। একবার মনে হোল যেন হঠাৎ কোমলতার আভাস পেলুম, কিন্তু অবাক হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা লুপ্ত হল। এতে এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন আমার হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হল। এই শুধু বুঝলুম যে, তুমি আমায় ভালবাস এ আশ্বাস যদি পেতুম তবে আমার জগৎ কত আনন্দে ভোরে উঠতো।

তুমি যে আমায় ভালবাস না, তা আমি তোমার চিঠি দেওয়ার দেরীতে বেশ বুঝেছি। আমার অনেক উচ্ছ্বাসের ফলে তোমার কাছ থেকে অনেক কষ্টে একখানা জবাব আসে। যতদিন না আমায় চিঠি লিখতে বারণ করছো—ততদিন অবশ্য আমার চিঠির জবাব না দিয়ে তোমার নিস্তার নেই। আশা করি আজ পর্য্যন্ত বারণ করবার কোন কারণই আমি দিই নি; যা কিছু আমি লিখেছি খুব সাবধানেই লিখেছি, কেবল বেশী লিখি বোলেই যদি তোমার সন্দেহ জাগে। বেশী লেখার মধ্যে একটু দুরভিসন্ধি আছে—আমার দশ পাতের উত্তরে এক পাতের কম ত আর তুমি লিখতে পার না! কিন্তু তোমায় জানতেই হবে যে, তোমায় আমি ভালবাসি। সামাজিকতা ও সাধারণ বন্ধুত্বের আবরণ সত্ত্বেও আমার চিঠিতে এমন দু'একটা কথার আভাস ছিল, যাতে আমার মনের ভাব ধরা পড়েছে বোলে মনে হয়। তারপর প্যারিস থেকে তুমি কত উপহার পেয়েছ যাতে দাতার নাম দেওয়া ছিল না। আর যুদ্ধের লাইন থেকে অজ্ঞাত নামে তোমার কাছে চকোলেট, বই, সিগারেটের অর্ডার ত চোল্‌ছেই। আমার এ ব্যবহার খুব রুচিসঙ্গত নয়—তা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার যে যোগ আছে, তা অনুভব করবার জন্যই একাজ করেছি। বইগুলোর জন্য আমি সহজে ধরা পোড়ে যেতে পারি, কারণ যখন আমরা একসঙ্গে ছুটিতে ছিলুম তখন তোমার কাছে অনেকগুলোরই নাম উল্লেখ করেছি—তুমি যে-সব বই পড়নি, আমি শুধু সেইগুলিই পাঠিয়েছি।

চিঠিতে একখানার নাম তুমি উল্লেখ করেছ The Journal of Marie Baskirtseff. তুমি লিখেছ যে, কে—সম্বন্ধে একথাও তুমি কার কাছ থেকে উপহার পেয়েছ আর আমাদের কথাবার্ত্তা মনে ছিল বোলে সেখানি পড়েছ। বোধ হয় আমায় স্বীকার করবার একটা সুযোগ দিয়েছ। নয়!

আমার সে আলোচনা মনে আছে। এক শীতের সন্ধ্যায় তোমার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। শেষ মুহূর্ত্তে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল—ট্যাক্সি আর পাই না—Place de e' Etoile যখন পার হলুম তখন দেখি মিনিট পনের দেরী হয়ে গেছে। তুমি না হয়ে আর কেউ হলে এ দেরীটায় কিছু এসে যেত না। জীবনের মধ্যে মাত্র কয়েকটা পনের মিনিট ত তোমার সঙ্গে মিশতে পেয়েছি, কাজেই সময় নষ্ট হওয়া ধনরত্ন উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী মনে হয়েছিল। গিয়ে দেখি, তুমি আমার অপেক্ষা ক'রছ; সব সময়ে যেমন থাক তেমনি একাই ছিলে। অন্য লোকের সঙ্গে তোমায় ত কখনও দেখিনি। তোমায় প্রথম দেখার দিন থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে, যতদিন আমরা একসঙ্গে থাকবো ততদিন তুমি শুধু আমার একলার জন্যেই নিজেকে সঞ্চিত কোরে রাখবে। সে বোধ হয় সম্ভব হয়েছিল কেবল আমি একা ছুটীতে ছিলুম বোলে। যাই হোক্, সেটা তোমার করুণা, আর তাতে আমি খুসি।

তোমায় যেন এখনও দেখছি—গরম ওভারকোটের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ বেশ কোরে ঢেকে শান্ত হাত দুখানি বুকের কাছে জড় কোরে তুমি বোসে আছ—তোমার চোখ দুটী কুয়াশা ঢাকা, তারার মতই স্নিগ্ধ ধূসর তাদের জ্যোতি—আমার জন্য তারা যেন অপেক্ষা করছিল; ঘরের মধ্যে পা রাখতেই নীরব হাস্যে তাদের দৃষ্টি আমার চোখের উপর নত হয়ে পড়লো!

তোমার মুখখানি বর্ণনা করবার চেষ্টা কখনও করিনি—কেমন কোরে করতে হয় তা যে জানি না। তোমার মুখখানি যেন প্রাণের আতিশয্যে চঞ্চল—ছোট কপালখানি যেন রগ থেকে সরু হয়ে কপোল বেয়ে চিবুকের দিকে নেমেছে—চিবুকটী অতি সুন্দরভাবে যেন একটী বিন্দুতে মিশেছে। তোমায় দেখলে ইউরোপীয় নবযুগের শিল্পাচার্য্যদের আদর্শ, সেই সব বহুদিন-স্বর্গগত বিচিত্র সুন্দরীদের কথা আমার মনে পড়ে। সর্ব্বদাই একটা রহস্যের, বিচিত্র শান্তির ও অর্দ্ধ-জাগ্রত সৌন্দর্য্যের ভাব যেন তোমায় ঘিরে আছে। যখন

তোমার সঙ্গে থাকতুম তখন সারাক্ষণ আমার ভয় হোত যে, হয়ত তুমি সহসা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারো। জুন মাসে এক বাগানে আমার এই রকম একটা অবাস্তব জগতের স্বপ্ন মনে জেগেছিল—গোলাপ কুঁড়ি ধীরে ধীরে তার পাঁপড়ি মেলেছে, শিশিরবিন্দু পাঁপড়ির উপর মুক্তাকণার মত টলমল করছে—তারা যে স্থায়ী হতে পারে না, এই বিশ্বাস তীব্রভাবে বার বার আমার মনে আসছিল—বস্তু-জগতের সঙ্গে তাদের কোন যোগ-সূত্র যেন খুঁজে পাওয়া গেল না।

তোমার ডাগর চোখ দুটিতে ছিল প্রাচ্য-সুন্দরীসুলভ অজানা বিষাদ, কিন্তু তোমার সারা মুখে ছিল উজ্জ্বল আনন্দের স্ফূর্ত্তি। তোমার চোখের উপর ভ্রূদুটিতেই যেন তোমার বিশেষত্ব—উড়ন্ত পাখীর বিস্তৃত পাখার মত, তুলি দিয়ে নিপুণ ভাবে টানা ভ্রূদুটি। সে রাত্রে তারা যেন আমার দিকে ভেসে আসছিল। এখন মনে হচ্ছে, যেন সামনের জোর বাতাসে বাধা পেয়ে অনিশ্চিত-মনা পাখীর মত তারা শূন্যে ভাসছিল। তোমার সঙ্গে আর একটী ঘণ্টার জন্য আজ আমার জীবনের সবই দিতে পারি—শুধু আর এক ঘণ্টা।

তুমি উঠে হাত বাড়িয়ে দিলে—দুজনে বেরিয়ে পড়লুম! যাব কোথায়? দুজনের তাতে কিছু এসে যায় না—যদি তুমি বলতে পৃথিবীর শেষে, চিরকালের মত—আমার মন তাতে উন্মত্ত আনন্দে ভরে উঠতো। Crillonএ গেলুম, ভাল লাগল না; সাঁতারের পুকুরে জল শুকিয়ে গেলে যেমন অস্বস্তি হয় তেমনি হল। নতুন জায়গার সন্ধানে বেরোলুম। কোথায় গিয়ে উঠলুম মনে আছে?—Café de Parisতে, যেখানে দুজনের এক সঙ্গে যাওয়া আদৌ উচিত ছিল না। প্রথমে ত আমরা বুঝতেই পারিনি; নিশাচরের দল যুগলে যুগলে যখন ভিতরে এসে সোনালী রঙের আরাম-গদীতে বসে সামনের বড় বড় আয়নার সামনে গায়ের পোষাক খুলতে লাগলেন তখন আমাদের চৈতন্য হল!

"ভারি দুঃখিত হলুম" আমি বল্লুম "আমার উচিত হয় নি—।" তুমি হেসে উঠলে—"যতক্ষণ না বেদনা লাগে ততক্ষণ জীবনের এ-অনন্ত বৈচিত্র্য--" "আর না" বলে তুমি শুধু মাথা দোলালে।

ব্যাপারটাকে সরলভাবে নেওয়ার জন্য মনে মনে তোমায় শত ধন্যবাদ দিয়েছি—আমায় এত শীগগীর তুমি মুক্তি দিলে—বড় ভাল লাগলো তোমার সরলতা, তোমার নির্ভীকতা। আমরা বসে রইলুম; আশপাশের কারুকে গ্রাহ্যই করলুম না। তখনই কথায় কথায় Marie Baskirtseffএর কথা উঠলো। তুমি তার বই পড়নি স্বীকার করলে। Metropolitan Galleryতে Bastien-Lepageএর Joan of Arc দেখেছ—এঁরই সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন—শুধু এঁকেই তিনি ভালবেসেছিলেন। তাঁর জীবনের কথা তোমায় বলেছি—কালো মখমলের উপর সোনালী সুতোর মত—অন্ধকার মেঘের মাঝে রূপালী রৌদ্রের গৌরব-রেখার মত। জীবনে তাঁর দুটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল—একটি বিশ্ববিশ্রুত হবার আর দ্বিতীয়, কোন যোগ্য পুরুষের অপরিমেয় প্রেম অর্জ্জন করবার। আবাল্য নিজের সম্বন্ধে কঠোর সত্য কথাগুলি তিনি কেমন সহজে লিখে গিয়েছেন—তাঁর প্রণয়োন্মাদ, তাঁর জীবন নিয়ে শত পরীক্ষা—কত মোহচ্যুতি—কত অসাফল্যের বেদনা। অপেরায় গান করতে শিখে শেষে তাঁর গলা খারাপ হয়ে গেল। Luxemburgএ দেখা সেই একটা বড় ছবি আঁকা—তারপর জানতে পারলেন যে, তিনি ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়েছেন—সারাজীবন ধরে যে প্রেমের বুভুক্ষা নিয়ে তিনি অবসন্ন হয়েছিলেন, সে প্রেম এল তখন—অনেক বিলম্বে! Bastien Lepageএর সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হোল তখন শিল্পীও সেই রোগাক্রান্ত হোয়ে অবশ্যম্ভাবী মরণের মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। দুর্ব্বলতার জন্য যখন তিনি দেখা করতে পারতেন না, Marie নিজেকে বহন করিয়ে তাঁর শিল্পাগারে যেতেন—খ্যাতি তাঁকে বঞ্চনা করেছিল—প্রেমের কাছেও সে বঞ্চনা সহ্য করতে হোল; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ডায়েরী ছাপা হোল।

তুমি প্রশ্ন করলে—প্রেম কত বিলম্বেই আসে—তাই ভাবছি। তোমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলুম—তোমায় বলবার প্রলোভন সামলান দায় হয়ে উঠে যে—তুমি হয়ত বুঝতে পেরেছিলে। আমি শুধু বল্লুম—"চল এইবার যাওয়া যাক।" তোমায় জামা পরাবার সময়ও তোমার দিকে চাইতে পারিনি—সাহসে কুলোয়নি। মানস নয়নে দেখলুম আমার সারা জীবনের সঞ্চিত প্রেম শোভাযাত্রা কোরে

চলেছে। আমি দেখলুম—কি সব হোতে পারতো—কি এখনও হোতে পারে। এর আগে প্রণয় কি—প্রেম কি—তাই জানতুম না। যতদিন জীবন থাকে ততদিন তাকে গ্রহণ করা কত সহজ কত সুষ্ঠু—এত দেরী যদি না হোত—কিন্তু আমি তা পারিনি। তোমার শান্তি যাতে নষ্ট হয় সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে বটে কিন্তু ভুলতেও হয়ত বেশী দেরী হবে না। মরণের মুখে যে এগিয়ে চলেছে তার তরে শুধু কাঁদবার জন্য এমন মেয়েকে রেখে যাবার কার কি অধিকার আছে? তাই তোমার প্রশ্ন, প্রশ্নই রেখে দিলুম। Marieর মত আমাদের পক্ষেও বোধ হয় প্রেম বিলম্বে এসেছে। Cafeর গরম ও আলো থেকে বেরিয়ে এসে আমরা রাতের অজানা ও অনিশ্চিতের অন্ধকারে পরস্পবের কাছে বিদায় নিলুম।

আমাদের সঙ্কীর্ণ ট্রেঞ্চের মধ্যে শুয়ে তোমার চিঠিখানি বালিশের তলায় গুঁজে—আমার এই সব কথা মনে আসছিল। বারবার ব্যাটারীর বোতাম টিপে চিঠির এক একটা অংশ পড়ছিলুম। আশা ছিল হয়ত একটা গোপন অর্থ, কথার ভাবে চাপা-পড়া একটু কোমলতা আবিষ্কার করতে পারবো। বন্দুকের শব্দ হতে লাগলো। রাত্রের কামান ছোঁড়া আরম্ভ হয়েছে—আমার সরু ঘরের দেওয়াল কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমাদের শ্রাপনেল যেখানে ফাটছে সরঞ্জাম-বাহী জার্ম্মাণদলের সেখানে কি দুর্দ্দশা হচ্ছে সে ছবিটা আমার মনে ফুটে উঠলো। তাদেব মারবার কি যে প্রয়োজন, যে সব লোককে জীবনে কখনও চোখেও দেখিনি! জীবন কি নির্দ্দয়! প্রেমে বঞ্চিত ছিলুম, যখন এল তখন দেরী হয়ে গেছে। আমাদের হাতে হত্যার যন্ত্র তুলে দিল অথচ আমরা শুধু চেয়েছি নিজের মনের মত কোরে বাঁচতে। জীবন শুধু ইঙ্গিত করেছে—যা কিছু চেয়েছি তার অস্পষ্ট আভাস দিয়েছে; তারপর আমাদের অন্ধ জগতের মধ্যে জোর কোরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

কতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম কিম্বা তন্দ্রা এসেছিল জানি না। পরের খবর যা জানি তা হচ্ছে যে, দেওয়ালটা আমার দেহের উপর ভেঙ্গে পড়েছে আর আমি বুকের উপর থেকে সে ভার সরাবার চেষ্টা করছি। বেশী চাপা পড়িনি কারণ গীগগীরই হাওয়ার গন্ধ পেলুম—ফাটা শেলের দুর্গন্ধে তা ভরপুর। জ্যাক যে দিকে শুয়ে ছিল সেদিকে পথ করে গেলুম এবং মাটী সরাতে লাগলুম। অন্ধকারে নিজেকে ভারি অক্ষম বোলে মনে হতে লাগলো। কামানের গর্ত্ত থেকে কোদাল নিয়ে কতকগুলো লোক ছুটে এল। তাদের দলই রাতে বন্দুক ছোঁড়ায় ব্যস্ত ছিল এবং যার জন্য চাপা পড়েছি সে শেল এরা পড়তে দেখেছে। প্রাণপণ আগ্রহে কোদাল নিয়ে খুঁড়তে আরম্ভ করলুম—শীগগীরই তার মাথা—না, না, বরং তার সেই স্ত্রীর বোনা থলেটি বের হ'ল। বাতাস পেয়ে তখনি সামলে উঠে জ্যাক নানা রকম আঘাত পেয়ে গজগজ করতে লাগলো।

আমাদের আলো শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিংবা তারা বুঝেছিল কারা ক্ষতি করছে। তাই তারা আমাদের কামানশ্রেণীর বিরুদ্ধে অগ্নিবৃষ্টি কোরে আমাদের সরাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করছিল। যতক্ষণ এরকম চলবে ততক্ষণ এ জায়গায় থাকার কোন মানে নেই, কাজেই আমরা কামান-বস্তি থেকে কামান-বস্তিতে ছুটতে লাগলুম। আমাদের তিনজন আহত হয়েছে, আঘাত অবশ্য মারাত্মক নয়। ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয়নি। বাকি রাতটা জ্বলন্ত বারুদের আগুন নিভিয়ে খুব উত্তেজনায় কাটলো।

সকাল বেলা সহকারীকে নিয়ে আমার ঘুমোবার থলে খুঁড়ে বার করতে গেলুম—তোমার চিঠি থলে সবই উদ্ধার হ'ল। এখন আর একটা ট্রেঞ্চে আছি। যেখানে জায়গার ভাড়া দিতে হয় না সেখানে নতুন নতুন জায়গা পাওয়া খুবই সহজ।

কিন্তু তোমার চিঠি! দিনের আলোয় সেখানি বারবার পড়ছি। প্রত্যেক নূতন পাঠে সেখানি আরও হৃদ্য বোলে মনে হচ্ছে। কেন যে মনে হচ্ছে তাই ভাবছি। বোধ হয় যখন এখানি প্রথম এল তখন আমি অনেক বেশী আশা করেছিলুম; মনে মনে কতবার এমন একখানি পত্র রচনা করেছি যা তোমার কাছ থেকে পাবার জন্য মনটা বারে বারে ব্যাকুল হয়ে উঠে। তোমার চিঠির মধ্যে আমি সেই মন-গড়া চিঠির স্বপ্ন দেখেছিলুম, কিন্তু তা পাইনি বোলে প্রথমে ভারি হতাশ হলুম, পরে একটু একটু কোরে তোমার কথাগুলি মনের মাঝে নিলুম—তোমার হৃদ্যতা তাই এত মিষ্টি লাগছে।

এখনও দেখছি খোকা গ্যাষ্টনই তোমার সব স্নেহ দখল কোরে আছে। তাকে আর ততবেশী বুড়োর মত দেখাচ্ছে না, তুমি লিখেছ, আর চোখ দুটি তার ক্রমে আরও বেশী করে স্বর্গীয় আভায় মণ্ডিত হয়ে উঠছে। কিন্তু তার ছোট দুটি হাত বেশী কোরে তোমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। তারা যে নিঃসঙ্গ। তুমি লিখেছ, সে যেমন কোরে তোমায় আঁকড়ে ধরে এবং শক্ত কোরে চেপে থাকে, যেন সে নিজে একা এজগৎকে মুখো মুখি দেখতে ভয় পায়। বেচারী শিশু—জীবনে তার সুবিধা ত বেশী কিছু হবে বলে মনে হয় না! সৈন্যদলকে দেখলে যুদ্ধকে ভারি গৌরবের বলে মনে হয় কিন্তু এর সমস্ত খুঁটিনাটি ভারি করুণ। আমি ত ব্যাপারটাকে আরও শোকাবহ আরও করুণ করবার জন্য রয়েছি; যা আমি ভেঙ্গেছি তা সেরে তোলাই তোমার কাজ। তোমার আমার বন্ধুত্বকে আমি এমন কোরেই দেখতে চাই—কর্ত্তব্য আর করুণার অপূর্ব্ব সঙ্গম।

আঃ—আমি ভুলে গেছি—তুমি ত মারি বাসকিরিটসেফ এর প্রশংসাই কর না—তুমি তাকে হৃদয়হীনা ও স্বার্থপর বোলে মনে কর এবং তার দুঃখের এই গুলোই প্রধান কারণ। আমি বুঝেছি, তোমার চোখের ধূসরতায় অনেক কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা ফরাসী প্রবাদে পৃথিবীর লোককে দুদলে ভাগ করেছে—যারা পরকে প্রিয় করে আর যারা পরের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে—মারি হল শেষ দলের, আর তুমি চাও তোমার বুকে বিশ্বের সমস্ত নির্জ্জনতা, নিঃসহায়তাকে জড়ো করতে—তোমার ধূসর চোখে মাতৃত্বের সে স্নিগ্ধ জ্যোতি আমি দেখেছি। মারিকে তোমার কেমন করে ভাল লাগবে! তাতে আমি দুঃখিত নই। যদিও অন্যায়, তবু সময়ে সময়ে মনে হয়—তুমি যেন মাতৃত্বের দিব্য প্রতিমা!

৯০

তুমি আমায় চিঠি লেখ না কেন? আমার কেবলই মনে হয়, তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ছিল ভাল। তোমায় ছেড়ে জীবন যে অসহ হয়ে উঠেছে। তুমি আমায় নাই বা ভাল বাসলে; আমায় যে শুধু মনে রেখেছ, তার নিদর্শন পেলেই সুখী হব। যাকে তুমি নিজে ভুলে গেছ তার চিন্তার মধ্যে তোমার স্মৃতি থাকবে এটা খুবই অসম্ভব। আমার চিঠি যখন পাও তখন কি তোমার হাসি আসে—খুব একটা করুণার হাসি, যা দেখলে আমার মনে আঘাত লাগত? যদি আমার উপর তোমার কোন দরদ না থাকে, তবে তা লেখ না কেন? তোমার নীরবতায় কি সেই কথারই আভাস দিচ্ছ? কিংবা তুমি হয়ত কিছুই মনে করছ না। তুমি হয়ত মনে মনে বল—"কি আপদ, সে হাড়-জ্বালানো লোকটার কাছ থেকে আবার একটা চিঠি এসেছে। আহা, সে যে আবার ট্রেঞ্চে আছে—আচ্ছা আজ বড় ক্লান্ত, যেদিন সুবিধা হবে সেদিন ভাবা যাবে—।" আর আমি তবু..............; আমি শুধু তখনই সুখী, যখন কাগজে লিখে আমার গোপন কথাটি তোমার সামনে ধরি।

তুমি ভাবতেই পার না, কি প্রবল আগ্রহে প্রতি রাতে তোমার চিঠির প্রতীক্ষা করি এবং যখনই তা পাই, কত যত্নে তা সঞ্চয় করি। তোমার জন্য নতুন কোরে জীবনকে আঁকড়ে থাকার ইচ্ছাটা যে আমার মনে জাগে, তাতে সারাক্ষণ আমার ভারি লজ্জা হয়। আমি যে কখনও ফিরে আসবো, একথা প্রথম থেকেই আমার মনে উঠেনি। কিন্তু কোন মেয়ে যে আমায় একটু ভালবাসে এই ছল করবে, এটাও কি খুব বেশী চাওয়া? তাতে তোমার বেশী কিছু এসে যাবে না—সপ্তাহে আধঘণ্টার লেখা, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। অন্য কিছু তোমায় স্বীকার করতে হবে না, শুধু লিখো 'তুমি আমার বন্ধু ছিলে।'

এই নির্জ্জনতার মধ্যে থেকে মন বুঝি আমার তিতো হয়ে উঠছে—ভয় হচ্ছে, আমি বুঝি বিদ্রোহী হয়ে উঠছি—জীবন ত আমায় অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে—এবার কি তোমা থেকেও বঞ্চিত করবে? আমি শুধু মনের তুলিতে সেই ছবিই আঁকছি—আমরা কি করতুম, যদি ....।

এ যেন তোমায় দোষ দেওয়া—পাষাণী বলে তোমার নিন্দা করা—না তা আমি করছি না। আমি বুঝতে পারছি—জীবনে এই প্রথম তুমি নিজেকে কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছ; করুণার আতিশয্যে কাজের মধ্যে তুমি এত মগ্ন, এত ক্লান্ত, তোমার যা আছে তার চেয়ে বেশী দেবার জন্য তুমি এত উৎসুক যে, তোমার মনে আর কোন ভাবের স্থান নেই। নিজের অজ্ঞাতসারে তুমি আমায় অগ্রাহ্য ক'রছ।

যদি বা আমার কথা তোমার মনে পড়ে, তোমার চিত্তের মহত্ত্ব দিয়ে আমার বিচার কর। এখন ভালবাসার কথা বলা যেন দেবতা ছেড়ে মানুষকে ভজনা করা, স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্তে নেমে আসা।

"Oh loose me! Seest thou not my bridegroom's face
That draws me to Him? For His feet my kiss,
My hair, my tears He craves to-day and oh,
What words can tell what other day and place
Shall see me clasp those blood-stained feet of His!
He needs me, calls me, loves me; let me go."

এ কথাগুলি যেন তোমারি বাণী—কবি Rossetti একটী মেয়ের মুখ দিয়ে এ কথাগুলি বলেছেন—সে মেয়েটী জীবনে যীশু খ্রীষ্টের প্রথম দেখা পেয়ে এত দিনের বাঞ্ছিত সমস্ত বিলাস-বাসনা ত্যাগ করলে।

উৎসব-সভায় যাবার পথে এক অপার্থিব মুখ দেখে থমকে দাঁড়াল। তার প্রণয়ী কিছু বুঝল না—বুঝতে চাইল না—সে প্রশ্ন করল :—

"Why wilt thou cast the roses from thine hair?
Nay, be thou all a rose-wreath, lips and cheek,
Nay, not this house—that banquet house we seek,
See how they kiss and enter. Come thou there,
This delicate day of love we two will share,
Till at our ear love's whispering night shall speak."

কিন্তু এই সব প্রলোভন সত্ত্বেও সে মেয়েটি তার সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে যীশুর অনুসরণ করে' অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রল—

"He needs me, calls me, loves me; let me go"

তুমি যা ক'রছ তার মধ্যে ধর্ম্মের কোন অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও; তা যদি হতে তবে সব নষ্ট হয়ে যেত। তুমি যা ক'রছ তার মধ্যে ধর্ম্ম আছে নিশ্চয়ই। পরদুঃখ বেদনায় আত্মবিসর্জ্জনের এক নব ভাবে তুমি অনুপ্রাণিত হয়েছ, বিশেষ করে কারুকে ভালবাসার কথা তোমার মনে জাগে না। তুমি ভাব—যদি কখনও ভাব—যে আমিও ঐ রকম; আমিও হৃদয়কে একটা মঠে পরিণত করেছি—তা করেছি। কিন্তু এখন, তোমার জন্যই একবার, কেবল একটীবার, তোমার জীবন্ত হাতের স্পর্শের জন্য, প্রাণ আমার কেঁদে উঠছে। তোমায় যদি বলতে পারতুম—! কি জানি; তুমি কি বুঝতে?

১১

আমি ক্রমে বুড়ো হচ্ছি। যুদ্ধে লোকের বয়স কত শীগ্‌গির বেড়ে যায়। আমাদের দলে অনেক বিশ বছরের ছেলে আছে, যাদের চল্লিশ বছরের বুড়ো বলে ভুল হয়; তাদের মুখ বসে গিয়েছে—গালে বলি পড়েছে। মনে আমিও তেমন হয়ে উঠেছি। কাগজে কথা কইবার কায়দাটা খুব বুড়োদেরই অভ্যাস। যাক, তাতে আর কি এসে যায়, যদি এই করে জীবনে দুদণ্ড খুসী থাকা যায়?

সময়ে সময়ে মনকে এমন করে প্রস্তুত করি, যেন তোমায় চিঠিগুলি পাঠাতে কোন দ্বিধা না জাগে। মন-জগৎটা একটা নেহাৎ অবাস্তব জায়গা—মিথ্যা আশা, কাল্পনিক ভয় এবং অনাবশ্যক করুণায় ভরা। মনে পড়ছে যখন স্কুলে পড়তুম তখন রাতের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতুম। দিনের বেলা সবাই ভয় দেখাত, শাসন করত, অসুখী হয়ে উঠতুম, কিন্তু রাতে ছেলেদের শোবার ঘর যখন অন্ধকারে ভরে যেত, আমি যেন আমার আত্মাকে পেতুম। যেখানে মন চায় সেখানে যেতুম। আমার নিজের মনের মত ভারি বিচিত্র একটা বিশ্ব গড়ে তুলতুম—বাস্তব জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা সেখানে কল্পনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। দিনে ভয় পেলেও রাতে খুব সাহসী হয়ে উঠতুম—নারীর সম্মানরক্ষা ও অন্যায় দমন করে, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরত যে সব বীর পুরুষ, একেবারে তাদের মত। এক ঘরে বিশটার মধ্যে আমার ছোট সাদা বিছানায় আমি জেগে থাকবার চেষ্টা করতুম, পাছে আমার নিজস্ব কয়েক ঘণ্টা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালায়; আর চোখ খুলে দেখতুম যে, আবার দিনের আলোর কারাগারে বাঁধা পড়েছি। এখানে এই ট্রেঞ্চের অন্ধকারে ছেলেবেলার সেই চালাকির আশ্রয় নিয়েছি—তোমার সঙ্গে যেমন করেই হোক মিলতে হবে ত!

না বন্ধু, আমি কাপুরুষ নই; মরবার জন্য আমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আমার চেয়ে এত ভাল লোক প্রাণ দিয়েছে যে, বাঁচলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না; আমায় কাপুরুষ

মনে কোরো না। কিন্তু তোমায় দেখা অবধি জীবনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার আগ্রহ আমার মনে তীব্র হয়ে উঠেছে। সেদিন পর্য্যন্ত জীবন নিয়ে কি করতে হবে তা যেন জানতুম না—আজ যে বড় দেরী হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বছর বেঁচে যা না করতে পারতুম, বর্ত্তমান জীবনে এক সপ্তাহে তা সম্ভব, কিন্তু তার মধ্যে যে তুমি নেই। আমার জগতে তোমার আসন পাতবার ব্যর্থ-চেষ্টার স্বপন দেখে আধেক রাত আমি জেগে কাটাই—কি অবুঝ মন আমার! তুমি যদি কখনও ভালবেসে থাক, তবে হয় ত বুঝবে!

নিরাপদ হবার সকল উপায় কাটিয়ে সামনের লাইনের পথে কামান-বস্তি তৈরী করবার ভার পেয়েছি। হুনরা আমাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে বোধ হয়—তাদের আকাশ-জাহাজ আমাদের লক্ষ্য করছে নিশ্চয়ই। কখন যে অগ্নিবৃষ্টি হবে, তা ত কেউ জানি না। তারা সরঞ্জাম নিয়ে আমাদের খুঁজে ফিরছে। এমন দিন যায় না, যেদিন আমার লোক না কমে। দুটো জায়গা এর মধ্যে হয়েছে—তৃতীয়টা বাকি—সেটা রাতে হবে।

সেদিন গোলার একটা টুকরো আমার মাথায় এসে লাগল। মাথায় বেশ গভীর ক্ষত হয়েছে, মারাত্মক নয় আশা করা যাক্। বোধ হয় আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমার কর্ত্তারা ছুটী দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাজ অনেক বাকি। তা ছাড়া, এই বৃহৎ ব্যাপারটায় অনুপস্থিত থাকতে চাই না। আমার কাজেই আছি—মাথার ক্ষতটা বিষিয়ে গেছে, মাথায় মস্ত এক ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি, দেখলে তোমার কষ্ট হবে কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমাদের সেনা-নায়কের সংখ্যা বড় কম, এখন চলে গেলে অপরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে।

জ্যাক হোল্টের নাম অনেকবার করেছি—দেখি সে ভারি ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, কারণ তার স্ত্রী এক শিশু জ্যাকের আগমন-সম্ভাবনা করছেন। একদিন পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্রে পাহারা দিচ্ছে; এমন সময় তার এক টেলিগ্রাম এল যে, তাকে দেশে ফিরতে হবে—তার স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। কি কোরে তাকে ছুটি পাইয়ে দেব ভাবছি, এমন সময় ষ্টীফেন এসে হাজির। ষ্টীফেনের কথা তোমায় বলেছি বোধ হয়, সেই লোক, যার নামে কোন চিঠি আসে না এবং যে কখনও কোন চিঠির প্রত্যাশা করে বলেও বোধ হয় না। তার চেহারা বেশ লম্বাচওড়া, দেখলেই ভাল লাগে; কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য যে তার জন্য ভাবে এমন কেউ তার নেই। সে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল—"বল্লে—আমার ছুটীর খবর পেলুম।" আমরা তখন তাকে জ্যাকের কথা বল্লুম—একমুহূর্ত্ত দ্বিধা না করে বল্লে—"তা হলে জ্যাক আমার ছুটীর ছাড়পত্র নিক—ইংলণ্ডে যাবার আমার সত্যই কোন দরকার নেই।" সে আমাদের জেদ করলে, যেন একথা আমরা জ্যাককে না বলি; কারণ যদি প্রকৃত কথা জানতে পারে, তবে সে এ সুবিধা নেবে না। জ্যাকের জায়গায় ষ্টীফেন কাজ করতেও স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হল। আমরা কোথায় আছি এবং সে অবস্থার তুলনায় ছুটীর মানে কি, তা যদি কখনও ভাবতে পারতে, তা হলে জানতে এ নিঃস্বার্থপরতা কি মহৎ! দুঘণ্টার মধ্যে জ্যাক ছুটী পেল তার ছাড়পত্র নিয়ে সে গরমজল আর ফরসা চাদরের বিছানার লোভে ছুটল। সে ভাবতেই পারলে না যে, তার সময় না আসতে ছুটী পেলে কি করে? পাছে সে কিছু ভাবে তাই আমরা চুপ করেই ছিলুম। আমরা সব নিতান্ত উৎসুক হয়ে আছি, শিশু জ্যাকের শুভাগমন-সংবাদের অপেক্ষায়। অফিসারের মেসে যেন একদল বুড়োঠাকুরমা বসে আছে—ছেলে কি মেয়ে যাই হোক, তার জন্যে নাম বাছাই হচ্ছে। আমরা মনে করছি এ শিশু যেন আমাদেরই—কামান-বস্তির জিনিষ। ঠিক হয়েছে, সে যদি ছেলে হয় তবে তার নাম হবে ষ্টীফেন—ঐ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিছু নেই তবে ষ্টীফেনেটা (Stephenatta) বলা যায়, কিন্তু কোন খুকীকে ঐ ভয়ঙ্কর নামে ডাকা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হবে না কি?

একজন অফিসারের নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপারে আমরা এত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠব, এ তোমার কাছে ভারি অদ্ভুত লাগছে, নয়? এটা বাস্তবিক অদ্ভুত নয়—এ নিছক হিংসা! আমাদের সবায়ের মনগত ইচ্ছা যে, আমাদের অমন একটী কিছু হোক। তাকে কামান-বস্তির জিনিষ করে তোলার মানে, তার পিতৃত্বে ভাগ বসান—। এখানে এলে পরে সব জিনিষই খুব সত্য আর সহজ হয়ে উঠে। আমরা যে সব সুবিধা হারিয়েছি, তা হিসেবের মধ্যে ধরে'নি—আমরা জানি আমরা কেন জন্মেছি; প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে আমাদের জন্মের সার্থকতা আমাদের বংশ

আর একজনের জন্মদানে, কিন্তু সে জন যেন আমাদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর হয়। অজানার সন্ধানে যাত্রা করা তখনই অসম্পূর্ণ হয়ে উঠে, যখন পিছনে রেখে যাবার মত কেউ থাকেনা। যাক্, সে কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাব না!

লিখতে বসেছি, আর একজন গ্রামোফোন বাজাচ্ছে—তার নির্ব্বাচনটি ভারি সময়োপযোগী কিন্তু তালটা একটু দ্রুত হলে বেশ হ'ত, অপেরার সুরে মিহিগলায় কে গাইছে—"All that I want is somebody to love me and to love me well – very well,"

চল্‌তি গানগুলোতে আমাদের গভীরতম মনোভাব অনেক সময় ভারি সুন্দর ও সত্যভাবে প্রকাশ করে। বিল লেন হঠাৎ বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ করেছে, চোখে তার মোহাঞ্জন—যার সঙ্গে বিয়ের কথা, সেই মেয়েটীর কথা ভাবছে। আমাদের মেজর হাতে মাথা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকেছেন আর ভ্রূকুটী করেছেন—তাঁর প্রণয়িনীর কথা ভাবলেই তাঁর মুখ ঐ রকম হয়ে যায়। আর আমি?—আমি প্যারিসের কথা, তোমার চোখের ধূসরতা, তোমার ছোট হাত দুখানির কথা স্মরণ করছি—আর তুমি তোমার কর্ত্তব্য ক'রছ সে কথা ভাবছি। জে—সহরে তুমি যেমন আছ, আমার মনে তার একটা ছবি জাগছে—হাসপাতাল, তোমার করুণাময়ী মূর্ত্তি আর শিশুর দল। বিশ্বের মঙ্গলচিন্তায় তুমি আমার বিপদের কথা, তোমার নিজের আরামের কথা ভুলতে পেরেছ এতে আমি প্রকৃতই খুসী হয়েছি। ষ্টীফেনকে তোমার ভাল লাগবে—আশা করি, সেও তোমার মত!

১২

একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে; আমার অতি অদ্ভুত স্বপ্নেও যে তেমন ঘটতে পারে এ কথা কল্পনাও করি নি। কাল তোমার ফটোগ্রাফ পেয়েছি। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু প্রকৃতই পেয়েছি। প্রমাণ দিচ্ছি; ছবিখানা তোলা হয়েছে একটা ফরাসীবাড়ীর উঠানে—ডানদিকের কোণ থেকে বাঁ দিকে একটা সিঁড়ি উঠেছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এক, দুই তিন—গুণে বলছি—ছয়টি; আমেরিকান রেড-ক্রশের উর্দ্দীপরা ছয়টি মেয়ে। নীচে একজন বাবুর্চি গোছের লোক, যার সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ নেই। সব বাবুর্চির যেমন থাকে তারও তেমনি—পাখীর বাসা গোছের বেশ রেশমী দাড়ী আছে। তার ডান দিকে উঠানের উপর একজন ফরাসী অফিসার; তার ডান দিকে এক সুন্দরী মেট্রন; তারপর আরও দুজন অফিসার, আর পাশে একটা দরজার সামনে দুজন মার্কিণ নার্স দাঁড়িয়ে আছে—তার একজন হ'চ্ছ তুমি। তোমার পোষাক একেবারে সাদা—জুতোটি পর্য্যন্ত সাদা—তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে সাদা ওড়না উড়ছে—এখন বিশ্বাস হচ্ছে ছবিখানি সত্যিই তোমার?

কেমন করে আমি পেলুম? কে যে আমায় পাঠালে তুমিও যেমন জান, আমিও তেমন জানি। পিছনে শুধু এই কটি কথা লেখা আছে—"ফ্রান্সে সেবা-নিরতা মার্কিণ রেড্-ক্রশের এক ভগিনী কর্ত্তৃক প্রেরিত। তিনি আমেরিকায় আপনার বক্তৃতা শুনেছেন।"

আমার সৌভাগ্য নয় কি? তোমার ছবি তুমি নিজে আমায় কথনও দিতে না। তোমার কাছে চাইতেও কি আমার কখনও সাহস হত? তোমার এবং আমার নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা সত্ত্বেও এখানি আমার কাছে এসেছে এবং বর্ত্তমানে আমি জামার জেবে নিয়ে ঘুরছি।

একেই বলে অকস্মাৎ! কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক ব্যাপারই অকস্মাৎ ঘটে। আমি ক্রমে কুসংস্কারাপন্ন হয়ে উঠছি—আমার আশার মূলে এ জিনিষটা নতুন রস যোগাচ্ছে। যে রাত্রে তুমি দেশ ছেড়ে আসবে, সেই সন্ধ্যায় তোমার প্রথম দেখা; আবার মতলব না ক'রেই প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল—আমার সারা ছুটী কাটল তোমার সঙ্গে। পরস্পরের সুখ-সাহচর্য্যের দিনগুলির মধুর স্মৃতি সম্বল করে' কোন রকম বাক্যবিনিময় না করে'ই বিদায় নিলুম। তারপর সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিঃসঙ্গ জীবনের গুরুভার আর হতাশার অন্ধকারের মাঝে কোন্ অজানা হাত থেকে তোমার ছবি পেলুম। এ দেখে মনে হয়, কোন অদৃশ্য স্বর্গীয় শক্তি আমাদের দুজনের জীবনকে চালিত ক'রছেন—একথা ভাবলে আমার মনে জাগে বিরাট এক আনন্দোন্মত্ততা! এ যেন তুমি আমার একলার—এখন যা কিছু লিখছি, তা নেহাৎ বাজে কথা নয় বরং ঠিক ও সম্পূর্ণ সঙ্গত কথা। এ মুহূর্ত্তে আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি যে, যখন আমি তোমার কথা

ভাবি, তখন তোমার হৃদয়ের গতিও দ্রুত হয় আর মন প্রণয়-শিথিল হয়ে উঠে।

নিশ্চয়ই, তোমার নিজের স্বপ্নও ত' আছে। আমি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, তা কি খুবই অদ্ভুত! তোমার মত আমারও বয়স কম; মৃত্যুর মধ্যে আছি বলে' জিনিষের চরম বাস্তবতা মনের সবখানি ভরিয়ে রাখে না বরং সুখময় ভবিষ্যতের জন্য মনকে আরও ক্ষুধাতুর ক'রে তোলে। এতে জীবনটাকে এত পূর্ণরূপে উপলব্ধি ক'রতে ইচ্ছা হয়—যা কিছু সুন্দর, যা কিছু করুণার্দ্র, দু'হাতে তা পরশ ক'রতে—বুকে চেপে রাখতে সাধ যায়। যদি কোনদিন এ নরকের শেষ হয়, যে কয়টা দিন বাকি থাকবে, সেগুলো কি ক'রেই ভোগ ক'রব! মনে কর, সেদিন ঘুম থেকে সকালে উঠে শুনবে যে, এবার থেকে বছরের সমস্ত সকালগুলা তোমার হাতে—নিজস্ব; হঠাৎ নষ্ট হবার কোন আশঙ্কাই নেই। আজ কিন্তু সে রকম দিনের সম্ভাবনাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। সেদিনের প্রতীক্ষায় ভবিষ্যতের দিকে চাওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়; এগিয়ে দেখতে গেলে হয়ত সাবধানী হয়ে যাবো। এ খেলায় নিজের সম্বন্ধে সাবধান হবার উপায় নেই। কিন্তু বন্ধু আমার—!

আবার তোমার ছবির দিকে দেখছিলুম। কি সুন্দর তুমি! কিন্তু অপরিণত প্রণয়ের কি ব্যবধান তোমায় আমায়! আমার পোষাকের দিকে দেখছি—ট্রেঞ্চের সমস্ত কলুষে ভরা; তোমার কাছে আমার দামই বা কি? কেমন ক'রেই বা দাম থাকবে? তোমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের তুলনায় আমি কত শক্ত, রূঢ় ও অমানুষ। আমি যে কাজে আছি তাতে লোকের বাহিরটা সুন্দর থাকতে পারে না—অন্তরে তার যতই উন্নতি হোক্। আমাদের চেহারা আদৌ বীরের মত নয়। আমাদের দেখলে অবসন্ন, কুৎসিত ও নিতান্ত জঘন্য বলে' মনে হয়। আমাদের মধ্যে কেউই আর নবীন হ'তে পারবে না। মেয়েদের মন আমি বুঝতে পারি না। যা কিছু ঘটেছে, তার জন্য তারা মোটে বিবেচনা ক'রতে চায় না। এ সব ত তাদের জন্যই ঘটেছে আর ঘটছে, অথচ তাদের তাতে কিছু এসে যায় কি? বোধ হয় তোমার উপর অবিচার ক'রছি—তোমার হয়ত খুবই এসে যায়!

এমন সব মেয়ের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রতে আমার সাধ যায়, যাঁরা যুদ্ধের পর আমাদের স্নেহের চোখে দেখবেন। ফরাসী মেয়েরা এর মধ্যেই আমার কল্পনানুযায়ী হয়ে উঠেছেন। হাসপাতালে আহত লোকদের তাঁরা প্রিয় বলে', বন্ধু বলে' সম্ভাষণ করেন, বুকে মাথা চেপে আদর করেন। আমাদের শক্তি যখন নষ্ট হয়, তখন এগুলি আমাদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠে—সেই সব মেয়ের তখন বেশী দরকার, যাঁরা দয়ার আতিশয্যে সাধারণ লজ্জা ত্যাগ করে' আমাদের মাতৃত্বে অগ্রসর হবেন। আমরা নিজে থেকে অতখানি চাইতে সাহস পাই না। যদি তোমরা নিজেরা না বুঝতে পার, তবে মুখ ফুটে আমরা কখনও ব'লব না। অথচ এই ট্রেঞ্চের মধ্যে আমরা সবাই এই রকম আদরের, মমতার স্বপন দেখছি; আজ আমরা মানুষ মারছি, কালও হয় ত তাই করব, কিন্তু শৈশবের স্বপ্ন-প্রবণতা আজও নষ্ট হয় নি—আর মনে আসে তোমাদের মত মেয়ের কথা। আমাদের মধ্যে যারা অতৃপ্ত হ'য়ে ম'রছে, ভগবান তাদের নিয়ে কি ক'রবেন, মাঝে মাঝে তাই ভাবি। তাঁর স্বর্গরাজ্যে সব চেয়ে করুণাময়ী নারীর উপর তাদের রক্ষার ভার দেবেন। যার জন্য আমাদের আজকার আকাঙ্ক্ষা সব চেয়ে বেশী, তা হ'চ্ছে বিশ্রাম আর দরদী কোন মেয়ের অযাচিত করুণা।

দুর্ব্বল ও বোকা! যা লিখেছি তা প'ড়লুম—অথচ এই দুর্ব্বলতা আর বোকামিই আমাদের শক্তি। যদি আমাদের দেহ দিয়ে অবরোধ না তৈরী করতুম, তবে এতক্ষণে তোমাদের পুষ্পতনু যে আঘাতে ক্লিষ্ট হত! ফ্রান্সে আহত বিকলাঙ্গকে সবাই "গৌরবান্বিত" বলে' সম্মান করে—যুদ্ধ থেকে ফিরে গ্রামে তারা সবার বাড়া শ্রদ্ধা পায়। মেয়েদের কাছে তাদের আঘাত-চিহ্ন আদৌ ভয়াবহ নয়—সে যে গৌরব-তিলক। দেশের জন্য বুক পেতে আঘাত নিয়ে তারা ধন্য হয়েছে—বিকলাঙ্গকে বরণ করে' নিতে ফ্রান্সে মেয়ের অভাব হয় না।

সত্যি, ফরাসীদের এই মহামানবতায় নিজেদের সম্পর্কে আমরা লজ্জিত হচ্ছি। এতদিন তাদের আমরা অলস, অনাচারী, ভাবপ্রবণ বলে' কত বিদ্রূপই করেছি—কত বাজে কথা রটিয়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রছি যে, আমরা যেন ঐ সব তথাকথিত পাপের অংশ পাই, তাই থেকে তাদের গুণের উদ্ভব হয়েছে ত'। ভালবাসা সম্বন্ধে শক্ত, আত্মসংহত বলে' আমরা কত ছলই করি! নিরর্থক বীরত্বের গর্ব্বে আমার ঘৃণা জন্মেছে। আজ যা কিছু চাই তা হ'চ্ছে, আমার কণ্ঠ-বেষ্টন করে তোমার বাহুর পরশ—আমার চোখের 'পরে তোমার অধরের মৃদু চাপ আর তোমার স্নেহ-সরস প্রিয়-সম্ভাষণ! তোমার কাছে একথা ব'লতে লজ্জা পাব কেন? এসব ক'রতে তোমার লজ্জাই বা কিসের? যে মেয়েটি সারা হৃদয়ের করুণায় যীশুর পা'দুখানি নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল, তার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার পরিমাণ আমি বেশ বুঝেছি। আহত সৈন্যের ক্লান্ত-মাথা বুকে চেপে, প্রিয়-সম্ভাষণ করে' ফরাসী মেয়েরা আজ যা ব'লছে, সে মেয়েটিও যীশুকে ঠিক তাই ব'লতে চেয়েছিল!

কি নিরর্থক বাণী উচ্চারণ করছি, বন্ধু, তুমি হয় ত এর কিছুই বুঝছ না!

(ক্রমশঃ)

কমল

এ, রাজাক

প্রিয়,

তোমার চিঠি যখন পাই, তখন আমি রোগশয্যায়। আর কিছুই না—ম্যালেরিয়া, অপরিহার্য্য ম্যালেরিয়া। সেরে উঠলুম চার পাঁচ দিন ভুগে—অবশ্য দুটো ইন্জেকৃশনের কৃপায়। ডাক্তার বল্লেন - শুধু কুইনাইন—কেবল কুইনাইন —একমাত্র মহৌষধ, অব্যর্থ।

তাই চালাচ্ছি কুইনাইন যথাসাধ্য।—

মাঝে মাঝে মনে হয়—দুঃখে, বড় দুঃখে—কেন পোড়া বাঙ্গালা দেশে জন্মেছিলুম। দুঃখে, দৈন্যে, রোগে-শোকে, হাহাকার-কান্নায় ভরা এই বাঙ্গালা দেশ—এই আমাদের জন্মভূমি—এই আমাদের মা। এর বুকেই জন্মেছি ব'লে দুঃখ ক'রবো? - ভাবতেই লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে, আমার এই দুঃখী, রুগ্ন বাঙ্গলা-মায়ের পায়ের তলায়! তারই পদ-রজ আমার মাথায় অক্ষয় হোক—এই কামনা করি।

কিন্তু যাক্ ও কথা—

'শেষ-প্রশ্ন' সম্বন্ধে তোমার মতামত অনেকটা বুঝ্‌তে পারলুম। একটা কথা গোড়া থেকে আমি ব'লে রাখি। শরৎচন্দ্রকে আমি ভালোবাসি নিজের ব'লে—আপনার ব'লে ভালোবাসি—প্রিয়তম আত্মীয়ের মত। বাংলাদেশের দুঃখকে সঠিক ভাবে আঁকৃতে পেরেচেন এই একটি মাত্র লোক।—তাকে বুকপেতে গ্রহণ ক'রেচেও সে। তাঁর দুঃখের সৃষ্টি, ব্যথার সৃষ্টি, পাপের সৃষ্টি—এ তাঁর ভাববিলাস নয়—এ তাঁর প্রাণের, অন্তরের করুণ কান্না।

তাই তাঁর বাসস্থান তিনি খুঁজে নিলেন, সহরে নয়—গ্রামে। যেখানে আভিজাত্যের, কৃত্রিমতার লীলাভূমি, সেখানে মানুষের সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র তিনি খুঁজে পেলেন না। বাঙ্গালীর বাড়ী, বাঙ্গালীর ঘর যে পল্লীগ্রাম —তারই মাঝে একটা ক্ষীণ স্রোতস্বতীর ওপর তিনি তাঁর নীড় বাঁধলেন। রূপনারায়ণের ধারে যে নর-নারায়ণের বাস—তারাই হ'ল তাঁর আপনার জন, আত্মীয়। সেই পল্লীমায়ের দুঃখী সন্তানদের মাঝে—তিনি তাদেরই একজন হ'য়ে বাস ক'রতে চাইলেন—তাদেরই সুখ দুঃখ হ'ল তাঁর নিজের সুখ দুঃখ। বাঙ্গালী তাঁকে পেয়ে ধন্য হ'য়ে গেচে। আমি তাঁকে নমস্কার করি।

এই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি কমল। তাই ভয় হয়, যাকে ভালোবাসি তাঁরই সৃষ্ট বস্তুকে সমালোচনা ক'রতে ব'সে বুঝি বা পক্ষপাতিত্বই ক'রে ফেলি। তাই তোমাকে অনুরোধ জানাই, যদিই আমার বিচার একটু একতরফাই হ'য়ে যায়—তা হ'লে আমাকে ক্ষমা কো'র। আমি আমার দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করি।

শিবানীকে আমি শ্রদ্ধা করি, কমলকে আমি ভালোবাসি কিন্তু অজিতাকে আমার কেমন যেন লাগে—তবু তার মঙ্গল কামনা না ক'রে থাকতে পারিনা। শিবানী যখন বলে, "হ্যাঁগা, ক'রবে নাকি তুমি এই রকম, দেবে নাকি আমাকে ফাঁকি"—তখন কী মিষ্টিই না লাগে! অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা তাকে এক ক'রে নিবেদন ক'রতে ইচ্ছে করে। স্বামীর প্রতি—প্রিয়ের প্রতি কী একনিষ্ঠ ভালোবাসা—কী অপূর্ব্ব বিশ্বাস! শিবনাথ এবং কমলের বিয়ে হ'ল শৈব মতে—আশুবাবুরা শৈব বিবাহ সমর্থন করেন না। তাঁরা বল্লেন, আচ্ছা কমল, আজ শিবনাথ যদি তোমায় ছেড়ে চলে যায়—তাহ'লে ত তোমাদের সম্বন্ধ প্রমাণ ক'রবার কোন উপায়ই থাকবেনা। উত্তরে কমল যে কথাটা ব'লেছিল তা এখনও আমার কানে বাজ্‌ছে—সে ব'লেছিল, "হা অদৃষ্ট, উনি যাবেন হয়নি ব'লে অস্বীকার ক'রতে আর আমি যাব তাই হ'য়েচে ব'লে পরের কাছে বিচার চাইতে। তার আগে গলায় দড়ি দেবার মত একটু খানি দড়িও কি জুটবেনা?" সত্যি, ভাবি, হৃদয়ে কতখানি ভালোবাসা থাকলে এমন জোরের সাথে, এমন নির্ভয়ে কথাগুলা বলা যায়। কিন্তু সত্যি সত্যিই শিবনাথ যখন তাকে ফাঁকি দিলে, তখন তার ঐ নীরবে স'য়ে যাওয়াটা কী মর্ম্মান্তিক হ'য়েই না বুকে বাজে! সহানুভূতিতে হৃদয় ভ'রে ওঠে। দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। আর তার এই এতবড় ভালোবাসাটার অপমান দেখে গুণী, রূপবান শিবনাথের প্রতি মনটা বিতৃষ্ণায়, ঘৃণায় বিমুখ হ'য়ে যায়। অথচ এই

শিবনাথকেই কমল ক্ষমা ক'রলে! তার বিরুদ্ধে একটি কথাও সে কইলে না!

তারপর আমরা পাই কমলকে। তার তর্ক করবার ক্ষমতা, তার আত্মনির্ভরশীলতা, তার যুক্তির গভীরতা, আর তার অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা,—সব কিছু মিলে তাকে বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু ক'রেই তোলে। তার রূপ যত না আকর্ষণ করে, এই সব গুণ তার চেয়ে শতগুণ বেশী তার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে। অর্থাৎ তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তাই তাকে ভালোবাসতে পারলেন আশুবাবু আর পারলো অজিত। আশুবাবু সাধারণ লোকের চেয়ে একধাপ উঁচু স্তরের লোক—তাই তিনি কমলকে প্রথম থেকেই ভালোবাসতে পেরেছিলেন—ঠিক নিজের মেয়ের মত—হয়তো তার চেয়েও বেশী।

কমলের প্রতি অজিতের ভালোবাসাটা বুঝতে পারি কিন্তু অজিতের প্রতি কমলের মনোভাবটা কেমন যেন হেঁয়ালী হ'য়ে ঠেকে। কমল যখন বলে, "অতীতের দুঃখকে দিয়েই সারাজীবনটা আচ্ছন্ন ক'রে রাখবো না—জীবনে যদি কোন দিন কোন রঙ্গীণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়—তাকে যেন না অবহেলা করি। অসময়ে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেচে ব'লে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি আর কাল প্রভাতে আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুঁজে তাকেই ব'লবো এ আলো নয়—এ মিথ্যে? জীবনটাকে এমনি ছেলে খেলা ক'রেই সাঙ্গ ক'রে দেবো?" কী চমৎকার সত্যি কথা! অথচ এই কথাটাই এই সত্যটাই যখন সে তার নিজের জীবনে খাটাতে গেল—তখন কেমন যেন লাগে—সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেন সেটাকে সমর্থন করা যায় না। অজিতের ভালোবাসাকে সমর্থন করি এবং শ্রদ্ধা করি কিন্তু সেই ভালোবাসারই প্রতিদান যখন কমলকে দিতে দেখি, তখন অন্তরটা যেন সায় দিতে চায় না। মনে হয়, এই ভালোবাসা-বাসিটা, এটা কি পুতুল খেলা! এত সহজেই কি একে নিশ্চিহ্ন করা যায়? কিন্তু তবু ভাবি, এ সংস্কার। শরৎচন্দ্র সময়ের যে স্তরে ব'সে এই সমস্ত সৃষ্টি ক'রেচেন সেই স্তরে হয়তো এখনও আমরা যেতে পারিনি।

বাস্তবিক এই মেয়েটির একটি কথারও প্রতিবাদ করা যায় না। এমনি গভীর যৌক্তিকতা রয়েচে প্রত্যেকটি কথায়। দেখো দেখি, কী সব সত্যি কথা কমল ব'লেচে—এর বিরুদ্ধে তর্ক ক'রবার যেন কিছুই নেই। সে বলে, 'দুঃখকে ভয় না ক'রলে তার ভেতর থেকে বড় বড় আদর্শের সৃষ্টি হয়। এমনি ক'রেই শুভ অশুভের পায়ে আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই মানুষের মুক্তির পথ।' সে আরও বলে, 'শাশ্বত, যা চিরন্তন—একটু পরিবর্ত্তনের ধারার মাঝ দিয়ে যখন সে আসে, তখনই তাকে নেবো না বল্লেই ঠেকান যায় না। সে আসবেই। যুগে যুগে এমনি ক'রেই পুরাতনই নূতন হ'য়ে দেখা দেয়।'

তুমি বলেচ 'কমল তর্ক ক'রবার একটা মেসিন। তার ভেতরে নারীত্বের পরশ খুব কমই আছে।' কিন্তু তুমি বড্ড ভুল বুঝেচ। কমল মেসিন ত নয়ই—বরং তোমার আমার চেয়ে বড় একটা মানুষ এবং দশটা ভদ্র শিক্ষিতা নারীর চেয়ে বড় একটা নারী। বিশ্বাস করি, তার সঙ্গে তর্কে তুমি পেরে ওঠোনি। কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করিনে যে, সে পরিপূর্ণ জীবন্ত নারী নয়। তার সমস্ত ভালোবাসার মৌনতা তার ক্ষণিকের মণিমাণিক্যের সঞ্চয়—তার সমস্ত জীবনব্যাপী ট্র্যাজেডি—সে কি কিছুই নয়? তার বুক-পোরা ভালোবাসা—সারা দেহে রূপের বন্যা। শিবনাথের চলে যাওয়ায় সে আরও দশটা নারীর মতই (বোধ করি অনেক বেশী) দুঃখ পেয়েচে—আশুবাবুর সামনে ধরা প'ড়বার ভয়ে পিছন ফিরে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছেচে। তারপরে শিবনাথ যখন অসুখে পড়লে, তখন কমল তাকে সেবাও ক'রতে গিয়েছিল। সে যদি নারীই না হবে তাহ'লে, যে শিবনাথ তার সাথে অতবড় বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে, সেই তাকেই আবার কেমন ক'রে শুশ্রূষা করতে গেল?—আমাদের গৃহস্থ-ঘরে মেয়েদের সাথে কমলের এই পার্থক্য যে, সে তার সমস্ত দুঃখ নীরবে স'য়ে গেছে। কারও কাছে সে নালিশ ফরিয়াদ ক'রতে যায় নি—এই খানেইত তার মহত্ত্ব। আর একটা মহত্ত্ব কমলের চরিত্রে এই যে, সাধারণ শক্তি কিংবা ঘরের মেয়েরা যা ভাবে অথচ ব'লতে পারে না সাহসের অভাবে—কমল তা নির্ভয়ে সমান তালে ঘোষণা ক'রে গেচে—নিজের জীবনে দেখিয়ে গেচে। আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, আমাদের সমাজের এই যে বিধবা নারীগুলা—যারা স্বামীর ভালোবাসা থেকে চির-বঞ্চিত হ'লো—তাদের হৃদয়ে কী কোন আকাঙ্ক্ষা জাগে না?—তাদের জীবনের ব্যর্থতার ব্যথা কি তাদের অন্তরে গুমরে গুমরে ওঠে না? তাদের প্রাণ কী চায় না আর দশজন যেমন ঘর-সংসার ক'রচে—তারাও তেমন করে? চায় তারা পুরুষের ভালোবাসা, চায় তারা পুরুষের সাহচর্য্য—পুরুষের সোনার হাতের মোহন পরশ না পেলে যে নারীর হৃদয়-মুকুল প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে না! কিন্তু শাসনের শৃঙ্খলে তারা সেটা মুখ ফুটে বলতে

সাহস পায় না। কিন্তু কমল শাসন-শৃঙ্খলকে পরোওয়া করেনি—হৃদয়ের চিরন্তন, জীবন্ত প্রেমকে সে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে চায়নি। শিবনাথই তাকে ফাঁকি দিয়েচে, সে ত শিবনাথকে ফাঁকি দেয়নি—সে ত কোন দোষ করেনি—যার জন্যে তার জীবনের অফুরন্ত আশা, ভালোবাসার দ্বার সে রুদ্ধ ক'রে দেবে? শিবনাথের বিশ্বাসঘাতকতার অভিশাপ তার নিজের জীবনের উপর টেনে নিয়ে কেন সে তার জীবনটাকে মরুময় ক'রে দেবে?

তুমি লিখেচ "কমল ঠিক ভারতবাসী নয়—ও বিলেত থেকে আমদানী করা জীব। ও বিলেতবাসী আর ভারতবাসীর সংমিশ্রণ। সুতরাং ওর আদর্শ ভারতবাসীর আদর্শ নয়।" আদর্শ জিনিষটাকে তুমি খুব খাটো ক'রে দেখেচ ব'লেই তোমার ও ভুল হ'য়েচে। সত্যিকার আদর্শ যেটা—সেটা সকল মানুষেরই আদর্শ। দেশ-কাল-পাত্রভেদে তার কিছু আসে যায় না। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যে আদর্শগুলি বদলায়, সেগুলি জীবনের ক্ষুদ্র সাময়িক আদর্শ—ওগুলিকে বৃহৎ চরম আদর্শ মনে ক'রলে ভুল হবে। তা বাদে, কমলের কোন্ খানটায় দেখ্‌লে অ-ভারতীয়ত্ব? সে তার ইংরাজ পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েচে সত্যি—কিন্তু দেখ্‌তে পাওনা ভারতবাসীরই মত সে একবেলা দু'টো আলুসিদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছে? সাধারণ ভারতবাসীরই মত কারো বাড়ী সে খেতে চায় না—আর ভারতবাসীরই মত সে সেবা-পরায়ণা? ভারতের দেবদেবী সে মানে না—ভারতের সঙ্কীর্ণ মানসিকতা তার ভেতর নাই—ব'লেই কি তাকে ভারতবাসী বলা হ'ল না? এমন অনেক নেটিভ ভারতীয় কি নাই, যারা কমলের সাথে একমত? তাহ'লে তাদেরকে কি ভারতবাসী না বলার দুঃসাহস হবে তোমার? আমি দেখচি, কমলকে ভারতবাসী ব'লে স্বীকার না করার একমাত্র কারণ এই যে, সে ভারতীয়ের কন্যা নয়। এই তার একমাত্র অপরাধ। কিন্তু সে তোমাদের ঐ তথা-কথিত ভারতীয় হ'তে লালায়িত নয়। দেখো, তোমার চোখ কুসংস্কারের অন্ধকারে দৃষ্টি হারিয়েচে ব'লেই, কমল যা নয় তাই বল্লে ত আর সত্য কথা বলা হোল না। জানি আমি, কমল বড় দুঃখী—তার সারা জীবনটা কেবল দুঃখেরই সাধনা। আর সেই অপরাধের জন্যই হয়ত সে তোমাদের কাছে অনাদর পাবে, অসম্মান পাবে! কিন্তু একদিন সময় আসবে, যখন কমলের জীবনের সাধনাই দেশের, জাতীয় জীবনের সিদ্ধি হ'য়ে দেখা দেবে। তার বুকের দুঃখের কাঁটা মঙ্গলের ফুল হ'য়ে ফুটে উঠবে। কমলকে আজ যে অসম্মান ক'রচো—তার জন্য তোমাদের অনুতাপ ক'রতেই হবে। এ আমি দিব্য ক'রে বলতে পারি। ভারতের সাহিত্যের আসরে কমলের মত মেয়ে বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল—এখানে দুটো কমল আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং একে তোমরা একটু সম্মান ক'রতে, ভালোবাস্‌তে শেখো।

আমার বিশ্বাস, এমন দিন আসবে, যখন এই বাঙ্গালা দেশেই ঘরে ঘরে কমলের জন্ম হবে—যখন এই বাঙ্গালা দেশেরই নারীরা ব'ল্‌তে শিখবে 'আমি হিন্দু—কি মুসলমান—ভারতীয় কি অ-ভারতীয়, এ আমার পরিচয় নয়—আমি মানুষ—এই আমার চরম পরিচয়।'

কমলের আদর্শ সংসারে প্রথম প্রথম কিছু বিপ্লব, কিছু abuse আন্‌তে পারে, কিন্তু অবশেষে বোধ হয় এই হবে মানুষের সত্যিকার আদর্শ—বর্ত্তমানে এটা আমাদের কাছে যতই দৃষ্টি-কটু, যতই শ্রুতি-কটু লাগুক কিন্তু এই যদি সত্যি ব'লে প্রমাণিত হয়—তা হ'লে ভারতকে তা গ্রহণ ক'রতেই হবে একদিন।

অক্ষয়কে আমি ভয় করিনে—কেন না, আজকাল বোধ হয় খুব বেশী অক্ষয় আমাদের ভেতরে নেই। অক্ষয় এবং হরেন্দ্রের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই মতামতের দিক দিয়ে। তফাৎ এইখানে যে, অক্ষয় মানুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার ক'রতে চায় না—আর ওর মনটা বড্ড নীচ এবং ছোট। তা ছাড়া, মানুষের মতামতকে সম্মান করা দূরে থাকুক ও মানুষের সাথে কথাই বলতে জানে না।

আর একটা কথা। একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারিনি ভাই। আমি ভেবেই পাইনে, আশুবাবুকে কী ক'রে ভালোবাসলো নীলিমা। আশুবাবুর অনেক গুণ মানি—তবু নীলিমা যে কী ক'রে এই রোগ-জর্জ্জরিত পঙ্গু-বৃদ্ধকে ভালোবাসতে পারে—সেটা আমার মাথায় ঢোকে না। অবশ্য নারী আমি নই। সুতরাং নারীর মনস্তত্ত্ব আমার না জানাই সম্ভব।

যাক্। 'শেষ-প্রশ্ন'এর আমি সমালোচনা ক'রতে বসিনি। কমলের সম্বন্ধেই দু' চারটে কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তবু একটা কথা না ব'লে থাক্‌তে পারচি না। শরৎচন্দ্রের উচিত ছিল, আমার মনে হয়,—যে-শিবনাথকে বাড়ীতে আসতে দিতেও মনোরমার আপত্তি ছিল, সেই শিবনাথকেই কমলের প্রতি এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে দেখেও সে কি ক'রে ভালোবাসতে পারলো—সেই ঘটনা-পরম্পরা ভালো ক'রে দেখিয়ে দেয়া।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এমন সমালোচনা ক'রতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। আমি যেখানটায় বুঝিনি, সেখানটা হয়তো তুমি বুঝেচো, তুমি যেখানটায় বোঝনি, সেখানটায় হয়তো আমি বুঝেছি। এবং তুমি আমি দুজনেই যেখানে বুঝেছি, সেখানেও যে কি শরৎচন্দ্র ভুল করেছেন এমন কথাও জোর করে' বলা যায় না—সুতরাং এইখানেই ইতি করি।

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

উত্তর মেঘ

৩৭

নব-জল-কণা শীতল পবন পরশে প্রিয়ারে জাগায়ো ছলে
যেমন করিয়া মালতীলতায় জাগাও নবীন মুকুল দলে।
স্তিমিত নয়নে চেয়ে বাতায়নে হেরিবে তোমায়,—তখন ধীরে—
লুকায়ে দামিনী—মৃদু গরজনে বোলো এই কথা সে মানিনীরে—

৩৮

"ওগো কল্যাণি,—আমি বারিবাহ,—তোমার পতির প্রিয়-সখা যে,—
তাহারি বারতা হৃদয়ে বহিয়া আসিয়াছি কাছে তোমারি কাজে।
আমি সেই মেঘ—স্নিগ্ধ-মন্দ্রে পাঠাই শ্রান্ত প্রবাসী জনে
গৃহপানে ত্বরা, উৎসুক যা'রা বনিতার বেণী-উন্মোচনে।"

৩৯

শুনি মুখ তুলি' তোমা পানে চেয়ে কুতূহলে হয়ে উচ্ছ্বসিতা—
পবন-তনয় সকাশে যেমন বিরহিণী সেই দুখিনী সীতা—
অতি-সমাদরে একমনে প্রিয়া শুনিবে তোমার সকল কথা,—
মিলনের মতো মধুর প্রিয়ের বন্ধুর মুখে তা'রি বারতা।

৪০

পূরা'তে আমার প্রার্থনা আর পর-উপকার-পুণ্য তরে
বোলো তা'রে—"সতি, আছে তব পতি চিত্রকূটের শৈল পরে।
সে-বিরহী আজও রয়েছে জীবিত,—তোমার কুশল-বারতা মাগে;
প্রাণীর বালাই ঘটেতো সদাই,—কুশল শুধাই তাইত আগে।

৪১

বিধি বাম, তাই পারে না আসিতে; শুধু দূর হ'তে কল্পনায়
তব কাছে আসি সেই পরবাসী তনুতে তোমার তনু মিশায়;
অশ্রুসিক্তা, উৎকণ্ঠিতা, কৃশা ও তাপিতা তোমারই প্রায়
অশ্রুসিক্ত, উৎকণ্ঠিত, কৃশ ও তাপিত সে-ও যে হায়!

৪২

সখীদের মাঝে বলিলেও বলা যায় যে-কথাটি, তা-ও যে তবু
তোমার আনন-পরশের লোভে কানে-কানে ছাড়া কহেনি কভু,—
শ্রবণের সীমা দৃষ্টির সীমা পার হয়ে সে যে গিয়েছে চ'লে,—
ব্যথিত হিয়ার কথাগুলি তা'র—শোনো শোনো—মোরে দিয়েছে ব'লে-

৪৩

"ইন্দুতে তব মুখের কান্তি, কুন্তল শিখিপুচ্ছ মাঝে,
নয়ন চকিত-হরিণী নয়নে, শ্যামা ললিকায় তনু-লতা যে ;
কোপনে, তোমার চারু ভ্রূভঙ্গ গোপনে দেখেছি বীচিমালায়.—
একাধারে তব রূপের তুলনা ভুবনের মাঝে মিলে কোথায় ?

৪৪

প্রণয়-কুপিতা মুরতি তোমার গৈরিকে আঁকি' গিরি-শিলায়
তব পদতলে আপন মুরতি আঁকিতে যখন বাসনা যায়
অমনি আমার আঁখির দৃষ্টি ঢাকে অবিরল অশ্রু-ধারে,—
নিষ্ঠুর বিধি মোদের মিলন চিত্রেও যেন সহিতে নারে !

৪৫

স্বপনের মাঝে কোন মতে যদি দেখা হয়, প্রিয়ে, তোমার সনে
শূন্যে দু'বাহু বাড়াই তোমায় বাঁধিতে ব্যাকুল আশ্লেষণে।
আমার দুঃখ দেখিয়া তখন বন-দেবতার চক্ষে ঝরে
মুক্তার মতো অশ্রু বিন্দু অবিরল তরু-পত্র প'রে।

৪৬

সদ্য ছিন্ন করি' গিরি প'রে দেবদারু-পল্লবনিচয়
লয়ে তাহাদের রস-সৌরভ দক্ষিণ-পথে যদি লো বয়
তুষার-গিরির শীতল সমীর,—আমি তা'রে করি আলিঙ্গন,—
যদি, প্রিয়ে, তব অঙ্গ-পরশ পেয়ে এসে থাকে সে সমীরণ !

৪৭

অসহ-দীর্ঘ ত্রিযামা যামিনী ক্ষণেকের মতো হ'ত যদি-বা !
মৃদু উত্তাপে সকল সময় স্নিগ্ধ রহিত যদি-বা দিবা !—
হেন দুর্লভ কামনা করিয়া, সুলোচনে, আজি হৃদয় মম
নিরুপায় হয়ে সহিছে তোমার বিরহ-যাতনা তীব্রতম।

৪৮

অনেক ভাবিয়া অনেক বুঝিয়া নিজেরে ভুলাই নিজেরে দিয়ে !
তাই কল্যাণি, তুমিও অমনই হ'য়োনা কাতর হ'য়ো না প্রিয়ে !
চির সুখে কে-বা আছে সংসারে, চির দুখে বলো কে-বা দহিছে ?—
—ঘুরিছে চক্র-নেমির মতন জীবের ভাগ্য উপরে নীচে !

৪৯

হরি অনন্তশয়ন ত্যজিয়া উঠিলে শাপান্ত হবে মোর,
নয়ন মুদিয়া কোন মতে, প্রিয়া, এই চারিমাস করিও ভোর।
বিরহে ভাবিয়া ভাবিয়া দু'জনে কাটাইব কাল যত আশাতে
একে একে সব করিব সফল জ্যোৎস্না- উজল শারদ-রাতে!"

৫০

বলেছে সে আরো—"ওগো প্রিয়তমে, একদা আমার কণ্ঠ ধরি'
ছিলে ঘুমাইয়া,—সহসা কাঁদিয়া উঠিলে জাগিয়া শয়ন 'পরি!
বারে বারে হায়, শুধা'লে তোমায় বলেছিলে, হেসে আপন-মনে,—
—'দেখিনু স্বপন, ওহে শঠ, তুমি রয়েছ অন্য রমণী সনে!'

৫১

এ মোর গোপন পরিচয়ে, প্রিয়ে, আমারে কুশলী বোলেই জেনো;
লোকের কথায় মোর 'পরে কভু অবিশ্বাসিনী হ'য়ো না যেন!
বিরহে প্রণয় শুনি ক্ষয় হয়, তাহা নয়; ভোগ-বঞ্চনায়,
বাঞ্ছিত তরে সঞ্চিত প্রেম পুঞ্জিত হয়ে ওঠে হিয়ায়।"

৫২

সান্ত্বনা দিয়া হেন মতে, মেঘ, নব-বিরহিণী তব সখীরে
শিবের বৃষোৎখাত কৈলাসশৃঙ্গ হইতে আসিয়ো ফিরে।—
এনো মোর তরে কুশল-চিহ্ন সে প্রিয়তমার প্রিয়-বচন,—
বাঁচায়ো, বন্ধু, প্রাতের শিথিল কুন্দের মতো মম জীবন।

৫৩

বন্ধুর কাজ ভাবিয়', সৌম্য, এ কামনা মোর পূরাইবে কি?—
প্রত্যাখ্যান করিছ কি মোরে, তাই কি তোমারে নীরব দেখি?
না, না, তা তো নয়,—চাতক চাহিলে নীরবেই জল কর যে দান!—
মহান্ যাহারা, নীরবেই তা'রা রাখে যাচকের আশার মান।

৫৪

জানি অনুচিত প্রার্থনা মোর, তবু, মেঘ, তব করুণা চাই।
বিরহ-বিধুর বন্ধু ভাবিয়া মোর প্রিয়কাজ সাধিও ভাই!
বরষায় নব শোভায় সাজিয়া যেয়ো পরে যেথা বাসনা মনে,—
ক্ষণ-তরে যেন বিরহ না হয় তোমার বিজলী-প্রিয়ার সনে॥"

[শেষ]

অদৃষ্ট

শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নবীন ছিল মাষ্টার হইল ডাক্তার—অবশ্য হোমিও-প্যাথি মতের। হোমিওপ্যাথদিগকে ঠাট্টা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও কম নয়, কাজেই ঠাট্টা তাহাকে সহিতে হইল ঢের। কিন্তু যে যন্ত্রণার উপশমের জন্য সে তাহার চিরদিনকার শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিল, তাহার খবর এক অন্তর্য্যামী ছাড়া হয়ত আর কেহই জানিত না। যেদিন ব্যয়বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে গিয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইল অথচ তাহার ছেলেটিকে বাঁচাইতে পারিল না, সেদিন পুত্রশোকের অপেক্ষাও বোধ করি আর্থিক অসহায়তার কথাটিই তাহার মনে জোর করিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল।

প্রথমে দিন কতক সে একোনাইট, বেলেডোনা প্রভৃতির পার্থক্যনির্ণয়ে ও তাহাদের রোগীর পৃথক পৃথক চিত্র-অঙ্কনের একনিষ্ঠ চিন্তার মধ্যেই কাটাইয়া দিল, তারপর সে পুরাদস্তুর ডাক্তার হইয়া বসিল। প্রথম হইতেই তাহার রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া গেল, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পুলকের কারণ থাকিলেও সে কিন্তু খুসী হইতে পারিলনা। রোগজীর্ণ শরীর ও উৎসাহহীন স্থবিরতা লইয়া যাহারা তাহার দুয়ারে নিত্য হাজিরা দিতে লাগিল তাহাদের দিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—কত অসহায় ইহারা, আর কত খানি নিরুপায় হইয়াই তাহারা তাহার মত অশিক্ষিত ডাক্তারের হাতে জীবন-মরণপণে নিজেদের দেহপঞ্জরের ভার তুলিয়া দিতে আসে।

ক্রমশঃ কঠিন রোগও তাহার হাতে সারিতে লাগিল। এম্ বি ডাক্তারদের অনেকের এজন্য অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাহার চিকিৎসার খরচ বাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে তাহা পারে কই? সে ত তাহার ডাক্তার হওয়ার ইতিহাস ভুলিতে পারে না।

ভীষণ বর্ষামুখর রাত্রে একদিন সে হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলীর গুণসংগ্রহে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছিল; হয়ত ঔষধগুলি জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছিল, এমন সময়ে আর্ত্ত কণ্ঠে বাহির হইতে ডাক আসিল 'ডাক্তার বাবু, ও ডাক্তার বাবু।'

ডাক্তার দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিলেন—বর্ষার বাথার সঙ্গে সুর মিলানো করুণ বিকট মূর্ত্তি - অর্দ্ধনগ্ন কর্দ্দমাক্ত দেহ, ভয়ব্যাকুল বীভৎস মুখশ্রী। দুইটি চক্ষু দিয়া তাহার বিভীষিকা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

দ্বার খুলিতেই সে নবীনের পা জড়াইয়া ধরিল—'বাঁচান ডাক্তার বাবু। ছেলেটি—সে হয়ত এতক্ষণ—'

—'এতক্ষণ কি করছিলি হতভাগা আহাম্মক।'

—'আমাদের সুধো ত গাছ গাছড়া ওষুধ দিচ্ছিল বাবু। এখন হিক্কে উঠছে তাই—'

'তাই ডাক্তার নিতে এসেছিস্, না?'

—'আজ্ঞে টাকার যোগাড়ও ছিলনা আর—'

—'চল্ দেরী করিস্নে। তিন মাইল পথ এই কাদা জলে কম নয়।'

—'বাঁচবে ত বাবু?' সে একবার উর্দ্ধমুখে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিল—। এক টাকার বেশী নেই। আপনার দয়ার শরীর, এই নিয়েই যদি—' সে আর এক বার ডাক্তার বাবুর পা চাপিয়া ধরিল।

ডাক্তার বাবু রওয়ানা হইলেন। ঝড়বৃষ্টি ঠেলিয়া সারা গায়ে কাদা মাখিয়া যখন তাহারা রোগীর বাড়ীতে পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।

অন্ধকার মাটির ঘরে একটি কেরোসিনের ডিবা অনবরত ধূম উদ্গিরণ করিয়া অন্ধকারকে ঠিক রূপ দিয়াছিল। তাহার মধ্যে কাঁথায় ঢাকা ক্ষুদ্র একটি শিশু!

তাহার মা বোধ হয় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পাশে ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল। তাহাদের শব্দ পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল—কিন্তু কিছু বলিল না। ডাক্তার কিছুক্ষণ ঠাহর করিয়া শিশুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেই সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'আমার বাছাকে কেড়ে নিয়ে যেওনা; রাতটুকুন ও আমার কাছে ঘুমোক্।'

ডাক্তার দেখিলেন, বর্ষার জলে সব ভিজিয়া গিয়াছে; মাথার উপরকার খড়ের শতছিদ্র ছাউনীতে জলস্রো-

করিতে পারে নাই ; ঘরের মেঝে সিক্ত, কর্দ্দমাক্ত। নিরাপদে মাথা গোঁজার স্থানটুকুও ছিলনা।

ডাক্তার খোকার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া যাওয়ার অভিযোগ করিতে করিতে রোগী দেখিতে বসিলেন, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই অতি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'আমি বাড়ী চ'ল্‌লাম।'

'কেন?' প্রশ্ন করিবার মত বুকের জোরটুকুও তখন আর কাহারও রহিল না।

নবীন সারাপথ ভিজিয়া বাড়ী ফিরিল। মাথার উপরের তীব্র বর্ষণ, বিদ্যুতের আকাশচেরা আলো, বজ্রের ভীষণ গর্জ্জনের যেন কোনও অর্থই আর তাহার নিকট ছিলনা।

যাইতে যাইতে হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—একটি এম্‌-বি ডাক্তার।

কথা কহিবার মত মনোবৃত্তি তাহার ছিলনা। সে চুপ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু এম্‌-বি ডাক্তার ছাড়িল না। কহিল—'বড় যে কথা কচ্ছনা ; পকেট বেশ কিছু ভারী হয়েছে বুঝি!'

নবীন শূন্য পকেট ঝাঁকি দিয়া দেখাইল।

'তবে?' এম্‌-বি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

—'তনু মুচির বাড়ীতে গিয়েছিলাম।'

তনু মুচির কথা উঠিতেই এম্‌-বি যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। উঃ বেটা কি চামার! আমার তিনদিনের ওষুধের দাম এক টাকা চোদ্দ আনা বাকী, আর কাল সন্ধ্যে বেলা এসে বলে কিনা—ডাক্তার বাবু এক টাকা যোগাড় হয়েছে, একবার দেখে আস্‌বেন চলুন। কি স্পর্দ্ধা।"

নবীন ক্ষুব্ধ চিত্তে শুধু কহিল—'ছেলেটি বিনা চিকিৎসায়ই মারা গেছে।'

ইহার পরে আর কথা চলিল না। এলোপ্যাথিক ওষুধের দাম তিন দিনে এক টাকা চৌদ্দ আনা খুব বেশী নয় আর এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের অল্প খরচে চিকিৎসা করা চলে না, কাজেই এম্‌-বিকে সে বিশেষ দোষ দিল না। তবুও একবার তাহার মনে উঠিল—সকল ক্ষেত্রে না হইলেও এই একটি ক্ষেত্রে কি দুটী টাকা ছাড়িয়া দেওয়া চলিত না!

কিন্তু সাধারণতঃ তা চলে না! ডাক্তারের কাছে মানুষ—শিরা উপশিরা স্নায়ু, রক্ত, মাংস অস্থি প্রভৃতির সমষ্টি মাত্র, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। দেহের অতিরিক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করার মত অবসর বা ধৈর্য্য থাকে কই?

নবীন বাড়ী ফিরিল। ভারাক্রান্ত মনে তাহার কত অভিযোগই না পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সে শ্রান্তদেহে টলিতে টলিতে আসিয়া যখন তাহার ডিস্‌পেনসারি-কক্ষে বসিল তখনও তাহার সম্মুখে ভাসিতেছিল সেই মৃত শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানি আর অসহায় মাতার করুণ আর্ত্তনাদ। ঐসব পার হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল—শিশুর গায়ের ভিজা কাঁথা ও খড়হীন চালের শূন্য কঙ্কালগুলি।

কম্পাউণ্ডার আসিয়া জানাইল – দূরবর্ত্তী স্থানের রোগী পরীক্ষা আরম্ভ করা উচিত।

সে সজাগ হইয়া চাহিয়া দেখিল—ঘর-বোঝাই রুগ্ন, শীর্ণ, শ্রান্ত, ক্লান্ত মনুষ্য-শরীর। সে আজ প্রথম বিরক্ত হইয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—'এ শ্রেণীর সমারোহ এত না হইলে কি ক্ষতি ছিল?'

সব রোগী একে একে বিদায় হইয়া গেলে একজন অবস্থাপন্ন রোগী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। নবীন তাঁহার দিকে এক চোখ চাহিয়াই আর চাহিল না। তাহার দামী পোষাক পরিচ্ছদ বিশেষতঃ হাতের সোণার ঘড়িটি আজ অকারণেই তাহার বুকে জ্বালা ধরাইয়া দিল।

—'নমস্কার মশাই।'

নবীন সংস্কারবশে প্রতি-নমস্কার করিল কিন্তু অভ্যাস মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিল না।

তিনি বলিলেন—'আপনার ফি কত?'

নবীন গৃহাগত রোগীর ফি লইত না কিন্তু উত্তরে কহিল—'আট টাকা।'

—'সে কি? এই মফঃস্বলে?'

—'আজ্ঞা হাঁ।'

—কি রকম? এ যে এম্‌-বির চেয়েও বেশী?'

—'এম্‌-বি ফেরত ত আসছেন? কাজেই—'

—'কিন্তু শুনেছি আপনার ফি কম ; আপনি দয়ালু।'

রুক্ষস্বরে নবীন কহিল—'ভুল শুনেছেন। দয়া থাকলে ডাক্তারী করা চলে না।'

'কেন ?'

—'এ দেশে দয়া আরম্ভ করলে সারা জীবনই তার জের টেনে চল্‌তে হয়। এত সামর্থ্য আমার নেই।'

—তবু।'

ক্রূরদৃষ্টিতে তাঁহার হাতের সোনার ব্যাগুটির দিকে চাহিয়া নবীন বলিল – 'তবু টবু নেই মশাই।'

ভদ্রলোককে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে এবার একটু জোরে বলিল—'আর না হয় পথ দেখ্‌তে পারেন।'

ভদ্রলোক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা আটটি দিয়া ঔষধ লইয়া চলিয়া গেলেন। নবীন টাকা কয়টি হাতের মধ্যে করিয়া ক্রমাগত নাড়িতে লাগিল। শেষে বার কয়েক বাজাইয়া উঠিয়া পড়িল ও সেই অসময়ে, তীব্র রৌদ্রের মধ্যেই তনু মুচির বাড়ীর পথ ধরিল।

সে অনেক বেলায় তনুর বাড়ী পৌছিল বটে কিন্তু তনু টাকা লইল না, বলিল—'দরকার নেই ত বাবু।'

তখন চালের ভিতর দিয়া সূর্য্যকিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। দেখাইয়া নবীন বলিল—'ঘরটাই নয় সারিস্‌।'

তনু চোখ মুছিয়া বলিল—'সে ত হয়ে উঠ্‌বে না বাবু, শুধু টাকা কটাই আপনার নষ্ট হবে। ঘর সারব কি, জমিদার মহাজনের তাগিদ্‌ মিটিয়ে ত।'

নবীন টাকাগুলি জোর করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে চাহিলে সে বাধা দিয়া কহিল—'ও আপনাদের জিনিষ, আপনাদেরই থাক্‌।'

সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া তৎপরদিনই নবীন তাহার ডিস্‌পেনসারিতে মস্ত সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিল—'দাতব্য-হোমিও চিকিৎসালয়।' সে পয়সা না লইয়াই চিকিৎসা করিবে।

শীঘ্রই সেখানে এরূপ ভীড় জমিয়া উঠিল যে, নবীন আর সামলাইতে পারিল না। দুইটি কম্পাউণ্ডার রাখিয়া ও একটানে বেলা একটা দুইটা পর্য্যন্ত খাটিয়াও প্রভাতের রোগী দেখাই সে শেষ করিতে পারিত না। ক্রমে তাহার স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত থাকিল না। কেবল রোগী আর রোগী, 'রোগ আর রোগ, রোগশয্যা আর আর্ত্তধ্বনি।

কিছুদিন এই ভাবে কাজ চালাইয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পৃথিবীর এ কি একঘেয়ে রূপ! এ কি ভীষণ অসহ্য কর্ম্মভোগ! রোগীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে, বিকৃত-দর্শন রোগীর মুখই ঘুম ভাঙ্গিয়া প্রথম দেখিতে হয়, রোগীর আকুল আবেদন আর করুণ আর্ত্তনাদ তাহাও অন্তরের স্তরে স্তরে অক্ষমতার গ্লানি ঢালিয়া দিয়া যায়। তাহার পক্ষে যেন আর কিছুই নাই—আছে রোগ, শোক, আর আর্ত্তনাদ। বিপুল জগতের পুলকস্পন্দন তাহার নিকট অপরিচিত অতিথি, দিনের দীপ্ত সূর্য্যালোক তাহার নিকট মসীলিপ্ত, রূপ রস, গন্ধের বিচিত্র উপভোগ তাহার নিকট একান্তই অর্থহীন।

এ যেন এক নূতন রাজত্ব। এখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, চন্দ্র সুষমা বিলায় না, পাখী গান ভুলিয়া যায়, রামধনু ব্যর্থ হইতে থাকে। গভীর অন্ধ অন্ধকার সমুদ্র ইহার একমাত্র রূপ। 'এ সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে তাহা দীর্ঘনিঃশ্বাসের আগুনে বাষ্প হইয়া যায়।

নবীন হাঁপাইয়া উঠিল। অহরহ এই বিষাক্ত অন্ধকারের বাষ্প গ্রহণ করিতে করিতে সে একদিন অসহ্য বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল—আর নয়, ইহার শেষ করিতেই হইবে। এই একঘেয়ে জগতের রূপ বদলাইতে গিয়া সে প্রাণান্ত করিয়াছে কিন্তু পারিল কই? এযে অশেষ, অনন্ত। এ বিষসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত তুলিতে সে পারিবে না।

সে বসিয়া ভাবিয়াই চলিয়াছিল—সমাগত রোগীর সংখ্যা দেখিয়া তাহার আর ধৈর্য্য থাকিতেছিল না। এমন সময়ে বিরক্ত কম্পাউণ্ডার আসিয়া বলিল—'এত আর পারা যায় না মশাই। আপনি আগের মত টাকা নিয়ে চিকিৎসা করুন। দেখছেন না—এ সব অদৃষ্ট, কর্ম্মফল। এর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।'

তাহার প্রাণ বিশ্বাস করিতে চাহিল না—এত লোকের এই একই অদৃষ্ট! কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা কি করা যায়? এই অনন্ত বিশীর্ণ জনসমুদ্র যে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল!

ইহার পর কিছুদিন কাটিতেই দেখা গেল, সে এই অদৃষ্ট মানিয়া লইয়াছে ও তাহার বাড়ীর সম্মুখে সাইনবোর্ডে লেখা—ভিজিট ১৬৲ টাকা—ধারে কারবার নাই।

কম্পাউণ্ডার আপত্তি করিয়া কহিল—'এত ভিজিট বাড়ালে রোগী একদম আসবে না। এ কি ক'রছেন?'

নবীন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বাঁচি তাহলে, আমি একটু একটু করে চিকিৎসা ছেড়ে দেব মনে করেছি। এ দুঃসহ জীবন আমার পোষাবে না। এ কি জীবন! ওঃ—সে শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু তবুও রোগী আসে। দলে দলে না হইলেও দুই চারিটি করিয়া। নবীন কিছু সুস্থ হইল; তাহার দিনের আলো, পাখীর গান আবার ফিরিয়া আসিল। যাহারা এখন আসে তাহারা গরীব নয়—তাহাদের দিকে চাহিলে প্রাণ শুকাইয়া উঠে না। ইহারা সামান্য অসুখে সময় থাকিতেই হাজির দেয়; মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তির সহিত মুখোমুখী হইয়া লড়াই করিতে হয় না। অসহায় দরিদ্রের

চরমাবস্থার করুণ কাকুতি শুনিতে হয় না—অল্পস্বল্পেই আরাম করা যায়, তৃপ্তি পাওয়া যায়।

নবীন অল্পদিনেই নিজেকে শক্ত করিয়া দাঁড় করাইল। আঁধারের রাজত্ব পার হইয়া আলোয় আসিয়া সে দুইহাত দিয়া আকণ্ঠ আনন্দসুধা পান করিতে লাগিল। যে এক-তিল অবসর পাইত না—সে আজ টাকার গাদায় বসিয়া দিবারাত্রির অধিক সময়ই স্ফূর্ত্তিতে কাটাইয়া দেয়। সে এখন নিজের বাড়ীতে একটা সঙ্গীতের মজলিস্ বসাইয়া দিল।

তবুও মাঝে মাঝে কেমন লাগে। বহুদূর হইতে মধ্যে মধ্যে রোগী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—'বাবু, এখানে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয় না?'

নবীন তখন প্রাণপণ বলে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উত্তর দেয়—'না।' সঙ্গে সঙ্গে সে ষোল টাকা ভিজিটের সাইনবোর্ডটি দেখাইতে ভোলে না।

সেদিন আড্ডা বেশ জমিয়াছিল। এম্-বি আসিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন—'তুমি খুব বুদ্ধি করে দাঁও মেরেছ হে। দিনকতক বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে' এখন লাখগুণে তার সুদসমেত আদায় ক'চ্ছ।'

নবীন উত্তরে মুচকিয়া হাসিল।

এম্-বি আবার কহিলেন—'মনে পড়ে একদিন আমাকে অর্থপিশাচ বলে' ঠাট্টা করেছিলে, মমতা নেই বলে' ঘৃণা করেছিলে?'

নবীন সটান উত্তর দিল—'ভুল করেছিলাম। যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে। দরিদ্রের অদৃষ্টই ঐ ভাবে মরা। আলো ওদের নেই, আনন্দ ওদের জন্যে নয়। দুঃখ কষ্ট ওদের নিত্যদিনের অভ্যাস, কাজেই স্বভাব। তবে কাদের জন্য ভাবি? চিরস্থায়ী অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, কাজেই শুধু শুধু অকারণ—'

নবীনের এই অভিজ্ঞতার প্রশংসাবাদে পঞ্চমুখ হইয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নবীনও উঠিল। এই সময়ে আকস্মিক কে একজন তাহার পা জড়াইয়া পড়িল—'বাবু রক্ষে করুন।'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে নবীন কহিল—'কে?'

—'আমি তনু। আপনাকে যেতেই হবে। টাকার অভাবে আর কারুর কাছে যেতে সাহস করি নি।'

নবীন কঠিন হইয়া বলিল—'আমার ভিজিট রাতে বত্রিশ টাকা।' উত্তরে তনু জোর করিয়া পা চাপিয়া ধরিল, কাঁদিয়া কহিল—'বাবু দয়া ক'রতেই হবে।' নবীনের পায়ের উপর দুই এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরিয়া পড়িল।

পায়ের ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া নবীন বলিল—'চালে খড় নেই বেটা, এসেছিস আমাকে নিতে! সস্তার ডাক্তার দেখ গে—যা।'

তনু উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল'—প্রাণের দায়ে এসেছি বাবু। কিন্তু আমরাও মানুষ ডাক্তার আপনারা কিন্তু রোগ সারাবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। বড় লোকের ঘরে যা সারান, তা রোগ নয়। রোগই আমাদের।'

—'তবে আসিস্ কেন?'

—'আসি কেন?' সে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল, বলিল—'আসি, আসি বাবু মন ভুলাতে। একটা সান্ত্বনা ত চাই, নইলে আপনাদের কোনও দরকার নেই আমাদের কাছে।'

সে চলিয়া গেল। নবীনও ধপাস্ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল—একটি প্রচণ্ড আঘাতে কে যেন তাহাকে বিকল করিয়া দিয়াছে।

তনুর কথাগুলি নবীনের হাড়ে হাড়ে গিয়া বসিল। সত্যই ত তাহারা রোগ সারাইতে পারে না। মৃত্যুকে রোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ডাক্তারি একটা মস্ত জুয়াচুরি, প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী! কিন্তু—'

সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। তনুর স্ত্রীকে সে দেখিতে যাইবে। সে দেখিবে, রোগ সারাইতে সে পারে কি না। জগতে ডাক্তারের দরকার আছে কি না।

কিন্তু যাওয়া তাহার আর ঘটিয়া উঠিল না। তাহার বন্ধুবর্গ আসিয়া পথ হইতে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গ্রামের থিয়েটার শুনাইতে লইয়া গেল।

তৎপরদিনই ডিসপেন্সারিতে বসিয়া নবীন খবর পাইল, তনুর স্ত্রী সেই রাত্রেই মারা গিয়াছে। হয় ত যখন সে থিয়েটারের আনন্দে মসগুল ছিল, তখনই।

কম্পাউণ্ডার বলিল—'হরিশ কবরেজ গিয়েছিলেন দেখতে। বললেন—শেষ করেই তবে এরা ডাক্তার ডাকে। ও অবস্থায় কি আর বাঁচে?'

'তা সত্যি।' সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গেল।

ইহার পরদিনই নবীন তাহার ডিসপেনসারি বন্ধ করিয়া দিল ও বিজ্ঞাপন দেখিয়া মাষ্টারির জন্য আবেদন করিল। তাহার আর ভাবিতেও সাহস হইল না যে, জগতে ডাক্তারের প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্র-শিল্পের ধারা

শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি শিল্প-সমালোচনার অধিকারী নই, যদিও শিল্প-চর্চ্চা ভালবাসি। শ্রোতা হিসাবে গীত-বাদ্যের নির্ব্বিরোধ শ্রোতাপদবাচ্য হ'তে পারি, কারণ আমার সম্বন্ধ ভাল-লাগা-না-লাগার উপর, তা'র কেরামতিসম্পর্কে আমার নিবিড় পরিচয় না থাকলে, তার সুর-তাল-মানের বিচার করা যায় না। সুতরাং তা করা অনধিকার প্রবেশ হ'বে। কিন্তু সমঝদার সমালোচকের দৃষ্টি ছাড়াও রস-বিচারে আর একটি দৃষ্টি আছে—সে-দৃষ্টি শ্রদ্ধাবানের দৃষ্টি,—বিশ্বাসীর দৃষ্টি। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে চিত্রমণ্ডপে কবিবরের নিজ-রচিত যে-সব চিত্র দেখ্‌লাম, সেগুলি আমার এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঞ্চয় হিসাবে সারাজীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইলো। চিত্রের মধ্য থেকে যেন নির্দ্দেশ পেলাম—চোখ তো শুধু প্রাণীর চোখ নয়, চোখে যে লুকান আছে জ্ঞানীর চোখ, ধ্যানীর চোখ কবির চোখ। সে-চোখ দিয়ে দেখলে বুঝবো নটরাজের লীলাখেলা সব দরকারী অদরকারী জিনিষের মাঝেই ছড়িয়ে আছে।

ছবিগুলি তাদের বাণীর ঝঙ্কারে আমাকে চঞ্চল করলো। কতবার মণ্ডপ হ'তে কিছু না বুঝেই বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু কি টানে বারে বারে ফিরে এলাম,—আবার দেখ্‌লাম, কিছু রসের আস্বাদ পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখবার বাসনা প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়ে উঠলো। এমনি ক'রে যেই শিক্ষার সুরু হ'ল, অমনি সব চিত্রের রূপ গেল বদলে,—মনে হ'ল বিশ্ব-স্রষ্টার শিল্প-নৈপুণ্য, যা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তারই সহজ রূপটীকে গোলমাল আর আবর্জ্জনার মধ্য থেকে কবীন্দ্র দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বেছে আলাদা করে নিয়ে, অনন্তের মাঝে সীমা টেনে টেনে মূর্ত্তি দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন।

মনে প'ড়ল তাঁর দৃষ্টির অবিশ্রাম খোঁজার সহজ স্বভাব, যার পরিচয় তাঁর কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। দৃষ্টির সেই সন্ধানী-আলো কবির এই শিল্পসৃষ্টির প্রত্যেক ছবিটীকে আপন কলা-মাধুর্য্যে নিজেকে গৌরবমণ্ডিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, মানুষ-শিল্পীর হাতের শিল্প-কুশলতার নয়ন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য বিস্তার না ক'রেও প্রত্যেকে এক একটী অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই যাদুকরী-মায়ামুক্ত না হ'তে পারলে এ চিত্রের পরিচয় অপরিজ্ঞাতই থেকে যাবে। তাই আপাত দৃষ্টিতে যা চোখে পোড়ছে তার বিপরীত দিক হ'তে দেখলুম। সঙ্গে সঙ্গে মায়ার পর্দ্দা সরে গেল, সকল চিত্রের অনন্ত রূপের স্বরূপ প্রকাশ পেল।

আমার মনে হয়—রবীন্দ্র-কাব্যের যে মূল কথা—যার সম্পর্কে কবি বারে বারে একটি কথার উল্লেখ করেছেন—ভূমা আর তার উপলব্ধি—রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলির মধ্যে প্রচলিত শিল্প-জগতের সংস্কার এড়িয়ে—তাঁর কাব্যের সেই মূল কথাটিই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বসৃষ্টির অন্তরের যে রূপ,—বাহিরের এই কদর্য্যতাকে প্রতিনিয়তই দৃষ্টির আড়ালে রেখে চলেছে—কবির সেই রূপের সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের যেমন ভাষায় দিয়েছেন তাঁর কাব্যে—তেমনি রেখায় দিলেন তাঁর এই চিত্রগুলিতে।

একটী চিত্রে দেখলাম, কতকগুলি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ এবং পানের পাতার মত—লম্বা, সরু সরু রেখায় অঙ্কিত আর তাদেরই উপর খানিক খানিক নীল, কাল, সাদা রং মাখান'—। ধীরে ধীরে মনে হ'ল ওরা যেন নাম-না-জানা কোন ফুলের, কোন পাতার গুচ্ছ, আচম্বিতে বাঁধা পড়েছে। দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন শক্তিই তাদের নাই, বাতুলের প্রলাপের মতই হাস্যোদ্দীপক—কিন্তু এদেরই মধ্যে কবি সন্ধান পেয়েছেন তাঁর মানস-রাজ্যের সুন্দরীর, তাঁর এই স্বভাব-সৃষ্ট রেখা-সমাবেশের মধ্যে খুব সুস্পষ্ট হয়ে আমার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠ্‌লো দণ্ডায়মানা, মুকুটভূষিতা মহারাণীর মতই একটী নারী মূর্ত্তি।

ছবি আঁকতে হ'লে তিনি জনপ্রিয় ছবিই আঁকতে পারতেন। কিন্তু কারও মন ভুলাতে তিনি চান নি, চেয়েছেন স্বভাবের সৃষ্টিটাকে তাঁর দেখা দিয়ে লিখে রাখ্‌তে। যদি কেও কবির হৃদয় দিয়ে চোখ দিয়ে দেখে, সেই বুঝ্‌বে। অন্যের কাছে হয় ত' এরা মায়াই থেকে যাবে।

দ্বিতীয় চিত্র, কবির করুণ হৃদয়ের সুস্পষ্ট ছায়া—একটী বৃক্ষকাণ্ড বহু বর্ষ ধ'রে পৃথিবীর বুকে শিকড় গেড়ে কত বসন্ত কত শরতের আনন্দ লুটে নিয়ে আজ জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে, রূপ-যৌবন সব গিয়ে এখন আছে কবরস্তূপের মতই নিজ শুষ্ক কাণ্ডটাকে যষ্টির মত খাড়া করে'। রৌদ্রের দাহন ও ঝঞ্ঝা-বর্ষার পীড়ন সইতে সইতে আকৃতিটা তার অনেকটা স্বজন-পরিত্যক্তা নির্য্যাতিতা নারীর মতই দেখাচ্ছে। চপল চঞ্চলমতি শিল্প-সমালোচক তার মধ্যে কবি-হৃদয়ের মূর্ত্তি না দেখ্তে পেয়ে একটা লম্বাগলা জীরাফ কল্পনা করলেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখ্লেন ঐ গাছটার মতই জীবনের সর্ব্বস্বহারা একান্ত নিরুপায় একটী অভিশপ্ত মাতৃমূর্ত্তি, নর-সমাজ তার মাতৃত্বের গৌরবকে স্বীকার করল না, সে লাঞ্ছিতা অবমানিতা। রেখার ভাষায় কবি তাই লিখে রেখেছেন। কে জানে হয়ত বা এ হ'তেও বড় ইতিহাস ওর পশ্চাতে লুকানো আছে।

তৃতীয় চিত্রে একটি নুড়ী—ময়লা জমে আঁচড় খেয়ে তাকে ক্লান্ত রমণীর অবয়বের মত অনুমান হচ্ছে। কি সুন্দর সংযোজনা!—সাধারণ পথিক কি কোন দিন পথে-পড়া নুড়ীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে না তার বাধাকে গ্রাহ্য করেছে? যখনই মনে হয়েছে ওটা চলার বাধা, তখনই হয় মাড়িয়ে গেছে, নয়ত বলপেটা করে দিয়েছে। নুড়ী হয়ত তাতেই কৃতকৃতার্থ হয়েছে। কারণ মাঝ-রাস্তার অহরহ জ্বালা ও কটূক্তি থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, একটী আগাছার শীতল ছায়ার তলায় এসে। কবি সেই নুড়ীটীর জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন একটী দীনা রমণী জীবন-ভিক্ষার আশায় পথপাশে বসে বসে সমস্ত দিনের রোদ ভোগ করে চলেছে, কেও দিয়েছে একটা পয়সা, কেও দেয় নাই, কেওবা কোম্পানীর রাস্তা কলঙ্কিত করার অপরাধে চোখ রাঙ্গিয়ে যেতেও ভুল করে নি। কিন্তু যখন এই দারিদ্র্য-সাধনার তার শেষ হ'ল, রৌদ্রের প্রখরতা কমে এলো, তখন ক্লান্তিতে অবসাদে ঝলসিত লতিকার মতই নিজ প্রসারিত কোলে মাথা রেখে রমণী ঘুমিয়ে পড়েছে—আর চুলগুলি তার উলটে এসে পায়ে তার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দুঃখহারী তার দুঃখ হরণ করেছেন, পৃথিবীর নির্য্যাতন আজকের মত তার শেষ হয়েছে।

একটি কথা কখনই ভোলা চলে না যে প্রচলিত চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্র হ'তে এ চিত্রগুলি পৃথক্ শ্রেণীর। এগুলি কবি-শিল্পীর কল্পনা, তাই সাধারণের দেখাটাকে চরম দেখা বা অভ্রান্ত বলে' ধরে নেওয়া সহজ নয়। সেইজন্য দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে কবি-কল্পনার ও চিন্তাশীল হৃদয়ের একত্র সমাবেশ এ চিত্রগুলির বিচারে অপরিহার্য্য। মনকে এম্‌নি স্তরে নিয়ে চতুর্থ চিত্রটীকে দেখলুম—পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আগমন-রহস্যটুকু কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে—এক প্রভাতে পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত পুষ্পগুচ্ছটী তার সব সৌরভ সৌন্দর্য্য নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আজ সৌরভহীন, সৌন্দর্য্যহীন, নিঃস্ব হয়ে বিদায়ের অপেক্ষায় রয়েছে, কখন্ আর একটী নূতন গুচ্ছ এসে তার স্থান অধিকার কোরবে, সেই সময়টুকু পর্য্যন্ত। তার রসহীন এলায়িত দলগুলিকে নিস্তেজ ডালটী আর ধরে রাখ্‌তে পারছে না। সে নুয়ে পড়েছে। তাকে জগতের আর প্রয়োজন নাই কারণ সে বাসি হয়েছে, সে কুব্জ স্থবিরের ন্যায় সব আশা আকাঙ্ক্ষা সংযত করে রেখেছে নূতনের যাত্রার উদ্দেশে বিদায় নেবে বলে'। আমার মনে—হ'লো এই ভাব-মূর্ত্তিই কবির এই চিত্রটীতে তার যাত্রা সুরু করেছে, দর্শকের করুণা কুড়োতে কুড়োতে

পঞ্চম চিত্রটী গ্যালারির একটী কোণে অনেক উঁচু থেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অন্যান্য ছবিগুলিতে যদিও বা রঙ-এর হাসি-খেলা আছে, এর তাও নাই—এ কেবল একটী রেখাচিত্র। ছবিটী দেখে মনে হ'ল, বিশ্বরাজ্যের বিশ্বকবি যেদিন আপন আসন কায়েম কোরে নিতে যাত্রা করলেন, সেদিন কবি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নয়নে, গদ্‌গদ হৃদয়ে দেখলেন, অনন্তরূপৈশ্বর্য্যশালী মহাসমুদ্র হ'তে কবির ভাগ্য-বিধাতা বিরাট তরঙ্গের রূপ-মহিমায়, বিপুল আনন্দে তাঁর রাণীর বড় পুত্রকে মহাসম্মানিত আসনে সমাসীন করবার জন্য স্পন্দনস্ফীত, উছলিত বক্ষে অভিনন্দিত করছেন, কবি সেই অভাবনীয় অঙ্কনাতীত রূপকে রেখাবদ্ধ ছন্দে ধরেছেন রূপাতীত ভাবে। তাই এই মহাসাগরের বিরাটকায় পুরুষরূপী তরঙ্গশীর্ষটী অজ্ঞানের কাছে অজ্ঞাত হ'য়ে থাকছে। এটির অঙ্কন-মাধুর্য্য এত উঁচু স্তরের যে মনে

হয় যে আর কোনরূপেই ইহার বিশেষত্ব ফুটে উঠ্‌তে পারত না, সর্ব্বপ্রকার রূপসৃষ্টি ও বর্ণ-বৈচিত্র্য এই ভাবধারার কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়।

আমি জানি, অনেকে এ কথা বলবেন যে, রেখামাত্র সম্মুখে রেখে কল্পনা করা যেতে পারে যে, সেই রেখারই অন্তরালে অসীম নীলাকাশ রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যঙ্গোক্তি হিসাবে এ উক্তি শোনায়ও ভালো—। রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রগুলি সম্পর্কে এমন কথা শোনাও গেছে—এর উত্তর আমি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দিয়েছি—ত্রুটি-সন্ধিৎসু সমালোচক আর শ্রদ্ধাবান ভক্তের দৃষ্টিতে পার্থক্যের উল্লেখপ্রসঙ্গে।

এই ছবিগুলি সম্পর্কে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এদের উৎপত্তির ইতিহাস। লেখার মধ্যে যে-সব কাটাকুটি হ'তো সেইগুলিকে রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা কবির চির-কালকার অভ্যাস—তাঁর বহু পূর্ব্বের পাণ্ডুলিপিতেও সে-পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব কাটাকুটি সৌন্দর্য্য-পূজারী কবির লেখনীসহায়ে অর্থহীন তুষারকণা কি শিশিরবিন্দুর অপরূপ মাধুর্য্যে বিকশিত হয়ে উঠতো।—কবি এখনও তাঁর কলম দিয়েই আঁকেন, কদাচিৎ কলমের উল্টো দিকও ব্যবহার করেন—রঙ দিতে তাঁকে মাঝে মাঝে আঙুলও ব্যবহার করতে হয়।—এই রহস্যময় জন্মেতিহাস যাদের, তারা যে সংসারের আর পাঁচটা জিনিসের মতোই সহজবোধ্য এবং স্বাভাবিক হবে—এমন প্রত্যাশা করা ভুল।—এদের নামকরণ বিষয়ে কবি বলেছেন—"রূপসৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার কাজ, তারপর নামবৃষ্টি অপরের।"—

আর একটী ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করে এই প্রবন্ধটী শেষ কোরব। এই ছবিটীকে বুঝতে আমার সমস্ত অনুভূতি একাগ্রভাবে বহুক্ষণ ধরে নিয়োজিত করতে হয়েছিল। কতক্ষণ আমি দেখেছি তা ঠিক বলা যাবে না, তবে যখন এর অনুভূতি ও উপলব্ধির কিরণচ্ছটায় অন্তরদেশ আমার রাঙা হ'ল তখন আনন্দে—আমি হাল্‌কা হয়ে উঠেছিলুম। জীবনে এ আনন্দ-অনুভব দু'একবারের বেশী ভাগ্যে ঘটে নাই। কবির মহনীয় রূপ-লালসার এই ছবিটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বর্ণ-সমাবেশে, নির্ম্মাণ-কুশলতায়, ভাব-সংযোজনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানু-ভূতির দক্ষতায় এ ছবিটী অতুলনীয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল,—এক নিদাঘ দ্বিপ্রহরে নির্জ্জন সাধন-প্রকোষ্ঠে বসে' কাঞ্চন-বরণ, সুঠামতনু, সৌম্যমূর্ত্তি শিল্পী অলোকসামান্য চিন্তার প্রেমপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মত ধীর স্বরে জল-আনয়নের আদেশ দিলেন। একটী স্ফটিক পাত্রে জলদেবী অনতিবৃহৎ একখণ্ড বরফ মাথায় করে' টেবিলের উপর এসে পৌঁছানে ধ্যান ভেঙ্গে যখন কবি শীতল জলপাত্রের দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চাইলেন, তখন মধুর ঝঙ্কারে তাঁর কানে কানে কে গেয়ে গেল, 'কবি দেখ তোমার জন্য আমি স্বর্গ উজাড় করে' কি অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করে রেখেছি—চোখ তোমার জুড়িয়ে যাক্, হৃদয় তোমার শীতল হোক্, জলে তোমার তৃষ্ণার শান্তি নেই, আজ রূপেই তোমার পিপাসার শান্তি হোক্।' আদর-শিহরণে কবি চমকিত হয়ে দেখ্‌লেন, কি অপরূপ! প্রকোষ্ঠের দরজায় দরজায়, জানালায় জানালায়, নীল পর্দ্দা ঝুল্‌ছে, দেওয়াল ও ছাদে শুভ্র রঙ, পার্শ্বে ফুলদানে লাল, পীত কত কি ফুল আর তাঁর নিজের পরিধানে রৌদ্রাভ গরদ, আর এদের রঙ-বেরঙ-এর রশ্মি প্রতিফলিত হয়েছে সেই রজত-শিরস্ত্রাণভূষিত জলপাত্রে। কবি দর্শক হয়ে তার মধ্যে বিশ্বশিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য নির্নিমেষ নয়নে দেখ্‌ছেন। তুষার গোলে এসে পড়ছে নীচ দিয়ে, যেন পাহাড় থেকে ঝরণা নেমে চলেছে, তারই আবর্ত্তনে সৃষ্ট হয়েছে পাহাড়, পর্ব্বত, গাছপাতা কত কি, আর তারা এই প্রতি-ফলিত রঙিন রশ্মিকে নিজের নিজের প্রয়োজনমত অধিকার করে নিয়ে, বিশ্বশিল্পীর মনের কথাটি সকলকে জানিয়ে চলেছে। কবি-শিল্পীর রূপ-তৃষ্ণার শান্তি হ'ল তারই অংশ জন সাধারণে বিলিয়ে দিয়ে।

তাঁকে আমাদের নমস্কার! তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ

মুক্তি

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

আমাদের সেই ধর্ম্মদাস…

ধর্ম্মদাস ধার্ম্মিক, কারণ সে সহস্রবার জপ করে,—ফোঁটা তিলক কাটে ও প্রকাণ্ড হরিনামের থলির ভিতর হাত রাখিয়া সর্ব্বদার জন্ম মালা ঘোরায়। লোকে বলে সে মহাপুরুষ, মহাত্মা। কিন্তু, এই রক্তমাংসের পৃথিবীতে কেই বা………………কিন্তু সে কথা থাক্। ধর্ম্মদাসের কথাই বলি। শুদ্ধ মাত্র একদিনের সামান্য দৌর্ব্বল্যে, মাত্র বুদ্ধির দোষে, এক সময় সে যে পাপ করিয়াছিল, আজ আমি অকারণ তাহাব সেই অতীত জীবনের মসীময়, কলঙ্কময় ইতিহাসের গুপ্ত পাতা 'ক'খানি সর্ব্বজন-চক্ষে যে ধরিতেছি, তা ঠিক নয়। কে কখন কোন্ পঙ্কে পড়িবে, কে জানে! কিন্তু তবু মানুষকে, মানুষের এই দুর্ব্বল মনকে জানিয়া শুনিয়াও যাহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তির উপর সাধু-সন্ন্যাসীর আবরণ জড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আর প্রচার করিতে চায় যে সে ইন্দ্রিয়জয়ী—তাহাদিগকে ভয় করি। হয়তো বা ঘৃণা করি। আমাদের ধর্ম্মদাস কেন, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মদাসেরই এই কথা। মুখে হরিগুণগান,—কণ্ঠে মালা—সর্ব্বাঙ্গে তিলক—মস্তকে শিখাই লোককে ধর্ম্মের দাস করে না।

ভুল কে না করে,—ভুল সকলেই করে। কিন্তু অতি-হিসাবী কৃষ্ণদাস যখন পুত্রের উন্মত্ত মতি গতির দুরন্ত তরঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য, সম্মুখে এক বালিকাকে খাড়া করিয়া দিলেন,—তখন এক মহা ভুল করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণদাস ভাবিয়াছিলেন,—বুঝি বা পুত্র-বধূ আসিলে ঐ উন্মত্ত তরঙ্গ শান্ত হইবে,- কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল,—তরঙ্গের গতিরোধ করিবার হিসাবে যাহাকে ব্যবহার করা হইয়াছিল—তাহা একদিন ভাসিয়া প্রবল বন্যার দুরন্ত ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু সে এর শেষের ইতিহাস। কৃষ্ণদাস গৃহস্থ—অবস্থা মন্দ নয়—বলিতে গেলে স্বচ্ছল। মুদিখানার দোকান করিয়া এক পয়সার তেল নুন বিক্রী করিয়া যাঁহারা একটী একটী পয়সা জমাইয়া সেই তৈলসিক্ত তামাকুলিপ্ত তাম্রখণ্ড দ্বারা দ্বিতল বাড়ী ফাঁদাইতে পারেন, তাঁহাদের ধৈর্য্য, তাঁহাদের সাধনা, কোন মুনি ঋষির কঠোর তপস্যার চেয়ে কম নয়। এ হেন দুঃখ-সাধক কষ্ট-সহিষ্ণু কৃষ্ণদাসের পুত্র তারাপদ তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে—কোন কর্ম্ম না করিয়া অষ্ট-প্রহর পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল,—এ দৃশ্যে কেন না তাঁহার পিতৃ-ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া যাইবে!

একদিন দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণদাস কহিলেন, 'কই সে হতভাগা,—গেল কোথা—!' স্বামীর সাড়া পাইয়া হরিমতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন, কি হ'য়েছে!' রাগে দিশাহারা হইয়া, কৃষ্ণদাস গাঁক্ গাঁক্ করিয়া উঠিলেন,—হবে, তোমার মুণ্ডু……অতবড় ধাড়ী,—সে লক্ষ্মীছাড়া গেল কোথা? হরিমতির বুঝিতে বাকী রহিল না, 'লক্ষ্মীছাড়া' ও 'ধাড়ী'—কে? কিন্তু এক্ষেত্রে, সে 'লক্ষ্মীছাড়া'র কি দোষ তাহাও অজ্ঞাত রহিল। শুধাইতে যাওয়াও বিড়ম্বনা—যে পুরুষ মানুষ আয় না করিয়া ব্যয় করে, তাহার আবার দোষের বাকী রহিল কি? এ তো জানা কথা।

কিন্তু এবারে অপরাধ আরও গুরুতর—

কয়দিন হইতে তারাপদর সন্ধান ছিল না। অভুক্তা অশ্রু-সজলা হরিমতি কৃষ্ণদাসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর যে সংবাদ আসিল, তাহাতে দুই গালে হাত দিয়া কৃষ্ণদাসকে বসিয়া পড়িতে হইল। সংবাদ এই, লক্ষ্মীপুরে মালতী বাইজীর গান চলিতেছে,……তারাপদ মালতী বাইজীর নিকট গান শুনিতেছে ও শিখিতেছে। আরও সংবাদ যে—সে তাহার সহিত অন্যত্র প্রস্থান করিবে।

তেল নুন বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণদাস জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন—শুধু তিনি তাহাদের দরের হিসাবই জানেন। বাইজীর খবর কোন দিনই করেন নাই ও জানেন না। তবে এইটুকু ধারণা ছিল যে, বাইজী নাম্নী স্ত্রীলোকেরা

কখনই সন্ন্যাসিনী নয়……তাহারা জীবন্ত পুরুষ পাইলে তাহার রক্ত-মাংস চুষিয়া একরকম মৃত অবস্থায় পরিত্রাণ দেয়। এ খবর তাহার চক্ষের উপর ভাসিতেছে।

কৃষ্ণদাস পুত্র-অনুসন্ধানে যখন লক্ষীপুরে পৌঁছাইলেন,—তখন রাত্রি হইয়াছে। বাজারের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন,—আজ আর গান হইবে না। গান না হোক্ ক্ষতি নাই—শুধু মালতীর বাসস্থান কোথায় জানিতে পারিলেই হয়। তাহারও সন্ধান হইল। গঙ্গার ধারে বাগান-বাড়ীর মধ্যে মালতীর আড্ডা। কৃষ্ণদাস কপালের ঘাম মুছিয়া চলিতে লাগিলেন। আকাশে তখন চন্দ্র উঠিয়াছে—রাস্তাঘাট উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। কৃষ্ণদাস বাগান-বাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটী ঘর হইতে আলো, সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে; কৃষ্ণদাস ধীরে ধীরে প্রায় দুয়ারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, বাইজীর পায়ে একরাশ ঘুঙুর; সে নাচিতেছে ও গাহিতেছে—

"সইরে যৌবন জনমের মত যায়
সে ত আশাপথ নাহি চায়।
একে আমার যৌবন-কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো,
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল
ও সইরে—।

গান চলিতেছে, তৎসহ বাঁশী, হারমোনিয়ম ও তবলা! কে একজন টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া, বাইজীর কোমর জড়াইয়া তাহার মুখের নিকট কাঁচের গেলাস ধরিল। উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে বিলম্ব হইল না যে, সে তারাপদ। কৃষ্ণদাস বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্ত্তনাদের মত ধ্বনিত হইল—তারা—।

কৃষ্ণদাস হিসাবী লোক। বাড়ী ফিরিয়া পুত্রের সম্বন্ধে হিসাব করিয়া ঠিক করিলেন, ঐ দুরন্ত বন্যার বাঁধ চাই…।

তাই বাঁধ হিসাবে রাধারাণীকে পুত্র-বধূ করিয়া ঘরে আনিলেন।

•

রাধারাণী দেখিতে সুন্দরী—কাজে কর্ম্মে সুন্দরী—কথা-বার্ত্তায় সুন্দরী। মনোমত পুত্র-বধূ পাইয়া কৃষ্ণদাস খুসী হইয়া উঠিলেন! কিন্তু এই খুসী বেশীদিন রহিল না—মাত্র তিন দিনের জ্বরে একদিন কৃষ্ণদাস নিঃশব্দে চক্ষু বুঁজিলেন।

কৃষ্ণদাস চক্ষু বুঁজিলেন বটে—কিন্তু আর সব এখন জীবন্ত……। কিন্তু সেই জীবন টিকাইয়া রাখিতে হইলে,—তাহার উপকরণ চাই। তাই তারাপদ পিতৃ-পরিত্যক্ত দাঁড়ি-পাল্লা আর কাঠের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া নুন আর তেল ওজন সুরু করিয়া দিল।

হরিমতি বুঝিতে পারিলেন, ছেলে বৌকে ভালবাসে না। কিন্তু কেন? অমন রূপ, অমন গুণ,……হরিমতি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বৌকে কোলের কাছে টানিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে এক এক সময় হরিমতি কাঁদিয়া ফেলেন। নূতন করিয়া কৃষ্ণদাসের কথা মনে হয়,—নিদারুণ ভাবে বার বার প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে, জীবন অসহ! কিন্তু পরক্ষণেই পুত্র-বধূর সুকুমার ঢলঢল মুখের দিকে তাকাইয়া মনে হয়, 'আমি মরে' গেলে এর কি হ'বে…।' ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া, কোথাও ইহার অবলম্বন করিবার মত একগাছি তৃণও হরিমতি দেখিতে পান না।

রাধারাণী স্বামীকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে—কিন্তু সর্ব্বো-পরি সে তাহাকে ভালবাসিতে চায় ও ভালবাসা চায়। কিন্তু তারাপদ তাহার এই ভালবাসাকে—ন্যাকামি-পর্য্যায়ে ফেলিয়া ভ্রূকুটী করে, রাধারাণী তটস্থ হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। স্বামী যে তাহাকে হেলা করে—ভালবাসে না…এই লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারে না। তাই দিনরাত মাথা হেঁট করিয়া স্বামীর অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে ফেরে।

দুপুরে দোকান বন্ধ করিয়া তারাপদ বাড়ী ফিরিয়া আসে। তাহার পদ-শব্দ শুনিয়া রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়ায়… জলের গাড়ু…গামছা ঠিক করিয়া, পাখা হাতে নিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই তারাপদ ভ্রূকুটী করিয়া কহে, 'বেশ তো, ও ঘরে ছিলে, আবার এখানে আসা কেন? যত সব ঢং!' রাধারাণী লজ্জায় এতটুকু হইয়া, যায়। তারপর এক সময় সরিয়া যায়। কিন্তু তারাপদর খচ্ করিয়া কোথায় যেন বাজে, ওতো সরিয়া যাইবেই ..কিন্তু আর একবার তাহার মুখের দিকে দু'খানি ভীরু চোখ তুলিয়া তাকাইয়া যদি সরিয়া যাইত…।

একটু অতৃপ্তির সাড়া—সারা বুকখানিতে বাজিয়া উঠে।

তারাপদ স্ত্রীকে ভালবাসে না—কিন্তু কেন? তারাপদর মন হইতে, তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই…ও য

চায়, তা সবখানি হয় তো রাধারাণীর মধ্যে নাই। সে একবার তীব্র মদ্য পান করিয়াছে···মালতী বাইজীর পরিপূর্ণ দেহের রূপের তরঙ্গ, কণ্ঠের মধুগান · বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ, বিচিত্র মোহভরা নৃত্য· ·ইহার পাশে রাধারাণীকে একটী ভীরু-প্রদীপ শিখার চাইতেও সামান্য লাগে। স্ত্রীকে ভালবাসা, তারাপদর পক্ষে অসম্ভব। আরও কারণ ছিল – কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর পূর্ব্বের আর্থিক স্বচ্ছলতার অনেকখানি রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। তারাপদ শুনিয়াছিল, "স্ত্রীভাগ্যে ধন"। এ কথা তারাপদ অবিশ্বাস করিতে পারে না···পাঁজীপুঁথির উপর তাহার অতি ভক্তি। তাহার কেবলি মনে হইত, পিতার এই মৃত্যু··· আর তাহাদের অচলা লক্ষ্মীর তিরোভাবের মূল হেতু—এই অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

হরিমতির জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এ কথা সত্য। তাই একদিন পরকালের কাজের জন্য, পাড়ার পাঁচ-জনের সঙ্গে তিনি তীর্থ করিতে প্রস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে যখন ভাঙ্গন সুরু হয়,—তখন সেই ভাঙ্গনকে পুনর্গঠিত করিবার ইচ্ছা মানুষের চলিয়া যায়···এবং স্বভাবতই তপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত এই কথা বাহির হয়, "আর পারি নে"।

তারাপদরও হইল তাই! একদিন দেখা গেল, – বহুদিনকার সচল দোকান অচল হইয়া উঠিয়াছে এবং দোকানের দরজায় বৃহৎ বৃহৎ দুটী তালা।

এমনি সময়, এই সংসারে আমাদের ধর্ম্মদাসের প্রবেশ। ধর্ম্মদাস যে সে ব্যক্তি নহেন, তিনি সাক্ষাৎ এই ভব-সিন্ধু পার করিবার একমাত্র কাণ্ডারী। ইনি কৃষ্ণদাসের কর্ণকুহরে ইষ্ট মন্ত্রদাতা—সেই গুরুর একমাত্র পুত্র। অধুনা পিতৃদেবের ·-গমনের পর···সেই পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনের এবং পাপীবৃন্দকে ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ করাইবার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এখন ইনিই গুরুদেব।

ধর্ম্মদাস আসিল। নধর গোলগাল তোয়াজের দেহটী··· সর্ব্বাঙ্গে ছাপ···মস্তকের পিছনে সু-পরিচ্ছন্ন একটী শিখা, কণ্ঠে হরিনামের মালা, মুখে হরিগুণ গান।

তারাপদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,··· তারপর রাধারাণী। ধর্ম্মদাস তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিল—এস মা,—আহা মা আমার সাক্ষাৎ রাধারাণী। বলিতে বলিতে তাঁহার মুখখানিতে এক অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুপুরে তারাপদ কোথায় যেন বাহির হইয়াছে। গৃহে রাধারাণী—। তপ্ত দিনের হাওয়ায় ক্লান্ত হইয়া মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িয়াছে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। কোথাও কোন শব্দ নাই— চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নিঝুম। গুরুদেব পা টিপিয়া টিপিয়া তারাপদর শয়ন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে রাধারাণী নিদ্রিতা মৃদু নিঃশ্বাসের তালে তালে বুক উঠিতেছে, নামিতেছে···বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ সরিয়া গিয়াছে। ওর পাতলা ঠোঁটদুটীর উপর ছোট্ট কপালটীতে মুক্তাবিন্দুর মত সারি সারি ঘামের ফোঁটা—। গুরুদেব দুই চক্ষুতে উদগ্র লালসা লইয়া বিস্ফারিত নয়নে শিষ্যার সৌন্দর্য্য-রসে ডুবিয়া গেলেন। হঠাৎ একসময় কোথায় কিসের মৃদু শব্দ হইতেই গুরুদেব চকিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

সন্ধ্যার পর যথারীতি আড়ম্বরের সহিত আহ্নিক সারিয়া দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া ধর্ম্মদাস বসিলেন। পায়ের তলায় সস্ত্রীক তারাপদ হাতযোড় করিয়া উপবেশন করিল। ধর্ম্মদাস নিমীলিত নয়নে কহিতে লাগিলেন,—"বাবা, এই দুঃসময়ে পৃথিবীতে সুখ আর নেই,—সবই তিনি করাচ্ছেন—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে সব চলছে। এই পৃথিবীতে সবই অসার, সবই তুচ্ছ! শুধু একমাত্র হরিনামই সার। আহা ওই যে গান আছে— ও যার নয়ন ভূষণ হরি দরশন—মুখের ভূষণ হরিগুণ গান। মানবজাতির সখা তিনি,—বন্ধু তিনি,—ত্রাণকর্ত্তা তিনি—তাঁর পায়েই সুখ দুঃখ সব অর্পণ করে, দুঃখ দুশ্চিন্তা চাঞ্চল্য হ'তে মুক্তিলাভ ক'রতে হবে। কিন্তু বাবা ও পথ হচ্ছে, বড় শক্ত—বড় কঠিন। জান তো বাবা—ঐ একটা কথা আছে, ক্ষুরস্য ধারা—ক্ষুরের মতই ঐ পথ বড় ভীষণ, বড় জটিল। তবে হাজার বিপজ্জনক পথ হোক, হাজার ক্ষুরের ধারার মতন তীক্ষ্ণ তার ধার হোক, গুরুর শরণ লও, সব কাজ সু-সাধ্য হবে, সহজ হবে! শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জ্জুনকে ব'লেছেন,—যুদ্ধ কর, শত্রু ধ্বংস কর— কিন্তু আমাকে স্মরণ কর...মামেকং স্মর।"

পরদিন সকালে গুরুদেব বিদায় নিলেন।

কিন্তু গুরুদেবের এ বক্তৃতা বৃথায় গেল। একদিন তারাপদর অন্তরের পশুটা রুখিয়া উঠিল, শুধু এই কথা! তাহার মনে হইতে লাগিল চোখ বুঁজিলেই পৃথিবী অন্ধকার।

পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কেহই কাহারও নয়। এই দুনিয়ায় তাহার আগমন হইয়াছে একাকী এবং যেদিন সে চক্ষু বন্ধ করিবে, সেদিন সেই অজানিত রাজ্যে একাকীই তাহাকে যাইতে হইবে। তবে কেন এই চিন্তা - কেন এই প্রাণপাত পরিশ্রম। শুধু একা তার দেহ—আর তার অন্তরের উদগ্র কামনা। এরাই আপন! এদেরই জলন্ত যজ্ঞে উপযুক্ত আহুতি দেওয়াই তাহার প্রধান ধর্ম্ম! মালতী বাইজীর কথা ভাবিতে ভাবিতে, তারাপদর মনে স্ফুটতম রেখায় এই সত্য ফুটিয়া উঠিল—এতদিন বৃথাই গিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে এক উজ্জ্বল প্রভাতে রাধারাণী দেখিল, স্বামী তাহাকে অগাধ সমুদ্রে ভাসাইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাধারাণী দেখিল, চক্ষের সম্মুখ হইতে পৃথিবী যেন ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। তারাপদ জমার ঘরে শূন্য রাখিয়া — দেনার ঘর ভারী করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। রাধারাণীর দিন চলেনা। যাহারা পূর্ব্বে তারাপদকে দোষী করিত, আজ স্পষ্টই তাহারা জানাইল—আর কিছুই নয়, দোষী এই হতভাগিনী…। স্বামীকে যে স্ব-বশে রাখিতে পারেনা, সে হতভাগিনী কালামুখী সমাজে মুখ বাহির করে কি লজ্জায়—ঘেন্না হয়না, মাথা কাটা যায় না—আরে ছিঃ—শতেক ছিঃ।

স্বামী-সোহাগিনীরা তাহাদের আঁচল-ধরা স্বামীদের আপাদ-মস্তক আর একবার ভাল ভাবে দেখিয়া লইয়া রাধারাণীর কথা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যায়। অবাক্ হইবার কথাই বটে! স্বামী তাহাদের আঁচল-বাঁধা—সে গিট খোলা শক্ত! যাই হোক, একবাক্যে সকলেই কহিলেন—আঃ ছিঃ, ওটা মেনিমুখী পোড়া-কপালী - !

রাধারাণীর উনানে হাঁড়ী চাপেনা, চাল দিয়া জল পড়ে। বস্ত্রে লজ্জানিবারণ দুঃসাধ্য। ও পাড়ার গয়লাপিসি আঁট-সাঁট গঠন—মুখ পান-দোক্তায় রসাল। বেড়াইতে আসিয়া রাধারাণীকে কাছে টানিয়া কহিলেন—ওমা একি হয়েছে হাল,—আরে আমার পোড়া কপাল! গয়লাপিসি চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন—বড় দাগা পেয়েছিস্ মা; দাগা দিতে ওরা বড় কম নয়। কাঁদিস্‌নে মা, কাঁদিসনে। যে যন্ত্রণায় আমি ভুগছি, সে জানেন ঐ একমাত্র ব্যথার ব্যথী দয়াল ঠাকুর। আমি বলি, একি পাথর চাপা কপাল করেছিলাম। দুঃখের কি শেষ নেই ঠাকুর! নে মা ওঠ—ওঠ, চোখের জল ফেলিসনে। গয়লা পিসি রাধারাণীকে কোলের আরও কাছে টানিয়া লইয়া, চোখ মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর কানে কানে কহিলেন, "আহা, রাধারাণী যেমন নামটী, তেমনি মা আমার রূপে রূপময়। এ ভুবন-ভোলান রূপে, সে ড্যাকরার মুণ্ডু কেন ঘুরবেনা।

তীরের মত মুখ তুলিয়া রাধারাণী কহিল—কার পিসি?

গয়লাপিসি রাধারাণীর নরম গালে টোকা মারিয়া খুব আস্তে কহিলেন—রাজরাণী হয়ে থাকবি, গহনায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়ে দেবে—সিন্দুক ভরা কত গহনা—কত কাপড়। তোকে মাথায় করে রাখবে। কে শুনবি, ঐ সীতে পতি—বড় ভাল লোক—বড় ভাল লোক। আমি এই কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, আমাদের রাধা কি এমন কপাল করে এসেছে—আরও কিছু হয়তো তাহার বলিবার ছিল, রাধারাণী তীব্রকণ্ঠে কহিল—পিসি, থাম,—এই বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া তর্জ্জনী উঁচাইয়া কহিল—যাও—যাও এখুনি, বলছি।

গয়লাপিসির বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বড় অসতর্কে বড় নরম জায়গায় আঘাত দেওয়া হইয়াছে। তিনি আর একবার রাধারাণীর পুরন্ত দেহখানির দিকে চাহিয়া সজল চক্ষে বাহির হইয়া গেলেন।

গয়লাপিসি চলিয়া গেলে রাধারাণী গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর এক সময় মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, আজ বহুদিন পরে প্রাণ খুলিয়া ডাকিল—ওগো!

রাধারাণী বুঝিতে পারে, আর এখানে থাকা চলিবে না, কিন্তু যাইবেই বা কোথায়। স্বামীর কোন সন্ধান নাই—তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছে, মালতীর সহিত সে নাকি কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী রাত্রে ভাল করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া নিদ্রাহীন নয়নে রাত্রি কাটায়—কিন্তু কানে আসে একটা শব্দ, যেন বাহিরে কেহ শীষ দিতেছে—যেন কেহ দরজার শিকলটা বাজাইয়া দিতেছে। সে দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া সকাতরে ডাকে, ভগবান দয়াল ঠাকুর—

কিন্তু দয়াল ঠাকুরের কর্ণে, এই নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল না। তিনি তেমনি প্রশান্ত -তেমনি নির্ব্বাক্— তেমনি বধির হইয়াই রহিলেন।

এমনই করিয়া রাধারাণীর সম্মুখে যখন দিনে দিনে ধরণীর সূর্য্য ম্লান হইয়া আসিতেছে, পৃথিবী সরিয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে, - মাথার উপর অনন্ত কূলহীন আকাশ যখন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে,—রাধারাণীর বক্ষ যখন ক্ষুদ্র শীতার্ত্ত বিহঙ্গ-শিশুর মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে— এমনি সময়ে পুনরায় গুরুদেব ধর্ম্মদাসের আবির্ভাব!

ধর্ম্মদাস পূর্ব্বে সব শুনিয়াছিল। এইবার বুঝিল যে, সুযোগ উপস্থিত—অতএব কাল বিলম্ব দোষের। তাই একদিন গুরুদেব শিষ্যার সম্মুখে অভয়বাণী লইয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরুদেবকে দেখিয়া রাধারাণী সেই যুগল পাদতলে, মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস একহাত শূন্যে প্রসারিত করিয়া কহিলেন—কোন ভয় নেই মা, চ— আমার আশ্রয়ে রইবি।

চোখের জল মুছিয়া রাধারাণী ভাবিল দুঃখ বুঝি ঘুচিল। পরদিবস দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, গুরুদেবের সহিত রাধারাণী ট্রেণে উঠিয়া বসিল। গুরুদেব আসিয়া নামিলেন হাওড়ায়। ট্যাক্সিতে উঠিয়া গুরুদেব কহিলেন এস মা— আর বেশী দেরী নাই। ইঙ্গিতে ট্যাক্সি ছুটিল।

ট্যাক্সি আসিয়া থামিল এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে—একটী অন্ধকার বাড়ীর সম্মুখে। বাড়ীর ভিতর হইতে এক প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল।

রাধারাণীর পানে চাহিয়া কহিল—বাঃ, খাসা মেয়ে— বেশ খাসা।

প্রৌঢ়ার চক্ষে সর্ব্বভুকের অসহিষ্ণু অনন্ত ক্ষুধা।

ধর্ম্মদাস রাধারাণীকে লইয়া সেই অন্ধকার গৃহের এক ক্ষুদ্র কুঠুরীতে উঠিয়া বসিলেন।

তারপর ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল—রাত্রি আসিল—রাত্রি বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস কোথায় বাহিরে গিয়াছে— আর সেই ক্ষুদ্র কক্ষে একাকিনী রাধারাণী। নিঃশব্দ রাত্রি— অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে ক্লান্তিতে—অবসাদে রাধারাণী ঘুমাইয়া পড়িল।

তারপর এক সময় শোনা যায় অসহায় নারীর ক্রন্দন। কিন্তু কে শুনিবে—রাত্রির কর্ণ বধির—উপরের যিনি সব দেখিতেছেন, সব শুনিতেছেন—তিনিও নির্ব্বাক্, তিনিও বধির।

আবার প্রভাত হয়—রাত্রি ফুরাইয়া যায়,—রাধারাণীর ঘর হইতে কোন শব্দ নাই, কোন সাড়া নেই। সেই প্রৌঢ়া রমণী এক সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া যা দেখিল, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাহার অভ্যস্ত কণ্ঠও মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। রাধারাণী ধূলিধূসরিত—রক্তাক্ত অবস্থায়—অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে একাকিনী মেজেয় শুইয়া আছে। চক্ষু দুটী নিমীলিত— নিঃশ্বাস নাই—বামস্তনের একদিক রক্তাক্ত। আর ওর প্রাণহীন দেহের পার্শ্বে ছোট্ট পুতুলের মত একটি মৃত শিশু সন্তান।
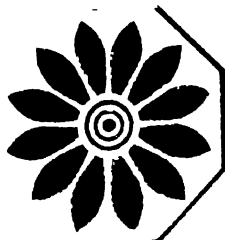
বিধাতার আদেশ

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার ওপর স্বর্গের বিধাতার কি আদেশ জানো ?

বিধাতার আদেশ-- নীলাঞ্জনবর্ণ দুটি সুগভীর স্নিগ্ধ চক্ষু আমায় মুগ্ধ করবে, আর সেই সুচারুনয়নার প্রেমোন্মত্ততাই হবে আমার জীবনের চরম লক্ষ্য।

সুতরাং সে আদেশ ব্যর্থ হবার নয়। বৃথা অনুযোগ বন্ধু, বৃথা বাক্যব্যয় !

আমার অন্তরের প্রেরণা আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বন্ধু, আমি উন্মাদ।

এ উন্মত্ততা আমার অপরাধ নয় বন্ধু, এ আমার আদেশ।

সে মৃগনয়নাকে আমি দেখেছি। শুধু দেখেছি নয়, ভালও বেসেছি, পাগলও হয়েছি।

তার আলিঙ্গন কত সুখের, সেকথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না বন্ধু, কারণ তার দেহালিঙ্গনের সুখ আমি এখনও পাইনি। পাব কি না জানি না। না পাওয়াই সম্ভব।

না পেলেও আমার দুঃখ নাই। সে জন্যে শোক আমি করব না।

তার প্রতি আমার ঐকান্তিক অনুরাগ শুধু অক্ষয় হয়ে থাক্ ! এ ছাড়া হাফেজের আজ আর অন্য প্রার্থনা নাই।

রক্তবর্ণ সুরা প্রস্তুত, স্থানটিও মনোরম, প্রাণের বন্ধু রয়েছে পাশে, প্রেমিকার অভিসারের এই ত' উপযুক্ত সময়, —এখন যদি তোমায় না পাই তবে কখন আর পাব বল ?

না ই যদি পেলাম ত' থাক্—

সারেঙ্গী বাজে,—এই সময় সারেঙ্গীর সুর শুনতে শুনতে সুরা পান করি।

মজনু একদিন লয়লাকে কি বলেছিল জানো ?

বলেছিল তার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে--চুপি চুপি তার কানে-কানে বলেছিল, 'অয়ি অনুপমা, শোনো ! প্রেমিক হয়ত তুমি আরও পাবে, কিন্তু তোমার প্রেমে এমন উন্মাদ প্রেমিক আর পাবে না।' *

আলোকে ও আঁধারে

শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ

রৌদ্র-কিরণে বসেছিনু যবে আমরা দু'টি
দূর উপবনে—নিকটে তো কেহ ছিল না আর।
চোখে চোখে চেয়ে কথা হল—তবু হৃদয় টুটি'
আপন কথাটি এল না বাহিরে একটি বার।
এত কাছে বসি' এত দূরে ছিনু—রুদ্ধ-দ্বার !

বিকালের আলো পলকে মিলালো দীর্ঘশ্বাসে।
(সে ছিল যেন এ দুজনার মাঝে তৃতীয় জনা !)
তিমির রজনী নামিল মোদের চারিটি পাশে ;
(সুপারির সারি আঁধারে কিছুই যায় না গণা।)
মোরা জানিতাম এল জীবনের অনুশোচনা।

কোথা বিচ্ছেদ ! এ-যে হেরি চির-মিলন-ক্ষণ।
দোঁহারে চিনিনু, দোঁহারে জিনিনু—আপনা দিয়া।
তিমির দুয়ারে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন।
পুড়ে গেল কথা পরশ-আগুনে। এখনি প্রিয়া
যদি পারিতাম মরিতে তোমারে বক্ষে নিয়া।

* হাফেজ

রামায়ণ—আদিকাণ্ড

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

রামায়ণের আদিকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবশিষ্টাংশের পরে রচিত বলিয়া Jacobi প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতবৃন্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদের দেশেও দৃঢ়মূল হইয়াছে। যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রধানতঃ এই* :—

(ক) রামায়ণের আদিকাণ্ডে দুইটী সূচীপত্র (table of contents) আছে, একটী প্রথম সর্গে এবং অপরটী তৃতীয় সর্গে। প্রথম সূচীপত্রটীতে আদিকাণ্ডের কোন ঘটনার উল্লেখ নাই।

(খ) আদিকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার সহিত পরবর্ত্তী কাণ্ডসমূহে বর্ণিত ঘটনার অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

এই যুক্তি দুইটী বিচারসহ কিনা তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে আদিকাণ্ডের ঘটনা-পরিবর্জ্জিত সূচীপত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন তাহা সূচীপত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে। ব্যাপারটী এই—নারদ আসিয়া বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। বাল্মীকি তপস্বিপ্রবরের নিকট ঔদার্য্যাদি অসংখ্য সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী ?' নারদ বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'তুমি বহু অথচ দুর্ল্লভ গুণের উল্লেখ করিয়াছ, এই পৃথিবীতে কোন এক ব্যক্তিতে এত গুণ থাকা সম্ভবপর নহে; তবে যে পুরুষরত্ন এই সমস্ত সদ্‌গুণের আধার তাঁহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।' ইহা বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন, 'রাম সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, ধৈর্য্যশালী এবং তুমি আরও যে সকল গুণের কথা বলিয়াছ, সেই সমস্ত গুণসম্পদেও বিভূষিত।' তিনি তাহার পরেই বলিলেন, 'এইরূপ গুণবান্ পুত্রকে রাজা দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহা হইয়া উঠিল না—কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল।' কবি এই স্থানে রামচন্দ্রের বনবাস হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষেপে রামায়ণের সমস্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন—যেহেতু আদিকাণ্ডের ঘটনাসমূহ বাদ দিয়া রামায়ণের অন্যান্য ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইজন্য বুঝিতে হইবে, আদিকাণ্ড অন্যান্য কাণ্ডসমূহের সহিত একত্র বর্ত্তমান ছিল না, অন্যান্য কাণ্ড রচিত হওয়ার অনেক পরে আদিকাণ্ড রচিত হইয়াছিল।

বাল্মীকির প্রশ্ন ও নারদের উত্তর একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। বাল্মীকি গুণসমূহ উল্লেখ করিবার সময় প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছিলেন ঔদার্য্যগুণের (১।১।৩)। নারদও উত্তরের প্রারম্ভেই সাধারণভাবে বলিয়াছেন—রাম সংযতাত্মা, ধৃতিমান্, জিতেন্দ্রিয় (১।১।১২)। ইহার পর রামচন্দ্র সম্বন্ধে যদি বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হয়, তাহা হইলে বাল্মীকির প্রশ্নের ও নারদের উত্তরের আদিতে উল্লিখিত হৃদয়ের মহত্ত্বব্যঞ্জক ঔদার্য্য সংযম প্রভৃতি গুণের পরিচায়ক ঘটনাবলীর উল্লেখই আবশ্যক হইয়া পড়ে। রামের ঔদার্য্য, সংযম প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায় পিতৃপ্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য তাঁহার বনগমনের সঙ্কল্প হইতে। আদিকাণ্ডে রামের হৃদয়ের মহত্ত্বদ্যোতক ঘটনা অতি অল্পই আছে। এই জন্যই কবি এই স্থানে আদিকাণ্ড-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই।

প্রথম সর্গে যে ঘটনাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সূচীপত্র প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নহে, রামের গুণাবলীর জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, প্রথম সর্গে বাস্তবিকই রামায়ণের একটী সূচীপত্র

* Macdonell's History of Sanskrit Literature, P. 304.

পাওয়া যায় এবং এই সূচীপত্রটী প্রমাণরূপে গণ্য, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে ইহা কোন্ কাণ্ডের অন্তর্গত? যদি অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে বোম্বের এবং বাঙ্গলার উভয় রামায়ণেই ইহা আদিকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল কিরূপে? যদি বলা যায় সূচীপত্রটী আদিকাণ্ডেরই অন্তর্গত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা রচিত হওয়ার সময় আদি-কাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত কারণ ব্যতিরেকে আদি কাণ্ডের ঘটনা ইহাতে উল্লেখ না করিবার অন্য কোনও কারণ কল্পনা করা যায় না। এই সমস্ত কারণে ইহাই মনে করা সঙ্গত যে, যাহাকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সূচীপত্র আখ্যা দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে সূচীপত্র নহে, বাল্মীকির প্রশ্নের সম্যক্‌রূপে উত্তরপ্রদান করিবার নিমিত্ত রামচন্দ্রের বিষয়ে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ মাত্র। সূচীপত্র প্রকৃতপক্ষে পাই আমরা আদিকাণ্ডে তৃতীয় সর্গে। বোম্বে এবং বাঙ্গলার উভয় রামায়ণেই এই সর্গে সংক্ষেপে সকল কাণ্ডের ঘটনাবলী উল্লিখিত হইয়াছে। সূচীপত্র সম্বন্ধেও বাঙ্গলার রামায়ণের একটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই রামায়ণে আদিকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে * একটী অতিবিস্তৃত সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আদি হইতে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত কাণ্ডেরই ঘটনাবলী বিশদভাবে উল্লিখিত দেখিতে পাই। এই সূচীপত্রটীর আধুনিকত্ব কল্পনা করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা মূল রামায়ণের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। কারণ, এই সূচীপত্রে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, মূল রামায়ণে সেই সমস্তের বর্ণনা পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা দুই একটী স্থলের উল্লেখ করিতে পারি। সূচীপত্রে অমাত্যবর্ণনের পরেই কৌশল্যার বর্ণনার উল্লেখ (১।১।৮) দেখিতে পাই; কিন্তু মূল রামায়ণে আদিকাণ্ডে কৌশল্যার বর্ণনা নাই। সূচীপত্রে আদিকাণ্ডের শেষ ভাগে অযোধ্যা-বাসিগণের প্রমোদ (১৪।২৮) উল্লিখিত আছে, কিন্তু মূল রামায়ণে আদিকাণ্ডে ইহার বিশেষ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় সূচীপত্র-রচনার সময় রামায়ণে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত বা সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা কালক্রমে অংশতঃ লুপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক রামায়ণের পূর্ণ কলেবর যখন বিদ্যমান ছিল এই সূচীপত্র সেই সময়ের এবং একই কবির রচিত—ইহাতে সংশয় করিবার কিছু নাই। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে প্রথম চারি সর্গে বাল্মীকির প্রশ্ন, শিষ্যগণের প্রতি বাল্মীকির উক্তি, বাল্মীকির কাব্যরচনা-বিবরণ প্রভৃতি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে তাহার সমাধান অন্যত্র। উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং ঘটনার বিবরণের সহিত স্বীয় নাম সংসৃষ্ট রাখা সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের লিখিবার একটা প্রণালী বিশেষ ইহা সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় রামায়ণের টীকাকার লোক-নাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—'মনুপ্রণীত মানব ধর্ম্মশাস্ত্র যেমন ভৃগু সঙ্কলন করিয়াছিলেন সেইরূপ বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণও তাঁহার কোন শিষ্য সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন।' মনুসংহিতায় যেমন 'মনুরুবাচ' 'মনুরব্রবীৎ' প্রভৃতি বাক্য দেখা যায়, রামায়ণেও সেইরূপ 'বাল্মীকিঃ পরিপপ্রচ্ছ' 'বাল্মীকির্বিস্ময়ং যযৌ' ইত্যাদি বাক্য দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাতে অস্বাভাবি-কতা কিছুমাত্র নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আর একটী যুক্তির অবতারণা করেন—আদি কাণ্ডের বর্ণিত ঘটনার সহিত পরবর্ত্তী কাণ্ড সমূহের বর্ণিত ঘটনার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমরা একটী মাত্র স্থল—যেখানে তাঁহারা এই অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন—প্রদর্শন করিব। আদিকাণ্ডে লক্ষ্মণের বিবাহ বর্ণিত আছে। অরণ্য কাণ্ডে (বোম্বে ১৮ সর্গ এবং বঙ্গীয় ২৪ সর্গ) যখন শূর্পণখা আসিয়া রামচন্দ্রকে ভর্তৃরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জানায়, তখন রামচন্দ্র বলিলেন, আমি বিবাহিত, লক্ষ্মণ অকৃতদার, তাহাকে ভজনা কর। এই অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া বৈদেশিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন আদিকাণ্ডে যে লক্ষ্মণের বিবাহ বর্ণিত আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরে রচিত। এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যদি প্রক্ষিপ্তই হইবে তাহা হইলে কি প্রয়োজনবোধে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণের বিবাহ আদিকাণ্ডে বর্ণিত না থাকিলে যে রামায়ণ অশুদ্ধ হইয়া যাইত তাহা নহে। যাঁহারা এই প্রক্ষেপের কর্ত্তা তাঁহারা কি এই জাজ্বল্যমান অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে পারেন নাই? লক্ষ্মণের বিবাহব্যাপারে বস্তুতঃ কোন প্রকার অসামঞ্জস্য আছে বলিয়াই আমরা মনে করি না। টীকাকার

* গোরেসিয়োর পুস্তকে যাহা চতুর্থ সর্গ, বাঙ্গলার হস্তলিখিত প্রায় সমস্ত পুস্তকে তাহা তৃতীয় সর্গ এবং গোরেসিয়োর তৃতীয় সর্গ এই সকল পুস্তকে চতুর্থ সর্গ।

গণ অবশ্য 'অকৃতদার,' শব্দের 'অসহকৃতদার' 'অসন্নিহিত কলত্র' প্রভৃতি ব্যাখ্যা দ্বারা অসামঞ্জস্য দূরীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা বলি এইরূপ ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, রামচন্দ্র যে শূর্পণখাকে পরিহাস মাত্র করিয়াছিলেন তাহা অরণ্য কাণ্ডের ঐস্থান হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একটু পরেই শূর্পণখাকে কবি 'পরিহাসানভিজ্ঞা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ অসামঞ্জস্য দুই-এক স্থানে থাকিতে পারে। অসামঞ্জস্যের পরিহার যে সর্ব্বত্রই সম্ভব তাহা নহে। কিন্তু দুই একটা অসামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করিয়া বা সামান্য হেত্বন্তর প্রদর্শন করিয়া কোনও সমগ্র গ্রন্থের বা অধ্যায়ের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-নির্দ্ধারণ বা পৌর্ব্বাপর্য্যনিরূপণ মোটেই নিরাপদ্ নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। রামায়ণের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ ঠিক একই দিনে রচিত হয় নাই এবং ইহার কাণ্ডগুলির মধ্যে আপেক্ষিক পৌর্ব্বাপর্য্য আছে ইহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু এক সময় ছিল—যখন রামায়ণের সমগ্র আদিকাণ্ড বিদ্যমানই ছিল না—এইরূপ সিদ্ধান্তের বিনিগমক হেতু আমরা কিছু দেখিতে পাই না।

সাময়িক সাহিত্যের বাজার

শ্রীপদ্মপাদ শর্ম্মা

সাময়িক সাহিত্যের বাজার একেবারে মন্দা।—বাজার বলিলে চটিবার কোনও কারণ নাই—কারণ মাসিক বা সাময়িক সাহিত্য এখন বাজারের পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে।—প্রবন্ধ ও কবিতা, গল্প ও উপন্যাস, আলোচনা ও সমালোচনার গুণোৎকর্ষে আগে সাময়িক সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত—প্রচলিত মাসিক বা সাপ্তাহিকের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব ছিল তাহা ওই গুণোৎকর্ষের দিক দিয়া—। কিন্তু এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা খুব সহজ হইয়া আসিয়াছে।

সাময়িক সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আলোচনা করিতে গেলে কয়েকটি বিষয় নজরে পড়ে—

(১) মলাট বা সাধু ভাষায় যাহাকে বলে প্রচ্ছদ—তাহারই সৌন্দর্য্য-সাধন নানাভাবে চলিতেছে—রুচি ও শিক্ষা অনুসারে এখানেও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা চলিতেছে—একদিকে রঙের বাহার—অন্যদিকে নারী-দেহের anatomical বিশ্লেষণ—"লাগে তাক, না লাগে তুক্"—হয় হরেক রকম রঙের খেলা দেখিয়া "colour-blind" রঙ-কাণা, নয়ত—নারী অঙ্গের curve বা আরোহ-অবরোহের পরমতত্ত্বে মশগুল হইয়া আত্মদান অর্থাৎ গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ-পত্র-প্রেরণ। মাসিকপত্রের ছবির কথা আর আলাদা ভাবে নাই বলিলাম—বলিতে গেলে একই কথা আরো রূঢ়ভাবে বলিতে হইবে।

—উপায় নাই—পয়সা খরচ করিয়া মাসিক বা সাপ্তাহিক-পত্রিকা যাঁহারা বাহির করেন—তাঁহারা ত একটা returnএর আশা করেন—অর্থাৎ পয়সায় পয়সা না আসিলে তাঁহারা অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া অলস সম্পাদক বা সাহিত্যিকদের আড্ডা জমাইয়া পাপের প্রশ্রয় দিবেন কেন? ব্যবসায় করিতে বসিয়া গুণগার দিবার মত সাহিত্যিক নির্ব্বুদ্ধিতা তাঁহাদের নাই। কাজেই সাধারণে যাহা চায় তাহা দিতেই হইবে।—গম্ভীর ভাবে তাঁহারা বলেন,—আমরা সমাজ-সংস্কারক নই যে তোমার বাঙ্গলা দেশের পাঠক তৈরী করিবার ভার লইব—আমরা তাই public taste কে cater করিতেছি। উপায় নাই—হ'কারও বলে "একঠো আচ্ছা (?) তস্‌বির ত দিজিয়ে"—'আচ্ছা' শব্দের মূলানুগত অর্থ অনুসারে কাজ করিতে হইলে—হয় ধর্ম্মতলায় অন্ধকারে ওঁত পাতিয়া থাকিয়া—ছবি কিনিতে হয়—নতুবা পয়সা থাকিলে একটা "আচ্ছা" জায়গায় studio খুলিয়া বসিতে হয়। ব্যস্!

(২) "যুগোপযোগী" গল্প চাই—শেফালিকা বা অনমিতা

দেবীর "bloody"—টগ্‌বগে কবিতা চাই। গ্রাহক বাড়ুক না বাড়ুক নগদ বিক্রী সন্তোষজনক বাড়িতে পারে। পয়সা কিছু খরচ হইবে কিন্তু করা কি! No venture no gain—যাায়সা কি ত্যায়সা—'ফ্যাল কড়ি মাখ তেল'—। তাহাতে গড়রাজী কে?—পয়সা লইয়া বাজারে নামিয়াছি,—কাহার পয়সা সে-কথায় কাজ কি বাপু?—অমুক পাইবে তমুক পাইবে সে কথায় দরকার কি?—তাহাদের থামাইয়া রাখিব—আপাততঃ লাগাও দেখি! গরম চাই—'আড্ডা' জমাইলে—সাহিত্যিকরা দানা বাঁধিয়া উঠিবে? 'কুচ্‌ পরোয়া নেই'—কিছু খরচ না হয় হইবে।—কিন্তু একটু দূরে থাক,—নেহাত অসাহিত্যিক আমি—কাগজ চালাইয়া শেষে চল্‌তি ব্যবসায় নষ্ট করিব—? কিছু additional income চাই; prejudice আমার নাই—তরুণের দল অভিযান করিলে যদি গ্রাহক-সংখ্যা ৫০০ বাড়ে আমি তাতে প্রস্তুত। Principle পুঁটুলি বাঁধিয়া নদীর ওপারেই রাখিয়া আসিয়াছি। অতএব চালাও 'পান্‌সী'—কিন্তু বে-আদপী সহ্য করিব না—'নুন' খাইতেছ—সে কথা মনে রাখিয়া—আমার কাগজটা যুগোপযোগী করিয়া দাও।—পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের এ উক্তি শিরোধার্য্য না করিলে সম্পাদকী করা চলে না।—ক্ষুধার জ্বালা তীব্র, ততোধিক তীব্র সম্পাদক হইয়া অপেক্ষাকৃত bold typeএ কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের নামটা মুদ্রিত করিবার বাসনা। বাসনা সার্থক হয়—কিন্তু ক্ষুধা মিটে না। মাসিক বেতন ৩৩৷৶০ তাও সাতবারে শোধ করিয়া লইতে হয়।—প্রাণহীন চেষ্টার ফল—যাহা অনিবার্য্য তাহাই হয়।—পরিচালক ভাবেন, অনর্থক ওই bogus লোকটাকে সম্পাদক করিয়া মাহিনা দিয়া পুষিলাম—ওটা যে অমন অকৃতজ্ঞ তাহা জানিলে—আমার 'খিদ্‌মতদার' দীনবন্ধু মহাপাত্রকে সম্পাদক করিলেই আমার এক খরচে দু'কাজ চলিত—establishment বাড়িত না।—সম্পাদকপ্রবর সত্যলুপ্ত সাপ্তাহিক বা মাসিকের বিবর হইতে বহির্গত হইয়াই তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন—'ও লোকটা আর আমার কদর কি বুঝবে'?—সাহিত্যের 'স' জানেনা।—একি বাবা দালালী—যে রাস্তায় বেরুলেই পয়সা!—সাহিত্য-প্রকাশের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে ঘর থেকে দিতে হয়—লাভের আশা করা নির্ব্বুদ্ধিতা।—

দ্বন্দ্ব এখানেই মেটে না। হাটে বাজারে, অফিসে ও চায়ের আড্ডায়—অনাবিল সাহিত্য-রস নর্দ্দামা বাহিয়া—ড্রেনে গিয়া পড়ে। ব্যবসাদার পত্রিকা-পরিচালকের কাছে সম্পাদক-সাহিত্যিকের বলিদান ঘণ্টা-কাঁসর বাজাইয়া এই ভাবেই চলিতে থাকে। কিন্তু তবুও আমাদের আক্কেল হয় না। সাহিত্যকে নিলামের ডাকে চড়াইয়া বসি, পাঁচ টাকা—এক, পাঁচ টাকা দুই—পাঁচ টাকা—

অশুদ্ধ-শোধন

গত সংখ্যা উপাসনায় 'অহল্যা' প্রবন্ধে ৬০২ পৃঃ প্রথম কলম ১১ পংক্তিতে 'ব্যাভিচারিণী' স্থানে 'ব্যভিচারিণী'; ১৪ পংক্তিতে 'ইন্দ্র' স্থানে 'গৌতম' এবং ৩২ পংক্তিতে 'সাতানন্দ' স্থানে 'শতানন্দ' হইবে। ৬০৩ পৃঃ প্রথম কলম দ্বিতীয় পংক্তিতে 'অধ্যাত্মা' স্থানে 'অধ্যাত্ম'; দ্বিতীয় কলম ২য় পংক্তিতে 'বারবণিতা' স্থানে 'বারবনিতা' হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

উদাসীর মাঠ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য একটাকা।—গল্পের বই। ৯৩ পৃষ্ঠা। ছাপা-বাঁধাই বেশ।

যদি বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যকে দুইটি মূল ধারায় বিভক্ত করা যায়—একটি নৃত্যপরা নটিনীর, অন্যটি ধূমায়মান আগ্নেয়-গিরির—তবে রবীন্দ্র মৈত্রকে প্রধানতঃ দ্বিতীয় ভাবধারা-পন্থীই বলিব। বাংলা সাহিত্যে বর্ষাস্ফীত ফেনিলোচ্ছল স্রোতস্বিনীর যে উন্মত্ততা আসিয়াছে—ভাব-ভঙ্গিমায় যাহা বিচিত্র ও অপরূপ, রবীন্দ্র মৈত্র সে ধারাকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেছেন—তাঁহার কাছে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকটাই বেশী করিয়া ধরা দিয়াছে। এই দুঃখের রূপকে তিনি যে-ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কঠিন আন্তরিকতায় শুষ্ক—গল্পের টাইল তাঁহার নিকট মুখ্য নয়,—সে দিক দিয়া তিনি এত উদাসীন যে সে-ঔদাসীন্য মাঝে মাঝে দোষের নামান্তর হিসাবে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই দোষাবরণের অন্তরালে কথা-সাহিত্যের আত্মার যে-পরিচয় পাই, তাহাকে এই ষ্টাইলের দোষ ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার এই ঔদাসীন্যকে মার্জ্জনা করিতে পারি না। মানুষের রুচি-সভ্যতার যেমন অন্তরের দিক আছে—তেমনই বাহিরের দিকও আছে। সভ্য-রুচি মানুষকে বনমানুষের মতো দাড়ী রাখিয়া, নখ বাড়াইয়া নিজেকে কদর্য্য করিতে দেখিলে যে-ক্রোধ হয়, তাহা স্বাভাবিক। সুতরাং শিল্পীর অন্তর নিয়াও শিল্পীর বহিরঙ্গের দিকে রবীন্দ্র মৈত্রের এই ঔদাসীন্য শিল্পী হিসাবেই তাঁহাকে অমর্য্যাদা করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে 'থার্ডক্লাশ'এ পরিমার্জ্জনা বিষয়ে তাঁহার এত ঔদাসীন্য ছিল না—তাই 'থার্ডক্লাশ'-প্রণেতা রবীন্দ্র মৈত্রের আগন্তুক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,—'উদাসীর মাঠ'এ সে প্রতিষ্ঠা তাঁহার অক্ষুণ্ণ থাকিবে না।

বইখানি "উদাসীর মাঠ" "ক্যান্‌ভাসার" "হোঁদলকুৎকুতে" "জুয়াড়ী" "উর্দ্ধরেখা" ও "ট্যারা" এই ছয়টি গল্পের সমষ্টি। "উদাসীর মাঠ" ও "ট্যারা" গল্পে তিনি ললিত ও সুকুমারের মধ্য দিয়া দায়িত্বহীন পুরুষ-যৌবনের যে-পরিচয় দিয়াছেন—টলষ্টয়ের 'নেখ্‌লিডব' ও রবীন্দ্রনাথের 'ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান" 'মোহিত মোহন'ও সেই একই পরিচয়ের কাঠগড়ায় অসীমকালের বিচার-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। "ট্যারা"র পরিণাম নির্ম্মম। "ট্যারা" মেয়ে বীণা বাব্‌ড়ি-ওলা সুকুমারের ভাববিলাসিতাকে আন্তরিকতা ভাবিয়া তাহার স্বপ্নে, কৈশোরের যে-সৌধটি বিবাহের কল্পনা-সজ্জায় ভরিয়া তুলিয়াছিল;—সুকুমারের হৃদয়হীনতায় তাহা তাসের ঘরের মতোই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অতঃপর—

"রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া বীণা সুকুমারের চিঠিগুলি পড়িল, তারপর সুকুমারের ছবিখানির দিকে চিঠিগুলি আগাইয়া ধরিয়া কহিল, 'এসব তা'হলে মিছে কথা? আমি শুধু ট্যারা?"

'ট্যারা! ট্যারা! কথাটি মনে করিতেই মাথার মধ্যে তাহার কেমন ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে হইল চোখটার সঙ্গে যেন সমস্ত দেহের কোনও সম্পর্ক নাই, ভাবিতে ভাবিতে টেবিলের উপর হইতে কখন বীণা পেন্সিল-কাটা ছুরিখানা তুলিয়া লইল। * * * আর্ত্তনাদ শুনিয়া রামহরিবাবু ও তাহার পশ্চাৎ গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, বীণার সমস্ত মুখখানা ভাসাইয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে আর ছুরিখানা ডান চোখের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে।"

স্বীকার করিতেই হইবে শিল্পি-হৃদয় যাহাকে বলে, রবীন্দ্র মৈত্রের তাহা নিশ্চয়ই আছে। আরও যাহা আছে সে হইতেছে তাঁহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ, বুঝি সহৃদয় রসানুভবে বক্রও। তাঁহার 'ক্যান্‌ভাসার' কাশি-হাঁপি সারিবার "ধন্বন্তরী বটি" ফিরি করিতে চীৎকার করিবার সময় নিজেই কাশিয়া খুন হয়। একটি ছোক্‌রা বিরক্ত হইয়া বলে, "দেখ্‌ছি যে সবই সারে, আপনার কাশিটা ছাড়া"—ভদ্রলোকের মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া যায়।—একই সঙ্গে হাসিকান্নার তরঙ্গ তুলিবার সামর্থ্য বড়ো কম শক্তির পরিচয় নয়। কবি-হৃদয়ে সমবেদনার তাঁহার অগাধ সাগর-বন্যা, দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁহার এই বন্যাকে বাঁধ দিয়াছে বলিয়া তাঁহার রচনা কখনও মাত্র উচ্ছ্বাস হইয়া উঠে নাই। 'জুয়াড়ী'র হৃদয়ের অনাবিষ্কৃত কারুণ্যও তাঁহার অগোচর নাই—আবার ক্যাপিটাল-সন্ধানী ননী হালদার ও মাখন বিশ্বাসের

সত্য পরিচয়ও তিনি জানেন। 'হোঁদলকুৎকুতে'-র বিত্তশালী বড়বাবু নিঃস্ব মহেশের শিশু সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত মুখে আলকাত্‌রা ও তুলা মাখিয়া মাথায় গাধার টুপি ও পরণে সাত-রঙা ছেঁড়া চাপকান পরিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে নিয়া বসেন।

বিশ্ব বিধাতার বিবিধ পরিহাসরসিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্র বাবু অনেকটা নিশ্চিত হইয়াছেন। তাই নাম-গল্প 'উদাসীর মাঠ'-এ এবং "ট্যারা"য় ব্যথার রক্ত-শতদল ফুটাইতে বসিয়াও তিনি অপরাপর গল্পে হাসিতে কার্পণ্য করেন নাই।

রবীন্দ্র মৈত্রকে আমরা স্বভাব-শিল্পী বলিব—শক্তি তাঁহার জন্মগত, কিন্তু সে শক্তিও সাধনার অভাবে হারাইতে বেশীদিন লাগে না—এ সতর্কবাণী তাঁহার সম্পর্কে আমরা বলিবার প্রয়োজন মনে করি।

শ্রীকিরণকুমার রায়

শ্রীহীন কৃষ্ণ—তড়িৎকুমার বসু। প্রকাশক :—অবনী-কুমার বসু। 'বুক হল', ১৬৯ রসা রোড, কলিকাতা।

প্রচ্ছদে বইয়ের পরিচয় দিয়া লেখা হইয়াছে—"শ্রীহীন কৃষ্ণ বাংলার প্রথম 'সিচুয়েসন'-নাটক। এর ভাবে কর্ম্মময় স্বদেশপ্রীতি, ভাষায় আনন্দময় হাসির রাশি, ভূমিকায় মঙ্গলময় চিন্তাধারা, নাটকে প্রাণময় আনন্দ-সুধা। এর নূতনত্ব রূপে গুণে গন্ধে টেকনিকে; সত্যই এ ধরণের নাটক বাংলায় এই প্রথম।"

উপর্যুক্ত গুণগুলির সন্ধানে আমরা বইখানি উলটাইয়া পালটাইয়া, খুঁজিয়া পাতিয়া, অনেক করিয়া পড়িলাম, একটিরও সন্ধান পাইলাম না। অবশ্য এই গুণগুলির নির্দ্দেশ না মিলিলেও একেবারে কোনও-কিছুর হদিস যে মিলে নাই এমন কথা বলিলে অন্যায় হইবে—আদ্যন্ত একটি জিনিসের প্রচুর প্রকাশ দেখিলাম, সে জিনিসটি অতিরিক্ত বায়ুর প্রকোপ। ভূমিকা পড়িয়া বুঝি, লেখক পড়াশোনা কিছু করিয়াছেন। আশঙ্কা করিতেছি এই পড়াশোনাই তাঁহার মস্তিষ্কের মাথা খাইয়াছে। সামান্য গুরুপাক জিনিসও দুর্ব্বলের পক্ষে মারাত্মক বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই মনোরম, মূল্যের উল্লেখ নাই, বোধ করি বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। ভালোই। যাঁহারা পাইবেন তাঁহাদের ঘরণীদের অনেক কাজে লাগিবে।

পুণ্য-স্মৃতি যতীন্দ্র দাসের নাম সংশ্লিষ্ট করিয়া লেখক বইখানির মূল্য বাড়াইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন—সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে।

ইয়াংস্থ হোটেলের কাণ্ড—শ্রীপ্রণব রায়।
সিঙ্গাপুর কাফে—শ্রীনিশানাথ নন্দী।
মৃত্যুর দেশে দু'বছর—শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য।

প্রকাশকঃ—রোমাঞ্চ কার্য্যালয়। ১২, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক আনা; বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা, বৎসরে ৫২ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। প্রতি বৎসরে দুই তিন খানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

নিবেদন-এ লেখা হইয়াছে—"বিলাতী 'থ্রিলার্স'এর মত বাংলা দেশেও রোমাঞ্চ সিরিজ-এর এতদিন প্রয়োজন ছিল। দেশ বিদেশের কত অদ্ভুত ঘটনাবলী, কত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, সুচতুর গোয়েন্দার বিস্ময়কর রহস্য-ভেদের কাহিনী, প্রেত-জগতের কত রোমাঞ্চকর ব্যাপার এতদিন বাংলার পাঠকবর্গের অগোচর ছিল। সেই সমস্ত বিচিত্র গল্প বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পকারগণ রোমাঞ্চের পৃষ্ঠায় প্রতি সপ্তাহে আপনাদের শুনাইতেছেন এবং শুনাইবেন।"

—প্রকাশকের এই প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদের সহিত সমর্থন করি। নানা দিক দিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ হইতে দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়। গল্পগুলি পড়িয়াছি, সুন্দর হইয়াছে।

হেঁয়ালি— শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল। বিপুলা সাহিত্য ভবন, কালিঘাট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০। ১৬০ পৃষ্ঠা।

গল্পের বই। কয়টি গল্পই সুপাঠ্য। গল্পগুলি পড়িলে যে কেহ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী হইলেও অমরেন্দ্র বাবু ইহারই মধ্যে কেন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। নবীন বাংলার তরুণ তরুণীর ক্রমাভিব্যক্তিকে লেখক দরদ দিয়া বুঝিয়াছেন। গল্পগুলির মধ্যে আমাদের সব চাইতে ভালো লাগিয়াছে 'দিকবিদিক'

—চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া 'বটব্যাল' উপভোগ্য।—"ভুল" গল্পটির কাঁটাও থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বুকে বিঁধিতে থাকে।

অমরেন্দ্র বাবু সুলেখক তাঁহার ভাষায় প্রাঞ্জলতা এবং ভাবপ্রকাশের সুন্দর ভঙ্গীটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।—এই গুণেই তাঁহার গল্পগুলি আরো উপভোগ্য হইয়াছে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমরেন্দ্র বাবুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট ভরসা করিতে পারি।

—বাতায়নিক

বাস্তবিকা—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা রচিত। যুগবাণী সাহিত্য-চক্র হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানিতে গুটি পনেরো হাস্য-রসাত্মক রচনা সন্নিবিষ্ট হয়েচে।

বক্ষ্যমাণ ব্যঙ্গ-রচনাগুলির মূল উদ্দেশ্য আমার বিশ্বাস অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যের কতকগুলি mannerismকে আঘাত করা। পূর্ব্বাহ্ণেই বলে রাখা ভাল, আমি এই mannerism এর পক্ষপাতী নই এবং তাদের হ'য়ে ওকালতীও করতে চাইনে। অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যের তথা-কথিত রিয়ালিজম্ এবং ন্যাকামিতে আঘাত করার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্তু সে আঘাত যেন আঘাতই হয়। সে আঘাত যদি নিজেই ন্যাকামি হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তার তুল্য failure আর কিছু নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিবাকর শর্ম্মার ৪৭ পৃষ্ঠার লক্ষ্মণ সীতার সম্পর্ক সম্বন্ধে ইঙ্গিত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ব্যঙ্গকার লিখ্‌চেন, লক্ষ্মণের এই বনযাত্রা শুধু কি ভাইয়ের সেবারই আকাঙ্ক্ষায়? ভ্রাতৃবধূটির লীলাচঞ্চল ভরা-দেহের নির্ব্বাক আকর্ষণ লেশ মাত্রও কি তাতে ছিল না?" এ ব্যঙ্গ নিজের অপরাধের ভারে নিজেই নুয়ে পড়চে, অপরকে আঘাত করবে কি করে?

বইখানিতে পলাতকা পালিত, চিড়িয়া চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ধরণের কতকগুলি হাস্য-রসাত্মক নাম দেওয়া হয়েচে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে পরশুরাম অগ্রণী, সুতরাং এ-কে অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই বল্‌ব না।

মোট কথা, রচনাগুলি সম্পূর্ণ topical বিষয় নিয়ে লেখা। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় এর যে-রস উপাদেয় হয়েছিল, গ্রন্থাকারে সেই রসই কটু হ'য়ে উঠেছে।

জগাখিঁচুড়ী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স। মূল্য এক টাকা।

'খেচরান্ন' হইতে 'খিচুড়ি' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব শুদ্ধ কথা 'খিচুড়ি', 'খিঁচুড়ি' নহে।

প্রথমেই বইখানির বাঁধাই-এর উপর দৃষ্টি পড়ে। বলা বাহুল্য যে বইখানি সুন্দর বাঁধানো হইয়াছে।

লেখক বলিতেছেন বইখানি হাস্যরসাত্মক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কিন্তু এই ভ্রমণের দৌড় লেখকের বাসস্থান হইতে কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান জেলার মানকর ষ্টেশনের অন্তঃপাতী রঘুনাথপুর গ্রাম পর্য্যন্ত। উপলক্ষ্য বন্ধুর বিবাহের বরযাত্রা, যদিচ এই বিবাহ শেষ নাগাদ বন্ধ হইয়া গেল। লেখকের বাসস্থান হইতে রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত যাওয়া এবং সেখান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসা—ইহাই বর্ণনা করিতে ১৩০ পৃষ্ঠার বই হইয়াছে। তাহার কারণ লেখার মধ্যে বর্ত্তমান রঙ্গালয়, মাসিক-পত্রের সম্পাদনা প্রভৃতি বিষয়ে মন্তব্য আছে। শেষোক্ত বিষয়টির পুনরুল্লেখ আছে, যদিও অপরের মুখে। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে উক্ত বিষয়ে লেখকের মনে একটা ব্যথা আছে।

লেখার মধ্যে রসিকতা আছে—কিন্তু তাহাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং সুরুচির ছাপ থাকিলে আরও উপাদেয় হইত। ভাষা ঝরঝরে। লেখকের আর একটা গুণ লক্ষ্য করিলাম—যে বিষয় তিনি বোঝেন না, তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার ওজন-বোধ আছে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

খেলাঘর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

৬

ভয় বলিয়া কোনো পদার্থ বিশ্বেশ্বরের মনে ছিল না।

তাহাদের গ্রাম হইতে দূরে বিলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বড় বটগাছ অজস্র ছায়া ও প্রচুর রহস্য বিস্তার করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের তিন মাইলের মধ্যে কোথাও গ্রাম নাই। লোকে বলিত, "সিধুর মায়ের বটগাছ"। কোন্ কালে কোন্ সিধুর জননী এই বটবৃক্ষটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সুদূর প্রান্তরে এই ছায়াঘন বটবৃক্ষটিকে ঘিরিয়া যে রহস্য লোকের মুখে মুখে ফেরে তাহাতে দিবা দ্বিপ্রহরেও কেহ তাহার কাছ দিয়া যাইতে সাহস করে না। গাছের ডালে ডালে বিবিধ প্রকারের স্ত্রী ও পুরুষ ভূত তো আছেই, গাছের নীচেও অগণিত হতভাগ্যের ছিন্ন শির দিবারাত্র গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করে, আর ঠকাঠক্ পরস্পরকে আঘাত করে। এ শব্দ অনেকেই শুনিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর তখন খুবই ছোট। একখানি বৃহৎ পঞ্জিকা, খান দুই কবিরাজের দোকানের গীতিবহুল বিজ্ঞাপন-পুস্তক এবং আরও কয়েকখানি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে দপ্তর মোটা করিয়া খুব ভারিক্কি চালে পাঠশালে যায়। দীঘির শান-বাধানো ঘাটে বসিয়া কাঠ-কয়লা দিয়া শ্লেট মাজিতে মাজিতে বিশ্বেশ্বর দূরের "সিধুর মায়ের বটগাছটি"র প্রতি চাহিত, আর সমস্ত মন ওই গাছটির সান্নিধ্যলাভের জন্য লোভার্ত্ত হইয়া উঠিত।

ছেলেবেলার কথা এখনও তাহার জ্বলজ্বল করিয়া মনে পড়ে। কতবার সেই বটগাছটির কাছে যাইবার জন্য তাহার সঙ্গীদের সে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে কেহই সাহস করিয়া যাইতে পারে নাই। সমস্ত দিন ওই গাছটির হিম-শীতল ছায়াতলে ভূতের শিশুরা কপাটি খেলে, কচি কাচ খোকাখুকীরা মাতৃ-স্তনদুগ্ধের পিপাসায় 'ওঁয়া ওঁয়া' করিয়া চেঁচায় এবং ভূতের অন্তঃপুরিকারা গাছের ডালে ডালে আঁচল উড়াইয়া দোল খায়। ওখানে যাইবার সাহস তাহার বয়সের ছেলেদের কাহারও ছিল না। কত দিন তৃষিত নেত্রে বিশ্বেশ্বর ওই গাছটির পানে চাহিয়াই থাকিত।

তারপরে—তাহার জীবনের সে একটি স্মরণীয় দিন—একদিন গ্রীষ্মকালে ভর দুপুর বেলায়, আর সব ছেলেরা যখন মায়ের কোলে সুখ সুপ্ত ছিল, সকলের চোখ এড়াইয়া বিশ্বেশ্বর বিলের পথে ছুটিতে লাগিল। প্রখর রৌদ্র, সর্ব্বাঙ্গে তাহার ঘাম পড়িতেছিল, সমস্ত পথে ছায়ার চিহ্নমাত্র নাই, পথের দুপাশে ফুটি ও কাঁকুড়, খরমুজ ও তরমুজের লতা নিঃশব্দে শুইয়া আছে, উঁচু নীচু মাঠ চৈতালী ফসলে শ্যামল। সে গাছটিকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই ছুটিয়া চলিল। কত পথ ছুটিয়া শেষ কালে—আঃ!

গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় তাহার শরীর জুড়াইয়া গেল। বিপুলকায় গাছের চারিদিকে বিস্তর ঝুরি নামিয়াছে, ডালে ডালে কত পাখী দিবারাত্র কিচির-মিচির, করিয়া সেই নিঃস্তব্ধতাকে মধুর করিয়া তুলিতেছিল। দূরে চারিদিকে গ্রাম-সীমান্তের বনরেখা বৈশাখের দ্বিপ্রহরে কেমন যেন ছল্-ছল্ করিতেছিল। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। ভয়? ভয় একটু করে বই কি! কিন্তু তারও চেয়ে বেশী আসে ঘুম। এমনি তপ্ত দিনে এমন ঘন ছায়ায় চোখ দুইটি যেন আপনা হইতেই বুজিয়া আসে।

তাহার বন্ধুরা কিন্তু তাহার কথা বিশ্বাসই করে নাই। প্রাচীনের দল ওই গাছটির সম্বন্ধে কত গল্প আজও করে। তাঁহারা নিজে কেহ কিছু দেখেন নাই বটে, কিন্তু এতো মিথ্যা নয় যে, গোটা পাঁচ সাত নিশাচর ভূত সমস্ত দিন উহার বিভিন্ন ডালে পা আট্‌কাইয়া নিম্ন মুখে বাদুড়ের মতো বিশ্রাম করে এবং রাত্রে সারারাত গাছময় দাপাদাপি করে। এক-

দল আলেয়া যে উহার চারিদিকে গেওুয়া খেলিয়া বেড়ায় এ তো সকলেই দেখিয়াছে। তেমন জায়গা হইতে কেহ কি প্রাণ লইয়া নিরাপদে ফিরিতে পারে? বিশেষতঃ শিশু-মাংস···হুঁঃ!

বিশ্বাস করিয়াছিলেন শুধু বিশ্বেশ্বরের বিধবা মা। তার আজও মনে পড়ে দুরন্ত শিশুকে কোলে লইয়া সমস্ত রাত তিনি কী কান্নাই কাঁদিয়াছিলেন! কত দেবতারই না আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন!

এই স্নেহপরায়ণ মা'টিকে সে কোনদিন স্বস্তি দেয় নাই। দুরন্ত ছেলে কখন কি করিয়া বসে সেই ভাবনায় তাঁহার ঘুম ছিল না। বারো বছর বয়সের মধ্যে গাছের মগ্‌ডাল হইতে চার বার সে পড়িয়া যায়, বাঁ হাতের কনুয়ের কাছটা এখনও বেঁকিয়া আছে। একবার শীতকালে বাজি রাখিয়া দীঘি পার হইতে গিয়া শীতে জমিয়া সে ডুবিয়া গিয়াছিল, বহু কষ্টে উদ্ধার করা হয়।

আর একবার—

তাহাদের গ্রাম হইতে মাইল ছয়েক দূরে মেলা বসে। গঙ্গাতীরে মস্ত বড় মেলা, স্নানার্থিনী পুণ্যলোভাতুরা বিধবাদের বিপুল সমাবেশ হয়। মাঘ মাসে মেলা,—সুতরাং চাষের কাজ শেষ করিয়া বহু কৃষক দলে দলে মেলায় গিয়া আমোদ করে। আমোদের মধ্যে তিনরাত্রি কলিকাতার যাত্রা, আর জুয়া খেলা। একটা দিকে একদল সন্ন্যাসী গায়ে ছাই মাখিয়া কেহ সূক্ষ্মাগ্র লোহার উপর শুইয়া, কেহ ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া, আর কেহ বা শুধু-শুধুই চিম্‌টি বাজাইয়া লোক জড় করে। গাঁজার ধোঁয়ায় ওদিকটা দিনরাত্রি অন্ধকার হইয়া থাকে। কাছেই আবগারী দোকান, সেদিকে ভিড় ঠেলা যায় না। কত ছোট ছেলেও যে বিবিধ নেশায় পরিপক্কতা লাভ করিতেছে এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিলেই বোঝা যায়। মেলার সংলগ্ন পশ্চিমপ্রান্তে দরমা দিয়া তিন-সারি ছোট ছোট খুপ্‌রি তৈরী করা হইয়াছে। বিগত যৌবনা, রোগবিবর্ণ, কদাকার একদল হতভাগিনী দিন দুই টাকা ভাড়া দিয়া উহারই এক একখানি করিয়া খুপ্‌রি ভাড়া লইয়াছে। মাঝে-মাঝে বাহিরে আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বরে হিল্‌হিল্‌ করিয়া কাঁপে। কিন্তু ভালো করিয়া রৌদ্র পোহাইবারও সময় নাই। প্রতি সন্ধ্যায় সেদিনের ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিতে হইবে।

এমনি মেলা। সকাল হইতে রাত্রি দু'টা পর্য্যন্ত বহু কণ্ঠের কলরবে ও বালকদের বাঁশীর শব্দে মুখরিত এবং ধোঁয়ায় ধূলায় ধূসর। বহুদূর হইতে তাহার শব্দ পাওয়া যায়। মনে হয়, বিরাটরাজের গো-গৃহে বোধ হয় আগুন লাগিয়াছে।

সেই মেলায় একবার সে গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স তেরোর বেশী নয়। তাহাদের দলের সকলেই গিয়াছিল। সমস্ত দিন মেলার পথে-পথে ঘুরিয়া অজস্র ধূলা খাইয়া সূর্য্যাস্তের কিছু আগে সে স্থির করিল, কলিকাতার যাত্রাদলের গান শুনিয়া পরের দিন সকালে বাড়ী যাইবে। এমন সময় তাহাদের গ্রামের একটী লোকের সঙ্গে দেখা। সে বলিল,—তুমি এখনও বাড়ী যাওনি? তোমার মা দেখগে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছেন।

আর বিশ্বেশ্বরের যাত্রা শোনা হইল না। সকলের অনুরোধ ঠেলিয়া সে যখন মেলা হইতে বাহির হইল তখন সূর্য্য অস্ত গেল। তাহাকে ছয় মাইল পথ চলিতে হইবে, মাঝে একটা পারও আছে। সমস্ত পথ তাহার কেবলই মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখ মনে পড়িতে লাগিল। একমনে সে কেবলি পথ চলে। শীতের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাঠ শোভায় আর ধরে না। পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ শব্দ উঠিল,—ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া;—অবিকল কচি ছেলের কান্না।

বিশ্বেশ্বরের বুকের ভিতর ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল,—সামনেই মুড়িমাধবতলা। যখন এদিকে রেলপথ হয় নাই, উদরান্নের জন্য যখন লোককে বিদেশে যাইতে হইত না, তখন এই মুড়িমাধবতলা দিয়া ভর দুপুরে কিম্বা রাত্রে যাহারা গিয়াছে তাহারা আর ফিরিয়া আসে নাই। বিশ্বেশ্বর দু'পা চলে, মনে হয় পিছনে কে যেন আসিতেছে, আবার পিছনে চাহিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়। এমন সময় একটা পাখী কচি ছেলের কান্নার মতো ডাকিতে ডাকিতে শোঁ। শোঁ। করিয়া উড়িয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের মনে পড়িল, শকুন-শিশু অমনি করিয়া ডাকে। মনে করিল বটে, কিন্তু ভয় গেল না। জোরে-জোরেই পথ চলে। যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি দশটার বেশী নয়।

একলা আসার কথা সে বাড়ীতে বলিতে সাহস করে নাই। বলিয়াছিল, অনেক লোকের সঙ্গে আসিয়াছে।

এমই করিয়া তার শৈশব কাটিয়াছে, কৈশোর কাটিয়াছে। তারপরে অনেক গুলি পরীক্ষা পাশ করিতে করিতে মনে যেদিন রোমান্সের রং লাগিল, সেদিন আসিল অমলা।

অমলা ধনী জমিদারের আদরের কন্যা। সেকেণ্ড বুক শেষ করিবার পূর্ব্বেই বটতলার যাবতীয় উপন্যাস তার পড়া হইয়া গিয়াছে। মনোমুকুলে অকালেই স্বপন-সুষমা জাগিয়াছে। শ্বশুরালয়ে আসিয়া তার মুখে হাসি আর ধরে না। অত বাদ্য, অত আলো, অত লোকের সমারোহে তার সমস্ত মন ময়ূরের মতো নাচিয়া উঠিল। শ্বাশুড়ী, ননদ, দেবর, আত্মীয় পরিজন সকলকে সে তার অন্তরের আনন্দপারাবারে ডুবাইয়া দিতে চায়। এবং আর একজনকে—

কিন্তু সে যেন ভরানদীর মতো স্থির: ঠোঁটের তৃতীয়ার চাঁদের মতো হাসি, ক্ষীণ, অথচ অন্তরের শান্তিতে পরিপূর্ণ। তাহার পরিণত, শিক্ষিত মন মধুর রসভারে আনত। সে মূর্ত্তি অমলার অপরূপ মনে হয়। বিশ্বেশ্বরের বুকের কাছে বসিয়া অমলা যেন ঝরণার মতো ফাটিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু সে চঞ্চলতা বিশ্বেশ্বরকে স্পর্শই করে না। সে হয়তো একটু ক্ষীণ হাসিল, হয়তো ললাটের চূর্ণ কেশগুচ্ছ আলগোছে একটু সরাইয়া দিল, নয়তো অমলার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিল যেন এমন করিয়া সে অনন্তকাল বসিয়া থাকিতে পারে।

অমলার লাগে বেশ। কিন্তু একভাবে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা তার ধাতে সয় না। সে মাথা টানিয়া লইয়া অকারণে রাগ করিয়া দূরে সরিয়া বসে। বিশ্বেশ্বর মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসে,—মানও ভাঙ্গায় না, কাছে টানিয়াও নেয় না। অমলার মান করা পোষায় না। পিঠের উপর আঁচল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, গহনা বাজাইয়া, হেলিয়া-দুলিয়া আবার আসিয়া বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সোহাগভরে বলে—ছাড়ো। আমি যাই বেড়াতে, তাই তোমার কাছে আসি

বিশ্বেশ্বর হাসে। বলে, নইলে আসতে না?

'না' বলিতে বাধে। অমলা উত্তর দেয় না, দয়িতের মুখের পানে মুখটি আগাইয়া দেয়

কিন্তু বিশ্বেশ্বর কি কিছু বোঝে না? সে শুধু অমলার গাল দুটি টিপিয়া দেয়। তারপর দু'জনে নিঃশব্দে শুইয়া থাকিতে থাকিতে কখন এক সময় বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়ে। অমলা অনেক রাত্রি জাগিয়া তাহার পড়া নভেলের প্রেমের দৃশ্যগুলি মনে করিবার চেষ্টা করে।

—কিছুই মেলে না।

অমলার সকল পড়াই বৃথা হইয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রে বিশ্বেশ্বর আদর করিয়া বলিয়াছিল,—এতদিনে তোমায় কাছে পেলাম। সে কথার মানে সেদিন সে বোঝে নাই। তবু বেশ লাগিয়াছিল। তাহার মুখের আরও কথা শুনিবার জন্য সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই। কিন্তু বিশ্বেশ্বর আর কোনো কথা কহে নাই। বিয়ে-বাড়ীর কাজ-কর্ম্মের পরিশ্রমের পর ঘুমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অমলাকে ঘুমাইতে বলিয়া সে নিজেও ঘুমাইয়া পড়ে।

ঘুমটি বিশ্বেশ্বরের সাধা। দুপুরে এক দফা আছে। অমলার ইচ্ছা করিত ঝাঁকি দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গাইলে বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত রাগ করে। দুই একবার সে চেষ্টা করিতে গিয়া অনেক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। রাত্রেও তাই। অমলা বনকপোতীর মতো অনর্গল বকিয়া যায়। হঠাৎ এক সময় দেখে বিশ্বেশ্বর দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তখনও বারোটা বাজে নাই। জাগাইয়াও দেখিয়াছে, আর আলাপ জমিতে চাহে না।

অমলার বন্ধুদের সকলেরই চিঠি আসে, একদিন অন্তর, আর কত লম্বা চিঠি! শুধু বিশ্বেশ্বরই চিঠি লিখে মাসে দু'খানা—তাও সাত আট লাইন, যেন কোনো রকমে দায়-সারা। বিবাহের গোড়ার দিকে অমলা একখানা চিঠি লিখিয়াছিল,—মস্ত বড় চিঠি। তাতে চাঁদ ও চকোরের উপমা ছিল, জলধর ও চাতকপক্ষীর কথা ছিল, এবং আরও অনেক ভালো-ভালো কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর সে-চিঠির এমন ঠাট্টা করিয়া উত্তর দেয় যে, অমলা সেই হইতে দিব্য করিয়াছিল আর কখনও সে দীর্ঘ প্রেমলিপি লিখিবে না। লেখেও নাই

একদিন বিকাল বেলা কি একটা প্রয়োজনে বিশ্বেশ্বর উপরে গিয়া দেখে অমলা প্রকাণ্ড বড় কি এক বাণ্ডিল কাগজ দেখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল,— কার চিঠি ?

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে অমলার মন বোধ হয় মধুর রসে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। সে হাসিয়া জবাব দিল,— তোমার নয়।

—তা জানি। অত বড় চিঠি লেখা আমার কর্ম্ম নয়। কিন্তু কার চিঠি ?

অমলা চিঠিখানি আগাইয়া দিল। এখানে-ওখানে খানিকটা করিয়া পড়িয়া বিশ্বেশ্বর বুঝিল, তাহার স্ত্রীর কোনো বন্ধুকে তাহার স্বামী চিঠি দিয়া জানাইয়াছে, ধ্যান বলিতে জ্ঞান বলিতে তাহার কেহ নাই, এমন কি "ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে"।

বিশ্বেশ্বর মৃদু হাসিয়া চিঠিখানি ফেরত দিয়া বলিল,— এ চিঠি তুমি কি ক'রে পেলে ?

—পাঠিয়ে দিয়েছে। বেশ লিখেছে, না ?

বিশ্বেশ্বর জবাব দিল না। শুধু ফিক্ করিয়া হাসিল।

অমলা রাগিয়া বলিল,—হাসলে যে? ভদ্রলোকের ভালোবাসবার প্রাণ আছে। তোমার মতো ইয়ে নয়।

বিশ্বেশ্বর আবারও হাসিয়া বলিল,—তা নয়। কিন্তু তোমার এই প্রেমিক ভদ্রলোকটিকে আমি জানি। আমরা এক মেসে থেকে এম, এ, পড়তাম।

—তারপরে ?

বিশ্বেশ্বর এক মিনিট একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,— তারপরের কথা জানিনে। দেখ্‌ছি, এখনও পড়া শেষ হয় নি, এবং সেই মেসেই আছেন।

—তা সবাই কি একবারে পাশ করতে পারে ?

—তা পাবে না। সবাই লম্বা-লম্বা চিঠিও লিখতে পারে না। কিন্তু রাত্রে মেসে না থাকাটাই খারাপ।

এবারে অমলা ভীষণ রাগিয়া গেল। এমন চমৎকার চিঠি যে লেখে তার ভালোবাসায় কোথাও ফাঁকি আছে এ কথা ভাবাও যায় না। সে বিছানায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—সব মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা আমি বলি না, বলার দরকারও হয় না। বড় চিঠিও তাই লিখতে হয় না।

বিশ্বেশ্বর চলিয়া যাইতেছিল, অমলা ডাকিল, শোনো, শোনো।

বিশ্বেশ্বর চৌকাঠের গোড়ায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,— কি, বলো।

—তোমার কি আমার কাছে বসতে গা জ্বালা করে ?

বিশ্বেশ্বর একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—না, না। বাইরে একটু কাজ আছে কি না!

—তোমার যত কাজ বাইরেই ? আমি যে ঘরের মধ্যে একলাটি হাঁফিয়ে উঠি, আমার কাছে কি তোমার কোনো কাজ নেই ?

—থাকবে না কেন ? কিন্তু হিতসাধন মণ্ডলীর—

হিতসাধন মণ্ডলীর একটা জরুরী কাজ ছিল সত্যই। তবু পাঁচ মিনিট বসিলে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু পাঁচ মিনিট বসিলেই চলিবে না। অমলা সমস্তক্ষণ তাহার স্বামীকে অধিকার করিয়া রাখিতে চায়। সেইখানেই তার ভয়। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সরিয়া পড়িল।

অমলা এক দৃষ্টে দ্বারের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

নীচে হইতে তাহার শাশুড়ী বার কয়েক ডাক দিলেন। কিন্তু সে সাড়াও দিল না, উঠিলও না। উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। সেদিন বিশ্বেশ্বর আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহার মান ভাঙ্গাইয়াছিল। সেই একদিন মাত্র।

কিন্তু একটি দিনের সুখস্মৃতিতে মানুষের জীবন ভরিয়া ওঠে না। একজন চায় সমস্তক্ষণ তাহার স্বামীকে এক-চেটিয়া অধিকার করিয়া থাকিতে, সেবা দিয়া, শুশ্রূষা করিয়া, ভালোবাসিয়া স্বামীর এবং নিজের মুহূর্ত্তগুলি মধুময় করিতে, আর একজনকে বাহিরের সহস্র কাজ ডাকে, তার নিশ্চিন্তে বসিয়া মধু-রজনী যাপনের সময়ও নাই, অভিরুচিও নাই।

সুতরাং উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে মেঘ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। যে অমলা একটি চোখ এবং একটি কান বিশ্বেশ্বরের যাওয়া-আসার পথের প'রে দিবারাত্র পাতিয়া রাখিত,

বিশ্বেশ্বর পাশ দিয়া চলিয়া গেলেও আর সে ফিরিয়া চাহে না। ক্রমে এমন হইল যে, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন একজন আর একজনের সঙ্গে কথাও কহিত না।

এমন সময় অমলা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইল। মধ্যে কয়দিন সামান্য জ্বর হইয়াছিল, একটু কাশিও ছিল। তখন কেহ বড় খেয়াল করে নাই। অমলা নিজেও কিছুই জানায় নাই। যখন জানা গেল, তখন অনেক বেশি জ্বর।

হিতসাধন মণ্ডলীর কাজ পড়িয়া রহিল। বিশ্বেশ্বর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মণ্ডলীর ছেলেরা মাঝে মাঝে শুশ্রূষা করিবার বায়না ধরিত। কিন্তু নিজের বাড়ীর কাজে নিজের প্রতিষ্ঠানের ছেলেদের ব্যস্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইত না, তাহাদের বসিতেও দিত না। নিজে দিবা-রাত্রি ঠায় বসিয়া থাকিত। অমন সেবা করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। দিন নাই, রাত্রি নাই শিয়রের কাছে বসিয়া রোগিণীর দিকে অপলক চাহিয়া থাকা বড় সহজ নয়। অমলা যখনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে, দেখিয়াছে দুটি স্নিগ্ধ আঁখি আকুল মমতায় তাহারই মুখের পরে নিবদ্ধ। সে তো চোখ নয়, যেন বিধুর হৃদয়ের আকুতি শুকতারায় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

কতবার অমলা তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইবার জন্য জেদ করিয়াছে। বলিয়াছে,—তুমি যাও, তুমি যাও,—কিছু ভয় নেই, আমি এখন বেশ আছি। কিন্তু তখনই জ্বরের ঘোরে সে কথা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের কোলের উপর দুখানি হাত ফেলিয়া দিয়াছে। বিশ্বেশ্বর আর উঠিতে পারে নাই, সমস্ত রাত শীর্ণ হাত দুটি কোলের উপর লইয়া কাটাইয়া দিয়াছে।

এমনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। একুশ দিনের দিন অমলা পথ্য করিল। সেদিন সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত বিশ্বেশ্বর অমলার বিছানার একপাশে পড়িয়া যে ভাবে ঘুমাইল তাহার উপমা একমাত্র রামায়ণেই মেলে। অমলা রোগ-শয্যায় শুইয়াও না হাসিয়া পারিল না।

কিন্তু তারপর দিন সকালে উঠিয়া আবার যে-কে-সেই। অমলা তখনও চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। বিশ্বেশ্বর চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া তাহার কপালের উত্তাপ লইবার জন্য হস্তস্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। বিশ্বেশ্বর তাহার-মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—ভালো বোধ হচ্ছে, না?

—হ্যাঁ। বলিয়াই অমলা তাহার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল,—তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন বলো তো?

অমলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল;—সে আমি জানি নে। আমার অনেক অপরাধ। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।

চব্বিশ ঘণ্টা নিদ্রার জড়তা তখনও বিশ্বেশ্বরের কাটে নাই। এই একটা রাত্রে এমন কি ঘটিতে পারে ভাবিয়া না পাইয়া সে শুধু আচ্ছন্নের মতো বলিল, মন্দ নয়!

অমলা তখনও বিশ্বেশ্বরের হাত ছাড়ে নাই। আবদারের ভঙ্গিতে বলিল,—না তুমি বলো ক্ষমা করেছ?

বিশ্বেশ্বর হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, করেছি। যত সব—হুঁঃ!

অমলার সমস্ত মন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গে নৌকার মতো দুলিতে লাগিল। অসীম বিস্ময়ে কেবলি ভাবিতে লাগিল,—এত বড় ভুল কেমন করিয়া সম্ভব হইয়াছিল! এমন শিবের মতো স্বামীকেও কেমন করিয়া ভুল বুঝিয়াছিল!

ফাল্গুনের উদাসী মধ্যাহ্ন। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নাই; কেবল একটা ঘুঘু একটানা ডাকিয়া চলিতেছিল। শীতের একটু আমেজ আছে। অমলা একখানা পুরু চাদর মুড়ি দিয়া শ্রান্তভাবে শুইয়া ছিল। সমস্ত মধ্যাহ্ন একজনের পদশব্দের প্রতীক্ষায় চাহিয়া চাহিয়া কাটিয়া গেল। নীচে কতবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কিন্তু বিশ্বেশ্বর উপরে আর আসিল না। দিনের আলো ধীরে ম্লান হইয়া আসিল। আরও কিছু পরে আনন্দময়ী সন্ধ্যাদীপ লইয়া ঘরে আসিলেন। অমলা তখন দ্বারের দিকে পিছু ফিরিয়া শুইয়া।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন আছ?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আনন্দময়ী ধীরে ধীরে তাহার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। ভালোই আছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার গায়ের উপর চাদর খানি ভালো টানিয়া দিলেন।

দিনের পর দিন যায়।

অমলা ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে একটু ব্যথা রহিয়া গেল তাহা আর কাহারও দৃষ্টিতে পড়িল না। সে হাসে-খেলে, খায়-দায়, কিন্তু কিছুতে যেন তাহার মন নাই,—সকলের কাছেই কি যেন একটা সর্ব্বদা চাপিয়া যায়।

পাড়ার মেয়েরা বিকাল বেলায় বেড়াইতে আসে। বিশ্বেশ্বরের সেবার কথা বলিতে তাহারা পঞ্চমুখ। অমলা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে, কিছু বলে না। তাহারা রাগ করিয়া অমলার গাল টিপিয়া দেয়।

এই সময়টি বিশ্বেশ্বরের চা-পানের সময় বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বর হাঁকে,—মা, একটু চা খেতাম।

বিকালের দিকে আনন্দময়ীদের মজলিস বসে পাশের বাড়ীতে। এই সময়টায় তিনি বাড়ীতে থাকেন না।

অমলা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসে। এবং বোধ হয় তাহার সঙ্গিনীদের শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বলে,—মা তো বাড়ী নেই, দাসী উপস্থিত। আমার তৈরী চা কি চলতে পারে?

বিশ্বেশ্বর গোঁ গোঁ করিয়া বলে,—একটু তাড়াতাড়ি কোরো। আমার আবার—

পাড়ার মেয়েদের এই রহস্যালাপ শুনিতে বড় কৌতুক বোধ হয়। তাহারা উৎকর্ণ হইয়া সিঁড়ির আড়ালে বাঁকের মুখে যেখানটিতে আসিয়া দাঁড়ায় সেখান হইতে অমলাকে দেখা যায়।

অমলা হাত জোড় করিয়া বলে,—তা আর জানি নে? আপনার অনেক কাজ। কিন্তু একটু স্থির হ'য়ে বসুন। চা করতে যতটুকু দেরী হয়, তার বেশী আমার দেরী হবে না। একটা আসন দোব কি?

বিব্রতভাবে বিশ্বেশ্বর দাওয়ার উপর বসিয়া পড়ে এবং বিড় বিড় করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টাও করে।

অমলা চা আনিয়া দেয়; সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরও কিছু রহস্য করে। বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া চা খাইয়া সরিয়া পড়ে। অমলা উপরে আসিতেই পাড়ার মেয়েরা তাহাকে লইয়া টানাটানি লাগায়। তাহাদের সঙ্গে সেও হাসে।

তার পরে—

সবাই যখন চলিয়া যায়, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে বিছানার উপর সে একেবারে লুটাইয়া পড়ে, চোখ ফাটিয়া হু হু করিয়া অশ্রু ঝরে।

তা ঝরুক। কিন্তু স্নান করিয়া আসিয়াই বিশ্বেশ্বর দেখে তাহার কাপড়খানি কে অতি যত্নে কোঁচাইয়া সুমুখেই রাখিয়া দেয়, জুতা জোড়ায় দু'দিন অন্তর কে চমৎকার করিয়া কালি দিয়া রাখে, পকেটের ময়লা রুমালের পরিবর্ত্তে মাঝে-মাঝে ফর্সা রুমাল রাখিয়া দিয়া যায়,—এমনি কত খুঁটি-নাটি বিশ্বেশ্বরেরও চোখে পড়ে।

কিন্তু তাহার তখন হিতসাধন মণ্ডলী লইয়া নাওয়া-খাওয়ার সময় নাই। একদল ছেলে লইয়া সে তখন নূতন-নূতন স্কীমের খসড়া তৈরী করিতেছে, এবং সেই নূতন পরিকল্পনাটিকে কি করিয়া মূর্ত্তি দেওয়া যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। চারিদিকের সহস্র সহস্র মূঢ় কণ্ঠে ভাষা ও ভগ্ন বক্ষে আশা জাগাইবার স্বপ্নে সে তখন বিভোর। একটি নারীর আকুলতা তাহাকে বাঁধিতে পারে না।

ছয় মাসের মধ্যে একটা নৈশ বিদ্যালয়, একটা লাইব্রেরী এবং ছেলেদের কুস্তি করিবার একটা আখড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এক সঙ্গে এই তিনটা খুলিয়া বিশ্বেশ্বরকে কম দুর্ভোগ পোহাইতে হয় না। নৈশ বিদ্যালয়ের ছেলে জোটানো বড় সহজ নয়। সকলেই চাষী লোক, সমস্ত দিন রৌদ্রে জলে মাঠের কাজ সারিয়া সন্ধ্যা বেলায় তাহারা একেবারে এলাইয়া পড়ে, পড়ায় মনঃসংযোগের শক্তি থাকে না। প্রতি দিন তাহাদের এক এক করিয়া ডাকিয়া আনিতে হয়। তাহার উপর ম্যালেরিয়ার কৃপাও আছে। এবং এই সমস্ত বয়স্ক লোকের স্মরণ-শক্তি এম্‌নি তীক্ষ্ণ যে, উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন অনুপস্থিত হইলে আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সে ধৈর্য্য সকলের থাকে না। অনেকে কিছুদিন পরে হাল ছাড়িয়া দেয়। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, তাহাদের পিছনে যে পরিমাণ সাধ্য সাধনা করা হয় তাহাতে তাহাদের মনে হয়, গরজ যেন বিশ্বেশ্বরেরই। ইহাতে পড়িবার আগ্রহ যায় কমিয়া।

আর লাইব্রেরী। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের পড়ারও সখ নাই, চাঁদা দিবারও সখ নাই। তাহাদের লইয়া কোনো হাঙ্গামাও নাই। আর এক শ্রেণীর লোক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক

চাঁদাটা দেয়, কিন্তু বই পড়িবার সখ নাই। ইহাদের কাছে দু'বারের উপর তিনবার চাঁদা চাহিতে লজ্জা করে। বিশ্বেশ্বর বুঝিয়াছে, ইহাদের চাঁদা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু বিপদ বেশী তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের লইয়া। ইহারা বই নিয়মিতই পড়ে, কিন্তু চাঁদা দেয় না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে হাতের বই ফেরৎ না দিয়াই গা ঢাকা দেয়।

ইত্যবসরে কুস্তির আখড়ায় একটা ছেলে বে-কায়দায় হরাইজণ্টাল বার হইতে পড়িয়া গিয়া ডান হাতখানি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ডান হাতখানি প্রায় অচল হইয়াই গিয়াছিল। এই ব্যাপারে বিশ্বেশ্বর তো খুনের দায়ে পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া যায়। বাঙালীর ছেলের কেরাণীগিরি করিয়া খাইবার সম্বল ওই হাত খানিই। কুস্তি করিলে তো খাওয়া জোটে না। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে ওই অঙ্গের মূল্যই বেশী।

কিন্তু ইহাতেও বিশ্বেশ্বর দমে নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে নারীমঙ্গল সমিতির একটা খেয়াল তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল। সেদিন এই সমস্যার সমাধানকল্পে সে দুপুর বেলায় অমলার শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। অমলা তখন গালে পান পুরিয়া শুইয়া-শুইয়া একটা নভেল পড়িতেছিল। নভেল না পড়িলে তাহার ঘুম জমে না।

বিশ্বেশ্বর আসিতেই অমলা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া জোড়হস্তে বলিল,—কি আজ্ঞা করেন?

বিশ্বেশ্বর শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া সহাস্যে বলিল,—আজ্ঞা একটু আছে।

তারপরে গম্ভীর ভাবে বলিল,—দেখ, আমাদের হিতসাধন মণ্ডলীর—বলিয়া অমলার পানে চাহিতেই দেখিল, অমলার চোখে একটু ভ্রূকুটি ঘনাইয়া উঠিতেছে। বলিল,—আচ্ছা, তুমি হিতসাধন মণ্ডলীর উপর চটা কেন?

—চটা নই তো। তারপরে বলো,—

বিশ্বেশ্বর একটু দ্বিধা করিতে লাগিল। বলিল,—আমি ভাবছি, আমাদের মণ্ডলীর সঙ্গে একটা নারীমঙ্গল সমিতি খুলবো।

—কি মঙ্গল তাতে হবে?

—সে অনেক কথা বলতে হয়।

অমলা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল,—না, অনেক কথা শোনবার ধৈর্য্য আমার নেই। তুমি সংক্ষেপে বল।

—সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে পৃথিবীর চিন্তাধারার যোগ-স্থাপন।

—আমাদের দেশের মেয়েদের পরে তোমার দয়ার অন্ত নেই। কিন্তু তাতে আমি কি করতে পারি?

—তাতে যা কিছু কাজ সে তো তোমারই। তুমি এ বিষয়ের ভার নাও।

অমলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপরে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এই জন্যেই আজ দুপুরে তোমার শুভাগমন?

—হাঁ্যা। নেবে তুমি ভার?

—না। দেখ, তুমি আমার জীবন দিয়েছ। সবাই বলে, তোমার মতো অমন সেবা না কি নার্সেও করতে পারে না। আমিও অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু ও সব আমি পারবো না।

বলিয়া অমলা পিছন ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল,—জীবন দেওয়ার কথা তুলো না। কৃতজ্ঞতারও কথা নয়। কিন্তু দেশের মেয়েদের জন্যে—

অমলা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল,—না, না, না। তোমার পায়ে পড়ি আমাকে আর জালিও না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর আর কোনো কথা বলিল না। রাগ করিয়া সেও উঠিয়া চলিয়া গেল।

ঈশান কোণে মেঘ ওঠে এক টুকরা। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহাই কখন দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহার আর ইতিহাস নাই।

অমলার মনে যে-মেঘের টুক্‌রা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহার পানে বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টিই পড়ে নাই। এই ভারতের ভাবীকালের মহিমময়ী মূর্ত্তি তাহার মনশ্চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। আপনার অন্তরের প্রেম অমলাকে নিঃশেষে দান করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, যেন ওদিকে আর তাহার কর্ত্তব্য কিছু নাই। অমলার কাছে সে কখনও কোনো জিনিস দাবীও করে নাই, ভিক্ষাও মাগে নাই।

তাহার কাছে যে অমলার দাবী করিবার কিছু থাকিতে পারে তাহাও সে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। সুতরাং ঝড় যখন উঠিল, তখন বিশ্বেশ্বর বিরক্ত হইয়া মনে করিল,—এ আবার কি বিপদ! সে নিজেকে বিপদ হইতে আরও দূরে সরাইয়া লইল। কিন্তু যতই সে সরিয়া যায়, বিপদ ততই বেশী বাধে।

এ বিরোধে দোষ কাহার সে বিষয় এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যাহারা মিশিয়াছে তাহাদের মধ্যেও দুই মত আছে। একদল বলেন,—দোষ অমলারই। জমিদারের কন্যা বলিয়া সে তো আর সকলের মাথা কিনিয়া রাখে নাই। মেয়ে মানুষের অত তেজ ভালো নয়। এই দলে প্রবীণার সংখ্যাই বেশী।

পাড়ার ছোট মেয়েরা কিন্তু এ কথা মানে না। বলে,—তেজ আবার তার কোথায় দেখ্‌লে? আমরা তো দিনরাত্রি মিশেছি, অমন সতী লক্ষ্মী দেখি নি। অত লাঞ্ছনা সইতো তবু বাপের বাড়ীর নাম করতো না। বাপ তো নিয়ে যাবার জন্যে সাধাসাধি করতো। তা একটি দিন বাপকে তার দুঃখের কথা জানায় নি।

এ কথা মিথ্যা নয়। নিজের এতটুকু দুঃখের কথা জানাইয়া মুখ নীচু করিবার মেয়ে অমলা নয়। স্বামীর কাছেও একদিনের তরে কৃপা ভিক্ষা সে করে নাই,—বেদনার দাহে তাহার অন্তর দিবারাত্র পুড়িয়াছে, গোপনে সে ছট্‌ফট্ করিয়াছে তথাপি একটি দিন বলে নাই,—আমাকে তুমি দয়া কর,—আর কষ্ট দিও না,—আমি আর পারি না।

তেজ আছে বই কি! কিন্তু সে যেন বিদ্যুতের তেজ, ঝিলিক্ মারিবার আগে পর্য্যন্ত বোঝা যায় না।

এমন মেয়েকে লইয়া সমাজের মানুষ কি করিতে পারে? বিপুল মানব-সমাজে বিবাহ একটা বড় রকমের আপোষ। দুটি মানুষে সম্পূর্ণ মিল হয় না। একজন কখনই আর একজনের সম্পূর্ণ মনের মতো হয় না। আমরা আপোষ করিয়া দুঃখে-সুখে গৃহ কর্ম্ম করিয়া যাই। দোষ গুণ, ভুল ভ্রান্তি সমস্ত মিলিয়া যে-মানুষ, তাহাকে জীবনের সঙ্গী করিতে গেলে আর তো উপায় নাই। তাহার গুণকে আমরা ভালোবাসি,—তাহার দোষত্রুটি ক্ষমা দিয়া, ভালোবাসিয়া শোধন করিয়া লই। মনে করি, যেখানে আমাদের মিল সেইখানেই আমরা মিলিব। তাই বলিয়া যেখানে মিল হইল না সেখানে বিরোধও করিব না।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর ও অমলার মধ্যে কোথায় বিরোধ এবং কোথায় মিল খুঁজিয়া না পাইয়া লোকে অবাক্ হইয়া যায়।

একজন তো ভোলা মহেশ্বর। কাছা-কোঁচার ঠিক নাই, কোথায় কে বিপদে পড়িয়াছে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে; কাহার ঘরে শুশ্রূষার অভাবে, পথ্যের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে কে মরিতেছে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা প্রয়োজন; হয় তো নিজের খাওয়া হয় নাই, কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে হইবে; যাহার কন্যা-দায় তাহাকে কোনো প্রকারে দায়মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। মানুষের বিপদের শেষ নাই এবং সংসারে বিপদগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং বিশ্বেশ্বরের কোনো পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর নাই। এমন মানুষকে কি কেহ অপরাধী করিতে পারে?

আর একজন পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দুঃখ হয় তো আছে, ব্যথাও আছে, কিন্তু বাহিরে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। রোগমুক্তির পরে সে যেন আরও প্রাণবতী হইয়া উঠিল। সমস্ত ব্যথা প্রাণপণে অন্তরে চাপিয়া এমন ভাবে স্বামীসেবা আরম্ভ করিল যে, সবাই বলিল,—হ্যাঁ, স্বামীসেবা যদি করিতে হয় তো এমনি করিয়া। স্বামীর তুচ্ছতম অভাবও ইহার দৃষ্টি এড়ায় না।

যাহারা শুধু চোখ মেলিয়া দেখে, মনের দলগুলি মেলে না, এমন দুটী প্রাণীর মধ্যে কোথায় জোড় মিলিতেছে না, কেবলি ফাট ফাটিতেছে তাহা তাহাদের চোখে পড়িবে কি করিয়া! তর্ক যে যাই করুক, অমলার মৃত্যুতে সকলের বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

পাড়া-ঘরের ব্যাপার,—এক বাড়ীর খবর অন্য বাড়ীতে জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু এই বাড়ীর দুটি মেয়েই এমন চাপা যে সে বিষয়ে পাড়ার লোকের কোনো সুবিধা হয় নাই।

যে দিন দুপুরে বিশ্বেশ্বর রাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং অমলা পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল, তাহার পরদিন হইতেই যেন একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আনন্দময়ী বুঝিলেন,

উভয়ের মধ্যে একটা কিছু হইয়াছে। কিন্তু পুত্র ও পুত্র-বধূর ব্যাপারে কোনো কথা কহিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কৌতুকই বোধ হইত,—একটু হাসিয়া চুপ করিয়া যাইতেন, কোনো কথা কহিতেন না। এবারেও চুপ করিয়াই রহিলেন।

তিনি দেখিলেন, বিশ্বেশ্বর পারৎ পক্ষে বাড়ী আসে না এবং প্রায় রাত্রি বাহিরেই কাটাইয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, মণ্ডলীর কাজ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, সবই রাগের কথা। কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না। বরং নিজের অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে হাসিলেন। পুরুষ মানুষ রাগ করিয়া কয়দিন থাকিতে পারে!

অপর পক্ষে অমলা আর তেমন যত্ন করিয়া সকাল বেলা চা-জলখাবার তৈরী করিয়া পাঠাইয়া দেয় না, জুতায় কালি দেয় না, কাপড় কোঁচাইয়া সামনে রাখিয়া দেয় না। সে যেন সব বিষয়েই উদাসীন,—নিজের বিষয়েও। তাহার নিজেরও যেন আর কোনো বিষয়ে চাড় নাই; বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে, কাজ করিতে করিতে কখন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া গিয়াছে, নিজেই জানিতে পারে না। এক সময়ে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলেই লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি কাজে মন দেয়। আবার ভুলিয়া যায়, আবার মন দেয়। এমনি করিয়া পাঁচ মিনিটের কাজে তার এক ঘণ্টা লাগে। আনন্দময়ী তাহার অবস্থাও দেখেন, কিন্তু তাহাকেও কিছু বলেন না। এমনি করিয়া মাসখানেক গেল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছুপরে বিশ্বেশ্বর কি একটা প্রয়োজনে উপরে আসিয়া দেখিল, অমলা দিব্য আরামে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে, আর নীচে মা ডাকিয়া মরিতেছিলেন। রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল।

বলিল,—মা ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?

এই মা'টির প্রতি অমলারও শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। নববধূ অবস্থায় সে যখন আসে, শাশুড়ী তাহাকে মায়ের স্নেহে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তারপর হইতে এখন পর্য্যন্ত তাঁহারই পায়ে পায়ে দিনরাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়। দোষ করিয়া তিরস্কৃত হইলে কাঁদিয়া রসাতল করে, মাকে নিজের হাতে সেই চোখের জল মুছাইয়া দিতে হয়।

কিন্তু বোধ হয় তার মন ভালো ছিল না,—অথবা অন্য যে কারণেই হোক সেও রাগের উপর ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল,—না পাচ্ছি না। একশোবার আমি কারও ডাক শুনতে পাবো না।

ইহার পর উভয় পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর অনেকগুলি রূঢ় কথা বলিল, যাহা তাহার মতো শিক্ষিত লোকের বলা উচিত হয় নাই,—এবং অমলা সমান রূঢ় কথা বলিয়া তাহার উত্তর দিল। কিন্তু মেয়েদের সহিত ঝগড়ায় পুরুষ মানুষের কোনোদিন জিৎ হয় না। বিশ্বেশ্বরকে পিছু হঠিতে হইল।

যাইবার সময় বিশ্বেশ্বর বলিতে বলিতে চলিয়া গেল,—মরণ না হ'লে আমার আর শান্তি নেই। বিয়ে ক'রে আমার নিজের অশান্তি নিজে ডেকে এনেছি।

অমলা কাঠ হইয়া হাতের মুঠা শক্ত করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল।

সে নীচে গিয়া রাত্রের রান্না শেষ করিল,—রাত্রে সে-ই রাঁধে। তারপরে স্বামীর খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া শাশুড়ী পায়ে হাত বুলাইয়া দিল। আনন্দময়ী সেকালের সংসারের যত গল্প করিলেন তাহা শুনিয়া হাসিল। তিনি ঘুমাইলে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে যে খায় নাই তাহা আনন্দময়ী জানিতেও পারিলেন না।

তারপরে কি যে হইল ভগবান জানেন, সকালে তো ওই কাণ্ড!

ডাক্তারী পরীক্ষা করাইলে হয়তো মৃত্যুর কারণ জানা যাইত। কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। মৃত্যু হার্টফেল করিয়াই হোক, আর বিষপানেই হোক তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। তবে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মনে হয়, ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিষ-সংগ্রহের কোনো সুবিধা ছিল না, হার্টফেল করিয়া মৃত্যু হওয়াই সম্ভবপর

(ক্রমশঃ)

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা]

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲।

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—**উপাসনা**—

৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

ফাল্গুন—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

ফাল্গুন—১৩৩৮

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জন্ম—১৮৫৩, নভেম্বর] [মৃত্যু—১৯৩১, নভেম্বর

প্রবাসী

২৪শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৮ | ১১শ সংখ্যা

কবির দুঃখবাদ

শ্রীকালিদাস রায়

তুমি শুধু চাও বন্ধু, কবি গা'বে আনন্দের গান,
তোমার ভুঞ্জনসুখে ঘনাইবে তার গুঞ্জতান ;
তব দুঃখতপ্ত প্রাণ জুড়াইবে নব নব সুরে,
ভাসাবে সঙ্গীত-স্রোতে অপ্রিয়েরে দূরে বহু দূরে।

কবি জড়যন্ত্র নয়, গাহে না সে স্বর-যন্ত্র প্রায়,
সে যে গো জীবন্ত যন্ত্রী বুঝে নিত্য শত যন্ত্রণায়।
দাঁড়াইয়া রণদূত বহির্দ্বারে, সমরের সাজে
বিদায় মিলনসুখ অশ্রুভরা অন্তঃপুর মাঝে,—
এ সংসারে ভোগসুখ তার বেশি কি বা বন্ধু আর ?
শোন নাকি মৃত্যুদূত মাঝে মাঝে ছাড়িছে হুঙ্কার,—
সময় আসন্ন বলি' ; বল বন্ধু, ভুলাতে একথা
কোন্ গান গাবে কবি, কোন্ সুরে জাগাবে মত্ততা ?

বাৎসল্য, প্রণয়, প্রীতি সবে মিলি একতান তুলি'
অপূর্ব্ব সঙ্গীত রচি' তোমারে রেখেছে কুতূহলী ;
ভোগে ভুলায়েছে তব সংসারের সকল প্রমাদ
ভারতীর আশীর্ব্বাদ, ইন্দিরার মঙ্গল-প্রসাদ।
আধিব্যাধি দ্বন্দ্ব দ্বেষ পাপ তাপ—তারা ঝাঁকে ঝাঁকে
তোমার গৃহটি ঘেরি উঁকি দেয় বাতায়নফাঁকে,
পথ দিয়ে গেয়ে যায় অন্ধ-পঙ্গু ভিখারীর দল
বড় সকরুণ সুরে,—করে না কি তোমারে চঞ্চল ?

নিপীড়িয়া প্রেয়সীরে বক্ষপাশে আনন্দে বিভোর,
রসপানে মগ্ন যবে,—চক্ষে আসে তন্দ্রার বিঘোর,
উচ্চকিত পন্থা— গায় 'বল হরি, হরি হরি বোল',
দূর গৃহ হ'তে উঠে আচম্বিতে ক্রন্দনের রোল।
শুনিতে পাওনা বন্ধু ? হয়ত বা শুনেও শোন না,
কবি যে শুনিতে পায়,—তাই সে যে ব্যথায় উন্মনা।

লোকালয় হ'তে দূরে প্রকৃতির ভোগ্যের ভুবনে
আনন্দে তন্ময় যবে প্রিয়াসহ নিকুঞ্জ কাননে
প্রজাপতি সম ঘুর'—ফুলে ফুলে মধু পান করি',
হেরিতে তোমার লীলা আমি বন্ধু কাছেই বিহরি।
হেরি আমি—ক্ষণে ক্ষণে তোমা হায় তুলিছে আকুলি
তোমার মানব-ধর্ম্ম জীবনের ব্রত লক্ষ্য গুলি,
হেরি তুমি অবসন্ন বীতরাগ পুষ্পাসবপানে,
অলক্ষিতে শ্রমঘন কর্ম্মদীপ্ত গৃহ তোমা টানে।
তুমি যে পতঙ্গ নও—হতভাগ্য মানব-সন্তান.
কতক্ষণ ভুলাইব এই সত্য, গাহি মায়া-গান ?

শীতান্তে উৎসবশেষে প্রকৃতির সংসার-সভায়
মলয়-হিল্লোলে নাচে পর্ণ-শিশুগুলি রাঙা পায়।
তুমি বল'—গাও কবি, হেন দিনে আনন্দের গান,
বসন্তের উদ্বোধনে ধর আজ কাফিসিন্ধু-তান।
আমি ত গাহিতে চাই বর্ষান্তের আনন্দ-সান্ত্বনা,
আমি ত ভুলাতে চাই বৎসরের বেদনা-লাঞ্ছনা ;

শুষ্কপত্র, যত মক্ষী-মশকের দল,
রোগের বীজাণুপুঞ্জ ঘূর্ণি রচি' করে কোলাহল
আমার বীণারে ঘেরি, ডুবাইয়া দেয় বার বার
তোমার আদেশ আর আনন্দের বসন্ত-বাহার।

পশুর 'অতীত' নাই—'স্মৃতি' নাই—নাই 'ভবিষ্যৎ',
'বর্ত্তমান' দিয়া শুধু রচা তার আনন্দজগৎ।
যূপকাষ্ঠবদ্ধ ছাগ নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্তজীবন,
সিন্দূর-তিলক পরি' বিল্ব-পত্র করে সে চর্ব্বণ ;
মন্দিরের হিংসামত্ত বাদ্যোচ্ছ্বাস উদ্দাম মদির,
তাহার চর্ব্বণানন্দে করি তোলে গভীর নিবিড়।
মানুষ ত পশু নয়— সার তার নহে বর্ত্তমান,
তাহারে শুনাবে কবি, হায়, কোন্ আনন্দের গান ?

অস্থি-চর্ম্ম-শৃঙ্গে রচা বীণা ডঙ্কা মৃদঙ্গ বিষাণ,
এর মাঝে কিসে হবে উচ্ছ্বসিত আনন্দের গান ?
নিসর্গ-শ্মশানবার্ত্তা কোন্ যন্ত্র করে না বহন ?
নির্ম্মম পাংশুল করে স্পর্শ কা'রে করেনি মরণ ?
কবি জানে, মর্ম্মদাহ ঘুচেনাক' প্রলেপে ব্যজনে,
কবি জানে, ঘনতমঃ মুছেনাক চপলা-স্ফুরণে।
স্বপ্নকে মদির করি' কিবা লাভ ?—হায়, জাগরণ
নিশ্চিহ্ন করিয়া সবি করিবেই লুণ্ঠন হরণ।

কবিরে ভুলাবে সত্যে কোন্ সুরা দিয়া উপহার ?
কোন্ পাত্রে সেই সুরা পরশিবে অধর তাহার ?
সব সুরা তা'র চক্ষে দ্রাক্ষালতা-বক্ষের রুধির,
সব পাত্র হস্তে তার ধরে রূপ নর-করোটির।
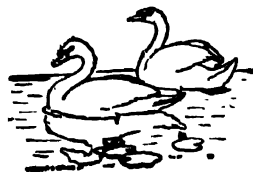
গল্পে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইউরোপ যেদিন বাঙলার কবিগুরুর কপালে নোবেল প্রাইজের বিজয়টিকা পরিয়ে দেয় সেদিন, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সে সমস্ত জাতিটার এবং জাতির ভাগ্যবিধাতার কপালেও একটা কলঙ্ক-তিলক লাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের কবি তখন পর্য্যন্ত নিজের দেশে ছিলেন একরকম অজ্ঞাত এবং খানিকটা অবজ্ঞাত তো নিশ্চয়ই; তাই প্রবাস-যাত্রায় তাঁর বর অঙ্গে এমন একখানি ভূষণ পর্য্যন্ত ছিল না, যা বিদেশের সভায় দেশের অবহেলার লজ্জাটা ঢাকতে পারতো। ফিরে যখন এলেন, কেউ হন্তদন্ত হয়ে "স্যার" নিয়ে হাজির হোলো, কেউ 'ডি-লিট্'। যার ঘটে বুদ্ধি আছে সে চেপে গেল—ভাবলে—তাইতো, 'স্যার' 'ডি-লিট্'এর জলুস তো আর খুলচে না—আমাদের দেওয়া কিছু আর মানাবে কি? ……

এটা কিছু আর নূতন কথা নয়।—তার একটু আগেই আমরা ম্যাক্স-মুলার-ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানীর সার্টিফিকেট-দেওয়া নিজেদের শাস্ত্রসম্পদ চিনতে শিখেছি—সুতরাং কবিগুরুর বেলায় জাতীয় স্বভাবের এমন কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই।

যাক্, হাওয়া বদলেছে—তাই সুদিনে যাঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামান দরকার বোধ করিনি, দেশের সর্ব্ববিধ দারুণ দুর্দ্দিনে এতটুকুর জন্যেও জাতির মনোবীণায় দুঃখের ইমনের জায়গায় তাঁর জন্যে জয়জয়ন্তীর মীড় জেগে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথকে আমল দিতে জাতির এত বিলম্ব হ'লো কেন, আমাদের সাহিত্যিক ইতিহাসে এ একটা স্থায়ী প্রশ্ন। এর একটা বড় কারণ যে তাঁর mysticism, সেটা একটা অবিসংবাদিত সত্য। তাঁর অনেক কবিতার চারিদিকেই একটি কুহেলী-মণ্ডল আছে, যা ভেদ ক'রে সবার দৃষ্টি কাব্যের মর্ম্মস্থানে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। আর অধিকাংশ পাঠকেরই কবির মর্ম্মস্থানে পৌঁছুবার কোন রকম হৃদয়ের তাগিদ কিংবা যাকে বলে মাথাব্যথা নেই। অনেকের ভাবগতিটা বরং এমনও ব'লে বোধ হয় যে, কবির কাব্য প'ড়ে, বুঝে তাঁরা কৃতার্থ হন না—কবিকেই কৃতার্থ করেন—সুতরাং কবির যদি ঋজুপাঠের মত ঋজু এবং সরল হবার সুবুদ্ধিটুকু না থাকে তো তিনি নিজের পথ দেখুন গিয়ে।

বাঙলা কাব্যের অভিনব ধারা এই mysticism আর এর প্রবর্ত্তক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যে-দিকটা, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা নাই। কবি অস্পষ্ট দুইটি কারণে হ'তে পারেন—প্রথমত, তিনি যখন নিজের ভাবকেই ভালমত আয়ত্ত ক'রতে পারেন না, তখন তাঁর অস্পষ্টতাই স্বাভাবিক। এখানে কবিই অক্ষম। আর দ্বিতীয়ত, যখন কবি এত উচ্চে উড্ডীন যে পাঠকই তাঁর নাগাল পায়না—এখানে পাঠকই অক্ষম। কবি আর তাঁর এ যুগের পাঠকের মধ্যেকার বিরোধ দূর ভবিষ্যৎ মেটাবে। Mystic সুফী কবিদের কাব্যের মধ্যে অমৃত ছিল ব'লেই সেগুলি কালের উজান ঠেলে উৎরে আসতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের mystic কবিতাগুলির মধ্যে যদি সে প্রাণ-শক্তি না থাকে তো সেগুলি কালের বাছাইয়ে টিকবে না। তা'হলে, কবি উপহাস ছলে যে কথা নিজেই গেয়ে রেখেছেন, তা একদিন, অন্ততঃ আংশিক ভাবে সত্য হ'য়ে উঠবেই—

> ততদিনে দৈবে যদি পক্ষপাতী পাঠক থাকে
> কর্ণ হবে রক্ত বর্ণ এমনি কটু ব'লবো তাকে
> যে বইগুলি প'ড়বে হাতে, দগ্ধ ক'রবো পাতে পাতে
> আমার ভাগ্যে হ'ব আমি দ্বিতীয় এক ভস্মলোচন
> আমায় হয়ত কর্ত্তে হবে আমার লেখার সমালোচন।

ভবিষ্যতের সেই ভস্মলোচন যিনি হোন না কেন, তিনি অপদার্থকে রেহাই দেবেন না, সুতরাং এ ধরণের কবিতা তাঁর বিচারে ছেড়ে দিলেও আপাততঃ কবির কাছে কিছু পাওয়া যায় কিনা তাই বিবেচনার বিষয়। এক কথায় বলতে গেলে—যায় পাওয়া, আর যা পাওয়া যায় তা অল্পও নয়, অকিঞ্চিৎকরও নয়। তা পরিমাণে, বৈচিত্র্যে, গভীরতায়, মাধুর্য্যে মনটাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলে। বিশ্ব-সাহিত্যে এত বড় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ পূর্ব্বে হয় নাই ব'লে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন—বুঝিবা ভবিষ্যতেও হবার নয়। তাই অল্প এক অংশ নিয়ে একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক্। কবির কাব্যরাশির আওতায় প'ড়ে তাঁর যে দু' একটা জিনিষ লোকচক্ষুর একটু আড়ালে পড়ে গেছে, তার মধ্যে একটি

হচ্ছে তাঁর ছোট গল্প। রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে যত লোক জানে, ঔপন্যাসিক হিসেবে তার চেয়ে কম লোক জানে, আর তিনি যে গল্পও লিখেছেন একথাটা জানে সবচেয়ে অল্প লোকে। অথচ সাহিত্যের এদিকটায় তাঁর যে দান, শুধু সেটুকু নিয়েই যে কেউ সাহিত্য-যশের অধিকারী হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা লিরিক্,—গদ্যে এই লিরিক্ প্রতিভার বিকাশ ছোট গল্প গুলিতে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যের নিছক কবিটি, যিনি সমস্ত জটিল সমস্যার বহু উর্দ্ধে, এক শুদ্ধ সৌন্দর্য্যালোকে বিহার করেন। তাঁকে একদিকে যেমন পাই কবির ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি পাই তাঁর ছোট গল্পগুলির ভেতর। কবিতার মধ্যে কিছু সামান্য অংশ এবং গদ্যরচনায় গল্পেতর প্রায় সমস্তটাই সমস্যাকণ্টকিত। কবি এসব স্থলে একা বহুধা হ'য়ে উঠেছেন। এক একটি রচনার মধ্যে যেন একটা মজলিস্ বসে গেছে তাতে কবি আছেন ও ঔপন্যাসিক আছেন, দার্শনিক আছেন ও সংস্কারক আছেন। "গোরা" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সবই এই চতুরঙ্গের সমবেত সৃষ্টি, "ঘরে বাইরে" তো সমাজের কাছে সংস্কারবিচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের দৃপ্ত প্রশ্ন।

ছোট গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কোনখানেই তেমন কোন নিগূঢ় সমস্যা নিয়ে পড়েন নি। এই গল্পগুলির মধ্যে মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রেচেন। মানুষের অন্তর্লোকের বিচিত্রতা এই গল্পসমষ্টির মধ্যে যেমন পাওয়া যায়—তাঁর আর কোন রচনা থেকেই তা পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্যের মধ্যে মোটামুটি ধরতে গেলে একটি মাত্র বিশিষ্ট মনের ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়—সে মনটি কবির নিজের। মনে রাখতে হবে, সে মন যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, তা একটি। আমরা দেখতে পাই "সন্ধ্যাসঙ্গীত"এর ব্যাকুল সংশয়-দুঃখ থেকে সুরু ক'রে সেই একটি মন কেমন ক'রে "কড়ি ও কোমল," "সোনার তরী" প্রভৃতির আশা-আনন্দ-উন্মাদনার মধ্য দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কেমন "নৈবেদ্য," "খেয়া" "গীতাঞ্জলী" প্রভৃতিতে নিজের চরম বাঞ্ছিতের সন্ধান পাওয়ার একটা তৃপ্ত আনন্দের মধ্যে এসে পৌছেছে। কিন্তু এর সহস্র মাধুর্য্য নিয়েও এ একেরই ক্রমবিকাশের ইতিহাস। এর বিচিত্রতা একেকেই আশ্রয় ক'রে। ছোট গল্পগুলির ধারা স্বভাবতই অন্যরূপ। এক একটির মধ্যেই একাধিক মনের সুখ দুঃখের আশা নিরাশার পরস্পর সংঘাতের লীলা-লহরী ব'য়ে চ'লেছে। এই নিয়ে প্রত্যেকটি গল্প আত্মসম্পূর্ণ।

মানব-মনের এই যে অশেষবিধ খেলা একে তাঁর গল্পে ব্যক্ত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনার সমস্ত ধরণ বা পদ্ধতি গুলিই কাজে লাগিয়েছেন—সাধারণ narrative tales থেকে আরম্ভ ক'রে romance, mystery tales—কোন ধারাকেই তিনি বাদ দেন নাই। বাঙ্গলা ভাষায় ছোট গল্পের জন্য বরমাল্য কাঁর পাওয়া উচিত সে কথা নিয়ে এক সময় একটা মসীতর্ক উঠেছিল। রচনা-কুশলতা বাদ দিলেও আমার মনে হয় শুদ্ধ গল্পের বৈচিত্র্যের দিকটা ধ'রলেও যে রবীন্দ্রনাথ এ বিভাগেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একথা অস্বীকারের উপায় নেই।

কতকগুলি গল্প বাঙ্গলার শান্ত অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র।—বাঙ্গালীর ঘরের দৃশ্যপট, বাঙ্গলার অপূর্ব্ব গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের ব্যাকগ্রাউণ্ড বা পটভূমিকায় আঁকা। বাঙ্গলার মন্থরগতি কিংবা বর্ষাস্ফীত নদীর বক্ষে দিগলম্বিত বিস্তীর্ণ মাঠের উপর, ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীর শান্তকোলে জীবনের যে সহস্র রূপ ফুটে ওঠে, কতকগুলি গল্প শুধু তারই আড়ম্বরহীন কাহিনী। এগুলি বাঙ্গালীর মনে যে সাড়া জাগায়, যারা সেই স্নিগ্ধ নিরুপদ্রব জীবনের সঙ্গে পরিচিত নয় তাদের মনে তদনুরূপ সাড়া জাগাতে পারে না। কিন্তু যা দেশ কাল জাতির গণ্ডী ছাড়িয়ে মানব-মনের শাশ্বত তত্ত্ব প্রচার ক'রচে, যার interest universal অর্থাৎ যাতে বিশ্বমানবের দরদ ফুটে উঠেছে, এমন সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের উপযোগী জিনিষেরও অপ্রতুল নেই। কবি কোথাও প্রতিদিনের ছোটখাট সুখদুঃখগুলি প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেচেন, আবার কোথাও জীবনের মূল সূত্র ধ'রে সেটিকে একটি গল্পের মধ্যে রূপায়িত ক'রে তুলেচেন। "দুরাশা" গল্পটি এই শেষ পদ্ধতির একটি সুন্দর উদাহরণ।—

আমাদের জীবনের ওপর আদর্শের প্রভাব অপরিসীম। জীবন তার পুরাতন বেষ্টনীর মধ্যে পুরাণ ধারা বেয়ে চলে—হঠাৎ এক গরিমাময় আদর্শের মোহন আলোকের সামনে প'ড়ে তার সমস্ত ওলট-পালট হ'য়ে যায়—মুগ্ধ সে সমস্ত

মনপ্রাণ দিয়ে সেই আদর্শের আধার যে, তার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। তারপর যখন সব শূন্য হ'য়ে গেছে—তখন হঠাৎ দেখে যার আলোকে আকৃষ্ট হ'য়ে সে ক্লান্ত—যাকে পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে সে নিজেকে অন্তরে বাহিরে—সমস্তটাই রিক্ত, বাঞ্চিত ক'রে রেখেছে, সে নিজেই ভ্রষ্ট, ভূলুণ্ঠিত—যখন সব শেষ—জীবন আর নূতন ক'রে যখন পত্তন করা যায় না, তখন এই জীবনব্যাপী ব্যর্থ তপস্যার যে বেদনা, তার মধ্যে সান্ত্বনার একটুকুও স্নিগ্ধ পরশ থাকে না।

বদ্রাওনের নবাব-পুত্রীর ইতিহাস এই। যে সৌম্যজ্যোতি ব্রাহ্মণকুমারকে পাওয়ার জন্যে অসূর্য্যম্পশ্যা নবাব-কন্যা একদিন নবাব-মহলের সমস্ত বিলাসবৈভব পায়ে ঠেলে বিশ্বের অপরিচিত পথে বাহির হ'য়ে পড়েছিল, যার গ্রহণ-যোগ্যা হবার জন্যে মুসলমান-পুত্রী হ'য়ে সে ব্রাহ্মণত্বের কঠোর সাধনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়ে দিল—সে শোভনলাল ছিল নিতান্ত সুদূর একটা দুরাশা মাত্র, তাকে জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের পর হঠাৎ একদিন পাওয়া গেল হিমালয়ের একটি অপরিচ্ছন্ন ভুটিয়া পল্লীতে। এই সে একদিন ম্লেচ্ছকন্যা ব'লে নবাব-পুত্রীর সেবা আর আত্মনিবেদন রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে তারই মনে শ্রদ্ধার বিমল আলো জ্বেলেছিল, আর আজ সে-ই, অনাচার-দুষ্ট, জঘন্য ভুটিয়া স্ত্রী গ্রহণ ক'রে ভুটিয়া পুত্র কন্যার মধ্যে বেশ কালাতিপাত ক'রচে।

বদ্রাওনের নবাব-কন্যার সুমহান আদর্শ এমনি ক'রে মাটিতে মিশিয়ে গেল। নিরাশার এমন একটা বিরাট রূপ একটা ছোট গল্পের অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে কি অদ্ভুত ভাবে যে ফুটে উঠেছে—আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের একটা দিক তাঁর mystery tales অর্থাৎ রহস্যাত্মক গল্প। এ শ্রেণীর গল্প বাঙ্গলা ভাষায় খুব কম—আর যাও বা আছে, তাও প্রায় ডাঁহা ভুতুড়ে গল্পে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ শিল্পীর মধ্যে প্রায় সেই সূক্ষ্ম চাতুরীর অভাব, যা'তে ক'রে গল্পগুলিকে অস্বাভাবিকতা থেকে রক্ষা করা যায়। শিল্পীর কাজ হওয়া চাই পাঠককে গভীর রহস্যের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে তীব্র অদ্ভুত রস পান করিয়ে আবার তার মনটিকে আমাদের এই চির-পরিচিত সহজ আলো বাতাসের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। রহস্যটা বেশ ঘনীভূত ক'রে দিয়ে আবার তাকে ভেঙ্গে না দিলে আখ্যানটি যা দাঁড়ায়, তা একটা স্বাস্থ্যবান বিচার-কুশলী মনের পক্ষে নিতান্তই হাস্যকর। সেটা সোজাসুজি একটা জুজুর ভয় দেখান হয়—ভূতের সঙ্গে আর্টও ম'রে ভূত হ'য়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর গল্পের মধ্যে "কঙ্কাল" "মণিহারা" "নিশীথে" আর "ক্ষুধিত পাষাণ" সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে। Type হিসাবে শেষেরটি নিয়ে একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক্।

গল্পটির স্থান কাল পাত্র সবই গল্পের বিষয়ের পরিপোষক। রাত্রি দশটার সময় জংসন ষ্টেসনের ওয়েটিংরুমে একজন সবজান্তা মুরুব্বি গোছের লোক—তিনি এক সময় এক পরিত্যক্ত নবাব-মহলে কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিলেন—তারই গল্প ফেঁদে ব'সলেন। শ্রোতা দুইটি—তার মধ্যে একজন থিয়োসফিষ্ট—ভৌতিক কাণ্ড'য় বিশ্বাস যাঁদের ধর্ম্মসিদ্ধ। সব দিক দিয়ে আবহাওয়াটি গোড়া থেকেই অনুকূল হ'য়ে উঠল। আর এই আবহাওয়ার মধ্যে মূল আখ্যানটি এমন সহজ ভাবে জ'মে উঠল যে, পাঠক সংশয়ের কোন অবসরই পেলেন না। কঠিন বর্ত্তমান থেকে তার মন কত শতাব্দী পূর্ব্বের কোন্ এক যুগের বিলাস-মোহের আবর্ত্তের মধ্যে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। বক্তার সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়ে শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কোন্ এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হ'য়ে উঠে সে সেই "শতকক্ষ প্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ড শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনিময়" বৃহৎ প্রাসাদের বুকে এক সুতীব্র তৃষ্ণা বহন ক'রে কোন্ মরীচিকার পেছনে ঘুরে বেড়াতে থাকে। মেহের আলির "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও" চীৎকারের মত ষ্টেসনের নিতান্ত পরিচিত একটা একটা শব্দ বোধ হয় পাঠকের মনটাকে বর্ত্তমানের কঠিনতার মধ্যে ফিরিয়ে আনে; কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভাবে গল্পের মোহময় আবহাওয়ার বাইরে চ'লে আসতে পারে না।

সেটা সম্ভব হয় যখন গল্পের একটা বিরতির মধ্যে কুলিরা এসে খবর দেয় গাড়ী আসিতেছে। তখন এ-যুগের অবিশ্বাসী মন প্রশ্ন ক'রে বসে। কেননা সেতো আর "বেতাল পঞ্চবিংশতি"-যুগের নয়। এই সন্ধানী মন তখনই বক্তার সবজান্তা ভাবের মধ্যে, থিয়োসফিষ্ট শ্রোতার ইঙ্গিতের

মধ্যে এবং গল্পটির আদি এবং শেষ ভাগে লেখকের লঘু humour এর মধ্যে গল্পটির অসম্ভাব্যতার ইসারা পেয়ে তৃপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে প্রেম খুব একটা উচ্চ আসন পায় নি অর্থাৎ প্রেমকেই glorify বা মাহাত্ম্যমণ্ডিত করবার জন্যে তিনি বেশী রকম সচেষ্ট হন নাই। অনেকের মতে নাকি তাঁর কাব্যেও মানবিক প্রেমের intensityর অভাব আছে। ও কথাটা বেশ স্পষ্ট ভাবে বলবার দুঃসাহস আমার নেই, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও খুব সত্য যে, সাধারণ ভাবে মানুষের মানবোন্মুখী প্রেমকে তিনি বরাবরই সন্দেহের চক্ষে দেখে এসেছেন। যখন নিগূঢ় ভাবে প্রেমকে অনুভব ক'রতে গেছেন, তখনই একটা কঠ় প্রশ্ন মনের কোণে প্রবেশ ক'রে জিনিষটাতে খাদ মেশাবার চেষ্টা ক'রেছে। এই প্রশ্নই কিন্তু তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ কথা, কেন না এ-ই শেষ পর্য্যন্ত ঐহিক প্রেমের অসারতা, প্রবঞ্চনা দেখিয়ে তাঁর কাব্যের ধারাকে শাশ্বত প্রেমের অভিমুখী ক'রে তুলে জগতের সাহিত্যে এক দিক দিয়ে তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ক'রে তুলেছে।

নারীর দিক দিয়ে প্রেমকে তিনি খুব বেশী হালকা করেন নি বটে, কিন্তু পুরুষের প্রেম তাঁর গল্পে বরাবরই লঘু একটা সাময়িক বিকার মাত্র। এই মনোভাবটি কবি "নিশীথে" গল্পটিতে নায়কের প্রথমা পত্নীর কথাবার্ত্তায়—ইঙ্গিতের মধ্যে বেশ ভাল ক'রে প্রকাশ করেছেন। দু'একটা কথা তুলে দেখান যাক্। নায়ক দক্ষিণাচরণের কথা হচ্ছে "দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ, সেই ঘনগন্ধ-পূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।"

এই রকম একটা মাদকতাপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দক্ষিণাচরণ আর নিজেকে সামলে উঠতে পারলেন না, তাই—"কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম—'তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না'। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদ স্বরূপে একটি কথা মাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে, এবং আমি প্রত্যাশাও করিনা।" এইটিই কবিরও মনের কথা। তারপরে গল্পের মধ্য দিয়ে তথাকথিত প্রেমের, বিশেষ ক'রে পুরুষের প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতা ফুটে উঠেছে। এইটিই গল্পের প্রতিপাদ্য।

"মণিমালা"তেও ফণিভূষণের প্রেমের বাহ্যিক সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ থাকলেও এমন কি, অন্তরের একটা তীব্রতা থাকলেও সেই একটি জিনিষ নেই, যা প্রেমিককে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক ক'রে দিতে পারে। কোথায় একটা আড় আছে, - একটা সম্ভ্রম, ভালবাসার মধ্যেও একটা দূরত্ব, যাতে পরস্পরের সম্বন্ধটা কখনই বেশ সহজ হ'য়ে উঠতে পারেনি—ঠিক যেন ভালবাসা নয়—একটা অনতিক্রম্য ব্যবধানের বাইরে থেকে ভক্তের সাগ্রহ পূজামাত্র।

মণিমালাকে হারান'র পর ফণিভূষণের তপস্যা কঠোর। তার ইহ জীবনেই রহস্যময় মৃত্যু নিজের অন্ধকার যবনিকার এক প্রান্ত তুলে দিয়ে শেষে তাকে নিজের চির রহস্যের মধ্যে টেনে নিলে। সেখানে ভক্তের পূজা অমর ভালবাসায় রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছিল কি না, সে সন্ধান কে দিবে?

এই গদ্য লিরিকের যুগটা বহুদিন আগে শেষ হয়ে যায়; তারপর সুদীর্ঘ সময় রবীন্দ্র-সাহিত্য আরও নানারকমের সোনার ফসল ফলিয়ে কেটে গেছে, কিন্তু গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রটা কবি এক রকম শূন্য, আবাদহীনই রেখে গেছেন ব'ললেই চলে। আমরা যখন এদিকে একেবারেই নিরাশ হ'য়ে পড়েছি, এমন সময় জীবনের শেষদিকে গদ্য-পদ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে এক পরমাশ্চর্য্য সম্পদ কবি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের বিস্মিত, অভিভূত ক'রে দিলেন—এটি তাঁর "শেষের কবিতা"। শেষের কবিতা একাধারে উপন্যাস, কাব্য, আবার গল্প। এ সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম—যার প্রধান ধারাটি সেই গদ্যশ্রেয়ী lyric, যার সুর গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় নানা মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল।

এবার বিদায় নেওয়া যাক্। রবির আলোক যে বিচিত্র বিশাল সৌরজগৎ সৃষ্টি ক'রেছে—তার ক্ষুদ্র একাংশের পরিচয়ও এক কথায় ভাল ক'রে দেওয়া চলে না। আমি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দিকের কথা তুলেছিলাম মাত্র—এ পরিচয়ও নয়, সমালোচনাও নয়—কবির এক মুগ্ধ ভক্তের সামান্য একটু ভক্তি-অর্ঘ্য মাত্র। *

---

* মজঃফরপুর রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে পঠিত।

বিরহী চাঁদ

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

রাতির সীঁথির প্রান্তে এসে
ক্ষীণ চাঁদ একটি নিমেষে
হীরকের মত জ্বলি'
আলোকিয়া বনস্থলী
আমারে শুধালো শুধু হেসে,—

'পাতার ঝালরে বায়ু বয়—
বন্ধু, আজো হ'ল না সময় ?'
কত পথ অতিবাহি
চমকি' কহিনু চাহি'—
'নয়, নয়, এখনো সে নয় !'

'এখনো মাটির গন্ধে মোর
সারা দেহ র'য়েছে বিভোর ;
প্রিয়ারে হয় নি দেখা,
ললাটে পড়েনি রেখা
বক্ষে তা'র খসেনি নিচোর !'

'অধরের আস্বাদ মধুর
লভিতে অধর লোভাতুর
এখনো নিমীল আঁখি—
কত পথ আছে বাকী
কত দেশ শ্যামল, পাণ্ডুর !'

'দেখ, আজো অধীর বাতাস
মঞ্জরীরে করিছে উদাস—
সৌরভে মিশিছে সুর,
পাত্র হ'ল পরিপূর,
কেন আজ যাওয়ার আভাস ?'

ম্লান হেসে পশ্চিম সীমায়
ক্ষীণ চাঁদ কহিল, 'বিদায় !—
আমি শুধু আছি জেগে,
আমার পরশ লেগে
তোমরা জানিবে আপনায় !'

'পাতার ঝালরে বায়ু বয়,
আজো কেন হ'বে না সময় ?
কৃষ্ণা রজনীর ছায়া,
ফেলিবে মেদুর মায়া—
তখন হ'বে না পরিচয় !'

'আবার আসিব আমি ফিরে,
সেদিন ফিরা'বে অতিথিরে ?
সেদিনের অবকাশে
প্রিয়ারে লই'ও পাশে
গুঞ্জন করিও ধীরে ধীরে !'

'আমি বন্ধু, সুচির-বিরহী,
তাই তোরে বারে বারে কহি—
চৈত্র-পূর্ণিমার রাতে,
আমার কিরণ-পাতে,
যেদিন হাসিয়া উঠে মহী !'

'যেদিন অম্বরে ধরণীতে,
গান জাগে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে,
সেদিন পথের 'পরে
রহিও না হেলাভরে
ফিরে এসো আপন সঙ্গীতে।'

'অঙ্গে থাক্ মাটির সুবাস,
গন্ধে তা'র ভরুক্ আকাশ—
ক্লান্ত দেহখানি ভরি'
মোহ উঠে থরথরি
কম্পমান মিলন-নিঃশ্বাস !'

'সেদিন শুধা'ব মৃদু হেসে,
সময়েরে পেয়েছ নিঃশেষে ?
প্রিয়ারে লভিয়া বুকে
তরঙ্গিত স্পর্শ-সুখে
কথা ক'য়ো একটি নিমেষে !'

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পুরাকালে কোনও সংস্কৃত কবি, জীবদ্দশায় বোধ হয় অরসিকমণ্ডলীর কাব্যবিচার-বিভ্রাটে পীড়িত হইয়া, বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের উপর স্বীয় কাব্যবিচারভার অর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত চিত্তে মৃত্যু-আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তদবধি জীবিত ও মৃত অপরাপর অনেক কবি নিশ্চয়ই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, পৃথ্বী যেন অধিকতরা বিপুলা হন, আর কালও যেন কোন কালে অবধিবদ্ধ না হয়। রসিক-চিত্তের আত্মপ্রকাশ যখন পুনঃ পুনঃ প্রতিকূল সমালোচনায় ব্যাহত হয়, তখনই সে-চিত্ত ভাবী দেশের ও ভবিষ্যৎ কালের নিকট প্রকৃত বিচার পাইবে—এই বিশ্বাস হইতে সান্ত্বনা লাভ করে। রসার্দ্র চিত্ত হইতে যাহা উত্থিত হইল, যুক্তি-দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই; সুতরাং দুর্ভাগ্যবশে অরসিক বা অতি-রসিক-পরিবেষ্টিত রচয়িতার পক্ষে ভবিষ্যতের উপর ভার দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ইহা হইতে একটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সাহিত্য-স্রষ্টার আনন্দ কেবল মাত্র সৃষ্টিতেই পরিবদ্ধ নহে, স্রষ্টার চিত্ত পাঠকচিত্তে সেই আনন্দ প্রতিফলিত দেখিতে চাহে। সৃষ্টির অর্থ প্রকাশ, অর্থাৎ এক হইতে বহুতে আনন্দের সংক্রমণ। সংক্রামিত আনন্দের মধ্য দিয়া একের সহিত বহুর অন্তর-বিনিময়ই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। অতএব প্রত্যেক সৃষ্টির মূলেই এই আনন্দের আদান-প্রদানের বাসনা নিহিত আছে;—ভগবৎ সৃষ্টিতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। জগৎ-সৃষ্টিরহস্যের কুঞ্চিকা স্বরূপ যে আলোক, তাহার সার্থকতাও চক্ষুতে। এমন কি আলোকে ও অন্ধকারে কোন প্রভেদই থাকে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোক পদার্থবিশেষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিফলিত না হয়। অস্তগামী সূর্য্যের যে আলোকচ্ছটা আকাশপ্রান্তরে বৃথাই ছুটিয়া চলে, সে ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘে বিচ্ছুরিত হইতে পাইলে, আপনার অন্তরের আনন্দ তন্মুহূর্ত্তে রঙিন্ করিয়া তুলে। স্রষ্টা ও দ্রষ্টাকে লইয়া তবে সৃষ্টির সার্থকতা। সৃষ্টি যে একটি আপেক্ষিক সত্তা, দ্রষ্টানিরপেক্ষ সৃষ্টির অস্তিত্ব যে আকাশকুসুম মাত্র, এ সত্য আজ আর দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, এ যুগের একজন মহামনীষীর প্রতিভাবলে তাহা গণিতের সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের সৃষ্টিতে আজ যে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কথাও তাহাই। লেখকচিত্ত যেখানে ভাষার মধ্য দিয়া পাঠকচিত্তের সহিত রসপরিচয় স্থাপন করে,—তাহাই সাহিত্য। 'সাহিত্য'এর মধ্যে এই 'সহিত' কথাটি অনেকখানি জুড়িয়া আছে।

সুতরাং কবিচিত্ত হইতে প্রকাশ যেইমাত্র ভূমিষ্ঠ হইল, তখনই তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। নিরুপায় শিশুর ন্যায়ই সে তখন বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের মুখে আশান্বিত সরল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া চাহিয়া থাকে। যে শিশু ভাগ্যবান্—যে রাজার ঘরে জন্মিয়াছে—তাহার পরিচয় অবশ্য জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ হইয়া যায়, তাহার সহায়ও অনেক। সাহিত্যরাজ্যে যাঁহার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কাব্যশিশুরও এ-সুযোগ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু অপরিচিতের ঘরে যে জন্ম গ্রহণ করে তাহাকে অনেক অপেক্ষা করিতে হয়। তথাপি প্রকৃত প্রতিভাবান্ শিশু নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া অল্পে অল্পে আপনার পরিচয়-ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াই চলে। কাব্যশিশু এমনি করিয়া দেশ হইতে দেশে, কাল হইতে কালে, পরিচয় হইতে পরিচয়ান্তরে পরিব্রজন করিতে থাকে এবং কবিচিত্তের গূঢ় রস বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধি কালের অধিবাসীবহুল পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করিয়া তবে প্রকৃত সাহিত্যলোকে উত্তীর্ণ হয়।

সাহিত্য বলিতে যখন আমরা দেশ কালের মধ্য দিয়া প্রবহমান লেখক ও পাঠকচিত্তপরম্পরার একটি পরিচয়-ধারার কথাই বুঝিতেছি, তখন তাহার দেশকালনিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র বা সীমাবদ্ধ আনন্দসত্তার কথা মানা চলেনা। নদীর ন্যায় কোথাও তাহা সংকুচিত, কোথাও তাহা প্রসারিত, কখনও তাহা নিন্দিত কখনও তাহা বন্দিত, কোথাও অন্তঃসলিলা প্রহতস্রোতা, কখনও বন্যাপ্লাবিতা প্রখর বেগবতী,—এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত জলাশয়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য কম। সুতরাং যে কবি

ভবিষ্যতের উপর তাঁহার কাব্যবিচারের বরাত দিয়া গিয়াছিলেন তিনি সাহিত্যের মর্ম্মকথাটি বুঝিতেন বলিয়াই মনে হয়। এক একটি কাব্যসৃষ্টিকে লইয়া এক একটি পরিচয়-ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিশেষ বিশেষ পরিচয়-ধারাই এক একটি বিশিষ্ট সাহিত্য। অর্থাৎ মেঘদূত গ্রন্থখানি সাহিত্য নহে। সেই মেঘদূতকে অবলম্বন করিয়া কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তপরম্পরার যে বিচিত্র পরিচয়-ধারা আজ পর্য্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে, তাহাই মেঘদূত-সাহিত্য। এইরূপ বহু ধারায় বিচিত্র, বহুতটে শ্যামল যে রসমাতৃক দেশ নরসভ্যতার আদি হইতে বিশ্বমানবমনে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাই সাহিত্যলোক। পার্শ্বের ভগবৎ-সৃষ্টিকে আশ্রয় অথচ অতিক্রম করিয়া, ভূর্ভুবঃস্বরাদি সপ্তলোকের উপর মানবসৃষ্ট এই যে সাহিত্যলোক, ইহার অভ্যন্তরে যিনি প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই বলিতে হয়—

> "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।"………

—বল্মীক স্তূপের মধ্যে তপঃসিদ্ধিলাভ করিবার পরও একটি শ্লোকের গুঞ্জন তাঁহাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলে। সাধারণ বন্ধন ও অসাধারণ মুক্তিকে অতিক্রম করিয়া এই যে নবতর বন্ধনানন্দ, ইহাই সাহিত্য-লোকের স্বাভাবিক আবহাওয়া।

কাব্যের মধ্য দিয়া কবিচিত্তের সহিত পাঠকচিত্তের পরিচয়ই যখন সাহিত্যধর্ম্ম এবং দেশ ও কাল যখন প্রধানতঃ পরিবর্ত্তনধর্ম্মী, তখন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ হইতেছে—তাহার অন্তরে একটি নিত্যপরিচয়াকাঙ্ক্ষী চিরমিশুক রসিক চিত্ত বর্ত্তমান থাকিবে। সেই রসিক চিত্তের বেশভূষা ভাষাভঙ্গী, রীতিনীতি অবশ্যই সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের উপযোগী হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে বিশেষ একটি পরিচয়োন্মুখীনতা না থাকিলে, দেশান্তর ও যুগান্তরের পাঠকচিত্ত তাহার সহিত পরিচয়স্থাপনে উৎসুক হইবে কেন? তথাপি এ কথাও সত্য যে, এই চিরমিশুক রসিক চিত্তের পক্ষেও অধিকাংশ সময় তাহার বৈদেশিক ও বৈজ্ঞানিক বেশভূষা, ভাষাভঙ্গী, রীতিনীতি বাধাস্বরূপ, ইহা তাহাকে নব নব পরিচয়স্থাপনে বিফলকাম করিয়া তুলে। ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন কালের নবপরিচয়-প্রত্যাশী চিত্ত যখন সাহিত্যলোক হইতে আমাদের দেশের ও কালের দ্বারদেশে সসঙ্কোচে উপস্থিত হয়, তখন তাহার পরিচায়নের জন্য পরস্পরের পরিচিত কোন দোভাষীর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাহিত্যলোক মানবের মানসাকাশে অবস্থিত, সুতরাং এই সাহিত্য-পরিচায়কের কেবল বাহিরের ভাষা জানিলেই চলিবে না, তাহাকে সে দেশ ও এ দেশ, সেকাল ও একাল, এই উভয়পক্ষের অন্তরঙ্গ হইতে হইবে। দেশে ও কালে নিবদ্ধ মানবচিত্তবিশেষ দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া অপরিচিতের সহিত পরমাত্মীয়তা স্থাপন করিবে, এতদুপযোগী শক্তি মোটেই সুলভ নহে। তাহার নিকট বাহিরের কোন বাধাই অন্তরপথের অন্তরায় হইলে চলিবে না। তাহার দৃষ্টি একই সময়ে প্রখর ও স্নিগ্ধ হইবে। সেই দৃষ্টিকারের অব্যর্থ তীক্ষ্ণতা বাহিরকে যেমন অনায়াসে ভেদ করিবে, অন্তরকে তেমনি সসম্ভ্রমে স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্তে আপনার গোপন পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিবে—'আমি আসিয়াছি!' দেশান্তর ও যুগান্তরের চিত্তকে এমনি ভাবে আত্মীয় করিবার শক্তি,—দুর্ল্লভ শক্তি।

কিন্তু কেবল এই শক্তি থাকিলেই পরিচায়কের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। তাহাকে উভয়কূল রাখিতে হইবে। অতীতের ও বিদেশের বন্ধু বলিয়াই বর্ত্তমান ও স্বদেশ হয় ত তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকিবে। এ দেশের ও এ কালের আত্মীয়তা অর্জ্জন করিতে না পারিলে প্রকৃত পরিচায়কের কাজ তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমান দেশ ও যুগের সহিত এই পরমাত্মীয়তা অর্জ্জন করিবার অধিকারী কে?

বিপুলা পৃথিবী জড়মাত্র, নিরবধি কালও চিরতন্দ্রাচ্ছন্ন। অতএব পৃথিবী ও কালের উপর সাহিত্যবিচারের ভার দেওয়ার অর্থ কি? দেশ ও কাল বলিতে যদি সাধারণ জনসঙ্ঘ বুঝায়, তবে সেই দেশ ও কাল হট্টগোল করিতে করিতে কোন ভোটশালায় গিয়া যে ভোট দিয়া আসিবে, তাহারই সংখ্যাধিক্য গণনা করিয়াই কি সেই দেশের ও সেই কালের সাহিত্য-বিচার মীমাংসিত হইবে? ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ, অন্ততঃ সাহিত্যে তথাকথিত ডিমক্র্যাসির কোন স্থান নাই। সাহিত্যসম্পর্কে দেশে দেশে এমন

মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহার রচনায় এই জড় পৃথিবী প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে; যুগে যুগে এমন সাহিত্যপ্রতিভার আবির্ভাব হয়, যাহার মধ্য দিয়া স্তিমিতনেত্র কাল চক্ষু মেলিয়া চাহে। এইরূপে মধ্যে মধ্যে যে প্রতিভাশালী যুগ-মানবের আবির্ভাব হয়, তাহার মধ্য দিয়াই তখনকার দেশ ও কাল চাহিয়া দেখে, গাহিয়া উঠে। এইরূপ প্রতিভাশালী স্রষ্টাই তৎসাময়িক মানবচিত্তের পরমাত্মীয়। রসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার প্রভাবে তাঁহার কথাই সেদিন গণ্য। কারণ সে দেশের ও সে যুগের সাহিত্যে সর্ব্বরসিক চিত্তের সহিত পরিচয়-পরীক্ষায় অর্থাৎ সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় —তিনি সেদিন সমুত্তীর্ণ। যে সাহিত্য-স্রষ্টার মধ্য দিয়া তাঁহার দেশ ও তাঁহার কাল এইভাবে পূর্ণ প্রতিফলিত হয়, তিনি অতি দুর্ল্লভ শক্তির অধিকারী যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য-মহারথী বলিয়া বন্দিত হন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রকৃত সাহিত্য-পরিচায়কের সেই দুর্ল্লভ শক্তি করায়ত্ত থাকা চাই যে শক্তিবলে মানবচিত্ত দেশান্তরের ও যুগান্তরের কবিচিত্তের সহিত পরমাত্মীয়তা স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। এখন দেখিতেছি তাহাকে বর্ত্তমান দেশ-ও-যুগচিত্তের অন্তরঙ্গ হইতে হইলে সুমহতী সৃজন-প্রতিভার অধিকারী হইতে হইবে। একই চিত্তে এই উভয় প্রতিভার যোগাযোগ অতিদুর্ল্লভ মহাপুণ্যযোগ। সুতরাং সাহিত্যলোকে যিনি দেশের সহিত দেশান্তরের, যুগের সহিত যুগান্তরের সম্যক্ পরিচায়নভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে যে কতবড় সব্যসাচী হইতে হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই পরিচায়নই প্রকৃত সাহিত্যসমালোচনা। যে দেশে যে কালে এমন সব্যসাচী জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশকালের উপর বিধাতার অশেষ অনুকম্পা। নানা-দুর্ভাগ্য-নির্য্যাতিত বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একজন অনতিক্রম্য সাহিত্য-পরিচায়কের জন্ম কতবড় ভাগ্যের কথা তাহা ভাবিয়া দেখিলে এ দেশের ভাগ্য-বিধাতাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত যেমন এখনকার পাঠকচিত্তের পরমাত্মীয়, তেমনি তাঁহার পাঠকচিত্ত অতীতের সর্ব্ব কবিচিত্তের সহজবন্ধু। রামায়ণ-মহাভারত--শকুন্তলা--কুমারসম্ভব--মেঘদূত--কাদম্বরী--বৈষ্ণব--কবিতা-বাউলসঙ্গীতের কবিচিত্ত তাঁহারই হাত ধরিয়া আমাদের সহিত যে নবপরিচয় স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে কেবল যে আমরাই পরমানন্দ লাভ করিয়াছি তাহা নহে, যুগান্তরের কবিচিত্ত যে প্রত্যাশায় বিপুল পৃথ্বী ও নিরবধি কালের উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহাও নূতন সার্থকতা পাইয়াছে। কালের বিস্তীর্ণ রাজপথ সুদীর্ঘ হইলেও মধ্যে মধ্যে দুরতিক্রমণীয় ধ্বংসনদী দ্বারা খণ্ডিত। যেমন ভূতত্ত্বে, তেমনি ভাবতত্ত্বের এই ধ্বংসনদী কালপথকে বিভক্ত করিয়াছে। যুগ ও যুগান্তর এই নদীরই এপার ওপার। অসাধারণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এই যুগযুগান্তরের মধ্যে যে সেতু রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যলোকে কালের পথ আজ অখণ্ডিত মনে হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে সমালোচনা ও সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-লোকের অতি উচ্চাঙ্গের পরি-চায়ন স্বরূপে আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে। তদুপরি যে ভাষা ও যে ভঙ্গীতে তিনি এই পরিচায়নকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহাও একান্ত বিস্ময়কর। তাঁহার প্রত্যেক সমালোচনা অতি বিপুল বিশ্লেষণ-মূলক হইয়াও এক একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি। রসই তাঁহার প্রধান অস্ত্র এবং বিধাতার বরে এই অস্ত্রের তূণও তাঁহার অক্ষয়। শরশয্যাশায়িত পিতামহের পিপাসা দূর করিবার জন্য আহূত হইলে সব্যসাচী কোন নদী বা তড়াগের শরণাপন্ন হন নাই; চিরাভ্যাসবশে গাণ্ডীবে শরসংযোজন পূর্ব্বক তিনি যেমন অনায়াসে পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া স্বরচিত উৎসধারায় আত্মীয়ের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁহার অনায়াসলব্ধ রস-দৃষ্টির সাহায্যে প্রাচীন সাহিত্যের পঞ্জরমর্ম্ম ভেদ করিয়া স্বখনিত উৎসপথে চিরনিরুদ্ধ রসধারা উৎসারিত করিয়া আমাদের তৃষ্ণা দূর করিয়াছেন।

রবীন্দ্রসমালোচনাসাহিত্যে এই স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি ও রসদৃষ্টি পৃথক প্রবন্ধের বিষয় হইবার যোগ্য; এই অল্প পরিসরে আর সে চেষ্টা করিলাম না।

চির-জীবনের কুসুম-মাসে

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ভুল করে' বুঝি গেঁথেছিনু মালা
ভুলে দিয়েছিনু তোমারই গলে,
তাই কি হেলায় আজি অবেলায়
ফিরালে আমায় কাজের ছলে ?
নব মালিকার আধফোটা ফুল
মধু-সৌরভে ছিল সমাকুল,
রঙীন রাখীর বাসন্তী রঙ
ধুয়ে মুছে গেল চোখের জলে !

পথে দেখা হ'ল—এতটুকু হাসি
সেই ত আমার পাথেয় হ'ল,
বাঞ্ছিত জনে স্বাগত-ভাষণ
আঁখি যুগে তব ফুটিয়া র'ল !
পথে যেতে যেতে দুটি ছোট কথা
প্রকাশিল সারা-জীবনের ব্যথা,
নিরুপায় লতা, কা'রে আঁকড়িতে
খরতাপে জ্বলি' ঢলিয়া প'ল ?

বুকে নিতে চাই, ধরা ত দেবে না
সরমে শিহরি' সরিয়া গেলে,
নয়ন-আড়াল হ'তে নাহি হ'তে
কি ভেবে' আবার ফিরিয়া এলে !
শুক্ল পক্ষ একাদশী তিথি,
আলো-ছায়া-ভরা ঘন বনবীথি,
ভরা সন্ধ্যায় নিগূঢ় ব্যথায়
কোথা গেলে সখি আমারে ফেলে ?

নয়নের দেখা ছিল না কখনও
মনে ছিলে তাই হে মনোরমা,
তিল তিল করি' মন-মন্দিরে
গড়েছিনু তোমা তিলোত্তমা !

অদেখা রূপের নিত্য-ধেয়ানে
চলে' গেছে দিন চাহি' পথ-পানে,
কাছে পেয়ে আজ যদি বুকে নিই
করুণায় তুমি করিও ক্ষমা।

কে দিয়েছে ব্যথা পরাণে তোমার
আশা দিয়ে কেবা আসেনি কাছে,
কা'র চরণের দলিত কুসুম
কবরীতে তব জড়ান আছে ?
চুম্বন দিল কে যে ছলনায়,
কাহার পরশ বুকে মূরছায়,
হারাণ মাণিক চাহনা খুঁজিতে
পেয়ে তুমি তা'রে হারাও পাছে !

মুখ পানে চেয়ে তাই কি তোমার
লাজে ও তরাসে সরে না বাণী,
ভালবেসে কেহ নিকটে আসিলে
দূরে সরে যাও ঘোমটা টানি !
তাই কি ব্যাকুল বাহু-বন্ধন
বুকে উথলায় রুদ্ধ রোদন,
ফাগুন-বনের কুসুম-সোহাগ
সহিতে পার না কুসুম-রাণী !

কা'রে দিলে তব নব সৌরভ
পিয়াইলে মধু পাত্র ভরি'
ক্ষণ-সুখচারী সে কোন্ মায়াবী
লুকাল কোথায় হৃদয় হরি' !
তাই কি আবার গুণ-গুঞ্জন
ফুলের ব্যথায় ভরে' তোলে মন,
কম্পিত আঁখি-পল্লব হ'তে
অশ্রু-মুকুতা পড়িছে ঝরি' !

আমি ত তোমারে চাহি নাক সখি,
ক্ষণ-ভুঞ্জন-সুখের আশে—
এক নিমিষের ফুল-উৎসবে
বাঁধিতে চাহি না বাহুর পাশে ;
আমি চাই তোমা জনমে জনমে
অন্তরে এস অন্তরতমে,
কুসুম-শয়ন রচিয়া রেখেছি
চির-জীবনের কুসুম-মাসে।

পরকীয়া ও চণ্ডীদাসের সাধন

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বহু প্রাচীন কাল হইতেই পরকীয়া-সাধন প্রচলিত রহিয়াছে। বৌদ্ধগণ নিজেদের পন্থায় এইরূপ ভজন করিতেন। তান্ত্রিকগণও বহুকাল হইতে এইরূপ ভজন সাধন করিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ভজন দেখা যায়। এই mystic ভজনের জন্য কে কাহার নিকট ঋণী বা কাহারও নিকট আদৌ ঋণ আছে কিনা—এই সব ঐতিহাসিক প্রশ্ন প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের বিচার্য্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল বৈষ্ণবগণের বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের পরকীয়া-ভজন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

বঙ্গদেশে এখনও পরকীয়া-ভজনকারী তান্ত্রিক সাধকের সংখ্যা কম নহে। ইঁহাদের ভজনোদ্দেশ্যের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাস্তবিকই এইরূপ ভজনের প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য বৈষ্ণবগণের অনুসৃত পরকীয়া-ভজনের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তান্ত্রিকী পরকীয়ার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান। বীরা-চার মতে পঞ্চ মকার সাধনের জন্য তান্ত্রিকী পরকীয়ার আবশ্যকতা। তাহার উদ্দেশ্য বেদান্তাদি শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তি। বীরাচারী তান্ত্রিক যে তরুণী রমণী আশ্রয় করিয়া পঞ্চ-মকার সাধন করেন তাহা 'স্বকীয়া' ও 'পরকীয়া' এই উভয়ই আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তন্ত্রে দেখা যায় 'স্বকীয়া' ও 'পরকীয়া' ভজনে বিশেষ একটা ভেদ স্বীকৃত হইতেছে না। বরং কোন কোন তন্ত্র স্বকীয়ারই অনুমোদন করিয়াছেন, ইহাতে ভজনের কোন ক্ষুণ্ণতা আসে না। কিন্তু বৈষ্ণবের রসের ভজনে পরকীয়ারই প্রাধান্য বিশদভাবে স্থাপিত হইয়াছে। স্বকীয়া-ভজন বাস্তবিকই তদপেক্ষা নিম্ন স্তরের সাধনা। পরে এ কথা বিশদ হইবে।

শুক্র ও শোণিত লইয়া পঞ্চম-কারের সাধন। ইহাতে রমণীদেহে ও পুংদেহে ভাগবত দেহের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। রমণী অঙ্গ হয় শক্তির প্রতীক এবং পুংদেহ হয় শিবের বা শক্তিমানের প্রতীক। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া হয় শক্তি ও শিবের মিলন বা শক্তি ও শক্তিমানের একী-করণ—ইহাই সত্য অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান বা সোহহং ভাব। শুক্র ও শোণিতের মহাসম্মেলন সময়ে, মহাসৃষ্টির পুণ্যক্ষণে, সৃষ্টির আনন্দ-বিভোর অবস্থায় যখন মানসিক বৃত্তিসমূহ তরল গঠনোপযোগী অবস্থায় থাকে, সেই সময় অদ্বয় জ্ঞান যেমন সুদৃঢ় ভাবে, গভীর ভাবে, উজ্জ্বল ভাবে চিত্তমধ্যে জাগিয়া যায়, তেমন আর অন্য সময়ে অন্য উপায়ে ঘটে না। তাই স্ত্রীদেহে ও পুংদেহে এক দেবদেহের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে জড়ের প্রকৃতি ও প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ চৈতন্যের সু-প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ ভজন-সূচিপদ্ধতি হইয়াছিল।

বৈষ্ণব পরকীয়া ভজনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তান্ত্রিকী ভজনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দ। বৈষ্ণব ভজন ভীত হইয়া এই ব্রহ্মজ্ঞানকে দূরে পরিহার করিতে চাহি-য়াছে। বৈষ্ণব ব্রহ্মানন্দ চাহেন না। তিনি প্রার্থনা করেন 'প্রেমা'। প্রেম-সেবার দ্বারা তিনি তাঁহার ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক এই উভয় সত্তায় শ্রীভগবানের "ইষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত" হইতে চাহেন। শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী রসিক-শেখরই তাঁহার ইষ্ট বস্তু। বৈষ্ণবের দর্শনমতে এই শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতত্ত্ব। ইহার উপর তত্ত্ব নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে সকল তত্ত্বেরই মীমাংসা হয়। সুতরাং ইহা পরতত্ত্ব। এই শ্রীকৃষ্ণই বাসুদেবাদিরূপে আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহার নাম 'বিলাস'। ইনি সর্ব্বদানন্দময়। ইঁহার সত্তায় বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে—ইনি চৈতন্যময় ও আনন্দময়। এই আনন্দময় অংশের অপর নাম 'হ্লাদিনী'—যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী। অর্থাৎ যে-শক্তি দ্বারা তিনি আনন্দিত হন এবং আনন্দ প্রদান করেন তাহাকে তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তি বলে। এই হ্লাদিনীরই বিশেষ আকৃতি হইতেছেন শ্রীরাধা। তিনি যাঁরেই আনন্দ লাভ করেন। শ্রীরাধিকা পৃথক

বস্তু নহেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, শাস্ত্রীয় ভাষায় 'স্বরূপ শক্তি'। অদ্বয় জ্ঞানরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে দ্বৈতরূপে শ্রীরাধা আখ্যায় বাহিরে প্রকটিত করেন, সম্যকরূপে আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত। কেননা বিশুদ্ধ অদ্বৈত অবস্থায় (pure monistic state) এইরূপ সম্যক আনন্দের সুষ্ঠু স্ফূর্ত্তি সম্ভবে না। সুতরাং সংক্ষেপতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব হইতেছে অদ্বৈত-তত্ত্বেরই দ্বৈতরূপে প্রকাশ। মূলতঃ ইহা অখণ্ড তত্ত্ব। এই দ্বৈত প্রকাশকে ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব ভজনের রস ও প্রেমার এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-মহল গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশ। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশ ইনি বাদ দিয়াছেন; যে অংশে ইনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, যে বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে ইনি বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন, সৃষ্টির মায়াবন্ধনে বিশ্বমানবকে অভয় দিয়া মুক্তি দিতেছেন, সে অংশ বৈষ্ণব গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব চাহেন বিশুদ্ধ আনন্দ। আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম হইয়া 'স্বয়ং ভগবান' শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে তিনি অভিলাষী। সেই সেবার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ তাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটিগুণে মূল্যবান্। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে হ্লাদিনী মূর্ত্তি বা শ্রীরাধার দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই আনন্দাত্মিকা শ্রীরাধা মূর্ত্তিই কিশোরী মূর্ত্তিরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবগণ এই কিশোরী মূর্ত্তির ভজন-পূজনই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি ও সাধক বলিয়াছেন—

"কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন,
কিশোরী-চরণ সার।"

এই কিশোরীই পরকীয়া ভজনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরকীয়া-ভজনের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার আগে বৈষ্ণব ভজনের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। নতুবা আমাদের বক্তব্য ঠিক স্পষ্ট হইবে না।

সকলেই জানেন বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ রসের আশ্রয় করেন। তন্মধ্যে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ, কেননা অপর সকল রসের গুণ ও স্বভাব ইহাতে বর্ত্তমান আছে। এইগুলি ব্যতীত ইহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা এই মধুর রসকে নিগূঢ় ও বিশিষ্ট করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভাবিয়া এই রসের অনুশীলন করিতে হয়। এই পতি-ভাবসাধনায় অভিব্যক্তি হিসাবে তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা' ও 'সমর্থা' এই ত্রিবিধ রতির আশ্রয় করিয়া সাধককে ক্রম-বিকাশের পথে অগ্রসর করে। সমাজ-শাসন স্বীকার করিয়া ও বিবাহ-জীবন পরিচালিত করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করেন তাঁহাদিগকে 'স্বকীয়া' বলা যায়। দ্বারকায় মহিষীগণ এইভাবে 'সমঞ্জসা' রতি আশ্রয় করিয়া ভজনা করিয়াছিলেন। মথুরার কুব্জা ভোগমূলক 'সাধারণী' রতি আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণ 'সমর্থা' রতি আশ্রয় করিয়া পরকীয়ার বিগ্রহরূপে রসিকশেখর রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। স্বকীয়া রসেরও প্রেমের ক্ষুণ্ণতা আছে। সমাজ-শাসনের ভীতি ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দয়িত ও দয়িতার মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করে—একটা যেন ফাঁক্ থাকিয়া যায়, যাহা বিশুদ্ধ প্রেমের বাধক। পরকীয়ায় এই ফাঁক্ থাকে না। ইহাতে এমন এক প্রাণের আকুতি থাকে, এমন এক অপ্রতিবোধনীয় আবেগ থাকে, এমন এক রহস্য-নিবিড় 'রঙ্গ' থাকে যৎকর্তৃক সকল ফাঁক্ নষ্ট হইয়া যায়, সব একাকার হয়। স্বকীয় বা বিবাহিত পত্নীতে রস হিসাবে একটা জড়তা আসে, একটা যেন monotony আসে যাহা সম্যক্ রসানুশীলনের বাধক হয়। কিন্তু পরকীয়ায় ইহা ঘটে না। ইহাতে নব নব রসের, নব নব ভাবের উল্লাস সাধিত হয়। নব নব ভাবে, বিচিত্রভাবে এই রসের সাধনা রসের খোরাক জোগাইয়া এই সতৃষ্ণ রহস্য-সাধনকে পুষ্ট ও বলবান করিয়া তোলে। তাই বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের রসের সাধনায় পরকীয়াকেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এই সমস্ত আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তরূপেই করিতেছি।

এই পরকীয়া ভাবেও ক্রমবিকাশ রহিয়াছে। শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকা চন্দ্রাবলীতে মহাভাববিকাশের ক্ষুণ্ণতা রহিয়াছে। সে কথা এ প্রবন্ধে আর বলিব না। সংক্ষেপে ইহাই বলিতে চাই যে, পরকীয়ার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি কেবল শ্রীরাধায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাই

শ্রীরাধা-ভজন বা কিশোরী-ভজনই বৈষ্ণবগণের পূর্ণ আদর্শ। স্থূলদর্শী অরসিক ভাবেন, এই ভজনে নৈতিক বিরোধ রহিয়াছে। আমরা বলি ইহা ভুল। যাঁহারা এই ভজনপ্রণালী অনুরাগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহাতে নীতি-দুষ্টি নাই। সমাজ-জীবনে বা গার্হস্থ্য জীবনে সখ্য, বাৎসল্যাদি রসের যে অনুশীলন হয় তাহাই রূপান্তরিত হইয়া ভগবন্মুখী হয় এবং ইহাতে এক দিব্য নিগূঢ় ভাগবত-জীবনের গঠন সম্ভব হয়, যাহা বোধ করি প্রচলিত অন্যান্য প্রণালীতে তেমনটা হয় না।

মহাকবি চণ্ডীদাস এই পরকীয়ার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রেমের যাজন করিয়াছিলেন; প্রীতির সমুদ্রে ডুব দিয়াছিলেন। এমন প্রেম-সাধক কবি জগতে কয়বার আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা আমরা জানি না। রজকিনী রামী তাঁহার প্রেমের গুরু। রামীকে আশ্রয় করিয়া তিনি কিশোরী ভজন করিয়াছিলেন। এই রামীই তাঁহার রাধামূর্ত্তি বা কিশোরীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া চণ্ডীদাস রূপ ও রসের এক অপূর্ব্ব সন্ধান পাইয়াছিলেন।

কিশোরী-ভজনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে শ্রীরাধামূর্ত্তি সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের অনুভূতির কথা বলা আবশ্যক। বাস্তবিকই এই ভজন রূপের ও রসের ভজন! সতাই এই ভজনে সেই পরম সুন্দর পরমপুরুষকে রূপ ও রসের ফাঁদে ধরিবার জন্যই যেন মানবতার শ্রেষ্ঠ গৌরব যৌবন-লক্ষ্মীকে আধ্যাত্মিকতার পুণ্য ক্ষেত্রে নামান হইয়াছে। তাই এই রসের গুরু পরম মোহনীয়া—অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী। সত্যই শ্রীরাধামূর্ত্তি নিখিল বিশ্বচিত্তে রস-জাগানিয়া মূর্ত্তি। এই রস মূর্ত্তিতেই নিখিল বিশ্বলোকের প্রতিষ্ঠা। এই রস-মূর্ত্তি, এই কিশোরী-মূর্ত্তির ভজন ব্যতিরেকে রসের উৎকর্ষ নাই, আনন্দের স্ফূর্ত্তি নাই, রস-জন্য মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই রসমূর্ত্তি আঁকিতে গিয়া বৈষ্ণব রসিক বলিয়াছেন, ইনি বয়সে কিশোরী। আর শ্রীকৃষ্ণ কিশোর। শৈশব বা পৌগণ্ড অবস্থার পর ও যৌবনাবস্থার পূর্ব্ব—এই সন্ধিক্ষণেই কিশোর বয়সের লীলা-বিকাশ। এই বয়সে রসের অপূর্ব্ব উদ্গম হয়। বিদ্যাপতি বর্ণনা করিয়াছেন,—

> শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
> শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল ॥
> বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
> ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ ॥"

অন্যত্র—

> "চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভান।
> জাগল মনসিজ মুদিত নয়ন ॥"

এই মূর্ত্তি যখন গোধূলি-লগ্নে বাহির হয় তখন যেরূপ ফুটিয়া উঠে তাহা অব্যক্ত, তাহা রহস্যময়। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

> "গোধূলি পেখল বালা,
> যব মন্দির বাহির ভেলা।
> নব জলধর বিজুরি-রেহা।
> দ্বন্দ পসারিয়া গেলা।
> ধনী অলপ বয়সি বালা।
> জনি গাঁথলি পুষ্পকি মালা।"

সাধককে এই অব্যক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হয়। রসশাস্ত্র বলিয়াছেন, এই রাধার অনেক গুণ; যথা ইনি মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা, নর্ম্মপণ্ডিতা, উজ্জ্বল-স্মিতা, মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী, গন্ধোন্মাদিতমাধবা ইত্যাদি। ইঁহার আভরণ দ্বাদশ প্রকারের যথা 'দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতা কুণ্ডল-দ্বন্দ্বকাঞ্চী,' ইত্যাদি। ইনি নয়নে কজ্জল, গণ্ডস্থলে মকরী-পত্রভঙ্গ, চরণে অলক্তকরাগ, ললাটে তিলক, পরিধানে নীলবসন ইত্যাদি ষোড়শ শৃঙ্গার ভূষণে মনোহারিণী। এতদ্ভিন্ন 'হাব,' 'ভাব,' 'হেলা,' বিচ্ছিত্তি,' 'বিভ্রম' প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অলঙ্কারে ইনি অলঙ্কৃতা। বৈষ্ণব-কবি এই রসমূর্ত্তির চিত্র আঁকিতে গিয়া বলিয়াছেন—

> "মুরতি শিঙ্গারিণী,
> রাস বিহারিণী,
> মণিময় ভূষণ ভূষিতা অঙ্গী।
> মধুরিম হাসনি,
> রসময় ভাষণী,
> দশন কিরণ মণি মোতিম রঙ্গী।"

এই যে অপূর্ব্ব শিঙ্গারিণী মুরতি—কেবল মাত্র মানস-লোকে ইহার সম্যক্ অনুভূতি ও আস্বাদন সম্ভবে না। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

> "হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
> দেখিতে পাইনু সে।"

হৃদয়ে idea রূপে ইহা ছিল—তাহাতে কিন্তু তৃপ্তির সম্পূর্ণ চরিতার্থতা হইতেছিল না। বাহিরে 'বেকত' হইল

বলিয়াই তাহা দেখা গেল—রসের সাধন সিদ্ধ হইল। বাস্তবিকই এই অব্যক্ত রূপে বাহ্য-ব্যক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সম্যক্ আস্বাদন হয় না। দৃঢ়রূপে, গভীর ভাবে, কিশোরী ভাব গ্রহণ করিতে হইলে বাহিরে এই ভাবের প্রকট হওয়া চাই। জড় রূপেই এই চিন্ময় সত্তার প্রকাশ চাই। জড়ের মধ্যেই চিত্তের প্রকাশ। জড় ব্যতিরেকে চিৎ একটা abstract idea মাত্র। তাই কিশোরী-ভাব কেবল মাত্র মানস লোকেই সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় নহে। তথায় ইহা যেন একটা সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়া যায়। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য abstract-কে concrete করিতে হয়, একটা বাহ্য দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সাধকের পুবতঃ একটা রসের বিগ্রহ, কিশোরী-ভাবের জলন্ত জীবন্ত সচল ক্রিয়াশীল মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। এই রসমূর্ত্তিই হয় কিশোরী শ্রীরাধার স্বরূপ। এই স্বরূপের অনুগত হইলে তবেই রূপের জনম হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

> 'স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম, কখন নাহিক হয়।
> অনুগত বিহনে, কার্য্য-সিদ্ধি, কেমনে সাধক কয়।"

এই উপায়ে realisation অতি সুলভ ও সুকর হইয়া থাকে। হিন্দুর দেব-দেবী উপাসনায় এই বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। চণ্ডীদাসের পরকীয়া-ভজনের মূলেও এই সত্য নিহিত আছে। ইহাকেই প্রতীক উপাসনা বলে। এই কিশোরী-ভাব, বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষিত সেই "উন্নতোজ্জ্বল রস—" পরিপূর্ণ ভাবে relaise করিবার জন্যই চণ্ডীদাস রামী-দেহ আশ্রয় করিয়া পরকীয়া ভজন করিয়াছিলেন।

তবে ইহাও অতি সত্য যে, এইরূপ ভজনে বিশেষ ভয় ও বাধা আছে। পদে পদে নৈতিক পদ-স্খলনের সম্ভাবনা আছে। এ রসিক চণ্ডীদাসের ভাষায় 'কোটিতে গোটিক' হয়। এই সাধনের অপর নাম সহজিয়া সাধন। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

> "সহজ সহজ, সহজ কহয়ে, সহজ জানিবে কে।
> তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার, সহজ জেনেছে সে॥
> চাঁদের কাছে, আলো আছে, সেই সে পীরিতি সার।
> বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে, কে বুঝিবে মরম তার॥"

এই সাধনায় নারীর মধ্য হইতে বিষাংশ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতাংশ আহরণ করিতে হয়। কে এ-কাজ সম্পন্ন করিতে পারে? কোন্ জন এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে? চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

> "যে জন চতুর, সুমেরু-শিখর, সূতায় গাঁথিতে পারে।
> মাকসার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে, এ রস মিলয়ে তারে॥"

মাকড়সার জালে যিনি মাতঙ্গ বাঁধিতে পারেন, সমুদ্রে পশিয়া যিনি না ভিজেন, জল না ছুঁইয়া যিনি স্নান করিতে সক্ষম তিনিই এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন; তিনিই এই ভজনের অধিকারী। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান ভক্ত শ্রীরায় রামানন্দ কিশোরী দেব-দাসী আশ্রয় করিয়া এই ভজন করিয়াছিলেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে, পরিপূর্ণ পবিত্র দিব্য প্রেমের অনুশীলনই পরকীয়া-সাধনের অঙ্গ, স্থূলদর্শিগণ যাহাই ভাবুন না কেন, অনঙ্গই হইতেছে এইরূপ প্রেমানুশীলনের পরিপন্থী। অনঙ্গদমন ব্যতিরেকে অনঙ্গমোহনের প্রতিষ্ঠা নাই, কিশোরী-প্রেমের অনুভূতি নাই। কারণ এই কিশোরী-প্রেমে 'কামগন্ধ' নাই—ইহা শুদ্ধ গঙ্গা-জলের ন্যায় পবিত্র। তাই এই ভজনে ভোগেচ্ছার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক। তবে এই ভোগেচ্ছার ধ্বংস ভোগ্যবস্তু হইতে কাপুরুষের ন্যায় দূরে পলাইয়া গিয়া নহে, বীরের মত এই ভোগ্য বস্তুকে স্বীকার করিয়াই কামের বিনাশ সাধন করিয়া 'বিবর্ত্ত-বিলাস' কার কথিত 'অকামে'র প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাই এই সাধনায় কাম বৰ্জ্জিত হয় নাই বীরাচারীর সহিত এইখানে এই সাধনার মিল আছে। তবে যে সব প্রক্রিয়ায় এই অসম্ভব সাধন করিতে হয় তাহা অতি গোপনীয় ব্যাপার—এই প্রবন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিবার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

> "নায়িকা-সাধন শুনহ লক্ষণ, যেরূপে সাধিতে হয়।
> শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়।

দেহকে শুষ্ক কাষ্ঠের সম করিতে হয়। কিরূপে ইহা সম্ভব? চণ্ডীদাস যোগক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যোগমার্গ সাহায্যে এই সাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন। যিনি

তাঁহার রাগাত্মক পদগুলি আলোচনা করিবেন তিনিই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। তিনি সাংখ্য-যোগোক্ত চব্বিশ তত্ত্ব স্বীকার করিতেন। যোগিগণের 'ষট্চক্র' সাধনও করিয়াছিলেন—পরকীয়ায় সাফল্যের জন্য। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥.........
ষট্চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড।.........
মূল চক্র হয় হংসযোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার॥............
অজপা নামেতে কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥.........
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে॥"

সুতরাং ষট্চক্র সাধনে রতি স্থির হয়। "অজপা" সাধনে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। সাধন-রাজ্যে প্রাণায়ামের স্থান অতি ঊর্দ্ধে। সকল প্রকার সাধনেই ইহার উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অজপা সাধনে নৈতিক পতনের সম্ভাবনা নাই। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"যখন সাধন, করিবা তখন এড়ায় টানিবা শ্বাস॥
তাহা হইলে, মনবায়ু সে, আপনি হইবে বশ।
কখন না হইবে পতন জগৎ ঘোষিবে যশ॥"

এই শ্বাস-সাধনে অসাধ্য সাধন হইবে। চণ্ডীদাস এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা "স্তম্ভন-শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।" এই স্তম্ভন-শৃঙ্গার কি? তদুত্তরে "চণ্ডীদাসে কয়, দেহরতি নয়, বিন্দুপাত নাহি হয়।"

চণ্ডীদাস অনুসৃত পরকীয়া-ভজনে একটা অমৃত ফল লাভ হয় যাহা সকল বৈষ্ণবেরই কাম্য বস্তু। তবে শ্রীগৌরাঙ্গের পরেকার বৈষ্ণবগণ এই কাম্য বস্তু realise করিতে গিয়া অন্য মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কিশোরীভজনের উদ্দেশ্য কিশোরী প্রেম অনুভব করা—ইহার অর্থ কিশোরীভাবে অবস্থান। এই কিশোরীভাবে অবস্থানকে সফল করিতে হইলে কিশোরী-সমাজে স্থিতি আবশ্যক। কিশোরী-সমাজে স্থিতি অর্থে কিশোরীর পরিবার বা 'গণ' ভুক্ত হইয়া রাধা-কৃষ্ণলীলার সহায়ক হওয়া, সেবা ও প্রেম দ্বারা চিন্ময় আনন্দ-জীবনের গঠনান্তর-লীলার রসপুষ্টি করা বুঝায়। কিশোরী-ভজনের ইহাই অমৃতময় চরম ফল। বৈষ্ণবের মতে সাধন-রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, অপর সকলে প্রকৃতি মাত্র। সুতরাং এই প্রকৃতি দেহ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হয় না। এই প্রকৃতি-দেহ বা 'গোপীদেহ' পাওয়াটা বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য বস্তু। এই প্রকৃতি-দেহপ্রাপ্তির জন্য তাহাকে অনেক কিছু করিতে হয়। চণ্ডীদাসের অনুসৃত পরকীয়া-ভজনে এই গোপীদেহপ্রাপ্তি সহজ না হইলেও যথার্থ ও সত্য হয়। দুশ্চর তপস্যার দ্বারা এবং নিগূঢ় কৃচ্ছ্রতায় এক মহা নবভাবের নবীন জন্মলাভ সত্যই যেন বাস্তব হইয়া উঠে। চণ্ডীদাসের প্রার্থনায় বাশুলীদেবী এই ভজনের অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন—

"বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে॥"

নিত্য শব্দে নিত্যধাম গোলক ও বৃন্দাবনধাম বুঝায়। বৈষ্ণবগণের মতে গোলকধাম ও বৃন্দাবনধাম—একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। এই মায়াতীত চিন্ময় গোলক ধামে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও অপরাপর পারিষদগণ সহ চিন্ময় আনন্দলীলায় নিত্য বিরাজমান। মহাকবি চণ্ডীদাস 'রাধারতি' আশ্রয় করিয়া গোপীদেহ লাভ করত, তাঁহার পারলৌকিক সত্তায় নিত্যধামে আনন্দলীলা আস্বাদনের জন্য তাঁহার বিচিত্র পরকীয়া ভজন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস অনুসৃত পরকীয়া-ভজনপ্রণালী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাপ্রভু ইহা পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে অন্যরূপ আকার প্রদান করিয়াছিলেন। সে যুগে ইহারই দরকার হইয়াছিল। প্রবন্ধান্তরে ইহা আলোচিত হইবে।

উপসংহারে আমরা ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি যে, বৈষ্ণবের এই রসের ভজন আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে জড়ের লেশ মাত্র নাই। ইহার

বীজ খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে উপনিষদের নিকট যাইতে হইবে। উপনিষদ শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ, ভগবান রসস্বরূপ। ভরতমুনি যে রসের আলোচনা করিয়াছিলেন সমাজ-জীবনে বা গার্হস্থ্য জীবনে তাহার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাও ব্রহ্মানন্দ সোদর। এই রসই রূপান্তরিত হইয়া ভগবন্মুখী হয় ও উচ্চতম ভাগবত জীবন গঠন করিয়া থাকে। ভারত বর্ষে রস কেবল মাত্র সাহিত্যানুশীলনের সামগ্রী নহে। ইহা সাধনের সামগ্রী। ভারতে রসের সাধন হইয়াছে। এই রস-সাধনার চরম বিস্তৃতি ও পরম সার্থকতা জন্মিয়াছিল বৈষ্ণবের এই নিগূঢ় রসসাধনায়। রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রধান। তাই বোধ হয় ইহা আদিরস রূপে কথিত। বহিরঙ্গ অরসিক জন এই রসসাধনার সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে নীতিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। প্রাক্ চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ রস-সাধক চণ্ডীদাস তাই বলিয়াছেন—

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব-রস-সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে সরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥"

কবি চণ্ডীদাস শৃঙ্গার সাধনার এই পরীক্ষায় রসোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগীরথের ন্যায় জড়ের দেশে প্রেমের পবিত্র জাহ্নবীধারা আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে প্রেমের তরঙ্গাভিঘাতে কাম-কালুষ্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। রামীদেহ তো ভোগ-দেহ নয়—ইহা দেব-দেহ। ইহা কবিকে অপরূপ এক প্রেমের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। তাই ভাববিহ্বল কবি রামীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—

'তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন, তুমি বেদ-মাতা গায়ত্রী॥"

ইহা তো নরনারীর সাধারণ প্রেম-সম্ভাষণ নহে। বিংশ শতাব্দীর রসিক যাহাই বলুন না কেন, বাঙ্গালী চিত্ত এই সম্ভাষার স্বরূপবোধে পরাঙ্মুখ হইবে না। বাঙ্গালীর কর্ণে এই অপরূপ প্রেম-সম্ভাষণ মন্দাকিনীর কলকল পবিত্র ধারার ন্যায় চির-দিনই বাজিতে থাকিবে, ঋষিকণ্ঠে উদ্‌গীত পবিত্র বেদ-ধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোনোদিন জানতাম না...

জানতাম না যে, প্রেমের পথও নিষ্কণ্টক নয়।

শেষে সেই কুসুমাস্তীর্ণ পথের ওপর কণ্টকের দেখা একদিন পেলাম।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এলো। এলো আমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী।

মানুষ এত নিষ্ঠুরও হ'তে পারে?

আমার বুক থেকে আমারই প্রেমিকাকে সে ছিনিয়ে নিতে চায়।

হায়, হায়, সে আঘাত যে কত নিদারুণ তা তুমি জানো না বন্ধু!

শেষে একদিন নিলো। আমার প্রেমাস্পদকে নিলো আমার বুক থেকে ছিনিয়ে।

এবং শুধু তাকে ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হলো না, প্রিয়-হারা সঙ্গীহারা হাফেজের কাতর প্রার্থনা যদি কোনোদিন শূন্যে উঠে' বিধাতার পায়ের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে, তাই সে আমার স্বর্গের পথও রুদ্ধ ক'রে দাঁড়ালো—বিভীষিকাময় দানবের মত।

দাঁড়াও ক্ষতি নাই। কিন্তু হে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তুমি আমার একান্ত অন্তরঙ্গ; তুমি আমার বন্ধু। এসো তুমি আমার কাছে এসো। দু'জনে সুরাপান করি। সুরা-মন্ত্রে সঞ্জীবিত না হ'লে আমার হারানোর ব্যথা তুমি বুঝবে না।

নয়ন, তুমি তোমার প্রিয়ার জন্যে অশ্রুবর্ষণ কোরো না। প্রিয়া-বিরহ-বেদনা তোমার চিরন্তন হ'য়ে থাক্। জ্বালাময়ী স্মৃতির সে মর্ম্মান্তিক দুঃখ নিয়ে কেউ যদি বেঁচে থাকতে চায়, ত' চোখের জলে সে স্মৃতির রেখা মুছে ফেলা শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ।

আর, তুমি কি ভেবেছ হাফেজ, অশ্রুজলে তোমার সে অবিনশ্বর প্রেমের স্মৃতি বিলুপ্ত হবে?

নিশ্চিন্ত থাকো হাফেজ, বিরহ-ব্যথায় বুকের ভেতর যে শোণিত-ক্ষরণ সুরু হয়, সে শোণিত-লেখা অশ্রুতে মোছে না। *

* হাফেজ

বিজ্ঞানের গল্প

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

তারার কথা

তারা ও সূর্য্য একই শ্রেণীর পদার্থ। সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রির আকাশে যে অসংখ্য দীপমালা জ্বলে ওঠে তার প্রত্যেকটী এক একটী সূর্য্য। আমাদের সূর্য্য নিকটতম তারা বলে তার গ্রহজগতের পরিচয় আমরা পেয়েছি ; কিন্তু ওই সব সুদূরবাসী সূর্য্যের গ্রহগোষ্ঠী আছে কি না, তা বলা দুষ্কর। থাকা খুবই সম্ভব। তবে সবার নয়। Dr. Jeans অনুমান করেন লাখের মধ্যে একটা সূর্য্যের গ্রহ পরিবার থাকা সম্ভব। গ্রহবেষ্টিত হওয়া তারাজীবনের প্রাকৃতিক নিয়তি নয় ; এটা বরং একটা ব্যতিক্রম।

তারাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই প্রথম কথা মনে হয় এদের সংখ্যা-গৌরব। মোট সংখ্যা এদের কত ?—নগ্ন চক্ষে একই সময়ে এক নজরে আমরা ৩০০০ তারা দেখতে পাই ; আর সমস্ত আকাশে শুধু চোখে দেখা যায় যত তারা তার মোট সংখ্যা হচ্ছে ৫০০০। কিন্তু একটা ছোট field glassএর সাহায্যে ১ লক্ষ ২০ হাজারের কিছু বেশী তারা দৃষ্টিগোচর হয়। একটা ছোট দূরবীণ যোগে চক্ষুগোচর হয় ৭০ লক্ষ তারা। আর সবচেয়ে বড় অতিকায় দূরবীণে (যেমন ১০০ ইঞ্চি object glass যুক্ত mt. wilson যন্ত্র) কোটী কোটী তারা নজরে ধরা পড়ে। ফটোগ্রাফি-যোগে যে সংখ্যা ধরা পড়ে তা শত কোটী সহস্র কোটী।

আসলে তারার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে একস্থানে আছে 'সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন'। কথা খুব সত্য। আমাদের নক্ষত্র জগৎটাতেই তারা-সংখ্যা স্থূল গণনায় অনুমিত হয়—৩০ হাজার হ'তে ৪৭ হাজার কোটী! এ ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সীমার বাইরে বহুদূরে দূরে আরো অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে। বড় বড় দূরবীণে এদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফিঁকে মেঘখণ্ডের মত দেখায়। এদের অনেকগুলাই স্বতন্ত্র নক্ষত্র-জগৎ। এই এক এক ব্রহ্মাণ্ডে কম পক্ষে ১০০ কোটী সূর্য্য আছে। এরূপ ২০ লক্ষের কিছু অধিক-সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া মহাকাশের অনাবিষ্কৃত অজানা গর্ভে আরো যে কতকোটী ব্রহ্মাণ্ড লুকানো আছে কে বলবে ? Dr. Jeans বলেন। এই সমস্ত বিশ্বের সমস্ত তারা যদি বালুকণা হ'ত তা হলে এত বালুকণা পাওয়া যেতো যাতে সমস্ত ইংলণ্ড দেশের ভূভাগে কয়েক শত গজ পুরু একটা বালুকাস্তর গড়ে উঠতো !

তারাগুলির সম্বন্ধে আধুনিক শতাব্দীতে অনেক নূতন জ্ঞান সংগ্রহ হয়েছে। তারাদের দূরত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে।

তারাদেহের বৈচিত্র্যও বড় কম নয়। এদের দেহের উপাদান, দেহগঠন, বস্তুত্ব বা mass ; আয়তন, তাপমাত্রা, দীপ্তিশীলতা সমস্ত বিষয়েই বিস্তর বিস্ময়জনক নূতন জ্ঞান সংগৃহীত হয়েছে।

তারাদের মধ্যে বামনও (dwarf) আছে আবার অতিকায়ও (giant) আছে। তবে মোটামুটী একটা সাধারণ size বেশী ভাগের মধ্যেই দেখা যায়। আয়তনের তারতম্যের দুটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিটেলজুস নামক তারাটীর (আর্দ্রা) ব্যাসরেখা—৩০ কোটী মাইল! সূর্য্যের হ'ল মাত্র ৮ লক্ষ মাইল! বিটেলজুসের দেহ-আয়তন (volume) সূর্য্য হ'তে ১৩ লক্ষগুণ বেশী! অপর প্রান্তে একটী বামন তারকা আছে, তার নাম VanMannen এর তারকা; এই বামনের আয়তন পৃথিবীরসমান; এইরূপ ১০ লক্ষটা বামন-তারকা সূর্য্যের গর্ভে ঢুকে যেতে পারে !

আয়তন

Volume বা আয়তনে তারাদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য থাকিলেও বস্তুত্বে অর্থাৎ পদার্থ-পরিমাণে এদের মধ্যে বড়

মারাত্মক তারতম্য নেই। Size এ খুব বড় হ'লেই যে তাতে বেশী পরিমাণ বস্তু থাক্‌বে তার মানে নাই। সুতরাং এই আয়তন-তারতম্য বস্তুর অণু পরমাণুগুলার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

বস্তুমাত্রা ও ঘনত্ব

উজ্জ্বল, জ্বলন্ত, তারাগুলার দেহবস্তু আসলে বাষ্পীয় বা গ্যাস অবস্থাযুক্ত। এই গ্যাসরাশির অণু পরমাণুগুলা কোনো তারায় খুব ঘন ও ঘ্যাঁসাঘ্যাসি ভাবে বিন্যস্ত; কোনো তারায় সেগুলা খুব তফাৎ তফাৎ বিন্যস্ত। প্রথম ক্ষেত্রে তারার বস্তুর density খুব বেশী; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুর density (ঘনত্ব) খুব কম।

যে সব তারা বিটেলজুসের মত অতিকায় তাদের এই বিপুলায়তনের কারণ হচ্ছে বস্তুর লঘুত্ব। তারামাত্রেরই দেহ উত্তপ্ত গ্যাস-পিণ্ড। এই গ্যাস কত লঘু? কত পাতলা? বাতাস যে কত লঘু ও পাতলা তা আমরা জানি; বিটেলজুস তারার দেহ-পদার্থ যে গ্যাস তার density বা ঘনত্ব বাতাসের চেয়ে হাজার গুণ লঘু বা কম। আবার Van Maannen এর বামন-তারকার দেহের বস্তু এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে তথায় এক টন পরিমাণ বস্তু একটা মটর দানা পরিমাণ স্থানে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

তারকা গুলির তাপ আলোক বিকিরণেও মাত্রার কম বেশী আছে। Wolf ৩৫৯ নামক তারাটী এত ক্ষীণ-তেজ যে, তার প্রদত্ত তাপালোক সূর্য্য-তাপের ৫০ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমাদের সূর্য্যের স্থানে এই চারিটীকে বসালে মুহূর্ত্তে সসাগরা ধরণী হিমে জমে' কাঠ হয়ে যাবে। অপর দিকে S. Doradus নামে এক ভীষণ জ্যোতির্ম্ময় তারা আছে, যার বিকিরণ তাপালোকের মাত্রা সূর্য্য হতে ৩ লক্ষ গুণ বেশী। S. Doraduscক যদি সূর্য্যস্থানীয় করা হয় তা'হলে মুহূর্ত্তে ধাতু-পাষাণময়ী ধরণী ভস্মরাশিতে পরিণত হবেন।

তারকাদের দেহতাপমাত্রা খুবই প্রচণ্ড। সূর্য্যের গর্ভভাগের উত্তাপ মাত্রা ৫ বা কোটী ডিগ্রী! তারাদেরও গর্ভভাগের তাপ-মাত্রা ঐ পরিমাণে।

এই উত্তাপ-মাত্রার ফলে তারাগর্ভে জড় পদার্থ পরমাণুগুলি অটুট অভঙ্গ অবস্থায় থাকতেই পারে না। প্রচণ্ড উত্তাপ-তাড়িত হয়ে পরমাণুগুলা সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে ছুটাছুটী করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি কচ্ছে এবং তার ফলে তাদের অঙ্গ হতে ইলেকট্রন খসে পড়ছে। অন্য পরমাণু এই সব বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন পলায়মান ইলেকট্রন গুলাকে আত্মসাৎ করছে। এই প্রক্রিয়াতেই পরমাণুর জাত্যন্তরে পরিণতি ঘটছে। একেই Transmutation of Elements বলে। এক জাতীয় মূল পদার্থ অন্য জাতীয় মূল পদার্থে রূপান্তর লাভ করছে। পৃথিবীতে যে কয়টী Radio active বা ভাস্বর পদার্থ আছে, তাদের মধ্যে আপনা হতে এই ইলেট্রন-হানিঘটিত রূপান্তর ঘটছে।

তারাদের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে—তাদের তাপালোক কোথা হতে উৎপন্ন হচ্ছে—এইটে খুঁজে বার করা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এ তত্ত্ব জানা ছিল না। তখনকার পণ্ডিতরা এ সম্বন্ধে যে সব জল্পনা-কল্পনা করেন তার পরিচয় 'সূর্য্যরহস্য' প্রবন্ধে দিইছি। সুতরাং এ আবিষ্কারটী বিংশ শতাব্দীরই নিজস্ব কীর্ত্তি।

Radium, Uranium প্রভৃতি ভাস্বর পদার্থের আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকরা এই ইঙ্গিত লাভ করেন যে, খুব সম্ভব তারকাদের দেহের পদার্থ-পরমাণু Radium জাতীয় ভাস্বর পদার্থেরই পরমাণু তুল্য। তবে তারকাদের গর্ভে যে সব ভাস্বর Radio active পদার্থ থাকা সম্ভব, সে গুলার atomic number খুবই বেশী; তাদের পরমাণুর গঠন Radium জাতীয় পরমাণু হতেও ভয়ানক জটিল; সে সব পরমাণু খুবই ভঙ্গুর আর খুবই ভারী। এই কারণে এই জাতীয় তেজ পদার্থ ও তাদের পরমাণুকে lucid matter এবং lucid atom নাম দেওয়া হয়েছে। এই সব lucid atom বা দিব্য পরমাণু পার্থিব Radio-active বা ভাস্বর পরমাণুর তুলনায় আধ-নিভন্ত অঙ্গারের তুলনায় জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন, তেমনি।

তারকাদের দেহের ও গভীর গর্ভভাগের উপাদান পদার্থ যে সাধারণ পার্থিব জড়পদার্থ নয়—পক্ষান্তরে সে পদার্থ একরূপ তেজোময় দিব্য পদার্থ radiant বা lucid matter এ অনুমান স্বয়ং Newton করেছিলেন। অধুনা

আবিষ্কৃত Radium জাতীয় ভাস্বর পদার্থের আবিষ্কারে এই তত্ত্বটা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা সত্যে পরিণত হয়েছে।

তারাদেহে বিশেষ তাদের গভীর গর্ভভাগের উপাদান পদার্থ হচ্ছে lucid matter বা দিব্য পদার্থ। এই পদার্থের যে সব পরমাণু তাদের গঠন খুবই জটিল; অর্থাৎ তাদের প্রটন খুব ভারী ও ইলেকট্রন সংখ্যা অনেক বেশী। এতই বেশী যে সেগুলা কোনো মতে কক্ষচ্যুত হয়ে ঠিকরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ atom গুলা 'Ion' এ পরিণত হচ্ছে। দিব্য পরমাণুরা ভাস্বর। ভারী, ভঙ্গুর ও চঞ্চল (unstable); পরিণামশীলতা, রূপান্তরপ্রাপ্তি এদের যেন মজ্জাগত প্রকৃতি। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে—এই সব দিব্য পরমাণুই কালক্রমে ইলেকট্রন হারাতে হারাতে পার্থিব ভাস্বর পরমাণুতে ও সাধারণ নিত্য পরমাণুতে পরিণত হয়। Radium জাতীয় পরমাণু দিব্য পরমাণুর তুলনায় জলন্ত অঙ্গারতুলনায় আধ-নিভন্ত অঙ্গারের মত; আর সাধারণ পার্থিব পরমাণু, atomic number যাদের ১ হতে ৮৩ পর্য্যন্ত, তারা তার তুলনায় নির্ব্বাপিত শীতল ছাই-এর মত।

সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের অভ্যন্তরভাগের উত্তাপ কি ভয়ানক পরিমাণের তা উল্লিখিত হয়েছে। তাদের অভ্যন্তর-দেহ যদি সাধারণ পার্থিব পরমাণুতে গঠিত হতো তাহলে সেগুলাউক্ত উত্তাপে কোন কালে ভস্ম হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো; কেবল দিব্য পরমাণুই সে উত্তাপে অঙ্গহীন হয়ে টিকে আছে মাত্র। কোনো পরমাণুই গোটা নাই। প্রবল বেগে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে করতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে এবং এই সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর অঙ্গ হতে ইলেকট্রন খসে যাচ্ছে। পরমাণু যেন খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে; অঙ্গহীন বা খোঁড়া হয়ে কিন্তু বেশী ক্ষণ থাকে না; যে সব কক্ষভ্রষ্ট ইলেকট্রন নিঃসঙ্গভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে বা তারা-দেহ হতে মুক্ত হয়ে বাইরে পালাবার চেষ্টা করছে, তাদেরই একটাকে গ্রাস করে, নিজের ভাঙ্গা অঙ্গ মেরামত করছে।

এইরূপ ইলেকট্রন-ত্যাগ ও গ্রহণ, উভয় কার্য্যের ফলেই খানিকটা তেজ radiation আকারে উৎপন্ন হয়।

এই বিমুক্ত তেজই তাপ ও আলোক আকারে তারা-দেহ ত্যাগ করে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আরও একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা এই পরমাণু-রাজ্যে ঘটে, যার ফলে ঐ নিষ্কাশিত অদৃশ্য তেজ পরিচিত তাপালোকে রূপান্তর লাভ করছে। সেই ঘটনাটী হচ্ছে—'পরমাণুর আত্মহত্যা'; সোজা সাদা ভাষায় অর্থ তার 'পরমাণুর শক্তিতে রূপান্তর লাভ করা'। আমরা দেখছি পরমাণুর দুই অংশ; একটা কেন্দ্রাংশ—জড়ধর্ম্মী Proton, অপরটা বহিরংশ শক্তিরূপী Electron; অনেক সময় এরূপ অঘটন ঘটে যে, ইলেকট্রন গিয়ে প্রটনের ঘাড়ে পড়ে; ফলে দুটাই ধ্বংস লাভ করে; ধ্বংসান্তে তার স্থানে এক ঝলক তেজ উৎপন্ন হয়; তারা-গর্ভে এই তেজ সূক্ষ্ম ইথর তরঙ্গ রূপে প্রথমে দেখা দিয়ে পরে তারা-দেহ ত্যাগ করে, স্থূল তরঙ্গ রূপ ধরে' পরে তাপ ও আলোকে পরিণত হয়।

সূর্য্য ও তারকাগুলি কোটী কোটী বৎসর ধরে যে পরিমাণ তাপ ও আলোক দিয়ে আসছে এবং এখনো কোটী কোটী বছর ধরে' দিতে থাকবে তাতে এই কথাটাই সব আগে মনে হয় যে, এই উত্তাপ ও আলোকের কারণ combustion বা দাহ্যবস্তুর দহন কখনও হতেই পারে না। এর একমাত্র কারণ—'জড়ের লয়'। পরমাণুর ধ্বংস হ'তেই এই তেজ-শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। জড়ের চরমাংশ যে পরমাণু, তারই ভিতরে এই শক্তি সুপ্ত আছে; এই পরমাণুই অংশতঃ অঙ্গহীন হওয়াতে বা সমূলে ধ্বংস হওয়াতে ইথর সমুদ্রে Electro magnetic তরঙ্গ উঠছে। এই তরঙ্গ-রাশি উৎপত্তি-স্থান হ'তে সূক্ষ্মতম আকার হ'তে আরম্ভ করে ক্রমশঃ স্থূল হ'তে হ'তে নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে অবশেষে পরিচিত উত্তাপ ও আলোক-মূর্ত্তি ধরে' আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হচ্ছে! তারালোকের রহস্য এই।

মালা-চন্দন

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একেই বলে—'কুঁদুলী'; কোঁদল না পেলে, বেণার মুড়োয় চুল জড়িয়ে 'কোঁদল করে'; তাও নিজের জন্য নয়, স্বজাত নয়, জ্ঞাতি নয়, এক পরের জন্য। তবে আর লোকের দোষ কি?—লোকে যে কাদুকে গোপনে সাত কুঁদুলীর সেরা কুঁদুলী বলে, সেটা মিথ্যাও নয় আর অন্যায়ও বলে না।

একা মেয়ে দশ দশ জন মেয়ের সঙ্গে কোঁদল বাধাইয়া বসিল। কিন্তু দশ জনও কথা বলিতে জানে, তাহারাও কম যায় না। হইলে কি হয়,—কাদুর মুখখানি ত' নয় যেন ক্ষুরের ধার, সে তাহাদের গতর চোখের মাথা খাইয়া বসিল; দশ দশটী মেয়ে হাঁফাইয়া উঠিল। এ যেন সেই 'লঙ্কাকাণ্ড' বা 'কুরুক্ষেত্র', কাদুর এক নিক্ষেপে লক্ষবাণ ধায় চারিভিতে; প্রতি পক্ষ জর্জ্জর ব্যাকুল!

তুলসী আসিয়া হাত ধরিয়া কাদুকে টানিয়া ঘর ঢুকাইল,—কহিল—"ছিঃ—"।

এই তুলসীর জন্যই কিন্তু কোঁদল।

কাদু কহিল—"ছিঃ! ছিঃ কেন শুনি, এমন চোখের মাথা খাব না, এমন জিভ খসে যাবে না!"

—"বলুক না!"

কাদু ঝঙ্কার দিল—"না,—বলবে কে-ন? বলি বলবে কেন শুনি? কোন চোখ-খাগীর,—"।

বাধা দিয়া তুলসী কহিল,—"আমার মাথা খাস!"

—"তোর মাথা খাব না ভাবছিস্, তোর মাথাও খাব, জ্ঞাতি আনব, তোর ওই চুলের রাশ কাটব, ঝামা দিয়ে নাকের রসকলি তুলব—তবে অন্য কাজ।"

তুলসী হাসিয়া কহিল—"তাই আন্, পরের সঙ্গে কেন বাপু।"

কাদু ও কথায় কান দিল না, সে তুলসীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ-নেত্রে কহিল—"দেখ দেখি—এই রূপে চোখ-খাগীরা কু দেখে? তাদের চোখের মাথা খাব না; এ রূপ গেলে দেখব কি, মুখপুড়ীদের কাল হাঁড়ী মুখ, না পোড়া কাঠ!"

তুলসী ঘটনাটাকে সরস করিবার অভিপ্রায়ে মৃদু কণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

"ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা,
কালসাপিনীর জিভে যেন বিষে আঁকা বাঁকা,—
আমার দারুণ ননদিনী!"

কাদু একটু হাসিল। তুলসী ভরসা পাইয়া স্নেহভরে কহিল—"ছিঃ—ওই সব কি বলে, না ঝগড়া করে?"

কাদু কহিল—"তবে কি বলব শুনি, শ্রীমতী কি বলতে বলেন শুনি?

তুলসী আবার গান গাহিল—

"ননদিনী ব'-লো নগরে—
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।"

বছর বিশেক বয়স মেয়েটীর নাম তুলসী;—'জাত-বোষ্টোম'এর ঘরের মেয়ে, চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হইয়াও তাই পত্যন্তর গ্রহণ করে নাই। 'জাত-বোষ্টোম' অর্থে পুরুষানুক্রমিক বৈষ্ণব, গৃহস্থের মত ঘর বাঁধিয়া সৎজাতি গৃহস্থের আচার ব্যবহার মানিয়া চলে।

বাউল ভেকধারী বৈষ্ণবেরা 'ছিঁড়লে মালা, নতুন গাঁথে।' অর্থাৎ বৈষ্ণব থাকিতেই মনান্তরে বা এমনি কারণে বৈষ্ণবী নতুন বৈষ্ণবের গলায় মালা, ললাটে চন্দন পরাইয়া মালা-চন্দন করে, বিধবারাও মালা-চন্দন করে। কিন্তু এরা—এই জাত-বোষ্টোমেরা সৎজাতি গৃহস্থের অনুকরণে বৈষ্ণব থাকিতে মালা-চন্দন করা ত দূরের কথা, বিধবা হইয়াও নতুন আশ্রয় গ্রহণ করে না; এ শুধু লজ্জায় নয়, বহুদিন হইতে পালন করিয়া এ আচার তাহাদের সংস্কার; ধর্ম্মের বিধান সত্ত্বেও সংস্কার তারা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

তুলসীর বাপ মারা যায়—তুলসী যখন তিন বছরের। তুলসীর মা বহু কষ্টেই মেয়েকে পালন করিয়া বড় করিয়া তুলিল। সেও আচার অনুযায়ী বিধবার মত কাটাইয়াছে; তারপর তুলসীর বিবাহ দিল দশ বছর বয়সে, ছেলেটী বারো বছরের। তুলসীর মা বড় সাধ করিয়া এ বিবাহ দিয়াছিল।

ছেলেটীর একটী সুন্দর সুশ্যাম কমনীয় লাবণ্য ছিল, আর তুলসী ছিল গৌরী ফুটফুটে মেয়েটী; এ যুগল দেখিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। এ রূপ দেখিয়া বৈষ্ণবী আর একটী যুগল রূপের কল্পনা করিত, সে তাহার ইষ্টরূপ! কিন্তু সে-সাধের মাথায় বাজ হানিয়া মরণ নির্ম্মম হস্তে ষোল বৎসর বয়সেই শ্যাম-কিশোরটীর ছবি ধরণীর বুক হইতে মুছিয়া দিল।

তুলসীর বয়স তখন সবে চৌদ্দ, তাহার গৌরী অঙ্গে রূপ সবে অপরূপ হইয়া ফুটিতে সুরু করিয়াছে, দেহ-লাবণ্যে সবে মাদকতার রেশ লাগিয়াছে। সে রূপ তখনও মুগ্ধ করে, মত্ত করে না।

এ আঘাতটা তুলসীর মার বুকে বড় কঠিন ভাবে বাজিল, বাজিবারই কথা; অবরুদ্ধ মর্ম্ম-যাতনায় দেহ তাহার ভাঙিয়া পড়িল দিবা রাত্রি চিন্তা করিয়া মনের সঙ্গে লড়াই করিয়া শেষ সে মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়া তুলসীকে কহিল,—"তোর, আবার আমি বিয়ে দোব।"

তুলসী বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। মা বুঝিতে পারিল না বিস্ময়, কি ভর্ৎসনা; সে কহিল,—"এমন ক'রে তাকিয়ে থাকিস্ না তুলসী,—এ আমাদের আছে,—আমরা বোষ্টোম আমরা ছিঁড়লে মালা নতুন গাঁথি; এ আমাদের ধর্ম্মে আছে, শাস্ত্রে আছে,—শুধু কথার কথা নয়:—তবে আমরা সে করি না—গেরস্ত সমাজে নিন্দে হ'বে বলে।—তা না হয় আমরা ভেকধারীর সমাজেই থাকব।"

চৌদ্দ পনের বছরের মেয়েটী, সদ্য-হারানো কিশোরটীকে ভুলিতে পারে নাই না কি,—

সে কহিল, "না-মা।"

মা মিনতি করিয়া হাত ধরিয়া কহিল—"আমার বুকে আর শেল হানিস্ না তুলসী, বিধবার আচার তোর আমি দেখতে পারব না, তোর মুখের হাসি—"

তুলসী হাসিয়া কহিল—"হাসির অভাব কোথা দেখলি তুই?—আমি হাসি তো,—এই দেখ না হাস্‌ছি।"

মা কহিল—"আরও শোন্, মা তোর অমর নয়, আর দেহের অবস্থা ত' এই, কোন্‌দিন আছি, কোন্‌দিন নাই,—কি ক'রে দিন চালাবি মা?"

—"হরি বোলে,—বোষ্টমের মেয়ে ভিক্ষে করতে ত' লজ্জা নাই,—পাঁচটা দোর ঘুরলেই একটা পেট চলে যাবে;—তুই আমাকে গান শেখা।"

তুলসীর মা কাঁদিয়া কহিল,—"তুই ত' জানিস্ না মা পথের কথা,—পথের ওপর রূপের ডালা নিয়ে বেরোনোর বিপদ; তুলসী, সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায়, কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় না। তুলসী, আমার কথা শোন্।"

তুলসী কিন্তু মায়ের কথা শুনিল না।—জোর করিয়া সে পরদিন হইতে মায়ের সঙ্গে ভিক্ষায় বাহির হইল,—মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গান শিখিতে সুরু করিল। বৈষ্ণবের মেয়ে একেবারে যে গান জানিত না তা নয়,—বাল্যকাল হইতেই গান সে গাহিত, তা ছাড়া এ দিকে,—এই গানের দিকে তুলসীর একটা সহজ দখল ছিল,—তুলসীর বাপ মহানন্দ দাস এ অঞ্চলে বেশ একজন দক্ষ সুস্বর গায়ক ছিল, তুলসীর মায়ের শিক্ষা তাহারই কাছে।

তুলসীর মায়ের গলা ছিল বড় মিঠা,—মহানন্দ ওই মিঠা গলার জন্যই সখ করিয়া তাহাকে গান শিখাইয়াছিল।

সলজ্জা নারী আপত্তি করিলে মহানন্দ কহিয়াছিল—"জান,—এ গুলো হচ্ছে ভগবানের দান, এই রূপ, কণ্ঠ, এর অপব্যবহার করতে নাই,—এতে তাঁর পূজো করতে হয়।—এ গলা তোমায় তিনি দিয়েছেন, এতে তাঁর স্তবগান হবে বলে; আর শিখে রাখ, আমার সম্পত্তির মধ্যে ত' এইটুকু,—ভালমন্দ কিছু হলে এ ভাঙ্গিয়ে তুমি খেতে পারবে।"

কথাটা যে এমন নিষ্ঠুর সত্য, তাহা সেদিন কেহ ভাবে নাই,—কিন্তু ভবিতব্যের চক্রে সত্যসত্যই নিষ্ঠুর রূপে সে সত্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাক্—কথা হইতেছিল তুলসীর,—উত্তরাধিকারসূত্রে তুলসীর সঙ্গীতে একটা যেন স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল, আর তরুণ কণ্ঠখানি ছিল তাহার সরল-বাঁশের বাঁশীর মত—সুডৌল, মধুক্ষরা;—আর, একবার শুনিলেই গানের সুরখানি সে যেন আপন কণ্ঠে বসাইয়া লইত।

তাহার উপর মায়ের কাছে শিখিল সে সঙ্গীতের কারু-শিল্প;—ছলছল হিল্লোলে কণ্ঠখানি যখন কম্পনে ভরিয়া উঠিত, তখন সে যেন উপলাহত প্রবাহের জল-তরঙ্গধ্বনি!

তুলসীর গানের আদরও হইল খুব;—ওই কণ্ঠ, তাহাতে এমন সুদক্ষ কারু-শিল্প,—সর্ব্বোপরি কিশোরীর

কমনীয় রূপ, আর তাহার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় একটা সংযত সুশান্ত শীলতা!

তুলসী গান করে চোখ দুটী থাকে তাহার মাটীর উপর। —কথা কহে বিনীত হাসি-মুখে, ভিক্ষা লয়—সন্তোষের আশীর্ব্বাদে গৃহস্থের ভিক্ষা-দেওয়া শূন্য অঞ্জলিখানি ভরিয়া; —আদর হইবারই কথা!

পুরনারীরা ভিক্ষা দিয়া নিমন্ত্রণ করে—

"আবার এসো তুলসী!"

'একদিনেই পরিচয় হইয়া যায়,—যাচিয়া পুরনারীর দল পরিচয় করে।

তুলসী সবিনয়ে হাসিয়া কহে—"আসব বৈ কি মা,—তোমাদের দুয়ারই যে ভিখারীর ভাণ্ডার।"

তুলসী হাসিয়া মাকে পথে কহিল—"মা! এই তোমার পথ?"

মা তুলসীর মুখপানে চাহিয়া কহিল,—"পথ এই বটে মা, কিন্তু সাপ ত' পথের ওপর বাস করে না,—সে দেখা দেয় তার সুবিধে মত।"

দেখাও দিল একদিন—

বেলা তখন ভাঙিয়াছে, সন্ধ্যার বড় দেরী নাই,—মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা সারিয়া গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছে,—গ্রামখানির প্রায় শেষে বাগানের মধ্যে একখানা প'ড়ো ঘর,—গ্রামের সখের যাত্রার আড্ডা—এইখানে তাহাদের বৈঠক বসে, সেইখান হইতে একটী ছোকরা,—বেশ ফিট্‌ফাট,—হাঁকিয়া কহিল—"বোষ্টোমী! ও বোষ্টোমী,—বলি—শুনছ, ওগো ও বোষ্টোমী!"

তুলসীর মায়ের বুকখানা ধড়াস্ করিয়া উঠিল;—সে কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া ভীত মৃদুস্বরে কহিল—"চ'লে আয়!"

কিন্তু তখন যুবকটি পথের উপর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছে, সে বেশ কটুকণ্ঠেই হাঁকিল—"বলি শুনতে পাও না, না কথা কেয়ার হচ্ছে না গো?"

ভিতর হইতে একজন কহিল,—"ধ'রে আন্ তো—।"

তুলসী ফিরিল,—মা কঠিন কণ্ঠে ক'হিল "তুলসী!"

তুলসী সম্মুখের পানে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল "বাবুরা কি ব'লচেন শুনে যাই মা,—তুমিও এস না।"

মাকেও অগত্যা ফিরিতে হইল। তুলসী শান্তভাবে আসিয়া নত হইয়া যুবকটিকে নমস্কার জানাইয়া কহিল,—"অনুমতি করুন, আমাদের বেলা যায় প্রভু।"

'তাহার স্বভাবসিদ্ধ শীলতার এমনি একটা সংযত মহিমা লইয়া সে দাঁড়াইল যে, উচ্ছৃঙ্খল যুবক কয়টীও একটু সংযত না হইয়া পারিল না;—এটা বোধ করি শীলতার একটা ধর্ম্ম,—অপরের সম্ভ্রম একটা জাগাইয়া তুলিবেই।

একজন একটু বেশ সংযত মিষ্ট ভাবেই কহিল—"তোমরাই গাঁয়ে গান ক'রছিলে, না?—বড় সুন্দর গান তোমাদের, মেয়েদের ভিড়ে আমরা ভাল ক'রে শুনতে পাই নি, আমাদের দুটো গান শোনাতে হবে।"

তুলসীর মা কহিল—"আজ্ঞে আজ আমাদের বড় দেরী হয়ে গিয়েছে,—"

তুলসী বাধা দিয়া কহিল,—"ছিঃ, সে কি মা, ওঁরা আমাদের গান শুন্‌তে চাচ্ছেন—সে আমাদের ভাগ্য, না কি বলতে আছে?—দাও একতারায় সুর দাও।"

তুলসী খঞ্জনীতে ঝঙ্কার তুলিয়া সেইখানেই বসিয়া একখানি দেহতত্ত্বের গান ধরিল; তুলসীর মা শুধু একতারাই বাজাইল, সে গান ধরিল না,—কন্যার অতিশীলতায় সে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

বেশ নিপুণতার সহিত গান শেষ করিয়া তুলসী মাকে কহিল—"এই ত' হয়ে গেল মা, কতক্ষণ লাগল? চল এইবার—"

"আর একখানা, আর একখানা,—"

চারিদিক হইতে সমস্বরে একটা প্রতিবাদ উঠিল—"আর একখানা—!"

একজন আবার বেশ সরস ভাবেই কহিল—"বোষ্টুমী তোমরা, তোমাদের মুখে পদাবলীর প্রেমের গানই শুন্‌তে ইচ্ছে আমাদের,—ভাবের ভাবুক তোমরা,—"

তুলসী কহিল—"আর এক দিন এসে শুনিয়ে যাব প্রভু—, বেলা-পানে চেয়ে দেখুন,—আমাদের ফিরতে হবে—।"

বক্তা কহিল,—"তা এইখানেই না হয় আজ থাকবে, খাও দাও,—না আপত্তি আছে—?"

বক্তার কণ্ঠের সরসতায়, ভঙ্গীতে একটী প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তুলসী তেমনি শীলতাভরে হাত জোড় করিয়া কহিল,—"দেখুন দেখি,—আপনারা কি

থাকতে পারে? অনাথা স্ত্রীলোক আমরা, আপনারাই ত আমাদের রক্ষক,—বাপ,—ভাই,—অনাথার আশ্রয়,—ভরসা! তবে প্রভু! ঘরে দুখানা থালা কাঁসা আছে, আর তুলসী-মঞ্চ -গরীবের বিগ্রহ-মন্দির, সে-মন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ প'ড়বে না,—সে বৈষ্ণবের মহাপাপ!"

অন্তর সাড়া দিল কি দিল না ভগবান জানেন,—কিন্তু এমন ক্ষেত্রে মানুষের চামড়ার খাতিরেও মানুষকে সুশীল হইতে হয়,—যুবক কয়টীকেও হইতে হইল, সুশীল বালকের মতই তুলসী ও তুলসীর মাকে তাহাদের বিদায় দিতে হইল।

পথে নীরবে চলিতে চলিতে তুলসী মাকে কহিল—"কি ভাবছ বল ত মা?"

পথ চলিতে চলিতেই মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া মা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"আমার বড় ভাবনা ছিল মা, কিন্তু সে ভাবনা আজ আমার ঘুচল;—তুই পারবি তুলসী, গোবিন্দ তোকে ভরসা দেবেন।"

* * *

তারপর আজ চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে।—তুলসীর মা দেহ রাখিয়াছে,—তুলসী আজ পূর্ণ যুবতী, তাহার ছিপ-ছিপে দেহখানি সবল পরিপুষ্টিতে ভরিয়া উঠিয়াছে;—লাবণ্য, মুকুলিত তরুর মত ঝলমল করিয়া সারাদেহখানি ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে;- সে-লাবণ্য তাহার অযত্নে অবহেলিত নয়,—তুলসী আপনার দেহের সেবা করে,—রূপের সে মার্জ্জনা করে!—

কোঁকড়াকোঁকড়া, ফুলোফুলো, একপিঠ চুল,—সে চুল লম্বা করিয়া টানিলে জানুদেশে আসিয়া পড়ে,—সেই চুলে সে পরিপাটী করিয়া বিন্যাস করিয়া রাখাল-চূড়া-বাধে, ঈষৎ বাকা নাকটীর ঠিক বাঁকটীর উপরেই সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা শুভ্র তিলকমাটীর রসকলি একটী, ঠিক তাহারই উপরে কালো ভ্রূরেখা দুটীর মাঝে তিলকমাটীর শুভ্র টীপ একটী গোধূলির তারার মত জলজল্ করে;—নাকে কোন অলঙ্কার নাই, কিন্তু নাকছবির জন্য ফোড়া দাগটী যেন অপরূপ একটী শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্ষারে কাচা শুভ্র মোটা কাপড়খানি সে ললিত তনুখানি ঘেরিয়া বেড়িয়া থাকে,—প্রান্তে সূক্ষ্ম রেখায় জরদা রঙের ফুল-পাড়।—

ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবায় দু'কণ্ঠি মিহি তুলসীকাঠের মালা—।

দেখিয়া সখি কাদু বলে—"শোভা কি মালার গুণে, শোভা হয় গলার গুণে।"

তুলসী ঈষৎ হেলান মাথাটী নাড়িয়া হাসে।

কিন্তু দশজনের চোখে এটা ভাল ঠেকিল না;—দশজনে দশ কথা কহিল;- গরবিনী মেয়েটীর তাতে কিছু আসিয়া যায় না,- সে যেমন চলে তেমনি চলে,—যেন দুটী তটরেখার মধ্য দিয়া একটী নদীর স্রোত আপন টানে আপনি চলিয়াছে,—কোন তটচারীর উপলনিক্ষেপে সে-প্রবাহ রুদ্ধও হয় না, ক্ষুব্ধও হয় না, স্বচ্ছন্দ গতি!

ননদিনী কিন্তু জ্বলিয়া উঠিল, ননদিনী তুলসীর মৃত স্বামীর ভগ্নী নয়, ননদিনী কাদু তুলসীর সখি!

কাদু গ্রামের মোড়লদের মেয়ে,—বাপের একমাত্র মেয়ে—বাপের যথাসর্ব্বস্ব পাইয়া বাপের ভিটাতেই স্বামী সন্তান লইয়া বাস করে;—গ্রামের সাত কুঁদুলীর এক কুঁদুলী, লোকে বলে সেরা-কুঁদুলী সেই, তাহারই মাথা লোকে আগে খায়।

মুখরা বলিয়া তুলসী সখ করিয়া কাদুর সহিত ননদিনী পাতাইয়াছিল।

তুলসী বলিত—'ননদিনী'—

কাদু বলিত—'বৌ'!

এই কথাটাই বলিতেছিলাম,—কাদু দশজনের কথা সহ্য করিল না, ওই কথা তাহার কাণে উঠিতেই সে জ্বলিয়া উঠিত,—দশজনকে সে শত কথা শুনাইয়া দিত;—তুলসী আসিয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিত।

* * *

তুলসীর তরুণ জীবনের একটা স্বপ্ন ছিল, -এ রূপে সে শ্যামসুন্দরের পূজা করিবে,—বহু ইতিকথা সে শুনিয়াছে,—কত বিগ্রহ প্রাণময় হইয়া প্রাণঢালা পূজা গ্রহণ করিয়াছে—।

আর স্বর্গগতা জননীর চক্ষু ত' আকাশের পার হইতে তাহারই পানে চাহিয়া আছে,—তাহাকে তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখাইবে!

সে তাই দেহকে সাজায়,—পরম যত্নে সাজায়;—রূপের জোয়ার তুলিয়া সে শ্যামসুন্দরের পটপূজা করে,—সন্ধ্যায় মাথার উপর ঘৃতদীপ ধরিয়া আরতি করে। কিন্তু বড় দুঃখ

তাহার—সে ছবি মূক; সে ছবি হাসে না,—অভয় দেয় না, স্বপ্নেও কখনও দেখা দেয় না।—ধারণাতেও সে তাহার হাসি-মুখ কল্পনা করিতে পারে না—;—কত সময় তাহার মনে জাগে,—কাতুর সংসার; স্বামীর সঙ্গে হাসি খেলা, ঝগড়া খুঁটী নাটী;—তেমন ধারা সে যে কল্পনাও করিতে পারে না! কিন্তু সাধ হয়। সময়ে সময়ে মনে হয়—পট না হয়ুক,—বিগ্রহ! প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা দেবতা, সে হাসিবে; বিগ্রহ-মন্দিরে তাই সে ছোটে!

গ্রামে, গ্রামান্তরে, তীর্থস্থলে বিগ্রহমূর্ত্তির সম্মুখে সে প্রাণ ঢালিয়া গান গায়, পাষাণের আঁকা অধর যদি ঈষৎ বিকশিত হয়!

পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে মহাপর্ব্ব, বহু পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, তুলসীর সেখানে যাওয়া চাই। এই বিগ্রহ-দেবতার উপর অসীম ভরসা ছিল তাহার,—এই ঠাকুরই ত' একদিন জয়দেব গোস্বামীর মহা সমস্যার সমাধান করিয়া কালির আখরে প্রেমিকার জয় ঘোষণা করিয়া—নারীচরণে মাথা নত করিয়াছিলেন।

কিন্তু সেখানেও তুলসীর আর ভরসা হয় না;—দেবতা আজও হাসে নাই, পাষাণের আপন ধর্ম্ম লইয়া নির্ব্বাক রহিয়া গেছে;—হাসিবে বলিয়া আর ভরসাও হয় না।

ৗর অভিমান হইল, সে সঙ্কল্প করিল এবার সে গান শুনাইতে যাইবে না!

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন স্নানের সময় ননদিনী তুলসীর দুয়ার খোলা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।—জয়দেবের যাত্রী সকালে রওনা হইয়া গিয়াছে!—

পোড়ামুখীর অসুখ করিল না-কি?—

সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"বৌ!"

তুলসী তখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল,—সে ঘরের ভিতর হইতে কহিল,—"দাঁড়া,—আমারও এই হয়েছে।"

—"তোর শরীর ভাল ত?"

তুলসী কর্ম্মশেষে ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিল—"বলি, ও—ওলো—ননদী,—আজকে হঠাৎ হলি যে তুই এমন দরদী? হঠাৎ শরীরের কথা যে?"

—"তবে যে বড় নাগরের ডাক হেলা করে বেলা বাড়াচ্ছিস্;—জয়দেব যাস্ নি যে?"

—"যাব না।"

—"কেন?"

—"মান করেছি।"

—"মান! সে মান ভাঙায় কে? পাথরের ঠাকুর তার চূড়াও হেলে না, হাতও মেলে না।"

তুলসী স্বপ্নপ্রবণ চোখে শূন্য সম্মুখপানে চাহিয়া কহিল—"দেখি—!"

ঘাটের পথে ননদিনী আবার কহিল—"বৌ, মিছে দেহপাত করিস্ নে,—কলিতে সে হবার নয়।"

তুলসী বোধ করি স্বপ্ন-কল্পনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল,—সে চকিত ভাবে মুখ তুলিয়া কাতুর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল।

কাতু কহিল—"এমন ক'রে তাকাস্ না ভাই, ওই তাকানিকে আমার বড় ভয় লাগে।" তুলসী তবু হাসিল না।

স্নান করিতে করিতে কাতু হাসিয়া কহিল—"তার চেয়ে বৌ আমাকে তোর শ্যাম কর ভাই; আমি তোকে বুকে ক'রে রাখব।"

সে তুলসীর নগ্ন সুন্দর বক্ষে একটী আঙুলের টোকা মারিল।

সে তখন আপন মনে হাত দুটী দিয়া কালো জলে হিল্লোল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছিল—

"সাগরে যাইব, কামনা করিব সাধিব মনের সাধা,
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন তাহারে করিব রা-ধা।"

ফিরিবার পথে তুলসী কহিল—"তাই ভাল ননদিনী!"

—"কি?"

—"তোকেই আমার শ্যাম ক'রব!"

—"মর্।"

—"সন্ধ্যেতে আসিস যেন?"

—"তুই যাস্ ভাই, ছেলেপিলের খাওয়া দাওয়া, চ্যাঁ-ভ্যাঁ, সন্ধ্যেতে আমার আসা হবে না।"

"আচ্ছা যাব। নন্দাই কিছু বলবে না ত?"

—"তাকে রাম মোড়লের মজলিসে তামাক খেতে পাঠিয়ে দোব।" তুলসী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, প্রেমাস্পদের উপর কি স্বচ্ছন্দ অবাধ অধিকার!

কিন্তু দ্বিপ্রহর না যাইতেই তুলসীর কি হইল কে জানে, সে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া, ছোট একটী পুঁটলী বাঁধিয়া ত্বরিতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল, ননদিনীকে ঘরের চাবী দিয়া, তুলসী-মন্দিরে দীপ দিবার কথা বলিবার অবসরও তাহার হইল না। সে চলিয়াছিল জয়দেব।

যাত্রীর দল ভোর বেলা রওনা হইয়া গিয়াছে, দশ বারো ক্রোশ পথ, শীতের দিন, রাত্রে ত' হাঁটা যাইবে না!

তুলসী একাই পথ ধরিল, হোক্ শীতের রাত্রি, দু'পহর পর্য্যন্ত হাঁটিলেই যাত্রীদলকে ধরা যাইবে। পথে তুলসীর মনে হইল, একখানি কাপড় গামছা ছাড়া কিছুই সে আনে নাই। গায়ের কাপড় খানা বাহির করিয়াও ভুলিয়া আসিল; তুলসী একটু হাসিল। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই একখানা গ্রাম পার হইয়া বিস্তীর্ণ মাঠ একখানা, আড়াআড়ি ক্রোশ দুই হইবে, দৈর্ঘ্যে আরও বেশী, আড়াআড়ি এই মাঠখানা পার হইলেই বড় একখানা গ্রাম; ওই গ্রামেই যাত্রীর দল সাধারণতঃ বিশ্রাম করিয়া থাকে। তুলসী ভরসা করিয়া মাঠের বুকেই আগাইয়া পড়িল। সদ্য ফসল-কাটা শুভ্র ক্ষেত, তাহারই মাঝে আইলের উপর দিয়া পায়ে-চলা পথের নিশানা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে; মাথার উপর আকাশে থানা থানা স্তর-মেঘের মেলা দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু তবুও অন্ধকার নয়, শুক্ল পক্ষের দশমীর চাঁদ মেঘের অন্তরালে; তাহারই জ্যোৎস্নার আভায় ভুবন-ব্যাপী একটী স্বচ্ছতায় সব কিছু স্পষ্ট না হোক্, আবছা দেখা যায়;—শীর্ণ পথ, আঁকিয়া বাঁকিয়া কত স্থানে কত শাখা প্রশাখা মেলিয়া কত দিকে চলিয়া গিয়াছে।

তুলসী ঠাওর করিয়া করিয়া চলিয়াছিল।

দূরে পশ্চিমে ওই অন্ধকার রাশির মত গ্রামের বৃক্ষশীর্ষ তাহার লক্ষ্য; কিন্তু সে অন্ধকার-লেখা চারিদিকেই। তাহার উপর শীতের সন্ধ্যায় কোন দূরাগত ধূমরাশি কি কুহেলিকা মাঠের বুকে চারিধারে জমিয়া আছে। যেন ক্ষেতের বুকে সাদা মেঘ নামিয়াছে। তুলসী চলিয়াছেই, মাথার উপরে কাটাকাটা মেঘের ফাঁক দিয়া আলো-আঁধারির খেলা খেলিতে খেলিতে সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও চলিয়াছে; কিন্তু পথ যে ফুরায় না।

পথ ভুল হইল না ত? চারিদিকেই ত' পথ!

তুলসী মাঠের উপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। উপরে চাঁদ তখন প্রায় মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে; রাত্রি ত' অনেক হইয়াছে! চারি পাশে তাকাইয়া দেখে—সে সেই মাঠেরই মধ্যে, গ্রাম সেই দূরে, একটুও আগাইয়া আসে নাই!

কান্না পাইল তুলসীর!

এই সীমা-হারা প্রান্তরে একা সে ভুল পথে ঘুরিয়া মরিতেছে! এমন ভুল সে কেন করিল! কে পথ দেখাইবে? কতক্ষণ দাঁড়াইয়া কাটিয়া গেল কে জানে, সহসা তাহার কানে আসিয়া পশিল কোন পথচারীর কণ্ঠস্বর, পথিক যেন গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

তুলসী চমকিয়া উঠিল, সে ত্বরিত পদে স্বর লক্ষ্য করিয়া চলিল;—ওই ওই মানুষের কায়া ছায়ার মত দেখা যায়।

তুলসী উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"কে—গো!"

আবার ডাকিল—"ওগো কে গো তুমি! একটু দাঁড়াও!"

পথিক শুধু দাঁড়াইল না, শব্দলক্ষ্যে ফিরিয়া কহিল—"কে—কে তুমি?" বলিয়া সে এই দিকেই হাঁটিতে সুরু করিল। আলি-পথের একটী বাঁকের উপরেই দু'জনের দেখা হইল; তুলসীর নয়নে তখন একটা স্বপ্ন-ভরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়া সে দেখিল পথিক যুবা। শুধু যুবা নয়, রূপও আছে তার।

গরবিনী, মর্য্যাদাশালা এই মেয়েটী সে রূপ দেখিয়া কেমন অননুভূত লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

পুরুষটী দেখিল অপরূপ একটী নারী; ঠিক এই সময়েই চাঁদ উঠিল। সলজ্জা তুলসী চোখ দুটী নত করিল; পুরুষটী সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

সহসা শুভ্র জ্যোৎস্না ম্লান ছায়ামাখা হইয়া গেল, চাঁদ আবার মেঘে ঢাকা পড়িল। দৃষ্টি বাধা পাইতেই পুরুষটীর মোহ যেন ভাঙিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবে তুমি?"

তুলসী উত্তর দিতে পারিল না।

* * *

তুলসীর মনে একটী গোপন আশা হইয়াছিল;—কিন্তু এ ত' সে নয়! ছায়াম্লান জ্যোৎস্নাতে শুভ্র ক্ষেতের বুকে তাহার দেহের দীর্ঘ ছায়াখানি বাঁকা ভাবে পড়িয়া আছে;

এ নিতান্তই রক্ত মাংসের মানুষ ; কিন্তু তবু তুলসীর সদ্য-সঞ্জাত বুকভরা লজ্জিত মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হইল না।

পথিকটীর পরিচয়ও পাওয়া গেল,—'সন্ধ্যা-জোল' গ্রামের আথড়ার মোহনদাস মহান্ত।

তুলসী কিন্তু আপন পরিচয় দিতে পারিল না, তাহার চোখ ওঠে না, বুকের ভিতরটা লজ্জায় কেমন দুরু দুরু করে, কণ্ঠে স্বর ফোটে না, সে বহুকষ্টে জানাইল—সে জয়দেবের যাত্রী, যাত্রীর সঙ্গ ধরিতে পারে নাই, মাঠে পথ ভুলিয়া

কথা কয়টা অনুমান করিয়া মহান্তই কহিল,—তুলসী শুধু হুঁ বলিয়া গেল।

মোহনদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা—কি ? সদ্‌গোপ ?"

তুলসী মৃদুস্বরে কহিল,—"না, বোষ্টোম !"

—"বৈষ্ণবী ! তা তোমার,"—মহান্ত প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করিতে পারিল না ;—নীরবে পথ চলিতে চলিতে কহিল—"তা তোমার মহান্ত,—" এবারও প্রশ্নটা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

এ কথার উত্তর তুলসী বহুবার বহু রসিক প্রশ্নকারীকে দিয়াছে,—নতচক্ষে অপূর্ব্ব শীলতার সহিত সে কহিয়াছে—"আমি জাত বোষ্টেমের মেয়ে, আমি বিধবা।" আজ কিন্তু পারিল না—।

মহান্ত আবার কহিল,—"আমিও জয়দেব ধাম যাব, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে,—না পথে আপন যাত্রীর খোঁজ করবে ?"

তুলসী পিছন-পিছন চলিতে চলিতে কহিল—"যাব।"

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে শীত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তার উপরে মেঘলা রাত্রির উত্তর বায়ু,—তুলসী কাঁপিতেছিল ; সে শীতবস্ত্রখানি বাহির করিয়া রাখিয়াও আনিতে ভুলিয়াছে।

মহান্ত কহিল—"তুমি যে শীতে কাঁপছ, গায়ের কাপড় বুঝি পুঁটলীতে আছে। বের ক'রে গায়ে দাও—।"

তুলসী মৃদুস্বরে কহিল—"থাক্।"

—"থাক নয়, গায়ে দাও, এ ঠাণ্ডায় কঠিন অসুখ করতে পারে।"

এবার বাধ্য হইয়া তুলসীকে জানাইতে হইল—সে গায়ের কাপড় আনিতে ভুলিয়াছে।

—তাইত ;—এক কাজ কর, আমার গায়ের কাপড়-খানা—"

—"না—না—থাক্।" আপনারও ত মানুষের দেহ।"

আবার চলিতে চলিতে মহান্ত কহিল—"দেখ—এ ছাড়া আমার কাছে নতুন শীতবস্ত্র দু'খানা আছে, তুমি একখানা নাও, গায়ে দাও—। আমার কথায় না বলো না।"

বলিয়া সে আপন পোঁটলা হইতে দু'খানা শীতবস্ত্র বাহির করিল, একখানা নীল অপরখানা হলদে। নীল গায়ের কাপড়খানা সে তুলসীর দিকে তুলিয়া ধরিল, "নাও, নাও, না ক'রো না,—পথের সাথীকে পর ভাবতে নাই, ধর।"

তুলসীকে অগত্যা লইতে হইল ; নীল গায়ের কাপড়খানি তাহাকে মানাইল ভাল।

মহান্ত তাহার পানে তাকাইয়া কহিল—"না আমার দেওয়া মিছে হয় নি ;—"

আবার চলিতে চলিতে মহান্ত কহিল—"প্রতিবার আমি জয়দেবের বিগ্রহকে শীতবস্ত্র ভেট দিয়া থাকি,—শ্যামচাঁদের কাপড়ের রং হলদে—আর রাধারাণীর গৌরী অঙ্গে নীল বসনই মানায় ভাল।"

তুলসী লজ্জায় মরিয়া গেল।

* * *

জয়দেব হইতে ফিরিয়া তুলসী যেন আর একটী হইয়া গেল। যে অপূর্ব্ব শীলতার মর্য্যাদায় সে স্বচ্ছন্দে পুরুষকে এড়াইয়া চলিত, সে শক্তি যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এখন যেন তাহার বুক কাঁপে।—স্বচ্ছ-বারি প্রবাহিণীর মত জীবনের ধারা তাহার যে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছিল, একটা অচিন্ত্য বাঁকের মুখে আসিয়া সে গতি যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল ;—তেমন সহজ আনন্দে পূজায় ভিক্ষায় দিন গুলি আর কাটিয়া যায় না, সরল আজ জটিল হইয়াছে, সহজ কঠিন হইয়াছে, আনন্দ যেন নীরস হইয়া গিয়াছে।

কানুর চোখে এটা ধরা পড়িল—"তোর কি হয়েছে বল্, ত' ?"

তুলসী নীরব হইয়া রহিল।

কানুও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ঈষৎ সঙ্কোচ ভরে কহিল—"আমায় বল্‌বি না ভাই ?"

কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করিয়া কানু আবার কহিল—"কতক্ষণ হাসিটী ছিল ?"

বিস্মিতা তুলসী কহিল—"কার ?"

—"ঠাকুরের ?"

কানুর মনে হইল এবার তুলসী কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া তুলসী কহিল—"তুই পাগল কানু ?"

—"কেন ?"

তখনও তুলসীর অধরে ম্লান হাসির রেশটী লাগিয়াছিল, —"ঠাকুর হাসে না ননদিনী।"

—"তবে !"

ওই 'তবে' কথাটীর মাঝে যে পরম নৈরাশ্যের সুর বাজিয়া উঠিল তাহার মধ্যে সখীর জন্য যেন অপরিসীম সহানুভূতি লুকান ছিল,—তুলসী তাহা অনুভব করিল;—সে তাহার মনের দুয়ার খুলিয়া গোপন কথাটী না বলিয়া পারিল না।

সে কহিল, "শ্যামের হাসি ঠাকুরের মুখে দেখা যায় না কানু, সে হাসি দেখা যায় মানুষের মুখে।"

কানু অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

তুলসীর হাত দুটী ধরিয়া কানু ব্যগ্রতা ভরে কহিল—"বৌ, আমায় বল্‌বি না ভাই ?"

—"ব'লব,—তোকে না বল্লে আর কাকে বলব ? আয় ওপরে আয়।"

সকল কথা কহিয়া তুলসী কহিল,—"ঠাকুরকে ভক্তি করা যায়, কিন্তু ভালবাসা যায় না ভাই, এ আমি বেশ বুঝেছি। কানু, রূপ যে ভোগ করতে পাবে না, রূপের পূজো তার পাওনা নয়।"

বলিয়া সে খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল,—কানুও নীরব। আঙিনার চারা আমগাছটীর কয়টা শাখা জানালায় আসিয়া পড়িয়াছে, শাখা কয়টার প্রান্তে নতুন মঞ্জরী, গাছটায় এবারই প্রথম মুকুল আসিয়াছে; একটা অতি মৃদু গন্ধ আসিতেছিল।

কানু কহিল—"এখন কি করবি ?"

—"তুই বল, আমি কি করব ?"

—"তোদের ত' এ রীতি আছে।"

—"রীতি আছে, কিন্তু এতদিন ত' এ রীতি মানি নি; এ রীতির কথা নয়, আমার মনের কথা; আমার মন আমি বুঝতে পারছি না ননদিনী, তুই ব'লে দে।"

কানু তুলসীর মুখ পানে চাহিল, দেখিল তাহার চোখের কোলে কোলে জল; সে চোখের কোলে কোলে এই কয়দিনেই ঈষৎ কালো একটা রেখা যেন কে টানিয়া দিয়াছে।

কানু কহিল—"বৌ, তুই তাই কর।"

তুলসীর চোখের জল কোলের বসনে ঝরিয়া পড়িল।

কানু তাহার হাত দুটী ধরিয়া কহিল—"বল, ভাই, তাহ'লে তোর নন্দাইকে আমি পাঠাই।"

—"না সে নিজেই আসবে; সে আমায় এ কথা বলেছিল, আমি জবাব দিতে পারি নি, সেই নিজে জবাব নিতে আসবে।"

কানু সরস পরিহাসে হাসিয়া কহিল—"রাধারাণীর জয় হোক, কলিতে দেখছি বৃন্দে বাদ পড়ল। তা মালা গাঁথতে ললিতেকে ত' চাই না কি ? মালা গেঁথে রাখি ?"

তুলসী সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল—"রাখ, তোকেই ত সব করতে হবে; আমার আর কে আছে ?"

দৃঢ় আলিঙ্গনে তুলসীকে বুকে লইয়া কানু কহিল—"তা হচ্ছে না গো, তুমি আমাকে তোমার শ্যাম করতে চেয়েছিলে, আমি ছাড়ব কেন ?"

বলিয়া মুখরা কানু তুলসীর রাঙা গালে এক চুমা খাইয়া বসিল।

কানুর গালে একটা ঠোনা মারিয়া তুলসী কহিল—"মর্।"

কানু কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, তাহাকে বুকে বাঁধিয়াই দুলিতে দুলিতে কহিল—"একটা গান বল ভাই।"

আলিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়াই তুলসী অতি মৃদুকণ্ঠে, যেন কানুর কাণে কাণে, গাহিল—"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম !"

কিন্তু আত্ম-ভোলা বিভোরার স্বর সে নয়, কোন কিশোরীর অতি সলজ্জ গোপন কথা নিবেদন।

তুলসী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কি করিতেছিল, শীতের রৌদ্রতপ্ত উপভোগ্য মধ্যাহ্ন, আমের মঞ্জরীগুলি এতদিনে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই উচ্ছসিত মধুর মত্ত গন্ধে প্রাঙ্গণখানি উতলা; কে ডাকিল—"রাধারাণীর দরবারে ভিক্ষা পাই।"

তুলসী চমকিয়া উঠিল,—সম্মুখে সেই আম্রছায়াতলে মোহন দাস। তুলসী তাড়াতাড়ি মাথার উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল, কিন্তু সে এক বিপদ, কাপড়ের টানে চুল মুখের উপর আসিয়া পড়ে, চুল সামলাইতে গেলে অবগুণ্ঠন খসিয়া যায়; তুলসী বিব্রত হইয়া পড়িল,—এ তুলসীর প্রথম, অবগুণ্ঠন সে দিত না।

মোহনদাস সম্ভাষণের অপেক্ষা না করিয়াই দাওয়ার উপর একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া কহিল—"ভিক্ষা দাও।"

তুলসীর এতক্ষণে হুঁস হইল, সে একখানি আসন আনিয়া নীরবেই সেই দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল; আসনই অতিথিকে সম্ভাষণ করে, বসিবার নিমন্ত্রণ করে, ভাষণটা অধিকন্তু।

মোহনদাস কিন্তু আসন গ্রহণ করিল না, সে সেই মাটীর উপরে বসিয়াই কহিল—"ভিক্ষুকের সম্মান হ'ল ভিক্ষা, ভিক্ষা না পেলে আসনে তার কি হবে?"

তুলসীকে কথা কহিতে হইল—সে মৃদুস্বরে কহিল—"আপনি বসুন।"

—"বসতে হবে, তুমি অনুরোধ করছ, বেশ;—" বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিল, তারপর আবার কহিল—"তুলসী, রাধারাণী, রাধারাণীর দরবার থেকে কি নিষ্ফল হয়েই ফিরতে হবে?"

তুলসী নীরবে ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিল, কোন উত্তর সে দিল না।

মোহনদাস সেই দাওয়াতেই বসিয়া রহিল, সে তুলসীর সকল ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিল, সে বুঝিল তুলসী মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার মনের মানদণ্ডে ওজন চলিয়াছে—একদিকে স্বপ্ন-কল্পনার ছবি একখানি, অপর দিকে রক্ত মাংসের মানুষ সে; মহান্তের মনে হইল ওই স্বপ্ন-কল্পনার ছবিখানির কাছে রক্ত মাংসের সে যেন বার বার তৃণের মত লঘুভার হইয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মহান্ত উঠিয়া মুক্তদ্বার ঘরখানিকেই সম্বোধন করিয়া কহিল—"জয় হোক তোমার তুলসী, রাধারাণী, তোমার ঠাকুর জয় হোক। আমি আসি।"

মহান্ত অঙ্গনে নামিয়া পড়িল।

"যাবেন না!"

মহান্ত ফিরিয়া দেখিল তুলসী দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিতেছে—"যাবেন না।"

তাহার চোখের কোণে অশ্রুর রেখা দূর হইতেও বোঝা যায়।

তুলসী আবার কহিল—"ফিরে আসুন।"

মহান্ত ফিরিল, এবার সে একেবারে দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তুলসী দ্বার-পথ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"জল খান্।"

ঘরের মধ্যে আসন পাতা, পাশে একগ্লাস জল, আসনের সম্মুখে একখানি রেকাবীতে কয়খানা বাতাসা, কদমা, মণ্ডা, নারিকেল নাড়ু, সরবতি আলু, কলা, পরিপাটী করিয়া সাজান, পাশে একটী খিলিদানীতে দুখিলি পান।

মহান্ত হাসিয়া কহিল—"না, তোমার আতিথ্যের অপমান করবার আমার সাধ্য নাই, ধর্ম্ম তোমার অক্ষয় হোক, রাধারাণীর সৌভাগ্য তুমি লাভ কর।" বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিল।

উপচারের সকল দ্রব্যগুলি নিঃশেষে আহার করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া মহান্ত পান লইতে লইতে কহিল—"এবার আমি আসি।"

তুলসী কথা কহিল না;—

মহান্ত আবার বিনয় করিয়া কহিল—"তুলসী রাধারাণী, সত্যিই কি নিষ্ফল হয়ে ফিরব?"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মোহনদাস পা বাড়াইয়া কহিল—"আসি তবে—"

—'না"

তুলসী লজ্জায় রাঙা হইয়া কোনমতে কহিয়া ফেলিল,—"না।"

*   *   *   *

পুণ্য মাখা পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মাঝে তুলসী আর মোহনদাসের মালা চন্দন হইল।

মালা গাঁথিয়াছিল নন্দিনী, মালা গাঁথিয়াছিল সে ফুলে আর আমের মুকুলে, কহিল—"শুধু আফলা ফুলের মালা পছন্দ হ'ল না, আমের মুকুলে যেমন থরে থরে ফল ধরে, তেমনি ফলে ফলে সংসার তোর ভ'রে যাক;—ছেলে নইলে সংসারের ফাঁক ভরে না।"

সে শুধু মালা গাঁথিয়াই পালা শেষ করিল না,—বাসর জাগাইয়া তবে ছাড়িল।

পরদিন চোখের জলে ভাসিয়া বিদায় দিয়া কহিল,—দেখিস্ একবারে ভুলিস না, আসিস্, ছমাস এখানে, ছমাস সেখানে তা' বলে রাখছি কিন্তু, হ্যাঁ!"

তুলসীও কাঁদিল।

বিদায় লইয়া যখন তাহারা সন্ধ্যা-জোলের আখড়ায় আসিয়া পৌছিল, তখন বেলা আর নাই, গোধূলির আলো ঝিকিমিকি করিতেছে।

তুলসী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছে—এক পাশে জাফরি-বোনা বাঁশের বেড়ায় গাঁদা ফুলের গাছ, সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া অজস্র ফুল; কয়টা বড় ফুলে ন্যাকড়া বাঁধা, বীজ থাকিবে; মাঝে মাঝে কয়টা রাধাপদ্মের গাছে বিশাল হলদে ফুল, কয়টা সন্ধ্যামণির গাছে তখনই সদ্য সদ্য রক্ত রাঙা ফুলগুলি ফুটিতেছে; ওপাশে কয়টা আমের গাছে মুকুলের মেলা, দুইটা সজিনার গাছে ফুলের ফুলঝুরি।

সম্মুখেই দাওয়া, উঁচু, বাঁধান মেঝে বড় মেটে-ঘর একখানি, তারই ঠিক পাশেই সমকোণ করিয়া ছোট ঘর একখানি, তারও বাঁধান মেঝে, আকারে প্রকারে মনে হয় এইটাই বিগ্রহ-মন্দির, দুয়ারের চৌকাঠে সিঁড়িতে সিঁড়িতে আলপনার বিচিত্র রেখার শুভ্র বেশ তখনও জাগিয়া আছে।

তুলসীর অনুমানই ঠিক, মহান্ত গিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল—"প্রণাম কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ!

তুলসী ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

"মহান্ত!"

পিছনে একটা অস্বাভাবিক দুর্ব্বল আর্ত্ত-স্বর ধ্বনিয়া উঠিল!

তুলসীর প্রণাম সম্পূর্ণ হইল না, সে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—ওঘরের দাওয়ার উপরে কঙ্কালাবশেষ জীর্ণা এক নারী, বুকের বসন খসিয়া গিয়াছে, বুকে রক্ত মাংসের কোন চিহ্ন নাই, রোগ নিঃশেষে সব মুছিয়া লইয়াছে, চামড়ার অন্তরালে পূর্ণ প্রকটিত পঞ্জরের মালা, আর তারই অন্তরালে দুর্ব্বহ জীবনের শ্রান্ত স্পন্দন; শীর্ণ মুখখানা লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, চামড়ার নীচে প্রতি হাড়টী দেখা যায়, গণ্ডের কোন অস্তিত্ব নাই, আছে শুধু দুইটা গহ্বর; মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে, যে কয় গোছা আছে তাহারই পিঙ্গল রুক্ষতার মাঝে কালো বর্ণের রেশে বোঝা যায়—তাহার বয়স বেশী হয় নাই; চর্ম্ম আর কঙ্কালের জীর্ণতার মাঝে দপ্ দপ্ করিতেছিল তাহার দুইটা চোখ!

তুলসী শিহরিয়া উঠিল, মহান্তর মুখখানা কঠিন হইয়া গেল, সে কহিল—"তুমি উঠে এসেছ?"

সেকথায় সে কর্ণপাতও করিল না, তেমনি আর্ত্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"ও—কে?"

দিয়া সে যেন তুলসীর রূপ-সম্ভার ভরা সব্ব অবয়ব গ্রাস করিতেছিল।

মহান্ত কহিল—"কেন, তুমিই ত আমায় বলেছ,—"

মেয়েটী পাগলের মত দুহাতে আপন জীর্ণ পঞ্জরে আঘাত করিয়া কহিল—"না, না, না, বলি নাই, বলি নাই আমি, সে আমি মিথ্যে বলেছি, তোমার মন রাখতে, মন বুঝতে বলেছি। হা হা করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

তুলসী থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, মহান্ত তুলসীর হাত ধরিয়া কহিল—"তুলসী! তুলসী!"

তুলসী দেবতার ঘরের খুঁটাটা ধরিয়া কহিল—"ওকে দেখ তুমি, ওকে দেখ—পড়ে যাবে হয় ত।"

মহান্ত তাড়াতাড়ি উন্মাদিনীকে ধরিতে যাইতে যাইতে কহিল—"তোমায় ত' এ কথা বলেছিলাম তুলসী।"

সত্য, ইহার কথা মহান্ত তুলসীকে বলিয়াছিল, কিন্তু এমন বলে নাই। জয়দেবে যখন প্রথম তুলসীকে সে ভিক্ষা জানায় তখনই বলিয়াছিল। বলিয়াছিল,—মরণ পথের যাত্রী একস্ত্রী তাহার বর্ত্তমান, বহুদিন ধরিয়া সে শয্যা-শায়িনী, তাহার সেবা, দেবতার সেবা দুই লইয়া মহান্ত বিব্রত; সাধন-পথের সঙ্গিনী ত' দুদিন পরেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে,—এখন যদি তুলসী তাহাকে দয়া করে তবে রুগ্নার সেবাও হয়, আর সেও হাসিমুখে তাহাকে অনুমতি দিয়েছে।

মহান্ত মেয়েটীকে ধরিয়া কহিল—"ভামিনী, ভামিনী—!"

মেয়েটীর নাম গৌর-ভামিনী।

ভামিনী তাহার দুটী পায়ে ধরিয়া কহিল—"দুটো দিন অপেক্ষা করতে পারলে না গো,—দুটো দিন আর দুটো দিন, আমি ত' বাঁচব না,—দুদিনও হয় ত বাঁচব না,—দুদিনের তরে এ তুমি কি শেল হান্‌লে গো!" আবার সে হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এতখানি কিন্তু তুলসীর ভাল লাগিল না, রক্তমাংসের দেহ হারাইয়াও রক্তমাংসের মানুষ লইয়া এ কি কাড়াকাড়ি! তবুও ওই নারীটার মর্ম্মভাঙা ক্রন্দনে সে বিচলিতও হইতেছিল,—তাহার অন্তরের শাশ্বত নারী সমবেদনার বেদনায় সারা হইয়া গেল,—সে ধীর পদক্ষেপে আসিয়া ভামিনীর পদতলে বসিয়া—মিষ্টকণ্ঠ আরও মিষ্ট করিয়া কহিল—"আমার ওপরে রাগ করলে দিদি!"

"—বেরো, বেরো, দূর হ, তুই দূর হ,—" বলিয়া ভামিনী তাহার কঙ্কালসার দেহে যতখানি শক্তি ছিল হানিয়া তুলসীকে লাথি মারিয়া বসিল,—অতর্কিতা তুলসী নীচে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। মহান্ত হাঁ হাঁ করিতে করিতে তুলসী আপনিই উঠিয়া বসিল,—"ওকি, তোমার ভুরু থেকে রক্ত পড়ছে যে, —" মহান্ত ভামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া তুলসীর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ওদিকে ভামিনীর চোখ তখন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

সে দৃষ্টি তুলসী দেখিল, সে মৃদু হাসিয়া ভ্রূতে বুলান রক্তমাখা হাতখানা দেখিতে দেখিতে কহিল—"না—না, লাগে নাই, লাগে নাই আমার,—যাও তুমি দিদিকে দেখ, রোগা মানুষ,—আমি নিজেই ধুয়ে ফেল্‌ছি।"

এ পাশ ও-পাশ চাহিতেই নজরে পড়িল, একটী চারা আমগাছের তলে খানিকটা বাঁধান জল ফেলিবার জায়গা,—বালতীতে জল, তুলসী জলে ভ্রূর রক্ত ধুইতে ধুইতেই শুনিল—ভামিনী বলিতেছে,—"না না, তুমি এমন ক'রে তাকিয়ো না, রাগ ক'রো না,—আর দুটো দিন, দুটো দিন তুমি ওকে পর ক'রে রাখ,—কথা ক'য়ো না,—আদর ক'রো না,—দুটো দিন গো—, দু দিন বই আর আমি বাঁচব না,—সত্যি বলছি।"

* * *

সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য কীর্ত্তন করিতে হয়;—মহান্ত তুলসীকে ডাকিল—"এস আমার প্রভুকে গান শোনাও।"

তুলসী কি ভাবিয়া কহিল,—"আজ থাক্‌।"

—"না না, এ আমাদের নিয়ম, আর অনেকে এসেছে, তুলসীর গানের কথা দেশ-দেশান্তরে রটেছে।"

তুলসী কহিল—"না, দুদিন পরেই শুন্‌বে, দিদির অবস্থাটা ভাব;—আমার গান শুন্‌লে সে হয়ত রেগে যাবে।"

মহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"হুঁ।"

তুলসী কহিল—"তুমি যাও, নাম আরম্ভ কর গে, নামের সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি দেখি দিদির একটু সাবু বার্লী করতে হবে।"

মহান্ত উত্তেজিত স্বরে কহিল—তুলসী, আগে দেবতার সেবা, তারপর মানুষ, এস তুমি—।"

দৃঢ়স্বরে তুলসী কহিল—"আমারও ছিল তাই মহান্ত, আজ আমার ধর্ম্ম উল্টো—সে ত তুমি জান।" বলিয়া সে ধীর পদক্ষেপে ওদিকে চলিয়া গেল;—

মহান্ত আপন মনেই সহসা বলিয়া উঠিল—"মরবেও না, আমারও অশান্তি ঘুচবে না।"

তুলসী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভর্ৎসনা পূর্ণ কণ্ঠে কহিল—"ছিঃ।" কথাটা তাহার কাণে গিয়াছিল।

ঘরের মধ্য হইতে একটী দুর্ব্বল ক্ষীণ অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল।

মহান্ত এতটুকু হইয়া চলিয়া গেল।

কীর্ত্তন ভাঙিয়া গেলে মহান্ত আসিয়া ডাকিল, "তুলসী" —তুলসী তখন ভামিনীর পাশে বসিয়া ছিল, ভামিনীর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, কিন্তু তখনও নিদ্রাতুরার বক্ষ ভেদিয়া মাঝে মাঝে ক্রন্দন-কাম্পিত দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল।

তুলসী সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

মহান্ত কহিল—"নাও।"

মহান্তর হাতে একটা ডালায় ফুল। তুলসী হাত বাড়াইল, কিন্তু জিজ্ঞাসু নেত্রে মহান্তর পানে চাহিয়া রহিল,—কি হইবে ফুলে?

মহান্ত হাসিয়া কহিল—"ফুল-শয্যায় ফুল চাই না?"

তুলসী হাতের ডালাটী তেমনি ভাবেই ধরিয়া রহিল,

বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তা হয় না মহান্ত।"

চমকিয়া মহান্ত কহিল—"কেন?"

—"দিদির কথাগুলোর কি কোন দামই নেই মহান্ত?"

মহান্ত তুলসীর হাত ধরিয়া কহিল—"তুলসী, আজকের দিন ত' ফিরে আসবে না, এটা যে একটা সাধের দিন।"

—আমারই কি নয় গো? কিন্তু সাধের জন্যে কি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারা চলে?

মহান্ত একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তুলসী, তুমি কি পাথর!"

তুলসী হাসিয়া কহিল—"পাথর হ'লে ত পাথরেই মন উঠত গো! মানুষ বলেই ত মানুষের ওপর মায়া হচ্ছে।"

—"আচ্ছা থাক্," বলিয়া মহান্ত দাওয়ার উপর হইতে নামিয়া গেল, তুলসী হাসিয়া কহিল—"রাগ হল বুঝি?"

মহান্ত উত্তর করিল না।

তুলসী ললিত ভঙ্গীতে দেহ দোলাইয়া কহিল—"আচ্ছা, তা বলে রাগ আমি ভাঙাব না, সে বলে দিচ্ছি, তোমাকেই ভাঙতে হবে।"

"মহান্ত!" ভামিনীর কণ্ঠস্বর।

তুলসী তাড়াতাড়ি ভামিনীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, ভামিনী তাহাকে দেখিয়া আবার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কহিল—"না, না, সরে যাও, সরে যাও তুমি।"

সভয়ে তুলসী বাহির হইয়া আসিয়া মহান্তকে কহিল—"যাও, ডাকছে তোমায়।"

মহান্ত একান্ত অনিচ্ছায় বিরক্তিভরে ভামিনীর শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, ভামিনী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে কহিল—"আজ তোমার ফুলশয্যে, তোলা বিছানার মধ্যে তোষক বালিস—"

মহান্ত বাধা দিয়া কহিল,—"না না, ভামিনী, সে কি হয়, —ও তোমার কাছেই শোবে।"

ভামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"না, আর আমার অপমান করো না মহান্ত; ওর দয়া আমাকে গ্রহণ করিয়ো না, তোষক বালিস নাও গে, কিন্তু আমার লেপখানা যেন নিয়ো না।"

মহান্ত উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু একটা কোমল শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—দুয়ারের সম্মুখে তুলসী, কথাটা আর বলা হইল না তাহার, কিন্তু ললাটের কুঞ্চনে, নাসিকার স্ফীতিতে তাহার কটু মনের পরিচয় গোপন রহিল না। সে ভামিনীর মাথায় হাতটা বুলাইতে লাগিল, হাত অল্প ঠেলিয়া দিয়া ভামিনী কহিল—"থাক্।"

মহান্তও চলিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর মহান্ত তামাক খাইতেছিল, তুলসী কহিল—"তোমার বিছানা দিদির ঘরে।"

মহান্ত চমকিয়া উঠিল,—তুলসী আবদারভরা কণ্ঠে কহিল—"না বলতে পাবে না, এ আমার প্রথম আবদার!"

মহান্ত কটুভাবে কহিল—"না, রোগীর গন্ধে—"

তুলসী শান্তভাবে কহিল—"পাষাণের ওপর ভালবাসা গেছে মহান্ত, মানুষের ওপর ভালবাসাটা আর ঘুচিয়ে দিয়ো না।"

মহান্ত তুলসীর মুখ পানে চাহিয়া কহিল—"তোমার জয় হোক্।"

তুলসী হেঁট হইয়া মহান্তের পায়ের ধুলা লইল, লোলুপ পুরুষ অবনত নারী-দেহখানিকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বনে অধর ভরিয়া দিল, সবল পেষণে পিষ্ট করিয়া ফেলিল যেন; তুলসীরও চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছিল, সহসা সে কহিল—"ছাড।"

মহান্ত হাসিয়া ছাড়িয়া দিল, তুলসী কহিল—"যাও, শোও গে, যাও; যে মরতে বসছে, তাকে আর ঠকিয়ো না।"

বলিয়া সে এপাশের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে তুলসী ঘরে ঝাঁটা বুলাইতে ভামিনীর ঘর ঢুকিল, ঝাঁট দিতে দিতে ভামিনীর পানে তাকাইতেই দেখিল, ভামিনী তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। তুলসীর ভয় হইল, ভামিনী কখন উত্তেজিতা হইয়া উঠিবে!

"তুলসী!"—ভামিনী তাহাকে ডাকিতেছে—

ভামিনী আবার কহিল—"তোমার নাম ত তুলসী?"

তুলসী মৃদুস্বরে কহিল—"হাঁ।"

ভামিনী কহিল—"শোন, আমার কাছে এস, ভয় নাই।"

তুলসী কাছে আসিয়া বসিল, সে তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল—"ভয় কি দিদি ?"

ভামিনী তাহার সে কথা শুনিল না, সে তাহাকে দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"রূপ একদিন আমারও ছিল।"

তুলসী চমকিয়া উঠিল; ভামিনী একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, "তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব বলেই ডেকেছি; আজ ছমাস বিছানা পেতেছি, ছমাস আজ একা প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছি; বড় সাধ ছিল বোন,—তা সে সাধ তুই মেটালি। আশীর্ব্বাদ করি তুই যেন চিরদিন তাকে পাস, চিরদিন একা-একা।"

ভামিনী সেইদিনই সন্ধ্যায় দেহ রাখিল, যেন ঐ আকাঙ্ক্ষাটুকুই তাহার জীবনকে জীর্ণ পঞ্জরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

বহুদিনের রোগী প্রায় সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করে, কিন্তু ভামিনী মরিল যেন বন্দোবস্ত করিয়া। বৈকালের দিকে শ্বাস উপস্থিত হইতেই মহান্ত কহিল—"ভামিনী, চল তোমাকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাই, প্রভুকে একবার দেখ।"

ভামিনী হাত নাড়িয়া কহিল—"না, দেবতার সেবা আমি অনেক করেছি, কিন্তু দেবতা আমায় কি দিলে? দেবতা নয় মহান্ত,—মহান্ত তুমিও না, এসময় তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। একা থাকি আমি, আমি ত' আজ একাই।"

ভামিনী পাশ ফিরিয়া শুইল, আবার কহিল—"তুলসী।"

তুলসী কাছে আসিয়া কহিল—"দিদি!"

—"তুই নাকি ভাল গাইতে পারিস, দেশ-বিদেশে তোর গানের নাম, একটা গান শোনা না ভাই।"

—"কি গাইব বল ?"

ভামিনী হাসিয়া কহিল—"বলে দিতে হবে; বেশ সেই 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল'।"

"কিন্তু সরে, সরে যা, ওই পেছনে বসে গা'।"

আপন জীবনের সমস্ত তিক্ত রসটুকু হতভাগী নিঃশেষে পান করিয়া তবে গেল।

* * * *

তার পর ?

এর পর একটা অবিচ্ছিন্ন মিলনের প্রগাঢ় আনন্দ।

ওই আনন্দের মধ্য দিয়া দিবারাত্রিগুলি স্বচ্ছন্দ শ্বাস প্রশ্বাসের মত বহিয়া যায়—

মিলনের আবেশে চোখের নিমিখ নামিয়া আসে, সে নিমিখ খুলিতে খুলিতে রাত্রি আসে, রাত্রি কাটিয়া প্রভাতের পাখী কলরব করিয়া উঠে।

হাসি, গান, আনন্দ, মান-অভিমান, অনুনয়, অভিনয়, অশ্রু, পুনর্ম্মিলন, আবার হাসি, আবার আনন্দ।

ছুটী তরুণ নর-নারীর জীবনের যা লীলা তাই, সেই পুরাতন জীবনে সে বারে বারে নবীন হইয়া দেখা দেয়।

তুলসী মাঝে মাঝে আপন গ্রামে যায়, মহান্তের আপত্তি টেঁকে না, সে ধরিয়া বসে—"আমি যা—ব; কাত্রর সঙ্গে কত দিন দেখা হয়নি, ননদিনীর জন্যে মন কেমন করছে।"

মহান্ত কহে—"আমার চেয়ে ননদিনী তোমার বড় হ'ল ?"

—"হ্যাঁ হল, কি বলছ বল ?"

মহান্ত আর কথা কয় না, তুলসী বকিতে বকিতে আপন গৃহ কর্ম্ম করিয়া যায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া মহান্তের সম্মুখে ঝাঁকিয়া বসিয়া কহে—"কি বলছ তা বল বাপু; ও চুপ ক'রে থাকা আমার ভাল লাগে না, আমি কিন্তু কাল যাব।"

তুলসীর যেন একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সীমারেখা-বদ্ধ প্রবাহিণীটী আর নয়, তাহাতে সার্থকতার জ্যোৎস্নার জোয়ার ধরিয়াছে, কুল ছাপায়-ছাপায়!

মহান্ত কহিল—"যখন যাবেই, তখন আর কি বলব বল ?"

তুলসী ঝঙ্কার দিয়া কহে—"ননদিনীর হিংসাতেই পাট-পাট; ননদিনী যেন ওঁর সতীন!"

মহান্ত আর কথা কয় না;—তুলসী কিন্তু তাহাতে ভয় পায় না, পরদিন প্রাতেই কাপড় বাঁধিয়া কহে, "চল্লাম আমি।"

গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ মাঠ,—সেই মাঠখানি; এই মাঠেই দুজনের তাহাদের প্রথম দেখা হইয়াছিল, তুলসী সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল, অধরে মৃদু হাসি আসে; পিছন হইতে মহান্ত কহিল, "এই আমাদের যমুনা-পুলিন!"

মহান্ত যে আসিতেছে, একথা তুলসী জানিত, তবু সে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহে—"তুমি !"

মহান্ত গান ধরে—"পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গড়ল কে ?"

জনহীন প্রান্তরে তুলসীও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে—

"পীরিতি পীরিতি, কি রীতি, মূরতি, হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গড়ল কে ?"

মাঠের প্রান্তে আসিয়া তুলসী কহে, "এইবার তুমি যাও। বেলা অনেক হল, ফিরতে দেরী হবে ; আচ্ছা, কি আসবার দরকার ছিল বল ত ?"

মহান্ত কহে, "চল, চল।"

তুলসী কহে—"না, তুমি কোথা যাবে ? তবে যাব না আমি

—"কেন ?"

—"তোমার ঠাকুরের সেবা—"

"— সে আমি বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি।"

—"তা হোক, তোমার যাওয়া হবে না, লোকে বলবে কি ? ফেউ-এর মত পিছু পিছু—ছিঃ ; চল বাপু, আমিই ফিরছি, আমার গিয়ে কাজ নাই।"

কোন বার সেখান হইতেই তুলসীকে ফিরিতে হয়, কোন বার মহান্ত ফিরিয়া যায়, বলিয়া যায় "তিন চার দিনের বেশী যেন থেক না।"

গ্রামে আসিয়া ননদিনীর দুয়ারে খঞ্জনীর ঝঙ্কার তুলিয়া তুলসী কহে—"খোকা হোক ননদিনীর, ভিক্ষা পাই গো !"

কাদু ঘর হইতেই ঝঙ্কার দিয়া বাহির হইয়া আসে, "তোর হোক, তোর হোক, তোর হোক্। মর পোড়ামুখ, মর ; রঙ্গ দেখ কেনে !"

তুলসী গান ধরে—

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
চোখের বালি—ননদী হে—।"

কাদু কয়, "থাক্ বাবা, আসতে পারলি ?"

তুলসী সলজ্জ ভাবে কহে—"যে কাজ ভাই, ঠাকুরের সেবা, অতিথ বোষ্টোম, একদিন না থাকলে চলে না।"

ননদিনী ঝঙ্কার দিয়া কয়,—"থাক্ থাক্ আর খুব হয়েছে।"

তুলসী ধরা দেয়, সে চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

ননদিনী কহিল—"তোর নন্দাইকে পাঠালাম—"

সবিস্ময়ে তুলসী কহে—"কবে ?"

—"এই সে দিন।"

—"কই না, যায় নি ত'।"

"—গিয়েছিল, কিন্তু চাষার আবাও ত' পথে মহান্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেইখান থেকেই ফিরে এসেছে, কয়েত-বেল গুড় দিয়েছিলাম, আর বলে দিলাম—বোব সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে বলে এস, তা পথে মহান্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেইখান হতেই কত্তা আমার ফিরেচেন, আলুতে মাটী দিতে হবে, রাজ্যপাট বয়ে যাচ্ছিল।"

তুলসী গালে হাত দিয়া কহিল—"হে-ই মা-গো, আমাকে যদি এক কথা বলে থাকে, যাই একবার দাঁড়াও না। আমাকে বল্লে কি—এ গাঁয়ের একটা লোক কোথা গেল এই পথে, তা দিয়ে গেল, ননদিনী দিয়েছে তোমার।"

ওদিকে কাদুর ছোট ছেলেটা কাঁদিয়া উঠে, কাদু ছেলেটাকে আনিতে যাইতে যাইতে কহিল, "ওই দেখ, কাল্দের জ্বালায় একদণ্ড অবসর আছে, না স্বস্তি আছে ;— যাই পোড়ামুখো দাঁড়া।"

রাত্রে কাদু তুলসীকে সঙ্গে করিয়া শুইতে যায়। ঘরে পাশাপাশি দুইটী বিছানা, কাদু কোলের ছেলেটীকে লইয়া একটীতে হাত-পা মেলিয়া দিয়া কহিল—"শুয়ে পড়, আঃ হাত পা ছড়িয়ে বাঁচলাম ! শুয়ে পড়, দাঁড়িয়ে রৈলি যে !"

তুলসী প্রবল আপত্তি তুলিয়া কহিল—"না না, তুমি এখানে শুতে পাবে না, স্বস্থানে পরমেশ্বরী, যাও বাপু আপনার ঘরে যাও।"

ননদিনী কহিল—"ভয় নাই, সে বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, ছেলেগুলোর কাছে আজ ছেলের বাপ থাকবেন, আজ তার পালা।"

—"না না কি মনে করবেন বলত ?"

কাদু হাসিয়া কহিল—"মনে করবার তার অবসর নাই, —এতক্ষণে দেখ গে তার অর্দ্ধেক রাত, ওই ওই, শোন্ না নাক ডাকছে,—ওই ঘড়র্-ঘোঁৎ, ঘড়র্-ঘোঁৎ, আবার শোন্ না, এক একবার হবে 'পট পট পট ঘড়র্-ঘোঁৎ ফুস্'—এই হ'ল—বলে—অ-অ ও-ই।" কাদু হাসিয়া উঠিল।

তুলসীও হাসিল, হাসিতে হাসিতেই কহিল,—"কাল ত মনে হবে, তখন!"

কাদু হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিল, "ভয় নাই সখি, আমাদের হ'ল চাষার মরদ, চাসে খাটা আকাট মুনিষ, ওরা চেনে শুধু মাটী আর মুড়ির বাটী, তারপর যা কিছু সব ফাউ, হ'লেও হয়, না হ'লেও হয়। আমাদের নটবর নয়, আর সে বয়েসও নাই।"

তুলসী কহিল—"মর্।"—এখন তোর কথা বল্, এখন দুদিন থাকবি ত? এমাস তোকে ছাড়্ছি না কিন্তু, এ মাসেরই আর ক-দিন আছে, আর ত' দশটা দিন।"

তুলসী কহিল—"বাপ্ রে, এই বলে আসতে দেয় না, ঝগড়া করে এলাম; বল্লাম ননদিনী কি তোমার সতীন, বলে কি—বলে হুঁ। আমি ঝগড়া করে চলে এলাম, তা পথে পিছু ফিরে দেখি পিছু পিছু আসছে; কত করে তবে তাড়ালাম, হয়ত কালই আবার এসে হাজির হবে।"

কাদু খুব হাসে, তারপর জিজ্ঞাসা করে—"এখন বল ত সখি চাঁদ-বদনী, মানুষ ভাল না দেবতা ভাল?"

তুলসীও হাসিয়া কহে,—"মানুষের জ্বালায় কিন্তু অস্থির ভাই, উদ্ভুট উদ্ভুট সখ, বলে দোলের সময় দোল্না টাঙিয়ে দুজনে দোল খাব; ঝুলনে ঝোলনায় ঝুলনে চাপতে হবে, রাসে সারারাত জাগতে হবে; অস্থির ভাই! কোন্দিন শুন্বি, দোল্না ভেঙে হাত পা ভেঙে পড়ে আছি।"

কাদু কোন সাড়া দেয় না, তুলসী ডাকে, "কাদু!"

কাদু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তুলসীর কিন্তু ঘুম আসে না, নতুন জায়গা বলিয়া বোধ হয়।

তুলসীর কথা পরদিনই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অপরাহ্নে মহান্ত আসিয়া হাজির, আসিয়াই সে দশ কথায় আসর জমাইয়া তুলিল, যেন কুলীনের জামাই—"প্রভুর ভোগ কাল ভাল হয়নি, অতিথ এসে মুড়ি চিঁড়ে খেলে, মানুষ নইলে কি সেবা চলে?"

কাদু আড়াল হইতে কহিল—"বাকী থাকল যে,—রাতে ঘুমোবার উপায় নাই, বিছানায় ছারপোকা হয়েছে, রোদে দেওয়া হয় নি; মশা হয়েছে ঘরে ধূপ পড়ে না, চালে কাঁকড়, পানে চূণ, বলুন সবগুলো, বাকী থাকল যে!"

তুলসী চিমটী কাটিয়া কহিল—'মর্!'

কাদুর মুখে হাত দেয় কে? সে চিমটী আমলেও আনিল না, তেমনি ভাবে সে কহিল, "তা বেশ, আজ রাতটা এখানে থাকা হোক, আমাদের এখানে মশা নাই, আর রূপের ধূপ ত ধূপদানীতে জ্বলছেই। চালও বেছে দোব, পানেও চূণ লাগবে না।"

মহান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহে—"না না দেব-সেবা।"

কাদু কহিল—"তা বেশ ত, আপনি আজ যেতে পারেন, রেতে ত বৌর যাওয়া হয় না, রাত্তে মাঠের মধ্যে ওকে আবার ভূতে পায়।"

মহান্তকে হাসিতে হয়।

তুলসীকেও পরদিন যাইতে হয়।

*　　*　　*

বোধ হয় বছর আষ্টেক পর; তুলসী অনুভব করিল দিনগুলি বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দিনগুলির ধারারও কেমন যেন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমন ছল ছল স্বচ্ছন্দ গতিতে দিন আর বয় না, কেমন যেন তার মন্দ গতি—উপলাহত প্রবাহের মত ব্যাহত ধারা।

তুলসী বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সেদিন মহান্ত খাইতে বসিলে সে কহিল—"চল বাপু কোথাও যাই।" মহান্ত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তুলসী কহিল—"আমার ভাল লাগছে না বাপু, চল বৃন্দাবনে যাই।—"

মহান্ত শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল—"কত খরচ জান,—ভিখেরীর ঝুলিতে তা' নাই।"

তুলসী কহিল—"বোষ্টোম হলেও ত' তুমি ভিখেরী নও।"

মহান্ত পরিষ্কার কহিল—"আমার বাপু টাকাকড়ি নাই।"

তুলসী ম্লান হইয়া গেল,—কিছুক্ষণ পর সে যেন একটা উপায় খুঁজিয়া পাইল—পরম উৎসাহ-ভরে সে কহিল—"কাজ কি আমাদের টাকায়, চল ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়ি, পুঁজি আমাদের গান, পদব্রজে ব্রজে চল—।"

মহান্ত খাইতে খাইতে কহিল—"আমার বাবা এলেও তা' পারবে না।"

তুলসীর মুখের দীপ্তি—মহান্তের কথার ফুৎকারে নিভিয়া গেল,—ক্ষণপরে সে আবার কহিল—"তবে নবদ্বীপ চল,—সে খরচ ত' বেশী নয়।"

মহান্ত পরম বিরক্তিভরে কহিল—"বাজে ব'কো না বাপু, যত সব—হুঁ।"

তুলসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"কিন্তু পাঁচ বছর আগে হ'লে তুমি আমার কথা এমন ক'রে ফেলতে পারতে না মহান্ত!"

সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মহান্ত খাইতে খাইতে আপন মনেই কহিল—'হুঁঃ'

তুলসী যেন এর পর হইতে সজাগ হইয়া উঠিল,—মহান্তের সেবা যত্নের পারিপাট্য যেন বাড়িয়া গেল।

নারীর এটা স্বভাব, মান অপমান বিচার করিয়া সে করে না,—কিন্তু সে করে।

মহান্তও যেন একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তবু তুলসীর মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ঘুরিয়া মরে, এ প্রসন্নতা ত' তাহার কাম্য নয়, এ প্রসন্নতা ত' দেবতার পূজা করিয়াও পাওয়া যায়, অতিথির কাছে পাওয়া যায়, এক মুষ্টি ভিক্ষার বিনিময়েও ত' এ প্রসন্নতা ভিক্ষুকের কাছে পাওয়া যায়। সে যাহা চায়—সে ত পূজায় মেলে না, এই মহান্তই ত' একদিন উপযাচক হইয়া তাহাকে তাহা দিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে কত কথা মনে আসে,—মনে পড়ে—ননদিনীর জীবনের কথা,—সেদিন ননদিনীর বাড়ী গিয়াছিল সে, সেখানে সে দেখিয়াছিল—দুটী প্রাণী নীড়-রচনায় ব্যস্ত, দু'জনেই আপন আপন কাজ লইয়া ফেরে, যেন দু'টী মৌমাছি, অবিরত মধুসঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, কেহ কাহারও পানে তাকায় না, কিন্তু সে অবহেলা নয়,—তাহার জন্য কাহারও অভিমান নাই, বেদনাও নাই!

কাদু বলিয়াও ছিল—"সখি রে সে দিন চলে গেছে।"

তুলসী একটু আশ্বস্ত হইল, দুশ্চিন্তায় যেন একটা ছেদ পড়িল, সে মনে মনে আপনাকেই কহিল—"সখি রে, সেদিন চলে গেছে।"

তুলসী পাকা রকমে গৃহিণী হইয়া উঠিতে চাহিল। সঞ্চয়, সঞ্চয়, সঞ্চয়—নীড়খানি দিনে দিনে অপরূপ করিয়া তুলিতে চাহিল,—আঙিনায় ধানটী পড়িয়া থাকিলে সে তাহা নখের কোণে খুঁটিয়া তোলে, পথ হইতে গোবর আনিয়া ঘরে তোলে—একগাছা কাঠি পড়িয়া থাকিলে তাও লইয়া আসে, জ্বালানীর সাশ্রয় হইবে। মন মানিল একরূপ,—কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, এত করিয়াও ধরণীর দিবারাত্রিগুলি তবু দীর্ঘ,—তবু বিরস!

তুলসী ভাবে,—ননদিনীর অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থাটা খতাইয়া দেখে, কোথায় নীড়ের মধ্যে ছিদ্র পড়িয়াছে, যে ছিদ্র দিয়া সকল মধু সকল রস ক্ষরিত হইয়া যাইতেছে!

কাদুর ছেলে গুলিকে লইয়া অনেক কাজ, তাহাদের লইয়া অবসর নাই। তাহার দু'টী কথা তাহার মনে পড়িল, যেদিন সে আমের মুকুলে মালা গাঁথিয়া দিয়াছিল সেদিন সে বলিয়াছিল—'ছেলে নইলে সংসারের ফাঁক মরে না!'

আর একদিন সে বলিয়াছিল—"ওই দেখ্ কালদের জ্বালায় অবসর আছে না স্বস্তি আছে!"

কিন্তু পরিপূর্ণ একটা আনন্দ আছে!

তাহার স্বামীও সেদিন ওই ছেলের পাল বুকে করিয়া নিদ্রা গেল, নিশ্চিন্ত সুখ-নিদ্রা, আনন্দ নহিলে কি সে আসে!

আর কাদুর স্বামীর উদাসীনতার মাঝে একটা আনুগত্য আছে, একটা নির্ভরতার মাধুর্য্য আছে, নিবিড় একটী আত্ম-সমর্পণ।

নিবিড় আত্ম-সমর্পণ—ওই বস্তুটীতেই কাদুর জীবনের সার্থকতা, আনন্দ! ওইটুকুরই অভাব তুলসীর; ওইটুকুই সব!

এই অভাবটাই প্রত্যক্ষ, সকল বেদনার হেতু, তুলসীর মনে পড়িল দেবতার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়া একদিন এই শূন্যতার বেদনা হেতুই সে মানুষের মাঝে তৃপ্তি খুঁজিয়াছিল।

তুলসী ব্যাকুল অন্তরে সেই হারাণো দিন ফিরিয়া পাইতে চাহিল; মানুষ তাই চায়, কিন্তু হায়রে, দিনের পর আবার দিন আসে সেই আলো সেই কলরোল লইয়া, কিন্তু মানুষের যে দিনটী যায় সে আর আসে না।

তুলসী সর্ব্ব দেহ মন দিয়া মানুষকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিল, ঐ মানুষটীই তাহার সে হারাণো দিন ফিরাইয়া দিতে পারে।

দোলের দিন আবার সে রংএর খেলা খেলিতে চায়,— রাসের দিন সারা রাত্রি জাগিয়া গান করিতে চায়। জীবনে সে লীলা চায়।

শ্রাবণ মাস, সম্মুখে ঝুলন পূর্ণিমা, মেঘাচ্ছন্ন শুক্ল পক্ষের বর্ষণমুখর রাত্রি; মেঘ-বারিত জোৎস্নার আভার স্বচ্ছতায় অবিরত ধারাপাতের ঝর ঝর ধারা কুহেলির মত দেখা যাইতেছে। রাত্রিটী তুলসীর বড় মধুর লাগিল।

মহান্ত সেদিন বাড়ীতে নাই, তুলসী কালও এমনি একটী রাত্রি কামনা করিয়া মনে মনে একটী সংকল্প করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। দেব-মন্দিরে 'ঝুলনা' ঝোলান হইয়াছে, যুগল বিগ্রহ ঝুলনে অধিষ্ঠান হইয়াছেন, এই শয়ন-মন্দিরে তাহারাও ঝুলনা ঝুলাইবে, তাহারাও দুজনে ঝুলনে দোল খাইবে— দে দোল, দে দোল!

এই সুখ-কল্পনায় তুলসী বিভোর হইয়া উঠিল।

বর্ষার শ্যাম-শোভার মত সুশ্যাম সাড়ীতে দেহখানি সে বেড়িবে, ঘন কুঞ্চিত কেশদাম তাহার এলান থাকিবে, সজল হাওয়ায় এলোমেলো উড়িয়া সে চুল মহান্তের মুখের উপর পড়িবে; নাকে সে এমন রসকলিটী কাটিবে তেমনটী বোধ হয় আজও কখনও হয় নাই!

মহান্তের গলায় দিবে গন্ধরাজের মালা, সে লইবে বেলার মালা, কাণে দুটী করিয়া রজনীগন্ধা, চুলের উপর তারা-ফুলের মত ছোট ছোট যুঁই ফুলের মালার বেষ্টনী!

কিন্তু এমন স্বচ্ছ বর্ষণমুখর সুন্দর রাত্রিটী কি কাল হইবে? তুলসীর আক্ষেপ হইতেছিল,—আজ যদি সে থাকিত! শুধু আক্ষেপ নয়, নারীটী পুরুষটীর জন্য একটী সলজ্জ মধুর বেদনাময় অভাব অনুভব করিতেছিল, কেহ সেখানে নাই তবু লজ্জা, যেন নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, প্রভুর দরবারে কীর্ত্তন গাহিতে হইবে তাহাকে, সে খঞ্জনী লইয়া বিগ্রহমন্দিরের দুয়ারে বসিয়া গান ধরিল—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

কণ্ঠস্বর সে উচ্চে তুলিতে পারিল না, অতি সলজ্জ মৃদু কম্পিত স্বর!

পরদিন প্রভাতে তখনও মেঘ কাটে নাই, তুলসী সজল মেঘ দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল, আজও তবে তেমনি রাতটী পাওয়া যাইবে! হয় ত' তার চেয়েও সুন্দর, স্বচ্ছতর, আজ চাঁদ আর এককলা বাড়িবে যে! তুলসী ঝুলনের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিল; মাপালী মাথায় দিয়া সে বড় পিঁড়েখানি ঘরে আনিয়া তুলিল, হাঁ। ইহাতে বেশ হইবে, দু'জনের বেশ বসা হইবে। তাহাতে সে বিচিত্র আল্পনার রেখা টানিয়া দিল, দু'টী পদ্মও আঁকিল!

তারপর সে বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিল তখন মহান্ত ফিরিয়াছে, দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে,— মহান্তকে দেখিয়া তুলসী কাপড়ের আঁচলে কি যেন লুকাইল, বেশ দেখাইয়াই লুকাইল! কিন্তু মহান্তের কোন কৌতূহলই উদ্রিক্ত হইল না, সে আপন মনেই বিরক্তিভরে বলিতেছিল —"জ্বালাতনরে বাপু, সারাদিন সারারাত টিপ্ টিপ্ ঝিপ্ ঝিপ্, হবে ত' তাই ভাল করে হোক্ রে বাপু, তা না সারাদিন মেঘলা!"

তুলসী কহিল—"হোক্ না বাপু, তোমারই বা কি, আমারই বা কি? কাল কেমন রাতটী হয়েছিল দেখেছিলে?"

মহান্ত কহে—"হ্যাঁ রাতটী বেশ হয়েছিল বটে!"

তুলসী খুসী হইয়া উঠিল, মহান্তের প্রাণ এখনও আছে! আহা—রূপ-সন্ধানী বৈষ্ণবের প্রাণ!

সে আঁচল হইতে লুকান জিনিষটা বাহির করিল, বেশ মোটা দড়ির আঁটী একটী, মহান্তের সম্মুখে রাখিয়া কহিল—"দেখ ত!"

ডান হাতে হুঁকা ধরিয়া টানিতে টানিতে মহান্ত কহিল— "কি হবে কি?"

তুলসী তরুণীর মত ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"বাঃ রে, আমি বল্লাম দেখত জিনিষটা কেমন, উনি জিজ্ঞেস করছেন কি, হবে কি? আগে আমার কথার উত্তর দাও।"

দড়ি দেখিয়া মহান্ত কহিল—"দড়ি ভাল, শক্ত বটে; এখন কি হবে শুনি?"

তুলসী স-কৌতুকে কহিল—"বল দেখি কি হবে? দেখি তুমি কেমন!"

মহান্ত যেন একটু বিরক্তিভরে কহিল—"তাই ত' পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করছি!"

তুলসী কহিল—"আচ্ছা বলছি, আগে আর একটী

কথার তুমি জবাব দাও দেখি ; দু'জন মানুষের ভার সইবে এতে ?"

—"কেন, গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে নাকি ? তা সইবে।"

তুলসীর মুখ ম্লান হইয়া গেল, এমন কথাটাকে সে কিছুতেই রহস্য বলিয়া সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইতে পারিল না, তবু সে কহিল—"আজ ঝুলন হবে আমাদের, শোবার ঘরে ঝোল্‌না টানাব।"

তুলসীর মুখের পানে চাহিয়া মহান্ত বেশ সরস শ্লেষেই কহিল—"বয়স দিন দিন বাড়ছে না কমছে ?"

—"কেন ?"

—"নইলে এখনও তোমার ঝুলনের সাধ ? আয়নাতে কি মুখ দেখা যায় না, না নিজের রূপ খুব ভালই লাগে।"

তুলসীর বুকে যেন ব্যথা ধরিয়া গেল, দড়ির গোছাটা হাত হইতে আপনি পড়িয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া তোলা বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই ঘরখানায় ভামিনী মরিয়াছিল, মহান্ত ভ্রমেও এঘরে পা দেয় না। কাঁদিতে কাঁদিতেই সে শুনিল মহান্ত গুঞ্জন করিয়া গাহিতেছে—"গেল নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।"

তুলসীর ক্রন্দনের বেগ বাড়িয়া গেল।

মহান্ত গান থামাইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল—"আমি ঘুরে আসি. ক'টী লোক আসবে, প্রভুর পূজার ফুল, ভোগ, অতিথ-সেবার সব ঠিক ক'রে রাখ, দেরী না হয়!" বহুক্ষণ কাটিয়া গেল ;—তুলসীর মনে হইল ভামিনীর কথা। মরণের দিন সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়াছিল—"রূপ একদিন আমারও ছিল !"

সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল—বেদনার বিলাপ, আজ মনে হইল প্রচ্ছন্ন অভিশাপ !

তুলসী তাড়াতাড়ি ওঘরে গিয়া দেওয়ালে টাঙানো আরসী খানা লইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল ; মুক্ত আলোকে নিবিষ্ট চিত্তে আপন রূপ দেখিতে বসিল ;—সত্যই ত কোথায় সে প্রাণ-মাতানো রূপ তাহার ! সেই গৌর বর্ণ আছে, কিন্তু তাহার চিক্কণতা আর নাই ; সেই ললাট কিন্তু সে মসৃণ স্বচ্ছতা আর নাই, মহান্ত বলিত 'জান, প্রথম দিন তোমার কপালে চাঁদ দেখেছি 'আমি' মসৃণ স্বচ্ছ ললাট তাহার চাঁদের প্রতিবিম্ব তুলিয়া লইয়াছিল! গালে সে টোলটী এখনও পড়ে কিন্তু তাহার পাশে পাশে কয়টী সূক্ষ্ম রেখার আভাস জাগিয়া সে শোভা তাহার ম্লান করিয়া দিয়াছে ; বাঁকা নাকটীর প্রান্ত দেশে কাল মেচেতার রেশ ; সেই সে, সেই রূপ, কিন্তু নূতনের অপরূপত্ব তাহার আর নাই! এই দীর্ঘ দিনে ধরার ধূলা তাহাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে! তুলসী তাড়াতাড়ি আরসীটী বন্ধ করিয়া দিল ; রূপের জন্য তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কয়ফোঁটা অশ্রুও তাহার ঝরিয়া পড়িয়া ধরায় ধূলায় মিশিয়া গেল !

হায় রে, রূপ কেন অজর অটুট নয় !

ইহারই কয়দিন পর, আকাশ তখনও মেঘলা হইয়া আছে ; তুলসী বিগ্রহ-মন্দিরের দাওয়ায় বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, আর আপন মনে গাহিতেছে—

"আমি হরি লালসে তনু ত্যজব পাওব আন জনমে।"

মহান্ত আজ দিন তিনেক বাড়ীতে নাই ; সেই লোক কয়টীর সঙ্গে কোথায় গিয়াছে, টাকা কড়ি লইয়া ব্যাপার ; কত টাকাও দিল, কিন্তু তুলসী কোন খোঁজ করে নাই ; তাহাতেই বা কি স্বার্থ তাহার, মহান্ত যে নাই, তাহাতেই বা তাহার কি যায় আসে।

মহান্ত আসিয়া বাড়ী ঢুকিল, কপালে তাহার চন্দনের তিলক জল জল করিতেছে, গলায় ফুলের মালা, পরনে গরদের কাপড়, অঙ্গে উত্তরীয় !

তুলসী মুগ্ধ হইয়া গেল, সে তাহার হাতের মালাগাছি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, হোক্ দেবতার নামে গাঁথা মালা ! সে কাছে আসিয়া কহিল,—"একি এযে নটবর বেশ !" দু'হাত তুলিয়া সে মহান্তের গলায় মালা দিতে গেল, কিন্তু সহসা তাহার হাত যেন পঙ্গু অসাড় হইয়া গেল ; সে আর্ত্ত স্বরে কহিল—"ও -কে মহান্ত ?"

মহান্তের পিছনে একটী তরুণী নারী, শ্যামাঙ্গী কিন্তু সর্ব্বাঙ্গব্যাপী একটী চটুলতায় সে অপূর্ব্ব, সে চটুল রূপ তাহার ষোল কলায় বিকশিত।

মহান্তকে উত্তর দিতে হইল না, চঞ্চলা তরুণীটীই উত্তর দিল—"আমি নতুন সেবাদাসী গো।

তুলসীর হাতের মালাগাছি ততক্ষণে হাত হইতে পড়িয়া গেছে। মেয়েটী আগাইয়া আসিয়া কহিল—"তুমিই বুঝি তুলসী বোষ্টুমী, গাইয়ে, বাজিয়ে, বলিয়ে-কইয়ে, রূপে মরি মরি! ও হরি—এই তুমি!"

সে ঠোঁটের আগায় একটা পিচ কাটিয়া দিল।

ততক্ষণে তুলসী নিজেকে সাম্‌লাইয়া নিয়াছে।

সে কহিল,—"হাঁ্যা আমিই তুলসী। এখন পাশে এসে দাঁড়াও দেখি,—বরণ করে ঘরে তুলি; আ—আমার মনের মাথা খাই, পিঁড়ির ওপর দাঁড়াতে হয় যে।"

সে সেই বড় পিঁড়িখান আনিয়া পাতিয়া দিল,—সেদিনের সে আল্পনা আজ ঝক্ ঝক করিতেছে, দু'টী জনের তরে দু'পাশে দু'টী পদ্ম!

পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া সে ঘট, শঙ্খ, দেবমন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিল।

মেয়েটী তখন মহান্তকে বলিতেছে—"আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে ত'!"

তুলসী মহান্তকে কহিল—"পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াও।"

মহান্ত কহিল—"থাক্।"

হাসিয়া তুলসী কহিল—"এ যে করণীয় কাজ গো! উঠে দাঁড়াও আমি বরণ করি, তুমি এই পদ্মে—তুমি ওই পদ্মে।"

বরণ করিতে করিতে সে হাসি মুখেই কহিল—"এ জল, ফুল আমি পাথরের যুগলের জন্যে রেখেছিলাম, তা সত্যি যুগলের সেবা হ'ল, ভাগ্য আমার!"

বলিয়া সে শাঁখ বাজাইল।

সন্ধ্যায় সে নিজ হাতে ফুলশয্যা সাজাইয়া দিল। আপনি শুইতে গেল ভামিনী যে-ঘরে মরিয়াছিল। সারাটা রাত্রি ঘুম নাই চোখে, ভামিনী যেন অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। তুলসীর ভয় হইল না—সেও হাসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান ইত্যাদি সারিয়া তুলসী মহান্তকে খুঁজিল;—মহান্ত নাই, উঠিয়াই কোথা চলিয়া গিয়াছে।

ভামিনীর ঘরেই সে বসিয়া রহিল, মহান্তেরই প্রতীক্ষায়। ওঘরে তরুণীটীর নিদ্রা তখনও ভাঙে নাই।

মহান্ত একটু বেলা হইলে ফিরিল, কিন্তু ফিরিল যেন একটু আড়াল দিয়া।

তুলসী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে ডাকিল—"মহান্ত!"

মহান্ত নত মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তুলসী হাসিয়া কহিল—"এমন লুকিয়ে ফিরছ কেন বল ত?"

নত চক্ষেই মহান্ত কহিল—"আমায় মাপ কর তুলসী!"

তুলসী হাসি মুখেই কহিল—"রাগ ত, করি নি আমি।"

মহান্ত ব্যগ্র ভাবে কহিল—"সত্যি কথা বল তুলসী।"

কয়খানা ভাঁজ-করা কাপড় বেশ করিয়া ঝাড়িয়া একটা পুঁটুলীতে বাঁধিতে বাঁধিতে তুলসী কহিল—"না।"

মহান্ত আদর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইতে তুলসী বেশ মর্য্যাদার সহিত আপনাকে মুক্ত করিয়া পোঁট্‌লাটী কাঁখে তুলিয়া কহিল—"আমায় বিদেয় দাও!"

—"সে কি?"

—"হাঁ্যা আমি আসি।"

—"তুমি যে বল্লে রাগ করি নি।"

—"সত্যিই আমি রাগ করি নি, কিন্তু মহান্ত, দিদির কথা মনে পড়ে তোমার, আমি যেদিন আসি?"

মহান্ত নীরবে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তুলসী কহিল—"মহান্ত, আমিও ত' মেয়ে মানুষ!"

মহান্ত তুলসীর হাত ধরিয়া কহিল—"তুলসী তোমারই রাজত্ব, ও দাসী হয়ে থাকবে, জান ত', বৈষ্ণবের সাধনা রাধারাণী—যৌবন—রূপ—,"

—"জানি মহান্ত, যৌবন রূপ সামনে না থাকলে ধ্যানে ধারণা হয় না, কিন্তু আমিও ত' বৈষ্ণবী, আমার ও ত' চাই শ্যাম-কিশোর একটী!"

মহান্তের মুখে বাক্ ফুটিল না।

তুলসী দ্বারের সমীপে গিয়াছে, তখন মহান্ত কর্কশ কণ্ঠে কহিল—"বলি—তারই সন্ধানে চল্লে বুঝি?"

তুলসী মহান্তের মুখপানে ফিরিয়া চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল—"হ্যা গো! তারই সন্ধানে চলেছি আমি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর।"

সে হাসিতে, সে স্বরে ব্যঙ্গ নাই, শ্লেষ নাই, ব্যথার রেশও পাওয়া যায় না;—বিচিত্র সে হাসি, বিচিত্র সে কল-স্বর।

গ্রামের প্রান্তে সেই মাঠখানি, সেই আঁকা-বাঁকা আলিপথ খানি, এই পথেরই কোন্ এক বাঁকে তুলসী মানুষকে ভালবাসিয়াছিল। এই পথেই সে সন্ধ্যাজোল আসিয়াছিল, আজও সেই পথেই সে চলিয়াছে; কোথায়—সেও জানে না; তবে আপন গ্রামে নয়, সেটা ঠিক; কাহুর কাছে এ দৈন্য লইয়া সে দাঁড়াইতে পারিবে না।—

পথ ত' আছে—অনন্ত বিস্তৃত পথ, তাহারই পাশে পাশে গৃহস্থের দুয়ার!

সে খঞ্জনী বাজাইয়া আপন মনে পূর্ণ কণ্ঠে এ জীবনে প্রথম গান সুরু করিল—

"সখি বলিতে বিদরে হিয়া,—
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া।"

কিন্তু গানটী সে শেষ করিতে পারিল না, অভিশাপের কলি তাহার কণ্ঠে ফুটিল না।

কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসতীশ রায়

কবি প্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নেন,—তার থেকে বিরোধ ঘট্‌লেই নিজের মহান আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হ'লেন বুঝতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তা' কখনো হ'ন নি। জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভালবাসার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গান তিনি গেয়েছেন, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতি মিলিয়ে এবং জীবন-দেবতার পানে তাকিয়ে! তাঁকে বলেছেন,—

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান!

আসল কথাটি হচ্ছে,—

ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ!

রবীন্দ্রনাথের জীবনটি যেন একটি সুরে বাঁধা বীণা!—প্রাচীন গ্রীকদের যেমন "ইয়োলিয়ান হার্প" থাকত ঠিক তেমনি,—বিশ্ববৈচিত্র্যের বাতাস এসে তা'তে ঝঙ্কার তোলে। তাঁর আপন অন্তরের আনন্দ বেদনা তা'তে বিচিত্র রাগিণী রচনা করে

অন্তরের সেই অপরূপ মাধুর্য্য যা' সাদা কথায় প্রকাশ করা যায় না, তাকে তিনি বাইরে ভুলিয়ে এনেছেন সুরের ইন্দ্রজালে, ভাষার মিষ্টতায়। কিন্তু এখনো তিনি সেই মাধুর্য্য-দেবতাকে ধরতে পারলেন কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ আছে,—

গানের ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ
বাঁশীতে পুরেছি কোমল নিখাদ
তবু তুমি ধরা দিলে কি?

জীবনে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পূর্ণতা কবি তাঁর গানের ভিতর দিয়েই পেয়ে থাকেন। গানের আবেগ কবির মনকে কি ভাবে যে দোলা দেয়, তা' "গান" কবিতাটিতে পাই,—

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে
হৃদয়ে আমার,
যৌবন-সমুদ্র মাঝে কোন পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার!

কবি জীবনে কখনো কোন প্রকার hypocrisyকে প্রশ্রয় দেন না কিংবা pose করেন না, তাঁর সান্নিধ্যে থাকায় এইটে লক্ষ্য করবার সুযোগ অনেকবার ঘটেছে। তাঁর গান-গুলি প্রাণেরই প্রকাশ, কথা সাজাবার কেরামতি নয়। কারণ "ছিন্নপত্র"এ কবি এক জায়গায় বলছেন, "জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যাকথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

দশজনের প্রশংসা পেয়ে কান তৃপ্ত হয় এমন সুলভ কবিতা বা গান কবির পক্ষে লেখা শক্ত নয় কিন্তু তাতে তার মন তৃপ্তি পায় না। নিজের বিশেষত্ব, নিজের আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তির জন্য কবি গানের জাল পাতেন, সুরের মোহময় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেন। তাঁর কবি-জীবনের একটি সরল সৌন্দর্য্য আমাদের মুগ্ধ করে,—মনে হয় তাঁর গান এবং তিনি যেন অভিন্ন।

যথার্থ কবিতা লেখা সহজ না হ'লেও হয়ত বেশী শক্ত নয়, কিন্তু কবি-জীবন যাপন করা ভারী শক্ত। বিশ্বের সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যকে অন্তরের মাধুর্য্যের সঙ্গে মিলিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করা, জীবনে তাকে স্বীকার করা, নিজের বুকের মধ্যে বিশ্ববাসীর হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা, সকলের ভেতর প্রবেশ করে' বাইরে তাকে প্রকাশ করা, রবীন্দ্রনাথের মত পৃথিবীর ক'জন কবি পেরেছেন জানি না।

মনে পড়ে তিনি পরিহাসচ্ছলে একদিন মৃদু হেসে বলে-ছিলেন, "যদি গেরুয়া নিয়ে গুরুগিরি করতুম ত' আমাদের দেশে অনেক চেলা মিলত রে।"

বাস্তবিক, আমাদের দেশ সম্মোহনের দেশ! বাইরেটা দেখে লোকে ভুলতে চায়। ঐযে "ঘরে বাইরে" তে সন্দীপ বলছে, "জয় হ'বে সম্মোহনের, জয় হ'বে মোহের! মক্ষিরাণী, বলো বন্দে মাতরং—"

অমনি সব অন্যায় ন্যায় হয়ে দাঁড়াল। শুধু স্বাদেশিকতায় নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমন কি ধর্ম্মেও আমরা সম্মোহন চাই, এ দেশে মোহেরি জয় হয়।

কবি লিখেছেন,—

আমারে চেনেনা তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্রদর্পে খলখল উঠে অট্ট হাসি
দেখে মোর সাজ!

একথা ঠিক যে সংসারে যাঁরা ত্যাগের গর্ব্ব করেন তাঁরা কবিকে ঠিক চেনেন্ না। কবি চণ্ডীদাস বোধ করি সঙ্কোচে এঁদের লক্ষ্য করেই গেয়েছিলেন,—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছেন যাঁরা,
কাজ নেই সখি তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকুন তাঁরা।

"ফাল্গুনী"তে ঐ যে কবি শেখর বলেছেন, "নদীর বৈরাগ্য দেখেন নি মহারাজ!" কবির বৈরাগ্য কবির সার্থকতার সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ তা'তে চমৎকার ক'রে প্রকাশ করেছেন। আপনাকে পূর্ণ ক'রে পাবার সাধনাই কবির ত্যাগ যা' তামসিকতারই নামান্তর—কবি সে সৌন্দর্য্যহীনতা বা বাইরের বৈরাগ্যকে সমর্থন করেন না, তা' অনেকদিন আগে তিনি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে কথাচ্ছলে বলেছিলেন;—

"বাংলা দেশের লোক রং ব্যবহার করতে কেন লজ্জা পায়?—সাদা ছাড়া আর কিছু যেন পরতে নেই!" কবি সহাস্যে বল্লেন "বিশ্বপ্রকৃতি ত বহুপ্রাচীনা, কিন্তু কই কোনো রকম রং ব্যবহারে তাঁর ত' কোন লজ্জা দেখিনা!"

আমার বেশ মনে আছে, তারপর থেকে তিনি ঘোর লাল রংয়ের একটা গায়ের কাপড় ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেবার তিনি জাপান থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন,—কালো সিল্কের একটা কিমানো পরতেন, আর তার সঙ্গে লাল শালটি colour contrast এ বড় সুন্দর মানাত!

প্রকৃতির সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিলনের এই প্রয়াস শুধু কাব্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সৌন্দর্য্য-সাধনার মধ্যে তার চেষ্টা চলেছে। তাঁর গান তাঁর প্রাণেরি প্রকাশ,—জীবন ছাড়া নয়, কিংবা তথাকথিত কবিজনোচিত চেষ্টা ক'রে গড়া নয়, এই কথাটি আমার বক্তব্য।

কি রচনায়, কি জীবনে সুলভ জনপ্রিয়তাকে কবি কোনো দিন চান নি।—জীবনে যা' ভাল ব'লে বুঝেচেন তারি অনুসরণে কাজ করেছেন বা কাব্যরচনা করেছেন। তিনি সহাস্য ক্ষোভে বলেছেন,—

বাহবা যে জন চায়
থাকুক সে চৌমাথায়
নাচুক তৃণের প্রায়
পথিকের স্রোতে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে কারো ভক্তিশ্রদ্ধা ভিক্ষার আশায় ক্লেশ নেন নি, এটা লক্ষ্য করি। মাধুর্য্যের সঙ্গে রুদ্রতার, প্রেমের সঙ্গে ত্যাগের, রমণীয়তার সঙ্গে দৃঢ়তার, এবং সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সাধনার যে যোগ, যে অপূর্ব্ব মিলন—কবির জীবনে এবং কাব্যে তা' একটি লক্ষ্য করবার জিনিষ।

তাঁর জীবনে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য চোখে পড়ে। ত্যাগের দ্বারা মানুষ এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়, যখন ভোগ আর তাকে বিচলিত করতে পারে না, ঐ যে কবীর বলেছেন,—

অমুয়া কয়লি ঘিসন্ রহগি
ঘিসত ঘিসত বাজ্যা সুর!

আমের আঁটিকে ততক্ষণই ঘসার দরকার, যতক্ষণ না তার থেকে সুর বাজে। ত্যাগের কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই অবস্থাটি পেয়েছেন; তাঁর জীবনের সুরটা ঠিক বেজেছে। এখন ভোগে আর তাঁর বিনাশ নেই বরং বিকাশ আছে।

কবির গানে আছে,—

অন্তরে মোর বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না!

কবির জীবনের দিকে তাকালে আমরা এ গানের প্রতিধ্বনি পাই। তিনি মহার্ঘ্য কৌষেয় বস্ত্রই পরুন আর রাজপ্রাসাদেই থাকুন, তাঁর মন কখনো সভ্যতার এসব কৃত্রিম উপকরণে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না।—সে চির-পথিক বাউল—তার একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে সে চলেছে—তার পথের আর শেষ নেই! "মেতেছি পথের প্রেমে" এ কবির কেবল "সেন্টিমেন্টাল" কথা নয়, প্রাণের অন্তরতম সত্যের প্রকাশ

সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথের গানের আবেদন প্রাণের কাছে সকলের আগে। কান ও বুদ্ধির কাছেও সে আবেদন জানায় তার রাগ-রাগিণীর চাতুর্য্য দিয়ে, তাই প্রাণের ভেতর কবির গানের সাড়া পাই। মনে হয় উনি যেন চুরি ক'রে আমাদের মনের কথা বল্‌ছেন—ও যেন আমি-ই বল্‌ব ভেবেছিলাম, কিন্তু বল্‌তে পারি নি!

তাই ত এই কবি শুধু আমাদের গুরু নন, তিনি আমাদের বন্ধুও! আমাদের মনের ব্যথা তিনি জানেন, আমাদের মনের কথা বলেন।—আমাদের গোপন দুঃখ-বেদনা আশা-

আকাঙ্ক্ষায় তিনি সহানুভূতি জানান। তাই ত' তাঁকে আমরা এত ভালবাসি, যত ভক্তি করি তার চেয়েও! আর এই ভালবাসাটি কবি তাঁর গানের বিনিময়ে আমাদের কাছে চেয়েছিলেন, কৃতজ্ঞতা চান নি,—"বিদায়-অভিশাপ"এর দেবযানীর মুখে আমরা সে খবর পেয়েছি!

সাধন-মার্গে শুষ্ক বৈরাগ্যের পথ এক হিসাবে ভাল; রসের পথে বিঘ্ন অনেক।

একটু বিকারে রস তাড়ি হ'য়ে ওঠে, মন্দ হ'য়ে আমাদের মত্ততা আনে—রবীন্দ্রনাথের জীবন বা কাব্যে তা' কখনো মন্দ প্রভাব ঘটাবার সুযোগ পায় নি। কী তপস্যা কী ত্যাগ দিয়ে ইনি যে সৌন্দর্য্যকে জীবনে বরণ করেছেন তা' আমরা দেখতে পাই না সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য-প্রকাশটি শুধু আমাদের চোখে পড়ে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল অগ্নিস্রোত বইছে কিন্তু উপরে তার ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফোটানোর বিরাম নেই—রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তেমনি দেখি—ত্যাগ ও তপস্যা, কিন্তু উপরে তার গানের ফুল ফুটছে, সৌন্দর্য্যের ফসল ফল্‌ছে অনবরত।

কোকিলের সুর যেমন প্রাণে বসন্তের উন্মাদনা সঞ্চার করে, মনে সৃজন-কামনার অস্থিরতা জাগায়, কবির গানে আমরা তা' ততটা পাই না। অবশ্য প্রাণকে উদ্বোধিত করবার, জাগ্রত করবার অনেক গান তাঁর আছে। তাঁর অধিকাংশ গানের সুর যেন ঘুঘুর ডাক!—তা' আমাদের মনকে সুরের পাখায় ক'রে এক মায়াময় অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, এক বেদনাময় স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। মনকে উদাসীন ক'রে সকল সৌন্দর্য্যের যিনি নির্ঝর সেই অনন্তের সন্ধানে আমাদের প্রাণকে উধাও করে। তাঁর গান শুন্‌লে—

ভেসে যেতে চায় মন
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া!

রবীন্দ্রনাথ জীবনে আশা-ভালবাসা ও মহত্ত্বের গান বেশী গেয়েছেন। কবির গানে জীবনের দুঃখ-বেদনা আনন্দের রূপ নিয়েছে,—তিনি দুঃখের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর দুঃখ আনন্দের রূপান্তর। তাই ত' তিনি বল্‌তে পেরেছেন, "দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান!" সংসারে যে রোগ, শোক, দুঃখ বেদনা তিনি পেয়েছেন তার মধ্যে বিধাতার মঙ্গল-উদ্দেশ্য তাঁর চোখে পড়ে। তাইত আশাভরা প্রাণে তিনি বলেন,—

ফুট্‌বে ফুল ফুট্‌বে
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'যে
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে!

রবীন্দ্রনাথ যদিও optimistic কবি তবু Skylark এ শেলী যে বলেছেন, "our sweetest songs are those that tell of sadest thought!" এই ভাবটি আমাদের কবির ভাবের সঙ্গে বেশ মেলে।

রবীন্দ্রনাথের গান খুব suggestive, তার ভেতর গভীর অর্থ আমরা খুঁজব না, তবে কতকগুলি কথায় সুর যোগ ক'রে তিনি যে মধুর ভাব ফোটাতে পারেন, মনের ছবি আঁকতে পারেন তাই দেখব। যেমন ধরুন এই গানটা,—

সেদিন এমনি ঘনঘটা রেবা নদীর কূলে
এমনি তর মেঘ করেছে শ্যামল শৈল-মূলে!
মালবিকা অনিমিখে
চেয়ে ছিল পথের দিকে
সেই চাহনি ভেসে এল আজকে আষাঢ়-সমীরণে!

এই বর্ষার গানে কবি যে ঘটনার সমাবেশ করেছেন, তাতে এমন একটা মিষ্টি কিছু ব'ল্‌ছেন যাতে করে বর্ষণ-মুখর আষাঢ়-সমীরণ আমাদের মনে ভাষা পেল, মনেরই অনির্দ্দিষ্ট বিরহ-বেদনা-ভরা মাধুর্য্যরসের সঙ্গে মিশে। পূর্ব্বেই বলেছি যে কবি গান রচনা করতে করতে তার মধ্যে যেন ডুবে যান। মাধুর্য্যরসে এই আত্মবিলোপসাধন, এই গানের ভিতর দিয়েই সম্ভব। তুরীয় আনন্দ উপভোগ করবার এমন উপায় আর কিছুতে নেই।

শেলী যেমন বলেছেন,—
"Like a poet hidden in the the light of thought!"

আমাদের কবি বলেন,—

আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশ মন
ডুবাইতে থাকে কুসুম-গন্ধ, বসন্ত সমীরণ!
পাগলের মত রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি'!

বাহ্য-চেতনারহিত কবি মনশ্চক্ষে দেখতে পান,

সুরের আলোয় ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী!

এই সঙ্গীত-সুধারস-আস্বাদনে কবিরা মশগুল হ'য়ে থাকেন ব'লে সংসারের অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্ট তাঁদের মনকে অভিভূত করতে পারে না এবং কবি-জায়াকেও আক্ষেপ ক'রে বল্‌তে হয়,—

মাথার উপর বাড়ী পড়' পড়'
তার খোঁজ রাখ কি?

কবি গৃহিণীর তাগিদে রাজার কাছে রাজভাণ্ডারের সোনাদানা চাইতে এসেছিলেন, গৃহিণীর কাছে তিনি গর্ব্ব করে' বলে গিয়েছিলেন,—

এমন মধুর শ্লোক বাখানিব
রাজ-ভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণ তলে!

কিন্তু রাজকণ্ঠের মালা পেয়েই সব কথা ভুলে গেলেন। সহানুভূতি পাওয়াই যে কবির গান গাওয়ার উদ্দেশ্য, রাজা তা জানেন এবং আরো জানেন যে, অন্যান্য সাধারণ প্রার্থীদের মত টাকাকড়ি জমিজায়গীর দিয়ে এই লোকটিকে বিদায় করলে এর যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া হ'বে না,—তাই তাঁর গলায় দুলিয়ে দিলেন নিজের গলা থেকে খুলে ভালবাসার পুষ্পমাল্য !

সকলের প্রেম কবির চাই, সেইজন্য তিনি এত গান করেছেন।

হয়ত ঘুচিবে দুঃখনিশা
তৃপ্ত হ'বে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেম-তৃষা !

এই "সর্ব্বপ্রেমতৃষা" রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ক'রে গান-রচনায় প্রেরণা দিয়েছে—এক প্রেমে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে।

পৃথিবীর সকলকে কবি ভালবাসেন, তাই জীবনের গান-রচনার প্রারম্ভেই তিনি তাঁর সঙ্গীতগুলি উৎসর্গ করেছেন বিশ্ববাসীকে,—

তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।

এবং পরে বলেছেন,—

এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল,
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করিয়াছি দান
ভরেছি ধরণীতল !

এই প্রসঙ্গে কবির জীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যখন আমেরিকায় বিপুল সংবর্দ্ধনার আয়োজন হ'য়েছিল, তখন সেই সমাগত বিরাট জনসংঘের কাছে তিনি বলেছিলেন, "সম্মানের স্মৃতিস্তম্ভ সে ত' মৃতের জন্য, কবির জন্য চাই প্রীতি-প্রফুল্ল সূর্য্যালোক ! মরুভূমির মেষপালকের মত আকাশের তারা গুণে আমার যৌবনকাল কেটে গিয়েছে, সেখানকার নক্ষত্রসভা আমার দোষগুণের বিচারও করেনি আমাকে পুরস্কারও দেয়নি। আমি যে গান করেছি, তাতে যদি আপনাদের মনে কোনো স্থায়ী আনন্দ দিতে পেরেছি বলে মনে করেন ত' তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা চাই না—কিংবা কোনো পুরস্কার দাবী করিনা। আপনাদের প্রীতিলাভই আমার প্রকৃত পুরস্কার !"

কবির "প্রার্থী" নামক গানেই কবি কি চান তা' আমরা জানতে পারি,—

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
তব নব প্রভাতের শীতল শিশির ঢালা !

কবির মর্য্যাদা, কবির পুরস্কার ওতেই,—হৃদয় জয় করায়। কত রাজ্য জয় করেছেন, কত যুদ্ধে সফলকাম হয়েছেন, তা' নেপোলিয়ন নাদির শার জীবন-চরিতে থাকতে পারে, কবির জীবন-চরিতে আমরা খুঁজব কত হৃদয় তিনি জয় করেছেন। তাঁর সঙ্গীতের সার্থকতা সেইখানে। ফুলের মালাই তাঁর বিজয়মালা, তাই তিনি চান,—মোহরের মালা নয়।

এইখানে কবির জীবনের আর একটা ঘটনার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না বোধ করি। রবীন্দ্রনাথ "নোবেল প্রাইজ" পাবার পর বাংলাদেশের কবির বহু ভক্ত-মণ্ডলী তাঁকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে শান্তি-নিকেতনে সমবেত হ'য়েছিলেন। কবি সেই সভায় সমবেত সুধীমণ্ডলীর অভিনন্দনের উত্তরে কি বলেছিলেন, সে কথা আপনাদের স্মরণ করতে বলি। তিনি বলেছিলেন, "আপনারা যে সম্মানের সুরাপাত্র আমার হাতে দিয়েছেন, তা' আমি ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করেছি মাত্র, তা' আমি পান করতে সাধি নি।" এতে ক্ষুব্ধ হওয়া মূঢ়তা। আমার বিশ্বাস তিনি তাঁর এই উক্তিতে অন্তরের একটি সরল সত্য প্রকাশ করেছিলেন। মনে যা মত্ততা আনে সেই সম্মানের সুরা কবিরা চান না, তাঁরা চান অন্তরের সুধা। রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার রচিত এই গানটি সকলে শুনেছেন,—

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
এরে পরতে গেলে লাগে
এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

এ কবিজনসুলভ বিনয়-রচন নয়, এ তাঁর অন্তরের যথার্থ ব্যথার প্রকাশ ! বাস্তবিক কবির গলায় মণির মালা সাজেনা—বনফুলের মালাই সাজে, অবশ্য মন যদি পিছনে থাকে। "দূরদেশী সেই রাখাল বালক" যে বটের ছায়াতলে বসে বাঁশী বাজায় সে এই কথাটি জানত, তাই ত সে গানের জন্যে আর কিছু পুরস্কার দাবী করে নি, শুধু সে চেয়েছিল,—

সে শুধু কয় আর কিছু নয়
তোমার গলার মালাখানি !

চেনা-অচেনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

১৩

ব্যাপার ত' বেশ জমে উঠেছে! প্রতিদিনই আমরা শত্রুপক্ষের বহুলোক ক্ষয় করছি। প্রথম সৈন্যশ্রেণীর পিছনে যে তৃতীয় কামান-বস্তি, তারই এই কাজ; কিন্তু আমাদের কাজ করতে হয় রাতের অন্ধকারে। হূণরা বোধ হয় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। হয় শব্দ আন্দাজ করে' অথবা হাওয়াইয়ের আলোয় তারা আমাদের অবস্থান জানতে পেরেছে। যাই হোক, তাদের এক অব্যর্থভেদী গোলন্দাজ আমাদের বেশ চিনেছে এবং একটা মেশিন-গান নিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। হতভাগাদের ফাঁকি দিয়ে ফিরতে বেশ লাগে কিন্তু আমার দলের লোক নষ্ট করতে আমার ভারি ক্ষোভ হয়। কোন লোক আহত হয়েছে কি না তা ঠিক করা শক্ত। কামান-বস্তি থেকে কামান-বস্তিতে ফিস্‌ফাস্ চলছে—"তুমি ঠিক আছ? বব কি ওখানে? কেউ গেল না কি?" তারপর কথাটা আমাদের কাছে চলে আসে—"কল্টনের সাড়া পেলুম না, মশায়। সে বোধ হয় স'রল।"

জন দুই গোলন্দাজ নিয়ে আমি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লুম, হারান লোকটির সন্ধানে। যখন তাকে পাই—হয় সে মৃত, না হয় অজ্ঞান। খাটুলী আনাতে হবে, লোক ঠিক করে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চোখ পর্য্যন্ত আমাদের কাদায় ভরে গেছে, সর্ব্বশরীর ভিজে; কিন্তু উষার প্রথম বিকাশ পর্য্যন্ত আমরা আচ্ছন্নের মত কাজ করি, তারপর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি সরে পড়ি।

বেচারা ষ্টিফেন সেদিন রাতে মারা পড়ল! তাকে তোমার মনে আছে? সেই লোক—যার নামে কোন চিঠি আসে না। এই কারণেই তাকে সব সময়ে আমার মনে থাকবে। হরকরা ডাক নিয়ে এসেছে, আমরা সবাই মুহূর্ত্তের মত সব দুঃখ ভুলে প্রিয়-পরশ আনন্দে বিভোর। ষ্টিফেন কাজ করেই চলেছে, তার জন্যে ভাববার কেউ নেই! সেই অব্যর্থ গোলন্দাজ তাকে মেরেছে—গুলিটা মাথায় লেগেছিল। জ্যাক ছুটী থেকে ফিরে এসে কাজ নেবার আগের রাতেই ব্যাপারটা ঘ'টল নিজের ছুটীর ছাড়পত্র বিলিয়ে দিয়ে ষ্টিফেন প্রাণ দিলে!

যুদ্ধের সামনের লাইনে মানুষ কত শীঘ্র বন্ধুজনের কথা ভুলে যায়। মনে করে' রাখবার আমাদের সময় কই? কোন রকম দুঃখ প্রকাশ যে শক্তির অপচয়। সামান্য সৈনিক বা সেনানায়ক—মৃত্যুর পরে আর প্রভেদ কোথায় তার দেহ পরিষ্কার করা হয় না, আঘাতের রক্তচিহ্ন গায়ের উপর শুকিয়ে যায় আর আকাশ আর মৃতের মাঝখানে শুধু একটা সস্তা কম্বলের অন্তরাল! চিঠি ছাড়া পকেট থেকে কিছুই নেওয়া হয় না। সে যে অবস্থায় পড়েছে—জুতো, জামা সবই তার গায়ে থাকে। রাত্রে যখন খাবারের গাড়ী আসে তাতে করে দেহটি রসদগাড়ীর আড্ডায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন একটা জনমানবশূন্য মাঠের দিকে শবের শেষ-যাত্রা। তারপর তার দেহানুযায়ী একটা গর্ত্তে সমাধি। কবরগুলোকে বিশেষ আরামপ্রদ করবার ত' সময় নেই, কারণ গর্ত্ত খোলার কি আর অন্ত আছে? কয়েকজন গোলন্দাজ-কর্ম্মচারী ও সাধারণ সৈন্য সঙ্গী রক্ষকরূপে পিছনে যায়। শবরক্ষীর কাজে আমাদের উৎসাহ দেখলে লোকে হঠাৎ বিস্মিত হতে পারে, কিন্তু ব্যাপার এই যে, এ কাজে যোগ দেবার আগে সে একবার স্নান করতে পায়। কাজেই আমাদের অনেকের শব-যাত্রায় যোগ দেবার মানে শুধু চব্বিশ ঘণ্টার মত পরি-ষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার একমাত্র সুযোগ। অনুষ্ঠান ত' পাঁচ মিনি-টের, তারপর জীবন যেমন ধারায় চ'লছিল তেমনই চলে। তবে আমরা সবাই ভাবি—আমার পালা বোধ হয় এই-বার। যাই হোক, আমার শবযাত্রায় যোগ দেবার পুরস্কার-রূপে শ্মশান-বন্ধুরা যেন অনেকখানি গরম জলে ভাল করে' স্নান করতে পায় এই আমার কামনা!

জ্যাক হোল্ট যখন ইংলণ্ডে, তখন তার শিশু জন্মাল।

আমাদের মেসে ভারি উত্তেজনা। শিশুটী খুকী—আমরা সবাই একমত হলুম—যা ঘটেছে তারপর মেয়েটিকে ষ্টিফেনেটা নাম না দেওয়া অন্যায়! ঐ নাম খোদাই-করা রূপার বাটী নামকরণ-উৎসবে উপহার দিয়ে খুকীর মাকে ঐ বিশ্রী নাম রাখতে বাধ্য করেছি। যদি খুকীকে ও নাম না দেওয়া হয় তবে অবশ্য বাটী ফিরিয়ে দিতে হবে! এই আমাদের ব্যবস্থা।

আমাদের সবায়ের ইচ্ছা যে, জ্যাক যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম পায়—এখন যে সে বাপ হয়েছে! তার একমাত্র উপায় অন্য বিভাগে বদলি হবার আবেদন করা। যদি করে, তবে নতুন কাজ শিখতে যতদিন যায় ততদিন সে ইংলণ্ডে থাকতে পাবে। ষ্টিফেনেটার বাবা যে এখনি মারা যায়, এ আমরা কেউই কামনা করি না, তাই মেজর সাহেব তাকে বুঝিয়েছেন উড়ো-সৈন্যদলে যোগ দিতে। যদি আবেদনপত্র মঞ্জুর হয়, তবে তার আরও ছয় মাস নিশ্চয় বাচবার আশা রইল।

বেচারা ভদ্রলোক তার শিশুর নানা রকম ছবি এনেছে—নানা ভঙ্গি, নানা রকমের পোষাক। সে তাকে নিয়ে একেবারে ক্ষেপেছে—খুকীর এক রকম মুখে সে নানা রকম বুদ্ধির চিহ্ন আবিষ্কার করছে। এক ছবি দেখিয়ে সে জেদ করে যে, খুকী হুবহু তারই মত; আর একটা ছবি দেখিয়ে বলে যে, সে অবিকল তার মায়ের মত। সেদিন তৃতীয় ছবিতে সে নাকি আবিষ্কার করেছে যে, ষ্টিফেনেটার চোখদুটী জ্যাকের ভায়ের মত, যিনি সোমের যুদ্ধে অশ্বারোহীদলের সঙ্গে মারা পড়েছেন। যাইহোক যেমন করে পারি মৃত্যুর হাত থেকে আমরা জ্যাককে বাঁচাবই।

তার ফিরে আসা অবধি আমি লক্ষ্য করছি যে স্ত্রী ও সন্তানের ভালবাসার ভিতর দিয়ে জীবন মানুষকে কি রকম আঁকড়ে ধরে—আর খুসী হচ্ছি যে তোমায় আমি কিছু বলিনি। জীবনের সঙ্গে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ অনুভব করতে আমি চাই না; বাঁচবার এই নতুন উপসর্গ নিয়ে জ্যাককে যে কত দাম দিতে হচ্ছে তা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি। ইংলণ্ডের দুটী প্রাণী তার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করেছে—তাদের সঙ্গে থাকবার জন্য তার সমস্ত প্রাণ বুভুক্ষু। নাম ঠিক মনে হচ্ছে না, একজন গ্রীক দার্শনিক বলেছেন—বেশী ভালবেসে না, কারণ যে বেশী ভালবাসে নিজের জন্য সে দুঃখ সঞ্চয় করে। কথাটা খুবই সত্য; প্রতি আনন্দময় মুহূর্ত্তের পূর্ণ মূল্য সে উৎকণ্ঠায় আদায় করে নেয়। অথচ মনে হয় জ্যাকের উদ্বেগ ভোগ করতে পেলে আমিও ধন্য হতুম যদি তার মত প্রেমের নিশ্চয়তা থাকত। ষ্টিফেনের মত এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ভাবে একা চলে যাওয়ার নিঃসঙ্গতা আজ মর্ম্মান্তিক মনে হচ্ছে। স্বার্থপরের অভিমান! কাঁদবার তরে সে ত' কারুকে রেখে যায় নি। নিজের কাজ সে করেছে অথচ তার ত্যাগের বোঝা বহন করবার জন্য কাকেও সে ডাকেনি। ভালবাসা পাবার, কারও স্মৃতিতে বাচবার জন্য হৃদয়ের এই যে প্রচণ্ড বাসনা এ হচ্ছে চরম স্বার্থপরতার একটা করুণ চিহ্ন। একশত বছর পার হয়ে গেলে মনে করবার কিংবা ভুলে যাবার কেউই থাকবে কি? কর্ত্তব্য করে যারা প্রাণ দিচ্ছে ভগবান নিশ্চই তাদের পুরস্কারের বন্দোবস্ত করবেন। যারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে গিয়ে নিজেদের উপর যথেষ্ট অন্যায় করেছে ভগবান তাদের উপরও করুণা না করে থাকতে পারবেন না।

শেষ বারের মত যদি তোমার একখানা চিঠি আজ পেতুম· ···না, এও একটা স্বার্থপরতা··· !

৬৪

বিরাট ব্যাপারটায় আমি বেশ কাজের ভার পেয়েছি আমরা আশা করছি যে, আক্রমণ যখন আরম্ভ হবে তখন আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। পদাতিক দল সুবিধা পেলে কামানের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারবে, কাজেই সামনের লাইন পর্যন্ত কামান নিয়ে যাবার একটা পথও তৈরী রাখছি। আক্রমণের দিন ঐ পথটাকে টেনে অজানার রাজ্যে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে—একেবারে সেই হূণদের ট্রেঞ্চের দিকে। শত্রুর অগ্নিবৃষ্টি মাথায় করে' এ কাজটি করতে হবে এবং এ কাজের বিশেষ ভার পড়েছে আমার উপর। আমার অধীনে থাকবে শত-খানেক লোক। বেঁচে ফিরে আসবার আশা ছেড়ে এগিয়ে যেতে হবে বলে এ কাজে কাউকে বাধ্য করা হয়নি—স্বেচ্ছায় যারা আসবে তাদের নিয়েই দল তৈরী হবে। মস্তবড় বুক নিয়ে এ কাজে আসতে হবে। আমাদের উপর হুকুম আছে

যে আহত হবে তাকে ফেলে রেখে চলতে হবে। যেমন করেই হোক পথ চাই। আমরা ইতিমধ্যে প্রথমাংশটা তৈরী করেছি। কামান-বস্তি তৈরী করবার সময়ই এটায় হাত দিয়েছিলুম। কখন কাজে নামব তা চাঁদের উপর নির্ভর করে, তবে প্রায়ই মাঝরাত্রে যাই। কানাকানি ছাড়া জোরে কথা বলবার নিয়ম নেই—তামাকটি পর্য্যন্ত খাওয়া বন্ধ। যে মুহূর্ত্তে জার্ম্মাণ হাওয়াই আকাশে উঠে, আমরা মাটী আঁকড়ে শুয়ে পড়ি, তারপর আবার তাড়াতাড়ি উঠে গর্ত্ত ভরাট করি—খারাপ জায়গায় কাঠের তক্তা পেতে দিই—তারপর ট্রেঞ্চের উপর সাঁকো বসাই। শত্রু বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আমাদের মতলব কি—কারণ রোজ রাত্রে তার বন্দুকের গুলি আমাদের খুঁজে বেড়ায়—মাঝে মাঝে খুঁজেও পায়!

এই অবিরাম হত্যা একদিকে যেমন জঘন্য আর এক-দিকে তেমনই চমৎকার! আমার লোকগুলোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এ হুকুমে হয় না, পয়সায় নয়, পারিতোষিকের লোভেও নয়—আন্তরিক ইচ্ছার মহত্ত্বই তাদের এই অমানুষিক সাহসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের লোকরা সামাজিক জীবনে কি বা কে ছিল তাতে কিছু এসে যায় না, বিপদের সময় সকলেই সমান ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করে। তাদের মধ্যে কতক পাবলিক্-স্কুলে-পড়া ভদ্রসন্তান, কেউ বা দোকানী, পশারী আর কেউ বা দিন-মজুর। দলে কতকগুলো লোক আছে যারা এককালে ছিল কয়েদী, কিন্তু অপর সবায়ের তুলনায় তাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বা বীরত্বের লঘুতা ত' কোনদিন চোখে পড়েনি। মানুষকে কেমন করে ভালবাসতে হয়, সমান করতে হয়, যুদ্ধে এসে সে শিক্ষা লাভ করেছি; জীবনের অন্য ক্ষেত্রে মনে হয় এ শিক্ষা দুর্ল্লভ। এই সব লোকের শান্ত ও সহজ বীরত্বের সামনে আমি ছোট হয়ে যাই। তাদের অবস্থায় তাদের মত সমান করে কাজ করতে পারতুম কিনা সন্দেহ হয়। সব সময় হুকুমের দ্বিগুণ কাজ করে—মুখ ভার করা কাকে বলে তারা জানে না—চোখে মুখে তাদের হাসির বিরাম নাই, কাজের জন্য হাত দুখানা যেন এগিয়েই আছে।

কিন্তু এই দীর্ঘ পরিশ্রম ও উদ্বেগের ফল বড় ভয়ানক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি যে শীগগীর আক্রমণটা হোক্। চব্বিশ ঘণ্টা কাদায় দাঁড়িয়ে বালিভরা থলি জমা করা, সাঁকো বসান আর অন্ধকারের আবরণে প্রাণপণ আগ্রহে মাটী কাটা ও শীতে আড়ষ্ট হওয়ার চেয়ে মনে হয় নরকের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়াও খুবই সহজ। আমরা নিজেরা উদাহরণ দেখাবার জন্য কোদাল নিয়ে কাজে লেগেছি—নিজে মুখে সিগারেট দিয়ে বসে থেকে লোকদের প্রাণপণ কাজ করতে বলায় যে প্রচণ্ড লজ্জা!

উদ্বেগে মানুষের স্নায়ু কেমন খারাপ হয়ে যায় তা তোমায় বলি। একটা অদ্ভুত উদাহরণ পেয়েছি। মৃত্যুর কিছু আগে বেচারী ষ্টিফেন একটা স্বপ্ন দেখেছিল। সে দেখলে একটা বনের ভিতরে সে এসে পড়েছে—ঘন ঝোপের পাশে একটী ছোট সাদা ক্রশ তার চোখে প'ড়ল। নীচু হয়ে সে পড়লে—তাতে লেখা—"জ্যাক হোণ্টের পবিত্র স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত।" তোমার মনে আছে যে, জ্যাক যখন ছুটীতে অনুপস্থিত তখন ষ্টিফেন মারা যায়। ফিরে এসে জ্যাক আমায় বল্লে-"আমি আগেই জানতুম ষ্টিফেন মারা গেছে।" তারপর অবিকল সেই স্বপ্নটা বর্ণনা করলে, কেবল যখন নীচু হয়ে সে ক্রশে খোদা কথাটা প'ড়ল, তাতে শুধু লেখা ছিল—"ষ্টিফেন"। একটা স্বপ্ন ফলেছে, কিন্তু আর একটা—সে কথা বলতে আমার গা শিউরে উঠে! লিখে রাখার ফলে হয়ত ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সত্য হয়ে যেতে পারে। জ্যাককে বিপদ-সীমার বাইরে রাখবার জন্য আমরা প্রাণপণ করছি; যখনই কোন বিশ্রী কাজ তার ভাগে পড়ে, আমরা মেজরকে ধরে সেটা আমাদের ভাগে নিয়ে নি। জ্যাক তা বুঝতে পারে না, আমরাও তাকে এসব কিছু বলি না। মেজর সাহেব তার উপর বিশেষ আস্থাবান না হওয়ায় তার ভাগে কঠিন বা বিপদসঙ্কুল কোন কাজ পড়ে না, এই জ্যাকের ধারণা। আমার বিশ্বাস, নতুন আক্রমণ আরম্ভ হবার আগেই সে উড়ো সৈন্যদলে যাবার অনুমতি পাবে।

তোমার কাছ থেকে আজকাল আর কোন চিঠি পত্র আসে না—সামনের কামান-বস্তিতে ডাক এলেই আমার বুক দুরদুর ক'রত, কারণ আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, তোমার কাছ থেকে একদিন চিঠি আসবেই। এখন আর তা নেই। অবশেষে আমি বুঝেছি যে তোমার কাছে আমি কিছুই নই, আমায় তুমি ভুলে গেছ! অথচ—একদিন ছিল যখন—না,

নিজেকে আমি কি বঞ্চনাই করেছি! আমার উপর যদি তোমার দরদ থাকত, তা হলে চিঠি না লিখে কি তুমি থাকতে পারতে? তোমার এই সু-দীর্ঘ মৌনিতায় সে কথাটা আমায় একটু একটু করে জানাচ্ছ। এ রকম করে জ্ঞানদানের মধ্যে আমার উপর তোমার করুণা প্রকাশ পাচ্ছে—সে কথা স্বীকার করে নিচ্ছি।

বন্ধু আমার, যে কটা দিন আর বাকি আছে তার মধ্যে তুমি আমার কাছে কতখানি তা যদি জানতে! ভাল যে বাসে না, তাকে ভালবাসা খুব অদ্ভুত তা জানি—নিজের ভাল বাসায় ব্যস্ত থেকে ভালবাসা পেয়েছি বলে ভুল করার জন্য হাসি মুখে ভদ্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করাও চলে তাও মানি; কিন্তু এরকম করে যারা ভালবাসে তাদের প্রেমের গভীরতা কম; অন্য জায়গায় মনের মত মন খুঁজে নেবার হয়ত অনেক সময় তাদের হাতে থাকে। কিন্তু জীবনে একবার মাত্র ভালবাসার অধিকার ও সুযোগ যারা পায় তাদের মত যে তোমায় ভালবেসেছি—আর আমার জীবনের গণা প্রহরের সংখ্যাও বুঝি ফুরিয়ে এলো!

তুমি ত এসব জান না, তবে অনুযোগ করে মরছি কেন? তোমায় যা বলেছি বা লিখেছি তা থেকে বিচার করলে আমায় হয়ত নেহাৎ বাজে লোক বলে তোমার মনে হতে পারে। প্যারিসে আমাদের আলাপ একটু জমেছিল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম। আমার কথা বা কাজে এমন কোন আভাস ছিল না যাতে তুমি আমার কথা বিশেষ করে ভাবতে পার। এমন কোন কারণও নেই। আমি ওরকম করে ব্যবহার করেছি যাতে তোমার মনে কোন সন্দেহও না জাগে। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে না, হচ্ছে আমারই জন্য, কারণ আমার প্রকৃত মনোভাব গোপন করবার সেদিনকার সার্থক প্রয়াসই আজ আমায় পীড়া দিচ্ছে।

আমার মাটীর নীচে ঘরের দেওয়ালে বাতি গুঁজে, তার আলোতে এসব লিখছি। এখন প্রায় অর্দ্ধেক রাত। সার্জ্জেণ্ট মেজর লোকদের গাঁতি, শাবল দিচ্ছেন, তার টুং টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কয়েক মিনিট পরেই তিনি অভিবাদন করে জানাবেন—"কাজের দল ঠিক হয়েছে মশায়—সবাই উপস্থিত ও প্রস্তুত।" এই ছায়ামানুষের দল যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে যাব এবং একসঙ্গে সামনের লাইনের দিকে অগ্রসর হব, কামান-বস্তি পার হয়ে যেখানে পৌছাব সেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে দশ-সেরী ওজনের গোলা আগুন বৃষ্টি করছে। তারপর তারের বেড়া দেওয়া মাঠ—সাবধানে এ জায়গাটাও পার হতে হবে। অবশেষে যে পথ পাব তা হয়ত কাদার মধ্যে তিন ইঞ্চ ডুবে গেছে। রাতে এপথ নানা রকমের গাড়ীতে ভরে যায় অথচ দিনের বেলা সাহারার মত জনশূন্য। পাঁক ভেঙ্গে চলতি গাড়ীর ছিটকান' কাদা গায়ে মুখে মেখে, এপথ ধরে চলতে হবে, যতক্ষণ না একটা বারুদখানা ও ট্রেঞ্চ ট্রামগাড়ীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। ট্রাম ধরে হূণরা যেখানে হাওয়াই ছুড়ছে সেখানে পৌছে খোলামাঠে হামাগুড়ি দিয়ে প্রথম লাইনের দিকে আমাদের রাস্তা যতদূর এগিয়েছে সেখানে পৌছাই। সেখানে ছুঁচার মত মাটীর কাজ করি। ফিস্‌ফিস্ করে হুকুম চলছে, নীরবে আহতদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অজানার দেশে এই পথ ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। আকাশের গায়ে উষার প্রথম আলোক-রেখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব ক্লান্ত হয়ে লুকিয়ে পালিয়ে আসব। বাইরে সেনানী-মহলে রঙ্গরসের কথা শুনতে পাচ্ছি। আজ রাতে কে ছুটী পাবার মত আহত হবে তা নিয়ে বাজী চলছে। একজন এ সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চিত দেখছি। সে বলছে যে বাঁ হাতের আঘাতই তার মনোমত, কারণ ডান হাতটা তার প্রণয়িনীর কটি-বেষ্টনের জন্য সে বাঁধা রেখেছে। এরা সত্যই অজেয়।

সার্জ্জেণ্ট মেজর এসেছেন—"কাজের দল সবাই উপস্থিত ও প্রস্তুত, মশায়।" আমি অভিবাদন করে বল্লুম—"যাচ্ছি।" এ নিশুতি রাতের নির্জ্জনতায় অনেক কিছু অন্যায় কথা লিখে ফেলেছি, বন্ধু! তোমার মনোমন্দিরে যে দিন প্রেমের আসন পড়বে, তোমার মনোলতায় যেদিন তা ফুলের মত ফুটবে, সেদিন সব কথাই তুমি বুঝবে ও আমায় ক্ষমা করবে। আশা করি, তোমার প্রণয়-লাভের সৌভাগ্য ভবিষ্যতে যিনি অর্জ্জন করবেন, সে মানুষটি সর্ব্বাংশে তোমার মনের মত।

তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে আনন্দ পেয়েছি বন্ধু, যেন আরও কাছে এসেছ। আজ রাতের কাজে নতুন করে যেন উৎসাহ পাচ্ছি।

১৫

বোধন পর্ব্বের আজ শেষ দিন। কাল থেকে মরণ-মহোৎসবের আরম্ভ। আমার দলের সব ক'টি লোকই বাছাই করা। এ যেন ছক্কার তাস, চাইবামাত্র হাতে এসে উঠেছে। কর্ণেলের সঙ্গে গোলন্দাজ ও গাড়ীর চালকদলের মধ্যে গিয়ে লোক চাইলুম। মর্ম্মান্তিক আঘাতের অবহেলায় প্রাণ হারাবার সমস্ত সম্ভাবনার কথা কর্ণেল সাহেব বিশদ ভাবেই তাদের কাছে আলোচনা করলেন। আমাদের ও শত্রুদলের প্রথম সারের মাঝখানে যে বিপুল ও বিপদসঙ্কুল অজানার রাজ্য সে শশ্মানে যে নরক এসে হানা দেবে একথাও তিনি গোপন করেন নি। আমরা হয়ত বাধা না পেয়ে এগিয়ে যাবো—হঠাৎ জার্ম্মানরা মাঝখানে ব্যূহ সৃষ্টি করে ফেরবার বা সাহায্য পাবার সকল পথই বন্ধ করবে। সেই অনিবার্য্য বন্দিত্ব বা মৃত্যু, সে বীভৎস সম্ভাবনায় কেউই ট'লল না। দু'দলের প্রত্যেক লোকই কর্ণেলের ডাকে এগিয়ে এল। কারুর মনে ব্যথা না দিয়ে, মৃত্যুপ্রার্থীদের বেছে নেওয়া সত্যই আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। যাই হোক, এখন দল গড়েছি—চার ভাগে তা ভাগ করেছি। দুইদল কামানের গোলায় ফাটা মাটীর গর্ত্ত ভরাবে, একদল তারের বেড়া কাটবে আর শেষ দল জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চের উপর সাঁকো বসাবে। এ কাজের যন্ত্রপাতি রাতের অন্ধকারে গর্ত্তের মধ্যে এর মধ্যেই আমরা রেখে এসেছি।

এ জীবন-মরণ অভিনয় বাস্তবিকই আমাদের কাছে মহোৎসব। আমরা যে কত খুসী, তা তোমরা বুঝতেই পারবে না। ঘরের চার দেওয়ালের আওতায় বসে আত্মীয়জন হয়ত ভাবতে পারেন যে ধ্বংস যেখানে বৃক্ষাবলম্বী কালনাগের মত মাথার উপর দুলছে, সেখানে মানুষের মন মেজাজের ঠিক নেই ; কিন্তু সে ধারণা একেবারে মিথ্যা। আয়োজনের পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে যদি মনে কোন দিন বিরক্তি এসেও থাকে তবে বিরাট সম্ভাবনার আনন্দে তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের মনোভাব তোমাদের বোঝাতে পারব না। মনে হয় এ মনোভাবের পিছনে আছে অদ্ভুত কর্ম্মের দুঃসাহস। বিপদ যেদিন মানুষের আত্মাকে যুদ্ধে আহ্বান করে সেই দিনই এই সাহসের জন্ম।

কাল এমন সময় আমাদের মধ্যে থেকে কতজন যে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ভাবে চলে যাবে, কে তা জানে? কিন্তু আমরা সবাই যে অকস্মাৎ গৌরব লাভ করব সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বাইরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীতে আজ সকল শব্দেই যেন গীত-মাধুর্য্যের আভাস পাচ্ছি। আর্দ্দালীদল সেনানায়কদের উর্দ্দির বোতাম আর চামড়া পালিশ করছে, মৃত্যুর মাহেন্দ্রক্ষণে উৎসব-বেশে না থাকার লজ্জা যেন কেউ না পায়। আর্দ্দালী আমার জন্য সবচেয়ে সৌখীন পোষাকটী সাজিয়ে রেখেছে ; আমি তাকে কিছুই বলিনি। কারোকে কিছু ব'লতেও হচ্ছে না।

কাল রাত্রে যে কোন্ জমিতে বিছানা পাতব' তা ভগবানই জানেন। আমরা যা ব্যবস্থা করেছি তা শুধু কামানের গাড়ী নিয়ে অজানার দেশে এগিয়ে চলার। মানুষ আর ঘোড়ার জীবনমূল্যে এই কামান-শ্রেণী রচিত হয়েছে। তাদের বেলুন আর আকাশ-জাহাজের নির্দ্দেশ-মত শত্রুরা আমাদের উপর শেল বৃষ্টি করবে নিশ্চয়। এ এক বিপর্য্যয় অভিনয়, উন্মত্ত খেলা—যার মোহ আমাদের দেহ মন আচ্ছন্ন করেছে। এমন করে' সাহসের পরীক্ষার দিন জীবনে বড় বেশী আসে না। প্রকৃত বীরত্ব প্রকাশের অবসর কোন্‌দিন আসবে, তা কেই বা আগে জানতে পারে? আমার মনে হচ্ছে, বহু জীবন বাঁচাবার জন্য সাহায্য করছি এবং ইতিহাস গড়ে তুলছি, এই বোধই আমাদের সাধারণ চিত্তে মহত্ত্বের অবলেপ দিয়ে দিয়েছে।

আমি লিখছি আর অন্য দল থেকে সেনানায়ক কয়েক জন আমার কাছে বসে তাস খেলছে। রঙ্গরস কথাবার্ত্তার স্রোত চলেছে, যেন সহরের কোন বৈঠকখানা, কে বলবে আমরা শ্মশানে আস্তানা পেতেছি।

বিপদকে বরণ করে' নেবার মত অচঞ্চল বীরত্বের লক্ষণ আমি নিজের মধ্যে দেখেছি। এখন তোমার সম্বন্ধে শান্ত-ভাবে, পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভাবতে পারছি—এতদিন যে স্বার্থ-পরতা আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার ঘোর যেন কাটছে। আজ আমি বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ যে, তোমার পরিচয় এ জীবনে একদিন পেয়েছিলাম—কয়েক দণ্ডের আনন্দময়ী সঙ্গিনীরূপে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে। কিন্তু সত্যই কি তোমাকে হারিয়েছি! কাল যদি নিরাপদে বেরিয়ে আসি, আমার মনের সকল কথা জানিয়ে তোমায় যে

আবার চিঠি লিখব একথা বারে বারে মনে হচ্ছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে আমার চিঠি তোমার কাছে পৌঁচেছে আর তুমি তা পড়ছ। এ এক চিত্র! তোমার সরল ভ্রূযুগটি ক্রমেই কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। আমার চিঠিতে অনুরাগের গভীরতা ও ভাষার উন্মত্ততা যত বাড়ছে, তোমার বিস্ময়ও জাগছে সেই অনুপাতে। আমার এতদিনের সাবধানে লেখা ভদ্র চিঠির পরে এ দুরন্ত প্রেমলিপির অকস্মাৎ আবির্ভাব—বিস্ময়কর সত্যই—কিন্তু বন্ধু—আমার চিঠি যতই ভব্য হোক, উত্তর আর তুমি দিলে কই? না—সত্যই তোমায় দু-এক লাইনে চিঠি লিখছি। বেশ শিষ্ট ভব্য চিঠি। তাতে লিখব, আমরা কত আনন্দে আছি; পথের কাদা কেমন করে শুকিয়ে যাচ্ছে—এই সব। এত দিন যেমন পাঠিয়েছি তেমনি আর একটা চিঠি, যাতে তোমার মনে হয় যে যুদ্ধটা একটা মজা—মজাই বটে, তবে এ আনন্দের হারে গাঁথা আছে রক্তপাতের নিদারুণ বিভীষিকা!

তোমায় লিখেছি বোধ হয় যে, কয়েকদিন আগে আমার মাথায় চোট লেগেছে। মাথায় আজো ব্যাণ্ডেজ রয়েছে, তবে ভেব না যে কোন দিন তুমি আমায় এ অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখতে পাবে। শরীরে নানা জায়গায় ঘা ফুটে উঠেছে, বিষ যেন প্রতি অঙ্গে রক্তের সঙ্গে ছড়িয়ে গেছে। আমার একার নয়, অনেকেরই এই দুর্দ্দশা। মনে হয় শাকসবজীর অপ্রাচুর্য্যে আর সাঁাতসেতে পাতাল ঘরে থাকার ফলেই রক্তের দোষ ঘটে। সেনানায়ক যে আজও আমায় হাসপাতালে পাঠান নি, সেইটুকুই সৌভাগ্য। এই বিরাট ব্যাপারটা যখন শেষ হবে তখন চিকিৎসার যথেষ্ট অবসর পাবো—কিংবা চিকিৎসার অতীত লোকে—কি জানি?

তুমি এখন কি ক'রছ তাই ভাবতে সাধ যাচ্ছে। তোমার ছবিখানি দেখছি—শিশু-হাসপাতালে খাট থেকে খাটে তুমি কেবলই ঘুরছ, মা-হারাদের সঙ্গে তোমার যে মায়ের খেলার পালা।

তুমি পুরান' ঠিকানায় আছ কি? আমি ত' সেই ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি। আর নয়, জ্যাকের হাতের তাস নিয়ে আমায় বসতে হবে, আমি এতক্ষণ যা করলুম, সেও তাই করতে চায়—এ জগতে যে মেয়েটিকে সে সব চেয়ে ভালবাসে, চিঠির ছলে দুদণ্ড তার সঙ্গে কথা বলতে তার সাধ। পরে তোমায় আরও কিছু লিখব * * *।

এখন রাত দশটা। সবাই ঘুমিয়েছে। আমিও চেষ্টা করলুম, ঘুম এল না। আমার আত্মীয়দের সবাইকে বসে বসে চিঠি লিখলুম। বোধ হয় আমার কাছ থেকে এই তাদের শেষ চিঠি। তোমার চিঠিখানিও শেষ করেছি। এখন লেখনী বন্ধ রেখে একটু চেঁচিয়ে ভাবছি। আর্দ্দালীকে বলেছি যে, যদি আমার চরম কিছু ঘটে তবে আমার কাগজপত্র সব যেন পুড়িয়ে ফেলে। তুমি কোনদিন তা হলে জানতে পারবে না, বন্ধু, তোমায় কেমন করে আর কতখানি ভাল বেসেছিলুম। তোমার জীবন থেকে অলক্ষ্য পদসঞ্চারে আমি চলে যাবো, তোমার শান্তির কোন ব্যাঘাতই আমি করব না। বলত বন্ধু, এই কি আমার উপযুক্ত কাজ নয়? আমাকে প্রত্যাখ্যান করবার বিরক্তিকর কোনদিন তোমাকে ভোগ করতে দিইনি, প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনাও আমি পাই নি। তুমি যে আমার, শেষ পর্য্যন্ত এই মোহ মনে জাগিয়ে রেখে গেলুম।

চাকরকে বলে রেখেছি, মাঝরাত্রে সে আমায় জাগিয়ে দেবে। মানুষটি বেশ। এত অযাচিত যত্ন করে আমায়। ভোরের আলো ফুটবার আগেই উৎসব-বেশে দলবল নিয়ে আমি বেরিয়ে প'ড়ব—সামনের দিকে—অজানা রাজ্যের নিরুদ্দেশে। আমাদের সৈন্যদলকে পথের খোঁজ দেবার ভার যে আমাদের। অক্সফোর্ডে বাচ-খেলার আগের রাত্রে যেমন দেহে মনে চাঞ্চল্য আর অস্বস্তি জাগত, আজ ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে, যেন শেষ হ'লেই বাচি। তোমায় বলেছি কি, দাঁড়ির দলে আমার নাম ছিল? কাল যেন সেই পুরাণো ভূমিকায় নামতে হবে। দলের গতি নির্ণয় করতে হবে, তাদের সাহস যোগাবার ভার আমারই। ভাবছি, কতগুলো 'কাল' আর আমার জীবনে বাকি রইল?

ঘরের এক কোণে শুয়ে বিল লেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকছে। কথা শুনে বুঝলুম যে জার্ম্মাণরা যেন তাকে ঘিরেছে আর সে ধরা দিতে বিষম নারাজ। এই মরণ-মহোৎসবের আগে যে সে বিয়ে করতে পারলে না, এতে বেচারী ভারি দুঃখ পেয়েছে। অথচ বিয়ে হলে সে মেয়েটীর দুঃখের কি আর অবধি থাকত? মনে হয়, আজ রাত্রে শত শত লোকের মনে এই এক চিন্তাই তার লুতাতন্তু বুনছে।

আচ্ছা, আমার উপর তোমার সত্যি কোন দরদ কেন জাগল না, বলতে পারো? আজকাল কেবলই এই প্রশ্ন আমার মনে আসে। তুমি যে আমার জন্য আদৌ ভাব না তা এত স্পষ্ট করে বুঝেছি, কিন্তু সেই ত আমার বেদনা ও বিস্ময়। জীবনের শত মিলন-মেলায় ঘোরা ফেরা করলুম অথচ কারো ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারলুম না, কেউ এসে হাতে হাত রেখে বল্লে না 'তুমি আমার'। মেয়ের ত' পৃথিবীতে অভাব নেই—একজনও অন্তত—।

যার প্রিয়া নেই, প্রিয়তমা নেই, এমনতর গাড়োয়ান, গোলন্দাজ যে আমার ব্যাটারীতে কেউ আছে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাদের চিঠি দেখলেই বুঝবে যে, তাদের চিত্তের আঙ্গিনায় মনের মানুষ যে ঘোরা ফেরা করে তার চিহ্ন কত। প্রিয়া আর প্রিয়তমা কেন বলেছি জান? একে ত' সবায়ের অভিরুচি নেই—প্রিয়া তাঁদের অনেকগুলি। মনের দুর্গে তারা হারেম খুলেছে। জান তো আমার লোকজনের চিঠি খুলে দেখে ছাড়বার ভার আমার। তাই ত' এত কথা জেনেছি। তাদের আমি দোষ দিচ্ছি না। নিজের প'রে করুণাও আমার নেই। তোমার সম্বন্ধে যে আমার গোপন মনোভাব নির্দ্বন্দ্বে পোষণ করতে পেরেছি, সেইটুকুই আমার যথেষ্ট। তবু বিস্ময় জাগে, জীবনের এই অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের পরিচয় পেলুম সেইদিন, জীবনশেষের বাঁশী যখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠেছে।

কি জানি, এ বাঁশী হয়ত নব-জীবনের আশ্বাস-রাগিণী। হয়ত ফিরে আসব। কিন্তু তুমি যদি সে প্রত্যাবর্ত্তনকে অভিনন্দিত না করো, তবে ফিরে আসবার ইচ্ছা আছে কি না, মনকে তা নিয়ে যাচাতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা। তার চেয়ে আজ যদি মরি তবে আমার একক প্রেমের পরিপূর্ণতা কি কেউ অস্বীকার করবে? আর যদি তুমি—?

সব কথা কি আজ বলব তোমায়? যুদ্ধের আরম্ভ থেকে ফ্রান্সের ভূমিতে শেষ শয্যা নেবার আমার বড় সাধ। এত বেশী লোক মরেছে যে আমার বেঁচে ফিরে যেতেও লজ্জা হবে। পরের জন্য নিজের জীবন দেবার এই আমার একমাত্র অবসর। এহেন সুযোগ আমি হারাই কেমন করে? আর কত হারাব বল? তোমায় হারিয়েছি, জীবনে কত কি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেছে—এটাও কি তেমন করে চলে যাবে।

আমি জানি, অনেকের পক্ষে মন নয় এ দেহই প্রকাণ্ড বাধা—আমার কিন্তু আর সে বাধার ভয় নেই!

এতক্ষণে আমার আর্দ্দালী জেগে উঠেছে। আমি পোষাক পরে' প্রস্তুত দেখে বেচারী একেবারে অবাক। মানুষটি এত ভাল। আমার উপর তার অখণ্ড মমতা। সে আমায়—কেমন করে বলব—এতদিন মায়ের মত স্নেহ যত্ন করেছে আজ সারাদিন কতবার আমায় বলেছে— "আশা করি এ ব্যাপারের ভিতর থেকে আপনি অক্ষত ফিরে আসবেন। অন্য অফিসারের কাছে নতুন করে কাজ করতে হবে ভাবতেও আমার কষ্ট হয়।"

আমি লিখছি আর সে আমার কোকো আর কামাবার গরম জল তৈরী করবার জন্যে কাঠ চেলা করছে। আমায় সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠাবার ভার যে তার - আমার পারিপাটা-হীনতা যে তার লজ্জা! 'আর লিখব কি না' জিজ্ঞাসা করছে—'আর লিখব না' বলে দিলুম।

তুমি এতক্ষণে ঘুমিয়েছ। তোমার হৃদয়ের 'পরে আমি যেদিন নত হয়েছিলুম সেদিন তোমার হৃদয়ও এমনি নিদ্রিত ছিল। তা বলে' তোমায় আমি ভাল না বেসে পারি নি। যদি বিপুল জীবনের অধিকারী হতাম, তোমার ঘুমন্ত হৃদয়কে ধীরে ধীরে অক্লান্ত চেষ্টায় হয় ত একদিন জাগিয়ে তুলতাম। সময় যে নেই বন্ধু—সময় যে কোনদিন পেলুম না—যেদিন দেখা হল তারপর থেকে অবসর খোজবার অবকাশটুকুও আমি পাই নি।

ঘুমাও, আমার নিদ্রিত বন্ধু, তোমার রজনী শুভ হোক্! অজানার রাজ্যে আমার নির্ব্বাচিত একশত সৈন্য নিয়ে গোপন সুড়ঙ্গে মধ্য রাত্রে অগ্নিবৃষ্টির অপেক্ষাকালে আমি সেই কামনাই করব। বিদায়! যার ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগাবার চেষ্টা করি নি সেই নিদ্রিত বন্ধুর কাছে এই হয় ত আমার শেষ বিদায়-সম্ভাষণ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

'বাংলার পরিচিত পাখী"

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ আচার্য্য মহাশয় মল্লিখিত 'দোয়েল' নামক রচনাটি "বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই" করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তম প্রশংসার্হ, কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও তথ্যকে বিকৃত রূপে প্রচার করার চেষ্টা নিতান্তই নিন্দনীয়।

বিহঙ্গ-জীবনের কোনও পরিচয় দিতে গেলে কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। পাখীর দেহবর্ণনা (colouration), ভূপৃষ্ঠে তাহার পরিব্যাপ্তি (distribution), তাহার বাসারচনা ও ডিম্ববর্ণন (nest and eggs), এবং তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি (habits) এই কয়েক প্রকার পরিচয় দ্বারাই পাখীর বৈজ্ঞানিক বর্ণনা হইয়া থাকে। যে লেগ্ ও হুইস্লারের নাম মণীন্দ্রবাবু পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, কেন না তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সেরূপ বৈজ্ঞানিক পুস্তক বাংলায় রচনা করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কেননা, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি নাই যাঁহাকে পক্ষিতত্ত্ববিৎ বলা যায়। অবশ্য, পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসু দু'একজন পক্ষি-বিজ্ঞান-রসিক আছেন বটে।

আমার যে রচনাগুলি বাহির হইয়াছে সেগুলি অত্যন্ত সাধারণ পাঠককে পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যই লেখা। বিহঙ্গ-জীবনের বিবিধ রহস্য সম্বন্ধে এক এক পণ্ডিতের এক এক মত ; কেননা, সেগুলি এখনও "থিওরি" মাত্র। সাধারণ পাঠককে পক্ষিতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই আমার লেখার মধ্যে পক্ষি-জীবনের এই সকল রহস্য সম্বন্ধে মাত্র ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছি। কোনও বিশেষ মতের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা আমি করি নাই। পাঠকের কৌতূহল-সৃজনমানসে যে সমস্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা লইয়া মণীন্দ্রবাবুকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। দোয়েলের জীবন সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনা করা আমার উদ্দেশ্য হইত তবে এই সব বাদানুবাদমূলক থিয়োরির উল্লেখ মাত্র করিতাম না —হুইস্লারের বইখানা ছাঁকা অনুবাদ করিয়া দিলেই পক্ষিতত্ত্বের লেখক হিসাবে আমার কৃতিত্ব বজায় থাকিত। আমার প্রবন্ধের হাল্‌কা ভাষা দেখিয়াও কি সমালোচকের জ্ঞান হইল না যে এ প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক বাদানুবাদের জন্য নহে!

যদি কোনও তথ্য বা fact সম্বন্ধে সমালোচক আমার ভুল দেখাইতে পারিতেন তবে 'অজ্ঞ' পাঠকদের জন্য ইঁহার দরদ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু দোয়েলের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যতিক্রম দেখাইতে ইনি সক্ষম হন নাই। কতকগুলি মন্তব্য লইয়া তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। এবং পক্ষিবিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া পক্ষিবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন এবং বিজ্ঞের মত বলিয়াছেন যে, পক্ষিজীবন-পর্য্যবেক্ষণ আমাদের অবসর-বিনোদন বা খেলার বস্তু নহে। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিরাট অবসর সম্পন্ন সিভিলিয়ান ও সৈনিক কর্ম্মচারীদের অবসর-বিনোদনের প্রচেষ্টা হইতেই কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের পক্ষি-পরিচয় গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করার কাজের নামই বিশেষজ্ঞের গবেষণা। নানা দেশে নানা অবৈজ্ঞানিক লোকে যাহা অবসর-বিনোদনকালে পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে (laboratory) বসিয়া বিশেষজ্ঞ তাহারই সাহায্যে পক্ষিতত্ত্বের শাস্ত্ররচনা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন।

আশা করি, মণীন্দ্র বাবু ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা মহোদয়ের নাম শুনিয়াছেন। আমাদের মনে হয় লাহা মহাশয় বাংলায় একমাত্র পক্ষিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু লেখক। ইনি যদিও স্থায়ী ভাবে বাংলা ভাষাকে পক্ষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু দান করেন নাই তবু বিজ্ঞান-সম্মত লেখা ইঁহার নিকটই কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার লেখা ইংরাজীতে একখানা বই আছে, "*Pet Birds of Bengal*, (Vol. 1.)" এই ইংরাজী

পুস্তকে দোয়েল সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ আছে। আশা করি, মণীন্দ্র বাবু স্বীকার করিবেন যে এই পুস্তকখানি পক্ষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া লেখা। (এই পুস্তকখানি মণীন্দ্র বাবু পড়িয়াছেন তো?) আমি দোয়েল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা এই পুস্তকের বর্ণনা হইতে বিভিন্ন নহে।

দোয়েল সম্বন্ধে মল্লিখিত বর্ণনার একটি মাত্র তথ্য সম্বন্ধে মণীন্দ্র বাবু ভুল ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম—"পাঁচ হাজার ফুটের বেশী উঁচুতে ওঠে না।" মণীন্দ্র বাবু এতদুত্তরে লিখিয়াছেন—"ইহা লেখকের উক্তি। বিশেষজ্ঞ হুইস্‌লার বলেন যে ৬০০০ ফুটেও ইহাকে দেখা যায়।" এরূপ সমালোচনার দ্বারাই মণীন্দ্র বাবু আমাকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাকে কিন্তু জখম করিতে পারিলেন না। কেননা, হুইস্‌লার দেখিয়াছেন কি না এবং দোয়েল পাঁচ হাজার ফুট গিয়া থামিয়া যায় কি ৫৯৯৬ ফুট গিয়া থামে, সাধারণতঃ "উপাসনা"র কোনও পাঠকই সে জন্য ব্যস্ত নন। কলিকাতার গৃহপ্রকোষ্ঠে বসিয়া "আগে পড়াশুনা ও জ্ঞানার্জ্জন করিয়া" হুইস্‌লার সাহেবের শিষ্য যে খবরটি "উপাসনা"র পাঠককে দিয়াছেন, সেই পণ্ডিতি খবরের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া যদি কোনও রসিক পাঠক দার্জ্জিলিং ভ্রমণে গিয়া দোয়েলের খোঁজ করেন তবে দোয়েলের সূক্ষ্ম দেহ দিব্যচক্ষুর দ্বারা দেখিলেও দেখিতে পাইবেন, চর্ম্মচক্ষুদ্বারা তাহার স্থূল দেহের দর্শনলাভ ঘটিবে না। কেননা কার্শিয়ং ও তদূর্দ্ধ স্থানে অপণ্ডিত আমরা চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দোয়েল দেখিতে পাই নাই। ডক্টর সত্যচরণ লাহার পুস্তকে দেখিতে পাই—"In Bengal, no place is unrepresented up to the very base of the Himalayas, where it is not seen higher up than the Terais." "ইহা লেখকের উক্তি" বলিয়া যে কথা উড়াইয়া দিলেন, বাবু এখন কি করিতে চান? "Pet birds of Bengal" যখন বাহির হইয়াছিল তখন হুইস্‌লারের বহি বাহির হয় নাই বলিয়া কি সত্য বাবু ঐরূপ লিখিয়াছিলেন?

দোয়েলের একা থাকিবার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে মণীন্দ্র বাবু অনেক গবেষণামূলক উক্তি করিয়াছেন। ডক্টর সত্যচরণ লাহা বলেন—"Like all pugnacious birds, the *Dhayal* is unsociable to a degree, staying alone throughout the greater part of the year, and only occasionally in the company of its mate" (P.23). বলিতে ইচ্ছা করে—হুইস্‌লারের বহি বাহির হয় নাই বলিয়াই কি এরূপ লেখা হইয়াছিল?

মণীন্দ্র বাবু লেগ্ সাহেবের বিশাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এইটুকু—'These consort together when not breeding." এবং ইহার বাংলা অনুবাদ দিতেছেন—"অর্থাৎ জননেতর ঋতুতে দোয়েল পাখীগুলার (বিশেষতঃ পুং-পক্ষীগুলার) পরস্পর মেলামেশার অভ্যাস আছে।" সত্যবাবু কি লেগ্ সাহেবের বহি না পড়িয়াই পুস্তক-রচনা করিয়াছিলেন? লেগ্ সাহেবের পুস্তক আমিও পড়িয়াছি। লেগ্ সাহেবের ঐ লেখার সঙ্গে আমাদের পর্য্যবেক্ষণ মেলে নাই বলিয়াই লেগ্ সাহেবের কথা লইয়া আমার প্রবন্ধে কোনও মন্তব্য করি নাই। বিশেষতঃ লেগ্ সাহেব লঙ্কাদ্বীপের পাখী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, আমরা বাংলার পাখী লইয়া ছিলাম ব্যস্ত।

মণীন্দ্র বাবু খুব পাণ্ডিত্য ফলাইয়া, নিজেকে জীববিদ্যার ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং পাখীর শবদেহবিশ্লেষণে নিজের অভিজ্ঞতার ডঙ্কা বাজাইয়া যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এই:—"সন্তানজনন ঋতুতে পাখীর শারীর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের ফলে উহার দেহের ও মনের, স্বভাবের ও আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামাজিকতা লোপ পাইতে থাকে" ইত্যাদি। (উপাসনা, ৫৭১ পৃঃ)। পাখার শবদেহ বিশ্লেষণ করিতে শিখিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় ডক্টর সত্যচরণ লাহা মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"Sometimes one may notice a deviation from this habit of exclusiveness on the part of the *Dhayal*. But this is seasonal only. Prompted by a freshly roused combative instinct, the bird suddenly develops a gregarious impulse during the mating period." (*Pet Birds of Bengal* P. P. 2324). পাঠক শেষ কথাগুলির প্রতি নজর দিবেন এবং মণীন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন।

এখন কথাটা হইতেছে এই যে, দোয়েল বাস্তবিকই Solitary পাখী, অর্থাৎ সে একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে। তবে কেহ কেহ ইহাকে যে প্রজনন ঋতুতে gregarious হইতে দেখিয়াছেন, তাহা সামাজিকতা বুদ্ধি প্রণোদিত হওয়ার জন্য যে তাহা নহে। তাহা 'gregarious impulse' নহে; তাহা পক্ষিজীবনের যৌন-রহস্যের একটা দিক মাত্র। অনেক কথা বলিতে হয় বলিয়া আমি আমার রচনা (যাহা সাধারণের জন্য লেখা) হইতে সে সব বিষয় বাদ দিয়া গিয়াছি।

দোয়েলের একপত্নীত্ব সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিষ্ঠা বা প্রচার করার চেষ্টা আমি করি নাই। ডক্টর সত্যচরণ লাহার পক্ষিগৃহে দৃষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলাম। মণীন্দ্র বাবু "আগে জ্ঞানার্জ্জন" করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"এক পত্নীত্বের দাবী দোয়েল করিতে পারে কি না ভারতীয় পক্ষি-বিশেষজ্ঞরা এখনও পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না।" মণীন্দ্র বাবুর মতে ডক্টর সত্য চরণ লাহা হয়ত "ভারতীয় পক্ষি-বিশেষজ্ঞ" নহেন। আমরা কিন্তু সেইরূপ মনে করি এবং সেইজন্য সত্যবাবুর পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধার করিতেছি। 'The bird seems to have a remarkably monogamous instinct Observations of its habits in the aviary substantiate the fact that a cock-bird, which has lost its hen refuses to chum up with any other female, and feels so much enraged as to kill all subsequent wives submitted for its approval." (*Pet Birds*, P. 29.) মণীন্দ্র বাবু এত জ্ঞানার্জ্জন করিলেন আর বাংলার একমাত্র পক্ষিতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞের পুস্তক খানি হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন কেন?

দেখা যাইতেছে যে আমার কোনও সত্যকারের ভ্রমপ্রমাদ মণীন্দ্র বাবু দেখাইতে পারেন নাই। পাখীর protective colouration লইয়া "ভবিষ্যতে আলোচনা করিব" লিখিয়াছিলাম বলিয়া সমালোচক মহাশয় বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়াছেন। সে আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা তাহা ভবিষ্যতেই বুঝা যাইবে। এই বর্ণচৌর্য্য বা protective colouration (আমি যাহার পরিভাষা দিয়াছি 'সঙ্গোপনী বর্ণবিন্যাস') প্রকৃতির খেয়াল কি জীব-বিজ্ঞানবিশারদের খেয়াল তাহা জানি না। তবে এরূপ একটি রহস্যজনক আলোচনা যে জীব-বিজ্ঞান শাস্ত্রে আছে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। এ ইঙ্গিতের সুযোগ হইয়াছিল, কেন না "চুপ করিয়া দোয়েল যখন বসিয়া থাকে তখন চট করিয়া তাহাকে দেখা যায় না।" দোয়েলের দেহে দুইটি conspicuous colours থাকিলেও সবুজ পত্রাভ্যন্তরে আলোছায়ার আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দোয়েল আত্মবিলোপনে সমর্থ হয় কি না, সে কথা লেগ্, নিউটন ও হুইস্‌লারের বহির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। যাদুঘরের পাথুরে প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ আগরপাড়ার বাগান পর্য্যন্ত ধাওয়া করিলেও বুঝা যাইবে।

দোয়েলের "তালুক" সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম সে বিষয়েও সমালোচক অনেক পাণ্ডিত্য করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন না, আমার লেখা পড়িয়া নাকি বুঝা যায় না এই তালুক পুরুষ দোয়েলকে লইয়া কিংবা স্ত্রীপুরুষ উভয়কে লইয়া। মণীন্দ্র বাবুকে আমাদের অনুরোধ, এইরূপ বুদ্ধি লইয়া তিনি যাদুঘরের কামরায় বসিয়া "গবেষণা" ও "জ্ঞানার্জ্জন" করিতে পারেন, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষেত্রে যেন না নামেন, বিজ্ঞান বিপদে পড়িবে। সেইরূপ আমার রচনা পড়িয়া তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই দোয়েল ground bird কি arboreal. প্রকাণ্ড সমস্যা বটে!

সমালোচক আমার রচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভুল দেখাইতে পারেন নাই। আমার প্রবন্ধের শিরোনামা ও ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে যে কোনও সহজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই এরূপ সমালোচনা হইতে বিরত হইতেন।

যদি সমালোচক ভদ্রলোকের পক্ষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা থাকে তবে তাঁহার ভয় পাইবার বা ঈর্ষান্বিত হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। আমি "উপাসনা"র পাঠকের অবসর-বিনোদনেরই খোরাক (বিজ্ঞানসম্মত-সত্যরক্ষা করিয়া) বিনা পয়সায় জোগাইয়াছি। যদি মণীন্দ্র বাবু কৃপা করেন এবং মূল্য দিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে, তবে ইংরাজীতে হউক, বাংলায় হউক, আমি তাঁহার জন্য বিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিতে প্রস্তুত আছি, সে অভ্যাস ও যোগ্যতা আমার আছে।

শৃঙ্খল *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

৭

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আসিয়া বিশ্বেশ্বর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সাধারণ কয়েদীর ওয়ার্ডে সে যে ভিতরে ভিতরে এত হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই প্রথম টের পাইল।

লম্বা একখানা দোতালা বাড়ী; উপরে নীচে ছোট ছোট অনেকগুলি কামরা,—প্রত্যেক কামরায় একজন করিয়া থাকিতে পারে। একখানি লোহার খাট, খড়ের গদি ও বালিশ এবং বিছানার চাদরেরও ব্যবস্থা আছে। বিশ্বেশ্বর মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—বাঃ!

সে খাটখানি ওদিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া পাতিল, তাহার উপর গদি বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া সটান চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই দৃষ্টি পড়িল, টেবিলটা অসজ্জিত অবস্থায় এক কোণে পড়িয়া আছে। সে টেবিলটা ঘরের মধ্যখানে টানিয়া আনিল, চেয়ারটা তাহার পাশে বসাইল, এবং যেই মনে হইল বেশ হইয়াছে, অমনি তড়াক্ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে পা নাচাইতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় মনে হইল, ঘরে জানালা নাই তো! ও বাড়াতে হল ঘর, কিন্তু বড় বড় জানালা ছিল, চারিদিকের বাড়ী-ঘর, গাছপালা, আকাশ দেখা যাইত। আর কিছু না করিলেও অন্ততঃ চিলমিথুনের জীবনযাত্রা দেখিয়াও নিঃসঙ্গ দিনমান কোনো রূপে কাটিয়া যায়। এখানে সমস্ত দুপুর একেবারে একেলা, দিন কাটাইবে কি করিয়া ভাবিতেই শিহরিয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বরের আর শোওয়া হইল না। উঠিয়া চেয়ারে বসিয়া ঘরখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। না, জানালা একটা আছে। যেদিকটায় তাহার খাটখানি সেই দিকের দেওয়ালে, নাগাল পাওয়া যায় না এমন উঁচুতে জানালার মত শিক দেওয়া কি একটা দেখা যাইতেছে বটে। সে সোৎসাহে একেবারে টেবিলটার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে উৎসাহ শুকাইয়া গেল। জানালা ঠিক বলা যায় না,—একটা বৃহদাকারের গবাক্ষ। কিন্তু তাহাতে এক প্রস্থ তারের জাল দেওয়া আছে, তাহার উপর বাহিরের দিকে একখানা কাঠের তক্তা এমন ভাবে ঢালু করিয়া দেওয়া আছে যে, আলো এবং বায়ু যদি বা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পাবে, আকাশের চিহ্ন মাত্র দেখিবার উপায় রাখা হয় নাই। তাহার সমস্ত মন হাহাকার করিয়া উঠিল,—একটি মাত্র জানালা! অপরাধ করিয়াছে বলিয়াই কি এমনি করিয়া শাস্তি দিতে হয়? একটি জানালা রাখিলে ন্যায়ের বিধানের এমন কি অমর্য্যাদা হইত!

এই ওয়ার্ডে যখন সে প্রবেশ করে, তখনও টিক্‌টিকির ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। তাই চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার সময় পায় নাই যে, ইহার ঠিক পিছনেই আরও একটি ওয়ার্ড আছে। সে দুই হাত টেবিলের উপর বদ্ধাঞ্জলি করিয়া ভাবিতে বসিল,—ওই দেওয়ালই জেলের শেষ সীমানা। খুব সম্ভব উহার পিছনেই এক টুকরা মাঠ এবং তারপরেই জেলের শেষ উঁচু পাঁচীলটি। যদি ওইখানে একটা বড় জানালা থাকিত!—হয়তো বহির্জগতের কিছু দেখা যাইত—ট্রামের মাথার উপরকার ডাণ্ডাটি এবং হয়ত ছ্যাকরা গাড়ীর গাড়োয়ানের মাথার পাগড়ীর কিয়দংশও, এই টেবিলের উপর দাঁড়াইলে তার শ্রান্ত, বিরক্ত মুখখানির কতকটা দেখিতে পাওয়াও অসম্ভব নয়।

এমন সময় নীচে দুপ্ দাপ্ করিয়া বহু পায়ের শব্দ উঠিল। এ শব্দ বিশ্বেশ্বরের অপরিচিত নয়। পরে এমনি দুপ্ দাপ্ করিয়া কয়েদীরা ওয়ার্ডে ফেরে।

* "খেলাঘর" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শৃঙ্খল" নাম রাখা হইল। মনে হয়, "খেলাঘর"এর চেয়ে "শৃঙ্খল"এরই সহিত এই উপন্যাসের আখ্যানভাগের সামঞ্জস্য বেশী।—লেখক।

এখানে ফিরিঙ্গি এবং ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী কয়েদীর বাস। কিন্তু হইলে কি হয়? ইহারা সাধারণ কয়েদীর অপরাধেই অপরাধী, এবং সামাজিক আসন সাধারণ কয়েদীর চেয়ে যত উচ্চই হোক, মানুষ হিসাবে তাহাদের চেয়ে উচ্চ নয়। ইহাদের সহিত আলাপ করিবার আগ্রহ বিশ্বেশ্বরের কখনই ছিল না। সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে ওয়ার্ডার আসিয়া সকলের ঘরের তালা খুলিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহাদের রাত্রির আহার্য্যও উপস্থিত। সকলে হুড়মুড় করিয়া নিজের নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং গায়ের জামা ও পায়ের জুতা কোনো মতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া থালা লইয়া রাত্রের খাবারের অংশ লইতে ছুটিল।

সে এক তুমুল ব্যাপার!—চীৎকার, কোলাহল ও হুড়াহুড়ি!

বিশ্বেশ্বরও থালা লইয়া খাবারের অংশ সংগ্রহ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল বলিয়াও মনে হইল না।

কিন্তু ঘরে আসিয়া বসিবার মিনিট দশেক পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া অতি সন্তর্পণে একটা চেয়ার টানিয়া বইয়া বলিল,—এই যে! কেমন আছেন?

বিশ্বেশ্বর মুখে বলিল,—ভালো।

এবং অবাক হইয়া ভদ্রলোকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ময়লা রং, মাথার সুমুখের দিকে চুলের চিহ্ন মাত্র নাই, মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি, সুমুখের কয়েকটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, এবং বাকীগুলিও নোটিশ দিয়া রাখিয়াছে। ভদ্রলোক এত সন্তর্পণে চলাফেরা করে যে, জুতার শব্দ পাওয়া যায় না এবং এমন ধীরভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলে যে, মনে হয় অর্দ্ধেক কথা চাপিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া সে আপন মনেই একটু হাসিল। ভাবটা, তুমি যে আমাকে চিনিতে পারো নাই তাহা আমি বুঝিয়াছি। এবং বুঝিয়াই বলিল,—আমার নাম ঘোষ, বাইরে মিঃ বি, বি, ঘোষ বললেই বিখ্যাত, তবে এখানে শুধু ঘোষ বললেই সবাই চিনবে।

বিশ্বেশ্বর একটু ভাবিয়া বলিল, সেই যাঁদের কালির—

ঘোষ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—কালি-কালি না মশাই, এডভোকেট বি, বি, ঘোষ, হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করতাম।

হাইকোর্টের খুব বড় দু'চার জন ছাড়া কোন এড্-ভোকেটকেই বিশ্বেশ্বর চেনে না, বিখ্যাত মিঃ বি, বি, ঘোষকেও না। সে বলিল,—ও।

ঘোষ মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার একবার মুখ নীচু করিয়া হাসিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আপনি অদৃষ্ট মানেন?

এ সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বর কখনও কিছু ভাবে নাই। ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিল,—তা—হ্যাঁ—মানে—

ঘোষ সগর্ব্বে বলিল—আমি মানি।

বলিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বিশ্বেশ্বরের চোখের সুমুখে ধরিল, সব এই হাতে, বুঝলেন? কিছু এড়িয়ে যাবার উপায় নেই,—জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত।

ঘোষ করতল খানি নিজের চোখের সুমুখে রাখিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। এইবারে নিজের নিজের সেলে যাইবার সময়। বাহিরেও একটা হুড়াহুড়ি পড়িল। ঘোষ ধীরে সুস্থে চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল—আচ্ছা, কাল এ সম্বন্ধে কথা কইব এখন। আজকে—

কিন্তু দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়াই আবার পিছন ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা আপনি ঘোড়ায় চ'ড়তে জানেন?

—না।

খুব দুঃখিত ভাবে ঘোষ বলিল—জানেন না? ওটা শিখে রাখা ভালো।

তাহাকে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে উঠিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল—এখন তাই দেখছি।

—হুঁ। বলিয়া ঘোষ নিজের সেলে চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ঘোষের অতি সন্তর্পণে চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে হাসিতে-ছিল। এমন সময় তাহাদের ওয়ার্ডের ওয়ার্ডার হঠাৎ সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে চমকাইয়া দু'পা পিছাইয়া গেল।

এই সার্জ্জেণ্টটির উপরেই আবার ফাঁসীর আসামীকে ফাঁসী দিবার ভার। কথা কহিবার আগেই লোকটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। ইতিপূর্ব্বে সে মাত্র একজনকে

ফাঁসী দিয়াছে। সকলে বলে, তাহার পর হইতেই উহার হাসি রোগ হইয়াছে। উহা নাকি মস্তিষ্ক-বিকৃতির পূর্ব্বাভাস।

সার্জ্জেণ্ট ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—So you here!

বিশ্বেশ্বর সসম্ভ্রমে বলিল,—Yes Sir.

—Quite comfortable?

—Yes Sir.

—That alright.

সার্জ্জেণ্ট হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

সে রাত্রি ভালো করিয়া বিশ্বেশ্বর ঘুমাইতে পারিল না। আগের ওয়ার্ডেও গান-বাজনা, হুল্লোর চলিত বটে, কিন্তু এমন বৈচিত্র্য সেখানে ছিল না। তাহাদের সাহস কম, সুতরাং এতদূর গলা উঠিত না, সবাই একটু চুপি চুপি সারিবার চেষ্টা করিত। এখানে তা নয়। সাধারণত যতটা রাত্রি মানুষ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ ইহারা চুপ করিয়াই থাকে, মানুষের ঘুমাইবার সময় বুঝিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করে। সে চীৎকার যেমন মধুর, তেমনি বিচিত্র।—

মোটা গলাওয়ালা একটা লোক ডাকে গাধা, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একদল, কেহ কুকুর কেহ শিয়াল ডাকিতে আরম্ভ করে। মিনিট খানেক ডাকিয়া যেই ইহারা পরিশ্রান্ত হইয়া চুপ করে, কোণের ঘর হইতে একজন অতি মিহিকণ্ঠে বেরাল ডাকিয়া উঠে, অমনি আবার বিবিধ জন্তুর স্বর-সাধনা আরম্ভ হয়। এমনি চলে রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত।

সকালে দ্বারের তালা খুলিয়া দিতেই সকলে প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাহির হইল। পায়খানার সংখ্যা বেশী নয়। সুতরাং পায়খানার দরজা হইতে উঠানের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত একের পর একজন তীর্থের কাকের মতো প্রত্যাশীনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে।

বিশ্বেশ্বর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই ঘোষ তাহার পাশ দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

—এই যে! কেমন আছেন?

বিশ্বেশ্বর সহাস্য ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালোই আছে।

—বেশ, বেশ।

ঘোষ অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর রেলিঙে ভর দিয়া নীচের সতীর্থদের সকৌতুকে দেখিতে লাগিল। তাহারা তখন উসখুস্ করিতেছিল। একজন ফিরিঙ্গি পিছন ফিরিতেই বিশ্বেশ্বরের উপর নজর পড়িল। সে অমনি একটা চোখ বন্ধ করিয়া জিভ্ বাহির করিয়া তাহাকে ভেঙচাইল। হয়তো ইহা আত্মীয়তাজ্ঞাপক রসিকতা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ভালো লাগিল না। সে বিরক্তভাবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সেদিন রবিবার;—কয়েদীদের ছুটি।

সকলের সঙ্গেই বিশ্বেশ্বরের পরিচয় হইল। ফিরিঙ্গিগুলা নেহাৎই অশিক্ষিত ও অভদ্র,—শুধু অশ্লীল রসিকতায় পটু। বাঙালীর মতো চুপ করিয়া বসিয়া গল্প জমাইতে জানে না। দু' মিনিট বসিয়াই একবার সমস্ত বাড়ীটি ছুটিয়া আসা চাই। ছুটির দিন তাহারা হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি করিয়াই কাটায়।

জ্যোতিষার্ণব মহাশয় মন্দ লোক নয়। বয়স চল্লিশের মধ্যেই। চোখ দুটি বেশ বড় বড় এবং প্রশান্ত, কিন্তু হাঁ-মুখটি সরু ও সুচল হওয়ায় মনে হয়, লোকটির মধ্যে চাণক্য-বুদ্ধির অভাব নাই। লোকটি বড় বেশী কথা বলে, এবং নিজে যখন কথা বলে তখন অন্য কেহ কথা বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। ঘোষের যে অদৃষ্ট ও কর-রেখার উপর শ্রদ্ধা হইয়াছে সে ইহারই কৃপায়। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে হংসমধ্যে এই দুটি মাত্র বক বাস করে। দীর্ঘদিন একত্র বাসের ফলে ইহারা কথায় বার্ত্তায় একেবারে ফিরিঙ্গি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভিতরের বাঙালী ভদ্রলোকটি এখনও যে মরে নাই তাহা একটু আলাপ করিলেই বোঝা যায়।

জ্যোতিষার্ণব জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়ের নাম?—যেন তাহার নিজের জ্যোতিষ কার্য্যালয়ে বসিয়া আলাপ করিতেছে।

—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বেশ, বেশ। 'শ্রী' টুকু এখনো বাদ দেননি দেখছি। ভালো, ভালো। আজকালকার ছেলেরা আবার 'শ্রী' বলে না কিনা।

বলিয়া ঘোষের পানে চাহিল। ঘোষ মুখ নামাইয়া মুচ্কি হাসিল।

—কি করা হতো ?

—বিশেষ কিছুই না এম, এ, পাশ ক'রে—

জ্যোতির্বার্ণব সাশ্চর্য্য কহিল,—হুঁ ? তোমারই জুড়িদার ঘোষ ? দেখো দেখি, কি দুর্ভোগ !

ঘোষ বিষণ্ণভাবে দেশলাইএর কলের ছুঁচের মতো মাথা নাড়িল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সবাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপরে জ্যোতির্বার্ণব বলিল,—তোমাকে আর আপনি বলতে পারি নে, বিশ্বেশ্বর। একসঙ্গে অনেকদিন কাটাতে হবে। মিথ্যে কুটুম্বিতা করা। তুমিও বরং আমাকে তুমিই বলো।

বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল,—না, না। আপনি—

—হ্যাঁ। তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কিন্তু কি জানো, জেলের মধ্যে এসে বয়সটাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি।

ঘোষ আস্তে আস্তে বলিল,—Civil death.

জ্যোতির্বার্ণব জিজ্ঞাসা করিল,—তার মানে ?

ঘোষ কহিল,—তার মানে, সাধারণ মানুষের যে সমস্ত করবার অধিকার আছে, তোমার তা নেই। তুমি যদি আজকে কোনো দলিলে সই করো, তোমার সে সই গ্রাহ্য হবে না। আইনের চোখে তুমি মৃত।

—ঠিক বলেছ। আমাদের তাই বয়সও নেই। বয়স মানে কি ? সূর্য্যোদয় থেকে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই যে সময়, তার আমরা নাম দিলাম 'দিন'। মহাকালকে এমনি খণ্ড খণ্ড করে তার ওপর আমাদের আস্তত্বের চিহ্ন রেখে আমরা চলি। তখন আমরা বলি, আমরা এই একটি দিন বাঁচলাম,—আমাদের বয়স হোলো এত। সেই কালের থেকে আজকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি, —এঁকে যাবার কোনো চিহ্নই নেই।

জ্যোতির্বার্ণবকে বিশ্বেশ্বরের বেশ লাগিল। এমন করিয়া সে আলোচনা করে নাই।

জ্যোতির্বার্ণব বলিতে লাগিল,—আমরা সবাই বয়সের বাঁধন থেকে মুক্ত। ফল যতক্ষণ হাওয়ায় থাকে ততক্ষণ বলা চলে এইটে আগে এসেছে, এইটে পরে। কিন্তু হাওয়াব থেকে যখন তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বায়ুবিহীন পাত্রে পুরলে অমনি তারা বয়সের হাঙ্গামা থেকে বেঁচে গেল। তাদের সবাই হোল সবারই সমবয়সী।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—হাওয়ার থেকে ফলকে যারা বিচ্ছিন্ন করে তারা ভালো লোক। কারণ সেই ফল অনেক দূরের লোকের ভোগে লাগে। কিন্তু জগৎ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে কার কি লাভ ?

ঘোষ বিস্মিত ভাবে কহিল,—পাপ করেছ, তার ফল ভোগ করবে না ?

বিশ্বেশ্বর জোরের সঙ্গে জবাব দিল,—না, করব না। মানুষ পাপ কোনো দিন করে না,—করে ভুল। পথ চলতে গেলে এমন ভুল সে করবেই। বন্ধুজনে তার সেই ভুল সংশোধন ক'রে দেবে। কিন্তু একটা ভুল ক'রেছে ব'লে তার পথচলাই বা বন্ধ হবে কেন ?—শাস্তিই বা সে পাবে কেন ?

লজ্জায়, অপমানে এবং অনুশোচনায় ঘোষের মস্তিষ্কের অবস্থা বড় ভালো নয়। কথা কহিতে গেলে নানা বিভিন্নমুখী চিন্তা এমন ভাবে তাহার মাথার মধ্যে জট পাকাইয়া বসে যে, সুসম্বদ্ধ আলোচনা তাহার পাল্লায় পড়িয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপে পরিণত হয়। কিন্তু আইনের কথা উঠিলেই তাহার মাথা কেমন পরিষ্কার হইয়া যায়। দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে পরিচ্ছন্ন রাস্তার সন্ধান পাইয়া তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। ফৌজদারী আইনে ঘোষের নামও ছিল, দখলও ছিল।

ঘোষ বলিল,—শাস্তি কেন পাবে তা আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি :—তুমি যখন তোমার নিজের জিনিষটি হারিয়ে ফেল, তখন করো ভুল। তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যখন আমার জিনিষটি সরিয়ে ফেল, তখন করো পাপ ! তখন তুমি আমার ওপর অন্যায় করলে। এই অন্যায়ের জন্য বৃহৎ মানব-সমাজের কাছ থেকে তোমায় শাস্তি নিতে হবে।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—কেন হবে, সেই ত আমার প্রশ্ন। আমি রাগের মাথায় তোমার দাঁত দিলাম ভেঙে। তোমার দাঁত ভাঙবার আমার অধিকার নেই, এবং সুস্থ অবস্থায় কখনই তোমার দাঁতে হাতও দিতাম না। এর জন্যে দায়ী আমি নই,—দায়ী পারিপার্শ্বিক অনেকগুলি

ঘটনা। আমার একটা বিশেষ মানসিক অবস্থায় তুমি নিশ্চয় এমন কতকগুলি ঘটনা এনেছ যাতে আমি ওই অপকর্ম্মটি করতে বাধ্য হয়েছি। তার বদলে, তোমার বৃহৎ মানব-সমাজ আমাকে দিয়ে মণ কয়েক তেল বার ক'রে নিলেন। কিন্তু সেই তেল তোমার ভাঙ্গা দাঁতের কোনো উপকারেই এল না।

ঘোষ বলিল,—আমার দাঁত সারাবার জন্যে তো তোমাকে দিয়ে ঘানি টানানো নয়। তোমায় শাস্তি দেওয়া হোল, যাতে ভবিষ্যতে তুমি অথবা অন্য কেউ পরের দাঁতের ওপর হাত না চালাও।

—অর্থাৎ পরের দাঁতের ওপর হাত চালানই যেন মানুষের পেশা।

—নিশ্চয়ই। দাও তো একবার জেল গুলো ভেঙ্গে, আর আদালতগুলো তুলে। দেখবে, মানুষের পক্ষে একটি দিনও পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। হয়তো তাই হ'য়ে উঠেছিল। আইন তো বিনা প্রয়োজনে হয় নি।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—অন্যায়ও মানুষ বিনা প্রয়োজনে করে না। ঘোষ, ঘানি টানা আর কি শাস্তি? এর আগে চুরি করার অপরাধে চোরের হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে, আ-কণ্ঠ মাটির মধ্যে পুঁতে অপরাধীকে ডাং কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে এবং আরও অনেক ব্যবস্থা হয়েছে যার নাম শুনলে আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। তবু পৃথিবীতে অপরাধের সংখ্যা কিছুমাত্র কমে নি এবং সাধু ব্যক্তিরা মানুষের সুমতি-সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে বানপ্রস্থও নেন নি। সবই সেই আছে, মাঝে থেকে আমাদের মতো কতকগুলো হতভাগ্য ঘানি টেনে, সতরঞ্চি বুনে আর ছোবড়ার দড়ি পাকিয়ে মরে।

ঘোষ বলিল,—মরুক দড়ি পাকিয়ে। ওরই মধ্যে মানব-সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে।

এবারে বিশ্বেশ্বর চটিয়া উঠিল। বলিল,—কী বারবার মানব-সমাজ, মানব-সমাজ করো। আমি এদিকে ঘানি টেনে মরি, তোমার মানব-সমাজের কল্যাণ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমি আছি, তাই তোমার মানব-সমাজ আছে। আমার কাছে এই পৃথিবীর কি মূল্য, যদি আমি নিজে এখানে না থাকি?

কিন্তু নিজের উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বর নিজেই হাসিয়া ফেলিল। শান্তভাবে বলিল,—তাও যদি বুঝতাম, আমার খরচায় তোমার মানব-সমাজের কিছু কল্যাণ হোলোই না হয়। তাও তো নয়। ওই ওয়ার্ডে ছিলাম তো, মনে হোতো, যেমন হরিহরছত্রের মেলায় রাজ্যের জানোয়ার এসে জড়ো হয়, ওখানে তেমনি সারা বাংলার মাতব্বর চোর জুয়াচোর গাঁটকাটার মেলা ব'সেছে। জেল কে বলে? এইখানেই নিখিল বঙ্গ বদমাইস সমিতির হেড্ অফিস। তুমি শাস্তির ভয়ের কথা কি বলছ, ঘোষ? ভয় শাস্তি পাওয়ার আগে পর্য্যন্ত থাকে, একবার শাস্তি পেলে মানুষের ভয় যায় ভেঙ্গে,—জেল আর তার কাছে জেল নয়। দেখ নি, একটা অপরাধী ক'বার এখানে এসে ঢুঁ মেরে যাচ্ছে?

ঘোষ কিছুই দেখে নাই। সে খুব কঠিনমতো একটা জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ খেই হারাইয়া বলিয়া বসিল,—তুমি অদৃষ্ট মানো না তাহোলে?

অদৃষ্ট মানলেও বিশ্বেশ্বরের যুক্তি দুর্ব্বল হয় না। তথাপি সে বলিল,—না, মানিনে।

এত বড় কথার কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া ঘোষ শুধু সক্রোধে বলিল,—নাস্তিক!—এবং বিব্রত ভাবে জ্যোতির্ণবের মুখের পানে চাহিয়া (যদি সেখান হইতে কোনো সাহায্য আসে) ডাকিল,—পণ্ডিত!

পণ্ডিত খুব বুদ্ধিমানের মতো শিরসঞ্চালন করিয়া বলিল,—এই আলোচনা যদি সাধারণ অপরাধীর সম্বন্ধে হয়, তখন আমি ঘোষের সঙ্গে একমত। কিন্তু যখন নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করি তখন বিশ্বেশ্বর, তোমারই দলে। তবু কথা যখন উঠলো, তখন আমারও কিছু বলবার আছে। কিন্তু আমি যা বলছি, তা আমি নিছক তর্কচ্ছলে বলছি বলেই ধ'রে নিও;—আচ্ছা, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস করো, আমাদের এই শাস্তিভোগের কোনো প্রয়োজন ছিল না? সত্যই বিশ্বাস করো?

—করি। কারণ, কতকগুলি মুদ্রার বিনিময়ে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ভার যারা অনুগ্রহ ক'রে নিয়েছেন, তাঁরা নিজেরা অভ্রান্ত নন। সুতরাং অনেক সময় চোর

ছাড়া পায় এবং নির্দ্দোষ ধরা পড়ে। এই সমস্ত নির্দ্দোষ লোকের শাস্তিভোগের নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল না। আর যে সমস্ত সত্যিকার চোর ধরা পড়ে, শাস্তি তাদের কোনো কল্যাণই করে না, সে তো তুমি জানো।

জ্যোতিষার্ণব বলিল,—কিন্তু আমার মতে শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে সবলের হাতে দুর্ব্বলের লাঞ্ছনার অবধি থাক্‌তো না। তুমি একটি নিরীহ, ভালো মানুষ ভদ্রলোক, স্ত্রী-পুত্র, জমিজমা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছ,—আমার গায়ে জোর আছে, তারই বলে আমি তোমার সমস্ত কিছুর ওপর অধিকার স্থাপন করতাম। তুমি আমায় রুখ্‌তে কি দিয়ে?

রুখতাম না। আজকেই কি পারি? আমি একজন জমিদারকে জানি, যে টাকার জোরে যা-খুসী তাই করে। কেউ তাকে রুখতে পারে না। প্রজাদের কাছে তার দাবীর অন্ত নেই। একজন প্রজা জেদ ধরলে দোষ না। অনেকগুলো জাল দলিল তৈরী করে জমিদার তার অনেকখানি জায়গা জোর ক'রে দখল করে নিলে। মামলা চল্‌লো,—প্রথম আদালতে জমিদার হারলো, তার আপীল হোলো সাবজজ কোর্টে। সেখানেও জমিদার হারলো, আপীল হোলো জজ কোর্টে। তখন প্রজার এমন অবস্থা যে, দিনের আহার মেলা কঠিন। তাকে হার মানতে হোলো, এবং অন্যান্য হীন সত্ত্বে। এমন ঘটনা অনেকই আছে। পণ্ডিত, যার জোর আছে তার কাছে মাথা নীচু ক'রে চ'লেই দুর্ব্বল বেঁচে থাকে। আইনের আগের যুগেও তেমনি ক'রে বেঁচেছে, এখনও তেমনি করেই বাঁচে। এ ছাড়া আর পথ নেই।

জ্যোতিষার্ণব বলিল,—কিন্তু তখনকার চেয়ে এখনকার মানুষ কি অনেক বেশী সুখে নেই? শাস্তির ভয়ে কি অনেকে তাদের রিপু দমন করে থাকে না?

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিল,—হয়তো থাকে, কিন্তু সে অল্পদিন। তারপরে শাস্তিকে এড়াবার কৌশল আবিষ্কার করে। রিপু তো মানুষের আছেই। কিন্তু সেই রিপু যিনি দিয়েছেন, রিপুদমনের শক্তিও তিনিই সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। মানুষ সত্যি-সত্যি রিপু দমন করে সেই শক্তি দিয়ে, আইনের ভয়ে নয়। তুমি আইনের ভয়ের কথা বলছ, কত লোক যে জেল নিশ্চিত জেনেও তহবিল তছরূপ ক'রে সেই টাকা গৃহিণীর কাছে রেখে হাসিমুখে জেল খাট্‌তে আসে। তারা দেখে—আজীবন না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে এ-ও ভালো।

জ্যোতিষার্ণব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—এই, এই,—তুমি একেবারে আমারই গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলে যে!

বিশ্বেশ্বর লজ্জিত ভাবে বলিল,—তাই নাকি?

জ্যোতিষার্ণব ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাই।

তারপরে বেলার দিকে চাহিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—সে ইতিহাস আর এক সময় বলবো বরং। এখন চলো, স্নান ক'রে আসা যাক্। বেলা অনেক হ'য়েছে!

সেদিন দুপুর বেলা সকলে খাইয়া দাইয়া বারান্দায় বসিয়া গল্প জমাইবার আয়োজন করিতেছে। ওদিকের কোণে চার জন ফিরিঙ্গি তাসে বসিয়াছে, মধ্যে দু'জন দাবা আরম্ভ করিয়াছে। লম্বা ছিপ্‌ছিপে ফিরিঙ্গিটা প্রতি-পক্ষের রাজাকে এমন একটা ঘোড়ার কিস্তি দিয়াছে যে, মন্ত্রীও ধরা পড়িয়াছে; আর এদিকে একপাশে বসিয়াছে ঘোষ, জ্যোতিষার্ণব ও বিশ্বেশ্বর। গল্প কেবল জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় ঢং ঢং করিয়া পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল।

তাস-ওয়ালাদের হাতের তাস টেবিলের উপর পড়িয়া গেল, মন্ত্রী বেচারা কিছুক্ষণের জন্য ঘোড়ার কবল হইতে বাঁচিয়া গেল, সকলে উর্দ্ধশ্বাসে নিজের নিজের ঘরে দৌড় দিল। বিশ্বেশ্বর কিছুই বুঝিল না, তথাপি ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে সেই ঘণ্টার শব্দে তাহারও বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করিয়া উঠিল। সেও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া অজানা আশঙ্কায় চৌকির উপর আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। নীচে তখন সিপাহী ও ওয়ার্ডার ভারি ভারি জুতার শব্দে চারিদিক সচকিত করিয়া সকলকে ঘরের বাহির না হইবার জন্য আদেশ দিতেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যে গণ্ডগোল থামিয়া গেল। ওয়ার্ডার উপরে আসিতেই সবাই বাহিরে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে—কি? কি? ব্যাপার কি?

ব্যাপার গুরুতরই;—

বেঙ্কো ভাগিয়াছে।

একজন কনেষ্টবলের জিম্মায় বেষ্টো এবং আরও দশ বারো জন কয়েদী জেলের বাহির হইতে ইট পাথর জেলের ভিতরে বহিয়া আনিত। আজ সকালেও সে নিয়মিত কাজে গিয়াছিল, তারপরে আর ফিরিয়া আসে নাই। কিন্তু সে কথা জানাজানি হইল খাওয়ার সময়। যে কনেষ্টবলটি ইহাদের লইয়া যায়, সে লইয়া আসিবার সময় গুণিয়া আনে নাই। তাহারও দোষ নাই। বারো মাস চাকরী করে, ছুটির নাম নাই। তখন সবে বসন্ত পড়িয়াছে, হয়তো কাছেই কোথাও একটা কোকিলও ডাকিয়া থাকিবে। হইলই বা কনেষ্টবল? পৃথিবীতে এমন কে পাষাণ আছে, যার এমন অবস্থাতেও মন উদাস না হয়? সে একটা ইটের স্তূপের উপর পরমানন্দে উঁচু হইয়া বসিয়া খইনি টিপিতেছিল এবং পরদেশী বঁধুয়া সম্বন্ধে গুন্ গুন্ করিয়া একখানা গজল ভাঁজিতেছিল। ইহার অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়াই বেষ্টো সরিয়া পড়ে। তখন কনেষ্টবল এ ব্যাপার টের পায় নাই। জেলের ভিতর আনিবার সময় যথারীতি গণিয়া লইলে টের পাইত নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিন তাহার মন ভালো ছিল, তাছাড়া কোনোদিন যাহারা পালায় নাই, সেদিনই কি তাহারা পালাইবে? কনেষ্টবল 'গুণ্‌তি' করিবার আবশ্যকতাই অনুভব করে নাই।

ওয়ার্ডার বলিল, এমন বোকা সে জীবনে কখনও দেখে নাই। বেষ্টোর মেয়াদ শেষ হইতে আর মাস খানেক মাত্র ছিল। পাঁচ বৎসর যে নির্ব্বিবাদে জেল খাটিল, এই একটু মাস সে আর সবুর করিতে পারিল না! কিন্তু সে পালাইবে কোথায়? ধরা তাহাকে একদিন পড়িতেই হইবে, সেদিন তাহাকে দ্বিগুণ সাজা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বেষ্টোর জন্যে ওয়ার্ডারের দুশ্চিন্তা নাই, আজ হউক কাল হউক, এক বৎসর পরে হউক, বেষ্টোকে ধরা দিতেই হইবে। তাহার চিন্তা কনেষ্টবলটির জন্য। লোকটি বড় ভালো ছিল। একটু ভুলের জন্য বেচারী জেল খাটিয়া মরিবে।

ওয়ার্ডার বলিল—I am really sorry for the constable.

সে শিষ দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সিঁড়ি দিয়া তর্ তর্ করিয়া নামিয়া গেল।

ওয়ার্ডারের দুঃখে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই পৃথিবীতে শতকরা নিরানব্বুই জন লোকই এমনি করিয়া ব্যথিতের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে, এবং তারপরে শিষ দিয়া, ছড়ি ঘুরাইয়া চলিয়া যায়। ইহার বেশী সে আর কিছু করিতেও পারে না, যদিও ব্যথিতের ইহাতে বিন্দুমাত্র উপকারও হয় না।

ওয়ার্ডার চলিয়া গেলে বিশ্বেশ্বর অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। বেষ্টোদের সঙ্গে না মিশিলেও অনেক দিন একত্র বাসের ফলে ইহাদের উপর তাহার কেমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল। বেষ্টোর অলক্ষ্যে তাহার স্ত্রী ও কন্যার পলায়ন সংবাদ লইয়া কয়েদী-মহলে যে কাণা-কাণি ও হাসা-হাসি চলিত, প্রীতিকর না হইলেও বিশ্বেশ্বরের তাহা কানে আসিত, যদিচ এই সমস্ত আলোচনা রং ও ব্যঞ্জনায় সত্য ঘটনাকে ছাড়াইয়া যাইত।

ঘোষ বলিল—দেখ্‌লে পণ্ডিত, এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটা চার বছর এগারো মাস বেশ কাটালো, একটা মাস আর কাটাতে পারলো না।

জ্যোতির্ষার্ণব বলিল—আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু বোঝা যায়।

—কি রকম?

জ্যোতির্ষার্ণব বলিল—চার বছর যখন কাটিয়েছে, তখন ওর সামনে মুক্তির কোনো রূপ ছিল না; যেমন আমাদের নেই। আমরা ভাবতেও পারিনে, কোনো কালে মুক্তি পাবো, বাইরের সেই পরিচিত পৃথিবীর পরিচিত জনতা, পরিচিত পথ-ঘাট আবার দেখতে পাবো। ভাবতে পারিও না, ভাবিও না। তারপরে দিন যত ঘনিয়ে আসে, মুক্তির রূপও তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষের যে একটা মাস, সে যেন আর কাটতে চায় না, মুক্তির ক্ষুধায় সমস্ত মন হাহাকার করতে থাকে। সে ক্ষুধা একেবারে মানুষের আত্মার ক্ষুধা, দেহ পর্য্যন্ত দুর্ব্বিষহ মনে হয়। তুমি জানো না ঘোষ, এই শেষের একটা মাসে মানুষ পাগল হ'য়ে যেতে পারে, তার অসাধ্য কিছু থাকে না।

ঘোষ বোধ হয় নিজের শেষের দিনের কথা ভাবিয়াই, শিহরিয়া উঠিল

বিশ্বেশ্বর বলিল, -কিন্তু বেষ্টোর বেলায় বোধ হয় ও কথা সত্যি নয়। এর আগেও বহুবার জেল খেটে গেছে, পরেও

বহুবার আসবে, ও বোধ হয় জেলেই থাকে ভালো। এবং এবারে মনে হয়, ও খুনী আসামী হয়েই আসবে।

ঘোষ আবার শিহরিয়া উঠিল—খুনী আসামী হয়ে?

—মনে হয়।—বলিয়া বিশ্বেশ্বর বেষ্টোর লজ্জাকর পারিবারিক ইতিহাসের যতটুকু জানিত বিবৃত করিল। এবং তারপরে বলিল—বেষ্টোকে দেখছেন তো? ও না করতে পারে পৃথিবীতে এমন অপকর্ম্ম নেই। স্নেহ, মায়া, মমতা ব'লে কোনো পদার্থ ওর মধ্যে নেই। অতি পরমাত্মীয়কে খুন করতেও ওর এক চুল বাধে না। স্ত্রীও ওর কাছে পরম সম্পদ ছিল না যে, তাকে ছেড়ে ওর বাঁচা বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠবে। রেঁধে-বেড়ে দেবার একটা লোক, তা তার জন্যে বাঙালী বেটাছেলের আট্‌কায় না। ও ইচ্ছে ক'রলেই কাল আবার একটা বিয়ে করতে পারে। আর সেই স্ত্রীও যে সতী-শিরোমণি ছিল না, তা' ও বেশ জানে। তবু সেই বিগত-যৌবনা স্ত্রীকেই ওর প্রয়োজন। সেই জন্যে হয়তো ও খুনই করবে।

ঘোষ বিজ্ঞের মতো বলিল,—ওর পৌরুষে ঘা লেগেছে। আমি জানি কিনা।

ঘোষ আবার কি জানে? দু'জনেই বিস্মিত ভাবে ঘোষের পানে চাহিল। ঘোষ সেদিকে না চাহিয়া বলিতে লাগিল,—

—ছেলে বেলায় আমি খুব দুর্ব্বল ছিলাম। তাই ভায়েদের চেয়ে বোনেদের সঙ্গেই আমার খেলা জমতো বেশী। এই দেখে মা একদিন খুব ধমক দিলেন এবং বাবাকে বললেন, এই ছেলেটা দিনরাত্রি মেয়েদের সঙ্গে খেলা ক'রে ক'রে যেন মেয়েলি হ'য়ে উঠ্‌ছে। বাস্‌! সেই যে পৌরুষে ঘা লাগ্‌লো, আর কোনোদিন মেয়েদের ছায়া মাড়াতাম না। এমন কি, ওরা যদি ডাক্‌তো, আমি ফিরেও চাইতাম না,—বুক ফুলিয়ে অন্যদিকে চলে যেতাম।

দু'জন শ্রোতাই হাসিয়া ফেলিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—পৌরুষে যদি ঘা লাগতো, তা-হোলে অনেকদিন আগেই লাগ্‌তো, যখন ও প্রথম জানতে পারে, ওর স্ত্রীর চরিত্র বিশেষ ভালো নয়। ওরা এমন একটা বেষ্টনীতে বাস করে, যেখানে চরিত্রের ভালো-মন্দের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

ঘোষ চটিয়া বলিল,—মাথাই যদি ঘামায় না, তবে খুন করতে ছুটলো কিসের জন্যে?

বিশ্বেশ্বর একটু ভাবিয়া যেন আপন মনেই বলিল,—বোধ করি ওর নীড়ে ঘা পড়েছে। ওর নিজের চরিত্র ভালো নয়, ওর স্ত্রীরও নয়, মেয়েরও নয়, এবং সম্ভবত বাকী ছেলেমেয়েগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ও খুব আশান্বিত। কারও পরে কোনো মমতাও যদি ওর না থাকে, দোষে-গুণে সবাই মিলে ওই যে নীড় বেঁধেছে, তার সঙ্গে ওর নাড়ীর যোগ আছে। সেই নীড় ওরই অস্তিত্বের একটা অংশ। সেইখানে যে ঘা পড়েছে, সে ঘা ওর নাড়ীতে বেজেছে। তাই ও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

জ্যোতির্ষার্ণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তা হবে।

নীড়ের কথা উঠিতেই ঘোষ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। পাষাণপুরীর মধ্যে বসিয়া গৃহের কথা শুনিলে সকলেরই মন উধাও হইয়া ছোটে। গৃহ বলিতে যাহা বোঝায়, ঘোষের তাহা নাই। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া পিতার এক বন্ধুর গৃহে তাহার বাইশ বৎসর কাটে। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থোর্জ্জন করা ছাড়া আর কোনো চিন্তাও করে নাই। যৌবনের প্রান্তে আসিয়া প্রথম নারীর রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কয়েকমাস মাত্র। শ্রীমতী শাশ্বতী মিত্র তখন এম, এ, পাশ করিয়া একটি মেয়ে ইস্কুলের মাষ্টারী করিত। কিছুদিন তাহার পিছনে ভিক্ষাপাত্র বহিয়া বেড়াইবার পর একদিন শাশ্বতী সদয় হইল। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল। এমন সময় এই গ্রহের ফের। শাশ্বতী কোথায় আছে, কেমন আছে, তাহার কিছুই ঘোষ জানে না। শুধু শুনিয়াছে, পঁচিশ বৎসর যাহার পুরুষের সাহচর্য্যের কোনোই প্রয়োজন হয় নাই, বিবাহের সব ঠিক হইয়া যাইবার পর ঘোষ যখন জেলে গেল, তখন পাঁচটি বৎসর সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। পরের বৎসরই কোথাকার একজন ডাক্তারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

নীড়ের কথায় ঘোষ কি ভাবিতেছিল কে জানে। সে বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি ডষ্টয়েভ্‌স্কির "ইডিয়ট" পড়েছ?

—পড়েছি।

ঘোষ একটু থামিয়া বলিল,—আমার সেই প্রিন্সটির মত সবুজ গাছের নীচে মরবার সাধ হয়। অথচ সবুজ গাছের নীচে বসলেই মনে হয়, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে মানুষের মন সরে কি করে!

ঘোষ আপন মনে বকের মতো মাথা নাড়িতে নাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘোষকে ইহারা কেহই বুঝিতে পারে না।

গত রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিশ্বেশ্বরের মন ভালো ছিল না। সকাল বেলায় ঘরের মধ্যেই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহার মৃতা স্ত্রীকে: ঘরের মধ্যে সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে সে যেন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, আর অমলা যেন তাহার পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তথাপি তাহার নিদ্রা আর ভাঙ্গিতেছে না। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, স্পষ্ট বুঝিল সত্যই পা-তলার দিকে কে কাঁদিতেছে। তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে, সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই একটা বেরাল চমকাইয়া লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের সমস্ত শরীর ভয়ে ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

তাই বটে! জীবনে যাহার চেয়ে প্রিয় কেহ নাই, মরণের পরে সে কাছে দাঁড়াইয়া আছে ভাবিতেই মানুষের ভয়ের সীমা থাকে না। এমনিই বটে!

এই বেরালটি নির্দ্দিষ্ট কোনো এক ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। হয়তো রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, কাজ করিতে যাওয়ার পথে কোনো কয়েদী টপ্ করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আধ মিনিট আদর করিয়া নামাইয়া দিল। আর একজন হয়তো তাহাকে কাঁধে তুলিয়া খানিক দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। বেশী আদর পাইত যমদূতের মতো একটা পেশোয়ারীর কাছে। এই পেশোয়ারীটিও একজন কয়েদী। কয়েকজন দুর্দ্দান্ত কয়দিকে সায়েস্তা করিতে না পারিয়া যখন সিপাহীরা হাল ছাড়িয়া দেয়, তখন এই লোকটি এমন নৃশংসভাবে তাহাদের শাসন করে যে, পুরস্কার স্বরূপ তাহার পর হইতে তাহাকে আর শারীরিক গুরু পরিশ্রম করিতে হইত না, এমন কি মেয়াদও কিছুদিন কমিয়া গেল। পেশোয়ারীটি ঘণ্টা মাফিক চোখ পাকাইয়া, দাড়ি ফুলাইয়া এবং অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া কয়েদী শাসাইয়া বেড়াইত এবং অবসর সময়ে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া বেরালটিকে খেলা দিত। তখন ইহার কুশ্রী মুখখানিই এমন মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিত যে, কে বলিবে এই লোকটিই বাকী সময় বাঘের চেয়েও হিংস্রভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। পেশোয়ারীটি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে ইহার যত্ন কিছু কমিয়াছে। অমন করিয়া ধারে বাবে নানা প্রকারের আহার যোগাইতে আর কেহ পারে না তবে এখন খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকিলে সকলের কাছেই কিছু না কিছু মেলে।

ইনিই কখন আসিয়া বিশ্বেশ্বরের খাটের উপর কম্বলের নীচে পা-তলার দিকে শয়ন করিয়াছিলেন!

বিশ্বেশ্বরের ভয় গেল বটে, কিন্তু মন কেমন এক অজ্ঞাত ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল.

চুপ করিয়া বসিয়া সে অমলার কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় দোর গোড়ায় নবী নওয়াজ আসিয়া প্রথমে উঁকি মারিয়া এবং তার পরে মলিন দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া চুপি চুপি তাহার দিকে আগাইয়া আসিল।

এখানে আসার পর হইতে পুরাতন বন্ধুদের কাহারও সহিত বিশ্বেশ্বরের দেখা হয় নাই, দেখা করার সুযোগও নাই। কেবল নবী নওয়াজই মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার 'তালাস' লইয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কি খবর নবী নওয়াজ? এত সকালে যে?

নবী নওয়াজ সে কথার উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া বাহিরে উঁকি দিয়া আর একবার দেখিয়া লইল, কেহ কোথাও আছে কিনা। তারপরে চট্ করিয়া এক টুকরা কাগজ বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—জীগ্‌গির পড়ে ফেলুন।

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ের সঙ্গে কাগজখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নবী নওয়াজের হাতে দিতেই সে চট্ করিয়া তাহা জামার নীচে কোমরের দিকে কোথায় লুকাইয়া ফেলিল এবং বিশ্বেশ্বরের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—মহম্মদ ইস্‌মাইল কে?

— আমার জামাই,— কাগজে পড়ে।

—সে লিখেছে বাড়ীর খবর সব ভালো। আর রহিম শেখের সঙ্গে তোমাদের যে মামলা চলছিল, তাতে তোমাদের জিত হয়েছে। শীঘ্রই তার সম্পত্তি ক্রোক ক'রে খেসারৎ আদায় করা হবে।

নবী নওয়াজ আনন্দের উত্তেজনায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল,—তুমি কি এইজন্যে ভোরবেলাতেই এখানে ছুটতে-ছুটতে এসেছ? ওখানে কি পড়াবার লোক ছিল না?

নবী নওয়াজ জিভ্‌ কাটিয়া বলিল,—ও ব্যাটারা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে যে, গোপনে বাইরে থেকে চিঠি আনিয়েছি, তা' হলে কি আর রক্ষে রাখবে? এক্ষুণি জেলারের কাছে লাগিয়ে দেবে।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত ভাবে বলিল,—তাই নাকি? তাতে ওদের লাভ?

—সে কথা ব্যাটাদের বোঝায় কে? সে বুদ্ধি থাকলে কি আর ঘানি ঘুরিয়ে মরে।

তা বটে। বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—তা যেন হোল। কিন্তু বাইরে থেকে চিঠি তুমি আনলে কি করে?

নবী নওয়াজ একটু সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বলিল,—বছর খানেক থাক্, গেলে আপনিই বুঝবেন।

অকস্মাৎ নীচে ভীষণ কোলাহল উঠিল উভয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া দেখিল, অনেকগুলা ফিরিঙ্গি কয়েদী জন নামক একটা ছোকরা-বয়সী ফিরিঙ্গি কয়েদিকে এই মারে তো এই মারে। ছোকরাটা একেবারে বোকা বনিয়া গিয়াছে এবং একবার ইহার পানে, একবার উহার পানে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া আত্মসমর্থনের জন্য একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সবাই মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই বলিয়া গালাগালি দিতেছে।

সকলের চেয়ে রাগিয়াছে রোবেরো,—বেঁটে গুণ্ডা গোছের একটা ফিরিঙ্গি। একটা লোক তাহাকে টানিতে টানিতে ভিড়ের বাহিরে আনিয়া যেই ছাড়িয়া দিতেছে অমনি সে জ্যামুক্ত গুলতির মতো আবার ছিট্‌কাইয়া ভিড়ের মধ্যে পড়িতেছে। তাহাকে সামলানোই সব চেয়ে বেশী কঠিন।

অবশেষে গোলমাল থামিল। কয়েকজন মিলিয়া ফিরিঙ্গি ছোকরাটিকে সরাইয়া লইয়া গেল। আক্রমণকারীর দলও খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আপন মনে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া একে একে গজ গজ্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

খামকা এতগুলা লোক কেন একজন নিরীহ বেচারীকে খুন করিতে উদ্যত হইল বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সবাই এক সঙ্গে হিন্দী ও ইংরাজিতে গালি দেয়, সবাই কহে,—মারো শালেকো। সেই বাক্যের ঝড়ে ভিতরের ব্যাপার উদ্ধার করা দুরাশা। বিশ্বেশ্বর কোনো মতে শুধু এইটুকু বুঝিল যে, এই কাণ্ডের সহিত একটি বেরালেরও সম্পর্ক আছে।

সে উপরে চলিয়া আসিল।

বেরালের সহিত সম্পর্ক আছে সত্যই।

বিশ্বেশ্বরের কাছে তাড়া খাইয়া বেরালটি জনের ঘরে আশ্রয় লয়;—সম্ভবত আরও একটু ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল। জনের ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল নড়ানোর অভ্যাস আছে। নিদ্রা যাইতে যাইতে কখন চোখ মেলিতেই এই আন্দোলিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বেরালের দৃষ্টিতে পড়ে। অভ্যাস বশেই হোক, আর কৌতূহল বশেই হোক বেরালটি ডান পা বাড়াইয়া তাহাতে আঁচড় দেয়। জন আঁতকাইয়া উঠিয়া পড়ে এবং সুমুখেই বেরালটিকে দেখিয়া খপ্‌ করিয়া তার টুঁটী চাপিয়া ধরিয়া দোতলা হইতে নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাতেই এই শোচনীয় কাণ্ডের উৎপত্তি।

তখন নীচে ছিল গ্রিফিথ্‌। সে স্পষ্ট দেখিয়াছে বেরালটি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া গেল। নিশ্চয়ই তাহার খুব লাগিয়াছে।

জন তাহা স্বীকার করে না। সে বলে—বেরালটি কখনই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালায় নাই। দোতলা হইতে ফেলিয়া দিলে বেরালের পা ভাঙ্গে না। সে ছেলেবেলায় অমন কত বেরাল ফেলিয়া দিয়াছে, একটারও পা ভাঙ্গে নাই।

এমন সময় রোবেরো আসিল। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল,—তোমাকে ওপর থেকে ফেলে দিয়ে দেখা যাক্,

তোমার পায়ে লাগে কি না। বলিয়া জনের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

জন দুর্ব্বল মানুষ। তার গায়ে কেহ হাত দিলেই সে রাগিয়া আগুন হয়। সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—বেশ করেছি, ফেলেছি। তোমার কি?

ইহার পরে মানুষে মানুষে হাতাহাতি হইতে কতক্ষণ?

ঘোষ বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—বেরালটি বড় ভালো ছিল।

পণ্ডিত বিস্মিত ভাবে বলিল,—'ছিল' মানে? বেরাল কি মারা গেছে না কি? আমি তো শুনলাম একটা পা নাকি ভেঙ্গে গেছে।

ঘোষ বলিল,—সেই হোল। জনের ও কাজটা ভালো হয় নি।

রোবেরো বলিল,—জন একটা rogue,—দয়া মায়া ব'লে কোনো পদার্থ ওর শরীরে নেই। একটা নিরীহ বেরাল—

এবং তারপরে ডানহাত দিয়া বাঁ হাতের পেশী টিপিয়া বলিল,—আজ ওকে শিক্ষা দিয়ে দিতাম। তোমরা না এসে পড়লে আমি ঠিক ওকে খুন করে ফেলতাম—upon God!—বলিয়া পিক্ করিয়া খানিকটা থুতু ফেলিল।

রোবেরোর মায়া-মমতা আছে।

পণ্ডিত বলিল,—তোমার সেদিনের সেই কথা হে, বিশ্বেশ্বর। আমি এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম যে, অপরাধ মানুষ করবেই। সেই অপরাধের বিচারের ভার যদি শাসন-প্রতিষ্ঠান না নেয়, লোকে নিজের হাতেই সেই ভার নেবে;—নেবে এই রোবেরোর দল। এবং বেরালের প্রতি মমতা এদের যতই থাক, মানুষের প্রতি এদের কেমনতরো দরদ, সে তো চোখেই দেখলে!

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—তাই দেখলাম। এবং তাতে আমার কথারই জোর বাড়লো। দেখলাম, আইন এবং বিচারালয় থাক্ বা না থাক্, মানুষ বিনা বাধায় অন্যায় ক'রে যেতে পারে না। তুমি যদি বুঝে থাকো, বেরালের প্রতি মমতায় ওরা মানুষের প্রতি নির্ম্মম হ'তে যাচ্ছিলো তা'হোলে ভুল বুঝেছ। মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের যে সংস্কার আছে, এ তারই প্রকাশ মাত্র। এই সংস্কার থাকার পরও মানুষ যখন অন্যায় করে, তখন তার ওপর ক্রোধ হয় না, হয় কৃপা। মনে হয়, বড় দুঃখেই সে অমন অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছে।

ঘোষ প্রশ্ন করিল,—আর যারা জন্ম-অপরাধী?

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিল,—তারা যে ব্যাধিগ্রস্ত। কুপথ্যের ওপরই রোগীর লোভ বেশী। ওদেরও লোভ অপরাধের ওপরই বেশী। সমস্ত জীবন ওরা বিকারের ঘোরে কাটিয়ে দেয়। কি করবে? নিজের 'পরে ওদের কোনো দখল নেই। কিন্তু এই রকমের জন্ম-অপরাধী তুমি ক'জন দেখেছ?

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর বলিতে লাগিল,—জেলের কথাই বলি। এই জেলে দিবারাত্র যে কাণ্ড চলছে, একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখছ?—বাইরের থেকে ভেতরে ক্রমাগত চিঠি চলাচল হচ্ছে,—বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, মদ যা চাও সবই এখানে মিলছে, শুধু দ্বিগুণ দাম দিতে হয়,—একটা জিনিস তো বাইরে রাখার উপায় নেই, একটু অসাবধান হয়েছ কি তোমার জিনিসটি উধাও। জেলে ব'সে মানুষ একদিনে যে অপরাধ করে, বাইরে দশ বছরেও তা কেউ করে না। হবে না কেন? চারিদিকের সহস্র বাধা-নিষেধ-শাসনের চাপে মানুষ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে, আর কেবলি ফাঁকি খুঁজতে থাকে। এবং আমার মনে হয়, দশ-বারো টাকা মাইনে দিয়ে যাদের এদের ওপর খবরদারী করবার জন্যে রাখা হয়, দু'পয়সা উপরির লোভে ফাঁকির বুদ্ধি যোগায় তারাই। তোমার কথাই ধরো, ঘোষ;—তুমি একজন বিখ্যাত এডভোকেট্—

ঘোষ নতমুখে মুচ্‌কি হাসিয়া মৃদু-মৃদু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিক্ষায়, রুচিতে সামাজিক মর্য্যাদায় তোমার চেয়ে ঢের কম, দু'বছর আগে সে হয় তো তোমারই বাড়ীতে দারোয়ানীর জন্যে উমেদার ছিল, সে আজ তোমার শাসন-কর্ত্তা,—দু'বেলা তোমায় চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে তোমারও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান গেছে ক'মে,—ওরই কাছ থেকে দু'টাকার জিনিস এক টাকায় কিনতে তোমার একটুকুও লজ্জা বোধ হয় না।

ঘোষ ইহার প্রতিবাদে কি একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর কহিতে লাগিল,—শুধু ও কেন, আরও ওপরে যাও; আমাদের যে জেলার তার একমাত্র qualification সে ইংরেজ, অথবা আইরিশ, অথবা এমনি একজন শ্বেতাঙ্গ। কাল আমার কাছে একটা চিট্‌ পাঠিয়েছিল তাতে ছ'লাইনে তিনটে বানান ভুল, এমন কি কোথায় বড় অক্ষর, কোথায় ছোট অক্ষর বসে তা পর্য্যন্ত জানে না। সামান্য একটা সার্জ্জেণ্ট—অথচ একেই দেখে—

এমন সময় ছড়ি ঘুড়াইয়া স্বয়ং জেলার সাহেব। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল।

প্রতি নমস্কারে ছড়িটা নাকের ডগায় ঠেকাইয়া জেলার সহাস্যে বলিল,—বিশ্বেশ্বর!

—Yes Sir.

—তোমার আজ একটা interview আছে তোমার মা আসবেন। বিকেল পাঁচটার সময়।

বিশ্বেশ্বরের শুষ্কমুখে স্বস্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। যাক্, তাহা হইলে তাহাদের আলোচনা সাহেব শুনিতে পায় নাই। বরং সুসংবাদ,—মা আসিতেছেন। সে প্রফুল্ল মুখে সাহেবকে ধন্যবাদ দিল।

জেলার চলিয়া গেল।

তাহার মা আসিতেছেন;—তাহার সংযতবাক্, শুচিস্মিতা, মা আনন্দময়ী। এই কারাগারের কুশ্রী প্রভাত অকস্মাৎ শারদপ্রভাতের মতো ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের মন শিশুর মতো নৃত্য করিয়া কেবলি বলিতে লাগিল,—আমার মা, আমার মা, আমার চিরকালের মা,—আজকে তিনি আসবেন।

কিন্তু কখন? কখন তিনি আসবেন? বিকেলে পাঁচটা আজকে কখন হবে?

বিশ্বেশ্বর কাজ করিতে করিতে কেবল ঘড়ির দিকে চায়। কাঁটা যেন আর ঘুরিতে চাহে না। বিশ্বেশ্বর প্রাণপণে অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করে,—পারে না। ঘড়ির কাঁটা তাহার চোখ দুইটাকে কেবলি টানে।

এখন ন'টা। দশটা—এগারোটা—বারোটা—এখনও আট ঘণ্টা। তাহার মনে হইল, হৃদ্‌পিণ্ড এমনি করিয়া লাফাইলে সে আটঘণ্টা কিছুতেই বাঁচিবে না।

পাশের টেবিলে কাজ করিতেছিল গ্রিফিথ্।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—জানো গ্রিফিথ্, আজকে আমার মা আসবেন দেখা করতে।

বিশ্বেশ্বর আপন মনে বলিল,—আমার মা, আমার মা।

গ্রিফিথ কাজে ব্যস্ত ছিল। মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল,—তাই নাকি?

বিশ্বেশ্বর সোল্লাসে কহিল,—হ্যাঁ। পাঁচটার সময় আসবেন।

কথাটা বিশ্বেশ্বর একটু জোরেই বলিয়াছিল। একটা সিপাহী ধমক দিয়া হাঁকিল,—এইও! আস্তে।

বিশ্বেশ্বর ভয়ে-ভয়ে কাজে মন দিল। কিন্তু গ্রিফিথ্ ঘাগী লোক, এই জেলে তাহার অনেকদিন কাটিয়া গেল। সে মুখ ভেঙচাইয়া সিপাহীর ধমকের জবাব দিল। সিপাহী দেশী লোক,—উপরওয়ালার হুকুম না পাইলে শ্বেতাঙ্গ কয়েদীকে কিছু বলিতে সাহস করে না। সুতরাং গ্রিফিথের রসিকতায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

ওখানে বিশ্বেশ্বরের সুবিধা হইল না।

ওয়ার্ডে ফিরিতেই পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিল,—পণ্ডিত, আজ বিকেলে আমার মা আসচেন যে।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—শুনলাম। কিন্তু এই খরচপত্র ক'রে আধঘণ্টার জন্যে দেখা করতে আসার কি যে লাভ, বুঝিনে।

বিশ্বেশ্বর শশব্যস্তে বলিল,—বলো কি পণ্ডিত! এই আধঘণ্টার মূল্য কি কম? এও যদি না থাকতো—

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—কি হোতো তাহোলে?—মরে যেতাম?

—মরা? মরেই তো আছি। জানো পণ্ডিত, আমার মনে হচ্ছে, আজকে আবার আমি নতুন ক'রে জন্ম নিলাম। মানুষের জীবনের মূল্য কত আজ আমি যেমন টের পেলাম এমন আর কোনো দিন পাই নি।

পণ্ডিত তাহার পানে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—কিন্তু মায়ের সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা করবে না?

—লজ্জা কেন করবে? মায়ের সামনে দাঁড়াতে আমি কোনোদিন লজ্জা পাই নি। আজ পাব কেন?

—পাবে না? ওই পোষাকে দাঁড়াতে?

পোষাকের পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখ ছোট হইয়া গেল। কিন্তু চট্ করিয়া বলিল,—তা হোক্‌গে।—এবং আর এক মিনিটও না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মনে-মনে হাসিল,—ছেলেমানুষ! এখনও ভাবালুতা যায় নাই!

কিন্তু একটু পরেই বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসিল। কহিল, —আচ্ছা, তোমার লজ্জা করে?

—না।

বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পণ্ডিত বলিতে লাগিল,—কেন করবে শুনি? কি ক'রেছি আমি? ওদের এক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল। আমি সে টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে আর একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। যে দিন হিসেবে ধরা পড়লো স্পষ্ট বললাম,—হাঁ, ও টাকা আমি নিয়েছি। আমার চা'র জেল। হাতে হয়েছে কি? লোকে বললে, বেটা চোর। হিংসায় বললে,—কারণ টাকাটা আমি মারলাম, তারা পারলে না। কিন্তু যেদিন আমি বাইরে গিয়ে ওই এক লাখ টাকা হাতে নিয়ে বস্‌বো, দেখবে, ওরাই দুবেলা আমার বৈঠকখানায় ব'সে চা চুরুট খাবে, আর আমার স্তুতিবাদে পাশের লোকটিকে হারাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। খবরের কাগজে আজকে যারা আমার নিন্দা করছে, কালকে তারা তাদের কাগজে ডিরেক্টার হবার জন্যে সাধ্যসাধি করবে। তোমায় আমি নিমন্ত্রণ ক'রে দেখাবো।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু এই কলঙ্ক? এতো যাবে না।

—না যায় তো থাক্‌। বিশ্বেশ্বর, কলঙ্ক নেই কার? যাঁদের লোকে মহাপুরুষ বলে, যাঁদের কোনো কলঙ্ক না থাকাও অসম্ভব নয়, তাঁদের নামেও মানুষ মিথ্যে কলঙ্ক রচনা করে,—নইলে সে স্বস্তি পায় না। একটা মানুষ তার চেয়ে বড় হবে, এ সে সইতে পারে না। অথচ বড় হওয়ার সাধনা করতেও সে রাজি নয়। এই সাধনা আমি করেছি;—রাজা, মহারাজা, বড়লোক, কারও চায়ের টেবিলে, কারও বালাখানায় প্রত্যহ হাজিরা দিয়েছি, প্রত্যহ দাঁত বার করে হেসেছি, প্রত্যহ একবার করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, চন্দ্র-সূর্য্যের জন্মের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁদের মতো জ্ঞানী, গুণী, মহাশয় ব্যক্তি আর হয় নাই, হবে না। কিন্তু এতেও টাকা মেলে না; সহজে কেউ টাকা দেয় না। বড় লোকের পকেটে টাকা বাজে, তারই শব্দে মক্ষিকা জোটে। সবাই শুধু শব্দ শুনে বাড়ী আসে, মধু অদৃষ্টে জোটে না। তোমায় কি বলবো, বিশ্বেশ্বর, প্রত্যহ নিজের ওপরে ধিক্কার জন্মেছে, তবু থামি নি। থামি নি বলেই আজ আমি লক্ষ টাকার মালিক।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—কিন্তু সৎ উপায়েও তো অর্থোপার্জ্জন করা যায়।

পণ্ডিত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—ছেলেমানুষ! উপার্জ্জনের বাজার তো দেখো নি। কি করবে তুমি? চাকরী? দু'বেলা মনিবের কাছে হাত জোড় ক'রে থাকতে হবে। একটু মাথা নেড়েছ কি,—বাস্ জবাব। আর যদি বলো ব্যবসা, সেখানেও একই অবস্থা! মাল দিয়ে টাকা নিচ্ছ, তবু পেয়াদা থেকে বড় সাহেব পর্য্যন্ত সবাইকে ঘুঁস দিতে হবে। নইলে সাহেব আর একজায়গায় মাল নেবে, একাউন্টান্ট বিল পাশ করতে দেরী করবে, কেশিয়ার টাকা দিতে দেরী করবে।

অবশেষে পাঁচটা বাজিল।—

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তখনও নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারে নাই। সে হাফ্‌প্যান্ট ছাড়িয়া একটা বড় পেন্টালুন পরিয়াছে, গায়ের উপর একটা গলাবন্ধ কোট। এবং এই জেলের পোষাক পরিয়া কি করিয়া মায়ের সুমুখে দাঁড়াইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিল। তিন মাস পরে আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সে অপরাধী, সত্যই অপরাধী। এমন করিয়া মাথা নীচু করিয়া মায়ের কাছে দাঁড়ানো যায় না।

মনে হইল, মা না আসিলেই সে বাঁচিয়া যায়।

একটু পরেই আপিস হইতে ডাক আসিল,—তাহার মা দেখা করিতে আসিয়াছেন।

ভাবিবার সময় নাই। বিশ্বেশ্বরকে চলিতে হইল।

আপিস ঘরে একটা কম্বলের উপর বসিয়া আছেন তাহার মা, সঙ্গে গুণেন্দ্র।

তাহার মা-ই বটেন। শুধু সুমুখের চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে, অনেকটা রোগাও হইয়াছেন,—কিন্তু সেই দুটী ঠোঁট, শান্ত অথচ দৃঢ়,—সেই আয়ত নীল চক্ষু, যেন বেদনার মেঘের ছায়া পড়িয়াছে,—তাহারই তপস্বিনী মা।

বিশ্বেশ্বরের সব ভুল হইয়া গেল,—এই জেলের আপিস ঘর, তাহার জেলের পোষাক, সুমুখে চেয়ারে উপবিষ্ট ডেপুটি জেলারের মিলিটারী গোঁফ সমস্ত ভুলিয়া ছোট ছেলের মতো ছুটিয়া মায়ের একান্ত সন্নিকটে বসিল।

আনন্দময়ী মুহূর্ত্তের জন্য একবার কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নীরবে বিশ্বেশ্বরের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

গুণেন্দ্র এমনি একটা মুহূর্ত্তের আশঙ্কা করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল,—সেই সকালে বেরিয়েছি, বিশুদা, আর ষ্টেশন থেকে সটান ট্যাক্সি ক'রে এখানে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন পাঁচটা বাজতে মিনিট কয়েক দেরী। আবার সাতটায় ট্রেণে চড়বো, বাড়ী পৌঁছুবো ভোর বেলাতেই ধরো। জ্যাঠাইমার তো খাওয়ার হাঙ্গামা নেই,—আজ একাদশী। যত বিপদ আমাকেই নিয়ে।

বলিয়া অনাবশ্যক হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু আনন্দময়ী ও বিশ্বেশ্বর কেহই কোনো কথা কহিলেন না।

গুণেন্দ্র বলিতে লাগিল,—আমারই কি আসা হোতো বিশুদা। কালকে আবার হিতসাধন মণ্ডলীর বার্ষিক উৎসব কিনা। দেখ্‌ছি পৌঁছেই বিশ্রাম করবার সময় পর্য্যন্ত পাবো না। জানো বিশুদা, আমাদের নারীমঙ্গল সমিতি বেশ জ'মে উঠেছে। জ্যাঠাইমা নিজেই তার ভার নিয়েছেন।

বলিয়া জ্যাঠাইমার পানে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে চাহিল।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু এ সমস্ত কথায় কোনো আগ্রহই দেখাইল না। বলিল,—তোমার বাবা এখন কোথায়?

—তিনি সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে বদলী হ'য়েছেন।

—ছুটির সময়, তুমি সেখানে গেলে না যে?

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—কি ক'রে যাই? তুমি নেই, আমিও যদি দেশে না থাকি তাহ'লে তো মণ্ডলীর চিহ্ন মাত্র থাকবে না।

এতক্ষণে আনন্দময়ী কথা কহিলেন,—ও কি বলে জানিস্‌, বিশু? বলে, রাম বনে গেছে, জ্যাঠাইমা, এখন ভরতের রাজত্ব। রাম-রাজত্বে ত্রুটি থাকলেও মানায়, কিন্তু ভরতের রাজত্বে এতটুকু ত্রুটি থাকলে চলবে না।

আনন্দময়ী সস্নেহে গুণেন্দ্রকে কাছে টানিয়া বলিলেন, —আর জানিস্‌ বিশু, তোর আর বৌমার একখানা ছবি নিয়ে ওরা একটা জলচৌকির ওপর বসিয়েছে। সন্ধ্যা বেলায় ওরা সেই ছবির সামনে ব'সে স্বদেশী গান করে। এই এক মাসে ও অনেক টাকা তুলেছে, নটবরের দলই দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল,—নটবরের দল?

হা হা করিয়া হাসিয়া গুণেন্দ্র বলিল,—দিয়েছে কি সাধে! তোমার জেল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলের দল এমন ক্ষেপে গেল যে, ওর ভয় হোল, কখন ওর ঠ্যাংটি তারা দেবে ভেঙ্গে। সেই ভয়ে ও রাত্রে বের হোতো না। এবারে যেমন চাঁদা চাইতে যাওয়া একেবারে নগদ পাঁচখানি দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিলে। তুমি বেরিয়ে এসে দেখবে, মণ্ডলীর নিজের বাড়ী পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন,—তা হবে। ওর বাবাই তো দিচ্ছেন পাঁচ শো টাকা। কিশোরগঞ্জে যাবার আগে ওর বাপ-মা দেশে এসেছিলেন কি না। ওর মা তো দিনরাত্রি আমার কাছেই থাকতো। যাওয়ার দিন বলে গেল,—আমি তো ওর কৈকেয়ী জননী দিদি, ওকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। তুমি বিশুকে যেমন মানুষ করেছ, ওকেও তেমনি মানুষ করে তুলো'।

একটু থামিয়া আনন্দময়ী বলিলেন,—ওর বাবা বললেন, —আমি বিশুর কথা ভাবছিনে বৌদি, আমি ভাবছি বৌমার কথা। এই মণ্ডলী না—কি, এরই জন্যে মা আমার তিল-তিল ক'রে নিজেকে নষ্ট ক'রেছেন। আমি পাঁচ শো

টাকা দিতে পারি, যদি তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা হয়। মণ্ডলীর যে বাড়ী হবে, গুণেনরা ঠিক ক'রেছে তার নাম হবে "অমলা-ভবন"।

বিশ্বেশ্বর আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিল,—না, না।

গুণেন্দ্র চটিয়া বলিল,—না কেন?

এই কেন'র উত্তর বিশ্বেশ্বর দিল না। প্রিয়জনের স্মৃতি বহিবার দুঃখ যে কত গুণেন্দ্র তার কি জানে? সে তো ছেলেখেলা নয়, সমারোহ করিয়া স্মৃতিফলক বসানো নয়,—সমস্ত জীবনব্যাপী সে এক দুশ্চর তপস্যা। কাল সমস্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছাইয়া দিতে চায়, একটি সমগ্র জীবন তারই বিরুদ্ধে উজান মুখে অচল, অটল দাঁড়াইয়া থাকা কি সহজ?

কিন্তু বিশ্বেশ্বর অন্য কথা পাড়িল। মায়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—কিন্তু তুমি যে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছ মা, তোমার চুল তো পাকতে আরম্ভ করেছে।

আনন্দময়ী হাসিয়া উত্তর দিলেন,—তা পাকবে না? বয়েসও হচ্ছে যে। আজ চুল পেকেছে, কাল দাঁত পড়বে, পরশু—

বিশ্বেশ্বর তাঁহার দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—পরশুর কথা আর বোলো না মা, ওই দাঁত পড়া পর্যন্তই থাক্।

ডেপুটি জেলার আসিয়া জানাইল, সময় হইয়া গিয়াছে।

আনন্দময়ী এবং গুণেন্দ্রর উঠিতে মন সরিতেছিল না। তবু উঠিতে হইল। কত কথা বলিবার জন্যই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। কিছু বা বলা হইল!

যাওয়ার সময় বিশ্বেশ্বর গুণেন্দ্রকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিল—মায়ের শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

গুণেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

জেল-ফটকের ছোট্ট দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্র যখন পিছন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৯

তারপর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর এখন ধীর, স্থির, প্রিয়ভাষী নয়। এখন সে কথায় কথায় ঘুঁসি পাকায়, একটু রাগিলে ইংরাজি, হিন্দী ও বাংলায় অনর্গল গালাগালি দেয় এবং বিকাল বেলায় ছুটির পর অন্য সকলের সঙ্গে গলা ধরিয়া সুমুখের উঠানে বেড়াইয়া বেড়ায়।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য পণ্ডিতের উপর প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহার রসজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়াছে। অশ্লীল বাংলা গানের পণ্ডিত একটি অফুরন্ত উৎস বিশেষ। ঘোষকে বাহির হইতে শান্ত-শিষ্ট, পাগল-পাগল দেখায় (অবশ্য মাথায় একটু ছিট্ ঘোষের আছে), কিন্তু সেও কম যায় না। রাত্রে সেই তো মিহি গলায় বেরাল ডাকে। বিশ্বেশ্বর প্রথম যখন আসে, ইহার রকম সকম দেখিয়া সবাই একটু সাবধানে চলিত। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই সে ব্যবধান কখন যে উঠিয়া গেল, কেহ টেরও পাইল না।

এখন,—

পণ্ডিত ডাকে,—ও বিশু, যাস্ কোথায়? শোন্ না।

বিশ্বেশ্বর না ফিরিয়াই বলে, কি বলো।

পণ্ডিত খোসামোদের সুরে বলে,—আহা শোনই না। বলিয়া গান ধরে—

ও ললিতে আমার একটা দুখের কথা শোন্,—
বুঝি রাধার ভার ছাড়তে হোলো রসের বৃন্দাবন।

ঘোষ টেবিল চাপড়াইয়া যোগান দিল, মরি হায়রে!

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলে, আচ্ছা, আমি নীচে থেকে আসছি।

পণ্ডিত তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলে—আর নীচে কেন, বাবা? নীচে তো কেউ নেই। তোমার 'মিরাণ্ডা' ওপরেই রবার্টের ঘরে। টেবিল, চেয়ার কত কি যে ফেলছে এইখানে ব'সে শুনতে পাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর চলিয়া যাইতে যাইতে অবজ্ঞার স্বরে বলিল, pooh! মিরাণ্ডা!

মিরাণ্ডা মেয়ে নয়, ষোলো সতেরো বছরের ছিপ্‌ছিপে সুন্দর একটি ছেলে। নাম একটা কি আছে, কিন্তু বিশ্বেশ্বর এবং তার দেখাদেখি সবাই, তাহাকে মিরাণ্ডা বলিয়া

ডাকে। মিরাণ্ডা বয়সে ছেলে মানুষ বটে, কিন্তু সয়তানী বুদ্ধিতে অন্য সবাই তাহার কাছে শিশু।

খাবার আসিলে সে সর্ব্বাগ্রে নিজের ইচ্ছামতো ভালো ভালো জিনিসগুলি (অর্থাৎ উহারই মধ্যে যাহা ভালো) লইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা বাকী থাকে, তাহাই সকলের মধ্যে ভাগ হয়। ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া হাসে। বিড়ি, সিগারেট তাহাকে কিনিতে হয় না। খুসীমত কাহারও পকেট হইতে বাহির করিয়া লয়।

বিশ্বেশ্বর হয়তো শুইয়া আছে, (এখন সে ধূমপান করিতে শিখিয়াছে) মিরাণ্ডা আসিয়া তাহার আলনায় টাঙানো কোটের পকেটে হাত দিয়া কতকগুলা সিগারেট বাহির করিল। বিশ্বেশ্বর ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি নিচ্ছ পকেট থেকে?

মিরাণ্ডা হাতের মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া বলিল, সিগারেট।

বিশ্বেশ্বর ডাকিল, এদিকে শোনো।

টেবিলের ওপারে দাঁড়াইয়া মিরাণ্ডা বলিল, কি বলো। তাহার চোখে দুষ্টামির হাসি।

বিশ্বেশ্বর ইসারায় তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল। সে তেমনি ধারা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

বিশ্বেশ্বর তাহাকে ধরিবার জন্য বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই সে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর হাসিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

মিরাণ্ডা এমনি খুনসুড়ি করে সকলের সঙ্গে সমস্ত দিন।

ইহারই মধ্যে বিশ্বেশ্বরের চমৎকার দিন কাটে। মাঝে মাঝে কিসের জন্য তাহার মন হাহাকার করিয়া ওঠে, নির্জ্জন গৃহকোণে তাহার মন কোন্ সুদূরে উড়িয়া যায়। কিন্তু তখনই হয়তো পণ্ডিত দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া একটা রসের গান ধরে, নয়তো ঘোষ আসিয়া কাণের কাছে ডাকে, মিট!

বিশ্বেশ্বর প্রথমটা চম্‌কাইয়া ওঠে, আগন্তুকের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চায়। কিন্তু তখনই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ওঠে, তাহার হাসির শব্দে ঘর ফাটিবার মতো হয়। পাশের ঘরগুলি হইতে সকলে চীৎকার করে, Shut up. তারপর তাহারা নিজেরাও হাসিয়া ওঠে।

সেদিন সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর সূর্য্যাস্তের কিছু আগে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। বর্ষণক্লান্ত মেঘে মেঘে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে। এবং তাহারই আভা আসিয়া পড়িয়াছিল সুমুখের কৃষ্ণচূড়ায় ও তৃণাচ্ছন্ন আঙ্গিনায় জেলের লাল পাঁচীলে এবং সর্ব্বত্র। অভিশপ্ত কারাগার সেদিন সন্ধ্যায় যেন হাসিয়া উঠিল।

মিরাণ্ডা ও বিশ্বেশ্বর তখন উঠানটিতে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়িল, মিরাণ্ডার মুখের উপর রক্ত মেঘের আভা পড়িয়া তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখখানি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বেশ্বর সেই মুখখানি মেঘের দিকে উঁচু করিয়া অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। পায়ের নীচের পৃথিবী একবার টলিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। তাহার শিরায় শিরায় পুলকের তরঙ্গ বহিতে লাগিল...

মিরাণ্ডা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—যাও।

বিশ্বেশ্বরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল, পায়ের নীচের মাটি পায়ে বাজিতে লাগিল...কি বিশ্রী! সে মিরাণ্ডাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া নিজেও দু'পা পিছাইয়া আসিল। বলিল—তুমি যাও।

মিরাণ্ডার রাত্রের সিগারেট নাই। সে আব্দার করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বর চীৎকার করিয়া বলিল—যাও!

তাহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মিরাণ্ডার আর সিগারেট চাহিতে ভরসা হইল না, ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

বিশ্বেশ্বরের সমস্ত দেহ অজ্ঞানিত আবেগে কাঁপিতে লাগিল। নিজেকে সে যেন আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। মনে হইল এই ভিজা ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া শুইয়া যদি সে কাঁদিতে পারিত, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো বিশ্বেশ্বর অনেকক্ষণ উঠানময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক দিন পরে আজ আবার তাহার নূতন করিয়া মনে হইল, সে বন্দী, সে বন্দী।

কৃষ্ণচূড়া গাছটি তখনও সূর্য্যাস্তরাগে ঝলমল করিতেছিল। বিশ্বেশ্বরের মনে পড়িল, বহুদিন আগে,—সেদিনও শ্রান্তবর্ষণ মেঘে-মেঘে অস্তরবির আভা পড়িয়াছিল। ছাদের

উপর একখানি চেয়ার লইয়া বসিয়া সে দূরের মাঠে কচি ধানের তরঙ্গায়িত পাতায় বর্ণ-শোভা দেখিতেছিল। কি কারণে অমলাও যেন ছাদে আসিয়াছিল,—হয়তো তাহারও মনে সোনালি আলোর স্পর্শ লাগিয়াছিল। তাহার পরণে ছিল বুঝি একখানি বুটিদার টিয়া রঙের শাড়ী। কতই যেন ব্যস্ত এমনি ভাবে বার কয়েক তার কাছ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সে যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন খপ্ করিয়া বিশ্বেশ্বর তার শাড়ীর প্রান্ত ধরিয়া ফেলে।

অমলা ব্যস্ত ভাবে বলিয়াছিল,—ছাড়ো—

সে হাসিয়া বলিয়াছিল,—না।

সেদিনে তাহার চোখে হাসি ছিল, বুঝি যাদুও ছিল। অমলার সমস্ত দেহ আনন্দে টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পানে ভালো করিয়া চাহিতে পারে নাই। নত-নেত্রে অস্ফুট স্বরে শুধু বলিয়াছিল,—কত কাজ বাকী আছে।

বিশ্বেশ্বর অমলাকে কাছে টানিয়া গাঢ় স্বরে বলিয়াছিল—, তোমার এমন রূপ আর কোনো দিন দেখি নি। অমন ক'রে মুখ নামাও কেন? আমাকে দেখতে দাও,—দেখতে দাও।

অমলা মুখ তোলে নাই,—তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া অকারণে বড় কান্না কাঁদিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর কি তাহার কানে-কানে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল?

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের উঠানে দাঁড়াইয়া সে তাহাই স্মরণ করিবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করিল।

অকস্মাৎ নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার সমস্ত মন চীৎকার করিয়া উঠিল,—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। কোনো দিন সে অমলাকে কাছে ডাকিয়া প্রিয় কথা কহে নাই,—কোনো দিন বলে নাই, তোমার এত রূপ! টিয়া রঙের শাড়ী? কোথায় টিয়া রঙের শাড়ী? চোখের একান্ত সন্নিকটে যে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহার দেহের পরে দৃষ্টিই কি কোনো দিন পড়িয়াছে?

বিশ্বেশ্বর বলিল,—সে মিথ্যা। আমার অতীত জীবন শুধু একটা স্বপ্ন। সত্য এই জেল, সত্য এই জেলের জীবন।

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

দোতালার বারান্দার এক কোণে ঘোষ ও মিরাণ্ডা মুখোমুখি দু'খানা চেয়ারে বসিয়া কি যেন গল্প করিতেছিল, আর হাসিতেছিল।

এমন সময় বিশ্বেশ্বর আসিয়া মিরাণ্ডার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল এবং তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে টেবিলের উপর বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

—সিগারেট নেবে?

ভয়ে মিরাণ্ডার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না, অবাক হইয়া বিশ্বেশ্বরের চোখের দিকে চাহিল।

বিশ্বেশ্বর একটা প্যাকেট সিগারেট তার কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

মিরাণ্ডা আস্তে আস্তে সেটা পকেটস্থ করিয়া বোকার মতো খানিকটা হাসিল, বিশ্বেশ্বরও হাসিল। সাহস পাইয়া মিরাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কাছে 'হেজলিন' আছে?

—তোমার চাই? আচ্ছা, কালকে আনিয়ে দোব।

মিরাণ্ডা ভারি খুসী হইয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর আপন মনেই কি খানিকক্ষণ ভাবিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, তোমার এমন চমৎকার চেহারা, কোনো মেয়ে তোমার প্রেমে পড়ে নি?

মিরাণ্ডা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল,—না।

—পড়েনি? মিথ্যে কথা বলছ? বিশ্বেশ্বর রাগিয়া গেল।

মিরাণ্ডা ভয়ে ভয়ে বলিল,—মিথ্যে নয়। সত্যি বলছি, পড়েনি।

—না পড়েনি! মিথ্যুক কোথাকার!

বিশ্বেশ্বর জোরে-জোরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

পরের দিন ভোরে প্রথমেই দেখা হইল পণ্ডিতের সঙ্গে। তখন তাহার চোখ জবা ফুলের মতো লাল। সে চোখ দেখিয়া পণ্ডিত ভয় পাইয়া গেল। কিছুদিন হইতেই বিশ্বেশ্বরের মেজাজ খিটখিটে হইয়াছে। হাসিতে হাসিতে এমন

অকস্মাৎ রাগিয়া উঠে যে, সকলে কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অবাক হইয়া যায়।

পণ্ডিত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার চোখ লাল হয়েছে যে! উঠ্‌লো নাকি?

বিশ্বেশ্বর প্রথমে বিরক্ত ভাবে বলিল,—না।

কিন্তু পরক্ষণেই পণ্ডিতের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ পণ্ডিত? একটু আমার ঘরে বসবে? ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে এস বিছানার কাছে।

পণ্ডিত চেয়ারটি তাহার বিছানার কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বসিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—তুমি ঠিকই ধরেছ পণ্ডিত। চোখ আমার লালই হয়েছে।

এ বিষয়ে পণ্ডিতেরও কোনো সংশয় ছিল না। সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—আজ দশ রাত্রি আমি ঘুমোই নি;—রাত্রেও না, দিনেও না। ঠায় জেগে কাটিয়েছি। কি করি বলো তো?

পণ্ডিত বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল,—তুমি বাড়ীর কথা ভেবো না, বিশু। বাড়ীর কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাবে। মনে কর, বাড়ী নেই,—এইটেই বাড়ী।

তাকে বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর রাগিয়া বলিল,—দুত্তোর বাড়ী! বাড়ীর কথা ভাববার জন্যে আমার দায় পড়েছে। তুমি কিছু বোঝ না কেন?

পণ্ডিত বোঝে সবই, কিন্তু দীর্ঘকাল বড় লোকের সঙ্গে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার না বুঝিবার ভাণ করা তাহার এমন রপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, সে অভ্যাস আজও যায় নাই।

পণ্ডিতের একখানি হাত খপ্‌ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—আমি ঠিক ম'রে যাব পণ্ডিত,—ঠিক ম'রে যাব। দেখ্‌ছ না, আমার শরীর দিন-দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে? আমার দেহে-মনে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে,—তারই যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছট্‌ফট্‌ করছি। এমন করলে ক'দিন বাঁচবো?

পণ্ডিত একবার তার দেহের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। তারপর একটু কাশিয়া গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিল,—তোমাকে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই আমি এমনি অবস্থার কথা ভেবেছিলাম। তার আগে ঘোষকেও দেখলাম কি না। বেচারার তো মাথাই খারাপ হ'য়ে গেল।

পণ্ডিত হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—তোমায় ছুঁয়ে বলছি, জীবনে কোনো দিন আমার এ চঞ্চলতা আসে নি। অমলা যতদিন ছিল, তার দেহের পানে ফিরে তাকাবার কোনোদিনই প্রয়োজন বোধ করি নি। লালসার কথা ভাবতে গেলেও আমার মন সংকুচিত হয়ে যেত। এ আমার কৃচ্ছ্র-সাধন নয় পণ্ডিত, এই ছিল আমার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে রূপের চাইতে অপরূপের 'পরেই লোভ ছিল বেশী। সেই অপরূপকে আমি পেয়েছিলাম অমলার মধ্যে। তাকেই পেয়ে আমার সমস্ত মন প্রজাপতির মতো দুখানি পাখা মেলেছিল। দু'হাতে আমার নিজেকে বিলিয়েও শেষ করতে পারতাম না,—তবু সবই বাকী থেকে যেত। কেউ কি জানতো, কিসের আনন্দে অমন ক'রে খাটতে পারতাম?

একটু থামিয়া বিশ্বেশ্বর আবার বলিল,—আমার কেবলি কি মনে হোতো জানো পণ্ডিত? মনে হোতো, এই পৃথিবীর কাছে আমার অনেক ঋণ। অমলার হাত দিয়ে তার সমস্ত রস সে একা আমাকেই পরিবেশন ক'রেছে। সেই ঋণ আমায় শুধতেই হবে। এ কথা কি অমলাই জানতো? প্রথম যৌবনের লালসা তখন তার কাঁধে ভর ক'রেছে। সে চাইতো, মাটির তালের মতো তার দেহকে কেবল আমি চট্‌কাই। মাঝে-মাঝে তার চোখের পানে চাইলে আমার ভয় হোতো। সেই ভয়েই আমি ক্রমাগত তাকে এড়িয়ে চল্‌তে চাইতাম।

বিশ্বেশ্বর আপন মনেই একটু হাসিল।—

—তখন কি জানি, এত প্রচণ্ড তার শক্তি! সেই লালসা অমলাকে মেরেছে, আমাকেও মারবে।

বিশ্বেশ্বর আবার হাসিল,—মুমূর্ষু রোগীর মতো অত্যন্ত ক্ষীণ, পাতলা হাসি।

অকস্মাৎ পণ্ডিতের জামার আস্তিনে টান দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, পণ্ডিত, আমার জীবনে যার দেহের কোনোই প্রয়োজন বোধ করিনি, তার সেই দেহটাই যেদিন ছাই হ'য়ে গেল, সেদিন যেন আমার জীবনেও আর কোনো মানে রইল না। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, কিন্তু সত্যিই আমি খুনের দায় থেকে নিজেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করি নি। অথচ, বাঁচবার পথ নিশ্চয় ছিল। আমার মনে হোল, এবারে এই দেহটা ফাঁসীতেই শেষ হোক, আর জেলেই শেষ হোক, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চঞ্চল হওয়ার কারণ নেই। আর আজকে এই দেহটা নিয়েই—

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের পানে চাহিল।

পণ্ডিত চিন্তিত ভাবে বলিল,—তাইতো!

উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা পণ্ডিত তোমার স্ত্রী বেঁচে আছেন ?

—আছেন বই কি ! নইলে কার জন্যে আর টাকা আত্মসাৎ করলাম ?

—তা বটে।—তারপরে একটু দ্বিধা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বেশ সুন্দরী ?

পণ্ডিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—খুব।

—তা ছাড়াও তো...

—হ্যাঁ, তা ছাড়াও অনেক ছিল।

বিশ্বেশ্বর বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল,—বেশ, বেশ। পণ্ডিত তুমি খুব সুখী লোক। তোমাকে আমার হিংসে হয়। তোমার কাছে সেই সব গল্প শুনতে খুব ইচ্ছে হয়। বলবে একদিন ? আমি নিজে অনেক সময় সেই সব ঘটনা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। পারিনে। তুমি বেশ রসিক লোক,—অভিজ্ঞতাও অনেক। তোমার কাছেই শুনবো একদিন।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—তাই শুনো। তারপর অবসর সময়ে ব'সে ব'সে তারই সাহায্যে নতুন নতুন কল্পনা কোরো। তোমার এই সব গল্প শুনতে বেশ লাগে, না ?

স্বীকার করিতে বিশ্বেশ্বরের লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু পণ্ডিতের কাছে আবার লজ্জা কি ? সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, লাগে।

১০

এই একটা মাস ঘোষের যেন আর কাটিতেছিল না। সে নিখুঁৎ হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, ২১শে সেপ্টেম্বর তাহার মুক্তির দিন। তার দুই একদিন আগেও ছাড়িয়া দিতে পারে। জেলের বইতে তাহার সম্বন্ধে মন্দ মন্তব্য কিছুই নাই। কেবল একবার জেলারের বিরুদ্ধে চটিয়া গিয়া তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছিল। তাহাতে তাহার দুই দিন 'পেনাল ডায়েট' হইত। কিন্তু জেলার লোক ভালো, পাঁচ জনে এবং তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষ নিজেও গিয়া তাহার হাতে-পায়ে ধরায় সে যাত্রা নিষ্কৃতি পায়। সুতরাং এক মাসেই যে সে ছাড়া পাইবে সে বিষয়ে কোনোই ভুল নাই, বরং আটাশ দিনও হইতে পারে, সাতাশ দিনও হইতে পারে।

মুক্তির সম্ভাবনায় ঘোষের আনন্দ হইয়াছে নিশ্চয়ই। তথাপি, কেন জানি না, সে অবসর সময়ে সম্পূর্ণ একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই ভালো বাসে। কেহ আসিয়া টানিয়া বাহির না করিলে বড় একটা বাহিরে আসে না। বেশীর ভাগ সময় সে হয় গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া ভাবে, নয় গুণ-গুণ স্বরে গান গাহিয়া ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পাদচারণা করে। সে যেন আস্তে-আস্তে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে কাহারও সংবাদ রাখে না, তাহার সংবাদও বড় একটা কেহ রাখে না।

তাহার মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন একদিন পণ্ডিত আসিয়া তাহার কক্ষে দেখা দিল।

পণ্ডিত তাহার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কী ঘোষ ! দিন আর কাটিছে না, না ?

ঘোষ সম্ভবত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সে প্রথমটা অবাক হইয়া পণ্ডিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল এবং তারপর বলিল,—খবর কি পণ্ডিত ?

পণ্ডিত তাহার পাশে আর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিল,—বাইরে গিয়ে তোমাকে একবার শ্যামবাজার যেতে হবে।

ঘোষ বিস্মিত হইয়া বলিল,—শ্যামবাজার ?

পণ্ডিত তাহার বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই বলিতে লাগিল,—চিঠিই দিতাম, কিন্তু তুমি যে লোক. চিঠি নিয়ে যাওয়া তোমার কাজ নয়। যাওয়ার সময় গেটে ঝাড়া-পোড়া নিয়ে তবে ছাড়বে। তুমি চিঠি সামলে নিয়ে যেতে পারবে না, ধরা পড়ে আবার জেল খাটবে। সে হয় না। কিন্তু আমারও ভারি জরুরী প্রয়োজন। কাল রাত্রে সেই কথাই শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। কি ক'রে যে খবর দিই, তার দিশে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হোল, তোমাকে দিয়ে খবর পাঠালেই তো চলবে।

ঘোষের এতক্ষণে মনে পড়িল, শ্যামবাজারে পণ্ডিতের বাড়ী। সে জিজ্ঞাসা করিল,—কাজটি কি ?

পণ্ডিত বলিল,—সে যাবার সময় ব'লে দোব এখন। এই যে, বিশু ! কি মনে করে ?

বিশ্বেশ্বর উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া অন্য স্থানের অভাবে ঘোষের বিছানার উপরই পা-ঝুলাইয়া বসিল।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—একা-একা অনাথিনীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ,—তোমার মিরাণ্ডা কোথায় ?

বিশ্বেশ্বর বলিল,—সে শালা মরেছে। কালকে সন্ধ্যার সময় সিগারেটের দরকার পড়েছিল, একবার এসে নিয়ে গেল। তারপর আর তার খোঁজ নেই। সে যাক্। কিন্তু ঘোষ যে চলল। আমার সত্যি এখন থেকেই মনটা খারাপ করছে।

পণ্ডিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমারও। কিন্তু—আচ্ছা ঘোষ, তুমি এখন গিয়ে কোথায় উঠবে ?

ঘোষ মুক্তির সম্বন্ধে ক্রমাগত অনেক কিছু ভাবিয়াছে,—এই কথাটি ছাড়া। তাহার পায়ের নীচের মাটি যেন সরিয়া গেল। সে হতাশ ভাবে বলিল,—তাই তো !

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও নেই ?

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এক পয়সাও না। যা ছিল, তাও···হুঁ:।

পণ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করিল,— বন্ধু-বান্ধব ?

ঘোষ উত্তর দিবার প্রয়োজন মনে করিল না,—শুধু একটু হাসিল। চোরের কি ভদ্রলোক বন্ধু-বান্ধব থাকে ? লোকে তাহাকে আশ্রয় দিবে কোন্ সাহসে ?

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, সেই যে মেয়েটি,—কি যেন চমৎকার একটি নাম আছে তার, ভুলে যাচ্ছি,—যে মেয়েটি তোমাকে একদিন ভালোবেসেছিল। দিন কয়েকের জন্যে সে কি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে না? এতদিনে হয় তো তার ছোট সংসারটি দু-তিনটি ছেলে-মেয়েতে আরও একটু বড় হয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে মাতৃত্বের স্নিগ্ধতা এসেছে। সে আরো অনেক বেশী সুন্দর হয়েছে নিশ্চয়। পুরোণো প্রেম স্মরণ ক'রেও সে কি তোমায় একটু আশ্রয় দেবে না ?

ঘোষ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, দেবে ? তুমি কি মনে কর পণ্ডিত, দেবে না ? অথচ তারই জন্যে আজকে আমার এই অবস্থা। নইলে মক্কেলের টাকা ভাঙার আমার কি-ই বা প্রয়োজন ছিল ?

পণ্ডিত বলিল—দেখ ঘোষ, পুরোণো প্রেমের দাম ছেঁড়া জুতোর চেয়েও কম। ছেঁড়া জুতোও মেরামত ক'রে সময়-অসময়ে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু পুরোণো প্রেমের আর মেরামতও চলে না। তবে—

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল—তুমি বলো কি পণ্ডিত ? কোনো গাছের ছায়ায় যে-অপরাহ্ণটি ওরা দুজনে মিলে কাটিয়েছে, যে-বাদলের মধ্যাহ্নে একের মন অন্যের সঙ্গের জন্যে লোভার্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,—হোলোই বা সে একটি মাত্র অপরাহ্ণ, হোলোই বা সে স্বল্প কটি দিন,—মানুষের জীবনে তার কি কোনো মূল্য নেই ?

পণ্ডিত চোখ দু'টি ঢুলু ঢুলু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কিছুমাত্র না। সে অপরাহ্ণটিকে ওরা মূল্য দিয়েই কিনেছিল। কিন্তু আজকে সেই পুরোণো অপরাহ্ণটির কোনো মূল্যই নেই। মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে। আজকে ঘোষকে আবার নতুন অপরাহ্ণের সন্ধানে বেরুতে হবে,—নতুন একটা বাদলের মধ্যাহ্নের।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল—তুমি জাননা পণ্ডিত, প্রেমের ব্যাপারে তুমি একটা প্রকাণ্ড নাস্তিক। তোমার ধারণা নেই, স্মৃতির টান কত প্রচণ্ড। যে-বাড়ীটায় তিন দিনের জন্যে বাসা বেঁধেও মানুষ চলে আসে, পথ চল্‌তে হঠাৎ সেই বাড়ীটার সামনে এসে পড়লে সহস্র কাজের কথা ভুলেও মানুষ সেই বাড়ীর পানে চায়। পুরোণো বাসার প্রত্যেকটি পরমাণু তাকে টানে। আর মানুষ, যার সঙ্গে কত মধুর মুহূর্ত্তের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সে টানবে না ?

পণ্ডিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে হাতের ইঙ্গিতে বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিতে লাগিল,—তুমি যা বলবে, আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনো মেয়েকেই কোনো একটা পুরুষ চিরকালের জন্যে জয় করতে পারে না, যদি না মন্ত্র প'ড়ে, আইন দিয়ে তার ভালোবাসার অগ্রগতিকে বাধা দেয়। সে সুযোগ যারা পায় না, তারা একটি মেয়ের একটি মুহূর্ত্তকেই জয় করে। গাছের জীবনে যে ফুলটি কালকে ফুটে কালকেই শুখিয়ে গেছে, আজ নতুন ফুল ফুটলো ব'লেই গতকালের ফুলটিও তো মিথ্যে নয়! —গাছের কাছেও নয়, শুকনো ফুলটির কাছেও নয়।

পণ্ডিত একটু হাসিয়া বলিল—তুমি যখন কবিতার মতো ক'রে কথা বলো বিশু, আমার ভারি মিষ্টি লাগে। তোমার কথাতেই সায় দিতে লোভ হয়। কিন্তু আমি জানি তোমার কথা সত্যি নয়। খুব ছেলে বেলায় একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম। সেই মেয়ের যেদিন অন্য জায়গায় বিয়ে হোল, সেদিন আমি কেবলই কেঁদেছিলাম। সেও কম কাঁদেনি। তারপরে কখন যে তাকে ভুলে গেলাম টেরও পেলাম না। অনেক দিন পরে হঠাৎ একখানা চিঠি এলো তার স্বামী মারা গেছেন। ক'টি নাবালক ছেলে নিয়ে সে অকূলে ভাসছে, কিছু সাহায্য চাই। প'ড়ে কষ্ট হোলো, গোটা কয়েক টাকা পাঠাবারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দিচ্ছি-দোব ক'রে তাও পাঠাতে ভুলে গেলাম।

ঘোষ ইংরাজিতে বলিল,—Brute.

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—তা বলো। এবং তোমার 'পুরোণো প্রেম'ও যেদিন তোমাকে আশ্রয় দেবে না, সেদিন তাকেও এই গালাগালিটা দিয়ে এসো। কিছু সান্ত্বনা পাবে।

ঘোষ ও বিশ্বেশ্বর রাগিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া পণ্ডিত শয়তানের মতো ক্রূর হাসিয়া বলিল,—মিথ্যে তোমাদের ক্রোধের ভাজন হ'লাম। যখন হ'লাম তখন আরও একটু ব'লে যাই। মেয়েরা কোনো দিন কোনো পুরুষকেই ভালোবাসে নি। মা হওয়ার যে আনন্দ, ওরা ভালোবাসে সেই আনন্দকে। পুরুষ সেই আনন্দের উপলক্ষ মাত্র। তারা চিরকাল বোকা, তাই চিরদিন দাস, মৌমাছির মতো খেটে মরে। তাদের চরিত্রহীন ব'লে বদনাম আছে, কিন্তু সে শুধু একটা যোয়াল খুলে আর একটা যোয়াল ঘাড়ে নেওয়া।

পণ্ডিত আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর অস্ফুট স্বরে বলিল—নাস্তিক !

(আগামী বারে সমাপ্য)

পুস্তক-পরিচয়

সমস্যা ও সমাধান—মোহাম্মদ আকরম্ খাঁ। মোহাম্মদী কার্য্যালয়, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০।

মোহাম্মদীর সম্পাদক আকরম খাঁ সাহেবের পরিচয় নূতন ক'রে দেবার আবশ্যকতা নেই। বিভিন্ন সময়ে তিনি মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় আধুনিক কালের বিশিষ্ট কতকগুলি সমস্যা নিয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখেছেন, তা চিন্তার ক্ষেত্রে ইতি মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রেছে। তারই কতকগুলি একত্র ক'রে এই বইখানি মুদ্রিত হ'য়েছে—বইখানি প'ড়ে আমরা বিশেষ সুখী হ'লাম।

বাংলা দেশে আমরা, হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই, পাশাপাশি বাস ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু উভয়ে উভয়ের আচার, অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির গোড়ার কথা গুলো ঠিক ঠিক জানিনে—এই না জানার ফল অনেক সময়ে অতি কদর্য্য রূপে আত্ম-প্রকাশ ক'রে থাকে। কাজেই উভয় সম্প্রদায়েরই নৈতিক ও সামাজিক জীবনের আদর্শগুলি সহজবোধ্য ভাবে লিখে প্রকাশ করা সঙ্গত। হিন্দুদের পক্ষ থেকে সে চেষ্টা হ'য়েছে, মুসলমানদের তরফ থেকেও আকরম খাঁ সাহেবের মত যোগ্য ব্যক্তি যে সে কাজের ভার নিয়েছেন এ খুবই আশার কথা।

আলোচ্য গ্রন্থে সুদ-সমস্যা, চিত্র-কলা, সঙ্গীত ও নারী সমস্যা সম্পর্কে ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রের মত কি তা বিশদ ভাবে আলোচিত হ'য়েছে, বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে—। সুদ-সমস্যা প্রবন্ধটি বেশ সুলিখিতই হ'য়েছে। নারী সমস্যা সম্পর্কে কন্যা, পত্নী এবং মাতা, নারী-জীবনের এই তিনটি বিভিন্ন অবস্থাকে ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র কি ভাবে ব্যাখ্যা করেন লেখক তা বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মূলতঃ আমাদের কোন বিরোধ নেই—তবে স্থানে স্থানে তিনি বড় অতিশয়োক্তি ক'রেছেন যেমন, "কন্যা জন্মিবা মাত্র স্বয়ং তাহার পিতামাতা যে নির্ম্মম উপেক্ষা, ক্রোধ ও ঘৃণার সঙ্গে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করে" ইত্যাদি।—অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা এবং পণপ্রথা প্রভৃতির অবশ্য-ভাবী পরিণাম যা দাঁড়িয়েছে তাকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা ঠিক হয় না। কোন কোন স্থানে লেখক অপর ধর্ম্মের প্রতি অন্যাধিক অনাবশ্যক কটাক্ষ ক'রেছেন, যেমন "এছলাম নারীকে দেবীও বলে নাই, রাক্ষসীও বলে নাই, ভবগতীর অংশভূতাও বলে নাই, ভগবানের বাণী শ্রবণ করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত করে নাই।" বিরুদ্ধ মত সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যায়—যুগ যুগান্তের পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমবিকশিত হ'য়ে এসেছে, প্রত্যেক যুগের নূতন নূতন সংস্কারক এর ওপর নূতন নূতন রং চড়িয়েছেন, কাজেই এক যুগের মতের বিরুদ্ধ মত অন্য যুগে দেখ্‌তে পাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়—এ ক্ষেত্রে কোন একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর মতকে সর্ব্ববাদীসম্মত উক্তি বলা চলেনা। হিন্দু শাস্ত্রে নারীর ধর্ম্মানুশীলনের অধিকার এবং পুরুষের সঙ্গে তাঁর অধিকার-সাম্যের কথা আছে একথা মৌলানা সাহেবের যে জানা নাই, এ কথা মনে হয় না। লেখক ইসলাম ধর্ম্মে ও দায়ভাগে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়েও এই রকম কটাক্ষ ক'রেছেন। বস্তুতঃ সমাজের গঠন-পরিবেশ অনুসারেই যদি আইনকানুন গঠিত হয় তাহ'লে স্বীকার করতে হবে যে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, কাজেই একের ক্ষেত্রে যে আইন মঙ্গলজনক ব'লে প্রযুক্ত হ'য়েছে অন্যের ক্ষেত্রে তা আবশ্যক না হ'লে তাকে অসঙ্গত বলা যায় না। তদ্ভিন্ন হিন্দু দায়ভাগেও 'স্ত্রীধন' কথাটার প্রয়োগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আলোচ্য বইটির ভাষা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। লেখক সমস্ত বইখানার মধ্যেই 'দুনয়া', 'কেয়ামত', পাঠকের 'খেদমতে', 'তছরূপ' প্রভৃতি শব্দ ঘন ঘন ব্যবহার ক'রেছেন—এ সকল শব্দ আরবী-ফার্সি-অভিজ্ঞদের জানা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের কাছে এরা অপরিচিত। আকরম খাঁর মত বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ সুসাহিত্যিক, যিনি একাই বাংলা দেশবাসী মুসলমানের

ভাষা বাংলা হওয়া উচিত ব'লে আন্দোলন করেছেন, তাঁর গ্রন্থে এরকম মিশ্রভাষা থাকলে তা দুঃখের বিষয় হয় না কি?

ব্যথা ও বেদনা।—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পুস্তক। প্রকাশক: দি বুক কোম্পানী, কলেজ স্কয়ার।

নব-পরিণীতা পত্নীকে দেশে রেখে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত গমন ক'রে লেখক যে বিরহব্যথা অনুভব ক'রেছিলেন তা হ'তেই এ কবিতাগুলির জন্ম। লেখকের কাঁচা হাতের ছাপ অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে, ছন্দের ত্রুটিও আছে, অনুকরণের ছায়াও আছে—তবু অনেকগুলি কবিতার মধ্যেই বেশ একটা স্নেহকরুণ অন্তরের সুর প্রকাশ পেয়েছে। বইখানির ভূমিকা-লেখক শ্রীযুত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ লেখকের কোন নিকট আত্মীয়—যদি আমাদের এ অনুমান সত্য হয় তাহ'লে তাঁর এ প্রকার ভূমিকা লেখাটা শোভন হয় নি ব'লতে হবে।

আমার আত্মকথা—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। আর্য্য-পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

দ্বীপান্তরের 'বারীনদা' সম্পর্কে বাঙালীর অন্তরে একটা শ্রদ্ধার আসন আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সে দিনকার যে কটী তরুণ রাতারাতি ভারত উদ্ধারের সহজ উপায় স্বরূপ বোমা-বীর সেজেছিলেন, দেশ তাদের প্রতি একটা সভয় সম্ভ্রম পোষণ করে এসেছে—তার উপর রাজ-রোষের কুজ্ঝটিকা আবৃত হওয়ায় তাঁদের জীবন সাধারণের কাছে কতকটা রহস্যময় এবং একটু অসাধারণও হ'য়ে প'ড়েছিল। এই অসাধারণত্ব টুকু ছিল সেই ভাল, কিন্তু সেই সঞ্চয়কে ভাঙিয়ে খেতে গিয়ে বারীনদা পড়েছেন ফ্যাসাদে। অহিংস আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী অসঙ্কোচে তাঁর জীবনের স্খলন পতনের ইতিহাস লিখেছেন, সেদিনকার অগ্নিযুগের বারীনদাই বা সে সুযোগ টুকু ছাড়বেন কেন? বারীনদাও আত্মকথা লিখেছেন—আগ্রহ সহকারেই তা আমরা প'ড়তে আরম্ভ করেছিলাম। আশা ছিল অরবিন্দ মনোমোহনের ভাই বারীন্দ্রকুমার, স্বদেশী যুগের বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্র কুমার, না জানি তাঁর নিজের জীবনের কি বিচিত্র ইতিহাসই লিখবেন! একটু ভয়ও ছিল, পাছে বইটির পাতায় পাতায় দেখি তান্ত্রিক অভিচারসাধনের রোমাঞ্চকর আয়োজন, কালো অমাবস্যা রাত্রে কপালিনী দেশমাতৃকার সম্মুখে নর-কঙ্কালের ওপর ব'সে আত্ম-বলির নিষ্ঠুর অভিনয়! কিন্তু হায়, যতই এগিয়ে যাই ততই দেখি, এযে খাসা প্রেমের কাহিনী, দিব্যি খোস্ মেজাজে বারীনদা রূপকথার রাজপুত্রের মত প্রণয়ের উজানে পাড়ি জমাচ্ছেন! হয়ত কথা উঠবে, কেন বোমার আসামী ব'লে বারীনদার কি প্রেমে প'ড়তে নেই? খুব আছে, রামা শ্যামা যখন প্রেমে পড়ে তখন বারীনদাও তা পড়তে পারেন। কিন্তু প্রেমে পড়াটাই এমন একটা অদ্ভুত কিছু নয় যার জন্যে বারীনদাকে লোকে অসাধারণ মনে ক'রবে। তাছাড়া অরুচির মুখে মুখ বদলানোর মত তিন দিন অন্তর একটা ক'রে প্রেমে পড়ার মধ্যে মহত্ত্বের বা উচ্চ মনুষ্যত্বের আদর্শ এমন কিছু নেই যার জন্যে এতখানি সোরগোল ক'রে আত্ম-জীবনী লেখা যেতে পারে। পত্রান্তরে এই কাহিনীকে 'frank confession' ব'লে তারিফ করা হ'য়েছে, এটা frank তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যা confession করারই অযোগ্য তা frank হ'লেই বা কি আসে যায়? বস্তুতঃ দেশসেবক বারীন ঘোষকে লোকে দেশসেবার দিক থেকেই দেখতে চায়—তিনি কার সঙ্গে প্রেমে প'ড়েছিলেন, কেমন ক'রে অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় ক'রেছিলেন, এবং কোন্ ফরসা লিক্‌লিকে সোনার বেনের ছেলেটা তাঁকে প্রথম ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তা জানবার কৌতূহল কারুর নেই; মানুষ-জীবনের আর পাঁচটা গুহ্য ব্যাপারের মত এগুলো সত্য হ'লেও কুৎসিত, এবং সেই জন্যেই প্রকাশের অযোগ্য। যাঁরা অর্থের বা অন্য কোন কারণের জন্যে রমেশদা, মুকুলদার আত্মকাহিনী লিখে বাজার মাৎ ক'রছেন ...তাঁদের আমরা বুঝতে পারি—কিন্তু বারীনদার এ মতিভ্রম কেন? বইটি থেকে কতকগুলি অংশ আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি, পাঠকরা নিজেই তার বিচার করুন—"নারী আমায় ভাল বেসেছে চিরদিনই লুকিয়ে—শাস্ত্র ডিঙিয়ে, লোকাচারের

পাঁচিল ট'প্‌কে, অবৈধতার চোর-দরজা খুলে, খিড়কির পথে" (পৃঃ ১২৭) "পড়া নিতে এসে আমার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে সুগন্ধি চুলের পরশ দিয়ে সে আমার সর্ব্বনাশটি করলে, মাথা ঘুরে যাবার যে টুকু বাকি ছিল তা শেষ ক'রে দিলে ঐ চোখের আড়ে আড়ে সলাজ সত্রাস চাহনি! বাস্, সেই থেকে হ'য়ে গেল আমাদের সর্ব্বনাশ!" (পৃঃ ১৩০) "অসুখ কোথা? তুমিও যেমন হাবা মনিষ্যি, দিদিমণির খোকা হবে গো, খোকা!..........যে এমন সর্ব্বস্ব ঢেলে নিবিড় প্রেমে আমার হয়েছে তার গর্ভে অন্যের সন্তান!" (পৃঃ ১৩২) কাবুলী ওয়ালাদের প্রসঙ্গে তিনি ব'লেছেন, "স্ত্রীর চেয়ে সুকুমার বালক ওরা কামচর্চ্চার জন্যে ভাল মনে করে" (পৃঃ ৩২)—এ ছাড়া ১৭৮।৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বারীনদা এবার "নব কামশাস্ত্র" রচনা করে কামানন্দ নাম নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে যান না।

বারীনদা নিজেই ব'লেছেন, "যারা এই দুশো পৃষ্ঠা ব্যাপী আত্মকাহিনী প'ড়েছেন তাঁরা এই মানুষকে তার রক্ত-রাঙা প্রচেষ্টার মধ্যে চিন্‌তে পারবেন কিনা সন্দেহ"! বারীনদার সন্দেহ অমূলক—চিনতে আমাদের বাকি নাই।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নন্দিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকে দুইটি গল্প আছে। শৈলজা বাবুর গল্প যে শ্রেণীর হইয়া থাকে—এই দুটি সেই শ্রেণীরই।

কন্যার পাত্র-নির্ব্বাচনে অসতর্কতা ও অবিবেচনার উপরই গল্প দুটির আখ্যান-বস্তু নির্ভর করিতেছে। ঐ পাত্র-নির্ব্বাচন ব্যাপারটায় একটু অস্বাভাবিকতা থাকিতে পারে—থাকিলেও তাহা প্রথমটা একটু মনে লাগে—কিন্তু ঐ ব্যাপারটা অবলম্বন করিয়া যখন গল্প জমিয়া উঠে—তখন আর সে কথা মনে পড়িয়া রসভঙ্গ ঘটায় না। লেখক যদি রস জমাইতে পারেন—তবে আখ্যান-ভাগের স্বাভাবিকতা ষোল আনা বজায় আছে কিনা তাহা বিচার করার প্রয়োজনই হয় না। গল্প দুইটি বেশ জমিয়াছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয়টি ত' একেবারে চমৎকার।

পাত্র-নির্ব্বাচনের অবিবেচনার সূত্র ধরিয়া শুধু লেখকের গল্প জমে নাই—বাংলার সামাজিক জীবনের দুর্গতিমূলক একটি সত্যেরও বেশ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে দেশের সমাজে divorce নাই—বিধবা-বিবাহ নাই—সে দেশের বৈবাহিক ব্যাপারটা যে কত সতর্কতা ও সুবিবেচনার বিষয় তাহা লেখকের রচনা পড়িয়া ভাবিতে হয়—এটা রসের সঙ্গে উপরি পাওনা।

'জননী' গল্পটি লেখক যে ভাবে উপসংহার করিয়াছেন—তাহা তাঁহার মতন পাকা হস্তের দ্বারাই সম্ভব। দুরন্ত মেয়ে, সে শান্ত হইবে কিসে? শুধু কি শ্বশুর-বাড়ী গিয়া? প্রেম চাই না?—স্বামীর আকর্ষণ চাই না? জননীত্ব চাই না? শঙ্করীর শ্বশুর শাশুড়ী শঙ্করীর জননীত্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষাই করিল না। সে প্রেমিকের রসস্পর্শ পাইল না। রসই পারে রোষকেও বশ করিতে। অপর্ণাও দুরন্ত মেয়ে। কিন্তু সে পাইল প্রিয়-দর্শন কিশোরের রসস্পর্শ! বয়সের বেশি তফাৎ নাই—কারণ স্বামী I. A. পড়ে মাত্র। ছাত্র-জীবনের মাধুর্য্য ও Romance তাহার অন্তরকে করিয়া রাখিয়াছিল সরস। প্রেম যে আপাতদৃষ্টির সকল অমিলকে মিলাইয়া দেয়—গতযৌবন বিষয়াসক্ত পিতৃমন তাহা বুঝিবে কি করিয়া?

যাক্—প্রথম গল্পটির সৌদামিনীর মানসদ্বন্দ্বটিকে লইয়া এবং দ্বিতীয় গল্পটির বিপত্নীক কেদার বাবুর প্রাণের আকুল বৎসলতা লইয়া লেখক যে রস-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীকালিদাস রায়

ব্যথার বাঁশী—কবিতার বই। রচয়িত্রী শ্রীমতী সুব্রত কুমারী দেবী। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। পাইকা অক্ষরে সাদা এণ্টিক কাগজে ছাপা।

"গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন"এ প্রকাশ তাঁহার পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং স্নেহের অত্যাচারে "এই ব্যথার বাঁশী" নিরুপায় হইয়াই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে হইল। ইহার উপর আমাদের মন্তব্য অনাবশ্যক। রচনার মধ্যে ঈশ্বর-ভক্তি ও একপ্রাণতা আছে।

অক্ষরা—কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত লিখিত ১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি কাব্য-পুস্তিকা। মূল্য দেড় আনা। প্রকাশক কবি নিজে।

জগদীশ বাবুর কবিতার বই বাহির হইল দেখিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি। অর্থাৎ আমারও একদিন এক গল্পের বই বাহির হইতে পারে। সে কথা যাক্—জগদীশ বাবুর প্রাণে কবিত্ব আছে, তাহা তাঁহার গল্প পড়িয়া বুঝিতে পারি। এ পুস্তিকা পড়িয়া বুঝিতেছি তাহার ছন্দোজ্ঞানও বেশ আছে। নূতন ভাব-সমাবেশের চেষ্টা আছে। তবে কবিতাগুলি অবসরে চিত্ত-বিনোদনকল্পে লিখিত বলিয়া মনে হয়। প্রাণের বিশেষ কোনও তাগিদ ইহাতে নাই।

পূজার পারুল—শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ছোট একখানি কবিতার বই।

'প্রথম পাতা'য় কবির নিবেদন মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার 'প্রণাম' গ্রহণীয় এবং তিনি 'আশীর্ব্বাদ' এর পাত্র বটে।

'পদ্মপাদ'

কাজল লতা—শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল। প্রকাশক—এম, সি সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম ১৷৷০

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সুতরাং তাঁর পরিচয় দিতে যাওয়াটা বাহুল্য।

তরুণ লেখকটীর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে এবং তাঁর শক্তিকেও আমরা শ্রদ্ধা করি।

কাজল লতা বইখানি পূর্ব্বে বিজলীতে প্রকাশিত হয়েছিল—এই বই খানিতে তিনি একটী নতুন রূপের সন্ধান করে তারই আনন্দ আমাদেকে পরিবেশন করতে চেয়েছেন।

সুলতা একটী রূপবতী নারী, জীবনের রস তার অপূর্ব্ব—সে রস এত স্বচ্ছ এত নির্ম্মল যে, সে রসে মত্ততাকামী পুরুষ তৃপ্ত হয় না, সরলতা তার এত সরল যে তার ছোঁয়ায় মানুষের মিথ্যা কল্পনার প্রসাদ মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। যে পথিক তার কাছে এসে অঞ্জলি পেতে দাঁড়ায় তারই অঞ্জলি খানি সে আপন জীবনের নির্ম্মল রসধারায় পূর্ণ করে দিচ্ছে সুসরল হাসিটী হেসে। সকলের স্মৃতিকেই সে পূজা করে, কিন্তু যেন বেদনা নাই।—বেদনা যদি থাকতো তবে এমন ভাবে সমান শ্রদ্ধায় পূজা করা চলত না। "অথচ সে স্বৈরিণী নয়,—সতীত্ব অসতীত্বের কথাই তার সম্বন্ধে ওঠে না।" এই-খানেই ওঠে বাস্তবতার কথা, বাস্তবে কি এমন সম্ভব? মানুষের সহজ প্রবৃত্তিতে এবং সংস্কারের ছায়ায় মানুষ বেড়ে ওঠে, এমন কি হয়? মনে হয় হয়না;—মানুষ এমন সদ্যোজাত শিশুর মত সরল হয় না;—এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কপাল-কুণ্ডলাকে বস-বাসহীন নির্জ্জন বালুচরে পালন করেছিলেন। সংস্কারের ছায়া তার ওপর পড়তে দেন নি। সুলতাকে বলব আমরা 'অপার্থিব';—একথা লেখক নিজেও বলেছেন ৬৪ পৃষ্ঠায়, 'অনাথিনী অপার্থিব সুলতা'। তা হোক বাস্তবতার দাবী তার না থাক, সে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে, সে সুন্দর। আমাদের মনে হয় যৌবনের কল্পনায় তিলোত্তমাকে তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন,—স্বপ্নে সে সকলকে দেখা দেয়, ধরা দেয়, তা ব'লে সে স্বৈরিণী নয়। সকলের অতৃপ্তির বোঝা মাথায় ক'রে সে চলেছে উদাস হাসি মুখে মেখে আর মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করছে কোথায় তার অপরাধ।

বাস্তবতার দিক দিয়ে সতোন, উপেন, মানুর মা সুন্দর, এরা নিরেনব্বুই জনেরই একজন। প্রিয়ার অপরের প্রতি ভালবাসার পরিচয়ে সত্যেনের যে ঈর্ষা যে জ্বালা সে অপূর্ব্ব। ব্রহ্মচারিণী শীতলার চুল আঁচড়ানোর অন্তরালে আরও খুঁটী নাটীর মধ্য দিয়ে যে সকরুণ ব্যথিত ইঙ্গিতটী পাওয়া যায়—তা সুন্দর।

নিশিপদ্ম—শ্রীপ্রবোধকুমার সন্যাল। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দাম দেড় টাকা।

বইখানি আটটী গল্পের সমষ্টি—নিশিপদ্ম, নারায়ণ, গভীর, প্রসাধন, ছন্দোপতন, মর্ম্ম-কামনা, কঙ্কাল, "বাতাস দিল দোল।" সকল গল্প গুলিই এর পূর্ব্বে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিকে আবার নবরূপে একটী সুন্দর গঠনপরিপাটোর আবরণের মধ্যে পেয়ে আমরা সুখী হয়েছি। গল্প বলার ভঙ্গীটী প্রবোধ বাবুর অনবদ্য।—বিষয়-বস্তুর মধ্যে করুণার একটী সুস্থ ফল্গু-প্রবাহ আছে, যাতে গল্প শেষ ক'রেই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়। নিশিপদ্মের পার্ব্বতীর মিথ্যাভাষণের অন্তরালে ব্যর্থতার বেদনা আমাদের ব্যথিত করে; নারায়ণের ভামিনীর অতিথির অত্যাচারে আমাদের নিজে হ'তে আরও কয়টী টাকা অতিথিটীকে হোটেল খরচ স্বরূপ দিতে ইচ্ছে করে:—'গভীর'এর বদরীর সেই পুতুলটী আমাদের স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে, প্রসাধনের মাসীমা, ছন্দোপতনের যতীন, পদ্মা—কঙ্কালের অবিনাশ—শেষ গল্পের মন্দা গৌর, কার ছেড়ে কার নাম করব! প্রতি গল্পটীই বেশ হয়েছে। গঠন-পারিপাট্যের জন্য প্রকাশক মহাশয়দের ধন্যবাদ দিতেই হবে। বইটির প্রকাশকল্পে পরম যত্ন তাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধেরও প্রশংসা করতে হয়।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

জাতীয় আন্দোলন ও ভারতীয় জীবন বীমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আজকের এই জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রসারবৃদ্ধির পক্ষে যে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য করেছে—একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন। দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির উপর জাতীয় আন্দোলনের সার্থকতা নির্ভর করে—অর্থহীন জাতির স্বায়ত্ত-শাসনের কোনও মূল্য নাই—পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজের কথা ত দূরের কথা। ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলি যে উন্নতি করবার সুযোগ পেয়েছে—তার সহায়তা করেছে দেশবসীর সহানুভূতি-সম্পন্ন মন। মনটা দেশের প্রতি আজ উন্মুখ হয়েছে বলেই জাতীয় আন্দোলনের সুফলটা ফলেছে এত তাড়াতাড়ি।

জীবন-বীমা ছাড়া অগ্নি (Fire), নৌ (Marine), দুর্ঘটনা (Accident) সংক্রান্ত বীমা পূর্ব্বে কেবল অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলিরই একচেটিয়া ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে এদিকেও ভারতীয় কোম্পানীগুলির কাজ আশাপ্রদ হয়েছে বলেই শোনা যায়।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের এই সুফল একেবারে যে অবিমিশ্র নয় কোনও কোনও স্থানে তার উদাহরণ দেখতে পেয়ে আমরা বিশেষ দুঃখ বোধ করেছি।—সেটা হচ্ছে এই ব্যবসায়-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে পরস্পর অন্যায় প্রতিযোগিতার চেষ্টা। এতে করে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর ক্ষতি ত হবেই—বীমাকারীর ভাগ্যেও যে আংশিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে তার জন্যও আমাদের সাবধান হ'তে হ'বে।

লক্ষ লক্ষ টাকা বীমা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে খাটছে—বীমা ও ব্যাঙ্কিং ছাড়া দেশের অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার অবসান হ'তে পারে না একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এই ভেবেই দুঃখ হয় যে দেশের মঙ্গলের জন্য যার প্রয়োজন এড়িয়ে চলার উপায় নেই—তাকেই আমরা রেষারেষির বিষে দূষিত করে ফেলছি।—দেশের ক্রোর ক্রোর টাকা অ-ভারতীয় কোম্পানীর হাতে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে—প্রভূত ধনাগমের উপর কর্ত্তৃত্ব করছে বিদেশী—এক্ষেত্রে যদি কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকে ত সে আছে অ-ভারতীয় বা বিদেশীয় কোম্পানীগুলির সঙ্গে। পক্ষান্তরে ভারতীয় কোম্পানী গুলিকে দেশের অর্থ-সংরক্ষণ করতে হ'লে,—আর্থিক ভারতের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখতে হ'লে, সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলেই ত মনে হয় না। এটা নূতন কথা নয়,—জানে সকলে,—"জেনে শুনে বরা পাগল" হ'লে তার অপরাধ অমার্জ্জনীয় হয়েই দাঁড়ায়।

ভারতীয় বীমার স্বার্থসংরক্ষণের জন্য আইন-প্রণয়নের কথা আগেও হয়েছে,—আইন-প্রণয়নের একটা বিশেষ সার্থকতা বর্ত্তমান সময়ে নিশ্চই আছে। শাসন-পরিষদে একপক্ষ থেকে এর ঘোরতর প্রতিবাদ হ'বে, কিন্তু ভারতের মঙ্গলকামী সদস্য-সংখ্যা কি আইন-পরিষদে এতই কম হয়ে পড়েছে, যে শ্রেণীর স্বার্থ-প্রণোদিত প্রতিবাদই সেখানে সফল হবে?—স্বর্ণমান নাকচ হওয়াতে বর্ত্তমানে যে সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব হয়েছে—তাতে অ-ভারতীয় কোম্পানীর প্রতিযোগিতা সফল হ'লে—ভারতীয় বীমা কোম্পানীর অবস্থা যে কি পরিমাণ শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াবে তা' সহজেই বুঝা যায়।—দেশবাসী আজ জানতে চায় এই অন্যায় ও অস্বাভাবিক বিনিময়-হার (exchange rates) কতদিন চলবে। ভারতের আর্থিক ক্ষতিতে আজ ইংলণ্ড আত্মরক্ষার পথ আবিষ্কার করেছে কিন্তু ভারতের জনমত উপেক্ষা করে আজ এক শিলিং ৪ পেন্সের যে বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তিত হল তার অবশ্যম্ভাবী ফলের বিষয় ভেবেই আমাদের কর্ম্মসূচী নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা—কিন্তু যদি আমাদের সততা. সূক্ষ্ম বিষয়-বুদ্ধি, অন্যায়ের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা, দোষসংশোধনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা থাকে—তা' হলে অতি বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা নিশ্চয় জয়লাভ ক'রব।

আমাদের মধ্যেকার দোষ ত্রুটি যা'তে আমাদের প্রচেষ্টাকে দুর্ব্বল করে না ফেলে তার দিকে বিশেষ চোথ রাখতে হ'বে। অসাধু উদ্দেশ্য ও তা' সাধন করার হীন প্রচেষ্টা যদি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসর হ'তে না দেয় তবে তার চেয়ে বেশী অনুতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে? 'বোঁচকা বাঁধা'র তীব্র ইচ্ছা এবং সে 'বোঁচকা সামলান'র সুন্দর কৌশল—এর কোনওটাই আমাদের জাতীয় ব্যবসায়ের সংগঠন বা সংরক্ষণে সহায়তা করবে না।

(প্রচারক)

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

শোক-সংবাদ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আকস্মিক 'সেরিব্রাল হিমরেজ' রোগে আক্রান্ত হইয়া ওরিয়েণ্ট্যাল জীবন-বীমা কোম্পানীর কলিকাতা-শাখার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮৩ সনে মাদ্রাজের কুইলন সহরে কৃষ্ণস্বামী আয়ারের জন্ম হয়। স্থানীয় হাই স্কুলে শিক্ষা সুরু করিয়া তিনি মাদ্রাজ শাখার চীফ অ্যাসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯২২ সনে কোম্পানীর এলাহাবাদ অফিসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯২৬-২৯ সন কোম্পানীর ব্যাঙ্গালোর শাখার কার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা-শাখার ভার নিয়া এই সহরে আসেন।

ব্যবসায় সম্পর্কে আমরা ইহাঁর নিকট গিয়াছি। স্বাস্থ্য-

কৃষ্ণস্বামী আয়ার।
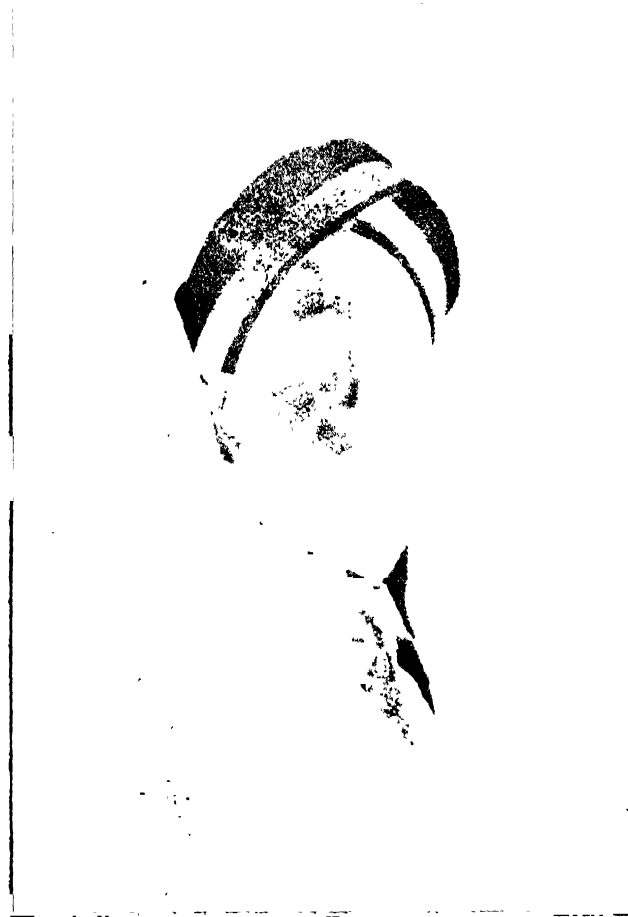
পালঘাট ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষা সাঙ্গ করেন। ইহার পর কিছুকাল এখানে ওখানে চাকুরী করিয়া ওরিয়েণ্ট্যাল জীবন-বীমা কোম্পানীর মাদ্রাজ অফিসে ১৯০৮ সনে সামান্য কেরাণী হইয়া চাকুরী আরম্ভ করেন। ১৯১৭ সনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ এজেণ্টস্ পদ পান এবং কিছুদিন পরেই

সবল দেহ, সম্পূর্ণ সামর্থ্য, সুপটু কর্ম্মশক্তি, সতেজ প্রফুল্লতা সমস্ত মিলিয়া ইহাঁকে সাধারণ ভারতবাসী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বরাবরই মনে হইয়াছে। ইহাঁর মৃত্যুতে কোম্পানী একজন সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মীকে হারাইলেন। আমরা তাঁহার প্রবাসী পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

মনীষী হরপ্রসাদ

গত ১লা অগ্রহায়ণ রাত্রি এগারটার সময় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৫৩ সনের নবেম্বরে ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী সহরে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম কমললোচন ন্যায়রত্ন। ন্যায়শাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। হরপ্রসাদ নামকরণের একটি ইতিহাস আছে। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল শরৎনাথ। কৈশোরে একবার কঠিন পীড়া হয়। মহাদেবের অনুগ্রহে ও প্রসাদে সে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন বলিয়া 'শরৎনাথ' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'হরপ্রসাদ' হয়।

শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় হরপ্রসাদ একপ্রকার নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। অর্থাভাবে সে উদ্দেশ্য বিফল হইবার উপক্রম হইলে বিদ্যাসাগর ইঁহাকে বাসস্থানাদি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলেজে থাকিতেই ইনি ভট্টপল্লীর জয়রাম তর্কভূষণের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কলেজের এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। আমরা নীচে বিবিধ বয়সে তিনি যে-সব পদে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা দিলাম—

১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী অনুবাদক ও হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত ও ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক।

১৮৮৩ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ।

১৮৮৯ সালে এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য।

১৮৮৬ সাল হইতে ১৮৯৪ পর্য্যন্ত বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান।

১৮৮৮ সালে Central Text Book Committeeর সভ্য।

১৮৯১ সালে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে পুঁথি-সংগ্রহ-ব্যাপারে ডিরেক্টর।

১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক।

১৮৯৬ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রযত্নে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্-এ ক্লাস খোলা হয়।

১৮৯৮ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধিলাভ।

১৯০০ সাল সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ।

১৯০৪ সালে এসিয়াটিক সোসাইটীর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি রূপে Royal Asiatic Society (Bombay) শাখার শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান।

১৯০৮ সালে সংস্কৃত-কলেজ হইতে অবসরগ্রহণ।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন স্কুলবিভাগে তিন জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পূর্ব্বে এম-এ পরীক্ষায় মাত্র 'A' Group পড়ান হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে 'B' ও 'D' Group খোলা হয়। সংস্কৃত কলেজের চতুষ্পাঠী-বিভাগে তিনি একজন ন্যায়ের অধ্যাপক, একজন স্মৃতির অধ্যাপক এবং একজন বেদান্তের অধ্যাপকের পদ প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহারই ফলে সংস্কৃত কলেজে Associationএর সৃষ্টি হয়।

১৯১০ সালের ৫ই জানুয়ারির একখানি পত্রে লর্ড কর্জন শাস্ত্রীমহাশয়কে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯১১ সালে তিনি সিমলায় "Conference of Orientalists"এর সদস্য মনোনীত হ'ন।

এই বৎসর দিল্লী-করোনেশন-দরবার উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

১৯১২ সালে স্যর জন মার্শালের অনুরোধে তিনি তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ১২০০০ পুঁথি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জন্য ক্রয় করিয়া দেন।

শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ও ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ, তিব্বতীয় ও পালি প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে কয়খানি—ভারত মহিলা, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, কালিদাসের ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে, History of India এবং আরও কয়েকখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক সর্ব্বজনপরিচিত।

ইঁহার বাংলা লেখার ধরণ অননুকরণীয়। স্যার আশুতোষের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এককালে এই বন্ধুত্ব এমনই নিবিড় ছিল যে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পুত্রদের নামের সঙ্গে আশুতোষের 'তোষ' শব্দটি জুড়িয়া দেন এবং আশুতোষও তাঁহার পুত্রগণের নামের সঙ্গে 'প্রসাদ' শব্দ যোগ করিয়া দেন। শেষ জীবনে দুইজনে মত-বিরোধ হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালীর এমন একটি যুগের শেষ মনীষীকে আমরা হারাইলাম, যে-যুগ বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। তিনিই বোধ করি 'last of the Victorians'.

UPASANA—Regd. No. C. 1695.

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

[২৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা]

"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"-এর সম্পাদক বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ভারত ফোটো-টাইপ ষ্টুডিও"র প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ শিল্পী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পরিচয়-পত্র দিয়াছেন :—
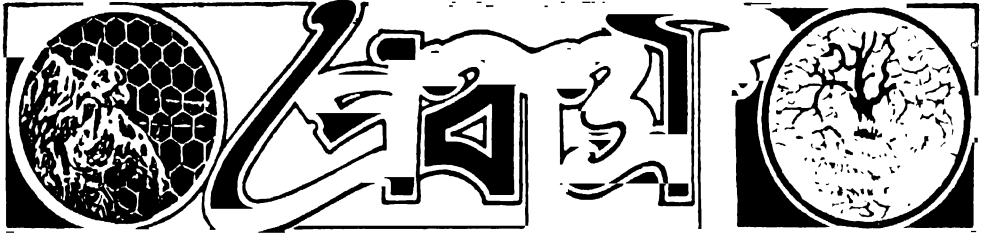
৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৮।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার জীবিতকালে ভারতবর্ষে হাফটোন ব্লকের কাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। তিনি তাঁহার শিল্পী কর্মচারীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্তকে দক্ষতম মনে করিতেন। আমারও ধারণা সেইরূপ। ললিতবাবুর অনেকের কাজ আমি দেখিয়াছিলাম। পরে তিনি যখন অপর কাহারও সংযোগের সহিত একটি হাফটোন ব্লকের কারখানা স্থাপন করেন, তখনও তাঁহার কাজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর্ত্তমানে তিনি স্বয়ং "ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও" নাম দিয়া হাফটোন ব্লক, লাইন ব্লক ও বহুবর্ণ ব্লকের একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ঐ সকল রকমের অনেক কাজ করিতে দিয়া থাকি। পূর্ব্বের মত এখনও তাঁহার ব্যবহার ও কাজ আমি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে করি। তাঁহার কাজ সমজদার লোকদের প্রশংসা পাইতেছে। ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

"আলোক-চিত্রাঙ্কণ-বিশারদ"—"পরিকল্পনা-কুশলী"—"উপহার-পত্র-শিল্পী"

"ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও"

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telephone—B. B. 3962. Telegrams—"Mezzotint" Cal.

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

মহাশয়,

আগামী বৎসরের উপাসনা নূতন আকারে ও নূতন কলেবরে প্রকাশিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিব।

মানুষ স্বভাবতঃ অজ্ঞানের দাস, জ্ঞানালোক তাহার অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূর করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশ করে। এই কথা ব্যক্তির প্রতি যেমন প্রযুক্ত হয় জাতির প্রতিও তেমন প্রযোজ্য। অতি প্রাচীন কালে যখন ভারতবাসী অজ্ঞানতাবশতঃ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল তখন ভগবান ব্যাসদেব সমস্ত জ্ঞানের সারস্বরূপ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ঐ জ্ঞানগর্ভ মহাকাব্য ও ইতিহাস জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা স্বরূপ প্রত্যেক ভারতবাসীর অজ্ঞানতা দূরীভূত করিয়া তাহাকে আবার স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবে। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল না হইলেও অধিক পরিমাণে যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপর যুগে যুগে আরও কতবার ঐ অজ্ঞানতা ভারতবাসীকে আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য দেবের অভ্যুত্থানে জাতি সেই সেই যুগে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু মানুষ বৃদ্ধ হইলে যেমন তাহার ব্যাধির চিকিৎসার ফল স্থায়ী হয় না সেইরূপ এই বৃদ্ধ জাতিরও জ্ঞানোন্মেষ স্থায়ী হয় নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই দেশে পরবর্ত্তীকালেও অনেক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে এবং তাহারা এই জাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য বহু সাধনা ও প্রযত্ন করিয়াছেন। তাই জাতি মরিয়াও মরে নাই। এবং তজ্জন্য আধুনিক কালে ঋষিতুল্য মহাজ্ঞানী বঙ্কিমচন্দ্র ও জ্ঞানের প্রতীক স্বরূপ মুক্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে দায়ী। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় জাতির জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া যে মঙ্গল সম্পাদন করিয়াছে তাহা জাতি ভুলে নাই। ভুলে নাই বটে কিন্তু প্রাণশক্তির অভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে সাহিত্যের ভিতর দিয়া অনেক কিছু খাদ্য জাতির সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে বটে এবং জাতিও মহোল্লাসে তাহা গলাধঃকরণ করিতেছে কিন্তু প্রাণের ত সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট করিতে হইবে বটে কিন্তু যে জ্ঞান জাতির দেহ ও মন পরিপোষণের সাহায্য করে সেই জ্ঞানার্জ্জনের উপযুক্ত পথের সন্ধান বর্ত্তমান সাহিত্যে আশানুরূপ মিলিতেছে না। কেহই যে সেইরূপ পন্থানির্দ্দেশের প্রচেষ্টা না করিতেছে, এমন নহে। তবে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যবসায় বাণিজ্য যাহা কিছু জাতির জীবন পরিপোষণে আবশ্যক তাহা একাধাবে সমাবেশ করিয়া অগোণে জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিবার অত্যন্ত প্রয়োজন জাতির কল্যাণকামী মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। সেই প্রয়োজনসিদ্ধি দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। তবুও আমরা তাহা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপাসনার কলেবর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কথিত বিষয়সমূহের বিশেষজ্ঞগণ তাহাদিগের জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধাদি দ্বারা আমাদিগকে সহায়তা করিবেন।

আমাদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ হইলেও আমরা গ্রাহকগণের চাঁদার হার অল্প মাত্র বৃদ্ধি করিয়া মাত্র চারি টাকা করিলাম।

বর্ত্তমান বৎসর অর্থাৎ সন ১৩৩৮ সালের গ্রাহক-মূল্য যাঁহাদের শেষ হইল, তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার যোগে আগামী বৎসরের মূল্য আমাদিগকে বৎসরের প্রথমেই প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমরা উৎসাহিত হইব। ১৫ই বৈশাখ তারিখের মধ্যে যে সকল পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট হইতে মূল্য কিম্বা অসম্মতিসূচক কোনও সংবাদ পাওয়া যাইবে না, বৈশাখের 'উপাসনা' তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠান হইবে।

—কর্ম্মকর্ত্তা-উপাসনা

উপাসনার নিয়মাবলী

১। উপাসনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৲ তিন টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ চার আনা।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা ভাল হইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিয়া থাকি।

৪। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্র এবং পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে এবং টাকা কড়ি ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাক টিকিট সহ জানাইতে হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা—

৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কে, সি, বসুর বার্লীর নূতন পরিচয়

আর কি দিব ?

(মেসিনে প্রস্তুত ও হস্তদ্বারা পৃষ্ট নহে)

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA ESTD 1885 THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY 1lb. net Prepared only of Genuine & Selected Grains K. C. BOSE & Co. SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY CALCUTTA

৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

এ যাবৎ

খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা

সাধারণতঃ এই বার্লীর ব্যবস্থা দিয়া

আসিতেছেন।

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য !

জানা জিনিষ ব্যবহার করুন !

কে, সি, বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টিম বিস্কুট ও বার্লী ফ্যাক্টরী, কলিকাতা

শিশুদের জন্য

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত করে, হজম-ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার— কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং—গিরগাঁও, বোম্বাই।

গরদ—মটক ও তসরের—
যা' কিছু সব মুর্শিদাবাদের দরেই
বিক্রয় করিয়া থাকি।

"ডায়না হেয়ার টনিক"

ইহা প্রসূতির চুল উঠা নিবারণকরণে এবং নবকেশ সত্বর পুনঃ সমদ্ভূত করণে অদ্বিতীয়, সেই কারণে সকল প্রসূতির ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় কেশ তৈল।

মূল্য—প্রতি শিশি, ১৸০ আনা।

দি ইণ্ডিয়ান
পারফিউমারি এণ্ড টয়লেট ওয়ার্কস,
পোষ্ট বক্স—৮৯৯৯
কলিকাতা।

সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা

বাঙ্গলার সঙ্গীত বিষয়ক একমাত্র সচিত্র মাসিক

সম্পাদক :—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার শ্রীকালিদাস নাগ এম, এ, ডি, লিট (প্যারিস)

পরিচালক :—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ

ইহাতে প্রতিমাসে ধ্রুপদ, খেয়াল টপ্পা, ঠুংরী, কীর্ত্তন, গজল, ও অধুনিক বাঙ্গালা ও হিন্দি গানের তাল মাত্রাদির সহিত স্বরলিপি এবং হারমোনিয়ম, বেহালা, সেতার এস্রাজ, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র শিক্ষার নিয়ম প্রণালী প্রকাশিত হয়

! কেবল গ্রাহকগণের স্বর্ণ সুযোগ !

প্রত্যেকেই বার্ষিকমূল্য ৩৲ পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া কালে একখানি "কন্‌সেসন কুপন" পাইবেন গ্রাহকগণ কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্রাদি কিনিবার সময় এই "কন্‌সেসন কুপন" অর্দ্ধ-শতাব্দীর সুনামভূষিত সর্ব্বজন বিদিত বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ বাদ্য যন্ত্র বিক্রেতা, আর, সি, দাস (৮সি লালবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ) মহাশয়ের দোকানে পাঠাইলে অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মূল্য তালিকা হইতে শতকরা ২০৲ কুড়িটাকা হারে কমিশন বাদে খরিদ করিতে পারিবেন। এই সুযোগ প্রতি কুপনে মাত্র একবার দেওয়া হইবে।

—কর্ম্মকর্ত্তা—
৮সি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্ম্মার

বাস্তবিকা

রবিকুমার, তাহার 'বাস্তবিকা' ক্লাব অবশেষে তাহার 'কুমার-রাজ্য' প্রতিষ্ঠার রসোজ্জ্বল কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গলার আনন্দহীন মনের অপূর্ব্ব রসায়ন।

দাম—পাঁচ সিকা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের

কিশলয়

—০—

যৌবন-আন্দোলনের কথা
নবযুগের নবীন প্রভাতে
তরুণ-তরুণীদের
—অপরূপ বিকাশ-সম্ভাবনার কথা—

বিষয়-সূচী

চৈত্র—১৩৩৮

বিষয়-সূচী

চৈত্র—১৩৩৮

ডোয়ার্কিনের
৫০বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ
নির্বোচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই
প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা।
আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরনীয়।
ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২সেট রীড
মেহগ্নি পালিস ৫ স্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্‌।
স্কোয়ার

প্রণাম

২৪শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩৮ | ১২শ সংখ্যা

মদন-ভস্ম

(কুমারসম্ভব হইতে)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রুদ্রাশ্রমে আসে শৈলজা—
সখী আসে পুরোভাগে,
পাণ্ডুবদন মদনের বুকে
নব আশ্বাস জাগে।
আজি-বসন্তে হাসে বনপুরী,
ফুলসাজে তাই সেজেছে গৌরী,
নবমল্লিকা সোনালু অশোক
সোণার অঙ্গ ছায় ;
চলিছে তন্বী স্তনভারানতা,
ফুলভারে যেন দুলে বনলতা,
চলে পার্ব্বতী, বকুল-মেখলা
খুলে' খুলে' খুলে' যায়।
সুরভিত তার মৃদু নিশ্বাসে,
মধুলোভী অলি উড়ে' উড়ে' আসে,
মানেনাকো তারা লীলাকমলের
অনিবার নিবারণ।
এই রূপপাশে বাঁধিব মহেশে,
ভাবিল মীনকেতন।

দেখিতে দেখিতে উপনীত উমা
লতাগৃহদ্বার-পাশে,
ধ্যান ভাঙি' শিব ত্যজে বীরাসন,
সম্বিৎ ফিরে' আসে।

নন্দী তখন করে নিবেদন,—
সখীসহ উমা সেবিবে চরণ,
ইঙ্গিতে তাঁর নিদেশ পাইয়া
আসে উমা ধীরে ধীরে ;
সখী দুটি আসি' বাসন্তী ফুলে
নমিল প্রথম শিব-পদমূলে,
সাথে সাথে উমা সন্নতজানু
প্রণমিল নতশিরে।

সুনীল অলকে প'রেছিল উমা
নূতন সোনালু ফুল,
খসিল কেশের কিশলয়-ভূষা,
খসিল ফুলের দুল।

তনুপুট ভরি' পুষ্পাঞ্জলি
দিল বুঝি পার্ব্বতী ;
আশিস্ করিল আশুতোষ,—লভ'
অনন্যরতি পতি।

শিবপাশে উমা হেরিয়া কামের
সব বোধ অবসান,—
সুযোগ ভাবিয়া ফুলধনু তুলি'
ঘন ঘন ছায় টান।
মন্দাকিনীর পদ্মের বীজে
গেঁথেছে গৌরী জপমালা নিজে,
সে মালা তুলিয়া চাহে পার্ব্বতী
উদাসী শিবের পানে,
বৎসল হাসি হাসি' ত্রিলোচন
যেমনি সে মালা করিবে গ্রহণ,—
অমনি মদন টানি' শরাসন
সম্মোহ-বাণ হানে।
কন্দর্পের সম্মোহ-বাণ
কখনো হয়নি ভুল,—
পূর্ণিমা-রাতে ঝড় উঠে যদি,
সাগরও হারায় কূল।
চঞ্চল হ'ল মহেশের মন
চাহিয়া দেখিল উমার বদন,—
কে যেন সেথায় রাঙা নিবেদন
ধ'রেছে অধরপুটে ;
লাজে নুয়ে পড়ে গৌরীর মুখ,
অজানা আশায় দুরু দুরু বুক,
সারা দেহ যেন কদম্ব হেন
পুলকে শিহরি' উঠে !

বিস্মিত শিব চিত্তের বেগ
ক্ষণে করি সংযত,
কি হেতু তাহার এ মনোবিকার !
চাহেন ইতস্ততঃ।
হেরেন অদূরে- টানি' ফুলধনু
জানুভরে ভাঙি' সুন্দর তনু
আপনি মদন হৃদয়ে তাঁহার
হানে ঘন কামশর !
তপোভঙ্গের বুঝিয়া কারণ
রুষিল মহেশ্বর।
ভ্রূকুটি-কুটিল শিবের আস্য
হইল দুর্ণিরীক্ষ্য,
সহসা নয়নে ছুটিল বহ্নি
দীপিয়া অন্তরীক্ষ !
'সম্বর প্রভু !' বৃথা উঠে রোল
অম্বরতল ভরি',
রুদ্রবহ্নি শান্ত হইল
মদনে ভস্ম করি'।
সাথে সাথে ভূমে লুটাইল রতি
দারুণ মূর্চ্ছাঘাতে ;
তিরোহিত ক্ষণে হ'ন শঙ্কর
তপের বিপৎপাতে।
লজ্জিত উমা, সখীর সমুখে
সজ্জিত তনু শেল হানে বুকে,
মরমে মরিয়া চাহে ফিরিবারে
চরণ নাহিক উঠে,
পাষাণের মেয়ে পাষাণের কোলে
কাঁদিয়া পড়িল লুটে'।

ব্যাকরণের সাধনা

বা

ব্যাকরণের স্মৃতি, তন্ত্র ও আগম সংজ্ঞা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্রকে কেবল শব্দরূপ ও ধাতুরূপ সাধন করিবার নীরস প্রণালী কিংবা দার্শনিকতা বিবর্জ্জিত কতকগুলি দুঃশ্রব সাঙ্কেতিক সূত্র বলিয়া চিরদিন ধারণা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই প্রবন্ধের নাম দেখিয়া কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে ভাবে ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাতে এই শাস্ত্রের গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। অনেকেই এখন ব্যাকরণালোচনায় দীর্ঘকাল ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহারা প্রচলিত নিয়মানুসারে ব্যাকরণের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেরই শব্দতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য ও তাৎপর্য্য জানিবার ঔৎসুক্য দেখা যায় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে ব্যাকরণসাহিত্যের মূল ভিত্তি, চিন্তার ধারা এবং চরম লক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় অনেকেই ব্যাকরণশাস্ত্রকে যথার্থ শব্দতত্ত্ববিদ্যা এবং ভারতীয় শব্দচর্চ্চার অতুলনীয় সম্পদ্ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পতঞ্জলি-ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণকে শুধু 'শব্দশাস্ত্র' বা 'শব্দানুশাসন' না বলিয়া অনেক সময় স্মৃতি, তন্ত্র এবং আগম নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাকরণানুশাসন যেমন একদিকে শব্দের সাধুত্ব নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়, তেমন অন্যদিকে শিষ্টপরিগৃহীত ও ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। এই ভাবে দেখিলে ব্যাকরণকে বরং স্মৃতি (স্মরণসমাচারঃ) বলা যাইতে পারে ; কিন্তু প্রশ্ন হইবে যে, ব্যাকরণশাস্ত্রকে তন্ত্র ও আগম বলা হয় কেন। বিশেষতঃ, আগমশব্দ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত। অনুষ্ঠানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তন্ত্রের সহিত ব্যাকরণোক্ত প্রক্রিয়ার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি, নাগেশভট্টপ্রভৃতি পরবর্ত্তী শাব্দিকগণের শব্দচর্চ্চার পদ্ধতি ও চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তন্ত্র ও যোগদর্শনের সহিত ব্যাকরণাগমের শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক সিদ্ধান্তের যে অনেকাংশে ঐকমত্য বর্ত্তমান আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কেবল তাহাই নয়, তত্ত্বার্থদর্শী মহাভাষ্যকার ও বাক্যপদীয়কার যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বর্ণমালার স্বরূপ বিচার, পরা-পশ্যন্তীপ্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আন্তর শব্দনির্ণয়, স্ফোটবাদ ও শব্দের নিত্যতাপ্রতিপাদন এবং শব্দব্রহ্মোপাসনা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে শৈবাগম ও শাক্তাগমের সহিত অন্ততঃ দার্শনিকতার হিসাবে শব্দচর্চ্চার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। শব্দশাস্ত্রেও অধ্যাত্মচিন্তা আছে। যাঁহারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই পারমার্থিক দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমগ্র চিন্তাপ্রবাহকে অন্তর্ম্মুখী করিতে চেষ্টা করিতেন, সেই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় মনীষিগণ শব্দচর্চ্চার মধ্যেও সাধনার রাজমার্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শাব্দিকগণ শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতেন। শব্দতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য আলোচনাই বৈয়াকরণদিগের সাধনা। বাগ্‌যোগবিদ্ পতঞ্জলি ও ভর্ত্তৃহরি এই সাধনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বাগুপাসনার সহিত উপনিষদ্‌বিদ্যা ও যোগমার্গের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে শব্দব্রহ্মোপাসনা অতি রহস্যময় ও প্রাচীন। বেদের জ্ঞানকাণ্ডই ইহার ভিত্তি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যাকরণের স্মৃতি, তন্ত্র ও আগম সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া ভারতীয় সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটা দিক্ প্রদর্শন করিব।

ব্যাকরণশাস্ত্র বেদাঙ্গ ও বেদমূলক শাস্ত্রসকলের প্রাধান্যাপ্রাধান্য বিচার করিলে বেদবিদ্যার পরেই ব্যাকরণের স্থান হয়। এই জন্য সকল বিদ্যা অপেক্ষা এই শাস্ত্রের প্রাধান্যও বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের ইতিহাসের ন্যায়

ব্যাকরণের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের অনাদিত্ব ও প্রবাহ নিত্যতা উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। বেদার্থ পরিজ্ঞানের জন্য যেই ছয়টী শাস্ত্র বৈদিক সাহিত্যের প্রথম যুগে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, ব্যাকরণ কেবল তাহাদের অন্যতম নয়, কিন্তু প্রধান। শ্রুতিতে আছে, যিনি বাগ্‌যোগবিৎ (বৈয়াকরণ) তাঁহার নিকট বেদবিদ্যা আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন (১)। ব্যাকরণের প্রাধান্য আরও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। যিনি শব্দসকলকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি পরলোকে অনন্ত সৌভাগ্য লাভ করেন (২)। বেদমন্ত্রের শাকল্য-কৃত পদপাঠেই আমরা ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণের প্রথম আভাস দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী কালে এই ব্যাকরণশাস্ত্র স্মৃতি এবং অন্যান্য আগম শাস্ত্রের ন্যায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মচিন্তার সহিত ব্যাকরণের উপাসনামূলক সিদ্ধান্তের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা পরে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাইব। তন্ত্র, স্মৃতি ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে আপাততঃ দৃষ্টিতে প্রভেদ দেখা গেলেও উপাসনার রাজ্যে সকলেরই শেষ লক্ষ্য যে এক তাহাও প্রসঙ্গক্রমে কতকটা বুঝিতে পারিব।

মন্বাদিপ্রণীত গ্রন্থসমূহ (সংহিতা) যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়, গম্যাগম্য ও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারদ্বারা স্মৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছিল, শব্দের সাধুত্ব ও অসাধুত্ব ব্যবস্থা করিয়া তেমন ব্যাকরণশাস্ত্রও মীমাংসকগণের নিকট 'ব্যাকরণ-স্মৃতি' বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ব্যাকরণ হইতে শব্দের সাধুত্ব-জ্ঞান হয় বলিয়া ভর্ত্তৃহরিও ব্যাকরণশাস্ত্রকে 'স্মৃতি' আখ্যা দিয়াছেন (৩)। মীমাংসকগণ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে ব্যাকরণ-স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করা কঠিন। এই জন্যই মীমাংসকেরা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ব্যাকরণকে এত উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্যাকরণের সহিত ধর্ম্মেরও সম্বন্ধ আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বহু বেদমন্ত্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্যাকরণশাস্ত্র বেদ ও ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। তিনি বলিয়াছেন, শব্দাত্মক বেদকে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যাকরণশাস্ত্র অভ্যাস করা দরকার (রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্)। বেদের ছয়টী অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন (১)। ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উভয়ই ব্যাকরণ জ্ঞানসাপেক্ষ। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—গৌঃ এই সাধু (সংস্কৃত) শব্দ এবং গাবী, গোণী প্রভৃতি অপশব্দ তুল্যভাবে অর্থজ্ঞান জন্মাইলেও চিরাচরিত নিয়মানুসারে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধুশব্দ প্রয়োগে ধর্ম্ম বা অভ্যুদয় হয়, পক্ষান্তরে অসাধু বা অপশব্দ ব্যবহার করিলে অধর্ম্ম হয় (২)। শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক সাধুশব্দ প্রয়োগ না করিলে অধর্ম্ম হয়—এই কথা বার বার বলিয়া পতঞ্জলি ধর্ম্মের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

'অনাদিকাল হইতে আচার্য্য-পরম্পরাক্রমে প্রচলিত' এই লক্ষণানুসারে মীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামী শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন (৩)। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, শ্রুতি, স্মৃতি ও আগম সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই স্মরণাতীত কাল হইতে শিষ্টসমাজে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রাকারে উপনিবদ্ধ না হইলেও এই সকল শাস্ত্রীয় প্রবাদ (tradition) লোকমুখে শুনিয়াই এক সময় মানুষ অভ্যাস ও আয়ত্ত করিত। এখন দেখা যায় যে, গুরুপরম্পরাক্রমে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রচলিত দেখিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রকে শিষ্টাচরিত 'স্মৃতি' বলা অসঙ্গত হয় নাই। ভর্ত্তৃহরি স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই প্রকার অনাদি আম্নায় ও ঋষিপ্রণীত স্মৃতি-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছে (৪)। বৈদিক ও লৌকিক শব্দের স্বরসংস্কারপদ্ধতি চিরন্তন নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়াই

(১) উত তস্মৈ তন্বং বিসস্রে—ঋগ্বেদ, ৭।৭১।৮।

(২) যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥
মহাভাষ্য-ধৃত শ্লোক (মহা, ১।১।১)

(৩) সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ। বাক্যপদীয়, ১।১৪৩

(১) প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্। মহাভাষ্য, ১।১।১

(২) সমানায়ামর্থগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন চ ধর্ম্মনিয়মঃ ক্রিয়তে।
মহাভাষ্য, ১।১।১

(৩) যথৈব পারম্পর্য্যেণাবিচ্ছেদাদয়ং বেদ ইতি প্রমাণমেবং স্মৃতিরেবমিয়মপি প্রমাণং ভবিষ্যতীতি। শবরভাষ্য, মীঃ সূঃ ১।৩।২

(৪) তস্মাদকৃতকং শাস্ত্রং স্মৃতিং বা সনিবন্ধনাম্।
আশ্রিত্যারভ্যতে শিষ্টৈঃ শব্দানামনুশাসনম্॥
বাক্যপদীয়, ১।৪৩

প্রসার লাভ করিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্র অধুনাতন-প্রবর্তিত নিরর্থক নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। শব্দের সাধুত্ব ব্যবস্থা করিবার প্রণালী অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে (১)। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পরিশুদ্ধভাবে যদি শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং তাহার অর্থ যদি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয়, তবে উহা কামধেনুর ন্যায় সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে (২)। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে। মন্ত্রের পাঠশুদ্ধি ও মন্ত্রার্থজ্ঞান না হইলে আবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ ফলোপধায়ক হয় না, বরং অনীপ্সিত ফল দান করে। পাঠশুদ্ধি এবং মন্ত্রার্থজ্ঞান উভয়ই ব্যাকরণজ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না। এই জন্য ঋষিগণ প্রথমেই ব্যাকরণচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ অনুভব করিয়া স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ব্যাকরণকেও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অসুরগণ অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল (৩)। দুষ্টোচ্চারিত শব্দ বজ্রস্বরূপ হইয়া আর একজন অসুরকে বধ করিয়াছিল (৪)। ব্রাহ্মণের পক্ষে দুষ্ট শব্দ (ম্লেচ্ছ) উচ্চারণ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল (ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ)। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে বেশ বুঝা যায় যে ধর্ম্মের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ কেমন অপরিহার্য্য।

তন্ত্র বলিতে প্রথমতঃ কেবল প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রকেই বুঝায় না (৫)। প্রাচীন কাল হইতে 'তন্ত্র'শব্দ বিভিন্ন শাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সকল শাস্ত্রে প্রবীণতার জন্য ষড়্‌দর্শনটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রকে 'সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র' বলা হইত। সাংখ্য-যোগ-মীমাংসাপ্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র সকলও তন্ত্রনামে অভিহিত হইত। কুমারিলভট্টের একখানি মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'তন্ত্রবার্ত্তিক'। কৌলাচার্য্যগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের ভিত্তিও শাশ্বত বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য কৌলবিদ্যাকে বেদাত্মক বলা হইয়াছে (১)। হারীত বচন উদ্ধৃত করিয়া মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুই প্রকার শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন (২)। বোধ হয়, এক দিকে তন্ত্রশাস্ত্রে বেদের বৈধ হিংসা ও উপনিষদের 'জ্ঞানামুক্তিঃ', 'ব্রহ্মাহমস্মি' ও 'জীব ও আত্মার ঐক্য স্থাপন' দেখিয়া, এবং অপর দিকে অথর্ব্ববেদে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ-প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত আভিচারিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রশক্তির কথা আছে বলিয়া তন্ত্রেরও শ্রুতি আখ্যা হইয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্রও বেদমূলক ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট বেদ সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ। বেদের উপর তাঁহাদের এমন অগাধ শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁহারা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল শাস্ত্রকেই বেদ হইতে সংগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ব্যাকরণশাস্ত্রও তন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইত এবং কোন কোন ব্যাকরণ আজও তন্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ (কাতন্ত্র)। কেবল নামে নয়, তন্ত্রোক্ত সাধনার সহিতও ব্যাকরণের শব্দব্রহ্মোপাসনার বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

স্বয়ং যোগেশ্বর শিব তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান বক্তা তাঁহার মুখ হইতে 'আগত' বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে সাধারণতঃ আগম বলা হইয়া থাকে (৩)। কথিত আছে,—সর্ব্বাগমবিশারদ মহাদেব যোগতত্ত্বোপদেশচ্ছলে পার্ব্বতীর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু তন্ত্রোক্ত কৌলাচার ও চক্রাদি-সাধনপদ্ধতি গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই জন্য মোক্ষোপদেশাত্মক উপনিষদ্বিদ্যার ন্যায় শাম্ভবী বিদ্যাও 'রহস্য বিদ্যা' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (৪)। কুলার্ণব-তন্ত্রকে বলা হইয়াছে 'মহারহস্য'। ত্রিপুরাখ্য তন্ত্রশাস্ত্রের

(১) নানার্থিকামিমাং কশ্চিদ্ ব্যবস্থাং কর্ত্তুমর্হতি।
তস্মান্নিবধ্যতে নিত্যা সাধুত্ববিষয়া স্মৃতিঃ॥ বাক্যপদীয়, ১।২৯

(২) একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি। মহাভাষ্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৮

(৩) তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ।

(৪) স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।
মহাভাষ্য, ১।১।১

(৫) এই বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ কাব্যতীর্থরচিত 'তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১) তস্মাদ্বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকং প্রিয়ে।
কুলার্ণব, ২।৮৫

(২) যদাহ হারীতঃ—শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।
মনু, ২।১ শ্লোকের কুল্লুক টীকা।

(৩) আগতং শিববক্ত্রেভ্যঃ—

(৪) বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব। ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥ কুলার্ণব, ১১।৮৯

মনুসংহিতা, ২।১৬০ শ্লোকের, 'সরহস্যম্' কথার ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন—রহস্যমুপনিষৎ। 'সাম্যং বা সরহস্যানাম্'—মনু, ১১।২৬২

প্রধান গ্রন্থের নাম 'ত্রিপুরারহস্য'। এরূপ অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থেরও রহস্যান্ত নাম দেখা যায়। পাণিনি ব্যাকরণের উপজীব্য সূত্রগুলিও শিবমুখাগত বলিয়া 'শিবসূত্র' নামে পরিচিত। শব্দব্রহ্ম বা বাগ্দেবতার সহিত সাযুজ্য (মুক্তি) লাভ করাই বৈয়াকরণের শব্দচর্চ্চার চরম ফল বা পরমপুরুষার্থ (১)। বৈয়াকরণের বাগ্ব্রহ্ম ও উপনিষদের উদ্গীথাক্ষর (২) (উৎ= প্রাণ, গীঃ=বাক্, অ=অন্ন) একই পদার্থ এবং উভয়ের উপাসনাপদ্ধতিও এক। সুতরাং উপাসনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এক অর্থে শব্দতত্ত্বালোচনাকেও 'রহস্য বিদ্যা' বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, দর্ভপবিত্রপাণি আচার্য্য পাণিনি বিশুদ্ধ স্থানে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করতঃ ব্যাকরণের সূত্রসকল অতিশয় যত্নের সহিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এমন পরিশুদ্ধভাবে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন যে তাহার একটী বর্ণও নিরর্থক হইতে পারে না (৩)। ঋষিরা বলিয়াছেন, 'যিনি শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাহার শব্দবাচ্য সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ হয়' (স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচোগতং তত্রাস্য কামচারো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৭।২)। উপনিষদের এই বাগুপাসনার কথা শুনিয়া মনে হয় যে, পতঞ্জলিপ্রভৃতির ন্যায় যে সকল শাব্দিকগণ শব্দ-ব্রহ্মোপাসনা করিতেন তাঁহারাও শব্দজ্ঞানবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই জানিতে পারিতেন। ইহাই সাধনার রাজ্যে 'দিব্যদৃষ্টিলাভ' বা 'সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রাপ্তি'।

শব্দের সাধুত্বনির্ব্বচনের উপায় বলিয়া এক দিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রকে মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ যেমন 'স্মৃতি' আখ্যা দিয়াছেন, তেমন অপর দিকে শব্দের নিত্যত্ব-প্রতিপাদন, প্রণব হইতে জগতের উৎপত্তি ও শব্দব্রহ্মবাদ-স্থাপন করার জন্য ব্যাকরণকে তন্ত্রসংজ্ঞায়ও অভিহিত করিয়াছেন। 'ঋক্‌তন্ত্র-ব্যাকরণ' নামে একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ (প্রাতিশাখ্য) আছে। ইহা শাকটায়ন-বিরচিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। পাণিনির সূত্রাত্মক অষ্টাধ্যায়ীর নাম 'ব্যাকরণ-তন্ত্র'। ভর্তৃহরি ব্যাকরণ-শাস্ত্রের লক্ষণকে বলিয়াছেন 'তন্ত্র' (তন্ত্রোপায়াদিলক্ষণঃ) এবং ইহাকে পুণ্যরাজ বলিয়াছেন 'তন্ত্রন্যায়'। ভর্তৃহরির 'সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাম্' এই কথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার পুণ্যরাজ কাত্যায়ন-প্রণীত বার্ত্তিকসূত্রগুলিকে 'অনুতন্ত্র' বলিয়াছেন (১)। কলাপব্যাকরণেরও একনাম 'কাতন্ত্র'। পাণিনি-ব্যাকরণের তুলনায় আয়তনে ক্ষুদ্র এবং বিষয়বিচারে তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয় সর্ব্ববর্ম্ম-প্রণীত ব্যাকরণের কাতন্ত্র সংজ্ঞা হইয়াছিল।

বৈদিক-সাহিত্যে পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (২)। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ব্যাকরণকে 'উত্তরা বিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩)। বিদ্যাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া (পবিত্রং সর্ব্ব-বিদ্যানাম্) ভর্তৃহরি ব্যাকরণবিদ্যাকে 'অধিবিদ্য' বলিয়াছেন। তন্ত্রমতে পরা, অপরা ও উত্তরা সকল বিদ্যাই চিচ্ছক্তিরূপা মহাবিদ্যার নামান্তরমাত্র। মহাবিদ্যা, বিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, উপবিদ্যা সকলই সেই এক মহাশক্তির অংশকলা বা বিভিন্ন রূপের স্ফূর্ত্তি। দেবীমাহাত্ম্যেও সকল বিদ্যাকেই পরা বিদ্যার রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৪)। শব্দতত্ত্বের পর্য্যা-লোচনা করিলে আমরা তন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত ব্যাকরণের উপাসনা-মূলক সিদ্ধান্তের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। বৈয়াকরণগণের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুষ্টয়ী বাক্‌ও তন্ত্রোক্ত পরা বিদ্যার বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈয়াকরণসিদ্ধান্তে চিন্ময়ী পরা বাক্‌ই গুণাতীত পরব্রহ্মশব্দবাচ্য এবং পশ্যন্তী বাক্ হইল বেদ-প্রসূতি প্রণব। ইহাই সকল শব্দের জনয়িত্রী ও ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্ম। প্রণব বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল কারণ এবং তাহা হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ সকলপ্রকার বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়াছে—এই কথা

(১) সত্যদেবাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্—মহাভাষ্য, ১।১।১
এবং 'প্রাপ্তরূপবিভাগায়া যো বাচঃ পরমো রসঃ। যৎ তৎ পুণ্যতমং জ্যোতিঃ... 'প্রাপ্তর্ষতাস্তমৃসম' যেন সাযুজ্যমিষ্যতে'।
বাক্যপদীয়, ১।১৫২

(২) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—১।৩।৬

(৩) প্রমাণভূত আচার্য্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা যত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্। মহাভাষ্য, ১।১।৩

(১) সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাং চ প্রণেতৃভিঃ।
বাক্যপদীয়, ১।২৩

(২) দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈ বাপরা চ—মণ্ডুকোপনিষৎ, ১।১

(৩) ব্যাকরণং নামেয়মুত্তরা বিদ্যা। মহাভাষ্য (পা, ১।২।৩২)

(৪) বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (চণ্ডী)

ভর্ত্তৃহরি শ্রদ্ধার সহিত প্রচার করিয়াছেন (১)। 'প্রণব' সকল শব্দার্থের চরমা প্রকৃতি' (২)। এই ব্যাকরণসিদ্ধান্তের সহিত বর্ণাত্মক-মন্ত্রশক্তিবাদী তান্ত্রিকগণের কোনও বিরোধ নাই, বরং ইহা তাঁহাদের স্বমতের যথেষ্ট অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। ভর্ত্তৃহরি শিল্পকলা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাকেই শব্দে উপনিবদ্ধ দেখিয়া বাঙ্ময়ী বলিয়াছেন (৩)। বাগ্রূপ-বুদ্ধিতত্ত্বে সন্নিবিষ্ট বলিয়া সকল বিদ্যাই বাগধিষ্ঠানা (৪)। কেহ কেহ বাগ্ব্যবহার বা শব্দোচ্চারণকেই আভ্যন্তর চৈতন্যের প্রত্যক্ষ স্পন্দন বা স্ফুরণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৫)। ভর্ত্তৃহরি বাক্‌কে 'প্রত্যবমর্শিনী' বলিয়াছেন (৬)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাগ্ব্যবহার দ্বারা সবিকল্পক জ্ঞান সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—'শব্দব্যবহার ভিন্ন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না এবং সকল প্রকার জ্ঞানই সূক্ষ্মভাবে শব্দে উপনিবদ্ধ আছে (৭)। মানুষের যাবতীয় লৌকিক প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতা শব্দকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে'।

তন্ত্রও বলেন, প্রতি মাতৃকাবর্ণের বা অক্ষরের উচ্চারণের সময় মূলাধারস্থিতা চিচ্ছক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার উচ্চারিত শব্দকে অনাহত ধ্বনির বাহ্য প্রকাশ বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও শব্দব্যবহারের মূলে বৈয়াকরণগণ বাগ্দেবতা বা চৈতন্যের সত্তা অনুভব করিয়া প্রণব বা শব্দকেই (বাক্) 'পরা প্রকৃতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৮)। শব্দই জগতের মূল। শ্রুতিতে আছে—প্রজাপতি ভূঃ এই বাচকশব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১)। এই শ্রুতিবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ভর্ত্তৃহরি 'ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত' এই কথা বলিয়াছেন। শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা বিশদ ভাবে বুঝাইবার জন্য বাক্যপদীয়ের প্রথম শ্লোকেই ভর্ত্তৃহরি শব্দতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চকে শব্দবিবর্ত্ত বলিয়াছেন(২)। বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তুজগৎ সূক্ষ্মভাবে শব্দে (বাচকশব্দে) অধিষ্ঠিত (৩)। বাচ্যবাচকরূপে তন্ত্রোক্ত মহাশক্তি বা ব্যাকরণের মহাসত্তা বা মহাসামান্য মায়িক উপাধিবশতঃ বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া প্রতিবিম্ববৎ আমাদের সামান্যবুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ভর্ত্তৃহরি অন্যত্র পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্বসৃষ্টির উপযোগিনী শক্তি শব্দেই অধিষ্ঠিত আছে (৪)। সর্ব্বভূতের অন্তরালে বিরাজমানা এই মহাশক্তিকে শৈবাগমে বলা হইয়াছে 'পরা সংবিৎ'। এই মহাশক্তি বা মহাসত্তা নিখিল পদার্থের ভিতর দিয়া বিভিন্নাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে। আকাশ যেমন এক এবং অখণ্ড হইলেও ঘটাকাশ ও পটাকাশরূপে অবচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তেমন স্বয়ং অভিন্ন হইলে ও সম্বন্ধী বস্তুর ভেদবশতঃ মহাসত্তাও আমাদের নিকট ভেদবিশিষ্ট বলিয়াই সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এই মহাসত্তাই সকল শব্দের বাচ্য বা অভিধেয়। প্রাতিপদিকার্থ, ধাত্বর্থ, ত্বতলাদি-প্রত্যয়ার্থ বলিতে বৈয়াকরণগণ এই সর্ব্বব্যাপিকা, সর্ব্বাত্মরূপা, নিত্যা, চিন্ময়ী মহাসত্তাকেই বুঝিয়া থাকেন (৫)। এখন আমরা দেখিতে পাইব যে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বা আত্মা, তন্ত্রোক্ত মহাশক্তি বা পরা সংবিৎ এবং ব্যাকরণের মহাসত্তা একই পদার্থ। এই জন্য যেই শাস্ত্রের জ্ঞান হইলে শব্দের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় সেই ব্যাকরণশাস্ত্রকে বলা হইয়াছে 'অপ-

---

(১) বিধাতৃস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ।
বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ॥ বাক্যপদীয়, ১।১০

(২) 'স হি সর্ব্বশব্দার্থপ্রকৃতিঃ'—পুণ্যরাজ

(৩) সা সর্ব্ববিদ্যা শিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী। বাক্যপদীয়, ১।১২৬

(৪) স্থাবরজঙ্গমস্য প্রবৃত্তয়ঃ বিদ্যাদয়শ্চ বাগ্রূপায়াং বুদ্ধৌ নিবদ্ধাঃ। পুণ্যরাজ (বাক্যপদীয়, ১।১২৭)

(৫) বাগ্রূপতামেব চিতিক্রিয়ারূপামিত্যেকে। পুণ্যরাজ। বাক্য, ১।১২৮

(৬) বাক্যপদীয়, ১।১২৫

(৭) বাক্যপদীয়, ১।১২৪

(৮) আম্নাতা সর্ব্ববিদ্যাসু বাগেব প্রকৃতিঃ পরা। পুণ্যরাজ-ধৃত শ্লোক (বাক্যপদীয়, ১।১২৮)

(১) স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভুবমসৃজৎ।—তৈ, ব্রাহ্মণ, ২।২।৪।২

(২) অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥ বাক্যপদীয়, ১।১

(৩) সর্ব্বা অপার্থজাতয়ঃ সূক্ষ্মরূপেণ শব্দাধিষ্ঠানাঃ। পুণ্যরাজ

(৪) শব্দেষ্বেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী। বাক্যপদীয়, ১।১১৯

(৫) সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥
তাং প্রাতিপদিকার্থং চ ধাত্বর্থং চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ॥ বাক্যপদীয়, ৩।৩৪

বর্গের দ্বার' এবং পরমার্থলাভের 'সোপান' (১)। শব্দতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অভিন্ন। শব্দতত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের এত প্রশংসা। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, যেই অখণ্ড সত্তা অভিন্ন হইলেও প্রক্রিয়া বা অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে নানারূপে প্রতিফলিত হয়, সেই পরব্রহ্মকে জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল শব্দতত্ত্বালোচনা (২)।

স্ফোটের স্বরূপ নির্ণয় করিবার সময় বৈয়াকরণগণ কেবল অক্ষর ব্রহ্মকেই স্ফোট বলিয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, কিন্তু তন্ত্রোক্ত নাদ, বিন্দু এবং বীজের কথাও বলিয়াছেন (৩)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৃষ্টিতত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত বিচার করিলে বৈয়াকরণ ও তান্ত্রিকমতের মধ্যে কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। নাগেশ ভট্টপ্রভৃতি বৈয়াকরণের সৃষ্টি-বর্ণনায় সারদাতিলকাদিতন্ত্রের মত অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রতি-পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নাগেশ বলেন, মহাপ্রলয়কালে প্রাণিজগতের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টির সহায় মায়া চিন্ময় ঈশ্বরে লীন হইয়া থাকে। আবার যখন পরম পুরুষের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন মায়ার আবির্ভাব হয়। তখন তিনি ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত বিন্দুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। এই বিন্দুর অচিদংশের নাম বীজ, চিদচিন্মিশ্রিত অংশ নাদ এবং শুদ্ধ চিদংশ বিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধ (৪)। সারদাতিলকের মতে বিন্দু, নাদ ও বীজ সেই পরশক্তিময় শিবের ভেদবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয় (৫)। তন্ত্রে এবং শৈবাগমে অনেক সময় পরা শক্তি ও পরমশিবকে বিন্দু-নাদ-কলাতীত অব্যক্ততত্ত্ব বলা হইয়াছে। দেবীস্তবে মহাশক্তিকে সাধারণ কণ্ঠতালুদ্বারা উচ্চারণের অযোগ্য, নিত্য, অৰ্দ্ধমাত্রা বলা হইয়াছে (১)।

উপনিষদের অনেক স্থানে বাক্ বা শব্দব্রহ্মোপাসনার বিষয় কথিত হইয়াছে। বৈয়াকরণগণও শব্দকে শুধু ধ্বনি বলিয়া মনে করেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রতীক বা শব্দাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানে শব্দোপাসনার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, যাহাকে বেদে 'বৃষভরূপী মহান্ দেব' বলা হইয়াছে (২) সেই অন্তর্যামী চৈতন্য সকলের মধ্যে সূক্ষ্ম শব্দরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই শব্দময়ী মহতী দেবতার সহিত সাযুজ্যলাভ করাই হইল ব্যাকরণানুশীলনের অন্তিম উদ্দেশ্য (৩)। বৈয়াকরণগণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং তদবলম্বযোগের সাহায্যে অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া শব্দের এই আন্তর স্বরূপ (পরা ও পশ্যন্তী) চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন (৪)। শব্দের সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া বাঙ্নেত্র বা প্রতিভারূপ প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করিয়া বৈয়াকরণগণ চিদানন্দময়ী ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করি-বার সামর্থ্য অর্জ্জন করেন। এই অদ্বয় শব্দতত্ত্বের সাধনা করিয়া পাণিনি ও পতঞ্জলি আর্ষ চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী শাব্দিকগণের নিকট তাঁহারা ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। বাগুপাসনার ফল ব্রহ্ম প্রাপ্তি। প্রাচীন শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করিয়া পুণ্যরাজ বলিয়াছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে শব্দের উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন (৫)। 'বিদ্যার উপাসনা করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়' এই কথা একাধিকবার উপনিষদেও বলা হইয়াছে (বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে)।

আধ্যাত্মিকদৃষ্টিতে বৈয়াকরণেরা 'শব্দসংস্কারকে' আত্মার চরম সিদ্ধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৬)। শব্দসংস্কার

---

(১) তদ্দ্বারমপবর্গস্য —বাক্যপদীয়, ১।১৪

(২) যদেকং প্রক্রিয়াভেদৈর্বহুধা প্রবিভজ্যতে।
তদ্ব্যাকরণমাগম্য পরং ব্রহ্মাধিগম্যতে॥ বাক্যপদীয়, ১।২২

(৩) ব্রহ্মেদমেতোক্ষরং প্রাহুস্তস্মৈ পূর্ণাত্মনে নমঃ। এবং 'নিদমে তু ব্রহ্মৈব স্ফোটঃ'। বৈয়াকরণভূষণ

(৪) প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন প্রক্ষয়াল্লীনসর্ব্বজগৎকা মায়া চেতনে ঈশ্বরে লীয়তে। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশো বীজং চিদচিন্মিশ্রোহংশো নাদঃ, চিদংশো বিন্দুরিতি —মঞ্জুষা

(৫) পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাদ্ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
শারদাতিলক, ১।৮

(১) অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। চণ্ডী

(২) ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।
ঋগ্বেদ

(৩) প্রাপ্তরূপবিভাগায়া যো বাচঃ পরমো রসঃ। যৎ তৎ পুণ্যতমং জ্যোতিস্তস্য মার্গোঽয়মাঞ্জসঃ—প্রাহুর্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্যমিচ্ছতি। বাক্যপদীয়, ১।১৩২

(৪) বৈয়াকরণস্তু শাস্ত্রবলেন তদবলম্বযোগেন চ গুহান্ধকারং বিদার্য্য সর্ব্বং জানাতীতি ভাবঃ। ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত

(৫) 'তে মৃত্যুমতিবর্ত্তন্তে যে বৈ বাচমুপাসতে'।
পুণ্যরাজ-ধৃত শ্লোক (বাক্য, ১।১২৮)

(৬) তস্মাদ্ যঃ শব্দসংস্কারঃ সা সিদ্ধিঃ পরমাত্মনঃ।
তস্য প্রবৃত্তিতত্ত্বজ্ঞস্তদ্ব্রহ্মামৃতমশ্নুতে॥ বাক্যপদীয়, ১।১৩৩

বলিতে এখানে শুধু প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিভাগ নয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মসংস্কার। শাব্দিকগণ এই শব্দসংস্কারতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব্ব ব্রহ্মামৃত পান করিয়া থাকেন। ইহাই শব্দশাস্ত্রের অপবর্গপ্রাপ্তি বা পরমপুরুষার্থলাভ। কথিত হইয়াছে—শব্দতত্ত্বের এই প্রকার অভ্যাসদ্বারা বৈয়াকরণগণ পূর্ব্বজন্মাহিত প্রতিভাবলে সকল ভাববিকারের প্রকৃতিভূত ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অন্তিমে নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। শব্দের প্রকৃত সংস্কার অনুভব করিয়া শব্দতত্ত্ববিদ্ বৈয়াকরণগণ হৃদয়-গ্রন্থির সহিত শব্দেরও বাচ্যবাচকরূপ সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থির উচ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন (১)। এইভাবে 'প্রাতিভ চক্ষু' উন্মিলিত হইলে তাঁহারা যোগিগণের ন্যায় দিব্য আন্তর জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং শেষে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞানান্ধকারের পর পারে উপনীত হইয়া 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হইয়া যান (২)। ইহাই শব্দব্রহ্মোপাসনার চরম উদ্দেশ্য। ইহার সহিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের সাধনার চরম লক্ষ্যের বাস্তবিক কোনও প্রভেদ নাই। সাধনার প্রস্থান বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান এক ('পয়সামর্ণব ইব')।

এখন বেশ বুঝা যায় যে, যেই পরা এবং পশ্যন্তী শব্দকে (বাক্) শাব্দিকগণ যথাক্রমে পরব্রহ্ম ও অবিনাশিনী অন্তর্জ্যোতি বা প্রতিভা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পরাবিদ্যা বা মহাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। নাগেশ পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাকে যথাক্রমে প্রণবের সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষাকে বলিয়াছেন 'দৈবী বাক্' (৩)। এই বাগ্দেবী ও তন্ত্রোক্ত বাগ্দেবতা এক ও অভিন্ন। তান্ত্রিকেরা 'বাগ্দেবতামাশ্রয়ে' (১) এই কথা দ্বারা পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী বাগ্দেবতার উপাসনাই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও শব্দকে (বাক্) 'দেবী' বলা হইয়াছে (২)। যেই শব্দব্যবহার দ্বারা বিশ্বের সকল প্রাণী স্ব স্ব ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে সেই ভাষা না কি দেবতারাই প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিগ্রহবতী দেবতা না মানিলেও মীমাংসকগণ শব্দময়ী বা 'মন্ত্রময়ী দেবতা' স্বীকার করিয়াছেন। মীমাংসকের শব্দময়ী নিত্যা শ্রুতিও পরা বিদ্যা হইতে অভিন্ন। হেলারাজ প্রতিভাকে 'ভগবতী' শব্দে অভিহিত করিয়া তন্ত্রোক্ত ভগবতী মহাবিদ্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন *। হেলারাজ এই প্রতিভারূপিণী নিখিলপ্রজ্ঞাকারা বাগ্দেবতাকেই গ্রন্থারম্ভে নমস্কার করিয়াছেন (৩)। যিনি অনন্ত জগদাকারে প্রকাশিত হ'ন, সেই চিচ্ছক্তিকে প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ে বলা হইয়াছে 'ভগবতী'। অন্যত্র চিচ্ছক্তিরূপা পরা সংবিৎ বা পরাশক্তিকেও 'ভগবতী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (৪)। মহাকবি ভবভূতি বাগ্দেবতাকে পরমাত্মার 'অমৃতকলা' বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন (৫)। তর্ক-প্রতিভার অবতার জগদীশও সর্ব্বানুভবজননী শব্দময়ী বাগ্দেবতাকেই গ্রন্থারম্ভে নমস্কার করিয়াছেন (৬)।

এখন বৈয়াকরণ ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুসারে বর্ণের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়া উভয় মতের মধ্যে কতদূর সাদৃশ্য আছে তাহা একটু দেখিতে চেষ্টা করিব। বর্ণাত্মক মন্ত্রের শক্তিবিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তান্ত্রিকগণ

(১) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥
মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮

(২) প্রাণবৃত্তিমতিক্রান্তে বাচস্তত্ত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ক্রমসংহারযোগেণ সংহৃত্যাত্মানমাত্মনি॥
বাচঃ সংস্কারমাধায় বাচঃ স্থানে নিবেশ্য চ।
বিভজ্য বন্ধনাস্যস্যাঃ কৃত্বা তাং ছিন্নবন্ধনাম্॥
জ্যোতিরান্তরমাসাদ্য ছিন্নগ্রন্থিপরিগ্রহম্।
পরেণ জ্যোতিষৈকত্বং ছিত্বা গ্রন্থীন্ প্রপদ্যতে॥
পুণ্যরাজ-ধৃত শ্লোক [বাক্য, ১।১৩৩]

(৩) দৈবী বাক্ ব্যবকীর্ণেয়ম্—বাক্যপদীয়, ১।১৫৬

(১) তন্ত্রোক্ত বাগ্দেবতার ধ্যান

(২) দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাঃ—ঋগ্বেদ, ১০।১০০

(৩) তৎ প্রাতিভং সংস্তুমঃ (বাক্যপদীয়, তৃতীয় কাণ্ড)

(৪) ভগবতী প্রতিভা—হেলারাজ (বাক্যপদীয় ২।৪৬২ কারিকার টীকা)

(৫) বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্। (উত্তররামচরিতের নমস্কার শ্লোক)

* শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত 'ভারতীয় দর্শনে প্রতিভাবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (The doctrine of Pratibha in Indian Philosophy—Annals of the Bhandarkar Research Institute.)।

(৬) গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতাং শব্দময়ীং দেবতাং প্রস্তুবৎ স্মরতি স্ম—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা

মাতৃকাবর্ণ বা বীজাক্ষরের অলৌকিক রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। তন্ত্রমতে প্রত্যেক বর্ণ এক একটী শক্তিকলা। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলির চান্দ্রী, সৌরী ও আগ্নেয়ী এই তিন প্রকার কলা হিসাবে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভাগ ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে (১)। তন্ত্রে বীজ শব্দের অর্থ গুহ্য বা অব্যক্ত শক্তিতত্ত্ব। যেমন একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ কালের বিশাল বৃক্ষ প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমন একটী সামান্য বীজ বা অক্ষরের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে বলিয়া মন্ত্রশক্তিবাদীরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত বীজতত্ত্ব হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং প্রলয়ে আবার ব্যক্ত জগৎ এই অব্যক্ত তত্ত্বে লীন হইয়া যায়। আদ্যাশক্তি বা কালিকার গলদেশে সাধারণতঃ আমরা যে নবমুণ্ডমালা বিলম্বিত দেখিতে পাই, উহা তান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল পঞ্চাশৎ বর্ণমালা (২)। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (৩) এই যোগসূত্রে যেমন প্রণবকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 'বাচক শব্দ' বলা হইয়াছে, তেমন তন্ত্রশাস্ত্রেও বীজগুলিকে মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রতীক (প্রতিবিম্ব) বা সূক্ষ্ম রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তান্ত্রিকেরা মাতৃকাবর্ণসমূহকে কেবল প্রাণহীন ধ্বনিমাত্র বলিয়া মনে করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বর্ণগুলি জীবন্ত ও মহাশক্তিশালী। সাধকগণ মন্ত্রোচ্চারণের সহিত মন্ত্রাক্ষরভাবনা এবং মন্ত্রাধিষ্ঠিত দেবতার ধ্যান করিয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহার মধ্যে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি দর্শন করিবার প্রণালীও কথিত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলিও বর্ণসমাম্নায় বা অক্ষরসমাম্নায়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিবার সময় ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি যে ভাবে ('ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বাক্ষরম্') অক্ষরশব্দের নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি 'অক্ষর' বলিতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে যাহা নিত্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া সুবিদিত তাহাই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার আর্ষ দৃষ্টির নিকট প্রত্যেক বর্ণই ব্রহ্মজ্যোতির এক একটী স্ফুলিঙ্গ বা কণা। তিনি বর্ণমালার ভিতর দিয়া চিন্ময় ব্রহ্মের উজ্জ্বল প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—'এই বর্ণসমাম্নায় ফলপুষ্পোপশোভিত চন্দ্রতারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল ব্রহ্মরাশি। এই বর্ণমালার সম্যক্ জ্ঞান হইলে সর্ব্ববেদাধ্যয়নের ফল হয়' (১)। এই ভাষ্যবচনের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়া কৈয়ট বলিয়াছেন—অনাদিকালপ্রচলিত বলিয়া বাগ্‌ব্যবহার নিত্য: এবং ব্রহ্মতত্ত্বই শব্দরূপপরিগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে (২)। বায়ু, অণু ও জ্ঞান কেমন করিয়া বর্ণাত্মক শব্দের রূপ ধারণ করিয়া আমাদের শ্রুতিগোচর হয় তাহা পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থ ও বাক্যপদীয়ে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (৩)। সূক্ষ্ম বাগ্‌রূপে অবস্থিত আন্তর জ্ঞানই শব্দাকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে (৪)। বক্তার বুদ্ধি বা জ্ঞান শব্দের ভিতর দিয়া শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধ্বনিত হয়। ইহাই বৈয়াকরণদিগের সিদ্ধান্ত। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—বর্ণসমূহকে অভিব্যক্ত করিয়া প্রাণবায়ু বর্ণেই আবার লীন হইয়া যায় (৫)। এইভাবে দেখিলে প্রত্যেক বর্ণই প্রাণের স্পন্দন এবং বুদ্ধিতত্ত্বের বাহ্য প্রকাশ।

বৈয়াকরণগণ এই ভাবে শব্দের যথার্থ রূপের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা শব্দের কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য রূপ দেখিয়া নিবৃত্ত হ'ন নাই, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিয়া শব্দের অকৃত্রিম রূপ নাদতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন এবং তথায় মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীর অব্যক্ত ধ্বনি (হং সঃ) শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে—অর্থের সহিত অভিন্ন, এক, অবিনাশিনী বাক্ প্রাণিজগতের প্রাণস্পন্দন রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে (৬)। যোগাভ্যাসাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে অন্তর্মুখ করিতে না পারিলে মানুষ এই ব্রহ্মাখ্য শব্দতত্ত্ব জানিবার অধিকার লাভ করিতে পারে না। সকল শব্দই ব্রহ্মের রূপ। নিখিল শব্দের রূপ ধারণ করিয়া অভিধেয় ভাবে সেই এক অদ্বয় তত্ত্বই প্রকটিত হয় এবং পুনর্ব্বার সেই শব্দ-

(১) কুলার্ণব, ৬।৩৬—৪৬

(২) তন্ত্রোক্ত বাগ্‌দেবতার ধ্যান—'পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদো' ইত্যাদি

(৩) যোগসূত্র, ১।২৭

(১) সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকাবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ। সর্ব্ববেদপুণ্যফলাবাপ্তিশ্চাস্য জ্ঞানে ভবতি। মহাভাষ্য, ১।১।২

(২) অনাদিত্বান্নিত্যত্বং বাগ্‌ব্যবহারস্য। ব্রহ্মতত্ত্বমেব শব্দরূপতয়া প্রতিভাতীত্যর্থঃ। মহাভাষ্য-প্রদীপ।

(৩) বায়োরণূনাং জ্ঞানস্য শব্দত্বাপত্তিরিষ্যতে। বাক্যপদীয়—১।১০৮

(৪) অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥ " ১।১১৩

(৫) প্রাণো বর্ণানভিব্যজ্য বর্ণেষ্বেবোপলীয়তে। " ১।১১৬

(৬) 'সূক্ষ্মামর্থেনাপ্রবিভক্ততত্ত্বামেকাং বাচমভিস্যন্দমানাম্'—
পুণ্যরাজ-ধৃত শ্রুতি।

মাত্রাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১)। পুরা-কল্পে আছে—শব্দমাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বেদবপুঃ প্রজাপতি নিজকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং শেষে সেই শ্রুতিশরীরেই স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন (২)। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম যেমন বিভিন্ন নাম ও রূপের ভিতর দিয়া অনন্ত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন, বস্তুজগতের বাচক-রূপে শব্দও তেমন অসংখ্য ভাবে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে (৩)। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের ন্যায় শব্দেরও বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য' এই বচন দ্বারা মহর্ষি যাস্কও শব্দ যে মহাব্যাপক এবং সর্ব্বপ্রকার অর্থের বাচক বা অভিধায়ক তাহা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ বৌদ্ধার্থেরই বাচ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত যাস্কবচনের ব্যাখ্যা করিবার অবকাশে দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—হৃদয়ের অন্তর্গত আকাশপ্রদেশে অভিধানাভিধেয়রূপা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার মধ্যে অভিধানরূপা বুদ্ধি পুরুষের প্রযত্ন-বিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া সকল প্রকার অর্থের প্রত্যয় জন্মাইয়া থাকে। প্রাণিমাত্রের 'ইতিকর্ত্তব্যতা' শব্দকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে (৪)। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মাহিত সংস্কারবলে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের মধ্যেও বাগ্দেবতার স্ফূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার 'শব্দভাবনা' উপদেশের অপেক্ষা করে না, স্বভাবতই উপচিত হইয়া থাকে। যাঁহার মধ্যে এইরূপ 'শব্দভাবনা' বা বাগ্দেবতার বহুল প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মধ্যে প্রজাপতির পুণ্যজ্যোতি অধিক-মাত্রায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে (৫)। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সুবক্তা ও শব্দবৈভব-শালী তাঁহারা এই জন্মে না হইলেও পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সহিত বাগ্দেবতার উপাসনা করিয়াছিলেন। দণ্ডী বলিয়াছেন—যেই ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রতিভা নিয়া জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তিনিও যদি যত্নপূর্ব্বক বাগ্দেবতার উপাসনা করেন, তবে নিশ্চয়ই বাগ্দেবীর কিছু না কিছু অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন (১)। তন্ত্রমতে বিদ্যার উপাসনাদ্বারা মানুষ বৃহস্পতির তুল্য বাগ্মী ও পণ্ডিত হইতে পারে। দক্ষিণকালিকার মন্ত্র জপ করিলে সাধক অনর্গল গদ্য ও পদ্য বলিতে পারে এবং তাঁহার মুখ হইতে কবিত্বামৃতনদী প্রসৃত হয়—এই কথা কর্পূরাদিস্তবে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন (২)। শাব্দিকগণ এই বাগ্দেবতার উপাসনা করিয়া এক দিকে শব্দসম্পদ্ ও অপর দিকে মোক্ষপদবী লাভ করিয়াছিলেন।

উৎপত্তির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও তন্ত্র (এবং আগম) এবং ব্যাকরণ এই উভয় শাস্ত্রের মধ্যে একটু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্রের ন্যায় পাণিনি-ব্যাকরণও এক অর্থে সর্ব্ববিদ্যাধীশ্বর মহাদেবের প্রসাদ-লব্ধ দানবিশেষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। পাণিনি-প্রণীত অষ্টাধ্যায়ীর মূল ভিত্তি হইল চতুর্দ্দশ প্রত্যাহার সূত্র—যেগুলি পাণিনীয় সম্প্রদায়ের নিকট 'শিবসূত্র' বা 'মাহেশ্বর-সূত্র' বলিয়া পরিচিত। কিংবদন্তী আছে—নটরাজ মহাদেব ঢক্কানিনাদচ্ছলে যে চতুর্দ্দশ প্রকার ধ্বনি প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মহর্ষি পাণিনি ব্যাকরণের মূল সূত্রসমূহের সন্ধান পাইয়া অষ্টাধ্যায়ী রচনা করিয়াছিলেন (৩)। কলাপ বা কাতন্ত্র ব্যাকরণ সম্বন্ধেও এইরূপ একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ইহা এইরূপ—'শঙ্করের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকেয় ময়ূরপুচ্ছে ব্যাকরণের সূত্র (সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ) লিখিয়াছিলেন (৪)। এই জন্য কাতন্ত্র ব্যাকরণ কলাপ বা কৌমার নামে প্রসিদ্ধ।

(১) ব্রহ্মেদং শব্দনির্ম্মাণং শব্দশক্তিনিবন্ধনম্।
বিবৃতং শব্দমাত্রাভ্যস্তাস্বেব প্রবিলীয়তে॥ পুণ্যরাজ-ধৃত শ্লোক

(২) বিভজ্য বহুধাত্মানং সচ্ছন্দস্তঃ প্রজাপতিঃ।
ছন্দোময়ীভির্মাত্রাভির্বহুধৈব বিবেশ তাম্॥ বাক্যপদীয়-ধৃত শ্লোক

(৩) সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্—ঋগ্বেদ, ১০।১১৪।৮

(৪) ইতিকর্ত্তব্যতা লোকে সর্ব্বা শব্দব্যপাশ্রয়া।
বাক্যপদীয়, ১।১২২

(৫) শাশ্বী বাগ্ভূয়সী যেষু পুরুষেষু ব্যবস্থিতা।
অধিকং বর্ত্ততে তেষু পুণ্যং রূপং প্রজাপতেঃ॥
বাক্যপদীয়-ধৃত শ্লোক

(১) ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।
শ্রমেণ যত্নেন চ বাগুপাসিতা ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥
কাব্যাদর্শ, ১।১০৪

(২) তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ।
কর্পূরাদিস্তব

(৩) নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চ বারম্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥
নন্দিকেশ্বর-প্রণীত কাশিকা

(৪) শঙ্করস্য মুখাদ্বাণীং শ্রুত্বা চৈব ষড়াননঃ।
লিলেখ শিখিনঃ পুচ্ছে কলাপ ইতি কথ্যতে॥

সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তীর বাহুল্যও বড় কম নয়। পণ্ডিতদিগের মুখে শুনা যায় যে, ভগবান্ মহেশ্বর 'মাহেশ' নামে সমুদ্রের মত এক বিরাট ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই শব্দ-রত্নাকার হইতে ব্যাসদেব বহু পদরত্নের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই ব্যাকরণ-সমুদ্রের সহিত তুলনা করিলে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীও না কি গোষ্পদের ন্যায় নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইত (১)।

কাশ্মীরীয় শৈবাগমও শিবসূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চাম্নায় (শৈবদর্শন) উৎপন্ন হইয়াছিল। অবশ্য, এই শিবসূত্র পাণিনির শিবসূত্র হইতে বিভিন্ন। শিবসূত্রের বার্ত্তিককার ভাস্করানন্দ বলিয়াছেন যে, শৈবাগমীয় শিবসূত্র সকল স্বয়ং শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং আচার্য্য বসুগুপ্ত ধ্যানযোগে তাহা লাভ করিয়াছিলেন (২)। ব্যাকরণাগমের ন্যায় কালক্রমে এই শৈবাগমেরও সম্প্রদায়-বিচ্ছেদের কথা শুনা যায়।

এখন দেখা যায় যে, তন্ত্র, শৈবাগম ও ব্যাকরণ (পাণিনীয়) এই তিন শাস্ত্রই জ্ঞানসিন্ধু মহাদেব হইতে সমাগত। ভগবানের কৃপা ভিন্ন জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান লাভের জন্য মানুষ পূর্ব্বে শিবের আরাধনা করিত ('জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ')। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি, মানুষের গৌরব করিবার যত কিছু সম্পদ্ সকলই ভগবানের আশীর্ব্বাদলব্ধ। এই জন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'সংসারে যাহা ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক তাহাই আমার ঐশী শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে' (৩)।

শিবভক্ত নন্দিকেশ্বর কাশিকাখ্য ষড়্‌বিংশ কারিকায় চতুর্দ্দশ শিবসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাশ্মীরীয় শৈবাগম বা ত্রিকসিদ্ধান্তের সহিত এই ব্যাখ্যা বা বর্ণার্থবিচারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই ষড়্‌বিংশ কারিকার টীকাকার উপমন্যু গ্রন্থশেষে স্পষ্টই শৈবাগমসিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১)। শৈবাগমে হকারের অর্থ 'পরমশিব'। নন্দিকেশ্বর বলিয়াছেন, 'হল্' এই অন্ত্যসূত্র দ্বারা তিনি স্বয়ং যে তত্ত্বাতীত, সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বানুগ্রহবিগ্রহ পরমাত্মা তাহা সনকাদিঋষিবর্গের নিকট প্রকাশ করিয়া দেবাদিদেব অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন (২)। উপমন্যু তদীয় টীকার মধ্যে ঈশ্বরবিমর্শিনী, জ্ঞানোত্তম, সনকদক্ষিণামূর্ত্তিসংবাদ প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন। নন্দিকেশ্বর-কৃত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'অইউণ্' এই শিবসূত্রটীর বিবৃতি নিম্নে প্রদর্শন করিলাম—

'অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যান্নির্গুণঃ সর্ব্ববস্তুষু।
চিৎকলামিং সমাশ্রিত্য জগদ্রূপ উণীশ্বরঃ॥'

অর্থাৎ—অকারবাচ্য নির্গুণ পরমেশ্বর ইকাররূপিণী মায়াকে আশ্রয় করিয়া সগুণত্ব লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এখন দেখা যায় যে, পাণিনি-প্রদর্শিত রীতির অনুবর্ত্তন না করিয়া অন্য প্রকারেও শিবসূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আগমিকগণ স্বসিদ্ধান্তানুসারে ইহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মত অনুসরণ করিয়া শিবসূত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কাশ্মীরীয় শৈবাগম সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। কাশ্মীর ও তত্রত্য শৈবাগমের সহিত ব্যাকরণের, বিশেষতঃ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির, বিশেষ সম্পর্ক আছে।

যোগী ও উপাসকগণের নিকট 'দেবতাত্মা' হিমালয় সাধনার সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র। বোধ হয় এই জন্যই যোগিরাজ মহাদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে হিমালয়কেই যোগাভ্যাসের অনুকূল মনে করিয়া সেখানেই নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। এই দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বতমালার এক দেশ 'কৈলাস' নামে অভিহিত। সাধকদিগের মতে হিমালয় পর্ব্বত কৈলাস, কাশ্মীর ও কুমায়ুন এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। কৈলাসের নির্জ্জনপ্রদেশে দেবাদিদেব মহেশ্বর পরা শক্তি মহামায়ার নিকট সকল শাস্ত্রের রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'ভূ-স্বর্গ' বলিয়া প্রখ্যাত কাশ্মীর খণ্ড হিমালয়ের পশ্চিমাংশ। চিরতুষারাবৃত, রজতগিরিনিভ,

---

(১) যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥
চণ্ডীর গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃত টীকায় ভারতাচার্য্যধৃত বচন।

(২) 'সূত্রমাহ মহেশ্বরঃ' এবং 'শিবসূত্রময়ীরচৎ'।

(৩) যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥ গীতা, ১০।৪১

(১) হকারঃ শিববর্ণঃ স্যাদিতি শৈবাগমস্থিতিঃ।

(২) তত্ত্বাতীতঃ পরঃ সাক্ষী সর্ব্বানুগ্রহবিগ্রহঃ।
অহমাত্মা পরো হল্ স্যামিতি শম্ভুস্তিরোদধে॥

স্বভাবসুন্দর এই কাশ্মীর প্রদেশ দেখিলে প্রকৃতই সাধনার যোগ্যভূমি বলিয়া মনে হয়। এই ভূভাগকে তন্ত্র বা শৈবদর্শনের জন্মভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাশ্মীরে যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচুর চর্চ্চা হইয়াছিল কাশ্মীরীয় অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থই (শাক্তাগম) তাহার নিদর্শন। এখানে বসুগুপ্ত, সোমানন্দ, উৎপলদেব, অভিনব গুপ্ত, ক্ষেমরাজ প্রভৃতি আগমিকগণ শৈবাগম বা তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বিপুল তন্ত্রসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শৈবাগম এবং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ইহাদের গভীর তত্ত্বালোচনার অমৃতময় ফল। এক দিকে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য যেমন দ্বৈতসিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া জ্ঞানরাজ্যে কল্পান্তস্থায়ী বিশাল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তেমন কাশ্মীরীয় আগমবাদীরাও অন্য দিকে তন্ত্রশাস্ত্র বা শৈবাগমের ভিত্তির উপর শিবাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া সাধনার রাজ্যে এক বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, যেই শাব্দিকশিরোমণি ব্যাকরণ-চর্চ্চাকে দর্শনশাস্ত্রের উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাভাষ্য-প্রণেতা, শেষাবতার ভগবান্ পতঞ্জলি এই কাশ্মীর দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামভদ্র দীক্ষিত তাঁহার পতঞ্জলি-চরিতে পতঞ্জলিকে দাক্ষিণাত্যবাসী (গোনর্দ্দীয়) এবং গোণিকাত্মজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শব্দব্রহ্মবাদী পতঞ্জলির ব্যাখ্যানকৌশলেই আচার্য্য পাণিনির মতসমূহ পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছে সাংখ্য-যোগাদিদর্শনের ন্যায় যথার্থ দার্শনিক সিদ্ধান্তরূপে গৌরব লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে আমরা পাণিনীয় দর্শন বলিয়া একটী স্বতন্ত্র দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখও দেখিতে পাই।

এখন মহাভাষ্যের সহিত কাশ্মীরের কি সম্পর্ক আছে তাহা একটু দেখিতে হইবে। মহাভাষ্যে অনেক ভাবে কাশ্মীর দেশের উল্লেখ আছে। মহাভাষ্যের কথাও আবার কাশ্মীরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ-তরঙ্গিণীকার কহলণ বলেন যে, মহাভাষ্যের চর্চ্চা বিলুপ্ত দেখিয়া কাশ্মীরের অন্যতম রাজা অভিমন্যু মহাভাষ্যের অধ্যয়ন পুনরুজ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণ-দিগকে আদেশ করিয়াছিলেন (১)। ব্যাকরণাগমের এই প্রকার সম্প্রদায়বিচ্ছেদ ও অধ্যয়নাদিবিলোপের কথা ভর্তৃহরিও তদীয় বাক্যপদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কহলণ আরও বলিয়াছেন যে, জয়াপীড় নামে কাশ্মীরের অন্য একজন ব্যাকরণানুরাগী নরপতিও দেশান্তর হইতে যোগ্য বৈয়াকরণ আনয়ন করিয়া নিজের দেশে আবার বিচ্ছিন্ন মহাভাষ্যের পঠন ও পাঠন প্রচলিত করিয়াছিলেন (১)। এই চন্দ্রাচার্য্যকে কেহ কেহ চান্দ্রব্যাকরণপ্রণেতা চন্দ্রগোমী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই আখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কাশ্মীরের তৎকালীন রাজবংশ শাস্ত্রচর্চ্চার—বিশেষতঃ ব্যাকরণচর্চ্চার—বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় নিয়মপূর্ব্বক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জয়াপীড়ের ব্যাকরণ শিক্ষার গুরু ছিলেন ক্ষীর বা প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ক্ষীরস্বামী।

তন্ত্র এবং শৈবাগমের সহিত ব্যাকরণের কোন অংশে মতের ঐক্য আছে তাহা এক রূপ বুঝা গেল। অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্মাখ্য শব্দতত্ত্ব অবগত হওয়াই যে বৈয়াকরণগণের শব্দচর্চ্চার চরম উদ্দেশ্য তাহা অবিসংবাদিত (২)। লৌকিক নিয়মে শব্দ-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া শাব্দিকগণ শেষ কালে ব্রহ্মবিদ্যার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া শব্দকে নিত্য কূটস্থ প্রভৃতি বেদান্ত-প্রসিদ্ধ বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানই যে শব্দ-তত্ত্বানুশীলনের যথার্থ তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন (৩)। শব্দকৌস্তুভকার ভট্টোজিদীক্ষিত যোগবাশিষ্ঠের আখ্যানোল্লেখ করিয়া এই বিষয়টী অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন (৪)—'সামান্য কড়ির খোঁজে বাহির হইয়া যেমন এক জন অমূল্য চিন্তামণি লাভ করিয়াছিল, তেমন বৈয়াকরণগণও শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যায় শব্দচর্চ্চার চরম তাৎপর্য্য নির্ণয়

(১) চন্দ্রাচার্য্যাদিভির্লব্ধ্বাদেশং তস্মাত্তদাগমম্।
প্রবর্ত্তিতং মহাভাষ্যং স্বং চ ব্যাকরণং কৃতম্॥ রাজতরঙ্গিণী, ১।১৭৬

(১) দেশান্তরাদাগমষ্য ব্যাচক্ষাণঃ ক্ষমাপতিঃ।
প্রাবর্ত্তয়ত বিচ্ছিন্নং মহাভাষ্যং স্বমণ্ডলে॥ রাজতরঙ্গিণী, ৪।৪৮৮

(২) এবং চ ব্রহ্মাখ্যং শব্দতত্ত্বমেবাবাঙ্‌মনসগোচরমস্তদীয়রূপ-ভেদোপগ্রাহেণান্যথান্যথা প্রতীয়তে। পুণ্যরাজ (বাক্য, কারিকা, ১।৮৭)।

(৩) শব্দের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া মহাভাষ্যকার একাধিকবার বলিয়াছেন—
'নিত্যেষু নাম শব্দেষু কূটস্থৈরবিচালিভির্বর্ণৈর্ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিঃ'। মহাভাষ্য।

(৪) বরাটিকান্বেষণায় প্রবৃত্তশ্চিন্তামণিং লব্ধবানিতি বাশিষ্ঠরামায়ণোক্তাভাণকন্যায়েন শব্দবিচারায় প্রবৃত্তঃ সন্ প্রসঙ্গাদদ্বৈতে ঔপনিষদে ব্রহ্মণ্যপি ব্যুৎপন্নতামিত্যভিপ্রায়েণ ভগবান্ প্রসজ্জাদ্ যুদপাদয়ৎ। শব্দকৌস্তুভ

করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রকে অধ্যাত্মবিদ্যার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ভর্তৃহরিও ব্যাকরণশাস্ত্রকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির গৌণ উপায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১)। ব্যাকরণ-চর্চ্চা বা শব্দতত্ত্বালোচনা যে কেমন করিয়া গৌণ ভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাহায্য করিয়া থাকে তাহা পুণ্যরাজ বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপা যে অখণ্ড কাল-শক্তি বা ব্রহ্ম ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ কিংবা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপে অনন্ত প্রকারে প্রবিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল সর্ব্বজ্ঞাননিধি বেদ (২)। এইজন্য ঋষিগণ বেদকে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়াছেন (ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে)। এইরূপ কথিত আছে—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া নিয়মপূর্ব্বক বেদাভ্যাসের পর দেহের আভ্যন্তর প্রদেশ হইতে বিশুদ্ধ, অক্ষয় জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং নানাত্ববুদ্ধি বা অজ্ঞানান্ধকার চির দিনের জন্য অপসারিত হয়। 'আমি' আমার' ইত্যাদি অভিমানগ্রন্থি বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানবলে ছিন্ন হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ('ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ॥)। আচার্য্যগণ বেদবিদ্যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরা কালে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মাত্মক, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় শব্দতত্ত্ব বা বেদবিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকার আজন্মসিদ্ধব্রহ্মবিদ্য এবং আর্ষজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদিগের মধ্য দিয়াই বোধ হয় শাশ্বত বেদ-বিদ্যা প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যাহারা তাঁহাদের ন্যায় ধর্ম্ম ও ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষের জন্য করুণাপরবশ হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্তবর্ণনার মত বেদ ও বেদাঙ্গাদিশাস্ত্র সকল বিস্তার করিয়াছিলেন (৩)। এই প্রকার ঋষি ও শ্রুতর্ষির কথা যাস্কও স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের অন্যতম অঙ্গ হইল ব্যাকরণ।

(১) ব্যাকরণস্য তৎপ্রাপ্ত্যুপায়তাং পরম্পরয়া প্রদর্শয়িতুমাহ
প্রাপ্ত্যুপায়োঽনুকারশ্চ তস্য বেদো মহর্ষিভিঃ। বাক্যপদীয়,

(২) বাক্যপদীয়, ১।৯

(৩) বাক্যপদীয়, ১।৫ কারিকার পুণ্যরাজ-কৃত টীকা।

বেদার্থাববোধক বলিয়া ষড়ঙ্গের মধ্যে পতঞ্জলি ব্যাকরণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যথাযথ ভাবে ব্যাকরণচর্চ্চা করিলে সাফল্যলাভ হইয়া থাকে। শব্দতত্ত্বা-লোচনা হইতে বেদার্থবোধ এবং বেদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই ভাবে ব্যাকরণজ্ঞান গৌণ উপায়ে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে। এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে ভর্তৃহরি ব্যাকরণশাস্ত্রকে কেন 'অপবর্গের দ্বার' এবং 'সিদ্ধিলাভের সোপান' ('তদ্দ্বারমপবর্গস্য' এবং 'সিদ্ধিসোপানপর্ব্বণাম্') বলিয়া এত উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ব্যাকরণচর্চ্চা বা শব্দতত্ত্বালোচনা পরমার্থপ্রাপ্তির উপায়' —এই কথা এখন আমরা সম্যক্ রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়। আমরা কৃত্রিম উপায়ে শব্দ-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহার সুগভীর তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না, কিংবা সত্য কথা বলিতে গেলে, আমাদের সেই সাধনা নাই যাহার বলে ভর্তৃহরি প্রভৃতি মনীষিগণ শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ কি প্রকার শ্রদ্ধার চক্ষুতে ব্যাকরণকে দেখিতেন তাহা পুণ্যরাজ-ধৃত একটী শ্লোক পড়িলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। 'পৃথিবীর মধ্যে জল পরম পবিত্র বস্তু। বেদমন্ত্র জল অপেক্ষা অধিক পবিত্র। আবার মন্ত্রাত্মক বেদচতুষ্টয় হইতেও ব্যাকরণশাস্ত্র পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ' (আপঃ পবিত্রং পরমং পৃথিব্যামপাং পবিত্রং পরমং চ মন্ত্রাঃ। তেষাং চ সামর্গ্যজুষাং পবিত্রং মহর্ষয়ো ব্যাকরণং নিরাহুঃ ॥)। ধ্বনি-কৃত বিকৃতরূপ তিরোহিত হইলে শব্দের যে শুদ্ধ সত্ত্বরূপ নিষ্কল ব্রহ্মজ্যোতির ন্যায় প্রতিভাত হয়, শাব্দিকগণ সমাহিত চিত্তে সেই অক্ষরতত্ত্বের উপাসনা করিতেন (বাতীতালোকতমসী প্রকাশং যমুপাসতে। বাক্য, ১।১৯)।

এখন আগমসম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন যুগ হইতে নিগম ও আগম এই দুইটী শব্দ যথাক্রমে বেদ বা আম্নায় এবং গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত, শিষ্টপ্রণীত শাস্ত্রের সংজ্ঞা রূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি তাঁহাদের গ্রন্থে শ্রুতি অর্থেই নিগম শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নিঘণ্টু শব্দের নির্ব্বচন করিবার সময় যাস্ক বৈদিক শব্দসমাম্নায়কে 'নিগম' বলিয়াছেন' (১)।

(১) নিগমা ইমে ভবন্তি। নিরুক্ত, ১।৮

নিরুক্তের অনেক স্থলে ছন্দঃশব্দ ব্যবহার করিলেও তিনি নিগম শব্দটীকে একেবারে বাদ দেন নাই। এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি প্রচলিত (তাঁহার সময়ে কথিত সংস্কৃত) ভাষার ধাতু হইতে অনেক সময় নৈগম শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (১)। বৈদিক প্রকরণে পাণিনি একাধিকবার নিগম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (২)। মনুসংহিতায় এবং মহাভাষ্যেও নিগম শব্দ (বেদ অর্থে) দেখিতে পাওয়া যায় (৩)। ভবভূতি বেদান্তশাস্ত্রকে বলিয়াছেন 'নিগমান্তবিদ্যা' (৪)। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, সংস্কৃতসাহিত্যে নিগম ও আগম শব্দের এইরূপ শাস্ত্রগত-বিভাগ ঠিক ভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক শব্দের নির্ব্বচনপর গ্রন্থকেও কখন কখন নিগম বলা হইয়াছে। শিবের মুখ হইতে নির্গত বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকেও নিগম বলা হইয়াছে। 'নির্গতং গিরাজামুখে' এইজন্য তন্ত্রেরও নিগম বা তন্ত্রাম্নায় আখ্যা হইয়াছিল। আম্নায় শব্দ বেদবাচী হইলেও পঞ্চাননের পঞ্চমুখনিঃসৃত বলিয়া কাশ্মীরীয় শৈবাগমেরও পঞ্চাম্নায় সংজ্ঞা হইয়াছিল।

আগমশব্দ ব্যাপক অর্থেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দেখা যায়, ভর্ত্তৃহরির বহু পূর্ব্ব হইতেই নিগম ও আগম শব্দের অর্থগত প্রভেদ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। তন্ত্রশব্দের ন্যায় আগমশব্দও পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রসমূহের সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়া প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনাদিকাল হইতে প্রচলিত কিংবা গুরুপরম্পরাপ্রসারিত শাস্ত্র সকলকেই আগম বলা হইত। এই অর্থে বেদকেও আগম বলা যাইতে পারে। অপৌরুষেয় শ্রুতিও অনাদিকাল হইতে সমাগত বলিয়া আগমশব্দ-বাচ্য। পুণ্যরাজ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই আগম বলিয়াছেন (৫)। বেদের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সায়ণাচার্য্যও বেদকে আগম বলিয়াছেন (১)। মনু বেদমূলক স্মৃত্যাদিশাস্ত্রকে আগম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের ন্যায় আগমশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন (২)। পরম শিব হইতে গুরুপর্য্যায়ক্রমে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রচলিত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রও আগম আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কাশ্মীরীয় তন্ত্রগ্রন্থ সকল সাধারণতঃ শাক্তাগম এবং শৈবাগম বলিয়া প্রসিদ্ধ। আগম বলিতে শাস্ত্রবিশেষকে না বুঝাইয়া সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাকে (যথা সঙ্গীতাগম, শিল্পাগম ইত্যাদি) বুঝাইলেও তান্ত্রিকগণ আগম শব্দটীকে প্রায় তন্ত্রশাস্ত্রের নিরূঢ় সংজ্ঞা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আগমশাস্ত্রকে ইংরেজীতে **traditional lore** বা **literature** বলা যাইতে পারে। নিগম ও আগমকে আমরা যথাক্রমে অপৌরুষেয় এবং পৌরুষেয় বা প্রভুসম্মিত এবং সুহৃৎসম্মিত শাস্ত্র বলিতে পারি। বেদ অপৌরুষেয়, আগম পৌরুষেয়। মহাভারত এবং রামায়ণ যেমন ব্যাস ও বাল্মীকি-রচিত বলিয়া সকর্ত্তৃক, তেমন আগমশাস্ত্রও সকর্ত্তৃক অর্থাৎ প্রণেতৃ-বিশেষোৎপন্ন (৩)। পুণ্যরাজ বলিয়াছেন—আগমশাস্ত্র পৌরুষেয় হইলেও তাহার প্রবাহ-নিত্যতা অস্বীকার করা যায় না (৪)। সকল আগমশাস্ত্রই বেদমূলক। চিরন্তন বেদই আগমশাস্ত্রের প্রাণ। এই আগমের উপর মনুষ্যের ধর্ম্ম ও ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ভর করে বলিয়া ভারতীয় আর্য্যদিগের বিশ্বাস ছিল। কালক্রমে কোনও আগম বিচ্ছিন্ন হইলে সর্ব্বশাস্ত্রাত্মক বেদে তাহার বীজ অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। বেদ হইতে সেই বীজস্বরূপ মূল সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রকারগণ লুপ্তাগমের উদ্ধার বা নূতনাগম সৃষ্টি করিতেন। এই ভাবে কোন আগমই এপর্য্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হইতে পায় নাই, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর প্রযত্নে (নূতনাকারে) পুনরুজ্জীবিত হইয়া আজও কোন প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে (৫)।

(১) ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে। নিরুক্ত, ২।২
(২) সাঢ়্যৈ সাঢ়্বা সাঢ়েতি নিগমে। পা, ৬।৩।১১৩
বা বপূর্ব্বস্য নিগমে। পা, ৬।৪।৯
(৩) নৈগমরূঢ়িভবং হি সুসাধু। মহাভাষ্য (পা, ৬।৩।১)
নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্। মনুসংহিতা, ৪।১৯
(৪) তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাম্। উত্তররামচরিত
(৫) শ্রুতিস্মৃতিলক্ষণ আগমঃ। বাক্যপদীয়, ১।৪১ টীকা

(১) প্রত্যক্ষানুমানাগমেষ্বন্তিমো বেদ ইতি তল্লক্ষণমিতি চেৎ—
সায়ণ-কৃত বেদোপোদ্‌ঘাত
(২) প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। মনু, ১২।১০৫
(৩) ন ভাত্বকর্ত্তৃকং কঞ্চিদাগমং প্রতিপদ্যন্তে। বাক্যপদীয়, ১।১৩৪
(৪) অনেন সর্ব্বাগমানাং প্রবাহানাদিত্বং ব্যবস্থাপয়তি।
বাক্যপদীয়, ১।১৩৪ কারিকায় টীকা
(৫) বীজং সর্ব্বাগমাপায়ে ত্রয্যোবাদৌ ব্যবস্থিতা। বাক্যপদীয়, ১।১৩৪

আগম যে এক প্রকার প্রমাণ তাহা মনুর বচন উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। 'নাগমা অপ্রমাণ মিতি' এই কথা বলিয়া বৈয়াকরণেরাও আগমের প্রামাণ্য স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন (১)। ভর্ত্তৃহরি ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ে তর্কাদিশাস্ত্র অপেক্ষা আগমের অধিকতর প্রামাণ্য ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন (২)। শুধু তর্কের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা হয় না (৩)। যেই তর্ক আগমের অবিরোধী তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই জন্য শুষ্ক তর্কদ্বারা আগম কখনও বাধিত হয় না (৪)। এমন কি, আগম-বলে শিষ্টগণ তর্কবিরুদ্ধ এবং লোকবিরুদ্ধ আচরণও কখন কখন অনুমোদন করিতেন (৫)। অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা ঋষিদিগের জ্ঞানকেও ভর্ত্তৃহরি আগমমূলক বলিয়াছেন (৬)।

চিরপ্রচলিত শ্রুতি ও ঋষি-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাকরণের উৎপত্তি (৭)। একাধিক শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি ব্যাকরণশাস্ত্র যে আগমমূলক তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শব্দ নিত্যই হউক, আর কৃতকই (অনিত্য) হউক, তাহা দ্বারা শব্দশাস্ত্রের আগমসংজ্ঞা নিরর্থক হয় না, কিংবা শব্দের অনাদি ব্যবহার ও বাধিত হয় না (৮)। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, প্রাণি-জগতের উৎপত্তি ও তাহাদের সংস্কারবিশেষ যেমন অনাদি, শব্দানুশাসনবলে শব্দের সাধুত্ব ব্যবস্থা করার নিয়মও তেমন অনাদিকাল হইতে লোকসমাজে চলিয়া আসিতেছে। শিষ্টাগম (ব্যাকরণ) হইতেই শব্দের সাধুত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে (৯)।

(১) বাক্যপদীয় টীকায় (১।১৩৪) পুণ্যরাজ

(২) এবং চাগমাবিরোধী তর্ক এব প্রমাণম্।
পুণ্যরাজ (বাক্য, ১।১৩৭ ।

(৩) ন চাগমাদৃতে ধর্ম্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে। বাক্য, ১।৩৭

(৪) বাক্যপদীয়, ১।৩১
তস্মাদাগমো ন তর্কবাধ্যঃ। পুণ্যরাজ

(৫) আগমাদ্ধি লোকবিরুদ্ধং তর্কবিরুদ্ধমপ্যাচরণং প্রতিপদ্যন্তে শিষ্টাঃ।
পুণ্যরাজ

(৬) ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্। বাক্যপদীয়, ১।৩০

(৭) তস্মাদকৃতকং শাস্ত্রং স্মৃতিং বা সনিবন্ধনাম্।
আশ্রিত্যারভ্যতে শিষ্টৈঃ শব্দানামনুশাসনম্॥ বাক্যপদীয়, ১।৪৩

(৮) নিত্যত্বে কৃতকত্বে বা তেষামাদির্ন বিদ্যতে।
প্রাণিনামিব সা চৈষা ব্যবস্থানিত্যতোচ্যতে॥ বাক্যপদীয়, ১।২৮

(৯) শিষ্টেভ্য আগমাৎ সিদ্ধাঃ সাধবো ধর্ম্মসাধনম্।
বাক্যপদীয়, ১।২৭

এই জন্য শৈবাগম ও শাক্তাগমের ন্যায় ধর্ম্মমূলক ব্যাকরণশাস্ত্রও আগম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভর্ত্তৃহরি ও পুণ্যরাজ অধিকাংশ স্থলেই ব্যাকরণকে আগম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১)। যেই সাধুশব্দ প্রয়োগে ধর্ম্ম বা অভ্যুদয় লাভ হয় শব্দের সেই সাধুত্ব-ব্যবস্থাপক ব্যাকরণাগমের পূর্ব্ব-কালে প্রভূত আলোচনা হইয়াছিল (২)। প্রাচীন ব্যাকরণ-সমূহের সূত্রে যে সকল বৈয়াকরণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় ইন্দ্র, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভরদ্বাজ স্ফোটায়ন, পাণিনি, ব্যাড়ি ও বাজপ্যায়ন প্রভৃতি শাব্দিকগণ অগণিত ব্যাকরণাগমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল ব্যাকরণাগম আজকাল এক রকম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিতে—আমরা সমুদ্রের নিকট হইতে সামান্য একটু জলকণামাত্র লাভ করিয়াছি। বোপদেব আট জন প্রসিদ্ধ শাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩)। কাল-ক্রমে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যাকরণাগমই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ব্যাকরণের মধ্যে কেবল পাণিনীয়াগম বা 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ'ই কালের করাল কবল হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাণিনীয় ব্যাকরণের সম্প্রদায়ও কতকটা অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাণিনীয়াগমের সূত্রকার, বার্ত্তিককার ও ভাষ্য-কারকে সাধারণতঃ 'ত্রিমুনি' বলা হয়। এতদ্ভিন্ন ভর্ত্তৃহরি, কৈয়ট, পুণ্যরাজ, জয়াদিত্য, নাগেশ ভট্ট, ভট্টোজিদীক্ষিত প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ বহুতর ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পাণিনীয়াগমের প্রভূত অঙ্গপুষ্টি ও সম্প্রদায়াবিচ্ছেদ সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণাগমও শাব্দিকগণের অমোঘ চেষ্টার ফলে এক প্রকার অবিচ্ছিন্নভাবেই চলিয়া আসিয়াছে (৪)।

(১) বাক্যপদীয় ১।৪১, ১।২৭, ১।১৩৪, ১।১৩৯, ২।৪৮৮, ২।৪৮৯, ২।৪৯০, ২।৪৯২, ২।৪৯৩।

(২) আগমাদেবাভ্যুদয়ার্থিভিঃ সাধবঃ প্রযোক্তব্যা ইতি সিদ্ধম্।
পুণ্যরাজ (বাক্যপদীয়, ১।১৪১ টীকা)

(৩) ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥

(৪) অবিচ্ছেদেন শিষ্টানামিদং স্মৃতিনিবন্ধনম্। বাক্যপদীয়, ১।১৪৩

পাণিনি-প্রণীত সূত্রসমূহ দ্বারা সকল পদের সাধুত্ব নির্ব্বাহ করা অসম্ভব দেখিয়া মহর্ষি কাত্যায়ন (বররুচি ?) অনেকগুলি অতিরিক্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাই 'বার্ত্তিক' নামে প্রসিদ্ধ। এই বার্ত্তিক-সূত্রের উপর পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করেন। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে তিন জন ঋষির হাতে পাণিনির ব্যাকরণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। পাণিনি-ব্যাকরণের উপর ব্যাড়ি 'সংগ্রহ'নামক লক্ষশ্লোকাত্মক একখানি বৃহৎ ব্যাকরণগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন (১)। পতঞ্জলি তদীয় মহাভাষ্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এক স্থানে ব্যাড়ির নামও করিয়াছেন (২)। মহাভাষ্যের শ্লোকাকারে নিবদ্ধ ব্যারণের কথাগুলির কিছু কিছু বোধ হয় এই 'সংগ্রহ' হইতে সংগৃহীত। ভর্ত্তৃহরি বলেন যে, অধ্যেতৃ-গণ ক্রমশঃ সংক্ষিপ্তরুচি ও অল্পবিদ্য হওয়ায় কালক্রমে 'সংগ্রহ' অস্তমিত হইয়াছিল (৩)। তাহার পর পাণিনীয়াগমের সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি কাত্যায়ন-প্রণীত বার্ত্তিক সূত্রগুলির ব্যাখ্যানাত্মক 'মহাভাষ্য' রচনা করেন।

পতঞ্জলি-রচিত মহাভাষ্য ব্যাকরণাগমের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কেবল ব্যাকরণের দিক দিয়া নয়, দার্শনিকতার হিসাবেও ইহার স্থান অতি উচ্চ। বৈয়াকরণসম্প্রদায়ের নিকট মহাভাষ্যের প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পতঞ্জলির ভাষ্যকে সাধারণতঃ মহাভাষ্য বলা হয় কেন তাহা ভর্ত্তৃহরি স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাষ্যে কেবল ব্যাকরণের কথা নিয়াই বিচার করা হয় নাই, কিন্তু ইহাতে সকল শাস্ত্রের কথাই স্বল্লাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল শাস্ত্রের 'ন্যায়-বীজ' ইহাতে উপনিবদ্ধ আছে বলিয়া ইহার গুরুত্ব অত্যাধিক (৪)। এই মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই পতঞ্জলি-কৃত ভাষ্যকে সাধারণতঃ মহাভাষ্য বলা হইয়া থাকে (৫)। নিসর্গসুকুমার এবং অতি গম্ভীর বলিয়া ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয়। ভর্ত্তৃহরি মহাভাষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহার সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্য ও রচনাপারিপাট্যের কথা অনেক বার বলিয়াছেন (১)। তিনি শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, মহাভাষ্য-চর্চ্চা না করিলে কাহারও জ্ঞান পরিপক্ব হইতে পারে না (২)। মহাভাষ্যের অপর নাম 'ফণিভাষ্য'। কথিত আছে—ফণি-পতি অনন্তদেব পতঞ্জলির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোনর্দ্দদেশে গোণিকানাম্নী তপস্বিনীর পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাভাষ্য প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি চিদম্বরপুরে যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত শিবের তাণ্ডব নৃত্ত দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে মহাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পতঞ্জলি-চরিতে বর্ণনা আছে ('নৃত্তং তৎফণিপতয়ে স দর্শয়িত্বা প্রাহেদং প্রণয়কিরা গিরা গিরীশঃ। ত্বং কৃত্বা ভুবি পদশাস্ত্রবার্ত্তিকানাং ভাষ্যং তদ্বিবৃণু ততো দিবং ব্রজেতি'। পতঞ্জলি-চরিত, ৪।৭৫)। অনেকে যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলির সহিত ইহাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পতঞ্জলি বৈদ্যক-শাস্ত্রের উপরেও একখানি (চরক) গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বৈয়াকরণগণ বলেন, মহাভাষ্য, যোগদর্শন ও বৈদ্যকশাস্ত্র এই তিন প্রকারের গ্রন্থ লিখিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি যথাক্রমে বাক্য, চিত্ত ও শরীরের মালিন্য দূর করিয়াছিলেন (৩)। ভোজরাজ স্বীয় বৃত্তির মঙ্গলাচরণশ্লোকেও ঠিক এই কথা বলিয়াই যোগসূত্রকার পতঞ্জলিকে নমস্কার করিয়াছেন ('বাক্চেতোবপুষাং মলঃ ফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতঃ')।

তার্ককগণের কুটতর্কজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বহুবিদ্যাবাদযুক্ত এই আর্ষ গ্রন্থও দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবগ্রস্ত হইয়াছিল (৪)। ভর্ত্তৃহরি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈজি, সৌভব, হর্য্যক্ষ প্রভৃতি শুষ্কতার্কিকগণের তর্কপ্রভাবে মহাভাষ্যের গৌরবও প্রতিষ্ঠা অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং ইহার পঠন ও পাঠন

---

(১) ইহ পুরা পাণিনীয়েঽস্মিন ব্যাকরণে ব্যাড়্যুপরচিতং গ্রন্থলক্ষপরিমাণং সংগ্রহাভিধানং নিবন্ধনমাসীৎ। পুণ্যরাজ (বাক্য, ২।৪৮৪ কারিকার টীকা)

(২) সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্। মহাভাষ্য, ১।১।১
দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ। মহাভাষ্য, (পা, ১।২।৬৪)

(৩) প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্।
সংপ্রাপ্য বৈয়াকরণান্ সংগ্রহেঽস্তমুপাগতে॥ বাক্যপদীয়, ২।৪৮৪

(৪) তচ্চ ভাষ্যং ন কেবলং ব্যাকরণস্য নিবন্ধনং যাবৎ সর্বেষাং ন্যায়বীজানাং বোদ্ধব্যমিত্যত এব সর্ব্বন্যায়বীজহেতুত্বাদেব মহচ্ছব্দেন বিশিষ্য মহাভাষ্যমিত্যুচ্যতে লোকে। পুণ্যরাজ

(৫) কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্ব্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে॥ বাক্যপদীয়, ২।৪৮৫

(১) অলব্ধগাধে গাম্ভীর্য্যাদুত্তান ইব সৌষ্ঠবাৎ। বাক্যপদীয়, ২।৪৮৬

(২) তস্মিন্নকৃতবুদ্ধীনাং নৈবাবাস্থিত নিশ্চয়ঃ। বাক্যপদীয়, ২।৪৮৬

(৩) কায়বাগ্বুদ্ধিবিষয়া যে মলাঃ সমবস্থিতাঃ। চিকিৎসালক্ষণাধ্যাত্মশাস্ত্রৈস্তেষাং বিশুদ্ধয়ঃ॥ বাক্যপদীয়, ১।১৪৮
এবং—যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥
কৈয়ট

(৪) মহাভাষ্যং হি বহুবিধবিদ্যাবাদবলমাস্যং ব্যবস্থিতং তত্তচ্চার্বাকিকী-মাত্রকুশলঃ কথং তন্নিশ্চিনুয়াৎ—পুণ্যরাজ

ক্রমে ক্রমে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল (১)। অন্য শাস্ত্রের পরিমলহীন তর্কের নাম শুষ্কতর্ক (২)। আন্বীক্ষিকী-মাত্র অধ্যয়ন করিয়া তার্কিকেরা তর্কবলে অন্য শাস্ত্রের মত-সমূহকে দুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদের প্রবল আক্রমণে ব্যাকরণাগম বিধ্বস্ত ও বিপ্লুত হইয়াছিল। ইহা হইতেই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের তৎকালীন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল এবং ব্যাকরণের আগমসংজ্ঞাও লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে এই ভাবে ব্যাকরণাগম পরিভ্রষ্ট হয় এবং মহাভাষ্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইয়া দাক্ষিণাত্য দেশে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল (৩)। বাক্যপদীয়ের এই ইতিবৃত্ত পড়িয়া মনে হয়, পতঞ্জলির সময় হইতে (খ্রী, পূ, ১৫০) আরম্ভ করিয়া ৫০০ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় মহাভাষ্যের উপর বা ব্যাকরণা-গমের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। ইহার পর (বোধ হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে) চন্দ্রাচার্য্য, বসুরাত প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ প্রাচীন ব্যাকরণাগম লাভ করিয়া এবং মহাভাষ্যস্থ সকল ন্যায়বীজ অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রযত্নে ভ্রষ্ট ব্যাকরণাগম আবার দীর্ঘকাল পরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত হইয়া উঠিল (৪)। কেমন করিয়া চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ প্রাচীন ব্যাকরণা-গমের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে ভর্তৃহরি ও পুণ্যরাজ একটা সুন্দর কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। 'ত্রিকূট পর্ব্বতের এক দেশে 'ত্রিলিঙ্গ' নামে একটী স্থান আছে। সেখানে উপলতলে রাবণ-বিরচিত মূল বা আদি ব্যাকরণাগম লিখিত ছিল। কোনও ব্রহ্মরাক্ষস তথা হইতে ব্যাকরণাগম আনয়ন করিয়া চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতিকে দান করিয়াছিল' (৫)। ইহা হইতে ব্যাকরণের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়া এবং শিষ্য-দিগের নিকট নিরন্তর ঐ শাস্ত্রের উপদেশ ও ব্যাখ্যা করিয়া চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণাগমের উদ্ধার ও প্রভূত পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন(১)। এই ভাবে আবার লুপ্ত ব্যাকরণাগম শাখাপল্লব-শোভিত বিশাল ও বিস্তৃত মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীতে এই চন্দ্রাচার্য্যের কথা আছে। কাশ্মীররাজ অভিমন্যু ও জয়াপীড় যে দেশান্তর হইতে চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণদিগকে আনয়ন করিয়া স্বদেশে মহাভাষ্য সুপ্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ভর্তৃহরির গুরু ছিলেন বসুরাত। তিনি যোগবলে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রস্থানবিচারপূর্ব্বক ব্যাকরণাগম সংগ্রহ করিয়াছিলেন (২)। এই ব্যাকরণাগম ও মহাভাষ্য-প্রদর্শিত ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুরূপদিষ্টমার্গের অনুসরণ করিয়া ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' নামে এক খানি অশেষপাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বৈয়াকরণের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। এই গ্রন্থের ভিত্তি হইল পতঞ্জলির মহাভাষ্য। ভর্তৃহরি যে বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। তিনি মহাভাষ্যের উপর একটী টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বার্লিনের পুস্তকাগারে (Royal Libray at Berlin) না কি ইহার কতক অংশ রক্ষিত হইয়াছে (৩)। ইহা অসম্পূর্ণ এবং আজ-পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত। বাক্যপদীয়ের ব্যাখ্যায় পুণ্যরাজ অনেক সময় ভর্তৃহরিকে 'টীকাকার' বলিয়াছেন।

ভর্তৃহরির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৈয়ট মহাভাষ্যের উপর 'প্রদীপ' নামে একটী টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই টীকার উপর আবার নাগেশ ভট্ট 'প্রদীপোদ্দ্যোত' নামে টীকান্তর রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত নাগেশ ভর্তৃহরির সিদ্ধান্ত-গুলিকে নৈয়ায়িকতার ছাঁচে ঢালিয়া 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা' নামক একখানি সুচিন্তিত গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ভর্তৃহরির অনুকরণে কোণ্ডভট্ট 'বৈয়াকরণভূষণ' নামে পদ্যাত্মক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কাশিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদী, শব্দকৌস্তুভ প্রভৃতি বহু গ্রন্থই নানা দিক্ দিয়া পাণিনিব্যাকরণ বা ব্যাকরণাগমের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

বৈজি-সৌভব-হর্য্যক্ষৈঃ শুষ্কতর্কানুসারিভিঃ।
আর্ষে বিপ্লাবিতে গ্রন্থে সংগ্রহপ্রতিকঞ্চুকে॥ বাক্যপদীয়, ২।৪৮

শুষ্কতর্কঃ কেবল এবান্যশাস্ত্রপরিমলহীনো ভণ্যতে পুণ্যরাজ

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালে স দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ॥ বাক্যপদীয়, ২।৪৮৮

৪। অথ কালান্তরেণ চন্দ্রাচার্য্যাদিভিরাগমং লব্ধ্বা তেন চোপায়-ভূতেন সকলানি ভাষ্যাবস্থিতানি ন্যায়বীজানি তাননুসৃত্য ব্যাকরণাগমঃ পুনরপি স্ফীততাং নীত ইতি—পুণ্যরাজ

৫। পর্ব্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্যবীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চন্দ্রাচার্য্যাদিভিঃ পুনঃ॥ বাক্যপদীয়, ২।৪৮৯
পর্ব্বতাৎ ত্রিকূটৈকদেশবর্ত্তিত্রিলিঙ্গৈকদেশাদিতি। তত্র হ্যুপলতলে রাবণবিরচিতো মূলভূতব্যাকরণাগমস্তিষ্ঠতি। কেনচিচ্চ ব্রহ্মরাক্ষসানীয় চন্দ্রাচার্য্যবসুরাতগুরুপ্রভৃতীনাং দত্ত ইতি -পুণ্যরাজ

'ত্রিলিঙ্গ' বলিতে বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজ ও নিজামরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী যে অংশে 'তেলেগু' ভাষা প্রচলিত আছে তাহাকে বুঝায়।

(১) তেন খলু যথাবদ ব্যাকরণস্য স্বরূপং তত্র উপলভ্য সততং চ শিষ্যাণাং ব্যাখ্যায় বহুশাখিত্বং নীতো বিস্তরং প্রাপিত ইত্যনু-শয়তে পুণ্যরাজ

ন্যায়প্রস্থানমার্গাংস্তানভ্যস্য স্বং চ দর্শনম্।
প্রণীতো গুরুণাস্মাকময়মাগমসংগ্রহঃ॥ বাক্যপদীয়, ২।৪৯০

(৩) মহাভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ডে কিলহর্ণের ভূমিকা—পৃঃ ১২০

রূপের বালাই

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

মাঘ মাস। কনকনে শীত পড়িয়াছে; তারপর আজ সমস্ত দিন এলোমেলো বাতাস বহিয়া সেটাকে যেন উখো দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া আরও ধারাল করিয়া তুলিয়াছে।

খেলা ধুলা সারিয়া চারু বাড়ী ফিরিতেছিল। আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে একটু বিরত। অবশ্য তাহার হিসাব মত তাহার এতটা বয়স হইয়া গিয়াছে যাহাতে এক আধদিন একটু বিলম্বের জন্য আর তাহার উপর অতটা তম্বি করা ভাল দেখায় না, কিন্তু এ বাড়ীর শাসন বড় গুরুতর—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গেটের ভিতর আসিয়া পড়া চাই-ই—তা' জোয়ান মরদই হও বা ঝিয়ের কোলের কচী খুকীটিই হও।

অন্য সবাই বকাবকি করে; ভাজ ঠাট্টা করিয়া বলে—"বড় হ'য়েচ ব'লেই তো গেরস্তকে বেশী সাবধান হ'তে হবে; উঠ্‌তি বয়েস—এখন হাজার রকম বিপদ যে…"

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বেচারী হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, এমন সময় একটা করুণ আর্ত্তনাদ তাহার কানে আসিয়া বাজিল। কানের উপর ভাঁজ করা র‍্যাপারটা একটু আলগা করিয়া দিল। রাস্তার ধারে ম্যুনিসিপালিটির একটা আবর্জ্জনাধার, আওয়াজটা তারই ওপার থেকে আসিতেছে। কান্নাটা এতই অরুন্তুদ যে চারুকে নিশ্চয়ই তাহার নিজের আসন্ন বিপদের কথা ক্ষণেকের জন্য ভুলাইয়া দিয়া থাকিবে। সেই গোল টবটার নিকট গিয়া গলা বাড়াইয়া পিছনে লক্ষ্য করিল এবং যাহা দেখিল তাহাতে ফিরিয়া আসা তো দূরের কথা—দুপা আগাইয়া একেবারে সম্মুখীন না হইয়াই পারিল না।—

রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত অশ্রু জমিয়া উষ্ণ হইয়া উঠে—দুর্দ্দশা দেখিয়া। সেই দারুণ শীত! গায়ে একখানি বস্ত্র নাই। ঘাঘরার মত কি একটা আছে—শরীরটিকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া হতভাগিনী সেইটুকু দিয়াই যতটা পারিয়াছে আবৃত করিয়া লইয়াছে। মুখটা বুকের মধ্যে গোঁজড়ান—মনে হইতেছে যেন কান্নাটা তাহার বুকটাই বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।—একটা অবিচ্ছিন্ন চাপা ক্লিষ্ট স্বর;—গুটান সুটান শরীরটা এক একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া ওঠে, আর সেই চাপা স্বরটা যেন বাঁধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে।

চারুকে দোষ দিই না—ও বয়সটাই ওই রকম। রূপ, এক কথায় চোখ দুটিকে নাছোড়-বান্দা হইয়া জড়াইয়া ধরে; ভাল মন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, মনটি আগুপিছু না ভাবিয়া মনের মতনটির কাছে নিজেকে ফতুর করিয়া বিলাইয়া দিয়া বসিয়া থাকে—বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুখ দুঃখের যোগে যদি আলোছায়ার সৃষ্টি হয়।

শুধু এই শোকলাঞ্ছিত রূপ নয়—আর একটু বিশেষত্ব ছিল,—এই ভাগ্যতিরস্কৃতা বিদেশিনী। ভাল করিয়া দেখা যায় না; সুতরাং ঠিক মত জাতি নির্ণয় করা কঠিন, আর চারুর জ্ঞানও ততটা নেই, তবে এযে কোন দিন কোন ইংরাজ বা ঐরকম কাহারও ঘর আলো করিয়া ছিল এরূপ মনে করা অন্যায় হয় না। সহরটা একটা রেলওয়ে উপনিবেশ—খাঁটি, দো-আঁসলা নানা রকম সাহেবে ঠাসা; সুতরাং যদিও এরকম দৃশ্য সচরাচর দেখা না যায়, যদিও এত সুন্দর এই শ্বেতাঙ্গিনীর এই ময়লা টবের পাশে পড়িয়া কাতরান—গল্পে পড়া গোছের বলিয়া বোধ হয়, তবু এ নেহাৎ-ই অসম্ভব নয়।

চারু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—আপনা আপনিই একটি অস্ফুট "আহা-চু্য-চু্য" শব্দ তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া পড়িতেই অভাগিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।—কি সুন্দর মুখখানি আর কি করুণ দৃষ্টি!

চারু প্রশ্ন করিল—"তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?—তুমি এখানে এমন ক'রে পড়ে কেন?"

উত্তরে একটি টানা আর্ত্তধ্বনি হইল এবং বুকের মধ্যে গুটাইয়া-রাখা দক্ষিণ হস্তটি বাহিরে আসিয়া পড়িল। চারু উবু হইয়া বসিয়া সেটি সন্তর্পণে উঠাইয়া লইয়া—'ইস্!' বলিয়া শিহরিয়া উঠিল।…মণিবন্ধের ঠিক ওপরে এতখানি একটা ক্ষত!—দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল আসে। কাছে-পিঠে জল নাই! অন্ধকারও ঘন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি

কোন রকম একটা কিছু করিবার জন্য চারুর মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। সে তাহার সোয়েটারের পকেট থেকে তাহার রঙিন, ফুলকাটা রুমালটী বাহির করিয়া তাহার একধার হইতে একটা ফালি ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর অবশিষ্ট রুমালটা পাট করিয়া সেই ক্ষতের উপর জড়াইয়া ফালিটা দিয়া বাঁধিয়া দিল।

কেউ কাহারও ভাষা ভাল রকম বোঝে না; কিন্তু সৃষ্টির আদিকাল হইতে সেজন্য কোন ক্ষতি হয় নাই, আজও হইল না। একের আছে দরদ—সেটা অপরকে দরদী করিয়া তুলিয়াছে—তাহার পরে যা ঘটনা-স্রোত তা' চিরদিন একই ভাবে বহিয়া আসিয়াছে—আচার বিচারের কুটোকাটি সে প্রবাহের মুখে যে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার খোঁজই পাওয়া যায় না।

হাতটা বাঁধিয়া চারু উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু কি ভাবিল যেন, তাহার পর আবার বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের বাড়ী যাবে?"

মাথাটি নড়িয়া উঠিল, শীতেও হইতে পারে; তবে এ-অবস্থায় চারুর নিকট রাজী হওয়ার ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হইল; না হওয়ার কোন সঙ্গত কারণও সে খুঁজিয়া পাইল না। কারণ, কোথায় রাখিবে, কি করিয়া সামলাইবে সে তার চিন্তা, এই আশ্রয়হীনার পক্ষে সে-কথা ভাবা স্বাভাবিক নয়। তার অবশ্য অনেক বিঘ্ন আছে—এক আধদিনের জন্য সব বাড়ীতেই আতুরকে আশ্রয় দেয়—তাহার বাড়ীতে অপর কাহারও বেলায় দিত; কিন্তু এক্ষেত্রে—"ম্লেচ্ছ—ম্লেচ্ছ" করিয়া এক তুমুল কলরব উঠিবে মাত্র। যা' বাড়ী!...তবুও ঠাকু'মা নাই।...

রাগ অভিমান দেখাইয়া এক আধদিনের হুকুম লওয়া যাইত; কিন্তু ঐযে পোড়া রূপ, ঐ হইয়াছে কাল;—সবার মনেই একটা সন্দেহ উঠিবেই যে, নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে নিজের করিয়া লইবার সে অভিসন্ধি রাখে।—আর সত্যই কি এ-জিনিষকে একবার আশ্রয় দিয়া আবার প্রাণ ধরিয়া স্বেচ্ছায় বিদায় করিয়া দিতে সেই পারিবে?—পাষাণ তো নয়!...

এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল উপায় এখনকার মত চুপিচুপি লইয়া গিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখা। একটা মস্ত সুবিধা—অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল নিজের ঘরেই আশ্রয় দেয়—যেমন নিজের বুকের ভালবাসা দিয়াছে; কিন্তু সে'তো আর সম্ভব নয়। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ছিল গোয়াল ঘর।—রাত্রিটা তো সেখানে রাখা যাইত, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া দিনের জন্য একটা বন্দোবস্ত হইতই—আশেপাশে অনেক পোড়ো বাড়ী আছে।—আজ দিন বুঝিয়া বুধীও কিন্তু বাদ সাধিয়াছে,—এতদিন থাকিতে আজই তাহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত। বাড়ীর মেয়ে পুরুষেরা পালা করিয়া তাহার ঘরে সমস্ত রাত জাগিবে।

একটা ঘরের কথা মনে পড়িল—ঠাকুরমার ঘরটা। বারবাড়ীতে, ঠাকুরদালানের পাশে একটেরেয় দিবি নিরি-বিলিতে ঘরটি। ঠাকুরমা দিন কয়েকের জন্য তীর্থে গেছেন—ঘর বন্ধ, রাত্রে কেউ ওদিকে যায় না। দু'টা রাত্রি সেখানে বেশ সংগোপনে রাখা যাইবে।

একথাও মনে হইল—আহা ঠাকুরমার ঘর—সেখানে একটু এড়া কাপড় পরিয়াও কাহারও ঢুকিবার হুকুম নাই;—একটা মস্ত বড় অনাচার হইবে না?...চারু এই বলিয়া কাটান দিল যে, ওটা যেমন পাপ, তেমনি যার এত কষ্ট তাহাকে জায়গা দেওয়া—এই দুর্দ্দান্ত মাঘের শীতে—এও তো একটা পুণ্য! তাহা ভিন্ন রোজ সকালে ধুইয়া মুছিয়া—ঘরে গঙ্গাজল ছিটান ঠাকুরমার নিত্য কাজ—গঙ্গাজল কি একটা যা'তা'?...

চারুর একটা দুঃখ হইল—গুরুজনের কথা শুনিয়া ইংরাজীটা যদি একটু মন দিয়া পড়িত তো আজ অনেক কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইতে পারিত। যাক্, এখানে অনেক বাঙ্গালী—ওরা বাঙ্গলা একটু আধটু বোঝে নিশ্চয়—অনেকটা এই আশায়, আর অনেকটা এইজন্য যে, ভালবাসা মাতৃ-ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ খোঁজে—চারু ভাষার অভাবে চুপ করিয়া থাকিল না।

—মুখের কাছে মুখ নামাইয়া বলিল—"বেশ, যাবে তো ওঠ। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমার ঠাকুর-মার ঘর, যদি 'টুঁ' শব্দ কর তো হুলুস্থুল প'ড়ে যাবে।...দু'টো রাত মুখটি বুঁজে কাটিয়ে দাও, তারপর আমরা কলকাতায় চলে যাব। আর যদি এর মধ্যেই তোমার লোকেরা খোঁজ করে—কি তুমি নিজেই আমায় ফাঁকি

দিয়ে চ'লে যাও তো কি আর করব?—মনের দুঃখ মনে চেপে চুপ ক'রে থাকব।...সত্যই কি তুমি এমন নিষ্ঠুর হবে?

—হবে তো হোয়ো, সে পরের কথা পরে। এখন ওঠ; উঃ, যা শীত—এস, আমার সোয়েটারটা জড়িয়ে দিই. এইবার ঠিক হ'য়েচে। বাড়ী গিয়ে কিন্তু আবার খুলে নোব, না হ'লে ধরা প'ড়ে যাব কিনা।—তোমায় খুব একটা ভাল কম্বল দোব'খন, কোন কষ্ট হবে না।

নাঃ, চ'লতে তুমি পারবে না—আহা-হা...হা।...আমি তোমায় কোলে ক'রেই নিয়ে যেতে পারতাম—একরত্তি তো শরীর তোমার—একদলা মাখনের মতন, কিন্তু...

আচ্ছা কোলেই এস অন্ধকার আছে, কেউ দেখতে পাবে না; বরং ঐ খিড়কীর পথ দিয়ে ঢুকে পড়ি।...উঃ, কি নরম তুমি—আহা—তবু কতদিন খাওনি—হাড় জিরজির ক'রচে।

কি নামটি তোমার? যাইহোক্ গিয়ে আমি মেরী বলেই ডাকব—আমার ঐ নামটিই পছন্দ...মেরী-মেরী-মেরী—আ মরি—কি মিষ্টি নাম!..."

২

খিড়কির দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিয়া খুব সাবধানে চারু পূজার দালানের নিকট উপস্থিত হইল। রকের নীচে একটু বেশী রকম প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখিয়া সঙ্গিনীকে সেইখানে কোল থেকে নামাইল। মাথায় হাত বুলাইয়া চাপা গলায় বলিল—"এক্ষুনি আসচি আমি; কোন রকম আওয়াজ না হয়, লক্ষ্মীটি"

সঙ্গিনী একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া, ঘাঘরাটি লুটাইয়া শুইয়া রহিল। চারু চাবি আনিবার জন্য ভিতরে গেল।

বাড়ী ঢুকিতেই একচোট বকুনি। তবে চারু সেটা গায়ে মাখিল না। তার মনটি পড়িয়া ছিল ঠাকুরঘরের দালানের নীচে এবং সেখান হইতে যে কোন কাতরানির সুর এদিকে শোনা যাইতেছে না এই আশ্বাসেই তাহার সমস্ত গঞ্জনা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। খানিকটা পরে, যখন সবাই নিজ নিজ কাজে নিবিষ্ট, সে ঠাকুরমার ঘরের চাবি ও একটা দেশলাই লইয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল। ঘর খুলিয়া তাহার এই নূতন পোষ্যটীকে ভিতরে লইয়া গেল। তারপর ভিতর হইতে আস্তে আস্তে খিল আঁটিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিল।

আলনার উপর হইতে পাট-করা একটা কম্বল ও সতরঞ্চি নামাইয়া একটি শয্যা রচনা করিল, মেরীকে সযত্নে শোয়াইয়া দিয়া চাপা গলায় বলিল—"দুঃখু ক'রোনা, আমার নিজের বিছানা হ'লে ওপরেই শোয়াতাম তোমায়; এটা একেবারে ঠাকু'মার বিছানা কিনা।...এবার সোয়েটারটা খুলতে হবে; তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক, আমি আস্তে আস্তে খুলে নিচ্চি। ক'লকাতায় চলনা, তোমায় সাহেব বাড়ী থেকে জামা কিনে এনে দোব,—যেমনটি মানাবে তেমনটি দেখে।...এই র্যাগটা গায়ে দাও, শীতের বাবাও ঘেঁষতে পারবে না।...এইবার দেখি হাতটা"

চারু হাতের পটিটি খুলিল। ঠাকুরমার গঙ্গাজলের কলসী থেকে একঘটি জল গড়াইল একটি ন্যাকড়া ভিজাইয়া খুব লঘুহস্তে ক্ষতস্থানটা ধুইয়া দিতে লাগিল। মেরী একআধবার কাতরাইয়া উঠিতেছিল, যন্ত্রণায় হাতটাও মাঝে মাঝে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, চারু খুব স্নেহভরে তাহার মাথায় মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ধোওয়া হইয়া গেলে একটু চুপ করিয়া এদিক ওদিক চাহিল। প্রদীপের দিকে নজর পড়িতেই তাহার একটা মেয়েলী টোট্‌কার কথা মনে পড়িয়া গেল। আঙুলে করিয়া খানিকটা ঈষৎ গরম পোড়া তেল লইয়া ক্ষতটার উপর আস্তে আস্তে লেপিয়া দিল।

মেরী একটি স্বস্তির আওয়াজ করিয়া মুখের দিকে চাহিল—তাহার একমাত্র সম্বল সেই কৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টির আবেদন লইয়া...

চারু বলিল—"কেমন ওষুধ বলত? তোমাদের বিলিতী টিঞ্চার ফিঞ্চার এর কাছে লাগে না—যত সব আদাড়ে ওষুধ। তুমি কিন্তু আজ একটা কেলেঙ্কারি না ক'রে ছাড়বে না দেখচি।—কোন রকম শব্দ কোরো না, দোহাই তোমার,—এখন যদি কেউ আমাদের এই অবস্থায় দেখে তো কি কাণ্ডটা হবে বল দিকিন?...'টুঁ' শব্দটি নয়; বুঝলে?

আমি এই তোমার ঠোঁট দুটি বন্ধ ক'রে দিয়ে যাচ্ছি—আবার সেই যখন খাবার নিয়ে আসব তখন খুলবে, বুঝলে ?"

মেরী কহিল—"হুঁ..."

ঠিক 'হুঁ' কহিল কি আরামে গুটাইয়া-গুটাইয়া শয়ন করিতে এই রকম একটি তৃপ্তিসূচক শব্দ আপনিই তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া আসিল বলিতে পারি না, তবে চারুর মুগ্ধ কর্ণে যে এটি সম্মতির বাণীর সুরেই বাজিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই! উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"বারে! আমাদের কথা তাহলে শিখতে আরম্ভ করেচ এর মধ্যেই!... তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কথা কিছু কিছু বোঝ, এখানকার সব সাহেব মেমেই জানে যে।...ক'লকাতায় চল, তখন প্রাণ খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইব—খুব শিগ্‌গির শিখে যাবে। ..কিন্তু এতটো দিন তোমার জবাব দিয়ে কাজ নেই—দোহাই তোমার লক্ষ্মীটি।...তাহ'লে চুপটি ক'রে শুয়ে থাক, আমি আবার আসব।"

প্রদীপটা নিভাইয়া দিয়া চারু বাহিরে আসিয়া দরজায় যেমন কুলুপ লাগান ছিল, লাগাইয়া দিল, তারপর খুব সতর্কতার সহিত আবার ভিতরে প্রবেশ করিল। খানিকটা দুধের আগে দরকার। সবার চোখের সামনে নিজের দুধ হইতে বাঁচাইতে গেলে—'কেন, কি বৃত্তান্ত'—এই সব জবাবদিহি দিতে দিতেই সব ফাঁস হইয়া যাইবে। তাহা ভিন্ন আহারের এখনও ঢের দেরী; ওদিকে কিছু পেটে না পড়িলে সে-বেচারীর প্রাণ যায়। কতদিন সে অভুক্তা তাহার ঠিক নাই;—পেটে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে।

চারু ব্যাকুলভাবে এঘর সেঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুধ রান্নাঘরে, কিন্তু সেখানে যেরূপ ভিড় তাহাতে কোন আশাই নাই।...সকলের উপর তাহার বেজায় রাগ হইল—অমন একজোট হইয়া দুধ আগলাইয়া থাকিবার কি দরকার?—কেহ কি চুরি করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে?...তাহার ইচ্ছা হইল ঘরে ঘরে সবার কচি ছেলে মেয়ে জাগাইয়া দিয়া দলটা ভাঙিয়া দেয়; বোধ হয় সেই উদ্দেশেই পা বাড়াইয়াছিল; এমন সময় দেখিল একবাটি দুধ হাতে করিয়া তাহার ভাজ রান্নাঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল। খুড়ীমার অসুখ—দুধ নিশ্চয় সেই ঘরে যাইতেছে। চারু একটু আড়ালে দাঁড়াইল এবং বৌদিদি আগাইয়া গেলে তাঁহার পিছু লইল।

ঘরে ঢুকিয়া বৌদিদি ডাকিল—"খুড়ীমা!"

রোগী উত্তর করিল—"এই যে মা, বল।"

"আপনার দুধ এনেচি।"

"রেখে দাও টেবিলটার ওপর, খানিক পরে খাব।"

"বেশ, এই ঢেকে রাখলাম; বেশী যদি জুড়িয়ে যায় তো ডাকবেন, আবার গরম ক'রে দিয়ে যাব'খন"—বলিয়া বৌদিদি বাহির হইয়া গেল।

চার পাঁচ মিনিট গেল; চারু ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"খুড়ীমা!"

"কে, কি বলচ?"

"না, আমি; অমনি ডাকছিলাম; ঘুমোও।"

আরও পাঁচ সাত মিনিট গেল। চারু খুব লঘু কণ্ঠে ডাকিল—"খুড়ীমা!"

কোন উত্তর হইল না। একটি বাটি আনিয়াছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া টেবিলের কাছে গেল। রোগীর দুধ হইতে প্রায় অর্দ্ধেকটা বাটিতে ঢালিয়া আবার যথাযথভাবে বাটিটা ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—অন্যায় বৈকি; তবে ভালবাসার দৌরাত্ম্যও বলা চলে।

চারু আবার ঠাকুরমার ঘরে গেল। দুয়ার খুলিল, আলো জ্বালিল, তাহার পর মেরীকে আস্তে আস্তে জাগাইয়া বাহুর নীচে ও মাথায় হাত দিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া বলিল—"নাও, দুধটুকুন খেয়ে নাও দিকিন, উবগার দেবে'খন, লক্ষ্মীটি আমার।"

তাহার লক্ষ্মীর দুধ খাওয়া হইলে তাহাকে নীরবতার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া কাঁধের উপর কাঁধ দিয়া একটু আদর করিল; তাহার পর আলো নিভাইয়া কবাট বন্ধ করিয়া আবার বাড়ীর ভিতর গেল।

রান্নাঘরের দোর গোড়ায় গিয়া বলিল—"আমার আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে মা; কিছু হ'য়ে থাকে তো দাও; নয়তো ঘুমুই গে..."

মার সন্ধ্যার রাগটা কিছু বাকী ছিল; বলিলেন—"এখনও কিছু হয় নি, আমার মাথা দিয়ে দোব?...যা,

ঘুমুগে যা।...কেন পড়াশোনা চুলোর দোরে গেল? সমস্ত দিন টঙোস্ টঙোস্ ক'রে বেড়ালে ঘুমের আর দোষ কি? .. যত বয়েস হচ্চে...।" পরশু চলিয়া যাইবে বলিয়া পিসীমার মনটা বড় ভিজা ছিল, বলিলেন "আঃ, কেন? বাছা খেতে চাইলে।" রুটি আর মাছের তরকারি হ'য়েচে, খেতে পারবি? আর দুধ আছে।"

চারু তাহাতেই রাজী হইল; বলিল—"মাছ তা'হলে কিছু বেশী ক'রে দিও পিসীমা।"

দালানের একটু অন্ধকার জায়গা দেখিয়া আহার করিতে বসিল, দুইখানি রুটি খাইল, তরকারির আলুগুলা খাইল, দুধে হাতও দিল না। আহারের আন্দাজি সময়টা কাটাইয়া দিয়া খাবার গুলো একটা কোণে লুকাইয়া রাখিয়া দিল। তারপর আড়ম্বরের সঙ্গে আঁচানটা শেষ করিল, একটু এঘরে সেঘরে নিজের চেহারাটা দেখাইয়া লইল এবং পরে সুবিধা বুঝিয়া খাদ্যসামগ্রী সমেত আবার ঠাকুরমার ঘরে মেরীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

আবার সেই রকম সযত্নে তুলিয়া খাওয়ান, আদর উপদেশ ইত্যাদি। মেরীও সেবার গুণে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, মুখে চোখে তার প্রফুল্লতার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাধ্যমত বন্ধুর সোহাগের প্রতিদান দিয়া নিজের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইল।

চারু যেন নিজের সমস্ত শ্রম সফল বলিয়া মানিল। আবেগ ভরে মেরীর ক্ষত হাতখানি মুঠার মধ্যে ধরিয়া কহিল—"তা'হলে আমায় ভালবাস?"

মেরী তাহার হাতের উপর মুখটা চাপিয়া জানাইল—"হুঁ"

"আর যদি কাল খোঁজ পড়ে যায়?" এই চিন্তাতেই বেচারীর মুখটা মলিন হইয়া গেল। মেরীর শুভ্র কাঁধের উপর নিজের কাঁধটি চাপিয়া বলিল—"ভাই তোমায় আর ছাড়তে ইচ্ছে ক'রচে না। কি সুন্দর তুমি, কি মিষ্টি, কেমন নরম তোমার..."

ভিতর হইতে কে ডাকিল—"চারু!"

"ওঃ-ই; একেবারে চুপচাপ ক'রে থাকবে, লক্ষীটি"। বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া, কপাট দিয়া চারু সদর হইয়া ভিতরে গিয়া হাজির হইল।

সে রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। হয় উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া কাটাইয়াছে, নয় দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে; কেবলই মেরীর সহিত বিচ্ছেদের স্বপ্ন, সমস্ত সাহেবদের মুখ যেন রাগে আগুণ হইয়া উঠিয়াছে...যেন ঠাকুরমার হাতে সাত হাতের একটা ঝাঁটা ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িয়া মেরীর শাদা গাটা রাঙাইয়া গিয়াছে...

এই রকম একটা উৎকট স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতে চারু দেখিল রাতটা কাটিয়া গিয়া আবছা আবছা দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘরের মধ্যে সবার গভীর নিদ্রার সজোর নিশ্বাস বহিতেছে। বাড়ীর অন্যত্রও কেহ যে শয্যা-ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছে এমন কোন সাড়া শব্দ নাই।

চারু বিছানা ছাড়িয়া খুব সন্তর্পণে বাহির হইয়া আবার কপাটটা ভেজাইয়া দিল। খিড়কীর দুয়ার খুলিয়া ঠাকুরমার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। একবার চারিদিকে ভাল করিয়া নজর ফিরাইয়া লইল; তারপর কপাট খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

মেরীকে এক রকম আলিঙ্গনে বাঁধিয়াই একদমে এক ঝুড়ি প্রশ্ন করিয়া বসিল "কষ্ট হয়নি তো, কাঁদনি তো? আর খিদে পেয়েছিল কি! শীত—? আমি সমস্ত রাত তোমার স্বপ্ন দেখেছিলাম। তুমিও আমার স্বপ্ন দেখেছিলে নিশ্চয়?"

উত্তর হইল একটি ছোট্ট "হুঁ"—আসল উত্তরটি দু'টি স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টির মধ্যে বাঁধিয়া রহিল।

"তাহলে আমায় ভালবাস নিশ্চয়, বাস তো? অথচ আমি কি পাষাণ দেখেচ?—তোমায় নির্বাসনে দিতে এসেচি। কি করব বল? এখানে তো তোমায় দিনের বেলায় রাখতে পারব না। এই আর একটু পরেই সবাই জেগে উঠবে: তখন কোন রকমে একটু টের পেলে আমার যা হবার তাতো হবেই—তোমায় যে-নাকালটা ক'রবে আমার সেই ভাবনা,—এ বাড়ীর লোকদের তো চেন না তুমি..."

চারু মেরীকে আলাদা করিয়া শোয়াইয়া কম্বল, রাগ পাট করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। বাড়ী হইতে একটী চট আনিয়াছিল, ঠাকুরমার ঘরে একটা ছেঁড়া কম্বল ছিল,

দুটাকে ভাঁজ করিয়া বাম হাতে লইল, ডান হাতে মেরীকে তুলিয়া ধরিল, বাহিরে আসিয়া কপাটে তালা লাগাইয়া কম্বল, চট আর মেরী সমেত সরকারদের পোড়ো বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। একেবারে গভীর জঙ্গল না হইলেও বাড়ীটা আগাছায় আচ্ছন্ন।

সামনের ঘরটা পার হইয়া দ্বিতীয় ঘরটায় প্রবেশ করিল। তখনও কোণেকাণে বেশ অন্ধকার আটকাইয়া আছে, গাটা ছমছম করিয়া উঠিল। ভরসা—দু'জন আছে। মেরীকে একবার বুকে চাপিয়া ধরিল।

ঘরের শান ফুঁড়িয়া মাঝে মাঝে আগাছা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। একটা কোণ পরিষ্কার করিয়া চারু চটটা গুছাইয়া পাতিল এবং মেরীকে শোয়াইয়া উপর হইতে কম্বল চাপা দিল। মাথায় আদরের গুটিকতক হাল্কা আঘাত দিয়া কহিল—"সমস্ত দিনটা তোমায় এইখানে কাটাতে হবে। আমি সবাইকে লুকিয়ে আবার এসে তোমার খাবার টাবার দিয়ে যাব, পারিতো আরও বিছানাও নিয়ে আসব। কিন্তু থাকতে হবে তোমায় একলা—সমস্ত দিনটা। আবার সন্ধ্যের সময় তোমায় এসে নিয়ে যাব। ভয় করবে না তো? ...না, ভয় তোমার জাতেরই নেই, মেয়ে মদ্দ কারুরই নয়—এই একটু সুবিধে।···এবার যাই, ফরসা হয়ে উঠল।"

মেরীর ক্ষত হাতখানির উপর চারুর ডান হাতটি রাখা। অপর হাত দিয়া মেরী চারুর হাতটি চাপিয়া ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে—"উস্" করিয়া একটা বেদনার শব্দ করিল।

বোধ হয় বলিতে চাহিল—"হে এক রজনীর বন্ধু, তুমিই আমার পরম আশ্রয়—একমাত্র অবলম্বন। যাও, কিন্তু মনে রেখ,—এ যেন সত্যিই আমার নির্বাসনের বিদায় না হ'য়ে ওঠে··"

চারু অন্তত এমনি বুঝিল, তাহার চক্ষু দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু সময় নাই—দিনের আলো স্পষ্টই হইয়া উঠিতেছে।···সে আর কথা কহিল না, আশ্রিতাকে নিবিড়-ভাবে বুকে চাপিয়া ইঙ্গিতেই ইঙ্গিতের উত্তর দিয়া উঠিয়া পড়িল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বুঝিল দু'একজন উঠিয়াছে। পড়বি তো পড় একেবারে সেজ-কাকার সামনে, রাগলে যার একেবারে জ্ঞান থাকেনা। বিস্মিত প্রশ্ন হইল—"বাবু কোথায় গিয়েছিলেন এত ভোরে?"

চারুর উত্তর অবশ্য জোগান ছিল; কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। আর একটা ধমক খাইয়া বলিল—"বেড়াতে; জামতাড়ার ভোরের হাওয়াটা ভাল, তাই···"

"ঢোকো ঘরে: ভোরের হাওয়া খেতে বেরিয়েচেন। এই হাড়ভাঙা শীত···"

চারুর মা বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো ঠাকুরপো?"

"এই দেখনা, তিনটে মাস সোজা আটটা পর্য্যন্ত বিছানায় কাটিয়ে আজ যাবার দিন ভোরের হাওয়ার ওপর টান পড়েচে। একটা নিউমোনিয়া টিউমোনিয়া হোক"

মা চারুর দিকে চাহিয়া অস্বাভাবিক শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, কাণ্ডটা কি?—তুই কখন বা উঠলি, আর কোথা থেকেই বা জুতো টুতো সব ভিজিয়ে এসে হাজির হলি? কাল সন্ধ্যে থেকে তোর মাথায় কি ভিরকুটি ঢুকেচে বলতো? যত বয়েস হচ্চে তুই কি তত ধিঙ্গি হচ্চিস? না বাপু, আমি হার মানলাম; সকাল বেলা কোথায় 'দুর্গা' নাম ক'রতে ক'রতে উঠবে লোকে, না—"

সকাল বেলা বলিয়াই কথাটা বেশী বাড়িল না তখন, তবে বাড়িল না বলিয়াই সমস্ত দিন তাহার জের চলিল। ফলে সকলের মন তাহাকে বিদ্রূপ কিংবা তিরস্কারে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য এমন উন্মুখ হইয়া রহিল যে, তার মেরীর কাছে লুকাইয়া যাওয়া কি তার আহার সঞ্চিত করিয়া রাখা এক রকম অসম্ভবই হইয়া উঠিল। বুধী গাইটা আবার আজ নূতন বাধ সাধিয়াছে—তার প্রসব বেদনা আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ওদিকে যে লোকে একটু অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবে সে উপায় নাই।

সে নিরুপায় ভাবে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুখটি শুকাইয়া গিয়াছে—তবুও প্রফুল্লতার চেষ্টা জাগাইয়া রাখা চাই; আহারে রুচি নাই, তবুও গিলিয়া গিলিয়া খাওয়া চাই—নহিলে যত রাজ্যের প্রশ্ন বর্ষিত হইবে,—এই ঠাট্টা বকুনির উপর।

এই রকম ভাবে একটা দেড়টা পর্য্যন্ত গেল। তখন বাড়ীটা দুপুরের আলস্যে একটু নিঝুম হইয়া পড়িতেই চারু

মরিয়া হইয়া এবং সাধ্যমত গা-ঢাকা দিয়া সুড়ুত করিয়া সরকারদের পোড়ো বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। জামার দুই পকেটে কিছু ভাত আর একটু মাছের তরকারি,—এ পর্য্যন্ত এই জোগাড় হইয়াছে, আর আশাও নাই।

মেরী তাহার ক্ষুধা পিপাসা আর রোগের যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে—সেই একভাবে—বেশ টের পাওয়া গেল একটুও নড়ে চড়ে নাই। চারুর পায়ের শব্দে একবার মাথা তুলিয়া চাহিল—মাথাটি আবার তখনই নেতাইয়া পড়িল।

এই নিদারুণ অবস্থা, অথচ তাহার সেবার আয়োজনের এই দৈন্য,—চারুর চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিল। অন্য সময় অত বকে, এখন একটিও কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না; সুধু এরই জন্য সহ্য করা আজ সারাদিনের গঞ্জনা মনে হইয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পকেট হইতে ভাত ও তরকারি বাহির করিয়া একটু কচু পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে রাখিয়া দিল। তাহার গলা বাধিয়া গিয়াছিল; সুধু বলিল—"জল আনতে পারিলাম না, যাই এখন··"

চলিয়া আসিল। ঐ মুষ্টিমেয় অন্ন শেষ করিয়া মেরী অতৃপ্ত ক্ষুধায় তাহার দিকে যে-দৃষ্টিতে চাহিবে, তাহা যাহাতে দেখিতে না হয় সেই জন্যই চারু সরিয়া গেল বটে; কিন্তু অ-দৃষ্ট হইলেও সেটি ক্রমাগত তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া থাকিয়া তাহার চিন্তাকে ব্যথিত করিয়া রাখিল।

ইহাতে এদিকে একটু উপকার হইল। সবাই মনে করিল—তাহাদের তিরস্কার বিদ্রূপ সফল হইয়াছে—চারু অনুতপ্ত। তাহার আড়ালে পিসীমা সবাইকে একটু বকিয়াও ছিলেন··"কেন তোমরা সবাই মিলে ওরকম গঞ্জনা দিচ্চ—মুখটি শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্চে বাছা সমস্ত দিন।—বয়েস হয়েচে—এখন মনে লাগে··"

চারুকে বলিলেন—"কৈ সন্ধ্যে হ'তে চলল—তুই এখনও খেলতে বেরুলি নি। যা সবার সঙ্গে দেখা শুনা ক'রে আয়; কাল সকালেই তো চ'লে যাবি।"

মা বলিলেন—"রাত করিস্‌নি কিন্তু, খবরদার, আজ আবার মেঘলা ক'রে র'য়েচে।"

পিসীমা বলিলেন—"তা' যদি একটু রাত হ'য়েই পড়ে তো কি করবে? কদ্দিনের জন্যে চ'লে যাচ্চে, সঙ্গীরা কি সহজে ছাড়তে চাইবে? তবে একলা আসিস্ নি, বুঝলি? পাহাড়ে জায়গা, সাপ খোপের ভয়···"

যাক্, সান্ধ্য মিলনের অনেকটা সুবিধা হইল।···আবার বুধীরও প্রসব-বেদনা উঠিয়াছে। খুড়ীমারও দুপুর হইতে বাড়াবাড়ি, একজন কাহাকেও আটকাইয়া রাখিবেনই। এর ওপরে সেজ কাকার কোমরের বাতটা যদি দেখা দিত আর মার বাতটা···না তা'হলে আবার কালকে যাওয়া বন্ধ হইবে।

যাহ'ক, কাকা এবং মা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও চারুর মনটা আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে মেরীর জন্য আহার্য্য সঞ্চয়ে লাগিয়া গেল। আজ আর বাড়ীতে আনাগোনা করিলে চলিবে না, একটু পরেই ঘরে, বারান্দায় যাত্রার জন্য বাঁধা ছাদা পড়িয়া যাইবে।

দোকান থেকে রাবড়ী ও কিছু লুচি কিনিয়া আনিয়া ঠাকুর দালানের পাশের ঘরটিতে লুকাইয়া রাখিল। বাড়ী হইতে কিছু জোগাড় হয় ভালই, না হয় মেরী তো আর অনাহারে মরিবে না?

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে—আর সেই সঙ্গে জোলো হাওয়া। ঘরের বাহিরে যায় কাহার সাধ্য! যাহাদের নেহাৎ-ই দরকার কোনরকমে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া 'হি-হি' করিতে করিতে ঘরে ঢুকিতেছে—

মা বলিলেন—"চারুটা এলনা এখনও, বুধন না হয় যাক না একবার আলোটা নিয়ে।"

পিসীমা বলিলেন—"অত ব্যস্ত হবার কি দরকার? দত্তদের বাড়ী আচে নিশ্চয়, হাওয়া বৃষ্টির জন্যে বেরুতে পারে নি; একটু ক'মলে নিজেই আসবে কাউকে সঙ্গে ক'রে। বেশী দেরী হয়,—বুধন তখন গিয়ে নিয়ে আসবেখ'ন। আহা কাল যাবে—একটু গল্পস্বল্প ক'রবে··আবার বেশী বকা অব্যেস; ওর নিজের কথা ফুরোতেই সময় ব'য়ে যায়···"

চারু তখন গল্পস্বল্পই করিতেছিল—ঠাকুরমার ঘরে। নীরব শ্রোত্রী শ্রীমতী মেরী! সমস্ত দিন যে তাহার শীত অনশনে গিয়াছে তাহার পরিপূরকস্বরূপ আজ সান্ধ্য সেবাটি সকলরকমে বাহুল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চারুর চেষ্টার ত্রুটি

নাই। নেহাৎ ঠাকুরমার তথ্‌তাপোসটিতে আর শোয়ায় নাই, তবে তাঁহারই বিছানা-পত্র সংগ্রহ করিয়া আজ যে শয্যা রচনা হইয়াছে তাহা প্রায় তথ্‌তাপোষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে—যেন তাহার ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত হইয়াই। আহারের উপচারের কথা বলিয়াছি,—তাহার উপর গরম দুধও সংগ্রহ হইয়াছিল খানিকটা—আহা; খুড়ীমা অসুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকুন—তবে অবশ্য যতটা সম্ভব চক্ষু বুঁজিয়া···

একটু একটু করিয়া বৃষ্টি নামিল। বাহিরে দুর্য্যোগ। এমন রাত্রির মিলনে মনে হয় আর সমস্তই ধুইয়া মুছিয়া মিলাইয়া যাইতেছে—আছি শুধু আমরা দু'টিতে—সমস্ত প্রাণ ভরিয়া আছি—প্রাণের বন্যায় একে অপরের মধ্যে ডুবিয়া আছি।

পুরু বিছানা আর র‍্যাগের মধ্য হইতে মেরীর শুধু মুখটা বাহির হইয়া আছে, তাহারও খানিকটা সুচারুর তপ্ত করতলে ঢাকা। কথা হইতেছিল—"আজ তোমার বড্ডই কষ্ট গেছে, না?"

"হুঁ···"

"হুঁ বলচ?—আর আমিই কি ঘরের মধ্যে ছিলাম ব'লে সুখে ছিলাম?···থাক্ এখন তো আর কোন কষ্ট নেই?"

"উঁহুঁ"

"তোমার জন্যে আমার অধর্ম্ম ক'রতে হ'চ্চে—ভারী দুষ্টু, তুমি। এসব ঠাকুরমার বিছানা, আমার পাপ হ'চ্চে না? বল তো?"

"হুঁ"

"বা—রে 'হুঁ'; ঐ একটি কথা শিখে রেখেচ। আমার একটুও পাপ হবে না, কখনই না—কেন তুমি এত সুন্দর হলে? রাস্তায় তো অমন কত প'ড়ে প'ড়ে গেঙ্গাতে থাকে—কা'কে বুকে ক'রে নিয়ে এসে কে আর নিজের ঠাকুরমার বিছানায় শোয়াচ্চে বল?"

সম্বন্ধে মেরী 'হুঁ' 'না' কিছুই মত প্রকাশ করিল না; বন্ধুর করতলে নিজের গালটা চাপিয়া ধরিল। বন্ধুও তপ্ত অধরটি আবেগে একটু সঙ্কুচিত করিল; কহিল—"এই আজকের রাত্তিরটুকু পর্য্যন্ত তোমার এই মেয়াদ; ক'লকাতায় দু'জনে এক ঘরেই থাকব··· কাল ভোর চারটের গাড়ীতে যাবে—বেশ অন্ধকার থাকতে; তোমায় এমন লুকিয়ে নিয়ে যাব—কেউ জানতেও পারবে না। তবে ঐ কথা,—'টুঁ' শব্দটি ক'রতে পারবে না। তারপর সেখানে গিয়ে তো নিজেদের রাজ্য—কত কি তোমায় শেখাব—কত কি দোব—কত ভালবাসা···তোমার বাড়ীর জন্যে মন কেমন ক'রবে নাকি?—তাহ'লে বুঝব—তুমি আমায় একটুও ভালবাস না। কৈ, তোমায় তো কেউ খুঁজতেও এলনা—তাহ'লে আমার চুরি করা হ'ল না—আমি কোন পাপ করচি না—শুধু ঠাকুরমার কাছে হচ্চে—সে তোমার দোষ······"

শয্যার মধ্যে মেরী একটু নড়িয়া উঠিল—হইতে পারে এরকম দোষার্পণের আপত্তিতে—অন্তত চারু সেইরূপই ধরিয়া লইল। মেরীর মুখের উপর নিজের মাথাটি চাপিয়া বলিল—"বেশ গো—দোষটা না হয় দুজনে ভাগাভাগি ক'রে নোব—হ'ল তো?"

এদিকে যখন ভাগাভাগি কষাকষি হইতেছিল; বাড়ীর মধ্যে চারুর তত্তক্ষণ বেশ একটু খোঁজ পড়িয়া গেছে। মা বলিতেছেন—"হ্যাঁ, সে নাকি আবার নিজের মতলবে আসবে,—সেই বান্দা কিনা···"

সেজ কাকা জানিতেন না; সব কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিতেছেন—"দেখ দিকিন কি সব কাণ্ড!—কোন্ আক্কেলে তোমরা বুধনকে এতক্ষণ পাঠাও নি? আর দিদি, তোমার আদর পেয়ে পেয়ে..."

পিসীমা ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবার পর অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, রাগিয়া নিজেই আলো লইয়া 'সমস্ত পাড়া' অন্বেষণ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল, যাহাতে এ-প্রসঙ্গটাই চাপা পড়িয়া গেল।

বারান্দার বন্ধ দরজায় একেবারে ব্যস্ত গোটাকতক ঘা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাগাদা—"শিগ্‌গির দোর খোল না, মলাম যে!"

কপাট খুলিয়া দিতেই এক ঝাপটা ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমা আসিয়া বারান্দায় ঢুকিলেন; ঘোড়ার গাড়ী হইতে এইটুকু আসিতেই ভিজিয়া গিয়াছেন। পিছনে মোট লইয়া গাড়োয়ানটা।

সকলে প্র[illegible] একসঙ্গে আশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল—"একি! আমরা জানি [illegible]মার আসবার ঢের দেরী···না চিঠি—না কিছু!—হঠাৎ.

"আজকাল আর ম্লেচ্ছেরা তীর্থের কি রেখেচে যে লোকে তীর্থ ক'রবে ? সহরে সহরে মুন্সিপালিটি হ'য়ে মেথরের ভিড় খালি—ম্যাগ্‌গে !·· ঐ যতটুকু মন্দিরটির মধ্যে থাকতাম বাবার কাছে ব'সে··"

কেহ শুকনা কাপড়, কেহ পা ধোওয়ার জল, গামছা, গায়ের কাপড় লইয়া আসিল—

ঠাকুরমা সভয়ে বলিলেন—"না—না— ওসব আমি এখন কিছু ছুঁতে পারব না—বাব্বাঃ এই ক'দিন ছিলাম না,—তোরা কি আর আচার বিচার কিছু রেখেচিস ?" চল্ আমার ঘরে গিয়ে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে পথের অনাচারই কাটাই। বাব্বাঃ—রেলগাড়ী -ঘোড়ার গাড়ী—কিছু কি রাখলে ধর্ম্মের। সব একাকার ক'রে দিয়েচে।··· আমার ঘরে কেউ তোমরা অনাচার নিয়ে উবগার ক'রে ঢুকতে যাওনি তো ?···চাবি কৈ ?"

ছেলে চাবি আনিতে ছুটিল।

চাবি নাই !

ঠাকুরমা সেই রকম ভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কাঁপিতেছিলেন। খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল।

শেষে তিনিই বলিলেন --"ও যা ভয় ক'রতে ক'রতে এসেচি তাই ;—তোমরা কেউ গিয়ে নিশ্চয় ঘরটি সুদ্ধ্ ক'রে এসেচ—আমার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েচ···"

সকলে অতি বড় দিব্য গ্রহণ করিল—"এই তুমি তীর্থ থেকে এসেচ, তোমার পা ছুঁয়ে বলচি মা—আমরা তোমার ঘরের দিকেই যাই নি···"

মা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন—"তাহ'লে কি —তাড়াতাড়িতে আমিই চাবিটা কুলুপে এঁটে চ'লে গেছলাম ?—হ'তেও পারে।···যাই হক্, যাক্ বাবু, আমার এখানে যেন গা ঘিন্‌ঘিন্ ক'রচে···এঃ, পাঁচটা রুটির ছিথেত্তোর ক'রচে গো !···কি জানি আমি আবার কিসের ওপর এসে দাঁড়ালাম..."

চটি, কম্বল, ছাতা—যে যেটা পাইল মাথায় দিয়া সমস্ত দলটি তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া হাজির হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহার নিজের মাথার উপর শুধু বর্ষামার্জ্জিত অনাচার-মুক্ত আকাশ।

শিকল খোলা, বাহিরে তালা চাবি নাই ! তবে দুয়ারটা ভিতর হইতে অর্গলিত, বিস্ময়ে, আতঙ্কে সবার মুখ শুখাইয়া গেল।

পুরুষ হিসাবে সেজ পুত্রই আগাইয়া আসিয়া শিকল নাড়িয়া ডাকিল—"কে আছো, দোর খোল !"

চারু তখন আলাপে ডুবিয়া আছে ; এই আকস্মিক বিপদে মেরীর গলা ছাড়িয়া বিবর্ণমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। মেরীও সচকিত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল।···আবার তাগাদা হইল—"খোল শিগ্‌গির—না হ'লে দোর ভেঙ্গে ঢুকব।"

চারু মন্ত্রচালিতের ন্যায় অর্গল খুলিয়াই ঘরের একটা কোণে গুটি সুটি মারিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দলটা হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা এতই অসম্ভব রকম বিস্ময়কর যে, প্রথমটা কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না। শেষে মার আওয়াজে সকলের সাড় হইল ; ঘরে ঢুকিয়াই পত্র পাঠ—"থু-থু" করিতে করিতে বাহির হইয়া গিয়া তিনি চীৎকার জুড়িয়া দিলেন—"ওরে, এরা আমার জাতকুল সব খেলেরে ! আমার তীর্থির ফল হাতে হাতে ফলিয়ে দিলে। না-না তোরা কেউ আমায় ছুঁস্‌নে, আমি আজ এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরব, তোরা দাঁড়িয়ে দ্যাখ, বাবা বিশ্বনাথ আজ তোদের মনস্কামনা পূর্ণ ক'রেচেন .."

সেজ কাকা অশুভসূচক শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"চারু, এগিয়ে এসো। বলি একি কাণ্ড ?···ছি—ছি—ছি—"

চারুর মা নিজেই আগাইয়া গিয়া একটা কাণ্ড ঘটাইতে যাইতেছিলেন। পিসীমা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়া কোণ থেকে একগাছা ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া গর্জ্জাইয়া উঠিলেন—"কেন, ওর কি এত দোষ ? ছেলেমানুষ, এই হারামজাদীর লোভে কুহকে পড়ে আর সামলাতে পারেনি। বেরো হারামজাদী ম্লেচ্ছিনী বেরো···"

একতোড়ে শপাশপ শপাশপ করিয়া ছয় সাত ঘা ঝাঁটা গায়ে, মুখে, মাথায় বর্ষিত হইয়া গেল।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মেরী চারুর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া মুখের পানে আর্ত্ত চক্ষু দুটি উঠাইয়া ধরিল।

বাহিরে মা গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছিলেন—"ওরে, শেষে আমার ঘরেই এই পাপের লীলা এই নরককাণ্ড, ওরে পোড়া দেবতার আকাশের বাজ কি সব ফুরিয়ে গেল রে ?..."

পিসীমা মেরীর আচরণে আরও আগুন হইয়া উঠিলেন। ঝাঁটার ঘায়ের উপর ঘা দিতে দিতে গর্জ্জাইতে লাগিলেন—"আবার সোহাগ ! তোর সোহাগের নিকুচি ক'রেচে, বেরো নেকালো !"

—সমস্ত গোলমালের ওপরে তাঁহার গলা আর ঝাঁটার শব্দ ছাপাইয়া উঠিতেছিল। মেরী চারুর পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া নিরুপায় ভাবে এই মরণ-প্রহার সহ্য করিয়া যাইতেছিল। আর সহ্য হয় না। ভাষা নাই যে বলে—তাহার আর্ত্তনাদের আওয়াজও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল।

চারু আর থাকিতে পারিল না ; মেরীকে তুলিয়া বুকে চাপিয়া, পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা ভুলিয়া অঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—"পিসীমা, আর মেরনা, ওর কোন দোষ নেই। এই বিষ্টির রাতটা ওকে থাকতে দাও—না হ'লে .."

ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পিসীমার হস্ত হইতে ঝাঁটাটা আপনিই মাটিতে পড়িয়া গেল। দুই পা পিছাইয়া গিয়া তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ ! চারু তুই হলি কি ? তোর হায়া ঘেন্না সব রসাতলে গেছে, তুই তলে তলে এতই গোল্লায় গেছিস্ ?..."

মূঢ় চৈতন্যটা আবার যেন তাঁহার দ্বিগুণ শক্তিতে ফিরিয়া আসিল। ঝাঁটাটা কুড়াইয়া লইয়া দুয়ারের দিকে বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ফাল্—দূর কর, কর্‌লি দূর ?"

চারুর ঠোঁট দুটি একবার কাঁপিয়া উঠিল ; কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না। শুধু অশ্রুমগ্ন, মিনতিভরা চোখ দুটি একটু সমবেদনার আশায় সবার রোষকঠোর মুখগুলির উপর চঞ্চল ভাবে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

পিসীমা আচ্ছন্নভাবে একটু দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ঝাঁটাতে একটা উগ্র ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"দিবি নে ফেলে ? তবে তুই সুদ্ধু দূর হ'—বেহায়া শতেকখো"

যাঃ গালের কথায় মনে পড়িল—আমি যে আসল কথাটাই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। চারু আমার নবমবর্ষীয়া শ্যালিকা শ্রীমতী চারুলতা দেবী, আর মেরী একটা বিলিতি কুকুর মাত্র।

উপন্যাস-রসসিক্ত বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার মনে যে সহজেই নায়ক নায়িকার কথা উদয় হইতে পারে এটা খেয়ালই ছিল না। এখন যদি হইয়াই থাকে তো তাহার জন্য মার্জ্জনা চাহিব কি শেষে নিরাশাটুকুর জন্য মার্জ্জনা চাহিব এ এক মহা ধাঁধাঁয় পড়া গেল।

মেরীর কেশবহুল ল্যাজটিকে "সাদৃশ্যাৎ" ঘাঘরা বলা হইয়াছে, সেও একটা অপরাধেই দাঁড়াইল দেখিতেছি। বিশেষ করিয়া সেই যুগে যখন কাপড়টাকেও ঘাঘরা করিয়া পরিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে।
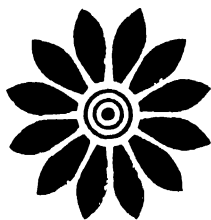
পল্লী-সন্ধ্যা

শ্রীমতী নমিতা দেবী

ডুবু ডুবু ওই রাঙা দিনমণি গাভীদল ফিরে ঘরে,
পশ্চিমাকাশে সোনার সিঁড়ি কে সাজায়েছে থরে থরে !
সন্ধ্যামণি সে উঠানের তলে ফুটে' ওঠে লাজে রাঙ্গা,
গোধূলির মাঝে ছড়ানো আবীর যেন নট্‌কনা ভাঙ্গা।
ঘাট হতে ফিরে আসে বধূদল সরমের মধুমেলা,
খোকাখুকী দ্বারে নাচে ভীড় করে' মধুর সন্ধ্যাবেলা।

গিন্নি আসিয়া সদর দুয়ার ধুয়ে দিয়ে গেল জলে,
কলসী লইয়া তরুণীরা সব ফিরে এল দলে দলে।
কর্ত্তা এলেন সারাদিন পরে মধুভরা গৃহতলে
ছোট মেয়ে তার ঢেলে দিল হাসি দু'হাত জড়ায়ে গলে।
পাতিহাঁস দল উঠানের কোনে ভীড় করি' করে খেলা,
নীড়ে নীড়ে পাখী করিছে কাকলি মধুর সন্ধ্যাবেলা।

দেখিতে দেখিতে মাঠের সীমায় উদিল চাঁদের কোণা,
অরূপে ও রূপে আলোকে আঁধারে হয় যেন জানাশোনা
তুলসী-বেদীতে ঘৃতের প্রদীপ দিয়ে গেল হেসে বধূ,
আঁচল হইতে প্রণামের সনে ঝরিয়া পড়িছে মধু।
ভূলোকে ঝরিল স্বরগের শ্লোক গগনে তারার মেলা,
চুম্‌কি-বসান শাড়ী দোলে বনে মধুর সন্ধ্যাবেলা।

ঘরে ঘরে ওরে বিরাম-বিপিনে হরষে কে দেয় দোল্,
পল্লীজননী সন্ধ্যায় আজি পেতেছে শান্তি-কোল।
রন্ধনশালে জ্বলে' ওঠে রাঙ্গা আগুনের রূপ-রাশি,
জ্বলে' উঠে সেথা সারা ভুবনের জীবনের মধুহাসি।
সংসার জোড়া প্রাণ-লাগি' সেথা নারীর দানের মেলা,
পল্লীর বুকে ঢেলে দিল মধু মধুর সন্ধ্যাবেলা। *

* লেখিকার বয়স গত ফাল্গুনে বার বৎসর পূর্ণ হইল।

হাঙ্গেরীয় গল্প-সাহিত্য

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

হাঙ্গেরীয় গল্প-সাহিত্য খুব প্রাচীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হাঙ্গেরীর লোকেরা গল্প বলতে যা বুঝতো তা অসংলগ্ন ছোট ছোট ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো একটু অতিরঞ্জিত করা ছাড়া আর কিছু নয়। ছোট ছোট স্বদেশের ঘটনাগুলোকে গল্পের ধরণে এই যে রূপ দেবার চেষ্টা তা সেণ্ট ফ্রান্সিস্ই প্রথম প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা পান,—সে অনেক দিন আগের কথা। সেণ্ট ফ্রান্সিসের "লিজেণ্ডস"ই মধ্য যুগের হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম গল্পের বই।

তারপরেই হচ্ছে একেবারে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। এই দু'শো বছরের মধ্যে হাঙ্গেরীয় কথা-সাহিত্যে যে ক'জন প্রতিভাশালী লেখক লেখনী পরিচালনা করেন, তাঁরা ছোট গল্প লেখার দিকে মন দেননি মোটেই, 'রোম্যান্স' ও গাথা রচনার মধ্য দিয়েই তাঁদের সৃষ্টি সার্থক হোয়ে উঠেছে। কিন্তু এঁদের এই বড় বড় একটানা রোম্যান্স ও গাথার মধ্যে গল্পের উপকরণের অভাব নেই। কিন্তু তাঁরা সেগুলোকে ইচ্ছা করেই রূপ দেননি, হয়তো উপন্যাসের মর্য্যাদা ক্ষীণ হোয়ে উঠ্‌তে পারে ভেবে। এই অনাদরের ফলেই গল্প-সাহিত্যের স্থান সে যুগের হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে বিশেষ সম্মানিত হোতে পারেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরু থেকে হাঙ্গেরীয় লেখকদের মনে সহজ সুন্দর ছোট ছোট গল্প সৃষ্টি করবার মোহ জাগে। তাঁদের রচনার এই নতুন ধারা হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে সত্যিকারের সুন্দর ছোট গল্প সৃষ্টি করে।—এই সকল গল্পই হাঙ্গেরীয় কথা-সাহিত্যে বিবর্ত্তন আনে এদের নবতম রচনার ভঙ্গীতে, নতুনতম প্রকাশ-ভঙ্গীর জন্য। হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিবর্ত্তন-ধারা প্রথম অনুভূত হয় কিস্‌ফালুদী ভ্রাতৃদ্বয়ের রচনার মধ্যে। এঁদের সৃষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীর হাঙ্গেরীয় সাহিত্যকে সেই শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিকতায় গৌরবান্বিত করে। দেশীয় সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যশালী করে তোলবার এই যে আন্দোলন—এই ভ্রাতৃদ্বয়ই তার অগ্রণী। দুই ভা'য়ের মধ্যে ক্যারোলীই সমধিক বৈশিষ্ট্যশালী ছিলেন, নাট্যকার হিসাবে হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের উপর এঁর প্রভাব অনন্য-সাধারণ। এঁর ভাই অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার—এঁরই রচনার ধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলেন, এঁর সৃষ্টি-প্রতিভায় প্রভাবান্বিত হোয়ে। ছোট গল্পের প্রকাশ ভঙ্গী, সহজ সুন্দর বর্ণনাকৌশল সংক্ষেপে চরিত্র-সৃষ্টির স্পষ্টতা—এ সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে ছোট গল্পের জন্য ইনিই সর্ব্বপ্রথম হাঙ্গেরীয় সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করে তোলেন। ইনি ছিলেন নাট্যকার, এঁর গল্পের মধ্যে নাটকীয় সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য এই জন্য প্রকাশ পেয়েছে। এঁর রচনার মধ্যে আধুনিকতার ধারা এম্‌নি ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত এঁর গল্পগুলি আধুনিক বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সৃষ্টির ধারার সহিত একটুও অসামঞ্জস্য হোয়ে পড়েনি,—এই জন্যই হাঙ্গেরীর সমালোচকদের মতে —the father of the modern Hungarian Stories হচ্ছেন ইনিই।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে হাঙ্গেরীর বুকে যুদ্ধবিপ্লব ও অরাজকতার প্রসার বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হলেও কথা-সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ ঘটে আধুনিকতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক অশান্তির মধ্যেও যে সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘট্‌তে পারে—এই অবিশ্বাস্য সত্য সত্যই পরিণতি লাভ করলো সাহিত্য-রসিকদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হাঙ্গেরীয় জনসাধারণ নাটক পড়তে আর কবিতা শুন্‌তেই ভালবাস্‌তো, গল্পকে তারা অনাদর করে এসেছে জন্মগত একটা সংস্কারের মধ্য দিয়ে।—এর কারণ ছিল যে, ছোট গল্প ও উপন্যাস সে দেশীয় সাহিত্যে তখনও এমন পরিণতি লাভ করতে পারেনি, যা জনসাধারণকে নাটক ও কবিতার মত মুগ্ধ করে তুল্‌তে পারে; গল্পের উপর লোকের ছিল তাই হতশ্রদ্ধা। সমসাময়িক জনগণের এই ধারণা তদানীন্তন লেখকদের চিত্তবৃত্তির উপরেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে—যার জন্য 'ক্যারোলী' যুগান্তকারী গল্প সৃষ্টি করলেও নাটক ছাড়া, অপর কিছুর

উপরে স্থায়ী দৃষ্টি দিতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের এদিকটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারেনা - হয়তো তাই থাক্‌তো, যদি না উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে যে আধুনিকতার আন্দোলন জাগে, তারই ঢেউয়ের আঘাত হাঙ্গেরীয় সাহিত্য-রসিকদের বুকে অতৃপ্তি জাগিয়ে না তুলতো। অপরিণত গল্প-সাহিত্যের জন্য জনগণের এই অতৃপ্তি, এই অসন্তোষ তাদেরই মধ্যে দু'জন বিখ্যাত লেখকের সৃষ্টি করলো—"জোকাই" ও "মিক্‌স্‌জাথ্‌"। এঁরা দু'জনেই দীর্ঘজীবী,, সত্যিকারের সৃষ্টিপ্রতিভা ছিল দুজনের মধ্যেই, আর দুজনে লিখেছেনও অনেক।

হাঙ্গেরীয় সাহিত্যিকদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা বিদেশীয় প্রভাবকে নিজস্ব রচনার মধ্যে স্বীকার করতে চান না—দেশগত স্বকীয়তা এই জন্যই হয়তো তাঁদের রচনার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশীয় সাহিত্য-রসিকরা নিজেদেরকে এঁদের সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পান বলেই, এঁদের রচনা জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছে, তাঁদের মন থেকে গল্পের প্রতি এই যে হতশ্রদ্ধা তা লোপ পাইয়ে দিয়েছে। নিজস্ব সৃষ্টির উপর এই যে সতর্ক দৃষ্টি এরই ফলে খুব শীঘ্রই হাঙ্গেরীয় সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে আদৃত হয়ে উঠেছে।

মিক্‌স্‌জাথ্‌ ও জোকাই এর পর ফেরেঙ্ক মোল্‌নার —ইনি শুধু দেশগত ন'ন, এঁর প্রতিটি রচনা বিশ্বমনীষীদের মুগ্ধ করেছে—ইনি বিশ্ব-জনীন।

হাঙ্গেরীয় কথা-সাহিত্যের একটা পরিচয়—নাটকীয় ক্রম-বিকাশ,—গল্পের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকেও সৃষ্টি করা হয় নাটকের মতই। সেটুকু বল্‌বার তা লেখকেরা নায়ক-নায়িকার কথাবার্ত্তার মধ্যেই বল্‌বার চেষ্টা করেন—নিজেরা কিছু বলতে চান না। সহজ ও অতি সাধারণ ভাবে গল্পের পূর্ণ বিকাশ এঁরা দেখতে চান—জটিল তথ্যকে জটিলতর ভাষায় প্রচার করে পাঠক-পাঠিকাদের বিহ্বল করতে এঁরা চেষ্টা করেন না। প্রত্যেক ঘটনাটী—তা সে নাটক, গল্প আর কবিতা যাতেই হোক, সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে এঁদের আগ্রহ—একখানা ছবির মত। আধুনিক সাহিত্যের ধারায় প্রভাবান্বিত হলেও হাঙ্গেরীয় গল্প-লেখকেরা কেবল দারিদ্র্যের মধ্যেই গল্পের নায়ক-নায়িকাকে সৃষ্টি করেন নি—সমাজের বিভিন্ন পর্য্যায়ে মানবের যে স্বরূপ, তারই চিত্তাকর্ষক অনুভূতি এঁদের রচনার অন্তর্মুখী প্রেরণা। অশ্লীলতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এঁদের রচনায় আছে, কিন্তু যে অশ্লীলতা নগ্নতামাত্র, তাকে ফুটিয়ে তুলে জনসাধারণের চিত্তকে সঙ্কুচিত করে স্ব-খ্যাতি প্রচারের চেষ্টা এঁরা করেন নি। বিদ্রূপাত্মক রচনার অভাব এ সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ফেরেঙ্ক মোলনারের কয়েকটা গল্প ছাড়া এদিক দিয়ে সত্যিকারের রসসৃষ্টি করতে আর কেউ পারেন নি—সুতরাং মনে হয় হিউমারের দিক থেকে এ দেশীয় সাহিত্য এখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গীর সারল্য আর স্পষ্টতা, বাহুল্য-বর্জ্জিত চরিত্র-সৃষ্টি এ সাহিত্যের একটা অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য।—সবার চেয়ে বড় কথা, ফরাসী ও রুষ সাহিত্য হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে এই আধুনিকতার সর্ব্বপ্রথম স্রষ্টা ক্যারোলী কিসফালুদীর কথা আগে বলেছি। ইনি হাঙ্গেরীয় গল্প-সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম বৈশিষ্ট্যশালী স্রষ্টা। নাট্যকার হিসাবেই ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ। কয়েকটা ছোট গল্প যা তিনি লিখেছেন, সমালোচকদের দিক থেকে সেগুলি তাঁর নাটকগুলির চেয়েও বেশী মূল্যবান্‌। সম-সাময়িক প্রভাবকে অতিক্রম করে তিনি যে ক'টী গল্প লেখেন সেগুলি আলোচনা সম্পর্কে সমালোচকেরা বলেছেন—'of a dreamy yet light-hearted disposition, yet was able to impart to his stories an air of actuality which makes them seem as if they were written for the present generation'—কাল্পনিক হাল্কা সাহিত্য সৃষ্টি করলেও, এঁর গল্পগুলির মধ্যে এমনি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা অষ্টাদশ শতাব্দীর নয়, অতি আধুনিক বিংশ শতাব্দীর উপযোগী করেই যেন লেখা।—এইখানেই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা। তাঁর রচনার এই অসাধারণত্ব ও নব্যতার আভাস তাঁকে আধুনিক হাঙ্গেরিয়ান গল্প সাহিত্যের জনক বলে স্বীকার করেছে। ছোট গল্প লিখ্‌তে হলে যে গুণক'টি প্রয়োজন তার সব ক'টাই এঁর গল্পের

মধ্যে আছে, তা সত্ত্বেও এম্‌নি সজীবতার একটা স্পন্দন আছে যা' ছোট গল্পের বাঁধা-ধরা রীতিনীতির মধ্যে বড় একটা চোখেই পড়ে না।—এই জন্যই এঁর সৃষ্টি সর্ব্বজন আদৃত। এঁর সৃষ্টির মধ্যে বোহেমিয়ান অনুভূতিই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।—ইনি নিজেও ছিলেন ছন্নছাড়া ভবঘুরে। বিয়াল্লিশ বছর জীবনের মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের যে উন্নতি ইনি করেন, তার মূল্য, তার প্রাপ্য সম্মান জীবিতাবস্থায় ইনি বিশেষ কিছু পাননি। সাধারণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই ভবঘুরের মত এঁর জীবনটা কেটে যায় অনাদরের মধ্য দিয়েই। এঁর বিখ্যাত গল্প—"অদৃশ্য ক্ষত" বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ আদৃত। একশো বছর পূর্ব্বেও এমন গল্প সৃষ্টি করায় এঁর অসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন সমালোচকদের দৃষ্টিতে পড়ে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ইনি বিশ্বসাহিত্যের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

উপন্যাসলেখক হিসাবে হাঙ্গেরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন মরাশ জোকাই। এঁর উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রের বাহুল্য এত বেশী যে, সমালোচকেরা বলেন—এঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি যদি সজীব হয়ে রাজপথের উপর এসে দাঁড়ায় তা হ'লে সেই রাজপথে একমাইলের চেয়েও বেশী ভীড় জমে উঠবে—"If all the persons whom he has called to life in his novels were to appear, the multitude would line the streets for more than a mile."—এই কথাটা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন অনেক, চরিত্র সৃষ্টিও করেছেন অগণ্য। তবু প্রত্যেকখানি উপন্যাসকে তিনি সত্যিকারের শিল্পীর মত রূপ দিয়েছেন। এই খানেই তাঁর সৃষ্টির প্রতিভা। ছোট গল্পও তিনি লিখেছেন বহু। জীবন সম্পর্কে এঁর ছিল সূচীভেদ্য পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি কিন্তু তার মধ্যে দর্শনের গাম্ভীর্য্য ছিল না। বর্ণনাভঙ্গীর চাতুর্য্যে ইনি হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে অদ্বিতীয়। সাধারণ দৃষ্টিতে মানবচরিত্রকে যেমন ভাবে চোখে পড়ে, সেই চিত্রই তিনি প্রতিবিম্বিত করেছেন, তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে সহজ সারল্যের সহিত। জটিল মনস্তত্ত্ব দিয়ে পাঠক-চিত্তকে ইনি বিরক্ত করে তোলেন নি কোথাও—কিন্তু তাই বলে তাঁর গল্প অসম্পূর্ণও থাকে নি কোথাও। তাঁর বিখ্যাত বই "শান্তি এবং সমরের চিত্র" বিশ্বসাহিত্যের সমরসম্বন্ধীয় অন্যতম আদৃত বই। মানবচিত্তের তীব্র অনুভূতিগুলোকে কত সহজ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে, কত সরল ভাষায় পাঠক চিত্তে প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে—এ সম্বন্ধে এই বইখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আশী বছর জীবনের মধ্যে ইনি বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে লিপ্ত ছিলেন—সাধারণ লেখকদের মত অলস ভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে ইনি পারেন নি। প্রথম জীবনে ছিলেন রাজনীতিক, তারপর সংবাদ-পত্রসেবী, শেষে হন সম্পাদক। উনিশ-শো-চার খৃষ্টাব্দের এক বসন্ত-বিমোহিত জ্যোৎস্না-রাত্রিতে ইনি ধরিত্রীর বুক থেকে বিদায় নেন্।

তারপর কাল্‌ম্যান্ মিক্‌স্‌যাথ্—ইনি সত্যিকারের স্বদেশ-প্রেমিক। লেখক হিসাবে প্রতীচ্যে এঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। শুধু হাঙ্গারী কেন,—সারা য়ুরোপ এঁর রচনায় মুগ্ধ—এঁর সুখ্যাতিতে মুখর হয়ে ছিল একদিন। এঁর মনে দেশপ্রেমের স্থান ছিল সবার উপরে, স্বদেশের স্বাধীনতাই ছিল এঁর জীবনের চরম কাম্য—এ সম্বন্ধে আজীবন ইনি চেষ্টাও করেছিলেন আপ্রাণ ভাবে। এই জন্যই অন্যান্য হাঙ্গেরীয় লেখকদের মত তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ঘটনাসংস্থাপন তিনি কখনও কোন বৈদেশিক স্থানে করেন নি। হাঙ্গেরীয়ান বল্‌তে যাদের বুঝায় সেই সাধারণ দরিদ্র পরিবারকে কেন্দ্র করেই এঁর চরিত্রসৃষ্টি। শ্রামককে শোষণ করে, পীড়ন করে যে ধনিক সম্প্রদায় আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠ্‌ছে। তাদেরকে নায়ক-নায়িকার রূপে ফুটিয়ে তুল্‌তে ইনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌তেন। এঁর গল্পগুলি আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের গৌরবের কথা। প্রাণের দরদ দিয়ে স্বদেশের 'জনসাধারণের এমন ছবি আর কেউ হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এঁর রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে এম্‌নি বিদ্রুপাত্মক ইঙ্গিতের আভাস ইনি দেন, যাতে হাসির বদলে পাঠকের চোখ বেদনায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠবে—এই খানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। এঁর রচনায় হাঙ্গেরীয়ান্‌রা গর্ব্বিত। কেন না এঁর প্রত্যেকটী রচনার মধ্যে তারা নিজেদেরকেই খুঁজে পায়—চিন্‌তে শেখে। চোয়াত্তর বছর বয়সে উনিশ-শো-বাইশ খৃষ্টাব্দে এই দেশপ্রেমিক

স্বদেশের দুঃখ-কষ্ট, পরাধীনতাকে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে বিস্মৃত হন।

আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের জীবিত লেখকগণের মধ্যে ফেরেঙ্ক্‌ মোল্‌ন্যার হচ্ছেন অন্যতম। সমসাময়িকগণকে ইনি এম্‌নি প্রভাবান্বিত করে তুলেছেন যে, তাদের সৃষ্টির মধ্যে অল্পাধিক এঁকেই আমরা দেখ্‌তে পাই। আঠারো-শো-আটাত্তর খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের এক কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় এক বিত্তশালী ইহুদী বণিকের ঘরে ধরণীর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইনি সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হন। প্রচুর অর্থ এঁকে বিলাসী শ্রমাতুর করে গড়ে' তুলতে পারেনি। বাল্য থেকেই পড়াশুনার দিকেই ছিল এঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। এঁর পিতাও সেদিকে একে বাধা দেননি, ফলে জেনেভা ও বুডাপেষ্ট্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। এর আগেই ইনি সাহিত্যসেবী হয়ে পড়েছেন, আঠারো বছর বয়স থেকেই। প্রথমে নাটক লিখ্‌তে সুরু করেন—এই নাটকগুলিই তাঁকে যশের শীর্ষে তুলে দেয়; কিন্তু গল্প ও উপন্যাসও বড় কম লেখেন্‌নি। এঁর রচনার মধ্যে চোখে পড়ে মানব-জীবনের প্রতিটী ঘাতপ্রতিঘাতের উপর সমালোচকের কঠোর ভ্রূভঙ্গী—অভিনব দর্শনবাদ দিয়ে এই দুনিয়াটাকে যেন বিচার করতে ইনি চেষ্টা করছেন। সকলের উপরে হচ্ছে এঁর তিক্ততা—জীবনের প্রতিটী পরিমাণু তার কারুণ্য কোমলতা—সব কিছু সত্ত্বেও যেন অতিরিক্ত তিক্ত হয়ে উঠেছে, তাই তার প্রতিটী অনুভূতিকে ইনি বিদ্রূপ করে চলেছেন দার্শনিকের মত। এই কঠোরতার জন্য বিশ্বসাহিত্যে এঁর গল্পের বিশেষ আদর না থাকলেও, হাঙ্গেরীয় সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করার দিক থেকে এঁর বিশেষ মূল্য আছে।

এঁর পরবর্ত্তী লেখকেরা এখনও বিশ্বসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করে উঠ্‌তে পারেননি বলেই এ প্রবন্ধে তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করবার সুবিধা হোল না।

গান

ভৈরবী—গজল

নজ্‌রুল ইস্‌লাম

এ কি সুরে তুমি গান শুনালে
ভিন্‌দেশী পাখী।
এ যে সুর নহে মদির সুরা;
রে সুরের সাকী॥
বসি' মোর জানালাপাশে
কেন বুক-ভরা নিরাশে
যাও ঘুম ভাঙায়ে নিতি
সকরুণ সুরে ডাকি॥
তোর ও-সুরে কাঁদ্‌ছে উষা অস্ত চাঁদের গলা ধ'রে,
ভোর গগনের কপোল বেয়ে শিশির-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে!
আমি রইতে নারি ঘরে
আমার প্রাণ কেমন করে!
আমার মন লাগেনা কাজে
আর জলে ভরে আঁখি॥

সাহিত্যিক যশ

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্যিকের জীবদ্দশার যশটা খাঁটী জিনিস নহে—উহার মধ্যে অনেক ভেজাল থাকে। যাহা প্রকৃত প্রাপ্য, তাব চেয়ে অল্প নয়, তার চেয়ে বেশীই দেখা যায়। কাজেই লেখকের জীবদ্দশার যশকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—খাঁটী মাল খুব বেশী নাই। আবার কোন কোন দুর্ভাগ্যের যশ মেঘের আড়ালে চাঁদের মত ম্লান থেকে যায়—মৃত্যুর পর মেঘ সরে গেলে যশের খাঁটী সত্তা বেরিয়ে পড়ে।

লেখক দরিদ্র হলে তার লেখার প্রকাশ, প্রচার, আলোচনা, সমালোচনা কোনটাই ভাল রূপ হয় না—জনসমাজে তার লেখাকে পরিচিত করবার লোকেরও যেমন অভাব, প্রচার করবার সুযোগ সুবিধাও তেমনি অল্প। পক্ষান্তরে ধনী লেখকের প্রত্যেক লেখাটির প্রচারের এবং আদর করবার লোকের সংখ্যা খুব বেশী এবং যত রকমে তার জন্য ঢক্কানাদ সম্ভব তার আর কিছুই বাকী থাকে না। ফলে তার যা' প্রাপ্য তার চেয়ে ঢের বেশী সে পেয়ে যায়। মৃত্যুর পর কিছুদিন ধনীর বংশধরের তুষ্টির জন্য জয় জয়কার চলতে থাকে। তারপর, রচনাবিচারে পাঠক সমাজ আর লেখকের আঙ্গুলে আঙটী ছিল কি না ছিল, সোনার কলমে লেখা কি খাগের কলমে লেখা, তার কথা আদৌ ভাবে না। প্রকৃত গুণাগুণের পরখ তখন হ'তে থাকে। তবে এক্ষেত্রেও দরিদ্র্যের ষোল আনা সুযোগ লাভ ঘটে না—কারণ দরিদ্রের লেখা ভালো হলেও পরের যুগ পর্য্যন্ত পৌঁছে কিনা সন্দেহ। লেখা ছাপা হয়ে দেশময় ছড়িয়ে না পড়লে পরের যুগ দরিদ্রের খোঁজই হয়ত পাবে না।

ইহাই সাধারণ নিয়ম—তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন কোন কোন দরিদ্র লেখক দরিদ্র বলেই সুধী জনের সহানুভূতি লাভ করতে পারেন। দেশময় লেখা রাষ্ট্র না হলেও সুধী-সংসদে তার লেখা পরবর্ত্তী যুগের জন্য টিকে যেতে পারে। ধনীরও জীবদ্দশায় বিপদ আছে। ধনী ব্যক্তি ভাল লিখ্‌লে অনেক লোক ধনীর নিজের লেখা ব'লে বিশ্বাস করতে চায় না। বলে অন্যে লিখে দিয়েছে, অমুক আবার পরিশ্রম ক'রে লিখ্‌তে গিয়েছে! ধনী যদি অন্য নানা প্রকারে নানা বিষয়ে ভাবুকতা ও বিজ্ঞাবত্তা না দেখায়, তবে তাব লেখাকে অন্যের লেখা বলে লোকে স্বভাবতই ভেবে থাকে। মৃত্যুর পর এ অপবাদটা ক্রমে কেটে যায়।

লেখকের চরিত্রের উপরও তার যশ অযশ অনেক নির্ভর করে। চরিত্রহীন লোকের লেখা যত ভালোই হোক, জীবদ্দশায় তা' তার প্রকৃত যশোমূল্য পায় না। দাম্ভিক ঈর্ষ্যাপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী, কটুভাষী, পরনিন্দক, পরপীড়ক ব্যক্তির লেখা সহজে যশোলাভ করতে পারে না। মৃত্যুর পর তার যশোবিকাশে চরিত্র আর বাধা দেয় না। লোকে জীবিত লোকের লেখাকে তার জীবন হতে, চরিত্র হতে পৃথক ক'রে বিচার করতে পারে না। পক্ষান্তরে সচ্চরিত্র সুশীল, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, অমায়িক, বন্ধুবৎসল পরোপকারী লোকের লেখা সহজেই অতিরিক্ত যশ লাভ করে। মানুষ ভালো ব'লে তার লেখাও ভাল এ ধারণা মানুষের জীবদ্দশায় পাঠক-সমাজে বেশ দৃঢ় হয়ে যায়। পরবর্ত্তী যুগে মৃত্যুর পর চরিত্রের মাধুর্য্য যশোরক্ষায় কোন সহায়তা করে না। শোভন-চরিত্র লোকের লেখা যদি খুব ভালও হয় তবু তা তার যোগ্য যশ হতে ঢের বেশী ভাগ্যে ঘটে যায়। সে যশও খাঁটী নয়। দু' রকমের উদাহরণই বঙ্গ সাহিত্যে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীও জীবদ্দশায় যশোবৃদ্ধির সহায়ক। ডিগ্রীটা একটা চাপরাশ। চাপরাশ তাহাকে সহজে পরিচিত করে। এত বড় ডিগ্রী যার সে খুব পণ্ডিত, তার লেখাও নিশ্চয়ই খুব ভালো—একথা লোকে পড়েও বলে, না পড়েও বলে। ডিগ্রী আছে ব'লে তার লেখা আগ্রহ করেও লোকে পড়ে। সেজন্য কোন কোন সাময়িক পত্র ডিগ্রীধারীর ডিগ্রীগুলি নামের শেষে নিঃশেষ করে যোগ ক'রে দেয়, আবার ২।৪ টী মনগড়া উপাধি আরো বসিয়ে দেয়। যার নেই, তার নামের শেষে ২।৪টা সংস্কৃত উপাধিও বসিয়ে দেয়। ডিগ্রী যশোলাভের সহায়ক। যার ডিগ্রী

নেই তার ভালো লেখারও অনেক সময় পাঠক জোটে না। যদি বা পাঠক জোটে, তবে তারা ডিগ্রীহীন লোকের লেখাকে রসগর্ভ বলে মেনে নিলেও কিছুতেই জ্ঞানগর্ভ বলতে রাজী হয় না। যদি কিছু উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় ধরাই পড়ে তবু তা কারও চুরি বলে সন্দেহ করা হয়। মৃত্যুর পর রচনাবিচারে ডিগ্রীর কথা উঠে না। তখন খাঁটী ও মেকী ধরা পড়ে যায়। উচ্চ ডিগ্রীধারীর লেখাকে খারাপ প্রমাণ করা যেমন শক্ত ডিগ্রীহীনের লেখা ভাল প্রমাণ করাও তেমনি শক্ত।

ধনী সাহিত্যিকের সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল—উচ্চ পদ-মর্য্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যিক সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। যশোলাভে ধনীর যে সুবিধা এদেরো সেই সুবিধা। এরা যে দয়া ক'রে লিখে বঙ্গ ভাষাকে ধন্য করছেন এটাই একটা গৌরবের কথা। পক্ষান্তরে সামান্য ইস্কুল মাষ্টার বা সামান্য কেরাণীর কাজই ত' কলম পেষা। তার লেখার আর বৈচিত্র্য কি ?

নিম্ন পদের প্রতি লোকের যে অবজ্ঞা সে অবজ্ঞাকে ঠেলে ফেলে তার প্রচণ্ড সাধনা কিছুতেই যশ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তার লেখা শুধু অবজ্ঞার জিনিস নহে, উপহাসেরো জিনিস। যার পদমর্য্যাদা নাই তার আবার সখ কেন ? এ যে রীতিমত পাগলামী বা ছেলেমানুষী। মৃত্যুর পর পদমর্য্যাদা রচনাবিচারে কোন সহায়তা করে না। দরিদ্র বৃত্তিও কোন বাধা দেয় না।

বংশমর্য্যাদাও অনেক সময় যশের সহায়ক। বড় ঘরে জন্মালে আত্মীয় বন্ধুর জোরটা খুবই থাকে। যশঃপ্রচারের লোকের অভাব হয় না। নামজাদা ঘরে জন্মালে কতকটা প্রসিদ্ধি নিয়েই সে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। জলে জল মেশে। মূলধন সুদে বাড়ে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পুত্র অল্প চেষ্টাতেই যশস্বী হতে পারেন ; পিতার বিষয়সম্পত্তির মত অন্যান্য গুণ ও সাহিত্যরচনার ক্ষমতাও সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ব'লে ভ্রান্ত ধারণা হয়।

বন্ধুবলও মস্ত একটা বল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কারো বন্ধুসংখ্যা বেশী থাকলে তার বন্ধুরা নানাভাবে তার যশ প্রচারের জন্য চেষ্টা করে, সমালোচনা করায়, নানা স্থলে নাম ক'রে বেড়ায়। কোমর বেঁধে নিন্দুকের সঙ্গে ঝগড়া করে। সুদৃশ্য ক'রে বই ছাপবার ব্যবস্থা করে দেয়। প্রকাশক জুটিয়ে দেয়। লেখক পাঠকের মধ্যে দৌত্য করে।

বড় মাসিক পত্রের সংসর্গ একটা যশোবৃদ্ধির উপায়। সম্পাদক হলে ত' কথাই নাই। উপ-সম্পাদক বা প্রধান লেখক হয়ে জুটতে পারলে তার যতটুকু শক্তি আছে তা মাসিক পত্রের সাহায্যে নিঃশেষ ভাবেই জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছায়। বড় কাগজ আরো নানা ভাবে যশ প্রচারের সাহায্য করে। ভালো প্রকাশক জুটলেও অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি লেখকেরও যশ ছড়িয়ে পড়ে। শক্তিমানের যশ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বড় প্রকাশক লেখকের লেখার সচিত্র রাজ সংস্করণ ক'রে বার করতে পারে। লোভনীয় ক'রে বইএর বাজারে শোভা বাড়িয়ে দিতে পারে। বইএর ক্রেতার সংখ্যা তাতে বাড়ে। চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশকে লেখকের নামাবলী পরিয়ে দিতে পারে। সুদৃশ্য রাজ সংস্করণের বই পেলে অনেকেই আগ্রহে কেনে—লাইব্রেরীতে রেখে দেয়, উপহার দেয়, শ্রদ্ধাসিক্ত মন নিয়ে পড়ে। সমালোচকরা যত্ন ক'রে খাতির ক'রে ভয়ে ভয়ে বিস্তৃত সমালোচনা করে। বই দামে ও দমে ভারী হলে সম্পাদক কাগজের অমূল্য জায়গা ছেড়ে দিতে আপত্তি করে না। আর ভালো করে ছাপা না হলে ভালো লেখাও চাপা পড়ে। কেউ কেনে না, ছোঁয় না, বিনা পয়সায় দিলেও পড়ে না, সহজেই হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে গেলে খোঁজও করে না, কেউ নিয়ে গেলে ফেরত নিতে মনেও রাখে না। উপহার দিলে প্রাপ্তিস্বীকারও করে না, ধন্যবাদও দেয় না, যার নামে উৎসর্গ করা হয়, সেও একটু প্রসন্ন দৃষ্টিতে চায় না। সমালোচক সমালোচনা করতে চায় না, করলেও প'ড়ে করে না, পড়লেও ভাল করে সমালোচনা করে না, বিস্তৃত সমালোচনার যোগ্যও মনে করে না, সম্পাদকও বেশী জায়গা দিতে চায় না। বারবার তাগিদ দিয়েও সমালোচনা আদায় করা যায় না। পুনঃ পুনঃ তাগিদে বিরক্ত করলে আবার ফল আরো খারাপ হয়। বঙ্গ সাহিত্যে অনেক ভালো বই যশোলাভ করে নাই, শুধু অভিসারিকার বেশে তারা বেরোয়নি ব'লে। সতীলক্ষ্মীর শাঁখা সিঁদুরের সম্মান সাহিত্যক্ষেত্রে নাই, ভালো করে ছাপা সম্ভব হয় নাই ব'লে অনেক ভালো লেখা প্রকাশই হয় নি।

শেষ-বিদায়ের দিনে

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটি বুল্‌বুল্ পেয়েছিলাম।—বুল্‌বুল্ পাখী।

পেয়েছিলাম অনেক দুঃখে। পেয়েছিলাম বুকের রক্ত পান ক'রে।

কিন্তু হায়, অকস্মাৎ এক নিঠুর বৈশাখী ঝঞ্ঝা তাকে হত্যা ক'রে গেল।

যাবার ইচ্ছা থাকে না, তবু যেতে হয়।

যেতে হ'লো—অতীব প্রিয় তার সেই রক্তবর্ণ কুসুমটিকে ছেড়ে,—বুল্‌বুল্‌কে আমার যেতে হলো চিরদিনের মত।

যাবার সময় তাকে দেখেছিলাম।

দেখেছিলাম—দেহপিঞ্জর হ'তে মুক্ত আত্মা কেমন ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাখা ঝটপট্ ক'রে বিধাতার উদ্দেশ্যে করুণ মিনতি জানিয়েছিল মাত্র একটিবার,—তারপর আর সময় হ'লো না।

অসহ্য যন্ত্রণার কাতরতায় নীরব নিবেদন তার অভিশাপ হ'য়ে উঠলো।. বিধাতার উদ্দেশে তিক্ত অভিশাপ বর্ষণ ক'রে বুল্‌বুল্ পাখীটি আমার ম'রে গেল।

শুকপাখীর মন সুখচিন্তায় সুখী ছিল, অকস্মাৎ মৃত্যুর ঝড় এসে তাকে নিয়ে গেল। আশার ছবি আর সুখের স্বপ্ন তার কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল কে জানে!

আমার চক্ষের মণি ছিল সে বুল্‌বুল্। বুল্‌বুলের মৃত্যুতে অত্যুজ্জ্বল সে মণি আমার নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

কিন্তু তোমার মনে থাকে যেন বুল্‌বুল্—তুমি চলে গেছ অতি সহজে, অথচ তোমার অদর্শনে আমার বেঁচে থাকা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন।

আমার প্রাণের বন্ধু চলে গেছে ভাই উষ্ট্রচালক, শোনো, শোনো। সঙ্গিহীন হয়ে আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি।—ভগবানের দোহাই, আমায় সাহায্য কর বন্ধু! জীবনের চরম দুঃখে ম্রিয়মাণ, পথশ্রমে ক্লান্ত এই অভাগা পথিকের যাহোক্ একটা পথ ক'রে দাও। একটি পাখীর বিরহে আমি কাতর হয়ে পড়েছি।—জগতের অতি তুচ্ছ একটি পাখী।

আমার চোখের অশ্রুকে অনাদর কোরো না বন্ধু, অশ্রুর মত সান্ত্বনার বস্তু দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

হায়, হায়! চন্দ্র সূর্য্য তাকে আর দেখতে পাবে না। চাঁদের মত মুখ শেষে গোরের মাটিতে মাটি হয়ে গেল।

শিরে করাঘাত আর কেউ ত' করবে না এর জন্যে,—হাফেজ্ করবে শুধু!—একটি পাখীর মৃত্যুতে সে আজ শক্তি-হারা।

কি করবে বন্ধু, কালের খেলা তাকে আজ বিহ্বল ক'রে ফেলেছে। *

* —খাজা হাফেজ্ তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর এই গজল্ লিখিয়াছিলেন
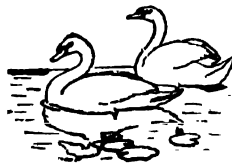
ক্ষতিপূরণ-সমস্যা

শ্রীকুলেন্দ্রচন্দ্র পাল

জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণ-সমস্যা আজ ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের উপর যে কেবল জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎই নির্ভর করিতেছে তা নয় —ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফরাসী প্রভৃতি জার্ম্মানীর পাওনাদারদের স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত। তা ছাড়া ক্ষতিপূরণ ও সমরঋণের বিপুল ভার পৃথিবীর আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট ও ব্যবসায়-মন্দার জন্য তাহা বিশেষ ভাবে দায়ী। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুন্নতি অসম্ভব।

কিন্তু এ সমস্যা কিছু মাত্র আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভার-সেলিসের সন্ধি-পত্রে (১৯১৯খৃঃ) যখন যুদ্ধের জন্য জার্ম্মানীকে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার স্কন্ধে মিত্র-শক্তিদের সমস্ত ক্ষতির ভার চাপাইয়া দেওয়া হইল, তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের এই সমস্যা দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিজেতাদের তখন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার মত মনের অবস্থা নয়। খাদ্যদ্রব্যের আমদানী অসম্ভব করিয়া দিয়া, (food blockade) অনাহারের তীব্র পীড়নের যে অমানুষিক উপায়ে এই অন্যায় সন্ধিপত্রে জার্ম্মানীর সম্মতি গ্রহণ করা হইল ইতিহাসে তাহা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। মিত্রশক্তিগণ যে প্রচুর সংখ্যায় তাহাদের দাবী উপস্থিত করিলেন, গণিতের কোন পুস্তকে তার স্থান নাই। প্রথমেই অধিকৃত সমস্ত জার্ম্মান সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইল—তাহার কোন্‌টি ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোন্‌টি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তা পর্য্যন্ত বিচার করা হইল না। অবশেষে সমস্যা দেখা দিল এত বিরাট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে গিয়া। কারণ বিজেতাদের বাড়াবাড়ির ফলে জার্ম্মানী তখন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল ক্ষতিপূরণ কমিশন জার্ম্মানীর মোট দেয় (১৩২,০০০ কোটি মার্ক অর্থাৎ প্রায় ৬৬০ কোটি পাউণ্ড) নির্দ্দিষ্ট করেন। তার কিছুদিন পর লণ্ডনে মিত্রশক্তিদের এক সভায় এ টাকা বৎসরে কি পরিমাণে আদায় করিতে হইবে তাহা স্থির হয়। কিন্তু বৎসর যাইতে না যাইতেই জার্ম্মানীর পক্ষে সে দাবী মিটান অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ফরাসী ও বেলজিয়াম জার্ম্মানীর রুঢ় (Ruhr) প্রদেশ দখল করিয়া লয়। জার্ম্মানী এ অধিকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি (passive resistance) অবলম্বন করিল এবং তার কিছুদিন পরেই জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়া পড়িল ও মার্কের মূল্য কমিতে কমিতে প্রায় শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্পষ্টই বুঝা গেল, ক্ষতিপূরণ পাইতে হইলে প্রথমে জার্ম্মানীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তখন জার্ম্মানীর আয়-ব্যয়ের সমতা ও মুদ্রার স্থায়িত্ববিধানের নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জেনারেল ডয়েসের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠিত হইল (নভেম্বর ১৯২৩)। তাঁহারা ক্ষতিপূরণের জন্য জার্ম্মানীর মোট দেয় কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সাময়িক একটি (পাঁচ বৎসরের) ব্যবস্থা অনুসারে তাহাকে কি দিতে হইবে তাহাই স্থির করিলেন এবং সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ ও প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিলেন। তা ছাড়া এই পুনর্গঠনের সময়ে সে টাকা দিতে গিয়া যাহাতে জার্ম্মান বাজেট বিপন্ন হইয়া না পড়ে সে জন্য তাহাকে বিদেশ হইতে ঋণ-প্রদানেরও বন্দোবস্ত করা হইল। রেলওয়ে ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল মর্টগেজ বণ্ড (Railway and Industrial mortgage bonds) ও জার্ম্মান রাজস্বের কতকগুলি বিভাগ ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Reichsbank) ও ষ্টেট রেলওয়ে সমূহ পরিচালনের জন্য বিদেশী কমিশনার নিযুক্ত হইল।

এই ব্যবস্থা অনুসারে জার্ম্মানী তাহার বাৎসরিক কিস্তি ঠিক মতেই দিয়া আসিল বটে কিন্তু ইহার কতকগুলি সর্ত্ত-সম্বন্ধে সে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অসন্তোষের প্রধান কারণ তাহার আর্থিক জীবনের উৎসমুখে বিদেশীর আধিপত্য। তা ছাড়া এ ব্যবস্থায় তাহাকে কয় বৎসর যাবৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে তাহাও স্থির হয় নাই। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের

ফেব্রুয়ারী মাসে এক কমিটী নিযুক্ত হইল এবং তার সভাপতি হইলেন মিঃ ওয়েন ইয়াং। এই কমিটি জার্ম্মানীর মোট দেয় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং যাহাতে সাধারণ আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়া এই ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চলিতে পারে তারও বন্দোবস্ত করিলেন। এ উদ্দেশ্যে যে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল তাহারই নাম Bank of International Settlements. আমেরিকার নিকট মিত্রশক্তিদের সমর-ঋণ প্রদানের ব্যবস্থার সঙ্গে মিল রাখিয়া এই স্থির হইল যে, জার্ম্মানীকে ৫৮ বৎসরে তাহার সমস্ত ক্ষতিপূরণ শোধ করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথম ৩৭ বৎসের জন্য তাহার বাৎসরিক দেয় গড়ে ১৯৯ কোটি মার্কের কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড। বাকি ২১ বৎসরে সে মিত্রশক্তিদের নিকট আমেরিকার মোট প্রাপ্যের (বৎসরে প্রায় ৮ কোটি পাউণ্ড) জন্য দায়ী থাকিল। জার্ম্মানীর বাৎসরিক দেয় দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ সর্ত্তহীন (unconditional) অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায়ই অবশ্য দেয়; অপর ভাগ সর্ত্তযুক্ত (conditional) অর্থাৎ যাহা জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থগিত রাখা যাইতে পারে। এ ব্যবস্থায় মিত্রশক্তিগণ সমর ঋণের সমস্ত টাকা জার্ম্মানী হইতে পাইল এবং ফরাসীকে তদুপরি তাহার বিধ্বস্ত প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের জন্য বেশ মোটা টাকাই দেওয়া হইল। জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ-প্রদানের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে সম্বন্ধীয় কতকগুলি আইনের পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, তাহার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্ত করা হইল।

কিন্তু এরূপ বিরাট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ-প্রদান কতদূর সম্ভব ইয়াং কমিটির বিশেষজ্ঞগণ যে তা কতকটা না বুঝিয়াছিলেন তা নয়। তাই জার্ম্মানীকে এই অধিকার দেওয়া হইল যে, যদি নিজের আর্থিক জীবন বিপন্ন না করিয়া তার পক্ষে ক্ষতিপূরণ-প্রদান অসম্ভব হয় তবে সে বাৎসরিক কিস্তির সর্ত্তযুক্ত অংশের প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে। তাছাড়া ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, জার্ম্মানী ও তাহার পাওনাদারদের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্ণ বিস্তার ব্যতীত এ ব্যবস্থা কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

বলা বাহুল্য বিশেষজ্ঞদের এ আশা সফল হয় নাই; বরং নানা কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্কোচই ঘটিয়াছে এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণের এই অন্যায় ব্যবস্থাও কম দায়ী নয়। তা সত্ত্বেও যে জার্ম্মানী এতদিন ক্ষতিপূরণ দিয়া আসিয়াছে তার প্রধান কারণ তার বৈদেশিক বাণিজ্য-ঋণ। এ ঋণ জার্ম্মানীকে খুব উদার ভাবেই দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, শুধু তাহারই সাহায্যে নিঃস্ব বিধ্বস্ত জার্ম্মানীর শিল্প বাণিজ্যের পুনর্গঠন ও বিস্তারের দ্বারা তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব ছিল। তদুপরি উচ্চ সুদের লোভ তো ছিলই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে ঋণ এখন প্রায় ১৫০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। যদিও যুদ্ধের পূর্ব্বের, যুদ্ধের সময়ের ও যুদ্ধের পরের ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ঋণই মুদ্রাপ্রসারের দ্বারা শোধ করা হইয়াছিল। এ ঋণের প্রায় ৬০ কোটি পাউণ্ড অল্প মেয়াদে এবং প্রায় সেই পরিমাণ দীর্ঘ মেয়াদে লওয়া হইয়াছিল। তাছাড়া প্রায় ৩০ কোটি পাউণ্ড জার্ম্মানীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে খাটিতেছে। এই বিরাট ঋণের সুদ বৎসরে ১০ কোটি পাউণ্ডেরও উপর। কাজেই ক্ষতিপূরণ ও রাষ্ট্রগত ঋণের সুদ বাবদ জার্ম্মানীর মোট বাৎসরিক দেয় এখন প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য এত টাকা জার্ম্মানীর পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। বিদেশ হইতে সে যে টাকা ঋণ পাইয়াছিল এবং এ পর্য্যন্ত নিজে যাহা কিছু সে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে তার প্রায় সমস্তই ক্ষতিপূরণ প্রদানে ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে ব্যয়িত হইয়াছে। ফলে তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা অবশ্য খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবসায়-মন্দা ও শুল্কদ্বন্দ্বের ফলে সে ক্ষমতা কোন কাজেই লাগিতেছে না। এদিকে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ পাইতে অসুবিধা হওয়ায় কিছুদিন হইতে জার্ম্মাণী বিদেশ হইতে অত্যধিক পরিমাণে অল্প মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করিতে থাকে এবং সে টাকা দীর্ঘ-মেয়াদ ঋণের ন্যায় কার্য্যকরী মূলধন (working capital) রূপেই ব্যবহার করিতে থাকে। যেরূপেই হউক এ গুপ্ত খবর প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অল্প-মেয়াদ ঋণের পাওনাদারগণ তাহাদের টাকা ফেরৎ চাহিয়া পাঠায়। কিন্তু জার্ম্মানীর তহবিল তখন শূন্যপ্রায়। সুতরাং এই টাকা উঠাইয়া লওয়ার ফলে তাহার কার্য্যকরী মূলধন (working capital) নিঃশেষ হইয়া উৎপাদন-ক্ষমতা

লুপ্ত হইতে সুরু করে। তখন জার্ম্মানীর প্রধান পাওনাদার আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহের প্রস্তাব অনুসারে গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত অল্প-মেয়াদ ঋণের টাকা পাওনাদারগণ ফিরাইয়া না লইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা দিন দিনই অধিকতর শোচনীয় হইয়া চলিয়াছে। ব্যাপার এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এই অল্প-মেয়াদ ঋণের টাকা উঠাইয়া লইলে জার্ম্মান বাণিজ্যের অবসান হইবে এবং তখন তাহার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য করিবার কথাই থাকিবে না। রাশিয়ার মত সেও তখন সমস্ত ঋণ অস্বীকার করিতে বাধ্য হইবে এবং সে কাজের দায়িত্ব তাহার না হইয়া তাহার পাওনাদারদেরই হইবে।

ব্যাপার বুঝিতে পাওনাদারদের বিলম্ব হইল না। তাই গত জুলাই মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভারের প্রস্তাবানুসারে তখন হইতে এক বৎসরের জন্য ক্ষতিপূরণ ও সমর-ঋণ উভয়েরই কিস্তি-প্রদান স্থগিত রাখা হইল। কিন্তু তাহাতে সমস্যাকে ঠেকাইয়া রাখা হইল মাত্র। তাহার সমাধান কিছুমাত্র হইল না। এদিকে আন্তর্জাতিক আর্থিক অবস্থা দিন দিনই অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল। সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং বহু দেশ তাহার পন্থা অবলম্বন করিল। জার্ম্মানীর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল কিন্তু সে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা-বিপর্য্যয়ের কথা ভুলে নাই, তাই প্রাণপণ চেষ্টায় সে স্বর্ণমান বজায় রাখিল। তাহার আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিবার জন্য মন্ত্রী ব্রুয়েনিং যে সব জরুরী ব্যবস্থা (Emergency measures) অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিপরিপালনের দৃঢ় সঙ্কল্পই বুঝা যায়। বেতনাদি নির্দ্দয়ভাবে কমাইয়া গভর্ণমেণ্টের খরচ বহুপরিমাণে কমান হইল এবং আয় বাড়াইবার জন্য নূতন নূতন কর স্থাপন করা হইল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজেটের অবস্থা সঙ্কটাপন্নই রহিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় গত নভেম্বর মাসে ইয়াং ব্যবস্থার সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ-প্রদানে অক্ষমতা জানাইয়া তাহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের অনুরোধ করে। সম্প্রতি সে অনুসন্ধানের বিবরণী বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধান কমিটির বিশেষজ্ঞগণ জার্ম্মানীর দাবী সমর্থন করিয়া জানাইয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণের সর্ত্তযুক্ত অংশ আংশিক ভাবে দিতে গেলেও জার্ম্মানীর আর্থিক জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া তাঁহারা ইহাও জানাইয়াছেন যে, এক দেশ হইতে অন্যদেশে এত বিরাট পরিমাণে অর্থপ্রেরণের ফলে বর্ত্তমান আর্থিক বিশৃঙ্খলা জটিলতর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য সাতটি বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্ণর ও তাঁহাদের মনোনীত অপর চারিজন বিশেষজ্ঞ।

কমিটি তাঁহাদের সুদীর্ঘ রিপোর্টের প্রথমেই জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়া জানাইয়াছেন,—বেতনহ্রাস, ব্যয়সঙ্কোচ ও দুর্ব্বহ করস্থাপন সত্ত্বেও জার্ম্মানীর বাজেটের অবস্থা এখনও সঙ্কটাপন্ন। দ্বিতীয়তঃ, বহির্বাণিজ্যে জার্ম্মানীর যে লাভ হইয়াছে, তার অধিকাংশই ক্ষতিপূরণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদপ্রদানে ব্যয়িত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ জার্ম্মানীর বৈদেশিক ঋণের টাকা ফিরাইয়া লওয়াতে তাহার ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থতঃ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়েরই অনেক সঙ্কোচ ঘটিয়াছে, উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে এবং ফলে সমস্ত জাতিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর কমিটি জার্ম্মানীর বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শতকরা ৩০৲ টাকা হারে পাইকারী মূল্য হ্রাসের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যে পুনরায় মূল্য বৃদ্ধি পাইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ মূল্যের অধোগতি নিবারণ করিবার কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। ক্রেতাদের মধ্যে বহুসংখ্যকের আয় কমিয়া যাওয়ায় লাভ কম হইতেছে এবং বেকারদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। গত কয় বৎসর যাবৎ আর্থনীতিক জগৎ যে দুই পরস্পরবিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, এই প্রসঙ্গে কমিটি তাহার উল্লেখ করেন। তাহা এই যে, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় অধমর্ণ দেশ হইতে উত্তমর্ণ দেশে বহু পরিমাণে টাকা পাঠাইতে হয় অথচ সে সব দেশে মালপত্রের অবাধ গতির বাধা দিনদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অসঙ্গতি ততদিনই চলিতে পারিয়াছে, যতদিন উত্তমর্ণ দেশ হইতে অধমর্ণ দেশকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, যেমন ১৯২৪ খৃঃ

হইতে ১৯২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত। কিন্তু যখন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই ঋণ-প্রদান বন্ধ হইল তখন-ই এই অসঙ্গতি বন্ধ হইয়া গত কয়মাসের আর্থিক বিপর্য্যয় দেখা দিল।

পরিশেষে কমিটি স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, যদি জার্ম্মানী তাহার ইয়াং ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী জুলাই মাস হইতে এক বৎসরের জন্য ক্ষতিপূরণের সর্ত্তযুক্ত অংশ-প্রদানে অক্ষমতা জানায়, তবে তাহাতে কিছুমাত্র অন্যায় করা হইবে না। কমিটি আরও বলিয়াছেন, ইয়াং ব্যবস্থায় যে অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী ব্যবসায়-মন্দা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে এই অভূতপূর্ব্ব সমস্যার সহিত তাহার কিছুমাত্র তুলনা চলে না। এ অবস্থায় কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন, এ সমস্যার সমাধানের জন্য যেন একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকা হয়

এই রিপোর্টের জন্য সকলেই প্রায় প্রস্তুত ছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতেই আন্তর্জাতিক বৈঠকসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। স্থির হইল ২৫ শে জানুয়ারী লোজাঁ সহরে বৈঠক বসিবে। এ সম্বন্ধে যখন আয়োজন চলিতেছে—তখন (৯ই জানুয়ারী) জার্ম্মান মন্ত্রী ব্রুয়েনিং জানাইলেন যে, জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায়, তার পক্ষে এ বৎসর কিংবা ভবিষ্যতে কখনই সর্ত্তযুক্ত বা সর্ত্তহীন কোনরূপ ক্ষতি-পূরণ-প্রদানই সম্ভব নয়। তিনি আরও বলিলেন যে, মিত্রশক্তিগণ যেন এ সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া কোনরূপ রফা করিতে চেষ্টা না করেন। কারণ, বর্ত্তমান অবস্থায় তার কিছুমাত্র প্রকৃত সম্ভাবনা নাই।

বলা বাহুল্য জার্ম্মানমন্ত্রীর এই উক্তি সমস্যাকে জটিলতর করিয়াই তুলিয়াছে, যদিও পূর্ব্বোক্ত রিপোর্টের পর ইহাতে বিস্মিত হইবারও কিছুই নাই। ফরাসী কখনই ক্ষতিপূরণের দাবী ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, এ উক্তিতে সে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একটি প্রসিদ্ধ ফরাসী কাগজে বলা হইয়াছে যে—জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ হইতে রেহাই পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই দেউলিয়া সাজিয়াছে।……কিন্তু ইংলণ্ড ফরাসীর সহিত এ বিষয়ে একমত নয়। স্বয়ং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন যে, তিনি জার্ম্মান মন্ত্রী উক্তিতে কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই। বরং লোজাঁ বৈঠকে জার্ম্মান পক্ষ হইতে এইরূপ কিছুই যে বলা হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই মতানৈক্য স্বার্থলেশ-শূন্য নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ বৎসরে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড ও বাণিজ্য ঋণের সুদ বাবদ প্রায় সেই পরিমাণ টাকা দিতে হয়। তা ছাড়া ক্ষতিপূরণের টাকা সর্ত্তহীন ও সর্ত্তযুক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ক্ষতিপূরণের সর্ত্তহীন অংশের বেশীর ভাগই ফরাসীর প্রাপ্য। অপর দিকে বাণিজ্যঋণের প্রধান পাওনাদার আমেরিকা ও ইংলণ্ড। জার্ম্মানী বাণিজ্যঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত আছে কিন্তু সে টাকা আংশিক ভাবে দিতে গেলেও তাহার পক্ষে ক্ষতিপূরণ-প্রদান সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ অবস্থায় ইংলণ্ড শুধু বাণিজ্য-ঋণের টাকা লইয়া ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে—অবশ্য যদি আমেরিকাও তাহার প্রাপ্য সমর-ঋণের টাকা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ফরাসীর এই অল্প-মেয়াদ বাণিজ্য-ঋণের পাওনা খুব অল্পই, কাজেই সে তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সর্ত্তহীন অংশ ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। তা ছাড়া তার ভয় আছে যে, জার্ম্মানী একবার মাথা তুলিতে পারিলে গত যুদ্ধের পরের সকল অবিচার অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না। এবং ক্ষতিপূরণের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইলে, তাহার নবগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে মাথা তুলিতেও জার্ম্মানীর বেশী সময় লাগিবে না।

কিন্তু জার্ম্মানীর সবচেয়ে বড় জোর এইখানে যে, সে মরিলে একা মরিবে না, অনেককেই লইয়া মরিবে। কাজেই ফরাসী যদি জোর করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে যায়, তবে তাহাকে একাকীই জার্ম্মানীর সহিত লড়িতে হইবে—এ বিষয়ে সে ইংলণ্ডপ্রভৃতি কাহারো সাহায্যই পাইবে না বরং সকলেরই অপ্রীতিভাজন হইবে। এ অবস্থায় ফরাসীর ইচ্ছা ছিল হুভার-মেয়াদকে আরও কিছুদিন বাড়াইয়া দেওয়া। কিন্তু আমেরিকা তাহাতে রাজী নয়। সে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে যে, ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সমর-ঋণের কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। পাওনাদারদের মধ্যে এরূপ মতভেদের ফলে লোজাঁ-বৈঠক স্থগিত রহিয়াছে এবং শুনা যাইতেছে জুন মাসে সে বৈঠক বসিবে।

কিন্তু এ ব্যাপার নিয়া মিত্র শক্তিদের সম্পর্ক দিন দিনই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। শুনা যাইতেছে যে যদি জার্ম্মানী টাকা না দেয় তবে ফরাসী একা বা ইংলণ্ডের সহযোগে আমেরিকাকে সমর ঋণ দেওয়া বন্ধ করিবে। যতই অযৌক্তিক হউক এ বিষয়ে ইংলণ্ডের পূর্ণ সমর্থনই আছে। কারণ ফরাসীর ন্যায় সেও সমরঋণের বিপুল দায় হইতে মুক্তি পাইতে চায়। বিশেষতঃ ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করায় পাউণ্ডের স্বর্ণমূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে ; ফলে তাহাকে সমরঋণ বাবদ পূর্ব্বাপেক্ষা পাউণ্ড হিসাবে এখন অনেক বেশী টাকা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য আমেরিকা এ আন্দোলন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। কারণ এর অর্থ আমেরিকাকে মহাযুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে বলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমেরিকা এ আব্দার গ্রাহ্য করিবে কেন? ইংলণ্ডের প্রধান যুক্তি এই যে, আমেরিকার এই আত্মত্যাগের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে পুনরুন্নতি ঘটিবে তাহাতে পরিণামে তাহার ক্ষতির চেয়ে লাভই অধিক হইবে। তাছাড়া বর্ত্তমান আর্থিক অনটনের সময় জার্ম্মানীর নিকট হইতে তাহাদের "প্রাপ্য" টাকা না পাইলে ইংলণ্ড ও ফরাসীর পক্ষেও সমরঋণ প্রদান সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমেরিকা এই হিতোপদেশ কানেই তুলিতেছে না। সে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, ইউরোপের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ তার রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। সে বিশ্বাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে ও সামরিক ব্যয়ভার কমাইয়া দিলে তাহাদিগকে ঋণ শোধ করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না। কাজেই বিরোধ এখন জার্ম্মানীর সঙ্গে মিত্রশক্তিদের ততটা নয়, যতটা মিত্রশক্তিদের নিজেদের মধ্যে। এর ফল কি হইবে ভবিষ্যৎই বলিতে পারে, কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের এখন পর্য্যন্ত কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

আবিষ্কার

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমার মানস-নভে স্নিগ্ধ দুটি লঘু ডানা মেলি'
গ্রীবার মধুর ভঙ্গি ধরিয়াছ মরালার মতো,
দীঘির গভীর ছায়া, কী অপার স্নেহে অবনত
অর্দ্ধেক-মুদিত চোখে! বিকালের কোমল কুহেলি,
রৌদ্রের সোণার তারে, মোহিনীর তুলেছে কম্পন,—
অকারণ বেদনার সেই গান একা বসে' শোনো ;—
সন্ধ্যার প্রথম তারা ভীরু চোখ মেলেনি এখনো—
এবার জাগিবে দূরে, কবিতার রূপকামাবন।

সর্ব্বাঙ্গে অনল জ্বলে কুণ্ঠাহীন দৃঢ় ভঙ্গিমার,—
নমিত-পল্লব চোখে করুণার স্তিমিত ইসারা—
স্ফুরিত অধরে তা'র রচিলাম পুরাণো কাহিনী!—
কপোত পাণ্ডুর ছায়া নামে দূর গ্রামান্ত-সীমার
সুরভি-মূর্চ্ছিত দেহে!—শীর্ণ নীল নদীটির ধারা,
নিমীল তন্দ্রার ঘোরে, আনে কোন্ হারানো রাগিণী!

শেষ প্রশ্ন

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

১

সংস্কার ও দুর্ব্বশ হৃদয়াবেগের মধ্যে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহারই ট্র্যাজিডি শরৎ-সাহিত্যের মূল উপজীব্য। মানব-জীবনের মধ্যে একটা চরম দ্বৈধতা আছে। মানুষের বুদ্ধি তাহার জীবন-যাত্রার সুবিধার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে, তাহাই তাহার সভ্যতার ভিত্তি। ইহা লইয়াই তাহার সমাজ। নরনারীর সম্বন্ধকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বিবাহ আবিষ্কার করিয়া; পাপবুদ্ধিকে সংযত করিয়াছে—ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যে। এম্‌নি কত কি। মানুষের মতের ও মনের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে; আর এই পরিবর্ত্তনের কাহিনীই সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু একটা কথা প্রায়ই সে ভুল করিয়া বসে যে, মানব-জীবনের গোড়ার কথা এই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি নয়; ইহাদের অন্তরালে রহিয়াছে মানুষের অন্তরাত্মা তাহার আকাঙ্ক্ষা বেদনাই মানব-জীবনের চরম সত্য বাহিরের আচার অনুষ্ঠানের একমাত্র সার্থকতা হইতেছে এই অন্তরাত্মার বিকাশে সাহায্য করা ইহার অধিক মূল্য তাহাদের নাই। অনুষ্ঠানকে শুধু অনুষ্ঠান বলিয়া মানিয়া চলার মধ্যে কোন গৌরব নাই, ক্ষুদ্র আচারের মরু-বালুরাশি যেখানে বিচারের স্রোতঃপথ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, মনুষ্যজীবনের চরম দুর্ভাগ্য ত সেইখানেই। অথচ মানবের সংহত শক্তি রূপ লইয়াছে সমাজদেহে, আর সমাজ বাঁচিয়া থাকে তাহার প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। কাজেই সামাজিক আচার অনুষ্ঠানকে তুচ্ছ করিলে চলিবে না; বরং মানুষ উন্নতিলাভ করিবে তাহার বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই। পশু-সমাজের শক্তি সংহত নহে; কাজেই সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান নাই। তাহার উন্নতির পথও খুব সঙ্কীর্ণ।

এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—মানবের অন্তরাত্মার প্রধান ধর্ম্ম হইতেছে তাহার একান্ত সজীবতা। এই সজীব অবচেতন অন্তরাত্মা সতত সঞ্চরমাণ। সে কোথাও স্থির, স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকে না। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার বিবর্ত্তন হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে নতুন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে; কারণ সে স্রষ্টা। সতত পরিবর্ত্তমান অন্তরাত্মার চরম উদ্দেশ্য লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন বাঁচিয়া থাকাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, কেহ মনে করেন তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে শক্তি সঞ্চয় করা। উদ্দেশ্য লইয়া মতভেদ আছে সত্য; কিন্তু ইহা যে সতত পরিবর্ত্তনশীল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অথচ আচার অনুষ্ঠান স্থিতিশীল। তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় ধীরে ধীরে, সহস্র সহস্র বৎসরের প্রচেষ্টায়। ইব্‌সেন দেখাইয়াছেন বিবাহের সম্বন্ধ নারীর পক্ষে কত পীড়াদায়ক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ প্রমাণ করিয়াছেন উহা নরের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর। নরনারীর অন্তরাত্মা এই অনুষ্ঠানকে একান্ত করিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনে নর ও নারী উভয়েই এই বন্ধনকে শ্লথ করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মনের বিবর্ত্তন যত দ্রুত গতিতে হইয়াছে, অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন সেই তুলনায় একান্ত ধীরে ধীরে হইতেছে। যখন মনের সঙ্গে সঙ্গে মতেরও বিকাশ হয়, তখনও বাইরের আচার-অনুষ্ঠান সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। কমল বলিয়াছে—

'ইউরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেলো নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিল না আচার অনুষ্ঠানে। পুরণোর গায়ে টাট্‌কা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগলো তার পুজো, ভেতরে গেল না শেকড়, সখের ফ্যাসান গেলো দুদিনে মিলিয়ে।"

এম্‌নি সর্ব্বত্র। মানুষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-মন্দিরের ইটগুলির ধ্বংস হইতে বহুকাল লাগে। আর শুধু তাই নয়। আচার অনুষ্ঠান নির্জীব, কিন্তু মানবের সচেতন মনের উপর তাহার অনন্ত প্রভাব। বহুকাল ধরিয়া যে আচারকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে সে মিশিয়া গিয়া মানব-মনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহাই তাহার সংস্কার। বহুকালের সঞ্চিত সংস্কারের শক্তি ও সাহস এত বেশী যে, অন্তরাত্মাকে পর্য্যন্ত সে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহে। তাই মানব-মনের মধ্যে চলিতেছে এক অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব। মানবের ধর্ম্ম বুদ্ধি রূপ

নেয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে, আর এই আচার অনুষ্ঠান তাহার ছাপ রাখিয়া যায় মানব-মনের সংস্কারে। মানবের অন্তরাত্মার পরিবর্ত্তন হয় অতি দ্রুত গতিতে; কাজেই অনুষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যে সে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অথচ অনুষ্ঠানগুলির সহজে কোন পরিবর্ত্তন হয় না; আর সংস্কার অন্তরাত্মাকে বুঝাইতে থাকে যে, তাহার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি পাপ-প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করাই সংহত সমাজ-শক্তির ধর্ম্ম। বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, মানুষের সর্ব্ব প্রকার বিকাশ হইয়াছে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া; কাজেই অনুষ্ঠানের ও সংস্কারের বিরুদ্ধে অন্তরাত্মার যে বিদ্রোহ, তাহা অকল্যাণের বহ্নি। তাহাকে নির্ব্বাপিত না করিলে সংসার, সমাজ, সভ্যতা কিছুই রক্ষা পাইবে না। কিন্তু মানবের অন্তরাত্মাকে বাদ দিয়া যে আচার অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন্ সত্য নিহিত রহিয়াছে, আর তাহাতে কোন্ কল্যাণ-ই বা সাধিত হইবে?

ইহাই তো মানব ইতিহাসের শেষ প্রশ্ন। যুগে যুগে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহার আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসা হয় নাই। এই অমীমাংসিত প্রশ্ন আমাদের সভ্যতার গোড়ার কথা। সভ্যতার ইতিহাস এই দ্বন্দ্বের কাহিনী মাত্র। য়িহুদীদের কড়া আইন মানবের অন্তরাত্মাকে বাদ দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল; যিশু বলিলেন—The Kingdom of Heaven is Within. মানবের অন্তরাত্মা তাহার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পালা আরম্ভ হইল; এবার য়িহুদী আইনের স্থান অধিকার করিল রোমের ধর্ম্ম-যাজক ও তাহার বিধিনিষেধ, ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন মার্টিন লুথার। তিনি মানুষের আত্মার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি কর্ম্মকে ছোট করিয়া অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের উপর জোর দিয়াছিলেন বেশী। আবার তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াও নতুন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারও এই একই দোষ; বাহিরের আচারের নিষ্ঠা মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণাকে প্রতিহত করিতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপে স্বাধীনতার আন্দোলন নানা অনুষ্ঠানকে ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম তাহার ক্ষেত্র ছিল ধর্ম্মগত অধিকার; এই আন্দো[illegible] নাম Protestantism। তারপর কলহ হইল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লইয়া। ফরাসী বিপ্লব মানবের এই দিক্‌কার শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। এখন আন্দোলন চলিতেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য লইয়া। মানুষের অন্তরাত্মা প্রতিদিন তাহার অনুষ্ঠানের আবরণকে জীর্ণ বাসের মত ফেলিয়া নতুন আচ্ছাদন আবিষ্কার করিতে চাহিতেছে। অথচ কোন অনুষ্ঠানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কারণ সে গতিশীল অথচ অনুষ্ঠান স্থিতিশীল। প্রাণহীন দেবদেবীর শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব মানবাত্মার স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছেন; তাঁহার ধর্ম্ম ছিল সরল ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাঁহার সহজ সরল বাণীকে আশ্রয় করিয়া নানা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। প্রাচীন সংস্কার সহজে লোপ পায় না; তিনি দেবদেবীকে স্থান দেন নাই। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার মূর্ত্তিকেই পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এমনি সংঘর্ষ চলিয়াছে অনন্তকাল ব্যাপিয়া। অনুষ্ঠান ছাড়া বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয় না; আর অনুষ্ঠান মনের মধ্যে শেকড় বাঁধে সংস্কারের সাহায্যে। অথচ চিরচঞ্চল অন্তরাত্মাকে অচল অনড় সংস্কার ও অনুষ্ঠান বাঁধিয়া রাখিবে কি করিয়া? এই দ্বন্দ্বই মানব জীবনের শেষ প্রশ্ন।

সাহিত্যেও এই প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসা হয় নাই। আগেকার যুগের সাহিত্যে এই প্রশ্নটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালের সাহিত্যে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের গোড়ার কথাও হইতেছে সংস্কার ও আত্মার মধ্যে এই কঠিন সংঘর্ষ। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, কিন্তু সে তাহার মন্ত্রপড়া স্বামী নহে। তাই সে তাহাকে একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারে নাই। সে একান্ত ভাবে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার দুর্ব্বশ হৃদয়াবেগকে বাধা দিয়াছে এবং এই দুই প্রতিকূলগামী প্রবাহকে সে একই সঙ্গমে মিলিত করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহাদের জীবন মরুভূমির মত ঊষর হইয়া গিয়াছে। সাবিত্রী সতীশকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিত কিন্তু সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার হৃদয়দেবতা কাঙালের মত তাহার প্রণয় ভিক্ষা

করিয়াছে, কিন্তু সে কঠোর ভাবে তাহার একান্ত কাঙ্ক্ষিতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এখানেও সেই এক-ই বাধা। সতীশ তাহার অন্তরের প্রিয়তম; কিন্তু তাহার জীবন ত শুধু অন্তরকে লইয়াই নহে। বাহিরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তরের আবেদনের মূল্য কতটুকু! বহুকাল ধরিয়া যে সমাজবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার বিধিনিষেধের কাছে এই আবেদন টিকিবে কেন? কামার্ত্ত, পরদারলুব্ধ, নির্লজ্জ সুরেশকে অচলা ঘৃণা করিত। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ—ইহা ত মানুষের বুদ্ধির গড়া জিনিষ, তাহার অন্তরাত্মা ইহার কোন খোজই রাখে না। সুরেশ নির্লজ্জ, পাপপুণ্যের ধার ধারে না। কিন্তু অচলার হৃদয়ের যে সুগভীর তলদেশে সে আঘাত করিয়াছে, সেখানে সামাজিক লজ্জা-সঙ্কোচ ও কল্যাণবোধ বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই। সমাজের চোখে তারাদাসের কন্যা ভৈরবী ষোড়শী—৺চণ্ডীর সেবাইত। কিন্তু ষোড়শীর অন্তরালে যে অলকা সুপ্ত ছিল, সে দেব-দেবীর সেবা করে না, সে মণ্ডপকে ঘৃণা করে না, জমিদারের সঙ্গে গ্রামের পলিটিক্স আলোচনা করে না। তাহার ন্যায়-অন্যায় বোধ নাই, সে আপনাকেও চিনে না, শুধু আপনার আকাঙ্ক্ষায় আপনি স্পন্দিত হয়।

৩

শরৎচন্দ্র বহু উপন্যাসে এই সুকঠিন সমস্যার চিত্র আঁকিয়াছেন; 'শেষ প্রশ্ন'এ এই শেষ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। এই হিসাবে শেষ প্রশ্নের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার পার্থক্য সহজেই অনুমিত হইবে। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে হৃদয়ের গভীরতম আবেগের কথা লেখা হইয়াছে, মনের গোপনতম ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী, অচলা, সাবিত্রী-ইহারা তর্ক করে নাই, ধরা দিয়াছে। ষোড়শী তার্কিক বটে, কিন্তু তাহারও পরাজয় হইয়াছে নিতান্ত অলক্ষিতে। শেষ প্রশ্নে হৃদয়ের গভীরতম বেদনার চিত্র কম। শিবনাথ ও কমলের শেষ বিদায়ের ক্ষণকেও শরৎচন্দ্র যথাসাধ্য সংযত, সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কমল জীবনের চরম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে যুক্তিতর্কের সাহায্যে। এই কমল শেষ প্রশ্নের নায়িকা। কমলের মা'র রূপ ছিল, কিন্তু সংযম ছিল না। তাহার বাবা ইউরোপীয়ান-বিশেষ কোন অনুষ্ঠান মানিয়া তিনি চলিতেন না এবং আত্মার স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশে তাঁহার আস্থা ছিল। কমলের জীবনের উনিশ বছর কাটিয়াছে তাহার পিতার কাছে আসামের চা' বাগানে। ইহার 'পরে কমলের বিবাহ হইল এক আসামীয়া ক্রীশ্চানের সঙ্গে। ইহার সঙ্গে কমলের কোন নিবিড় সংশ্রব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কমলের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তাহার মধ্যে সমাজের প্রভাব খুব কম; তাহার মনের মধ্যেও কোন রকমের সংস্কার কোন গভীর ছাপ রাখিতে পারে নাই। ইউরোপীয়ান ক্রীশ্চান ও বাঙালী হিন্দু কুলটার মেয়ে, আসামীয়া ক্রীশ্চানের স্ত্রী—কোন্ সংস্কারের বশবর্ত্তীই বা সে হইবে? সে অতীত মানে না, প্রাচীন আদর্শের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই বলিলেও চলে, অন্তরাত্মার আহ্বান শুনিয়া চলা-ই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম। সে নিজেই বলিয়াছে—

"নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তাহার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেচি কোনদিন কোন কারণেই আর তাহার পরিবর্ত্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়'.........আমার দেহ মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানবো প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই সেদিন বুঝবো এর শেষ হয়েছে—এ মরেছে।"

কোন কিছুকে আঁকড়াইয়া থাকাকেই সে মিথ্যা বলিয়া মনে করে; লোকে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব ঘোষণা করে, কমল তাহার মধ্যে শুধু মিথ্যার ফাঁকা আওয়াজ দেখিতে পাইয়াছে। তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের ধারণাও অদ্ভুত। অজিতকে সে বলিয়াছে—

"আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তা'কেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি.. ...এ জীবনের সুখদুঃখের কোনটাই সত্যি নয়, অজিতবাবু, সত্যি শুধু তাহার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, সত্যি শুধু তাহার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধিও হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া।"

ইহাই যাহার মত তাহার কাছে সতীত্বের কোন মূল্য নাই; তাই তাহার মায়ের যে গর্হিত অপরাধের কথা মনে করিতে অন্য কোন সন্তান লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইত, কমলের কাছে তাহা রুচির বিকার মাত্র। শিবনাথের

রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিল, অনুষ্ঠানের দিক দিয়া তাহাকে পাকা বিবাহ বলা চলে না। বিবাহের মত একটা হইয়াছিল—শিবনাথ বলিলেন, বিবাহ হইল শৈব মতে। কিন্তু অনুষ্ঠান পাকা হইল কি কাঁচা হইল তাহা লইয়া কমলের মনে জিজ্ঞাসাই হয় নাই। কারণ হৃদয়ের যে সম্বন্ধ সত্য তাহাই যদি টুটিয়া যায়, তবে অনুষ্ঠান তাহাকে সজীব রাখিবে কিসের জোরে? যেদিন শিবনাথের সঙ্গে তাহার সমস্ত সংস্রব চুকিয়া গেল, সেদিনও সে কাহারও কাছে নালিশ করে নাই। এই সম্বন্ধ তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবনাথ ভাঙিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে বিশ্বাস-ঘাতককে ক্ষমা করিয়াছে। হৃদয়ের কোর্টের বিচার একতরফা—কাজেই কোন অভিযোগ সে আনে নাই, সে মনে করিয়াছে তাহার যা কিছু পাওনা ছিল তাহা সুদশুদ্ধ আদায় হইয়াছে। শিবনাথ তাহার চরম দুর্গতি করিলেও সে মনোরমাকে লইয়া সুখী হউক—কমল এই কামনাই করিয়াছে এবং আশুবাবু যাহাতে কোনরূপে এই বিবাহের অন্তরায় না হন, তাহাবও চেষ্টা করিয়াছে।

এই-ই ত হইল কমল—কোন প্রাচীন সংস্কার, কোন স্থায়ী আদর্শকেই সে স্বীকাব করিতে চাহে না। ইহার চারিদিকে কয়েকটি লোক জুটিল তাহারা প্রাচীন আদর্শের উপাসক ও সংস্কারের দাস। আশুবাবু, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, সতীশ, অজিত, মনোরমা, নীলিমা ইহারা সবাই সংস্কারেব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহিরেব দিক দিয়া ইহাদের জীবনের ও চরিত্রেব পার্থক্য অনেক, কিন্তু মূল আদর্শে কোন তফাৎ নাই—ইহারা সকলেই সংস্কারকে মানে, অতীতের সুখস্মৃতি পূজা করে, প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শের উপাসনা করে। ইহার মধ্যে ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয় খুব রূঢ়ভাষী; সে কমলকে low bred, ইতর, ভ্রষ্টা নারী বলিয়া গালাগালি দেয় এবং প্রাচীন ভারতের সতীত্বের আদর্শের ও হিন্দুর চিরাগত আচাব অনুষ্ঠানের জয় গান করে। আশুবাবু বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার ও ডক্টর, তাঁহার দেহ বাতগ্রস্ত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তিনি অক্ষয়ের রূঢ়তা ও অতিরিক্ত কৌতূহলকে ঘৃণা করেন, ভয় করেন, অথচ মূলতঃ অক্ষয় ও আশুবাবু একই আদর্শের অর্চনা করেন। নীলিমা বিধবা; বিপত্নীক ভগিনীপতির শূন্য গৃহের গিন্নীপনা করে বলিয়া তাহার পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার নির্মল চরিত্রে সত্যিকার কোন দাগ পড়ে নাই, বিধবার নিষ্পাপ মন শিশিরের মত নিষ্কলুষ ও শুভ্র। মনোরমা আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে, সর্ব্বপ্রকার কদাচারের প্রতি তাহার অকুণ্ঠিত ঘৃণা। তাহার বাবা শিবনাথের মত দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র মাতালকে প্রশ্রয় দিতেছেন দেখিয়া তাহার মন তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে, কমলের মুখে বাধাহীন যৌবনের লজ্জাহীন জয়গান শুনিয়া সে মনে মনে আহত হইয়াছে। তাহার ভাবী স্বামী অজিত একটি অদ্ভুত পুরুষ। সে বিলাত গিয়াছে, ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে, আবার সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, দেশ ঘুরিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনের ধ্রুবতারা অচঞ্চল রহিয়াছে—এই ধ্রুবতারা হইতেছে মনোরমার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। চার বৎসর ইহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, পত্রালাপ পর্য্যন্ত হয় নাই, কিন্তু একের হৃদয় অপরের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আগ্রায় আর যাহাদের সঙ্গে কমলের পরিচয় হইল তাহারাও এই পথের পথিক। হরেন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন ভারতের গৌরবময় আদর্শ ফিরাইয়া আনিতে চাহে, তাহার বন্ধু সতীশ আশ্রমের বড় পাণ্ডা, সতীশের বন্ধু রাজেন্দ্র শুধু ব্রহ্মচারী নহে, বিপ্লবী।

এই সব সংস্কারপন্থী ও অতীতবাদীদের সঙ্গে কমলের ঘোর তর্ক হইত। রাজেন্দ্র ছাড়া সবাই এই তর্কে যোগ দিত, আর এই তর্কের মীমাংসারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। মীমাংসা করিয়া দিল ইহাদের নিজেদের অন্তরাত্মা। যাহারা অতীতের স্মৃতি ও একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ ধরিয়াছিল তাহাদের অনেকেই পরাজিত হইল—কমলের তর্কের জোরে নহে, স্বকীয় হৃদয়ের দুর্ব্বশ প্রণয়াকাঙ্ক্ষার কাছে। বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন যে, যৌনপ্রবৃত্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ; এই আকর্ষণ ঘৃণিতের প্রতি জাগরিত হইতে পারে, জিঘাংসা প্রবৃত্তির সঙ্গে ইহা একত্র বসবাস করিতে পারে, একান্ত অপরিচয়ের বাধাকে ইহা অক্লেশে অতিক্রম করে। মনোরমা cultured মেয়ে, সর্ব্বপ্রকার নীচতার প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি নাই, শিবনাথের মত দুশ্চরিত্র মাতালের প্রতি বিদ্বেষেরও অন্ত নাই। কিন্তু যেদিন এই শিবনাথের রূপ ও গুণ তাহার

অলক্ষিতে তাহার মনে আঘাত করিল, সে দিন অতীতের সমস্ত স্মৃতি, ধর্ম্মের ও শিক্ষার সমস্ত বুলি নিঃশেষে মুছিয়া গেল, যে অজিতের জন্য সে একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া চার বৎসর অপেক্ষা করিয়াছে, সেই অজিত যখন হাতের কাছে, তখনই সে মনোরমার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল। অজিতের পক্ষেও সেই একই কথা; সাতসমুদ্র তের নদীর পরপারে মনোরমাকে সে ভালবাসিয়াছে; কিন্তু যেই কমলের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশকে স্পন্দিত করিল, অমনি কোথায় বা গেল তাহার শিক্ষা, কোথায় বা গেল তাহার একনিষ্ঠ, সাত্ত্বিক প্রেম? জেম্‌স ব্যারী তাঁহার এক নাটকে একটা অদ্ভুত দ্বীপের কথা লিখিয়াছেন। সেই দ্বীপের একটা অত্যাশ্চর্য্য সম্মোহিনী শক্তি আছে। সেই মোহিনী শক্তির প্রভাব কাহার উপরে কখন পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু একবার সেই অদৃশ্য মায়াজাল যাহার উপরে বিস্তার করিবে তাহার আর নিস্তার নাই। মুগ্ধ নর বা নারীকে পৃথিবীর সমস্ত ভুলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য লোকে যাইতে হইবেই; সন্তানের মায়া, স্বামীর প্রেম, পিতার স্নেহ কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। হৃদয়ের নিঃশব্দ আহ্বানও ঠিক এই রকমের; তাহার কাছে অতীতের স্মৃতির মূল্য নাই, শিক্ষা, ধর্ম্মবুদ্ধি বা সংস্কার তাহার কাছে অর্থহীন। কমল যাহার জন্য তর্ক করিত, তাহার প্রমাণ আসিল তাহার বিপক্ষ দল হইতে; আর যাহারা এই প্রমাণের উপকরণ সংগ্রহ করিল তাহার মধ্যে একজন তাহার স্বামীকে ছিনাইয়া লইল, আর একজন তাহার নিজের কাছেই প্রণয় ভিক্ষা জানাইল! অথচ এই ভ্রষ্ট নর ও এই ধর্ম্মপথচ্যুত রমণী—ইহারা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে যাইতেছিল।—এই-ই ত অনুষ্ঠানের সত্যতা, সনাতন আদর্শের অক্ষুণ্ণ গৌরব!

আর শুধু অজিত ও মনোরমার কথাই বা বলি কেন? বিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব যুগে যুগে কীর্ত্তিত হইয়াছে; নীলিমার জীবন এই শুভ্র, নির্ম্মল আদর্শে পরিচালিত হইয়াছে। সে দুর্নাম কিনিয়াছে, কিন্তু তাহার নিষ্পাপ মনে কলঙ্কের রেখামাত্র পড়ে নাই। অথচ আশু-বাবুর সেবা করিতে করিতে যে আকাঙ্ক্ষা তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে জাগিয়া উঠিল, আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে তাহার সংস্রব কোথায়? স্বামীর যে পুরাণ স্মৃতিকে সে এতকাল ধ্যান করিয়াছে আজ তাহা যদি বর্ম্মের মত তাহাকে রক্ষা করিতেই না পারিল, তবে সেই ধ্যানের মূল্য কতটুকু? নীলিমার জীবন হইতে কি এই কথাটাই প্রমাণিত হয় না যে, বিধবার নিষ্ফল স্মৃতিচর্চ্চা ও ব্রহ্মচর্য্য সুস্থও নয়, সবলও নয়, সম্ভবও নয়? এই ত গেল ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতার কথা। হরেন্দ্র ও সতীশ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপন করিয়াছিল; তাহাতে প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসারে ত্যাগ ও নিবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইত, কমলের ভাষায় "প্রচণ্ড আড়ম্বরে নিষ্ফল দারিদ্র্য চর্চ্চা" করা হইত। এই আশ্রম টিঁকিল না, আর ইহার একমাত্র কর্ম্মী রাজেন্দ্রকে ইহার পাণ্ডারা স্বীকার পর্য্যন্ত করিল না সে ছিল ইহার অতিথিমাত্র, পুলিশের হানার সম্ভাবনাতেই নোটিশ পাইল। আশ্রমটি কেমন করিয়া ভাঙিল তাহার বিস্তীর্ণ ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই; কিন্তু যাহা জীবনের সহজ, সরল নীতির পরিপন্থী তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জীবন-দেবতা রূপ-পিপাসু, সে ভোগবিলাসী; তাই সৌন্দর্য্য ও ভোগের পথ রুদ্ধ করিয়া অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যাইবে না। অতি সংযম শুধু বঞ্চিতের সান্ত্বনা।

আর একজন লোকও কমলের মতবাদের কাছে হার মানিয়াছিল; সে হইল স্বয়ং অক্ষয়। অক্ষয় রুচিবাগীশ Puritan, সে কমল ও শিবনাথের দুর্নীতি হইতে আগ্রা সহরকে মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। অন্য সবাই সংযম ও ভারতবর্ষের অন্যান্য আদর্শে বিশ্বাস করিত; অক্ষয় এই সব আদর্শের বিরুদ্ধ আচরণের নিঃসঙ্কোচ নিন্দা করিত। অক্ষয় অতিশয় রূঢ়ভাষী; কমলের নিন্দা করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাহাকে অপমান পর্য্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু শেষে এই অক্ষয়ও কমলের কাছে নতিস্বীকার করিয়াছে, তাহাকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহাকে চিঠি লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। তাহার এই দীন নতিস্বীকার, এই কাতর অনুরোধের কারণ কি? কমল তাহাকে কেমন করিয়া পরাজিত করিল? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কমল কাহাকেও জোর করিয়া নত করে নাই; হৃদয়ের যে বৃত্তির কথা সে সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক নরনারীর

অন্তরের মধ্যেই নিহিত আছে ; সাড়া পাইলেই সে জাগিয়া উঠে। অজিত ও মনোরমার জীবনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল এক আকস্মিক আলোড়নে ; অক্ষয়ের জীবনের পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল ধীরে ধীরে একান্ত সঙ্গোপনে আর তাহাও negative ভাবে। তাহার নিষ্ঠা মথিত করিয়া কোন বিদ্রোহী প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে নাই ; সে ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিয়াছে, গতানুগতিক আদর্শকে মানিয়া চলিয়া যে জীবন সে অতিবাহিত করিয়াছে তাহাতে গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য নাই। তাহার স্ত্রীভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া সে নিজেই বলিয়াছে, হয়ত একেই স্ত্রীভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি নিঃসঙ্গ একা। অক্ষয়ের এই একান্ত একাকিত্বের জন্য দায়ী তাহার স্ত্রী নহে ; যে আদর্শকে শিরোধার্য্য করিয়া এই দম্পতি জীবন অতিবাহিত করিয়াছে তাহার মূল হইতেছে প্রবৃত্তির নিরোধ। তাহা মানুষকে নিঃসঙ্গ করিয়া দিবেই, কারণ সেই মানুষ যে নিজেই নিজের সঙ্গী হইতে পারে না।

এমনি করিয়া প্রায় সবাই কমলের আদর্শের কাছে নতশির হইয়াছে। কিন্তু একথাও মানিতে হইবে, কমল শুধু পরাস্ত করে নাই, সে নিজেও অজ্ঞাতসারে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। সে অতীত স্মৃতির বন্ধনকে স্বীকার করে নাই, অতীত সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু শিবনাথ তাহাকে যে সুখ দিয়াছে তাহাকে সে সহজে ভুলিতে পারে নাই, শিবনাথ তাহাকে ছাড়িয়া যাইয়া যে ব্যথা দিয়াছে তাহাও তাহার মনে গভীর রেখা পাত করিয়াছে। শিবনাথকে সে অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা করিয়াছে, কিন্তু অম্লান বদনে তাহাকে বিদায় দিতে পারে নাই। তাহার মনে ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু ব্যথা ছিল। শিবনাথের সঙ্গে বা তাহার সম্পর্কে সে যখনই কোন কথা কহিয়াছে তাহার মধ্যে হতাশের ব্যথা ও প্রবঞ্চিতের অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। সে অবশ্যই বলিয়াছে যে, মুচীপাড়ায় মৃত্যুদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাহার অভিযোগের শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি ছিল না। কিন্তু তাহার আচরণ ও আলাপের মধ্যে এই ব্যথার রেশ রহিয়া গিয়াছে ; আর এই মুচীপাড়ার অভিজ্ঞতা একটা আকস্মিক ঘটনা ; ইহা যদি না আসিত, তবে এই ব্যথার স্মৃতি মুছিত কে ? মানুষের জীবনের বড় দুর্দ্দৈব এই যে অর্দ্ধ চেতন অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু সচেতন আত্মা স্মৃতির দ্বারা ভারাক্রান্ত। বহুলোকের পুঞ্জীভূত স্মৃতির নামই সংস্কার। শুধু বাঁচিয়া থাকিলেই মানুষ বাদ দিতে পারিবে,—না স্মৃতিকে, না সংস্কারকে। শিবনাথ ও শিবানীর বিবাহিত জীবনের প্রীতিতে ভরা সম্বন্ধের পরিচয় আমরা খুব কমই পাইয়াছি ; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা সতেজ ঔজ্জ্বল্য আছে। অজিতের সঙ্গে সে যে জীবন আরম্ভ করিল তাহা সুখের জীবন হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা কাতর দৈন্য আছে, যাহা পীড়াদায়ক। অতীতের স্মৃতি তাহার বর্ত্তমানের আনন্দকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজেই স্বীকার করিয়াছে,—

"শিবনাথের দেবার যা ছিল, তিনি দিয়াছেন, আমার পাবার যা ছিল, তা পেয়েছি—আনন্দের সেই ছোট ছোট ক্ষণ গুলি মনের মধ্যে আমার মণি মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে।"

এই স্মৃতির সঞ্চয়ই সংস্কারের মূল। কমল মনে করে যে, সে আক্ষেপের ও অভিযোগের ধূয়ায় আকাশ কালো করিয়া তোলে নাই। ইহা সত্য ; আকাশ কালো হয় নাই, কোর্টে বিচার হয় নাই, কিন্তু তাহার মনের আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার আর ভুল কি ? অজিতকে সে যখন গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার দেহ মনের যৌবনের সেই অপরাজেয় স্ফূর্ত্তি নাই। এই সম্পর্ককে পাকা করিতে সে রাজি হইয়াছে ; বিবাহের অনুষ্ঠান সে পালন করে নাই, বিবাহ নামটাও সে বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু বিবাহের যাহা প্রাণ আজীবন সংশ্রবের অভিলাষ ; তাহাকেই সে মানিয়া লইয়াছে। অজিতকে সে বলিয়াছে,—

"জোরে কাজ নাই। বরঞ্চ তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই......ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম—দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই যেন একদিন আমি মর্‌তে পারি।"

এ ত হইল বিবাহিতা স্ত্রীর একান্ত কাতর প্রার্থনা ! এই যে অতীতের অভিজ্ঞতার উপর ভর করিয়া ভবিষ্যতের স্বর্গ গড়া—ইহাই তো স্মৃতি ও সংস্কারের দাসত্ব ; ইহা তো শুধু চলিয়া যাওয়ার ছন্দটুকুর মাধুর্য্য নয়। এমনি করিয়াই কমল সংস্কারবাদীদের কাছে পরাস্ত হইয়াছে। শেষ প্রশ্নের মধ্যে

যে বিরাট বিরোধ রহিয়াছে ; কোন পক্ষই তাহার সমাধান করিতে পারে নাই। সংস্কারপন্থীরা ধরা দিয়াছে হৃদয়ের চঞ্চল প্রবৃত্তির কাছে ; আর যে কোন সংস্কারকেই স্বীকার করে নাই, গতিশীল মনের চঞ্চল আকাঙ্ক্ষাকেই যে সগৌরবে মানিয়া লইয়াছে, সে অতীত বাধাকে সহজে বিদায় দিতে পারে নাই, সে বর্ত্তমানকে দিয়া ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছে।

বিপ্লবী রাজেনের কাছে কমল এই প্রশ্ন তুলিয়াছিল ; সে ইহার উত্তর দিয়াছে খুব অদ্ভুত ভাবে। সে বিপ্লবী, কর্ম্মই তাহার ধ্যান ও জ্ঞান। কর্ম্মের প্রতি তাহার নিষ্ঠা এত বেশী যে কর্ম্মের মধ্যে সত্য আছে কিনা, ইহা লইয়া তর্ক করিবার মত প্রবৃত্তি বা অবকাশ তাহার নাই। কেমন করিয়া তাহার মনে হইয়াছে—এই বিপ্লব ও আত্মোৎসর্গের পথ চরম কল্যাণের পথ এবং তাহার পর সে এই আদর্শের জন্য না করিয়াছে এমন কাজ নাই ; আর কোন দিন প্রশ্ন করিয়া দেখে নাই, এই আদর্শে কোন সত্য আছে কি না। কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে একান্ত ভাবে লিপ্ত করিয়া দিয়াছে বলিয়াই হঠাৎ মনে হয়, সে বোধ হয় একান্ত ভাবে নির্লিপ্ত। দেশের অগণিত নরনারীর জন্য তাহার অপরিসীম মায়া এবং সেই গভীর টানের জোরেই সে মুচীদের অমনি করিয়া সেবা করিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের মরণ বাঁচনের সঙ্গে তাহার যেন কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের জন্য যেন তাহার কোন মায়া নাই। ইহা যে শুধু একটা ঢং তাহা নহে ; কর্ম্মের মধ্যে যে ডুবিয়া আছে, বাহিরের দৃষ্টিতে তাহাকেই একান্ত নির্লিপ্ত বলিয়া মনে হয়। সমগ্রের জন্য নিজেকে যে বিলাইয়া দিয়াছে, খণ্ডকে সে সমগ্রের অঙ্গ করিয়াই দেখে ; তাহার জন্য অতিরিক্ত কোন টান তাহার নাই। এই আত্মোৎসর্গের সার্থকতা লইয়া সে তর্ক করে না, আদর্শের সত্য লইয়া কোন প্রশ্নকেই সে গ্রাহ্য করে না। কমল এই প্রশ্ন তাহার কাছে তুলিয়াছিল ; সে উত্তর দিয়াছে—

"কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে ? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য। ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই।......কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক্, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যাবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুজনের মনের মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্য দল যুদ্ধ করে তাদের বাইরের ঐক্যটা রাজার শক্তি। হৃদয় নিয়ে তার গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।"

ইহা শক্তিমান, বিরাট কর্ম্মীর উপযুক্ত উত্তর বটে ; কিন্তু এই উত্তরে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। বহুলোকের ঐক্যের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম ; কিন্তু মানুষের মনের মধ্যেই যে দ্বৈধতা আছে, তাহার মীমাংসা হইবে কি করিয়া ? যে প্রশ্ন সব্যসাচীর মনে জাগে না, সুমিত্রার মন তাহাতে স্পন্দিত হইতে পারে, যে দ্বৈধতা রাজেনকে বিচলিত করে নাই, তাহা অজিতের থাকিতে পারে। কর্ম্মও কখনও আপনাতে আপনি সমাপ্ত হইতে পারে না ; কর্ম্ম থাকিলেই তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকিবে এবং সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া তর্কও চলিবেই ইহাকে এড়াইবার কোন পথ নাই। রাজেন্দ্র শেষ প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার মীমাংসা করিতে পারে নাই।

তবে শেষ প্রশ্নের কি কোন মীমাংসাই হইবে না ? আমাদিগকে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে এই যে, প্রাণ শক্তির অনন্ত বিবর্ত্তনের পথে মানুষ একটি step মাত্র। সৃষ্টির আদিও নাই, অন্তও নাই। Protoplasm হইতে বহুবিধ সজীব পদার্থ দেখা গিয়াছে, বহু সজীব পদার্থ লুপ্ত হইয়াছে ; এখন পর্য্যন্ত যাহারা সৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে মানুষ অবশ্য শ্রেষ্ঠ, the lord of action। কিন্তু মানুষও অসম্পূর্ণতায় ভরা। তাহার এই অসম্পূর্ণতা সে যেদিন অতিক্রম করিবে, সেইদিন তাহার শেষ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। আবার মজা হইতেছে এই যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপূর্ণতা, একই সূত্রে গাঁথা হইয়া আছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব তাহার বুদ্ধি। পশু নদী পার হয় সাঁতার কাটিয়া, কিন্তু মানুষ সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ চালাইয়া যায়, বুদ্ধির গুণে সে পাখীর মত খেচর ও মাছের মত জলচর। তাহার এই অপরিসীম শক্তির মূলে রহিয়াছে

তাহার সম্পূর্ণ সচেতন বুদ্ধি ও তাহার জ্ঞান-পিপাসা। এই অনন্ত জিজ্ঞাসা প্রাণ-শক্তির মূল উদ্দেশ্য। সে যদি শুধু শক্তি চাহিত তাহা হইলে অতিকায় megatheriumএ সৃষ্টির প্রবাহ থামিয়া যাইত, সৌন্দর্য্যই যদি তাহার কাম্য হইত তবে ময়ূরের পরে বানরের সৃষ্টি হইত না। মনে হয় প্রাণশক্তির লক্ষ্য হইতেছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সচেতন করা। সে নিজেকে একান্তভাবে জানিতে চায়, বুদ্ধি দিয়া অর্দ্ধ-চেতন আত্মাকে জাগ্রত করা তাহার চরম আকাঙ্ক্ষা। তাইত কিঞ্চিলিকা হইতে মানুষে আসিয়া বিবর্ত্তনের ধারা পৌঁছিয়াছে এবং মানুষও তাহার বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য দিয়া সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে। অথচ জীবনের প্রধান অভিশাপ হইতেছে এই যে,তাহা অজ্ঞেয়; মানব-মনের গভীরতম রহস্য রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। টমাস্ ম্যানের The Magic Mountain এ একটি লোক বলিয়াছেন, "It seemed forbidden to life that it should know itself." বিজ্ঞান বলে protoplasm হইতে cell, এবং তৎপর আস্তে আস্তে মনুষ্য-দেহের উৎপত্তি। কিন্তু কি প্রেরণায় প্রাণশক্তি এই বিবর্ত্তনের চক্রে পড়িল, কেমন করিয়া মানবের অজস্র আশা, আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইল, কে তাহার সদুত্তর দিবে। আর এই একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে,—মানুষের দেহের বয়স অনন্ত, অথচ তাহার মনটি সেদিনের জিনিস; বুড়োর কাছে নিতান্ত খোকা। দেহের কত প্রয়োজন, কত প্রবৃত্তি; তাহা সচেতন বুদ্ধি জানিবে কেমন করিয়া আর নিয়ন্ত্রিতই বা করিবে কি উপায়ে? এক পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন, "Shall a child control his grandfather?" দেহের এই প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি রহিয়াছে হৃদয়ের গভীরতম অর্দ্ধচেতন প্রদেশে; সচেতন বুদ্ধি তাহার চতুর্দ্দিকে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে মাত্র, তাহার তলদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অথচ প্রাণশক্তির লক্ষ্য হইতেছে এই যে, সমস্ত অজ্ঞেয় রহস্য তাহার কাছে সহজ ও সরল হইয়া যাইবে; ইহা যে দিন সম্ভব হইবে মানুষের প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি ও হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না, অবচেতন আকাঙ্ক্ষা সচেতন বুদ্ধির সাহায্যে সবল ও সতেজ হইবে—সেই দিন কমল শিবনাথকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিদায় দিতে পারিবে, অজিতকে পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিবে; সেই দিন শিবনাথের শঠতা ও তাহার রূপ গুণসম্বন্ধে মনোরমার মনে কোন দ্বৈধতা থাকিবে না; সেই দিন মৃত স্বামীর স্মৃতি বিধবার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিবে না, আর যদি সেই স্মৃতিই বিধবার পক্ষে একমাত্র কামনার ধন হয়, তবে কোন নতুন প্রীতি তাহার চিত্তকে দ্বিখণ্ডিত করিবে না; সেই দিন অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না, ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও সংযমের নির্দ্দেশ একই পথে আসিবে, সেই দিন প্রাচীন সংস্কার ও বর্ত্তমান প্রবৃত্তি একই লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবে। সেই দিনই শেষ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে; তৎপূর্ব্বে কমলের তর্ক ও অক্ষয়ের যুক্তি—উভয়ই সমান ভাবে নিষ্ফল হইবে।

চেনা-অচেনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

১৬

কতদিন হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে শেষ কথা কয়েছি। এর মধ্যে যে সব ব্যাপার ঘটে গেছে, সে সব যেন রুগ্ন মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্ন। এখন মাটীর নীচে একটা ভাঙ্গা ঘরে বসে আছি। আগে এটা ছিল জার্ম্মাণ অধিকারে। এ যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় যেখানে ছিলুম, তার থেকে সাত মাইল দূরে এগিয়ে এসেছি। উঁচু একটা ঢিবির উপরে এই ঘরটা। এখান থেকে দূরের সহর আর বিস্তৃত মাঠ অবাধে চোখে পড়ে। সহরের বহু কারখানার চিমনি থেকে অবিরাম ধূমস্তম্ভ আকাশের দিকে উঠছে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড মাঠে, হাজার হাজার মানুষ যেখানে হত্যার সুযোগ খুঁজে লুকিয়ে আছে সেখানে কিছুই নড়ছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে, পৃথিবীর সে অংশটুকু আমাদের শত্রুভূমি। আকাশের কোলে বেলুনগুলো আমাদের দিকে খরদৃষ্টি হানছে। অদূরের ঐ পাহাড়গুলি একদিন তরুলতায় সুশোভিত ছিল— শ্র্যাপনেলের আঘাতে আর আগুনের তাপে ডাল পাতা পুড়ে ঝরে গেছে আর ঝোপ ঝাড় মৃত নরদেহে ভরে গেছে। এখানে আজ সব কিছুই জীবনশূন্য।

আর আমি— আমায় দেখলে সকলের হাসি আসবে। আমার সৌখীন সজ্জার শোভনতার লেশমাত্র নেই। প্রায় দিন পনের হ'ল সেগুলো একবার খুলবার অবসর পাইনি। পথের কাদা আর যত কিছু জঞ্জাল একসঙ্গে জমে তার উপর শুকিয়েছে। কামাবার প্রয়োজনও যথেষ্ট। এদিকে সেই পুরাণো ঘা-এর জন্যে মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। ব্যাণ্ডেজটাও ময়লা হয়েছে খুব। বোধকরি এতেও চিত্র সম্পূর্ণ হয়নি—সেদিন কাঁধে একটা আঘাত পেয়েছি, তার ফলে সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে। আমার সঙ্গে এখন আর তোমার প্যারিসে বেড়াবার সাধ হবে কি? আমার দলের লোকদের অবস্থা আরও চমৎকার! তারা যে পাতালঘরে বাসা বেঁধেছে তার মধ্যে নাকি পোকা মাকড়ের দল আগে থাকতেই আশ্রয় নিয়েছিল, কাজেই বর্ত্তমানে মাথা গোঁজবার ঠাঁই নিয়ে দুদলে খুব সম্ভবতঃ যুদ্ধ বেঁধেছে। এদিকে মৃতদেহের উপর বসন্তের কবোষ্ণ রোদ পড়ে সেগুলিকে মাছির জন্মভূমি করে তুলেছে। পাতালঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অযুত পাখার গুঞ্জন শুনতে পাবে। তোমার গায়ে মাথায় তারা বসতে চাইবে। বাইরের খোলা মাঠ এ রকম বীভৎস নয়, তবে মাছির উৎপাত যথেষ্ট। আমি বাইরেই ঘুমোই—ভাঙ্গা কামানের আড়ালে—শত্রুর শেলের পরিচয় পাবার সম্ভাবনা কম নয়, কিন্তু মৃতের পাশে শোবার চেয়ে আমার কাছে মরাটাও ভাল বলে মনে হয়।

এবার তোমায় যুদ্ধের গল্পটা বলি। জীবনে এ রকমটা আর কখনও দেখিনি। এগিয়ে যাবার কিছু আগেই তোমায় শেষ চিঠিখানি লিখেছিলুম। সেই মাঝরাতে অভিযানের কথা। সারারাত ধরে বরফ পড়েছে—ঠাণ্ডা ট্রেঞ্চের মধ্যে আমরা প্রায় চারটা পর্য্যন্ত নানারকম গল্পগুজব ঠাট্টা পরিহাস করে সময় কাটালুম! তার মধ্যে মাঝে মাঝে শত্রুর কামান গর্জ্জন করে উঠছিল। তারপর সব চুপ। মনে হল সারা জগৎ যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কিসের অপেক্ষা করছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার গলতে লাগল। দিকচক্রবালে ঊষার আভাস জাগল। এইবার—আমরা ঘড়ি খুলে মিনিট, ক্রমে সেকেণ্ড গুণতে লাগলুম। নির্দ্ধারিত সময় এগিয়ে এসেছে। এবার স্বর্গের অধঃপতনে নরকের প্রচণ্ড অভ্যুত্থান! একসঙ্গে শত কামান গর্জ্জন করে উঠল—ফাটা শ্র্যাপনেলের মধ্যে থেকে আগুনের সাপ জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চের দিকে ছুটে চলল। "জয়" "জয়" চীৎকারে আমাদের অগ্রগামী পদাতিকদল উন্মত্তের মত অগ্রসর হ'ল। পাণ্ডু আকাশের নীচে রেখাচিত্রের মত অস্পষ্ট মানুষের দল পাহাড়তলী ছাড়িয়ে অজানার দেশে

নেমে গেল।, এতক্ষণে জার্ম্মাণদল জেগেছে। প্রথম জার্ম্মাণব্যূহ আমাদের সৈন্যদলকে গ্রাস করেছে দেখে, দ্বিতীয়দল এগিয়ে চলল—একটু পরেই ধ্বংসের ধূম-যবনিকার অন্তরালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। মারণ অস্ত্রের বিকট শব্দে কাণে আমাদের তালা লেগেছে। মরিয়া মানুষের মরণ-খেলা নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিলে। কিন্তু এর চেয়ে যে ভীষণতর কিছু থাকতে পারে, সে ধারণা ছিল না। সে ভ্রম ঘুচল যখন—দেখি জার্ম্মাণরা আকাশ থেকে তরল আগুন ছড়াতে লেগেছে। তাদের শেলগুলো মাটী থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট আকাশের দিকে উঠে ফেটে গিয়ে যেন বালতি করে আগুন ঢালছে। বীভৎস সে দৃশ্য—কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব্ব—অভাবনীয়!

আমি আরও আধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করলুম, তারপর অন্য এক অফিসারের হাতে আমার দলের ভার দিয়ে, জন পঞ্চাশ লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের হাতে ইউনিয়ন জ্যাক, ফিতে আর পেরেক—যে পথে যাব তার নিশানা রাখতে হবে ত?

এর পর থেকে আর আমার ধারাবাহিক কিছু মনে নেই। স্মৃতির টুকরোগুলো জমাট বেধেছে—কেউ বা স্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট। আমার সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তাদের উন্মত্ত হাসির কথা মনে পড়ছে, আর আমার অন্তরের মুক্ত বিহঙ্গের উড্ডীয়মান কামনা। যেন দেহের বন্ধন আমায় কোথাও বাঁধছে না। দুই বিপুল সৈন্যদলের মাঝখানে বিস্তৃত স্থানটায় যেন বিরাট আলোড়ন চলেছে—ঝঞ্ঝাভিহত সমুদ্র যেন বারে বারে অর্দ্ধমগ্ন শৈলশিখরকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। মৃত আর মরণাহতের ভিড় জমেছে এই মাঠে। অনেকে কাদার ভিতর দিয়ে হাতে ভর করে চলেছে, নিরাপদ হবার আশায়—সাপের মত তারা বুক দিয়ে চলেছে—পা আর মেরুদণ্ড তাদের ভেঙ্গে গেছে। প্রতি বিশ চল্লিশ হাত অন্তর শেল ফাটছে, আর মৃত্যুর ফোয়ারা ফুটে উঠছে। এত-তেও যে মানুষের জ্ঞান থাকে, এই আশ্চর্য্য। চোখে যা দেখেছি, সবই যেন মিথ্যা—ছায়াবাজী—এ একটা প্রকাণ্ড বীভৎসতা, যার কথা শুধু কেতাবেই পড়া যায়!

প্রত্যেক অগ্নি-যবনিকার অন্তরে একটা করে ফাঁক আছে। যদি মাথা ঠিক রেখে দেখা যায়, তবে চোখে পড়ে একটা জায়গা যেখানে যুধ্যমান দুই দলের ব্যাটারীর ধোঁয়া মিশে যায় নি—মাঝে একটা ব্যবধান আছে। এই রকম অবকাশ আমার চোখে পড়ল। একের পর এক আমরা অগ্রসর হলুম। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে পুরাণো শেলের গর্ত্তে স্তূপীকৃত মৃতদেহ—শত্রুর তরল আগুনে এরা পুড়ে মরেছে। এই ডোবার মধ্যে তারা গায়ের আগুন নেবাবার চেষ্টায় নেমেছিল। জলে যেন জমাট রক্তের লালচে-কাল রং মিশেছে কিন্তু প্রকৃত সে রং বারুদের। আহত সৈন্যদল আমাদের বারে বারে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে উঠল, কেউ বা মরিয়া হয়ে শুধু চেয়ে রইল। আমরা তাদের ফেলে চল্লুম—মরণাহতের সেবার সময়টুকুও আমাদের নেই। জার্ম্মাণ সীমার কাঁটা-তারের বেড়ার কাছে এসে কি আর ফেরা চলে? এখানে যে দৃশ্য দেখেছি—যেদিন আমার চোখ বুজবে সেদিন সে স্মৃতি মুছবে কিনা সন্দেহ—যেন রক্তের নদী বইছে, আর সেই লাল জল ঢেকে মৃত আর মরণাহতের বীভৎস জঞ্জাল। নির্ব্বাক্‌, নিস্পন্দ পাণ্ডুর নরদেহ—নিষ্প্রভ উন্মত্ত চোখ————এরা সকলেই আজ সকালে এ ধরণীর কোল জুড়ে বিরাজ করেছে!

তোমার কাছে এ বর্ণনা তিতো লাগছে, নয়? সত্যি, এ বীভৎসতা অমানুষিক, করুণ কিন্তু মহিমাবঞ্চিত নয়। আমার শেষ কথাটা তোমার হয়ত ভাল লাগবে না। তুমি আমার মনোভাব বুঝতে পারবে না। শুধু তুমি কেন, যে এ দৃশ্য দেখেনি সেই বুঝবে না। কিন্তু এর গৌরব এর বিরাটত্বে!

চারবার আমরা পতাকা পুতেছি আর প্রতি বার দুজনকে এই কাজে হারিয়েছি। শেষ সীমার কাছে এসে প্রথম বন্দীদলের দেখা পেলুম। তারা এত অপরিচ্ছন্ন যে একশ গজ দূর থেকে তাদের গায়ের দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল! সে দলে ছিল প্রায় জন পঞ্চাশেক।......

এইবার আমার ফেরবার পালা। পিছন থেকে কর্ণেল এসে বল্লেন, "এখন কি আর ফেরা চলে?" "চলে বৈকি!" আমার যাওয়া স্থগিত করবার হুকুম দেবার আগেই একটা

শেল এসে পড়ল তাঁর উপর। কোন হুকুমই তিনি দিতে পারেন নি!

মুখোষ পরে কাজ করা কি দায়, অথচ উপায় কি? শত্রুদল এবার বিষবাষ্প আকাশে ছড়াতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দল থেকে এক একজন উল্টে মাটীতে পড়ে যাচ্ছে, কখনও বা বাষ্পের বিষে, কখনও বা গোলার আঘাতে। শুশ্রূষায় যে সারল, আবার সে কাজে যোগ দিল। অদ্ভুত এই মানুষগুলির সাহস, অসাধারণ এদের কর্ম্মশক্তি!

কয়েকটা জার্ম্মান ছোকরাকে ধরেছি। কেমন করে, শুনবে? দলের আহত মানুষগুলোর জন্য একটা আশ্রয়ের আশায় শত্রুদলের মাটীর নীচের ঘর সন্ধান করলুম। পুরাণো বাসিন্দারা প্রায় সবাই মৃত, কিন্তু দু'এক জনকে এদিক-ওদিকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে দেখলুম। এমনি কয়েক জনকে ধরে বাহকের কাজে লাগিয়েছি

এবার আর যুদ্ধ সমতল ভূমিতে নয়, প্রকাণ্ড বাজপাখীর মত শত্রুর আকাশ-জাহাজ মাথার উপর থেকে আগুন ছড়াচ্ছে আর মেশিন-গানের মুখে মাটী থেকে আমরা তার উত্তর দিচ্ছি। অব্যর্থ-লক্ষ্য কয়েকজন গোলন্দাজ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জাহাজের চালককে তাদের চাই-ই চাই!

আমরা আবার এগিয়ে চলেছি। মৃত্যুর আর শেষ নেই। মৃত্যুর সংখ্যা নেই অথচ বিরামহীন আমাদের অগ্র-গতি। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ যখন বৃষ্টি নামল তখন আমরা থামলুম। এত যত্ন করে সারাদিনে শত জীবন দিয়ে যে পথ করেছিলুম, কাদার সমুদ্রে তা নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল!

অপরিসীম ক্লান্তিতে দেহ মন যেন ভেঙ্গে পড়ছে, হাড়ের ভিতর অবধি যেন ভিজে গেছি। উৎসাহের উৎসমুখে পাথর চাপা পড়েছে। কোন রকমে ব্যাটারীর সন্ধান করতে পারলে অন্ন আর আশ্রয় পেয়ে যেন বাঁচি। পথে দেখি, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে শ্মশান-বন্ধুদল মৃত সৎকারে ব্যস্ত। ঝির ঝির করে তখনও বৃষ্টির ধারা নামছে। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, সব ধুয়ে, গলে গিয়েছে। ব্যাটম্যান আমার জন্যে একটু মাথা গোঁজবার স্থান করে-ছিল। সে একটা পাতাল-ঘরের অংশ, তার ভিতর থেকে কয়েকটা মৃত মানুষকে স্থানচ্যুত করে সে আমার বিছানা পেতেছে। শুধু জুতোটা খুলে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেশ আলো ফুটেছে।

তার পরের দিনগুলোর আলাদা স্মৃতি আমার নেই। যা কিছু মনে আছে, সে শুধু দলের লোকের দুঃসাহসিকতা আর ক্লেশ-স্বীকারের ক্ষমতা। প্রায়ই বরফ পড়ত বা বৃষ্টি নামত। আমরা ক্রমে ক্রমে কামানগুলোকে এগিয়ে নিয়ে সব সময়ে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। কি যে খেতুম তাতে কারুর কিছু এসে যেত না। এই ত গেল কষ্টের কথা।

আমাদের দুঃসাহসের কাজ ছিল উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে নজর রাখা। এ যেন মৃত্যুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। প্রথমে এমন বিপদে পড়লুম—দুদিন ধরে আমাদের পদাতিক দলের অবস্থান কোন মতেই নির্দ্ধারণ করতে পারলুম না। এগিয়ে চলার যে প্রবল নেশায় আমরা সবাই উন্মত্ত, বোধ করি তারি ঘোরে তারা উধাও হয়েছে! এগিয়ে চলেছি, ছোট একটা সৈন্যদলের সঙ্গে জার্ম্মানদের উপর গুলি ছুঁড়ছি। সারাদিন এ ছাড়া আর আমাদের কোন কাজ নেই। কতকগুলো গ্রাম ও সহরের মাঝখানে যে সমতল ভূমির কথা তোমায় বলেছি, শত্রুরা সেইদিকে গিয়েছে। আমাদের গোলন্দাজদের কাজ হচ্ছে তাদের সেইখানেই রাখা, এগিয়ে বা পিছিয়ে না যেতে পারে।

সহরের মধ্যেও অযুতশত্রু সৈন্য জমা হয়ে আছে। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত অবধি তারা নানা আবরণের মধ্যে মাঠ ছেড়ে সহরে ঢুকছে।

মনে হয় সব চেয়ে আশ্চর্য্য দৃশ্য যা দেখেছি, তা হচ্ছে আমাদের অশ্বারোহী দলকে একটা সহর দখল করতে যেতে দেখা। তারা যখন ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, আমি তাদের থেকে প্রায় দশ ফিট দূরে একটা ঘাসের গাদার পিছনে বসে ছিলাম। এই আক্রমণের সমস্ত ব্যাপারটাই আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ঘোঁড়ার পিঠের উপর ঝুঁকে তারা সবেগে একটা গ্রামের কাছে যেতেই শাদা পতাকা হাতে নিয়ে জার্ম্মানরা বেরিয়ে এল। আমাদের দল থমকে দাঁড়াল। কথাবার্ত্তা শেষ হতেই, আমাদের দল মুখ ফিরিয়ে ভাল করে বসল তারপর

ঘোঁড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে, হাওয়ার মত ছুটে বেরিয়ে এল। জার্ম্মানরা কি বলেছিল, পরে শুনেছি—তারা বলেছিল "এসেছ, ভালই করেছ, আমাদের কাছে ধরা দাও, কারণ, ফিরে যাওয়া মুস্কিল। তোমাদের লক্ষ্য করে অনেকগুলো কামান আর মেশিনগান সাজান আছে। সেটা ভুলো না।" কথাটা সত্যি। আমাদের দল যখন দ্রুত পলায়ন-তৎপর জার্ম্মান গ্রাম থেকে তখন আগুন ছুটেছে। ঘোঁড়ার শরীর অর্দ্ধেক কেটে চলে গেল, সওয়ার ছটকে মাটীতে এসে পড়ল। ফিরতি মুখে আমার ঘাসের গাদা যখন তারা পার হ'ল তখন দলে অর্দ্ধেকেরও কম অবশিষ্ট আছে। তাদের দেখে মনে হল সবাই উন্মাদ হয়ে গেছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর লেলিহ জিহ্বা তাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছিল!

দু' সপ্তাহ আগেকার কথা মনে পড়ছে। হঠাৎ সূর্য্যাস্তের সময় সমস্ত জার্ম্মান শ্রেণী পিছু হটতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড পিঁপড়ের সারের মত তারা ক্রমাগত চলছে। আমাদের দলে খবর পাঠালুম। পথ দেখাবার ভার পড়ল আমারই উপরে। সে কি রাত্রি! পথের কাদা যেন আটার মত, ঘোড়া পা পিছলে পড়ছে আর আটকে যাচ্ছে। ভোরের কাছাকাছি আমাদের সৈন্যদল কাজে লাগল। তাদের সঙ্গে এগিয়ে একটা জার্ম্মান সহরে এসে উপস্থিত। সেখানে পথে পথে যুদ্ধ সুরু হয়েছে। কি অদ্ভুত অবস্থা আমাদের। যদি হারি ফিরে পালাবার সব পথই আমাদের পক্ষে বন্ধ। যুদ্ধের শাস্ত্রে আমাদের আখ্যা হচ্ছে "বলির দল"। নিজেদের জীবন-বিনিময়ে জার্ম্মানদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে, আমাদের কামানগুলো সাজাবার অবকাশ দেবার জন্যে। যুদ্ধের আগে এসব কথা, কি ভয়ানক বলে মনে হ'ত। কিন্তু আজ এর মধ্যে ভয় নেই, আনন্দ পাচ্ছি। মৃত্যুর চোখের ভিতর সোজা চেয়ে দেখার আনন্দের স্বাদ সত্যই অপূর্ব্ব।

তোমার কথা ভাবছি—শেষ পর্য্যন্ত ভাববো তোমারই কথা—যদি শেষ আসে। তোমায় পরিপূর্ণ ভাবেই পেতে চাই। যত দিন যাচ্ছে তোমায় পাবার আকাঙ্ক্ষা আর দাবী, দুই-ই বেড়ে চলেছে। কিন্তু লোভের স্বার্থপরতা আর আমার নেই। আমি নিঃসংশয়ে জেনেছি যে, মৃত্যুই জীবন-নাট্যের চরম যবনিকা নয়। প্রেম অমর। জীবন অবিনশ্বর। আমাদের জীবন-নাট্যে যে অঙ্কের আপাত পরিসমাপ্তি দেখা যাচ্ছে, সে নাটকের পরিপূর্ণতা কালসাপেক্ষ। এ জগতে না হয়, অন্য জগতে তোমার ও আমার মিলন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্মে হয়ত তোমার আমার দরকার হ'ল না। বিধাতার অভিপ্রেত কি, তা তুমি আমি কতটুকু বুঝি? আমাদের বোধের পরিধি কতটুকু? আমি কোন মতেই ভাবতে পারি না যে, সত্যই প্রেম কোন কালে নষ্ট হতে পারে। ট্রেঞ্চের মধ্যে মৃতের জঞ্জাল সৃষ্টি করে যারা তাদের আদর্শ-প্রীতির পরিচয় দিল, তাদের এই আত্মত্যাগের মধ্যে স্বর্গীয় আবেশ অস্বীকার করি কেমন করে? "ভগবান এ পৃথিবীকে ভালবেসে তাঁর একমাত্র সন্তানকে বলি দিলেন—"; এই সব লোক পৃথিবীকে এত ভালবাসে যে, তারা নিজেদের দান করে বসল। তারা যে আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, তাতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু জার্ম্মান, ফরাসী বা ইংরেজ, তারা আজ সবাই ভগবানের সমান হবার চেষ্টা করছে। এই আদর্শ-নিষ্ঠাই তাদের ধর্ম্ম-সাধন!

আমার মুখে এ কথাগুলো অদ্ভুত শোনাচ্ছে—নয়? কিন্তু আমার বোধ আমার আপাত হিংসাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। আমার হাতের চেয়ে মন বড় হয়েছে—সেটা কি খুব অস্বাভাবিক?

হিংসা আছে, মৃত্যু আছে—কিন্তু তবু—তুমি—তুমি ত রয়েছ এই মৃত্যু থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনবে বলে। তোমার ধূসর চোখে—তোমার দেহ ঘিরে—জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মত বিরাজ করছে বিরামের আর পরিপূর্ণ শান্তির, আভাস! তোমার সাধনহীন বিভ্রমহীন রমণীত্ব! কতবার ভাবি সেদিন এ দেহ ছেড়ে যাব সেদিন কি তুমি তাকে বাহু-বন্ধনে ঘিরে নেবে—আমার মুখের 'পর মুখ রাখবে—বেঁচে থাকতে যে সোহাগ সারাক্ষণ কামনা করেছি, কোন দিন পাই নি। মিথ্যা এ কামনা—মিথ্যা এ সান্ত্বনা—আমার ওষ্ঠ যেদিন নিস্পন্দ সেদিন তোমার অধরস্পর্শে আমার কি লাভ?—

৯৭

এ এক বিচিত্র বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন-প্রণালী! বর্ত্তমানে আমরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছি জানো? প্রকাণ্ড এক

ফলের বাগানে। পাশে একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ। তার দেওয়ালে গর্ত্ত করে কামানের নল সাজিয়েছি! কিন্তু এখনও জার্ম্মানদের দৃষ্টি এড়াতে পারি নি। মাথার উপরেও কোন আচ্ছাদন নেই—তারের জাল আর লতাপাতা দিয়ে জঙ্গল বলে শত্রুর ভ্রম জন্মাবার চেষ্টা করছি মাত্র।

তাই, দিনে আমাদের চলাচল বন্ধ। শত্রুর আকাশ-জাহাজ সারাদিন মাথার উপর উড়ছে। যদি আমাদের একজনও তাদের গোচরে আসে তবে এ আশ্রয় তখনি ঘুচবে। আমাদের যেন বন্যপশুর জীবন—দিনে লুকিয়ে থাকি, রাত্রে দৈত্যের মত কাজ করি, আর—অপেক্ষা করি কবে বিভ্রান্ত শত্রুদল সামনে এসে পড়বে। পরস্পরের কামান-শ্রেণীর অবিরাম গোলা বর্ষণের ফলে পৃথিবীর যত ধূলো আকাশ ছেয়েছে। তার ভিতর থেকে আমাদের আড্ডার আলো শত্রুর চোখে পড়বে বলে ত' মনে হয় না।

কি জীবন! ১৯১৩ সালে কে ভেবেছিল যে, আমরা অবলীলায় এ দুঃসাহসের জীবন বরণ করে নেব। আমরা সবাই আজ ক্লান্ত—অতি শ্রান্ত, কিন্তু তা বলে উৎসাহের অভাব আছে, এ পরিবাদ মিথ্যা। আমাদের পদাতিক সৈন্যনায়ক-দল যুদ্ধের প্রথম দিক থেকে কাজে নেমেছে, বদলির অভাবে ছুটি পায় নি। হুণদের উপর বিষম ঘৃণা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির বশে তারা শারীরিক সকল দুর্ভোগ স্বীকার করে কাজ করে চলেছে, আর কাজ যখন না থাকে—শুধু ঘুমায়।

আমরা যে পাতাল-ঘরে থাকি, একদিন সেটা ছিল শত্রুর আশ্রয়। মাটীর মধ্যে কয়েক ধাপ নেমে তবে এই ঘরে ঢুকতে হয়। জার্ম্মানরা কি বিশ্রী অবস্থায় এটাকে যে রেখে গেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সাফ করে নিচ্ছি। মুস্কিল এই যে, আলো জ্বালতে আমরা আদৌ সাহস করি না। জল-সরবরাহের সুবন্দোবস্ত নেই। শত্রুরা যা কিছু পানীয়ের বোতল ফেলে গেছে তার উপরই আমাদের নির্ভর, কারণ কুয়োর জল বিশ্বাস করে ব্যবহার করা চলে না। হয় ঘটনাচক্রে কিংবা শত্রুর চেষ্টায় সে জল বিষাক্ত হতে পারে। একটা কুয়ো থেকে কয়েকদিন আমরা জল তুলে-ছিলুম; শেষে একদিন মৃতদেহের টুকরো জলের সঙ্গে বালতিতে উঠে এল। তাই থেকে আমাদের শিক্ষা হয়েছে।

সারা দিনমান আমাদের কাছে রাত্রি বলে মনে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার থেকে উষার প্রথম আভাস পর্য্যন্ত আমাদের বহির্জ্জীবনের লীলা—বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ-সূত্র টেলিফোনের তারেই আবদ্ধ। অথচ মধুময় সূর্য্য-লোকের স্পর্শ-সুখে ধরণী আজ বসন্ত-উতলা! মাটীর নীচে এই ঘরে বসে ভাবতে পারা কঠিন যে, এ বিশ্বের কোন স্থানে ফুল ফুটেছে! মনে হয় সৌগন্ধ্য-সৌন্দর্য্য-ভরা এই বসন্তে একটা স্বাধীন দিনের জন্য আমার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় জিনিসটীকেও বিনিময়ে দিতে পারি। এই অসম সাহসের নরক থেকে যদি কোনদিন মুক্তি পাই, তবে সত্যই আমার জীবনের প্রত্যেক স্বল্প সুখ, সামান্য সৌন্দর্য্যকে অভিনন্দিত না করে পারবো না!

এত দিনের সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর দু'রাত আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। তা হ'লে তুমি আমায় একেবারে ভোল নি! না—তুমি আমায় আদৌ ভোলো নি। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, এখন সেরেছ। তোমার যে কি হয়েছিল, তা ত লেখ নি। কোন আহত সৈনিকের জন্য কিছু করতে গিয়ে আঁচড় লেগে তোমার শরীরে বিষ মিশেছিল—এর মানে কি? কি করতে গিয়েছিলে তুমি? তোমায় এত কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। এখন তুমি নিশ্চয়ই বেশ সুস্থ হয়েছ—তা না হলে আর কাজে যোগ দেবে কেমন করে!

হাওয়া বদলাতে তোমায় মন্টি কার্লো'তে পাঠিয়ে-ছিলো! আঘাত থেকে সেরে উঠছে বা ছুটী উপভোগ করছে এমন সব প্রাণবন্ত নবীন সারবিয়ান সেনানায়কের যে সুন্দর চিত্র তুমি দিয়েছ তা সত্যই চমৎকার। সুখ-স্রোতে ভাসমান এমন একটী জীবের কৈফিয়ৎ—যা তুমি লিখেছ তা আমার খুব ভালই লেগেছে—"বার্দ্ধক্যের গৌরবে আমাদের লোভ নেই—যতদিন পারি ততদিন প্রাণপণে শুধু জীবন উপভোগ করে নিই।" মনে হয় যদি সে আদর্শে চলতুম, তোমায় এতদিনে আমার করে পেতুম। কিন্তু আমি যে অমন করে চলতে পারি না। আমি ভুলতে পারি না যে, অযুত লোক যুদ্ধ করছে, অসংখ্য মানুষ দলে দলে

মরছে। আমার ন্যায্য সুখ অধিকার করব আর এদের কথা ভাবব না, সে আমার পক্ষে অসম্ভব। এ দুর্ব্বলতা—না শক্তি। কি জানি? অতীতে আর ফিরে পাওয়া যায় কি? যা ঘটে গেল, তা অপরিবর্ত্তনীয়। সেই সারবিয়ান তরুণের মত আমারও বার্দ্ধক্যে লোভ নেই—যতক্ষণ পারি প্রবল ভাবেই বাঁচতে চাই। আমারও বাঁচবার সুবিধা এসেছিল, যখন প্যারিসে ছিলুম। কিন্তু সে সুযোগ নেবার মত মন যে ছিল না। যুধ্যমান সৈন্যদলের প্রথম সারের মানুষগুলিকে আমি ভুলতে পারি নি - আমার সেই দল।—যাদের জীবনে একমাত্র সুযোগ শুধু মৃত্যুর!

মন্টি কার্লোতে তোমার সঙ্গে থাকলে বেশ হ'ত। তুমি সেখানে আমার অভাব বোধ করেছিলে জেনে খুসী হলুম। কি জানি সেখানে গেলে হয়ত সুখী হতে পারতুম না। যে মানুষের মনে এ বেদনার আঁচ লেগেছে, সে চায় কেবল সুখ ও দুঃখের মাঝখানে নিজের দেহ দিয়ে অন্তরাল রচনা করতে—চারিদিকে কি মর্ম্মান্তিক দুঃখই জেগে উঠেছে

"সাজ সাজ" রব পড়েছে। প্রত্যেকেই প্রস্তুত। অস্ত্র সরঞ্জাম, নায়ক ও সৈন্যদল যে যার জায়গায় নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা মেনে চলছে। প্রতি মুহূর্ত্তে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা আমাদের সদাজাগ্রত রেখেছে। বেচারী ঘোড়াগুলোর আর দুর্দ্দশার অন্ত নেই। গোলাগুলি নিয়ে অবিরাম বন্ধুর পথে চলে', তারা শুধু ক্লান্তিতে পড়ে মরছে। পাহাড়তলার রাস্তাটা ঘোঁড়া আর মানুষের মৃতদেহে বুঝি বন্ধ হয়ে এল।

আর্দ্দালী চিঠি নিয়ে এল। তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি এল না। আমি কিন্তু আশা করি নি—সেদিন যে পেয়েছি!

১৮

আমরা আগে যেখানে ছিলুম সেখান থেকে অনেক সরে গেছি। এ জায়গাটা বড় বিশ্রী। একেবারে খোলা জায়গায় থাকতে হয়—চার মাইল দূরে শত্রুর আস্তানা। তাদের বেলুনে আমাদের চোখের সামনের আকাশটা ছেয়ে গেছে। আমরা যে তাদের গোচরে আছি এ কথাটা তারা নানা রকমে জানিয়ে দিচ্ছে। আমরা কামান ছুঁড়লে, তারা শেল ছেড়ে তার উত্তর দিতে দেরী করে না—জানাতে চায় যে, যখন খুসী আমাদের দলবলকে উড়িয়ে দিতে পারে।

যখন এখানে এলুম, তখন না ছিল পাতাল-ঘর, না কোন আশ্রয়। অবশ্য এখন যে ব্যবস্থা ভাল হয়েছে, তা নয়। কয়েকটা গর্ত্ত ও সুড়ঙ্গ করে নিয়েছি—গোলার টুকরো লাগলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না বটে, গোলাটা এসে দেওয়ালে লাগলে আমাদের খেলা-ঘরের অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের সামনে গোলার-আঘাতে ভাঙ্গা এক রেল-লাইনের নীচে একটা খিলান আছে; শত্রু সেখানে অবিরাম গোলা ছুঁড়ছে। সামনে যেতে হলে এই খিলানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। পার হবার সময় এর কাছে এসে দম বন্ধ করে আমরা দৌড়াই—যারা সময় ঠিক করতে পারে না, উল্টে পথের মাঝখানে মরে পড়ে থাকে। বাস্তবিক আমরা যা করছি তা হচ্ছে আত্মহত্যার খেলা - মৃত্যুর সঙ্গে উন্মত্ত লুকোচুরি।

আমাদের কামানে শত্রুর কোন ক্ষতি হলে তখনই আমরা বুঝতে পারি, কারণ তার বিনিময়ে তারা যে শেল ছাড়ে তা যেমন দ্রুত, তেমনই মারাত্মক। তারা সারাদিন গুলি ছোঁড়ে আর রাত্রে গ্যাস ছাড়ে। আমাদের আর বিশ্রামের অবসর দেয় না। মাঝে মাঝে তাদের গোলা এসে আমাদের বারুদ প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নিভাবার অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত পরিশ্রম আমি গ্রাহ্য করি না, দুঃখ পাই যখন আমার দলে মৃত্যু এসে হানা দেয়। আমার এই লোকগুলিকে সত্যই আমি ভাল বেসেছি।

শত্রু এবার নতুন ফন্দি করেছে। আকাশ-জাহাজ থেকে বোমা ফেলে আমাদের নিঃশেষ করতে চায়। সেদিন আমাদের এক দল দুটো ভাঙ্গা কামান সরাচ্ছে, হঠাৎ বিরাট একটা শব্দ হল—পায়ের নীচে মাটী ফেটে গেল—দলের ত্রিশ জন লোক ও চৌদ্দটা ঘোড়ার মধ্যে বাকি রইল একটা মানুষ আর একটা ঘোড়া। এখন এই যুদ্ধের ধারা দেখে মনে হয়, আগেকার যুদ্ধ যেন ছেলেখেলা। এর মধ্যে থেকে বেঁচে ফিরে আসা সত্যই সৌভাগ্যের কথা!

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময় এই যে, এসব সত্ত্বেও আমাদের আনন্দের কোন বাধা নেই। মনে হয় বিপদই মানুষকে আত্মশক্তি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করে। পরমুহূর্ত্তে হয়ত নিঃশেষে

সব হারাতে পারি, কিন্তু সর্ব্বস্ব পণ রেখে জুয়াড়ীর যে উত্তেজনা, তার আবেশ যেন আমাদের মনকে ঘিরে ধরেছে।

কেমন করে যে এখানে এসেছি তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। রাত্রের অন্ধকারে আমাদের এই বীভৎস অভিযান। মাঝ পথে শত্রুর আক্রমণ যে বাধা রচনা করল তা যে কেমন করে দূর করেছি, তা আজ বলতে পারব না। হয়ত ঠিক জানিও না। বাতাসে শত্রুর ছাড়া গ্যাসের গন্ধ পেয়ে কামানের গাড়ী প্রাণপণে টেনে নিয়ে পালিয়ে এসেছি—দলের মানুষের বুকের ওপর সে গাড়ীর চাকা রাস্তা কেটেছে! অন্ধকারে কিছুই দেখিনি!

তোমায় যে এসব কথা কেন বলি, তা জানি না। তুমি কোন কালেই এসব পড়বে না। কিন্তু না বলে যে আমার মনে সোয়াস্তি নেই। নিজেদের মধ্যে আমরা এ সবের আলোচনা করি না। আমরা যা কিছু করি তার খুঁটী-নাটীর ভাবনা আর সহ্য হয় না। এ গুলোকে ভুলতে চাই, কিন্তু স্মৃতির অভিশাপ যে আমাদের মাথায় বোঝার মত চেপে আছে।

বন্ধু আমার! এ জীবনে যে কল্পলোক রচনা করেছিলুম তার মধ্যে এ সকলের কোন দিন কোন স্থানই ছিল না। জীবনে শুধু পরম সহৃদয়তায় বাঁচতে চেয়েছিলুম। মারণ-অস্ত্র আস্ফালন করে জীবনের পথে পা বাড়াব এ দুঃস্বপ্ন কোনদিন ভোগ করি নি। আজ যদি তোমার সামনে দাঁড়াই, তোমায় হয়ত চিনতে পারব না, অপরিচিতের মত চেয়ে থাকব। যা কিছু তোমার নিজস্ব, যার জন্যে তুমি, তুমি হয়েছ—সেই কমনীয়তা, রমণীয়তা, শোভা, সরলতা—আজ সমস্তই এত সুদূর মনে হচ্ছে—জীবনে যেন কোন দিন তাদের পরিচয় পাই নি। সভ্য জীবন থেকে যেন সরে গেছি। আদিম যুগের অধিবাসী—সামান্য বা হেয় নয়—যেন ভয়ানক হয়ে উঠেছি। আমাকে কেন্দ্র করে বীভৎস মৃত্যু, মহৎ ভয় আর বিরাট ধ্বংস যেন অবিরাম দ্রুত প্রদক্ষিণ করছে। পা ফেলতে পারি না; পাৎলা মাটীর আবরণে আধঢাকা মানুষের মৃত দেহ যেন মাড়িয়ে চলেছি।

এ সব দৃশ্যের মধ্যে এতকাল বাস করেছি যে কোন কালে এর স্মৃতি মন থেকে মুছবে না। যদি কখনও আবার তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়, তুমি হয়ত তখন আমার নীরবতার অর্থ বুঝতে পারবে না। এত বেদনা এত দুঃখ দেখে আজ কোন মতেই ভাবতে পারি না যে, এ জীবনে আনন্দ-আস্বাদে আবার আমার মতি হবে।

অথচ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন ত্রুটি নেই। তাস খেলি, গ্রামোফোন বাজাই, যখন কষ্টের চরম হয়, সবাই মিলে একসঙ্গে গান ধরি। হঠাৎ মনে হয়, দলের লোকেরা বুঝি বাইরে বিপদে পড়েছে। গান বন্ধ করে ছুটে যাই। জীবন্ত বা মৃত, তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ধূলা আর রক্তমাখা হাতে ছড়ান তাস কুড়িয়ে নি। হাত ধোবার জল এখানে দুর্ল্লভ কিন্তু রক্ত প্রচুর!

আমি বুঝেছি, আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূলে আছে, নিজেদের কাছে নিজেদের সাহসী বলে প্রমাণ করা। আমাদের এ সাহস কেবল ভয়শূন্যতা নয়—আত্ম-সম্মান।

চড়াই-এর পিছনে, আমাদের নব নব আক্রমণের পাদ-পীঠে, আবার পপিফুলের দল কৈশোর-শোভায় ফুটে উঠেছে। দীর্ণ জীর্ণ বনভূমি আজ আবার অযুত পুষ্পের মাতৃঅঙ্ক। তাদের নিঃশব্দ হাস্য ও লাস্যচঞ্চলতায় পর্ব্বতসানু যেন মুখরিত। কামান শ্রেণীর বহু উর্দ্ধে আকাশের কোলে পাখীর গান বেজে উঠেছে। সূর্য্যকিরণের মত আনন্দ যেন আপনাকে চরাচরে ব্যাপ্ত করেছে। আমাদের অন্তরেও তার প্রতিধ্বনি জাগছে, অজানা পুলক যেন সমস্ত ভীতিকে জয় করেছে!

কাল রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখেছি। এই প্রথম তোমায় এ রকম ভাবে দেখতে পেলুম। স্বপ্নের চিত্রটী অপূর্ব্ব, কিন্তু সত্যই কি অসম্ভব? আশেপাশে গোলাপ ফুটেছে, কি জানি কাদের সে বাগান। রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করছে—জনপ্রাণী নেই—তুমি আর আমি। কিছু-দিন আগে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আমার একহাতে ভর ক'রে পাশে পাশে চলেছ। একটা লতা-বিতানে পাথরের আসনে আমরা দুজনে বসলুম! আমার কাঁধে মাথা রেখে, তুমি স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাইলে—তোমার চুলে আর আমার অধরে মৃদু কম্পন জাগল! যতক্ষণ স্বপ্ন ছিল, ততক্ষণ সন্দেহ মাত্রও জাগেনি যে তুমি আমার নও—জেগে দেখি, তুমি নেই—বিরাট

ব্যবধান দুই কূলের মধ্যে নদীজলের মত বিরাজ করছে। কোন দিন কি এ স্বপ্ন সফল হবে? এমন করে কোন দিন তুমি কি আমার কাছে আসবে না? প্রশ্নই শুধু করে চলেছি—উত্তর কে দেবে—কি জানি!

১৯

এই শেষ! এ ব্যাপার বেশী দিন চলতে পারে না। আমাদের অর্দ্ধেকের উপর গোলন্দাজ মারা গেছে; নায়ক-দলে বেঁচে আছি শুধু আমি। অগ্নিবর্ষণ যেন অশেষ হয়ে উঠেছে। এইমাত্র দুটো কামান নষ্ট হয়ে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক নিস্তব্ধ।

জ্যাক হোল্ট মারা গেছে। আমাদের মেসে একটা শেল ফেটে তাকে জখম করল, আমার সামান্য লাগল আর আমাদের মেজর মারা গেলেন। তিনদিন আগে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কামানগুলো চালাবার জন্য জ্যাক আমার কাছে থাকতে চাইল। আমি জিদ করে তাকে চলে যেতে বল্লুম, কারণ সে আমাদের দলে এখন নেই। মুক্তির পথে বেচারী বোধ করি একশ গজ এগিয়েছে, এমন সময় একটা জার্ম্মাণ শেল তার মাথার উপর পড়ল। বিস্ময় লাগে, কে এমন করে শত্রুতা সাধল! তুমি জান, কত চেষ্টা করে তাকে আমরা বাঁচাতে চেয়েছিলুম। উড়ো সৈন্যদলে যোগ দেবার নিয়োগ-পত্র, সে মাত্র কয়েকদিন হ'ল পেয়েছে। চলে গেলে, সে মাস ছয়েক ইংলণ্ডে স্ত্রী ও মেয়ের কাছে থাকতে পেত। সে যদি সেই দিনই চলে যেত! কিন্তু তার মনুষ্যত্বই হ'ল তার বাঁচবার পথে অন্তরায়। সে বেশ জানত যে, তাকে বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ দরকার—কিন্তু এমন করেই ষ্টিফেনের স্বপ্ন ফলে গেল। পরস্পরের স্বপ্নে দেখা সাদা পাথরের দুটি ছোট ক্রশ সত্যই এবার দেখা দেবে!

তোমায় বলেছি, নায়ক দলে আমিই একা বেঁচে আছি। না—আরও একজন আছে সে বিল লেন। এই অভিযান সুরু হবার আগে সে ছুটী পেয়ে ইংলণ্ডে চলে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ কর্ণওয়াল বা এমনি কোন সুখ-স্বর্গের আশেপাশে তার নব পরিণীতা প্রিয়তমাকে নিয়ে সে নীড় রচনা করেছে।

* * * *

শত্রুর আক্রমণে এবার আমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। আমাদের যে কি অবস্থা করেছে, তা তুমি ভাবতেও পারো না। আমাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামে আগুন লেগেছিল. এইমাত্র সে আগুন নিভিয়ে ফিরলুম। কয়েকটা কামান এখনও অটুট আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে জার্ম্মান আক্রমণের আশঙ্কা করছি; অবশ্য যদি আসে, আমরাও প্রস্তুত।

আমার সৈন্যদলে এমন ধারা স্ফূর্ত্তি আমি আগে কোন দিন দেখিনি। এরা কি দেবতা? কি জানি, কিন্তু শ্রদ্ধায় আমার বুক ভরে উঠছে। বারে বারে ভাবছি, এই সব দুঃখ বেদনাকে এরা জয় করে কেমন করে? নিজেকে ছাপিয়ে ওঠে কোন্ শক্তিতে? তাদের চারিদিকে সহকর্ম্মী বন্ধুজন দিনের পর দিন একে একে মারা পড়েছে। সৎকারের সময় পর্য্যন্ত নেই—যে যেখানে পড়েছে, সেই তার শেষ শয্যা, সেই তার শবাধার!

আমার পায়ে আঘাত লেগেছে। চলতে কষ্ট হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত আমি বোধ হয় বেঁচে যাব। বড় সৈন্যদলের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে, টেলিফোনের তার নষ্ট হয়ে গেছে। যোগস্থাপনার চেষ্টা চলছে কিন্তু জার্ম্মান গোলা বর্ষণের মধ্যে তাদের সে চেষ্টা কতখানি সফল হবে তাই সন্দেহ। সারাদিন ধরে এই বর্ষণ চলেছে। গত দুদিন ত আমরা ধোঁয়ার আড়ালে রয়ে গেছি। বহির্জ্জগতের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। মনে হচ্ছে এ যবনিকা ধোঁয়ার নয় মৃত্যুর। দুদিন আমরা কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি খাবার নয়, জল নয়, বারুদ বন্দুক কিছুই না। হাত গুটিয়ে বসে আছি। বন্দুক ছোড়া বন্ধ করে গুলি জমিয়ে রাখছি। আচম্বিতে যদি শত্রু হানা দেয় তবে তাকে রুখতে হবে ত!

পা এত টাটিয়ে উঠেছে যে, সামান্য ভর দিলে ভয়ানক লাগে। কিন্তু মনে আমার কোন ব্যথা নেই। আমার সৈন্যদলের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জার্ম্মানরা যদি আসে তবে অভ্যর্থনা কেমন হবে তারই জল্পনা চলছে!......

এর চেয়ে বেশী কিছু আর আমার করবার নেই। সামনের দিকে কি একটা গোলযোগ হচ্ছে, কিন্তু পাছে নিজেদের পদাতিক সৈন্যদলের ক্ষতি হয় সেই ভয়ে কামান

ছোড়া বন্ধ রেখেছি। তারা যে এখন কোথায় আছে, তাই আমরা ঠিক জানি না। এখন খবরাখবরের তারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নি। দুজন লোককে সংবাদসংগ্রহে পাঠিয়েছিলুম, সেই বোধ করি তাদের শেষ অভিযান!

যদি এ মরণসমুদ্র সন্তরণে পার হতে পারি, তবে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তোমায় সব কথা স্পষ্ট করে জানাব। এই শেষ কয়েক মাসে সুযোগ নেবার শিক্ষা পেয়েছি। হয়ত প্রথমে তুমি আমায় চাইবে না। কিন্তু এবার আমার প্রতিজ্ঞা যে, তোমায় আমি চাওয়াবো! যেমন করে তোমায় আমি কামনা করেছি, তেমন করে তুমিও আমায় চাইবে!

যখন সময় ছিল, তখন তোমায় বলিনি কেন? ভাল মন্দের বিচারটা কি বেশী হয়ে গেছে? আর যদি তোমায় বলতুম! সেই চির পুরাতন প্রশ্ন, হয়ত এর উত্তর পাবার আগেই চির সূর্য্যাস্তের দেশে প্রয়াণ করব। আমি কোন দিনই জানতে পারব না তুমি আমায় ভালবেসেছিলে কি না, কিংবা চেষ্টা করলে আমার দিকে তোমার মন ফিরান যেত কি না। হয়ত আমার এত দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজনই ছিল না। অবান্তর আমার এই সব সন্দেহমূলক প্রশ্ন! তুমি হয়ত দিনের পর দিন আমার কাছ থেকে প্রেম-নিবেদনের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করেছিলে!

প্রিয়া—প্রিয়তমা—আর আমি কি বলব। বলবার আমার আছে কি বল? ভাষা দিয়ে, কথা দিয়ে কতটুকুই বা বলা যায়। সকল বাণীকে ছাপিয়ে উঠে যে তপ্ত দুটি হাতের পরশ, কম্পিত দুটি অধরের মিলন—তোমায় আমি এমন করেই আজ পেতে চাই। সকল বাণী নীরব রেখে আমি চাই.........

সমাপ্ত

গান

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

না জ্বালিতে বাতি রাতি পোহায়,
ভোরের বাতাসে ঘুম-ছোঁয়ায়
নয়ন ঢুলিয়া আসিছে, হায়—
কোথা প্রিয়তম, দয়িত কই!

বিদায় নিল যে দখিনা বায়
বেণুবনে সে-ই বাঁশী বাজায়,
সুরে সুরে সেই ডাকে আমায়—
ঘরের এ জ্বালা কেমনে সই?

মালতীর মালা বুকে শুকায়—
বুকের কান্না চোখে লুকায়,
আনমনে মন ফিরিয়া চায়,
প্রিয়-পথপানে বেদনাময়ই!

সখী কহে "চল্ জলকে চল"
ডাকে ইসারায় গভীর জল,
পায়ে পায়ে বাধে থলকমল—
সমুখে সিন্ধু অথই থই।

শৃঙ্খল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

মনের মধ্যে কোথায় যে ফাঁক, খুঁজিয়া না পাইয়া বিশ্বেশ্বর বিধাতার উপর চটে, নিজের উপর চটে এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর চটে। তাহার সমস্ত জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যই যদি বিধাতা থাকেন, তবে এমন করিয়া তাহাকে পৃথিবীতে পাঠানোর কি-ই বা প্রয়োজন ছিল!

বিশ্বেশ্বর রাগিয়া বলে,—ভগবান নেই।

তবু;—

মানুষের যে একজন ভগবান চাই-ই। এই দুঃখ যে শুধু দুঃখ নয়, ইহা যে অজানিত বৃহত্তর কোনো কল্যাণের জন্য ভগবানের স্বহস্তের দান এবং ইহার পরে যে একটি অবিচ্ছিন্ন সুখের সম্ভাবনা আছে, তাহা না ভাবিলে দুঃখী মানুষ বাঁচে না। দুঃখের ভারে মানুষের মেরুদণ্ড যখন ভাঙ্গিয়া যায় যায়, তখন এই সম্ভাবনার কথা ভাবিয়াই সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় কোনোরূপে বাঁচিয়া থাকিবার প্রাণপণ প্রয়াস পায়।

বিশ্বেশ্বরের মন দ্বিধাভরে টলে।—

এমনি করিয়া তাহার দিন রাত্রি কাটে! নারীর প্রেম, নারীর অধর-কোণের হাসি এবং নয়নকোণের দৃষ্টি, তাহার মৃণাল বাহুর আলিঙ্গন কল্পনা করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন মাধুর্য্য-রসে আপ্লুত হইয়া ওঠে;—সে যুক্ত করে ভগবানকে প্রণতি জানায়। তারপরে আসে প্রতিক্রিয়া।

জীবনের ব্যর্থতা ও পুরুষ-জীবনের নিরুদ্ধ কামনা অকস্মাৎ অগ্নি উদ্গার করে। সে অস্থির হইয়া ঘরময় পায়চারী করে এবং টেবিলে একটা ঘুসি মারিয়া বলে—ভগবান নেই।

পণ্ডিতের কথা তার ভালো লাগে নাই। এম্‌নি কথা শুনিলেই তার মন মাতালের মতো অস্থির হইয়া ওঠে। এবং এই ধরণের যুক্তি যতই তার মনের মধ্যে দাগ কাটিতে চেষ্টা করে, ততই সে অধৈর্য্য হয়, কিছুতে সহ্য করিতে পারে না।

ঘোষের ঘর হইতে আসিয়া সে মনে মনে অমলার কথা ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অমলার সম্বন্ধে ভাবিবার কিছুই নাই। সে প্রেম প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বৃহৎ,—টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিয়া দেখা চলে না। তাজমহল যেমন একখানি-একখানি পাথর চুনিয়া, এক-একটি দিনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এ তেমন নয়। ইহার শুধু পরিপূর্ণতা আছে, সমগ্র একটি রূপ আছে, পিছনে কোনো পট-ভূমিকাই নাই। হঠাৎ একদিন অমলাকে সে পাইয়াছিল, হঠাৎই ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল। এই ভালোবাসা এতই বৃহৎ এবং এতই সহজ যে, প্রেম নিবেদনেরও প্রয়োজন হয় নাই, নিত্য নূতন-নূতন ঘটনা সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয় নাই।

কিন্তু ঘোষের তো তেমন নয়। আপনার সমস্ত চিত্তকে বহু নারীর মধ্যে বিশেষ একটি নারীর সুমুখে মেলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিতে হইয়াছে, অল্পে অল্পে তাহার চিত্তকে জয় করিতে হইয়াছে। ইহা তো আকস্মিক নয়। দিনের পর দিন কত উদ্যম, কত কল্পনা ব্যয়িত হইয়াছে তাহার কি হিসাব আছে? হয়তো…

কিন্তু কল্পনা-প্রয়োগের আর প্রয়োজন হইল না, ঘোষ ধীরে ধীরে আসিয়া সর্ব্বস্বহারার মতো করুণ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

তাহার চেহারা দেখিয়া বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনেক কিছু না হারাইলে মানুষের চেহারা অমন হয় না। অথচ আজ নূতন করিয়া কি-ই বা সে হারাইল!

তাহার কারাদণ্ডের কিছুদিনের মধ্যেই শাশ্বতী যখন নূতন একজনকে বিবাহ করিল, তখন সে ক্রোধে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে এবং কিছুটা অপমানেও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে ক্রোধ ভুলিতে দীর্ঘদিন লাগে নাই। এমনও মনে হইয়াছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতীও তাহার স্মৃতি হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গেল বা। কারাবসানে সে যে শাশ্বতীর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবে এ সম্ভাবনার কথাও ইতিপূর্ব্বে তাহার মনে জাগে নাই। কিন্তু কথাটা যেই উঠিল, অমনি মনে হইল শাশ্বতীই যদি তাহাকে আশ্রয় না দিতে পারে তাহা হইলে কারামুক্তির আনন্দ আর রহিল কি! বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্নভাবে তাহার একখানি হাত ধরিতেই তাহার শীর্ণ ঘাড়ের উপর

মাথাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে থপ্ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কি হয়েছে, ঘোষ?

ঘোষ প্রথমটা উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মাথাটা আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। একটু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা, একি সত্যি?—পণ্ডিত যা বললে?

বিশ্বেশ্বর ক্ষিপ্রভাবে উত্তর দিল—কক্ষনো না।

ঘোষ অলসভাবে বলিল,—কিন্তু আমি যেন কিছুতে মনের মধ্যে জোর পাচ্ছিনে। তার সঙ্গে পরিচয়ের মাস তিনেক পরে একদিন তাদের পরিবারের সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাকে সেদিন বলবার যে আমার অনেক কথা ছিল, আমার চোখ দেখে সে বোধ হয় তা টের পেয়েছিল। এবং তারও বোধ হয় অনেক কথা বলবার ছিল। অন্য সকলের থেকে আমরা দুজন যে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি তা জানতেও পারি নি। যখন জানতে পারলাম, তখন আমরা একটি নির্জ্জন কুঞ্জের কাছে এসে পড়েছি। তখন সূর্য্য অস্ত যেতে বেশী দেরী নেই।

একটু থামিয়া ঘোষ বলিল,—আমরা নিঃশব্দে একটি বেঞ্চের ওপর কতক্ষণ ব'সে রইলাম,—অনেকক্ষণ। কিন্তু যা বলতে চাই তা আর কিছুতে বলতে পারিনে। শুধু কখন্ এক সময় তার যে হাতটি টেনে নিয়েছিলাম, সেই হাতখানি হাতের মধ্যে ক'রে ব'সেই আছি। অবশেষে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। তার পায়ের তলায় বসে তার কোলের ওপর মাথাটি রেখে কি যে বললাম, তা আমার নিজের কানেই পৌছুল না; কিন্তু সে ঠিক শুনতে পেল। আমার মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে অস্ফুট স্বরে বললে—আমি তোমারই, আর কারো নই—বলিয়া ঘোষ নিজের মাথায় একবার হাত বুলাইল।

ঘোষের মাথায় প্রকাণ্ড টাক। বিশ্বেশ্বর অজ্ঞাতসারেই সেদিকে চাহিল। কিন্তু ঘোষের চোখ তখন ছলছল্ করিতেছিল।

ঘোষ বলিল,—সেই ক'টি কথার আনন্দ আমি কোনোদিন ভুলবো না। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি সে তো রাখে নি।

—কিন্তু কে বললে তোমায় রাখে নি?

ঘোষ বিস্মিতভাবে বলিল,—তার মানে? তুমি কি শোনোনি সে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে?

বিশ্বেশ্বর পরম দার্শনিকের মতো হাসিয়া বলিল,—শুনেছি। কিন্তু কি জানো ঘোষ, যে-মেয়েটিকে তুমি ভালোবেসেছিলে, সে তোমারই সৃষ্টি। তার মাধুর্য্যকে তুমি তোমার অন্তরের নিজস্ব রূপ দিয়েছিলে। যে-মেয়েটি অন্য একজনকে বিয়ে ক'রেছে সে তোমার শাশ্বতী নয়। তোমার শাশ্বতী তার সমস্ত মাধুর্য্য নিয়ে আজও তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

কথাটা না বুঝিয়া ঘোষ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এমন সময় মিরাণ্ডা আসিয়া বিশ্বেশ্বরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বেশ্বরের মন যখন রূপলোকে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন মিরাণ্ডাকে দেখিলেই তাহার সমস্ত অঙ্গ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল।

ঘরে আসিয়া বিশ্বেশ্বর নিজের চেয়ারটিতে বসিয়া বলিল, —বুঝতে পারলে? আজও তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

কিন্তু ঘোষের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল, সে ইহার একটি বর্ণও বোঝে নাই।

বিশ্বেশ্বরও কিন্তু আর বোঝাইবার চেষ্টা করিল না। অন্যমনস্কভাবে পা নড়াইতে নড়াইতে সে হঠাৎ উঠিয়া বালিশের তলা হইতে গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিরাণ্ডা তখন বারান্দার এক প্রান্তে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছিল। বিশ্বেশ্বর তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিশ্বেশ্বরের মনে তখন করুণা হইতেছিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে তাহার হাতে একটা সিগারেট গুঁজিয়া দিল। মিরাণ্ডার ক্রোধ তখন আর বাধা মানিল না। সে সিগারেটটা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিয়াই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না আর থামিতে চায় না।

বিশ্বেশ্বরের মনে তখন অনুশোচনা হইয়াছে। ছেলেমানুষ,—অমন করিয়া উঁহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া না দিলেও চলিত। সে তো কিছু করে নাই, গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র।

সে তাহাকে নীচে লইয়া গিয়া উঠানে পায়চারি করিতে-করিতে অনেক কথা বলিল। তবে তাহার রাগ ভাঙ্গিল।

—জানো মিরাণ্ডা, আজ বিকেলে আমার মা আসবেন, দেখা করতে। দশটা টাকা তিনি নিয়ে আসবেন। তার মধ্যে পাঁচটা টাকা তোমায় দোব। তুমি যা খুসী তাই কিনো।

মিরাণ্ডার মুখে হাসি ফুটিল। বলিল,—সত্যি দেবে?

—সত্যি দোব। কি কিনবে বলো তো?

—সে বল্‌বো না। একটা মজার জিনিস কেনার ভারি দরকার ছিল। বেশ হোলো।—বলিয়া কি মজার জিনিস কেনা যায় তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে মিরাণ্ডা খুসী হইয়া উঠিল।

দুপুর বেলার মধ্যে মিরাণ্ডা কথায়-কথায় বার দুই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছে, বিশ্বেশ্বরের মা ঠিক আসিবেন তো? তাহার ব্যাকুলতার কারণ ভাবিয়া বিশ্বেশ্বর না হাসিয়া পারে নাই।

পাঁচটার সময় জেল-আফিস হইতে লোক আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতে সে নীচে হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বরকে সংবাদ দিল, তাহার মা আসিয়াছেন। জেল আফিসের লোকও তখনই পৌছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে দেরী হইল না।

আনন্দময়ীর শরীর খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে কঠিন অসুখে পড়িয়া প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু পাছে বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠে, সেজন্য সংবাদটি বরাবর গোপন রাখা হইয়াছিল। গেল বারে গুণেন্দ্র একাই আসিয়া দেখা করিয়া ও টাকা দিয়া গিয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনে আনন্দময়ী আসিতে পারিলেন না, এই কথাই বিশ্বেশ্বরকে জানানো হইয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কি অসুখ ক'রেছিল মা? শরীর যে বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে।

আনন্দময়ী উত্তর দিলেন না। তিনি বিশ্বেশ্বরের দেহের পানে চাহিয়া আশঙ্কায় ও উদ্বেগে শিহরিয়া উঠিলেন, চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

তিনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর এ কি চেহারা হ'য়েছে বিশু! গাল ভেঙ্গে গেছে, সর্ব্বাঙ্গের চামড়ায় কর্কশতা এসেছে, চোখের কোণে কালি প'ড়েছে,—তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

বিশ্বেশ্বর কৃত্রিম উৎসাহের সহিত বলিল,—না, কষ্ট আর কি! জেলে টাকা না থাকলেই কষ্ট। টাকা থাকলে যা চাইবে তাই হাতের কাছে পাবে। সেই জন্যই তো বারে বারে টাকা চেয়ে তোমাদের বিরক্ত করি।

কিন্তু মায়ের চোখে কৃত্রিমতা ঢাকা পড়ে না। তাঁহার উদ্বেগ গেল না।

গুণেন্দ্রের পেটের মধ্যে অনেকগুলা কথা জমিয়া গজ্‌গজ্‌ করিতেছিল। কাহারও দেহসম্বন্ধে আলোচনায় তাহার কোন দিনই উৎসাহ নাই। তাহার ধারণা, অসুখ হইলেই মানুষের শরীর খারাপ হয়, এবং অসুখ সারিয়া গেলেই শরীরও সারিয়া যায়। ইহার জন্য চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাহারও ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। বিশ্বেশ্বর এবং আনন্দময়ী একটু চুপ করিতেই সে সেই অবসরে বলিল,—

—আমাদের কত বই হ'য়েছে, শুনেছ বিশুদা? এগারো শো'র বেশী। তারিণী চৌধুরীর মত লোকও একশো টাকা দিয়েছে। বালিকাবিদ্যালয়ে প্রায় একশোটি মেয়ে পড়ছে। জ্যেঠাইমার পাল্লায় প'ড়ে গ্রামে এমন একটি মেয়ে নেই, যে নারীমঙ্গল-সমিতির সভ্য নয়।

বিশ্বেশ্বর সোল্লাসে বলিল,—তাই নাকি!

—হাঁ।

—তারিণী চৌধুরীও।—বলো কি হে?

গুণেন্দ্র তো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—দিয়েছে কি সাধে? সেবার বাবা এসে এমনি কড়্‌কে দিয়ে গেলেন যে, বেচারী ভয়ে ভয়ে একশো টাকা দিয়ে দিল।

—তোমরা খুব বাহাদুর তো!—বলিয়া বিশ্বেশ্বর পিছনে চাহিয়া দেখিয়া লইল ডেপুটি জেলার কি করিতেছে।

—এইবারে বিশুদা, নির্ঘাৎ একটি ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খুলতে হবে।

বিশ্বেশ্বর একটু অন্যমনস্ক হইতেছিল। গুণেন্দ্রের কথা ঠিক শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুলতে হবে ?

—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম।

ঠিক সেই সময়েই ডেপুটি জেলার তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া থুতু ফেলিতে উঠিল।

বিশ্বেশ্বর সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—টাকা এনেছ ?

এবং কাহার কাছে টাকাটা আছে জানিতে না পারায়, চকিতের মধ্যে একবার মায়ের পানে, একবার গুণেন্দ্রের পানে চাহিল। গুণেন্দ্রের কাছেই টাকাটা ছিল। সে বাহির করিয়া দিতেই বিশ্বেশ্বর চট্ করিয়া তাহা পেণ্ট্‌লুনের পকেটে পূরিয়া ফেলিয়া যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে বলিল,—

হ্যাঁ, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমটা নিতান্তই চাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই জাতির বর্ত্তমান অধোগতির কারণ। মনের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য সব যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, শুধু এই একটা জিনিস ভুলেছি ব'লেই। আমার মনে হচ্ছে, এ সম্বন্ধে আমি একটা লিখিত স্কীমও ক'রেছিলাম। মণ্ডলীর আফিসে খুঁজলে পেতেও পারো।

গুণেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল,—সেইটে হঠাৎ একদিন পাওয়ার পরেই তো এ সঙ্কল্প আমাদের মাথায় এসেছে। সেদিন মণ্ডলীর বার্ষিক উৎসবে বাবা নিজে সভাপতি হ'য়েছিলেন। তোমার উল্লেখ ক'রে তিনি আমাদের বললেন, তোমার স্মৃতির সব চেয়ে বড় সম্মান তোমার ছবি পূজো ক'রে নয়। তুমি ফিরে এসে যেদিন দেখবে তোমার প্রত্যেকটি সঙ্কল্পকে আমরা রূপ দিতে পেরেছি, সেই দিনই তোমাকে আমরা সত্যিকার সম্মান দোব। আমি তখুনি তাঁকে তোমার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের স্কীমটি দেখালাম। সেটি প'ড়ে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তারই পিঠে দু'শো টাকা চাঁদা সই ক'রে দিলেন এবং বললেন, আরও টাকা তিনি উঠিয়ে দেবেন।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—আপাতত, একটি মাইনর স্কুল নিয়েই আরম্ভ কর। পরে আস্তে আস্তে হাই স্কুল করলেই চলবে। প্রথমেই যদি বড় ক'রে আরম্ভ কর, সামলাতে পারবে না।

গুণেন্দ্র বলিল,—না, এখন তো হাইস্কুল নয়। সে হবে তুমি ফিরে গেলে। তুমি হবে হেড মাষ্টার, আমি সেকেণ্ড মাষ্টার।

গুণেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি সেকেণ্ড মাষ্টার হবে কি? তুমি তো ততদিন নিশ্চয়ই একটা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি পেয়ে যাবে।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—হয়তো পাবো। অন্তত বাবা সেই চেষ্টাই করছেন। কিন্তু আমি স্থির ক'রেছি, গ্রামের কাজেই জীবন উৎসর্গ করবো। তোমার যা ব্রত, আমারও সেই ব্রত।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আমার কি ব্রত জানো ?

গুণেন্দ্রও হাসিয়া উত্তর দিল,—সব হয় তো জানি নে। কিন্তু যেটুকু জেনেছি—আমার মতো লোকের সমস্ত জীবনের পক্ষে তাই ঢের।

উত্তর শুনিয়া বিশ্বেশ্বরও হাসিল,—কিন্তু অত্যন্ত ফিকা, পাৎলা হাসি।

গুণেন্দ্রের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটি জেলার আসিয়া বলিল, সময় হইয়া গিয়াছে।

সকলকে উঠিতে হইল।

এতক্ষণে গুণেন্দ্রের আনন্দময়ীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—ওই যাঃ! জ্যাঠাইমা, তুমি তো এতক্ষণ একটা কথাও বলো নি।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস আনন্দময়ীর অন্তঃস্তল হইতে অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া বাতাসে মিলিয়া গেল। তিনি চলিতে চলিতে বলিলেন,—সব কথাই তো তুই বললি। আমার আর নতুন কি-ইবা বলার ছিল!

একটু থামিয়া, পিছন ফিরিয়া বিশ্বেশ্বরকে বলিলেন,—খুব সাবধানে থাকিস, বিশু।

আনন্দময়ীর নূতন কিছুই বলিবার ছিল না।

সংসারে তাঁহার বন্ধন বলিতে ওই একটি। ওইটিকে রাখিয়া তাঁহার স্বামী যেদিন পরলোক গমন করেন, সেদিন

তিনি শেষ অনুরোধ করিয়া যান,—বিশুকে মানুষ করিও। আনন্দময়ীকে ভাঙা মন আবার নূতন করিয়া বাঁধিতে হইল। বাঁচিবার আনন্দ যাঁহার শেষ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রাণ-ধারণের বিড়ম্বনা বড় কম নয়। কিন্তু চোখের জল চোখেই শুকাইয়া আনন্দময়ীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল;—বিশুকে মানুষ করিতে হইবে যে,—বিশুকে সর্ব্বপ্রকারে তাহার পিতার অনুরূপ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার স্বামীর শেষ আদেশ।

সহজ স্বচ্ছন্দতায় বিশ্বেশ্বর বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সে কি জানিত, তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের গতিবিধি তাহার ওই শুচিস্মিতা জননী সকলের অলক্ষ্যে নিয়ত লক্ষ্য করিতেছেন? —সকলের কাছে অতি সহজে যাহা গোপন করিয়া যাওয়া চলে, মায়ের কাছে তাহার কিছুই গোপন থাকে না?

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন! যাঁহাকে ছাড়িয়া একদিনও কি করিয়া বাঁচা যায় ভাবিতে আনন্দময়ী শিহরিয়া উঠিতেন, একদিন তাঁহারই চেয়ে তাঁহারই গচ্ছিত দ্রব্য মহার্ঘ হইয়া উঠিল। স্বামীর কথা আনন্দময়ীর আর মনেও পড়িত না। তাঁহার সকল চিন্তা, সমস্ত কর্ম্ম শুধু বিশ্বেশ্বরের পিছনেই নিয়োজিত হইল—তাহাকে মানুষ করিতে হইবে। সেই বিশ্বেশ্বর একদিন বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রে মানুষ হইল,—সন্তানের গর্ব্বে মায়ের বুক ভরিয়া উঠিল।

বহু কাল পরে সেই স্বামীকে স্মরণ করিয়া আজ কিন্তু আনন্দময়ীর মন হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কেবলি বলিতে লাগিল,—মানুষের ছেলেকে মানুষ করা যে এত অসম্ভব এ তো তুমি জানিতে প্রভু! তবে এত বড় পণ্ডশ্রমের বোঝা কেন আমার উপর দিয়া গেলে? আমি যে তোমার আদেশের মোহে তোমাকেও ভুলিয়া বসিয়াছিলাম।—

নূতন কথা? না, নূতন কথা কিছুই তাঁহার বলিবার নাই,—বিশুকেও না, পৃথিবীর কোনো মানুষকেই না। রসাল ভাবিয়া যে তরুটিকে এত কাল তিনি সুপ্রচুর স্নেহবারিসেচনে বড় করিলেন, আজ বুঝিলেন, তাহা রসাল নয়। মায়ের জীবনে ইহার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর আছে? তাঁহার ভাঙা মন শেষ বারের মতো ভাঙিয়া গেল।

অথচ, এমন কি-ই বা তিনি বিশ্বেশ্বরের চেহারায় দেখি-

নয়? চিরকাল সুখে লালিত বিশ্বেশ্বরের তাহাতে চেহারা খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা। শরীর অসুস্থ বলিয়াই গাল ভাঙি-য়াছে, হনু উঁচু হইয়াছে। দুর্ব্বলতার জন্য চোখের কোণে কালি পড়িয়া দৃষ্টি কিছু উগ্র হইয়াছে। ত্বকের কর্কশতা? তৈলাভাবে অমন হয়।

কিন্তু আনন্দময়ীর মন বলিল,—না, না, না।

অফিস ঘর হইতে বাহির হইয়াই বিশ্বেশ্বর যেন ওয়ার্ডে ফিরিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে আপন মনে একবার বিদ্রূপের সুরে বলিল,—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম! হুঁঃ।

গুণেন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার ভারি কৌতুক বোধ হইয়াছে। ছেলেমানুষ,—ভাবিয়াছে ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। সমস্ত মানুষ যেন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—কেবল গুণেন্দ্রের মুখের একটি কথার অপেক্ষা। এবং যে দিন সমস্ত মানুষ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিবে, সে দিন আর পৃথি-বীতে কোনো দুঃখ থাকিবে না। বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইবে, গাভী বহুক্ষীরা হইবে, সকল নারী সতী ও সকল পুরুষ সৎ হইবে, এবং পাপীকে জেল খাটাইবার জন্য পুণ্যবান আদালতে নালিশ করিবে না।

বিশ্বেশ্বর মনে-মনে খুব এক চোট হাসিয়া লইল।

তাহাকে ওয়ার্ডে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই মিরাণ্ডা ছুটিয়া আসিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার মা এসেছিলেন? খবর সব ভালো?

বিশ্বেশ্বর তাহার মাথাটি নাড়িয়া দিয়া বলিল,—হ্যাঁ, খবর সব ভালো,—মানে, দশ টাকা পাওয়া গেছে।

মিরাণ্ডা বেশ খুশী হইল। বলিল,—তোমার মা বেশ লোক। আমার মায়ের টাকা দেওয়ার নাম নেই,—এসে শুধু বাইবেলের উপদেশ দিয়ে যায়।

রাগিয়া বলিল,—ডাইনী বুড়ী!

ঘরের মধ্যে আসিয়া বিশ্বেশ্বর পেণ্টলুনের পকেট হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে পাঁচটি টেবিলের উপর রাখিয়া বাকী পাঁচটি পকেটে পূরিল

প্রভুর বিনানুমতিতে সম্মুখের মাংসখণ্ড গ্রহণ করিতে না

পাইয়া কুকুর যেমন লেজ নাড়িতে থাকে, টাকা কয়টি তুলিয়া লওয়া ঠিক হইবে কিনা স্থির করিতে না পারিয়া, মিরাণ্ডার দেহও সেইরূপ অস্থির হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর যেমন বলিল,—ও টাকা তোমার, তুমি নিয়ে যাও,—মিরাণ্ডা ঠিক চিলের মত ছোঁ মারিয়া তাহা লইয়াই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

তাহার পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর আর একদফা হাসিল ;—পৃথিবীর আর এক পিঠ।

এমন সময় চটি পায়ে ফট্‌ফট্ করিয়া পণ্ডিত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হোলো? দেশের খবর ভালো?

বিশ্বেশ্বর বলিল,—মায়ের শরীর খুব খারাপ দেখলাম। বোধ হয় অসুখ করেছিল, কিন্তু সে কথা লুকোলেন। ভাবলেন, আমি বোধ হয় ব্যস্ত হব।

পণ্ডিত বলিল,—ব্যস্ত হবারই তো কথা। তোমার তো ওই মা'টি ছাড়া আর কেউ নেই।

বিশ্বেশ্বর এ কথার জবাব দিল না, শুধু একটু হাসিল। তারপর বলিল,—আর একটি ছেলে এসেছিল, শুনেন। এবারে এম্-এ পাশ ক'রেছে। ওর বাবা ওর জন্মে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগিরির চেষ্টা করছেন। ওর কিন্তু অন্যরকম ইচ্ছা।

পণ্ডিত বলিল,—কেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তো ভালো চাকরী।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—ভালো চাকরীই তো। কিন্তু ও দেশোদ্ধার করতে চায়। আপাতত একটি ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খুলবে স্থির করেছে।

পণ্ডিত বলিল,—সে তো ভালো কথা।

—ভালো কথা? তুমি বলো কি পণ্ডিত! ব্রহ্মচর্য্যের মানে আছে? যতদিন যৌবন জাগে না, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য। একবার জাগলে আর রক্ষে আছে? এই শীতকালের দুপুর বেলায় দশ নম্বরের ছাদের উপর থেকে, কোনোদিন বা ওদিকের নেড়া অশ্বত্থ গাছের ডাল থেকে চিলের শীর্ণ, তীক্ষ্ণ ডাক শুনতে পাও? ওর ডাকে আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলতে থাকে। আমি জানি, ও ডাক আসে চিলীটির কণ্ঠ থেকে। ব্রহ্মচর্য্য! যেদিকেই চোখ মেল, দেখবে সমস্ত পৃথিবী দিবারাত্রি ব্রহ্মচর্য্য পালন করছে! ব্রহ্মচর্য্যই বটে!

বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—বেশ তো। ব্রহ্মচর্য্য না পালতে চাও, নাই পাললে। কিন্তু চট্‌ছো কার ওপর?

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—না, চটি নি। আমি বলছিলাম ·····এই যে ঘোষ! এসো, এসো।

ঘোষ একগাল হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা বিশ্বেশ্বর, তুমি কোনোদিন কবিতা লিখেছ

ঘোষের মন যে আজ খুবই প্রফুল্ল, তা তাহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যায়। নহিলে কয়েদীর কবিতা লিখিবার সখ হয়!

বিশ্বেশ্বর বলিল,—না। ও দুশ্চেষ্টা কোনোদিন করি নি। গোপনে গুণ্ গুণ্ ক'রে বেতালা গান গাওয়ার বেশী আর এগুতে পারি নি।

পণ্ডিত গম্ভীর ভাবে বলিল,—আমি লিখেছি।

ঘোষ এবং বিশ্বেশ্বর উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল,—তুমি লিখেছ? কবিতা?

পণ্ডিত পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল ;—

—তাহোলে বলি শোন,—আমার এক জ্যাঠামশাই ছিলেন। আমাদের সংসারে তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। আমরা একে একে ভূমিষ্ঠ হবামাত্রই তিনি ঠিক ক'রে ফেলতেন, আমাদের কে কি হবে। বড়দা ভূমিষ্ঠ হবামাত্র জ্যাঠামশাই একটা জজিয়তি তাঁর জন্যে আলাদা ক'রে রেখে দিলেন,—তিনি পাঁচ বছর বয়সেই মারা গেলেন। সম্ভবত সেইটিই পরে দ্বারিক মিত্তির পেয়েছিলেন। মেজদার এঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা। তিনি জ্যাঠামশায়ের কিছু মর্য্যাদা রেখেও ছিলেন ;—অনেক কষ্টে সাব-ওভারসিয়ার হ'লেন।

এইবার আমার পালা। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে-বাইরে ক্রমাগত শুনতে লাগলাম, আমি যে একটা মহামহোপাধ্যায় হ'য়ে পিতামহের মর্য্যাদা রাখবো এ একরকম ঠিকই হ'য়ে আছে। কিন্তু ক্রমাগত পাঁচবার চেষ্টা ক'রেও যখন কাব্যের উপাধিটি আয়ত্ত করতে পারলাম না, তখন জ্যাঠামশাই হতাশ হ'য়ে পড়লেন।

পঞ্চম বারের কাব্যের উপাধি পরীক্ষার ফল বেরবার পরদিন আমাকে বাইরের ঘরে ডেকে বললেন,—দেখ বাপু,

আর তুমি কাব্যের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারবে না।

এ বিষয়ে আমার নিজেরও কোনো সংশয় ছিল না। সবিনয়ে স্বীকার করলাম,—আজ্ঞে, না।

তিনি প্রশ্ন করলেন,—তাহোলে কি করবে স্থির করলে? বেটাছেলে একটা কিছু করা তো চাই।

কিছুই স্থির করি নি। সুতরাং চুপ ক'রেই রইলাম।

তিনি পুনশ্চ বললেন,—দেখ বাপু, ও সংস্কৃতের দিকে আর তোমার কিছু হবে না। তুমি বরং বাংলার চর্চ্চা করো।

আমি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি বললেন—আমাদের দ্বিজু ঠাকুরের ভাই, শুনলাম, বেশ কবিতা লিখছে। বিক্রীও কিছু কিছু হয়, দু'পয়সা হাতেও আসে।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিতভাবে বলিল,—দ্বিজু ঠাকুরের ভাইটি কে?

—রবীন্দ্রনাথ।—বলিয়া পণ্ডিত অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে তাহাদের মুখের পানে চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ঘোষ ও বিশ্বেশ্বর হাসিয়া অস্থির হইল।

ঘোষ বলিল,—তারপর দিন থেকে তুমি কবিতা লিখতে লাগলে?

—প্রত্যহ। সকালে উঠে খাতা পেন্সিল নিয়ে জ্যাঠা মহাশয়ের কাছে বসতে হোতো, দশটার সময় ছুটি পেতাম।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে পণ্ডিত অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল এবং একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—কিন্তু এমন স্নেহ-পরায়ণ মানুষ আর দুটি দেখিনি। এ পৃথিবীতে তিনি একটি ব্যতিক্রম।

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ উল্লাসভরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল,—দেখলে, ঘোষ, পণ্ডিতেরও দুর্ব্বলতা আছে।

১১

ইতিমধ্যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড হইয়া গেল,—যাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না।—

জেলে "সরকার সালাম" বলিয়া একটা বস্তু আছে। সকালে জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যখন কয়েদী-পরিদর্শনে বাহির হন, তখন প্রত্যেক ওয়ার্ডে কয়েদীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিলেই একজন সিপাহী হাঁকে,—সরকার—

কয়েদীরা কপালে হাত ঠেকাইয়া সমস্বরে বলে—সালাম!

ওদিকের রাজনীতিক ওয়ার্ডের বন্দীগণ জেদ ধরিয়া বসিলেন, তাঁহারা "সরকার সালাম" করিবেন না, তাঁহারা ছাপাখানায় কাজও করিবেন না। তাঁহাদের জেদ যত বাড়িয়া চলিল, তাঁহাদের উপর জুলুমও তত বাড়িতে লাগিল। শেষটা তাঁহারা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন।

পাঁচদিন, সাতদিন, দশদিন যায়।—জেল-কর্ত্তৃপক্ষও জেদ ছাড়েন না, রাজবন্দীগণও জেদ ছাড়েন না। বিশ্বেশ্বররা তাহাদের ওয়ার্ডে বসিয়াই প্রতি মুহূর্ত্তের সংবাদ পায়,—কোন্ রাজবন্দী অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন,—কাহাকে জোর করিয়া নলের সাহায্যে নাক দিয়া দুধ খাওয়াইতে গিয়া যথেষ্ট-পরিমাণ রক্ত পড়িয়াছে,—কে বিছানায় কেবলি ছটফট্ করিতেছেন, তাঁহার শয্যাকণ্টক আরম্ভ হইয়াছে,—কাহার ওজন কত পাউণ্ড কমিয়াছে। শুনিতে শুনিতে তাহাদেরও রক্ত গরম হইয়া ওঠে। তাহারাও তো ভদ্রসন্তান, এবং রাজবন্দীদের অপেক্ষা শিক্ষায়, দীক্ষায় ও সামাজিক পদমর্য্যাদায় কোনো অংশে হীন নয়। সুতরাং তাহারাই বা "সরকার সালাম" করিবে কেন? এবং ছাপাখানাতেই বা কাজ করিবে কেন?

ইহা লইয়া দিন দুই নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইল। দেখা গেল, তাহাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে জেলার আসিয়া এমন ভাবে ইঙ্গিতে তাহাদের শাসাইয়া গেল যে, তাহাদের এই গোপন সঙ্কল্প যে জেলারের কাণে উঠিয়াছে ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। অথচ কে যে এই ঘৃণিত গুপ্তচরের কাজ করিল তাহাও বোঝা গেল না।

কিন্তু শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার বুঝি একটা আদিম প্রবৃত্তি সকল মানুষের অন্তরেই লুকাইয়া থাকে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার সে একটা নেশা। বিশ্বেশ্বর ছিল ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের পাণ্ডা। সে সেইদিনই সকলকে ডাকাইয়া স্পষ্টই বলিল,—নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যেই কেহ এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু সে যেই হোক, তাহাতে তাহাদের কোনো ক্ষতিই হইবে না। কারণ, তাহাদের এই ব্যাপারে গোপন করিয়া রাখিবার কিছুই নাই।

তাহাদের দাবীসম্বন্ধে সে একটা খসড়া করিয়া আনিয়াছিল। সেটা সকলকে পড়িয়া শোনাইয়া সে ইহাতে সকলের স্বাক্ষর চাহিল। আরও জানাইল যে, পরের দিন সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিলেই তাঁহার হাতে ইহা দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর করিতে কাহারও আপত্তি হইল না। ফিরিঙ্গিরাও সানন্দে সই করিয়াছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় জেলার আসিয়া সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া গেল, তাহারা কাল সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে যে দাবী পেশ করিবে, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। তাহাদের এই দাবী কিছুতেই গ্রাহ্য হইবে না। যদি কেহ "সরকার সালাম" না করে, কিংবা প্রেসে যাইতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। একটা রাত্রি এখনও সময় আছে। সকলে স্থিরভাবে সমস্ত দিক ভাবিয়া দেখিয়া যেন কাজে নামে।

জেলার আর দাঁড়াইল না, গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে কি করিয়া সংবাদটি তাহার কাছে পৌঁছিল, তাহা কেহ ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিল না।

জেলার চলিয়া যাইবার পরে সকলেই অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। এবং সকলেরই মন দ্বিধাভয়ে টলমল করিতে লাগিল। টলমল করিবার কারণও আছে;—জেলের শাস্তি যে কত ভীষণ, তাহার স্বাদ ইহাদের মধ্যে অনেকেরই একাধিকবার করিয়া গ্রহণ করা আছে কি না! অধিকন্তু তাহাদের মধ্যেই কেহ-না-কেহ যে গুপ্তচরের কাজ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। সেই ব্যক্তি যে কে, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া প্রত্যেকের মন অপরের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। একতা না থাকিলে এমন কাজে হাত দেওয়া যায় না। সুতরাং কোনো কিছু স্থির হওয়ার পূর্ব্বেই সকলে নিজের-নিজের ঘরে উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই ঘোষ চুপি চুপি বিশ্বেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিল।

বিশ্বেশ্বরের মাথায় ঝড় বহিতেছে। সে শুধু ঘোষের পানে চোখ তুলিয়া একবার চাহিল, কোনো কথা কহিল না।

ঘোষ আস্তে-আস্তে বলিল,—আমার কিন্তু গ্রিফিথের ওপরই সন্দেহ হয়, বিশু। ওকে আমি খানিক আগে সিপাইটার সঙ্গে চুপি-চুপি কথা বলতে দেখেছি।

ইহার পরে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একে ফিরিঙ্গি, স্বভাবতই দেশীয়-বিদ্বেষী, তাহার উপর সিপাহীর সঙ্গে চুপি-চুপি কথা কহা।

বিশ্বেশ্বরের মাথা গরম হইয়া উঠিল। লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—মারবো শালাকে!

ঘোষ বহু কষ্টে তাহার রাগ থামাইল। বলিল,—থাক গে। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু এমন অবস্থায় আর এ কাজে হাত দেওয়া চলে না। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

অবশ্য ঘোষের অদৃষ্টে আর নূতন করিয়া কিছুই হইবার নাই। তাহার মেয়াদ শেষ হইয়াই আসিয়াছে। এই কয়টা দিন প্রেসের কাজ করিলেই বা কি, আর না করিলেই বা কি। স্বার্থ বেশী অন্যান্য সকলেরই।

বিশ্বেশ্বর কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

ক্রমাগত ফিস্ ফাস্ করিয়া ষড়যন্ত্র করার এবং একটা তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ক্রমাগত সচকিত ও সশঙ্কিত হইয়া চলায় একটা মাদকতা আসে। তাহা মানুষের শান্ত বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং তাহার সমস্ত অস্তিত্ব ওই কয়টি দাবীতে বিলীন হইয়া যায়,—পৃথক সত্তা থাকে না।

বিশ্বেশ্বর অস্থির ভাবে বলিল,—তুমি এখন যাও, ঘোষ। আমি ভেবে দেখি।

ঘোষ যেমন সন্তর্পণে আসিয়াছিল, তেমন সন্তর্পণে চলিয়া গেল।

কিন্তু কি ভাবিয়া দেখিবে সে?

শীতের রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না বাহিরে অপূর্ব্ব রহস্য-লোক সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিক ছমছম্ করিতেছে। মাঝে-মাঝে সিপাহীর ভারী বুটের শব্দ—খট্‌খট্ করিয়া বিকট শব্দ হয়, আবার আস্তে-আস্তে মিলাইয়া যায়;—টুপ্ টুপ্ করিয়া গুটি কয়েক পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে,—থাকিয়া থাকিয়া পায়খানার ফ্লাশ হইতে হুস্ হুস্ করিয়া জল নামে। আবার সিপাহীর বুটের আওয়াজ নিকটবর্ত্তী হয়,—আবার গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে টুপ্ টুপ্। মাঝে মাঝে পায়রাগুলি ঝট্ পট্ করে। জলের কল হইতে কনক-

কঙ্কণের মতো টুং টাং শব্দে একফোঁটা একফোঁটা করিয়া জল পড়ে। অকস্মাৎ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বিশ্বেশ্বর উঠিয়া বসে।

ওদিকে কয়বারই কয়েদীদের "গুণ্‌তি" হইয়া গেল। জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। বিশ্বেশ্বরের চোখে আর ঘুম নামে না।

কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কি সে ভাবিবে?

ধর্ম্মঘট করার শাস্তির কথা তাহার অবিদিত নয়। কাল সকালে দাবী জানাইবা মাত্র গোটাকয়েক যমদূতের মতো পেশোয়ারী এবং সিপাহী আসিয়া তাহাদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিবে। সে প্রহারে অনেকেই অজ্ঞান হইয়া যাইবে। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আবার নির্য্যাতন সুরু হইবে। এমনি করিয়া শাস্তিদাতারা যখন শাস্তি দিয়া-দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন কাহারও "নিৰ্জ্জন সেল", কাহারও "টিকটিকি", কাহারও বেত এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের "পেনাল ডায়েট"।

অথচ সমস্ত শাস্তির সম্ভাবনা জানিয়াও ওই রাজবন্দীর দল তাহাতে দ্বিধা করে নাই। উহারাও তাহাদেরই মতো ভদ্রসন্তান এবং মনের বলেও তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। উহারা যদি পারে, তাহারাই বা পারিবে না কেন?

না পারিবার কোনই হেতু নাই। তবু বিশ্বেশ্বরের মন স্থির হয় না,—মাঝে মাঝে সাহস জাগে,—মাঝে মাঝে এলাইয়া পড়ে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে, বংশমর্য্যাদায় এবং মনের বলে রাজবন্দীদের শ্রেষ্ঠত্ব সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। ওই তো কতকগুলা ছেলেকে মাঝে মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। উহারা নিশ্চয়ই ইস্কুলের পাঠ এখনো সাঙ্গ করিতে পারে নাই। হয়তো দলে পড়িয়া, বিশেষ কিছু না বুঝিয়াই জেলে আসিয়াছে। অথচ আজ দশদিন তাহারাও সকলের সঙ্গে প্রায়োপবেশন করিতেছে,—এখন পর্য্যন্ত তো টলে নাই। তাহারা কি ওই অতি-সাধারণ ছেলেদের চেয়েও হীন?

মুখে বলে, নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মনের মধ্যে একবিন্দুও সাহস খুঁজিয়া পায় না।

এমনি ধারা অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যেই বিশ্বেশ্বর একসময় ঘুমাইয়া পড়িল।

এই কয়দিনেই জেলের হাওয়া যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে সেই নাচ-গান, হাসি ও হুড়াহুড়ির চিহ্নমাত্র নাই। অকস্মাৎ বাতাস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকের বুকের ভিতরের বায়ুও যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

দুটি কয়েদীতে একত্র হইলেই শুধু স্বদেশী বাবুদের কথা। কাহার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে,—কাল দুপুরে কে বিছানায় পড়িয়া ক্রমাগত ছটফট করিয়াছে,—কাহার মা মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে বসিয়া আহার গ্রহণের জন্য সকাতরে বৃথাই অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন,—কেবলি এই সব কথা।

এমন সময় হয় তো ব্যস্ত ভাবে জেলার কয়েকজন সিপাহী ও পেশোয়ারী লইয়া তাহাদেরই পাশ দিয়া চলিয়া যায়। কয়েদীদের দুর্ব্বল চিত্ত ভয়ে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিয়া ওঠে। তাড়াতাড়ি তাহারা তফাৎ হইয়া বসে,—পাছে কেহ সন্দেহ করে। কিন্তু জেলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাহার মনে অন্য দুশ্চিন্তা।

জেলের ঘণ্টা বাজিলেই গভীর আশঙ্কায় তাহারা উৎকর্ণ হইয়া ওঠে,—"পাগ্‌লা ঘন্টি" নয় তো! এবং এই ভয় ও দুশ্চিন্তার পাশাপাশি আরও একটি ক্ষীণ স্রোতোধারা হৃদয়ের ক্ষেত্র দিয়া অতি সঙ্গোপনে বহিয়া চলিতেছে। হয় তো মিথ্যা আশা, অলীক কল্পনা,—এবং এ কথা পাশের লোকটির কাছে মুখ ফুটিয়া বলিবার পর্য্যন্ত সাহস নাই,—তবু, আনন্দ-পারাবারের মুমূর্ষু জোয়ারের সর্ব্বশেষ তরঙ্গটি সকলেরই বুকে একটুখানি ছোঁয়া দিয়া যায়। সকলেই মনে মনে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে,—হে ভগবান, আমাদেরও দয়া কর। আমরাও যে আর পারি না।

কিন্তু ভগবানের দয়া করিবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। তাহাদিগকে নিয়মিতই খাটিতে হয়। ভগবানের দয়ায় বিনায়াসে ঘানি হইতে তেল বাহির হয় না, পাথরও নরম হয় না। শুভ লক্ষণের মধ্যে কেবল এইটুকু দেখা গেল যে, তাহাদের উপর আরও কড়া পাহারা বসিয়া গিয়াছে এবং

সময়ে-অসময়ে তর্জ্জন-গর্জ্জনের মাত্রাও কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে; আগে খোলা থাকিবার যতখানি তাহারা সুবিধা পাইত, এখন তাহাও কমিয়াছে। কড়া পাহারায় তাহাদের কাজে যাইতে হয়, এবং কাজ শেষ হইলেই সিপাহী সকলকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া তালাবন্ধ করিয়া দেয়। কেবল স্নানাহারের সময়টুকু বাহিরে থাকিতে পায়। তাও তাড়ার উপর তাড়া,—জল্দী জল্দী করো।

তাহারা জল্দী করিয়াই সারিয়া লয় এবং রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া স্বদেশী বাবুদের কল্যাণের জন্য ভগবানের করুণা ভিক্ষা করে। মানুষের ঘুঁসের প্রতিশ্রুতিতে দেবতার ভাণ্ডার ভরিয়া ওঠে।

কোকেন-চোর নাটু তাহাদের পাড়ার কালীতলায় জোড়া পাঁঠা মানৎ করিয়াছে, নবী নওয়াজ পীরের দরগায় সিন্নি মানিয়াছে। সোনার বোতাম সেটটি বিক্রী করিয়া মহিমের গোটা পাঁচেক টাকা জমিয়াছিল, সুদে-আসলে তাহা কিছু বাড়িয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় স্পেশাল ওয়ার্ড হইতে ফিরিয়া অকস্মাৎ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া সেই যত্নসঞ্চিত অর্থ হইতে বুড়াশিবতলায় পাঁচ সিকার ভোগ সে মানিয়া বসিল। তাহাদের গ্রামের বুড়াশিব অতি জাগ্রত দেবতা। তাঁহার কৃপায় বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়,—বাত, হাঁপানী, অম্লশূলের রোগী তো ডুলিতে করিয়া আসে এবং হাঁটিয়া ফিরিয়া যায়।

মহিম মানতের কথা গোপন করিয়া শুধু বুড়াশিবের মাহাত্ম্যের কথাই সকলকে শুনাইয়া দিল। গ্রাম হইতে কিছু তফাতে বাদসাহী সড়কের ধারে অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির। কতকগুলি বট ও নিমের চারাগাছের উৎপাতে মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গে ফাট ধরিয়াছে। পাশেই একটা বিপুলায়তন বটবৃক্ষ।

মহিম বুড়াশিবের কথা ভুলিয়া গিয়া বলিল,—অতবড় বটগাছ আমি জীবনে দেখি নি,—জীবনে দেখি নি। দিনের বেলায় তার নীচে কিছু দেখবার উপায় নেই,—এমন অন্ধকার। আর শালা; রাজ্যের বাদুড় সেই গাছে। কিছু না হবে তো পাঁচ-সাত লাখ,—সমস্ত দিন গাছের ডালে পা আটকে ঝুলছে।

মহিম প্রত্যেকের মুখের পানে এক একবার করিয়া চাহিয়া হাসিল। সকলের মুখ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে হাঁ হইয়া গেল।

কেবল নাটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আপন মনেই হাসিল,—তাহাদের পাড়ার মা-কালীর মন্দিরের সমস্ত মেঝে মার্ব্বেল পাথরে বাধানো।

হাঁফ ছাড়িয়া বাচিয়াছে রঘুবীর সিং। বেষ্টো ইহাঁর জিম্মা হইতে পালাইয়া যাওয়ায় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলার জন্য বেচারীর ছয়মাস জেল হইয়াছে। এই রঘুবীর সিংএর চোখ পাকানোর চোটে কয়েদীরা সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, তখন ইহাকে যমদূতের মতো দেখাইত। কিন্তু সেই রঘুবীর সিপাহীর পোষাক ছাড়িয়া কিছুদিন পরে যেই জেল-পোষাকে আসিয়া উপস্থিত হইল, সবাই তো হাসিয়া খুন। কেহ চিমটি কাটিয়া দেয়, কেহ টিকি ধরিয়া টানে, কেহ বা অকারণেই মাথায় একটা চাঁটি মারে। রঘুবীরকে সমস্তই মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিতে হয়। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা সমীচীন নয়। এখন স্বদেশী বাবুদের ধর্ম্মঘটের ফলে তাহার উপর আর কেহ উৎপীড়ন করে না। সকলেরই মন চঞ্চল।

নাচ-গান বন্ধ হওয়ায় কেবল কানাই মাঝে-মাঝে আফ্‌-শোষ করে। এত শোক তাহার ভালো লাগে না। বলে,—ওদের ধর্ম্মঘট তো আমাদের কি বাবা? বেল পাক্‌লে কাকের কি?

নাটু চোখ পাকাইয়া ধমক দেয়,—চোপ্‌ শালা!

কানাই গজ্‌ গজ্‌ করিতে-করিতে শুইয়া পড়ে।

বিশ্বেশ্বর নিদ্রা হইতে উঠিয়া কেবল বসিয়া-বসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতেছে, এমন সময় নবী নওয়াজ আসিয়া একগাল হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল,—

খুব ভালো খবর মাষ্টার, স্বদেশী বাবুদের জিৎ হ'য়েছে।

বিশ্বেশ্বরের নিদ্রার ঘোর তখনও কাটে নাই,—নবী-নওয়াজের কথা বুঝিতে দেরী হইতেছিল।

নবী নওয়াজ পিছনে কেহ আছে কি না, আর একবার দেখিয়া লইয়া অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল,—কাল সন্ধ্যের পর খবর এসেছে, স্বদেশী বাবুদের আর "সরকার সালাম"ও করতে হবে না, ছাপাখানায় কাজও করতে হবে না

বলিয়া যেন তাহার নিজেরই জয় হইয়াছে, এমনি ভাবে সগর্ব্বে হাসিতে লাগিল। তখন বিশ্বেশ্বরের চোখের সুমুখে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

নবী নওয়াজের নিজের একটু স্বার্থ ছিল। স্বদেশী বাবুদের দেখা-দেখি যদি 'সাহেব-ওয়ার্ড' একটা কিছু করিতে পারে, তাহা হইলে, চাই-কি, তাহারাও একদিন কোমর বাঁধিয়া নিজেদের দাবী জোর গলায় জানাইতে পারে। কিন্তু 'সাহেব ওয়ার্ড'এর কয়েদীরা এমন ভাবে তাহাদের ওয়ার্ডে বন্ধ থাকে যে, বাহিরের সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ নয়। সেজন্য সে নিজের গরজেই তাহার 'মেটের পেটি'র জোরে তাহাদের ওয়ার্ডে আসিয়া গোপনে বিশ্বেশ্বরের কাছে সকল সংবাদ দিয়া যায়। এই গোয়েন্দাগিরি ধরা পড়িলে শাস্তির আশঙ্কা আছে। কিন্তু ভাবী স্বার্থের লোভে সেটুকু বিপদ সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নবী নওয়াজের বেশীক্ষণ বসিবার সময় ছিল না। কথাটা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইল।

বিশ্বেশ্বরের মনে তখন প্রবল আনন্দের ঝড় বহিতেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সকলকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং অতঃপর তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধেও মতামত প্রার্থনা করিল। রাজবন্দীদের জয়ে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই আপন-আপন ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—যতদিন তাহাদের দাবী পূর্ণ না হইবে, ততদিন কেহ কাজে যাইবে না, কিংবা আহার গ্রহণ করিবে না। তাহাদের উপর যত কিছু উৎপীড়নই চলুক না কেন, তাহারা কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইবে না।

উৎসাহে বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন কি, সকলের প্রতিজ্ঞাশেষে একতা ও তাহার শক্তিসম্বন্ধে উদাহরণ সমেত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিয়া বসিল, এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট না আসা পর্য্যন্ত সকলকে নিজের-নিজের ঘরে শান্ত ভাবে অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া, সে নিজের ঘরে চলিয়া আসিয়া সংগ্রাম-পরিচালনার উপায়-উদ্ভাবনে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু, সাতটা—আটটা—নয়টা বাজিয়া গেল, না জেলার না সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কাহারও আসিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আটটার মধ্যে মারধোর যা হোক একটা কিছু হইয়া যাইবে, সকলেই সেজন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। এমন ভাবে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা চলে না। জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাহাকেও না দেখিয়া সকলেই ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এবং সেই উৎকণ্ঠা দমন করিতে না পারিয়া একে একে বিশ্বেশ্বরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিশ্বেশ্বরের ইহাতে একটু আপত্তি ছিল। সে নেতা সাজিতে চায় না,—নেতৃত্বের অনেক বিপদ আছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাদের নেতা কে? এবং নেতৃপদের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিরও গুরুত্ব বাড়িবে। সেই জন্য সে সকলকে এই কথাই বলিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদের কোনো বিশেষ নেতা নাই।

আর তাহারই ঘরে সকলের সমাবেশ!

সে সকলকে নিজের-নিজের ঘরে যাইবার জন্য আদেশ করিল।

এমন সময় নীচে অনেকগুলা ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল। সুতরাং যাহারা নিজের-নিজের ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়াছিল, তাহাদেরও আর চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। সকলেই স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে-দেখিতে জেলার একদল সার্জ্জেণ্ট ও সিপাহী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল।

জেলার আসিয়াই বলিল,—বিশ্বেশ্বর, তোমাকে একবার আফিসে যেতে হবে।

বিশ্বেশ্বরের মুখ শুকাইয়া গেল। সে নীরবে বাহিরে আসিতেই দু'জন সিপাহী তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

এইবারে বাকী সকলের পালা। জেলার তাহাদের পানে অনেকক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এবং তারপরে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—তোমরা তা হোলে ধর্ম্মঘট করাই স্থির করলে? উঁ?

ভয়ে এবং ভাবনায় কাহারও মগজে তখন আর কিছু প্রবেশ করিতেছে না। চিরদিনের অভ্যাস মতো ওইটুকু ঘরের মধ্যেই একেবারে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া তাহারা তখন সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাহারও মুখে কথা ফুটিতেছে না।

জেলার আবার এক ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি স্থির করলে? উঁ?

কিন্তু উত্তর দিবে কে? জেলারের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও কেহ সাহস করিতেছে না। সকলে কাঁপিয়া, ঘামিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

মিনিট খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জেলার উত্তরের প্রতীক্ষায় প্রত্যেকের মুখের পানে একবার করিয়া চাহিল। বাহিরের সার্জেণ্ট ও সিপাহীগুলা যুদ্ধের ঘোড়ার মতো অস্থির ভাবে পা ঠুকিতেছে। ইহারা বীর পুরুষ, অনর্থক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। জেলার হুকুম দিলে ইহারা নিমেষ ফেলিতে-না-ফেলিতে বন্দীদের মারিয়া শোয়াইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। কিন্তু জেলারের আদেশ আসিতে দেরী হইতেছিল।

কয়েদীদের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে-মনে হাসি আসিতেছিল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আদেশ দিল,—যারা কাজ করতে চায়, তারা নীচে গিয়ে লাইনবন্দী দাঁড়াক।

মিনিটখানিক কয়েদীদের নড়িবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাহারা বোধ হয় পাথরের মূর্ত্তির মতো অচল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জেলার জোরে মাটিতে একটা পা ফেলিয়া তাহাদের দিকে এক পা আগাইয়া আসিতেই তাহারা সুড় সুড় করিয়া একে একে নীচে চলিয়া গেল।

পিছনে দাঁড়াইয়া জেলার আর একবার উদ্গত হাসি চাপিয়া গেল।

কিন্তু এত শীঘ্র ব্যাপারটি শেষ হইয়া যাওয়ায় সিপাহী রাম-আশিস্ সিংএর আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। হাতটা তাহার নিস্ পিস্ করিতেছিল। মনের ক্ষোভ চাপিতে না পারিয়া সে বিরক্তিভরে বলিল,—জেনানা আদমী কাঁহাকা।

সমস্ত দিন বিশ্বেশ্বরের আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। সে যে কোথায় আছে এবং কি শাস্তি ভোগ করিতেছে তাহার কিছুই কেহ জানিতে পারিল না। সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করিতে গেলে জবাব মেলে না। যাহারা ভালো মানুষ তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত তেজস্বী তাহারা ধমক দেয়,—আপনা কাম করো জী। দুসরে কো বাৎ মৎ পুছনা।

হয়তো তাহারাও কিছু জানে না। কি করিয়া জানিবে? জমাদার আসিয়া কাঠের পুতুলের মতো এক-এক জনকে এক-এক দরজায় বসাইয়া দিয়া যায়। সেখান হইতে তাহাদের নড়িবার উপায় নাই। কিন্তু কয়েদীদের কাছে 'জানি না' একথা স্বীকার করিলে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা আছে। তাহারা যে কর্ত্তৃ-পক্ষের কেহ নয়, এ কথা তো উহাদের কাছে বলা চলে না!

তাহাদের ওয়ার্ডারটা হয়তো কিছু জানে। গ্রিফিথ তাহাকে সিগারেট দিয়া এবং আরও বিবিধ প্রকারে খোসামোদ করিয়া খবরটি জানিতে চাহিল। ওয়ার্ডার সিগারেট পকেটে পুরিল, কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়া, শুধু একটু হাসিয়া সরিয়া পড়িল।

খবর কিছুতেই জানা যায় না। এবং জেল-কর্ম্মচারীরা যতই খবরটি গোপন করিয়া যায়, ইহাদের আশঙ্কাও ততই বাড়িতে থাকে।

অবশেষে বেলা চারিটার সময় নবী নওয়াজ পণ্ডিতকে গোপনে বলিয়া গেল, বিশ্বেশ্বরকে চৌদ্দ ডিগ্রী সেলে রাখা হইয়াছে,—সাত দিনের সাজা। এবং আরও বলিয়া গেল, ঘোষ না কে আছে, তাকে যেন বিশ্বাস করা না হয়।

পণ্ডিত বিস্মিত ভাবে বলিল,—কেন?

চলিয়া যাইতে যাইতে নবী নওয়াজ বলিয়া গেল,—সে গোয়েন্দা। সাত দিনের মধ্যে সে ছাড়া পাবে।

পণ্ডিত তো অবাক! ঘোষ গোয়েন্দা? মাথা-পাগল মতন দেখিতে,—চুপ করিয়া থাকে,—অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথা কয়,—

কে জানে! সে-ই তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত খবর জেলারের কাছে জানাইত? কিন্তু কি করিয়া? তাহাদের কাহারও তো বাহিরে যাইবার উপায় নাই, জেলারও তাহার মধ্যে ভিতরে আসে নাই। তবে? আর এত খবর ওই লোকটিই বা জানিল কি করিয়া?

কিন্তু পণ্ডিত পাকা লোক। কথাটি কাহারও কাছে ফাঁস করিল না, চাপিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে গ্রিফিথ নীচে হইতে আসিয়া বলিল,—খবর শুনেছ ?

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল,—না। কি খবর ?

উত্তেজনায় গ্রিফিথের যেন স্বর বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে কোনো মতে বলিল,—এমন ক'রে তাকে বেত মারা হ'য়েছে যে, সে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে।

কথাটা শুনিয়া কাহারও আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না,—সকলেই গ্রিফিথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষের মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল। সে মুখ চুণ করিয়া মৃদুস্বরে কেবল বলিল,—না, না।

গ্রিফিথ বিরক্ত ভাবে বলিল,—না তো কি আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে গেল ?

পণ্ডিত ধীর ভাবে প্রশ্ন করিল,—খবরটা দিলে কে ?

সে কথা গ্রিফিথ বলিবে না। তবে সংবাদটি যে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গিয়াছে তাহার সে বিষয়ে সংশয় নাই।

পণ্ডিত বিশ বাঁও জলে গিয়া পড়িল। সেও একটা সংবাদ পাইয়াছে। কিন্তু সে অন্যরূপ। এবং তাহার সংবাদদাতার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সে গ্রিফিথের মতো অতখানি নিঃসংশয়ও নয়। বিশেষ, ঘোষের সম্বন্ধে নবী নওয়াজ যাহা বলিয়া গিয়াছে, অন্য কেহ হইলে তাহা তো তখনি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু পণ্ডিত নাকি ঝানু লোক, মানুষের সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কোনো কিছুই এক কথায় ঠেলিয়া ফেলে না, তাই সে-কথার জের এখনও মনে-মনে টানিতেছে।

সে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি এখন হাসপাতালেই থাকবে ?—না এই খানেই ফের নিয়ে আসবে ?

তাহাকে যে এই ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কোথাও রাখিতে পারে, এ প্রশ্ন গ্রিফিথের মনে আদৌ ওঠে নাই। সে বোকার মত বলিল,—সে কথা তো জিজ্ঞেস করি নি।

কথাটা মিথ্যা হইলে ঘোষ যেন বাঁচিয়া যায়। সে সাগ্রহে বলিল,—তাহোলে খবরটা হয় তো সত্যি নয়, গ্রিফিথ।

গ্রিফিথ দাঁত বাহির করিয়া ভেংচাইয়া বলিল,—না সত্যি নয় !

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আর একটা নূতনতর খবর পাওয়া গেল,—বিশ্বেশ্বরকে এখান হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে চালান করা হইয়াছে। খবরটা আনিল জোসেফ, এবং এই অজ্ঞাতনামা সংবাদদাতার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও জোসেফের সন্দেহ নাই।

সে আরও বলিল, মারের খবরটা সত্যি, কিন্তু অতখানি নয়। একটা সিপাহী তাহাকে গোটা দুই ব্যাটনের গুঁতা দিয়াছিল মাত্র। বিশ্বেশ্বর চ্যাঁচাইয়াছিল, কিন্তু অজ্ঞান হইয়া যায় নাই। আর হাসপাতালে আনার খবরটা তাহা মিথ্যা,—তাহা মিথ্যা। বলিয়া তাহার মুঠাটি দুম্ করিয়া টেবিলের উপর ঠুকিল।

কিন্তু বহু কষ্টে এবং অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া গ্রিফিথ যে খবর সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা এত সহজে এক কথায় মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। তাহার খবর যে সত্য, তাহা সে বারংবার জোর গলায় প্রচার করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে জোসেফও নিরস্ত হইবার পাত্র নয়,—তাহাকেও সংবাদ-সংগ্রহে কম বেগ পাইতে হয় নাই। এমনি ভাবে উভয় পক্ষ অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া শেষে যখন আর তাহাতে পোষাইল না, তখন উভয়েই আস্তিন গুটাইয়া ঘুঁসি বাগাইয়া দাঁড়াইল।

হয়তো মুষ্টি-যুদ্ধই হইত, কিন্তু জেলার আসিয়া পড়ায় সে সুবিধা আর ঘটিয়া উঠিল না। উভয়েই উদ্যত মুষ্টি সম্বরণ করিল। গ্রিফিথের যেন রোখ চড়িয়া গিয়াছিল। জেলার-কয়েদী-সম্বন্ধ ভুলিয়া সে সটান জেলারের কাছে গিয়া প্রশ্ন করিল,—I say Mr. Graham, বিশ্বেশ্বর কোথায় ?

জেলার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—You demand that of me, do you ?

গ্রিফিথ ভয়ে দুই পা পিছাইয়া আসিল।

জেলারের রাগিয়া উঠিতে এক মিনিটের বেশী দেরী হয় না। কিন্তু কেহ তাহার ক্রোধকে ভয় করিতেছে জানিতে পারিলেই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। সে হাসি দেখিয়া কয়েদীরা আবার তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

জেলারের কাছেই সত্য সংবাদ পাওয়া গেল। গ্রিফিথ এবং জোসেফ দু'জনের সংবাদই মিথ্যা,—পণ্ডিতকে নবী নওয়াজ যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহাই সত্য। অর্থাৎ চৌদ্দ ডিগ্রি সেলে সাত দিনের জন্য নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে জেলার বন্ধুভাবে বলিল,—ছোকরার জন্যে আমি সত্যই ভারি দুঃখিত। কিন্তু ধর্ম্মঘট করার মতলব কি ক'রে যে ওর মাথায় এলো! অথচ, আমি নিজে এসে বার বার নিষেধ ক'রে গেছি। তবে সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের হাতে-পায়ে ধরলে দু'-তিন দিন পরে ছেড়েও দিতে পারে। আমি নিজেও তার জন্যে চেষ্টা করব। Poor fellow!

—হয়তো করিবে। স্ত্রীর ভয়ে সে প্রায়ই বাহিরে-বাহিরে ফিরে। কয়েদীদের ক্রমাগত খবর্দ্দারী করিয়া তাহাদের উপর একটু মমত্ববোধও জন্মিয়া যায়। যাহারা অনেক জেলের জল খাইয়াছে তাহারা বলে, এমন জেলার বড় একটা দেখা যায় না।

কি করিয়া যে চৌদ্দ ডিগ্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এখন আর বিশ্বেশ্বর তাহা স্মরণ করিতে পারে না। দুই জন সিপাহী যখন তাহাকে লইয়া বাহির হইল, সে মনে করিল ইহলোকের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,—এ পৃথিবীর সম্বন্ধে আর কিছু না ভাবিলেও চলিবে।

অমনি একটা মানসিক অবস্থা লইয়া সে সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের সম্মুখীন হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেশী লোক, দেশী লোকের দরদ, অন্ততঃ মনে-মনেও বোঝেন। কিন্তু তিনি যে কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সে তাহার আদৌ উত্তর দিয়াছিল কিনা অথবা কি উত্তর দিয়াছিল, স্মৃতিপটে তাহার আর চিহ্নমাত্র নাই। যে দু'টি সিপাহীর সঙ্গে নিজের ওয়ার্ড হইতে বাহির হইয়াছিল, একান্ত বিহ্বল ভাবে আবার তাহাদেরই সঙ্গে চৌদ্দ ডিগ্রীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একতলা একখানা বাড়ী;—মধ্যে পাচীল দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে দু'টি করিয়া 'সেল',—সুমুখে ছোট্ট একফালি উঠান। সেলের প্রবেশ-পথে আর একখানি করিয়া ছোট ঘর এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, ভিতর হইতে বাহিরের কিছু দেখিবার উপায় নাই,—এক টুকরা আকাশ পর্য্যন্ত না।

এমনি একখানি ঘরে অনেকক্ষণ কম্বল বিছাইয়া শুইয়া থাকিবার পর বিশ্বেশ্বরের চেতনা ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে সে বুঝিল, তাহাকে 'সেল'এ আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের তীব্র দৃষ্টির ও পুনঃ পুনঃ অস্বস্তিকর প্রশ্নের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া প্রথমটা 'সেল'ও তাহার স্বর্গ মনে হইল। সে পরমানন্দে একটা গান ধরিয়া দিল।

কিন্তু গান গাহিয়া আর কতক্ষণ কাটানো যায়! সে আস্তে-আস্তে উঠিয়া লোহার শিক দেওয়া দরজায় চোখ লাগাইয়া দেখিল,—সুমুখের একটু নির্জ্জন ঘর, তাহার ওপ্রান্তে আবার একটা দরজা। সেই দরজার ওদিকে কিছু দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু ভারি বুটের শব্দ শুনিয়া মনে হয়, ওখানে একটা সিপাহী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বেশ্বর সবিনয়ে ডাকিল,—সিপাহী জি!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু সিপাহীর বুটের শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল,—ডাক সম্ভবত তাহার কাণে পৌঁছিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর আরও করুণ স্বরে ডাকিল,—সিপাহী জি!

একটা ভারি গলায় উত্তর আসিল,—কেয়া?

—একঠো বিড়ি তো পিলাইয়ে।

আর কোনো উত্তর পাওয়া গেল না; বুট আবার টহল দিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।—তাইতো! ধূম-পানের কোনো সুবিধাই নাই যে! সে নিরুপায় ভাবে আবার কম্বলের উপর শুইয়া পড়িল। সে দিন এবং সে রাত্রি একবার বসিয়া, একবার শুইয়া এবং দু'বেলা দু'মুঠা আহার করিয়া কোনো রকমে কাটাইয়া দিল। বহুদিন গুরু পরি-শ্রমের পর এ বিশ্রাম তাহার মন্দ লাগিল না। কষ্টের মধ্যে ধূমপানের অভাব এবং রাত্রের ছারপোকা। মশাও আছে; কিন্তু এখনও শীত যায় নাই, আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। কিন্তু ছারপোকার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনো উপায় নাই।

হ্যাঁ, ছারপোকা বটে। একশো নয়, দু'শো নয়, একে-বারে অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী,—নানাভাগে বিভক্ত হইয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করে। মাঝে-মাঝে ঘটোৎকচের মতো সে ইহাদের উপর দিয়া নিজের দেহটা রোলারের মতো চালাইয়া দেয়,—রক্তে তাহার শরীর ভিজিয়া যায়। তবু কি ইহাদের সংখ্যা কমে? আবার কোথা হইতে নূতন

আর একদল আসিয়া দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করে। বিশ্বেশ্বরের গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে মন হয়; লজ্জায় পারে না। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া কুস্তি করে।

ভোরের দিকে ছারপোকা-বাহিনী আস্তে-আস্তে চলিয়া যাইবার পর তার চোখে নিদ্রা নামিল। কিন্তু ভালো করিয়া জমিতে-না-জমিতেই সিপাহী তাহাকে প্রাতঃকৃত্যের জন্য উঠাইয়া দিল।

বাহিরে আসিতেই গভীর পরিতৃপ্তিতে সে বলিয়া উঠিল,—আঃ!

এই রবিকর এবং ওই আকাশ সে যেন বহুদিন দেখে নাই।

কিন্তু আধঘণ্টা মাত্র সময়। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিবার পর আর আকাশ দেখিবার বেশী অবকাশ মিলিল না।

আবার সেই সেল।

একটা সিগারেট পাওয়া যায় না?—অন্ততঃ একটা বিড়ি? কিন্তু সিপাহীটা ডাকিলে সাড়া দেয় না, কথা কহিতে গেলে কথা কয় না। নিয়ম নাই না কি?

হঠাৎ মনে পড়িল, সেই ছারপোকাগুলা? তাহার পোষাক রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে,—হাত ও পায়ের নিম্নার্দ্ধে বসন্তের গুটির মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কম্বল উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়াও জীবিত ছারপোকার চিহ্নমাত্র পাইল না।

সে পরম পরিতোষের সঙ্গে সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। একে অনিদ্রা, তার উপর সারারাত ছারপোকার সঙ্গে কুস্তি! তাহার সর্ব্বশরীরে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল। তবু শুইয়া থাকিতে পারিল না। শুইয়া থাকিতে কতক্ষণ ভালো লাগে? সে আবার উঠিয়া দেওয়ালগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

হঠাৎ একজায়গায় দেখিল নখে করিয়া চুণবালি কাটিয়া একজায়গায় লেখা আছে, নরহরি। আঁকা-বাঁকা লেখা,—তাহার উপর [illegible] ড়িয়াছে, তবু পড়া যা[illegible]

[illegible]ঃ মন্দ নয় তো!

[illegible]রহরিকে সে চেনে না। কিন্তু 'এক পালকের পাখী' নিশ্চয়ই। তাহার মনে হইল, ও তো শুধু কয়েকটি অক্ষরে লেখা তাহারই কোনো হতভাগ্য সতীর্থের নাম নয়, ও যেন নরহরি স্বয়ং। ওর সঙ্গে যেন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া গল্প করা যায়। সে মুগ্ধ নেত্রে অপটু হস্তের ওই কয়টি হরফের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় বাহিরে তালা খোলার শব্দ হইল,—পর পর দুইটি তালা। এবং তারপরেই সিপাহীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া একজন কয়েদী তাহার ভাত লইয়া আসিল। কাল্‌কের সেই লোকটি নয়,—ইহাকে যেন চেনা-চেনা মনে হইল, বোধ হয় নবী নওয়াজের ওয়ার্ডে দেখিয়া থাকিবে,—কিংবা অন্য কোথাও।

লোকটি ফিক্ করিয়া একটু হাসিল মাত্র। কোনো কথা না কহিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল;—সিপাহীটিও। আবার পর পর দুইটা তালা পড়িল,—ঘটাং ঘট্।

চেনা লোকই বটে। তাহাকে দেখিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়াও গেল। বিশ্বেশ্বরের আপশোষ হইল, উহার নিকট তাহাদের ওয়ার্ডের ধর্ম্মঘটের খবরটা লওয়া হইল না!

—সিপাহী জি!

উত্তর আসিল না।

বিশ্বেশ্বর আবার সকাতরে ডাকিল,—এ সিপাহী জি!

—কেয়া?

কাল্‌কের সেই সিপাহীটি নয়,—ইহার গলা অতখানি বাজখাই নয়, একটু মিষ্টত্ব আছে।

সাহস পাইয়া বিশ্বেশ্বর সবিনয়ে বলিল,—শুনিয়ে।

—বলিয়ে না।

একটু ইতস্তত করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—সাহেব ওয়ার্ডকো ধরমঘট চল্‌তা হৈ?

—বাৎ মৎ বোল্‌না বাবুজি,—বাৎ বোল্‌নে মানা হৈ।

তাড়াতাড়ি বিশ্বেশ্বর বলিল,—শ্রেফ এহি এক্‌ঠো বাৎকো জবাব দেও সিপাহীজি,—আউর দু'সরে বাৎ নেহি পুছেঙ্গে।

সিপাহীটা একটুক্ষণ কি ভাবিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—ধরমঘট নেহি হুয়া।

—নেহি হুয়া? একদম নেহি হুয়া?

আর কোনো জবাব মিলিল না।

বিশ্বেশ্বরের ক্ষুধা ছিল না। তবু যা-হোক্ দু'মুঠা এখনই খাইয়া লইতে হইবে। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ও-ভাত আর মুখে দিবার উপায় থাকিবে না।

কিন্তু মিছামিছি এ কী দুর্ভোগ! নির্জ্জন কারায় সহস্র কষ্ট ভোগ করিয়াও সে মনে-মনে এই সান্ত্বনা পাইতেছিল, সে একজন martyr—আপাতত নিজের জন্য হইলেও ভবিষ্যতে তাহারই মতো আর যে সমস্ত হতভাগ্যকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আশ্রয় লইতে হইবে, তাহাদের সকলের জন্য সে মস্ত বড় একটা কিছু করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সে গৌরব রহিল কোথায়? তাহার সঙ্গীরা তাহাদের দাবী বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে। এখন আর এই দুঃখভোগের সার্থকতা কি? নিজের ভাগ্যের উপর বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনর্থক দুঃখভোগ করাই বুঝি তাহার বিধিলিপি।

ক্রোধে, ক্ষোভে ও অনুশোচনায় তাহার গলা দিয়া ভাত যেন আর নামে না—তবু দলা-দলা সেই পিণ্ড উদরে পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

হঠাৎ ভাতের মধ্যে কি যেন তাহার হাতে ঠেকিয়া খড়্‌খড়্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মধ্যের ভাত একপাশে ঠেলিয়া রাখিতেই দেখিল, এক টুকরা কাগজ সযত্নে ভাঁজ করা। ভাঁজ খুলিতেই চোখে পড়িল, বেশ স্পষ্ট করিয়া পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—কিছুমাত্র ভাবিও না। তোমার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টায় আছি।

কে এই 'আমরা', এবং তাহার জন্য কি বিশেষ চেষ্টায় আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। হাতের লেখাও চিনিতে পারিল না কিন্তু এই দুই ছত্র লেখার মধ্যে তাহার মুক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কবে চেষ্টা করিবে তাহারা? কবে এই পাতালপুরী হইতে মুক্তি পাইবে সে?

রাত্রে ঘুম হয় নাই, দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। সময়ও তো কাটানো চাই। কিন্তু ঘুম যেন চোখ হইতে পালাইয়া গিয়াছে। ঘুম আসিল না, বার বার চিঠিখানিই পড়িতে লাগিল। কিন্তু একচিঠি কতবারই বা পড়া যায়? বিছানা ছাড়িয়া আবার সে দেওয়ালে আর কোথাও কিছু লেখা আছে কি না, দেখিবার জন্য উঠিল।

পিছনের দেওয়ালে ইহার মধ্যে সে একবারও তাকায় নাই। সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল,—ওটা রক্তের দাগ নয়? রক্তের দাগই তো,—একবার চুণকাম করা হইয়াছে বটে, তবু স্পষ্ট রক্তের দাগ!

বিশ্বেশ্বর সেই দিকে সরিয়া আসিল,—ব ন্দে মা ত র ম্।

রক্তের দাগই বটে,—কিন্তু মানুষের নয়, ছারপোকার। ইতিপূর্ব্বে আর একজন কেউ তাহারই মতো রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই। একটি-একটি করিয়া ছারপোকা মারিয়াছে, আর তাহারই রক্তে লিখিয়াছে, ব ন্দে মা ত র ম্।

লোকটি তাহার চেয়ে বুদ্ধিমান নিশ্চয়। সমস্ত রাত্রি কুস্তি করার চেয়ে রাত্রি কাটাইবার এই কৌশলই ভালো। বিশ্বেশ্বর মনে-মনে একচোট হাসিয়া লোকটির বুদ্ধির তারিফ করিল।

কিন্তু নির্জ্জন কারাবাসের ক্লেশই এই যে, কোনো একটা বিষয়ে মনঃসংযোগের শক্তি থাকে না। বিশ্বেশ্বর আবার চারিদিকের দেওয়াল দেখিয়া ঘুরিতে লাগিল। বহু লোকই নখে খুদিয়া তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল, এ যেন একখানি ইতিহাস।—মানুষের নয়,—এই কারাকক্ষের,—বহু মানুষের পায়ের স্পর্শে এই পাষাণী যেন প্রাণ পাইয়াছে। এ যেন একটি সজীব, মূক প্রতিমা, ওই কয়টি লেখায় আপনার ব্যথিত হৃদয়-দুয়ার উদ্ঘাটিত করিতেছে। উহারই ব্যথা মানুষের ব্যথায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

দেওয়ালে-দেওয়ালে বহু লোকের নামই লেখা আছে,—একটি নারীরও। মেয়েটি নিশ্চয় এখানে আসে নাই। হয়তো তাহার প্রিয়তম নিজের নাম না লিখিয়া ওই দেওয়ালে তাহারই নাম লিখিয়া গিয়াছে।

সেই নামটি দেখিতে-দেখিতে তাহার মাথায় ভূত চাপিল। সে-ও নখে করিয়া লিখিতে বসিল,—একটি মেয়ের নাম,—কিন্তু অমলার নয়,—কাহার তা সে-ও জানে না। তার নীচে আর একটি মেয়ের নাম, তার নীচে আর একটি। এবং বেশ করিয়া সেই তিনটি নাম পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বার বার দেখিয়া, বদ্ধ পাগলের মতো হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার নূতন তিনটি খেলার সাথী জুটিয়াছে।—

একটা টিকটিকি মাঝে মাঝে এই ঘরে আহার-অন্বেষণের জন্য আসে। ঘুলঘুলির ওদিকে কোথাও থাকে সে। সেখান হইতে কালো কালো চোখ নাচাইয়া সতর্ক দৃষ্টি হানিয়া অতি সাবধানে আঁকিয়া বাঁকিয়া দেওয়াল বহিয়া নামে। তাহার দুর্ব্বল গতিভঙ্গি দেখিতে বিশ্বেশ্বরের কৌতুক বোধ হয়।

এই কৌতুক একদিন টিকটিকিটির পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিল। একটা মাছি কাছেই দেওয়ালের গায়ে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া পিছনের দুটি পা দিয়া পাখা সাফ্ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া টিকটিকির লোভ জাগিল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাছিটার পানে চাহিয়া বিদ্যুদ্-বেগে গিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য কেবল উদ্যম করিতেছে, এমন সময় বিশ্বেশ্বর গিয়া তাহার লেজটি আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিল।

শিকার করা আর হইল না। টিকটিকিটা ডাহিনে বামে কোমর হেলাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বিশ্বেশ্বরের কবল হইতে মুক্ত করিয়া একদিকে দৌড় দিল বটে, কিন্তু লেজটুকু আর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিল না; বিশ্বেশ্বরের কাছেই রহিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরের অত্যন্ত দুঃখ হইল;—যদি টিকটিকিটা আর না আসে! এবং টিকটিকিটা আর না আসিলে সে কি করিয়া দিন কাটাইবে ভাবিতে গিয়া সত্য সত্যই বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ দিন কাটাইবার ও-যে মস্ত বড় একটা অবলম্বন। বিশ্বেশ্বর বার বার আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু টিকটিকির লজ্জা নাই। লাঙ্গুলের দুঃখ ভুলিতে তার দেরী হইল না। পাঁচ মিনিট পরেই দেখা গেল আবার সে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া চোখ নাচাইয়া অতি সন্তর্পণে ঘরের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় সঙ্গীটি এক মাকড়সা।

নানা স্থানে জাল পাতিয়া সে যে কোথায় লুকাইয়া থাকে দেখা যায় না। কিন্তু কোনো জালের কোনো একপ্রান্ত কিছু একটা দিয়া ঈষৎ নাড়িলেই, কখনো সিলিং হইতে, কখনো বা দেওয়ালের সর্বোচ্চ প্রান্ত হইতে বড় বড় ঠ্যাং মেলিয়া নামিয়া আসে। কিছু দূর হইতে হিংস্র চোখের তীব্র দৃষ্টি দিয়া দেখে, শিকার জালে পড়িয়াছে কি না।

শিকার প্রায়ই পড়ে না। বেশীর ভাগ বার বিশ্বেশ্বরই জাল নাড়ে। মাকড়সাটি নামিয়া আসিয়া প্রায়ই হতাশ হয় এবং ছেঁড়া জাল মেরামত করিয়া আবার কোথায় গিয়া গা ঢাকা দেয়।

তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বিশ্বেশ্বর হো হো করিয়া সশব্দে হাসিয়া ওঠে। বলে,—ওরে বোকা, দু'মিনিট পর পর তোমার জালে শিকার পড়লে তো তুমি দু'দিনে ফুলে হাতী হবে। তোমার জীবনে তেমন শিকার পেয়েছ কোনো দিন?

কোনোদিনই পায় নাই। তবু শিকারীর মন কি বোঝে?

আবার কখনও কখনও জাল নাড়া দিলেও মাকড়সাটি আর নামে না। বিশ্বেশ্বর রাগিয়া গিয়া তাহার জাল ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করে। মাকড়সাটির দুই দিকেই বিপদ।

কিন্তু ইহাদের সঙ্গে খুনসুড়ি করিতেও বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। তিন দিনেই বিশ্বেশ্বর অস্থির হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ ঘরময় দ্রুতবেগে পায়চারি করিয়া আবার হয়তো ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়ে।

তাহার বুকের মধ্যে কি যেন একটা বিপুল শূন্যতা সর্ব্বক্ষণ হাহাকার করে;—মগজের মধ্যেও। সে স্থির হইয়া একটুক্ষণ বসিতে পারে না, স্থির হইয়া একটা কিছু ভাবিতে পারে না। কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর একটুকু শুনিতে পাইলে উৎকর্ণ হইয়া ওঠে। কিন্তু তাও কি শুনিতে পায় ছাই! তখন নিজেই যে কোনো একটা গানের যে কোনো একটা লাইন চীৎকার করিয়া গাহিতে আরম্ভ করে।

সিপাহী ধমক দেয়। কখনো ধমক খাইয়া চুপ করে, কখনো করে না।

কখনো হয়তো রবীন্দ্রনাথ কিংবা শেলীর একটা কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি করে। কিন্তু রস না পাইয়া কবির উপরই চটিয়া যায়।

—কবিতা লিখেছে, না আমার মাথা লিখেছে।

তারপরেই হয়তো ধূমপানের জন্য মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। মুখে মুখেই সিগারেট সম্বন্ধে একটা গান বানাইয়া জোরে জোরে গাহিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু গান গাহিলে সিগারেট আসে না। বিশ্বেশ্বর হতাশ ভাবে বিছানায় শুইয়া পড়ে।

—শালারা আমার জন্তে চেষ্টা করছে, না ইয়ে করছে। সব শালাদের ভাঁওতা। একবার বেরিয়ে তো যাই। তারপরে—

বিশ্বেশ্বর আবার উঠিয়া উন্মত্তভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করে।

ঘুম যেন তাহার চোখ হইতে একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কিছুতে ঘুম আসে না। তাহার ঘরে আলো জ্বলে না, জ্বলে সুমুখের ঘরে। তাহারই স্বল্প আলো এই ঘরে আসিয়া পড়ে। একজন সিপাহী সুমুখের ঘরে বসিয়া, কখনো বা বাহিরের বারান্দায় পায়চারি করিয়া তাহাকে পাহারা দেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কয় না। কথা কহিতে নিষেধ আছে।

সেই স্বল্পালোকে বিশ্বেশ্বর মাঝে মাঝে হাঁফাইয়া ওঠে। চীৎকার করিয়া বলে,—Light, more Light!

মাঝে মাঝে তাহার মানুষের সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা হয়।

—সিপাহীজি, এ সিপাহীজি!

—কেয়া?

—তুম গ্যেটেকো নাম শুনা হৈ? উয়ো ভি হামকো মাফিক্ এ্যায়সে চিল্লায়া,—Light, more Light!

সিপাহীজি গ্যেটের নাম শোনে নাই, এবং "Light, more Light" এরও মানে জানে না। কিন্তু সে মনে মনে বাংগালী বাবুর জন্ত দুঃখিত হয়, বেচারার মাথা একদম খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে গম্ভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলে—নিদ্ যাও বাবুজি, নিদ্ যাও।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের তাহা বোধ হয় কানেও যায় না। সে মনে মনেই গুণ গুণ করিয়া আবৃত্তি করে,—আরো আলো, আরো আলো,—

পরের দিন সকালেই বিশ্বেশ্বর মুক্তি পাইল।

এই কয়দিনের মধ্যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদিনও আসিয়া সংবাদ লইতে পারেন নাই। সেদিন প্রথম আসিলেন। বাহিরে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিশ্বেশ্বর দোরগোড়ায় উদগ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি আসিতেই, সে একেবারে তাহার পায়ের উপর পড়িয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। 'সুপার' প্রথমটা হত চকিত হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই নিজের পাদুটি তাহার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং জেলারকে হুকুম দিলেন, বিশ্বেশ্বরকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে।

গৃহের আরামের মধ্যে বসিয়া যাঁহারা এই কলঙ্ক-কাহিনী পড়িবেন, বিশ্বেশ্বরের জন্ত তাঁহারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বর নিজে এতটুকু লজ্জিত হইল না, সে লাফ দিয়া উঠানে পড়িল। কিসের লজ্জা? এমন আকাশ, এমন আলো সেলের মধ্যে কোথায়?

তাহাকে দেখিয়াই ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের কয়েদীরা কলরব করিয়া উঠিল। গ্রিফিথ উঠানেই পায়চারি করিতেছিল। সে তো বিশ্বেশ্বরকে একেবারে কাঁধে তুলিয়া দোতালায় লইয়া আসিল। পণ্ডিত, ঘোষ, জোসেফ, গ্রিফিথ গল্পে, গানে, হাসিতে মুখর হইয়া উঠিল। কেবল মিরাণ্ডা দূরে দূরে ঘুরিতেছিল। পণ্ডিত তাহাকে ধরিয়া আনিতেই আর একবার হাসির হিল্লোল উঠিল।

এত বড় সংবর্দ্ধনার জন্ত বিশ্বেশ্বর প্রস্তুত ছিল না। তাহাকে নির্জ্জন কারার কবলে পাঠাইয়া ইহারা সকল প্রতি-শ্রুতি ভাঙ্গিয়া দিব্য আরামে আছে, এ কথা বিশ্বেশ্বর 'সেল'এ বসিয়া যতই ভাবিয়াছে ততই তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এত বড় সংবর্দ্ধনার পরে তাহার আর ক্রোধ রহিল না। সে বেশ বুঝিল, নির্জ্জন কারা হইতে ফিরিয়া সে ইহাদের চক্ষে অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্মপ্রসাদেই তাহার মন উদার হইয়া উঠিল।

১৩

ঘোষের কথাটা পণ্ডিত অনেকদিন চাপিয়া গিয়াছিল। নবী নওয়াজের কথা সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে নাই। অন্ত কেহ হইলে এত বড় একটা রুচিকর কথা লইয়া জেলে সোরগোল পাকাইত, জেলে নূতন কথার একান্ত অভাব।

দিনের পর দিন সেই একই লোক, তাহাদের সঙ্গে সেই এক-ঘেয়ে রহস্যালাপে মন বদ্ধ জলার মতো বিষাক্ত হইয়া ওঠে। ঘোষের প্রসঙ্গ অন্তত কিছুদিন তাহাদের আলাপ আলোচনায় নূতনত্ব দিত। কিন্তু সংসারের ভালো-মন্দ সকল বিষয়েই পণ্ডিত উদাসীন। বিশেষ, যে কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সে কথা নিয়া সোরগোল করিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতেছিল।

নবী নওয়াজের অদ্ধেক সংবাদ সত্য হইয়াছিল, বিশ্বেশ্বরকে নির্জ্জন 'সেল'এ রাখার কথাটি সত্য। অপরার্দ্ধের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য পণ্ডিত অপেক্ষা করিয়া ছিল। সেই সত্যও প্রমাণিত হইল, ঘোষের মুখ হইতেই শোনা গেল, তাহাকে কাল কিংবা পরশু ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; অর্থাৎ মেয়াদ শেষ হইবার কয়েকদিন আগেই।

এ কথা শোনার পর পণ্ডিত আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক সময় নিরিবিলি পাইয়া কথায় কথায় বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল; আচ্ছা, আমাদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে কে গোয়েন্দাগিরি ক'রতো জানো?

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জানি।

বিশ্বেশ্বরও জানে! পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া গেল। তবে হয়তো নবী নওয়াজের কাছেই শুনিয়া থাকিবে।

পণ্ডিত বলিল—লোকটি ভারি উপকারী। কি নামটি তার?

—কার কথা ব'লছ তুমি?

—ওই যে সেই মুসলমান 'মেট'টি;—তোমার কাছে প্রায়ই আসে?

—নবী-নওয়াজ?

—নবী নওয়াজ। সেই তো এসে খবর দিয়ে গেল, তোমার সাতদিন 'সেল' হয়েছে। তারই হাত দিয়ে তো তোমার কাছে চিঠি পাঠাই। তোমার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বেশ্বর গাঢ় স্বরে বলিল,—হাঁ, লোকটি খুব ভালো।

পণ্ডিত ধূর্ত্তের মতো কুটিল হাস্য করিয়া বলিল, তারই কাছে তো গোয়েন্দাটির পরিচয় পেলাম। এমন কি, সাত দিনের মধ্যে যে মহাপ্রভু ছাড়া পাবেন, তাও বলে গেল।

এবারে বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইল, কে সাত দিনে ছাড়া পাবে? গ্রিফিথ?

পণ্ডিতের বুঝিতে দেরী হইল না, বিশ্বেশ্বর কিছুই শোনে নাই। সে গ্রিফিথকে সন্দেহ করে।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—তুমি কচু জানো। গ্রিফিথ কেন গোয়েন্দাগিরি করবে?

—তবে কে করেছে?

—মিঃ ঘোষ:—বলিয়া পণ্ডিত তাহার পানে মিটিমিটি চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, পণ্ডিত। রাঁচি যাও,—রাঁচি যাও।

পণ্ডিত রাঁচি যাইবার কোনো আগ্রহ না দেখাইয়া বলিল,—তোমার সঙ্গে নবী নওয়াজের দেখা হয়েছে? হয় নি? আশ্চর্য্য! অথচ তোমার জন্যে সে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। আর তুমি ছাড়া পাওয়ার পরে একদিন দেখা করতেও এলো না?

—আসবে একদিন। কিন্তু তুমি ঘোষের কথা কি শুনেছ বলো।

—ওই ত বললাম। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার পর বিকেল পর্য্যন্ত তোমার কোনো খবর না পেয়ে যখন আমরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম, সেই সময় হঠাৎ ও আমায় ডাকলে। ডেকে তোমার খবর দিলে, আর বলে গেল,—ঘোষ না কে আছে সেই গোয়েন্দা, সাত দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। তখন কথাটা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এখন দেখছি সত্যি।

কথাটা শুনিতে-শুনিতে বিশ্বেশ্বরের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল,—কি ক'রে দেখলে সত্যি?

—এক্ষুনি শুনলাম, ঘোষ কাল কিংবা পরশু ছাড়া পাবে।

বিশ্বেশ্বর কিছুই বলিল না, চিন্তিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি—

বিশ্বেশ্বর একটু পরে কহিল,—আচ্ছা, মাস তিনেক আগে বেটো জেল থেকে পালিয়েছিল, তোমার মনে আছে? আমরা অবাক হ'য়ে ভাবছিলাম, ছাড়া পেতে আর তো তার বেশী দিন ছিল না, তবু কেন নিজেকে বিপন্ন করে

অমন ভাবে পালালো? আরও বছর খানেক আগে একটা বুড়ো কয়েদী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে। তখনও আমরা অবাক হ'য়ে ভেবেছিলাম, লোকটার তো বছর পাঁচেক জেল হয়েছিল,- তাও তো হাসপাতালেই প'ড়ে থাকতো, খাটতেও হোতো না,—ও কেন আত্মহত্যা করলে? আর আজকে তোমার কাছে শুনছি, ঘোষ গোয়েন্দাগিরি ক'রেছে৷ আরও একটা খবর জানি, - কিন্তু সে আমার নিজেরই কলঙ্ক-কাহিনী, সুতরাং সে আর বলবো না।

বিশ্বেশ্বর চুপ করিল। 'সেল' হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে সে লক্ষ্য করিতেছে, একটানা কিছুক্ষণ কথা বলিলেই তাহার হাঁফ ধরে।

দম লইয়া বিশ্বেশ্বর বলিতে লাগিল,—সব মুক্তির ক্ষুধা। ভেতরে-ভেতরে আমাদের সকলের মনই মুক্তির জন্যে ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। সকল সময় টের পাইনে, কিন্তু সুমুখে প্রলোভন এসে পড়লে, আর সামলাতে পারি নে। বন্ধনের জ্বালায় অস্থির হ'য়েই তো আমরা ধর্ম্মঘট করতে যাচ্ছিলাম, কত বড় শাস্তির আশঙ্কা ঘাড়ে নিয়ে! অথচ কতটুকুই বা পেতাম। তাও পারলাম না,—ভিতরে-ভিতরে শক্তির ভাণ্ডার যে এত রিক্ত হ'য়ে গেছে, ভাবতেও পারি নি। আর সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার লোভে যে ঘোষ গোয়েন্দাগিরি করবে তার আর বিচিত্র কি!

পণ্ডিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল,—মাত্র দিন কতক আগে মুক্তির জন্যে?

—দিন কতকই কি কম? দু'টো দিন আগে মুক্তির জন্যে আমি; কিন্তু আমার কথা থাক্। বেণ্টো পালালো কেন? বুড়োটা বিষ খেলো কেন? পাঁচ বছর পরে সে তো দিব্যি মুক্তি পেতো। কিন্তু পাঁচ বছর পরে মুক্তি পাওয়ার কোনো মানে নেই। মানুষ আজকে মুক্তি চায়,—এক্ষুনি। এই মুহূর্ত্তের বন্ধনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বুড়োকে চরম মুক্তির আশ্রয় নিতে হোল।

পণ্ডিত কহিল,—কিন্তু আমরা তো রয়েছি। আমরা তো আত্মহত্যা করি নি।

—রয়েছি, কারণ আমাদের মনের জোর ওদের চেয়ে বেশী;—কারণ পৃথিবীর ওপর মমতা, কোনো রকমে বেঁচে থাকার ওপর মমতা ওদের চেয়ে বেশী। আমরা আত্মহত্যা করিনি, কিন্তু করা বিচিত্র নয়।

— বিচিত্র নয়? আমার পক্ষে তো অসম্ভব।

বিশ্বেশ্বর সায় দিয়া বলিল,—আমার পক্ষেও। কিন্তু তুমি বাইরে লাখ টাকা গচ্ছিত রেখে এসেছ। নিরাপদে বাকী জীবনটা সেই টাকা ভোগ করার লোভ তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমারও পৃথিবীর কিছুই ভোগ করা হয় নি। সেই অনাস্বাদিত আনন্দের লোভে দিন গুণে চলেছি। নইলে কি যে কোরতাম, নিশ্চয় ক'য়ে বলা যায় না।

পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের একটা যুক্তিও গ্রহণ করিল না। হাসিয়া বলিল,—যাই বলো, ঘোষের এই নীচতা কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না।

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল,—সমর্থন তো করছি না। কেন সে এ কাজ করলে তাই বিচার ক'রে দেখছি। এবং যতই দেখছি ততই বিশ্বাস হচ্ছে, এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই, ঘোষের 'পরে ক্রুদ্ধ হবারও কিছু নেই।

—ক্রোধ তো নয়, ঘৃণা।

বিশ্বেশ্বর দৃঢ় স্বরে বলিল,—না, ঘৃণাও হয় নি।

সেই দিনই জেলারের মারফৎ ঘোষ নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিল, কাল সকালে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর হইতে তাহার সমস্ত কিছু যেন যাদুস্পর্শে বদলাইয়া গেল। যাহার পায়ের শব্দ পাওয়া যাইত না, কারণে-অকারণে তাহার চলা-ফেরা এতই বাড়িয়া গেল যে, তাহার জুতার খট্‌খট্‌ শব্দে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। যখন-তখন তাহার অকারণ উচ্চ হাস্যে ওয়ার্ড মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহার সামনে সকলেই কাষ্ঠহাসি হাসে, কিন্তু আড়ালে অনেক কথাই হয়।—

গ্রিফিথ বলিল,—বাবা, ছাড়া আমরাও একদিন পাবো। কিন্তু ও যেন একেবারে দিগ্বিজয় করতে চলেছে।

পণ্ডিত একটু খানি কুটিল হাসিয়া বলিল,—ও যে অনেক মূল্যে মুক্তি কিনেছে। ফূর্ত্তি করবে না?

—কি রকম? কি রকম?—সকলেই গোপন কথাটা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহার গা টিপিয়া নিরস্ত করে। পণ্ডিত চুপ করিয়া যায়। গেলে কি হইবে? ধর্ম্মঘট অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার পর, তাহার যে অকস্মাৎ দশ-বারো দিনের মেয়াদ মাফ হইয়া গেল, তাহাতে অনেকেই অনেক রকম সন্দেহ করিয়াছিল। পণ্ডিত এইভাবে চুপ করিয়া যাওয়ায় সেই সন্দেহই সকলের মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

গ্রিফিথ বলিল,—ও আমরা জানতাম।

বিশ্বেশ্বর বিরক্ত ভাবে বলিল,—কি জান্‌তে?

—যে ওই বেটাই গোয়েন্দা,—নিশ্চয় ওই বেটা। আর কেউ নয়।

বিশ্বেশ্বর রাগিয়া বলিল,—ও সব বাজে,—মিথ্যা কথা।

এ কথাটার এইখানেই শেষ হইয়া গেল বটে, কিন্তু মিয়াঁওার মারফৎ যথাসময়ে ঘোষের কাণেও পৌঁছিল। বিদায়ালাপের অছিলায় সে বিকালের দিকে বিশ্বেশ্বরের ঘরে গেল।

—তা হোলে বিশ্বেশ্বর, এইবারে তো চল্‌লাম। হয় তো অনেক দিন অনেক কষ্টই—

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিয়া বলিল,—বিলক্ষণ! বোসো, বোসো,—আর তো তোমায় পাবো না। আজকেই শেষ গল্প ক'রে নিই।

ঘোষ বিনীত ভাবে বসিয়া বলিল,—কাল পর্য্যন্ত জেলের কষ্ট অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের পেয়ে সুখে-দুঃখে মন্দই বা কি ছিলাম।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—কিন্তু এক্ষুনি যদি খবর আসে, কাল তোমার যাওয়া হবে না, তা হোলে?

ঘোষ শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে বলিল,—সে কথা উঠেছে না কি?

তাহার ভয় দেখিয়া বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল,—না, ওঠে নি। যদি উঠ্‌তো সেই কথা বল্‌ছি।

ঘোষ আশ্বস্ত হইল। হাসিয়া বলিল,—তা হোলে আমার ঠিক হার্টফেল করে।—ঘোষ আর একবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

পরে গম্ভীর হইয়া বলিল,—কিন্তু মুক্তির সুমুখে দাঁড়িয়ে পেছনের দিনগুলির পানে চাইলে মনে হয়, সুখে-দুঃখে সেও মন্দ কাটে নি। অন্তরের হিসাব করলে দেখা যাবে, অনেক কিছুই হারিয়েছে। কিন্তু মন যেন আজকে আর তার জন্যে শোক করতে চাইছে না। বলছে,—হোক্‌গে ক্ষতি। তবু দিন তো কেটেছে। তোমাদের কাছ থেকে কিছু আনন্দ তো পেয়েছি। সেও কি কম লাভ?

ঘোষের কণ্ঠস্বরে বিশ্বেশ্বরের সন্দেহমাত্র রহিল না যে, এ কথা তাহার অন্তরের কথা। সে বিস্মিত ভাবে বলিল,—তোমার কি সত্যই তাই মনে হয়।

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—সত্যই তাই মনে হয়।

—এতগুলো বছর যে মিছি-মিছি নষ্ট হোল সে জন্যে দুঃখ হয় না?

—দুঃখ হয় বই কি! কিন্তু সে দুঃখ আজকে সইতে পারি।

বিশ্বেশ্বর অনেকক্ষণ কি যেন ভাবিল। তারপর সে চিন্তা ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল,—আচ্ছা, বাইরে গিয়ে তুমি আবার 'প্র্যাকটিস্' করতে পাবে?

—পাবো বোধ হয়, কিন্তু পারবো না। এর পরে হাইকোর্টে আর মুখ দেখানো যায় না।

—তা যায় না। কি করবে তা হোলে?

ব্যস্তভাবে ঘোষ বলিল,—ঐ কথাটি তুলো না। কি করবো সে আমিও জানি না। ও কথা ভাবতে ভয় করে,—ভাবিও না। মনে এলেই দুপাশে ঠেলে ফেলে দিই। আগে বাইরে তো যাই, তারপর সে হবে।

বাইরের কথায় ঘোষের কণ্ঠস্বর যেন ভিজিয়া গেল। বলিল,—আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না যে, কোনো দিন বাইরে যাব,—আবার ট্রামে-মোটরে উঠতে পাবো,—ইচ্ছামত ফুটপাথে চলতে পাবো। ঠিক জানি ছাড়া পাব, তবু বিশ্বাস করতে পারি না।

ঘোষের কথা শুনিতে শুনিতে বিশ্বেশ্বর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময় বলিল,—তুমি শাশ্বতীর কাছে যাবে না?

ঘোষ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—তুমি কি বলো? যাবো?

—না, যেও না। কাজ কি গিয়ে? তুমি বরং বড় সড় দেখে মেয়ে বিয়ে কর।

—বিয়ে? ঘোষ হাসিয়া ফেলিল, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

—দেবে, দেবে। যারা কুষ্ঠরোগীর হাতে মেয়ে দিতে পারে, তেমনি কারো মেয়ে। আমি বলছি, তাতে তুমি সুখী হবে।

বিশ্বেশ্বরের কথায় ঘোষ হাসিতে লাগিল। কিন্তু এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া আসল যে জন্য তাহার আসা, এইবারে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল—আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে একটা বিশ্রী গুজব উঠেছে শুনেছ বোধ হয়?

এই প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে বলিল—শুনেছি। কিন্তু ও তো মিথ্যে কথা। আমি ওর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।

ঘোষ রাগিয়া বলিল,—তবে অমন কথা রটে কেন? রটায় কে?

বিশ্বেশ্বর তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল—এ 'কেন'র কি জবাব আছে? অনেক মিথ্যে কথাই অনেক কারণে রটে। আমার মনে হয়, হিংসে করেই কেউ এ কথা রটিয়েছে।

ঘোষ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—ও! আমি ছাড়া পাচ্ছি সেই হিংসেয়।

বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

ঘোষ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে প্রশ্ন কোনো মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে করিতে পারিত না।

ঘোষ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার হিংসে হচ্ছে না?

—হচ্ছে বই কি?

—তবে তুমি এ গুজব বিশ্বাস কর না কেন?

বিশ্বেশ্বর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাঝে মাঝে ঘোষের মাথা খারাপ হইয়া যায়। সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—তা হোলে তোমার কাছে আর মিথ্যে বলবো না, বিশ্বেশ্বর, গুজবটা সত্যি। আমিই সিপাহীর মারফৎ জেলারের কাছে খবর দিতাম। কেন যে দিতাম তাও জানি না, ওই এক আমোদ!

—শুধু আমোদের জন্যে?

—ভগবানের দিব্যি, শুধু, আমোদের জন্যে।

ঘোষের কণ্ঠস্বরে লজ্জার চিহ্নমাত্র নাই।

—তোমার মেয়াদ মাফ হবে এই ভরসায় নয়?

—না। মেয়াদ মাফ হ'তে পারে আমি তাই কোনো দিন ভাবিনি

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল! কিন্তু পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঘোষ আর একটু তাহার কাছে ঘেঁসিয়া আব্দারের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল, তুমি আমাকে সাধু লোক ভাবতে, না?

বিশ্বেশ্বর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, না। আমি সবই জানতাম।

বিশ্বেশ্বর বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু ঘোষের মুখে বিস্ময় অথবা বেদনার কোনো চিহ্নই ফুটিতে দেখা গেল না।

পরের দিন সত্যই ঘোষ চলিয়া গেল। তখন সকাল আটটার বেশী নয়, আফিস হইতে তাহার মুক্তির সংবাদ লইয়া একজন লোক আসিল। সকলেই ইহাকে মুক্তি-দূত বলিয়া ডাকে। লোকটির মুখে গ্রীকদের মতো দাড়ি,—তৈলাভাবে মলিন স্বর্ণাভ; ঠোঁটে হাসি লাগিয়াই আছে।

ও জেলের কর্ম্মচারী নয়, দীর্ঘ মেয়াদের একজন কয়েদী মাত্র। কাহারও মেয়াদ শেষ হইলেই ও আসে মুক্তির সংবাদ বহন করিয়া। কিন্তু ওর নিজের মেয়াদ কবে শেষ হইবে, সে খবর কেউ রাখে না।

মুক্তি-দূতের প্রতীক্ষাতেই ঘোষ যেন বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল। সংবাদ আসা মাত্র সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। সকলের সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও হইল না। কিন্তু বিদায় জানাইয়া ঘোষ যে কি বলিল, তাহার কিছুই বোঝা গেল না। দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার বিদায় লইবার ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমতো খুব এক চোট হাসি পড়িয়া গেল। ইহারও পূর্ব্বে অনেকেই তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই এমন করিয়া যায় নাই। আনন্দ কি হয় নাই? তাহাদেরও আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু পিছনে যাহারা রহিল

তাহাদের মুখ চাহিয়া সে আনন্দ যথাসাধ্য সংযত রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিল।

পণ্ডিত বলিল,—ওটা বদ্ধ পাগল!

গ্রিফিথ বলিল,—কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শয়তানী বুদ্ধি যথেষ্ট আছে।

জোসেফ বলিল,—সখের পাগল! তালে ঠিক আছে।

যাহার যাহা ঝাল আছে, নিঃশেষে ঝাড়িল।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার যে বাসায় কি খবর দেবার ছিল, দিয়েছো তো? না ভুলে ব'সে আছ?

—দিয়েছি তো। কিন্তু উনি যে কষ্ট ক'রে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যাবেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভুলেই যাবেন হয় তো। মাথার তো ঠিক নেই।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—এমনি কথাবার্ত্তায় তো বোঝা যেত না, ওর মাথা খারাপ?

পণ্ডিত বলিল,—তা যেত না। কিন্তু হঠাৎ ও এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসত।

বিশ্বেশ্বরের প্রথম দিনের কথা মনে পড়িল। সে হাসিয়া বলিল,—আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন আলাপ হ'ল, সেদিন কি জিগ্যেস করেছিল জানো? বেশ কথা বলছিল, হঠাৎ জিগ্যেস ক'রে বস্‌ল, আপনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন? ঘোড়ায় চড়ার কথা কি ক'রে ওর মনে এল, ওই জানে।

জোসেফ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—মনে এল, না ছাই! সমস্ত ছলনা।

কিন্তু সমস্ত রাগ নিঃশেষ করিয়াও তৃপ্তি হইল না। তাহাদেরই চোখের সুমুখ দিয়া একজন মুক্তি পাইয়া চলিয়া গেল, আর তাহারা এখনও জেলে পচিতেছে,—আরও কতদিন পচিবে কে জানে,—এই অবস্থা তাহারা মনের মধ্যে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। মনে হইল, এ যেন তাহাদেরই উপর অন্যায় করা হইল। এমনি মানসিক অবস্থায় সকলেই গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বেশ্বর ঘোষের শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—যাই বল, ওয়ার্ডটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

সকলেই ঘরের দিকে চাহিল:

খাটের উপর গদীটা ঠিকই আছে, কিন্তু চাদরটা সরিয়া গিয়াছে,—বালিশটাও তাল পাকাইয়া এক কোণে পড়িয়া আছে। টেবিলের উপর কল্যকার নৈশাহার যেমনকার তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে,—ভালো করিয়া খায়ও নাই। কতকগুলা ময়লা পোষাক এক কোণে এলো-মেলো ভাবে পড়িয়া। যে-প্রতিবেশীটি দীর্ঘকাল এই কক্ষে সুখে-দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছে, সে আজ নাই।

একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস সকলের অন্তস্তল হইতে উঠিয়া সেই শূন্য কক্ষে ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল।

১৪

আরও অনেক দিন গেল।

জেলে আসার প্রথম দিকে বিশ্বেশ্বরের শরীর খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সে কমনীয়তা ফিরিয়া না পাইলেও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিল। আবার গত দুই-তিন বৎসর হইতে শরীর তাহার ভালো নাই। গত ছয়মাস যাবত সে ক্রমাগতই একটা-না-একটা রোগে ভুগিতেছে। মাঝে-মাঝে ঘুসঘুসে জ্বরও হয়। কিন্তু হাসপাতালে যাইবার ভয়ে অসুখের কথা চাপিয়া যায়।

হাসপাতালে ভয়ের কিছুই নাই,—বরং বিশেষ আরামেরই ব্যবস্থা আছে। তবু তাহার ভয় করে। এখানে দীর্ঘদিনের সহবাসে একটা আবেষ্টনী গড়িয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে সে আবেষ্টনী পাইবে কোথায়! সেই অপরিচিত আবেষ্টনীর ভয়ে সে জ্বরের কথা চাপিয়া যায়। ডাক্তার রোজই আসেন,—কিন্তু রোগী নিজে রোগের কথা না জানাইলে তিনি কি করিবেন! ফলে তাহার দেহের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, দেখিলে আর চেনা যায় না। মনেরও সে লঘু স্বচ্ছন্দ ভাব আর নাই। সর্ব্বদাই বিমর্ষ ভাবে বসিয়া-বসিয়া কি যেন ভাবে।

পাঁচ বৎসর এক জেলে একাদিক্রমে বাস করার ফলে জেলের হাওয়া একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। সেই পরিচিত কয়টি লোকের অতি পরিচিত রসিকতা, সেই দৈনন্দিন কার্য্য-ক্রম গরুর গাড়ীর মতো অলস, মন্থর গতিতে ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া

চলিতেছে। এবং তাহার মধ্যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গণিয়া কাটাইয়া সে একেবারে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে।

মেজাজও তাহার অসম্ভব রকম রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া মানুষের মুখ দেখিলেই তাহার পিত্ত জ্বলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে পণ্ডিতের সঙ্গে এক চোট হইয়া গিয়াছে।

কোন্ মান্ধাতার আমলে ঘোষকে সে কি বলিয়া দিয়াছিল, ঘোষ তাহা তাহার বাড়ীতে বলিয়া আসে নাই। ঘোষের চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই পণ্ডিত তাহা তাহার বাড়ীর লোকদের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছিল। এখন আবার তাহার কন্যার যোটক-বিচার লইয়া নূতন কি একটা গোলযোগ হইয়াছে খবর পাইয়া পণ্ডিত আবার সেই পুরাতন কথার জের টানিতেছে। তাই লইয়াই বচসা।

কিছু পরেই নবী নওয়াজ আসিয়া উপস্থিত।

দাঁত বাহির করিয়া নবী নওয়াজ বলিল,—মাষ্টের, বেষ্টো আবার এসেছে।

বেষ্টোর কথা এতদিন পরে বিশ্বেশ্বরের মনেই ছিল না। পণ্ডিতের সঙ্গে কলহের ঝাঁঝ তখনও তাহার মন হইতে যায় নাই। সে মুখ বিষ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিল। ইহার উপর নবী নওয়াজ আসিয়া বেষ্টোর শুভাগমন-সংবাদ দিতেই সে একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল।

মুখ ভ্যাংচাইবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তবে তো আমি স্বর্গে চল্‌লাম।

তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়া নবী নওয়াজ তো অবাক। সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিতে লাগিল,—না, তাই বলছিলাম, তাই বলছিলাম।

বিশ্বেশ্বর তাহাকে নীচের উঠান দেখাইয়া দিয়া বলিল—ওই দিকে গিয়ে বলগে।

নবী নওয়াজ বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

কিন্তু বিকেল বেলায় ছাপাখানা হইতে ফিরিবার পথে ওই বেষ্টোরই সঙ্গে বেই দেখা, অমনি সহাস্যে বিশ্বেশ্বর বলিল, এই যে, বিষ্ণুচরণ, আবার এসেছ, বাবা?

পরম বৈষ্ণবের মতো দুটি হাত যোড় করিয়া বেষ্টো বলিল—আজ্ঞে, আপনাদের মায়া আর কাটাতে পারলাম না।

—বেশ, বেশ। ক'বছর?

—আজ্ঞে, জেল-পালানোর জন্যে এক বছর হ'য়েছে। আরও একটা ঝুলছে।

জেলেই বেষ্টোর শরীর ভালো থাকে। জেলের বাহিরে থাকিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার শীর্ণ দেহের পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—আরও একটা ঝুলছে! বাঃ! বাঃ! তুমি তো একটা অসাধারণ লোক হে।

আত্ম-প্রশংসায় বেষ্টো বিগলিত হইয়া আর একবার হাত দুটি যোড় করিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—আর যেটি ঝুলছে সেটি কি?

—আজ্ঞে, ৩০২।

বিশ্বেশ্বর চমকিয়া উঠিল। আস্তে-আস্তে বলিল,—তোমার স্ত্রীকে শেষ পর্য্যন্ত খুনই ক'রে ফেললে?

বেষ্টো অম্লান বদনে বলিল,—আজ্ঞে, তাইতো পুলিশ বলছে।

বিশ্বেশ্বরের মুখ ধীরে-ধীরে পাথরের মতো কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বেষ্টোর পানে কিছুক্ষণ অপলক চাহিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—আর তোমার মেয়ে?

মেয়ের প্রসঙ্গ বেষ্টো উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক নয়। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। এবং তারপর নিজের পথে চলিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বিশ্বেশ্বরের ভীষণ জ্বর আসিল। রাত্রে তো ঘরের মধ্যেই বন্ধ থাকে,—কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিয়াছিল, সকাল বেলায় জ্বর ছাড়িয়া গেলে আর কোনো হাঙ্গামাই হইবে না।

কিন্তু সকাল যখন হইল, তখন তাহার আর উঠিবার শক্তি নাই। চোখ জবা ফুলের মতো লাল হইয়াছে,—বুকে অসহ্য ব্যথা,—১০৪ ডিগ্রি জ্বর। ডাক্তার আসিয়াই তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন,—টাইফয়েড ব'লেই মনে হচ্ছে,—তবে নিউমোনিয়াও হ'তে পারে।

দিন ত্রিশেক একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় কাটিবার পর, দুইজন ডাক্তার একমত হইয়া বলিলেন, নিউমোনিয়া নয়। কিন্তু কি, তাহা সঠিক জানা গেল না।

না যাক্। কিন্তু এই বিশদিন এবং ইহার পরে আরও বিশ দিন বিশ্বেশ্বর একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইল। কখনো লোক চিনিতে পারে, কখনও পারে না,—ঘোলাটে চোখ মেলিয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।

আর কাহারো তাহার সহিত দেখা করিবার তেমন সুবিধা নাই। কেবল নবী নওয়াজ মাঝে-মাঝে যায়। কখনো ডাক্তারের কাছে তাড়া খাইয়া দ্বার-প্রান্ত হইতেই পালাইয়া আসে, কখনো বা কাছে বসিয়া ললাটে, মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দেয়,—বাড়ীতে খবর পাঠাইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করে।

বিশ্বেশ্বর কতক শুনিতে পায়, কতক পায় না;—তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের সকলে বিশ্বেশ্বরের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। সকালে ডাক্তার আসিলেই তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

ডাক্তারটি নিতান্ত ভালো মানুষ :—মোটা-সোটা, নাদুস্-নুদুস্ ভদ্রলোক। ডাহিনে-বামে ঘাড় দোলাইয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া চলেন এবং পথ চলিতে-চলিতে সর্ব্বদাই আপন মনে কি যে ভাবেন তিনিই জানেন, আর মুচকি-মুচকি হাসেন। এক সঙ্গে জেল গেট হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সঙ্গের লোক যখন হাস-পাতালে পৌঁছিয়া যায়, তিনি তখনও অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতে পারেন না।

এমন লোককে কেহই ভালো না বাসিয়া পারে না। রাজ-নৈতিক ওয়ার্ডে তো ইঁহাকে লইয়া যথেষ্ট কৌতুকের অবতারণা হয়। কেহ নকল করে ইঁহার হাঁটিবার ভঙ্গি, কেহ বা কথা কহিবার ধরণ। ওয়ার্ডে আসিলে, সকলেই ইঁহাকে খাওয়াই-বার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইনি একটা প্রকাণ্ড উদ্গার তুলিয়া বলেন, —ওরে বাপ্! আজ? অসম্ভব!

এবং কেন অসম্ভব, তাহা বুঝাইতে গিয়া সকালের আহারের এমনি একটি বিরাট তালিকা পেশ করেন যে, সে-পরিমাণ দ্রব্য যিনি উদরে স্থান দিতে পারেন, অগ্নিমান্দ্য তাঁহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে পারে না।

কিন্তু ছেলেরা ছাড়ে না। অত বড় উদ্গারের পরও খান-কয়েক টোষ্ট তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

—না, না, চা দেবেন না। সকাল থেকে তিন পেয়ালা হয়েছে। আবার?

ডাক্তার ইহাদের হাত এড়াইবার জন্য চেয়ার লইয়া দূরে সরিয়া যান। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই;—চতুর্থ পেয়ালা চাও পান করিতে হয়।

—আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আপনি কখনও বাঘ শিকার করেছেন?

শিকারের কথায় ডাক্তার বাবুর সমস্ত মুখ উৎসাহে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে,—ঠোঁটের দুই কোণ এবং চিবুকের দিকটা ঝুলিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটা বিস্ফারিত হয়।

ডাক্তার বলেন,—করেছি। কিন্তু বড় নয়, ছোট।

—রয়াল বেঙ্গল?

চোখ মিট্ মিট্ করিয়া সায় দিয়া ডাক্তার বলেন,—রয়াল বেঙ্গলের বাচ্ছা।

তারপর বাঘ শিকারের অদ্ভুত বর্ণনা। ডাক্তারের কণ্ঠ থাকিয়া-থাকিয়া বাঘের মতো হুঙ্কার দেয়, চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতো জ্বলিয়া ওঠে;—সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত এবং দুই হাত সুমুখের দিকে প্রসারিত করিয়া তিনি বাঘের মতো লাফ দিবার আয়োজন করেন। কিন্তু তখনি বাঘের আক্রমণকে তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহার মুখে একটা প্রশান্ত ভাব এবং ঠোঁটের কোণে উপেক্ষার হাসি ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার হাতের কাল্পনিক বন্দুক হইতে গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম করিয়া গোটা তিনেক গুলি ছুটিয়া যায়। একটা লাগে বাঘের হাঁ-মুখে, একটা পিঠে এবং একটা পেটে। ডাক্তার নিশ্চিন্ত হইয়া চেয়ারে ভালো করিয়া বসেন।

—কিন্তু ছোট বাঘ,—রয়াল বেঙ্গলের বাচ্ছা।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে গিয়া তিনি আর একটু কঠিন হন।

সেদিন সকালে, সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল,—বিশ্বেশ্বর কেমন আছে?

ডাক্তার ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন,—ভালো না।

—বাঁচবে তো? বাঁচবে তো?

ডাক্তার আকাশের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন,—ভগবান জানেন।

ভগবান তো জানিবেনই। কিন্তু তিনি জানেন কি না?

তিনি জানেন না। রোগ কঠিন হইলেই তিনি রোগীকে ভগবানের চিকিৎসায় ছাড়িয়া দেন। না বাঁচিলে রোগীর আত্মীয়েরা ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করুক। আর বাঁচিলে তিনি গিয়া রাজনীতিক ওয়ার্ডে গল্প ছাড়িবেন।

পণ্ডিত চটিয়া বলিল,—ভগবান যে আছেন, সে সবাই জানে। কিন্তু তিনি তো 'ফিজ্' নেন না,—মাস-মাস মাইনে নেন আপনি।

অন্য কেহ হইলে ভীষণ চটিয়া যাইত। কিন্তু ডাক্তার বাবু হাসিয়াই খুন!—

—এ তো বেশ ব'লেছেন মশাই! ভগবান 'ফিজ্' নেন না,—নিই আমি! অ্যাঁ? এ তো মন্দ বলেন নি!

ডাক্তার চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার বসিলেন। তাঁহার হাসি আর থামে না,—গমকে গমকে হাসিয়া ওঠেন।

মিরাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল,—রোগটা কি?

ডাক্তার তাহার পানে সকৌতুকে চাহিয়া বলিলেন,—রোগ? ইউরি-আর্ণিকো-নিউমো-সিগ্রয়েড। কি বুঝলে?

কেহই কিছু বুঝিল না।

ডাক্তার বাবু কি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—খুব কঠিন রোগ।

এবং সমস্ত রাস্তা ফিক্-ফিক্ করিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে হাসপাতালে চলিলেন।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে বিশ্বেশ্বরের মাতাকে জেলে আসিয়া পুত্রের শুশ্রূষা করিবার অনুমতি দিলেন।

আনন্দময়ী বাহির হইতে একবার খাইয়া আসেন, আর সমস্ত দিন রাত্রি সন্তানের পাশে বসিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর মাঝে-মাঝে তাঁহার পানে চায়, কিন্তু ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারে না।

আনন্দময়ী তাহার মুখের উপর মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—আমাকে চিনতে পারছিস্ না? আমি,—মা। ওই যে পাশে গুণেন ব'সে রয়েছে,—তোর পা'তলার দিকে। চিনতে পারছিস না?

কিন্তু সে কাহাকেও চিনিতে পারে না,—বোধ করি, মায়ের স্বর কাণেও পৌছে না। সে অস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়।

ইহার পর হইতেই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। এবং দু'জন ডাক্তার তাহার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্রের বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিল। ডাক্তার ক্রমাগত আশ্বাস দেয়, কিন্তু তাহাতে কি মায়ের মন মানে?

সন্ধ্যার পর হইতে বিশ্বেশ্বরের ঝোঁক চাপিল। সে কেবল-ই চীৎকার করিতে লাগিল,—আমার মা কই? আমার মা?

আনন্দময়ী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলেন,—এই যে আমি, বিশু। এই যে তোর কাছেই।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর কিছুতেই তাহা শুনিবে না। সে তাহার মাকে এদিকে-ওদিকে হাতড়াইয়া কেবলি খুঁজিল।

কখনো অমলাকে ডাকে। চীৎকার করিয়া বলে,—অত দূরে কেন দাঁড়িয়ে রইলে? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না যে। অত আস্তে কথা কও কেন? কিছু শোনা যায় না যে। আমার চার পাশে এরা যে কেবলি চ্যাচাচ্ছে।

আস্তে-আস্তে সুর করিয়া বিশ্বেশ্বর ডাকে,—তুমি এসো, —তুমি এসো,—তুমি এসো।

আর বালিশের উপর মাথা নাড়ে। ওই মাথা নাড়াই খারাপ।

কখনো বা এমন বিশ্রীভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করে যে, চার পাশে যাহারা থাকে তাহারা লজ্জায় কেহ কাহারো মুখের পানে চাহিতে পারে না। হোক প্রলাপের ঘোরে,—তবু তাহার শুভ্র অন্তরের কোণে-কোণে এত কুশ্রীতাও জমা হইয়া আছে, ভাবিতে গিয়া আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্রের মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে।

কিন্তু তখনি বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ আর্ত্তকণ্ঠে কহে,—ওঃ! কি যন্ত্রণা!

অমনি সকলের স্নেহসিক্ত চোখ তাহার দিকে নিবদ্ধ হয়। এমনি করিয়া যমে-মানুষে লড়াই পঁয়তাল্লিশ দিন চলার

পর শেষে মানুষই জয়ী হইল। বিশ্বেশ্বর এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। রক্ষা পাইয়া গেল বটে, কিন্তু হাসপাতালের হাত হইতে নয়। আরও একমাস তাহাকে হাসপাতালের খাটে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তখন আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্র চলিয়া গিয়াছে। রোগীর জীবনের আশা ফিরিয়া আসিতেই তাঁহাদের চলিয়া যাইতে বলা হয়।

পথ্যগ্রহণের পরও বিশ্বেশ্বরের মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা গেল না। কথা কহিতে ক্লান্তি বোধ হয়,—পাশে কেহ গল্প করিলে, কিংবা জোরে কথা কহিলে বিরক্তি লাগে। দিন-রাত্রি চুপ করিয়াই শুইয়া থাকে।

দুপুরে জানালার বাহিরে ঘনপত্রবহুল কতকগুলা ছোট-ছোট গাছে অনেকগুলি ছোট-ছোট পাখী কিচ্ কিচ্ শব্দ করে। তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে তাহা একটি সুন্দর ঔদাস্যের সৃষ্টি করে। মাঝে-মাঝে নবী নওয়াজ আসে। বিশ্বেশ্বর কোনো দিন তাহার সঙ্গে গল্প করে, কোনো দিন বা চুপ করিয়া শুনিয়া যায়।

অসুখের সময় তাহার মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেড়া মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে এক দিন বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—মাথায় হাত দিলেই আমি চমকে উঠি। হঠাৎ মনে হয়, এ যেন অন্য কারো মাথা,—যখন অসুখের ঘোরে অজ্ঞান ছিলাম, কেউ এসে আমার ঘাড়ে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

কথা শুনিয়া নবী নওয়াজ হাসিল। কহিল,—কিন্তু মাথাটা বেশ পাতলা লাগছে না?

বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—উঁহুঁ। শরীরেও গ্লানি আছে, কিন্তু মাথাতেই বেশী দিন-রাত মাথার মধ্যে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

নবী নওয়াজ বিশ্বেশ্বরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর চোখ বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আমার খালাস হ'তে আর কতদিন বাকী আছে? অনেক দিন তো হ'য়ে গেল। মেয়াদ কি আর শেষ হবে না?

তাঁহার বন্ধুদের-কে কবে জেলে আসিয়াছে নবী নওয়াজের তাহা কণ্ঠস্থ। সে মনে-মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া হিসাব করিয়া বলিল,—আপনার তো আর বেশী দিন দেরী নেই। বোধ হয় মাস চার পাঁচ আছে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহাতে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাইল না। সে অসহিষ্ণু ভাবে নবী নওয়াজের হাতটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—তুমি তো সবই জানো। এরা আমাকে কিছুতে ছাড়বে না,—এই খানেই মারবে। কেন যে বাঁচলাম!

বিশ্বেশ্বর পাশ ফিরিয়া শুইল।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মায়ের সঙ্গে বেশী বার দেখা হয় নাই, এবং যাও দেখা হইয়াছে, সে অতি অল্পক্ষণের জন্য। এ বারে তাঁহাকে পাশে পাইয়া আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল না। তিনি যখন চলিয়া যান, বিশ্বেশ্বর ভালো করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই;—অশ্রু-গোপনের জন্য পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। আনন্দময়ী তাহার দুঃখ বুঝিয়াছিলেন। তিনিও এমনি একটা দৃশ্য এড়াইবার জন্য নিঃশব্দেই চলিয়া যান। মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তাহার আর এক মুহূর্ত্তও যেন জেলের হাওয়া সহিতেছিল না।

বিশ্বেশ্বর আবার আপন মনেই বলিল,—ছেড়েই যদি দেবে না, তবে কেন আমায় বাঁচালে? এ কি অত্যাচার!

নবী নওয়াজ অনেকক্ষণ হইতেই একটা কথা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। একবার বেষ্টোর কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়াছিল, সে কথা ভোলে নাই। কিন্তু পেটের মধ্যে কথা চাপিয়া কতক্ষণ থাকা যায়?

সে বিশ্বেশ্বরের কথার সুযোগ লইয়া বলিল,—কিন্তু মাষ্টের, ম'রেই বা কি লাভ হ'ত! তবু তো একদিন ছাড়া পাবো আমরা,—আবার দুনিয়াটা ভোগ করতে পাবো। কিন্তু এই যে বেষ্টোর ফাঁসী হ'য়ে গেল,—দুনিয়ার সঙ্গে ওর আর কি সম্পর্ক রইল?

বিশ্বেশ্বর শিহরিয়া উঠিল! মানুষ জ্বরে বেশ মরিতে পারে, কিন্তু ফাঁসিতে?

বিশ্বেশ্বর বিবর্ণ মুখে বলিল,—বেষ্টোর ফাঁসী হ'য়ে গেল? ফাঁসী?

—সে এক রকম হওয়াই বই কি! লাট সাহেবের কাছে জীবন-ভিক্ষা চাওয়া হ'য়েছে। কিন্তু তা কি আর পাবে?

— তাহোলে ?

তাহা হইলে যে কি হইবে, তাহা কেহই জানে না।

১৮

শরীর একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেই বিশ্বেশ্বর হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইল। সে যখন ওয়ার্ডে ফিরিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। কঠিন অসুখে ভুগিলে সকলেরই চেহারা খারাপ হয়; কিন্তু এ অন্তরূপ ;—ললাটে অনেকগুলি রেখা পড়িয়াছে, চোখের অবসাদের মধ্যে কেমন একটা ম্লান নিঃস্পৃহা,—এই দুই মাসেই সে যেন বৃদ্ধ হইয়াছে।

এমন লোককে লইয়া হৈ চৈ করিয়া আনন্দ করা চলে না। প্রথম আলাপ অত্যন্ত মামুলি প্রথায় সম্পন্ন হইল। এবং তারপরেও, যে বিশ্বেশ্বরের ঘরে আসিত, সে অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে দু'একটি কথা কহিয়াই চলিয়া যাইত।

অসুস্থতার জন্ম বিশ্বেশ্বর আরও এক পক্ষ কাল প্রেসে কাজ না করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এবং জেলার আসিয়া এমনও বলিয়া গিয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে আরও পনেরো দিন তাহাকে ছুটি দেওয়া হইবে। তাহার আহারও হাসপাতাল হইতেই আসে। সকালে-বিকালে ডাক্তার বাবু দু'বেলা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান, এবং কি ভাবে, একমাত্র তাঁহারই চিকিৎসার বলে তাহাকে বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে সে কথা সকলকে শুনাইয়া যান। আরম্ভ করেন, তাহার মায়ের অদ্ভুত শুশ্রূষা করিবার শক্তির বর্ণনা করিয়া এবং শেষ করেন নিজের অত্যদ্ভুত চিকিৎসানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া। বিশ্বেশ্বর সকল কথাই শোনে, কিন্তু কেন যে তাহাকে বাঁচানো হইল তাহা আজও বুঝিতে পারে না। তবু নিঃশব্দে শুনিয়া যায়।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে ফিরিয়া আসার পরের দিন, কিংবা তারপরের দিন সে তাহার জৈলটিকিট লইয়া হিসাব করিয়া দেখিতেছিল, তাহার ছাড়া পাইবার আর ঠিক কতদিন দেরী আছে। সহজ হিসাবে পাঁচ মাস দেরী, কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রের কোনো কঠিনতর প্রক্রিয়ার দ্বারা মেয়াদ আরও একমাস কমাইতে পারা যায় কিনা দেখিবার জন্ম সে দ্বিতীয়বার হিসাবে মনঃসংযোগ করিল। অকস্মাৎ একটা আর্ত্তনাদ উঠিল। তাহার মনে হইল দূরে কে যেন সুর করিয়া কাঁদিতেছে। কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে নির্ণয় করিবার জন্ম সে সমস্ত বারান্দা ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু স্থির করিতে পারিল না। একবার মনে করিল ঘানিঘরের ওদিক হইতে,—একবার মনে হইল, বিচারাধীন কয়েদীর ওয়ার্ড হইতে। কিছুপরে আর শোনা গেল না।

আবার সে মেয়াদের হিসাবে মনোনিবেশ করিতেই আবার সেই কান্না। কি বলে বোঝা যায় না, শুধু একটা করুণ সুর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ভাসিয়া আসে।

বিশ্বেশ্বর নীচের সিপাহীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে কাঁদছে দেখ তো ?

সিপাহী সতর্ক ভাবে কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল,—কাঁহা রোতা হায় বাবুজি ?

বিশ্বেশ্বর অসহিষ্ণু ভাবে বলিল,—ওই তো কাঁদছে! শুনতে পাচ্ছ না ?

এবারে সিপাহী বুঝিল। হাসিয়া বলিল,—রোতা নেহি বাবুজি, গানা করতা হৈ।

গান ? অমনি করিয়া গান করে ?

বিশ্বেশ্বর আশ্বস্ত হইল,—তাহা হইলে কান্না নয়। সিপাহীটা বলিল, ফাঁসীর ওয়ার্ডে বেট্টো বলিয়া নূতন যে লোকটি আসিয়াছে, সেই গান গাহিতেছে। কান্না নয়, মনের আনন্দেই গাহিতেছে।

ফাঁসীর আসামী মনের আনন্দে গান গাহিতেছে ? এবং সে আসামী আর কেহ নয় বেট্টো ? বিশ্বেশ্বরের কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইবারই বা কি আছে ? সংসারে তাহার আকর্ষণ বলিতে কিছু নাই। একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী,—তাহাকে সে নিজের হাতেই শেষ করিয়া আসিয়াছে ; আর একটি পুত্র,—কিন্তু বেটাছেলে, ভিক্ষা করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে ; বাকী মেয়েটি,—কিন্তু তাহার কথা থাক্।

সুতরাং হাসিতে-হাসিতে ফাঁসী যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি !

হাসপাতালে থাকিতে একখানা "ইংলিশম্যান" তাহার হাতে আসিয়াছিল। তাহাতে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল,—একজন খ্যাতনামা মার্কিন ব্যবসায়ী গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন! তাঁহার বিছানায় এক টুকরা কাগজে লেখা ছিল,—"আমার জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। সুতরাং আর বাঁচিয়া লাভ নাই।" এই ব্যবসায়ী বিশেষ একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর বহু কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, এবং ইহার জীবনব্যাপী দানের পরিমাণ পনেরো কোটি টাকা। যশ, অর্থ, বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠা,—মানুষ যাহা কিছু কামনা করে, সবই তো ইহাঁর ছিল। ইহাঁর কাছে পৃথিবীর আকর্ষণ কিছুতেই কম হইতে পারে না। তথাপি বাঁচিয়া থাকিবার যে আদিম ইচ্ছা প্রতি মানুষের বুকেই আছে, ইহাঁর সে ইচ্ছা কেনই বা এত শীঘ্র শেষ হইল, কে বলিতে পারে!

অথচ এমনও দেখা যায়, অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে চিররুগ্না, কর্কশভাষিণী স্ত্রী এবং বুভুক্ষু, স্বল্পায়ু বহু সন্তান-সন্ততি লইয়া দিন যাহার আর কাটে না, তাহারও জীবনের উপর কী মমতা! রুগ্না স্ত্রী চোখের সুমুখে পথ্যাভাবে, চিকিৎসাভাবে তিল তিল করিয়া মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে,—ছেলেদের দেহে স্বাস্থ্য নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, ঘরে ফিরিবা মাত্র হাঁ হাঁ করিয়া ছাঁকিয়া ধরে,—তবু মানুষ মরিতে চায় না। অদৃষ্টের কথা বলা তো যায় না;—একদিন কপাল ফিরিয়া যাইতেও পারে, এই ভরসায় তাহারা যত পারে লটারীর টিকিট কিনিয়া যায়, নয় তো লুকাইয়া স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া রেস খেলে।

সিপাহী বলিল,—ওর এখনও বিশ্বাস ও ছাড়া পেয়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

সিপাহী জবাব দিল,—লাট সাহেবের কাছে ওর ফাঁসী মাফ্ করবার জন্যে আরজি করা হ'য়েছে। ওকে আমরা সবাই ভরসা দিই, লাট সাহেব ওকে ছেড়ে দেবেন।

ও! সেই ভরসায়!

বিশ্বেশ্বর ভাবিয়া দেখিল, আত্মহত্যা করা যায়,—জলে ডুবিয়া মরা আরও সহজ,—কিন্তু ফাঁসীতে-

না, ফাঁসীতে মরা যায় না।

সিপাহী যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নয়।

দিনের পর দিন যায়! কিন্তু লাট সাহেবের কাছ হইতে কোনো হুকুমই আসে না। বেষ্টো ফাঁসীর ওয়ার্ডে একলা বসিয়া অস্থির হইয়া ওঠে। তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। রাত্রে যখন সমস্ত জেল নিস্তব্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া কয়েদীদের ঘুম ভাঙিয়া যায়। সকলের মন তাহার ব্যথায় আর্দ্র হইয়া ওঠে। স্পষ্ট শোনা যায়, একটা লোক কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিদ্রিত পৃথিবীকে শোনাইয়া বলিতেছে, তাহার কোন দোষ নাই,—শত্রুর চক্রান্তে পড়িয়া বিনাদোষে সে ফাঁসীতে ঝুলিতে চলিয়াছে। তাহাকে বাঁচাও,—বাঁচাও,—

বেষ্টোর কথা সত্য নয়। সে সত্যই তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে,—সে অপরাধী। তবু মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথায় সহানুভূতি-আকর্ষণের কি দুরন্ত প্রয়াস! কিন্তু নিদ্রিত পৃথিবীর কাণে কি সকল কথা পৌঁছায়? পৌঁছিলে কোন্ কালে তাহার সুখনিদ্রা চিরদিনের জন্য টুটিয়া যাইত।

জেলার পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে এই জেলেই অনেকগুলা ফাঁসী দেখিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া অমনুষ্যকণ কেহ চ্যাঁচায় নাই। বেশীর ভাগ লোকেই ফাঁসীকাঠে যে সাহস দেখাইয়াছে তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়।

জেলার বলে,—লোকটা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কোনো দিন সামান্য কিছু মুখে দেয়, কোনো দিন খাবার ছোঁয়ও না,—যেমনকার তেমনি পড়ে থাকে। সমস্ত দিন রাত্রি খালি "দুর্গা, দুর্গা" করে। এদিকে পেটে-পিঠে ঠেকে গেছে। দু-চার দিনের মধ্যে লাট সাহেবের কাছ থেকে ভালো-মন্দ যা হোক একটা হুকুম না এলেও এমনিই ম'রে যাবে।

'সেল'এ বসিয়া বেষ্টো সমস্ত দিন যে কি একটা বলে তাহা শোনা যায়,—কিন্তু সে যে "দুর্গা দুর্গা" বলে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না

সকালে, স্নানের সময় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য একবার করিয়া তাহাকে বাহির করা হয়। স্নানের সময় তো স্নান করিতেই আধ ঘণ্টা কাটিয়া যায়,—সকালে ও সন্ধ্যায় কড়া পাহারায় তাহাকে ছোট উঠানটিতে পায়চারি করিতে দেওয়া হয়। পাশের ওয়ার্ডের দোতালা হইতে তাহা দেখা যায়। কিন্তু সে সময় সেখানে কাহারও দাঁড়াইবার উপায়

নাই। কাহাকেও দেখিলেই সে প্রাণ-পণে চীৎকার করিয়া মুক্তির জন্য এমন করুণ আবেদন করিবে যে, পাষাণের পক্ষেও তাহা স্থির হইয়া শোনা অসম্ভব।

একদিন সকালে দেখা গেল, ছাদের উপর দাঁড়াইয়া সে সকলের নিকট মুক্তির জন্য করুণ আবেদন করিতেছে এবং পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার দেহ কুব্জ হইয়া গিয়াছে, চোখ কোটর-প্রবিষ্ট, মুখময় অপরিচ্ছন্ন দাড়ি

কি করিয়া 'সেল' হইতে সে বাহির হইল তাহাই কেহ বুঝিতে পারে না। পরে জানা গেল, সকালে মেথর যখন তাহার ঘর পরিষ্কার করিতেছিল, সেই সময় দ্বার খোলা পাইয়া সকলের অলক্ষিতে দেওয়াল বহিয়া সে ছাদে ওঠে। কিন্তু ওই দুর্ব্বল, ভঙ্গুর দেহে দেওয়াল বাহিয়া ছাদে উঠিবার শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল!

খবর পাইয়া একদল সিপাহী লইয়া জেলার তো হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। তাহার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে। বেষ্টো যদি কোনো রকমে ছাদ হইতে পড়িয়া মারা যায়, কিংবা আত্মহত্যা করে তাহা হইলেই জেলারের কাজ শেষ! চাকরী তো যাইবেই, কঠিনতর শাস্তিও হইতে পারে।

জেলার কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলিল। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাগজ খানা নাড়িয়া বেষ্টোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আরে, জলদী উতর আও, তুমকো ফাঁসী মাফ হো গিয়া!

প্রথম বার তো বেষ্টো শুনিতেই পাইল না। আরও বার দুই বলিতে কথাটা তাহার কাণে গেল।

হঠাৎ তাহার সমস্ত মুখখানি প্রদীপের মতো জ্বলিয়া উঠিল। সে শুধু একবার বলিল—মাফ হো গিয়া?

এবং তারপরেই তাহার অচৈতন্য দেহ ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িল।

•

তার পরেও, আরও বহুদিন আশা ও নিরাশার দোলে কাটানোর পর, অবশেষে বেষ্টোর ফাঁসীই হইল।

আপনার ওয়ার্ডে বসিয়া বিশ্বেশ্বর সকল সংবাদই পাইল। ফাঁসীর আগের দিন বেষ্টো সমস্ত রাত অবিরাম ভগবানকে ডাকিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সে কাতর আহ্বানে মানুষ ঘুমাইতে পারে নাই, কিন্তু দেবতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না কে বলিবে। শেষ রাত্রে যখন জেলার আসিয়া তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলিল, তাহার কণ্ঠ হইতে শুধু একটা শীর্ণ, তীব্র স্বর বাহির হইল,—ও-ও-ও-ও –

আর কিছু শোনা গেল না। সম্ভবত ইহার পরই সে অজ্ঞান হইয়া যায়। কিংবা –

কিন্তু জেলার বলে, সে মরিয়া যায় নাই। তবে অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহার ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয় জেলারের কথাই সত্য। আর সত্য না হইলেই বা কি? দণ্ডিতের মৃত্যু ফাঁসীতেই হোক, অথবা অন্য কারণেই হোক, তাহাতে দণ্ডধারীর কি ক্ষতি? তবু আইন, আইন।

এই কথাটি বিশ্বেশ্বর বুঝিতে পারে না। বলে,—আচ্ছা পণ্ডিত, বেষ্টো যদি ছাদ থেকে পড়ে মরতই, কার কি ক্ষতি! বিশেষ, লাটসাহেবের কাছ থেকে ফাঁসীর হুকুম বাহাল হয়ে আসার পর।

কি যে ক্ষতি, তাহা পণ্ডিতও বুঝিতে পারে না। তবু বলে,— ওর যে ফাঁসীর হুকুম হ'য়েছিল।

—তাতে কি? দণ্ডিত কি তার ইচ্ছামত মৃত্যু বেছেও নিতে পারবে না?

পণ্ডিত এ কথার উত্তর দিতে পারে না।

বিশ্বেশ্বর আবার বলিল,- বেষ্টোকে মেরে কারই বা কি লাভ হোল?

কথাটা পণ্ডিতের বোধ করি কাণেও গেল না। তাহার মেয়ে এই কার্ত্তিকে এগারোতে পড়িয়াছে। এই বৎসরেই তাহার বিবাহ দেওয়া চাই। যে ছেলেটির সঙ্গে বিবাহের কথা চলিতেছে, সস্তায় অমন পাত্র আর পাওয়া যাইবে না। এখন কোষ্ঠী মিলিলে হয়।

রবিবারের মধ্যাহ্ন। সমস্ত জেল নিস্তব্ধ। একটা কাঠঠোক্‌রা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কোন একটা গাছে ঠোক্‌রাইতেছে। গোটা দুই পায়রা থামের উপর বসিয়া পাখায় ঠোঁট গুঁজিয়া ঝিমাইতেছিল।

অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে আপন মনেই বিশ্বেশ্বর বলিল—আমার জেল না হ'য়ে যদি ফাঁসী হোতো তো বেশ হোতো।

'আপনার ক্লান্ত জীবন সে আর বহিয়া বেড়াইতে পারে না।'

মিরাণ্ডা আসিয়া তাহার স্বল্প কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

বিশ্বেশ্বর তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল না। শ্রান্ত ভাবে চোখ বন্ধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, ভালো নাই।

মিরাণ্ডা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—আর তো মাস তিনেক। তারপরে বাইরে গেলেই তোমার শরীর সেরে যাবে।

গভীর নৈরাশ্যে বিশ্বেশ্বর শুধু একটু ম্লান হাসিল।

বিশ্বেশ্বরের দুর্ব্বলতা মিরাণ্ডা জানে। সে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,—গিয়ে বেশ টুকটুকে একটি বউ এনো।

কাকাতুয়া যেমন ঘাড় বাঁকাইয়া একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বুলি শেখে, বিশ্বেশ্বর তেমনি করিয়া মিরাণ্ডার পানে চাহিল। এবং মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল—হাঁ, একটি নারী,—লোকালয়ের বাইরে একখানি সুখনীড়,—প্রচুর অর্থ,—প্রভূত যশ—অমিত বীর্য্য,—অক্ষুণ্ণ যৌবন,—কিন্তু আমার বয়স কত জানো, মিরাণ্ডা?

—কত? তিরিশ?

তাচ্ছিল্য ভাবে হাসিয়া বিশ্বেশ্বর সজোরে বলিল—পঞ্চাশ,—ষাট কিংবা তারো বেশী।

বিশ্বেশ্বর হাঁফাইতে লাগিল। একটু থামিয়া বলিল—আমার দেশের ছেলেরা আমার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে' আছে। আজও তারা প্রত্যহ আমার ছবির পূজো করছে। কিন্তু আমার তাতে কি? পৃথিবী থেকে রস টেনে নেবার শক্তি গেছে, আজকে আমায় যেখানেই বসিয়ে দিক, কোথাও আমি বাড়তে পারবো না,—বাঁচতে পারবো না,—ফুল ফোটাতে পারবো না। এই ক'টা বছরে আমার শক্তি গেছে,—আমার সমস্ত গেছে।

বিশ্বেশ্বর আবার হাঁফাইতে লাগিল।

তিন মাস শেষ হইতে তখনও দুই-এক দিন দেরী আছে, এমন সময় একদিন সকালে জেলার হাসিতে হাসিতে বিশ্বেশ্বরের ঘরে আসিয়া বলিল,—Pack off. You are released.—

বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু বলিল,—Released!

দেখিতে দেখিতে সকলে আসিয়া জুটিল। বিশ্বেশ্বর সকলের মুখ পানে চায়,—কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারে না, সত্যই সে মুক্তি পাইয়াছে। মিরাণ্ডা আসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া সকলের সামনেই ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল,—কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না।

জেলারকে ইঙ্গিতে চলিতে বলিয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, কিছুতে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় জেলারের পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

জেলের বাহিরে আসিতেই গুণেন্দ্র এবং আর কয়েকটি ছেলে আসিয়া তাহার পায়ের কাছে টিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। বিশ্বেশ্বর একবার তাহাদের পানে, একবার পথের পানে চাহিল।—

হু হু শব্দে ট্রাম-বাস মোটর অবিশ্রান্ত ছুটিয়াছে।—ফুটপাথে, রাস্তায় জনতার সমুদ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালের সকাল,—এখনই রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বিশ্বেশ্বর চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কোথাও ছায়ার চিহ্নমাত্র নাই। মানুষের পায়ে পায়ে একটি তৃণাঙ্কুরও মাথা তুলিতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীকে কে যেন পাথরে মুড়িয়া লোহায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

গুণেন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া বলিল,—চল, বিশু দা।

সেই খানেই ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িয়া বিশ্বেশ্বর অস্ফুটস্বরে বলিল,—একটু বসি।

শেষ

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

বলার যুগ, লেখার যুগ যে আর নাই—আজিকার দিনে একথা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। সাহিত্য বিকাশের প্রাথমিক কথা নির্বন্ধন, তা' সে যে বন্ধনই হউক না কেন,—মনের বন্ধন সাহিত্য-জীবনের বড় কথা বটে কিন্তু আইনের বন্ধনটা এড়াইতে যাওয়ার চেষ্টার মধ্যেও বিড়ম্বিত অধ্যবসায় যে সাহিত্য-জীবনকে পঙ্গু করিতে পারে—পঙ্গু করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

তবে বলিবার কিছু না থাকিলে কথা গুছাইয়া, ছন্দো মিলাইয়া ভাব সঞ্চারিত করিবার বিফল প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-সাধকের পক্ষে মাঝে মাঝে চুপ করিয়া থাকাও সেইজন্য একটা উচ্চাঙ্গের সাধনা। প্রকৃতির লতা-পাতা ফুল আপনা হইতেই বিকশিত হইয়া সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে মধুর করিয়া তুলে—কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে বহুদিনের গোপন ও নির্ব্বাক সাধনা রূপে রসে আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে তাহার কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। আবার কিশলয় বা ফুল পরিণতির দিক দিয়া কোনটাই চরম নহে—কিশলয় হইতে পত্রে, ফুল হইতে ফলের যে পরিণতি তাহা আকস্মিকও নহে, শব্দসমন্বিতও নহে।

আমাদের নিস্তব্ধ যুগের নীরব সাধনার ফলে, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তিতে নিত্য নূতন সাহিত্যরসের সৃষ্টি হইবে। মানসলোকের অন্তরালে যে চিন্তার ধারা বিপুল অনুভূতিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল তাহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু I think, therefore I am, মনস্তত্ত্বের এই প্রাথমিক তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া মূকের যুগকে সকলেই অভ্যর্থনা করিতে চাহিবে না। যাহাদের সত্যই কিছু বলিবার কিংবা জানাইবার আছে, তাহাদের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা শোভন হইতে পারে না।—

"Great as literature is, it is merely the fitful manifestation of the worlds' rich Inner life—its noblest thought, its most heroic deeds, that this life flows on everlastingly and untiringly and would continue to flow."

তবে যাহারা প্রকৃত সাহিত্যিক নয়, সাহিত্যিক নামের দোহাই দিয়া যাহারা ব্যবসায় চালাইতে চাহে, যাহাদের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ নাই,—সাহিত্য-নীতির প্রতি কোনও প্রকার শ্রদ্ধা নাই, সাহিত্যিকদের সংস্পর্শমাত্র আসিয়া যাহারা সাহিত্যিক সাজিয়া আপনাকে জাহির করে, বংশানুক্রমিক প্রভাব বা সাহিত্যিক পরিবেষ্টনীতে পড়িয়া না জানিলেও যাহারা লেখনী-পরিচালনে অভ্যস্ত, তাহারা চুপ করিয়া থাকিলেই সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর। আর যাহাদের লেখনী বহুপ্রসবের ফলে মৃতবৎসা হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের সাহিত্য-প্রজনন-বিজ্ঞান অজ্ঞাত থাকায় সন্তান-সন্ততি জন্মমৃত অথবা অকালমৃত হয়, তাহাদের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে মনের খোরাক জোগাড় করিতে পারিলে ফল শুভ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

এসিটিলিনের আলো যে বস্তুটির জোরে অন্ধকার দূর করে, তাহার অভাব ঘটিলে আলোর পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে যে মনোরম গন্ধটি ছড়াইয়া পড়ে তাহা আর যাহাই হউক স্বাস্থ্য এবং আরামের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

অসাধু উপায়ে সাধারণের কাছে নিজেকে জাহির করিবার নেশা একবার পাইয়া বসিলে আর নিস্তার নাই। ক্রমশঃ নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেরই মনুষ্যত্বের ঘরে চুরি করিতে লজ্জা বোধ হয় না—বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করাও

অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-সাধনাই মুখ্য আদর্শ, সাহিত্যে নাম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইতেছে অযাচিত আভরণ, মানুষকে তাহা শ্রীদান করে কিন্তু তাই বলিয়া সোণার বাজু নাড়া দিয়া সুপরিচিত হইবার মেছুনী-বুদ্ধির যে বিড়ম্বনা, তাহা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যদি সংক্রামিত হইয়া পড়ে,—তবে তাহা লোভেরও নয় লাভেরও নয়, ক্ষোভের বিষয় বটে।

যিনি সত্যকার কবি, সাহিত্যিক, তিনি ত নিখিলমানব সমাজের মুখপাত্র। নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহারই হৃদয়ে বিশ্বমানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; সংসার-সংঘাতের মূক বেদনাকে ত তিনিই যুগে যুগে আপনার অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার যাদুস্পর্শে মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা, সহজ চৈতন্যের উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসে রূপে রূপে রসে রসে তিনি চিরগোপনকে সুন্দর ও মধুর করিয়া, আমাদের গভীরতম অনুভূতি ও সূক্ষ্মতম দৃষ্টির মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া দিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও রসোপলব্ধির এই যে আনন্দ ইহার জন্য আমরা কবির কাছেই ঋণ স্বীকার করি। কবি-চিত্ত প্রকাশের বেদনায় আকুল হইয়া উঠিলে কাব্যরস পরিবেশনের অভাব হইবে না। কোনও দিন যদি পারিপার্শ্বিকের অন্তরালে কবি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নৈবেদ্য-থালিকা হইতে সরাইয়া লইয়া মৌনব্রত গ্রহণ করেন—আমরা বুঝিব আমাদের জীবনের সে অতি দুর্ভাগ্যের দিন!

মানব-মনের নানা বিচিত্র কল্পনা, পরমাশ্চর্য্য ভাবুকতা, অলৌকিক অনুভব-শক্তি এবং অপূর্ব্ব সমবেদনায় যাঁহার রসসৃষ্টি লীলায়িত হইয়া পাঠক-চিত্তকে রসসিক্ত ও পরিতৃপ্ত করিয়া দিতেছে, চিরন্তনের জন্য তাঁহার মগ্ন সমাধি গভীর পরিতাপের বিষয় বলিয়াই অনুমিত হইবে।

কবির জীবনের যে নীরবতা তাহা চিরন্তনের জন্য নহে, তাহা প্রকাশের সহিত যোগ-সাধনের একটি উপায় মাত্র।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতিভা ছিল—"one with nature"—তিনি বলিয়াছেন—

> I wandered *lonely* as a cloud
> Which floats on high o'er vales and hills.

আর একস্থানে বলিতেছেন—

> In vacant or in pensive mood
> They flash upon the inward eye
> Which is the bliss of *solitude.*

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে উচ্চাঙ্গ কাব্য-সৃষ্টির জন্য *lonely* হওয়া, এবং bliss of *solitude* পাওয়া দরকার। একটি মানসিক অবস্থা অপর একটী মানসিক অবস্থার সহিত যোগসাধন করিতেছে মাত্র।—কাব্যের পরিণতির দিকে আত্মস্থ মন সর্ব্বদাই সাহায্য করে।—চিন্তার ধারা তাহাতে কখনই ব্যাহত বা বিক্ষুব্ধ হয় না।

সুতরাং দেখা গেল সময়ান্তরে প্রকৃত সাহিত্যিকের পক্ষেও নীরবে নির্জ্জনে মানসিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। যাঁহার দান করিবার মত কিছু নাই,—বক্তব্য বিষয়ের অপেক্ষা মন্তব্যের আড়ম্বর যাঁহার বেশী—অন্তর্মুখীনতাকে কাম্য না ভাবিয়া যিনি বাচালতাকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহার লেখনী "নিরবধি কাল" এর জন্য বন্ধ হইয়া গেলেও কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু সৃষ্টির প্রতিভা লইয়া যিনি সাহিত্যিক বা কবি হইয়াছেন—"বিপুলা পৃথ্বীর" মনের ক্ষুধা মিটাইবার দায়িত্ব যে সত্যসত্যই তাঁহার। লোকচক্ষুর অন্তরালে, দূরে বনান্তরে যে যোজনগন্ধা ফুলটি ফুটিয়া আপনিই ঝরিয়া যায়—তাহার ফুল-জীবনকে সার্থক করিবে কবি, অজ্ঞাত অখ্যাত মূক, নিরুপায় বেদনাকে ভাষা দিবে কবি, ব্যথার অশ্রুতে মিড় টানিয়া সৌন্দর্য্যকে বাজাইবে কবি—হাসির মুক্তা অশ্রুর মাণিকে বাণীদেবতার পূজার নৈবেদ্য সাজাইবে কবি।

সাহিত্য-সন্দেশ

বিচিত্রা—মাঘ, ১৩৩৮—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার শুভ পরিণয়োপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ—"'পরিণয় মঙ্গল' নামক কবিতা, ভাবে ভাষায় ও সত ভাষণে অনবদ্য হইয়াছে বলাই বাহুল্য। দুটি উন্মনা পাখী দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে অসীম শূন্য পাড়ি দিবার সময় দৈবাৎ পাখায় পাখা ঠেকিয়া কি ভাবে সটান্ মাটিতে পড়িয়া গেল,—তাহারই একখানি নিখুঁৎ চিত্র। তবে আশীর্ব্বাদ কোথাও দেখিলাম না। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথকেও এখনো বিয়ের কবিতা যোগাইতে হয়! তিনি যে তাঁহার কবিতার নানাস্থানে নানারূপ বলিয়াছেন তাঁহার গানের মূলে যে সব গোপন দুঃখ ও ব্যথা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহার খোঁজ ত কেহ রাখে না, একথা একান্ত সত্য।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, পি-আর-এস্, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র একটী সুন্দর সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া করিয়া শেষে পরম বিস্ময়ভরে বলিতেছেন—

"এ কি চোখের ও বুদ্ধির দীপ্তি, যার ফলে অতিসূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যও তার (কার?) দৃষ্টি এড়ায় না, অতি তীক্ষ্ণতম বাক্যও তার অর্থ হারায় না। আমরা যে-সব তরুণ-তরুণী বর্ত্তমানে এই অতি-আধুনিক যুগে বাস করি, এমন করে আমরাও দেখি নে, বুঝিনে, জানিনে; যতটুকু দেখি, বুঝি বা জানি ততটুকুও এমন করে বলতে পারি নে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের তরুণীদের চাইতেও অধিকতর তরুণ?"

'শেষের কবিতা'য় যে সব ভাবনা ও বাক্য স্থান পাইয়াছে তাহা প্রাচীন অথবা আধুনিক বহু তরুণতরুণী বুঝে না ও জানে না, একথা আমরা জানিতাম। কিন্তু নীহাররঞ্জন প্রমুখ যে সব তরুণতরুণী এই অতি-আধুনিক যুগে বাস করেন তাঁহারাও যে ইহা বুঝেন না ও জানেন না, একথা জানিয়া বিস্মিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথ তবে এই বৃদ্ধ বয়সে এত কষ্ট করিয়া বইখানি কাহার জন্য লিখিলেন? তদুপরি বিস্ময়ের বিষয় এই যে অতি-আধুনিক যুগবাসী তরুণতরুণীও তীক্ষ্ণতম বাক্যের অর্থ না হারাইয়া এমন করিয়া বলিতে পারে না, যেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন! তাঁর 'শেষের কবিতা'র বাক্য তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে, অথচ তাহার অর্থ হারাইয়া যাইতেছে না, অতিতরুণ সাহিত্যিকের কাছে এতদপেক্ষা বিস্ময়ের কথা আর কি আছে? এই অতিবিস্ময়কর ব্যাপার সম্ভব হইল কিরূপে? কারণ আর কিছুই নহে, সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ আমাদের (নীহাররঞ্জনপ্রমুখের) তরুণীদের চাইতেও অধিকতর তরুণ!

আমরা এই বিস্ময়াত্যাধিক্যে সম্পূর্ণ যোগদান করিতেছি। কেবল একটু খট্‌কা লাগিতেছে—যে-কবির তারুণ্যের তুলনা একমাত্র তরুণীদের সহিতই করা চলিতে পারে, তাঁহার কাব্যমানসের বিশ্লেষণ উপলক্ষে লেখক যে পুংলিঙ্গাত্মক 'বৃদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা কি ব্যাকরণসম্মত হইয়াছে? ভাবিয়াছিলাম ফাল্গুনের বিচিত্রায় 'ত্রুটিস্বীকার'এর মধ্যে এটি সংশোধিত হইবে। কিন্তু তাহাও দেখিলাম না। বিচিত্রাতে যে এরূপ ব্যাকরণ ভুল হইবার উপায় নাই তাহার প্রমাণ এই সংখ্যাতেই পাইতেছি—যেখানে প্রণতা মানকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথকে চার লাইনে জয়ন্তী করিবার সময় লিখিয়াছেন—

"তোমারে পেয়ে যে কৃতার্থা হয়েছে আমারি মাতৃভূমি।"

এ সংখ্যার 'ত্রুটি-স্বীকার' নিবন্ধটি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন—গত সংখ্যার "টুক্‌রী" কবিতাগুলিতে "ঘোর গাঙে আজ" এর স্থলে "মোর গাঙে আজ", "আমি বাদলের" স্থলে "আজি বাদলের" "কালো মেঘের" স্থলে "কালো মেয়ের" হইবে। এইরূপ "বেগুন" স্থলে "সেগুন" এবং "ফুল" এর স্থলে "ফল" হইবে।

আমরা শব্দগুলি বদলাইয়া কবিতাকয়টি পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিলাম—আশ্চর্য্য রচনা-কৌশল, অর্থের কোনই ব্যতিক্রম হইল না!

সাময়িকী

দেশে দুঃসময় আগত হওয়ার পর হইতে আমরা সাময়িকী লেখা বন্ধ করিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম দুঃসাময়িকী না লিখিয়া সুসময় ফিরিলে পুনরায় চেষ্টা করা যাইবে। এখন দেখিতেছি সে আশায় থাকিলে এ অধ্যায় বুঝি চিরদিনের জন্যই বাদ দিতে হয়!

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে অদূর অতীতে বাংলার সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না; তখন টাকায় ৮ মণ ধান, ক্ষেতভরা ফসল ও লোকের সুপ্রচুর অবকাশ ছিল। পশ্চিমের সংঘাতে, দেবদ্বিজে ভক্তির অভাবে ও অপরাপর নানা কারণে দেশের সে সব সুখের দিন চির-কালের জন্য তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু এই ইংরাজ-রাজত্বের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ছায়াতলে বসিয়া আমরা ত পুনরায় সেই দিনের আভাস পাইতেছি; তথাপি সুখ নাই কেন? যে ধান মহার্ঘ্য হওয়াই কাল পর্য্যন্ত আমাদের সমুদয় দুঃখের কারণ ছিল; সেই ধান সস্তা হওয়াই আজ বাঙ্গালীর সর্ব্বকষ্টের মূল হইল। আক্রা হইলেও দোষ, সস্তা হইলেও বিড়ম্বনা; ধান্য বেচারী কোন পথে যায়? টাকায় এক মণ হইয়াই যখন আমাদের এই দশা, তখন আট মণ হইলে ব্যাপার কি হইবে অনুমান করা কঠিন।

ক্ষেত্রে ফসলের অভাব গতবার মোটেই ছিল না। পাট ত কাটাই হইল না, পাছে ভরা ক্ষেতের কোণ শূন্য হইয়া যায়। এবারও ক্ষেতভরা ফসল ফলিয়াছে। আমাদের দুঃসময় ত বাড়িয়াই চলিতেছে।

লোকের অবকাশও বাড়িতে বাড়িতে প্রায় সেকালের আদর্শে উপনীত হইয়াছে। চাকুরীগ্রস্তেরা দলে দলে অবকাশ লাভ করিতেছে। ব্যবসায়ীদের নৈমিত্তিক হরতাল ক্রমে নিত্য অবকাশে পরিণত হইতেছে। হনুমানের অত্যাচারে সাহিত্যিকদিগের চিরন্তন কলাবাগানেও আর কদলী থাকিতে পাইতেছে না। নিরুপায় হইয়া অনেকে নূতন বাগানের আশায় বালি চষিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মোটের উপর দেখিতেছি সেকালের শায়েস্তা খাঁর সেই সুখের রাজত্বকালই যেন ফিরিয়া আসিতেছে। কেবল অদৃষ্টে দুঃখ লেখা ছিল বলিয়াই এত সুখের মধ্যেও আমাদের দুঃখ বাড়িয়া চলিল।

বিড়ম্বনা লইয়া ক্রন্দন বা অভিমান করিব তাহাও আমাদের অদৃষ্টে লিখে নাই। কারণ অভিমান-ভরে কি বলিতে কি বলিয়া, জানা-অজানা আইনের কবলে পড়িয়া যাইব, তাহাতে কাহারই বা লাভ? যাঁহারা বরাবর জেলে যান, এবারও তাঁহারা নীরবে জেলে গিয়াছেন। কলরব করিবার জন্য যাঁহাদের বরাবর বাহিরে থাকিবার কথা, তাঁহারা বাহিরেই আছেন, কেবল কলরব করিতে পারিতেছেন না এই দুঃখই দেশের পক্ষে আজ মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। তথাপি সারাদেশে বৃথা বাক্যব্যয় বন্ধ করিবার এই ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন বলিয়াই মনে করি।

কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, চীনাদের প্রতি অবিচার ত আর দেখা যায় না! উদ্ধত জাপান রাজ্য ও ব্যবসার লোভে সর্ব্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের বিবিধ বিনীত নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সাংহায় আক্রমণ করিয়াছে। জাপান আশা করিয়াছিল যে তাহার সুশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত প্রণালীর রণসম্ভারের চাপে চাপাই হইতে সাংহাই পর্য্যন্ত প্রদেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দখল করিয়া লইবে। কিন্তু চীনা-সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। বহুদিন হইতেই কেবল-উসাং, চাপাই, কিয়াংচান ও সাংহাই এই কয়টি স্থানের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম। ইহাতে বুঝা গিয়াছিল যে জাপান সহজে ঐ সকল স্থান পূর্ণ দখল করিতে পারে নাই। তবে জাপান কাহারও হিতোপদেশে কর্ণপাত না করিয়া সাংহাইএর নিরপেক্ষ নিবাসে নূতন সৈন্যদল অবতরণ করাইয়া পুনরাক্রমণ করায় চীন সৈন্যের হটিয়া যাইতে হইয়াছে, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

উভয় পক্ষে ভীষণ গোলাবর্ষণ, আকাশরথে বিষম বিস্ফোরণ ক্ষেপণ, সামরিক ও অসামরিক হতাহত ব্যক্তিদের সংখ্যানির্দ্ধারণ প্রভৃতি সমান ভাবে চলিতেছিল ; কিন্তু ইহা হইতে যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে চীন জাপানে যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহা হইলে তিনি নিতান্তই সেকালের লোক। চীন জাপান উভয়েই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য, এবং বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ জীবিত থাকিতে চীন ও জাপানে যুদ্ধ বাধিতেই পারে না, নৈতিক প্রভাব সঙ্ঘের এতই অধিক! আমাদের দেশে যেমন অনাহারে লোক মরিতে পারে, অথচ দুর্ভিক্ষ হইবার যো নাই, এও অনেকটা সেই রকম।

—

তবে উভয় পক্ষে hostility বা শত্রুজনোচিত ব্যবহার চলিতেছে ইহা সত্য বটে। ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতির রণ-তরীতে চীন ও জাপান সেনাপক্ষদিগের বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে এই hostility বন্ধ করিবার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। জেনেভাতেও সভা সমিতির অন্ত নাই। এই সবের ফলে যে-যুদ্ধ বাধে নাই সেই যুদ্ধ যদি থামিয়া যায় তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব।

—

চীন দুর্ব্বল, জাপান প্রবল। চীন সেনাদের বিপুল বিক্রমে দেশরক্ষার সংবাদে আমরা স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হইয়াছি ; হয়ত প্রার্থনা করিতেছি যে তাহারা যুদ্ধে জয়ী হউক! কিন্তু বিপুল বিক্রম, দেশরক্ষা, যুদ্ধজয় প্রভৃতি কথার অন্তরালে মানবের যে নিদারুণ দুঃখ কষ্টের বার্ত্তা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাতে কাহারও উৎফুল্ল হইবার কথা নহে। সেদিন সংবাদ আসিয়াছিল যে চাপাই কিয়াংওয়ান প্রদেশে ৮০০০ অসামরিক ব্যক্তি জাপানী মারণাস্ত্রের মুখে হত হইয়াছে! তাহার মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক কিছুই অবশ্য বাদ পড়ে নাই। এ ব্যাপারের প্রকৃত উপলব্ধি যদি সম্ভবপর হয়, তবে যুদ্ধে কে জিতিল কে হারিল এ সংবাদ অবান্তর হইয়া পড়ে। যে ভারতবর্ষ শপথ করিয়া বলিয়াছে যে রাষ্ট্রীয়-মানস হইতে হিংসা-নীতিকে নির্ব্বাসিত করাই তাহার এযুগের ধর্ম্ম, সেই ভারতবর্ষেও যখন সকলেই অন্ততঃ মনে মনে পক্ষাবলম্বন করিয়া চীন জাপান যুদ্ধে জয় পরাজয়ের সংবাদে আনন্দ বা নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে, তখন জগৎ হইতে যুদ্ধ নির্ব্বাসনের আশা কোথায়? ঝটিকা ও জলপ্লাবনের ন্যায় মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের আবির্ভাব হয়ত বা জগতব্যাপারে অনিবার্য্য!

—

জলপ্লাবনের কথায় কলিকাতা সহরের রাস্তার কথা মনে পড়িয়া গেল। সামান্য বৃষ্টিপাতে এই সহরে যে জল-প্লাবন ঘটে বহুদিন হইতে তাহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। এই জন্য কর্পোরেশন Mr. Dey কে Spl. Officer নিযুক্ত করিয়াছেন। Mr. Dey দেশে বিদেশে শিক্ষিত ; কৃতী ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁহাকে নিয়োগ করিবার সময় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় হইতে কর্পোরেশন যে বাধা পাইয়াছিল তাহা অনেকেরই হয়ত স্মরণ আছে। তিনি কলি-কাতাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে প্ল্যান দিয়াছিলেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মিঃ রবার্টসন, মিঃ অ্যাট্‌কিন্‌স্‌, মিঃ রোচে ও মিঃ গ্রিফিন্ এই চারি জনকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত করিয়াছিলেন। কমিটী একবাক্যে রিপোর্ট করিয়াছেন যে Mr. Deyর প্ল্যান একেবারে অচল ; কারণ তিনি গোড়ায় গলদ করিয়া হিসাব ধরিয়াছেন। এই প্ল্যান অনুসারে কাজ হইলে অবিলম্বে ময়লা জমিয়া ড্রেন বন্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহারা মনে করেন ১৯১৪ সালে Mr. Ball Hill যে প্ল্যান করিয়া দিয়াছিলেন সেই অনুসারে কার্য্য করাই সঙ্গত।

—

Mr. Dey ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহার হিসাব মোটেই ভুল নহে। কমিটির সদস্যগণকে তিনি বুঝাইবার সম্যক চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছেন যে তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। তদুপরি তাঁহাদের মধ্যে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার Mr. Roche আজও বারিবিজ্ঞানের আদিম যুগের অঙ্ক-সূত্র আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছেন, আধুনিক সূত্র সম্বন্ধে বিশেষ খবর তিনি রাখেন না। পাছে এ সম্বন্ধে আমরা কেহ সন্দেহ করি, সেজন্য Mr. Dey বলিয়াছেন যে আধুনিক মতে Vo=1·17 R, were Vo=Criticial nonsilting velocity, R=Hydraulic mean

Radius, F (?)=Siltfactor. অতএব তিনি যে প্ল্যান করিয়া দিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য করিলে অনেক অল্প ব্যয়ে কলিকাতার প্লাবন-সমস্যার মীমাংসা হইবে। কমিটি যে উপদেশ দিয়াছে তাহার অনুসরণ করিলে কর্পোরেশনের আর একবার প্রচুর অর্থ নষ্ট হইবে মাত্র। এই জাতীয় উপদেশ শুনিয়া করপোরেশন ও গবর্ণমেণ্ট যেমন একবার ১০ লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়াছেন, এবারও সেইরূপ অপব্যয় হইবে

এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা তবে কে করিবে? আমাদের মতে রাস্তার হাঁটুজলে দাঁড়াইয়াও সকলের বলা উচিত—একজন বাঙ্গালীর হিসাব যতই সূক্ষ্ম হউক, তাঁহার কথায় ৪জন সাহেবের কথা অগ্রাহ্য করা স্বরাজী করপোরেশনের উচিত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ত সে ভুল করিবেনই না

এবিষয়ে কেন, কোন বিষয়েই যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভুল করিতে পারেন এরূপ মনে করা আর চলিবে না। কারণ স্যর স্যামুয়েল হোর সেদিন যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম হইতেছে—অর্ডিন্যান্স্ চালন সম্পর্কে চূড়াধিষ্ঠিত বড়লাট হইতে তলস্থ পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারী সাহস, সাবধানতা ও সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগসহকারে কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং ভুলক্রমেও অর্ডিন্যান্সের অপপ্রয়োগ হইতেছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। ভারতবাসীদের যত দোষই থাকুক তাহারা যদি একবার পাহারাওয়ালা হইবার সুযোগ পায় (বড়লাট হইবার অবশ্য উপায় নাই) তাহা হইলে সর্ব্বদোষবর্জ্জিত হইয়া পড়ে, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সকলেই জানি। মহাত্মা দেশবাসীকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন—তাহারা যেন প্রথমে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মশুদ্ধি করে। মহাত্মা যে প্রকৃতির লোক, তাঁহাকে যদি কোন প্রকারে একবার বিশ্বাস করান যায় যে পাহারাওয়ালা হইলে এরূপ চিত্তশুদ্ধি অনিবার্য্য, তবে তিনি যে দেশবাসী সকলকে বেতনে বা অবেতনে পাহারাওয়ালা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জয়াকর ও সাপ্রু কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের বিরোধ মিটাইবার অনেক চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই; আর একবার এই পন্থায় চেষ্টা করিলে কি হয় বলা যায় না।

স্যর স্যামুয়েল আরও বলিয়াছেন, ভারতের উপস্থিত অবস্থা তিনি সঙ্কটসঙ্কুল (critical) বলিতে চাহেন না তবে তাহা চিত্তাকর্ষক (interesting) বটে। হায়রে, ঈসপের বৃদ্ধ ব্যাং এর মুখে যাহা নির্গত হইয়াছিল, আমাদের মুখে আজ তাহাও শোভা পায় না।

কিন্তু ব্যাং-বংশের একেবারে ভরসাহীন হইবার কারণ নাই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরাই গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত কমিটি গুলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন দেশে যাহাতে অচিরে সুদিন সুবৃষ্টি ফিরিয়া আসে, যখন পুনরায়

গলা ফুলো কোলা ব্যাং,
ডাকিবে গ্যাঙোর গ্যাং!

—

আর এক ভরসা স্বদেশী জিনিষের কাটতি খুবই বাড়িয়াছে। চিনির কাটতি কমিয়া গুড়ের চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে। কুমিল্লা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে সে জেলার জীবিত লোকেরা ত চিনি ছাড়িয়াই দিয়াছে। যাঁহারা মারা গিয়াছেন তাঁহারাও কেবল মাত্র গুড় ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া শ্রাদ্ধাদিতে চিনির চলন উঠাইয়া দিতে হইয়াছে।
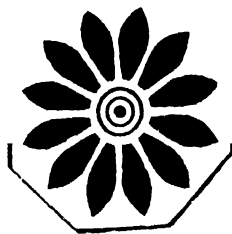
পুস্তক-পরিচয়

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক: প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ছাপা বাঁধাই ভালো।

আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের যাহা পরম আশীর্ব্বাদ, তাঁহার নিজের কাছে তাঁহার সেই প্রতিভাই চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। 'হাত অপেক্ষা আম বড়' নিয়া আমাদের চলিত বাংলায় একটি প্রবাদ-বাক্য আছে। যে দেশে ও কালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের ও কালের পরিমাণে রবীন্দ্র-প্রতিভা এতখানি যে, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে কখনও জোড় হস্তে পূজা দিতেছি, কখনও যতদূর সম্ভব গালাগালি করিতেছি। তবু যদি পূজার উপচার কটূক্তির পর্ব্বত-প্রমাণ অবয়বের নিকট হাস্যকর রকমে ক্ষুদ্র না হইত, তাহা হইলেও বুঝিতাম! তাঁহার প্রতিভার শৈশবে, কৈশোরে ও যৌবনে, বাংলার সাহিত্যিক অ-সাহিত্যিক সকলে নির্ব্বিচারে তাঁহার উদ্দেশ্যে যে গ্লানি বর্ষণ করিয়াছে, তাহার কণিকা ধুইতে আজ সহস্র রবীন্দ্র-জয়ন্তীও অক্ষম। তবু সান্ত্বনা হয়তো এই যে, প্রায় সকল প্রতিভার ভাগ্যেই সকল কালে ও দেশে এমনই ঘটিয়াছে। আমরা তো তাঁহার জীবিত কালেই প্রায়শ্চিত্ত সুরু করিয়াছি, অন্য ক্ষেত্রে মরণের বহু পরে প্রায়শ্চিত্তের ক্ষণ আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বলি নাই—অভিধান খুঁজিয়া এমন নিন্দাবাণী বাহির করা শক্ত। দেশের ছেলেরা আজও তাঁহাকে সভায় লাঞ্ছনা করিতে ছাড়ে না। যেদিন তিনি 'ঘরে বাইরে' লিখিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার 'সন্দীপ'এর সহিত দু'একজন দেশ-নায়কের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া আমরা তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছি। সেই 'ঘরে বাইরে'র 'নিখিলেশ'ই কিন্তু অহিংস অসহযোগের প্রথম পুরোহিত। এই অহিংস অসহযোগের আমলেই আবার আমরা তাঁহার 'নিখিলেশ'কে ভুলিয়া তাঁহাকে 'সত্যমিথ্যা' কত কথাই না বলাইয়া ছাড়িলাম। আজও তিনি নিস্তার পান নাই। আজও আমরা বলি যে, তিনি কল্পনার স্বপ্ন-জাল বয়ন ছাড়া আর কিছু না করিয়াছেন!

এক একবার মনে হয়, আমাদের এই অপরাধের জন্য আমরাই কেবল মাত্র দোষী নই। রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রচারের যাঁহারা ভার নিয়াছেন, তাঁহারাও অংশতঃ দায়ী। শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বর্ত্তমান সঙ্কলনখানি পড়িয়া আমাদের সে ধারণা আরও বলবতী হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয় লিখিয়াছেন—

> "আমাদের দেশের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছে যে, রবীন্দ্রনাথের মন দেশের চেয়ে যেন বিদেশ ও বিদেশীর প্রতিই বেশী উন্মুখ! অর্দ্ধ শতাব্দীর একনিষ্ঠ স্বদেশসেবা ও সাধনার পর দেশবাসীর কাছে এই রকম উপহার নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই লাগে!......মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আমাদের কাণে ও মনে মধুবর্ষণ করবার বায়না নিয়েই আসরে নেমেছেন। সেটা বড় কম কাজ নয়, কিন্তু তার উপরও কবি কিছু করেছেন, যার প্রমাণ তাঁর অগণিত অনাদৃত গদ্যরচনার মধ্যে রয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কবির একনিষ্ঠ ভক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।"

সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতেই ডক্টর নাগ ভারত বাবুকে এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—আমরা ইহার সমর্থন করি। আমরা কিন্তু প্রশ্ন করিব, কবির যে গদ্যরচনা এতদিন অনাদৃত পড়িয়া আছে, তাহার জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রচারের ভার নিয়া 'বিশ্ব-ভারতী' এতদিন কি করিতেছেন? কতকগুলি কাব্য-গ্রন্থের শোভন সংস্করণ অশোভন মুদ্রাকর প্রমাদের সহিত প্রকাশ করিয়া এবং অসম্ভব মূল্যের ছাপ দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠোৎসুক দেশবাসীর কাছে তাহাদিগকে দুষ্প্রাপ্য করা ছাড়া 'বিশ্বভারতী' এ অবধি রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারকল্পে কি করিয়াছেন?

'বিশ্বভারতী'কে আমরা মাত্র ব্যবসায়ী হিসাবে দেখিলে এ কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতাম না—আমাদের মতে 'বিশ্বভারতী' বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অছি। সুতরাং 'বিশ্বভারতী'কে তদুপযুক্ত দায়িত্ববোধসম্পন্নই আমরা দেখিতে চাই।—

নিবেদন হিসাবে ভারতবাবু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া বইখানির পরিচয় দিতেছি,—

"রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ষোল বছরের সাহিত্য হতে আরম্ভ ক'রে এ পর্য্যন্ত বহু লেখা দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে আমি সংগ্রহ করেছি। সম্প্রতি তারই সামান্য কিছু দিয়ে ভাবী গ্রন্থের ভূমিকার সামিল ক'রে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে পাঠকের কাছে হাজির করলুম।"

"শুধু রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার ধারা তাঁর নিজস্ব ভাষায় পাঠক সমাজে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁর লেখার উপরেও আমাকে যে অল্প বিস্তর লেখনী চালাতে হলো, তা আমার প্রবল ইচ্ছার বেগে নয়, প্রয়োজনের তাড়নায় বাধ্য হ'য়ে। অতএব আমার আলোচনা যদি কারো কাছে কোথাও ভাল না লাগতে চায়, তবে তাঁরা যেন মনে করেন—আমার ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ সবটা নাইবা হ'লো, উদ্ধৃত লেখাংশগুলিই রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্য তাঁদের কাছে রইল। এতদ্দ্বারা পাঠকের ষোল আনা লোকসান হবে না বলেই আশা করা যেতে পারে।"

আমরা বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া এক আনাও লোকসানগ্রস্ত হই নাই। যে পরিসরের মধ্যে তাঁহাকে এত ব্যাপার সাঙ্গ করিতে হইয়াছে, তাহাতে ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইয়া ভারতবাবুকে আমরা নিঃসঙ্কোচে এ গুরু কার্য্যের ভার ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি। তরুণ চিত্তকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে দীক্ষা দিতে হইলে ভারতবাবু এ পুস্তকে সে-সাহিত্যের যেদিকের পরিচয় দিয়াছেন, সেই দিকই প্রশস্ত।

বিদ্যালয়—শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল ভাদুড়ী। প্রকাশক :—শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষৎ। ৯ ও ১০ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা।

শ্রমজীবী শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক পুস্তিকাখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"বহু বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে শ্রমজীবী শিক্ষা আন্দোলন চলিতেছে। শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষৎ বিংশ বৎসরাধিক এই বিষয়ে কাজ করিতেছে। এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যে শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা সম্ভব।...এরূপ বিদ্যালয় কিরূপে স্থাপন ও পরিচালন করিতে হয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকাতে কর্মীদের ইচ্ছা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না বা স্থাপিত হইলেও স্থায়ী হয় না। মাণিকতলা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী বি-এস্-সি মহাশয় শ্রমজীবী বিদ্যালয় বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশে শ্রমজীবী শিক্ষা প্রচারে এই পুস্তিকা বিশেষ সাহায্য করিবে, এই আশায় শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষৎ হইতে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হইল।"

আমরা পুস্তিকাখানি পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি। যতখানি সম্ভব প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা সকলেরই পাঠযোগ্য হইয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিষদের ভাণ্ডারে জমা হইবে।

শ্রীকিরণকুমার রায়

ভাদুড়ী মশাই—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কথা-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ, সুরসিক কেদার বাবুর গ্রন্থের পরিচয় পাঠকগণকে আর বেশী করিয়া দিতে হইবে না। ব্যঙ্গ ও হাস্য-রসের সৃষ্টি করিতে তিনি যে সিদ্ধহস্ত তাহা তাঁহার 'কোষ্ঠীর ফলাফল' প্রভৃতি গ্রন্থ যিনি পড়িয়াছেন তিনিই জানেন। এই উপন্যাসেও তাঁহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোককেই অল্প-বিস্তর স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার অনাবিল হাস্য-রসও সকলকেই আনন্দ দান করে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। হাস্য ও ব্যঙ্গ-রস স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সাবলীল হইলেই সু-সাহিত্য হয়। আমাদের মনে হয়, আলোচ্য গ্রন্থের রস কয়েক স্থলে কষ্টকল্পিত অনুপ্রাস এবং কোনও কোনও শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে একটু একঘেয়ে হইয়াছে। গ্রন্থকারের 'কোষ্ঠীর ফলাফল' পড়িলে এই পুস্তকের আচার্য্য-চরিত্রের মাধুর্য্য যেন কমিয়া যায়। আচার্য্যের উক্তিগুলি অনেক স্থলে বাক্-বাহুল্যে রস-মধুর হইতে পারে নাই। এমন একখানি সুখপাঠ্য পুস্তকের স্থানে স্থানে একটু আধটু কাটাই ছাঁটাই করিলে, ইহা আরও সুন্দর ও সমঞ্জস হইত।

মাতঙ্গিনী ও মন্দাকিনী ঔপন্যাসিকের অপূর্ব্ব, সুন্দর স্ত্রীচরিত্র। দুই জন দুই রকম। দুই জনই স্বামী ও সংসার ভালবাসে। দুইয়ের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের নারী-চিত্তের প্রতি বিশেষ অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্য বইখানিকে আগাগোড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। দোষে গুণে আচার্য্যের জুড়ি মিলে না। 'সপ্তর্ষি মণ্ডল'এর সৃষ্টিটি বেশ জীবন্ত ও ব্যঙ্গ-রসের আকর হইয়াছে। মতি বাবুর চরিত্রটি ফুটিয়াছে

বলিয়া মনে হয় না। মীরা ও ইরার চরিত্র বেশ হইয়াছে। মীরা ও ইরা দুই বোন—দুই জন দুই রকম। মীরা ধীর স্থির গম্ভীর, অতি লাজুক, বুক-ফাটে ত' মুখ-ফোটে-না-ধরণের। আর ইরা সদা প্রফুল্ল, প্রস্ফুরিতাধরা। ইরা যেন মীরাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—ইরা না থাকিলে মীরা ফোটে না। কবির এই কল্পনা যেমন মনোরম তেমনি উপভোগ্য। কিন্তু একটা কথা—ইরার চিত্রে স্থানে স্থানে যেন একটু বেশী চটুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐটুকু বর্জ্জিত অথবা সুমার্জ্জিত হইলে উহা আরও মনোজ্ঞ হইত। মোটের উপর, পুস্তকখানি ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, মাতা সকলকে লইয়া উপভোগ করা যায়—'আধুনিকতা'র কোন উচ্ছ্বাস বা গন্ধ ইহার কোথায়ও নাই। বর্ত্তমান যুগে ইহাও এই গ্রন্থের সুতরাং গ্রন্থকারের একটা মস্ত বিশেষত্ব। ইহার ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের ত তুলনাই নাই। বাঙ্গলার পাঠক-মহলে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে বলিয়াই মনে হয়। বইখানিও প্রকাণ্ড—তিন শত পৃষ্ঠার উপর। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই ভাল।

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—শ্রীঅরবিন্দ-লিখিত। প্রকাশক—শ্রীরামেশ্বর দে, চন্দননগর। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই গ্রন্থে আমাদের ধর্ম্ম, গীতার ধর্ম্ম, মায়া, অহঙ্কার, স্বাধীনতার অর্থ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, জাতীয় উত্থান, দেশ ও জাতীয়তা প্রভৃতি কুড়িটি ছোট ছোট প্রবন্ধ আছে। উহা সবই ১৩১৬ সালে অরবিন্দ বাবু পরিচালিত 'ধর্ম্ম' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়েই প্রবন্ধগুলি সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রবন্ধগুলি মোটের উপর বলিতে গেলে জাতীয়তা ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধেই লিখিত। গ্রন্থকারের সহিত সব বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও প্রবন্ধগুলি যে গভীর চিন্তাশীলতায় পূর্ণ তাহা বলা যায়। ১৩২৭ সালে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ হয়। তাহার পর ইহার আরও দুই বার মুদ্রণে সাধারণের নিকট ইহার আদরেরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে সুচিন্তিত নিবন্ধের যেরূপ অভাব হইয়াছে তাহাতে আমরাও ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। রামেশ্বর বাবু ইহার এমন সুন্দর সংস্করণের জন্য ধন্যবাদার্হ। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে—ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীকান্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক—দাস গুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় পয়সা।

অন্তঃসত্বা, প্রসূতি ও শিশুর কি কি রোগ হইতে পারে এবং ঐ ঐ অবস্থায় কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভাবী মাতা ও প্রসূতির বিশেষ উপকারী। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে আমাদের দেশের প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কিছু কমিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক বৎসরের মধ্যে দুইটি সংস্করণ হওয়ায় গ্রন্থের আদর হইয়াছে দেখা যাইতেছে। পুস্তকের মূল্য অতি সামান্য। ইহা সকলেরই ঘরে একখানি করিয়া রাখা উচিত। বাঙ্গলা ভাষায় এই জাতীয় অতি সুলভ গ্রন্থ এই প্রথম দেখিলাম বলিয়া মনে হয়।

চিকিৎসা-সোপান—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী এম, এ, প্রণীত। প্রকাশক—মেসার্স আর, সি, দধি এণ্ড কোং, মিহিজাম পোঃ, ই, আই, আর। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

বহিখানি ছোট হইলেও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। জীবাণু ও রোগ, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থী ও রোগ, বায়োকেমিক টীসু ঔষধ ও রোগ, এবং মহাত্মা হানিমানের মত—হোমিওপ্যাথিক মতে পারিবারিক চিকিৎসার ঔষধ নির্ব্বাচনের কথা ছাড়া উপরি উক্ত বিষয় কয়টি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা সাধারণের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। রোগের লক্ষণাবলী ও ঔষধ-নির্ব্বাচনের পদ্ধতি আর একটু বিশদ হইলে ভাল হইত। পুস্তকের ভাষা ভাল—সামান্য লেখাপড়া জানা স্ত্রীপুরুষ সকলেই ইহার সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া উপযুক্ত ডাক্তারের প্রতীক্ষা করিতে পারিবেন।

শ্রীপঙ্কশিখ ভট্টাচার্য্য

বীমা-প্রসঙ্গ

সম্প্রতি আমেরিকার বীমা-জগতের একটি মজার কাহিনীর খবর পাওয়া গিয়াছে। বি, বি. ক্র্যাণ্ডাক নামে জনৈক ভদ্রলোক বীমা করিয়া, ঐ বীমার টাকা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পাইবেন, এমন ব্যবস্থা করেন। কয়েক বৎসর পরে ভদ্রলোক জলে ডুবিয়া মারা যান্ খবর আসে। দাবী প্রমাণিত হইলে কোম্পানী ভদ্রলোকের বিধবাকে বীমার টাকা দিয়া দেয়। অতঃপর কিছু দিন পরে সংবাদ পাওয়া যায়, ভদ্রলোক মরেন নাই। তখন ঐ বীমার এবং অন্যান্য আরও কোম্পানীতে ভদ্রলোক যেসব বীমা করেন, সেই সব বীমার টাকা একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ডে জমা রাখা হয়। চুক্তি থাকে যে, তিন বৎসরের মধ্যে বীমা-কোম্পানীগুলি বীমাকারী ভদ্রলোক জীবিত আছেন প্রমাণ করিতে পাইলে সমস্ত টাকা ফেরৎ পাইবে। চুক্তির তিন বৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিয়া যাইবার দিন কয়েক পরে বীমাকারী ব্যক্তি বাঁচিয়া আছেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আবার ট্রাষ্ট ফাণ্ড সৃষ্টি হয়। এইবার নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে ভদ্রলোক সত্যই বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু তখন ভদ্রলোকের স্ত্রী টাকাকড়ি বীমা-কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিয়া বসেন। ফলে বীমাকোম্পানী মোকর্দ্দমা করিতে বাধ্য হয় এবং মোকদ্দমায় জয় লাভ করে।

'**ওরিয়েন্ট্যাল**' গত ১৯৩১ সনে মোট ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৯ শত ৫৪ টাকার জন্য ২৬,৪৮৬ খানি প্রস্তাব-পত্র মঞ্জুর করিয়াছে। দেশব্যাপী এই অর্থ-সঙ্কটের বৎসরে এই পরিমাণ ব্যবসায়-সাফল্য কেবল প্রশংসার্হ নয়, বিস্ময়কর।

বীমা করিতে গিয়া আমাদের দেশের লোকের মনে যে-চিন্তা আসে, তাহার একটি এই যে, মরিলে স্ত্রী-পুত্র টাকাটা পাইবে কিনা, পাইলেও তাহার অপব্যয় না হইয়া তাহাদের কাজে লাগিবে কিনা। স্ত্রী-পুত্র টাকাটা পাইবে কি পাইবেনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। দাবী প্রমাণ করিতে দেরী হয় বলিয়া মাঝে মাঝে বীমাকারীর মৃত্যুর কিছু পরে বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে টাকাটা আদায় হয়—ইহা সত্য কথা, কিন্তু টাকা একেবারেই পাওয়া যাইবে না, এমন কথা উঠিতেই পারে না।

কিন্তু টাকা পাওয়া গেলেও বীমাকারী যে উদ্দেশে টাকাটা রাখিয়া যান, সে উদ্দেশে অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য সে-টাকা ব্যয়িত না হইয়া অন্য ব্যপদেশে উহা খরচ হইয়া যায়, এ দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। ইহাতে বীমার যাহা একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাই ব্যাহত হয়। সুতরাং এরকম দৃষ্টান্ত নজরে পড়িলে, বীমা সম্বন্ধে যে কোনও ব্যক্তির শ্রদ্ধা কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। একবারে থোক্ ৫০০০ কি ১০০০০ হাজার টাকা নাবালক ছেলেদের হাতে পড়িলে কিম্বা বিধবার নিকট ন্যস্ত থাকিলে, এ টাকার সদ্ব্যয় হওয়ার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু এই টাকাটাই যদি মাসিক কিস্তিতে কম-কম করিয়া ইহাদিগকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তবে এ আশঙ্কার কারণ থাকে না।—এই সব কারণে আজকাল দু'য়েকটি কোম্পানী নূতন পদ্ধতির একটি বীমা-ব্যবস্থা করিয়াছে।

'**এম্পায়ার**'এর 'ফ্যামিলি সিকিউরিটি পলিসি'তে এই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার উত্তরাধিকারীকে শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে মোট বীমার টাকা হইতে কিছু টাকা এককালীন থোক্ দেওয়া হইবে। অতঃপর বীমাকাল যতদিন অবধি শেষ না হয় ততদিন মাসিক কিস্তিতে কিছু কিছু টাকা মৃত বীমাকারীর পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দেওয়া হইতে থাকে। অবশেষে বীমাকাল উত্তীর্ণ হইলে মোট বীমার অবশিষ্ট টাকাটা পাওয়া যায়। যদি বীমাকাল উত্তীর্ণ হইবার পরে বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তবে বোনাসসহ মোট বীমার টাকাটা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী কুড়ি বৎসরের মেয়াদে দুই হাজার টাকার বীমা করিলে মেয়াদ-কাল মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে, প্রথমে নগদ ২০০৲ মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক ২০৲ টাকা এবং উত্তীর্ণ হইয়া গেলে থোক ১৮০০৲ টাকা পাওয়া যায়। মেয়াদ-কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর বীমাকারীর মৃত্যু হইলে থোক্ ২৮০০৲ টাকা বোনাসসহ একেবারেই পাওয়া যাইবে।

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের দিক হইতে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট লোভনীয়। মাসে মাসে টাকা পাইবার ব্যবস্থা থাকিলে, স্ত্রীপুত্রের যে ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের বীমা করা সেই উদ্দেশ্য সফল হয়।

'মেট্রোপলিটান' ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী প্রথম বৎসরেই ৪০ লক্ষ টাকার ব্যবসায় সংগ্রহ করিয়া ভারতের বীমা-জগতে এ সম্পর্কে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই কোম্পানীর প্রত্যেক বীমাকারীই দৈবদুর্ব্বিপাক কিংবা চিরস্থায়ী অক্ষমতার জন্য বীমাবিষয়ে যে সব ব্যবস্থা আছে তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে। এজন্য কোনও অতিরিক্ত চাঁদা দিতে হয় না। কোম্পানীর বাতিল বীমা বাকী চাঁদা না দিয়াও পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। বাঙালী-পরিচালিত এই কোম্পানীর আমরা সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

বর্ত্তমানে দেশব্যাপী ব্যাঙের ছাতার মতো যে-সব হরকছম বীমা কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে, আমরা বহুবার তাহাদের সম্পর্কে আমাদের পাঠকগণকে সচেতন করিয়াছি। ইহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গুজরাটে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রেরণায় একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গুজরাট কংগ্রেস কমিটি হইতে যে ইস্তাহার জারী হয়, তাহার কিয়দংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি—On reading the report of the Provident Society Vigilance Committee, it is found that the Free Insurance Companies working on the Dividing Principle are defrauding the ignorant and poor people by making false promises of large sums and pushing their business in the name of Swadeshi. Hence the Committee warns the public against walking into the parlour of such so-called Insurance Companies.

অনেক অভিশাপের মতোই বৎসরে বৎসরে বন্যায় বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়া আমাদের দেশের লোকের প্রায় গা-সহা হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসরই বন্যা হয় এবং প্রতি বৎসরই বন্যা-পীড়িতের জন্য আমরা চাঁদা তুলিয়া বেড়াই। এ সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু আমাদের কর্ত্তব্য আছে কি না সে কথা ভাবি না। গত ভূমিকম্পে জাপানের কিয়দংশ ধ্বংস হইয়া যাইবার পর হইতে জাপানে ভূমিকম্পের আশঙ্কায় চাষীরা তাহাদের ফসল ইত্যাদি বীমা করিতে সুরু করিয়াছে। ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি আকস্মিক সব উৎপাত এ্যাক্চুয়ারীর হিসাবখাতায় অঙ্কপাত করিতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় 'ইন্সুরেন্স ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার মারফৎ আমাদের দেশে বন্যার আশঙ্কায় বীমা সম্ভবপর কি না, এ বিষয়ে একটি জ্ঞাতব্য নিবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে বীমা কোম্পানীগুলির ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd., 56, Dharamtala Street, Calcutta.

ভারতীয় মহিলাদিগের

আদর্শ সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

প্রধান সম্পাদিকা—

মিস্ রুত, ই, রবিন্সন

বাঙ্গালোর।

ক্যানারীজ ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিস্ এম, এম, বগ্‌বী,

কোলার টাউন।

হিন্দী, উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিস্ চেষ্টার,

মোরাদাবাদ, ইউ, পি,

বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা—

মিসেস, এস্, কে, মণ্ডল

বোলপুর, (বীরভূম) ই, আই; আর, লুপ।

মহারাষ্ট্র ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা-

মিস ক্লেনার,

ক্লাব ব্যাক রোড।

বাইকুল্লা বোম্বাই।

তামিল ভাষায় মুদ্রিত মহিলা বান্ধবের সম্পাদিকা-

মিসেস এইচ, এফ্, হিলমার,

মেথোডিষ্ট পাবলিশিং হাউস, মাদ্রাস।

বাঙ্গলা ভাষার অনুবাদক—শ্রীযুত অমরনাথ বিশ্বাস।

এক কপি মহিলা বান্ধব একই ঠিকানায় এক বৎসরের জন্য

মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸৹ বার আনা।

UPASANA—Regd. No. C. 1695.